সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ

সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ

সুদেষ্ণা বসাক

সম্পাদিত

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ২০০১

পুনশ্চ, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিণ্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪ এন,
ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

মা-কে

বিষয়সূচী

প্রবন্ধ

চিঠিপত্র

ভূমিকা

সুলেখা দাশগুপ্ত রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। আমার প্রয়াত মায়ের বহুদিনের সাধ পূর্ণ হলো। আফসোস রইল তিনি নিজে বইটি দেখে যেতে পারলেন না।

দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সুলেখা দাশগুপ্ত ঢাকা শহরের অধিবাসী ছিলেন। সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান এবং জীবনের পরম লক্ষ্য-যেটা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জ্জন করেছিলেন। সাহিত্য ও শিল্পচর্চা ছিল তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের অঙ্গ। প্রয়াত লেখক জ্যোতির্ম্ময় রায়, যাঁর উপন্যাস 'উদয়ের পথে' গত শতকের চল্লিশদশকের একটি পথিকৃৎ উপন্যাস—ছিলেন তাঁর অতিশ্রদ্ধেয় দাদা, যিনি তাকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময় রায়ই ছিলেন সর্ববাপারে তাঁর সমর্থক, প্রেরণা এবং উৎসাহ দাতা।

সুলেখাদেবীর অল্পবয়সে বিবাহ হয়ে যায় ঢাকার একটি রক্ষণশীল, একান্নবর্ত্তী পরিবারে— যেখানে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর চল থাকলেও গল্প-উপন্যাস লেখার চল ছিলনা। ঢাকা শহরে তাঁর শ্বশুর-বাড়ীতে তখনও বিজলী আলো, পাখা এসে পৌঁছয়নি। রাত্রিবেলা সব কাজ সেরে, হ্যারিকেনের আলোয় মশারীর ভেতরে বসে তিনি লিখে চলতেন পাতার পর পাতা। অনেক সময় অযথা তেলপুড়ছে অনুযোগ শুনে তাঁকে আলো নিবিয়ে দিতে হতো। লেখা বন্ধ করে দিতেন, কিন্তু তাঁর অন্তরের প্রেরণা তো বন্ধ হতোনা।

দেশবিভাগের পর কলকাতায় এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে লাগলেন তিনি স্বামী, পুত্র-কন্যা এবং অন্যান্য পরিজন সহ। ঢাকা শহরের পারিবারিক কূপমন্ডুকতা থেকে বেরিয়ে এসে কলকাতার সাহিত্যিক পরিমন্ডল তাঁকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করল। জ্যোতির্ম্ময় রায়ের প্রিয় ভগ্নী হিসেবে পরিচিত হলেন অনেক জ্ঞানী গুণীজনদের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, সৈয়দমুজতবা আলী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সুলেখাদাশগুপ্তকে লেখিকা হয়ে উঠতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রী প্রাণতোষ ঘটক। তিনিই কলকাতার পাঠক সমাজের কাছে সুলেখাদেবীকে ছাপার অক্ষরে পরিচিত করেন— 'জিজ্ঞাসা' নামে একটি বড় গল্প ধারাবাহিক চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত করে। মাসিক বসুমতীতে পরপর তাঁর তিনটি উপন্যাস —'মিত্রা', 'বর্ণালী' এবং 'হৃদয়পাতো' পাঠকদের মনে সাড়া জাগায়। ঔপন্যাসিক হিসেবে সুলেখাদাশগুপ্ত পরিচিতি লাভ করেন। একমাত্র 'মিত্রা' উপন্যাসটি বই আকারে ছাপা হয় ১৯৬০ সালে। বাকিউপন্যাসদুটি বসুমতীর পাতাতেই আবদ্ধ থাকে।

সুলেখা দাশগুপ্তকে প্রকৃতপক্ষে নারীবাদি লেখিকা আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর উপন্যাস এবং ছোটোগল্পগুলিতে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ এবং পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিটি উপন্যাস নায়িকা প্রধান এবং সেই নায়িকারা সংসারের মধ্যে বাস করেই মেয়েদের বিরুদ্ধে সমাজের দেওয়া প্রতিটি অন্যায় অবিচারের সঙ্গে লড়াই করেছে, করেছে তার দীপ্ত প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদী নারী চরিত্রের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত 'বর্ণালী'র দুই নায়িকা মঞ্জু এবং মৌরী। মিত্রা এবং শিবানী যদি লেখিকার প্রতিবাদী কলমের সার্থক সৃষ্টি হয়, বর্ণালীর মঞ্জু তাহলে তাঁর মানসকন্যা, যে জোয়ান-অব-আর্কের মত স্ফুলিঙ্গ নিয়ে দেশ এবং সমাজকে বদলে দিতে চায়!

১৯৫৫ (বাংলা ১৩৬২) সনে সুলেখাদেবী সম্পাদিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ঐ বছর তিনি 'বলাকা' নামদিয়ে একটি মহিলা মাসিকপত্র সম্পাদনা সুরু করেন যার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করেছিলেন। এই মাসিকপত্রটি একটি সুরুচিপূর্ণ, বিদগ্ধ কাগজ হিসেবে গুণীজনের স্বীকৃতি লাভ করে প্রকাশনার প্রথম বছরেই। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক শ্রীহিরণকুমার সান্যালের কথায়— ''কাগজটি যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা হয়েছে, মেয়েলি পত্রিকা নয়।''

সম্পাদিকা হিসেবে সুলেখাদাশগুপ্ত তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা— সমাজের মঙ্গল, সাধারণ মানুষের মঙ্গল, সত্য, শিব সুন্দরের আরাধনাই যে সরস্বতীর আরাধনা, এটা প্রমাণ করেছেন 'বলাকা' পত্রিকার পাতায় পাতায়; তাঁর প্রতিটি সম্পাদকীয় তে, প্রতিটি প্রবন্ধে এবং পাঠিকাদের চিঠি-পত্রের উত্তরে। লেখক, চিন্তাবিদ এবং সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থের ঊর্ধে উঠে একটা বৃহত্তর আদর্শের জন্যে কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র সস্তা চমক দিয়ে পাঠকের মনোরঞ্জন করা সুস্থ-সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হতে পারে না। এটাই ছিলো 'বলাকার' মূল বক্তব্য।

এই মাসিকপত্রটি নিয়মিত প্রকাশ করতে তাঁকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সংগ্রামটা কি ধরনের সেটা তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছেন, যেগুলো এই রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে। বিজ্ঞাপন যোগাড় করার জন্যে তাঁকে প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের দোরেদোরে ঘুরতে হয়েছে। আর্থিক সঙ্গতি এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অভাবে 'বলাকা' মাঝে মধ্যে ডানা গুটিয়ে বসে পড়েছে। আবার যখনই কিছু বিজ্ঞাপন যোগাড় করতে পেরেছেন, তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন কখনো শারদীয় সংখ্যা হিসেবে, কখনো ভাষা সংখ্যা হিসেবে, কখনো বা অনুবাদ সংখ্যা। প্রত্যেকটি সংখ্যাই ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ঠে উজ্জ্বল। তার আরম্ভ থেকে শেষ অবধি সম্পাদিকার নিজস্ব ভাব, ভাষা এবং আদর্শ ছেয়ে থাকত। তিনিই ছিলেন এই সাময়িকপত্রের প্রাণ।

এই রচনাসংগ্রহে, সুলেখা দাশগুপ্তের উপন্যাস এবং গল্পগুলির সঙ্গে 'বলাকা'র সম্পাদকীয় 'বলার কথা' এবং চিঠিপত্রগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর সম্পাদক সত্ত্বাকে উপেক্ষা করা যায়না বলেই এটা করা হয়েছে। পাঠকের মনোবঞ্জনকারী হয়তো তাঁর উপন্যাস গুলোই হবে, কিন্তু মননশীলতাও তো উপেক্ষা করার বস্তু নয়।

লেখকের অনেক লেখার পান্ডুলিপি হারিয়ে গেছে বা পাওয়া যায়নি। ভ বিষ্যতে সেগুলোর সন্ধান পেলে আরো একটি সংগ্রহ প্রকাশ করার কথা ভাবা যেতে পারে। যেগুলো আছে সেগুলো সন্ধান করে একত্র করতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশিষ্ঠ লেখক-সাংবাদিক শ্রীনিখিল সরকার (শ্রীপান্থ নামেই যিনি বেশী পরিচিত) মহাশয়ের কাছে যে সহযোগিতা এবং উপদেশ পেয়েছি তা অমূল্য। নিখিলবাবু তরুণবয়সে 'বলাকা'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং সুলেখাদাশগুপ্তকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। তাঁর সেই কাছে থেকে দেখার উপলব্ধিটুকু দিয়ে তিনি আমাকে এই রচনাসংগ্রহ পরিকল্পনা করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং "পুনশ্চ" প্রকাশনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

'সুবর্ণরেখা' প্রকাশনার কর্ণধার শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার মাসিক বসুমতীর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার সংখ্যাগুলি তাঁর সংগ্রহশালা থেকে, এনে না দিলে 'বর্ণালী' এবং 'হৃদয়পাতো' উপন্যাসের সন্ধান পেতামনা। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই সংকলনের প্রস্তুতিপর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্ত্তী তার কাছে তখনও অজানা লেখক সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুলেখা দাশগুপ্তর সমগ্র রচনা পড়ে তিনি সানন্দে তার বিস্তারিত আলোচনা করতে সম্মত হন। তার এই উৎসাহ এবং আন্তরিকতার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আশাকরি তার লেখা মূল্যায়ন পড়ে আজকের বাঙ্গালি পাঠক সমাজ সুলেখাদেবী এবং তাঁর রচনার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন। নারীর রচনা সম্বন্ধে অধুনা যে অনুসন্ধান এবং গভীর আলোচনা চলেছে সেখানে সুলেখা দাশগুপ্ত তাঁর প্রাপ্ত স্থান লাভ করবেন।

সবশেষে কিন্তু সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদ প্রাপ্য 'পুনশ্চ' প্রকাশনার কর্ণধার শ্রীসন্দীপ নায়কের। তরুণ এই প্রকাশকের কাছে যে হার্দিক ব্যবহার এবং সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি তা অমূল্য।

৬.১.২০০১ সুদেষ্ণা বসাক
কলকাতা

বিস্মৃত-প্রায় নাম, অবিস্মরণীয় রচনা

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

বাঙালি পাঠকের কাছে হয়তো সুলেখা দাশগুপ্তার নাম আজকের দিনে ততটা পরিচিত নয়। তার দরুন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সাহিত্যখ্যাতির শেয়ার বাজারে বিশ্ব জুড়ে ওঠানামা লেগেই আছে। জীবদ্দশাতেও এই লেখিকা প্রচারবিমুখ ছিলেন মনে হয়। তবে আজকের দিনে তাঁকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়োজন আছে। তাঁর নিজস্ব প্রতিভা ও শিল্পগুণ যেমন পাঠককে তৃপ্ত করবে, তেমনি উত্তর-আধুনিক, উত্তর-নারীবাদী যুগে তাঁর সামাজিক বিশ্লেষণ, পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তরের দশকে দুই বাঙলার মধ্যবিত্ত নারীর অবস্থান চিত্রণ, নতুন ভাবে আলোকপাত করবে। একটু পুরানো দিনের মহিলা সাহিত্যিকদের দিকে ফিরে তাকানো তো এখন প্রায় প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ।

সুলেখার রচনাসংখ্যা খুব বেশি নয়। তিনি প্রকাশ করেছিলেন তিনটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, দুটি বড় গল্প বা নভেলেট, তিনটি ছোট গল্প, গোটাকয়েক ফিচারধর্মী রচনা। তাছাড়া "বলাকা" প্রত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে তিনি সম্পাদকীয় কলাম লিখতেন। পরিমাণে স্বল্প হলেও, এই সৃষ্টি মনে দাগ কাটার মতো। তার কয়েকটি দিক নিয়েই আমরা এখানে আলোচনা করব।

উপন্যাস ক'টির কেন্দ্রে দেখা যায়, এক বা একাধিক নারী ও তাদের সমস্যা। এটা অবশ্য ওই যুগের বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আকাশ থেকে পড়ার মতো কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক অগ্রগণ্য লেখক নারীর মূল্য, নারীর অধিকার, পরিবারে ও সমাজে নারীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কলম ধরেছেন। মেয়েরা নিজেরাও থেমে থাকেন নি। উনবিংশ শতাব্দী থেকে আমরা দেখেছি রাসসুন্দরী, কৈলাসবাসিনী, কৃষ্ণভামিনী প্রমুখ গৃহবধূর, নটী বিনোদিনীর মতো সমাজবহির্ভূত শিল্পীর আত্মচরিত ও নারী সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ কেবল পুরুষ সংস্কারকদের হাত ধরে নয়, মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের পথ উন্মোচন করতে শিখেছেন, ধীরে ধীরে, বহু বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা নারী সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যানধারণাকে অনেকখানি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। যেমন অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জানিয়েছিলেন প্রগতি আন্দোলনের লেখক গোষ্ঠী। দ্বিতীয়োক্ত শিবিরের উল্লেখযোগ্য নাম, সাবিত্রী রায় ও আর এক সুলেখা, সুলেখা সান্যাল। এ সব সত্ত্বেও সুলেখা দাশগুপ্তার উপস্থাপনা মৌলিকতা ও বৈচিত্র্যের দাবিদার।

ধরা যাক, সুলেখার বড় গল্প 'জিজ্ঞাসা" ও উপন্যাস "হৃদয় পাতো"র কথা। দুটির কাহিনী এক। বড় গল্পটি ডালপালা বিস্তার করে উপন্যাসে পরিণত হয়েছে। যে ধরনের রূপান্তর দেখা যায় অনেক লেখকের অনেক রচনার ক্ষেত্রে। বড় গল্পে স্বামীর নাম, শিবনাথ, স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী। উপন্যাসে পাল্টে তারা হয়েছে ইন্দ্রনাথ আর শিবানী। গল্পের বীণা হয়েছে নমিতা।

দুই কাহিনীতে ইন্দ্রাণী/শিবানী বিশাল ধনীর বধূ। একচ্ছত্র সংসারের কর্ত্রী। রাজকীয় আরাম বিলাস তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে।

> "পঞ্চাশ জনের আরাম ও সুখ-সচ্ছন্দ-বাসের আয়োজনে বাস করে কিন্তু
> দু'টি ব্যক্তি—ইন্দ্রাণী ও তাহার স্বামী শিবনাথ।" (জিজ্ঞাসা)

শিবনাথ চায়, এই ঐশ্বর্য নিয়ে ইন্দ্রাণী যেন খুশি থাকে। কিন্তু সোনার খাঁচায় পাখি হতে ইন্দ্রাণী নারাজ।

> "গাড়ী, বাড়ী, জড়োয়ার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ-বিস্ময়ে মজিয়া থাকিবে—কর্ত্রীত্ব করিবে
> সর্ব্ব বিষয়ে, শুধু তাহাকে বাদ দিয়া, —কিন্তু সব কিছুতেই যেন উল্টা হইয়া
> গেল। তাহার সব কর্ত্রীত্ব শুধু শিবনাথকে লইয়া।" (জিজ্ঞাসা)

শিবনাথ ব্যবসায়ী হলেও অফিসের বাইরে তার আচরণ পায় "সাহেব বিবি গোলাম" উপন্যাসে জমিদার বাড়ির কর্তাদের মতো। সে অপরিমিত মদ্যপান করে, নারীকে ভাবে সহজলভ্য ভোগ্যবস্তু। নিষিদ্ধ প্রমোদের জন্য একটি বাগানবাড়িজাতীয় বাড়ি রাখে। সেখানেই মাতাল হয়ে ধর্ষণ করে স্ত্রীর বান্ধবী বীণা/নমিতাকে। বীণা

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা এক ছিন্নমূল, হতদরিদ্র, উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে। পেটের দায়ে, চাকরের খোঁজে পুরানো বন্ধু ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ইন্দ্রনাথ অবশ্য তাকে চিনত না। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বীণা হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, কারণ, তার হাতে ট্রামবাসের ভাড়া দেওয়ার মতো পয়সা ছিলনা। বাধ্য হয়েই সে পাশ দিয়ে যাওয়া শিবনাথের গাড়ির ''লিফট্'' নিয়েছিল। মত্ত অবস্থায় শিবনাথ ধরেই নিয়েছিল, একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা, অপরিচিত পুরুষের গাড়িতে উঠতে রাজি হওয়া মেয়ে নিশ্চয় ''খারাপ মেয়ে''। তাই বীণার সম্মান নষ্ট করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। মূল্য হিসাবে কিছু টাকা দিয়েই তার বিবেক পরিষ্কার।

এহেন গুণধর স্বামীর স্ত্রী ইন্দ্রাণী অবশ্য ''সাহেব বিবি গোলাম'' -এর পটেশ্বরী বউঠান নয়। সে স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকে না। (যদি শিবনাথ সময়মতো বাড়ি ফেরে, তবেই শিবনাথের আগে সে ফিরবে। ইন্দ্রাণী আধুনিক মেয়ে। স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার, পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে বিশ্বাসী।) সে স্বামীর পায়ে ধরে কাঁদে না। আবার অনর্থক ঝগড়া করে সময় ও শক্তির অপচয়ও করে না। বরং ইন্দ্রাণী স্বামীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজের স্বতন্ত্র জীবন গড়ে তোলে। চাকরি করে, পিয়ানো বাজায়, নিজস্ব বন্ধুদের সঙ্গে মেশে। অবশ্য ইন্দ্রাণী/শিবানী একজন উচ্চাশা সম্পন্ন, ''কেরিয়ার'' সচেতন নারী, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাকে পায়ের তলায় মাটি দিয়েছে। কিন্তু এটাও তার মূল লক্ষ্য নয়। চাকরি যেন, স্বামীর উপর প্রতিশোধ। স্ত্রীর স্বাধীন কাজ, উপার্জন ইন্দ্রনাথ/শিবনাথের দু'চোখের বিষ। তার জ্বালাই ইন্দ্রাণী/শিবানীর আনন্দ।

অন্য ভাবে কি প্রতিশোধ নেওয়া যেত? স্বামী যেমন ফুলে ফুলে মধুপান করে বেড়ায়, তেমনি ইন্দ্রাণী কি ঝুঁকতে পারত অন্য পুরুষের দিকে? শিবনাথ অবশ্য সেটাই সন্দেহ করে।

> ''আমার জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকবে একি হতে পারে! তোমার প্রতীক্ষায়ই
> বসে থাকে, কত কত লোক।'' (জিজ্ঞাসা)

ইন্দ্রাণী/শিবানীর ভক্ত আছে। কিন্তু কারোর প্রতি সে তেমন ভাবে আকৃষ্ট নয়। অন্য পুরুষের মধ্যেও সে হয়তো দেখে নিজের স্বামীর ভয় জাগানো ছায়া। আর এক পথ হয়তো খোলা ছিল, অথবা উন্মুক্ত হতে চলেছিল। কাহিনীর পটভূমিকা মধ্যপঞ্চাশের দশক। হিন্দু পারিবারিক আইন পাশ হতে চলেছে। তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। রক্ষণশীলরা প্রত্যাশিত ভাবেই নববিধানের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এর দরুন হিন্দু পরিবার ও সমাজব্যবস্থা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু কেউ কেউ নারীর প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সমালোচনা করেছিলেন। যেমন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা আচার্য কৃপলানির মতে, বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতা মেয়েদের বিপন্ন করবে। ডিভোর্সিরা যাবে কোথায়? বেশির ভাগ অর্থনৈতিক ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। তাদের দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রায় অসম্ভব, বিশেষতঃ যদি প্রথম পক্ষের সন্তান থাকে। লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী ''কল্যাণী'' উপন্যাসে এ কথাই বলেছিলেন ও নতুন আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। কৃপলানির পরামর্শ, যদি বিবাহ বিচ্ছেদ চালু করতেই হয়, তবে সে অধিকার একমাত্র মেয়েদের দেওয়া হোক। উল্লেখযোগ্য যে এনলাইটেনমেন্ট যুগের অন্যতম ফরাসি দার্শনিক মতেস্ক একই কথা বলেছেন। মেয়েরা দুর্বল বলে তাদের এই রক্ষাকবচটুকু চাই।

সুলেখা দাশগুপ্তা সমসাময়িক এই বিষয় ও বিতর্ক নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন। পত্রিকা ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন দেখি। তিনি কিন্তু কৃপলানির সঙ্গে একমত ছিলেন না। বরং মেয়েরা বিবাহ বিচ্ছেদের যাকে বলে receiving end, তাতে থাকার ঝুঁকি নিক। প্রচলিত অবস্থাতেই কি তার আসন খুব নিরাপদ?

> ''নারীর থাকার চিন্তা! পূর্বকালের কুলীন কন্যারা কোথায় থাকত? বর্তমানে
> বিধবা নারী কোথায় থাকে? স্বামী-ঘর-চ্যুত নারীর সংখ্যা এখনও কম নয়,
> তারা আছে কোথায়? সুখের আশায় ঘর বেঁধে দেন যারা সে ঘর দুঃখের
> হলে বুকেও টেনে নেন তারাই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত
> প্রয়োজনে যা চলছিল তাই চলবে।..........
> আমরা বলি, তাও ভালো। যা করবার ছেড়ে দিয়ে, করতে হবে, বেঁধে রেখে
> পারবে না--- সেই মস্ত মুক্তি।'' (সম্পাদকীয়, বলাকা, শ্রাবণ- ১৩৬২)

হিন্দু সংসার মাত্রই স্বর্গরাজ্য, নতুন আইন সেখানে সর্বনাশ ডেকে আনবে, এ যুক্তিও সুলেখার কাছে গ্রাহ্য হয় নি। সত্যিই বিবাহিত জীবন কতখানি সুখী, তা এই আইনের কষ্টিপাথরে বরং যাচাই হয়ে যাবে।

''আইন চালু হওয়া মাত্র সুখী দম্পতি সুখের ঘর ভেঙ্গে দিয়ে, বিচ্ছেদ ব্যবস্থা
আনতে ছুটবে—এ নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়।
আর যাদের দাম্পত্য জীবন গেঁথে আছে শুধু আইনের বাধার
উপর তাদের সে বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়াই মঙ্গলের।'' (সম্পাদকীয়, বলাকা, আষাঢ়, ১৩৬২)

এমন কি, বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা হয়তো স্বামীকে স্ত্রীর সম্বন্ধে অধিক সচেতন করে তুলতে পারে। স্ত্রী হাতের পাঁচ, স্বামী ছাড়া গতি নেই, এই ধারণাই হয়তো তাকে ঠেলে দেয় অবহেলার অন্তরালে।

....''হৃদয় পাতো'' উপন্যাসে শিবানী, আসন্ন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে একথাই বলে। এ ভাবেই চিন্তা করে। সন্দেহ নেই। নায়িকা ও লেখিকা এ ক্ষেত্রে অভিন্ন।

কাহিনীর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইন্দ্রাণী/ শিবানী বিবাহ বিচ্ছেদ, স্বামীর ঘর ছেড়ে যাওয়া বা এ জাতীয় কিছু করে না। বরং তার ভাগ্য এক অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। সে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর পুত্রসন্তান উপহার দেয় স্বামীকে। ইন্দ্রনাথ/শিবনাথ আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিছুদিন পর আবার ~ ইন্দ্রাণী/শিবানী সন্তানসম্ভবা হয়। এবার তার কিছু লক্ষণ দেখা যায় যা প্রথম বার চোখে পড়ে নি। তাছাড়া ডাক্তারের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর কথোপকথনের কিছু অংশ শুনে শিবনাথ বুঝতে পারে, যে শিশুটিকে তারা ঘরে এনেছে, মানুষ করছে, সে ইন্দ্রাণীর গর্ভজাত নয়। অভিযোগের উত্তরে ইন্দ্রাণী জানায় ছেলেটি তার নয় বটে, তবে শিবনাথের। শিবনাথ বীণা/নমিতাকে ধর্ষণ করেছিল। তারই ফলে এই শিশুর জন্ম। বন্ধুকে বাঁচাতে, স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে একটি অজ্ঞাত মানব সন্তানকে তার পৈতৃক সম্পত্তি ও ঘরের অধিকার দিতে (যদি শিবনাথের মতো পিতা লাভ কোনো শিশুর পক্ষে সৌভাগ্য পণ্য হয়!) ইন্দ্রাণী ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল। সন্তানসম্ভবা সেজে নিজের মা'র কাছে গিয়ে ফিরেছিল বীণার ছেলেকে কোলে নিয়ে।

...স্ত্রীর মহত্ত্বে অভিভূত শিবনাথের মধ্যে যেন নতুন মানুষ জন্ম নিল।

''ইন্দ্রাণীর কমনীয় স্ত্রীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে শিবনাথের চক্ষে আজ এমন
একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দেয় যে, নারীর এই অপূর্ব পরিচয়ে সে
নিজের জীবন সার্থক বোধ করে। সে নিজের সমস্ত অহংকার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে
এই মাধুর্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জ্জন দিল—.... উঠতে হলে,
তোমার দিকে চোখ রেখেই যে আমাকে এগুতে হবে ইন্দ্রাণী।'' (জিজ্ঞাসা)

এই হৃদয় পরিবর্তন কতখানি বিশ্বাসযোগ্য বা স্থায়ী, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ইন্দ্রাণী/শিবানী কি একজন ধর্ষণকারী পুরুষকে সহ্য করতে পারবে, দু'টি শিশুর মুখ চেয়েও? তবু আশা করলে ক্ষতি কি? এই ইতিবাচক ইঙ্গিত সহ উপন্যাস (এবং নভেলেট) শেষ হয়েছে।

বিষয়টি অভিনব ও গভীর অনুভূতির ফল। Ethical Motherhood, নিজের গর্ভজাত নয় এমন কারোর প্রতি নারীর মাতৃভাব, সাহিত্যে বিশেষত বাংলা সাহিত্যে, একটি পরিচিত থিম। এমন কি সপত্নীসন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ (স্বামীর রক্ষিতা বা ধর্ষণের শিকার কি এক অর্থে সতীন?) অন্তত সাহিত্যে দুর্লভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ''রজনী'' উপন্যাসে বৃদ্ধের যুবতী, সুন্দরী স্ত্রী লবঙ্গলতা প্রায় সমবয়সী সৎ ছেলে শচীনকে অপত্য জ্ঞান করে। যে জটিলতা এমন ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারত, তা অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্রের ''শ্রীকান্তে''র রাজলক্ষ্মী ও ''পণ্ডিত মশাই'' -এর কুসুম সামাজিক কারণে (কুসুমের ক্ষেত্রে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক কারণে) স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন থেকে বঞ্চিত। তাদের সমস্ত স্নেহ পড়েছে সতীনের ছেলেদের উপর। ''বিপ্রদাস'' -এ দয়াময়ী, ''বৈকুণ্ঠের উইল'' -এ ভবানী নিজেদের গর্ভজাত পুত্র থাকা সত্ত্বেও স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলের প্রতি অধিক স্নেহশীলা। অনুরূপা দেবীর ''মা'' উপন্যাসে বন্ধ্যা, সত্যিকারের স্বামীসুখহীনা ব্রজরানী শেষে সতীনের ছেলেকে বুকে টেনে শান্তি পায়। কিন্তু ইন্দ্রাণী/শিবানী সহমর্মিতা ও ন্যায়বোধ থেকে যা করে, তা এসব তুলনার বাইরে।

স্বামীর অবৈধ সন্তানদের কি নিজের সন্তানের স্থান দেওয়া যায়? প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিদিজের এক নাটকে দেখি, বীরশ্রেষ্ঠ হেক্টরের বিধবা পত্নী আঁদ্রোমাকের স্মৃতিচারণ। আঁদ্রোমাকনা কি এক কালে। হেক্টরের জারজ সন্তানদের স্তন্য দান করত। কিন্তু সে যা করেছিল তা কর্তব্যজ্ঞানে বা সামাজিক চাপে। ইন্দ্রাণী/শিবানীর মতো আধুনিক, স্বাধীনচেতা নারী নিজের পথ বেছে নিয়েছে। অবশ্য ইন্দ্রাণী সম্পূর্ণ দেবী নয়। তার ভয় হয়, যদি

নিজের সন্তান জন্মালে সে তাকেই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করতে চায়। ঈর্ষা করে যে শিশুকে সে নিজেই রাজপুত্র বানিয়েছে, তাকে সরাতে চায়। তবে এ দুর্বলতা সাময়িক, খুব সম্ভব কাল্পনিক।

''মিত্রা'' উপন্যাসে নায়িকার সমস্যা এসেছে অন্য দিক থেকে, যদিও তার গভীরতা সমান। পিতৃহীনা মিত্রা মামার বাড়িতে মানুষ। তার বিধবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মা মেয়েকে সুখী দেখে মরতে চান। বিয়ের বাইরে কোনো সুখ তিনি কল্পনা করতে পারেন না। মাত্র ষোল সতেরো বছর বয়সে মিত্রার বিয়ে দেওয়া হয়। মায়ের মুখ চেয়ে সে আপত্তি করে না। তবে বনেদী, ধনী, রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়িতে সুখ খুঁজে পায় না। মিত্রার স্বামী লীলাকান্ত শিবনাথের মতো প্রচলিত অর্থে চরিত্রহীন না হলেও মানসিক ভাবে একেবারেই স্ত্রীর যোগ্য নয়। দু'জনের মনের মিল অসম্ভব। মিত্রা পড়া চালিয়ে যেতে উদ্গ্রীব। কিন্তু তাদের বাড়ির বউ কলেজে যাবে, এ কথা ভাবতে লীলাকান্তর হাসি পায়। বড়জোর বাড়িতে পড়া সম্ভব। এ সূত্রেই মিত্রার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে শ্বশুরবাড়ির এক আত্মীয়, ঝকঝকে স্বভাবের তরুণ শমিতের সঙ্গে।

মাত্র কয়েক বছর বিবাহিত জীবনের পর দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে মিত্রা বিধবা হল। স্বামীর অকালমৃত্যুতে হয়তো সে বিশেষ শোকাহতা হয় নি। বরং মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু সামাজিক ভাবে এক তরুণী, সন্তানবতী বিধবার অবস্থা খুব সহজ নয়। সুখেরও বলা যায় না। শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়িতে (মিত্রার ক্ষেত্রে মামার বাড়িতে) স্বচ্ছন্দে নিজের স্থান খুঁজে পাওয়া যেন দুঃসাধ্য। মিত্রা একদিন এক নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে আমিষ খেয়ে ফেলেছিল। সেকেলে বিধবার এই নিয়মভঙ্গ ডেকে এনেছিল কুরুক্ষেত্র। প্রচণ্ড অসুখে মিত্রা প্রায় মরতে বসেছিল। রোগের উৎস কতখানি মানসিক, তা বিচার্য। শেষ পর্যন্ত মিত্রাকে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করল দু'টি বস্তু; তারই নিজের সদ্য আবিষ্কৃত ছবি আঁকার প্রতিভা আর শমিতের ভালবাসা। শমিত উদারভাবে বিধবা, বিশেষ করে সন্তানবতী বিধবা, বিবাহের ''টাবু'' ভেঙে মিত্রা ও তার ছেলেমেয়েদের গ্রহণ করল পরম স্নেহে। দ্বিতীয় বিয়ের পর মিত্রা একটি স্বতন্ত্র শিল্পীজীবন গড়ে তুলবে, এটাও অনুমান করা যেতে পারে।

''মিত্রা' য় ''হৃদয় পাতো'' উপন্যাসের মতো অতখানি ঘাতপ্রতিঘাত বা নাটকীয় ঘটনা নেই। যা মনে দাগ কাটে তা হল মিত্রার চেতনার বিকাশ। নিশ্চিন্ত কুমারী জীবন, অসুখী বিবাহিত জীবন, মাতৃত্বের সান্ত্বনা, বৈধব্যের পর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা, এ সবের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র। ঠিক বিদ্রোহিনী না হলেও আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদায় দৃঢ়। পরিণতি তাই ইচ্ছাপূরণ মনে হয় না।

''বর্ণালী'' উপন্যাস উন্মোচিত করে নারী সমস্যার ও সংগ্রামের আর একদিক। মৌরী এক সচ্ছল ও মোটামুটি প্রগতিশীল পরিবারের মেয়ে। পরিবারের সদস্য বলতে, মৌরীর বাবা যতীনবাবু, পিসিমা (বিপত্নীক ভাইয়ের সংসারে তিনিই কর্ত্রী) বড়দা জয়দেব, তার স্ত্রী অমিতা, ছোড়দা বাসুদেব, ছোট মঞ্জু। মৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে। তার বিয়ে ঠিক করা হয় সুদর্শন নামে এক তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে। সে রূপ, গুণ, ব্যক্তিত্ব, সব দিক থেকে মনোমত। সম্বন্ধ করা বিয়ে হলেও আধুনিক রীতি অনুসারে বিয়ের আগেই পাত্রপাত্রীর পরিচয় হয়। দু'জনের মধ্যে এক ধরনের মানসিক নৈকট্য গড়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন মঞ্জু অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে আর সুদর্শনের চিকিৎসার আরোগ্য লাভ করে।

একই সময় বাসুদেবের বিয়ে ঠিক হয় মমতা নামে এক চমৎকার মেয়ের সঙ্গে। সম্বন্ধ পাকা হওয়ার পর জানা যায়, মমতা পেশায় নার্স। সে যুগে মনে করা হত (হয়তো এ ধারণা এখনো পুরোপুরি মুছে যায় নি) যে নার্স মানেই ''খারাপ মেয়ে।'' তারা ডাক্তার, মেডিকাল ছাত্র ও অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে বৃন্দাবনলীলায় পটু। পাত্রপক্ষ, অর্থাৎ মৌরীর বাড়ির লোক, তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। পাত্রীপক্ষ সেটাকে ন্যায্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু মেনে নেয় না মৌরী। নিজের পরিবার একটি নির্দোষ মেয়ের প্রতি যে অন্যায় করেছে, তার প্রতিকার বা প্রতিশোধস্বরূপ সে যে উপায় বার করে তা যেমন বিচিত্র, তেমনি সাহসী। মৌরী ঘোষণা করে, সে সুদর্শনকে বিয়ে করবে না। তার যুক্তির মধ্যে ফাঁক নেই। যে কোনো অবৈধ সম্পর্কের জন্য দুই পক্ষ, নারী ও পুরুষ দরকার। ডাক্তার আর নার্স পরস্পরের সব চেয়ে কাছে আসে। যদি প্রত্যেক নার্সের কপালে ''খারাপ মেয়ে'' নামক লেবেল লাগানো হয় তবে দুনিয়াসুদ্ধ ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্রকেও ''চরিত্রহীন'' বলা উচিত। যদি মমতা বাসুদেবের যোগ্য বধূ না হয়, তবে, সুদর্শন বাসুদেবের বোনের উপযুক্ত স্বামী নয়। ইংরিজিতে যাকে বলে, "What is sauce for the goose is sauce for the gander"

বলা বাহুল্য মৌরীর সিদ্ধান্তে তার পরিবারের লোক বজ্রাহত হয়। বাসুদেব অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয় মমতাকে বিয়ে করতে। তবে সমাধান এত সহজে হয় না। নানা জটিলতার পর সুদর্শন ও মৌরী আবার মিলিত হয়। মমতার তুলনায় বাসুদেব যে কিছুই নয়, দু'জনের বিয়ে মমতার দিক থেকেই অসম্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

তিনটি উপন্যাসে দেখা যায়, পুরুষ-শাসিত সমাজ কত সহজে মেয়েদের বিচার করে। বিশেষ করে যে সব মেয়েদের খুঁটির জোর নেই। অপরিচিত পুরুষের গাড়িতে চড়া মেয়ে অথবা নার্স মাত্রেই নষ্ট, ভ্রষ্টা। এ কথা বলতে লোকের দ্বিধা হয় না। তার বিপরীতে দেখি, নারীদের মধ্যে সহমর্মিতা, আর সহযোগিতা।

এই সহযোগিতা কি স্বাভাবিক? মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু, এ কথাই বরাবর আমরা শুনে আসছি। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, ক্ষুদ্র ব্যাপারে ঈর্ষা নিয়ে ব্যস্ত। যে যার পুরুষদের নিজের দিকে টানতে চেষ্টা করে। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখিকা ও নারীবাদী Virginia Woolf তাঁর "A Room of one's own" বইটিতে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটি আধুনিক উপন্যাসের উল্লেখ করেছেন, যেখান দু'টি মেয়ের বন্ধুত্ব ও একত্রে কাজ চিত্রিত হয়েছে। এর সঙ্গে ভার্জিনিয়া তুলনা করেছেন ধ্রুপদী সাহিত্যকে। যেমন, শেক্সপীয়ারের অমর রচনাবলী। "Antony and Cleopatra" নাটকে অ্যান্টনির প্রিয়তমা, মিশরমহিষী ক্লিওপ্যাট্রা, অ্যান্টনির বৈধ রোমান পত্নী, অক্টেভিয়াকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। অবশ্য শেক্সপীয়ারের নাটকেও নারীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সখ্য নেই, তা নয়। উদাহরণস্বরূপ দেখা যেতে পারে, "Othello"-র ডেসদিমোনা ও এমিলিয়া "Measure for Measure" -এর ইজাবেলা ও জুলিয়েট, "As You Like It" -এর রজালিণ্ড ও সিলিয়া, "merchantof Venice" এ পোর্শিয়া ও নেরিসা প্রমুখ চরিত্রকে। এমনকি ক্লিওপ্যাট্রার দুই সহচরী, ইরাস ও শার্মিয়ান জীবনে ও মরণে মহিষীর অনুগামিনী।

সুলেখাও "নারীই নারীর বড় শত্রু" এ যুক্তি কিছুটা মেনে নিয়েছেন। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন সংক্রান্ত তাঁর আলোচনা আমরা দেখেছি। সুলেখা অন্য ক্ষেত্রে কৃপলানির বিরোধিতা করলেও অন্তত একটি বিষয়ে ওই নেতার সঙ্গে একমত। এ দেশে অসুখী বিবাহিত জীবনের অন্যতম কারণ, যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব ও ছক। স্বামীর উপর তার পরিজনদের, সমাজতত্ত্বের ভাষায় যাকে "natal family" বলা হয় তার প্রভাব, তাকে নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে বিরূপ বা উদাসীন করে তোলে। অন্য কিছু বলা মানে ভণ্ডামি, অথবা বাস্তবের দিকে চোখ বন্ধ করে থাকা।

> "মেয়েরা বধূজীবনে নিপীড়িত হয় স্বামীর দ্বারা নয়—শাশুড়ী ননদের দ্বারা। বেশীর ভাগ ছেলেই মার মন্দ প্রভাবে চালিত হয়। যারা তা নাও হয় তাদের পক্ষেও একান্নবর্তী পরিবারের পারিপার্শ্বিকে স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি বা বিবেচনা দেখানো সব সময় সম্ভব হয় না। কারণ তাহলে তাদের স্ত্রৈণ আখ্যায় ভূষিত করা হয়। তাই কৃপালনীর মতে শাশুড়ী ননদের দ্বারা দলিত না হয়ে, প্রথম, বধূজীবন সুখ ও আনন্দের হলে, আপনা থেকেই স্বামী-স্ত্রীর ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে। নারীরাই নারীর প্রধান শত্রু।" (সম্পাদকীয়, বলাকা, শ্রাবণ, ১৩৬২)

এই রচনার পর, এবং আইন পাশের পর, প্রায় অর্ধ শতাব্দী বিগত হয়েছে। যৌথ পরিবার প্রাচীন প্রজাতির মতো বিলুপ্ত না হলেও সংখ্যায় ও শক্তিতে অনেক কমেছে। অন্যদিকে বিবাহবিচ্ছেদের রেখাও ঊর্ধ্বমুখী। এর থেকে কিন্তু সুলেখা, কৃপালনী প্রমুখের যুক্তি অসার প্রমাণিত হয় না। মনে রাখতে হবে, যৌথ পরিবারের রমরমার যুগে হিন্দুসমাজে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব ছিল না। মেয়েদেরও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছিল না অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এই দুটি বস্তুর অস্তিত্ব মেনে নিলে সম্ভবত সে যুগে বিবাহ বিচ্ছেদের হার আজকের "রেট" -কেও ছাড়িয়ে যেত। অথবা যৌথ পরিবারের ভাঙন আরো ত্বরান্বিত হত। আজও সভ্য, আধুনিক পরিবারে ও সমাজে অন্তঃসলিলা স্রোতের মতো বহমান শাশুড়ি বউয়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। বধূ অবহেলিত, অত্যাচারিত অথবা শাশুড়ি বৃদ্ধাশ্রমে নির্বাসিতা। বধূহত্যার মতে জঘন্য, কিন্তু প্রচলিত অপরাধের অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রে চোখে পড়ে শাশুড়ি ননদের অদৃশ্য হাত।....অবশ্য সুলেখা কেবল "নারীরাই নারীর প্রধান শত্রু" বলে থেমে থাকেন নি। এই শত্রুতার কারণও দেখিয়েছেন। যে কারণ অনেক সমাজতাত্ত্বিক মেনে নেবেন।

> "কারণটা খুবই স্পষ্ট। শিক্ষার অভাব সমাজের বিস্তৃত পটভূমি থেকে অপসারিত হয়ে, ঘরের কোণে সসঙ্কোচ অবস্থান আর পুরুষের পরম অধীনতা

"...এই তিনের বিষময় ফল ঐ একটিতে। বিশেষ করে পরাধীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা মানুষের প্রধান গুণগুলোকে নষ্ট বা পঙ্গু করার পক্ষে যথেষ্ট।"

(বলাকা, শ্রাবণ-১৩৬২, সম্পাদকীয়)

পরাধীন জাতির এটাই বিধিলিপি। সুলেখা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ব্রিটিশ আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সব চেয়ে বিরোধিতা করেছিল ভারতীয়দেরই একাংশ। পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরাও এক অর্থে পরাধীন। পুরুষদের সহায়তা ও সমর্থন যখন তাদের অস্তিত্বের শর্ত, তখন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি চলা স্বাভাবিক।

সুলেখার উপন্যাসের নারী চরিত্ররা অবশ্য প্রচলিত অবস্থার মধ্যেই যাকে "feminine solidarity." নারীসুলভ সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বলে, তার বিস্ময়কর পরিচয় দেয়। ইন্দ্রাণী/শিবানী তার দুঃস্থ বান্ধবী বীণা/নমিতার জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় চাকরি জোগাড় করে দেয়। তাদের বন্ধুকে বাঁচাতে নিজের স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে, যা করে তার তুলনা নেই। তেমনি তুলনাহীন মৌরী যে ভাবে আর একটি মেয়ের অপমানের শোধ নিতে নিজের পছন্দের বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। অথচ সে সময় মৌরী মমতাকে বলতে গেলে চিনতই না। মমতা অনুরূপভাবে শরিক হয়েছে তার এক সহকর্মিণীর অপমানের। ডক্টর চ্যাটার্জি নমিতা নামে এক নার্সের সঙ্গে প্রেমের খেলা সাঙ্গ করে একটি "ভাল" মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছেন। এই বিশ্বাসঘাতকতায় যেন নমিতার চেয়ে মমতা আরো বেশি আহত হয়েছে। শেষে মৌরী ও মমতা মিলে তৃতীয় এক নারীকে সাহায্য করে।

"মিত্রা" উপন্যাসে মিত্রা কয়েক বছর কাটায় পুরানো ছকের যৌথ পরিবারে। তার শ্বাশুড়ি স্বর্ণময়ী অবশ্য শান্ত, নিরীহ। বধূর বিরুদ্ধাচরণ করার বদলে ছেলে লীলাকান্তকে মনে করিয়ে দেন স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্যের কথা। মিত্রার অসুখী বিবাহিত জীবনের দায় অন্তত শ্বাশুড়ি ননদ নয়, সরাসরি তার স্বামীই বহন করবে। তবে বিধবা মিত্রার মাছ মাংস খাওয়ার খবরটি তার এক পিসশ্বাশুড়ি কৌশলে রটিয়ে দেন। চিরশান্ত স্বর্ণময়ী একাধারে বধূর বিরুদ্ধে অভিমানে ও ননদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে আবার নিজেই যেচে বধূর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে দ্বিধা করেন না। মিত্রার সব চেয়ে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার জা রানীর সঙ্গে। রানীর বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। রানীর স্বামী ধনী হলেও শ্বশুরবাড়ির জন্য কিছু করতে নারাজ। মিত্রা রানীকে এই প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য অর্থ দেয়। এটাও নারীসুলভ সহযোগিতার এক নিদর্শন হতে পারে।

"পারলাম না" নামক নভেলেট সুলেখার সৃজন ক্ষমতার আর এক দিক তুলে ধরে। এখানে যা বিষয়— পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে সম্পর্ক। দেশভাগ ও তার বিষাক্ত ফসল। দুই দিকের মিল ও অমিল— একাধিক বার বাংলা সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে। এই বড়গল্পটি তবু মনকাড়া মৌলিকতা দাবি করতে পারে।

কাহিনীর রূপরেখা এই রকম। পটভূমিকা, বিশ্বযুদ্ধের আগেকার সময় থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাল। যখন কাহিনীর সূত্রপাত তখন দেশভাগ হয়নি। তেমন ঘটনার কথাও অচিন্তনীয় ছিল। তবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে (গল্পে কেবল মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্ণ, হিন্দু বাঙালিদের কথাই ধরা হয়েছে) এক ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন চোখে পড়ল। তথাকথিত "ঘটি" ও "বাঙাল" পরস্পরকে একটু অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করত। দুই পক্ষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের খুব একটা চল ছিল না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নায়ক/কথক কিশোর অমলের ছোটমামা (কাহিনীতে তার অন্য কোনো নাম বা পরিচয় দেওয়া নেই) অলিখিত নিয়ম ভেঙে, বাড়ির লোকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিক্রমপুরের এক সুন্দরী জমিদারকন্যা সুমিত্রাকে ঘরে আনলেন। নরানাংমাতুলক্রমঃ। অমল ছোট মামীমার সঙ্গে তার বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে পূর্ব বঙ্গের প্রকৃতি ও দুর্গাপুজোর বৈভব দেখে মুগ্ধ, হল। কেবল তাই নয়, সুমিত্রার ছোটবোন, কিশোরী উত্তরার প্রতি আকৃষ্ট হল। জলের দেশের কিশোরী উত্তরা যেন সুন্দরী জলকন্যা। তার বেশির ভাগ সময় কাটে নদীতে। মাছ ধরে, সাঁতার কেটে, নৌকো বেয়ে।

অমল ও উত্তরার বাল্যপ্রেম তারা পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লতাপাতা বিস্তার করে। কিন্তু পরিণাম লাভ করে না। অথচ দুজনের সামাজিক মিলনের পথে এমন কোনো দুস্তর বাধা ছিল না। সুমিত্রা গোড়া থেকে এই বিবাহের বিরুদ্ধে, কিন্তু তার যুক্তি—

অমলের বাবা মা তাখুশি হবেন, উত্তরা বন্ধ্যা হতে পারে, কারণ তার পরিবারে কেউ কেউ নিঃসন্তান— খুব জোরালো মনে হয় না। সুমিত্রা নিজের বিবাহিত জীবনে সুখী হয় নি। হতে পারে, বিক্রমপুরের গ্রামের জল হাওয়া মাটি দিয়ে গড়া মেয়ে কলকাতার জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নি। সর্বোপরি সুমিত্রা আর তার

স্বামী আজকাল যাকে বলা হয় "Intellectually incompatible" । অমলের ছোটমামা লোক খারাপ নন। নিজের কষ্টার্জিত স্ত্রীকে নিজের মতো করে ভালও বাসেন। কিন্তু কিছু স্থূল প্রকৃতি ও রুচির এই মানুষ সুমিত্রার অবেগপ্রবণ ও স্পর্শকাতর মনটিকে ঠিক বুঝতে পারেন না। জীবনের এই শূন্যতা সুমিত্রাকে অকালমৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। সুমিত্রা ও উত্তরা দু'জনেরই ভয়, ছোটবোনের ক্ষেত্রে দিদির অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

শেষ পর্যন্ত অমল ও উত্তরাকে বিচ্ছিন্ন রাখে ভৌগোলিক ও চরিত্রগত পার্থক্য, ব্যবধান। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের কন্যা, দেহমনে জলের সঙ্গে জড়িত উত্তরা অন্য কোনো জীবন কল্পনা করতে পারে না। মহানগরে তার অবস্থা হত আক্ষরিক অর্থে ডাঙায় তোলা মাছের মতো। আবার অমল কলকাতার পরিচিত দীপ্তি ও নিজের কর্মজীবন ছেড়ে বিক্রমপুরের গ্রামে থাকতে পারে না। এ যেন খাঁচার পাখি আর বনের পাখির মিলন বিরহ।

দেশভাগের মতো বিপর্যয় অমলকে আশান্বিত করে। এবার ত' উত্তরাকে এ পারে চলে আসতেই হবে। তখন আর দুজনের মধ্যে চীনের প্রাচীর মানে জলের প্রাচীর থাকবে না। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয় নি। যে সব হিন্দু সব বাধা-বিপত্তি সহ্য করে, মাটি কামড়ে, পূর্ববঙ্গে থেকে গিয়েছিল, উত্তরার পরিবার তাদেরই অন্তর্গত। উত্তরার বক্তব্য, কোন ভরসায় তারা এপার বাংলায় আসবে? ভারতের ভাগ্যবিধাতা যারা, তারাই ত' দেশভাগের জন্য দায়ী। "হৃদয় পাতো" উপন্যাসে অনুরূপ ভাবে নমিতার দাদা অচেনা জায়গায় উদ্বাস্তু হয়ে ভিক্ষা করার বদলে পূর্ববঙ্গের মাটিতে প্রাণ দেওয়া শ্রেয় মনে করে।... শেষ পর্যন্ত অমল ও উত্তরা দু'জনেরই বিয়ে হল, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে নয়। প্রায় দুই দশক পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, খান সেনাদের সীমাহীন বর্বরতা, পূর্ববঙ্গের প্রিয় নদীগুলিকে রূপান্তরিত করল রক্তের স্রোতে। এবার আর মাটি কামড়ে পড়ে থাকার প্রশ্ন নেই। রক্ত নদীতে ভেসে, স্বামী সন্তানদের হারিয়ে, উত্তরা এসে পড়ল পশ্চিমবঙ্গের এক উদ্বাস্তু শিবিরে। অমল যখন তার খোঁজ পেল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। অমল কেবল হাতে পেল উত্তরার শেষ চিহ্ন, তার ডায়রি।

"পারলাম না" বড়গল্প বা নভেলেটটির সূক্ষ্ম উপস্থাপনা, সংযত আবেগ পাঠককে বিস্মিত না করে পারে না। "বাল্য প্রেমে অভিশাপ আছে" বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা ঘুরেফিরে বাংলা সাহিত্যে অনেকবার এসেছে। কিন্তু প্রকৃতির সাহচর্যে যে প্রেমের জন্ম, আবার প্রকৃতিই যে প্রেমের বাধা, এক সঙ্গে আসা, এবং কোনো অমোঘ শক্তির টানে দূরে সরে যাওয়া, সময় ও বিবর্তনের চিহ্ন, এ সবের এমন চিত্রণ বিরল। সময়ের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দুই কুশীলবের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যও লক্ষ্যণীয়। অমল স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, কর্মজীবনে সাফল্য, লেখক হিসাবে নাম যশ পেয়েও উত্তরাকে না পাওয়ার শূন্যতা অতিক্রম করতে পারে নি। অন্যদিকে উত্তরা বাল্যসঙ্গীকে না ভুললেও যোগ্য স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে সুখী। মুক্তিযুদ্ধেব বিপর্যয় না এলে তার জীবন অসুখী হত না। বোধ হয় পূর্ব-বঙ্গের জলজীবন উত্তরার প্রথম ও প্রধান প্রেম ছিল। আর সব অপেক্ষাকৃত গৌণ।

এই পূর্ববঙ্গের ছবি, গ্রামের দুর্গাপূজা, পংক্তিভোজন থেকে লাঠিখেলা, বাইচখেলা ইত্যাদির আনন্দ বর্ণনা, নভেলেটের এক বিশেষ আকর্ষণ। কেবল নায়িকা নয়, তার স্থানকালের পটভূমিকাও অবিস্মরণীয়। অবিভক্ত বাংলার, পূর্ব ভাগের গ্রামীণ দুর্গাপূজা সম্বন্ধে লেখিকার এই "নস্টালজিয়া" আমরা অন্যত্রও দেখি। নৌকোয় দেশের বাড়িতে যাওয়া থেকে রাতজাগা যাত্রা, জমিদারবাড়িতে নিম্নবর্গের দরিদ্র প্রজাদের খাওয়া, বাড়ির গৃহিনীদের নিজের হাতে পরিবেশন, গোবিন্দ নামে এক অতিথির অনুপস্থিতিজনিত ক্ষোভ, সবই ফুটে ওঠে সরল অথচ উজ্জ্বল রেখায়। সুলেখা অন্যত্র লিখেছেন ঃ

> "Now we stretched put our hands for the lotuses that bloomed in such abundance and gazed at bamboos bent low over the water in which weed was thickly entwined. Who can describe the danca of slender bamboo leaves?" (The Statesman Puja Supplement– September 18. 1976)

যারা এই ছবির উপর কালি ছিটিয়েছে, দেশভাগের অদৃশ্য ছুরি দিয়ে গঙ্গাপদ্মাকে ভাগ করেছে। তারপরও ওপার বাংলা থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষদের স্থান দেয়নি (কেত মেয়ের অবস্থা বীণা/নমিতার মতো হয়েছে) তাদের প্রতি সুলেখা ক্ষমাহীন। দেশভাগের তিন দশক পর তার মন্তব্য,

> "I had heard of secularism before and didn't ponder too deeply over it. We had always believed in secularism. But that

secularism would amount to saying 'We will first separate and then live together' was a startling evelation. Yet that was precisely the official attitude to the east. Secularism exacted a fearsome price and it had to be paid by the Hindus in East Pakistan." (The Statesman, Independence Day Supplement-August 15, 1977)

পঞ্চাশের দশকে যারা কাশ্মীর, পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্তান সম্বন্ধে কেঠোর নীতি "টাফ লাইন" দাবি করতেন, সুলেখা তাদের একজন। "ডাভ" নেহরু নয়, "হক" বাজপাখি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শ নায়ক। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য তিনি পরোক্ষে নেহরুকে দায়ী করেছেন। সুলেখার ক্ষোভ ন্যায্য। পূর্ব-বঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি যে ন্যায়বিচার করা হয় নি সে কথা তর্কাতীত। তবু পুরো ব্যাপারটা কি এত সহজ ছিল? নেহরু ও গোটাকয়েক বিশ্বাসঘাতক নেতা, পাকিস্তানের সঙ্গে শেখ আবদুল্লার "গভীর ষড়যন্ত্র"—আর কিছু নয়? বিশ্বাসঘাতকতা সম্ভব হয়েছিল কোন অবস্থায়? সুলেখার "হিরো" "বাংলার শেষ উপযুক্ত সন্তান" শ্যামাপ্রসাদ ("তোমাকে আমরা ডাকছি" সম্পাদকীয়, বলাকা, ফাল্গুন ১৩৬২), পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ চেয়েছিলেন, যদিও তাঁর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী নেহরুর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। প্রাক বিভাজন পূর্ব বঙ্গের গ্রামাঞ্চল কি সত্যিই, দুর্গাপুজোর কয়েকটা দিন বাদে, স্বর্গরাজ্য ছিল? গোবিন্দদের সব ক্ষোভ, দাবি প্রশমিত হত কর্ত্রী ঠাকরুনদের এক দিনের পরিবেশনে? কিশোরী উত্তরা বা কিশোরী সুলেখা না ভাবতে পারে, পরবর্তী কালের সুলেখা কি এ নিয়ে তলিয়ে দেখেন নি? তবে এ জাতীয় প্রশ্ন হয়তো অবান্তর। সুলেখার হাতে যা পেয়েছি, তাই আমাদের পরম প্রাপ্তি।

সুলেখার তিনটি ছোটগল্পও বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। ফুটিয়ে তোলে তাঁর সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দৃষ্টি। বিশেষ নারীবাদী সুলভ মনোভাবও অনুপস্থিত নয়।

"মর্যাদা" গল্পে (বলাকা, আষাঢ়, ১৩৮০), পড়তি বনেদি পরিবারের মেকি মর্যাদার এক বিচিত্র রূপ চোখে পড়ে। লেখিকার সাধারণ মন্তব্য, "ধর্মপরায়ণ সমাজজীবী ধনী আর জমিদার উৎখাত হয়েছে কিন্তু তৈরী হয়েছে এক দিকভ্রষ্ট সমাজবন্ধনহীন আত্মপরায়ণ অঢেল টাকাওলা গোষ্ঠি।" (মর্যাদা)

এই অতি সরলীকরণ নিয়েও বিতর্ক উঠতে পারে। আগেকার দিনে— ধরে নেওয়া যেতে পারে লেখিকা ব্রিটিশ আমলের অবিভক্ত বাংলার কথা বলছেন— সব অর্থ কি, বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসের ভাষায়, "জপতপের টাকা" ছিল? ফরাসি সাহিত্যিক বালজাকের মন্তব্য, "Behind every great fortune is a great crime." কি সে যুগেও প্রযোজ্য ছিল না? আর কিছু না হোক, জমিদারি প্রথার দীর্ঘ, গ্লানিময়, কখনো কখনো রক্তাক্ত ইতিবৃত্ত অথবা মন্বন্তরের সময় ব্যবসায়ীদের আচরণ অন্য কথা বলে। তবে টাকার খেলা উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠছে, লেখিকার বর্ণনা অনুসারে " মশাই" বা বাঙালিদের হাত থেকে "রিয়েল এস্টেট" বা জমি বাড়ি, বিষয় আশয় হস্তগত করতে আগ্রহী, এ সত্য স্বীকার্য। যাই হোক, নীরেন মুখার্জি এমন এক খানদানি পরিবারের ছেলে, যার খানদান ছাড়া বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই।

> "পেপার মিলের হাজার দেড় হাজারী ম্যানেজারীর টাকায় আজকের দিনে বড়লোকী মেজাজ চালিয়ে যাওয়া যায় না। .... দোল দুর্গাপূজা ইত্যাদি তো গেছেই। বাজারে গিয়েও মাছের বদলে ডিম, মাংসের বদলে কিমা কিংবা কাঁকড়া কিনে ফিরতে হয়।" (মর্যাদা)

এ হেন নীরেনের বড় মেয়ে জয়তি গৌতমকে ভালবেসে ফেলল। পাত্র রূপগুণ, বিদ্যা, বিত্ত, সব দিক থেকেই পরম কাম্য, কেবল জাতে নীচু। প্রত্যাশিত ভাবেই নীরেন প্রবল আপত্তি জানালেন। কারণ তাঁর মতে,

> "লেখাপড়া শেখা যায় এক পুরুষে কিন্তু রক্তে শুদ্ধি আসতে সময় লাগে কয়েক পুরুষ।"

জয়তি নিজেও এক সময় লক্ষ্মী মেয়ের মতো বাবার কথা মেনে গৌতমকে ত্যাগ করতে রাজি হয়। তার যুক্তি কিছুটা বিচিত্র। যতই রোমান্টিক প্রেমের কথা বলা হোক না কেন, বিয়ের পর দাম্পত্য সম্পর্কে শরীরের দাবি আসবে। সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, দৈহিক সুখের জন্য একটা পারিবারিক ও সামাজিক গোলযোগ বাধানো, "হাটের মধ্যে নাচানাচি", "মা বাবার মুখে ঘুষি মেরে বাসর ঘরে ঢোকার মত।" এটা জয়তির রুচিতে বাধে। একই ভাবে সুমিত্রা অমলকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ভাল ছেলের মতো বাবা মার পছন্দের বাইরে বিয়ে না

করতে। সুলেখার নারী-চরিত্রদের প্রখর আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতাবোধ থাকলেও তাদের বিদ্রোহিনী বলা যায় না। ...যাই হোক, জয়িতার পিসেমশাই বিমলবাবুর উৎসাহে ও চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে গেল। এবার বোঝা গেল —মানে, লেখিকা একেবারে শেষে পাঠকের কাছে রহস্যটি উন্মোচিত করলেন— নীরেনের অমতের আসল কারণ। তিনি মুখে বলেন,

"যৌতুকে সম্ভারে, সহস্র ফুলের মালা আর আলোর মালায় সাজানো আতর
গন্ধে দিক আমোদিত করা আসরে বিয়ে দিতে চাই মেয়েদের।" (মর্যাদা)

কিন্তু তেমন রাজসিক চালে বিয়ে দিতে গেলে বিশ পঁচিশ হাজার (আজকের হিসেবে লাখ টাকারও বেশি) টাকা লাগে। নীরেনের সে সামর্থ্য নেই। আছে মেকি মর্যাদাটুকু। এখন বরং অজুহাত দেওয়া গেল, অবাধ্য মেয়ে অসবর্ণ বিয়ে করছে বলে তার প্রাপ্য কিছু নেই। জয়তি যখন মনে করছে, সে বাবার বুকে শেল বিঁধছে, প্রকৃত পক্ষে নীরেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

ছোট গল্পের প্রচলিত রীতি অনুসারে, পরিণতি হবে একাধারে প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত। মনে হবে "এমনটা ত, ভাবিনি।" একই সঙ্গে "আর কিছু সম্ভব ছিল না।" "মর্যাদা" গল্পের শেষ 'টুইস্ট' টুকু যেমন একদিকে চমকপ্রদ, তেমনি অন্য দিকে কাহিনীর প্রধান কুশীলবের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই "আয়রনি" পূর্ণ পরিণতি মোপসাঁ, সাকি, ও হেনরি প্রমুখ গল্পকারদের শৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

"আয়রনি" আরো স্পষ্ট, তীব্র ও কিছুটা কমিক ঢঙে দেখি "সব বয়স বাজারে ছেড়ে দেবেন না" গল্পে। বিয়ের বাজারে মেয়ে যেখানে পণ্য, রূপগুণের মতো বয়সও সেখানে বিচার্য। ললিতবাবুর মেয়ে কবিতা কৃতী, এম. এ. পাশ, কলেজে পড়ায়। এই করে তার বয়স সাতাশ স্পর্শ করেছে। একটি পরম সুপাত্র ধরতে বয়স কমাতে হবে। কিন্তু কুষ্ঠির মতো এম. এ. পরীক্ষার সার্টিফিকেট তো জাল কবা যায় না। তাই যেখানে সবাই বিদ্যা বাড়িয়ে দেখাতে চায়, সেখানে বিয়ের কনেকে চালানো হল বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী বলে। এই হাস্যকর প্রচেষ্টার পরিণাম অম্লমধুর।

"ঝড় এসেছিল" গল্পে মহীর স্বামীছেলেমেয়েভরা সুখী জীবনে ঝড়ের মতো এসেছিল অমিতাভ। কিন্তু সে ঝড় স্থায়ী হল না। কয়েক ঘণ্টার আবেগের পর মহী নিজেকে সংযত করে পুরানো জীবনে ফিরে গেল। দ্বিতীয় বার অমিতাভের সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখল না। ঝড়ে উড়ে যেতে দিল না তার নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার গৃহ।

সুলেখার রচনাশৈলী পাঠকের পক্ষে এক বাড়তি পাওনা। গল্প-উপন্যাস বা সম্পাদকীয়তে এই ঝকঝকে, স্বচ্ছন্দ, বুদ্ধিদীপ্ত লেখনভঙ্গি গতি সঞ্চারিত করেছে। কোথাও "আয়রনি," কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা গভীর আবেগের সংযত বর্ণনা, এনে দিয়েছে বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিক রূপ।

সুলেখা দাশগুপ্তাকে নতুন করে আবিষ্কার করে বাংলার সাহিত্যজগৎ তার লেখক তালিকায় আর একটি নক্ষত্র সংযোজনের সুযোগ পাবে।

মিত্রা

মিত্রা। মিত্রা কে?

সত্যি তো মিত্রা কে। আত্মকাহিনী বলবার মতো কথা ও কাহিনীর সমাবেশ কি ওর জীবনে ঘটেছে?

ঘটেনি।

কথা যেটুকু জমেছিলো বাল্যের প্রগলভতা ছাড়িয়ে [illegible] নি। আর কাহিনী? সে তো থেমে গিয়েছিলো তার কৈশোর চাঞ্চল্যের সীমা পার না হতেই।

মা এতটুকু এক ছোট্ট মেয়েকে বুকে করে অকাল-বৈধব্যে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এসে উঠেছিলেন বাপের ঘরে। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যে মেয়েকে নিয়ে শ্বশুর ঘরে বাস করবার চেষ্টা না করেছিলেন তা নয়। কিন্তু বাড়ীর বিধবা বউ কিছুদিনের মধ্যেই এমনই একটা ফেলাছড়া বাড়তি বস্তু হয়ে দাঁড়ায় যে, শেষপর্যন্ত একদিন সবাইকেই বাপের ঘরের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়তে হয়। তারও যে একদিন তাই পড়তে হবে, মিত্রার মা সুমিত্রাও তা জানতেন। তাই সে দিন যখন সত্যি এসে উপস্থিত হলো তখন সে জন্যে বিস্মিত হলেন না, বেদনা বোধও করলেন না। কিন্তু যে ঘরে বসে স্বামীর মুখে আদরে সোহাগে বারবার শুনেছেন,—'সব তোমার'— সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েই যখন তাকে শুনতে হলো দেওর ভাসুরদের মুখে, কিছুই নাকি তার নয়, এক থালা ভাত আর বাড়ীর ছাদের তলায় শোয়া বসা হাঁটা চলার অধিকারই এখন শুধু তার আইন সঙ্গত অধিকার, তখন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। দুরন্ত অভিমানে সেই যে শ্বশুর ঘর ছেড়ে এলেন, আর ওমুখো হলেন না কোনদিন।

তিনভাই এর একমাত্র বোন সুমিত্রা—আর তারই জীবন অবলম্বন এই একরত্তি মেয়ের কণা মিত্রা— সমস্ত পরিবার বুকে তুলে নিল ওদের।—ওদের দু'জনের সুখ আনন্দকেই করে নিলো নিজেদের আনন্দ সুখ।

বধূ বরণ করে দিদিমা বলতেন—আমার সুমিত্রা আর তার ঐ মেয়ের কণাটাকে ভালোবেসো, যত্ন করো— আর কিছু চাইবো না তোমার কাছে।

বাবা এসে জানতে চাইতেন—বউ পছন্দ হলো তো সুমি-মা? তোমার ভালো লাগাই যে সব গো।

বাসর ঘরে নববধূকে প্রথম সম্ভাষণেই স্বামীর কাছে শুনতে হতো —বাড়ীতে রয়েছে আমাদের একটি দুঃখী বোন। বিয়ের পর থেকেই চোখের জল ফেলে কাটছে তার জীবন। আমরা শুধু তার চোখের জলের সামনে বাঁধ বেঁধে চলি। কিন্তু সে তো বালির বাঁধ। সতর্ক খেয়ালে চলতে হয়। সবাই আমরা তাই চলি। আজ থেকে তুমিও আমাদের একজন হলে। তোমার কাছেও এ আশাই করবো। তার অভিমানে ঘা দিও না—ব্যথা দিও না।

অপরিসীম আদর যত্ন স্নেহের ভেতর রাণীর মতো কেটেছে ওর মায়ের বৈধব্য জীবন। আর ও নিজে প্রতিপালিত হয়েছে যেন সোহাগিনী রাজকন্যা। মামারা ডাকতেন, সুমিত্রা দি সেকেণ্ড। দাদু ডাকতেন, রাজকন্যা মিত্রাণী। দিদিমা ডাকতেন কত নামে, আজ আর তা মনেও পড়ে না।

মামীদের বুকে শুয়ে দিদিমার কোলে পা তুলে দিয়ে আব্দারে আহ্লাদে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো মামাদের পর্যন্ত।

জল দেও না রাঙামামা। না, চাকরের হাতে খাবো না—না— মামীমার হাতের গড়ানোও খাবো না। তুমি দেবে।

বড়মামা বলো না, একটা গল্প। ভূতের? না ভালোবাসি না আমি ওসব ভূত প্রেতের গল্প। মানুষের গল্প বলো—আর বলো রাজপুত্র রাজকন্যার।

এ্যা, আজ আর ভিখিরীর গল্প ছাড়া গল্প নেই—কোল থেকে মাথা তোলে মিত্রা, কেমন করে হলো সবাই ভিখিরী? ডাইনির মায়ায়? দেবতার অভিশাপে? বলো না?

ছোটমামা এখন বাড়ী ফিরেনি! বাবা! খালি বেরুনো আর বেরুনো। কোথায় যায় এতো বলতো? পরীক্ষায় পাশ দিয়েছেন আর যেন রাজা হয়ে গেছেন।

সেজমামাকে নিয়ে না; আর পারিনে—এলে তো স্নান করে এই ভর সন্ধ্যেয়....

বলতো কখনো বুড়োমানষী মুরুব্বিয়ানায়—কখনো অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে। বাড়ীর আর ক'টি বোনের চাইতে ওর আধিপত্যটা যে অনেক বেশি,—মুখে চোখে সে দেমাক ফুটিয়ে তুলে সমস্ত বাড়ী ঘুর ঘুর করে বেড়াতো মিত্রা—আট বছরের মিত্রা। কাটছিল দিন চমৎকার। যার তুলনা সমস্ত জীবনেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু সুখের চাকা বুঝি ঘোরে তাড়াতাড়ি। অতর্কিতে কোথা দিয়ে কতগুলো অমঙ্গল এসে ওদের সুখী পরিবারটাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে গেল তছনছ করে। সেজমামা আর সেজমামীমা গিয়েছিলেন এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে। ফেরবার সময় এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন দু'জনে—কয়েক ঘন্টা আগে পরে। আর তার সাতদিন বাদে দাদু সিঁড়ি থেকে পড়ে। মেয়ের মাথার সিঁদুর মুছে যাওয়ার পর থেকেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন দিদিমা। এবার নিলেন শয্যা। সমস্ত বাড়ীর ছন্নছাড়া উদভ্রান্ত ভাব ভুলিয়ে দিলে ছেলেমানুষদের— ছেলেমানুষী, আব্দার অভিমান হাসি খেলা। চুপচাপ খেয়ে আসে। সন্ধ্যায় বারান্দার একোণে সেকোণে দেয়ালে পিঠ রেখে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। ওরা শুনেছে যারা গেছেন তাঁরা সব তারা হয়েছেন আকাশের। কোন তারাটা সেজমামা? কোনটা সেজমামীমা? কোনটাই বা দাদু? ওদের দেখছেন কি তাঁরা? ওদের মনের কথা শুনছেন কি তাঁরা; ঠিক ওদেরই মতো আকুল হয়ে কাঁদছেন কি তারাও? আকাশের দিকে তাকিয়ে এমনি কত কি ভাবে, আর ভাবে। তারপর শ্রান্তিতে বিষন্নতায় ক্লান্ত চোখে যখন অবসাদ নেমে আসে, চোখের পাতা আসে বন্ধ হয়ে তখন কখনো উঠে গিয়ে কোথাও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নয়তো কখনো বারান্দার মেঝের উপরই পড়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে— তদারক করবার থাকে না কেউ।

আর সুমিত্রা—লুটিয়ে পড়লেন ছেড়া লতার মতো। স্বামীকে তিনি বেশিদিন পান নি। বাবার কাছ থেকে একদিন বিয়ের কনে কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছিলেন স্বামীর ঘরে, আবার কিছুদিন বাদে ঠিক তেমনি কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে কোলে ফিরে এসেছিলেন তাঁরই বুকে। স্বামীর ঘর তার কাছে দু'দিনের স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। বাবাই ছিলেন তার গুরু সুহৃদ সঙ্গী বন্ধু— বাবাই ছিলেন তার বল আর আশ্রয়। ভাই-এর মৃত্যু যদিও বা সামলেছিলেন, বাবার মৃত্যু মেরে রেখে গেল তাকেও। সুমিত্রার চোখে খেলে বেড়াতে লাগল কেবল ত্রাস! কেবল ভয় পেতে আর চমকে চমকে উঠতে লাগলেন সুমিত্রা কারণে অকারণে।

মিত্রার ছোট্ট বুকে কাঁপুনি তুলে দিতে লাগল মার চোখের সেই শূন্য দৃষ্টি। অমন দৃষ্টিতে তাকান কেন মা? কেন চমকে উঠেন কেউ কথা বলতে গেলে? কেন ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান চোরের মতো পা ফেলে? শব্দ করতে ভয় পান, শব্দ শুনলে চমকে ওঠেন কেন? আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে হাতের পিঠে চোখের জল মুছে চলতো। কখনো ছোট্ট দুটি হাতে মুখ রেখে বসে বসে ভাবত মিত্রা, তের বছরের মিত্রা— মা কেন এতো কাঁদে। ওরই বা কেন পায় এমন ভীষণ কান্না। কেন বসে না খেলায় মন। কেন ভালো লাগে না সঙ্গী সাথী।

সময়ের হাতের ধীর সান্ত্বনায় দুঃসময়ের ঘোর কাটিয়ে আবার সংসারটা উঠতে লাগল জেগে। ফিরে আসতে লাগলো মানুষগুলোর মনের স্থৈর্য্য। অন্ধকার রাতের অস্পষ্ট ঊষার প্রথম আলোর মতো মৃদু হাসি, অনুচ্চ কণ্ঠের কথা, শান্ত গল্প ঝিলমিল করে উঁকি দিতে লাগলো এ-ঘরে, সে-ঘরে। দিদিমাও বিছানা ছেড়ে উঠে মন দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন সংসারের শত কাজে।

কিন্তু সুমিত্রা?

তার কোন পরিবর্তন নেই কেন?

কেন তার চোখের দৃষ্টি, মুখের চমক, হাসি কান্না দুর্দৈবের এতোগুলো দিন পার হয়ে এসেও সুস্থ চলায় চলছে না!

শঙ্কিত হয়ে উঠলেন সবাই।

বড়মামা বললেন, চলো বেরিয়ে পড়ি। বেরিয়ে এলেই সুস্থ হবে মন। দিদিমা ও মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বড়মামা পুরীর উদ্দেশে। কিন্তু গাড়ীতে উঠে বসেই হঠাৎ চমকে উঠলেন সুমিত্রা। উদভ্রান্তের মতো তাকাতে লাগলেন এদিক ওদিক— মিত্রা, আমার মিত্রা!

বোঝানো গেল না; থামানো গেল না—গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন তিনি। সে দিন ফিরে আসতে হলো দিদিমাদের।

দোতলার খোলা বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল মিত্রা। মাত্র কিছুক্ষণ হলো বড়মামা রওনা হয়ে গেছেন মা দিদিমাকে নিয়ে। বড়মামীমা মেয়েকে বসিয়ে রেখে গেছেন ওর কাছে। মিত্রা শুনেছে মামীমা বলে গেছেন মেয়েকে, ওকে একা ফেলে কোথাও যেও না গায়ত্রী। ওকে ভুলিয়ে রাখো।

মিত্রার মনে হলো মামীমা যেন বলে গেলেন,—ওযে জগতে আজ কত একা, সেই নিষ্ঠুর সত্যটা ভুলিয়ে রাখো গায়ত্রী। ওর বাবা নেই বুঝতে দিও না। ওর ঘর নেই বুঝতে দিও না। ওর মার অবস্থা কোন দিকে চলেছে বুঝতে দিও না। ওকে ভুলিয়ে রাখো। তোমাদের সব আছে তাই যে অপরাধে তোমাদের পিঠে মার পড়ে সে অপরাধে আমরা ওর পিঠে হাত বুলোই। যে অপরাধে তোমাদের বিষম শাস্তি মেলে তার চাইতেও গুরু অন্যায়ে ওর গালে গাল রেখে আমরা ওকে আদর করি, চুমু খাই। অদৃষ্টের হাতের মার রুখতে পারিনে, কিন্তু তার ধার ভোঁতা করে দেবো আমরা।

সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ অভিমানে হঠাৎ ফুলে ওঠেছিল মিত্রার বুক। মা কেন এমন হলেন। দিদিমা সহ্য করছেন কি করে? তার সন্তান, তার বধূ তার পঞ্চাশ বছরের সঙ্গী স্বামীর বিদায় ব্যথা তিনি সহ্য করেছেন কি করে। দিদিমার দিকে তাকিয়ে মিত্রার মনে পড়ে কিছুদিন আগে দেখা একটা ছবির কথা। একটা ছবি দেখেছিল সে। রোজ রোষে পড়ে বিনা অপরাধে শাস্তি মাথা পেতে নিচ্ছে এক রোমান বীর। চামড়ার চাবুকের মার যখন এসে সপাং করে পিঠের খালি চামড়ার উপর পড়ছে, মুখটায় সামান্য একটা দুটা ভাঁজ পড়ছে মাত্র। তারপরেই যে কে সেই। ওর দিদিমা যেন সেই রোমান বীর। মারগুলো যখন এসে পড়ে, একবার করে কেঁপে ওঠেন, কেঁদে উঠেন, চোখ ঢাকেন তিনি। তার পরই ফেলেন নিজেকে সামলে।

হঠাৎ গায়ত্রীর ডাকে চমকে উঠেছিল মিত্রা। তার অঙ্গুলী নির্দ্দেশে নীচের দিকে তাকিয়ে গাড়ী থেকে মা-দের নামতে দেখে বিস্ময়ে ছুটে এসেছিল নীচে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন মা। যেন আর একটু হলেই হারিয়ে ফেলেছিলেন ওকে। ভালো লাগেনি, ভালো লাগেনি মিত্রার। মার কান্না, মার ভয়, মার ত্রাস ভালো লাগে না তার। তার বুকের ভেতর কুঁকড়ে উঠেছিল সে।

তবু সেবার তাদের সঙ্গী হতে পেরে বেঁচে গিয়েছিল মিত্রা। বাড়ীতো নয় হয়ে উঠেছে যেন একটা মৃতের কবরখানা। ঘরের চার দেয়ালে কেবল মৃতের ছবি। কোথাও সেজমামার। কোথাও সেজ মামীমার। কোথাও দাদুর। কোথাও হারিয়ে যাওয়া আর কোন পুরুষের। দিদিমা ধূপ দেন। প্রদীপ দেন। মৃত্যু তিথিতে মালা পরান। জ্যান্ত মানুষ কটারই যেন আজকাল কোন অস্তিত্ব নেই বাড়ীতে। সেজমামার ছবির দিকে চোখ পড়লেই স্পষ্ট দেখতে পায়, ওকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে আসার অভিনয় করতে করতে সেজমামা বলছেন, ওমা, আমাদের সেই ছোট্ট মিতু আর ছোট্ট নেই তো! কোলে নেবো কেমন করে!

সেজমামীমা পাশের দেয়াল থেকে তার সুন্দর বাঁকানো ভুরুকে আরো বাঁকাটানে বাঁকিয়ে তুলে বলছেন, চোখ লাগিও না বলছি।

দাদু মধ্যখানের দেয়ালটা থেকে গম্ভীর গলায় ডেকে উঠছেন— কই গো সুমি-মা। কাগজটা নিয়ে এসো দেখি।

কান্না-কান্না-কান্না। কান্না দিয়ে ঠেসে রেখেছে সবাই বাড়ীটাকে। মানুষ নিশ্চয়ই কাঁদতে ভালোবাসে—নইলে এমন করে কান্নার আয়োজন সাজিয়ে বসে থাকে! পরে দেখেছে মিত্রা, ঠিক তাই। মানুষ কাঁদতে ভালোবাসে। দুঃখ সুখ আনন্দ, প্রেম প্রশান্তি— যে কোন অনুভূতির চরম প্রকাশ যতক্ষণ না গিয়ে চোখের জলে পৌঁছোয় ততক্ষণ তার পাওয়া পূর্ণ হয় না।

মার সঙ্গে বেরুতে পেরে নয়— বাড়ীটা থেকে বেরুতে পেরে বেঁচে গেল মিত্রা।

বোনকে নিয়ে বড়মামা ঘুরলেন কত দেশ। দেখালেন কত নিত্য নতুন জায়গা। পরিবেশের নতুনত্বে মুছে দিতে চাইলেন দুঃখের বেদনা। পাহাড় সমুদ্র অরণ্য—বোনকে নিয়ে প্রকৃতির মুখোমুখি দিতে লাগলেন দাঁড় করিয়ে। যেন প্রকৃতিরই তো সন্তান আমরা। সেই শান্ত করবে, শান্তি দেবে।

কিন্তু জল হাওয়ায় পরিবর্তন হলো অনেক। সুমিত্রার ভেতরে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

এমন একটা ভয়ংকর সত্যকে স্বীকার করে নেবার আগে সব চাইতে বড় প্রয়োজন বাড়ীর মানুষগুলোর মনের প্রস্তুতি। ধৈর্য্য আর শক্তি ধারণের মানসিক সেই প্রস্তুতির প্রয়োজনে কিছু নয়, কিছু নয়ের চোখে ধূলো দেওয়া কালাতিবাহন আর যখন চলে না, দিদিমা ডেকে পাঠালেন ছেলেদের। জিজ্ঞাসু মুখে এসে দাঁড়ালো দু ছেলে মার কাছে। মা সময় নিলেন একটু। তারপর বললেন—মিত্রাকে বিয়ে দিয়ে ফেলতে চাই আমি। একটি ভালো পাত্রের খোঁজ করো তোমরা।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন বড় ছেলে মার দিকে— একি বলছ মা!

ছোট ছেলে অরুণ। মেডিকেল কলেজের ছাত্র। খেলতে যাচ্ছিল। হাতের টেনিস র‍্যাকেটটা এ হাত থেকে ও হাতে করতে করতে মার কথার পুনরাবৃত্তি করলো সে—মিত্রার বিয়ে দিয়ে ফেলতে চাই। একটি পাত্র দেখো। ফেলে দেবার জন্য আবার একটা পাত্রের প্রয়োজন কি। দু আঙ্গুলে টিপে ধরে জানালা দিয়ে ঐ মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হয়।

বড় ছেলে শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল কারণ।

ছোট ছেলে দিল মাথার চুলে ঝাঁকি— কারণ, কারণ আবার কি খেয়াল সেফ খেয়াল!

বৃদ্ধ বয়সের শীর্ণ চিবুক মার কুঁচকে রেখাময় হয়ে কেঁপে উঠল বারকয় থর থর করে— একটু সময় নিয়ে নিজেকে শান্ত করলেন মা। তারপর বললেন, দেখছ না বোনের অবস্থা? বুঝতে পারো না কিছু? তুমি তো ডাক্তার হতে চলেছ। এখন সময় আছে। সবাই ভাবে দুঃখী মানুষ কাঁদে। কিন্তু যদি এমনি ধারা চলতে থাকে কিম্বা দাঁড়ায় বাড়াবাড়িতে— তখন কে আর নেবে তোমাদের মিত্রাকে ঘরের বউ করে? কেঁদে উঠলেন তিনি আকুল হয়ে।

আর কথা বলতে পারলে না বিমল। তার কণ্ঠও গেছে রুদ্ধ হয়ে।

মাথার ঝাঁকুনীর সঙ্গে মার কথা ঝেড়ে ফেললো অরুণ। এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলে সব যুক্তি।—যত বাজে কথা। পর পর ঘা খেলে ওরকম হয়। আবার সেরেও যায়। ওকে পাগল বলে না। দিদিও সেরে উঠবেন। মাঝখান থেকে তুমি পাগলামী করে বোসনা। এ হতে পারে না। হতে দেবো না।

কিন্তু এরপর মা চুপ করলেও—বোন চুপ করলেন না। বেশ ছিল সুমিত্রা চুপচাপ নিজের মনে। কথাটা কানে যেতেই যেন মিত্রাকে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে পেয়ে বসল তাকে। সে এক দুর্দান্ত ইচ্ছা। ভাইদের পেছন পেছন ঘুরে ঘুরে কেবল এক কথা বলেন, আর এক মিনতি জানান। বাড়ীতে কেউ এলে দুহাত হাতে জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করেন একটি ভালো পাত্রের খোঁজ দিতে। রবিবারের কাগজে পাত্র-পাত্রী সংবাদের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বিজ্ঞাপন পড়েন আর চিঠি ছেড়ে চলেন। উত্তর আসে। কেউ কেউ এসে উপস্থিত হয় মেয়ে দেখতে। ভুলানো কথায় চলছে না দেখে বাধা দিতে হলো ভাইদের। প্রথমে নীরবে চোখের জল মুছে চললেন সুমিত্রা। তারপর তার গুমরানো কান্নার চাপা শব্দে মুহ্যমান হয়ে রইল বাড়ীটা সমস্ত রাত।

অবশেষে বাধ্য হয়েই মামাদের মত দিতে হলো এবং মন দিতে হলো পাত্র খোঁজায়। বিয়ে যখন স্থির হলো তখন মিত্রার বয়স বড়জোর পনেরো ষোল। স্কুল ফাইনেল পরীক্ষা দিয়ে এসে, কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখছে দু বোন—ও আর গায়ত্রী।

দিদিমা বললেন, এই ভালো হলো। মেয়ে যদি আমার এই আনন্দে ভালো হয়ে ওঠে— কত মাথা কুটেছি, ভগবানের কাছে কত মানত করেছি—

'শিশু বলি মেনেছিলে বুঝি।' অরুণের ইচ্ছে হলো একবার বলে। কিন্তু কিছুই না বলে হাতের কাগজ নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

শুনে ছুটে এসেছিল মিত্রা বড় মামীমার কাছে।—কার বিয়ে হচ্ছে শুনি? আমার? ঠোঁট বাঁকালো সে। আমার বিয়ে, আমিই জানিনে। কি চমৎকার। তবে আর আমার দরকার কি। যারা ঠিক করেছে, তারাই বিয়ে করে আসুক গিয়ে।

হেসে উঠেছিল গায়ত্রী। বিয়ে করবি নে তো সেদিন গিয়েছিলি কেন ঐ বুড়োকে প্রণাম করতে?

ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফুঁসে উঠেছিল মিত্রা— জানি আমি? আমায় বললেন সবাই দাদু হয়। প্রণাম করে যাও। মিথ্যুক সবাই মিথ্যুক। বড়রা নাকি এমন মিথ্যে কথা বলে। তোমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আর জীবনেও করছিনে আমি। কোনদিনও করছিনে— —

বুকে টেনে এনেছিলেন বড়মামীমা ওকে। মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন— চমৎকার ছেলে। তিন তিনটে পাশ। তাতে মস্ত ধনী। এমন সম্বন্ধ মেলে নাকি সবার ভাগ্যে। এর পর আমাদের মিতু এই মস্ত গাড়ী চড়ে আসবে যাবে। আমরা রিক্সায় চেপে ঠুন ঠুন শব্দ তুলে গিয়ে নামলে যাবে লজ্জায় মরে। চুপি চুপি এসে বলবে, এভাবে তোমরা আসবে না মামীমা। আগে খবর পাঠাবে। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।

বিজ্ঞাপন আওড়ালো গায়ত্রী—লাল পাড় টুকটুকে শাড়ী— আঁচলেতে বেঁধে আনে জমি বাড়ী গাড়ী। তুই লাল পাড় টুকটুকে শাড়ী পরেছিলি নাকি রে মিতা?

কেঁদে ফেলেছিল মিত্রা। এই যদি ভালো, তবে একা আমার কেন হবে। গায়ত্রীর হবে না কেন। তোমরা শুধু আমাকেই তাড়াতে চাচ্ছ।

কিন্তু মা যখন ওকে ডেকে আদর করলেন, সুন্দর সুন্দর কথা বলে বোঝাতে লাগলেন— মরণ, কেবল মরণ দেখে দেখে ভয় ধরে গেছে তাঁর! কবে এমনি হঠাৎ চলে যাবেন নিজেও তা কে বলতে পারে। মেয়ের জীবন গড়ে দিয়ে যেতে চান তিনি। তার গড়া জীবন একটু দেখে যেতে চান। তাকে সুখী দেখে সুখ পেতে চান। মেয়ের সুখ দেখার বড় লোভ তাঁর।

ভয়ে আর অস্বস্তিতে কতদিন হলো মার কাছে এগুতে পারেনি মিত্রা। সেদিন মিশে রইল মার বুকের সঙ্গে।

আজ মনে হয়, ওর বিয়ের চরম লাভ হয়েছিল সেটাই আর কিছু নয়।

বিয়ে ঠিক হয়ে গেল মিত্রার কলকাতার এক শিক্ষিত ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে। চার ভাই ছিলেন ব্যবসার মালিক। কালের গুনতিতে একরকম অকালেই গত হয়েছেন তিন ভাই। বেঁচে আছেন শুধু মেজকর্তা। তিনিই এখন এই সংসার মালার গ্রন্থি সূতো। এ গ্রন্থিটি ছিঁড়ে গেলেই সমস্ত পরিবার খসে ছড়িয়ে পড়বে যে যার হয়ে। ছেলেরা সব বাপের ব্যবসার ভার হাতে তুলে নিয়েছে হাতে। কাঁচা হাতে নেয়নি, নিয়েছে শক্ত হাতেই। কারণ ব লিখতে শিখবার আগেই ব্যবসায়ে পুত্রদের প্রবেশ করাননি কর্তারা। কলেজে পড়িয়ে, প্রফেসর রেখে পড়াশোনাটা করিয়ে নিয়েছিলেন আগে। তার মানে এই নয় যে, ধনের চাইতে জ্ঞানকে তাঁরা বড় করে দেখেছিলেন। আজও যদি তাদের ধন আর জ্ঞানের যে কোন একটি ইচ্ছে পুরণের দৈব যোগ ঘটে, তারা ধনই চাইবেন। শিক্ষার প্রতি এই প্রীতিটুকু তাদের পূজারী ব্রাহ্মণের ফুল প্রীতির মতো। একের ধর্ম পথ প্রশস্থ করতে। আর একজনের ব্যবসায়ের পথ। কিন্তু কেবল ঐ টুকুই। অন্তর রয়ে গেছে তেমনি সবার অন্ধকারে। তাই অন্দরে আলো জ্বলেনি। হাতের প্রদীপের আলোয় পথ চলে, ঘরে ঢোকার আগে তারা দেয় ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে। তারপর এসে বসে অন্ধকার দেশের বাদশা হয়ে। এ বাড়ীরই মেজ কর্তা এক নজরে পছন্দ করে গেলেন মিত্রাকে তার ছোট ভাই-এর ছেলে লীলা-কান্তের জন্য। মিত্রাদের অবস্থা নিয়ে খুঁতখুঁত উঠেছিল। কিন্তু মেজকর্তা আমল দিলেন না। মিত্রাকে তার মনে ধরে গিয়েছিল। পাকা কথা দিয়ে, বর্মিলুঙ্গী পরে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুভ মহেন্দ্র যোগের খোঁজে উল্টে চললেন পঞ্জীকার পাতা।

চার ভাই-এর ভেতর মেজকর্তা শশীকান্তর সঙ্গে ছোটকর্তা রমাকান্তর মিল ছিল বেশি। তাই হয়তো মেজগিন্নী শৈলনন্দিনী আর ছোট গিন্নী স্বর্ণময়ীর মধ্যেও হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল সব চাইতে বেশি। ছোটকর্তার মৃত্যুর পর নির্ভর করলেন স্বর্ণময়ী সব কাজেই শশীকান্ত আর শৈলনন্দিনীর ওপর। বড় দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন ছোটকর্তা নিজে। তাই মন না উঠলেও শশীকান্তর ওপর কথা বলতে দিলেন না স্বর্ণময়ী কাউকে।

মুখের হ্যাঁর সঙ্গে মনও তৈরী হয়ে উঠে শেষে আপনা থেকেই। মিত্রার মনও প্রস্তুত হয়ে উঠতে লাগল ঠিক আরো অপর দশটি বিয়ের কনের মতো। মন রঙ্গিন স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল মনে মনে। একে বিয়ের স্বপ্ন, তাতে অপরিণত বুদ্ধির। কল্পনায় বাস্তবের ছোঁয়া রইলো না তিল মাত্র। রাজপুত্রের মতো চেহারা নিয়ে আসবে বর। বেল ফুলের মালা জড়িয়ে দিবে ওর খোঁপায়। হাতে তুলে দেবে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। হাতে তুলে নেবে ওর হাত। কখনো চাঁদের আলোয় ঘুরবে হাত ধরে। কখনো গল্প করবে কোলে মাথা রেখে— এই তো বিয়ে। দিন গুনছিল কি মিত্র? হাঁ, তাও গুনেছিল বৈকী।

কিন্তু দধিমঙ্গল রাতে যখন বেজে উঠল সানাই, মা মামীমা দিদিমারা সবাই কুলো মাথায় করে চললেন, জল ভরতে, দু চোখ ভরে উঠেছিল মিত্রার জলে। সানাই যেন কাঁদছে। বেহাগ, ভৈরো, ইমন দেশ নানা রাগিনীতে সে কেবল কেঁদে চলেছে। মিত্রাও বালিশে মুখ চেপে কেঁদে চলল, কেবল কেঁদে চললো।

বিয়ের রাতে সুন্দর লাগছিল মিত্রাকে— অপূর্ব সুন্দর।

শ্বেত চন্দন ফোঁটা ছিল কপাল ঘিরে। মাঝখানে ছিল একটি কুমকুম বিন্দু। কালো রেশমের মতো চুলের মস্ত খোঁপায় জড়িয়ে দেওয়া ছিল বেল কুঁড়ির মালা। ঘন সোনালী বুটির সবুজ ওড়নার ঘোমটা ছিল মাথায়। লাল বেনারসী সরু কোমড় ঘুরে সামনা আঁচল বিছিয়ে ছিল বুকের উপর। সদ্য গড়িয়ে আনা অলঙ্কার ছড়াচ্ছিল দ্যুতি। হাতে হাত পদ্ম, গলায় কণ্ঠী, মাথায় সিঁথি ঝালর— যেন দেবী লক্ষ্মী। যেন মোন প্রতিমা। দেহ লাবণ্য যেন গলানো মোম। এখন ওর সব অঙ্গের মোম দৃঢ় ভঙ্গিমায় জমে ওঠেনি। কাঁচা। সময় না দিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে মোম প্রতিমা পরিণত হবে মোম পিণ্ডে।

মার আনন্দ উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন মনে প্রবেশ করেছিল মিত্রা বাসর ঘরে। নানা সম্পর্কের দিদি বৌদিরা এনে ওকে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল নতুন জোড়া খাটের সিল্কের বিছানার উপর। মাথায় হাত রেখে যেন বড়মামীমা অস্ফুট কণ্ঠে করে গিয়েছিলেন কি আশীর্বাদ। হয়তো করেছিলেন ওর দাম্পত্য জীবনের কল্যাণ কামনা। গায়ত্রী আর অন্য বন্ধুরা সব গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ভারি সুন্দর হয়েছে বর। সুন্দর না হলে বর হয় কি করে। ভেবেছিল মিত্রা।

দধি মঙ্গল রাতের সানাই-এর করুণ সুরের মূর্ছনা তখন মুছে গিয়েছে ওর মন থেকে। অন্তর ইন্দ্রিয় দানা বেঁধে উঠেছে ইংরেজী বাজনার সুরে সুরে। চোখে ভাসছে অপ্রকৃতিস্থ মার প্রকৃতিস্থ চেহারা। দুঃখিনী মায়ের সুখী মুখ। তাই আজ সেও সুখী।

গল্প করতে ইচ্ছে করছিল মিত্রার— অনেক গল্প। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল মিত্রার— অনেক কথা। ঠিক যে ভাবে কথা বলে গায়ত্রীর সাথে। বলে স্কুলের বন্ধুদের সাথে। বলে ছোটমামার সাথে। একমুখে সহস্র কথা। আজ আনন্দের সঙ্গে বলে যাবে ও কেবল ওর মায়ের কথা। আর কারু কথা নয়। এক মাথা দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন ভগবান ওর মায়ের মাথায়, কিন্তু শক্তি দেন নি সে বোঝা সহ্য করবার।

কিন্তু কথা বলে না কেন এ! বোকা না বোবা অপাঙ্গে তাকালো সে লীলাকান্তের দিকে। মুখের চন্দন নাকি ধুয়ে ফেলেছিল লীলাকান্ত। তাই বৌদিরা ফের তার কপালে একটা মস্ত চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়ে গেছেন। ফিনফিনে শান্তিপুরের ধুতীতে, সিল্কের পাঞ্জাবীতে হাতের লাল নীল সাদা পাথরের গোটা কয় আংটিতে, তাকে দেখাচ্ছে যেন ঠিক বড়বাজারের ধনী মাড়োয়ারী ছেলের মতো। উকিল বড়মামার সঙ্গে নববর্ষের দিনে যাদের দোকানে যায়। যারা রূপোর আতর দানে আতর ছিটোয়। হাতে দেয় রূপোর তবক মোড়া পান মিষ্টি।

কিন্তু সত্যি কথা বলছে না কেন : ছোটমামা হলে এতক্ষণে ভূতের গল্প বলে ওকে সমস্ত ঘরময় দৌড়ঝাঁপ করিয়ে ছাড়তেন না! আবার তাকাতে গিয়েছিল সে লীলাকান্তের দিকে। কিন্তু এবার লীলাকান্ত ওর দিকেই তাকিয়েছিল। তার সে তাকানো অদ্ভুত। এমন তাকানো মিত্রা দেখেনি। খাট থেকে পা নামালো মিত্রা মাটিতে। পা একবার মাটির নাগল পেলেই ও দৌড়োবে— কিন্তু পারলো না।

লীলাকান্তের দু হাতের বন্ধনে ততক্ষণে বাঁধা পড়ে গেছে। ওর ছোট্ট মুখটার তলার অংশের পুরোটাই তখন লীলাকান্তের মস্ত হা করা চুম্বনের ভেতর।

প্রথম ছাড়া পেয়ে মিত্রার ইচ্ছে হয়েছিল লীলাকান্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে কামড়ে খামচে ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু কিছুই করলে না সে। শুধু ছাড়া পেয়ে শান্ত পায় দাঁড়িয়ে ছিল এসে বারান্দায়—পৌষের শীতেও ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে। অসম-নিঃশ্বাসে কেঁপে চলা বুক নিয়ে। ক্লান্ত ঘুমে বারান্দার এ কোণে সে কোণে ঘুমিয়ে ছিল জড়ানো কলাপাতার পুলিন্দা বালিশ করে ঝি চাকররা। কুকুরটা শুয়ে ছিল কুণ্ডলী পাকিয়ে আঙিনায়। মানুষের সাড়া পেয়ে এগিয়ে এসেছিল ঘেউ ঘেউ শব্দ তুলে। মিত্রাকে দেখে চোখের শিকারী দৃষ্টি, পায়ের উদ্যত থাবা বুজে গিয়েছিল তার। মিত্রার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করে চলেছিল লেজ নেড়ে।

অন্ধকার রাত।

বাড়ীটার চারদিকে ঘিরে আছে ঘন অন্ধকার। শুধু উৎসব বাড়ীর এদিক ওদিকের দু একটা আলোতে কোথাও কোথাও মানুষ চেনা অস্পষ্টতা।

কে ও—

—আমি মা, অসহায় ভাবে জবাব দিলে মিত্রা।

উঠে এসেছিস যে? কিছু চাই?

জল খাবো।

জল রাখা হয়নি ওঘরে। আয় আয়। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে মেয়ের হাতে দিলেন।

মিত্রা এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে নিল। এতক্ষণে বুঝলো সে, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল তার।

আর এক গ্লাস জল ভরে মেয়ের হাতে দিলেন মা। বললেন, নিয়ে যা।

মা তাকিয়ে আছেন ওর দিকে জ্বলজ্বলে চোখে।

জলের গ্লাস হাতে করে উপায়হীন মিত্রা ফের এসে পায় পায় ঢুকল বাসর ঘরে। মা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আরো সুস্থ হয়ে উঠবেন দিনেদিনে। এখন নূতন আবার কিছু ঘটলে—ভাবতে পারে না মিত্রা। তার চাইতে যা হয় হোক। যা খুশী হোক। আশ্চর্য্য! এক রাত্রির ভেতর পা দুলিয়ে গল্প করা মেয়ে যেন পেকে বুড়িয়ে গেলো গ্রীষ্মের দিনের ফলের মতো।

শুধু বড়মামীমাকে একা পেয়ে মুখ চেপে ধরেছিল তার বুকে-- কেঁদে উঠেছিল ফুঁপিয়ে— এই নাকি তোমাদের বিয়ে।

খুঁজে বের করেছিলেন বড়মামীমা অরুণকে। বলেছিলেন— লীলাকান্ত তো তোমাদের বয়সী। যদি তুমি একটু বলে দেও।

বিস্মিত অরুণ জানতে চাইল— কি বলে দেবো?

এই—লাল হয়ে উঠেছিল নিলীমার মুখ ছোট দেওরের কাছে লজ্জায়। তবু বলেছিলো— মেয়ে আমাদের নিতান্ত ছোট তো। আর...

অরুণ কি বলতে গিয়েও যেন গিয়েছিল থেমে। মিত্রার বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর থেকে সে যেন তার জিভে লাগাম কসে রেখেছে। ছুটতে চাইলেই রাশ টেনে ধরে। শুধু বলেছিল—ষোল সতেরো বছরের মেয়ে আবার ছোট কি! বারো বছরে আগের দিনে মেয়েরা খোকা কোলে নিত।

সে আগের দিনে। এখন তো নয়।

বিয়ে হয় না, তাই নয়—

বিমল বসেছিল স্তব্ধ হয়ে।

মিত্রাকে লেখাপড়া শেখাবেন। যত পড়তে চায় তত পড়াবেন। বিদেশে যেতে চায়তো তাও পাঠাবেন। তার ভেতর যে সম্ভাবনা রয়েছে তা নষ্ট হতে দেবেন না তিনি। এই তো ছিল তার ইচ্ছে। কিন্তু হলো না। কিছুই হলো না। কিন্তু কেন হলো না। সে যদি বেঁকে দাঁড়াতো কার সাধ্য ছিল বিয়ে দেয় মিত্রার। কিন্তু ছিল কি সেই বেঁকে দাঁড়াবার মতো মনোবল? ছিল না। চতুর্দিকে মৃত্যু আর হতাশা। বাবা চলে গেলেন। চলে গেল ছোট ভাই। বোনের ভেতর দেখা দিল মানসিক বৈকল্য। মনে চেপে বসল বৈরাগ্য। মানুষের হাত কতটুকু! যা ঘটবার তা ঘটে চলে। একটার পর একটা ঘটে চলে। বিমল কি পেরেছে কোন ঘটনাকে নিজ ইচ্ছায় চালাতে? তবে বৃথা চেষ্টা করা কেন। হয়তো সুখীই হবে মিত্রা। অ-দৃষ্ট।—অর্থাৎ সবই তো না-দেখা আর না-বোঝার খেলা। তবে আর বৃথা আকুলতা অস্থিরতা প্রকাশে লাভ কি।

কিন্তু আজ নেই আর তার সেই বৈরাগ্য ভাব। শেষ নেই তার ক্ষোভের। একি করলেন তিনি। একজনের ভালো করতে গিয়ে আর একজনের জীবনের মূলে আঘাত হানবার কোন অধিকার ছিল না তার। না ছিল আর কারু। আজ তার মন বলছে, মিত্রার জীবনের আলো নিভে গেল। সুখের আলো নিভে গেল। লীলাকান্তের সঙ্গে মিত্রার জীবনের সুর কোন দিন ঐকতান তুলবে না।

মিত্রা কাঁদছিল। বড় মামার কোলে মুখ রেখে কাঁদছিল।

তাড়া নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন মা—

তোমরা করছ কি দু'জনে? বর-কনে রওনা হবে। ওদের বাড়ীর পুরুত ঠাকুর তাড়া দিচ্ছে। মার চোখে সন্দেহের ছায়া।

ঝলকে হেসে ওঠে দাঁড়ালো মিত্রা। বললো—কাঁদছিলাম। মামার কোলে মাথা রেখে কাঁদছিলাম। কাঁদবো না! না কাঁদলে তো তোমরাই বলবে কি মেয়ে। মায়া-মমতা নেই গো। আমাদের ছেড়ে যেতে কাঁদলে না! মুখটা উঁচুতে তুলে থুতনীতে ভাঙ্গ ফেললো মিত্রা—হু, এখন তো অবস্থা হবে শাঁখের করাতের মতো। আসতেও কাটবে, যেতেও কাটবে।

খুশিতে হেসে উঠলেন সুমিত্রা।

মাকে দুঃখ দেবে না সে—এই এক লক্ষ্যে যদি না চলতো মিত্রা, তবে সাধ্য ছিল কার লীলাকান্তের সঙ্গো গাঁটছড়া বেঁধে ওকে শ্বশুর ঘরে রওনা করে দেয়।

প্রচলিত অনুষ্ঠান শেষে গুরুজনদের প্রণাম করে সবার কাছে বিদায় নিয়ে, লীলাকান্তের সঙ্গে উঠে বসলো মিত্রা গাড়ীতে। বাজলো সানাই। শঙ্খ, হুলুধ্বনি।

সবাই সারবেঁধে দাঁড়িয়ে মুছে চললো চোখের জল। গায়ত্রী দাঁড়িয়ে কন্‌ভেন্ট স্কুলের সাদা জামার উপর ঘন নীল স্কার্ট পরে। মাথার লাল রিবনটা উড়ছে তার বাতাসে।

গাড়ী ছুটে চলেছে।

হারিয়ে গেলেন মা, বোন, দিদিমা, মামীমা, মামারা। আর দেখা যায় না কারুকে। এবার ছাড়িয়ে গেল ওদের বাড়ীটা। গাড়ী পড়লো অন্য পথে। মোড় ঘুরলো। কান্নায় কেঁপে উঠল মিত্রা—এই যে বাড়ী সুদ্ধ লোক গাড়ীটা মোড় ঘোরার সঙ্গে চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল— এ যেন শুধু এখনকার জন্য নয়। মিত্রার জীবন থেকেই যেন আজ তার পরম প্রিয় লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো—কান্নায় কেবল কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল মিত্রা।

উঃ গায়ত্রীর মাথার ফিতেটা কি লাল। বাতাসে উড়ছিল সাপের জিভের মতো। আজ কলেজে ভর্তি হয়ে এসেছে গায়ত্রী। কেমন আঁট সাট স্কার্ট পরে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন বাচ্চা মেয়ে। আর ও? ওর মাথায় একমাথা সিঁদুর। হাতে ডজন ডজন চুরি বালা চুর। মোটা মোটা শাঁখা। পরোনে সোনা-রূপার জালবোনা বারো হাত বেনারসী। বসে আছে জবু থবু জড় পদার্থের মতো।

এ কোথায় চলেছে সে। দাদু থাকলে এ কখনোই হতে দিতেন না। দাদু বলতেন, বিয়ে-টিয়ের কথা মনের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দিও না মিত্রালী। নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়াটি করে চলো। বরের চাইতে বড় নজরানা দেবো।

মার বুদ্ধি সুস্থ ছিল না। দিদিমা বুড়োমানুষ। ওর নিজের কথা তো ওঠেই না। কিন্তু তোমরা মামা, তোমরা কেন ও হতে দিলে। হাতের রুমাল মুখের ভেতর ঢোকালো মিত্রা কান্নার শব্দ চাপতে।

পাশে বসে লীলাকান্ত ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। নিজের রুমালটা পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে ধরলো ওর দিকে।

পুরোণো দিনের বিরাটা বনেদী পরিবারের বধূ হয়ে এসে নামলো মিত্রা। আতর ছড়িয়ে দিতে লাগলো মেয়েরা সঙ্গে ফুলের পাপড়ি।

তখন মাত্র সন্ধ্যা।

সমস্ত বাড়ীর গায় আর আশে-পাশের গাছে গাছে লাল নীল হল্‌দে সাদা আলোর মালা জ্বলছে। পাশে মস্ত প্যাণ্ডেল— কালকের বৌভাতের আসর। গেটের মাথায় নহবৎখানা। সানাই বাজছে।

সন্ধ্যার রাগ পূরবী ধরেছে সানাই। যে মেয়েটি তাকে লাল সালুর কাপড় বিছানো পথ আর সিঁড়ি দিয়ে তুলে এনে হল-ঘরে জোড়া পনের থালার উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, সেই মেয়েই অবশেষে এক সময় তাকে ক্ষির সর চিনি মুখে আর কানে মধু ঢালার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো উপরের ঘরে। মাথার ওড়না খুলে; মুখ কানের মিষ্টি মধু ধুয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, চা খাবে? তারপরই পরিচয় দিলো নিজের। আমার নাম কমলা। লীলাকান্ত নামে যে ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হলো আমি তার ছোট বোন নিয়ে আসবো চা?

কমলার কথার ধরনে হেসে ফেললো সে।

হঠাৎ হরিণের মতো কান খাড়া করে বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনলো কমলা। তারপর ডেকে উঠলো—শমীমামা।

পায়ের শব্দ থামলো। সাড়া এলো— কেন?

চলে যাচ্ছ যে? বউ দেখে গেলে না।

কতবার দেখবো বউ।

কতবার দেখবে মানে। কমলা বেরিয়ে এলো বারান্দায়। আমাদের নতুন বউ দেখেছ তুমি।

দেখিনি। বলিস কি!

করবে?

কেন কালকে। বিয়ের সময়।

কি সাংঘাতিক তুমি শমীমামা! গিয়েছিলে তুমি কাল আমাদের সঙ্গে বরযাত্রী? আমি বুঝি দেখিনি তুমি ভিড়ের ভেতর থেকে আলগোছে পালিয়ে গিয়েছিলে।

না, কাল বিয়ে বাড়ীতে শমিত যায়নি। আর এই না যাওয়ার কথাটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। তার ধারণা বিয়ে যখন বাড়ীতে একটা হয়ে গেছে; তখন তাকে বরযাত্রী যেতে হয়েছে। বউ দেখতেও হয়েছে।

আজও হট্টগোলের ভেতর থেকে পালাচ্ছিল সে। একটু অপ্রতিভ বোধ করল শমিত। এগিয়ে আসতে আসতে বললো— রোজ যে বাড়ীতে বিয়ে লেগে থাকে, সেখান থেকে মানুষ এ ভাবেই পালায়।

সে এসে ঘরে ঢুকতেই মিত্রার মুখ আঁচলে ঢাকলো কমলা— বউ রাগ করেছে। মুখ দেখাবে না।

তবে যাচ্ছি।

বেশ যাও। এমন অবহেলার দেখায় বউ ঘোমটা খোলে না।

কাজ ছিল শমিতের। কমলার উপদ্রব—কতক্ষণ খুনসুড়ি করবে সে কে জানে। বললো, আচ্ছা, কাল দেখবো বউ।

ঘাড়ের রোঁয়া খাড়া করলো কমলা। কাল দেখবো! কক্‌খনো দেখাবো না। এমন মুখ না দেখবার জন্য কাঁদবে শেষে।

হঠাৎ একটু থমকালো শমিত। তারপর হেসে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু শমিত এ বাড়ীর ছেলে নয়।

শমিতের বাড়ী এটা নয়।

এটা শমিতের দিদির বাড়ী।

কিন্তু তবু শমিত এ বাড়ীরই ছেলে। এটা তারও বাড়ী। কেন— সেটাই একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন।

বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন এ বাড়ীর মেজকর্তার স্ত্রী শমিতের দিদি শৈলনন্দিনী। হঠাৎ মায়ের মৃত্যু খবর পেয়ে গিয়ে দেখলেন, অনেক বয়সে সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছিল মায়ের। অনেক কষ্ট পেয়ে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ করেই চোখ বুজেছেন তিনি। যে ছেলে এতো সাধনার দেখে যেতে পারেন নি তার মুখটি পর্যন্ত। ফিরে এলেন শৈলনন্দিনী মা মরা ভাইটিকে নিজ সন্তানের সঙ্গে বুকে করে। পালন করতে লাগলেন আপন সন্তানের সঙ্গে আপন স্তনপান করিয়ে। ছেলেমেয়ে শৈলনন্দিনীর হলো কিন্তু রইলো না। মৃতবৎসা দিদি আকুল ভাবে আঁকড়ে ধরলেন ভাইটিকে পুত্র স্নেহে। বাপ যে ছেলেকে নিতে না চেয়েছেন তা নয়। কিন্তু সে চাওয়ায় জোর ছিল না। শমিতের বাবা বিয়ে করেছিলেন আবার।

আজ আর কারুর এ সব বিগত ঘটনা স্মরণেও নেই। শমিত এখন একান্ত ভাবেই একীভূত ও বাড়ীর ছেলে। কিন্তু একই হাড়ির রান্না খেয়ে, একই কলেজে পড়ে এবং একই পারিপার্শ্বিকতায় মানুষ হয়েও জন্মের গঠন বৈচিত্র্যের জন্যই হয়তো তার স্বভাবটা নয় এ বাড়ীর অপর ছেলেদের মতো। সে থাকে তেতলার একটি মাত্র ঘরে, নির্জনে — একা। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কের আদান-প্রদানটা ও তার ঐ দূরের ঘরে থাকার মতোই দূরত্ব রাখা। সাংসারিক দায়-দায়িত্বে না জড়িয়ে, কলহ বচসার ঝক্কি এড়িয়ে নির্ঝঞ্ঝাট কিছু কথাবার্তা হাসি কৌতুকের মধ্যই সীমাবদ্ধ। কখনো প্রতিদিনের বের হওয়া দেখলে মনে হয় পৃথিবী উলটে-পালটে গেলেও বের তাকে হতেই হবে। কখনো তার বই-এর ভেতর মাথা গুজে পড়ে থাকা দেখলে মনে হয় বই এর জগৎ ছাড়া বাইরের জগৎ শমিত চেনে না। যেন গ্রহ যোগ আছে।

বাড়ীর ওর বয়সী প্রায় সব্বারই বিয়ে হয়ে গেছে। বাকী ছিল লীলাকান্ত। তারও এই হয়ে গেল। কিন্তু শমিত বলে, সে বিয়ে করবে না। ক্ষোভের অন্ত নেই শৈলনন্দিনীর। সবার ঘরে মেয়ে বউ। তার ঘরে না আছে মেয়ে না এলো বউ।

শশীকান্ত বলেন---আছে বুঝি কোথাও মন ঠিক করা।

শৈলনন্দিনী বলেন--- বেশ তো, সেখানেই করুক।

হয়তো কিছু আছে।

কি আবার থাকবে?

না, এ বলছিলাম—

কি বলছিলে?

না কিছু না।

কি বলছিলে শুনিই না।

যদি বিধবা টিধবা হয়?

আৎকে ওঠেন শৈলনন্দিনী।—কি যে বলো। শুনে বুক কাঁপে। একথা মনে হবার মানে?

উদাস কণ্ঠে শশীকান্ত বলেন, মনে হবার কি মানে থাকে।

তবে অমন অলুক্ষুণে কথা বলো না।

কিন্তু শুনে সত্যি বুক কাঁপে তার। দূর সম্পর্কের বোন জয়া। কিছু দিন হলো বিধবা হয়ে বাপের ঘরে ফিরে এসেছে। শমিতের গরজে সে পড়াশুনা আরম্ভ করেছে। পড়ায় শমিত নিজে। স্বামীর ইঙ্গিত কি সেই দিকে!

কিন্তু এ সবই অনুমান মাত্র।

বাড়ীর মেয়ে বউরা কারণ জানতে চাইলে শমিত বলে, ক'টা বলবো।

দু' একটা শুনি?

এই ধরো সুন্দর হলো তো নেই বুদ্ধি। রইল বুদ্ধি তো হলো না সুন্দর। আর ও দুটো থাকলো তো রইল না বিদ্যে। এই তো তোমরা এতো কটি আছো। দেখ সত্য কিনা।

তোমার বুঝি চাই একাধারে সব?

বিয়েই করতে পাবো একটি। এক আধারে না হয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় আধারে থাকলে আমার লাভ?

পাবে মনে হয় না।

যত দিন আশায় থাকা যায়। তারপর অগত্যা।

ব্যবসায় নিয়ে ভাইকে শৈলনন্দিনী এখনো বসাতে পারেন নি। এম. এ. পাশ করে সে দিব্য আনন্দে অধ্যাপনার কাজ করে চলেছে। ব্যবসার দিকে মন দেবার কথা বললে বলে, হবে হবে।

একাজও তার সখের। সে জানে দিদির সম্পত্তির অংশ তার।

বাড়ীটাতে কত লোক, কত ঘর, কত দাস-দাসী বহুদিন লেগেছিল মিত্রার এ সব জানতে। বহুদিন লেগেছিল তার সম্পর্কের প্যাচগোচ বুঝতে। বাড়ীতো নয় যেন গোলকধাঁধা। একবার দু-তিন পাক এদিক ওদিক করলে নিজের ঘর চিনে ফিরে আসতেও কষ্ট হয়েছে মিত্রার। ইংরাজী বর্ণমালার 'এইচ' অক্ষরটার মতো দু মহলা বাড়ী। দু বাড়ীর মাঝখানে এক সার একতলা দালানের ছাদ। বাড়ীতে পূজো হয়। আছে নাটমন্দির আর পূজো দালান। অতিথি অভ্যাগতের ভীড় লেগেই থাকে, আছে তাদের জন্য একেবারে ভিন্ন ব্যবস্থা। শুধু ব্যবস্থা নয়—সুব্যবস্থা। বহু নিকট সম্পর্কের আর দূর সম্পর্কের আত্মীয় কুটম্বে বাড়ী ভরা।

মিত্রা দর্শক হয়ে তাকিয়ে থাকতো আর দেখতো, একান্নবর্তী পরিবারের বর্তমান একতাটা ঐ শুধু দু'বারের অন্নেতেই এসে ঠেকেছে এদের। নইলে যার যার সখ আহ্লাদ সব গেছে ভিন্ন হয়ে। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক স্টোভ। ঘরে ঘরে ফ্রিজ। আনো বোসো খাও নিজ নিজ খুসী মতো।

তবু অশান্তি লেগে থাকে! কার ঘরে আত্মীয় বন্ধু অভ্যাগত এসে বেশিদিন রইল—কথা হয় এনিয়েও। এমন কি কারুর ঘরে যদি মেয়ে এসে বেশিদিন বাস করে তা নিয়েও মুখ ভার হওয়া বাদ যায় না। ভাতের খরচটা যে সবার পকেটের। লেগে আছে হিংসা দ্বেষ বিবাদ বিসংবাদ। পড়শীদের দুঃখে সুখে সহানুভূতির যে সাড়াটুকু মেলে, এরা হারিয়ে ফেলেছে পরস্পরের মধ্যে সেই সহৃদয় সমবেদনাটুকু পর্যন্ত। তবে একান্নবর্তী পরিবারের সুবিধে যেগুলো আছে, সেগুলোর ব্যবহার করে কিন্তু খুব খুসী মনে। বিশেষ করে উপহারের দিকটার সুবিধার অন্ত নেই। এই দুর্দিনের বাজারে একা দেওয়া আর একান্নের সুবিধায় চার ভাগের এক ভাগ দেওয়া মস্ত লাভ।

বর্তমানের হাওয়া এসে এই সংসারের পালেও নানাভাবে দোলা তুলেছে। এসেছে আশ্রিত-পালনে তাচ্ছিল্য। অসময়ের অতিথিতে বিরক্তি। আজকের যুগের ফাঁক ও ফাঁকিতে ভরে উঠেছে এদের আতিথেয়তা আর শরণাগত পোষণ। মন নেই বুঝি মানুষও নেই। আছে শুধু স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব জগৎ।

এ বাড়ীতে দর্শক হয়েই রইল মিত্রা—বাড়ীর কেউ হয়ে উঠতে পারলো না। ভালো লাগে না—কাউকে ভালো লাগে না ওর। লীলাকান্তকে ভালো লাগার আশা ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে অন্যদের ভালো লাগার আশা। কিন্তু জীবনে নিজের ভালো-লাগাটাই যে একমাত্র কথা নয়—দু'দিন আগের অবুঝ মিত্রা আজ তা বোঝে, বোঝে সে আজকাল অনেক কিছু। চলতে শিখেছে সে ভেবে চিন্তে আগু-পিছু বিবেচনা করে। নইলে এখানে বাস করছে সে কি করে।

লীলাকান্তের সঙ্গে দেখা হয় তার সামান্যই। ব্যবসার সময় ছাড়া লীলাকান্তের পেশা তাস। সন্ধ্যায় নীচে লীলাকান্তের বসবার ঘরে বসে তাসের আড্ডা। যায় ট্রে ভর্তি ভর্তি চা খাবার ভাজাভুজি। মিত্রার কথা মনেও থাকে না লীলাকান্তের যখন গাড়ী চেপে বন্ধুদের নিয়ে বেরোয় স্ফূর্তি করতে।

মা স্বর্ণময়ী সরল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু সেজ গিন্নী শৈলনন্দিনী সইতে পারেন না। বধূ জীবনে শশীকান্তের যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক কাঁদিয়েছে তাকে। আজকালকার ছেলেদের ভেতর ওসব অন্যায় সইতে পারেন না তিনি। ডেকে পাঠান লীলাকান্তকে। বলেন, বিয়ে করেছ, ঘরে বউ আছে মনে করিয়ে দেবে কে? আমি? মিত্রাকে নিয়ে ছবি দেখতে যাও আজ।

শুনে হাসি মুখে এসে ঘরে ঢুকছে লীলাকান্ত। জিজ্ঞাসা করেছে মিত্রাকে—ছবি দেখতে যেতে ইচ্ছে করে? যাও দেখে এসো জয়ন্তী আর রাণী বউদিকে নিয়ে। টিকিট কাটিয়ে এনে গাড়ী বলে দিচ্ছি।

আবার কোন দিন সেজগিন্নি মনে করিয়ে দিলে বা ভালো ছবি হলে ব্যস্তভাবে উঠে এসেছে সে। তেমনি হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, যাবে নাকি ছবি দেখতে। তেমনি টিকিট কেটে এনে গাড়ী বলে দিয়েছে।

একদিন নিজেই বললো লীলাকান্ত—কেবল একা গুম্ মেরে ঘরের ভেতর বসে থাকো। মার কাছে যেতে বললেও যেতে চাও না। হয়েছে কি?

চুপ মিত্রা।

বাড়ীর কারু সঙ্গে কথা বলোনা কেন?

তেমনি মিত্রা চুপ।

বই পড়ার ঝোঁক আছে শুনেছিলাম, কই তাও পড়ো কই। ভালো লাগে না এখানে? আচ্ছা, পড়াশুনাটা আরম্ভ করো না। আই. এ. টা যাতে দিতে পারো?

উৎসাহে খাট থেকে নেমে পড়েছিল মিত্রা— কলেজে ভর্তি করে দেবে? যেন আনন্দে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছিল তার। গায়ত্রীর মতো কলেজে যাবে সে!

কলেজে? এ বাড়ীর বউ বই হাতে কলেজে যাচ্ছে, অন্যের কথা বলবো কি, আমারই যে হাসি পাচ্ছে। সত্যি হেসে উঠেছিল লীলাকান্ত।

হাসতে জানে লীলাকান্ত। কথার আগে আসে। মাত্র ঐটুকু। নইলে বুঝি মিত্রার পক্ষে সহ্য করাও অসম্ভব ছিল তাকে। বললো— বাড়ীতে কে পড়াবে? তুমি?

আমি? কি বলো! সে বিদ্যে আছে নাকি আমার। ফুটো কলসীতে জল ভরার মতো পড়া আমাদের। পরীক্ষার হল ছাড়তে না ছাড়তে পাত্র ঠনঠন। তারপর একটা ভালো বুদ্ধি দেওয়ার মতো করে ছিলো —দেখো শমিতকে পটিয়ে নিতে পারো কি না। পারলে আই. এ. কেন চাই কি এম. এ. পাশ করিয়ে ছাড়বে তোমায়। আর তা না হলে বাড়ীতে মস্ত লাইব্রেরী রয়েছে তো— বলতে বলতে সরে পড়েছিল লীলাকান্ত।

চিন্তা করেছিল মিত্রা একবার শমিতের কথা। কিন্তু 'পটানো' ওটা কি শব্দ। শব্দটাই পছন্দ হলো না মিত্রার। তা ছাড়া তার কাছে সেধে যেতে সে কখনোই রাজী নয়।

তারপর একদিন সেই লাইব্রেরী ঘরে গিয়েই ঢুকেছিল মিত্রা।

মস্ত লাইব্রেরী। কাচের আলমারী ভর্তি চারদিকের দেয়াল ঠাসা বই আর বই। মধ্যিখানে মেহগিনি কাঠের কালো বার্ণিসের মস্ত গোল টেবিল। চারপাশে চেয়ার। ধূলো ধূলো—ধূলোময় সব। বই চেয়ার টেবিল ঘরের যেখানে যা কিছু আছে সব দেখতে লাগল সে।

কে? ঠিক ঘুমিয়ে নয়, চোখ বুজে ছিলেন সেজকর্তা। বই নাড়াচাড়ার শব্দে জিজ্ঞাসা করলেন— কে?

প্রথমটায় একটু চমকে উঠেছিল মিত্রা। ঘরে যে কেউ আছে, দেখেনি সে। তারপর এগিয়ে এলো— আমি জেঠামশাই। ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম ভেঙ্গে দিলাম আমি? বিব্রত কণ্ঠে বললো মিত্রা।

উঠে বসলেন শশীকান্ত। লাইব্রেরীটা কি ঘুমোনোর জায়গা মা? অনেকক্ষণ একটানা পড়লে চোখ বিশ্রাম চায়, স্মৃতি ভুল করে— বুড়ো হয়েছি যে। বোস মা বোস।

সসঙ্কোচে বসল মিত্রা চেয়ারে।

বলো দেখি কি পড়তে ভালোবাসো তুমি।

পড়তে ভালোবাসি সব কিছু তবে—

এই যে পড়ার গল্প জমলো মিত্রার আর শশীকান্তর—চাকর এসে দু তিনবার কক্ষে পা'ন্টেদিয়ে গেল। ঝি রেখে গেল ফলের রস। বেলা গড়িয়ে গেলে যখন তাড়া এলো স্নান খাওয়ার তখন শশীকান্ত উঠতে উঠতে বললেন—বড় লোকের বাড়ীতে একটা ভালো মূল্যবান্ লাইব্রেরী থাকা চাই—সেই প্রয়োজনেই একদিন এই ঘরের জন্ম। শমিতকে বাদ দিলে আজও প্রায় তাই চলছে। আমি বই ভালোবাসতাম। কিন্তু খেয়াল ছিল অনেক রকম—একটু হাসলেন তিনি। কিন্তু ইচ্ছেটা বোধহয় মনের ভেতর চাপা ছিল। নইলে এখন এতো পড়ছি কি করে। এদের নিয়েই তো রয়েছি। হাত দিয়ে বই এর তাকগুলো দেখালেন শশীকান্ত। বললেন, এখানে বসে অনেকদিন কিন্তু তোমার কথা আমি ভেবেছি। তোমার মামা বলেছিলেন, বই তোমার নেশা। ভেবেছি কই বইটই নিতে তো আসো না। আজ থেকে রোজ আসবে। সকাল সন্ধ্যা আমরা এখানে বসে পড়বো। আলোচনা করবো। তর্ক করবো মতভেদ হলে। বুড়োর সঙ্গে তো কেউ কথা বলতে চায় না—কথা বলতে ভালোবাসে না। ফাঁকি দিয়ে কথা বলিয়ে নেবো তোমায়। বলে উচ্চ হাস্য করে উঠলেন শশীকান্ত।

তারপর থেকে শশীকান্তর সঙ্গে পড়ার আসর, তর্কের আসর জমে উঠতে লাগল মিত্রার প্রতিদিন। শশীকান্তর কাছে এসে ভুলে যেতো মিত্রা যে সে এ বাড়ীর বধূ। মাথার ঘোমটা পড়ে গেলে তুলে দিতো না। গলা চড়ে গেলে চাপতে চেষ্টা করতো না। উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠতো। জোরের সঙ্গে তর্ক করতো। এঁটে উঠতে না পারলে মাথা দোলাতে দোলাতে বলতো, দাঁড়ান—বিষয়টা জানা নেই একেবারে। কিছু বই পড়েনি।

এ বাড়ীর বউদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাত্রও সচেতন ছিল না শমিত। তার লক্ষ্য প্রথমে টেনেছিল মিত্রাই। বউদের ভেতর এসে পড়লে অনেক সময়ই সে লক্ষ্য করতো তাকে। লক্ষ্য করত শমিত আঠারো উনিশ বছরের নববিবাহিত মেয়ের কপালের ওপর পড়ে থাকা তিক্ত তির্যক রেখাটাকে। আর ঐ কপালের রেখাটার সঙ্গে মিল রেখে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মিত্রাকে ।

সেদিন বই নিতে লাইব্রেরী ঘরে এসে ঢুকেছিল শমিত। শশীকান্ত আর মিত্রাকে মুখোমুখি বসে জমে তর্ক করতে দেখে বিস্মিত হলো। এ বাড়ীর পক্ষে যেন অভাবিত কিছু দেখলো। চুপচাপ গিয়ে পেছনে দাঁড়ালো সে মিত্রার।

শশীকান্ত দেখলেন। কিন্তু তার অন্যমনস্কতার ভেতর হারিয়ে গেল শমিতকে বসতে বলার কথা।—

উত্তেজিত মিত্রার মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি একাগ্র শশীকান্তর দিকে। একটু ঝুকলো মিত্রা। বললো, আপনি বলছেন বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের আবিষ্কার। এ কি একটা কথা হলো? নইলে বিবেকানন্দ অপ্রকাশিত থেকে যেতেন! বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ না হয়ে নরেন্দ্রনাথ থাকলে ভারত তার কাছে আরো বেশি পেতো কিনা— শক্তি থাকলে আমি তাই নিয়েই গবেষণা করতাম—

শশীকান্তর মুখে উঠলো হা হয়ে—

শমিতের দৃষ্টিতে আলো বেরুলো। চেয়ার টেনে বসে মিত্রার দিকে তাকিয়ে বললো—আমি যদি তোমার মতের সঙ্গে একমত না হতে পারি?

শমিতের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি চমকে দিয়েছিল মিত্রাকে। বিস্মিত করেছিল মিত্রাকে। থমকালো সে।

শমিতের সঙ্গে কখনো সহজ ভাবে মিশতে পারে নি মিত্রা। শমিতের মার্জিত ব্যবহার মিত্রার মনে হয় তার দম্ভেরই আর একটা রূপ। বাড়ীর ছোটবড় সবাই এমন একটা সম্মান সমীহ করে তাকে যে, দেখে সময় সময় মিত্রার ভুরু কুচকে উঠে। কিন্তু সে জানে আদায় করে নিতে না জানলে আর যাই দিক না; এ বস্তু কেউ কাউকে সেধে দেয় না। তবু বউরা যখন শমিতকে তার আসা যাওয়ার পথে ডেকে থামায় সে দাঁড়ায়। বউরা কথা বলে, কেমন যেন বাড়তি গায় পড়া ঠেকে মিত্রার। অপমান লাগে তার। সে দূরে দাঁড়িয়ে তার মুখ তোলে শক্ত করে। দম্ভ-প্রকাশ করে মিত্রা। দম্ভের দেয়াল খাড়া করে সে তার সামনে।

একটু সময় চুপ করে থেকে বললো— বেশ শুনি।

শমিত বললো—ধরো আমি যদি বলি—

বাধা দিল মিত্রা। বললো, 'আমি যদি তোমার সঙ্গে একমত না হতে পারি। ধরো আমি যদি বলি—' এসব যদি আর ধরো টরো নয়। যা বলার তা স্পষ্ট কথায় বলতে হবে। নিজের মত অস্পষ্ট রেখে এ-জাতীয় জিজ্ঞাসা করা মানে পরীক্ষা করতে বসা।

হা হা করে হেসে উঠলেন শশীকান্ত।

হাসলো শমিতও। বললো, আচ্ছা স্পষ্ট করেই বলছি—

সে তর্ক চলেছিল ওদের বহুদিন। মিত্রার ঘরের একটা কোণ ভরে উঠেছিল বিবেকানন্দর বইতে। সরকার মশাই চুপে চুপে স্বর্ণময়ীকে সংবাদটা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ছোট বৌমা যে রকম বিবেকানন্দের বই আনাচ্ছেন আমাকে দিয়ে—আপনি একটু লক্ষ্য করবেন। শেষে মিশনে টিশনে না—

শশীকান্ত আর মিত্রার এই নিভৃত সাহিত্য সভার প্রায় নিয়মিত সভ্য হয়ে উঠলো শমিতও। এক এক সময় শমিতকে বিস্মিত করে দেয় মিত্রা। তার অপঠিত বিষয়ে প্রথমে সে শমিতের বক্তব্য শোনে। তারপর পরমুহূর্তে তার কথা থেকে কথা নিয়ে সে বিষয়ের ওপর কথা বলে।

শশীকান্ত বলেন, মেয়েটাকে লেখাপড়া করালে কেমন হয়।

শমিত বলে, ভালো হয়। উচিতও। কিন্তু— হাসে সে।

দাড়িতে হাত বুলোতে থাকেন শশীকান্তও।

—শমিতের ঐ 'কিন্তু' টাই সত্য।

কোথায় পড়ে রইলো মিত্রার বৈদগ্ধ স্পৃহা। কোথায় পড়ে রইলো তার সাহিত্য সভা। না ঘটলো দাম্পত্য সম্পর্কের কোন মাধুর্যের সঙ্গে কোন পরিচয়। পরিচয় হলো ওর বিবাহিত জীবনের পরিণতি সীমাহীন চরম ব্যথার সঙ্গে। অসময়ে অসহ যন্ত্রণার ভেতর জন্ম দিলো একটি মৃত সন্তান। তারপর নিজেও রইলো অর্ধমৃত হয়ে বাপের বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী দু'দিককার যত্ন সেবায় শরীরটা মাত্র ফিরছিল, আবার সন্তান সম্ভবা হলো মিত্রা।

একা ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছিলো সে।

ঠোঁট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল ফোঁটায় ফোঁটায়।

মিত্রাকে দেখে হেসে ফেলেছিল গায়ত্রী। বি. এ. পড়া মেয়ে গায়ত্রী। হাসতো না। কোন অসুখে যদি স্বাস্থ্য হারিয়ে আসতো মিত্রা, তবে নিশ্চয়ই গায়ত্রী। হাসতো না। পেছনের কারণটার জন্যই হেসে ফেলল গায়ত্রী। বললো—একি চেহারা করেছিস মিত্রা। একেবারে কাশীর বেগুনের মতো পেট। আর কাঠি কাঠি হাত পা।

সিঁড়ি ভাঙ্গার শ্রমে হাপড়ের মতো হাঁপাচ্ছিল মিত্রা। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে তাকিয়ে রইলো গায়ত্রীর দিকে— কাউকে মরতে দেখলে হাসি পায়?

অপ্রতিভ গায়ত্রী হাসি মুছে ফেলল মুখ থেকে। বললে—যাঃ, কি যে বলিস। যদিও মিত্রার কথা শুনে বুকটা তার কেঁপে উঠেছিল। সে শুনেছে, মিত্রার সন্তান হবার কথা শুনে ডাক্তারবাবু বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, এবার বিপদ আছে। শুকনো কণ্ঠে বললো— এবার আমাদের এখানে দেখিস শরীর ঠিক হয়ে যাবে তোর।

কি করে?

যত্ন হবে। পিসিমা মা যত্ন করবেন।

ওখানেও আমার যত্নের ত্রুটি হয় না। আমার শ্বাশুড়ী আমাকে যত্ন করেন।

কথাটা সত্য। স্বর্ণময়ী তার তিন বধূর ভেতর মিত্রাকে স্নেহ করেন বেশি—বোধহয় ছোট ছেলে সব চাইতে প্রিয় বলে। মিত্রার প্রতি তার দৃষ্টির অন্ত নেই।

মিত্রা একটু সুস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো— এতো সেজেগুজে কোথায় চলেছিস? কলেজে?

না। কলেজে কি এতো সাজা যায়। আজ আমাদের কলেজের বাৎসরিক উৎসব। একটা আবৃত্তি করতে হবে আমাকে।

স্বাস্থ্যে তারুণ্যে তাজা গায়ত্রী। সাবান ঘষা চুলের এলো খোঁপায় বাঁধা হলদে রিবনটা ঘাড়ের কাছে দুলছে। উপরের ঘূর্ণায়মান পাখাটার দিকে চোখ রাখল মিত্রা।

মিত্রাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল লীলাকান্ত। সে এসে ঢুকলো ঘরে।

মিত্রা মুখ ফেরালো অন্যদিকে।

সুমিত্রা এসে এক বাটি দুধ ধরলেন মেয়ের মুখের কাছে— নে, গরম গরম খেয়ে নে একটানে। বাবা, কি চেহারা হয়েছে মেয়ের।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে গিয়ে ফেলে দিল মিত্রা দুধের বাটি। তারপর ও গ্রাহ্য করলে না মিত্রা দুধের বাটি উলটে পড়ে যাওয়া। বলতে লাগল—আসামাত্র একবাটি দুধ এনে ধরলেন; কেন? যেন দুধ না খাওয়ার জন্যই আমার এই অবস্থা। খাওয়া মাত্র ভালো হয়ে যাবো—

বাটি পড়ে যাওয়ার শব্দে ঘরে এসে ঢুকলো নতুন মামী সৌমী। অরুণের স্ত্রী। নেকড়া দিয়ে মেঝের দুধ মুছে, বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে বললো—থাক। মাত্র তো এসেছে। খাবেখন পরে।

সৌমীর পেছন পেছন নীরবে বেরিয়ে গেলেন সুমিত্রাও। মার কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে কান্নায় গলা বুজে এলো মিত্রার। তোমার জন্য তো তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করে নিচ্ছি মা—আর কি করতে পারি আমি—আর কি করতে পারি।

লীলাকান্ত ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে রইল অপ্রস্তুতের মতো।

গায়ত্রী সহজ করতে চাইলো আবহাওয়াটা। হেসে বললো— স্ত্রীটির মেজাজ একেবারে বিগড়ে এনেছেন। শান্ত করে তবে যেতে পাবেন। বাড়ী ফিরে এসে যেন খুশী দেখতে পাই। বলে বেরিয়ে গেল সে।

গায়ত্রীকে অনুসরণ করতে করতে যেন মিত্রার চোখের দৃষ্টি ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলো ঘর থেকে।

এগিয়ে এলো মিত্রার কাছে লীলাকান্ত।—হলো কি? হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেলে কেন গো? বলে, মাথায় হাত রাখতে যাচ্ছিল সে—

লীলাকান্তর হাত ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ওঠে দাঁড়ালো মিত্রা। অঞ্জলিবদ্ধ হাতে বললে—তুমি যদি নীচে মামাদের কাছে গিয়ে বোস একটু, তবেই আমি নিজেকে সুস্থ করবার চেষ্টা করতে পারি। দয়া করে যাবে? ওর বুকের ওঠা নামার শব্দ লীলাকান্ত যেন শুনতে পাচ্ছিল।

একেবারে ছেলে মানুষ—বলে কি যেন বলতে যাচ্ছিল লীলাকান্ত—

নিজের মাথাটা নিয়ে লীলাকান্তের সামনে বাড়িয়ে ধরলো মিত্রা—দাও, দাও এক হাঁড়ি চুণ ঢেলে দেও মাথায়, তবেই হয়ে যায়।

তবু লীলাকান্ত হেসে একবার পরিহাস করার চেষ্টা করলো, আশীর্বাদ করি সবার যে ভাবে কেশ পাকে তোমারও সে ভাবে পাকুক। পাকাচুলে সিঁদুর পরো তুমি—

কিন্তু মিত্রার মুখের চেহারা দেখে আর সাহস করলে না। আচ্ছা, আচ্ছা আমি যাচ্ছি, বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

মিত্রার ক্ষেপা চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় তার আজকের নয়। প্রায় নিত্য দিনের। কিন্তু কেন যে এমন হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তোলে মিত্রা, প্রায় সময়ই লীলাকান্ত তা বুঝে উঠতে পারে না। মিত্রার মত মেজাজ যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কারণে বিগড়োয়, ততটা সূক্ষ্মতার ধার লীলাকান্ত ধারেনা।

দিন মাস পূর্ণ হলে এবার নির্বিঘ্নে মিত্রার হলো একটি কন্যা। জাপানী চেহারায় ছোট্ট মেয়েটি এবার মিত্রাকে দিলো শুধু কষ্টই নয়, মা হবার আনন্দও। কিন্তু তারপরও বছরের ব্যবধানে এলো আর একটি।

শরীরে রক্ত মাংস দিয়ে গড়ে গড়ে এই বয়সে যে মেয়েকে নাড়ী ছিড়ে জন্ম দিতে হলো এতগুলো শিশুর, সে মেয়ের কাছে তখন দাম্পত্য রস গাঁজলে বিষ হয়ে উঠেছে। ভয়ে আতঙ্কে ঘৃণায় সিঁটিকে যে যন্ত্রণা থেকে বাঁচবার উপায় খুঁজে চোখে অন্ধকার দেখছিলো—

এই ছিল মিত্রার জীবন। এর কোথায় বা ছিল কথা, কোথায় বা ছিল কাহিনী। ভবিষ্যৎ জীবনে জন্ম দিত সে আরো কিছু সন্তান। সামনের চুল উঠে কপালটি দেখাত টাকপড়া—চকচকে চওড়া। সূতিকায় ভুগে ভুগে অবশিষ্ট থাকত হেজে যাওয়া চামড়া আর হাড়। দুবার চলা-ফেরার শ্রান্তিতে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন হয়ত ত্রিশ বছরের জীবনে ষাট বছরের বৃদ্ধার মতো শুকনো বুক থেকে মিত্রার বেরিয়ে যেত প্রাণ।

কিন্তু তা হলো না। মানুষের এই ক্ষুদ্র ললাটের তলা সমুদ্রের তলার মতোই অজানার রহস্যে আবৃত। মানুষের সব জানা, সব বোঝা, সব ভাবা মুহূর্তে তাই রূপান্তরিত হয়, অভাবিত অচিন্তনীয় ঘটনার—মিত্রার জীবনেও তাই হলো।

মাঝ রাতে জোড় কড়ানাড়ার শব্দে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালো বিমল। তার ঘরটাই রাস্তার দিকে। তাতে ডিস্পেপসিয়ার রোগী সে। এই মধ্য রাতেও সে ঘরময় পায়চারি করছিল পেটে হাত বুলোতে বুলোতে। জিজ্ঞাসা করলো — কে?

শ্যামবাজার থেকে এসেছি।

শ্যামবাজার থেকে? আরে কে, সরকার মশাই। দাড়ান দাড়ান দরজা খুলছি। ব্যস্তসমস্তভাবে চটির শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল বিমল।

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অরুণ। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো তার স্ত্রী সৌমী। এতোগুলো দরজা খোলার আর পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে বিছানার উপর উঠে বসলেন সুমিত্রা। অর্থাৎ জেগে উঠলো সমস্ত বাড়ী।

সুমিত্রা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন— কি হয়েছে?

সৌমী বললো— কি হয়েছে তো বুঝতে পারছিনে। মিত্রার বাড়ী থেকে লোক এসেছে।

এতো রাত্রে! উদ্বেগে কাতর হয়ে উঠলেন মা।

দিদির ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে গেল অরুণ—ভাবনার দিকে আছে। তোমার বেয়ান হয়তো বউমার নির্বিঘ্নে আর একটি পুত্র কিংবা কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার খবর পাঠিয়েছেন—স্কাউন্ড্রেল। গুলী করে মারা উচিত। নিজ মনে বলতে বলতে চলে গেল অরুণ।

এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

মিত্রার বিয়ের পর থেকে রাতে বেরাতে তো এ খবর নিয়েই লোক আসে।

তা কি হয়! তবে কি সুমিত্রা জানতেন না। মাকে লুকিয়ে থাকলেও মামীর কাছে বলতো না। সৌমীর দিকে চাইলেন মা— তুমি জানতে মিত্রার শরীর খারাপের কথা?

কই না।

কি খবর নিয়ে এলো তবে লোক ওখান থেকে। কেঁপে উঠলেন মা। নীচে এসে দেখলেন সরকার মশাই দাঁড়িয়ে চোখ মুচছে। দু'ভাই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমূঢ় ভাবে।

হাত দিয়ে দরজার পাট চেপে ধরে পতনোন্মুখ দেহ সামলালেন মা।

দৌড়ে এসে অরুণ দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো সুমিত্রাকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে উঠল—মিতু ভালো আছে দিদি। লীলাকান্ত হঠাৎ ব্লাড প্রেসারের স্ট্রোক হয়ে—বলতে বলতে দিদিকে হাত ধরে বসিয়ে দিল সে চেয়ারে।

মৃত্যু গুটি গুটি পায় এগিয়ে আসছিল। হৃদপিণ্ড চেপে ধরছিল, হঠাৎ মুঠো আলগা করে যেন সে ছেড়ে দিল সুমিত্রাকে।

যত মর্মান্তিক আঘাত আসুক, যত দুঃসহ মনে হোক, লীলাকান্তের মৃত্যু সংবাদ সামলাবেন সুমিত্রা' মিত্রা নেই মানে তো সুমিত্রার কাছে পৃথিবী নেই।

সেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলো অরুণ লীলাকান্তর নাম বলে।

সৌমী দৌড়ে উঠলো গিয়ে উপরে পড়িমড়ি করতে করতে। সমস্ত দিন খেটেখুটে ঘুমোয় নীলিমা। তার ঘুম সহজে ভাঙ্গতে চায় না। হাপাতে হাপাতে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তুললো সৌমী তাকে। ওঠ, শিগ্‌গির ওঠ। কি কাণ্ড হয়ে গেল—

আচমকা ঘুম ভেঙ্গে আলুথালু বেশে বিছানার উপর উঠে বসলেন নীলিমা মিত্রার বড় মাসীমা। প্রথমে শুনে হা করে তাকিয়ে রইলো সৌমীর মুখের দিকে তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

ও বাড়ী যেতে হবে দিদি! ওঠ ওঠ। সৌমী ছুটোছুটি করে রাস্তার দিক্‌কার দরজা জানালা বন্ধ করে। ঝিকে ডেকে তুলে ছেলেমেয়েদের ঘরে এনে শোয়ায়। আবার ছুটে এসে বলে—চলো চলো।

বয়স হয়েছে নীলিমার। মোটা হয়ে গেছেন বেশী। আজকাল আর জামা রাখতে পারেন না গায়। কোন মতে একটা জামা চাপাচ্ছিলেন শরীরে। কাঁদছিলেন আর বলছিলেন তুই তো সৌমী সেদিন মাত্র এসেছিস। গায়ত্রীর সঙ্গে বুকে করে মানুষ করেছি মিতুকে আমি—এই কচি মেয়ে!

খুলে গেল প্রতিবেশীদের জানালা। উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল মেয়ে পুরুষের মুখ। কি হলো বিমলবাবুর বাড়ীতে চোখে চোখে নীরব জিজ্ঞাসা।

মিত্রাদের বাড়ীর গাড়ীই দাঁড়িয়েছিল। ছিল সরকার মশাই। দুই বউ আর সুমিত্রাকে নিয়ে অরুণ বিমল রওনা হয়ে গেলো মিত্রাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

বাড়ী ফিরতে পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেল। স্নানান্তে বিছানায় পড়ে রইলেন সুমিত্রা চোখ বুজে। বোজা চোখের পাতা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল। ফোঁটায় ফোঁটায়, একের পর এক। এক জীবনে কত মরণ সঙ্গে করে এনেছেন তিনি। আর কত সহ্য করতে হবে। ভগবান আর দুঃখ দিও না—আর দুঃখ দিও না। ভগবানকে

ডাকছেন কেন তিনি— তার আর কি প্রয়োজন ভগবানের? কি প্রার্থনা আছে তাঁর কাছে তার। মিতুকে আমার সুখী করো? সদ্য বিধবার জন্য এ কামনা—লোকে হাসবে না। মিত্রা কাল কি শঙ্কিত চোখে তাকাচ্ছিল তার দিকে। মিত্রার ভয়টা কোথায়, সুমিত্রা তা জানেন। মার মানসিক রোগটাকে তার বড় ভয়। সুমিত্রা জানেন, তার মুখ চেয়ে মিত্রা বিয়েতে মত দিয়েছে। তার মুখ চেয়ে বহু সুখের অভিনয় মিত্রা করে গেছে। সব সময় সব বুঝে উঠতে না পারেন, অনেক সময় বুঝেছেন বৈকি। আবার যদি মার কিছু হয়— এই চিন্তাতে শঙ্কিত হয়ে বসেছিল মিত্রা কালও। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস টানলেন সুমিত্রা। অল্প শোকে কাতর বেশী শোকে পাথর—পাথর হয়ে গেছেন তিনি।

নিজের সমস্ত জীবন তো কাটলো কৃচ্ছসাধনায়—মিত্রারও এখন থেকে তাই কাটাতে হবে! হবিষ্যি ঘরে খাবে সাদা থান পরবে মিত্রা কাল থেকে— কপালের দুপাশের শিরা দুটো নীলবর্ণ হয়ে ফুলে ওঠে দপ দপ আরম্ভ করে।

সৌমী এলো মিছিরির সরবৎ হাতে।

এক নিঃশ্বাসে সরবৎটা খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন সুমিত্রা।

ভাইরা বলছিলো, যাক কিছুদিন। তারপর নিয়ে আসবো মিত্রাকে আমরা। থাকবে এখানে। অবশ্যি তখন কিছু বলেন নি তিনি। বলার সময় এখন নয়ও কিন্তু এ ব্যবস্থায় রাজী নন সুমিত্রা। আসবে যাবে। যখন যেখানে মন চায় থাকবে মিতু। কিন্তু বরাবরের বন্দোবস্ত নয়। নিজের জীবন কাটলো বাপ ভাইয়ের সংসারে। দোষে গুণে মানুষ। কিন্তু স্বীকার করতে হবে ভাই আর বউ দুটির দোষের চাইতে গুণ বেশী। তবু বুঝে-সুঝে চলতে হয় বৈকী। নিজের মান নিজের কাছে। এর চাইতে সত্য আর নেই। নইলে যতই ভালো হোক, সব সময় কি আর সব ব্যবহার ঠিক হয়। আগে মা ছিলেন, ছিলো সব কিছুর চেহারাই ভিন্ন। তার থাকাও ছিল মার কাছে থাকা। মার মৃত্যুর পর সে থাকা এখন হয়ে গেছে ভাই-এর সংসারে থাকা। কতদিন আরো বাঁচতে হবে কে জানে। হয়তো পড়তে হবে শেষে বিমল, অরুণের ছেলেদের সংসারে। থাকতে হবে তাদের কাছে। সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ছে আর হয়ে উঠছেন তিনি অপরের সংসারের বোঝা। না—এর ভেতর মিত্রাকে টেনে আনা কিছুতেই ভাল নয়। ছেলে আছে, মেয়ে আছে থাকা সে আপনার সংসারে তাদের নিয়ে। নিজের সংসারের মতো জোর বল মেয়ে মানুষের আর কোথায়।

দিদিমণি!

মণি—আয় আয়। দুহাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলেন সুমিত্রা মুন্নীকে। মিত্রার মেয়েকে। মনেই ছিলনা মিত্রার ছেলে মেয়েকে যে নিয়ে এসেছে মামারা। মুন্নীর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন সুমিত্রা— কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কি করছিলে? ভাইটি কোথায়?

কোন জিজ্ঞাসারই জবাব দিলো না মুন্নী। কেঁদে উঠল— মার কাছে যাবো।

মার কাছে তো যাবেই। মুন্নীকে কোলে টেনে উঠে বসলেন সুমিত্রা। আমরাও তো যাবো। সবাই মিলে বিকেলে যাবো— কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে মুন্নী। চুমু খেলেন মুন্নীর গালে। না, মিত্রার জন্য ভগবানের কাছে চাইবার আছে। কামনা করবার আছে। তিন বছরের মেয়ে মুন্নী আর দুই বছরের ছেলে কুমার—এরা বেঁচে থাক— সুস্থ থাক— মিতুর বুক জুড়ে থাক। মার জন্য সন্তানের মঙ্গল কামনার চাইতে বড় চাওয়া আর কি থাকতে পারে। মুন্নীর চুলের জটে আঙুল চালাতে লাগলেন চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

মুন্নী সুমিত্রার মুখের দিকে ফোলা ফোলা জাপানী চোখের দৃষ্টি মেলে বললো—আমরা কাঁদলে বলো ছিঃ কাঁদতে নেই। লোকে মন্দ বলবে। দুষ্টু বলবে। জুজুতে ধরবে—কত কি। বড়রা কাঁদলে কি বলে দিদিমণি?

মুন্নীর গালে গাল রেখে সুমিত্রা বললেন—কিছুই বলে না। শুধু ছোটরা তাদের কচি কচি গাল এমনি করে বড়দের গালে রাখে। আর তাতেই তারা শান্তি পায়, শান্ত হয়।

এই তো আমি তোমার গালে মুখ রেখেছি। তুমি আর কাঁদবে না বলো?

না, আর কাঁদবো না মনি।

রাতে ঘরে এসে একগ্লাস জল চেয়েছিল নীলকান্ত। বৈশাখের গরমে শরীরে রক্তশূন্যতার জ্বালাপোড়া নিয়ে ঠাণ্ডা মেঝের উপর গড়াচ্ছিল মিত্রা। উঠে জল নিয়ে এসে নীলাকান্তর হাতের কাছে ধরে চমকে উঠলো

তার চোখের দিকে তাকিয়ে। বুকের উপর ছুরি তুললে মানুষের চোখের দৃষ্টি যে রকম হয়—ঠিক সেই রকম দৃষ্টি তার চোখে।

কি হলো? উৎকণ্ঠিত মিত্রা জানতে চাইলে।

কিন্তু লীলাকান্ত না পারলে আর কথা বলতে না পারলে জল খেতে। চেয়ার থেকে পড়ে গেল সে, মিত্রা কিছু বুঝে উঠবার আগেই।

মিত্রার আর্ত ডাকে ছুটে এলেরন স্বর্ণময়ী। এলেন বাড়ীর সবাই। ছুটোছুটি করে গেল গাড়ী বেরিয়ে গোটা দুই। এলো ডাক্তার। কিন্তু তার বহু পূর্বে লীলাকান্তর হৃদপিণ্ড চিরতরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। যে রক্ত জীবের জীবনী তারই মাত্রাহীন চাপে স্তব্ধ করে দিয়েছে লীলাকান্তের হৃদস্পন্দনকে। চির বিদায়ের মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারলে না লীলাকান্ত যে সে চলেছে। তার আর জানা হলো না যে সে গেছে। কিন্তু যারা রইলো ঘটনার আকস্মিকতায় তারা গেল বিমূঢ় হয়ে।

ভূমিকম্পে ভেঙ্গে না পড়লেও অনেক সময় বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেমন বিস্তৃত চিড় ধরিয়ে দিয়ে যায়—লীলাকান্তের মৃত্যুও তেমনি করে যেন চিড় ধরিয়ে দিলো বাড়ীর মানুষগুলোর মনে। অক্টোপাসের মতো আটটা শুঁড়ওয়ালা দেহ নিয়ে মৃত্যু তো চারদিকেই কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। শুধু অতর্কিত আক্রমণে চেপে ধরবার অপেক্ষা মাত্র। যখন যার উপর এসে পড়বে, তার আটটা শুঁড় দিয়ে যাকে জাপটে ধরবে তাকেই চলে যেতে হবে লীলাকান্তের মতো তরতাজা স্বাস্থ্য নিয়েও এমনি আকস্মিক ভাবে।

বিস্ময় লাগে মিত্রার। সে জানে বাড়ীটাতে অনেক মানুষ। কিন্তু এতে লোকজনের আনাগোনা যেন বয়ে চলেছে প্রবাহের মতো। সাধ্য কি একটু একা থাকবে। চোখ বুজে থাকবে। ভাশুরদের সঙ্গে কথা বলার চল আছে কিন্তু নেই গল্প করার। দাঁড়িয়ে ঘুরে দেখে যান তারা। দেওররা সব এসে বসে। সেবা করতে শুশ্রূষা করতে চেষ্টা করে। শশীকান্ত ভালোবেসেছেন মিত্রাকে। দিনের ভেতর যে কতবার ঘুরে ঘুরে আসেন, মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন তার ঠিক নেই। শোকে আর বেদনায় বৃদ্ধের আঙ্গুল কাঁপে থরথর করে। আসছে যাচ্ছে বসছে সব তরফের বউ মেয়েরা। গিন্নীরা সব মনোমালিন্য ভুলে আছেন স্বর্ণময়ীকে নিয়ে। বড় জা জয়ন্তী আর মেজ জা রাণী তো মিত্রার কাছেই আছে রাত দিন। তারা রাতে ঘুমায়ও তাকে নিয়ে।

এক শমিতকে আসতে দেখা গেল না একবারও।

সে কি নেই এখানে?

আছে।

সে রাতে সবাইকে ঠেলে সরিয়ে শমিতই এসে লীলাকান্তর হাত প্রথম হাতে তুলে নিয়েছিল। নাড়ী দেখেছিল। তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে রেখে, ছুটে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার ডাকতে।

বড় গিন্নীর বড় মেয়ে বালবিধবা নীহারিকা। আজ প্রায় প্রৌঢ়া। কাছে এসে বসে। সান্ত্বনা দেয়। বলে—ছেলেমেয়ে আছে। সংসার ধর্ম করবে পোড়া অদৃষ্টে তো তাও ছিল না। কি ভাবে যে জীবনটা কাটিয়ে আসছি—অসমাপ্ত কথার ভেতর টেনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীহারিকা।

মাথা নাড়েন বুড়ো পিসশাশুড়ী। যা বলেছিস নীহার। শ্যাওলার মতো এঘাট থেকে ওঘাট, ওঘাট থেকে এঘাটে ভেসে ভেসে পরজীবী আর পরচ্ছন্দ হয়েই তো জীবনটা গেল। এ বয়সে স্বামী যাওয়া যে কী শাস্তি—চোখে আঁচল চাপা দেন পিসীমা।

কানে আসে স্বর্ণময়ীর বিলাপ—ঐ কচি বউ আমার—

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! যত কান্না সব ওকে নিয়ে। ওর কথা বলে। ওকে বুকে চেপে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওরই মাথায় হাত রেখে। ও তো মরেনি। কেন তবে ওকে নিয়ে এ হা-হুতাশ। মৃত্যু এসে যার জীবনে অকালে সমাপ্তি রেখা টেনে দিলো, আশা আকাঙ্ক্ষা, সাধ বাসনা পেছনে ফেলে অতৃপ্ত মানুষটা যে গেল— সেই মানুষটার কথা ভাবা, তার জন্য দুঃখ শোক করা যেন এ নয়। সব শোক যেন যে গেলো তার জন্য নয়। যে রইলো সে নারীর দুর্বিসহ বৈধব্য জীবনের বেদনায়!

পাতলা ফর্সা মুখের ওপর কাঠিন্যের ছাপ পড়ে মিত্রার। অমর শোকের আকাঙ্ক্ষায় নারীর ওপর শোকের বোঝা চাপাতে গিয়ে কি নিদারুণ ফাঁকির বোঝার তলায় চাপা পড়েছে পুরুষ নিজে! শেষ বিদায়ের চোখের

জলটুকুও নিয়ে যেতে পারে না সঙ্গে করে। জীবনকে মৃত আত্মার সঙ্গে এমন নিশ্ছিদ্র বাঁধনে বেঁধে জীবন্মৃত করে রেখে যাওয়ার ভেতর একটু ফাঁক থাকলেও, যে গেলো তার কথা ছাপিয়ে যে রইলো তার জন্য দুঃখটা এতো বড় হয়ে উঠতো কি?

কিন্তু এতো সব ভাববারই কি সময় এটা মিত্রার?

তা চোখ দেখলে, মন ভাবলে সে কি করতে পারে। পারে শুধু ভাণ করতে। পারিপার্শ্বিক মানানো ভাণ করতে।

কিন্তু তাই বলে কি ভাসা মন নিয়ে শুধু সে দেখলো আর ভাবলোই? কাঁদলো না?

কাঁদলো।

সত্যিকারের কান্নাই কাঁদলো। কাঁদলো নিজের কথা ভেবে নেয়। যে গেছে তার অসমাপ্ত জীবনের স্বল্পায়ুর বেদনায়। আর সত্যই কাঁদলো সে। তার সন্তানের পিতৃ বিয়োগ ব্যথায়।

আবার দিনে দিনে ব্যথা যে সরে যেতে লাগল তাও তেমনি সত্য।

মনের অবচেতনে ওর ছাড়া পাওয়ার, মুক্তির পাওয়ার স্বস্তি কি?

কে জানে।

দাম্পত্যজীবন মনে করতে বসলে, একটা দিনও কি সে মনে করতে পারে, যা আনন্দের, আবেশের, মোহের? যার স্মরণে শরীর মনে আনন্দের সাড়া জাগে? আছে কি এমন স্মৃতি, যার অনুভূতি ওকে করে রাখবে আবিষ্ট? ওর অপরাধ কি। আপন সম্ভোগটাই যে পুরুষের কাছে সব— সে পুরুষের নিবিড় সংস্পর্শ দিনের পর দিন যে নারীকে টেনে চলতে হয়, সেই জানে সে গ্লানি কি। সে অত্যাচার সহ্য করা কি অসহকে সহ্য করা। মনে হলে শরীর মন দুই-ই এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে মিত্রার। দিনের উদাসীন অনাসক্ত স্বামীর শয্যায় রাতে গা হেলাতেও মিত্রার মন ঝংকৃত হতো বিতৃষ্ণার বিষে। যেন অপরিচিত কারু শয্যায় অংশ গ্রহণ—সহ্য করা বলপ্রয়োগের অত্যাচার। উপায়হীন নারীর সর্ব অবয়বের পেশী কঠিন করে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকা। পড়ে থাকা ঠেলে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার দুর্দমনীয় ইচ্ছাকে হাতের শক্ত মুঠোয় বেঁধে। নারীর আনন্দ তৃপ্তিতে উদাসীন পুরুষ পরিতৃপ্ত হয়েছে যে ঘৃণার দানে, এমন ঘৃণার দান দীন দরিদ্রেও গ্রহণ করে না।

কিন্তু এই তো ঘটেছে।

দিনের সংগী নয়, রাতের প্রিয় নয় এমন লোকের অভাব শরীর মন অভাব বোধের সাড়া তুলে যদি কেঁদে মরতে না চায়— কি করতে পারে মিত্রা?

কেউ এলো?

কান খাড়া করলো মিত্রা। গাড়ী থামলো না একটা?

হ্যাঁ। গাড়ী থামলো।

কয়েক জোড়া পা সিঁড়ি ভাঙ্গলো।

স্বর্ণময়ীর ঘরে কান্নার শব্দ উঠল।

প্রথমটায় দিশেহারার মতো খাটের উপর ওঠে বসলো মিত্রা। কি করবে দরজাটা বন্ধ করে দেবে? এক্ষুণি তো আসবে সবাই এ-ঘরে। এসেই তো আরম্ভ করবে ওকে নিয়ে হা-হুতাশ। আর পারবে না মিত্রা সহ্য করতে। কার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে যেন। শুয়ে পড়ল মিত্রা গা মাথা চাদর মুড়ে। উঠবে না ও। কিছুতেই উঠবে না। মুখের চাদর সরাবে না।

মিত্রা—

শৈলনন্দিনীর ভাঙ্গা গলার শান্ত নিচু ডাক। যেন দেখছেন জেগে আছে কি না সে।

মিত্রা—

আচ্ছা দিদি!

তেতলার ঘর থেকে নেমে বারান্দা পার হচ্ছিল বোধহয় শমিত। থামল মিত্রার দরজার কাছে। বসলো— ওকে কেন ডাকছ?

শৈলনন্দিনী বোধহয় কেন ডাকছে তাই বলতে যাচ্ছিলেন—

শমিত বাধা দিয়ে বললো— কেউ এসেছেন বুঝেছি—

আরে কেউ কি! মিত্রার দুই মাসশাশুড়ী এসেছেন সোধপুর থেকে।

হোক দিদি। ওকে একা থাকতে দাও। কেউ এলেই তার কাছে ওর আসতে হবে। বসতে হবে— এটা কি ভদ্রতা রাখার সময় মিত্রার। একা থাকতে দাও ওকে।

ফিরে গেলেন শৈলনন্দিনী।

মনে মনে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালো মিত্রা শমিতকে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো—আহা, শমিত যদি এখন একটা গান গাইত। কিন্তু এমন একটা কথা শুনলেও ওর মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকবে সবাই। গান দুঃখের কত বড় সাথী—এ বোধ ওদের নেই। যদি শমিতের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠ এই নিস্তব্ধ শোকাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় গানের সুরে ছড়িয়ে দিত —

'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।'

তবে ও বালিশে মুখ চেপে অনেকক্ষণ কাঁদতো—স্বর্গীয় কান্না কাঁদতো। পবিত্র কান্না কাঁদতো। কেঁদে শান্ত সমাহিত হয়ে বসে থাকত চুপ করে।

গেলো বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। গেলো শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন। এলো পুজো। কাটল লীলাকান্তের মৃত্যুর পর এতোগুলো দিন মাস। এখন কথায় কথা এসে গেলে আলোচিত হয় লীলাকান্ত। কিন্তু তবু কমে এসেছে বাড়ীর শোকাচ্ছন্নতা। সন্ধ্যায় এখনও বাড়ীর মেয়ে বউরা এসে একবার জড়ো হয় মিত্রার ঘরে। কিছুক্ষণ বসে গল্প করে যায়।

বাড়ীর বাৎসরিক পুজো। কোন কারণেই তা বন্ধ রাখা চলে না। যতই সংক্ষেপে হোক চলছে তার আয়োজন। বাড়ীর সবাই আজ বেরিয়েছে শাড়ী কাপড়ের সওদা করতে। মেজ জা রাণী বসে আছে আজ শুধু মিত্রার কাছে। মিত্রার চুলের বোঝা বসে বসে বাঁধছে আর খুলছে সে। যেন খেলছে। রাণীকে মিত্রার ভালো লাগে। ভালবাসে সে তাকে। সমান বয়সী ওরা। কিন্তু রাণী ছেলে মানুষ রয়ে গেছে। কচি মনের নরম স্বভাবের মেয়ে রাণী।

মিত্রার কানের পিঠে মুখ লাগিয়ে রাণী আব্দারের গলায় বললো—আজ আমি শোব তোমার কাছে।

ভুরু কুচকে তুললো মিত্রা। বললো—আর কতদিন এসব চালাবে তোমরা। বলছি দরকার নেই।

আচ্ছা, আজ আমি শুয়েনি। কাল থেকে বন্ধ করে দিও তুমি— কেমন তো? আজ নয় লক্ষ্মীটি।

আর কিছু বললো না মিত্রা।

অনেক সময় নিয়ে, অনেকবার খুলে আর বেঁধে, বেঁধে আর খুলে অবশেষে রাণী চুল বাঁধা শেষ করলো মিত্রার। আর করেই হঠাৎ হাতের চিরুণী ফেলে পড়িমরি করে দৌড়ালো—বড়দিকে ওষুধ দিতে ভুলে গেছি। দুবারের অষুধ দেওয়া বাদ পড়ে গেছে গো। এমন ভুলো মন। এমন কথা শুনিয়ে দেবে না- -

বড়দি মানে জয়ন্তী ওদের বড় জা--সন্তান সম্ভবা। ভারী মাস। অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

মিত্রার শরীর বারকয়েক কাঁটা দিয়ে উঠলো ঘন ঘন। তারপর শান্ত হলো। আঃ। এ পাট আর ওর জন্য নয়।

চুল বাঁধা হয়ে গেছে। এখন গা ধুতে যাবে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করে না মিত্রার। দক্ষিণ-পশ্চিমের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চোখ পেতে বসে রইলো। সূর্য এইমাত্র অস্ত গেল। এইমাত্র টুপ করে ডুবে গেল পশ্চিম আকাশে সোনা ছড়িয়ে দিয়ে। শীতের সন্ধ্যা এমনি করেই হঠাৎ নেবে আসে। পাখীরা সূর্যের দিকে তাকিয়ে, বেলার দিকে তাকিয়ে ঠিক দিশে করে উঠতে পারে না। পথেই আঁধার নেবে আসে। পরস্পরকে কিচমিচ শব্দে ডাকাডাকি করতে করতে আর পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কুলের দিকে উড়তে থাকে তারা। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে উত্তর দিকে— সব পাখীদের একমুখে গতি কেন বুঝতে পারে না মিত্রা। সন্ধ্যা নামলো কি উত্তর পথে চললো তারা ঝাঁকে ঝাঁকে— কেন! ওদের সবার বাড়ী এক দিকে। বসে বসে পাখীদের নীড়ে ফেরা দেখতে লাগলো মিত্রা। আশ্বিনের নীল নির্মেঘ আকাশে বকের ঝাঁক— যেন ছবি। উঠে এসে জানালার শিকে মুখ চেপে দাঁড়ালো সে। বৈশাখ নিয়ে এসেছিল বৈশাখের মতোই দুর্যোগ। আষাঢ় শ্রাবণ ধারা বইয়ে গেল মানুষগুলোর চোখে শ্রাবণের ধারার মতো। আজ আশ্বিন দেখা দিয়েছে তার নির্মেঘ নীল আকাশ নিয়ে। শান্ত। সুন্দর। ঠাণ্ডা।

বিপদ ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে অতর্কিত আক্রমণে সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ভয় দেখিয়ে ধমকে উঠে বলে, থামো।

আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় মানুষ থেমে পড়ে স্তব্ধ হয়ে।

কিন্তু ক' দিন?

সামলে উঠবার সময়টুকু মাত্র। তারপর তাকেও এক ঝাকুনীতে ঝেড়ে ফেলে মানুষ ধমকে ওঠে বলে— পথ ছাড়ো। নষ্ট করবার মত সময় নেই। তোমার যা করবার তা তো করেছই।

নাঃ, সন্ধ্যা হয়ে গেলো। জানালা ছেড়ে ফিরলো মিত্রা। প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হলো সামনের মস্ত আয়নায়।

এ কে!

অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো মিত্রা নিজ অঙ্গের প্রতি স্তম্ভিত বিস্ময়ে। অসুস্থ রুগ্ন রক্তশূন্য দেহ ওর হবিষ্যান্ন আর দুধ ফলের রসে দিনে দিনে কখন পুষ্ট হয়ে ভরে উঠলো এমন স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে? এই কি কুড়িতে বুড়িয়ে যাওয়া ওর সেই শরীর? কোন মায়ামন্ত্রে দেহের এই বিস্ময়কর রূপান্তর? প্রতি অঙ্গের এমন দৃঢ় ভঙ্গিমা ময় দম্ভ?

আস্তে আস্তে সরে এলো আয়নার কাছ থেকে। মিহি সরু পাড়ের কাপড়টা নেটে নিলো হাতে। চললো স্নানের ঘরের দিকে।

বারান্দায় বসে পুজোর সলতে পাকাচ্ছিলেন স্বর্ণময়ী। পাশে ছোট বাটিতে জল আর স্তূপাকৃত নেকড়ার ফালি। দূর থেকে দেখেই থমকে পড়লো মিত্রা।

হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে নীরবে নিঃশব্দে কেঁদে চলেছেন স্বর্ণময়ী। মায়ের চোখের জল সময় শুকিয়ে তুলতে পারে নি। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যার নিরিবিলি, রাত্রি শেষের অস্পষ্ট ঊষার নিভৃতি— প্রতিদিনের প্রতিটি নির্জন অপণীয় অবসর অর্পিত হয়ে চলে ছেলের উদ্দেশ্যে চোখের জলের তর্পণে। শিউলি ফুলের পাপড়িতে ভোরের শিশিরের সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকে স্বর্ণময়ীর চোখের জল। এতো বড় মানুষটা শুকিয়ে গেছেন ছোট্ট এতটুকু হয়ে।

ফিরে এলো মিত্রা।

নিজের এই স্বাস্থ্যভরা শরীর নিয়ে ঐ নিবিড় শোকাচ্ছন্ন ছোট্ট মানুষটার সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া নয়তো যেন একটা শোককে মাড়িয়ে যাওয়া। সংকোচে পা উঠলো না মিত্রার।

শশীকান্ত আবার ডেকে নিতে চান মিত্রাকে সেই লাইব্রেরী ঘরে। ওদের আসর আগের মতো করে জমিয়ে তুলতে চান, পড়াশুনা, আলোচনা, তর্কে বিতর্কে।

কিন্তু মিত্রা পারে কৈ!

শান্ত ভাবে বসে কিছু করবে সে শান্তি স্থৈর্য বর্তমান মানসিক অবস্থা ওর নেই। নিজের সম্বন্ধে, নিজের চারদিক সম্বন্ধে শুধু কেবল অসন্তোষ আর অধৈর্য—অধৈর্য আর অসন্তোষ। পত্রিকা হাতে করে দুটো খবরের ওপর চোখ বুলিয়েই ওঠে তিক্ত হয়ে। কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলে, কি আছে ওর ভেতর যে পড়বো আর পড়ে শোনাবো বলুনতো জ্যেঠামশাই।

কখনো দু'একটা গল্প উপন্যাসের দু'এক পাতা উল্টে দেখে ঐ হাতের কাগজের মতোই নিদারুণ বিতৃষ্ণায় ফেলে দিতে দিতে বলে, যা সব লেখা! পড়া নয় তো সময় নষ্ট। তার চাইতে আপনি আপনার পুরোণো দিনের গল্প বলুন। অনেক ভালো সময় কাটবে জ্যেঠামশাই।

শশীকান্ত হাসেন। চোখের দৃষ্টি হয়ে আসছে ক্ষীণ হতে ক্ষীণ। স্মরণ শক্তি যাচ্ছে চলে। গল্পের সঙ্গতি ধরে রাখতে কষ্ট হয় মনে। ভালো লাগে তারও কথা বলতেই। ক্ষেপা মেয়েটা ক্ষেপে উঠে অধৈর্য প্রকাশ করে— করবেই তো। যে মন সুরে বাঁধা নেই, সে মনে সব কিছু বেসুরে বাজে। যে তার সুরে বাঁধা থাকে না সে তারে কি সুর ওঠে। স্নেহের হাসি হাসেন শশীকান্ত। উঠে বসে সস্নেহে হাত রাখেন মিত্রার পিঠে। বলেন—

> 'অতিরিক্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি যার
> তারি নিত্য অকারণ অসন্তোষ। বুদ্ধি,
> তার বিশ্বচরাচর বিঁধিতে ব্যাকুল।'

বুঝলে গো ছোট মা। কিন্তু,—

একটু থামলেন শশীকান্ত। তারপর বললেন, পুরোণো দিনের গল্প কি শুনবে বলো। সে তো অনেক জানো। বিড়ালের বিয়েতে ট্রেফিক কন্ট্রোল করা গড়ের বাদ্যি বাজানো মিছিল। পিসের ভাই এর শ্রাদ্ধে সোনার কলসী দান। হাজার টাকার নোট দিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো। নাচ গানের আসরে তোড়া বাধা নোট ছুঁড়ে দেওয়া বাঈজীর পায়—পুরোণো ইট কাঠ দালান বাড়ীর সঙ্গে নোনা ধরে উঠেছে ওসব পুরোণো কাহিনীতে। নতুন মানুষের নতুন গল্প শোন গিয়ে আমাদের প্রণবের কাছে। বস্তি আর ক্ষুধা, ক্ষুধা আর হাহাকার। টাটকা তাজা। একেবারে বর্তমানের মুহূর্ত দিয়ে তৈরী কাহিনী। যে ক্ষুধার্ত সে এখনও মুখে তুলবার মতো দুমুঠো অন্ন জোগাড় করে উঠতে পারেনি। যে নিরাশ্রয় সে পড়ে আছে এখনো গাছতলার শয্যায়। যে রুগ্ন সে এখনো ধুকছে পথে শুয়ে— পুরোণোর লেশ এতে নেই।

প্রণব এ বাড়ীর বড় কর্তার বড় নাতি। পাশ করে বেরিয়েছে। একটা গাড়ী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ভোর থেকে রাত। স্ট্রাইক করে। মিটিং করে। টেবিল চাপড়ে ক্ষুধা আর বস্তীর বক্তৃতা দিতে গিয়ে গলায় ঘি ভাতের গ্রাস ঠেকে বিষম খেয়ে কাশে। ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল খেয়ে সুস্থির হয়।

মিত্রা তাকিয়ে দেখে। শোনে। হাসে বিদ্রুপের ভাব পড়ে গালে।

আজও হাসলো। আপনি বুঝি বসে বসে শোনেন প্রণবের কথা?

উৎসাহের সঙ্গে শশীকান্ত বললেন, আরে কেবল কি বসে শুনি। জানো, একদিন প্রণবের সঙ্গে গিয়ে কত জায়গা ঘুরে এসেছি।

এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলো মিত্রা। তাই!

অপ্রস্তুত চোখে তাকিয়ে রইলেন শশীকান্ত মিত্রার দিকে। তিনি ভেবেছিলেন মিত্রা খুসী হবে শুনে।

মিত্রা বললো—এসব তো প্রতিদিনের সংবাদ। এই তো রয়েছে আপনা আর আপনার নাতির ফেলে যাওয়া ফল-দুধ-মিষ্টির ডিসের তলায় হাত-পা বাঁকানো রাস্তায় পড়ে থাকা উপোসী মানুষের ছবি। প্লেট দুটো তুলে কাগজটা বের করে টেবিলের উপর মেলে ধরলো মিত্রা। বললো—এই পর্যন্তই তো বেশ। আবার দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্য।

শশীকান্তর মুখ এতটুকু হয়ে উঠলো। করুণ কণ্ঠে বললেন— কেবল মনে হয়, দেখি··· দেখে যাই। পুরোনো যুগের মানুষ–– তোমাদের নতুন যুগটাকেও যাওয়ার আগে একটু দেখে যাই।

কথার ঝোঁকে শশীকান্তকে আঘাত দিয়ে লজ্জিত হয়ে ওঠে মিত্রা। শশীকান্তকে শ্রদ্ধা করে সে।

কিন্তু মিত্রার ভেতরটাই যেন ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে।

দিন যায়। মিত্রার মামারা এসে নিয়ে গেলেন তাকে বহুবার। কিন্তু মন ওর টিকতে চায় না সেখানেও।

বড়মানুষীর বেড়াজালে ভালোভাবেই আটকা পড়েছে সে। মামারা ধনী নয়। ওখানে গেলে বড়লোকি অভ্যাসগুলো কেবলই ত্যাক্ত করে ওকে! তেষ্টার জল চাই? কি বিস্বাদ কলসী গড়ানো জল! গ্লাসের গা ঘেমে ওঠা ঠাণ্ডা জল কোথায়? যার উপর ভাসমান থাকবে দু এক কুচি ছোট্ট বরফের টুকরো। জলের টানে ভেসে আসবে মুখে। হাতের গ্লাস মুখ থেকে নামিয়ে দাঁতে কেটে কুড়কুড় করে বরফ চিবোবে সে। ফল মিষ্টিগুলো হয়ে থাকবে জমা বরফ। ঘন দুধের বাটিতে চিনি ছড়িয়ে চামচে কেটে মুখে দিলে মনে হবে আইসক্রিম। যদিও আসবার সময় সঙ্গে একজন ঝি নিয়ে আসে। কিন্তু সে দেখা-শোনা করে ছেলেমেয়েদের। ওর পরিচর্য্যা করে কে। ডাকের মাথায় হাতের কাছে দাসী, দরজায় দাঁড়ানো গাড়ী—সর্বনেশে আয়াস জমিয়ে তুলতে চাচ্ছে শরীরের গাঁটে গাঁটে চর্বির দানা। এখনো পারেনি। সকাল সন্ধ্যায় ছাদে খুব এক চোট ঘুরপাক খেয়ে আসে। কিন্তু কাজ! ভালোলাগে না। অনভ্যাস হাঁপ ধরায়। মামীদের সাহায্য করতে গেলে তারা হেসে ওঠেন। সরিয়ে দেন। ওর সঙ্কোচ লাগে। তাই মামাবাড়ীতে গল্পে আনন্দে কেটে যাওয়া দিনগুলোতে অভ্যাস হাঁপ ধরিয়ে তোলে। আর শ্বশুর বাড়ী এলে দুদিনের মধ্যে সব আয়াস-বিলাস তুচ্ছ হয়ে মন ছটফট করে মামাবাড়ীর আনন্দ পরিবেশটির জন্য। না পারে মিত্রা এখানে— না পারে ওখানে কোনখানেই স্থির হতে। না পারে কিছুতে মনোনিবেশ করতে।

এমনি একটা বিক্ষিপ্ত অনিবিষ্ট মন নিয়ে মিত্রার সময় কাটে কখনো মামাদের কাছে। কখনো শ্বশুর ঘরে। মামাদের কাছে কাটে কেবল গল্প করে। শ্বশুর বাড়ী কাটে সন্তান পালনের টুকিটাকি দেখাশোনার কাজে। সংসারের করণীয় কর্ত্তব্যে— যেটুকু অন্তত দেখাদৃষ্টি না করলেই নয়। কখনো শুয়ে বই পড়ে। কখনো শশীকান্তর সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে গল্প করে কথা বলে।

কিন্তু এবার শশীকান্ত আর মিত্রার সাহিত্য সভায় শমিতকে এসে যোগ দিতে দেখা গেল না।

আসা যাওয়ার পথে বারান্দা অতিক্রম করতে গিয়ে যদি শশীকান্ত বা মিত্রার চোখে চোখ পড়ে যায় তবে হেসে এসে ঘরে ঢোকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু একটা কথা বলে। কি নিয়ে আলোচনা চলছে বা কি বই পড়া হচ্ছে— এই জাতীয়। কিন্তু বসে না শমিত।

যদি বই নিতে এসে কখনো ঘরে ঢোকে, তবে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনের মতো ওদের কথা শোনে। কথায় যোগ দেয় না। শশীকান্ত পীড়াপীড়ি করেন। বলেন, বোস ভায়া বোস। আমি আর আজকাল ছোটমার সঙ্গে একেবারেই পেড়ে উঠছিনে। অনেক পড়ে ফেলেছেন ছোট মা— এসো তুমি।

এমন ক্ষেত্রে শমিত হেসে চেয়ার টেনে বসে। সকৌতুকে বলে আচ্ছা, দেখা যাক পরীক্ষা নিয়ে—

বসে। কথা বলে। যুক্তির প্রতিযুক্তি দেয়। উত্তরের প্রত্যুত্তর। জমে ওঠে তর্ক। কিন্তু তবু— তবু সে যোগ দেওয়াকে কিছুতেই যোগ দেওয়া বলা চলে না আগের মতো। কোথায় যেন দূরত্ব থেকে যায় শমিতের ব্যবহারে। যেন বহুদূরে বসে কথা বলে সে।

আত্মসচেতন মিত্রার আত্মমর্যাদায় আঘাত করে।

ফের অসহজ হয়ে উঠলো সেও। কেউ এক হাত ব্যবধান আনতে চাইলে বিশ হাত দূরে সরে সে। যেখানে নিশ্চয় আগ্রহের পরিচয় নেই মিত্রাও সেখানে নেই।

বধূর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে গা শিরশির করে স্বর্ণময়ীর। দিনকে দিন ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে একি মরণ-রূপে ভরে উঠছে মিত্রা।

জলে দুচোখ ভরে ওঠে স্বর্ণময়ীর। লীলাকান্ত কত দিন বলেছে মা গো বউ যে তোমার সাদা পাট-কাঠির মতো হয়ে উঠেছে শুকিয়ে। একটু দেখো। দেখেছেন বৈকী তিনি। যত্ন করেছেন বৈকী তিনি। কিন্তু কিছুই তো তখন হয় নি।

আর আজ?

মিত্রার সেই ফ্যাকাশে শুকনো শরীরে এ কি তাজা রক্তের জোয়ার! যেন স্বচ্ছ লাল কাচের বাটিতে ভরাজলের মতো টলটল করছে মিত্রা।

বাড়ী ভর্তি আত্মীয় অনাত্মীয় পোষ্য—ভাশুর দেওর কুটুম্ব—বধূর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে গা শিরশির করে স্বর্ণময়ীর।

বউমা!

মিত্রা কোথায় যেন যাচ্ছিল। থামলো। রুক্ষ চুলের বোঝা অযত্ন খোঁপায় হাতে জড়াতে জড়াতে এসে স্বর্ণময়ীর কাছে দাঁড়িয়ে বললো, আমায় ডাকছেন?

হ্যাঁ, মিত্রাকে তিনি ডেকেছেন।

শুধু তার ঐ চলাটা থামানোর জন্যই বোধহয় স্বর্ণময়ী ডেকে উঠেছেন মিত্রাকে।

একটু সময় চুপ থেকে স্বর্ণময়ী বললেন, মাথায় তেল দেও না বৌমা তুমি?

না তো! আপনি মানা করেছেন যে দিতে।

বিস্মিত মিত্রার 'না তো' জবাবেই মনে পড়ে গিয়েছিল স্বর্ণময়ীর। তারই নিষেধ আছে। না তার নয়— এই পরিবারের নিষেধ। বাড়ীর নিয়মে স্বামীর মৃত্যুর পর আর মাথায় তেল দেওয়া চলে না। তবে সবাই কি আর এ নিয়ম আজকাল মেনে চলে। চলে না। তেল না দিলে কারু মাথা ঘোরে। কারু ঘুম হয় না বায়ু চড়ে যায়। একাদশীর দিন যদিও বা বাদ দিলেন তো ভোর রাতে উঠে মাথায় তেল জল ঠাসেন আর বলেন অষুধ, অষুধে দোষ হয় না।

স্বর্ণময়ী বললেন—আজকাল কেই বা আর নিয়ম পালছে। তোমার মাথা তেল না দিলে ঘোরে না?

কই না!

হলো না। স্বর্ণময়ী অষুধ হিসাবে চালাতে চাচ্ছিলেন। হলো না। তবু বললেন, কিছুদিন না দিলেই দেখবে ঘুরবে। তুমি বেশ ভালো করে মাথায় তেল দেবে। তেল দিয়ে আঁচড়ে আঁটসাট করে চুল বাঁধবে। এমন সুন্দর চুল।

যে ভাবেই ঘুরিয়ে বলুন না কেন, বুঝল মিত্রা সবই। হাসলো মনে মনে। মুখে বললো—আচ্ছা।

কিন্তু ঘরে এসে লজ্জায় মরে বসে রইলো মিত্রা।

কথার সব অর্থ সব সময় একসঙ্গে ধ'রে ওঠা যায় না। তাই প্রথমে কথাটা শুনে মনে মনে হেসেছিল সে।

এমন সুন্দর চুল তোমার বউমা! বেশ করে তেল দিয়ে আট করে বেঁধে রাখবে। চুলের প্রতি যত্ন নেবার মতো করে বললেও, স্বর্ণময়ীর কথার যে গূঢ় অর্থ সর্বপ্রথম ওর মনে ঝলক দিয়ে গিয়েছিলো, সে অর্থ আত্মপ্রসাদ ঘটিয়ে ছিলো ওর—রুক্ষ কেশভারে বড় বেশী সুন্দর দেখায় তোমাকে।

রূপের প্রশংসায় খুশী না হয় কে? এত সুন্দর দেখাবার দরকার নেই—দরকার নেই। স্বর্ণময়ীর মনের এই আশঙ্কার ইঙ্গিতটুকু ধরে উঠতে পেরেও মনে মনে তাই হেসেছিল সে। কিন্তু এই অঙ্গনটুকু পার হয়ে আসতে ভাশুর দেওরদের চোখে চোখ পড়ে পড়ে আরো কিছু অর্থ যেন যোগ হয়ে গেল সেই কথার সঙ্গে।

তোমার ঐ একমাথা তেলহীন চুলের এলো-মেলো খোঁপার ভেতর—তোমার রুক্ষ অলকগুচ্ছের গুড়ার ভেতর—মাদকতা আছে। আকর্ষণ আছে। ডাক আছে। তোমার মুখের উপর তাদের উড়তে দিও না। তাদের ডাকতে দিও না। পুরুষ বড় লোভী।

ছিঃ ছিঃ লজ্জা!

জানেন না স্বর্ণময়ী জানেন না— ওর এ জীবনের প্রতি অপরিসীম বিতৃষ্ণার খবর তিনি রাখেন না। জানেন না তিনি, পুরুষ সম্বন্ধে কোন আগ্রহই নেই মিত্রার। রুক্ষ চুল চঞ্চল বাতাসের সঙ্গে মিশে যদি চঞ্চলতা প্রকাশ করে কারু মনে প্রশ্রয়ের ইশারা জাগায়ও, ওর মুখের রেখার দিকে তাকিয়ে সব চঞ্চলতা থেমে যাবে তার।

পিসীমার মুখে কৃষ্ণের শত নাম শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো মিত্রা ঘর থেকে। গঙ্গাস্নান ও কালী দর্শন করে ফিরলেন তারা। এখন নিরামিষ রান্নাবাড়ীর দালানে বসবেন গিয়ে সব। এই বেলা এগারোটার সময় মুখে দেবেন একটু ফল মিষ্টি জল। পিত্তপড়া রোধ করবেন। খেতে তো সেই বেলা দুটো আড়াইটে। এ সময় বউদের যেতে হয়। ফল মিষ্টি জল দিতে হয়। যিনি না খেতে চান তাকে একটু সাধতে হয়। হয় মানে—করলে ভালো হয়। প্রশংসা মেলে। ওরা খুশী হন। নইলে নিন্দে হয়। ফেলানো সম্পর্ক নয়। আছেন তিন শাশুড়ী, আছেন পিসশাশুড়ী, আছেন বিধবা ননদ—তার উপর আত্মীয় কুটুম্ব। এতগুলো মুখের নিন্দে—স্বর্ণময়ী এটুকু বাঁচিয়ে না চললে দুঃখ পান। তারপর মিত্রা নিজেও এ ঘরেরই তো একজন।

বামুন ঠাকুরণকে এ ঘরেও বেশ বড় বড় ডেক-ডেকচি হাতা খুন্তি নিয়েই কাজ করতে করতে হিমসিম খেতে হয়।

এখানে আসতে দেখতে বেশ লাগে মিত্রার। পৃথিবীর আলো বাতাসের বাইরে যেন এটা একটা আলাদা জগৎ। এঁটোর শুদ্ধি গোবরে। মানুষের শুদ্ধি গঙ্গাজলে। এতে পাপ। ওতে পূণ্যি। ভগবান যেন একটা ধর্মের চার্ট লিখে ওদের হাতে দিয়ে গেছেন। বেগুনের গায় দা লাগিয়ে হাত বন্ধ করে চেচিয়ে উঠল কেউ, আজ দ্বাদশী নয় তো দিদি? বেগুন খাওয়া চলবে তো?

দ্বাদশী? সর্বনাশ! ফেলেছিলাম তরকারীতে বেগুন দিয়ে।

ও মেজ বউ দেখ কি করেছ! তরকারীতে তিন তরকারী দিয়ে রেখেছ। এক টুকরো পটল দিয়ে তিন তরকারীর দোষটা কাটিয়ে দিও।

ও জ্যাঠাইমা, এখন হয়েছে ম্লেচ্ছের কাণ্ড! কে বাজারে গিয়েছিল আজ? সরকার মশাই তো। তার কি ভীমরতিতে ধরেছে। কাল পৌষ সংক্রান্তি গেল না। আজ নিয়ে এসেছে এক গাদা মূলো। হিন্দুর ঘরে মূলো খায় মাঘ মাসে এ্যা। যা দিয়ে আয় গরুটাকে ধরে।

ঐ যা! ভালো করে না দেখেই গরমজলে চাল ছেড়ে দিলে বামুনদি। দূর থেকে লাল মুশুরীর ডালের মত কি যেন একটা দেখলাম। তবেই তো হয়েছে আজ খাওয়া। মুশুরীর ডাল খাওয়াও যা মাংস খাওয়াও তাই— এ ছাড়া আর কি। এমন অসাবধান হলে জাত জন্ম থাকবে কি করে বামুন দি।

এই জগতের এই চেহারা।

যদিও আধুনিক হালচাল এদের ওপর নানাভাবে এসে যে ছড়িয়ে না পড়ছে তা নয়। কিন্তু বিপদ হলো না মানার সঙ্গে মানাটাও এরা চালিয়ে যেতে চান সমান তালে।

দেখি পড়ো দেখি বৌমা চিঠিটা। কি লিখেছে দেখি ভাশুর ঠাকুর আমার। হুঃ! একটু তুচ্ছ শব্দ করলেন— আত্মীয়া মাসী।

জয়ন্তী চিঠি দেখে বললো, চিঠি লিখেছে আপনার ভাশুরপো।

ঐ এক কথাই হলো। বাপই লিখিয়েছে ছেলেকে দিয়ে। শুনলেই বুঝবো খবরটা কি। হঠাৎ কাকিমার এমন সৌভাগ্য হলো কেন যে ভাশুরপোর তাকে মনে পড়লো।

চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্তী বললো—অনেক কিছু লিখেছেন ওরা। তবে আসল যেটুকু সেটুকু হলো, আপনাকে ওরা সংবাদ দিয়ে সুখী করছেন সম্পত্তি বাড়ী ঘর নিয়ে বাবা কাকাদের ভেতর যে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়েছিল, তা তুলে নেওয়া হয়েছে। এবং ভাইরা নিজেরাই আপোষে সব মিটিয়ে নিয়েছেন। বাবা যে বাড়ীটাতে ছিলেন, সেটাতেই রয়েছেন। কাকারা স্বইচ্ছায় শ্রীরামপুরের বাড়ীদুটোতে চলে গেছেন। আপনাকে কালীঘাটে পূজো দেবার জন্য পাঁচ টাকা পাঠানো হলো। একবার গেলে খুবই আনন্দিত হবেন।

মাসী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, সব ঠকিয়ে নিলে গো।

পিসী একটা সন্দেশ গালে ফেলে ঢক ঢক করে জল খেতে খেতে বললেন, ঝাঁটামারো এমন ভাশুর দেওরের মুখে।

তবে সব ভাশুর দেওরদের মুখেই ঝাঁটা মারতে হয়। আমার বেলাও তো এই হলো। নইলে কি আর আমার এ-ভাবে স্বর্ণর গলগ্রহ হয়ে পড়ে থাকতে হয়।

সারা জীবন আতপ-সিদ্ধ খাও আর জপ-তপ-করো—শুধু ভাশুর দেওরদের কেন—ঝাঁটা মারো এমন ব্যবস্থার মুখেও।

কলা সেদ্ধ খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে কলা দেখিয়ে যাওয়া আর কি—

শুনছি আইন নাকি পালটাচ্ছে।

মাসী চোখ কপালে তুললেন, সেই জন্যই ভাই-ভাই মিল হয়ে মোকদ্দমা তুলে নিয়েছে গো! শয়তান—শয়তান।

হ্যাঁ মিত্রা জানে যদিও সুমিত্রা এ ভাবে 'শয়তান শয়তান' বলে ওঠেননি। কিন্তু যে ঘরে স্বামীর মুখে বহুবার তিনি শুনেছিলেন 'সব তোমার—' সেই ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়েই ভাশুর দেওরদের মুখে তাকে যখন শুনতে হয়েছিল, কিছুই নাকি তার নয়। শুধু এক থালা ভাত আর বাড়ীর ছাদের তলায় শোয়া বসা হাঁটা চলার অধিকারই কেবল তার এখন আইন সঙ্গত অধিকার, তখন কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি।

সুমিত্রা বলেনি। কিন্তু যদি সুমিত্রা না হয়ে মিত্রা হোত তবে নিশ্চয়ই বলে উঠতো, স্ত্রীর চাইতে রক্ষিতাকেও পুরুষ বেশী দিয়ে যায়।

ঢেউটা ওকে এনেও প্রায় আছড়ে ফেলেছিলো এদের ভেতর! একটু, একটুকুর জন্যে—একেবারে কানের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার মতো গুলীটা যেন চলে গেছে মিত্রার। ছেলে আছে ওর। সে তার অভিভাবক। কাকা জ্যেঠাদের সঙ্গে সম্পত্তিতে সমান অধিকার তার ছেলের। নইলে তাকেও আজ হোক, কাল হোক— দশ দিন বাদেই হোক আর বিশ দিন বাদেই হোক গিয়ে উঠতে হোত মার কাছে। থাকতে হতো মার সঙ্গে মামার আশ্রয়ে। তাদের অন্নে ভাগ বসিয়ে। তারপর একদিন মামাতো ভাইদের অন্নে। এই মাত্র যে মাসী ডুকরে কেঁদে উঠলেন তার মত। ঢেউটা ছিল পর্বত প্রমাণ। গুড়িয়ে ফেলতো ওকে!

এই একঘর মেয়ে সাদাথান পরে গালে মিশ্রির টুকরো ফেলে ঢকঢক করে জল খাচ্ছে কেন?

কেন এদের স্বামী, সন্তান বন্ধু নেই?

রান্না ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাছ ভাজার গন্ধে নাক কুচকালো মিত্রা। কি মিষ্টি ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধটা। কিন্তু একথা সে আজ আর মুখেও আনতে পারবে না। যে মাছ না হলে এক গ্রাস ভাতও খেতে পারতো না, কিছুদিন আগেও যার স্বাদে গন্ধে আনন্দ পেয়েছে সে আজ তার গন্ধ নাকে যাওয়াও তার পাপ। মনে আছে কোথায় যেন নতুন বছরের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল ওরা। ফিরে এসে স্বর্ণ-নন্দিনী, শৈলনন্দিনী যখন শুনতে পেলেন যে, নেমন্তন্ন বাড়িতে না ছিল মাছ, না ছিল মাংস ডিম—আঁৎকে উঠেছিলেন তারা। নেমন্তন বাড়ীর লোকগুলো কি কাণ্ডজ্ঞানহীন। বাড়ীতে কি এয়োস্ত্রী নেই। না খৃষ্টান ওরা। বছরের প্রথম দিন মাছ ছাড়া নিরামিষ খাইয়ে দিলে। দু জায়ের ঘরে নিরাশ হয়ে তৃতীয় ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলেন আধা সাতলানো কয়েক টুকরো ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা মাছ। ভরপেট খাওয়ার উপর ওদের তিন জাকে— সেই কাঁচা তেলের গন্ধ মাখা ঠাণ্ডামাছ দিতে হয়েছিল মুখে। এমনি ভাবে অভ্যাস করিয়ে, তারপর যে ঘরে মাছ-মাংস সে ঘরেও তোমার ঢোকা নিষেধ। কখনো না খেলে স্বামীর অকল্যাণ, কখনো খেলে তোমার পাপ— যেন খেলা—জীবনটা খেলা আর কি!

খাওয়া পরার যে অবাধ স্বাধীনতা পৃথিবী জোড়া মেয়ে পুরুষ ভোগ করছে, ওদের বেলায় কেন তা পাপ পূণ্যের চোখ রাঙানোর রক্তিম থাকবে। যা কোথাও নেই কেন থাকবে তা।

মিত্রা ভাবে, ধর্মসংস্কারকে এক করে যারা আঁকড়ে ধরে মেনে গেছেন—গেছেন। পাপ পূণ্যের চোখ রাঙ্গানোই যুগিয়ে গেছে তাদের শক্তি। ভবিষ্যতে ঝেড়ে ফেলা জীবন যারা পাবেন—তারা তো পেলেনই। আঁকড়ে ধরার সংস্কার নেই, ঝেড়ে ফেলার নেই সাহস—আজকের যুগসন্ধিক্ষণের সঙ্গে জোড়াতালির সন্ধি করে চলা জীবন ওদের। শ্রদ্ধার মান দিতে চলা নয়, শুধু মানিয়ে চলা। এর চাইতে করুণ আর কি হতে পারে।

সেদিন পিসীমা সেই কথারই ইঙ্গিত দিলেন। কি কথা যেন হচ্ছিল, মিত্রাকে দেখে একটু অবান্তর ভাবেই বলে উঠলেন পিসীমা— আর ক'দিন। করে গেলাম আমরাই। এর পর সবাই মাছ খাবে, মাংস খাবে, বিয়ে করবে, বাদ থাকবে না কিছু। সংযম বলে আর থাকবে না কিছু।

কথাগুলোর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত আঘাত করল সবার কানে।

স্বর্ণনন্দিনীর দু চোখ উঠল জল ভরে।

শৈলনন্দিনী তিক্ততা প্রকাশ করলেন ভ্রুকুতে।

অপমানের ঝলক মাথার রক্ত চড়িয়ে দিলো মিত্রার। নিজেদের বঞ্চিত বুভুক্ষিত জীবনগুলো নিয়ে কি নির্বোধ গর্ব! সামলাতে পারলে না নিজেকে সে। ও আর নতুন বউ নেই। কিশোরী নেই। কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা নেই। কিন্তু উত্তেজনা প্রকাশ করলো না। ঠাণ্ডাগলায় বললো—তা ঠিক। আমরাই করে গেলাম পিসীমা। এ অত্যাচার আর বেশীদিন চলবে না। কিন্তু আজকালকার মেয়ে বলে যাদের গাল দিলেন, তাদের সংযম কিন্তু আপনাদের চাইতে অনেক বেশী।

কেন— আমাদের অসংযম দেখলে কোথায় শুনি? বটি কাঁত করে চোখের তাড়া পাকালেন পিসীমা। কে বলতে পারবে—

মুখ কালো হয়ে গেল স্বর্ণময়ীর।

বাধা দিলেন শৈলনন্দিনী—ঠাকুর ঝি!

কিন্তু মিত্রা থামলে না। পিসীমাও না।

মিত্রা বললো ঠিক তেমনি শান্ত ভাবে বললো—আপনাদের অসংযম কোথাও দেখেছি বলে তো আমি বলিনি।

তবে? ঘাড় বাঁকালেন পিসী।

তবে হলো এই, আপনাদের সংযমের প্রয়োজনটা কি? অতদূর যাবার দরকারই তো হয় না। অন্ধ সংস্কারই তো শক্তি যোগায় আপনাদের। গরুর মাংস—

মিত্রা শব্দটা উচ্চারণ করতেই, 'মা গো' বলে নাকে কাপড় চাপা দিলো ঘরের অনেকে!

তবু মিত্রা থামলো না। বললো— এই যে নামটা শোনা মাত্র আপনারা 'মাগো' বলে নাকে কাপড় চাপা দিলেন, এটা সংযম নয়, সংস্কার। সংস্কার এমনি বস্তু যে, মুখে পুরে দিলেও বমি করে বার করে দেয়। সংযমের প্রয়োজন সংস্কার শূন্য মনে নিজেকে বঞ্চিত করে চলায়। আজকালকার মেয়েরা তাই করছে।

তাই করছে আজকালকার মেয়েরা!

তাই করছে। গলাটা থরথর করে কেঁপে গেল মিত্রার।

গরুর মাংস খেতে আজকাল তাদের সংস্কারে বাধে না—তবু তারা তা খাচ্ছে না বুঝি? গলায় যেন পিসিমার শান দেওয়া ছুরি।

না ওখানটায় তাদেরও বাধে। তাই সেখানে তাদেরও সংযমের দরকার হয় না। গরু গিরগিটি আরশোলা—ঝিনুক শামুক খাদ্য। বহু মানুষ খায়। কিন্তু আমরা কল্পনায়ও শিউরে উঠি। কিন্তু যা খেয়ে এই শরীর তৈরী তা ঠেলে রেখে যখন তারা সংস্কার শূন্য মন নিয়ে আপনাদের পথে চলে, তখন তাদের সংযমের দরকার হয়। যেটা তারা বর্তমানে করছে। এবং সেই সংযমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হচ্ছে।

সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে বলতে যাচ্ছিলেন পিসীমা, তুমি তাদের ভেতর একজন বুঝি। কিন্তু সাহস পেলেন না। কথাটা ঠোঁটে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিত্রাকে তিনি মনে মনে ভয় করেন। আর এক ঘর মানুষ কেমন চুপ করে আছে। কারো মুখে চোখে পর্যন্ত সমর্থন নেই তার প্রতি। আচ্ছা—

কমলা বামুনদিকে তুলে দিয়ে একমনে বসে দুধ জ্বাল দিচ্ছিল। প্রয়োজনে নয়। এই করছিল একটা কিছু। আর কান পেতে কথা শুনছিল। ওথলানো দুধে ফুঁ দিতে দিতে ভাপে ভেজা ঘর্মাক্ত মুখটা তুলে পিসীমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমাদের নিয়ে তোমরা যেমন কেবল কাঁইকুঁই করো, বিচার নেই আচার নেই সংযম নেই—গেলো গেলো সব গেলো। রইলো না আর কিছু বলে। জানো, তোমাদের শাশুড়ী দিদিশাশুড়ী, মা ঠাকুমারা আজ স্বর্গে বসে ঠিক তেমনি কাঁইমাই লাগিয়ে দিয়েছেন তোমাদের দেখে।

কেন, কি করিলা আমরা, শুনি।

শুনবে। আচ্ছা। ওথলানো দুধের কড়া নামিয়ে ঠক করে মেঝের উপর রাখল কমলা। তারপর উঠে টান হয়ে কোমড়ে দু হাত রেখে এক অপূর্ব ঝগড়াটে মেয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললো— শোন বলছি, একাদশীর দিন তারা নিরম্বু উপোস করতেন। কেউ এক গ্লাস মিছরির জল গলায় ঢালতেন। শুনেছি, দাদুর বাবা নাকি কেউ নিরম্বু উপোস করলে রক্ষে রাখবেন না বলে ভয় দেখিয়ে একাদশীর দিন ফল আর কলসী ভরা মিছরি জল রাখতেন ঘরে। এখন বামুনদি সেখানে রাঁধেন তরকারী বুটের ডাল, বেগুন ভাজা, লুচি। আসে দৈ ক্ষীর কত কি। তাঁরা পাল্কী সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে স্নান করতেন। তারপর সেই পাল্কীতেই এসে একেবারে অন্দরে ঢুকতেন। আর তোমরা এক ঘাট পুরুষের মাঝে স্নান করো প্রায় মেমসাহেবদের সাঁতারের পোষাকের মতো পোষাক পরে। এক টুকরো আঁচল বুকে আর একটু টুকরো আচল কোমড়ে রেখে।

হেসে উঠল রাণী জয়ন্তী অন্যান্য মেয়ে বৌরা।

শৈলনন্দিনী মুখ ফেরালেন অন্য দিকে।

স্বর্ণময়ী ধমক দিলেন মেয়েকে।

পিসীমার মুখ কালো।

কমলার কথা তখনও শেষ হয়নি। সে তার কথা শেষ করলো—সেখানে দাঁড়িয়ে কাপড় পালটাও। চটি পায় দিয়ে গিয়ে ট্রামে বাসে ওঠো। স্বর্গ থেকে দেখেন আর লজ্জায় তাঁরা শিউরে শিউরে উঠেন। বলেন, আধুনিকাদের জন্য সব গেলো।

নাটক শেষে ভিড় পাতলা হতে হতে হল খালি হয়ে যাবার মতো পাতলা হতে হতে খালি হয়ে গেল নিরামিষ ঘর। পিসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়লো সবাই।

বামুনদি একটা রান্না নামিয়ে আর একটা রান্না চাপালেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে, দু একটা মন রাখা কথা বলে পিসীমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন।

পিসীমা মুখ কালো করে মাখা ময়দার থাল হাতে নিয়ে বসলেন পায়েসের জন্য ময়দার চসি বানাতে।

মিত্রা সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরের দিকে মোড় ঘুরবার সময় রাণীর সঙ্গে ধাক্কা খেলো।

তাড়াতাড়ি হাতের দুধের বাটি সামলালো রাণী। বললো, দিচ্ছিলেতো ছেলের দুধ ফেলে। কি ভাবতে ভাবতে চলেছ।

হা অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা ভাবতে ভাবতে চলেছিল সে। অপ্রস্তুত মিত্রা হাত বাড়ালো— দাও, আমি তোমার ছেলেকে দুধ খাইয়ে আসছি।

বলো কি গো।

অর্থাৎ দুধের বাটি হাতে নিয়ে চার ঘর; দু বারান্দা পরে হয়ে কারো ছেলে মেয়েকে দুধ খাইয়ে আসা, কোনদিনও এ কাজ মিত্রা করেনি।

তা করেনি। কারু সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে এ বাড়ীতে সে ওঠেনি। কিন্তু রাণী তার ভেতর নয়। শশীকান্ত ব্যতিত এক রাণীর সঙ্গেই তার সম্পর্কটা গভীর প্রীতির। রাণীকে ভালোবাসে মিত্রা। কিন্তু তবু তার ছেলেকে বসে দুধ খাইয়ে, স্নান করিয়ে, কাজল পরিয়ে আসার কথা মনে আসেনি কোনদিন মিত্রার। মিত্রা হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, দাও না।

রাণীও হেসে বাধা দিল—আরে! তুমি দুধের বাটি মুখে ধরলে সে বেচারা তো ভ্যাঁ করে দেবে।

দেখতে পাওনা তোমাকে দেখলেই ভয়ে মুখ গোঁজে কোলে।

চলো আজ ভাব করে আসি।

জয়ন্তীর মুখ উঁকি দিল ঘরের ভেতর থেকে, কার এতো সৌভাগ্য হলো মিত্রা, তুমি সেধে ভাব করতে যাচ্ছ।

জবাবটা দিলো রাণী। বললো, আমার ছেলের সঙ্গে ভাই। ঠাকুর মশাই ছেলের ঠিকুজি দেখে বলেছিলেন, ছেলে নাকি আমার কল্পনাতীত সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। তখন কে বিশ্বাস করেছিলো ভাই সে কথা। বলে মিত্রার দিকে তাকিয়ে মুখ-চোখ টিপে একটু দুষ্টু হাসি হাসলো রাণী।

জয়ন্তী বললো—রাণী কিন্তু আজকাল খুব কথা শিখেছে।

ঐ মিত্রা—দিনরাত বসে বসে মিত্রা কেবল আমায় কথা শেখায়।

রাণীর কথায় এবার হেসে ফেললো মিত্রা।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ তুলে তার তেতলার ঘর থেকে নেবে এলো শমিত। ওদের তিনজনকে দেখেও পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল সে, জয়ন্তী ডাকলো।

যে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল তাকে ডাকাতে মিত্রার দুই ভুরুর ফাঁকে তার সেই বাঁকা রেখাটা দেখা দিল। খুব স্পষ্ট করে নয়—অস্পষ্ট ছায়ায়। এই ডাকের ভেতর যে সে নেই, শুধু সেই ভাগের রেখা যেন টেনে রাখলো সে ভুরুতে।

শমিতের দিকে তাকিয়ে তার পোষাক লক্ষ্য করে জয়ন্তী বললো— যে সেজেগুজে চলেছো, মনে হচ্ছে বিশেষ আমন্ত্রণে যাচ্ছ।

বিশেষ আমন্ত্রণ। হাসলো শমিত। বললো—না, আমন্ত্রন টামন্ত্রণ নয়। নেমন্তন্নে যাচ্ছি।

ওমা! আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণে তফাৎ আছে না কি।

রাণীর বিস্ময়ে শমিত বললো— নেই?

কক্‌খনো নেই। আছে মিত্রা। আমন্ত্রণ নেমন্ত্রণ আলাদা মানে।

রাণীর মিত্রার উপর আস্থা দেখে হেসে ফেলল শমিত।

জয়ন্তী বললো— কে তোমায় এতো নিত্যদিন নেমন্তন খাওয়ায় আর কোন গুণে খাওয়ায় শুনি।

গুণীর আদর ঘরের লোক না করলেও সমঝদারের অভাব হয় না। হলে কি আর গুণী বাঁচতো।

চোখে বঙ্কিম টান দিল জয়ন্তী—আহা, বাড়ীর লোকদের কত গ্রাহ্য করো তুমি। বড় শোনাও তুমি তাদের গান। কোনদিন তোমাকে গান গাওয়ানো যায়। নিজের খেয়ালে হলে গাও। আজকাল তাও ছেড়ে দিয়েছ। বাড়ীর লোকদের ভারী দোষ।

আজ রাতে গেয়ো না। আমরা ঘরে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে শুনবো— ছেলে মানুষের মতো অনুরোধ করলো রাণী। সত্যি অনেক দিন তোমার গান শুনিনে।

লীলাকান্তর মৃত্যুর পর শমিত এ বাড়ীতে এ পর্যন্ত কোনদিন আসেনি।

রাণীর অনুরোধটা কি মিত্রার চোখেও চকচক করে উঠল।

আচ্ছা। বলে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল শমিত।

রাত তখন কত হবে কে জানে!

ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লো গান।

ছড়িয়ে পড়লো শমিতের উদাত্ত কণ্ঠ—

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু
বিরহ দহন লাগে—

শুনে বিশ্বপ্রকৃতিও যেন তার শাখার পত্র আন্দোলন বন্ধ করে দিলো। স্তব্ধ হয়ে কান পাতলো আকাশ।

বই পড়ছিল মিত্রা হেলানো চেয়ারে বসে। টেবিল বাতি জ্বালিয়ে। খোলা বই বুকের উপর নামিয়ে রেখে, বাতি নিভিয়ে চোখ বুজলো সে।

তবুও প্রাণ নিত্য ধারা
বহিছে সূর্য চন্দ্র তারা
বসন্ত নিকুঞ্জে গাহে বিচিত্র রাগে—

ধারায় ধারায় অশ্রু গাল ঠোঁট চিবুক গলা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল মিত্রার বুকে। যে কান্না কাঁদবার জন্য ভেতরটা ওর কেঁদে মরছিলো, বসে বসে সেই কান্না-কাঁদতে লাগলো মিত্রা। প্রশান্ত কান্না। বুক ভেঙ্গে চুরে উঠে আসা কিছু হারানোর বিভ্রান্ত কান্না নয়।

গানে গানে ঘুমিয়ে পড়লো মিত্রা।

ভোর রাতে মুন্নী রোজই উঠে এসে মার গলা জড়িয়ে ধরে আর এক ঘুম দিয়ে নেয়। আজও ডালিমঝির কোল থেকে বিছানায় ঝাপিয়ে পড়ে মা'র গলা জড়িয়ে ধরলো। মেয়েকে বুকে টেনে নিল মিত্রা।

চা তৈরী করে এনে দিলো ডালিমঝি। আধশোয়া ভাবে হাতের তালুতে মাথা রেখে চায়ের চুমুক দিতে দিতে মেয়ের মাথার রেশম চুলে হাত বুলিয়ে চলল মিত্রা।

এমন প্রসন্ন প্রশান্ত ঘুম ভাঙ্গা তার সচরাচর ঘটে না।

কি এমন অনির্বচনীয়কে পেয়েছিল মিত্রা কাল রাতে।

গান—গান। গানে ডুবে ঘুমিয়েছিল মিত্রা। শমিতের গান কাল ওকে কাঁদিয়েছে। দূরে, বহুদূরে নিয়ে চলে গেছে। আবিস্ট করেছে। প্রেমিকা করে তুলেছে। গানের কথার প্রতিধ্বনি তরঙ্গ তুলেছে ওর বুকে। যখন শমিত গেয়েছে, আঁধার রাতের প্রহরগুলি কোন সুরে আজ ভরিয়ে তুলি'—তখন শুধু ওর বুক নয়, সুরের তরঙ্গে স্পন্দিত হয়েছে ওর ঘরটা।

আর এক কাপ চা দেব মা?

দে।

ডালিম মিত্রাকে ফের চা এনে দিলো। নিজে মেজের উপর বসে কলাই-করা পেয়ালায় শব্দ করে করে চা খেতে লাগল। পাখীদের কিচির মিচির শোনা যেতে লাগলো গাছে। নীহারিকা শীতে হি হি শব্দ করতে করতে আর কাঁপতে কাঁপতে সাজি হাতে ওদের শিয়রের বারান্দা পার হয়ে গেল বাগানে ফুল তুলতে। দেয়ালে টানানো লীলাকান্তর ছবিটা ভোরের আলোয় উঠতে লাগল স্পষ্ট হয়ে। হাসছে লীলাকান্ত।

লীলাকান্তর এই হাসিটা মিত্রার বড্ড চেনা। হাসতে জানতো লীলাকান্ত। কথার আগে হাসতো সে। আজ তার ব্যবহারই নয়, সেও মুছে গেছে ওর জীবন হতে। কিন্তু আশ্চর্য তাজা হয়ে আছে মিত্রার চোখে কারণে অকারণে লীলাকান্তর শান্ত হাসিটা।

দু'চোখ জলে ভরে উঠল মিত্রার। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল এসে পড়লো মা'র বুকে মুখ গুজে ঘুমিয়ে থাকা মুন্নীর নরম গালের উপর। মুন্নী স্বপ্ন দেখলো, কোথাও ব্যথা পেয়ে সে যেন খুব কাঁদছে।

শীতের অপরাহ্নে মিঠে রোদে পিঠ পেতে বসে দক্ষিণের বারান্দায় কাঁথা সেলাই করছিলেন দু'মা। শৈলনন্দিনী আর স্বর্ণময়ী। মস্ত কাঁথায় ঘন সহস্র সেলাই-এর এক একটি ফুল-লতা-পাখী আঁকছেন। সেলাই ছাড়া তিল পরিমাণ জায়গা থাকছে না। দেখে বিস্ময় লাগে কি অসীম ধৈর্য্য কি অদ্ভুত কর্মক্ষমতা এই বৃদ্ধ বয়সেও। ঘরে ঘরে মেয়ে বউরা যখন শুয়ে ঘুমিয়ে গড়িয়ে সময় কাটাচ্ছে, এরা তখন বসে বসে কাঁথা সেলাই করছেন। চাল ডাল ঝাড়ছেন; নয় তো তেঁতুল কাটছেন।

পিসীমা কোন চিকণ কাজে নেই। বঁটি পেতে বসে তিনি ছাড়াচ্ছিলেন তেঁতুল বীচি।

গুজরাটি এমব্রোয়ডারি করছিল দেয়ালে পিঠ পেতে, পা ছড়িয়ে বসে কমলা। একজন কেউ কাছে না থাকলে বার বার সূঁচে সূতো পরিয়ে দেয় কে। মা জ্যেঠাইমার এই কাজটা কমলা এখানে থাকলে করে দেয় সেই। স্বর্ণময়ীর তিন ছেলের পর দুটি সন্তান মরে গিয়ে এই মেয়ে কমলা। স্বর্ণময়ীর চোখের মণি। ঘুরে ফিরে বেশীর ভাগ সময় কাটে কমলার মার কাছে। বড়লোকের মেয়ে— ভেট তত্ত্ব তালাশে খুশী থাকেন শাশুড়ী। অর্থাৎ স্বর্ণময়ী তুষ্ট রাখেন বেয়ানকে সওগাত আর উপঢৌকন দিয়ে। শ্বাশুড়ী চালাক মানুষ। বোঝেন বউ তো তার আছেই—এগুলো বাড়তি। আর বউ হলো ছেলের। এগুলো, ভাড়ার দেরাজ পূর্ণ করছে তার।

স্বর্ণময়ী মেয়ের দিকে সূঁচ সূতো বাড়িয়ে ধরে বললেন— দে দেখি সূতোটা ভরে দে।

হাতের সেলাই মাটিতে রাখতে রাখতে কমলা বললো—এদিকে চোখে দেখতে পাওনা, কিন্তু হাত চলে যেন কলে। এই পরিয়ে দিচ্ছি সূতো, এই নেই। তোমাদের দু জনের জন্য যদি আমার কাজ একটুও এগোতে পারি।

পিসীমা বললেন—ঠিকই তো। কমলা ভালো কথাই বলেছে। আমি তো দেখছি। কবে নিয়েছে কাজটা করেই উঠতে পারছে না। তিন তিনটি বউ তোমার ঘরে। কেউ এসে বসে না। ওদের কাউকে থাকতে বললেই তো পারো। ও বেচারি কাজ করে। আর ওকেই কেবল বিরক্ত করো।

কারু বুঝতেই কষ্ট হলো না! পিসীমার কমলার প্রতি সহানুভূতিটা নিতান্ত মৌখিক। উদ্দেশ্য পরোক্ষে বউদের নেওয়া—ঠিক বউদেরও নয়। মিত্রাকে। অন্যান্য বউদের ঝঞ্ঝাট আছে। বাচ্চা কোলে। রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু মিত্রার কি।

স্বর্ণময়ী মেয়ের হাত থেকে সূঁচটা নিয়ে সুতোর শেষ প্রান্তে গিঁট দিতে দিতে বললেন, কমলা রয়েছে। নইলে তো রাণী এসে বসে।

ঐ তো এক রাণীই এসে বসে।

জয়ন্তীর কোলের বাচ্চা ছোট।

মিত্রা—-শুয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কি কাজ তার। সোমত্ত মেয়ের শরীর মন ভালোও থাকে না তাতে। কথার সঙ্গে সঙ্গে কাটা তেঁতুলের তাল নিয়ে হাঁড়ীতে ঠাসান পিসীমা।

স্বর্ণময়ীর মুখ করুণ হয়ে ওঠে।

আর কমলা সূঁচটা ঠোঁটে চেপে। এমব্রয়ডরির ছবির লতাটা পেন্সিলে টেনে আর একটু স্পষ্ট করে নিতে নিতে বলে—তা যা বলেছ পিসীমা!

ঠিক বলেছি না কমলা!

ঠিক বলছ! কেবল শুয়ে বসে দিন কাটানো কোন কাজের কথা নয়। আর দুপুরে বসে বসে শাশুড়ী, জেঠী শাশুড়ীর সূঁচে সূতো ভরে দিলেই বা স্বাস্থ্য মনের এমন কি উন্নতি ঘটবে। বলে পিসীমার দিকে চোখ পিটপিট করে একবার তাকিয়ে জ্যেঠাইমার দিকে চোখ ফেরালো কমলা আচ্ছা, জ্যেঠাইমা। ছোট বউদিকে তোমার মামাতো বোন জয়ার মতো পড়ালে কেমন হয়।

জ্যেঠাইমা শৈলনন্দিনী খুশী মনে বললেন—খুব ভালো হয়। আমারও মনে হয়েছিল এই কথাটা জয়াকে দেখে। পাশ দিয়ে জয়া যখন এসে প্রণাম করলো, তখন মনে হলো, মিত্রাও বসে না থেকে পড়ুক। কোন অসুবিধা নেই। জয়া কি পারতো শমিতের সাহায্য ছাড়া কিছু করতে। মিত্রাকেও শমিতই দেবে তৈরী করে। আই, এ., বি. এ এই তো চোখের উপর পাশ দিয়ে ফেললে জয়া। এবার এম, এ, ক্লাশে ভর্তি হয়েছে।

বাঃ, কি চমৎকার! বলে মার দিকে চোখ পাকালো কমলা— রাখলে মুখ্যু করে। শাশুড়ীকে এটা পাঠিয়ে, ওটা পাঠিয়ে,— ঘুষ দিয়ে মেয়েকে কাছে রাখছেন এখন। কেন পড়ালে কি হতো। ঘরের মেয়ে, ঘরের খেয়ে পড়ে লেখাপড়া শিখতাম। আই. এ. বি. ও—এম. এ. পাশ দিতাম।

খুশী হয়ে উঠলেন স্বর্ণময়ী মিত্রার পড়ার কথায়। একান্ত নিবিষ্ট মনে করবার মতো কিছু মিত্রার সামনে ধরে দিতে পারলে তিনিও শান্ত বোধ করেন।

কিন্তু হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল পিসীর বললেন— তবে কি তোমরা বউকে কলেজে পাঠাবেই স্থির করলে না কি?

কলেজে কোথায়? বাড়ীতে পড়তে। ওতো বাড়ীতেই পড়েছে। বললেন শৈলনন্দিনী।

তবে যে বললে এম. এ. ভর্তি হয়ে এলো।

এম. এর ক্লাসে ভর্তি হয়েছে কলেজে। কিন্তু আগে বাড়ীতে পড়েছে। মিত্রাও এখন তাই পড়ুক।

তারপর কলেজে যাবে?

বিরক্ত হলেন শৈলনন্দিনী।—তার পরের কথা পরে। সে তো আজই ঠিক করার কিছু নয়।

একবার পাশটাশ করে বেরুতে পারলে, এ বউ আর তোমাদের হাতে থাকবে, না তোমাদের কথা শুনবে?

ত্যক্ত শব্দ করলেন শৈলনন্দিনী।

স্বর্ণময়ী কাঁথা সেলাই করে চললেন মুখ নিচু করে।

কমলা সেলাই করার ভঙ্গিতে চোখ নিচু দিকে রেখে আড়-নয়নে দেখতে লাগল পিসীমার মুখটা।

পিসীমা বটি কাত করে, হাঁড়ি তুলে উঠে দাঁড়ালেন—আমরা নয় কেউ নই। কিন্তু শশীকান্ত যখন বেঁচে রয়েছে তখন তার মতামতটাও তো একবার জানতে হবে।

শৈলনন্দিনী স্বামীর ইচ্ছা ভালো করেই জানেন। বললেন— ওর হবে অমত! নিজেই তো এতদিন লাইব্রেরী ঘরে মিত্রাকে কেবল ডেকে নিয়েছেন। এখন বাতে বিছানায় পড়ে তাই পারেন না।

কমলা বললো— তুমি নিশ্চিন্ত থাকো পিসীমা। সব প্রথম জ্যেঠামশাই-ই এ কথা বলেছেন।

তোকে বলেছে শশীকান্ত—

বলছেন।

পিত্তি জ্বলে উঠলো পিসীমার—এতো লোক থাকতে তোকে ডেকে বলতে গেলো শশী মিত্রার পড়ার কথা?

ডেকে বলেন নি। কাছেই ছিলাম। বললেন, বাতে একেবারে পঙ্গু করে ফেললো। নইলে ছোট মাকে পড়িয়ে পরীক্ষাটা দেওয়ালে হতো। কি হবে বসে থেকে— ও কি পিসীমা। হনহন করে চললে কোথায়। বড় জ্যেঠাইমা, মেজ জ্যেঠাইমাদের ঘরে খবরটা না হয় ধীরে সুস্থেই পৌঁছে দিও। ছোটবার কি আছে!

ধমকে উঠলেন স্বর্ণময়ী— কমলা তুমি ফের—

থাক থাক ঢের হয়েছে! 'তুমি' 'আপনি' ধমকের শাসন কিনা, তাই জিভে লাগাম নেই মেয়ের। এখনও একটা ভাই বেঁচে, তাই আছি। তারপর এই অপমানের রাজত্বে একটা দিনও নয়। 'বাপ রাজা তো, রাজার ঝি, ভাই রাজা তো আমার কি'— কি আর সাধে বলে! ভাই-এর বউদের কাছে ননদ হলো ফেলানো। একটা পেট চালিয়ে নিতে পারবো কাশীতে রাঁধুনীর কাজ করেও।

কাজই যদি করতে হয়, রাঁধুনীর কাজের চাইতে কেউ উপযুক্ত হোক এ তোমার পছন্দ নয়—

শোন শোন কথা শোন তোমার মেয়ের—কেঁদে ফেললেন পিসী।

ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন স্বর্ণময়ী মেয়ের গালে। যেন ননদের কান্নার সঙ্গে শাসনের ভারসাম্য রাখলেন। বললেন— ফের যদি ওর মুখে কথা বলবে তোমাকে আমি শেষ করে ফেলবো।

—কথা মনে এলে আমি না বলে পারবো না বাপু। নির্বিকার কণ্ঠে বলে গালে হাত বুলোতে লাগলো কমলা। ইস্, কি লেগেছে দেখোনা। আজ রাতে আমি খাবো না—যাও। বলে হেসে ফেলল সে।

সন্ধ্যায় ডাক পড়লো মিত্রার স্বর্ণময়ীর ঘরে।

তখন মিত্রার ঘরে মা আর ছেলেতে মেয়েতে খুব খেলা জমে উঠেছে। কুমার মুন্নীকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরলে শীতের সন্ধ্যায় এতোটা সময় খোলা মাঠে থাকার জন্য মিত্রা ভৎর্সনা করলে ডালিমকে। শুনে দুজন ছুটে এলো। মার গালে শীতে জমে ওঠা হাতটা ছুঁইয়ে হেসে উঠলো। মিত্রাও খুব চম্‌কে উঠবার মতো করে বললো, বাব্বাঃ কি ঠাণ্ডা যেন বরফ।

আর পায় কে। এই খেলাতেই পেয়ে বসলো দুজনকে। বারবার মিত্রার গালে ঠাণ্ডা হাতটা চেপে ধরে, আর মিত্রা, বাব্বাঃ! কি ঠাণ্ডা যেন বরফ— বলে ওঠে। হেসে লুটোপুটি খায় কুমার ও মুন্নী।

বাড়ীর সরকারী ঝি গলা বাড়ালো—কই গো ছোট বউদি, মা ডাকছেন—

ছেলে মেয়ের মুখে হাত চেপে হেসে কুটপাট হওয়া দেখে মিত্রাও হেসে মরছিল। হাসলে তার চোখে জল বেরোয়। আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো সে শান্তিনিকেতনী মোড়া ছেড়ে। যাচ্ছি— বলে হাত বাড়িয়ে দেরাজের ওপর থেকে সিরোলীন রচির শিশি নামালো। চামচে ঢেলে লাল টলটলে অষুধ এক এক চামচে করে খাওয়ালো ছেলে মেয়েকে। বউ ঝিরা বলে বাতিক মিত্রার। কিন্তু মিত্রার বড় ভয় ছেলে মেয়ের অসুখকে। পৃথিবীতে দ্বিতীয় কিছু নেই যাতে তাকে এর চাইতে বেশী কাতর করে। সব লক্ষণকেই তার দুর্লক্ষণ মনে হয়। আর ভেতরটায় এক একটা ঠাণ্ডায় শ্রোত বয়ে যায়। তাই অতি সাবধান সে। আজ নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগিয়ে এনেছে ডালিম ওদের। সিরলিন খাইয়ে দিল সে প্রতিষেধক হিসাবে।

সরকারী ঝি হাসল নস্যি ঘষা দাঁতে। ভাবলো ছোট বউদির বাতিক অসুধ খাওয়ান এ কথা কি আর সাধ করে বলে বউদিরা। মুখে বললো, বউদি। তুমি এসো। আমি যাচ্ছি।

মিত্রা কালোপেড়ে শাড়ীর ঘোমটা মাথায় তুলে দিলো। দক্ষিণের বারান্দা পার হয়ে গিয়ে ঢুকলো স্বর্ণময়ীর ঘরে। মাঝখানে দু'জায়ের ঘর পার হয়ে গিয়ে দেখল রাণীর ঘর অন্ধকার। জয়ন্তীর ঘরে আলো জ্বলছে। ভাশুর চেয়ারে বসে। জয়ন্তী খুব কথা বলছে।

মিত্রাকে দেখে হাসিমুখে স্বর্ণময়ী বললেন—এসো। শৈলনন্দিনীকে দেখিয়ে বললেন, তোমার জ্যেঠাইমা ঠিক করেছেন—তুমি পড়বে।

পড়বো!

শৈলনন্দিনী বললেন, হাঁ, শুধু আমি নই আমরা সবাই মিলে তাই ঠিক করেছি। তোমার জ্যেঠামশাই শুনে এতো খুশী যে তিনিই তোমায় ডেকে বলবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু বাতের ব্যথাটা বাড়লো। অষুধ খেয়ে বললেন, তোমরা বলো গিয়ে। এই ব্যথা বেদনা নিয়ে কাঁইকুই করা যায় কথা বলা যায় না। স্বামীর কথাটা বলে তিনি একটু হাসলেন।

মিত্রা ভাবলে স্বর্ণময়ীর সঙ্গে কথা বলে গিয়ে এখন জ্যেঠামশাই-এর ওখানেই বসবে সে। সকালেও অনেকক্ষণ ছিল সে তাঁর কাছে।

স্বর্ণময়ী বললেন, বই তো তুমি সব সময়ই পড়ো। বাজে বই না পড়ে পড়ার বই পড়বে।

চুপ করে রইলো মিত্রা।

চুপ করে রইলে যে তোমার পড়তে ইচ্ছে নেই?

কমলা দাঁতে ফিতে চেপে খুব কষে চুলে গোড়া বাঁধছিল। বললো—আমার কথা যদি শোন তো বলি, রাজী হয়ে যাও এক্ষুনি। নইলে শেষে আফশোস করে মরতে হবে। যেমন আমি মরছি। কবে যেন মা বলেছিলেন পড়বি? কিন্তু তক্ষুনি কথাটাকে চেপে ধরিনি। ভেসে যেতে দিয়েছি। এখন কেউ বললে এই এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ি। বলে হাত দুটোয় জলে ঝাপিয়ে পড়ার ভঙ্গি করলো কমলা!

মিত্রা হেসে বললো, তুমি এখন পড়ো না। তুমি তো ছেলে মানুষ।

আমি ছেলে মানুষ, আর তুমি?

তোমার চাইতে আমি অনেক বড়।

কতো?

অনেক।

ক তো? কয়ের ওপর জোর দিয়ে বলে উঠলো কমলা।

চার পাঁচ ছ' সাত—

কি বলেরে! বলে খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল কমলা। দাঁতের ফিতে ফাঁস পড়ে গেল দাঁতের চাপ থেকে। ফের সেটাকে দাঁতে চেপে ধরতে ধরতে বললো, থামলে কেন। বলে যাও—আট নয় দশ বারো পনেরো। আচ্ছা মা, আমি আর ছোটবউদি ঠিক কতো ছোটবড় গো?

একটু ভেবে নিয়ে স্বর্ণময়ী বললেন—

তা হবে বছর দুই তিন মতো—তাই না দিদি?

শৈলনন্দিনী সমর্থন করে বললেন, না, তার বেশী হবে না।

বছর দুই! তিনটাকে তো স্বীকারই করলে না কমলা। বছর দুটোকেও যেন দু ঠোঁটে ফেলে দিলে মাটিতে। হয়েছে—এ বয়সে দু ছেলেমেয়ের মা হয়েছো তাই যথেষ্ট। আবার কতো। কিন্তু এমন ভারিক্কি চালে চলবে না, মা যদি এখন বলতেন, তা হবে ছোট বউদি তোর চাইতে বছর দশেকের বড়—হ্যাঁ, মাথা কাত করলো কমলা, নিশ্চয় বিশ্বাস করতাম।

সত্য।

সেই যে দিদিমার কোলে শুয়ে, মামীমাদের কোলে পা তুলে দিয়ে পাকামো করে চলতো—কোথায় গেলো বড় মামা না খেয়ে. আর পারিনে বাপু তাঁকে নিয়ে।

ছোটমামাটা যেন কি। পাশ দিয়েছেন তো রাজা হয়ে গেছেন। ঘরে যদি ছেলের এতটুকু মন বসে।

আচ্ছা, সেজমামা! এলে তো এই ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা জলে স্নান করে! বেশ গো বেশ। দেখবো অসুখ হলে।

বুড়োমির বীজ তখনই ওর ভেতর শিকড় গেড়ে বসেছিল। যখন যে বয়স তার চাইতে চলনটা থাকতো এগিয়ে। তারপর ওর সেই বাহ্যিক চলার ছন্দে সহায়তা করলো ওর জীবন। ওকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চললো জীবন পথে। পনেরো ষোলতে হলো বিয়ে। সন্তান এলো দুটো বছর না যেতে। মৃত জীবিত মিলে চার বছরে চারটি সন্তানের জন্ম দিলো। হলো বিধবা। খাওয়া উঠে এলো আমিষ ঘর থেকে নিরামিষ ঘরে। বৃদ্ধা আর প্রৌঢ়া শাশুড়ী ননদের দলের সঙ্গে বসতে লাগলো পাথরের থালায় ভাত নিয়ে। পরিচ্ছদ এসে দাঁড়ালো কালোপাড় ধুতীতে।

এখন ওর জীবনের সামনে কি?

সন্তান মানুষ করা।

ওকে এখন সবাই কি করতে বলবে?

বলবে সন্তানদের দেখতে।

নিজের কথা?

না, একেবারেই ভাববে না।

তবে হঠাৎ ওর পড়াশুনার জন্য ওদের এতো আগ্রহ কেন?

ঐ ওর নিজের কথা ওকে ভুলিয়ে রাখার জন্য। ওকে ব্যস্ত রাখার জন্য। অন্য কাজে ব্যাহত রাখার জন্য। ওর জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়। ওকে বিদুষী বিদ্যাবতী মহিলা করবার জন্য নয়। ভূতকে বাঁকা চুল সোজা করার কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখার মতো ওকেও একটা কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখছে ওরা।

কিন্তু ও আর কমলা বছর দু-তিনের বড়ো-ছোটো। ওকে যেন বিস্মিত করে দিয়ে গেলো কথাটা। ঐ যে কমলা দাঁড়িয়ে বিড়া খোঁপা বাঁধছে, খোঁপায় প্লেসটিকের ডিরী ফুলের মালা জড়াচ্ছে, গাঢ়ো সবুজে লালে বুটিদার শাড়ী বের করে রেখেছে পড়বার জন্য, রেখেছে বের করে কুমকুম আলতা—এই। প্রসাধনরতা মেয়ের সঙ্গে মিল কোথায় ওর!

শৈলনন্দিনী বললেন— মনে হচ্ছে তোমার পড়তে ইচ্ছে নেই। আমরা ভেবেছিলাম তুমি খুশী হয়ে রাজী হবে।

মিত্রা বলল—বয়সটার কথাই ভাবছিলাম। এই বয়সে—

বয়সের কথা ভাবছিলে? এই বয়সে?

স্বর্ণময়ী শৈলনন্দিনী দুজনেই হেসে ফেললেন।

শৈলনন্দিনী বললেন—তুমি যখন স্কুল ফাইনেল পাশ করেছিলে, তখন থেকে যদি পড়ে যেতে তবে এতোদিনে কবে তোমার সব পাশ হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি বলেই পড়ার বয়স চলে গেলো এ কেমন কথা। জয়া তোমার চাইতে বছর চারেকের বড়। সে যখন বিধবা হয়, তখন স্কুল ফাইনেল পরীক্ষাটাও তোমার মতো পাশ করা ছিল না। বয়স হয়েছে বলে বসে থাকলে কি লাভ হতো? এই তো কেমন চটপট পাশ করে এখন এম. এ. পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বছরগুলো চোখের উপর দিয়ে চলে যাবে। দেখবে শেষে মনে হবে বসে না থেকে যদি পড়তাম। এতোদিনে বি. এ., এম. এ. পাশ করে বেরুতাম।

কলেজে পড়ছে এ স্বপ্ন মিত্রা এক সময় জেগে দেখেছে। ঘুমিয়ে দেখেছে। কিন্তু আজ আর দেখে না। জেগেও দেখে না। ঘুমিয়েও দেখে না। ইচ্ছাটারই মৃত্যু ঘটে গেছে। পড়তে ভালোবাসে, কেবল বসে বসে পড়ে। কিন্তু বিচ্ছৃঙ্খল কাজের যেমন কোন রুপ নেই, প্রয়োজনের মুহূর্তে সে যেমন কিছুই হাতের কাছে এনে দিতে পারে না—বিচ্ছৃঙ্খল পড়ারও সেই অবস্থা। প্রয়োজনের মুহূর্তে কিছুই এনে দিতে পারে না হাতের কাছে। সে এক যন্ত্রণা।

পড়ার—কলেজে পড়ার আগ্রহটা আবার জীবনে পেতে চায়। সে বলে, ভালো কাজে 'দেরী' হয়ে যাওয়া বলে কোন কথা নেই মিত্রা।

ভেতরে উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল মিত্রার।

প্রফেসরের কাছে লাইব্রেরী ঘরে বসে অর্থনীতি আর ইতিহাস পড়ছে। নোট নিচ্ছে। পরীক্ষা দিচ্ছে। এ বাড়ী ও বাড়ী দু বাড়ী থেকে টিফিন হাতে নিয়েছে সবাই। দাঁড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠিত মুখে। ও হল থেকে বেড়িয়ে আসছে প্রশ্নপত্র হাতে। ডাবের জল তুলে দিচ্ছে ওর হাতে রাণী আর সৌমী। আবার বেশ পড়তে ছুটছে সে হলে—এখনও এমন দিন আসতে পারে!

একজন প্রফেসর রেখে দিতে হবে কিন্তু মা—জ্যাঠাইমা। মা জ্যাঠাইমা এসব ডাক এ ভাবে মিত্রার গলা দিয়ে আসতে চায় না। আনন্দে ডেকে ফেললো সে।

স্বর্ণময়ী বললেন, তোমার জ্যেঠাইমা বলেছেন শমিত পড়াবে।

থমকালো মিত্রা।

শমিত পড়াবে, এ কথায় কিছুদিন আগে ভুলেও মিত্রার মনে দ্বিধা দেখা দিত না। ওদের আলোচনায় সেধে যোগ দিয়েছিল সে। তারপরও তার আগ্রহ আর ভালোলাগার পরিচয় দিয়ে গেছে শমিত তার প্রত্যাহের উপস্থিতি দিয়ে। ওদের ভেতর শমিতের এই সহজ প্রবেশ খুশী করেছিল মিত্রাকে। তার অসহজ ভাবও কেটে গিয়েছিল। সহজ হয়ে উঠেছিল মিত্রা। কিন্তু শমিতের বর্ত্তমান ব্যবহারের দূরত্ব দৃষ্টিতে আত্মসচেতন মিত্রা তার দম্ভের দেয়ালও ফের খাড়া করে দিয়েছিল তার সামনে।

মিত্রা কি বলবে, কি করবে ভেবে উঠবার, বুঝে উঠবার আগেই শৈলনন্দিনী ডেকে পাঠালেন শমিতকে। দিদির ডাকে নীচে নেবে এলো শমিত।

শমিতের এই সন্ধ্যের সময় বাড়ী থাকবার কথা নয়। থাকেও না। কিন্তু ঐ যে গ্রহ যোগ আছে তার। এক এক সময় তার বের হওয়া দেখলে মনে হয়, পৃথিবী থাক আর যাক— বের তাকে হতে হবেই। আর এক সময় মনে হয় ঘর আর বই এই সে চেনে।

এখন চলছিল শমিতের ঘরে থাকার যোগ।

ঘরে বসে বই পড়ছিল সে। দিদির ডাকে বই হাতেই নেবে এলো নীচে। ঘরে ঢুকে দেখলো, প্রায় আয়নায় মুখ লাগিয়ে কমলা কুমকুমের টিপ পরছে কপালে। আর তার কাছে ড্রেসিংটেবিলের কোণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিত্রা। তার একপাশ করা মুখের উপর দিয়ে চলে যাওয়া ঘোমটার কালো ভেলভেট পাড়টাই প্রথম চোখে পড়লো শমিতের। তারপর তার পাতলা ফর্সা নাকের একটা দিক। সাধারণতঃ শৈলনন্দিনী ভাইকে কিছু বলতে হলে, নিজেই যান ওপরে। ডেকে বড় পাঠান না। তাতে বলে পাঠিয়েছেন স্বর্ণময়ীর ঘরে আসতে—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো শমিত দিদির দিকে। বললো— কি ব্যাপার।

স্বর্ণময়ী পুরোনো আমলের উঁচু জোড়া খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার কাছেই শৈলনন্দিনী। সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কথাটা যখন আরম্ভ করে ফেলেছেন তখন শেষ করে যেতে চান। শৈলনন্দিনী বললেন—বুঝলে শমিত আমরা সাব্যস্ত করেছি মিত্রা পড়বে।

সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলো শমিত— বাঃ, খুব ভালো কথা।

তুমি পড়াবে। সে কথাই তোমাকে বলতে ডেকেছি আমরা।

আমি! হেসে উঠল শমিত। তবেই হয়েছে।

কেন, তবেই হয়েছে কেন?

আমি কি পড়াতে পারি না কি।

তুমি পড়াতে পারো না!

না। হাতের বইটার উপর আস্তে আস্তে টোকা দিতে দিতে বললো শমিত।

তবে তুমি কলেজে পড়াও কি করে?

কলেজে পড়াতে কি পড়াতে-জানা দরকার হয়? তাই যদি হতো তবে আর আমি সেখানে কাজ পেতাম না।

চটে উঠলেন শৈলনন্দিনী, বাড়ীর কথা বললেই যে তুমি ফাঁকি খুঁজবে এতো জানা কথাই।

শমিত হাসলো দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে। বললো, বুড়ো বয়স পর্যন্ত ফাঁকিতে প্রশ্রয় দিয়ে কুঁড়ে সর্দার বানিয়ে তুলেছ তো তুমিই। এখন চটলে কি হবে। মাষ্টারি করা আমার পোষায় না।

তোমার মাষ্টারি করা পোষায় না! আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন শৈলনন্দিনী ভাইয়ের দিকে। শমিত যে মিত্রাকে পড়াতে মত করবে না, এটা তিনি কল্পনাও করেন নি। করলে, সবার সামনে এভাবে নিজেকে অপদস্থ করতেন না। এদের অপ্রস্তুত করে তুলতেন না স্বর্ণময়ী। কমলা—বাদ দিলেন না হয় তিনি ওদের কথা। মিত্রা—মিত্রা দাঁড়িয়ে রয়েছে না সামনে!

শুধু এইটুকু— আর কিছু নয়, মিত্রাও ভাবছিল এই কথাটাই। শমিত যদি কেবল ওর উপস্থিতিটাকে একটু সম্মান করতো, এখনকার মতোও 'আচ্ছা' বলে চলে যেতো, তবেই আর মিত্রার বলার কিছু থাকতো না। আর শমিত কি ওকে এটুকুও চিনে উঠতে পারেনি যে, তার এই এক কথার 'আচ্ছা' যে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে, তাই মিত্রাকে ঠেলে নিয়ে যাবে অনেক দূরে। আর বেশী দরকার হবে না। অনর্থক এতো কথাই বা সে বলছে কেন দাঁড়িয়ে।

শমিত বললো, সিরিয়াসলি যদি ঠিক করে থাকো তোমরা যে মিত্রাকে পড়াবে, তবে একজন সিরিয়াস মাষ্টার রেখে দিও। যাতে সত্য কাজ হবে।

এবার ফেটে পড়লো শৈলনন্দিনী। হয়তো পড়তেন না। মিত্রাকে পড়াতে না চাইলেও এভাবে রাগে ফেটে পড়তেন না, যদি না চেপে রাখা সংশয়টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো। জয়াকে নিয়ে মনে মনে স্বস্তি ছিল না শৈলনন্দিনীর। সংশয়টা শশীকান্তই ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তার মনে। সেই থেকে ভেতরে ভেতরে তাকে সংশয়টা অনবরতই কুরছে। পড়ানোতে এতোই যদি অনিচ্ছা তবে আর একজনের বেলা এতো ইচ্ছা আসে কোথা থেকে। তিনি কি জানেন না, বলতে গেলে শমিতের জন্যই জয়ার পড়া। তার অর্থটা তবে কি হয়? একে সম্পর্কে বোন, তাতে বিধবা—একেবারে ফেটে পড়লেন শৈলনন্দিনী। বললেন, কেন জয়াকে কি তুমি পড়াও নি। তখন পড়াতে শিখেছিলে কোথা থেকে। সে টক টক করে এতোগুলো পাশ দিয়ে গেলো তো তোমার পড়ানোতেই।

হেসে উঠলো শমিত। বেচারার পড়াই হতো না আমি না পড়ালে। প্রফেসার রাখার টাকা ওদের নেই। তোমরা তো একটা কেন তিনটা মাষ্টার রেখে দিতে পারো। হাতের বইটা ঝুলিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করে বললো, যা স্থির করো আমায় জানিও। আমি ভালো কাউকে ঠিক করে দেবো। একটু উত্তরের অপেক্ষা করে চলে গেলো সে।

মর্মাহত কণ্ঠে বললেন স্বর্ণময়ী, তবে থাক। মাষ্টার রেখে বউ পড়ালে আমার আর উপায় থাকবে না। এমনিতেই বউদের জন্য আমার বহু কথা শুনতে হয়।

কথাটা সত্য।

সাধারণতঃ শ্বশ্রূদের কাছ থেকে যে অনুজার স্নেহহীন ব্যবহার বউদের ভাগ্যে জোটে, মিত্রারা তিন জা সে হিসাবে ভাগ্যবতী। স্বর্ণময়ীর মুখে কোনদিনও কেউ শুনতে পায়না বউদের নিন্দা। আপন সন্তানের মতো দোষ অপরাধ আড়াল করিয়া রাখেন। বাড়িয়ে ধরেন গুণটুকু। সেই যে নতমুখি নববধূ ভিরুদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে 'মা' সম্বোধন করে এসে দাঁড়ায়—তখনই তাঁর মন জয় করে নেয়। মা ডাকের অসম্মান তার কাছে আর হয় না। স্বর্ণময়ীর কথা তুলনা টেনে শাশুড়ীদের মুখের উপর শুনিয়ে ছাড়ে অন্যান্য বউরা। স্বর্ণময়ীকে গালাগালি দেন তার জায়েরা বোকা বলে। বলেন, বউদের এখন এতো মাথায় তুললে শেষে পায়ের তলায় ফেলবে তারা তোমায়। অনেক সময় চেষ্টা করেন স্বর্ণময়ী কড়া হবার। কিন্তু যার স্বভাবে যা নেই, তা কিছুতেই হয় না। আর হলেও এমন বেমিল আলগা লাগে সেটা যে, ও-কড়া হওয়াতে লাভ হয় না কিছুই। জয়ন্তী, রাণী, মিত্রা হেসে ফেলে। বলে, ও আপনি পারবেন না। থাক। প্রফেসর রেখে বউ পড়াতে ভয় পাবেন বৈকী তিনি।

কাঁসর ঘণ্টা বাজছিল অনেকক্ষণ ধরে পূজো দালানে। আস্তে আস্তে দু জা বেড়িয়ে গেলেন পূজো দালানের দিকে। কমলা চোখ কোণ করে ড্রেসিং টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মিত্রাকে দেখলেন। দেখে আয়নার উপর উপুর হয়ে থাকা দেহ টান করলো। অতক্ষণ ওভাবে থেকে কোমরটা বোধ হয় ধরে গিয়েছিল। পিঠটা টান করলো কমলা শরীর বেঁকিয়ে। একটু দাঁড়ালো। তারপর বেড়িয়ে গেল।

স্বর্ণময়ীর ঘর থেকে বেড়িয়ে নিজের ঘরে এসে মিত্রাও প্রথমে সেই তার শান্তিনিকেতনী মোড়ার উপর শান্ত হয়েই বসেছিল। কিন্তু পারলো না। যতক্ষণ বসে রইলো যেন জোর করে ধরে রাখলো নিজেকে। তারপর উঠে দাঁড়ালো। শমিতের কাছে এসে এভাবে জবাব চাইতে দাঁড়ায়নি কোনদিন। এক মিত্রাই দাঁড়ালো। ওর রাগ আর বেপরোয়া ভাবটা কাউকে খাতির করে চলে না বলে। খাতির করা শেখেনি মিত্রা।

তবু চেষ্টা করেছিল মিত্রা। খাতির করতে নয়। নিজেকে সংযত করতে। পারলো না। মনের অদমনীয় উত্তেজনা কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিলে না ওকে। যদিও ভেতরের উত্তেজনা গরম লাগিয়ে তুলেছিল তবু দেরাজের উরর থেকে ভাঁজ করা শালটা খুলে গায় জড়িয়ে নিয়ে তেতলার শমিতের ঘরের দিকে রওনা হলো সে।

আরাম কেদারার উপর আধশোয়া ভাবে চোখ বুজে শুয়েছিল শমিত। পায়ের উপর টানা ছিল শাল। বিছানার বেডকভারটার যে অবস্থা তাতে মনে হয়, ওটা টেনেই শমিত পায়ের ঠাণ্ডা চাপা দিতে চেয়েছিল। দিয়েছিলও। কিন্তু তারপর মাঘের শীত ওতে না মানায়, শাল টেনে দিয়েছে। বুকের উপর মধ্যমার চাপে বন্ধ বই। যে বইটা হাতে নিয়ে সে নীচে নেবেছিল, লাল মলাটের সেই বইটা। পড়তে পড়তে হয়তো এই মাত্র বন্ধ করেছে। নয় তো নীচ থেকে উঠে আসবার পর থেকে এভাবেই বসে রয়েছে—আর খোলেই নি বই। অনামিকার হীরের আংটিটা জ্বলছে—জ্বলছে বাতির আলোয় লাল নীল বেগুনী রশ্মি ছড়িয়ে।

শীতের রাত।

ঘরের জানালাগুলো সব বন্ধ। তাই লেসের পরদাগুলো দুলছে না। নড়ছে না। জানালার কাঁঠালচাঁপা রং-এর উপর ফুল-লতা পাতার নক্সা তুলে স্থির হয়ে আছে। নইলে ওর তেতলার ঘরের পরদা ওড়ার উপরই থাকে। মিনেকরা ফুলদানীতে একগুচ্ছ ফুল। শীতের ফুল। সিজিন ফ্লাওয়ার। ঘরটা আলো করে আছে তারাই। নইলে গোছানো নয় শমিতের ঘর। পায় টেনে দেওয়া বিছানার ঢাকনাটা ঝুলে আছে কার্পেটের উপর। তার পাশে পড়ে তাকিয়াটা। ওটার উপর পা রেখেছে শমিত। বিছানা বালিশ দুটো নীল ঢাকনার উপর পড়ে রয়েছে আবোল তাবোল। আকাশের বুকে উড়ন্ত হাঁসের মতো দেখাচ্ছে সে দুটোকে। এতো যে বে-গোছালো ঘর—তবু সুন্দর। রূপসী মেয়ে যেমন না সেজেও সুন্দরী।

বসে বসে তাকিয়ার উপর রাখা পা নাড়ছিল শমিত। ঘরে উঁচু পাওয়ারের আলো জ্বলছে। বাইর থেকেই ভেতরটা দেখতে পেলো মিত্রা। দরজার কাছে এসে থামলো সে।

চোখ চাইলো শমিত।

পায়ের শালটা টেনে গেঞ্জীর উপর তুলতে তুলতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সে আরাম কেদারা ছেড়ে—'আরে' বলে তারপর বললো, এসো। এসো।

ঘরে ঢুকলো মিত্রা।

শমিত ওর খাটের সঙ্গে লাগানো নিচু সোফাটা দেখিয়ে বললো, বোস।

বসলো না মিত্রা। শমিতের বই-এর তাকে হাত রেখে দাঁড়ালো। বললো, আমি বসতে আসিনি।

হাসলো শমিত। বললো, জানি। ভীষণ রেগে এসেছ।

যদিও হেসেই বললো কথাটা; তবু তার মুখ দেখে কে বলবে, সে এই মাত্র হাসলো—দিদির ঘরেও হেসেছে। শমিতের মুখ কালি ঢালা কালো।

মিত্রার নিজের মুখেও তাই। তার দেখবার কথা নয় শমিতের মুখের কালি। দেখলোও না সে। বললো, না। রাগ করা কোথায় চলে আর কোথায় চলে না, সে বোধ আমার আছে। আমি শুধু একটা কথা বলতে এসেছি।

বই-এর তাকে রাখা মিত্রার নিরাভরণ হাতটার ওপর থেকে চোখ নামিয়ে এনে শমিত মিত্রার মুখে ওপর রাখলো। বললো, যদি কোন কথাই না বলো, আমি কৃতজ্ঞ থাকবো মিত্রা।

তুমি কি ভাবছ আমি তোমাকে পড়ানোর কথা বলবো।

না।

আমি বাধা দেবার সময় পেলে জ্যাঠাইমা যে তোমাকে ডেকে পাঠাতে পারতেন না, তা জানো?

জানি।

তবে আর কি? স্পষ্ট কথায় জবাব দিতে তো তোমার বাধেই না কোথাও।

যেমন এই মাত্র দিদির ঘরে দিয়ে এলাম।

নিশ্চয়। তবে আর কথাকে এতো ভয় পাচ্ছ কেন?

ভয়? ফের হাসলো শমিত। বললো, সত্যি ভীষণ ভয় পেয়েছি আমি। কতো—তা তুমি বুঝবে না। তাই যেখানে রয়েছি সেখান থেকে এক পা নড়তে সাহস নেই আমার।

আমি খুব দুঃখিত। তোমার ঠাট্টা পরিহাস এখন ঠিক নিয়ে উঠতে পারছিনে। মিত্রার কণ্ঠের রুক্ষতা আড়াল রইল না।

শমিত বললো, ঠাট্টা পরিহাস? না। কতগুলো কথা আছে, কতগুলো ব্যাপার আছে, যেখানকারটা ঠিক সেখানেই থেকে যেতে দিতে হয় মিত্রা।

আহত মর্যাদার আত্মাভিমানে মিত্রা ক্ষুব্ধ, মাথার রক্ত তার চড়া। অন্যান্য বোধগুলো তার তলায় চাপা পড়ে গেছে সব। তাই তার কণ্ঠস্বরের রুক্ষতা এবার রূঢ়তায় পরিণত হতে পারলো। নইলে হয়তো পারতো না। বললো, এগুলোকে কি বলে জানো, বলে কথার খেলা।

অর্থ কিছু পেলে না?

না।

চেয়ারের ওপর থেকে হাত দুটো তুলে বিবেকানন্দ ভঙ্গিতে বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখছিলো শমিত—

মিত্রা বললো, কি, আর কথা বাড়ালেই মারবে?

হেসে ফেললো শমিত। নিজের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটার দিকে চোখ নিচু করে এক নজর দেখে বললো, কাউকে মারার পক্ষে এ ভঙ্গিটা খুব প্রশস্ত বলে তো মনে হচ্ছে না আমার। তারপর হাতের আড় খুলে ফেলে বললো, এক এক সময় হাত দুটো এমন বিরক্ত করে! কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না, কোথায় রাখা যায়! কোথায় রাখি বলতো হাত দুটোকে?

এমন অসহায় কণ্ঠে প্রশ্নটা করলো শমিত যে, অন্য সময় হলে হেসে ফেলতো মিত্রা। এখন ভ্রূ কুঁচকে বললো, সে তোমার খুশি।

না খুশিমতো রাখা চলবে না। এটাই কি খুশিমতো রেখেছিলাম। রইলো এখানেই। বলে ফের সে হাত দুটো চেয়ারের মাথায় রাখলো। তারপর বললো, তোমরা ভাবো, আমি কেবল আমার মর্জি মতো চলি। এই তো দেখলে, পারলাম?

মিত্রা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, তোমার কথার ধাঁধায় মাথা ঘুরছে আমার। কথার খেলা তোমাকে আমি আমাদের সেই লাইব্রেরী ঘরেও তর্কের সময় বহু খেলতে দেখেছি। নতুন নয়। সময় সময় মন্দ লাগে না। কিন্তু এখন ভালো লাগছে না। আমি যে কথা জানবার জন্য এসেছি, শোন তো বলি। নইলে চলে যাই। কিন্তু কথাগুলো থেকে ঠেলতে ঠেলতে এতোদূর নিয়ে গেছ আমাকে—

সানন্দে বলে উঠলো শমিত— তবে থাক। কথার খেলা আমার সার্থক হোক। জানবার আগ্রহে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে, দুঃখ বাড়ে বই কমে না মিত্রা।

থাক। আমার দুঃখ পাওয়া নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।

না, তা আমি ভাবতেই বা যাব কেন বলো। তোমার বোধ আছে, কার ওপর রাগ করা চলে আর কার ওপর চলে না— আর কার দুঃখ পাওয়া নিয়ে আমার ভাবা চলে আর চলে না, সে বোধ আমার কি নেই! আমি শুধু বলছিলাম, থাক।

বই-এর তাক থেকে হাত নামিয়ে শরীর টান করলো মিত্রা—

আমার বলার কথাটাই যদি থাকবে, তবে তুমি কি মনে করছো আমি তোমার সঙ্গে একটু সন্ধ্যা কাটিয়ে যাবার লোভে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

এবার গম্ভীর হলো শমিতের মুখ।

হাসির আড়ালে তার মুখের কালো প্রলেপটা এতক্ষণ কিছু ঢাকা পড়েছিল। গম্ভীর মুখের উপর এবার সেই কালো প্রলেপটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

চুলগুলো দু হাতে পেছন দিকে চেপে ধরে বললো, বেশ বলো। তা আমার ঘরে যখন এসেছ, দয়া করে না হয় বসেই কথা বলো।

জয়ন্তী রাণীরা কিন্তু তোমার বিনয় দেখলে আজ বিস্মিত হতো।

তা হতো। কিন্তু আমার বিনয় দেখে নয়, আমাকে দেখে। আমার ভেতর সৌজন্যের অভাব তারা কখনো দেখেনি। থাক্। তোমার জিজ্ঞাসাটা বলো। দেখি, আমার সাধ্যে কুলায় তো জবাব দেবো।

মিত্রা বললো, জয়া— যদিও আমি তাকে চিনিনে। শুনে বলছি। তাকে তুমি পড়ালে, নইলে তার পড়া হতো না। এর চাইতে ভালো কাজ আর কি হতে পারে। মানুষকে চেনা যায় তো তার এমনই দু একটা কাজের মধ্য দিয়েই। কিন্তু যত টাকাই থাক বাইরের মাষ্টার রেখে যে এ বাড়ীতে বউ পড়ানো হবে না, এ জানা কথা। আমিও জানি। তুমিও জানো। একদিন এ বাড়ীতে কলেজে পড়বার কথা বলতে গিয়ে শুনতে হয়েছিল, 'এ বাড়ীর বউ বই হাতে কলেজে যাচ্ছে, অন্যদের কথা বলবো কি, আমারই যে হাসি পাচ্ছে।' নিজেকে নিয়ে যতদূরেই থাকো, তুমিও এ বাড়ীর ছেলে। মনোভাবটা তোমার এই না হোক— অন্যদের ভাবটা জানো। তা সত্ত্বেও তোমার সহৃদয়তা আমাকে সাহায্য করতে রাজী হলো না কেন, আপত্তিটা কোথায়—শুধু এটাই আমার জানার কৌতূহল। আমি তোমার কাছে সাহায্য নিতাম কি নিতাম না সেটা পরের কথা।

কিন্তু কথা শেষ করেই তক্ষুনি তা ফিরিয়ে নেবার মতো করে হঠাৎ বলে উঠলো মিত্রা, না থাক। জানার আগ্রহে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে দুঃখ বাড়ার ভয়ে নয়— বলে ফেলে মনে হচ্চে, কোন অর্থ হয় না এ জিজ্ঞাসার— নাঃ—একেবারেই অর্থ হয় না। তুমি যদি এখন বলো, একজনকে যে কাজ আনন্দের সঙ্গে করাতে ইচ্ছে করে, আর একজনের বেলায় তা নাও করতে পারে। তবে—

মিত্রার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা শুনছিল শমিত। হঠাৎ স্তম্ভিত মিত্রা দেখলে শেষ কথাটা বলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

বিমূঢ় মিত্রা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একা ঘরে।

অপসৃয়মান শমিতকে এগিয়ে গিয়ে বলতে পর্যন্ত পারলো না. তুমি যাচ্ছ কেন। আমিই যাচ্ছি। তবেও বুঝি কিছুটা শেষ রক্ষা হতো। অপমানে লাঞ্ছনায় শরীরের সমস্ত রক্ত জল হয়ে যেন চোখ দিয়ে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু মিত্রার অহঙ্কার সে অশ্রুকে ঝরে পড়তে দিলে না শুধু নয়—তার ছায়া পর্যন্ত চোখের উপর পড়তে দিলে না। বিড়ম্বিত মিত্রা দাঁড়িয়ে রইলো নিঃস্পন্দ ভাবে।

নিজেকে সামলে নীচে নেবে আসতেই প্রথম দেখা হলো জয়ন্তীর সঙ্গে। সে মুখ বাঁকিয়ে বললো, শমিতের কাছে জবাব চাইতে যাওয়া মানে, সেধে অপমানিত হতে যাওয়া। আমি বাবা, ভুলেও যাইনে। নিজের মান নিজের কাছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে ভেবে চিন্তে এগুতে হয়।

দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা পাশ কামড়ে ধরে মিত্রা বললো, তুমি জানলে কি করে? গিয়েছিলে সঙ্গে?

সঙ্গে যাবো কেন ভাই। জানলাম তোমার মুখের চেহারা দেখে। খুশি হয়ে ফিরলে কি আর মুখের চেহারা অমনি হয়। ও ছেলে কাউকে গ্রাহ্য করে না। তুমি ভাবো তোমায় করবে। হলো তো। ও বাবুর কাছে সব সমান।

কমলা এদিক দিয়েই যাচ্ছিল। বা এদিকেই আসছিল। হয় তো সে বাড়ীর এই আবহাওয়াটার দিকে নজর রাখছিল। জয়ন্তীর কথা শুনে বললো, উঁচু থেকে নীচের সব মানুষকেই মাথায় সমান দেখায়। শমিমামা নিশ্চয়ই তার তেতলার ঘরে বসে তোমাদের সবাইকে তেমনি দেখেন। নইলে সমান দেখার তো কথা নয়।

কেন নয়? ফুঁসে উঠল জয়ন্তী।

দেখো, ছোট বউদি তোমার চেয়ে মাথায় কত লম্বা। কপালের কুমকুমের টিপের অভ্র চকচক করে উঠল কমলার মাথা নাড়ার সঙ্গে।

তুমি তাই বলেছ?

বলি নি?

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জয়ন্তী তাকিয়ে রইলো কমলার দিকে।

কমলা হেসে দু আঙ্গুলের টিপের ভেতর একটা ছোট্ট বিন্দুর মাপ দেখিয়ে বললো, এই এত্তোটুকু একটা অন্য অর্থ আছে।

ক্রুদ্ধ জয়ন্তী বললো, তোমার বড্ড মুখ হয়েছে কমলা।

হয়েছে কি বলছো? বলো দিন দিন বাড়ছে।

তা যত খুশী বাড়ুক। একটা মুখ তোমার বেড়ে দশটা বিশটা হোক— কিন্তু—

চেঁচিয়ে উঠলো কমলা, আরে বলে কি! থামো থামো। তোমাদের নন্দাই-এর দুর্ভোগের কথাটা ভেবে দেখেছো একবার—

জয়ন্তী তো হেসে ফেললেই। মিত্রাও হেসে ফেললো।

সবুজ শাড়ীতে ঢেউ তুলে কমলা বললো, চা তৈরী করেছি। খাবে তো এসো দু'জন। তারপর উঠে গিয়ে তেতলার সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে ডেকে উঠলো—শমিমামা, ও শমিমামা চা খাবে?

খাবে তো বলো। মা দের জন্য বিশুদ্ধ পাথরের বাটীতে বানিয়েছে। পাঠিয়ে দিচ্ছি এক বাটি। তুমি তোমার লণ্ডন-মেড কাপে ঢেলে নিও। বলেই তরতর করে রেলিং-এ হাত রেখে নেবে এলো নীচে। যেতে যেতে গেয়ে উঠলো, "অল্প লইয়া থাকি তাই, মোর যাহা যায় তাহা যায়। কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হা-আ-আ-আ-আ-য়।"—পরিবেশ হালকা করতে চাইলো কমলা।

শমিত কমলার ডাক শুনে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালো।

কিন্তু তখন সেখানে কেউ নেই। কেন ডেকেছিল কমলা, একবার ভাবলো নেমে খোঁজ করে। কিন্তু ইচ্ছে করলো না। নিজের ঘরে এসে ঢুকলো শমিত। পায়ের তলায় কার্পেটটার দিকে তাকিয়ে বসে রইলো সোফাটার উপর।

চিন্তা করছে সে? না। মাথা তার একেবারে শূণ্য। টোকা দিলে শূণ্য কলসীর মতো ঠন্‌ঠন্ শব্দ তুলবে। তারপর উঠে গিয়ে দু'হাতে মাথা রেখে বিছানার উপর রইলো শুয়ে।

আধ ঘণ্টাখানেক বাদে চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো কমলা। শমিতের খাটের সামনের নিচু টিপয়ের কাপ নামিয়ে রেখে বললো— এই রইল চা।

বোস-না। আধ-শোয়া অবস্থায় এক হাতে মাথা রেখে, অন্য হাতে চায়ের কাপ তুলে নিল শমিত। পেয়ালার একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে 'আঃ' বলে পুনরায় মাথা রাখলো বালিশে। দাঁড়িয়ে থাকা কমলার দিকে তাকিয়ে বললো, কই বসলি নে।

শমিতের সেই কার্পেটের উপর ফেলে রাখা তাকিয়াটার ওপর চেপে বসে কমলা বললো—

তা বসলাম। নইলে যাবোই বা কোথায়। আকাশের অবস্থা আজ মোটেই সুবিধের নয়।

অন্যমনস্ক শমিত বললো, মেঘ করেছে?

মেঘ করেছে। মাথা নাড়লো কমলা। কোথাও কোথাও এরই মধ্যে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এবং আরো হবার সম্ভাবনা আছে। কোথাও আকাশ কালো। মনে হচ্ছে এ অবস্থাটা চলবে কিছুদিন। দিন কয় ও-বাড়ী থেকেই ঘুরে আসবো কিনা ভাবছি।

শাশুড়ীর কাছে যাবি ভাবছিস?

না উঠবো ভাবছি। গা তোলার ভাব করলো কমলা।

বাধা দিলো শমিত। আরে বোস, বোস।

কার কাছে বসবো? তুমি কি এখানে রয়েছো?

বাঃ, কেন থাকবো না। হাতের কাপ নিয়ে একেবারে উঠে বসলো শমিত বিছানার উপর।

শুনেছ আমার কথা?

কেন শুনবো না। এই তো বলছিলি শ্বশুর বাড়ী যাবার কথা ভাবছিস—আচ্ছা, তুই এখানে থাকতে এতো ভালবাসিস কেন বলতো।

কমলা বুঝলো ও উপলক্ষ্য মাত্র, শমিত কথা বলে সময় কাটাতে চাচ্ছে। বললো, অভ্যাস।

অভ্যাস কি রকম।

কুড়ি বছর রইলাম যে।

অসিত কি লিখেছে জানিস আমার কাছে!

কি?

লিখেছে, এবার যদি তার কাছে চলে না যাস, তোকে ডাইভোর্স করবে সে।

হৈ হৈ করে উঠলো কমলা, তা সেটা তো বেশ হয়।

সেটা তো বেশ হয়! এদিকে শুনতে পাই ভোরে বিকেলে দুপুরে সন্ধ্যায় দিনে চার বেলা তুই চারটা চিঠি লিখিস অসিতকে। অসিত চারটে চিঠি লেখে তোকে।

হাঁ, তা লিখি এবং লেখেন।

তবে।

তবে কি। তারপরও লিখবো এবং লিখবেন। একটু ভাববার ভঙ্গি করলো কমলা, আচ্ছা, তা এই চিঠি লেখাটা যদি ডাইভোর্সের সঙ্গে ঠিক না মানায়— না হয় দেবো বন্ধ করে।

হেসে উঠল শমিত। চায়ের খালি কাপটা নামিয়ে রাখলো খাটের তলায় উপুড় হয়ে। তারপর সোজা হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাবার জন্য টিনটা নিল হাতে তুলে। বললো, বিলটা এখনও পাশ হয়নি বলেই তোর এতো সাহস নাকি রে?

সেই যে সন্ধ্যায় দিদির ঘরে ডাক পড়েছিল। নীচে নেবে গিয়েছিল হাতের সিগারেট নিভিয়ে—তারপর এই প্রথম সিগারেটের কথা মনে হলো তার। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে শমিত উঠে এসে ওর সেই আরাম কেদারায় বসে বললো, সত্যি, তোর অসিতের জন্য মন খারাপ করে না।

করে।

তবে ঘুরে ঘুরে এখানে চলে আসিস কেন।

সেই জন্যই আসি।

সেই জন্যই আসিস!

হাঁ সেই জন্যই বিশেষ করে চলে আসতে হয়। কাছে থাকলে সম্পর্কটা বড্ড পানসে হয়ে ওঠে। দুদিন বাদে বিস্বাদ। তারপর শুধু বিবাদ। তার চাইতে চিঠির ভেতর, গানের ভেতর অনেক বেশী রোমান্স। এই যেমন ধরো, বলে বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে বসলো কমলো—ধরো মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম-ভাঙ্গা চোখ মেলে উঠে বসবো বিছানায়। পড়া চিঠি বালিশের তলা থেকে বের করে সবুজ বাতি জ্বালিয়ে পড়বো আবার। গান গাইবো বেহাগ সুরে "তুমিও একাকী, আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে— নিদ নাহি আঁখি পাতে।" গানের সঙ্গে বাদল নামবে নয়নে। একেবারে জমাট।

আর কাছে থাকলে? সকৌতুকে জানতে চাইলো শমিত।

কাছে? সব মাটি। যেই না গান ধরলাম, তুমিও একাকী আমিও একাকী—অমনি কোথা থেকে এসে চেয়ার টেনে বসলেন একেবারে মুখোমুখি হয়ে। রাতে ঘরে এসে সবুজ বাতিটি জ্বালতে যাবো, নাক ডাকার শব্দে গেল হাত কেঁপে।

একেবারে বাজে—একদম বাজে। ঠোঁট উল্টে বিরাগ প্রকাশ করলো কমলা।

এবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো শমিত।

বেশ লাগছে তার।

সন্ধ্যায় যে দম বন্ধ হয়ে আসবার যোগাড় হয়েছিল।

কমলা আপন মনে গুন গুন করে উঠলো, গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া— এস হে আমার বাদলের বধূ—আচ্ছা শমীমামা—

আহা, থামলি কেন! গেয়ে যা না।

ওপর থেকে কমলার গানের রেশ ভেসে এলে মিত্রা একবার ওপর দিকে তাকালো। শমিতের ঘর ওদের মাথার ওপরে। দেখা যায় না কিছুই। তবু একবার ছাদের দিকেই চোখটা ঘুরে এলো মিত্রার।

কমলা তার শমীমামার চা নিয়ে যাবার সময় দুটো কাপ দু হাতে নিয়ে মিত্রার ঘরেই প্রথম ঢুকেছিল। ওরটা ওর সামনে নামিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল ওপরে। চা খেতে মিত্রার একটুও ইচ্ছে করছিলো না। কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না বলেই কমলা যখন কাপ নামিয়ে রাখলে, তখন সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চা-টা খেয়েছিল সে। ভেবেছিল যদি মাথা ধরাটা কমে যায়। কিন্তু গেলো না। একটা বিশ্রী রকমের মাথা ধরা নিয়ে সারিডন খেয়ে শুয়ে পড়ছিল সে বিছানায়।

কমলার গানের, 'এসো হে আমার বাদলের বধূ' লাইনটাকে উড়িয়ে দিয়ে 'গগনে বাদল নয়নে বাদল জীবনে বাদল' লাইনটাকে নিয়ে বালিশে মুখ চেপে ফুলে ফুলে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলো মিত্রা। কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুখ যখন ফুলে উঠলো, মাথাটা ছিঁড়ে পড়ার সামিল হলো তখন উঠে আরো একটা সারিডন খেলো। তারপর ফের চাদর মুড়ি দিলো।

ঘুম যখন ভাঙ্গলো মিত্রার রাত তখন অনেক।

বাতি নিভে গেছে ঘরে ঘরে। শুধু রান্না-দালান হতে শব্দ আসছে জল ঢালার, ঘর ধোবার, ঝাটা চালাবার। গায়ের চাদর ফেলে খাট থেকে নেমে পড়লো মিত্রা। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। বুকটা বড়ই দুর্বল লাগছে। চার ঘণ্টা পর ছাড়া যেখানে সারিডন খাওয়া নিষেধ, সেখানে ও আধ ঘণ্টার ভেতর পর পর দুটো খেয়েছে বোধ হয় তাই ওরকম করছে। ফের খাটের উপর একটু সময় বসলো মিত্রা। ছেলেমেয়ের ঘরের দিক তাকালো। নিবিড়ে ঘুমুচ্ছে তারা। মেঝের উপর ঘুমুচ্ছে ডালিম। নাক ডাকার শব্দ উঠছে তার। মাঝের পরদাটা গুটানো। ওকে কি খাবার জন্য ডেকেছিল ডালিম? হাঁ, ডেকেছিল। শুধু ডাকেনি, রাগ করেছিল। রাতে মিত্রা প্রায়ই খায় না। তাই রাগ করে বলেছিল, 'রাত উপোষে হাতীও পাচার পড়ে!' পাচার শব্দটার অর্থ কি? ডালিম ভুল উচ্চারণ করেছে? উঠে দেখবে নাকি চলন্তিকা খানা। না, ইচ্ছে করছে না। কাল দেখবে।

কতক্ষণ বসে থাকলো মিত্রা খাটের উপর চুপচাপ। উঃ, কি অসহ্য মাথাই না ধরে ছিলো। মনে হচ্ছিল ঘাড়ের রগগুলো দপদপ্ করতে করতে পটপট করে ছিঁড়ে যাবে আর ও লীলাকান্তর মতো মরে ঢলে পড়বে মাটিতে। এখন কি আশ্চর্য আরামই না লাগছে। আরাম আর অসহ্য যন্ত্রণার পর আরাম, দুটোর ভেতর কি ভীষণ ব্যবধান! মাথা ধরার অষুধগুলো কিন্তু চমৎকার। খেলে কি সেরে গেল। মনে হচ্ছে যেন ক্ষিধে— পেয়েছে। তেষ্টাও পেয়েছে দারুণ। এই শরীরে রাতে ফ্রিজ খুলে খেলো একগ্লাস বরফ জল। ঠাণ্ডাজল হাতে নিয়ে মাথায় কপালে কানের পাশে দিলো। তারপর ফের গিয়ে বসলো বিছানায়। না, একটা নিচু সোফার সেট কিনতে হবে। এ-ঘরে রাখতে হবে। সব সময় খাটের উপর শুতে পড়তে ভালো লাগে না। ঘরে বসবার একটা ভালো ব্যবস্থা রাখতে হবে। অসুবিধে কি। এতো বড় ঘর। ঐ পাশটায়—ঘরের পূর্বদিকটায় ঐ তো বেশ জায়গাটা রয়েছে। ওখানটায়ও বসবার জায়গা করবে। বেশ সুন্দর দেখে একটা নিচু সোফার সেট কিনবে। লম্বা সোফাটা থাকবে

দেয়ালের সঙ্গে। ছোট দুটো দু'পাশে। মাঝের টেবিল হবে কাচের। সেটটা সিঙ্গাপুরী বেতের কিনবে? আচ্ছা, সে তখন কিনবার সময় দেখা যাবে।....খাওয়া যায় কি? দুধ আছে গরম করে খাওয়া যায়। বিস্কিট আছে তাও খাওয়া যায়। আছে চা চিনি—চায়ের সরঞ্জাম। চা তৈরী করা যায়। কিন্তু নড়তেও ইচ্ছে করলো না মিত্রার। চোখ মুখটা এতো ভারী ভারী লাগছে কেন। আয়নার কাছে গিয়ে মুখটা দেখতে চেষ্টা করলো। ছেলে মেয়ের ঘরের অস্পষ্ট সবুজ আলোতে মুখ দেখতে পেলো না। অসময়ে ঘুমিয়েছে বলে হয়তো ওরকম ভার ভার লাগছে চোখের পাতা। না। মনে পড়েছে। কেঁদেছে বলে। কমলার গানের সময় সে কেঁদেছিল। সন্ধ্যার ঘটনাটা ফের মনে পড়ে গেলো মিত্রার। সঙ্গে সঙ্গে পালের শিরা দুটো আবার দপ্‌দপ করা শুরু করে দিতে চাইলো। দু-আঙ্গুলে দুটো শিরা চেপে ধরলো মিত্রা। কুমার মুন্নীর গায় পাটা তুলে দিয়েছে। উঠে গিয়ে পা ঠিক করে, লেপ টেনে দিল ওদের গায়। দু'জনের চুলগুলো হাত আঁচড়ে মুখের উপর থেকে কানের পাশে দিলো ঠেলে। তারপর ওদের গালে গাল লাগিয়ে আধশোয়া হয়ে রইলো সবুজ আলোর অস্পষ্টতার ভেতর ছবির মতো।

টুকটুক করে অতি সন্তর্পণে ঘরের কড়া নড়ে উঠলো।

কে? চমকে ছেলেমেয়ের গাল থেকে গাল তুললো মিত্রা।

আমি।

কে রাণী! দরজা খুলে দিতে দিতে বললো মিত্রা।

ঘরে এসে ঢুকলো রাণী। বললো, অতো চমকে উঠলে কেন?

কোথায় চমকে উঠলাম।

উঠেছিলে। বাতি জ্বালি?

দাঁড়াও বাচ্চাদের মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

মিত্রা দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বেলে দিলো। ঘর ভরে উঠলো আলোয়।

মিত্রা বসলো খাটে। রাণী মোড়ায়। বসে মিত্রা জিজ্ঞাসা করলো, তোমার ব্যাপার কি? দাম্পত্য কলহ?

আবার কি।

চুপ করে রইলো দু'জনেই।

কিছুক্ষণ সময় গেলে মিত্রা জিজ্ঞাসা করলো, কি নিয়ে?

সে পরে হবে। মাথা ধরা সেরেছে তোমার?

হ্যাঁ।

রাতে খেয়েছ?

না। খাওয়া হয়নি। কিন্তু এখন ক্ষিধে পেয়েছে। তোমাদের কলহটা কখন লেগেছিল? খাওয়ার আগে না পরে?

হেসে রাণী বললো, আগে। সেই সন্ধ্যের সময়।

ও, তাই তোমার ঘর অন্ধকার ছিল। তবে খাওয়া তো তোমারও হয়নি?

না। ক্ষিধে পেয়েছে আমারও। কি আছে তোমার ঘরে?

চা বিস্কিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চমৎকার! বলে অন্যমনা রাণী বসে রইল তেমনি।

মিত্রা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তবে ডালিমকে ডাকি।

ততক্ষণে উঠে পড়েছে রাণীও। বললো, না তোমার ডালিমকে ডেকে কাজ নেই। উঠে মোটা শরীর নিয়ে ঘুরবে আর ঘোৎ ঘোৎ করবে। আমি চা তৈরী করছি।

তবে আমি করছি। আমার ঘরে আতিথিয়তা তো করবো আমি।

তা করো। চা বিস্কিট আমাকে বেশী করে দিও।

মিত্রা আর আপত্তি করলে না। তার চাইতে কাজের বেশী রাণী।

তবে আমি হাত মুখটা ধুয়ে আসছি। এতো ঘুমিয়েছি। সমস্ত রাত জেগে গল্প করা যাবে।

স্নানের ঘর থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে, চিরুণী হাতে এসে বসলো মিত্রা। আজ মাথায় চিরুণী ছোঁয়ানো হয়নি। তাতে চাদর মুড়ে শুয়ে মাথাটা হয়ে আছে কাকের বাসা। জট ভাঙ্গতে লাগলো সে চুলের।

রাণী চায়ের জল হিটারে চাপিয়ে ভিজে হাত মুছবার জন্য তোয়ালের অনুসন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বললো, তোমার সাজানোর জ্বালায় আর পারি নে। কোথায় ঢোকাও তোয়ালে গামছা টামছাগুলোকে।

এই যে দিচ্ছি। হাতের চিরুণী রেখে উঠতে যাচ্ছিল মিত্রা।

রাণী বললো, দরকার নেই। উঠো না। আমার হাত মোছা হয়ে গেছে। আমি আঁচলে মুছে নিয়েছি।

আবার চিরুণী নিয়ে বসে মিত্রা বললো, এবার বলো। কি নিয়ে লাগলো আজ?

চা নিয়ে এসে বসে তারপর বলবো।

জল ফুটে না ওঠা অবধি মোড়ার ওপর চুপ করে বসে রইলো রাণী।

মিত্রা চুল বাধা শেষ করলো।

তারপর পট ভর্তি চা, টিন ভর্তি বিস্কিট, মাখনের টিন আর পেয়ালা সাজানো ট্রে এনে নামালো রাণী মোড়ার উপর।

মিত্রা একবার তাকিয়ে দেখে বললো, জুতসই হচ্ছে না।

কেন?

আমি খাটের উপর। তুমি দাঁড়িয়ে। মোড়ার উপর চা—অত দূরে দূরে কি কথা জমে।

বসবো তো।

তা তো বসবে কিন্তু কোথায়। ঘরে একটা বসবার ব্যবস্থা করতেই হবে। মনের ভেতর খেলে গেল কিছু। আগের ঘর সাজাবার চিন্তাটা। বললো, দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।

রাণী দেখতে লাগলো আর মিত্রা করে চললো।

একটা কম্বল বিছালো মেঝেতে। তার উপর ধোয়া চাদর পাতল একটা। মোড়ার উপর থেকে ট্রে টা নামিয়ে এনে রাখলো মাঝখানে। তারপর রাণীকে হাত দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে বললো— বসুন।

বাঃ, চমৎকার হলো তো! বলে বসে পড়লো রাণী ফরাশে।

বললো, এতোও মাথায় আসে তোমার।

মিত্রা বললো, আচ্ছা, দেখো একটু বদল চেহারা দিয়ে নিলে সব কিছুই কেমন নতুন ভাবে ভালো লাগে না? রোজের ঘর। নিত্য দিনের চা। যেখানে বসে কত সময় খাই, সেখানে বসেই খাচ্ছি। শুধু সময়ের নতুনত্বটুকুর জন্য কেমন সব অন্যরকম লাগছে!

সত্যি ভারি মজা লাগছে। তোমার ঘরটাও বড্ড সুন্দর জায়গায়। একেবারে কোণঘেঁষা। নইলে ঘরে আলো দেখলে, কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলেই অমনি এসে হাজির হতো কেউ না কেউ। আর জানতে চাইতো কি হয়েছে।

চায়ে চুমুক আর বিস্কিটে দাঁত বসিয়ে মিত্রা ত্রুটি ঘটে যাবার মতো করে বললো, ও হো, আমার আতিথিয়তাতে তো বাদ পড়ে গেল। এক মুঠো বিস্কিট প্লেটে রেখে ঠেলে দিল প্লেটটা সে রাণীর দিকে।

হেসে উঠলো দু'জনে।

মিত্রা বললো, তারপর বলো।

রাণী বললো, তারপরটা আর কি। তার আগেও যা পরও তা। আমাদের ঝগড়াও যেমন রোজের ব্যাপার। তোমার শোনাটাও তেমনি রোজের। এ দুটোতে নতুন নেই কিছু। নতুনের ভেতর হলো, আজকের কারণটা আমার বোনের একখানা চিঠি। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো রাণী।

ঘরের সামান্য হাল্কা হয়ে আসা ভাবটা ফের পর্যবসিত হলো বিষণ্ণতায়। বোনের চিঠিতে কি ছিল? জিজ্ঞাসা করলো মিত্রা।

দুঃখের কথা ছিল। যে সমস্ত দুঃখের কথা শুনলে সুখী মানুষের মুখ ভার হয়ে ওঠে সেই সব কথা ছিল। অভাবের কথা, অনটনের কথা, পড়া বন্ধ থাকার কথা। লিখেছিল দিদি, তোর কাছে আর অন্যদিককার অবস্থার কথা কি লিখব। ওসব তো তুই জানিসই। আর সে সব কথা লিখবার জন্যও আমার এ চিঠি নয়। খাওয়ার না থাকে এক বেলা খাবো—রাণী থামলো। বন্ধ হয়ে আসা গলাটা পরিষ্কার করলো বারকয় ঢোক গিলে গিলে। দু চোখ ভরে আসা জল ফেরত পাঠালো ভেতরে।

মিত্রা দু'জনের কাপে চা ঢালতে লাগলো চোখ নিচু করে।

রাণী বললো, তারপর যে কথা নিয়ে লাগলো সে কথাটা হলো, সে লিখেছিল, দুই ভাই বোনের পড়া বন্ধ করে দিতে হচ্ছে দিদি। পরীক্ষা দিতে দেয় নি। ক্লাশ থেকে বের করে দিয়েছে। দিয়েছে নাম কেটে। ঘরে বসে আছি। বাবা বলছেন, তাই থাকবে। তুই ভাই আমাদের দু'ভাই বোনের পড়ার খরচটা চালিয়ে দেনা—বেশীদিন নয়। বছরখানেক। তারপর স্কুল ফাইনেলটা একবার আমি পাশ করে বেরুতে পারলে, টিউশনি করে যা পাবো তাতেই ভাইবোনের পড়া চালিয়ে নিতে পারবো। আমি তোর দিকে চেয়ে রইলাম। তোর তো অনেক টাকা। এমন বোকা মেয়ে। আমার যদি অনেক টাকা তবে তোদের এত দুঃখ হয়!

তারপর।

তারপর সে চিঠি আর সাহস করে কিছুতেই ওকে দেখাতে পারিনে। কিন্তু না দেখালেই বা টাকা পাব কোথায়? ওকেই বা লিখব কি। দিদির মুখ চেয়ে বসে আছে, কিন্তু দিদি যার মুখের দিকে চাইবে; চিঠি পড়ে মুখের চেহারাখানা তাঁর যা হয়ে উঠলো, দেখে মনে হলো আর দরকার নেই। মানে মানে এবার পালাই। যাচ্ছিলামও চলে। কিন্তু হাতের চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন, যাচ্ছো যে। দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, না যাচ্ছি না। বিরক্তিতে মুখ চোখের চেহারা যাচ্ছেতাই করে তুলে বললেন, তাই ক'দিন ধরে মুখের চেহারা ওরকম। কিন্তু আমার আর ভালো লাগে না। একটা নয়তো আরেকটা লেগেই রয়েছে। উঠে ঘরের মধ্যে হাঁটতে শুরু করে দিলেন রাগের চোটে। ইচ্ছে হলো বলি, অভাবের পরিবার। লেগেও থাকে অনটন একটা নয়তো আর একটা। কিন্তু তোমার কাছে কি পায়। শুধু কানে শোনার এতো তাক্তত। কিন্তু কথা বলবো কি ভাই। গলাটা ভেঙ্গে চুরে এমন একশা হয়ে থাকে যে, কথা বেরুতে চায় না। দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘুরে ঘুরে কত কি যে বলে চললেন তার ঠিক নেই। বাপের বাড়ী, বাপের বাড়ী করে ঘরের শান্তি নষ্ট করতে নাকি আমার জুড়ি নেই। বিয়ের পর থেকে আমি নাকি কেবল এই করে চলেছি। যে মেয়েরা বিয়ের পর শ্বশুর ঘরে এসে কেবল এমনি করে বাপের বাড়ীর টান টানে তাদের কপালে নাকি সুখ হয় না। জয়ন্তীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বললেন, এই তো বউদি রয়েছেন, তারও একটা বাপের বাড়ী বলে পদার্থ আছে। কিন্তু সে কথা আমরা তো ভুলেই গেছিই। বউদির নিজেরও বোধ হয় মনে থাকে না। বউদির বাবা দাদারা যে দুঃসময় পার করলেন এর ভেতর আমি হলে নাকি পাগল হয়ে থাকতাম! ওসব বালাই নেই। তাই সুখে আছেন জয়ন্তী বৌদি।

মিত্রা বললো, তা ঠিক। বালাই যত কম, তত সুখ। বুদ্ধির বোধের বিবেকের মনের কোন বালাই নেই কুকুর বেড়ালের। তাদের সুখ নেয় কে।

সন্তুষ্ট হয়ে উঠলো রাণী। ঠিক বলেছো। তারপর দুচোখ বড় করে তুলে বললো, তুমি তো দেখনি। আমাদের তো একসঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো—দুই বউ একই দিনে এখানে এসেছিলাম। আমি দেখেছি। অদ্ভুত মেয়ে বাবা! বাড়ীর কথা মনে করে ভেতরটা যেন কেবল আমার মুচড়ে মুচড়ে উঠতো। শাশুড়ীকে মা বলে ডাকতে গেলে যেতো মার কথা মনে পড়ে। বাবা বলে গিয়ে দাঁড়াতে সঙ্কোচে মরে যেতাম শ্বশুরের কাছে। উনি যখন দাদা বলে ডাকতেন গলা বুজে আসতো কান্নায় দাদা আর বোনদের কথা মনে করে। আর জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম অবাক হয়ে। বাবা বলে গিয়ে কাছে দাঁড়াচ্ছে শ্বশুরের । মা মা করছে কারণে অকারণে শাশুড়ীকে। এর যত্ন করছে। ওর সেবা করছে। তার ব্যথায় মালিশ লাগাচ্ছে। ছোটদের স্নান করাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে। বুকে করে নিয়ে ঘুরছে। বড়দের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকছে বেরুলে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত—ধন্য ধন্য পড়ে যেতো বউ-এর। লজ্জায় মুখ লুকোতাম আমি। ও বাপের বাড়ী যেতে ভালোবাসে না। ভয়ে নাম করতাম না আমিও। কিন্তু ওর বাবা জান তো বেশ বড় লোক। আগে আগে প্রায় রোজই মা আর বাবা মেয়েকে দেখতে আসতেন। ঐ যে তিনি বললেন না, জয়ন্তীদের পরিবারে দুর্দিন গেছে অনেক—সে দুর্দিন কিন্তু টাকার নয়। তবু গিয়ে দাঁড়ায়নি তাদের পাশে। জয়ন্তী আমাকে একদিন বলেছিল, আমার নাকি বাপের বাড়ী একটা রোগ।

বললেনা কেন, থাকলেও ওর ভয় নেই। রোগটা ছোঁয়াচে নয়। ওকে ধরবে না।

উঃ কি খুশিই না রাণী হলো! চাপা শব্দে কিটকিট করে হেসে উঠলো সে। প্রথম দিকে শুধু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কথা বলছিল, এখন মন কিছুটা পাতলা হয়ে বিস্কিট মুখে দিলো। বললো, ঠিক বলবো এর পর কোনদিন বললে।

পারবে না। পেয়ালায় ফের গরম চা ঢালতে ঢালতে বললো মিত্রা।

ইস্! কেন পারবো না। আমাকে কি ভীতু ভাবো নাকি?

আচ্ছা দেখি আজ শেষ পর্যন্ত কি সাহসের পরিচয় দিয়ে আমার ঘরে এসেছো।

বীরের মতো বুকটান করে রাণী বললো, দিয়েছি—

কি দিয়েছ?

জয়ন্তীর দৃষ্টান্তটাকে তো ঘেন্নায় ঠেলে ফেলে দিয়েছি-ই—

কি বলে?

অপ্রস্তুত ভাবে রাণী বললো, মুখে কিছু বলে নয়।

তবে? ঠোঁটে?

মিত্রার 'তবে' ঠেকিয়ে ফেলেছিল রাণীকে। মিত্রাই আবার ভাষা যুগিয়ে দিল রাণীর হাতের কাছে। বললো, হাঁগো ঠোঁটে।

ঠোঁটের কথা তোমার কর্ত্তা বোঝেন বলে তোমার মনে হয়? যাক্ মুখে কি বললে সেটাই শুনি।

মুখে—কি বললাম? বললাম, বাঃ; তোমরা চাইবে তোমাদের মা বাবা ভাই বোনদের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদবে। আমরা না হয় উল্টে নাই চাইলাম আমাদের বাবা মা ভাই বোনের জন্য তোমাদেরও কাঁদুক। কিন্তু আমাদের কাঁদতে পারবে না কেন?

বেশ তো বলেছো।

বেশ বলেছি? জবাবখানাও বেশ দিলেন। মুখ বাঁকিয়ে বললেন, না তা কেন। তোমার বাপের বাড়ীতে যতদিন মাংস পোলাউ এর হাড়ি উনুনে না চাপছে—ততদিন আমাদের বাড়ীতেও ওসবের হাঁড়ি চড়া বন্ধ করে দিতে হবে। তাই না? বিদ্যাসাগরী মন রাখো। আমার দ্বারা কিছু হবে না— আর দাঁড়াইনি। আচ্ছা, বলতো 'দেবো না' এ কথাটা আবার বলার কি দরকার ছিল।

ট্রের উপর পেয়ালা পিরিচ তুলতে তুলতে মিত্রা বললো— ঈশ্বরচন্দ্রের মতো অত বড়ো হৃদয় স্বয়ং ঈশ্বরও বড় হামেশাই তৈরী করে উঠতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে তাঁর হাতে স্বার্থপর মানুষই তৈরী হচ্ছে তাও কিছুতেই নয়। পথের লোকের দুঃখে না কাঁদুক, ঘরের লোকের দুঃখে কাঁদে; পরের জন্য না কাঁদুক, আত্মীয়ের জন্য কাঁদে— এমন সৃষ্টি তার আছে। নইলে পৃথিবীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কিসের ওপর।

ভেতর একটা ব্যাঙ্গের ঢেউ খেলে যেতে লাগল মিত্রার। বোকা, বোকা। কি বোকাই না এই পুরুষগুলো! বেশী চাইতে গিয়ে কেবল ফাঁকে পড়ছে। লীলাকান্তর মৃত্যু সময়ে ও দেখেছে সব কান্না কেঁদেছে সবাই ওকে নিয়ে—ওর দিকে তাকিয়ে—আহা, ঐ কচি বউ। লীলাকান্তর কথা বলতে কাউকে শোনেনি। নিজের মৃত্যু দিয়ে আরেক জনকে জীবন্মৃত করে রাখতে গিয়ে তার পাওয়া দাঁড়ায় গিয়ে এই। আর নারীর ভালোবাসা একা ভোগ করতে গিয়ে সমস্ত জীবন কাটায় পুরুষ হৃদয়শূন্য নারী নিয়ে। রাণীর মতো মেয়েদের ফিরে আসতে হয় স্বামীর কাছ থেকে কাঁদতে কাঁদতে। জয়ন্তীর মতো মেয়েদের নিয়ে তাদের সুখের অন্ত থাকে না। রাণী জয়ন্তী হলে আজ তার স্বামীও সুখী— হতো। হায় ভগবান!

অনেকক্ষণ সময় চুপচাপ কাটলো।

তারপর এক সময় মিত্রা জানতে চাইলো, আমি কি করে এ বাড়ীতে এলাম আমি জানি। কিন্তু তুমি কি করে এ বাড়ীতে এলে শুনি?

সে গল্প তোমায় বলিনি?

গল্প?

গল্প-ই। তবে বড় নয়। ছোট্ট একটু গল্প আছে বৈকী। নইলে আমার মতো গরীবের মেয়েকে কি আর শুধু ঘটকের সাধ্য ছিল এ বাড়ীতে বউ করে দেয়।

কৌতূহল বোধ করলো মিত্রা। বললো, শুনি।

রাণী বললো—আমার বাবা ছিলেন রেঞ্জার। এটা বন বিভাগের চাকরী। এ চাকরী করে গরিব বড় কেউ থাকে না। আমার বাবা ঘুষ ছুঁতেন না। তাই অভাব আমাদের চিরকালের। এখন পেনসন নেওয়ার পর তো কথাই নেই। এটা বদলির চাকরী। বাবা যখন যেখানে যেতেন আমরা সঙ্গে যেতাম। বাবা সেবার বদলি হলেন দার্জিলিং থেকেও আড়াই হাজার মাইল উঁচুতে সনডক্‌ফুতে— ঠিক সেখানেই নয়। তারই একটা পাহাড়িগ্রামে। সেখানে কেবল পাহাড়িদের বাস। শীতের দিনে গ্লাসের জল জমে যায়। গ্রামে ঢুকতে বিশ ত্রিশ মাইল পথ পার হতে হয় ঘোড়ায়। বাবা রেখে গেলেন সবাইকে মামা বাড়ী। বেশ ছিলাম। কি যে হলো, একবার বাবা ছুটিতে এলে জেদ ধরলাম বাবার সঙ্গে যাবো। দার্জিলিং-এর সূর্যোদয় দেখবো। সনডক্‌ফুর সূর্যোদয় দেখবো। মা তো রেগেই অস্থির। শীতের কথা ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। বাবা তো আমাকে নিয়ে বসে থাকবেন না—ঐ পাহাড়ি গ্রামে একা থাকবে কি করে। একা কেন, দাদাও চলুক না। টাকা? সে কথা শোনে কে।

—স্কুল? কিছু হবে না কামাই হলে। জেদ আর ছাড়ি নে—

তোমার এতো জেদ আছে নাকি।

আমার নয়। এটা আমার অদৃষ্টের জেদ। সেখানে না গেলে আমার যে এ-বাড়ীতে আসা হয় না। কিন্তু আমাকে এ বাড়ীর মেজ বউ যে হতেই হবে।

গেলাম শেষ পর্যন্ত দুই ভাই বোন। সেই পাহাড়ে, পাহাড়িদের মধ্যে— কাঠের বাড়ীতে, ঠাণ্ডায়, অন্ধকার করা কুয়াসায়, নির্জনতায় কি যে আনন্দে ক'টা দিন কাটলো—আজও যদি সেখানে আমায় কেউ রেখে আসতো আর কিছু চাইতাম না।...একদিন সন্ধ্যায় দুই ভাই বোন নেপালী ভাষা শিখছি বাবার নেপালী আর্দালির কাছে— তিনটি ভদ্রলোক এসে উপস্থিত।

সত্যি গল্প যে!

ঐ কেবল এইটুকু। ভদ্রলোক তিনটি দার্জিলিং থেকে সনডক্‌ফুতে এসেছিলেন সূর্যোদয় দেখতে। তারপর বেড়িয়েছিল ঘোড়ায় উঠে গ্রাম দেখতে। পাহাড়ি পথ প্রদর্শক এনে তাদের হাজির করেছে রেঞ্জার সাহেবের বাড়ী। এই তিন ভদ্রলোকের ভেতর যিনি বাবার নাম ঠিকানা নিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েই আমি এ বাড়ীর মেজ বউ। মা ভাবলেন, মেয়ে তার স্বয়ং উমা। হিমালয় ছাড়া শুভদৃষ্টি হতে পারে না বলেই এমন জেদে পেয়ে বসেছিল তার মেয়েকে।

মিত্রা বললো, শেষটা জমা বোধ হয় বড় কঠিন। বই পড়তে গিয়েও দেখি বাস্তবেও দেখছি, গল্পের শুরুটা জমে মন্দ নয় কিন্তু তারপরই আসতে থাকে যেন জলো হয়ে।

ঘড়িতে মিষ্টি সুরের তিনটে শব্দ হলো।

রাত তিনটে।

উঠে পড়লো দু'জনে। রাণী কম্বল চাদর তুলতে ভাঁজ করতে লাগলো।

মিত্রা ওর সন্ধ্যায় অসমাপ্ত কাজ গুছিয়ে রাখতে লাগলো। কিছুই নয়। ছেলে মেয়ের গরম জামা কাপড় মুজো সকালে যেগুলো পরে ওরা ঘর থেকে বেরুবে সেগুলো গুছিয়ে রাখা। ডালিমের কোন বাছ বিচার নেই পোষাকের। যা খুশি তাই গায় চাপায় সে। মিত্রা পছন্দ করে না। কোন রং-এর মুজো পরবে দেখতে দেখতে মিত্রা বললো— শোন রাণী—

রাণী তাকালো মিত্রার দিকে।

তোমার ছোট ভাই বোন দুটির লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ আমার।

সে কি! হাতের কম্বল খসে পড়লো রাণীর।

কি হলো?

না না— ছিঃ ছিঃ তুমি দেবে কেন!

কেন, আমি দিলে তোমার অসম্মান হবে?

সঙ্কোচের সঙ্গে রাণী বললো, ছিঃ এ কি বলছো। অসম্মান হতে যাবে কেন।

তবে?

রাণী ওর ভালোমানুষ মুখটা কাচুমাচু করে দাড়িয়ে রইলো।

মিত্রা বললো—এতো কিছু ভাববার নেই এতে রাণী। ভাববার থাকতো যদি আমাকেও তোমার মতো কারু কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হতো। কারু কাছে চাইতে হচ্ছে না অনুমতি নিতে হচ্ছে না আমাকে, তবে আর কি।

না না মিত্রা — এ হয় না। তুমি বুঝতে পারছো না। জানতে পারলে—

কেউ জানবে না। আর জানতে পারলেই বা কি? কণ্ঠে রোষ প্রকাশ পেলো মিত্রার। আমাকে আটকাবে কে? দেখ রাণী, দিনগুলোকে তো সংস্কারের হাড়িকাঠে বলি দিয়েই প্রতিদিন বিছানা থেকে নামি। এ বলে লাভ নেই। সইতেই হবে। কিন্তু অসহ্য মনে হয় রাণী যখন দেখি, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তিগুলোর পেছনেও হৃদয় নেই, রয়েছে ঐ সংস্কার। স্ত্রীর ভাই-বোন তাই তোমার এমন দুঃখের মুহূর্তেও নির্দয়তা ছাড়া স্ত্রীকে হাত বাড়িয়ে আর কিছুই দেওয়ার পেলেন না তোমার স্বামী। আর যেহেতু আমার ভাই-বোন নয়—তোমার, সে হেতু মৌখিক সহানুভূতির বাইরে আর কিছু যে আমার করার থাকতে পারে—ভাবতেও পারছো না তুমি। শুনে দাঁড়িয়ে রয়েছো স্তম্ভিত হয়ে। কিন্তু আমি কি দেখছি জানো, কারুর কেউ নয়। শুধু দুটো কচিকচি উজ্বল হাসি মুখ। আজকের দিনটা আমার এই মাত্র সার্থক হলো রাণী।

টসটস করে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো রাণীর চোখ দিয়ে।

ওরা দু'জন যখন শুতে গেল তখন রাত বড় আর বাকী নেই।

মিত্রার ক্যামেলরাগটা গায় মুড়ে গুটিশুটি হয়ে সুখে চোখ বজলো রাণী। বোজা চোখেই বললো, তোমার সব সুন্দর মিত্রা। আমাদের এই মস্ত মস্ত মোটা মোটা সব লেপ। তোমার কি সুন্দর পাতলা কম্বলটা— দেখ, আবার নিয়ে যাও বলে বোস না।

মিত্রা হেসে বললো, জানো, পৃথিবীতে যে সবার প্রথম 'আমার' শব্দটা উচ্চারণ করেছিল সেই নাকি সমাজের সব চাইতে বড় অপরাধী।

বেশ বলেছ।

আমি বেশ বলিনি। বলেছেন মনীষী গর্কি।

তা কথাটা যখন শুধু বলাই নয় সেই মতো কাজ শুরু হয়ে গেছে সমাজে তখন তুমি আর আমায় নিয়ে যাও বলোনা ভাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো রাণী। মনটা হাল্‌কা হয়ে গেছে তার। সন্ধ্যাবেলা হয়তো চাদর মুড়ে শুয়েই ছিল। ঘুমোতে পারেনি দুঃখে-দুশ্চিন্তায়। কিন্তু মিত্রা অযুধ খেয়ে সন্ধ্যারাত থেকে একটানা ঘুমিয়েছে প্রায় একটা পর্য্যন্ত। আর তার ঘুম আসবে না। কানের কাছে রাণীর গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ উঠতে পড়তে লাগল। বুকের উপর হাত আড় করে রেখে শুয়ে রইল মিত্রা। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢুকতে লাগল ঘরে।

জানালাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। বেশ ঠাণ্ডা আসছে। উঠে জানালা বন্ধ করে দিলো। ফের আর একবার দেখলো ছেলেমেয়ের গায়ের লেপ ঠিক আছে কিনা। তারপর এসে শুয়ে পড়লো আবার। হঠাৎ ভিজে জায়গায় হাত পরে কনকনিয়ে উঠলো মিত্রার হাতটা। এখানে ভিজে জিনিষ কি এলো? ও, রাণীর শাড়ীর আঁচলটা। চোখের জলে ভিজে। না, স্বামীর অর্থ আছে, তাই স্ত্রীর অভাব থাকতে পারে না— এ নিভাজ মিথ্যে। স্বামীর ইচ্ছা আর প্রয়োজনের সঙ্গে স্ত্রী ইচ্ছা আর প্রয়োজনের মিল না হলে, স্বামীর যতই অর্থ থাক, স্ত্রীকে অভাববোধ করতে হয়। টাকার জন্য কাঁদতে হয় এমনি করে। একজনেরটাতে আর একজনের সমান অধিকার—এ হয় না। স্বামী-স্ত্রীর ভেতরও হয় না। সন্তান সংসার দু'জনার এক। তাই গরমিল বড় হয় না। হলে স্বামীর টাকা যে তার নয়, এ সত্য স্ত্রীকে বুঝতে হয়।

পরের দিন আরামকেদারায় শুয়ে বই পড়ছিল শমিত। গায়ের ওপর টানা ছিল আগের দিন সন্ধ্যার সেই শালটা। শীতের উত্তরের বাতাসে অবিন্যস্ত চুলের দু একগাছা উড়ছিল এদিক ওদিক।

ওর এই ঘরটার মতো নিঃসাড় নিঃশব্দ স্থান এ বাড়ীতে আর দ্বিতীয় নেই। বাড়ীর পাঁচ মেশালো হট্টগোলের সামান্যও এসে এখানকার শান্তিভঙ্গ করতে পারে না। আসবাব-পত্রে রং-এ নীরবতায় আলস্যমাখা এ ঘর উন্মুক্ত

আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একা নিঃসঙ্গ। ধারে পাশের কোন বাড়ী বা গাছের একটা ছায়া পর্যন্ত পারেনি এ ঘরটার ওপর পড়ে তার একাকীত্বে বিঘ্ন ঘটাতে।

এখন বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে বাজে। সকাল থেকে একটানা বই পড়েছে শমিত। শেষ অধ্যায়ে এসে দেখলো কিছুই মনে নেই। এতক্ষণ সে কি পড়েছে তবে! বইটা বন্ধ করে রেখে দিল নামিয়ে।

হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে দেখলো, সকালবেলাকার খালি ছাইদানটায় আর একটুকরো সিগারেট ফেলবারও জায়গা নেই। তারই ভেতর হাতের টুকরোটা কোনমতে ঠেসে দিল শমিত। সমস্তদিন কত সিগারেট খেয়েছে সে? নতুন কৌটাটা খুলেছিল কখন? দুপুরের সময়। ক'টা রয়েছে আর ওতে। কৌটোর মুখটা খুললো সে। ঝকঝকে টিনের ভেতর পাতলা শরীর নিয়ে হেলে রয়েছে মাত্র একটি সিগারেট। তাকিয়ে রইলো সেই সিগারেটটার দিকে। একটিন সিগারেট ফুরিয়েছে একবেলায় সেই বিস্ময়ে নয়। ও দেখতে লাগলো হেলে থাকা সিগারেটটাকে। যেন তন্মনা নারী তির্যক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একা। পরণে তার সাদা শাড়ী।

কমলার মুখ উঁকি দিল ঘরের মধ্যে।

শমিত পিঠের বালিস সরিয়ে ওঠে বললো, আয়।

কমলা এসে ঢুকলো ঘরে।

শমিত বললো, বোস। তোর কথাই ভাবছিলাম।

কমলা নীচে কার্পেটের ওপর বসে পড়ে বললো—এতো মিথ্যে কথাও বলতে পারো তুমি শমীমামা।

মিথ্যে কথা কেন?

তুমি বসে বসে আমার কথা ভাবছিলে?

কার কথা ভাবছিলাম?

তা জানিনে। সে যদি জানতাম তবে তো সমস্যাই মিটে যেতো। কিন্তু আমি বড় ঘাবড়ে গেছি। তোমার ঘরে এমন অচিন্তনীয় আপ্যায়ন মিলছে কেন দুদিন ধরে ভেবে পাচ্ছিনে। এ সৌভাগ্য তো বড়ো ঘটে না। চা এনেছিস— যা রেখে যা। বই চাই? ঐ যে। আয়! বোস। তোর কথাই ভাবছিলাম— ব্যাপার কি?

কমলার কথা শুনতে শুনতে কৌটোর সিগারেটটা তুলে ঠোটে চেপে ধরতে ঠোটটা একটু কাঁপলো শমিতের। মনে মনে হাসলো সে।

বেলা তিনটার পড়ন্ত রোদের টুকরোটার ওপর পায়ের পাতা দুটো রেখে কমলা বললো, আচ্ছা, শমীমামা আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম—

হাতের দেশলাই রেখে সিগারেটে একটা টান দিয়ে শমিত বললো, বুঝেছি। শমীমামার ঘরে এমন সমাদর সচরাচর মেলেনা আর কমলারই যেন তার ঘরে এতো ঘনঘন সাক্ষাৎ মিলে। মা জেঠিমাদের সঙ্গে তেঁতুল কাটার আসরে বসে জেঠামো করা বাদ দিয়ে যখন এখানে এসে বসেছিস তখনই বুঝেছি।

এমনি সময় গম্ভীর মুখে ঘরে এসে ঢুকলেন শৈলনন্দিনী।

কালকের সন্ধ্যার পর দিদির সঙ্গে শমিতের এই প্রথম দেখা।

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল শমিত। দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মুখ গম্ভীর করলো।

ভ্রু কোচকালেন শৈলনন্দিনী। আমাকে দেখে মুখ কালো করে তুললেন যে।

হাসলে যদি তুমি রাগ করো তাই।

দিদি আরো গম্ভীর হলেন।

কমলা হাসলো।

শমিত বললো—শশীকান্ত মুখুজ্জের স্ত্রী তুমি—

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন শৈলনন্দিনী। ওঃ, শশীকান্ত মুখুজ্জের স্ত্রী হয়ে কত সুখ পেয়েছি—এখন শমিত মৈত্রের বোন হয়ে আরো কত সুখ পাবো। আমি বলে—অন্য কেউ হলে বিবাগী হয়ে যেতো।

কথাটা মন্দ নয়! আয় বেরিয়ে পড়ি কমলা। শুধু হাতে থাকবে একটা দোতারা। আর কণ্ঠে গান।

এক্ষুনি।

দিদি বললেন, নেও ফাজলামো রাখো। দেখো, এ ছবি দুটো দেখো তো।

কার? শমিত হাত বাড়িয়ে ছবি নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলো।

কমলা ছবির উপর উপুড় হলো।

দিদি বললেন, এ মেয়ে দুটির মা আমায় অনেকদিন ধরেই ধরেছেন। দেখো, তোমার পছন্দ হয় কিনা। জয়ার ভয় এতোই বেশী ঢুকেছে ভেতরে যে শৈলনন্দিনী আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। এবার তিনি শমিতের বিয়ে দেবেনই দেবেন।

শমিত বললো—দু'জন?

এরা দু বোন। যমজ। তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে চাও। তাই সে রকম সম্বন্ধই এনেছি। মেয়ে দুটি আই. এ পাশ করে বি. এ পড়ছে। গান জানে। দেখতেও সুন্দর। তোমার যাকে পছন্দ হবে তার সঙ্গেই কথা পাকা করবো।

ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখার ভান করলো শমিত। তারপর বললো— এ দুটো ছবি একজনের নয়?

না। বললাম যে যমজ বোন ওরা।

কি আশ্চর্য্য—একেবারে বোঝাই যায় না যে এ ছবি একজনের নয়। না কমলা?

কমলা বললো, সত্যি।

এখন কি করি বলতো? যমজ! চেহারা এক রকম। গুনাগুন সব এক এ অবস্থায় যাকে অমনোনীত করবো, বিয়ের রাতে সেই অপরিচিতা অমনোনীতা যদি এসে কৈফিয়ৎ চায়—তাকে অমনোনয়নে অসম্মানিত করলাম আমি কেন— কি উত্তর দেবো?

কমলা আঁচল কোমরে গুজতে গুজতে বললো—এসো 'টস' করি।

ক্রুদ্ধা দিদি ফটো দুটো টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বড় বড় পা ফেলে।

কমলা বললো, জেঠাইমা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বিয়েটা করে ফেললেই তো পারো বাপু ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।

মন্দ বলিসনি। ঐ ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে ফেলবার জন্যই বিয়েটা করে ফেলি।

তাই করে ফেলো বাপু। আমরাও দেখে চোখ সার্থক করি তোমার কবিতা-কল্পনা-লতাকে। তবে আমি বিয়ের পর দিনই হাওয়া হবো এখান থেকে সে নিশ্চয়।

কেন!

ও বাবা সে বড় দুর্ভোগ গো। কেবল টেনে টেনে বসাবে আর বলবে, বুঝলি কমলা তোর মামী এতো ইন্টেলিজেন্ট না—বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আর ভেতরটা কি যেন আগুন। কথা কি বলে উত্তরই দিয়ে উঠতে পারি নে। মনটা উদার। জানিস্ এটাই চাচ্ছিলাম রে। কেন যে একটা উদার মন বিশেষ প্রয়োজন তোমার —কি তার হাত দিয়ে তুমি বিলিয়ে দেবার জন্য বসে আছ— সে কথা জিজ্ঞাসা করলে অবশ্যি উত্তর মিলবে না। কিন্তু আমাকে বসে শুনতেই হবে।

তুই জানলি কি করে? অসিত বলেছিল ওগুলো।

বলছিলেন না। বাঁধা খৎ! সবাই বলে। তুমিও বলবে এবং আমাকেও শুনতেই হবে।

তুই অসিতকে কি জবাব দিয়েছিলি।

আমি? জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ও দুটো বস্তুর কি প্রয়োজন মহাশয়ের! ও দুবস্তু আমার নেই। আর তাই খুশি হউন মহাশয়, বলুন যে, বেঁচে গেছি। তোমায় নিয়ে সুখেই ঘর করতে পারবো। শীতের বেলা। কমলার পায়ের উপর পড়ে থাকা রোদের টুকরোটা ঘর থেকে ছাদে, ছাদ থেকে আলসের উপর দিয়ে কখন মিলিয়ে গিয়েছিল। আর শীতের সন্ধ্যা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছিল। সূর্য ডোবা আকাশের লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে কমলা বললো, সংসারের পক্ষে বড্ড বাড়তি জিনিষ শমীমামা মেয়েদের মন আর বুদ্ধি। ও দুটো না থাকলে যেমন বাঁচোয়া।

থাকলে তেমনি মরণ। বুদ্ধি বিবেচনা মনের ধার ধারেন না জয়ন্তী দেবী। সুখে আছেন তিনি। রাণীদেবীর মন তো নয় যেন গলায় ঝুলছে একখানা পাথর। আর মিত্রা দেবীর ও দুটোই এতো বেশী যে ও দুটোই পিষে ফেলবে তাকে। আচ্ছা, শমীমামা তুমি ছোট বউদিকে পড়াতে রাজী হলে না কেন? আমি কিন্তু এটা ভাবতেই পারি নি।

চুপ করে রইল শমিত।

ঝি এসে শমিতের চা খাবার দিয়ে গেল। কমলা লাফ দিয়ে উঠে পড়লো। হয়েছে। আজ আর রক্ষে নেই। বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীপুজোর বার। ফুল দুর্বা হাতে এঁয়ো স্ত্রী হয়ে লাল পাড় শাড়ী পড়ে বসতে হবে আমায়। পুঁথি পড়তে হবে সুর করে। কিছুই মনে ছিল না। এমনিতেই তো তুমি চটিয়ে মটিয়ে রেখেছ দুই গিন্নীকে। জেঠাইমা যে ভাবে পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন— বেচারা সত্যি কতদুঃখ পাচ্ছেন তোমাকে বিয়ে না দিতে পেরে। দু পা শমিতের কাছে এগিয়ে এসে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বললো কমলা, একটা কথার জবাব দেবে শমীমামা?

শমিত কমলার দিকে তাকালো।

সত্যি তুমি এখন বিয়েতে রাজী নও?

না।

হেসে জিজ্ঞাসা করলো—কারু জন্য না এমনি?

বোধ হয় কারু জন্য।

বোধ হয় কি আবার?

ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে।

জয়া কিনা—হয়তো জিজ্ঞাসাই করে ফেলত কমলা। কিন্তু নীচ থেকে ডাক এলো।

'যাচ্ছি' বলে সাড়া দিয়ে নীচে ছুটল কমলা।

শমিত চা খেয়ে খোলা ছাদে ঘুরল কিছুক্ষণ। বই আজ সে সমস্ত দিনই পড়েছে। কিন্তু তার একটা লাইনও তার মনে নেই। কিন্তু এটা মনে আছে বহুবার তার ঘুরে ফিরে একথাটাই মনে হয়েছে যে, কালকে ওভাবে ঘর ছেড়ে যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার হয়েছে তার। অনেকক্ষণ ভাবলো সে। তারপর নীচে নেবে মিত্রার দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, আসতে পারি।

মেঝেয় বসে সুটকেশ গুছাচ্ছিল মিত্রা। হাতের কাজ থেমে গেল তার।

কথা বলার অতি অনিচ্ছায় ঠোঁট দুটো যেন পরস্পর এঁটে থাকতে চাইলো।

তবু ঠোঁট খুললো সে। মুহূর্ত পূর্বে আঁটা এনভেলাপের মুখ টেনে খুলবার মতো করে খুললো। বললো, এসো।

পরদা সরিয়ে ঘরে এস ঢুকলো শমিত।

মিত্রা তার হাতের কাজে চোখ রেখে বললো, কি সৌভাগ্য!

হেসে উঠল শমিত, আমাকে দেখে ভীষণ খুশি হয়েছ না।

এক পাঁজা জামা পাট করে সুটকেসে ভরে আরো কিছু টেনে আনল মিত্রা সামনে—জবাব দিল না।

তবে বসা যাক— মোড়াটা টেনে বসল শমিত। জিজ্ঞাসা করলো, এতো গোছগাছ কিসের। মার কাছে যাচ্ছ।

হ্যাঁ।

এখন হঠাৎ!

এরকমই হঠাৎ যাই আমি।

বাড়ীর সবাই—মানে মহিলারা সব পূজোর ওখানে। তুমি যাও নি যে।

না।

না তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন?

আমি সেখানে গেছি ভেবেই কি তুমি আমার এখানে এসেছ।

না। মনে ছিল না যখন আসি। এসে কাউকে না দেখে কমলার কাছে কথাটা শোনা ছিল বলে বুঝতে পেরেছি। তা তুমি যাওনি যে।

আমার না গেলেও চলে।

শমিতের চোখ গিয়ে পড়লো মিত্রার সাদা সিঁথির উপর। যেন চিকণ এক টুকরো ইস্পাতের পাত বেঁকে পড়ে আছে। হঠাৎ মোড়াটা একটু কাছে টেনে, একটু ঝুকে বসে শমিত বললো—আমি আমার কালকের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি মিত্রা তোমার কাছে। কথা বলতে বলতে গলাটা ভেঙ্গে উঠলো দেখে শমিত লজ্জিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু আমি তোমার নাটকে যোগ দিতে পারছিনে বলে ক্ষমা চাচ্ছি। আর কিছু বলবে? সোজা শমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলো মিত্রা।

মুখ কালো হয়ে উঠলো শমিতের। উঠে দাঁড়ালো সে। ঈষৎ সন্নত ভঙ্গিতে বললো, না এবার তোমার অনুমতি পেলে আমি যেতে পারি।

মিত্রা—

আরে মামী এসো এসো। সুটকেসটা হাত দিয়ে ঠেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো মিত্রা। আঁচলটা সুটকেসের কোণে আটকে খসে পড়ে গেল শরীর থেকে। নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে মিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল শমিত। দৃষ্টি সরিয়ে তো সে নিলই না। দৃষ্টি তার হঠাৎ যেন উঠলো আরো নির্ভীক হয়ে। মিত্রার মুখের ওপর থেকে চোখ তার নেমে এসে দাঁড়ালো মিত্রার বুকের উপর।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অসংবৃত আঁচল টেনে নিল মিত্রা। কপালের উপর দেখা দিল ছোট ছোট ঘামের মুক্তা বিন্দু।

সৌমী এসে ঘরে ঢুকলো।

মিত্রা গিয়ে তার দু'হাত জড়িয়ে ধরলো।

সৌমী বললো, দুপুরে তোমার চিঠি পেলাম—

দুপুরে কেন? আমি তো সকালে পাঠিয়েছিলাম।

বোধ হয় সরকার মশাই সময় করে উঠতে পারেন নি। তা তোমার মামারা তো যে যার বেরিয়ে গেছেন। ডাক্তার তো কখন ফিরবে তার ঠিকই নেই—তোমার বড় মামার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। তাই আমিই এলাম তোমাকে নেওয়ার কথা বলতে।

বেশ করেছ। বোস।

সৌমী বসতে গিয়ে শমিতকে দেখল। তাড়াতাড়ি দু-হাত এক করে বললো, নমস্কার। মাপ করবেন। আপনি এখানে আমি দেখতে পাই নি।

শমিত একটু হেসে বললো, একেবারে না দেখতে পেলেও আপত্তি ছিল না। আচ্ছা, নমস্কার। নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলো শমিত। এসে দাঁড়ালো নিজের ঘরে। বাতি জ্বালাতে গিয়ে ও আনলো হাত নামিয়ে। মনের সঙ্গে চোখের কি আশ্চর্য্য মিতালি। মনটি অন্ধকার হয়ে উঠলো তো চোখও সঙ্গে সঙ্গে দিল আলো ফিরিয়ে। বিছানার উপর হাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো সে টান হয়ে। উত্তরের খোলা জানালা দিয়ে হিমালয়ের হিমপ্রবাহ যেন ওর বিছানায় বালিশে লেপে বরফের কুচি ছিটিয়ে রেখে গেছে। একেবারে তুষার শয্যা। অপূর্ব। এতোটা বৈপরীত্য ব্যতীত বুঝি শমিতের ঠাণ্ডা হবার উপায় ছিল না।

কিন্তু দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসতে হলো মিত্রাকে শশীকান্তর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে।

সুহৃদ হারানোর ব্যথা নিয়ে কাঁদলেন মিত্রা।

তারপর দু'টি মাসও কাটলো না। এক সঙ্গের অন্ন ভিন্ন হয়ে হয়ে উঠে গেল যার যার ঘরে ঘরে। এক হাঁড়িতে সেদ্ধ হবার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যেন চাল ডালগুলোও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো।

শৈলনন্দিনী আর কাকে নিয়ে আলাদা হবেন। তিনি আর স্বর্ণময়ী রইলেন এক সঙ্গে।

কমলা তার স্বামীর কাছ থেকে প্রতিদিন প্রায় একখানা করে চিঠি লেখে।

এই বউদিরা!

মুখ দেখা দেখি যদি বন্ধ না থাকে তবে তিন মাথা এক করো। একজন পড়ো। দু'জন বসে শোন হাতে চিবুক রেখে। এক বাড়ীতে একই কথা তিন প্রস্থ করে লিখতে পারবো না। কিন্তু লিখবো কি তাই ভাবছি। তোমাদের অসিতবাবুর দেখা পাওয়া ভার। ডাক্তার। তাতে মিলটারীর। মিলটারী কেতায় চলেন ফেরেন বলেন কাজ করেন।

গৃহস্থ মানুষ আমি ঘোমটার ফাঁকে চোখ বড় করে চেয়ে থাকি। হাসছো তো? ঘোমটা আবার কবে মাথায় তুললাম। ওটা রূপক। ঘোমটা মাথার নয় মনের। এ সমাজের উপযুক্ত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত সাহস নেই আমাকে নিয়ে বেরুবার। যদি হাই হিল উল্টে পড়ে যাই। যদি নাচতে না পারি। তাই আমার কাটে ঘরে বসে। নয়তো শুয়ে। চোখ বুজে। ঘুমোতে যে মেয়ে যেতে চায় না চোখ বন্ধ করতে হবে বলে, সে মেয়ের জেগে চোখ বুজে থাকা। পালিয়ে আসবো।

পরের দিনই হয়তো আবার এলো আর একখানা—

এই বউদিরা!

এই মাত্র পরিচয় হলো এক মুসলমান অভিজাত পরিবারের সঙ্গে। নেমন্তন ছিল খাওয়ার। খেলাম। বাবা, খাওয়া কাকে বলে! আস্ত ভেড়ার রোস্ট। সেই ভেড়ার পেটে চৌদ্দটা মুরগী। চোদ্দটা মুরগীর পেটে বিয়াল্লিশ ডিম। তারপর বিরিয়ানী কাবাব— না বাপু লিখতে পারলাম না। আমি জানিই নে। কিন্তু ওসব কিছু নয়। মন হরণ করে নিয়েছে আমার বেগম সাহেবের গড়-গড়াটি। মোগলাই বিরিয়ানী আর শামী কাবাব খেয়ে এখন শোফার গা ডুবিয়ে বসে অভাব বোধ করছি ঐ রকম একটি আতর গন্ধি অম্বুরি তামাক ভরা বেগমী গড়গড়ার। যার শরীরটা সোনা রূপার লাল নীল সবুজ পাথরের হবে। নলটা হবে সোনা রূপার তারে জড়ানো। গন্ধে ভরে উঠবে ঘর। তোমাদের অসিতবাবু বলেছেন, দেবেন একটা এনে। বেগম সাহেবাকে বললেই নাকি সে খুশী হয়ে পাঠিয়ে দেবে। এখন সামনে এগিয়ে ধরেছেন একটা সিগারেট। বলছেন, খাওনা। খাবো গো বউদিরা?

হেসে লুটিয়ে পড়ে ওরা।

রাণী হাসতে হাসতে চোখের জল মোছে।

মিত্রা তাকিয়ে রাণীর হাসি দেখে।

হাসে জয়ন্তীও। কিন্তু মন্তব্যও করে নাক কুঁচকে বলে; ঠিক অসিত মেয়েটাকে সিগারেট খাওয়াবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে বিনা সংবাদে বিনা চিঠিতে এসে একদিন হাজির হলো কমলা। অবশ্যি একা নয়। সঙ্গে জা' ননদরা। বেরিয়েছে দেওরের বাড়ীতে বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। আনন্দ রব পড়ে গেল।

স্বর্ণময়ী আনন্দ উদ্ভাসিত মুখে বললেন, খবর দিয়ে এলিনে কেন?

অসিত আসে নি?

এসেছেন। খবর দেইনি চমকে দেবো বলে। শিগগির চা তৈরী করো। মরে গেলাম একে বারে। হাত পা টান করে মেঝের উপর বসে পড়লো সে। বাবা, বাড়ী বাড়ী ঘুরে নেমন্তন করা কি চাট্টিখানি কথা। এক তলা, দো তলা, তিন তলা চার তলা ওঠ আর নাম। নাম আর ওঠ। কোমর ভেঙ্গে গেছে। হাতে চিঠি দিয়ে মুখে বলতে হবে, 'যাবেন কিন্তু।' তবে নেমন্তন সই। নইলে চিঠি দিলে, মুখে বলেনি। মুখে বললে, চিঠি পাই নি।

স্বর্ণময়ী বললেন, তা তো বলবেই।

কেন বলবে। এ নিয়ম আর চলতে দেওয়া নেই। চিঠি। শুধু মাত্র সুন্দর মনোরম ঝকঝকে একখানা চিঠি। বাস। ত্রুটিহীন নিমন্ত্রণ।

মিত্রা হেসে বললো, চিঠির মতো তোমার কাছে আর কিছু নেই।

কিছু নেই। সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু। কিন্তু তুমি আবার সে বিষয়েও কুড়ের সর্দার। ভুলেও চিঠি লিখ না। এক বাড়ী থেকে একই কথা তিন কপি করে যাওয়ার মানে হয়?

হেসে উঠল কমলা।

মা বললেন, বিয়ে মিটে গেলে যাবার আগে এসে থাকবি তো আমার কাছে ক'দিন?

থাকলাম তো দু ঘণ্টা।

এ আবার থাকা নাকি!

তবে ক'দিনটাও থাকা নয়। এক মাস থাকবো।

জয়ন্তী রাণী কুটুম্বদের নিয়ে চিকণ পাটি বিছিয়ে বসিয়ে, চা মিষ্টি পরিবেশন করলো।

যাবার সময় গাড়ীতে উঠে বসে দাদাদের মুখ বাড়িয়ে বললো, আমরা তোমাদের মতো বড়লোক নই দাদা। খাওয়াবো। যদিও হাতে হাতে ডিস। তবু ব্যবস্থা ভালো।

বড়লোক নোস বলে খাওয়াবি! হাসলেন দাদারা। সে আবার কেমন?

আজকালকার বড়লোকেরা খাওয়ায় না। শুধু নিজেরা খায়। খাওয়ার উপর খায় আর মোটা হয়। কিন্তু শমীমামাকে তো পেলাম না। জেঠাই মা তুমি বলবে। না গেলে রক্ষে রাখবো না বলে দিও।

বাড়ীটা যেন হাসি আর এক মুখের সহস্র কথার বন্যায় প্রাণ পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

মিত্রার জীবনে বিয়ে আর লীলাকান্তর মৃত্যুর পর তৃতীয় ঘটনাটা ঘটলো, এই বিয়ের নেমন্তন রক্ষা করতে গিয়ে কমলাদের ওখানে অভাবিত ভাবে নেমন্তন বাড়ীতে দেখা হয়ে গেল মিত্রার এক সহপাঠিনীর সঙ্গে। ক'দিনই বা পড়েছে; ক'দিনেরই বা বন্ধুত্ব তবু স্কুল জীবনটুকুতে সব চাইতে বড় বন্ধু ছিল ওর এই রমা। প্রথম ভর্তি হয়ে ভয়ে ভয়ে ক্লাস রুমে ঢুকলে, রমা এসে ওকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল। পাশে বসিয়ে ছিল। শিক্ষয়ত্রী যখন একে 'বুক' শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর মিত্রা ওর বুক মথিত করেও 'বুক' শব্দের অর্থ বের করতে পারছিল না, পাশ থেকে রমা চুপে চুপে বলে দিয়েছিল —বলো বই। সেই থেকে ওরা বন্ধু, গলা জড়িয়ে ধরে স্কুল বাড়ী ঘুরেছে। টক কুল আর তেঁতুল খেয়েছে নুন কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। একজন পড়া তৈরী করতে না পারলে অন্য জন বলে দিয়েছে। বাড়ীর সম্মতি আদায় করতে পারলে একজন আর একজনের কাছে ছুটে এসেছে দিন কাটিয়ে যেতে। উঃ কত যুগ আগের কথা যেন সে সব। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো ওরা। ভীড় থেকে দূরে সরে গিয়ে বসল দু'জনে এক কোণে।

ফাষ্টক্লাস ফাষ্ট হয়েছিলি এম.এ- তে? কিসে?

সংস্কৃত সাহিত্যে।

প্রফেসারি করছিস্?

হ্যাঁ।

বিয়ে করিস্ নি?

এতো দিন নয়। হাসলো রমা।

এখন?

এখন—বিয়ে করতে হচ্ছে। বিয়ে বাড়ীটার দিকে চোখ বুলিয়ে দেখিয়ে বললো, তবে এ সব হৈ-হাঙ্গামা নেই কিছু। তিন আইনে বিয়ে।

কেন অন্য জাতে করছিস?

না।

তবে? পছন্দ করিস নে এ সব?

তা আবার! ভদ্রলোকের ইচ্ছে, পুরো আমাদের দেশী প্রথায় বিয়ে হয়। ফুলের মালা পরবেন, গরদজোড় পরবন। চন্দনের ফোঁটা দেবেন। এমন কি টোপরও বাদ যাবে না। বিদেশী মানুষ, সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছেন। তাই এ সবের দিকে ভীষণ আগ্রহ।

কথাটা যেন ধরে উঠতে পারলো না মিত্রা। কে বিদেশী মানুষ।

হেসে উঠে রমা এবার তার গুপ্ত কথা ফাঁস করলো। বললো, ভদ্রলোক জার্মান।

টুপ করে যেন মিত্রাকে বিস্ময় সমুদ্রে ফেলে দিল রমা। বললো, কে জার্মান? যাকে বিয়ে করছিস্ তুই?

হ্যাঁ। এ দেশে এসেছিলেন সংস্কৃত পড়তে। এক প্রফেসারের বাড়ীতে পরিচয় হয়েছিল। আমিও সংস্কৃতের অধ্যাপিকা। তারপর থেকে আমার কাছেই পড়তে আসতে লাগলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি যে ভেতরে ভেতরে আমাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন, সত্যি আমি তাই বুঝতে পারিনি।

হাঁ করে তাকিয়ে মিত্রা কথা শুনতে লাগলো। তোরা কথা বলিস্ সংস্কৃত ভাষায়?

মুখে ছোট রুমালটা চেপে ধরে হেসে উঠল রমা।

ইংরেজীতে বলি। ভালো ইংরেজী জানেন ভদ্রলোক। কথাই বলেন ভদ্রলোক কম। জার্মানরা বোধ হয় তাই হয়। বিয়ের প্রস্তাব করেছেন কি ভাবে জানিস্? ওঁর মার জার্মান ভাষার চিঠিটা ইংরেজীতে অনুবাদ করে আমার সামনে ধরে বললেন, পড়ো।

পড়ে তো আমি অবাক।

কি লিখেছেন তিনি?

মহিলা লিখেছেন, প্রিয় লুডউইগ,

ভারতীয় মেয়েদের তোমার ভালো লেগেছে। তাদের ব্যবহারে তুমি মুগ্ধ হয়েছ লিখেছ। আমারও তাদের সম্বন্ধে আগ্রহ আছে। আমি তাদের নমনীয়তা, কোমলতা, মিষ্ট নম্র স্বভাবের কথা শুনেছি। যদিও তুমি কিছু লেখনি। কিন্তু আমার মনে হয় একটি মেয়েকে ভালো লাগার ভেতর দিয়ে তোমার ভালো লাগা বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সব ভারতীয় মেয়ের ওপর। সত্যি যদি তাই হয়। তুমি যদি কোন মেয়েকে ভালোবেসে থাকো এবং তুমি তাকে বিয়ে করো। আমরাও সুখী হবো জেনো—

কখন যে কে এসে হাতে তুলে দিয়ে গেল খাবার ডিস। কখনই বা খাওয়া শেষ করে ডিস নামিয়ে ওরা জলের গ্লাস হাতে তুলে নিল চৈতন্যই ছিল না দু'জনার। মিত্রা চমকে উঠল জয়ন্তীর ডাকে। দেখলো হল ভরা লোক। কেউ খাচ্ছে। কেউ খাওয়া শেষ করেছে। কেউ জল চাচ্ছে—এতক্ষণে মিত্রার খেয়াল হলো। এটা বিয়ে বাড়ী। শুধু দু'জনই ওরা নয় এখানে।

জয়ন্তী এসে দাঁড়ালো কাছে। বললো, তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ হয়ে গেছি। চল শিগ্‌গির চলো। খাবে। কোণ ছোড়া তুমি বসতেই পারো না।

আমি তো খেয়েছি।

কখন খেলে?

এই তো এই মাত্র।

ওখানে বসেই যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলেন পিসীমা। আঁতকে উঠলেন তিনি। কি সর্বনাশ। কোন্ খাবার খেলে তুমি?

বোকার মতো মিত্রা ওর শূন্য প্লেটটার দিকে তাকালো।

পিসীমা উঠে এলেন, চপ কাটলেট খেয়েছ তুমি? দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে তার।

সমস্ত হলঘরটা এক সঙ্গে তাকালো মিত্রার দিকে।

ছুটে এলো কমলা। একেবারে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো সামনে মিত্রার। কি আশ্চর্য ছোট বউদি। তুমি কি? নিজ হাতে আমি তোমাকে লুচি মিষ্টির ডিস দিয়ে গেলাম। তুমি বললে, এখন খাবো না। আমি জোর করে দিয়ে গেলাম না—

সেখানে চুপ করে গেলেও কমলার এই ধোঁকায় পিসীমা ভুললেন না। বাড়ীতে এসে ঘেন্নায় অপ্রবৃত্তিতে শিউরে উঠলেন। বললেন, বুঝতে কি আর বাকী আছে কারো। কমলা ধোঁকা দিলে কি হবে। মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে লোকের কাছে মান সম্মান কিছু আর রইল না। ছিঃ ছিঃ!

স্বর্ণময়ীর জীবনে এই প্রথম। কাঁদছিলেন তিনি। কান্নায় চোখ ফুলে আছে তার। ননদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—কমলার শ্বশুর বাড়ীতে মান সম্মান তো ডুবিয়ে দিয়ে এলেন আপনিই। ঘরের সম্মান চিরকাল নষ্ট করেছেন। করবেন যত কাল বাঁচবেন।

স্বর্ণময়ীর অনভ্যস্ত চিঁচিঁ করা কণ্ঠস্বরের চিৎকারে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেন পিসীমা। আজ তার দিন। এটাই তার ধারণা ছিল। স্বর্ণময়ী যে আবার উল্টে তাকে আক্রমণ করতে পারেন ভাবেন নি। প্রথম ধাক্কাটার পরই দাঁতে দাঁত ঘষে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনিও। তোমার ঘরের সম্মান বুঝি নষ্ট করে এলাম আমি? তোমার বউ নয়? এই তো বলবে। আর বলবে কি?

আপনি—আপনিই নষ্ট করেছেন। শত্রুতা থাকলেও এ রকম কেউ করে না। আমি জানি চিরকাল তলে তলে এই করেছেন। যতদিন বাঁচবেন এই করবেন। কিন্তু আর নয়। আমি আর আপনাকে রাখবো না। কাশী চলে যান। আমি টাকা দেবো।

কি বললে? তুমি রাখবে না। বলি তুমি আমাকে এখানে রাখার কে? তোমার দয়ায় রয়েছি আমি! পিসীমা মৃত ভাইদের ডেকে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলেন— এসে তার অপমান লাঞ্ছনাটা একবার দেখে যাবার জন্য।

ননদের হয়ে তিরস্কার করে উঠলেন শৈলনন্দিনী। একি উল্টো রাগ। মিত্রা যেমন বুঝে করেনি, ঠাকুরঝিও তেমনি ইচ্ছে করে বলেনি, অবাক হয়ে আচমকা বেরিয়ে গেছে কথাটা।

ভেতরে মায়া মমতা থাকলে কখনোই বেরুতো না। আমার মুখ দিয়ে বেরুতো? তোমার মুখ দিয়ে বেরুতো। ঝেঁঝে উঠলেন স্বর্ণময়ী। সত্যি কোন খাবার খেয়েছে তা দেখবার জন্য উঠে গিয়ে প্লেট দেখতাম না আমরা। মিত্রাকে জব্দ করবার জন্য ওৎ পেতে ছিলেন—

আমার মুখ বন্ধ করে মিত্রাকে আর কতদিন—

থামুন—বলে পিসীমাকে থামিয়ে দিল রাণী।

ঠোঁট কাঁপতে লাগল স্বর্ণময়ীর। তার লীলাকান্তর বউ।

ও বাবা রাণীও দেখি চোখ পাকাচ্ছো। চোখ পাকানো টাকানো কোন কথা নয়। শৈলনন্দিনী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, মিত্রা নেহাৎ কচি খুকিটি নয়। এক বাড়ী লোকের কান ফেলা এদিকে। সবাই গিয়েছিল কমলার বাড়ী নেমন্তন খেতে। সবাই দেখেছে ব্যাপারটা।

হঠাৎ মিত্রা এসে ঢুকলো ঘরে। দু চোখে তার আগুন বেরুচ্ছে। বললো, না মিত্রা কচি খুকিটি নয়। মিত্রা ছেলে মানুষ নয়। সে ইচ্ছে করে মাছ মাংসের চপ কাটলেট খেয়েছে। কি করবেন আপনারা। সে আরো খাবে।

ততক্ষণে স্বর্ণময়ী মিত্রার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরেছেন। পিসীমা বলছেন, ঐ তোমার শাশুড়ীকে কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে যাও। তবেই আমরা বাঁচি। আমাকে বলতে হবে না।

রক্ত চোখে উন্মাদের মতো দু হাতে ঠেলতে লাগলেন মিত্রাকে। স্বর্ণময়ী, যাও—বেরিয়ে যাও তুমি এখান, থেকে। যা খুশী তাই বলবে। আমি ঠিক বিষ খাবো।

রাণী টেনে বের করে নিয়ে এলো মিত্রাকে। এনে ঘরের ভেতর ঠেলে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরের মধ্যে কুমার মুন্নী কাঁদছিল ফুলে ফুলে।

বললো, হাঁপাতে হাঁপাতে রাণী—ছিঃ ছিঃ মিত্রা। তুমি গেলে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে।

পাগলের মতো দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মিত্রা।

জানোয়ার, অসভ্য, বর্ব্বর সব। আমি চলে যাবো এখান থেকে। আর কোনদিন আসবো না। আর আমি জীবনেও এদের মুখ দেখবো না— তিন সত্য করলাম।

বেশ তো ঠিক আছে। কিন্তু তার আগে ওদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে কেন ছুটে। ওদের সঙ্গে ঝগড়া করা তোমায় মানায়!

কুমার মুন্নীকে বুকের কাছে টেনে এনে ওদের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল রাণী। দেখতো, ছেলেমেয়ে দুটো ভয়ে নীল হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ বাদে চোখ মুখ মুছে উঠে বসলো মিত্রা।

রাণী সক্ষোভে বললো, এই তো বাড়ী! বড় দুটি ভাই তো ছিলেন। গিয়ে ঢুকলেন যার যার ঘরে। ধমকে দিলে হয়তো আর একটা কথাও বলতে পারতো না। কমলা ছাড়া কেউ মানুষ নয়। আঁচল দিয়ে কুমার মুন্নীর মুখ মুছিয়ে দিলো রাণী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দাঁড়াও গাড়ী বের করতে বলে আসি।

প্রস্তুত হতে হতে মিত্রা বললো, আমি মোহন সিংকে গাড়ী তুলতে মানা করে দিয়েছিলাম।

একেবারে চলে যেতে গাড়ী দাঁড় করিয়ে! আবার ও ঘরে গিয়েছিলে ঝগড়া করতে কোন বুদ্ধিতে। রাগলে, তো তোমার সব বিগড়োলো।

ঘরের ভার ডালিমের উপর দিয়ে সোজা গিয়ে উঠে বসল গাড়ীতে। একবার ফিরেও তাকালো না বাড়ীর কোনদিকে।

জয়ন্তীর ঘরের বাতি টুক করে নিভে গেল আর অন্ধকার জানালায় এসে দাঁড়ালো একটা ছায়া। মিত্রা পিঠের অনুভবে বুঝতে পারলো, জয়ন্তী দেখছে তার যাওয়া।

রাত প্রায় বারোটা।

শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ দীর্ঘ পথ। গোটাকয় রাস্তাপার হতেই কাদার তালের মতো ঘুমিয়ে পড়লো কুমার মুন্নী গাড়ীর গদির উপর।

একটা নিদারুণ নিঃক্রিয়তার মন নিয়ে দুটি হাত কোলের উপর রেখে বসে রইলো মিত্রা।

সেণ্ট্রাল এ্যাভেনুর দোকান পাট সব বন্ধ। পানের দোকান গুলো শুধু খোলা। দোকানগুলোতে ভিড় নেই বটে কিন্তু জনশূণ্যও নয়। তাই যদি থাকবে তবে আর দোকানদার দোকান নিয়ে বসে থাকবে কেন। কেউ সিগারেট কিনছে। কোথাও এসে গাড়ী থামছে। বাবু টাকা বের করে দিচ্ছেন। ড্রাইভার নেমে পান নিয়ে আসছে। সিগারেট নিয়ে আসছে। কোথাও চলতে চলতে পানের দোকানে জ্বলন্ত দড়িটা তুলে কেউ বিড়ি ধরিয়ে নিচ্ছে। ফুটপাতের উপর কোথাও খাটিয়া পেতে শুয়েছে কেউ কেউ। আবার কোথাও ফুটপাথে পাশাপাশি প্রায় দশ বার জন ঘুমিয়ে আছে গায় চাদর টেনে। বড় বড় দোকান পাট বন্ধ থাকায় এ্যাভিন্যুর পথে আলোর জোর তেমন নেই। পথটা আলো আঁধারে মেশানো মতো। শমিতের ষ্টিয়ারিং ধরা হাতের উপর মাঝে মাঝে পথের আলো এসে পড়ছিল আর আংটির হীরেটা জ্বলে জ্বলে উঠছিল।

গাড়ী এসে পড়লো চৌরঙ্গীতে।

সিনেমা পাড়া চৌরঙ্গীর তখন মাত্র রাতের শো ভেঙ্গেছে। গাড়ী বেড়িয়ে আসছে লাইট হাউস নিউ এম্পায়ারের গলি থেকে। মেট্রো থেকে। রাস্তার উপর দৌড়াচ্ছে ছোকরাগুলো ট্যাক্সি ধরবার জন্য। ধরে দিতে পারলেই দু আনা চার আনা মিলবে। বোধ হয় কোন ভালো ছবি চলছে। ভিড় স্বাভাবিকের চাইতেঅনেক বেশী।

লাল আলো জ্বলে উঠল। গাড়ী থামলো।

সান্ধ্য পোশাক পরা এক জোড়া মেম সাহেব গাড়ীর সামনেটা পার হয়ে গেল।

লাল আলোটা আস্তে আস্তে ফিকে হলো। তৈরী হলো গাড়ীগুলো? নীল আলো জ্বলে উঠতেই মোচড় দিল ষ্টিয়ারিং। আলো পড়ে আংটির হীরাটা জ্বলতে লাগলো শমিতের।

ছটাটা ঘন ঘন বারবার চোখের উপর এসে পড়তে মিত্রা তাকালো—সে দিকে।

শমিতকে ষ্টিয়ারিংএ বসে থাকতে দেখে হঠাৎ যেন শরীরে কাটা দিয়ে উঠল তার লজ্জায় অপমানে। দয়া—দয়া দেখাচ্ছে শমিত ওকে। অনুকম্পা।

ড্রাইভার গাড়ী চালাচ্ছে। ওদিকে তাকায়নি মিত্রা। আগে দেখতে পেলে নেবে পড়তো সে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছিল তখন দূর থেকে শমিতকে সে মাথা নিচু করে লনে পায়চারি করতে দেখেছিল। চোখ পড়া মাত্র দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল সে শমিতের উপর থেকে। তারপর লনে এসে আর তাকে দেখেনি। সে ছিল কি ছিল না লক্ষ্যও করেনি।

শমিতের ষ্টিয়ারিং ধরা হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো মিত্রা। ভাবলো কোন কথা বলবে না। যেমন বসে আছে তেমনি থাকবে। বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামলে ছেলে মেয়ে নিয়ে এমনি নিঃশব্দে নেবে যাবে। যেমন এতক্ষন জানত না কে চালাচ্ছে গাড়ী, তখনও তেমনি জানবে না।

কিন্তু মিত্রার স্বভাবে ধৈর্য্য নেই।

নিজেকে চাপতে পারে না। নিজের মনোভাবকে চাপতে পারে না। রাগ হলে তার প্রকাশ না করা পর্যন্ত তার মন শান্ত হয় না। অপমানের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত ভেতরটায় তার জ্বলতে থাকে আগুন। শমিতের সেই তাকে পড়াতে অস্বীকার করা, বিড়ম্বিত মিত্রাকে একা ঘরে রেখে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া সে এখনও ভোলেনি, সে অপমান তার মনে আছে।

ধৈর্য্য নেই মিত্রার স্বভাবে।

যদি থাকতো তবে সে ও ঘরে গিয়ে আজ ঐ ঝগড়ার ভেতর উপস্থিত হতো না। পিসীমাকে অস্বীকার করতে গিয়ে তাকে জবাব দিতে গিয়ে স্বর্ণময়ীর মনে আঘাত দিতো না। করুণা করছে শমিত ওকে। শান্ত হয়ে এসেছিল সবে, আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল তার ভেতরটা!

বললো—তুমি এসেছ কেন?

শমিত বুঝতে পারলো মিত্রা তাকে এই দেখলো।

বললো, তোমাদের পৌঁছে দিতে।

কেন আমার ড্রাইভারের কি হলো?

আমি শুধু ঐ ড্রাইভারের কাজটুকুই করছি।

আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছ শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে। দয়া? করুণা? কিন্তু আমার ড্রাইভার যে কাজ অনায়াসে করতো এবং করার জন্য বসেছিল তাকে নামিয়ে দিয়ে— তোমার সময় নষ্ট করবার কোন দরকার ছিল না। আমার মনে হয় না, তোমার এই অনুকম্পার আমার খুব প্রয়োজন ছিল।

একটা গাড়ীর পাশ কাটালো শমিত। জবাব দিল না।

কি তুমি আমার কথা শুনতে পারছ না, না জবাব দিচ্ছ না?

গাড়ী রেড রোডের দিকে মোড় ঘুরলো।

গঙ্গার দিকে যাচ্ছ যে? তোমাকে কি ওরা আমাকে গাড়ী সুদ্ধু গঙ্গায় ফেলে দেবার জন্য পাঠিয়েছে?

শমিত বললো, না। তবে আমি নিজেই ভাবছি কথাটা।

কিন্তু তাতে তোমারও বাঁচবার উপায় থাকবে না।

না, আমার বাঁচবার আর উপায় নেই। চেষ্টা করেছিলাম, এখন আশা ছেড়ে দিয়েছি। সহজ কণ্ঠে জবাব দিল শমিত।

এবার মিত্রাকে মামারা দস্তুর মতো আদেশের সুরে বললেন— বাস্ যথেষ্ট হয়েছে। দু'বাড়ী ছুটাছুটি ছেড়ে দিয়ে এবার বোস স্থির হয়ে। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবছ না? এ ভাবে এখানে দুদিন ওখানে দুদিন করে ওদের মনের স্থিতি নষ্ট হচ্ছে। এক জায়গায় শিকড় গাড়তে না পারলে বড় হবে কি করে?

স্থির হয়ে বসল মিত্রা শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জে। কুমার মুন্নীকে ভর্তি করে দিল মণ্টিসারিতে।

অখণ্ড অবসর। এখন এই মস্ত মস্ত দিনগুলি নিয়ে মিত্রা করে কি। একটা দিন আসে না যেন একটা অলস অজগর এসে সামনে পড়ে। এ বাড়ীতে গায়ত্রীই ছিল ওর সমবয়সী বন্ধু। সে চলে গেছে বিয়ে হয়ে। মামীমারা ব্যস্ত, ছেলেমেয়ে স্বামী সংসার নিয়ে। মা সার করেছেন কুমার মুন্নীকে। তার উপর আছে ডালিম। এদের দু'জনের হাত থেকে ছেলেমেয়ের জন্য কিছু করতে যাওয়া নয়তো কাড়াকাড়ি করা। প্রয়োজন কি?

ও বাড়ীর সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ কোন খবর দেওয়া নেওয়া নেই। শুধু কমলা চলে যাবার আগে দেখা করে গেছে। সহজ ভাবে, যেন ও-বাড়ীর সঙ্গে মিত্রার সম্পর্কটা সম্বন্ধেও সে সচেতন নয়। বলে গেছে, চিঠি দেব। তবে বেশী নয়। উদ্দেশ্য মহৎ—ঘন ঘন জবাব লেখা থেকে তোমায় বাঁচানো। গিয়েই পৌঁছ সংবাদ লিখেছে—এইমাত্র ঘরে ঢুকলাম। কি রকম 'এইমাত্র' জান? ষ্টেশন থেকে গাড়ী, গাড়ী থেকে বাড়ী, বাড়ীর বারান্দা দিয়ে জুতোর ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে— পা পিছলে গিয়ে সে শব্দে ছন্দপতন ঘটে। হাই হিল রপ্ত হয়নি এখনও— ঘরে ঢুকেই সোজা টেবিলের কাছে। স্ত্রীর খাতিরে সদ্য ঝাড়পোঁছ করা টেবিল। নয় তো বুঝতেই পার এই একমাসে টেবিলের অবস্থা কি হয়েছিল। সেই টেবিলে হাতের ব্যাগটি নামিয়ে পৌঁছ সংবাদ লিখছি। লিখব, চিন্তা করোনা, নির্ব্বিঘ্নে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু আমার মঙ্গলমতো ঘরে ঢোকা নিয়ে কি উৎকণ্ঠিত হয়েই না বউদি আমার সময় কাটাচ্ছিলো! তা ননদের জন্য ভাবিত হওয়া বউদিদের উচিত। তুমি কি বই পড়তে পড়তে আর এ উচিতটুকুও করনি!

তা এমনি নিশ্চিন্ত করা চিঠি আরও খান কয়েক লিখতে হবে। জলন্ধরে জলকষ্ট আর গরম দুটোই সমান। সুখতো বুঝতেই পারছ।

কমলার চিঠির জবাব আগে লিখল মিত্রা। তারপর রাণীর কাছে একখানা লিখতে গিয়েও হাত থেকে কলম নামিয়ে রাখলো।

না, রাণী যখন এমন চুপ করে আছে, তখন নিশ্চয়ই ওখানকার আবহাওয়াটা তার প্রতি অনুকূল নয়। থাকবার কথাওতো নয়। হয় তো বারণ-ই হয়ে গিয়ে থাকবে ওর সঙ্গে কোনরকম সম্পর্কের আদান-প্রদান রাখা। কমলা মেয়ে, রাণী বউ। কমলার পক্ষে যা করা সম্ভব, রাণীর পক্ষে তা অসম্ভব বৈ কি। আর দরকার নেই। এমনিতেই

স্বামী স্ত্রীর যে হৃদ্যতা। ওকে নিয়ে কোনো ঝামেলা হোক মিত্রা চায় না। তবু কেমন যেন রাণীর খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে। কতদিন হয়ে গেল দু'জনে এক সঙ্গে বসে কথা বলে না। কলম হাতে তুলে নিল মিত্রা—

রাণী,

ভয় পেয়োনা, লিখতে বসেছি বলেই যে সে চিঠি তুমি পাবে তার কথা কি আছে? তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তা তো এখন কোন মতেই সম্ভব নয় তাই আলাপের দ্বিতীয় উপায়টাই হাতে তুলে নিলাম। পরে বিবেচনা করে যদি উচিত মনে না হয়—ছিঁড়ে ফেলব। তোমার অশান্তির কারণ ঘটতে দেব না।

বেলা পড়ে এসেছে। এক্ষুনি সব বাচ্চারা স্কুল ফেরত এসে পরবে। মামীরা ব্যস্ত—বিকালের জলখাবারের আয়োজনে। সাহায্য করতে গেলে তারা বলে উঠবেন, না না করে। মামারা করবেন রাগ, ডালিম হবে ক্ষুব্ধ, মা বিরক্ত। কিন্তু মিত্রা করে কি? আপাতত ঘরে বসে চার দেয়ালের ভাপে সেদ্ধ হচ্ছে। প্রায় থালায় পরিবেশিত হবার মতো অবস্থা।

দেখলে তো, পুরো বৈশাখটা চলে গেল, না নামল একদিন একটু বৃষ্টি, না উঠল একদিন কাল বৈশাখির ঝড়। আচ্ছা, ঝড় ঝঞ্ঝাগুলোকি সব স্থান পরিবর্ত্তন করে জড়জগত ছেড়ে জীবনে চলে এসেছে? আর তাদের সরান যাবে না?

বাচ্চাদের স্কুলগুলোতে প্রার্থনার আয়োজন চলেছে বৃষ্টির জন্য। জলে পড়ে তৃণ আঁকড়ে ধরা আর বৃষ্টির জন্য শিশু প্রার্থনা— দুটোইতো এক। কিন্তু জান, আগেকার দিনে এমনি নানা উপায়ে বৃষ্টি নামানোটা নাকি মোটেই আশ্চর্য্য ঘটনা ছিল না। মেঘমল্লারে নাকি বৃষ্টি নামত। অসম্ভব কি? ইথার তরঙ্গের বার্তা বয়ে নেওয়ার মতো তেমন কোন সাধক কণ্ঠ আকাশ অন্তর চঞ্চল করে জল ঝরিয়ে এসেছে, হতে পারে। হতে পারে নেমেছে মেয়েদের ব্রতসাধনা আর সন্ন্যাসীদের যাগযজ্ঞে হোমে।

কিন্তু সেই রামরাজ্য নেই, নেই রাণী সীতা। এটা সত্যযুগ নয়। এখন শিশুকণ্ঠের কচি আহ্বানে সন্ন্যাসীদের গুরু তপস্যায় মেয়েদের প্রার্থনার ঐকান্তিকতায়—আকাশের জল আকাশেই থাকে। তাই বৃষ্টির আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছিলাম শুধু সন্ধ্যার বাতাসটুকুর জন্যে। কিন্তু বৃষ্টি নামল।

তারপর।

আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে
জানিনে কিছুতে কেন যে মন লাগে না--

তেতলার ঘর থেকে কি এ গান ভেসে আসছে না?

না আসলেও তুমি গিয়ে বললেই গাইবে শমিত। তারপর যদি সুরে তালে পাঠিয়ে দিতে পারতে সে গান। কিন্তু মানুষের মুখে ছাড়া তো কলমের মুখে সুর ধরা দেয় না। আচ্ছা এ দুঃখে কলমের কি মরে যেতে ইচ্ছা করে না? অন্তত আমার তো বর্ত্তমানে তাই করছে।

নানা মিষ্টি বাজনা বাজিয়ে—বড় ঘড়িটা ঘোষণা কবল চারটা। অমনি দুচোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলাম— হে ভগবান রেডিওর ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাদের মনে সুমতি দেও, নাই বা থাকল আজকের অনুষ্ঠান-পত্রে, তবু এমন আদর্শ মুহূর্ত্তটিতে যেন ওঁরা কবির স্মরণ নিতে না ভোলেন। ফলাফলটা লিখতে হবে? তুমিও কি আমার মতো নিরাশ হওনি? যে হাতে খুলে ছিলাম সে হাতেই বন্ধ করে উঠে এলাম। ধ্যাত্তর। কিন্তু ধুইয়ে নিল বৃষ্টির জল মনের এই ভাব। এমন অঝোর ঝরা জলের দিকে তাকিয়ে থাকলেই সারা শরীর মন স্নাত হয়ে যায়— যায় পবিত্র হয়ে। উঠে গিয়ে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে ভিজতে ইচ্ছে করছে। কলম রাখলাম।

কলম নামিয়ে—উঠে এল মিত্রা। মুখটা জানালার শিকে চেপে ধরে বলে উঠল—আঃ। ওর মনে হতে লাগল জলের বড় বড় ফোঁটাগুলো যেন ওর মুখের উপর পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে বালির উপর জল পড়ার মতো। এমন ঝমঝমে বৃষ্টি আর মিনিট কয়েক হলেই তো রাস্তায় দাঁড়াবে মুন্নীর গলা জল। মিত্রার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। জানালা ছেড়ে চলে এলো ও সিঁড়ির মুখে।

উল্লাসে মেতে ভিজতে ভিজতে ছোটরা ঘরে ফিরল। সময়ের এমন যোগাযোগ না ঘটলে তো ওদের অদৃষ্টে জলে ভেজা ঘটেনা শুধু হাত দুটি জানালা গলিয়ে বৃষ্টির জল ধরা ছাড়া। ঘাড়ের ব্যাগ নামাতে নামাতে এক সঙ্গে তুললো সবাই কথার তুফান।

কুমার ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠে, মুন্নী না মা, পথের মাঝে হাঁ করে বৃষ্টির জল খেয়েছে। ঠিক চাতক পাখীর মতো।

মুন্নি প্রতিবাদ জানায়, আর তুমি আর টিপু যে বই-পত্তর শুদ্ধ ব্যাগটা রাস্তার জলে ফেলে তার উপর চেপে বসলে? দেখ মা ওদের দুজনার সব ভিজে।

তোমার সঙ্গে আমিও তো হাঁ করে জল খেয়েছি না মুন্নী? ছুটে এলেন সুমিত্রা। গামছা হাতে ছুটে এলো ডালিম।

ছোটমামা এলেন ভিজতে ভিজতে। নিজের ঘরে যেতে যেতে ডাকলেন—শীগগির শুকনো তোয়ালে নিয়ে এসো সৌমী!

একটু বাদে কোথায় গা বলে ডাক দিয়ে এসে ঢুকলেন বড় মামা।

মামীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল কোথায় শুকনো তোয়ালে, কোথায় চটী, গেঞ্জি, লুঙ্গি।

আবার মিত্রা একা।

অনেক সময় এমনি হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠে মিত্রা দেখে সে একা। নাড়ীর যোগ নেই যেন কোথাও। কিন্তু কি প্রয়োজন ওর এখন একা ঘরে এভাবে বসে থাকবার। ওকি মিশে যেতে পারে না এসব কাজের ভেতর? পারে। কিন্তু এভাবে বসে থাকার অর্থ নেই বলেই উঠে যেতে হয়। আর শুধুমাত্র সেই জন্যই মিত্রা বসে থাকে স্তব্ধ হয়ে। মামারা অবশ্যি কাপড়-চোপড় বদলে চায়ের কাপটি হাতে ধরবার আগেই ওর খোঁজ করবেন। ডেকে নেবেন। এক সঙ্গে চা খাবেন। কিন্তু এসব তো ভদ্রতা। না মুখের নয়, অন্তরের। কিন্তু তাহলেও মার্জিত ঔদার্য্যেরই সদ্ব্যবহার। ওকে দুঃখী ভাবেন সবাই। কিন্তু কেন? কিসের দুঃখ ওর? কি সুখ লীলাকান্ত দু'হাত ভরে দিয়েছে যে আজ তার অভাবে ওর হাতের অঞ্জলি শূন্য। কাপড় বদলে চুলটায় চিরুণী চালিয়ে একটু গোছগাছ করে তৈরী হচ্ছিল মিত্রা মামাদের কাছে যাবার জন্য।

দেখ কে এসেছে। সৌমীর কথায় পেছন ফিরল সে।

রাণী!

রাণী এগিয়ে এসে দু'হাত জড়িয়ে ধরল মিত্রার।

দু'জনে হাত ধরেই বসল খাটের ওপর।

মিত্রা বললো, জানো এতক্ষণ বসে বসে তোমার কাছে একটা মস্ত চিঠি লিখছিলাম।

হাত পাতলো রাণী, দেখি।

দেখার মতন কিছু নেই, এমনি।

তবু আমার চিঠি আমাকে দাও।

মিত্রা হেসে বললো, আচ্ছা যাবার সময় দিয়ে দেব। কিন্তু তুমি এলে কি করে এই ঝড়-বাদলের মধ্যে সব ভয় ডর ছেড়ে? না তোমাকেই ত্যাগ ক'রেছে ওরা?

কোনোটাই নয়। এসেছি প্রেম বিলোতে, বিলোতে।

সেকি।

হ্যাঁ বলে মাথা কাত করলো রাণী। যে প্রেম কাউকে অবজ্ঞা করেনা, যে প্রেম কাউকে ঘৃণা করেনা, যে প্রেম কাউকে ত্যাগ করেনা—বর্ত্তমানে এই শুধু জানে রাণী।

সাধু, সাধু! ফল হচ্ছে?

অসাধারণ। নইলে কি আসতে পারতাম।

ভালো। কিন্তু প্রেম আর সন্তোষ কি উপায়ে বিলোনো হচ্ছে শুনি?

সদাসর্বদার জন্যে গালের ভাঁজে, ঠোটের রেখায় একটি মধুর প্রসন্ন হাসি। কানে কালা. মুখে বোবা। মনোভাবে ওঁদের খুশী করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য আর নিজের জীবনটা উপলক্ষ্য মাত্র।

হেসে উঠল মিত্রা, এমন একটা হঠাৎ পরিবর্ত্তনে সবাই ভাবছে আমার মন্দ প্রভাব মুক্ত হয়েই তোমার এই আত্মিক উন্নতি।

তা ভাবতে পারে।

আপত্তি নেই। তোমার সুখ হলেই আমি খুশি। এখন তবে তোমাদের দু'জনের সম্পর্কটা ভালো?

আমাদের দু'জনার? মানে স্বামী-স্ত্রীর? ঠিক প্যাঁচ নষ্ট হওয়া কলমের খাপের মত। যতই ঘোরাও আর কস, কোথায় যে একটি খাঁজ কেটে গেছে সে আর লাগবার উপায় নেই। তবু লাগিয়ে রাখতে হয়। আর সামান্য অসাবধানতায় ছিটকে পড়ার দুর্ভোগ ভুগতে হয়।

মিত্রার চোখ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। তাকিয়ে রইল রাণীর দিকে। কি সুন্দর লাগছে ওকে!

কচি কলাপাতা রং-এর শাড়ী, সাদা ব্লাউজ। মাথাভরা এক খোঁপা। বড় ভালো মেয়ে। ও ছেলে হ'লে কামনা ক'রতো এমনি একটি স্ত্রীর। কিন্তু রাণীর স্বামীর কেন রাণীকে নিয়ে মন ওঠে না? যেতে হয় অন্যত্র অন্বেষণে। কি সে সুখ, কিসের সে অতৃপ্তি, যা ঘরে মেলেনা? তবু জীবিত কি মৃত এঁদের জন্যেই জীবন-যৌবন উৎসর্গ করে মরণের দিন গুণতে হবে। ভেতরটা মিত্রার জ্বলে ওঠে। অদৃষ্ট বলে অদেখা ভাগ্যের কাঁধে সব দোষ চাপিয়ে, দেখা-দৃষ্টির দুর্ভোগ থেকেও উদ্ধার পাওয়ার উপায় থাকবে না? কারা ওদের এ ভাবে বেঁধে রেখে গেছে? এখনও কি সে শৃঙ্খলে পচন ধরেনি? টেনে ফেললে ছিঁড়বে না?

না ছিঁড়বে না। বছর বছর নূতন করে গড়িয়ে আনা হচ্ছে আধুনিক ডিজাইনের—হাতবন্ধ না বাজুবন্ধ বোঝা দায়।

রাণী বললো, কি অমন করুণ চেহারা ক'রে তাকিয়ে রয়েছ যে আমার দিকে? ভাবছ, 'আহা মেয়েটা'।

না, সে আর নতুন করে কি ভাববো।

নতুন করে ভাববার যখন নেই, তখন নতুন ক'রে দুঃখ পাওয়ার ও কিছু নেই। কিন্তু তুমি করছো কি?

আশ্চর্য্য হয়ে মিত্রা বললো, আমারই বা নতুন ক'রে করবার কি আছে?

কেন থাকবে না?

কি?

তা আমি জানিনা।

মামী, মামী! হঠাৎ হেঁকে ওঠে মিত্রা।

সৌমী জবাব দিল, আসছি দাঁড়াও।

এক্ষুণি। যে ঘরে যে ভাবে থাক, চলে এসো।

অমন করে হৈ হৈ করছো কেন গো? হেসে উঠল রাণী।

হ্যাঁ চেষ্টা করছে মিত্রা হৈ হৈ করতে। নইলে তলিয়ে যাচ্ছে সে হাঁপিয়ে যাচ্ছে সে। কবে যে শামুকের খোলে ঢোকার মতো গুটিয়ে অন্তরবন্দী করেছিলো নিজেকে মনে নেই। সেটাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে—তবু এক একসময় মনে হয় আর পারে না।

মামীকে ডাকছ কেন? রাণী বলে।

আত্মহত্যার ব্যবস্থা করতে বলব।

সে কি!

হ্যা, ঠিক করেছি উষর এ জীবন আর রাখব না।

গল্প, উপন্যাস, নাটক কিছু জমে না প্রেম ছাড়া।

তাই না জীবনটা জমছে না। আত্মহত্যা ছাড়া গতি কি?

আত্ম সমর্পণ কর।

কার হাতে?

দু'টি হাত অঞ্জলি বদ্ধ করে মিত্রার সামনে বাড়িয়ে ধরলো রাণী— এ হাতে।

তোমার হাতে?

হ্যাঁ। আমি যথাস্থানে পৌছে দেব।

সেটা কোথায়?

তা আমি দেখব।

এখনো দেখা হয় নি?

হয়েছে।

হয়েছে? শুনি ত। দুর্দ্দমনীয় কৌতুহলে ঝুঁকে এল মিত্রা রাণীর সামনে।

উহুঁ তুমি না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছু বলছি না।

আমিই বা না শুনে দেই কি করে।

বিশ্বাস রাখতে হবে আমার উপর।

আচ্ছা সেটা ভেবে দেখছি। কিন্তু এতটা উদার মতের হয়ে উঠলে কবে থেকে। আমি তো দূরে, এবার কার প্রভাবে।

ইস্, আমার বুদ্ধি বিবেচনা কেবল বুঝি ধারের কারবার করে চলে।

সৌমী চা খাবার পাঠিয়ে দিল।

চা খেতে খেতে কত গল্প যে ওরা করে চললো ঠিক নেই। হঠাৎ 'ওমা' বলে রাণী ওর ব্যাগ ঘেটে একটা চিঠি বের করে বললো, নেও পড়। এতক্ষণ ভুলেই গেছলাম এটার কথা।

কার চিঠি? চিঠিটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলো মিত্রা।

কমলার। কি মজার চিঠি যে মেয়েটা লেখে।

মিত্রা চিঠি খুললো।

বউদি—মিষ্টি বউদি!

আচ্ছা, পা ফেলা দেখে যেমন ধরা যায় মানুষটা নেশাগ্রস্ত কিনা,—হাতের কলম চলা দেখেও কি সেটা বোঝা সম্ভব! তুমি কি বুঝতে পারছ, কমলার হাতের কলম নেশায় টলে টলে চলছে!

নেশা করেছি, কি করব বলো! ভদ্রলোকটি দুরন্ত একরোখা। বলেন সামান্য খেলে এ্যাপিটাইট বাড়ে অর্থাৎ ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হয় স্বাস্থ্যোন্নতি। আর মাত্রা ছাড়ানো।

সে তো বিশ্বসংসারের সব কিছুর ফলই খারাপ।

বললাম এই কাঠি কাঠি হাত পা নিটোল হবে।

বললেন—নির্ঘাত।

আজ আমাদের সেই পর্বের প্রথম রাত। সাহেবি কেতায় নয়, পুরো ভারতীয় প্রথায়। পরিকল্পনায়—অসিত চক্রবর্তী।

ভারী কাশ্মীরি গালিচার মাঝখানে ভাসে সাদা আর লাল গোলাপের গুচ্ছগুলো, দুলছে বাতাসে। কাছে পীত বর্ণের পানীয় ভরা টলটলে ডিকানটর। ট্রের উপর পানের সরঞ্জাম। ঘর আমোদিত আতর সৌগন্ধে। একেবারে নির্ভেজাল ওমরের শয়ন-ঘর। দীপ্ত মাঙ্গলিক না গাইলে কাল আর কমলা চোখ মেলছে না।

কিন্তু অমন ঢলঢলে চেহারা হলে কি হবে—বস্তুটা স্বাদে গন্ধে বিস্বাদ। মা গো, মুখটাকে তেতো গেলা করে তো প্রথম মাত্রা শেষ করা গেলো। দ্বিতীয় অবস্থা—এর জন্য এত। তৃতীয়ত — হ্যাঁ তো, কেমন যেন একটা অচেনা হৃদয়াবেগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। স্ফুর্তির নিশানা মিলছে ভারী হয়ে আসা চোখের পাতায়, অস্পষ্ট উচ্চারণে জড়িত জিভে কথা বলতে। হেসে গড়িয়ে পড়লাম। বউদিগুলো তো নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। কমলা যে বসে টুইটুম্বুর হয়ে উঠেছে আঙ্গুর রস পান করে, কল্পনাও করতে পারছে না। উঠে দাঁড়ালাম—চিঠি লিখব।

অসিত বাবু তো স্তম্ভিত। বলো কি! যা বলেছি, বলেছি-ই।

কার্পেটের উপর উপুড় হয়ে পড়লাম কাগজ নিয়ে।

কি আর করেন! শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছেন আর মাঝে মাঝে চুল ধরে টানছেন আর জিজ্ঞাসা করছেন, হলো? লোকটা মন্দ নয়। এখন তো একেবারে অপূর্ব লাগছে।

তাই খুব চুপি চুপি বলছি—শোন বউদি (কমলা কিন্তু এখন দস্তুর মতো সিরিয়াস) স্লিপ্ লিখে দোকানে পাঠাও চাকরকে। এখানকার পরিকল্পনায় অসিত। তোমার ব্যবস্থাপনার হোক রাণী। বন্ধ কর ঘরের দরজা, অবশ্যি দাদাকে ভেতরে রেখে। তারপর নিজে নেও দাদাকে দেও। কথা বল অনর্গল। মিত্রা দেবীর ট্রেনিং এর

শুধু ভালো কথা আর ভারী ভারী কথা নয়— যা খুশি যা মন চায়। তরল হও—হ্যাঁ তরল হতে বলছি তোমাকে—লাইট। তোমাদের কমলা এর ভেতর অনেক কিছু শিখেছে। সব চাইতে নতুন যেটা শিখেছে—লজ্জা করছে। চোখ বুজে বলে ফেলি এ্যাঁ। ছেলেরা তরলতা হালকামো ভালোবাসে। যারা নিজেরা তরল তাদের তো কথাই নেই। যারা তা নয় গম্ভীর গম্ভীর ভাব করে, তারাও। শুধু তাই নয়, তারা ভালোবাসে আদিমতা। বাঁচতে হবে তো, সামঞ্জস্য ক'রে নাও। নাঃ কেমন যেন গম্ভীরভাব এসে যাচ্ছে, বেচারীর অত আয়োজন সব পণ্ড করব শেষে—তাই এখানেই থাক।

মিত্রা হাতের চিঠি ভাঁজ করতে করতে বললো, মেয়েটার মাথাটা হাতের কাছে পেলে গুঁড়িয়ে দিতাম—'মিত্রা দেবীর ট্রেনিং এর কথা নয়। কিন্তু ভগ্নীর পরামর্শটা ভ্রাতা নিলে হয়। ভাইকে বোনের চিঠি দেখিয়েছ।

রাণী বললো, পাগল নাকি।

জোরে হর্ণ বেজে উঠলো নীচে।

তোমার গাড়ী এসেছে।

হ্যাঁ, শমিত নিতে এসেছে। এর ভেতর দু ভাইয়ে দু'খানা নতুন গাড়ী কিনেছেন। সে গাড়ী নিয়ে বড় বেরিয়েছেন সস্ত্রীক, আর একজন স-বন্ধু।

আগের গাড়ীখানার ড্রাইভার তুলে দিয়ে সেটা নিয়ে সহর চষে বেড়াচ্ছে শমিত। আজ সবাই বেরিয়ে গেলে সুযোগ বুঝে বললাম, একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসবে। বললো, চলো। গাড়ীতে উঠে বললাম, কোথায় যাব জিজ্ঞাসা করলে না। বললো, জানি।

ঘুমন্ত কুমার মুন্নীকে সস্নেহে চুমু খেয়ে রাণী নিচে নেমে এলো। মিত্রা সঙ্গে এলো গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে।

বৃষ্টি ধরে গিয়ে দেখা দিয়েছে আকাশের গায় ছোটো একটুক্‌রো চাঁদ। তার আলো এসে পড়েছে মসৃণ ভিজে পিচ পথে। সবুজ মর্মরিত পাতায়। গাড়ীর মাথায় জল বিন্দুর উপর। যেন নব-আষাঢ় ধূলি-মলিন শহর ধুইয়ে তার সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে। গাড়ীতে হেলে বসে সিগারেট টানছিলো শমিত। ওদের দু'জনকে দেখে, হাতের প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলে, ভেতর থেকেই হাত বাড়িয়ে গাড়ীর দরজাটা খুলে দিলো।

আরো কিছুটা সময় পথে দাঁড়িয়েই দু'জনে পারিবারিক কথার আদান-প্রদান করলো-- – যে কথা এতক্ষণ বাকী রয়ে গিয়েছিল। এতটুকু বাঁধা সময়ের ভেতর কি আর সব কথা হয়। শেষে চলে গেলে মনে হয় কত কথা জানবার ছিলো বলবার ছিল। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলোর কুশল সংবাদ পর্য্যন্ত মিত্রার জিজ্ঞাসা করতে এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। ভাগ্যিস শেষ অবধি ভুলটা ভুলই রয়ে গেলনা। রাণী কি ভাবত। ত্রুটিটা শুধরে নিতে বারবার ও ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আর পড়াশুনোর খবর নিতে লাগল।

মিত্রা বিদায় নিলে রাণী জিজ্ঞাসা করলো শমিতকে— তুমি মিত্রার সঙ্গে কথা বললে না কেন।

গাড়ীর মোড় নিতে নিতে শমিত বললো, সাহসের অভাবে।

রাত তখন কত হবে কে জানে।

অনেক যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে, সেই সঙ্গে শিল।

জানালা দরজায় শব্দ তুলতে লাগলো শিলের আঘাত। মিশকালো রাতটা এসে যেন মিত্রার ঘরে লোভীর মত পড়লো হুমড়ি খেয়ে। অন্ধকারে একটা ষ্টিয়ারিং ঘোরানো হাতের হীরে উঠতে লাগল জ্বলে জ্বলে।

পরের দিন উঠে-পড়ে লাগলো মিত্রা বাড়ী-ঘর গোছগাছ করতে। ঝাড়ল মুছল ধোয়াল সাজালো। ডালিমের কোমর ধরে উঠল জল টানতে টানতে। কি আর হয়েছে তাতে একদিন তো। মামীদের বললো, যত ছেঁড়া জুতো, ময়লা কাপড় শোবার ঘরে রেখে কি সৌন্দর্য্য বাড়াচ্ছ শুনি। কি কাজে আসবে এ সব।

চাকরকে দিয়ে দাও রাস্তায় ফেলে। মা, এত কি ডালা কুলো সামনের দিকে। রইলো এ সব ভাঁড়ার ঘরে। বাচ্চাদের জিনিষপত্র এক জায়গায় গুছিয়ে দেখিয়ে দিল কিভাবে নিতে হবে আর রাখতে হবে। যে তা করবে না তার শাস্তি ভীষণ।

একদিন পড়ল নিয়ে ছেলেমেয়েদের। বসলো মাথা ঘসার স্যাম্পু, নখ কাটার কাঁচি ইত্যাদি নিয়ে।

ইস্ তোদের দেখে সবাই বলবে তোদের ঘরে মা নেই।

মুন্নী আহ্লাদে মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, এই আমার মা।

সে তো তুমি দেখছো। স্কুলের কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না। তারা তোমাদের দেখে ঠিক বলবে, ঘরে মা নেই মুন্নি বেবীদের, তাই না এমনি নোংরা থাকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে উঠল মুন্নী, তা কখ্খনো ও ভাববে না। তোমাকে না দেখলে কি হবে, আমরা খেলছি, হাসছি, আনন্দ করছি ওরা ঠিক বুঝবে মা আছে। মা না থাকলে কি হাসতাম আমরা।

একদিন গেল রাঁধতে। আজ সব রাঁধব আমি। আমিষ, নিরামিষ সব। দেখো, মামারা তোমাদের রান্নার চাইতে অনেক ভালো খাবেন। ঢুকলো রান্না ঘরে। রাঁধল, খাওয়াল তারপর মাথা ধরে, সারিডন খেয়ে এসে বিছানায় শুলো। বললো, রান্নার লোক রাখ মামী।

মামীরা হেসে বলে, হ'লো তো একদিন একদিন করে সবই করলে আর দরকার নেই আমাদের সাহায্যের। তোমার বই নিয়েই তুমি থাক।

দিন যায় মিত্রার হাতে বই থাকে বটে, কিন্তু তাতে মন থাকে না। বই-এর কাল্পনিক মানুষগুলোর সুখ, দুঃখ, প্রেম ভালোবাসায় জড়িয়ে যাবার আগেই কাছের মানুষ এসে দখল ক'রে বসে ওকে। রমা এখন কোথায়। এখানে না জার্মানীতে। ঠিকানাটার জন্য মনটা ছট্‌ফট করে। সেদিন কি অবস্থার ভেতরই না ওদের শেষ পর্য্যন্ত বিদায় নিতে হয়েছিল। নইলে কখনও মিত্রা ভুলত রমার ঠিকানাটা চেয়ে রাখতে। বিদেশী জীবনযাত্রার কত নতুন খবর ও আরব্য উপন্যাস পড়ার মত পড়ত ঘরে বসে। শুনতো রমার জার্মান স্বামীর গল্প। ভদ্রলোকটির চেহারাখানা নিশ্চয়ই যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। তাই তো হয় জার্মানরা। ঐ থাবার মত বড় বড় হাতে রমার ছোট্ট পাতলা হাতখানা কেমন লাগে। নিজের হাতটা মিত্রা মেলে ধরল চোখের সামনে। হাতটা একবার শক্ত মুঠো করে— আবার মেলে দেয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে পাতলা ফর্সা চামড়ার নীচে রক্তের খেলা। আংটিটা মাংসের ভেতর ঢুকে গেছে—মোটা হলো নাকি আরও। আচ্ছা কমলা....নাঃ। ওর চিঠিটা যেন মিত্রার মাথায় বসে আছে। কিন্তু কি আছে ওতে অত পেয়ে বসবার। অসিত আর কমলার ছেলেমান্‌সি তো মিত্রা কম দেখেনি। ওর ছেলেমান্‌সির বয়স চলে গেছে। কুড়ি, বাইশ, পঁচিশে।—কবে এসেছিল কুড়ি, বাইশ, চব্বিশ, চলেই বা গেল কবে। কি নিয়ে গেল সে তার যৌবনের ভেট। তার চাওয়া, কই কুড়ি বাইশ তো ওকে স্মরণ করিয়েও দেয়নি একবার। তখন কি মিত্রা মরেছিলো। কিন্তু কিসের বয়স গেল, সুখের আনন্দের সম্ভোগের। যেমন বাল্যে যায় পুতুল খেলা, কৈশোরটি পার হলেই যায় চাঞ্চল্য।

হাতের বই রেখে উঠে পড়ল মিত্রা। গিয়ে দাঁড়াল আয়নার কাছে। আঁধারের গোমট গরমে ঘামে ভিজে পাতলা ব্লাউজটা গেছে শরীরের সঙ্গে লেপটে। জামাটা খুলে ফেলে স্বেদ-স্যাঁত-সেতে শরীরে দিলো কৌটো উপুড় করে পাউডার ঢেলে। পাউডার হাতে দিয়ে ঘসে মিলিয়ে দেয় না তো যেন মনে হয় ভেলভেটের উপর হাত বুলোচ্ছে। হাতের স্পর্শে যে সৌন্দর্য্য এত নরম, কোমল, আয়নাটার প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে সে সৌন্দর্য্যকে দেখাচ্ছে কিনা জমা পাথর। জীবন নেই, আছে প্রাণহীন কাঠিন্য।

কমলাদের ওমরের শয়নঘর কি আজও বসবে? বাতাসে গোলাপ দুলবে, হাওয়ায় উড়বে আতর গন্ধ। অসিত সিগারেটের ধোয়া ছাড়াতেছাড়তে হাত বাড়িয়ে কাছে টানবে কমলাকে— নাঃ।

কিন্তু বৃথা। যতই রাগ টেনে ধর আর চোখ রাঙাও, মন তার আপন তৃপ্তির পথে ঘুরে ফিরে গিয়ে উপস্থিত হয়—এই তার ধর্ম। কি বিড়ম্বনা। অসহিষ্ণু ভাবে উঠে জানালাগুলো সশব্দে খুলে দিল মিত্রা। ঘরটা ভরে থাক আলোতে। গিয়ে দাঁড়াল সে জানলার কাছে।

রোজকার মত পাশের বাড়ীর মহিলাটি ছাদে বড়ি, আচার উল্টে পাল্টে দিচ্ছিলেন। রোজ এই করতে দেখে ওকে মিত্রা। যৌবনে সুন্দরী ছিলেন মহিলাটি। সে সৌন্দর্য তার চলে যায়নি, শুধু পরিণত গাম্ভীর্য্য নিয়েছে। কাজের মানুষ। সারাদিন চরকির মত ঘুরে কাজ করে। তাই হয়ত চর্বি জমে উঠতে পারেনি শরীরে। শরীরটা তার আশ্চর্য্য তরুণ। লম্বা খাসা একটি নাক। রোদ একদিক থেকে আর একদিকে সরে গেছে। ছায়ার জিনিষ

রোদের দিকে টেনে টেনে নিচ্ছিলেন তিনি। এই আচার, আমসত্ত নাড়াচাড়া, আর ভাই এর দুধ গরম করা ছাড়া আর কোনো সাড়া কি মেলে না এর মনে? না, মিললেও তিনি সেটাকে প্রশ্রয় দেননা, মেরে ফেলেন। সন্ধ্যাবেলা ছাদে সন্ধ্যা করতে বসে হঠাৎ যখন মেঘ করে আসে, দমকা হাওয়া ছাড়ে, বাতাসে সাদা আঁচল উড়িয়ে নেয় তখন কি ভাই এর দুধের বাটিতে ধুলো পড়ছে কিনা, আর ভাইপো, ভাইঝিদের শুক্‌নো কাপড় ভিজলো কিনা, এ ছাড়া আর কিছু মহিলাটির মনে আসে না। মনে কি হয় না, মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে এখন কারুর সঙ্গে গল্প করার কথা যে নাকি গল্পের মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে তার হাতটা স্পর্শ করবার জন্যে অস্থিরতা প্রকাশ করবে।

কিন্তু রাত্রিও ওকে বঞ্চিত করল একটানা শান্তির ঘুমটুকু থেকে। অসংলগ্ন সব স্বপ্নের ভীড় চোখের পাতা দুটি এক হতে না হতে ওকে জাগিয়ে ছাড়ে। দেখে, গড়িয়ে যাচ্ছে মস্ত উঁচু এক পাহাড় থেকে। দাঁত ভেঙ্গে মাথা থেত্‌লে চুলে রক্তে একাকার। কিন্তু রক্তগুলো কি দারুণ সাদা, মাগো! কোনদিন দেখে, হলে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। অবসাদে হাত চলে না। জানেনা একটি প্রশ্নের জবাব। জানেনা সে অন্য মেয়েরা সব বেঞ্চে মাথায় এক করে কত কি লিখে চলেছে। কি লিখছে ওরা এতো, করুণ নয়নে তাকিয়ে দেখছে। পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে ওর কলমশুদ্ধ হাতটা কে ধরলো এমন শক্ত মুঠোয়। মুখটা সে তার দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার হাতের আংটির আলোটা টর্চের আলোর মত পড়েছে খাতার পাতায়। লিখে চললো দ্রুত গতিতে। তারপর হাত মুঠো করে ধরে বললো, চলতো। বলার স্বরটা মিনতি মাখা, কিন্তু হাতের মুঠোটা কি দৃঢ়! কিছুতেই পারে না সে নিজেকে মুক্ত করতে— কুমার, মুন্নী!—

মার হাতের ঝাঁকুনিতে জেগে উঠে মিত্রা, দেখে ওর দুচোখ ভরা টলটলে জল। তারপর রাতজাগা মিত্রাকে নিয়ে বাকী রাত মন যে খেলা খেলে, মর্মান্তিক সে খেলা।

একদিন ধেৎ-তেরি করে উঠলো মিত্রা ত্যক্ততায়। কিন্তু গোটা জীবনটাই তো আর 'ধেৎ-তেরি' বলে দূরে ঠেলে রাখা সম্ভব নয়। এমনি সময় নিতান্তই আকস্মিকভাবে মিত্রা আবিষ্কারের বিস্ময়ে দেখলো, আঁকার হাতকে তার তুচ্ছ করবার মত নয়। ছেলেমেয়ের ছবির বই থেকে ওদের খেলা দিতে গিয়ে পেন্সিলের টানে টানে দিব্য গোঁফ ফুলিয়ে দাঁড়াল তো বিড়াল ছানাটি চোখে শিকারী দৃষ্টি নিয়ে। তার ঘাড়ের রোঁয়া ফোলান গোঁওও— গোঁওও শব্দটা পর্যন্ত যেন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে। মনে পড়ল, দাদু একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হাতী বানান করো তো। ছোট্ট এতোটুকু মেয়ে চুল ঝাঁকিয়ে ও জবাব দিয়েছিল, বানান করতে পারব না। এঁকে দেখাই? ওর জবাব শুনে অবাক দাদু বলেছিলেন, বানান করতে পারবে না। এঁকে দেখাবে? পেন্সিল তুলে দিয়েছিলেন হাতে। দেখাও দেখি এঁকে। দাদুকে সেদিন হাতী এঁকে বিস্মিত করে দিয়েছিল সে। তারপর সবাইকে ছবি এঁকে আশ্চর্য্য করে দিয়েছে সে শৈশবে অনেক। স্কুলে ড্রয়িং এ প্রথম হয়ে পুরস্কার পেয়েছে প্রতিবার। কিন্তু তাই বলে কারু মনে কোনদিন উঁকি দেয়নি যে এটাকেই আঁকার হাত বলে।

খাতা ভরে একের পর এক এঁকে চললো সে। আনন্দ ধরে না বাচ্চাদের, যে যতটা পারে আদায় করে নিয়ে দৌড়ল বাড়ীর সবাইকে দেখাতে। ওরা চলে গেলেও হাতের পেন্সিল নামালোনা মিত্রা। নিজের নাম ছাপানো প্যাডটা টেনে নিয়ে অবশিষ্ট রাখলোনা তার একটি পাতা। কে আঁকছে এ সব? এই দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে, বসে থাকা মজুর, ওর পায়ের কাছে গুড়ি মেরে বসে থাকা মিনি বেড়াল। ওর হাত— কি কাণ্ড! আর ও কিনা এই হাত দুটোকে কোলের উপর রেখে বসে থাকে দিনরাত চুপ করে। ছবি আঁকার সরঞ্জাম আনালো গাড়ী বোঝাই করে। ঘর ভরে উঠতে লাগল মিত্রার সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ ভালো মন্দো ছবিতে। মামারা উৎসাহ দেন। আঁকার হাত দেখে একটু চিন্তিত হন। ছোটমামা বললেন, কোন কাজের পিছনেই শিক্ষা না থাকলে হয় না। অশিক্ষিত পটুত্বে কিছুদূর অবশ্যি যাওয়া যায়। তারপর থেমে যেতে হয়--এই তার মত। আর্ট স্কুলের একজন দক্ষ শিক্ষক নিয়ে এলেন তিনি মিত্রাকে ছবি আঁকা শেখাবার জন্য।

মামীরা বললেন, ঘর দোর সব যে রঙীন হয়ে উঠলো মিত্রা। অর্দ্ধ সমাপ্ত ছবিখানা একাতে সেকাতে দেখতে দেখতে মিত্রা বলে, শুধু কি বাড়ী ঘর দোর। আমার হাত তোমাদের মন পর্যন্ত রাঙিয়ে তুলবে।

রাণীকে লিখলো, যে ভাবেই হোক চিঠি পাওয়া মাত্র চলে এসো। নতুন খবর। আশ্চর্য খবর। মিত্রা ছবি আঁকছে। তার মামারা বলছেন, মনে হয় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে এর ভেতর। আর তার শিক্ষক বলছেন, 'মনে হয় নয়,—নিশ্চয়।

কমলাকে লিখলো, তোমার ওমরের ঘরের নেশার স্বাদ অবশ্যি আমি জানিনে। কিন্তু আমি যে নেশার স্বাদ পেয়েছি, মনে হচ্ছে তুমি বুঝি ভাই হেরে গেলে। ছবি পাঠালাম।

ছবি পেয়ে চিঠি লিখলো কমলা, স্তম্ভিত হয়ে গেছি। হ্যাঁ গো তোমার ছবি দেখে। তোমার অসিতবাবু বলছেন, লিখে দাও বউদিটিকে এখানে চলে আসতে। ভিন্‌দেশীয় জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে যান, তারপরে আঁকুন। তোমার ছবিগুলো এখানকার একটি পত্রিকা নিয়ে গেছে। বাংলার ব্যাপারে ওদের ভারী উৎসাহ। কিন্তু ছবিগুলো নিয়ে যাওয়ার পর বসে ভাবছি, মা গো, কি ভালো আমি! শহরশুদ্ধ লোককে ডেকে ডেকে চায়ে আপ্যায়ন করে ছবি দেখালেন, তারপর একেবারে দিয়ে দিলেন, পত্রিকায় প্রকাশ করতে। আর আমিও তাই হতে দিলাম। যদি নাম কর, প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে আরও ছবি চায়—চায়, ফটো ছাপাতে, জীবনী লিখতে! পারবনা সহ্য করতে বউদি, পারব না। 'ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী— ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম।' না হলাম শিল্পী নাই বা হলাম সাহিত্যিক, তাই বলে হিংসার শক্তিটুকুও ধরব না?

রান্না কি হবে জিজ্ঞাসা করতে এসে অহেতুক প্রচণ্ড ধমক খেল বাবুর্চি। আজ ভদ্রলোকটির অফিস ফেরত শ্রান্ত অদৃষ্টে কি রয়েছে কে জানে! বাস্ সুমহতী ঈর্ষার উপস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। এখন ভালো হতে পারাটা আরও সুমহান ধর্ম। প্রবৃত্তির উপরে চলে যাওয়াটাই হ'লো কথা। ষড় রিপু—অর্থাৎ ছয় শত্রু বেষ্টিত হয়ে না চললে শক্তির পরীক্ষা হবে কি করে? সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করেই না, অভিমন্যু বীর। কবে আসছ শিগগির জানাও।

মামারা খবর নিয়ে এলেন, সর্বভারতীয় প্রদর্শনী হবে দিল্লীতে। বহু সময় রয়েছে—ছবি তৈরী করে পাঠিয়ে দিও।

এত আনন্দ কল্পনা করতে পারেনা মিত্রা। সময় যেন তার ডানায় বসিয়ে ওকে নিয়ে উড়ে চলেছে। রাতের স্বপ্ন দিনে আর ওকে পীড়া দেয় না। জলের ওপরকার শিশির ধোয়া পদ্মের মত টলটলে মন নিয়ে ঘুম ভেঙ্গে উঠেই ও মগ্ন হয় ওর আঁকার সাধনায়। স্নানের ঘরের ভিজে দেয়ালে রান্নাঘরের ধোঁয়াটে মলিনতায়, ছায়া আবছায়া আলো অন্ধকার, সর্বস্থানে মিত্রার চোখ দেখে কেবল ছবি আর ছবি। ঘোরে ওর চোখে দৃশ্যময় জগৎ। অদৃশ্য এক শক্তির পায়ে মাথা কুটে কুটে প্রার্থনা করে—হাতভরে শক্তি দাও ভগবান! তোমার ভাণ্ডার তো পূর্ণ। কৃপণতা করো না।

প্রথম, জীবনে প্রথম লীলাকান্তের উদ্দেশ্যে হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি বাড়িয়ে ধরল মিত্রা। বঞ্চিত ক'রে ক'রে, নারীত্বে, সখ্যে, সৌহার্দ্যে, সর্ব দেওয়ায় বঞ্চিত করে, তুমি আমার জীবনটাকে এমন ফাঁকির শূন্য ভাণ্ড করে ফেলেছিলে বলেই না ভ'রে উঠবার আগ্রহে আমার এই নিজেকে আবিষ্কার। আর আমি কিছু চাই না, আর কিছু চাই না।

সৌমী বলে, তুমি মিত্রা কথা বলা ভুলে গেলে?

জবাব দেয় মিত্রা, বলো কি। সমস্ত দিন কথা বলেছি যে আমি এদের সঙ্গে—ছবিগুলো দেখালো মিত্রা চোখে। সব চাইতে ওস্তাদ কথক মানুষের মুখ নয়—এই দুটি হাত। কাগজ কলম, রং তুলি বাদ্যযন্ত্র যা মন চায় বোস হাতে করে। গুণী হলে এমন জমবে, মুখ কথা বলতে ভুলে যাবে। দুনিয়াতে কাজের শত্রু, শান্তির শত্রু হলো কথা। জান মামী আমি ভেবে দেখেছি, পৃথিবীর লোকগুলো যদি শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আর 'শান্তি শান্তি' করে চিৎকার ছুটাছুটি আর সভা সমিতি না করে, শুধু কেবল চুপ করে ঘরে বসে থাকতো তবে শান্তি প্রস্তাবের প্রশ্ন উঠে যেত পৃথিবী থেকে।

পৃথিবীর কথা জানিনে, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথার জন্য কত যেন অশান্তি বেধেছে আমাদের। বলে ওঠে সৌমী।

বাধেনি। কিন্তু বাধতে কতক্ষণ। জিভটি তো রসালো হয়েই থাকেন। তার কি বলো। সে তো যা বলার বলে দাঁতের দুর্গে আশ্রয় নেবে। তারপর যতই শাসাও তাকে টেনে বার করা চাট্টিখানি কথা নয়।

হেসে ফেলল সৌমী।

মিত্রা তার প্রতিক্ষারতার চোখের পিছিতে কালো রং-এর ঝটকাটান মারতে মারতে বললো, তাই দিব্য নির্ঝঞ্ঝাটে কথা বলে মিত্রা তার মুটে মজুর আশ্রয়হীনা আর চিন্তামগ্নাদের সঙ্গে। ওরা এখন মিত্রার সঙ্গে কথা বলছে। তারপর ছড়িয়ে পড়বে তার কথা নিয়ে। হাসছো। হাসো। কিন্তু জান, মানুষের জীবনটা শুধু কেবল কতগুলো ঘটনার সমাবেশ। তার ভেতর সম্ভব যেমন আছে। অসম্ভব ঘটনাও আসে। কেউ বলতে পারে না, কার জীবনে কোন অসম্ভব ঘটনা এসে উপস্থিত হবে। কেউ বলতে পারে না, কাকে দিয়ে কি হবে আর হবে না। শিল্পী মিত্রা মুখোপাধ্যায়— উঃ আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। মামী—

আনন্দ চিত্ত মাঝে আনন্দ সর্ব কাজে,
আনন্দ সর্ব লোকে মৃত্যু বিরহ শোকে—

হাতের তুলি রেখে স্প্রিং-এর খাটে ধুপ্ করে শুয়ে পড়ে চোখ বুজে। যেন রোমাঞ্চটা অনুভব করে মিত্রা।

এমনি আকুলভাবে প্রকৃতির দাবীর উপর প্রতিভার জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেবার সাধনায় মিত্রা যখন বিশ্বসংসার ভুলতে বসেছে, আর তখনি কিনা একদিন অসহ্য মাথার যন্ত্রনায় জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল সে।

ম্যানিন্জাইটিস? ম্যালিগনেনট ম্যালেরিয়া?

ওষুধে, ডাক্তারে গৃহস্থবাড়ীর বাতাস ভারী হয়ে উঠল হাসপাতালী গন্ধে। প্রাণসংশয়ে মন কষাকষি ভুলতে না পারলেও মুলতুবী রাখতেই হয়। এল ওর ভাসুর জা শাশুড়ীরা। সৌমীর সঙ্গে শুশ্রূষায় অংশ গ্রহণ করে এসে রাণী। দিন থেকে মধ্যরাত পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপত্র লিখিত ওষুধ যোগাড় করে শমিত। আর অবসর সময়ে গাড়ীর গদিতে হেলে বসে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানে। বেশী উদ্বিগ্নতার ছাপ বাড়ীর চেহারায় ফুটে উঠতে দেখলে উপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মিত্রার দিকে তাকিয়ে।

সুমিত্রা সেই যে মেয়ের কাছে এসে বসলেন, সবাই বুঝল মেয়ে না উঠলে মায়ের এ বসাও শেষ বসা।

তিনজন ডাক্তার পরস্পর পরামর্শ করেন। কি বলেন, কি লেখেন, বোঝে না কেউ। ছয়টি দিন কাটল নিরবিচ্ছিন্ন জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায়। ইন্জেকসনে, ইন্জেকসনে নীল হয়ে উঠল মিত্রার দু'হাত।

সাত দিনের দিন মিত্রা ঠোঁট নেড়ে অস্পষ্ট স্বরে জল চাইল।

নিজে থেকে সে জল খেল।

ডাক্তাররা বিপদকাল উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করলেন।

সাতদিন পর দমবন্ধ বাড়ীটা আবার সহজভাবে নিঃশ্বাস টানল।

লীলাকান্তের মৃত্যুর রাতে যাদের মনে হয়েছিল কোনো কিছুতেই মানুষের হাত নেই, তারাই আবার ভাবল মানুষ কি না করতে পারে।

মিত্রা ঘুমোচ্ছে। ঘুমে যেন সামান্য ব্যাঘাত না হয় ডাক্তারদের এই নির্দেশ।

সৌমী আর রাণী মিত্রার পাশের ঘরে বসে মৃদুস্বরে কথা বলছে।

রাস্তায় শমিতের পরিচিত গাড়ী থামার শব্দ হ'লো।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল সৌমী।

ঘরে ঢোকে শমিত। জিজ্ঞাসা করে রোগী কেমন আছে?

ভালো আছে।

তবে আজ আপনারা বিশ্রাম করতে যান। মস্ত এক ঘুম দিয়ে এলাম সেই দুপুর থকে এই পর্য্যন্ত। এখন দিন দেখি সব ওষুধপত্র বুঝিয়ে। যে রাতে কিছু করবার নেই সে রাতটা আমি জাগি।

সৌমী আপত্তি করলো, কেন আপনি কষ্ট করবেন? এই ক'দিন তো আপনার ওপর দিয়েও কম যায়নি।

ওর ওপর দিয়ে আবার কি বেশী গেছে? বিস্ময় প্রকাশ করলো রাণী। ও গাড়ী দৌড়তে ভালোবাসে সারাদিন গাড়ী দৌড়েছে। আজকে রাত জাগার পালা ওর ওপরই থাক না, আপত্তি কি?

সৌমী ওষুধের টেবিলের কাছে যেতে যেতে বললো, ওষুধ আজ আর বুঝিয়ে দেবার মত কিছু নেই। যদি জেগে যায় আর ঘুম না আসে তবে এই ঘুমের ওষুধটা শুধু।

সৌমী যাবার আগে দেখিয়ে দিয়ে গেল ফ্লাস্ক ভর্তি চা। এগিয়ে দিয়ে গেল হাতের কাছে বই।

বাঃ অপূর্ব ব্যবস্থা। শমিত গিয়ে কৌচে বসলো বই হাতে।

নীরব, নিথর রাত। প্রহর শেষের সঙ্কেত ডাক ডাকছে মোরগ। এতগুলো দিনের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর হয়রানির পর সবাই আজ স্বস্তির ঘুমে মগ্ন। কিছু না ভেবে, না করে, চুপচাপ বসে থেকে সময় পার করে দিতে লাগল শমিত।

তারপর এক সময় যখন মনে হ'ল এবার একবার রোগীকে উঠে দেখে আসা উচিত তখন উঠে দেখতে এল মিত্রাকে।

ঘরের সামান্য পাওয়ারের টেবিল আলোটার শেড-এ রঙিন কাপড় চাপিয়ে আলোটাকে আরো স্নিগ্ধ করা হয়েছে। মাথার উপর পাখাটা ঘুরে চলেছে নিঃশব্দে। মিত্রার বাঁ হাতটা বুকের ওপর। ডান হাতটা ঝুলে পড়েছে খাটের বাইরে। তেলহীন রুক্ষ চুলে, রক্ত শূন্য ঠোঁটে, রোগ-পাণ্ডুর নরম গালে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ঘুম জড়ানো সব্জে আলো। আজ বোধ হয় বিছানার চাদর-ওয়াড় দেওয়া হয়েছে পাল্টে। ওষুধের গন্ধে হয়ত মিত্রা বিতৃষ্ণায় নাক কুঁচকে থাকবে তাই হয়তো সৌমী ঢেলে দিয়েছে বিছানায় দামী সেন্ট। স্প্রিং-এর গা-তলিয়ে যাওয়া খাটে, ঐ ধবধবে বিছানায়, ঘরভরা সেন্টের মিষ্টি গন্ধের ভেতর ডুবে ঘুমিয়ে আছে মিত্রা। দাঁড়িয়ে রইল শমিত। খানিক বাদে পাশের নিচু মোড়ায় বসে মিত্রার হাতটা তুলে নিল বিছানায় তুলে রাখবার জন্যে। রাখলও। কিন্তু শমিত হাত সরিয়ে নেবার আগেই মিত্রা 'মা' বলে পাশ ফিরে কাত হ'লো ওর দিকে।

মিত্রার বুকের নীচে শমিতের সম্পূর্ণ হাতখানা গেল চাপা পড়ে।

ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের সমতালে উঠানামা করতে লাগল শমিতের বুক।

আস্তে আস্তে হাতটা টেনে এনে কপালের স্বেদ-বিন্দু মুছল শমিত।

মাঃ—অস্ফুট শব্দ করলো মিত্রা।

শমিত একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলো, কিছু অস্বস্তি হচ্ছে মিত্রা? তার কাছ থেকে কোন জবাব এলো না দেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো শমিত।

না মিত্রা ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ঘোরে শব্দ করেছে সে। পাখার মৃদু বাতাসে মিত্রার মুখের ওপর কয়েক গাছা চুল উড়ছিলো। শমিত সেগুলোকে তার কানের পেছনে সরিয়ে দিল। তারপর আরো একটু দেখে উঠে দাঁড়ালো সে চলে যাবার জন্য। কিন্তু তার মোড়া ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর যে শব্দটুকু হলো তাতেই এপাশ থেকে ওপাশ ফিরল মিত্রা। আগের মতো তেমনি অস্পষ্ট কণ্ঠে 'মাঃ' শব্দ করল।

ঘুমের ওষুধ আর জলের গ্লাস নিয়ে মিত্রার দিকে ঘুরে এলো শমিত। মাথায় হাত রেখে বললো, একটু হাঁ করতো।

এবার মিত্রা চোখ মেললো।

সামান্য কিচুটা উপুড় হয়ে মিনতি করা সুরে শমিত ফের বললো— দেখি মিত্রা ওষুধটা খেয়ে নেও তো।

কিন্তু মিত্রা তার ঘোর চোখ মেলে আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইল শমিতের দিকে।

অল্প একটু হাসবার মতো করে শমিত বললো, কি অমন করে তাকিয়ে রয়েছ যে?

শমিতের এ কথার পরও ঠিক তেমনি ভাবে তাকিয়ে রইল মিত্রা তার দিকে।

না আর পারে না—মিত্রা যদি তার দিকে দুই অলস চোখ মেলে এভাবে তাকিয়ে থাকে তবে আর পারে না শমিত। জলের গ্লাস আর ওষুধ নামিয়ে রেখে মিত্রার পাশে বসে তার মুখটা সোজা করে ধরে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললো শমিত, কিছু বল। ওভাবে তাকিয়ে থেকো না।

ওর দুই হাতের ভেতর মুখ রেখেই এবার চোখ বুজল মিত্রা। সস্নেহে বলে উঠল শমিত, ভয় করে, ভয় করে মিত্রা—কাল যদি তুমি আমাকে অপরাধী করো—কিন্তু ততক্ষণে মিত্রার শুকনো ঠোঁট দুটো শমিতের ঠোঁটের চাপে থর থর করে কাঁপছে।

অল্পক্ষণ পরেই মিত্রাকে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়তে দেখে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল শমিত। ওর ঘামে ভেজা চুলগুলো দিল অতি আস্তে কানেব পাশে সরিয়ে, মাথার বালিশটা দিল ঠিক করে। তারপর নিঃশব্দ পায় গিয়ে দাঁড়াল বাইরের বারান্দায়। চললো একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে! একি অসম্ভব পাওয়া এইমাত্র ও পেয়ে এলো! এ কি অবিশ্বাস্য জয় এইমাত্র ও করে এলো!

দুরের আকাশে রাতের অন্ধকার পাতলা ক'রে চাঁদ উঠল। তাল গাছের পাতাগুলো শির-শির করে কেঁপে চললো। ঠিক যেন ওর শরীরের রক্তবাহিকা ধমনীর কম্পনের মত। চুলের ফাঁকে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিল তার স্পর্শ বুলিয়ে। ঘরে বাইরে, সব কিছু এমন রমনীয় মোহময় করে আজ ওর জন্যে কে সাজিয়ে রেখেছে! এমন কত রাত দাঁড়িয়ে আকাশ দেখেছে, কই এমন ক'রে তো কোনদিন ওর মনের সপ্তসুর ধ্বনি তোলে নি।

পরের দিন ভোরবেলা বাড়ী যাবার সময় নিতান্ত জানা পথেও কোথা দিয়ে যে কিভাবে একেবারে উল্টো পথে গাড়ী চালিয়ে চলেছে, প্রথমে বুঝতেই পারল না শমিত। যখন খেয়াল হলো তখনও চমকে উঠল না বা চেষ্টা করলো না ভুল শোধরাবার। ভোরের বাতাসে ঘুরলো বহুক্ষণ। বাড়ী ফিরলো দস্তুরমত বেলা হয়ে গেলে। সোজা নিজের ঘরে চলে যাবার মুখে একবার থমকে দাঁড়ালো মিত্রার বন্ধ ঘরটার কাছে। তাকাল ঘরটার দিকে অপরিসীম একটা মমতার দৃষ্টিতে। তারপর গিয়ে ঢুকল ওর তেতলার ঘরে। মিত্রার খবরটা যে একবার বাড়ীতে বলে যাওয়া উচিত সে খেয়ালটাও হ'লো না। কোন কথাটাই বা শমিতের খেয়াল আছে। মনে আছে কি কালকে সৌমীর দেওয়া ফ্লাস্কের চা তেমনি রয়ে গেছে— আজও সে সকাল থেকে চা খায়নি।

জয়ন্তী এসে ঘরে ঢুকল। প্রশ্ন করলো, মিত্রা ভালো আছে তো?

বিছানার ওপর হাত-পা টান ক'রে শুয়ে পড়েছিলো শমিত। জয়ন্তীর কথায় এমনভাবে চমকে উঠল সে, যেন জয়ন্তীর গলার স্বরটা ওর মাথার স্নায়ুতে গিয়ে হাতুড়ির ঘা মেরেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলো সে। বললো, হ্যাঁ ভালো।

খবরটা একবার বলে আসতে হয়। তোমার সাড়া পেয়েই তো মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

অপ্রস্তুত কণ্ঠে শমিত বললো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

তা দেখতে পাচ্ছি। একটু মুখ টিপে হাসল জয়ন্তী। আমাকে বসতে বলতেও কিন্তু তোমার ভুল হয়ে গেছে। যেটা কখনো হয় না তোমার।

আবারও অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলে উঠল শমিত, সত্যি—বোস বোস।

বসল না জয়ন্তী। বললো, তোমাকে দেখে কিন্তু এবার আমরা সবাই খুব অবাক হয়েছি।

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে শমিত বললো, বাড়ীর সবাই এক সঙ্গে।

তা একটু আগে পরে হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু হয়েছে সবাই। এমন সেবা তুমি করতে পার, আমরা জানতাম না। এত চিন্তিত তুমি কারো জন্যে হও, এ আমাদের ধারণা ছিল না।

মুখ টিপল জয়ন্তী।

শমিত ছাই ঝাড়লো ছাইদানে। বললো, ঠিক।

কিন্তু এরপর বলার কথা কিছু না থাকলে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হয় না। তবু দাঁড়িয়ে রইল জয়ন্তী।

সোজা ভাবে বলার না থাকা বাঁকা ভাবে বলার আছে। বললো, তা খুব ভালো করেছ। ওদের গাড়ী নেই, ছুটোছুটি করবার লোক নেই। আর এদিকে দু ভাই তো ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তোমার কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি চলছে তাই তুমি এতো করলে, তাই না আমাদের বাড়ীর মুখরক্ষা হলো।

অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট ঝাড়তে ঝাড়তে বললো শমিত, এক কাপ চা খাওয়াতে পার?

মিত্রা এখন অনেকটা ভালো।

রাণী ফিরে এসেছে। আর দরকার নেই থাকার। তবে শমিতেরই বা আর যাওয়ার কি দরকার থাকতে পারে। গেলও না শমিত। তারপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে দুপুরের দিকে গিয়ে উপস্থিত হ'লো মিত্রার ওখানে। মনের কোনে তার এইটুকুই ছিল, হয়ত এ সময়টা একা পাওয়া যেতে পারে মিত্রাকে। বেলা তখন প্রায় দুটো বাজে। না স্নান, না খাওয়া শমিত এসে উপস্থিত হলো।

সৌমী বই পড়ে শোনাচ্ছিল মিত্রাকে। উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে আহ্বান জানিয়ে বললো, আসুন। এই ক'দিন একেবারেই দেখা পাইনি কেন আপনার। বসুন আজ আপনি। সকাল সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে মেয়ে তৈরী হয়ে থাকেন

দুপুরটির জন্যে। আর ভোগান্তি আমার, বইপড়, গান কর, কবিতা শোনাও, কত কি। আজ সব ভার আপনার ওপর।

হঠাৎ শমিতের উসকো মাথার দিকে তাকিয়ে বললো, ওমা স্নান খাওয়াই হয়নি দেখছি? তবে আর কি করে হবে?

হাত দিয়ে চুলগুলো পাট করতে করতে শমিত বললো, একটা কাজে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে অনেক। নইলে আমি স্নান খাওয়া করেই বেরিয়েছি। যদি সম্ভব হয় এক কাপ চা চাই শুধু।

এক্ষুনি দিচ্ছি।

চলে গেল সৌমী।

মিত্রার খাটের পাশে নীচু মোড়াটায় বসে সৌমীর চা নিয়ে আসবার অপেক্ষা করতে লাগল শমিত।

আর মিত্রা—সৌমীর রেখে যাওয়া বইটা হাতে তুলে নিয়ে গোটা চার পাঁচ বালিশে পিঠ রেখে যে ভাবে বসেছিলো সে ভাবেই বসে রইল দু আঙ্গুলে চোখ টিপে।

ঘরের ভেতরটি আজও প্রায় সেই রাতের মতই। পাখাটা তেমনি নিঃশব্দে ঘুরে চলছে। জানালার গাঢ় নীল পর্দাগুলো দুলছে বাতাসে। ঘর ছড়ানো একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ। যে গন্ধ নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেলে অন্তরে আবেশ সৃষ্টি করে। শিয়রের কাছে টিপয়টার ওপর ওষুধ-পত্রের শিশি আর হরলিকস ওভালটিনের মাঝখানে ফুলদানি ভরা রজনীগন্ধার গুচ্ছ। বাসি, তাই তার কিছু ঝরে পড়েছে টেবিলে। কিছু ফুটছে আবার নুতন করে। মনের চাঞ্চল্য শমিতকে বেশীক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকতে দিলো না। উঠে ওষুধের শিশি তুলে দেখল। পড়ল ভাজ করা ব্যবস্থা পত্রগুলি। ঘরময় পায়চারি করে চললো, দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখে। থমকে দাঁড়াল মিত্রার কিশোরী বয়সের একটা ফটোর কাছে। কি ভীষন রোগা ছিল। সমস্ত ছবিটার ভেতর শুধু ভেসে আছে দুটি বড়-বড় চোখ। চিবুকের স্বল্প হাসিটা মনে করিয়ে দেয় মোনালিসার হাসি। আর এর পরের ছবিখানা নিতান্ত শৈশবের। খাটো বেনিয়ান গায়, খালি পা, মাথায় বড় চুল, উড়ছে। দু গাল ভরা হাসি নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শমিতের মনে হয়, মিত্রার মুখের শৈশবের এই ঝলমলে হাসি কৈশোরে এসে চিবুকে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ গেছে একেবারে ঝরে। এখনকার হাসি মিত্রার মুখে নয় চোখের কোনে। অন্তত শমিত তার চাইতে বেশি দেখেনি।

বিশেষ সময় ছিল না, চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল সৌমী।

দুপা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে কাপটা হাতে তুলে নিয়ে ধন্যবাদ জানায় শমিত।

সৌমী বললো, ধন্যবাদ তো আমি জানাব আপনাকে, দুপুরটা চোখ বুজতে পারব বলে। তারপর মিত্রার দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর গ্লাস ঢাকা মিশ্রির জলটা দেখিয়ে বললো, এটা একটু বাদে খেয়ে নিয়ো মিত্রা।

সৌমী চলে গেলে শান্তিনিকেতনী মোড়াটা টেনে চায়ের পেয়ালা হাতে খাট ঘেঁসে বসল শমিত। কথা সুরু করতে প্রথমটায় যেন কথা খুঁজে পেলোনা সে। নীরবে চায়ে চুমুক দিয়ে চললো। এ যে দস্তুরমত ঘাবড়ে যাওয়া অবস্থা। হাসি পেল শমিতের।

ঠিক এমনি একটা সময়ের সম্মুখীন যে তাকে আজ না হয় কাল হতেই হবে এ মিত্রা জানতো। মিত্রা নিজের কাছে নিজেও তত স্পষ্ট নয় আজ শমিত ওর কাছে যত স্পষ্ট।

চোখ না তুলে শমিত বলতে থাকে, ভয়, ভীষণ ভয় পেয়েছি আমি মিত্রা। তাই যেখানে আছি সেখান থেকে এক পা নড়তেও আমার সাহস নেই।

মিত্রার মনে পড়ে যায় একদিনের কথা। শমিত তাকে বলেছিলো, নাঃ, বাঁচবার আর আমার উপায় নেই। চেষ্টা করেছিলাম, পারলাম না। সেদিন শমিতের এই কথাগুলির গুঢ়অর্থ মিত্রা বোঝেনি। কিন্তু আজ তার চোখের সামনা থেকে যেন একটা আচ্ছাদন সরে গিয়েছে।

কিন্তু এর শেষ কোথায়! কোথায় এর ছেদ টানবে মিত্রা! শমিত যদি সে-রাতের কথা নিয়ে ওর কাছে আর এসে না দাঁড়াত, ও বাঁচত। মোহ কি অদ্ভুত জিনিষ! রোগের ভেতরও মোহ আছে, জ্বরেরও নেশা আছে, তা যে মদের মতই কাজ করে মিত্রা জানতো না।

শমিত জিজ্ঞাসা করলো, বাড়ীর আর সব মানুষ কোথায়?

সবাই পূজো দিতে গেছেন।

আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই?

হ্যাঁ।

বাঃ, বাড়ী খালি করে সবাই গেলেন পূজো দিতে। আর সাতদিন বাদে ঠিক সেই দিনটিতেই আমি বের হ'লাম বন্ধু-মিলনে ঘুরে বেড়াতে। তারপর এই ভর দুপুরে বাড়ী ফেরবার মুখে চলে এলাম তোমায় দেখতে। আর অমনি সৌমীদেবী সানন্দে তোমার অবসর বিনোদনের ভার আমার ওপর দিয়ে চলে গেলেন ঘুমোতে। নাঃ, কোথায় বসে যেন সত্যসত্যই কেউ গল্পের জাল বুনে চলেছে।

বিপন্ন হাসি হাসল মিত্রা।

মিত্রার মুখের দিকে তাকালো শমিত। সে রাতের মিত্রা যেন আজকের মিত্রা নয়। এ মিত্রাকে ভয় করে তার।

বললো, সে দিনের ছেলেমানুষি মনে আছে?

বড়দের ছেলেমানষি মানে নির্বুদ্ধিতা।

শমিত বললো, এ আমি জানতাম। সে রাতের ঘটনাকে তুমি উড়িয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু তোমাকে আমার চাই মিত্রা।

এই কথাগুলি বলছে কে ওকে? মিত্রার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেদিনের সেই বিবেকানন্দ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা শমিত। কথাগুলো সেই শমিত বলছে।

হাতের খালি কাপটা খাটের নীচে ঠেলে রেখে পকেট থেকে সিগারেটের কৌটোটা বার করল শমিত। একটা সিগারেট তুলে ঠোঁটের চাপে ধরে, দেশলাই এর কাঠিটা জ্বালাতে গিয়ে থেমে জিজ্ঞাসা করলো, ধরাতে পারি?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল মিত্রা।

সিগারেট ধরিয়ে নীরবে ধোঁয়া ছেড়ে চললো শমিত। বন্ধ ঘর থেকে বেরুবার পথ করতে না পেরে, দু-এক কুণ্ডলী ধোঁয়াই নাকের কাছে ঘুরে ফিরে নিশ্বাসে অস্বস্তি আনতে লাগলো মিত্রার।

একটা জানলা—

খাটের তলার দিকে চায়ের কাপটা ঠিক কোথায় রেখেছে এক নজরে দেখে নিয়ে হাতের সিগারেটটা তক্ষুনি সেটার ভেতর ফেলে দিল শমিত।

একি ফেলে দিলে যে।

ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি আমার কথার জবাব দাও।

বিপন্ন কণ্ঠে মিত্রা বললো, কি জিজ্ঞাসা করেছ?

শোননি? আচ্ছা আবার বলছি। আমি তোমাকে চাই। এ হ'লো আমার কথা—তোমার?

আমার কথা। মিত্রা হেসে বললো, এখানেই থাক।

দিয়ে ফিরিয়ে নিতে পারনা তুমি।

কতকগুলি কথা আছে, কতকগুলি ঘটনা আছে যেখানকারটা সেখানেই থাকতে দিতে হয়। একটা নিঃশ্বাস টেনে ধীরে ধীরে জবাব দেয় মিত্রা।

হাসল শমিত। কথাটা সে-ই বলেছিলো মিত্রাকে যেদিন গিয়ে শমিতের কাছে পড়াতে না পারার কারণ জানতে চেয়েছিল মিত্রা। আজ সে জবাবটাই ঘুরিয়ে দিলো তাকে মিত্রা।

বললো, ঠিক। সে চেষ্টা আমি করেছিলাম তুমি জানো। কিন্তু ঘটনা যখন কিছুতেই যেখানকারটা সেখানে থাকলো না তখন তাকেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। আমি অনেক ভেবেছি। তুমি হয়তো বলবে, 'আমি তো ভাবিনি।' আমি বলবো আর ভাবাভাবির প্রয়োজন নেই। ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে জগতে কিছু ঘটেনা। তবু দূরদর্শী হবার চেষ্টাটা মানুষের বিচক্ষণতার ভান মাত্র। সেটুকু দরকার মত আজ থেকে আমি করবো। অর্থাৎ তোমার চিন্তা এখন থেকে আমার।

মিত্রার খাটের ধারে পায়চারি করতে করতে বললো, তোমার কাছে কেন জগতের কারো কাছে মিথ্যে বলবার মত মনের অবস্থা আজ আমার নয়। বিশ্বাস কর, আমার জীবনে আজ সব চাইতে বড় সত্য, আমি তোমাকে ভালোবাসি মিত্রা। এর ভেতর কোনো ফাঁকি নেই।

নীরব মিত্রা।

নীরব হলো শমিত।

নীরব বাড়ী, নীরব মধ্যাহ্নের জনশূণ্য পথ।

চোখে হাত ঢাকা দিয়ে জীবনে প্রথম ভালোবাসার কথা শুনছে মিত্রা। তাই নীরব চারদিক।

একটা রিক্সা ঠুন-ঠুন আওয়াজ করতে করতে পার হয়ে গেল রাস্তা। একটা গাড়ী এসে থামল যেন কোথায়। শব্দ হলো দরজা খোলা আর বন্ধ করার। একটা ফেরিওয়ালা হাঁকলো লেস-ফিতা। কাঁসার বাসনওলা কাঁসা বাজাতে বাজাতে হেঁটে গেল ঢিমে তালে। গ্রীষ্মের পথ আবার পড়ে রইল নিঃশব্দে।

শমিত টিপয়রের উপর থেকে সরবতের গ্লাসটা এনে মিত্রার হাতের কাছে ধরে বললো, এর ভেতর তোমার এটা খাবার কথা ছিল।

মিত্রা জানে শমিতের স্নান-খাওয়া হয়ে যাওয়ার কথাটা মিথ্যে। বললো, এটা তুমি খেলে আমি খুব খুশী হবো।

একতরফা খুশী সবসময় করা যায় না।

চোখ বড় করে শমিতের দিকে তাকালো মিত্রা, আমার দিকে তাকিয়ে কবে কি করলে তুমি?

সব।

সব?

সব। আমি যা করেছি সব তোমার দিকে তাকিয়ে। তা নইলে কবে তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতাম।

বিস্ময়সূচক শব্দটা মুখে হাত চাপা দিয়ে বন্ধ করলো মিত্রা।

এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত সরবতটা খেয়ে নাও। আমি তো এক্ষুনি চা খেলাম।

আর কথা বাড়ালোনা মিত্রা। যতটা পারল খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। গ্লাসটা তুলে বাকী সরবতটা শমিতকে খেয়ে ফেলতে দেখে, একি বলে উঠতে গিয়েও থেমে গেল মিত্রা। শমিত গ্লাস সরিয়ে রেখে ঘরের কোণ থেকে বেতের হেলান-চেয়ারটা টেনে এনে মিত্রার খাটের সঙ্গে এক করে তাতে পিঠ রাখল। হাত বাড়িয়ে মিত্রার খোলা চুলগুলি নিয়ে বললে, আজ তোমায় আমি গান শোনাব। তারপরেই কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিল— 'ওগো দুখজাগানিয়া তোমায় গান শোনাব।....আমার কাজের মাঝে মাঝে কান্না হাসির দোলা তুমি থামতে দিলে না যে'....

সব কথা, সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব স্তব্ধ হয়ে গেল মিত্রার। সাপের সব শোনা যেমন বুকের অনুভূতিতে, মিত্রাও তেমনি যেন কান দিয়ে নয়, গান শুনতে লাগল নিজেকে গানের পদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে।

গাইল শমিত একটা দুটো নয়, একের পর এক। পাশের ঘরে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে সৌমীও। এত নিচু গলায় শমিত গাইছিল যে একটা ঘর পার হয়ে আসতেই বহুপদ তার হারিয়ে তবে তা এসে পৌঁছচ্ছিল সৌমীর কানে। কি জানি এমন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে মাত্র একজনের উদ্দেশ্যে গাওয়া গান এর চাইতে উঁচু গলায় গাইলে বুঝি সমস্ত পরিবেশটাই আহত হতো।

মিত্রার মনে হলো সে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। যে জগতের কথা সে জানতনা, চিনতনা, আছে বলে বিশ্বাস করত না, কেউ বললে হাসত বিদ্রূপের হাসি, যেন তেমনি জায়গায় ওকে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গান শেষে মুখ তুলে হাসল শমিত। মুখটা ওর গরমে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বললো, এবার বক্শিস।

গলা থেকে চিকন বিছেহারটা খুলে শমিতের দিকে বাড়িয়ে ধরল মিত্রা।

গলার হার? একেবারে রাজরাণী স্টাইলে সভা-গায়কের বখ্শিশ? কিন্তু এটা চাই না।

তবে কি দেবো?

অন্য কিছু।

কি?

তোমার আংটিটা। হাত পাতল শমিত।

মিত্রা বললো, তুমি যেমন এখনি বলেছিলে, ভয় ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি আমি মিত্রা, তাই যেখানে আছি সেখান থেকে এক পাও নড়তে সাহস নেই। আজ আমিও দাঁড়িয়ে পড়ে ঠিক সে কথাটাই বলছি, আর এক পাও নড়তে সাহস নেই আমার। তুমি তো আমার দিকে তাকিয়েই সব করছো, এটাও করো।

দুই পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে কিছু সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শমিত।

বেশ। আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেল সে।

তারপর একাঘরে যে কান্নাটা মিত্রা কাঁদলো সে কান্নাকে সে ভয় পায় না। কান্না ছাড়া কি-ই বা সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে?

একটু বাদে চঞ্চল পায় হৈ-হৈ করে এসে ঘরে ঢুকল বাচ্চারা। মা এসে মেয়ের মাথায় ছোঁয়ালেন আশীর্ব্বাদী ফুল। মুখে দিলেন প্রসাদ। ছোটরা কলরব করে বর্ণনা ক'রে চললো তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। খুশীতে ঝলমল করে মুন্নী চোখ বড়-বড় করে বললো, ঠাকুব বলেছেন এবার আমার মা ভালো হয়ে যাবেন।

কুমার এসে মার হাতে একটা বেলফুলের মালা তুলে দিয়ে বললো, ইস্ তুই যেন ঠাকুরের কথা শুনেছিস! গভীর জঙ্গল না হ'লে ঠাকুর আসেন না, তার কথা শোনা যায় না। ভারিক্কি চালে বলে কুমার।

মুন্নীর বোকামিতে ছোটরা সব উঠল হাততালি দিয়ে হৈ-হৈ করে।

মার মুখের উপর উপুড় হয়ে পড়ল মুন্নী, জঙ্গল না হ'লে ঠাকুর আসেন না বুঝি—তবে কেন আমরা মন্দিরে পূজো দিতে গেলাম? তবে আমরা জঙ্গলে যেতাম না মা?

দেখ মামী, কি চেহারা হয়েছে এক এক জনের। শঙ্কিত মুখে বলে মিত্রা। মাকে এত বারণ করলাম ওদের নিয়ে যেতে। শিগগির হাতমুখ ধুইয়ে খাইয়ে বিছানায় ঢোকাও সবগুলোকে।

যা সব শান্ত আর বাধ্য ছেলে মেয়ে। আমি ঢোকালাম ওরাও ঢুকল।

সৌমী সবাইকে নিয়ে চলে গেল। গায়ের চাদরটা গলা পর্য্যন্ত টেনে অবসাদে চোখ বুজল মিত্রা।

শমিত আর এলনা। মিত্রা জানে ওর কাছ থেকে ডাক না গেলে শমিত আর আসবে না। মাঝি যেমন তুফান এলেই হাল ছেড়ে দেয় না, আরো শক্ত করে ধরে, মিত্রাও ঠিক তেমনি ঝড়ের শব্দের ভেতর শক্ত হয়ে বসে রইল।

সেদিন খোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়ে বসেছিল মিত্রা। মেঘের সঙ্গী হয়ে মন চলে গিয়েছিল দূর আকাশে। মেঘ দানা বেঁধে স্থির হয়ে আছে আকাশের এক প্রান্তে। কানে ভেসে আসছে তার গম্ভীর গুরু গুরু ধ্বনি। অপর প্রান্তে ছুটোছুটি করে ফিরছে স্বচ্ছ মেঘ-স্তর। সন্ধ্যা সূর্যের রক্তলাল আলোর দ্যুতি সে-মেঘের আড়াল হতে বিচ্ছুরিত হয়ে রাঙ্গিয়ে দিলো পৃথিবীর বুক, মানুষের মন। সেই রবি রশ্মি চুলে চিবুকে ছড়িয়ে পড়ে রাঙিয়ে তুলেছে মিত্রার অঙ্গ হতে হৃদয়ে অন্তঃস্থল পর্যন্ত। ইচ্ছে করছে ঐ পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘের মালা চুলে জড়িয়ে, কণ্ঠে দুলিয়ে মেঘে-মেঘে পা ফেলে বৃষ্টি সঙ্গে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে সে নদীর বুকে। সব ভাসিয়ে নিজেও ভেসে চলে সমুদ্র-সঙ্গমে।

উঃ কি ভীষণ ঝড় এসে গেল! মামীরা ছুটেছেন দরজা জানালা বন্ধ করতে। এমন মাথা কোটাকুটিও আরম্ভ করে হাওয়ায় চমকে উঠে দরজা জানালাগুলো। নিরীহ মানুষের হাতের ছোঁয়ায় অভ্যস্ত জীবনে দুর্দান্ত ঝড়ো হাওয়ার ঝাঁপিয়ে পড়া মাতামাতি বুঝি ওদের সহ্য হয় না। যেন পরপুরুষ হস্তে লাঞ্ছিতার মত নিজেকে ছিনিয়ে আনবার জন্যেই ওদের এই মাথা কোটাকুটি। পরপুরুষ! কথাটা শুনতে কি বিশ্রী। কে পর কেই বা আপন? কি তার বিচার? বিয়ে?

ভিজে হাত মুছতে মুছতে সৌমী এসে বসল মিত্রার পাশে। চোখ কচলে বললো, একেই বলে কালবৈশাখী! কেবল ধুলোর ঝড় আর চোখ কচ্‌কচি সার।

ধুলোর অপরাধ কি বল? বাতাস এসে ওকে উড়িয়ে দিল আর তার চলার পথে তোমার চোখ বাধা হ'লো তাই না তোমার চোখে পড়ল সে। কাজের সঙ্গে কারণ যোগ না ক'রে কাউকে কিছু বলতে নেই।

নাঃ, ধুলোকে বললেও, মানুষকে বলবনা কক্খনো। হাসলো সৌমী।

বলবে না তো। সত্যিগো—যাদের নিয়ে দিন কাটাতে হয় তাদের যদি সাধারণ বিবেচনাটুকু থাকে তবে যে জীবনটা কত শান্তির হয়ে ওঠে তা আমি আমার মামীদের দেখলেই বুঝতে পারি। কিন্তু কি অন্যায় দেখ, শিশু মায়ের কোলে দোল খায় আর ঘুমপাড়ানি গান শোনে, 'মামী এলো লাঠি নিয়ে—' কি মিথ্যে অপবাদ! আজকালকার এমন মিষ্টি মিষ্টি সব আধুনিক মামী—দাঁড়াও মামীদের ওপর কবিতার প্রতিযোগিতা ঘোষণা করব।

হেসে উঠলো, সৌমী। বেশ তা ক'রো।

মিত্রা কোলের বই নামিয়ে উঠে বসলো। বললো, মনে হচ্ছে কি জানো, যমরাজ তো দিব্য ভাবসাব জমিয়ে রেখে গেলেন। এখন মাঝে মাজেই যদি সম্ভাষণ নিয়ে এসে দাঁড়ান—ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুব সুবিধের হবে না।

নাগো তা ক'রবেন না। শত হ'লেও যে রাজার জাত, সে পরিচয় তার যাওয়ার চেহারায় রেখে গেছে।

কি রকম?

আমার সুন্দরী ভাগ্নীটির সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে হয়েছিলো, এসেছিলেন। কিন্তু দেখনা যাবার বলা তার দুদিনের মিতাকে কেমন জীবনের সঙ্গে নব যৌবন উপহার দিয়ে গেছেন। কি সুন্দর যে তুমি হয়ে উঠেছ।

হেসে উঠল মিত্রা। জীবনের সঙ্গে নব যৌবন, ভাষাটা যোগাড় করলে কোথা থেকে? একটু থেমে তারপর বললো, তবে সত্যি যদি তা দিয়ে গিয়ে থাকেন তবে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবো তার কাছে। একটা নব যৌবনের বড় দরকার আমার। আবার নতুন করে সব সুরু করতে হবে আমাকে। ভয় পেয়ো না। বিয়ে নয়। কাজ।

ভয় পাবো কেন? বিধবা বিয়েতো—

থামো মামী। প্রয়োজনাতিরিক্ত জোরে কথাটা বেরিয়ে এলো মিত্রার মুখ থেকে। তোমাদের ঐ বিধবা কথাটাই আমার কাছে শত বছরের পচা গলিত শব্দ মনে হয়। ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দাও ওটাকে।

মিত্রার উত্তেজনায় প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল সৌমী। তারপর হেসে বললো, মা গো, চমকে উঠেছিলাম একেবারে। কিন্তু এতবড় একটা ধমক দিলে কেন শুনি? বিধবা শব্দটা যে শত বছরের গলিত শব্দ, এ বিষয়ে আপত্তি নেই আমারও। জলজ্যান্ত তোমার মামা বেঁচে — আমি ভাই সমাজ সংস্কারের মূল্য হিসাবে না হয় ডাইভোর্স বিলটা একেবারে নিজে উদাহরণ হয়ে সমর্থন করতে পারি। কিন্তু বিধবা শব্দটিকে ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলবার জন্যে সহানুভূতি আর সহযোগিতা ছাড়া তো আমার কিছু করবার নেই। দরকার হ'লে তাতে পিছপা হবো না দেখো।

এমনি সময় ঘরে এসে ঢুকল রাণী। সাগ্রহে ওকে হাত ধরে টেনে পাশে বসাতে-বসাতে মিত্রা বললো, এসো এসো। কিন্তু রাণী তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন? শরীর ভালো নেই?

প্রথমে দু'তিনটা বড়-বড় নিশ্বাসে বেশী পরিমাণে হাওয়া টেনে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিল রাণী। তারপর কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো, আমাদের মতো অভাগীদের অসুস্থ হয়ে সুখ কোথায়? তোমার মত সেবা করবার লোক কি আর অদৃষ্টে জুটবে? বিশেষ ক'রে এমন মামী।

আমার মত জা বুঝি ফেলা গেল?

সৌমী হাসি মুখে বেরিয়ে গেল। রাণী দু হাতে জড়িয়ে ধরল মিত্রাকে, মা গো কি বলে। তুমি ফেলা গেলে রাণীর তহবিলে তুলে রাখবার মত আর জমা রইল কি।

হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখবার ভঙ্গিতে চাইল মিত্রা রাণীর দিকে। বললো ব্যাপারটা কি, শরীরের ওজনটা দুজনার বলে বোধ হচ্ছে কেন।

রাণী মিত্রাকে ঠেলে সরিয়ে শুতে-শুতে বলে, দেখি সর। একটু শুই, শুয়ে শুয়ে কথা বলি।

দূর তোমাদের মত মেয়ের সঙ্গে কথা বলে কে।

কেউ না। আমি নিজে পর্যন্ত না। একা থাকলেই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলতে হবে। আর সে ঘেন্নাতেই না পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে।

মিত্রা বললো, কি হয়েছে রাণী? ছেলে হওয়াটা নিশ্চয়ই এতটা মন খারাপের কারণ নয়। কিছুদিন ধরেই তোমার মুখ কালো দেখছি। যা পেয়েছি পেয়েছি, যা পাইনি, পাইনি। আমাদের দেশের মেয়েদের চিরন্তন এই মনোভাব মেনে নিয়ে একরকম চলে যাচ্ছিল তো তোমার মন্দ নয়। এর ওপর আবার নতুন কি ঘটল?

খাবার খোঁজা জানোয়ারের মাটি শুঁকে চলা দেখেছ? চোখের পাতা বন্ধ করে ঠাণ্ডা গলায় বললো রাণী।

দেখেছি।

ঠিক তেমনি একটা ক্ষুধার্ত সন্দিহান মন নিয়ে সমস্ত বাড়ীর মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছেন তোমার ভাসুর।

কারণ?

সেই চিরপুরাতন কারণ, বাপের বাড়ীর চিঠি— ছোট্ট ভাই-ঝিটির বড় বড় আঁকা বাঁকা অক্ষরে, আ-কার ই-কার ছাড়া একখানা চিঠি। তার বক্তব্য, ছোট পিসিকে দুশ পাঁচশ টাকা পাঠাই, তাকে পাঠাই না কেন। ছোট পিসি, মা, বাবা কেউ ওকে কিচ্ছু দেয়না। খেলার গাড়ি, কাঠি লজেন্স খাবার পয়সা নেই। ডল পুতুলটা মা হতে পারছে না একটা ছোট্ট ডল নেই বলে। এমন একটা মনকষ্টের খবর শুনে ভাবছি একটা জ্যান্ত ডল দিলে সে-দায়িত্ব নিতে সে রাজী আছে কিনা, তাই জানতে চেয়ে চিঠি লিখি, হঠাৎ পেছন থেকে মন্তব্য শুনলাম, দু'শ পাঁচশ। হাতটা কেঁপে উঠে মাটিতে পড়ে গেল চিঠিটা। সবিনয়ে সেটা তুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, ভয় পাচ্ছ কেন? আমি টাকা দিচ্ছিনা, আমার পকেটও তুমি মারছ না, মারলে টের পেতাম। আমার চটবার কারণ নেই। শুধু টাকা কে দিচ্ছে সেটা শুনি। বললাম, সত্যি কি আমি এত টাকা পাঠাই নাকি? একটা বাচ্চা মেয়ের চিঠি।

বললেন, সে জন্যেই খাঁটি। ছল-চাতুরী আর মিথ্যে এখনও শেখেনি। এত না হোক বিশই পাঁচবারে শ' হয়। পাচ্ছ কোথায়? চুরি করে নয় নিশ্চয়ই। দিচ্ছে কে?

আমার নাম বলে দিলে না কেন?

তার আগেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন শমিত কি না।

মেঘের সঙ্গী হয়ে উড়তে যাওয়া মনটা মিত্রার যেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো। রাণীকে বহু দুঃখে সে সান্ত্বনা দিয়েছে, করেছে হাত বাড়িয়ে সাহায্য কিন্তু আজ সে কোনো কথা খুঁজে পেল না তাকে বলবার জন্যে। যে স্ত্রীকে অত্যাচারে অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন স্বামীকে জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা টেনে কথা বলতে হয়, তাকে বলবার জন্য বুঝি অভিধানেও কোনো কথা থাকে না। কেবল বলল, তুমি তোমার মার কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য ঘুরে এসো রাণী।

তাই যাব ঠিক ক'রেছি।

আমি যাব তোমার সঙ্গে। আমার হাওয়া বদলানো দরকার। ডাক্তার আমাকে অন্য কথাও যেতে বলেছে।

সত্যি? সত্যি বলছ আমার সঙ্গে যাবে। রাণী দু'হাতে ফের জড়িয়ে ধরল মিত্রাকে।

সত্যি। তোমার সঙ্গেই যাবো। কুমার মুন্নী থাকবে মার কাছে।

কি আর বলবে রাণী। যেন আনন্দে দিশেহারা হয়ে উঠলো সে। কে বলবে একটু আগের রাণী আর এই রাণী এক। বললো, সে লিখলেও না কি কেউ বিশ্বাস করবে না। আবার বললো, না কিছু লিখবে না সে আগে থাকতে। হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হয়ে চমকে দেবে সবাইকে। ইস্, তোমায় দেখে ভাই বোনটার মুখের অবস্থাটা কেমন হবে তাই ভাবছি। জান, জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর। নইলে আমি কখনও রাজী হতাম না তোমায় নিয়ে যেতে।

তারপর যাবার সময় একমুখ হাসি নিয়ে মিত্রার গলা জড়িয়ে ব'লে গিয়েছে — দেখো এত আশা দিয়ে আবার মত বদলে ফেলো না যেন।

তাকে খুশি মনে বিদায় দিতে পেরে মিত্রার ভালো লাগল। যাক্ ব্যবস্থাটা বেশ হ'লো। রাণীর ছোটো বোনটি কতবার লিখেছে একবার বেড়িয়ে যেতে। সে লেখায় কত কৃতজ্ঞতা, কত সঙ্কোচ! মামারা চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন তাকে নিয়ে, কোথায় যাওয়া যায়, কেই বা নিয়ে যায় আর সঙ্গে থাকে। চমৎকার হলো। সেও এখন বেরিয়ে পড়তে পারলেই যেন বাঁচে।

কিন্তু রাণীর সঙ্গে যাওয়া হলো না মিত্রার। ভাসুর নাকি শুনেই ক্ষেপে উঠেছেন। যার শ্বশুর বাড়ী, যার সম্পর্কে সম্পর্ক, তার অমতে আর কি ক'রে যাওয়া যায়।

শুনে মিত্রার যেন জিদ চেপে আসতে চায়। কার সম্পর্কে সম্পর্ক, কে পরিচয় করিয়ে দেয় প্রথম, সেটা কি দুজনের চিরকাল স্মরণ ক'রে চলতে হবে নাকি? ও ওর বন্ধুর বাড়ী যাবে। বাস্।

কিন্তু রাণীর সাহস কোথায়!

কেঁদে ফেলে রাণী স্বীকার করলে, না তার সাহস নেই!

মনটা খারাপ হয়ে গেলো মিত্রার। মনে হলো অযথা যাবার কথা তুলে আরো একটা বাড়তি দুঃখ যেন সে রাণীকে পাইয়ে দিলে।

রাণী মিনতিভরা সুরে বললো, এখন তো ভালোই হয়ে গেছ তুমি। চলো না ওবাড়ী। কতদিন দুজনে একসঙ্গে থাকিনে। যাবার আগে বড্ড ইচ্ছে করছে একসঙ্গে থাকতে। আমি চলে গেলেই তুমি এসে পড়ো—এ্যাঁ?

না রাণী। ওবাড়ী আর আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

এটা কোনো কথা হলো না মিত্রা। ঝগড়া মনোমালিন্যের কথা কি মানুষ চিরকাল মনে করে রাখে? না তুমিই তা রাখতে পারবে? চলো ভাই। দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো রাণী।

মিত্রা কি করে বলবে, ওবাড়ী থেকে দূরে সরে তাকে এখন থাকতেই হবে। সেও রাণীর দুহাত উলটো জড়িয়ে ধরে বললো, সে হয় না। হলে আমি তোমার কথা কখনোই ফেলতাম না।

ক্ষুণ্ন মনে চলে গেল রাণী। শুনে মামারা বললেন, তোমার অসুখের সময় ওরা সবাই এতো করলেন। এতো এলেন, গেলেন। তুমিও না হয় দুদিনের জন্যে একটা 'রিটার্ণ ভিজিট' গোছের দিয়ে এসো না।

মিত্রার সেই এক কথা, আর ওবাড়ী নয় মামা।

কিন্তু স্বর্ণময়ী যখন লিখলেন, মা! কয়েকটা দিনও যদি তুমি ছেয়েমেয়ে নিয়ে আমার কাছে একবার এসে থেকে যেতে, তবে বুকটা আমার ঠাণ্ডা হতো। মনে শান্তি পেতাম।—তখন সে ডাক অস্বীকার করতে পারলো না মিত্রা।

লীলাকান্ত যে নরম মন মিত্রার জন্য রেখে গিয়েছিল স্বর্ণময়ীর মনে—যে মন শত জল-রোদেও আজ পর্যন্ত কঠিন হতে পারলো না, স্বর্ণময়ীর সে মনটাকে সম্মান না করে পারে না মিত্রা।

আবার এ বাড়ীর দেউড়ি পার হতে হলো মিত্রাকে।

যেদিন এলো সেদিন কোন সংবাদ দিয়ে এলো না। সময়টা বাছলে দুপুর—যাতে ছেলেরা কেউ বাড়ী না থাকে। তবু গাড়ী থেকে মাটিতে পা ছোঁয়াতেই বুকটা সশব্দে আছাড় খেলো ওর ভেতরে। ঠিক এমনি ভাবে হৃদপিণ্ডটা বুকের ভেতর আছড়ে পড়ে ওর সর্বশরীর কাঁপিয়ে তুলেছিল সেদিনও, যেদিন লীলাকান্তর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে প্রথম প্রবেশ করেছিল এবাড়ীতে। কিন্তু সে দিনের সেটা ছিল যেন বলির পশুর কাঁপুনি। মুখ চেপে কাঠগড়ার দিকে পশুকে যখন টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে যে ভাবে বারংবার কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে—ঠিক তেমনি। আর আজকের হৃদয় কম্পনটা যেন মিত্রার একমাঠ ঘাসফুলের সন্ধ্যাবাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা।

ছেলেমেয়ে নেমেই দৌড়োলো ভেতর মহলের দিকে।

আর মিত্রা ওর দৃষ্টিটা তেতলার যে জানালাটার দিকে ধাবিত হতে চাচ্ছিল তার বিপরীত দিকে রেখে লন পার হয়ে উঠে এলো প্রশস্ত সিঁড়ির উপর।

যদি শমিত তার জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ওর জন্য নয়। ও সংবাদ দিয়ে আসেনি। যদি এমনি দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার দশটা পাঁচটার অফিস নয়। কলেজ। কবে কটার সময় থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই তো।

যে ভয় মিত্রা করছিল, তাই হলো—সেদিন শমিতের কলেজ ছিল দুটোয়। ক্লাশ লেকচারটা মনে মনে গুছোতে গুছোতে গাড়ী বারান্দা অতিক্রম করছিল সে। মিত্রাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখে প্রথম ধাক্কায় তার রক্তও সংবাদটা নিয়ে সমস্ত দেহময় এমন ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিলো যে, একটু থামতে হলো তাকেও। তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো, কি ব্যাপার? তুমি এ রকম হঠাৎ?

মিত্রা যেমন চলছিল তেমনি চলতে চলতে বললো, মা একবার আসতে লিখেছেন।

তুমি আজ আসবে বাড়ীতে জানে? মিত্রার সঙ্গে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলো শমিত।

না। আমি আসবো তার আবার একটা খবর দেবার কি আছে?

কিন্তু আমার খবরটা এমনি পেয়ে যাওয়া উচিত ছিল—তাই না?

শুকনো কণ্ঠে মিত্রা বললো, কি রকম?

মিত্রার গলার শুকনো ভাব লক্ষ্য করে শমিত বললো, না, এমনি বললাম। তা তুমি থাকবে না আজই চলে যাবে?

কয়েক দিন থাকবো। সিঁড়ি পার হয়ে গাড়ী বারান্দায় উঠলো ওরা। এবার মিত্রা একটু দাঁড়াবে ভেবেছিল শমিত। কিন্তু মিত্রার চলায় বিরতির আভাসটুকু পর্যন্ত না দেখে এবার থেমে পড়লো শমিত। বললো, যে ক'দিন থাকবে তার ভেতর এমনি যাওয়া আসা কিংবা বারান্দা পারাপার করতে গিয়ে যদি দেখাটেখা হয়ে যায়— যেমন এই হয়ে গেলো। আমি নিরুপায়। আশা করি অপরাধ নেবে না। পাঞ্জাবীর হাত সরিয়ে ঘড়িটা এক নজর দেখতে দেখতে পেছন ফিরল শমিত।

হল ঘরে ঢুকে এবার একটু থামলো মিত্রা। যেন চলার শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল তার। পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে নিল সে।

তারপরও চলা ফেরায় সতর্কতার অন্ত রাখলো না মিত্রা। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো না। সিঁড়ির মুখে গল্প জুড়লো না। ছাদে উঠলো না। এক একটা দিন পার করে-করে এক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে লাগলো আর হিসাব করতে লাগলো পনেরো দিনের ক'দিন গেলো। কিন্তু যখন পনেরো দিনের পাঁচদিন নির্বিঘ্নে কেটে গেলো শমিতের ছায়া পর্যন্ত সে দেখতে পেলো না এবং বুঝলো এ নিয়ে আর ওর আতঙ্কে কন্টকিত হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই, তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলো মিত্রা, বাকী দিনগুলো সঙ্গে-সঙ্গে শূন্য হয়ে গেল তার কাছে। আর কিছুই যেন করবার রইলো না ওর এখানে।

মিত্রা নিজেই নিজেকে বললা, বাঃ এতো বেশ মজার ব্যাপার দেখছি। মন! তোমাকে নিয়ে করবো কি? তুমি এও চাও না, ও-ও চাও না। চাও কি? অন্তত সাহস করে আমায় বলো।

জয়ন্তীর ছোট বোনের বিয়ে।

নেমন্তনের দিন যখন ছোট-বড় মেয়ে-পুরুষ মিলে সব ঝেঁটিয়ে নেমন্তন রক্ষা করতে গেলো, তখন কেউ মিত্রার যাবার কথা একবার উল্লেখও করলো না। স্বর্ণময়ী ছেলেমেয়ের কথাও নিষেধ করেছিলেন। থাক মিত্রা যেভাবে আছে। তার শান্ত থাকায় সামান্য নাড়াচাড়া দিতেও রাজী নন তিনি। কিন্তু জয়ন্তী শুনলে না। সে তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জোর করে নিয়ে গেল ওদের। ইচ্ছা না থাকলেও চুপ করেই রইলো মিত্রা।

সবাই চলে গেলে মিত্রা খালি বাড়ীর খোলা বারান্দায় মাথার ঘোমটা ফেলে পায়চারি করলো অনেকক্ষণ। একটা জনশূণ্য বাড়ীর মধ্যে একা-একা ঘোরার ভেতর যেন কেমনতর একটা আশ্চর্য রোমাঞ্চ আছে। খালিবাড়ী পেলেই আর বসে থাকতে পারে না মিত্রা ঘরে। কেবল ঘুরতে ইচ্ছে করে তার এঘর-ওঘর বারান্দা। মিত্রা ঘুরলো অনেকক্ষণ। তারপর সন্ধ্যা নামলে এসে ঘরে বসলো বই নিয়ে। বইটা নতুন। সেটাকে উল্টে-পালটে দেখলো। নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকলো—নতুন বই এর গন্ধে ওর নেশা লাগে। তারপর পড়ায় মন দিলো।

কিন্তু শমিতের বাহ্যিক ব্যবহারের সঙ্গে তার ভেতরকার চিন্তার সামঞ্জস্য ছিলো না এতোটুকু। তার অন্তরের কথাটা ছিলো, এই যে মেয়ে, এই মেয়েকে তার চাই।

কিন্তু কি ভাবে?

কোন উপায়ে?

কোন পথে?

মিত্রাদের বাড়ী থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত এই এক কথাই সে ভাবছে। সেদিন সিঁড়ির উপর, আসতে যেতে দেখা হলে ক্ষমা করতে বলার মতো একটা নির্লিপ্ত এবং ব্যবধান রাখা অনুরোধ করেও সিঁড়ি নামতে নামতে যে কথাটা সে চিন্তা করছে তাও ঐ, মিত্রাকে তার চাই।

কিন্তু কিভাবে—

কোন পথে—

কি উপায়ে—

মিত্রাকে নিয়ে সে ভাবিত নয় বিন্দুমাত্র। যে মেয়ে দু'দুবার বিহুল আত্মসমর্পনে নিজেকে সমর্পন করেছে ওর হাতে, তার বাইরের ব্যবহার নিয়ে ভাবে না সে। তার চিন্তা বিঘ্ন—অসংখ্য বিঘ্নের পাহাড় পার হওয়া যায় কি করে! যে-সব বাধার কাছে মিত্রা দাঁড়িয়ে পড়েছে। একদিন দাঁড়িয়ে পড়েছিলো সে নিজে।

কাজকর্ম সব গেলো। বসে বসে টিন-টিন সিগারেট নিঃশেষ করতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো।

হয়তো এ ভাবেই আরো দিন কাটিয়ে দিত শমিত। কিন্তু সেদিন বাড়ী খালি করে সবাই চলে গেলে, সময়টা নষ্ট হতে দিলো না সে। মনস্থির তার করাই ছিল। নীচে নেমে এসে গিয়ে ঢুকল মিত্রার ঘরে।

ঘরের ভেতর ছায়া পড়তে চমকে মুখ তুললো মিত্রা। শমিতকে দেখে আচমকা হাতের বই খসে পড়ে গেল তার মেঝের উপর।

বইটা তুলে টেবিলের উপর রেখে মোড়া টেনে মিত্রার মুখোমুখি বসলো শমিত।

নেমন্তন্নে যাওনি? জিজ্ঞাসা করলো মিত্রা। কিন্তু কণ্ঠের বিপন্ন ভাবটা লুকোতে পারলে না সে।

হাসলো শমিত। বললো, না।

কেন?

এমনি।

একেবারেই যাবে না?

না।

জয়ন্তী রাগ করবে।

করতে পারে।

না, এটা ঠিক করছো না কিন্তু।

আমার নেমন্তন্নে যাওয়া নিয়ে তোমার ব্যাকুল হয়ে ওঠাটা কিছু বেশী হয়ে যাচ্ছে না?

একটুও না। উঠে দাঁড়ালো মিত্রা। প্রথম কথা না যাওয়াটা অন্যায়। দ্বিতীয় কথা এ বাড়ীতে আজ রান্না হয়নি। খাবে কি?

মিত্রাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে উঠে পড়লো শমিতও। একটু অধৈর্য প্রকাশ করে বললো, কলকাতা শহরে খাবার জায়গার অভাব নেই মিত্রা। এসব অবান্তর কথায় সময় নষ্ট না করে তুমি দয়া করে আমার ক'টা কথা শুনবে?

মিত্রা ধরা গলায় বললো, বা, তা শুনবো না কেন। ফের সোফায় বসে বললো, বলো।

এখানে নয়। আমার ঘরে চলো।

কেন এখানে কথা বলতে অসুবিধে কি— শমিতের দিকে তাকিয়েই পুরো কথাটা বলতে চেষ্টা করেছিলো মিত্রা। কিন্তু তার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে কথা বলা শেষ পর্যন্ত ওর পক্ষে সম্ভব হলো না। চোখ নামিয়ে এনে বললো, এখানেই বলো।

ডালিম এসে ঘরে ঢুকলো চা নিয়ে। শমিতকে দেখে বললো, মামাবাবু এখানে। আচ্ছা নিন এটা আপনি। মার জন্য নিয়ে আসছি আমি। হাতের পেয়ালাটা শমিতের জন্য রেখে আর এক পেয়ালা চা আনবার জন্য চলে গেলো ডালিম।

শমিত বললো, এখানে কথা বলার অসুবিধেটা কোথায় দেখলে তো? আমাকে তোমার ভয় করবার কিছু নেই। সেদিন তোমাদের বাড়ী আমায় দেখেছো, চলো মিত্রা।

কিন্তু ভয় কি মিত্রা শুধু শমিতকে করে? নিজেকে ভয় করে না ওর? এই নির্জন সন্ধ্যায়, এই নিরালা বাড়ীতে, শমিতের নিভৃত ঘরে যাবার মনোবল কি মিত্রারই আছে? গেলে নিজেই যদি সে ঠিক থাকতে না পারে। অদ্ভুত এক জীবন-বঞ্চনায় 'ঠিক থাকার' মাতা-মাতামহীর রক্তধারা মিত্রার ধমনীতেও তো বইছে।

টেবিলের ওপরকার বইটা হাতে তুলে নাড়াচাড়া করতে করতে ভাঙ্গা গলায় মিত্রা বললো—মাপ করো আমাকে!

এবার শমিত দু'হাত জোড় করে ব্যাকুল কণ্ঠে বললো, প্লিজ-প্লিজ মিত্রা। এমন সুবিধে আর পাবো না। মানুষ মানুষ মানুষ। মানুষের জন্যই পৃথিবীটা একেবারে যেন মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। সত্যি আমার অত্যন্ত দরকারী কথা আছে—আমার ঘরে একবারটি এসো।

সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করলো মিত্রাও— আর অনুরোধ করোনা। দুর্বলের উপর শক্তির পরিচয় দিতে নেই। আমাকে বাঁচতে দেও। এখানেই থামতে দাও। এখানেই থাকতে দাও আমাকে।

এরপর শমিত আর কি বলবে। বার দুই অস্থিরভাবে পাইচারি করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডালিম ফের চা নিয়ে এসে বললো, ওমা! মামাবাবু চা খাননি? দিয়ে আসবো তেনার ঘরে?

মিত্রার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলো, মা মামাবাবুর চা দিয়ে আসবো উপরের ঘরে?

মিত্রা ওর ঘাম চটচটে মুখটা আঁচলে মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

শমিতের ঘরে ঢোকবার মুখে হাতের পেয়ালা-পিরিচ দুটো যেন মিত্রার জাহাজের ডেকের উপর রাখা জিনিসের মতো ঝাঁকুনি তুলতে লাগলো। সে দুটোকে তাড়াতাড়ি নীচু তেপয়টায় নামিয়ে রেখে, কার্পেটের উপর বসে পড়লো মিত্রা ধুপ করে।

শুভ্র বসনা মিত্রাকে আবছা অন্ধকারে শমিতের মনে হলো যেন বন্ধ ঝিনুকের মুখ খুলে একটা তাজা মুক্তা খসে পড়লো তার কাছে।

নিশ্চল বসে রইলো শমিত।

সমুদ্রের ঢেউকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে যেমন তার কিছুই হাতে আসে না, কতগুলো আনন্দ আছে যেন ঠিক তেমনি। ঢেউএর মতো শুধু বুকের উপর বয়ে যেতে দিয়ে অনুভব করতে হয়। আর তাই বোধ হয় শমিত বসে রইল এমন নিশ্চল হয়ে।

মিত্রা বললো, চটেমটে তো চলে এলে—

চটেমটে!

ঐ একই। চুপচাপ চলে আসা যা আর চটেমটে চলে আসাও তাই। বলো কি বলবে?

বুকের উদ্দামতা কিছুটা শান্ত হয়ে আসতে মিত্রাও যেন শক্তি ফিরে পেয়েছে কিছুটা।

বললো, বাতি জ্বালি?

না।

না শমিত— প্রথম সামনা-সামনি এভাবে শমিতকে নাম ধরে ডেকে দু হাতে মুখ আবৃত করলো মিত্রা। আমাকে এভাবে গোপন জীবনের ভেতর টেনে নামিয়ে এনো না তুমি। মর্যাদা ভেঙ্গে-ভেঙ্গে খাবো, এমন রাক্ষুসে ক্ষুধা আমার নয়।

শমিত ওর চেয়ারটা টেনে মিত্রার কাছে এগিয়ে এলো। তারপর হাত দুটো মুখ থেকে টেনে নিজের হাতে নিয়ে হেসে বললো, রাক্ষস হোক আর মানুষই হোক ক্ষুধার চেহারা এক—

কক্‌খনো নয়।

নিশ্চয়ই। শুধু রাক্ষসের থালার হাতী-ঘোড়ার আইটেমগুলো মানুষের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একেবারে না হলেও চলে না। প্রবৃত্তির নামটা যখন ক্ষুধা তখন তার ক্ষুধার কথাটাও ভাবতে হবে।

এই ভাবে?

না। এ ভাবে নয়। সেই কথা বলতেই আমি তোমাকে ডেকেছি।

মিত্রা নীরবে তাকিয়ে রইলো শমিতের দিকে।

শমিত বললো, আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

ওর অন্ধকারে জ্বলতে থাকা ভিরু চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে একেবারে আঁৎকে উঠলো মিত্রা। শমিতের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করতে করতে বললো, পাগল নাকি?

কেন, পাগলের কাণ্ড এর ভেতর কোথায় দেখলে?

শমিতের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে মিত্রা বললো, না, এ হয় না। কিছুতেই হয় না।

কেন হয় না? আর যে কারণই বলো, তোমার ছেলেমেয়ের কথা বলতে পারবে না।

বিস্মিতভাবে চোখ ফেরালো মিত্রা শমিতের প্রতি। যেটা কারণ সেটাই বলতে নিষেধ করছে শমিত। বললো, আমার যেটা সব চাইতে প্রধান কারণ সেটাই তুমি বলতে মানা করছ?

হ্যাঁ। তুমি ওদের তোমার একা ভাবছ কেন। আজ তুমি মরে গেলে সব চাইতে আগে আমি ওদের বুকে তুলে নেবো। বড় করবো। মানুষ করবো। তাতে সন্দেহ করো? তুমিও কি ওদের আমার কাছে দিয়ে যাবে না?

হাসলো মিত্রা। শমিতের মুঠোর ভেতর থেকে আর একবার হাত দুটো ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করতে করতে বললো, মা তো বুড়ো মানুষ। আমি মরে গেলে ঠিক ওদের তোমার হাতে দিয়ে যাবো।

হাত ছাড়লো না শমিত। আরো শক্ত করে ধরে বললো, তবে?

মিত্রার মনে পড়ে গেল ওর স্বপ্নের কথা। পরীক্ষা দিতে বসে কিছুই লিখে উঠতে পারছে না সে। যারা লিখছে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কাতর নয়নে। এমন সময় কে যেন ওর হাত পেছন থেকে মুঠো করে ধরলো। খাতার পর খাতা লিখল। তারপর ওর হাত ধরে বললো, চলো। ও কেঁদে উঠল, কুমার মুন্নী—

কেঁপে উঠলো মিত্রা।

কিন্তু আর তাকে কথা বলতে দিলে না শমিত। মিত্রার দুই ঠোঁট প্রথম দিনের মতোই শমিতের ঠোঁটের চাপের ভেতর কাঁপতে লাগলো থরথর করে!

দুঃখ-বেদনা, সুখ-আনন্দের ভেতর যে নীরব ঢেউ আছে তা হৃদয় থেকে হৃদয়ে আপনি গিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তার সেই নীরব স্পর্শে কোন কিছু না দেখে না জেনে-শুনেও মানুষের সব জানা, সব বোঝা হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে কোথায় দুঃখ আঘাত করেছে। কোথায় বেদনা উঠেছে অন্তর মথিত করে। কোথায় চাচ্ছে আনন্দ ছড়িয়ে পড়তে। যে বার্তা বাতাস বুকে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে তাকে শমিত গোপন করবে কি করে।

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে মিত্রার দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী একদিন বললো, তুমি যদি ভাই এখন এখানে কিছুদিন থেকে যেতে তবে আমি মার কাছে ক'দিন থেকে আসতাম। ছোট বোনটা চলে গিয়ে মা বড্ড কাতর হয়ে পড়েছেন।

মিত্রার চোখে মুখে গালে গরম রক্ত ছুটে এলো। নিজেকে সংযত করে হাসলো মিত্রা। বললো, তুমি তোমার মার কাছে যেতে চাইছ, থাকতে চাইছ, তোমার মার এমন সৌভাগ্যে আমি কখনই বাদ সাধতাম না, যদি জানতাম আমার যাওয়াটাই তার অন্তরায় হবে। আমি আজ যাচ্ছি। আর সে কথাটাই বলতে যাচ্ছি মাকে।

সেদিনই চলে এলো মিত্রা।

স্বর্ণময়ী ঠাকুর ঘরে দরজা দিয়ে কাঁদলেন।

আর শমিত চমকে উঠলো খবর শুনে। হাতের বই মুখের সিগারেট নামিয়ে রেখে বিস্মিত কণ্ঠে জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কখন গেল?

ভুলে গেল, এ ভাবে এ জিজ্ঞাসা তাকে মানায় না।

গম্ভীর জয়ন্তী বললো—এই মাত্র।

আর কথা বললো না শমিত। জয়ন্তী চলে গেলেও বসে রইল তেমনি ভাবে। দিদি ঘরে এসে ঢুকলেও সিগারেটটা হাত থেকে ফেলে দেওয়ার কথা খেয়াল হলো না তার। ভাই এর এই নিদারুণ অন্যমনস্কতা শৈলনন্দিনীর নজর এড়ালো না। থমথমে কণ্ঠে বললেন, তোমার কোন কথা আমি আর শুনবো না। তোমাকে এবার আমার কথা, আমার শেষ ইচ্ছেটা রাখতে হবে।

হঠাৎ কথার শব্দে যেন সম্বিত ফিরে এলো। হাতের সিগারেট ফেলে দিলো শমিত।

একেবারে অন্যজগতে থেকে, একেবারে অন্য কথা মনে নিয়ে দিদির কথার জবাব দিলো সে যন্ত্রের মতো! বললো, বলো।

দিদি বললেন, সম্পত্তি আর ব্যবসার যাবতীয় অংশ তোমার নামে উইল করে নিতে আমাকে কত কষ্ট, কত ঝামেলা, আর পারিবারিক অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে তুমি জানো?

জানি।

আর মায়ের মৃত্যুর পর বুকে করে এনে কি ভাবে তোমাকে বাঁচিয়েছি, মানুষ করে তুলেছি তাও জান।

আমার সবই তুমি করেছ। এ আর একটা-একটা করে বলে লাভ কি দিদি। তোমার স্নেহ কি আজ আমাকে শুনে জানতে হবে।

দিদির চোখে জল দেখা দিতে চাইল। সেটা সামলে নিয়ে বললেন, আজ তোমাকে আমায় কথা দিতে হবে।

দিদির দিকে তাকিয়ে রইল শমিত।

তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। যে মেয়ে দুটির ফটো একদিন তোমাকে দেখিয়েছিলাম, তাদের একজনের সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে স্থির করে ফেলতে চাই—একটু সময় শমিতের জবাবের অপেক্ষা করে দিদি বললেন, কি কিছু বলছ না যে?

সামান্য হাসলো শমিত। তুমি তো ঠিক করেই ফেলেছ।

তবু, তোমার মুখের 'হ্যাঁ'-টা তো নিতে হবে।

তারপর বউকেও সম্পত্তির খোঁটা দেবে তো?

গায় মাখলেন না শৈলনন্দিনী শমিতের খোঁচা। বললেন, আমি তোমার বউ নিয়ে সংসার করবার জন্য বসে থাকব কিনা। এবার আমরা দু'জা ঠিক করেছি কাশী চলে যাবো। তোমরা সুখে থাকলেই আমাদের সুখ। বাঁচবোই বা আর ক'দিন। বাকি কটা দিন কাশী বাস করবো।

আমার সুখের জন্য বিয়ে করতে বলছো?

তবে কি আমার সুখের জন্য তোমাকে বিয়ে করতে বলছি!

আমি তো সেটাই ভাবছি।

শৈলনন্দিনী উঠে পড়লেন। বললেন, বেশ আমার সুখের জন্যই তুমি বিয়ে কর।

অর্থাৎ তিনি বিয়ে দেবেনই শমিতকে।

দিদি চলে গেলে চুলের ভেতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে অস্থির পায়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলো শমিত। মিত্রার এরকম অকস্মাৎ চলে যাওয়া আর দিদির ওকে বিয়ে দেবার বেয়াড়া জেদ চেপে বসার মধ্যে কি কোথাও কোনো যোগ রয়েছে? অপমানিত হয়নি তো মিত্রা? চঞ্চল হয়ে উঠল শমিত। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল শমিত।

এবার ফিরে এসে আর দিন নষ্ট করলো না মিত্রা। স্বাস্থ্য আর মন অনেকগুলো দিন ওর নিয়েছে—আর নয়। ছবি নিয়ে বসলো সে। কিন্তু এক-একটা কাগজ ইজেলের গায় পেতলের পিনে আটকাতে লাগলো, কোন একটা চিন্তা নিয়ে রং তুলি চালাতে থাকলো, আর দু'এক টানের পরই টেনে খুলে ফেলে দিতে লাগলো ছেড়া কাগজের ঝুড়িতে। তারপর যে শয্যার ওপর একদিন সে আঁকতে আঁকতে উঠে পড়ে 'আনন্দ আনন্দ আনন্দ' বলে শুয়ে পড়েছিল, সেই শয্যার ওপর ক্লান্ত চোখ আর শূন্য মাথা নিয়ে এসে পড়ে রইলো চোখ বুজে। না, না। আঁকতে জানে না সে। মামারা যেমন চিরকাল ওকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছেন, এটাও তাঁদের এক রকমের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। যে কারণে স্বর্ণময়ী ও শৈলনন্দিনী ওকে পড়তে উৎসাহ দিয়েছিলেন, ঠিক সেই কারণে মামারা ওকে ছবি আঁকায় উৎসাহ দিচ্ছেন। উঠে বসলো মিত্রা বিছানার ওপর। ছিঁড়ে ফেলবে—চিঠি ছেঁড়ার মতো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে সব ছবি জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেবে সে। দেরাজ খুলে ছবিগুলো টেনে-টেনে ফেলতে লাগলো মেঝের ওপর। তারপর বসলো ছিঁড়তে। কিন্তু যেই মেলে ধরে টান মারতে যেতে লাগলো অমনি যেন ছবিগুলোই হাত চেপে ধরতে লাগলো মিত্রার। ফুলগুলো যেন প্রবলভাবে দুলে উঠে আপত্তি জানালো। লতাটা যেন নিজেকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করলো। মেয়েটির চোখের সুখের আবেশ হঠাৎ যেন উঠল আতঙ্কিত হয়ে। রিক্সাওলাটা হাত তুললো মাথা বাঁচাতে।

তবে কি আঁকতে জানে সে!

আনন্দ আনন্দ আনন্দ—

আনন্দ সর্ব কাজে, মৃত্যু বিরহ শোকে—দুচোখ বুঁজে আবার বলে উঠলো মিত্রা।

জয়ন্তী এসে সংবাদ জানিয়ে গেলো একদিন—জেঠাইমার দৃঢ় সংকল্প এই মাসের ভেতর শমিতের বিয়ে দেবেনই। তা শমিতও মত দিয়েছে। ওরা প্রতিদিন দুবেলা মেয়ে দেখছে। শমিত বলেছে, সে শুধু রূপ চায়। আর কিছু নয়। দুধে-আলতায় রং হবে। তিলফুল নাক হবে। গোলাপ পাঁপড়ি ঠোঁট হবে। চাঁপার কলি আঙুল হবে। ভেবে ছিল জব্দ করবে। কিন্তু জেঠাইমা ঠিক তেমনি রূপবতী মেয়ে বের করে ফেলেছেন।

জয়ন্তী চলে গেলে সৌমী বললো, এই কথাগুলো শুনিয়ে যাবার জন্যই ভদ্রমহিলা ছুটে ছুটে আসছেন! কার যে কিসে আনন্দ কে বলতে পারে!

মিত্রা শুধু হাসলো।

জয়ন্তীর কথা প্রায় কিছুই কানে যায়নি তার। এই যদি সত্য হতো তবে মিত্রা বাঁচতো। সে জানে শমিত বিয়ের কথা নিয়ে তার কাছে আসবেই। তাকে কি করে এড়াবে, নিজে সে এ সঙ্কট থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে তার চিন্তা এই। আর কিছু সে না শুনছে, না ভাবছে। জয়ন্তী চলে যাওয়ার পর সৌমী উঠে গেলে হাতের চেটোয় চিবুক রেখে এই ভাবতে লাগল মিত্রা—

শমিত আসবে। কোন কথা শুনতে চাইবে না। নিজের যুক্তি বার বার বলে যাবে। বলবে, আমার বাবার তো ছেলেমেয়ে ছিল। কই তার বিয়েতেতো আমরা প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য হইনি। তোমরা বলবে পুরুষ পারে। এই তো? তাই যদি হয় তবে মেয়েরাই বা পারবে না কেন? স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান নিয়ে নিজেকে নিয়ে তারা যে অসহায় আর অসহনীয় অবস্থার ভেতর গিয়ে পড়ে, দোর থেকে দোরে যে ভাবে তাড়িত হয়ে ফেরে, স্ত্রীর মৃত্যুতে ছেলেদের কি তার একটাও হয়? তবু তারা বিয়ে করে। নিজের চোখের উপর প্রথমার সন্তানকে অত্যাচারিত হতে দেখে। উইল করে দ্বিতীয়াকে দিয়ে যায় দেবার মতো কিছু থাকলে। প্রথমার সন্তানকে বঞ্চিত করে— যেমন

করে গেছেন আমার বাবা—এবং বহু জনের বাবা করে জান। সৎমার সঙ্গে সঙ্গে বাবাও সৎ হয়ে দাঁড়ান। বেঁচে থেকে অবিচার অত্যাচার করতে বা দেখতে পুরুষের কোমল হৃদয় চূর্ণ হয় না, বুক ফেটে যায় তাদের পরলোকে বসে সন্তানের ভাবনা ভেবে। আমার তো ধারণা, পুরুষ স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্তানের যে হাল করে, মেয়েরা তার ধারে কাছেও এগোতে পারবে না। নিজেদের দাবীকে জোরের সঙ্গে গ্রহণ করতে শেখো মিত্রা। পুরুষের মনুষ্যত্বের দরজায় হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকলে সেই ভিখিরীই থেকে যাবে।

হঠাৎ রেডিওটা বন্ধ হয়ে ঘন্টা স্তব্ধ হয়ে যেতে মুখ তুলে মিত্রা দেখলো শমিতই রেডিও বন্ধ করছে। শমিত তাহলে এসেছে ঠিকই।

চিবুকের হাত নামিয়ে পিঠের চুল হাতে জড়িয়ে গুছিয়ে বসলো মিত্রা।

সোফায় বেশ আরাম করে বসে শমিত জিজ্ঞাসা করলো, ভাবছিলে?

রেডিও শুনছিলাম।

গান, না মাছ চাষের আলোচনা হচ্ছিল?

গান মানে আধুনিক তো? অনেক সময় ও দুই-কে আলাদা করা যায় না।

শমিতের মুখে শরীরে আনন্দর ভাবটা লক্ষ্য করতে লাগলো মিত্রা।

শমিত পাখার হাওয়া বাঁচিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললো, আমার বিয়ের কথা ভাবছিলে।

প্রেজেন্টটা কি দেবো তাই ভাবছিলাম।

পেলে খুঁজে?

উঁহু।

আচ্ছা, আমি তোমাকে পরে সাহায্য করবো। এখন তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর —পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মিত্রার সামনে তুলে ধরলো শমিত। তারপর বললো ঃ এটাতে একটা সই করে দাও।

এটা কি?

রেজিস্ট্রেশান ম্যারেজে দুজনার যুক্ত সই দরকার হয়।

এ হয় না শমিত।

হবে। বলে প্রফুল্লিত শমিত সোফার পিঠে মাথা রেখে গুনগুন করে উঠল—

মনে হলো যেন পেরিয়ে এলাম
    অন্তবিহীন পথ
    আসিতে তোমার দ্বারে।
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি
    শিক্ত যূঁথির মালা
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ ঢালা
    লজ্জা দিও না—দিও না।
    লজ্জা দিও না তারে—

—প্লিজ মিত্রা, লজ্জা দিও না। এটা সই করে আমার ওপর সব ভার দিয়ে চুপ করে বসে থাকো।

নীরব মিত্রার কাছে আরো বারকয় একই অনুরোধ করলে শমিত।

অসহায় অবসন্ন কণ্ঠে মিত্রা বললো, তোমার বিরক্ত লাগছে না?

একটুও না।

আমার কিন্তু লাগছে।

তবে বিরক্ত হয়েই একটা সই দিয়ে দাও।

বিরক্ত হয়ে কি কেউ সই দেয়, ছিঁড়ে ফেলে।

আর একটা লিখে আনবো।

ততক্ষণে আমি কমলার নেমন্তন্ন রাখতে জলন্ধরের পথে রওনা হয়ে পড়েছি।

মানে? এবার গম্ভীর হলো শমিত। কিছুক্ষণ যেন আত্মস্থ হয়ে রইল সে। তারপর উঠে পড়ল সোফা ছেড়ে। বললো, এতটা করবার দরকার নেই। তোমাদের কোথাও পা বাড়াতে একটা মাসী পিসী ননদ জাতীয় কিছুর

দরকার হয়। পৃথিবী সামনে করে বেরিয়ে পড়তে আমার প্রয়োজন শুধু মনে করা। দরজা পর্যন্ত চলে গিয়ে একবার ঘুরে এলো সে। মিত্রার একেবারে অতি কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো, জীবন নাটকের ছকটা যা কেটেছ মিত্রা, তা অতীব সস্তা দরের। নায়কের নিরুদ্দেশ যাত্রা। কিংবা বিয়ের রাতে কনের মুখের ওপর প্রিয়ার মুখ দেখা। নায়িকার চাঁদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা—রাবিশ। দেখলাম সংস্কারের পায় বলি হবার জন্য মাথাটি বাড়িয়ে থাকে সব মেয়েই। তাই তুমি আমার এই একান্ত সম্ভ্রমের চাওয়াকে সম্মান দিতে পারলে না। অনেক পুরুষই তোমাদের ঠকায়। কিন্তু যারা তা চায় না তাদের সঙ্গেও পা মিলিয়ে চলতে পারো না তোমরা। আচ্ছা—হাত তুলে একটা নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেল শমিত।

কৌচের উপর ফের পিঠ রাখলো মিত্রা।

মিত্রা আর কাঁদবে না। কোন দিন নয়। কোন কারণেই নয়। কাকে চাই আর কাকে পেলাম না তার জন্যেও নয়।

যে তুফানের শব্দ কানে নিয়ে বসেছিল মিত্রা, সে তুফানটা যেন এই মাত্র ওকে অতিক্রম করে গেল।

সৌমী এসে পাশে বসে বললো, আমার বুদ্ধির ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই মিত্রা?

কেন বলতো? মাথা তুলল মিত্রা।

কই আমাকে তো কোন কথা বলছ না? কিছু জিজ্ঞাসা করছ না?

করুণ হাসলো মিত্রা। কি আছে এর ভেতর জিজ্ঞাসা করবার বলো? দ্বিধা থাকলে বুদ্ধি চাইতাম। এখানে দ্বিধার তো কোন অবকাশ নেই মামী।

কেন নেই? আচ্ছা, তুমি কি ভাবছ সেটাই আমি আগে শুনি?

মিত্রা একটা গদির বালিশ কোলে তুলে নিয়ে তাতে দুই কনুই রেখে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, মামী আমি ভাবছি দুটি বৃদ্ধার কথা। ভাবছি আমার শাশুড়ীর কথা। আমি তাঁকে আঘাত করতে পারবো না—কিছুতেই না।

চাকর এসে একটা চিঠি দিল মিত্রার হাতে। বড়বাবু দিলেন।

ওপরের ঠিকানার উপর চোখ বুলিয়ে মিত্রা বললো, রাণীর চিঠি। অনেকদিন বাদে এলো। দাঁড়াও পড়েনি।

এনভেলাপ ছিঁড়ে চিঠি বের করল সে।

মিত্রা,

একটা গল্প শোন। একটি মেয়ে—নাম? এক যে ছিল রাজার মতো—এক যে ছিল মেয়ে বলে গল্প চালিয়ে গেলে আপত্তি কি?

মেয়েটি বহুদিন বাদে ভাই বোন মা বাবার কাছে আসতে পেরে বেশ আনন্দেই আছে। হঠাৎ তার স্বামী এসে উপস্থিত। অভাবিত স্বামী দর্শনে খুশি হওয়া উচিত। উচিত কাজ মেয়েটি তার নিজের ওপর মমতা না করেই করে আসছে চিরকাল। সেদিনও করল। খুশি হলো।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বাড়ীর সবাই। গরীবের ঘরে ধনী জামাই। ধন্য হয়ে গেছে তারা। নির্জন সাক্ষাতে স্বামীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি। গম্ভীর ভাবে বললেন, কুশলেই আছেন সব। তবু তাঁর মুখের চেহারা দেখে উৎকণ্ঠিত হলো মেয়েটি। ফের জিজ্ঞাসা করতেই হাসলেন বাঁকা ঠোঁটে। বললেন, পুত্রকন্যা এখানে। বর্তমানে তিনিও সশরীরে উপস্থিত। তবে শ্বশুরঘরের কার কল্যাণ সংবাদের জন্য এতো উদ্বিগ্ন হয়েছে সে। বৃদ্ধা শাশুড়ীর জন্য নয় নিশ্চয়ই?

মেয়েটি স্তম্ভিত।

তবে কি সেই মাটি শুঁকে চলার ধাওয়া এটা? ঠিক তাই। ঝির কাছ থেকে এবং আরো অনেকের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে তিনি স্থির নিশ্চয় হয়েছেন যে, কি দিনে, কি রাতে সেই মেয়ে বেরিয়ে যেত এ বাড়ীরই তেতলার এক ছেলের সঙ্গে। মেয়েটার ভাইবোনের পড়ার খরচ কে যোগাচ্ছে এরপর তো স্পষ্ট। তারপর আর যা যা বললেন, সে কথা আর লিখব না। বোন আর মা যখন বারান্দায় চা জলখাবার হাতে, জামাই তখন স্টেশনমুখী। ঘরের দরজায় ভিড় করে এসে দাঁড়ালো ভীষণ আতঙ্কিত কতগুলো দরিদ্র মুখ। শঙ্কিতা মা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে কি হয়েছে বলে—

মেয়েটি দুই চোখ মুছে ডাকলো, ধরণী দ্বিধা হও।

চিঠি পড়ে দু-চোখে আগুন জ্বলে উঠল মিত্রার। দাঁতে ঠোঁট চেপে বসে রইল সে। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খসখস করে একটা চিঠি লিখে উঠে গেল বাইরে।

মিত্রা ফিরে এলে সৌমী রাণীর চিঠিটা পড়া শেষ করে ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বললো—ভদ্রলোক কি সাংঘাতিক মানুষ এ্যাঁ?

মানুষ!

কিন্তু এর কাছেই তো আবার তোমার রাণীকে ফিরে আসতে হবে। এই তো আমাদের মেয়েদের অবস্থা।

কেন আসবে? উত্তেজিত মিত্রা উঠে দাঁড়ালো।

তবে কোথায় যাবে?

তবে কোথায় যাবে—মেয়েদের জগৎটা যেন থেমে পড়েছে এখানে এসে।

তুমি কাকে চিঠি লিখলে?

শমিত কে।

কেন?

তার এ চিঠি দেখা দরকার। এবং ও বাড়ী ওর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

ছেলেমেয়েরা এসে মিত্রার কাছে দাঁড়ালো তাদের রোজকার বরাদ্দ গল্পের জন্য। যেটা ওরা ঘুমোতে যাবার আগে শোনে।

সৌমী বললো, এমন এক মজার গল্প তোদের কাছে বলবার জন্য দিদিমণি বসে আছেন—শুনে আমিই লাফিয়ে উঠেছিলাম। শিগগির চল। দেরী হলে ভুলে যাবেন। জানতো কেমন ভুলো মন তাঁর।

বাচ্চারা দৌড়োলো দিদিমার ঘরের দিকে।

শমিতের গাড়ী থামার শব্দ হলো নীচে। তারপর তার জুতোর শব্দ নীচ থেকে উঠে এলো ওপরে। বসবার ঘরে এসে সোফার পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে বললো, কি হয়েছে? কার চিঠি যে এক্ষুনি শ্যামবাজার থেকে ছুটে এসে আমায় পড়তে হবে?

চিঠিটা শমিতের হাতে দিতে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো মিত্রা।

এক নির্জন সন্ধ্যায় ক্রন্দনরত স্বর্ণময়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেমন কুণ্ঠায় পা ওঠেনি মিত্রার তেমনি যেন আজ শমিতের মুখের দিকে দ্বিতীয়বার চোখ তুলতে পারলো না মিত্রা। এই এতোটুকু সময়ের ভেতর একি চেহারা হয়ে গেছে শমিতের!

চিঠি শেষ করে সেটা ভাঁজ করে মিত্রার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অবিন্যস্ত চুল পেছনে ঠেলতে ঠেলতে শমিত বললো, এ চিঠি পড়বার জন্য তুমি চাকরকে ট্যাক্সি করে পাঠিয়ে আমায় নিয়ে এলে? কি আছে এর ভেতরে?

কিছু নেই!

কিছুই না। সুন্দর ঝরঝরে চিঠি। শুধু শেষ লাইনটায় গিয়ে যা একটু নিরাশ হলাম। সমাপ্তিতে ভেবেছিলাম, পাতালে প্রবেশটা যখন সম্ভব হলো না, জহর ব্রতট্রত একটা কিছু থাকবে।

ঠাট্টা করতে পারছো তুমি?

পকেটে দু হাত ভরে টান হয়ে দাঁড়ালো শমিত। বললো, কি করবো, মিত্রা, নিতান্তই তোমাদের সঙ্গে জালে জড়িয়ে পড়েছি। নইলে ঠাট্টা কি বলো, প্রাণ খুলে হেসে উঠতাম তোমাদের আধুনিকাদের অগ্রগতির দৌড় দেখে। মুক্তিতে পর্যন্ত টেনে বুক ভরা একটা নিঃশ্বাস নিতে —পারো না। বেঁচে আছো কি তোমরা? যাক্, রাণীর চিঠি নিয়ে এতো ভাববার বা উত্তেজিত হবার কিছু নেই। মেজবাবু এখনো আসেন নি। স্ত্রীর প্রতি তার দুর্বলতা আছে। আর ঐ দুর্বলতাটুকু নিয়েই রাণীর জীবন বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। এর চাইতে বেশী তোমাদের দরকার হয় না।

তুমি এর পরও ওবাড়ী থাকবে?

কেন থাকবো না বলো? মেজবাবুর উপর আমার কোন রাগ নেই। কিছু মানুষ আছে কতগুলো ব্যবহার তারা নিজেরাই ডেকে আনে বা করতে প্ররোচিত করে। কাউকে দেখলেই একটু কৌতুক করতে ইচ্ছে করে। কাউকে নিয়ে ইচ্ছে করে মজা করতে—কাউকে ক্ষেপাতে-রাগাতে-চটাতে। তেমনি মেয়েরা উৎসাহিত করে কাঁদাতে, লাঞ্ছনা করতে, ঠকাতে। এগুলোতে তাদের কাছ থকে যেমন অপূর্ব সাড়া আর সহযোগিতা মেলে তেমন আর কিছুতে নয়। মেজ কর্তার কি দোষ?

একটু থেমে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় গলা মুখ মুছতে মুছতে ক্লান্ত কণ্ঠে বললো, তবে আপাততঃ আমার এখানে ওখানে সেখানে—কোনখানেই থাকার কোন প্রশ্ন উঠছে না। সস্তা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে

কিছু সস্তা কাজ বাধ্য হয়েই করতে হয়। একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে রাতের ট্রেনের যে কোন একটা কামরায় শুয়ে পড়তে পারলেই এখন আমি বেঁচে যাই। আর কোন কারণে নয়—আমার তেতলার ঘরের নির্জনতা নষ্ট করে ফেলেছেন দিদি—শুধু এই জন্য। এবার যেতে পারি আমি?

মিত্রার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলো শমিত। মনে পড়লো, নতুন বউ মিত্রাকে দেখার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করায় কমলা রাগ করে বলেছিলো, এমন একখানা মুখ যে, শেষে দেখবার জন্য কাঁদবে। হায় ভগবান!

মাটির দিকে পাতা চোখ তুললো না মিত্রা। বেরিয়ে গেল শমিত।

শমিতের স্টার্ট নেওয়া গাড়ীর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সৌমী বললো, আমি চা খাবার তৈরী করছি, আর আপনি চলে এলেন?

হাত জোর করলো শমিত—আর একদিন।

সে তো আছেই। আপনি নামুন।

আজ আমার বড্ড তাড়া রয়েছে!

নিজের হাতে দরজা খুলে শমিতের হাত ধরে আকর্ষণ করলো সৌমী— আসুন। আমি আপনাকে একটুও দেরী করাবো না।

আশ্চর্য হলো শমিত। ফের স্টার্ট বন্ধ করে নেবে এলো সে।

ঘরে পায়ের শব্দ পেয়ে মিত্রা হাত চোখ ঢাকা অবস্থায়ই অনুনয়ের সুরে বললো, বাতি জ্বেলোনা মামী।

ততক্ষণে সৌমী বাতি জ্বেলে দিয়ে শমিতকে বলছে, বসুন শমিত বাবু।

শমিত! চোখে ঢাকা হাত যেন চোখের উপর জমে গেলো মিত্রার। এই মাত্র যে বস্তুগুলোর সাড়া মেয়েদের কাছে সব চাইতে বেশী মেলে বলে পরিহাস করে গেল শমিত, তারই একটাতে মিত্রার গলা, চিবুক, কনুই সব ভিজে যে!

সৌমী মিত্রার পাশে বসে পড়লো। তারপর মাঝের টেবিলের ওপর পড়ে থাকা শমিতের সেই কাগজ আর কলম সুদ্ধ টেবিলটা ওর আর মিত্রার সম্মুখে টেনে এনে কলমটা তুলে নিয়ে হেসে বললো, আমি পুরুত ঠাকুরের কাজটুকু করার জন্য এসে বসলাম। আমাদের মেয়েরা নিজেরা ওটা করতে পারে না। কলমের মুখটা খুলে হাতে নিয়ে বললো, তবে আপনি একটা কথা বুঝতে পারেন নি। মিত্রার প্রধান বাধা কিন্তু দুটি বৃদ্ধা। আচ্ছা—শমিতের দিকে চাইল সৌমী—এখন সবাইর জানার দরকার কি?

বাধ্য হয়েই চোখের আবৃত হাত সরিয়ে চোখ মুখ মুছে উঠে বসতে হলো মিত্রার। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে বললো, এ কি হচ্ছে মামী?

সৌমী বললো, এমন সুন্দর মুহূর্তটাকে যদি আমি ধরতে না পারি, নিজেকে কোনদিনও ক্ষমা করতে পারবো না মিত্রা। মিত্রার হাতটা মুঠো করে ধরে একরকম নিজেই মিত্রার নাম সই করে দিয়ে হেসে উঠে গেলো সৌমী। আর মিত্রার হাতটা সৌমী যেখানে নামিয়ে রেখে গেল সেখানেই সে হাত পড়ে রইলো মৃতের মতো।

শমিত ভেবে পেলো না, এখন ওর কর্তব্য কী। ও এখন কী করবে। এ জোর করা নাম-সই তো অর্থহীন। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলবে? ছেলেমানুষি হবে। দরকার কি? যেমন চলে যাচ্ছিল তেমনি চলে গেলেই তো হয়। কিন্তু সৌমী এই যে বললো, পুরুত ঠাকুরের কাজটা করে দিচ্ছে সে—কনের অলস হাত বরের হাতে তুলে দিয়ে যেমন মন্ত্রপাঠ করে পুরুত, সৌমীও তেমনি মিত্রার অবশ হাত ধরে সই করে দিয়ে গেলো।

তবু এ নাম-সইয়ে মন সাড়া দিলো না শমিতের।

উঠে পড়ে মিত্রার কাছে এসে অবসন্ন কণ্ঠে বললো, তোমার অনুমতি পেলে আমি যেতে পারি।

কি যেন বলবার জন্য মুখ তুলেও বলতে পারলো না মিত্রা। চোখ নামিয়ে অনল শমিতের মুখের ওপর থেকে।

দরকারও ছিল না আর বলার। মিত্রার পাশে বসে পড়ে তার হাত হাতে তুলে নিল শমিত। উদ্বেলিত কণ্ঠে বললো, তুমি যতদিন না বলবে, ততদিন কেউ জানবে না মিত্রা এ-কথা—কেউ জানবে না। এতো দুটি বৃদ্ধাকে নয়, এ একটা যুগকে সম্মান করা। আমি হৃদয় দিয়ে তোমার এই ইচ্ছার সম্মান রাখবো। আর ছেলে মেয়ে? ও প্রশ্নটা আমি সইতে পারি নে। ও প্রশ্নটা আমাকে আহত করে, অসম্মান করে মিত্রা। বিশ্ব সামনে রেখে বিশ্বের মানুষকে ভালোবাসতে বেরিয়ে পড়েছি আমরা—আর দুটো শিশুকে ভালোবাসতে পারবো না!

বর্ণালী

॥ ১ ॥

পরীক্ষাশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতে ফলাফলের যে দুর্ভাবনা আর অশান্তি ভোগ আরম্ভ হয়েছিলো, সে ভোগের শেষ হয়ে গেছে পাশের খবর পেয়ে। তার ওপর শুধু ভালো সম্বন্ধই নয়, স্থির হয়ে গেছে বিয়ের দিন— মৌরীর মন নির্জন মাঠের একক সর্ষেফুলটির মতো খুশীর ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছিলো।

বর্তমানে ও ওর বসবার জায়গা করেছে বাড়ীর চিলেকোঠায়— যেখানে বসে দু'দিন আগেও কেবল পিঠ টান করে পরীক্ষার পড়া তৈরী করেছে। আজ আর টান হয়ে এমন একটানা পড়বার দরকার নেই। তাই সে আনিয়ে নিয়েছে একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার। এতে গা ঢেলে বসে ও গল্প উপন্যাস পড়ে— নয়তো তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। ভাবে কত কি—যার আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই। ছোট বোন মঞ্জু অবশ্যি ওর এই আয়াস ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে তাতে ধনুকটান মেরে বলে, ইংরেজী সাহিত্যের মোটা মোটা বই যোগাড় করেছে, দেখ না কত! পড়বে তো নাইই আর পড়লেও বুঝবে ছাই। চল্‌ছে তো শুধু বসে বসে বিয়ের কথা ভাবা।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। একে বয়সটা স্বপ্ন দেখার। তার উপর বিয়ে—মনটা কখনও ওর স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসছে, কখন চাইছে গান গেয়ে উঠতে। সে দিন মৌরী ওর চিলেকোঠায় ইজিচেয়ারে বসে চোখ বুজে গানই গাইছিলো—

> 'দিনে দিনে কঠিন হলো কখন বুকের তল
> ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চোখের জল,
> হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
> কান্না তখন থামে না যে—'

—'এই দিদি, তুই এখনও গান গাচ্ছিস যে?'

—'কেন কি হয়েছে তাতে?' ভ্রূ কুঁচকে ছোট বোনের দিকে তাকাল মৌরী।

—'বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর কেউ ও গান গায়? আর যদি গায় তো তার বিয়ে তক্ষুণি ভেঙ্গে যায়।'

—'গানটার অপরাধ?'

—'হঠাৎ দেখা পথের মাঝে কান্না তখন থামে না যে—' মা গো, কী ভীষণ গান! তোর বর এখন এ গান শুনলে বিয়ে ভেঙ্গে দেবে। পরে শুনলে সমস্ত জীবন তোর দিকে আড় নয়নে তাকিয়ে থাকবে— আর পথে তুই পরিচিত, অপরিচিত যার দিকে যক্ষুণি তাকাবি, তোর চোখে জল খুঁজবে। "কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুম চয়নে" এছাড়া কনের মুখে গান মানায়?

মৌরী উঠে দাঁড়িয়ে বোনের লম্বা চুলে কষে এক টান দিয়ে বলল,— 'বেশ তো ছিলাম আমরা ক'ভাই বোন। শেষকালে তোর মত একটা অতি ফাজিল মেয়ে হবার কি প্রয়োজন ছিল?'

—'আমি তোমাদের প্রয়োজনে নয়, জন্মেছি বিশ্বের প্রয়োজনে। গার্গী, মৈত্রেয়ীর পর বন্ধ্যা ভারত এই প্রথম আবার একটি কন্যাসন্তান উপহার দিয়েছেন মাতা ধরিত্রীকে। কিন্তু সে কথা তো বলে বিশ্বাস করান যাবে না, করে দেখাতে হবে।'

'আচ্ছা ব্যাপারটা কি?' বৌদি এসে দাঁড়ালেন সামনে—'তুমি সেই থেকে ছাদে বসে আছ, পাত্তা নেই— মঞ্জুকে তোমায় ডাকতে পাঠালেন পিসিমা—তারও দেখা নেই। আজ সন্ধ্যায় বাসুর জন্যে মেয়ে দেখতে যেতে হবে না?'

'এমন একটা কথা ভুলে বসেছিলাম ক্ষমা নেই।' মৌরী ছুটল নীচে। এসে ঢুকল একেবারে ছোড়দা বাসুর ঘরে।—'এই ছোড়দা, হাঁচি, কাশি কমেছে তো? তোমার জন্যে মেয়ে দেখতে যাচ্ছি, দেখো বেরুবার মুখে আবার হ্যাঁচ্চো দিয়ে বসো না।'

বাসুদেব অল্প-জ্বরের সর্দ্দি-কাশি নিয়ে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। হাত দিয়ে নিজের পাশটা দেখিয়ে বললো— 'শোন, বোস এখানে। কথা আছে।'

—'সময় নেই। খুব চটপট সার।' হাতে জড়িয়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে মৌরী গিয়ে বসল বাসুদেবের খাটের উপর। 'কি কথা, খুব ভালো করে দেখব এই তো?'

—'ঠিক উল্টো। একেবারেই মানা করছি যেতে।'

—'কেন?' আশ্চর্য্য হয়ে জানতে চাইলো মৌরী।

—'আচ্ছা', হাতের বইটা বন্ধ করে উঠে বসল বাসু —'এই যে তোরা এমন আয়োজন করে মাসীপিসির সঙ্গে দল বেঁধে মেয়ে দেখতে গিয়ে বসিস, লজ্জা করে না তোদের? লেখাপড়া শিখেছিস, রুচিবোধের গর্ব্ব করিস, কিন্তু তোরা কি? নিজে তো বার চোদ্দ, নির্ব্বিকারচিত্তে গিয়ে বসলি সভার মাঝে। আবার চলেছিস আরেক জনকে দেখতে।'

—'মিথ্যে কথা। কক্ষণো সভায়-টভায় বসিনি। আমি চা-খাবার সাজিয়ে ওঁদের ডেকেছি। সবাই এসে বসলে, সামনে উপস্থিত থেকে খাবার তদারক করেছি। কথা জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিয়েছি, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তা মহিলারা যা সদা-সর্বদা বাড়ী-ঘরে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় করে থাকেন। বিকার ঘটবে কেন?'

—'তুই জানতিস নে দেখতে এসেছে তোকে?'

—'এই কথা। ঐ সম্বন্ধ নামটাতে তোমার আপত্তি? না আমার অবশ্যি তেমন কোন সংস্কার নেই।'

—'ঠাট্টা নয়, ও ভাবে পুতুলের মতো সাজিয়ে এনে দেখানোতে অসম্মান হয় মেয়েদের।'

—'বেশ', মৌরী যেন তর্ক করবার জন্য গুছিয়ে বসলো— 'তবে মানুষের বিয়ে হবে কি করে?'

—'আসা-যাওয়ায়, আলাপে, পরিচয়ে।'

—'বাঁচা গেল। একেবারে দেখাদেখি-বর্জ্জিত নয়। তবে এমন দু'-এক ঘণ্টার দেখায় তোমাদের হচ্ছে না। আরো সময় চাই। তা বেশ, হলো আসা-যাওয়া, হলো আলাপ-পরিচয়। তারপর?'

—'তারপর ভালো লাগলে বিয়ে।'

—'না লাগলে?'

—'হবে না।'

—'অর্থাৎ কেটে পড়বে?'

মুখ-চোখের এমন ভঙ্গী করে কথাটা মৌরী বলল যে, বাসুদেব হেসে ফেলল। বললো—'পরে কাটাকাটি হওয়ার চাইতে, আগে কেটে পড়া অনেক ভাল।'

'তোমাদের মেলামেশার বিয়েতে পরে আর কাটাকাটি হয় না— নিশ্চয়তা দিতে পারো?'

—'না, তা অবশ্যি পারিনে।'

—'পারলে এক্ষুণি হাতে হাত মিলাতাম। কিন্তু তা যখন নয়, তখন বেশী দেখায় লাভটাকি— প্রয়োজনটাই বা কোথায়। তবু চলনে বলনে রূপে বুদ্ধিতে দিনের পর দিন ভালো লাগিয়ে তোমাদের আকর্ষণ করতে হবে? রক্ষে করো, তার চাইতে এই আমার ঢের ভালো।'

'এটা দুই পক্ষের কথাই হচ্ছে—ভালো লাগা-না-লাগাটা দুয়েরই।'

—'আমাদের চলতি ব্যাপারটা কি একজনের মতে, আর একজনের গলায় দড়ি দিয়ে হয় না কি?'

—'তোদের যে ভাবে দেখতে যায়, ছেলেদের কেউ সে ভাবে দেখতে গিয়ে বসে?'

—'প্রয়োজন নেই। তোমাদের চেহারাটা নিতান্ত সাপ, ব্যাঙ জাতীয় না হলেই হলো। প্রয়োজন জ্ঞান গুণ আয়-ব্যায়ের হিসেব দেখা— সেটা তো সামনে বসিয়ে দেখবার জিনিষ নয়, খোঁজ-খবরের। সে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় বৈ কি। বাছাই কি শুধু মেয়েই হয়? আমার বিশটা সম্বন্ধ কি বাবা এক নাক কুঁচকে ভেঙ্গে দেননি?'

মঞ্জু এসে ঘরে ঢুকলো—'না দিদি— তোকে নিয়ে পারা গেল না। ছাদ থেকে টেনে নামালাম, আবার এখানে এসে তর্কে মেতেছিস? ছোট পিসিমা পর্য্যন্ত এসে গেছেন, আর আমরা এখনো তৈরীই হইনি। আজ বাবা রক্ষে রাখবেন না।'

মৌরী দৌড়োলো স্নানের ঘরে।

মেয়ে দেখে দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে মঞ্জু বললে—'ও বাবা, এ কি মানুষ না প্রতিমা রে দিদি?'

মৌরী মাথা নাড়ল। 'যা বলেছিস। প্রতিমাই। কিন্তু মাটির নয়, প্রাণ আছে। এ মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করতে হবে ছোড়দার।'

বিপত্নীক ভ্রাতার গৃহে পিসিমাই কর্ত্রী। তিনি নাকে চশমা এঁটে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখে সন্তুষ্টচিত্তে মন্তব্য করলেন, 'হ্যাঁ, এ মেয়ে আমার বাসুর কাছে লক্ষ্মীর মতো মানাবে। ছোট পিসিমা তার মতামত সহজে বলে বসেন না। তিনি মনে করেন তাতেই গুরুত্ব বাড়ে।'

উদ্বিগ্ন মেয়ের মার মুখে দেখা দিল খুশীর কৃতার্থ হাসি। বললেন—আপনাদের পছন্দ হয়েছে, আমার মেয়ের ভাগ্য। সাহস ছিল না আপনাদের ঘরে কথা তুলি। কিন্তু কর্ত্তা বললেন, —'কিছু চায় না গো, চায় শুধু মাত্র একটি সুন্দরী মেয়ে। তা ভগবান সব দিকে বঞ্চিত করলেও মেয়ের রূপটুকু দিয়েছেন। তুমি চিঠি লিখে দাও মেয়ে দেখে যেতে। তারপর আমাদের বরাত।'

চঞ্চল মঞ্জু উঠে গিয়ে বসল মেয়েটির কাছ ঘেঁষে। চুপি চুপি বললো—'বড় ভালো লেগেছে ভাই তোমাকে। এক্ষুণি ইচ্ছে করছে বাড়ী নিয়ে যেতে। জান, চীন দেশে নাকি কনে পছন্দ হলেই শ্বশুরঘরে নিয়ে যাওয়ার রীতি। এ নিয়মটাই এখন আমার নিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।' আবার তক্ষুণি মৌরীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে—'কিন্তু তোর বেলা নয়।'

বাড়ী ফিরে দু'বোন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে। শাড়ী কাপড়শুদ্ধ মেঝেতে বসে পড়ে বললো—'না ছোড়দা, পছন্দ হলো না।'

—'আছে তো লিষ্টিতে শ'খানেক। সব ক'টি বাড়ীর চা-মিষ্টি ধ্বংস না করে হবেও না।

—'না গো ছোড়দা, এমন কন্যে শ' কেন, লাখেও মিলবে না; সূর্যমুখী ফুলের মতো মাথা দোলাল মঞ্জু।

—'একেবারে এমন ভীষণ!'

—'হ্যাঁ, মাথা ঘুরে যাবে চেহারা দেখলে! আমাদের তো তাই গিয়েছিল।'

বাসু গম্ভীর ভাবে বললো— 'মেয়েরা যখন অন্য কোন মেয়ের রূপের প্রশংসা করে তখন বুঝতে হবে, সে মেয়ে যে বলছে তার চাইতে অবশ্যই দেখতে খারাপ।'

মঞ্জু হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো— 'হে মা কালী, তাই যেন হয়। পাঁচ জোড়া পাঁঠা দেবো। একসঙ্গে এত রক্ত দেখে যদি ভয়ে কিংবা আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছা যাও, চিন্তা নেই—ঘরে ডাক্তার জামাই আসছে। আর তোমার চিকিৎসা দিয়ে ব্যবসায় বউনি করতে পারলে, ঝনঝনে পসার তার আটকায় কে?'

উঠে দাঁড়িয়ে মৌরী হেসে বলল—'যাই বাবাকে খবর বলে আসি গে।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জুও। দুবোনকে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াতে দেখে বাসু বললো, —'তোরা কি জোড়া-বাঁধা? এক জনের সঙ্গে আর একজন উঠে দাঁড়ালি? বোস না।'

হাসিতে ফেটে পড়ল দু'বোন। 'কি শুনতে চাও বলো না? আচ্ছা দাঁড়াও আসছি আমরা বাবার কাছ থেকে হয়ে।'

পরের দিন। বেলা তখন দশটা। বৌদি এলো ব্যস্ত পায় খবর নিয়ে,—'শীগগিব বসবার ঘরে যাও বাসু! তোমাদের বড়দা, বাবা কেউ বাড়ী নেই। একা ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি ছেলেটিকে।'

—'ছেলেটি? কে সে ছেলে?' জিজ্ঞাসা করল বাসু।

চোখ মুখ ঘোরালেন বৌদি। 'কে, তা কি আমিই প্রথমে বুঝে উঠতে পারি। গা ধুতে যাবার আগে গেছি বসবার ঘরটা একটু গুছিয়ে রেখে আসতে। ও মা, দেখি কে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছে। জানতে চাইলাম, কা'কে চাই? এগিয়ে এসে বললো—'লক্ষ্মৌ থেকে এসেছি। আমার নাম সুদর্শন, কলকাতা আসতে হলো—বাবা বললেন একবার এখান হয়ে যেতে।'

লাফিয়ে উঠল মঞ্জু—'তোর ভাবী বর দিদি! বাবা এবার ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছে, হার্ট, লাংস মজবুদ কিনা দেখতে, মা গো—' হেসে লুটিয়ে পড়ল সে।

বাসু ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। আর মৌরী দাঁড়িয়ে রইল একটা বুক টিপ-টিপ নিয়ে।

বৌদি বললেন—'আজই লক্ষ্মৌ চলে যাচ্ছে রাত্রের ট্রেনে। বলছে, বেশীক্ষণ বসতে পারবে না। তুমি চট করে তৈরী হয়ে নাও মৌরী! আমি যাচ্ছি পিসিমাকে খবরটা দিতে।' বৌদি চলে গেলেন।

গায়ে পাঞ্জাবী চাপাতে চাপাতে বাসু বললো—'আর কি, যাও। আবার সেজেগুজে দাঁড়াও গিয়ে সং হয়ে।'

—'আমাকে যেতে হবে কেন? আমায় দেখতে এসেছে এমন কথা তো বলেনি।'

আকাশের দিকে তাকালো মঞ্জু—'দুর পাগল। তোকে দেখতে আসবে কেন? বাপ ছেলেকে আমাদের ঘরের আসবাব দেখতে পাঠিয়েছেন।'

—'আসবাবই তো তোরা। বিদ্রূপে ঠোঁট বাঁকালো বাসু। নিত্যদিন ঝাড়পোঁচ আর ঘসামাজার জৌলুস তুলে খরিদ্দারের চোখ ভোলাবার জন্য বসে থাকছিস।'

—'এই ছোড়দা, কথা বাড়িও না বলছি। শেষে পালাবার পথ পাবে না।'

—'পালাবার পথ পাবো না!'

—'হ্যাঁ পাবে না। জবাব দেবার মতো কথা মিলবে না।'

—'এমনি সব ধারালো উত্তর রয়েছে। বেশ—রইল তোলা। দেখা যাবে কে কার হাতে বধ হয় আজ। আর দেরী করলে ভদ্রলোকটির আমাদের ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে প্রথম দিনই একটা সন্দেহ এসে যাবে। আমি নীচে যাচ্ছি। তোরা তৈরী হয়ে আয়।'

এগিয়ে এল মৌরী। 'দাঁড়াও ছোড়দা, আমি তোমার সঙ্গেই আসছি।'

—'এই ভাবে?'

—'হ্যাঁ।'

মঞ্জু বলে উঠলো—'কেন এ ভাবে যাবে না? এর ভেতর ও বুঝি বার দু'তিনেক আয়নায় দেখে নেয়নি এই অগোছালো চেহারায় ওকে এখন যা সুন্দর লাগছে, প্রসাধন করলে তার সিকিও লাগবে না।'

—'তোকেও বেশ লাগছে। এ ভাবেই যাবি, না সাজতে হবে?'

—'তোর বর এসেছে, তুই সাজলি নে আমি সাজবো! তোর চাইতে চেহারাটা আমার ঢের ভালো— সে খেয়াল আছে? একটা সমস্যার সৃষ্টি হতে কতক্ষণ।'

—'ওর সঙ্গে পারবিনে মৌরী! চল শীগ্‌গির।' বাসু বোনদের নিয়ে ঢুকলো গিয়ে বসবার ঘরে।

সুদর্শন বসে বসে একটা বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল। ওদের দেখে বই রেখে উঠে দাঁড়াল। বাসু নমস্কার জানিয়ে, একা বসিয়ে রাখবার জন্যে চাইল মাপ। তারপর দুবোনকে দিল পরিচয় করিয়ে। নমস্কার-বিনিময় করে আসন গ্রহণ করল সবাই। গল্প জমে উঠতে লাগল বাসুর সঙ্গে সুদর্শনের। মৌরী বসে রইল খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আর মঞ্জু বসে রইল একটা অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ করে। যে জিনিষে যত বেগ, তাকে আটকাবার জন্যে প্রয়োজন হয় তত বেশী ওজনের চাপ। মঞ্জুকে দেখেও মনে হচ্ছিল ভীষণ একটা হাসির রেশের মুখ চেপে রাখছে ও ঐ রকম অস্বাভাবিক ওজনের গাম্ভীর্য্য দিয়ে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—'আপনাদের ওখানে মাছের দর কত?'

—'মাছের দর!' আশ্চর্য হয়ে চোখ তুলে সুদর্শন প্রথমে মঞ্জুর দিকে, তারপর মৌরীর দিকে তাকালো। শুধু সুদর্শনই নয়, বিস্ময়ে চোখ বড় করল বাসু, মৌরীও।

—'হ্যাঁ মাছের দর।' তেমনি গম্ভীর মুখ মঞ্জুর।

মেডিকেল কলেজে পড়া ছেলে সুদর্শন সেও হকচকিয়ে গেল। সবিনয়ে বললো—'মাছের দর বলতে পারবো না।'

—'কেন?' ভারী বিস্মিত মঞ্জু।

—'আমি বাজার করিনে।'

—'তবু?'

—'হঠাৎ চাকর চলে গেলে কি করেন?'

হেসে ফেলল বাসু। 'এ কি হচ্ছে মঞ্জু?'

—'বাঃ যতই লেখাপড়া করুক ঠেকা পক্ষের জন্যে মেয়েদের যেমন কিছু মেয়েলীকাজ জেনে রাখতেই হয়— ছেলেদেরও তেমনি কিছু জানা উচিত—নইলে সংসার অচল হয়ে ওঠার মতো বাহির অচল হয়ে ওঠে না।'

এবার হাসল সুদর্শন।—'তেমন দিনে হোটেলে যাব।'

পিসিমার ডাকে বেরিয়ে এসে বাঁচল মৌরী। বৌদির দিকে তাকিয়ে বলল—'কি দুর্দ্দান্ত মেয়ে রে বাবা!'

—'কেন কি করেছি আমি?'

—'আর কি কি করবার ইচ্ছে ছিল আপনার?'

—'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।' ছোড়দাটা সমানে কথা বলে চলেছে যেন ভদ্রলোক ওকে দেখতে, ওর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। দিলাম কথার মোড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাবার ব্যবস্থা করে—আমারই দোষ হ'ল?'

—'না কিছু না।' জান বৌদি, জিজ্ঞাসা করে কি না ''মাছের দর কত?''

গালে হাত দিলেন বৌদি।

—'তবে কি জিজ্ঞাসা করব? রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েছেন? কবিতা কেমন লাগে? চিত্রতারকাদের কে আপনার প্রিয়? আচ্ছা তুমিই বল বৌদি, তার চাইতে বাজারদর প্রশ্নটা ভাল নয়?'

—'খুব ভালো। কিন্তু পাত্র দেখলে কেমন, তাই বল এবার।' হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন বৌদি।

—'অপূর্ব্ব! ভারী মিষ্টি দেখতে। ছোড়দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন। মাথার চুলগুলি যে বাতাসে উড়ছিল তাই বা কি মিষ্টি। তুই অমন করে তাকাচ্ছিস কেন দিদি? একদিন তুই তোর এক বন্ধুর বর দেখে এসে এক ডজন মিষ্টি বলেছিলি, আমি গুণে রেখেছি।'

—'ঐ যে পিসিমা বলেন, তোকে পুলিশ দিয়ে সামলাতে হবে, সত্যি তাই।'

'— কে জানে, পিসিমাতার বাণী না জানি আমার জীবনের ভবিষ্যৎ বাণী!' একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঞ্জু।

কিন্তু যে ট্রেনে যাবার কথা ছিল সে ট্রেনে সুদর্শনকে যেতে দিলেন না মৌরীর বাবাই। বললেন—'এমন ছুটোছুটি করে যাবার দরকার কি? একদিন দেরি করলে কি খুব অসুবিধে হবে?'

—'তেমন নয়।'

—'তবে আর কি। আজ এখানেই থেকে যাও।'

সন্ধ্যারাতে বেশ একটা জমাট আসর বসেছিল। কে যে কখন এক এক করে উঠে গেছে— মৌরী লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ খেয়াল হলো, মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়েছে। আর ও চলে যাওয়া মানে সুদর্শন আরও একবারে একা পড়া। মঞ্জুর হাত চেপে ধরল মৌরী—'তুই আবার কোথায় চললি?'

—'রান্নাঘরে। নয়তো নিজের ঘরে। নয়তো তোর তেতলার চিলেকোঠায়।'

ধমক দিল মৌরী—'বোস বলছি।'

—'এক পেয়ালা চা সম্ভব হবে?' সুদর্শন মঞ্জুর দিকে চাইল।

—'ওয়েল ম্যানেজড। তা এ বাড়ীতে আপনার জন্য আজ অসম্ভব বলে কোন কথা নেই।'

মঞ্জু চলে গেল। সুদর্শন রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। যদি এমন ভারী কোচ না হয়ে বসবার স্থানটা হালকাজাতীয় কিছু হতো, তবে সে নিশ্চয়ই সেটা টেনে মৌরীর কাছে এগিয়ে আনত। একটু ঝুঁকে বসে বললো—'ভাবছি, বাবাকে গিয়ে মাথা ঠুকে একটা মস্ত প্রণাম করব।'

—'কেন?'

—'আনন্দে, কৃতজ্ঞতায়, তাঁর নির্ব্বাচনে মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু আমাকে কি রকম লাগল জানতে চাইলেও আপনি তো নিশ্চয়ই মুখ খুলবেন না?'

চুপ করে রইল মৌরী।

—'কি, বলবেন না তো?'

—'এই সময়টুকুর ভেতর কি আর একজনকে চেনা যায়?'

—'এতটুকু সময়। ভোর দশটা থেকে আটটা—পরিচয়ের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল যে।'

তবু চুপ করে রইল মৌরী।

—'আরো সময় চাই। বেশ! বর্ত্তমানে যতটুকু গেছে, তাই বলুন না হয়?'

—'পোষাক ভালো, চেহারা মন্দ নয়, ড্রইংরুম আলাপে দখল আছে।'

হেসে ফেললো সুদর্শন। —'ড্রইংরুমের পাশের ঘরের সাক্ষাৎটার জন্যেই তবে আর সব জানা তোলা রইল।'

সুদর্শনের দৃষ্টি, তার কথা, গলার স্বর সব মিলিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে মৌরী। এবার ওঠা ভালো কিন্তু যেই মৌরী উঠে দাঁড়িয়ে বললো 'আসছি।' অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সুদর্শনও।

ওদের দুজনকে নিভৃত আলাপের সুযোগ দিতেই যে সবাই চলে গেলেন, এটা সুদর্শন ঠিকই বুঝেছিল। কিন্তু সুযোগটা সে কিছু নিয়ে ফেলল বেশীই। আচমকা কাছে টেনে আনল মৌরীকে। এত অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা মৌরীর কাছে যে, প্রথমে কিছু বুঝে উঠতেই পারলো না সে। তারপর সুদর্শন যখন ওকে ছেড়ে দিয়ে ফের গিয়ে কৌচে বসল, তখন হয় ও পাথর হয়ে গেছে, নয় গেছে মরে। নইলে ছাড়া পেয়েও ও অমন স্থির দৃষ্টিতে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

মৌরীর এ দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ছিল না সুদর্শনের। সে ভেবেছিল, ছাড়া পাওয়া মাত্র ছুটে পালাবে মৌরী লজ্জায়। এমন স্থির দৃষ্টিতে যে ওরই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, বা কোন মেয়ে তা থাকতে পারে—এ পর্য্যন্ত সুদর্শনের জীবনে সে অভিজ্ঞতা হয়নি। অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ালো উল্টো অর্থাৎ ওরই ছুটে পালাবার মতো। একেবারে এতটুকু হয়ে গেল সে। হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে সময় চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো মঞ্জু। —'এ'কি। হাত জোড় হয়ে কি প্রার্থনা করছেন!' সুদর্শনের হাতে চা দিয়ে মৌরীর দিকে তাকাতে গিয়ে মঞ্জু দেখল, এরই ভেতর কখন যেন সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

ধীর পায় একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলার চিলেকোঠায় উঠে এসে ইজিচেয়ারটার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মৌরী। স্তব্ধ হয়ে রইল ওর শরীরের সমস্ত রক্তকণিকা। অন্য কোথাও এ অবস্থায় ওরা শরীরময় মাতাল-নৃত্য জুড়ে দেয়। কিন্তু যে শরীরে বাস করে, তাকে ওরা ভালো করেই চেনে। সেখানে মাতলামী করবে তেমন সাহস ওরা রাখে না।

কিন্তু সত্যি কি এতটা বিচলিত হবার মতো কারণ কিছু ঘটেছে?

কারণটা বাইরে খুঁজলে মিলবে না। অন্বেষণটা চালাতে হবে ভেতরের দিকে। মাটির সামান্য কম্পনেও বিশ্ব-সংসার কেঁপে ওঠে, কারণ নাড়াটা দেয় সে বিশ্বের মূল ভিত ধরে। সুদর্শনও নাড়াটা দিয়ে ফেলেছে মৌরীর চারিত্রিক কাঠামোর মূল ভিতে। একটা অতি উঁচু সুরে বাঁধা মন মৌরীর—প্রায় ক্ল্যাসিক মানের। সঙ্গীত জগতের মতোই এমন মনেরও সমঝদার মেলা ভার। ওর সঙ্গে কারু বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। আর গড়ে উঠলেও ভাঙ্গতে সময় লাগে না। বয়সধর্মে ওদের কথা ওদের মতি যেদিকে গতি নেয়, মৌরী মুখ ফেরায় সে দিক থেকে। নতুন বিয়ে হয়ে আসা বান্ধবীদের নিয়ে কৌতূহলে কেউ মাত্রা ছাড়ালে মুখের প্রতিটি রেখায় প্রকাশ করে বসে, এমন বিরাগ যা আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করে। মনে মনে অপমানিত বোধ করে ওরা। বন্ধ হয়ে যায় বন্ধুদের মনের দরজা। এই একটি দরজাই ওদের মনের আছে। সেটা বন্ধ হলে আর কোন পথ পায় না মৌরী ভেতরে ঢোকবার। মন খারাপ করে এসে ঘরে বসে। শুনতে পায় বন্ধুরা মন্তব্য করছে, অতি আনরোম্যাণ্টিক মেয়ে তো। শুনে হাসি পায় মৌরীর। একটি রোম্যাণ্টিক মন পাওয়া জগতে যত দুর্লভ তার ভেতর একটিও বোধ হয় ওদের নেই। তাই অপপ্রয়োগে এমন নিঃসঙ্কোচ।

এমন মেয়ের মন পাওয়া কঠিন— সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বাড়ীর সবাই। তাই আগে থেকেই ওর মনটা তৈরী করে রাখায় কাজে লেগে গিয়েছিলেন তাঁরা। পাত্রের বিদ্যা -বুদ্ধি। ব্যক্তিত্ব ঐশ্বর্য্যের বাণ এমন নিপুণতার সঙ্গে এক একটি করে নিক্ষেপ করে চলেছিলেন, যেন মৌরী মুখ ফেরাবার পথ না পায়। যখন ওপক্ষ থেকে পছন্দ হবার খবর এলো, তখন সবাই মিলে এমন কাণ্ড জুড়ে দিলেন, যেন অপ্রত্যাশিত নয়, অকল্পনীয় কিছু ঘটতে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখতে যা সাহস ছিল না তা চলছে সত্য হতে।

ভয়ে ভয়ে এসে বোনকে জিজ্ঞাসা করেছিল মৌরী—'কি করি বলত?'

নিজের দুচোখ বন্ধ করে দেখিয়ে দিল মঞ্জু—'একেবারে এমনি করে দুচোখ সেঁটে বন্ধ করে বসে থাক।'

—'চোখ বন্ধ করে বসে থাকব?'

—'হ্যাঁ। আর খুলবি সেই শুভদৃষ্টির সময়ে। এর আগে নয়। সাহিত্যেরথী মহারথীদের মানসপুত্রদের জন্য বসে বসে মালা গাঁথছিস— মিলবে? তোর দ্বারা আপন স্বামী নির্বাচন জীবনেও হবে না। তোকে বিয়ে করতে হলে যাঁদের নির্বাচন করতে হবে, তাঁরা যখন অমন চাঁদ পাওয়া ভাব করছেন, তখন তুই চোখ বুজে বসে থাক।'

তাই থাকবে ঠিক করছিল মৌরী। ছিলও তাই। সুদর্শন না এলে ও চোখ খুলত সত্যি শুভদৃষ্টির সময়েই। তাই যখন বৌদি এসে বললেন সুদর্শন এসেছে, তখন ওর বুকটা যে এমন ঢিপ ঢিপ শুরু করেছিল তার কারণটাও এই—যদি ভালো না লাগে। যদি মন বেঁকে বসে। কি দেখে বেঁকবে, কেন বেঁকবে, সবার কাছে যা তুচ্ছ মনে হবে বা কিছুই মনে হবে না তেমনি কারণে ওর মন কেন এমন বিমুখ হয়ে উঠবে, যে শত চেষ্টা করেও আর মুখ ফেরাতে পারবে না। নিজেও বলার মতো কোন কারণ হয়ত বের করে উঠতে পারবে না। কিন্তু— তা হলে কি হলো। যা হবার তা হয়ে গেছে। সুদর্শনকে ওর ভালো লাগেনি। ওর সূক্ষ্ম রুচিবোধে বা সূক্ষ্ম মাত্রাবোধে হয়ত সে এর ভেতর বহু বার আঘাত করে ফেলেছে। কিন্তু আলাপে পরিচয়ে যখন ভালো লাগল সুদর্শনকে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মৌরী। রূপে সে কন্দর্প নয়। কিন্তু তার চেহারায় যা আছে তা রূপের চাইতেও মূল্যবান। একটা স্থির আত্মবিশ্বাস। এমন চেহারার ডাক্তার দরজায় এসে দাঁড়ালেই রোগী মনের বল ফিরে পায়। ডাক্তারের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন রোগীর মুখে গিয়ে পড়ে, তার বিশ্বাসও বাড়িয়ে তোলে। মৌরী দেখল, কথা বলতে সুদর্শন জানে কিন্তু তবু সে সংযত বাক। এই বাক সংযম তার প্রকৃতিগত না অভ্যাসকে স্বভাবে দাঁড় করিয়েছে আপন ব্যবসার অঙ্গ হিসাবে, ও অবশ্যি তা বুঝে উঠতে পারেনি—তা যাই হোক, একটা মানুষকে ভালো লাগার পক্ষে এটা ওর কাছে একটা ভাল গুণ। তাই অসাধ্য সাধন হয়ে গিয়েছিল। মৌরীর ভালো লেগে গিয়েছিল সুদর্শনকে। যত বার ওর দিকে তাকিয়ে সুদর্শন কথা বলেছে বা হেসেছে এমন একটা অপরিচিত অনুভূতির স্রোত ওর শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে যে, মৌরী বিস্মিত না হয়ে পারেনি। কিন্তু সব কিছুর উপর নিজ হাতে যেন ছুরি চালিয়ে দিল সুদর্শন। পরিণতি লাভের জন্য যে সম্পর্ক যতটুকু সময় চায়, যে ঘটনার জন্য যতটুকু প্রস্তুতি-কাল প্রয়োজন, সেটুকু দিতে অবসর না মানা—এ অশ্লীলতা।

দিনটা অসহ্য গরম। পরিমাপ যন্ত্রের পারদ ক'দিন ধরেই গিয়ে ঠেকেছে আট নয় ছাড়িয়ে। সন্ধ্যার দিকে যন্ত্রের পারদ নেমে এলেও গরমটা ধরে রাখে ইট, কাট, দেওয়াল। অন্য দিন বাতাস থাকে, আজ তাও নেই। একেবারে দমবন্ধ ভাব। দমবন্ধ হয়ে আসছিল মৌরীরও। যদিও কিছুক্ষণ আগে এর উল্টো মনোভাবটিই কাজ করছিল ওর মনে—কিন্তু এখন মনে হ'তে লাগল কোথাও কিছু ভালো লাগার মত নেই। আকাশটা অতি বেশী নীল। তারাগুলো অতি বেশী জ্বলজ্বলে। চাঁদটা যেমন কাছে, তেমনি বিশ্রী রকমের বড়। রং ব্যবহারে সংযম নেই কোথাও। অতি কাঁচা শিল্পীর হাতের কাজ।

গলির ওপরের আমগাছটা তার গুঁড়িটি মাত্র গলিতে রেখে সমস্ত শরীরটা নিয়ে এসে ঝুঁকে পড়েছে ওদের ছাদে। মঞ্জু বলে— 'ও 'কারু নয়' হয়ে থাকতে চায় না। সেই গাছটা এখন ঝেঁপে উঠেছে বৈশাখী আমে। রং ধরা শুরু হ'লো বলে। সোজা হয়ে বসল মৌরী। আচ্ছা গাছগুলো যদি হঠাৎ হঠাৎ ভুঁইফোঁড় হয়ে বেরিয়ে এসে এক একমাথা পাকাফল নিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়া'ত? প্রকৃতি সুজলা, সুফলা হ'তেন ঠিকই কিন্তু তার শিল্পী নাম ঘুচত। পাতা খোলা, পাপড়ি মেলা, ফুল ফোটা, ফুলের ফল হয়ে ওঠা, তার কাঁচা বর্ণে রং ধরা—এর একটা স্তরও সে জোর ক'রে এগুতে চায় না, এমন সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি তার। ভালোবাসারও এমনি একটা ধাপে ধাপে পরিণতি আছে— সেও সময় চায় পাতা খোলার, পাপড়ি মেলার। শিল্পিমনের অনুভূতিকাল ওতো সেটাই। শুধু ফলে লক্ষ্য তো লোভীর! কিন্তু তার জন্যও তো সময় দিতে হয়। উপভোগ করতে না জানলেও অপেক্ষা করতে জানতে হয়। মৌরীর মনে হয়, অনেকটা রম্য পথ সুদর্শন ওকে হেঁচড়ে নিয়ে এল। পথ, সব কিছুতেই এই পথটাই তো সবচেয়ে মূল্যবান। পথের সাধনায় এক টুক্‌রো নুড়ি ওঠে ভগবান হয়ে। নইলে ঘরে বসে যে পাথরের টুক্‌রোটাকে মানুষ নুড়ি ব'লে ফেলে দেয়; চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে, মরুপ্রান্তরের আগুনে ঢালা পথে পা ফেলে, হিমালয়ের বরফ ঠেলে—অনাহারে অর্দ্ধাহারে কত দুঃখের পথ অতিক্রম ক'রে— সে নুড়িকেই বুকে চেপে ধরে, মানুষ ভগবান বলে। পথের সাধনায় আপন অন্তরটাই হয়ে ওঠে তখন তাদের পবিত্রবেদী। চোখ বুজলে সেখানেই তারা ভগবানকে দেখতে পায়। কি ভগবানের ক্ষেত্রে কি ভালোবাসার ক্ষেত্রে, এ প্রস্তুতিটাই কি পুণ্য নয়? এই প্রস্তুতিটাই কি প্রেম নয়?

শুধু এই নয়, এই ঘটনার ভেতর দিয়ে মৌরী যেন সুদর্শনের চরিত্রের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখে নিল। একটি মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে তার ঠোঁট স্পর্শ করবার কাঁচা অবস্থা সে পার হয়ে এসেছে। অভ্যস্ত—এতে অতি অভ্যস্ত সুদর্শন। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল মৌরী। তারাভরা আকাশটাকে যদি টেনে নামানো সম্ভব হ'তো তবে বুঝি সেটা দিয়েই মুখ ঢাকত মৌরী।

॥ ২ ॥

মঞ্জু উপরে উঠে এসে দিদিকে ও-ভাবে চোখে হাত-ঢাকা দিয়ে বসে থাকতে দেখে একটু পা-টেপা ভাবেই কাছে এগিয়ে এসে মৌরীর চোখের নীচে হাত ছোঁয়াল।

—এ কি হচ্ছে? মৌরী ঠেলে দিল মঞ্জুর হাতটা।

—অন্ধকারে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নি, তাই দেখছিলাম তুই কাঁদছিস কি না।

—কাঁদব কেন? ভুরু ঘোরালো মৌরী।

—কাঁদবি কেন? কারণটা আমি কি করে বলব? কেন যে এক এক সময় ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে, তার কারণ মানুষ নিজেই বুঝে উঠতে পারে না; তা পরে বলবো। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—তোর কি মনে হয়?

—আমার কি মনে হয়? আন্দাজ করতে বলছিস? ঠিক না হলে মাথায় বাড়িটাড়ি মেরে বসবি না তো?

—না।

একটু ভাববার ভঙ্গি করে মঞ্জু। তার পর বলে—নামটা সুদর্শন, ভাবছি নামের প্রভাবটা হয়ত চরিত্রে কিছু আছে। তা মন্দ কি। প্রেমিক মানুষ, ভালো তো।

—প্রেমিকদের মেকির কারবারই চালাতে হয় বেশী। অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল মৌরী।

—দেখ দিদি, বাড়াবাড়ি করিস নে। যার সঙ্গে আজ বাদে কাল বিয়ে—

—হাঁ তার জন্যই। নইলে ভাবনাটা ছিল কি। এই পরিচয় তো শেষ হয়ে যেত আজই।

—বাঁচালি। এখন শেষ হয়ে যায় নি তাহলে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস টানার ভাব করে বসে পড়ে মঞ্জু। মাথাটা চেয়ারে হেলিয়ে তাকায় আকাশের দিকে।

চাঁদটা তখন উঠে এসেছে একেবারে মাথার উপর কিন্তু আলোটা তার আর আগের মত স্পষ্ট নেই। হাওয়ায়-ওড়া পাতলা মেঘ ভেসে ভেসে এসে ঢেকে ফেলেছে তাকে। আর সে তারই এ-ফাঁক ও-ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেষ্টা করছে কেবল তার উজ্জ্বল রূপটা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে। রূপ দেখার তৃষ্ণার চাইতে রূপের নিজেকে দেখাবার তৃষ্ণাটা যে একটুও কম প্রবল নয়, যেন তারই একটা দৃষ্টান্ত চলছে আকাশেও।

চেয়ারে মাথা রেখে মঞ্জুকে ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে মৌরী বলে—হঠাৎ যেন তুই বড্ড ভাবনায় পড়ে গেলি মনে হচ্ছে?

—তোর কি উপায় হবে তাই ভাবছি।

—আমার উপায় ভাবছিল! হেসেই ফেলল মৌরী। আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে মনের চাপা ভাবটাও যেন গেল অনেকটা ওর হালকা হয়ে। তা স্থির করতে পারলি কিছু?

—স্থির করা ব্যাপারটা কোন সময়ই তেমন কিছু কঠিন নয়। বিশেষ করে তোর বেলা তো নয়ই। কঠিন হলো যে স্থির করার নিয়ে পৌঁছোনোর পথ মেলা নিয়ে।

—অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে তার ধারণাটা এমন পরিষ্কার যে, উপায় খুঁজতে একটুও অন্ধকার হাতড়াতে হয়নি। ঠেকে গেছিস সেই উপায়ে গিয়ে উপস্থিত হওয়া নিয়ে। পথটা খুবই দুর্গম বুঝি?

—দুর্গম বলে কোন শব্দ নেই মঞ্জুরীর অভিধানে। পথই নেই। নির্ভয়ে সঙ্গে দেওয়া যায় এমনি পাত্রের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন পথ নেই যে গিয়ে উপস্থিত হবো প্রস্তাবটা নিয়ে।

—কেন তোর আগেই অপর কেউ গিয়ে প্রস্তাবটা করে ফেলেছে? চোখ মিটমিট করল মৌরী।

—না। যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও তাঁর জন্য উপযুক্ত কন্যা বানিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই একটা তুচ্ছ কারণ তৈরী করে অবিবাহিতই রেখে দিয়েছেন।

এই বার সত্যিই কৌতূহল বোধ করে মৌরী।—নামটা বল তো? দেখি প্রস্তাবটা নিজেই গিয়ে করে উঠতে পারি কি না।

—বললাম যে, তার উপায় নেই।

—বেশ, উপায় না থাকে প্রস্তাবটা না হয় নাই-করা গেল। পরিচয়টা জানতে বাধা কি?

পরিচয় কি দেবে মঞ্জু! ও কি কোন বাস্তব লোকের কথা বলছে? মঞ্জু জানে, যোগাযোগ বইখানা দিদির কাছে ধর্মগ্রন্থ বিশেষ, বিপ্রদাস ওর কাছে আদর্শ পুরুষ, কুমু ওর মন খারাপের ওষুধ। মনের তুফান থামাতে কুমু

চোখ বুজে আবৃত্তি করত "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্" মঞ্জু দেখেছে মৌরী মেলে ধরে বসে কুমুকে। বলে, যে শ্রদ্ধা দিয়ে কুমুকে তার সৃষ্টিকর্তা গড়েছেন আমাদের গড়বার সময় আমাদের সৃষ্টিকর্তাও নিশ্চয়ই তার কিছুটাও অন্তত দিয়ে গড়েছেন। আর বিপ্রদাস—মৌরীর কাছে নাকি ও নামটার সঙ্গে তিনটা ছবি জড়ানো। তার প্রথমটা হলো, দীর্ঘদেহ এক বলিষ্ঠ পুরুষ ঘোড়াটাকে নিজ মরজি মত চলতে দিয়ে ক্লান্ত দেহে বসে আছেন। বিষণ্ণ দৃষ্টি তাঁর দিগন্তে মেলা। মন ভারক্রান্ত প্রিয়তম বোনের ভবিষ্যৎ মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তায়। আর তার দ্বিতীয়টা হলো, স্বামীর হাতে বোনের লাঞ্ছনায় স্থির থাকতে না পেরে অসুস্থ শরীর নিয়েও বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। গায়ের সাদা মোটা চাদরটা লুটিয়ে পড়েছে তাঁর মাটিতে। বোনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—'আয় কুমু আমার কাছে আয়।' আর তার তৃতীয় আইটেমের ছবিটা বলতে তো মৌরী দস্তুরমতো অভিভূত হয়েই পড়ে—স্বামীর ঘরে চলে যাচ্ছে কুমু। আর হয়ত দেখা হবে না। আর হয়ত ওকে এখানে আসতে দেবে না। বোনকে তার জীবনের সকল অমিলের সকল বেসুরের পরপারে পৌঁছে দিয়ে আসতে বসলেন, তখনও ভোর হয়নি। তখনও আলো ফোটেনি বোনের হাতে তুলে দিলেন একটি নিজে তুলে নিলেন একটি এসরাজ। বললেন 'আয় দু'জনে মিলে বাজাই।' দিদির চোখে-মুখে তখন একটা আলো খেলছে। যদিও মঞ্জুর কাছে বিপ্রদাসের রূপটা একমাত্র দাদা। এছাড়া আর কোন চেহারায় ও তাঁকে ভাবতে পারে না! কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে কেন জানি তাঁকেই মনে পড়ে গেছে মঞ্জুর দিদির উপযুক্ত পাত্র হিসাবে। মৌরীর পাত্রের পরিচয় জানতে চাওয়ার জবাবে ধীরে ধীরে বলে—কুমুর দাদা।

বিস্ময়ে ভুরু ঘোরাল মৌরী—কুমুর দাদা—সে আবার কে?

—কুমুর দাদা, সে আবার কে? কুমু আর বিপ্রদাসের সঙ্গে তোকে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না কি?

—হা ভগবান! মানুষকে এ ভাবেও নিরাশ করতে হয়? ভেবেছিলাম নাম-ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একেবারে গোলাপ-কুঁড়ির মালা হাতে গিয়ে দাঁড়াব সামনে। তার পরও ফিরিয়ে দিতে পারেন এমন পুরুষই হন তো তাঁরই মন জয় করব, এই হবে আমার সাধনা।

—দুঃখ ত এই। এমন পাত্র থেকেও নেই। বিজ্ঞানী আর ডাক্তার আজ কাল কত পারে আবার যেমন কিছুই পারে না, জীবন দিতে পারে না—লেখকদেরও সেই এক অবস্থা। সৃষ্টি করতে পারে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাই বলছি, মনের বিচরণক্ষেত্র মেঘলোক থেকে মর্তলোকে নাবিয়ে আনুন মহাশয়া। প্রথম প্রথম শক্ত ঠেকবে কিন্তু সেটাই সত্য। কেতাবী জগতে মন যেমনি সচল, দেহ তেমনি অচল। ও-জগতের নায়ক নিয়ে জীবন চলে না।

বৌদি মুখে অপ্রসন্নতা শরীরে রান্নাঘরের পেঁয়াজ-রসুন মাংস-মসল্লার এক সংমিশ্রিত গন্ধ নিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো।— তোমরা ভাই এখানে একটা কলিং-বেল-টেল গোছের কিছু লাগিয়ে নাও বাপু! খবর দিতে নিতে ডাকতে এত বার বার উপর-নীচ করতে আমি পারিনে।

সত্যি, সুদর্শন আসবার পর থেকে আজ বিশ্রাম একটুও মেলেনি অমিতার। হঠাৎ করে ওবেলা কিছুই করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সেটা পুষিয়ে নেওয়া হচ্ছে রাতের আয়োজনে। নিয়ে আসা হয়েছে ছোট পিসিকে। ছোট পিসি নিয়ে এসেছেন তার রান্নার লোকটিকে, যে না কি তিনহাজারী পিসেমশাইয়ের পদস্থ অতিথিদের সদাই সামলাতে অভ্যস্ত। মুরগী-মটন-ডিম-বিস্কিট-পেস্তা-বাদাম-পেশোয়ারী চাল—আরও কত দেশী বিদেশী আয়োজন ঘরময় ছড়ানো। মাঝখানে ছোট পিসি এক শান্তিনিকেতনী মোড়ায় চেপে বসে তদারক করছেন। সাধ্য কি অমিতা সে ঘর থেকে বেরোয়। এটা হয়েছে তো ওটা করো। ওটা হয়েছে তো সেটা করো। বেচারীর অনভ্যস্ত কোমর সত্যি কটকট করছিল। চোখ ফেটে আসছিল জল। মঞ্জু ওকে হাত ধরে টেনে ওর চেয়ারটায় বসিয়ে দিলে। অমিতা বসে কিন্তু মুখে বলে—থাক, আমার আর বসে কাজ নেই। ছোট পিসির থম-ধরা মুখ আরো থম ধরে উঠবে। আর অপরকে বলব কি। তোমার দাদাটিই মানুষ! জুতো মচ্‌মচ্ করে রান্নাঘর থেকে আমায় ডেকে নিয়ে এলেন— আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমরা দু'জন ছাদে, আমি রান্নাঘরে আর সুদর্শন বসবার ঘরে একা। তোমাদের ছাদে থাকার, আমার রান্নাঘরে থাকার আর বাবুর একা থাকার কারণ, আমার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। তুমি এই কিছুক্ষণ আগেই না চা করে নিয়ে এলে? কি করে জানবো আমি, তোমরা কখন ছাদে এসেছ?

—এই না জানাটাকেই দাদা অপরাধ মনে করেছেন। মঞ্জু বলে।

—রান্নাঘর থেকে পা দূরের কথা, মুখটা পর্য্যন্ত বার করে ঠাণ্ডা হতে ফুরসুত দিচ্ছে না। এদিকের খবর জানব কি করে?

—সেটা আবার দাদা জানেন না। তাই সব সময় সব ঘটনা জানবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, ম্যানেজ করতে জানতে হয়। তা জানবে না কেবল 'কি অন্যায়' বলে উঠবে রেগে। এসেছ তো নিশ্চয়ই এক পশলা ঝগড়া করে?

—এসেছিই তো।

—জানি।

—তুমি হলেও করতে।

—পাগল!

—করতে না? মিথ্যে মিথ্যে দোষ ঘাড়ে চাপিয়ে রাগ দেখালে চুপ করে থাকতে?

—আচ্ছা, সে যাক। কিন্তু দাদা যখন বললেন—'সুদর্শন একা কেন' তখন তুমি জবাব দিলে না কেন? 'তার এখন একটু একা থাকা দরকার তাই।'

স্বামীর সম্বন্ধে নালিশ ভুলে গেল অমিতা। কেন, তার একা থাকা দরকার কেন?

মৌরী রাগত ভাবে চোখ টিপল মঞ্জুকে। মঞ্জু তা দেখেও দেখল না।—ঠিক তোমার এই জিজ্ঞাসাটা এই ভাবে দাদাও করতেন। আর তখন তুমি আঁচল ঘুরিয়ে চলে আসতে আসতে বলতে, 'তা নিয়ে তোমার প্রয়োজন নেই।' দাদা তোমার কাণ্ডজ্ঞান অভাবের কথা ভুলে গিয়ে ভাবতেন, 'কি হলো।' আর সে আবার তুমি ভদ্রলোকদের খোঁজে পড়তে বেরিয়ে। এসে দেখতে, সত্যি তার একা থাকার প্রয়োজন আছে কি নেই। থাকে তো চলে গেলে। না থাকে তো বসতে কাছে। বাস হয়ে গেল। কিছু ম্যানেজ করতে জান না, কেবল ঝগড়া আর রাগারাগি, রাগারাগি আর ঝগড়া।

—ও সব মুখেই বলা যায়। ঘাড়ে পড়লে তখন দেখা যাবে। মৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে— হোক না আগে, তার পর বুঝবে বিয়েতে কত মধু।

মৌরী বলে—জোড়ায় জোড়ায় তোমাদের দেখছি, স্বাদটা এটা মিঠা না কষা, বোঝাটা কি নিজের জিভের জন্য তুলে রেখেছি?

মাথা দোলাল মঞ্জু।—এ বাপু তোমাদের পিঁপড়ের মধু খাওয়ার পরিণতি দিয়ে মধুর বাটিটাকে গালাগাল দেওয়া।

বিস্ময়ে চোখ বড় করে মৌরী।—ব্যাপারটা কি রে! ভূতের মুখে রামনামের মত কানে ঠেকছে যে। তুই না কি বিয়েই করবি না? যদি এমন মধু ভরা, তবে বিয়েতে তোর এত বিরাগ কেন?

—বিরাগ? কি বলে! বিয়ে আমি করব না। তার কারণ মধুর পাত্রটা জীবনে আমাদের না হলেও চলে কিন্তু এ নুণপাত্রটি জীবনধারণের পক্ষে কেবল অপরিহার্যই নয়, এটা সব স্বাদের মূল, আর যার অভাবে আজ আমাদের জীবনের সব স্বাদ এমন বিস্বাদের পর্য্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে আমি কেবল সেই নুণপাত্রটির অন্বেষণে—কিন্তু তার দেরী আছে। নীচে যাচ্ছি। তুমি নির্ভয়ে বিশ্রাম কর বৌদি! তোমাদের পরিচালন থেকে পরিবেশন সব ভার আমার। তরতর করে নামতে নামতে একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাদার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া ভাবে মুখোমুখী অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জু। জয়দেব বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত নিজেই ওপরে উঠে আসছিল। সুদর্শনকে একা বসিয়ে রেখে তোরা সবশুদ্ধ অমন ছাদে গিয়ে বসে আছিস কেন?

—আমরা না থাকলেই বুঝি একা হলো?

—আমরা বসে বসে গল্প করলে ভারি ভালো সময় কাটবে তার! একা বসতে কি?

মঞ্জু জানে কথাটা সত্য নয়। এই সন্ধ্যার সময়টা ঘরে বসে থাকতে জয়দেবের বিষম আপত্তি। এটা তার তাস খেলবার সময়। তাসটাই নেশা, তাতে খেলাটা তিন তাসের, এ সময়টা তাকে কোন মতেই আটকে রাখা যায় না বাড়ীতে— গেলে আজ অন্ততঃ সে বাড়ী থাকতই। এতক্ষণে কবে সে চলে যেত। কিন্তু বাড়ীর প্রতি কর্তব্যটাকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে সব সময় চলা যায় না।—অবশ্যি তাতেও আপত্তি ছিল না তার! আপত্তিটা বাড়ীর এবং তা এমন কম জোরালো নয় যে অনায়াসে অবহেলা করা চলে। সুদর্শনকে একা দেখে দু-একবার

ঘরে ঢুকে দু-চারটা কথা বলেছে, বসেছে আবার উঠে এসেছে আবার গেছে। তার পর অমিতাকে উপরে ডেকে তিক্ততা প্রকাশ করেছে—তবু কারু দেখা নেই। এ ভাবে যেতেও পারছিল না বসতেও পারছিল না। এবার সে হাঁটা দিল। কিন্তু ক'পা গিয়েই ঘুরে এসে ডাকল মঞ্জুকে, এই মঞ্জু শোন। মঞ্জু এলে নীচু গলায় বলল—কুড়িটা টাকা দেমা। কালকেই দিয়ে দেবো। ঐ যে সেদিন দিয়েছিলি ঠিক কথা মতো আজ সকালে তোকে দিয়ে দিয়েছি না?

হাসল মঞ্জু। তা দিচ্ছি। কিন্তু সকালে নিয়ে সন্ধ্যায় আবার কি ঠিকমত দিয়ে দেওয়া বলে? টাকা এনে দিল মঞ্জু। আজ রাত করো না দাদা।

—না না। আজ তাড়াতাড়িই আসব। জয়দেব হাঁটা দিল। মঞ্জু এসে অতি সাবধানে এবার উঁকি দিল বসবার ঘরে। তখন সুদর্শন চোখের দু'কোণায় ভাঁজ ফেলে বসে সিগারেট টানছে। কপালের ভাঁজ চিন্তা করছে বলে, না হাতের সিগারেটের ধোঁয়ার জন্য বুঝল না মঞ্জু। ঢুকবে—একটু ভাবল ও। না তবে এক বার রান্নাঘরটা হয়ে আসতে হয়। বৌদিকে নির্ভাবনায় বসে থাকতে বলে এসেছে যে।

ঘরখানা যা সেজেছে পুঁই ডাঁটার চচ্চড়ি আর ইলশে-বেগুন ঝোল রাঁধার ঘর তো নয়, যেন এটা বড় হোটেলের বাবুর্চিখানা। ছোট চাকর কানাইলাল ধবধবে পাজামা আর হাউই সার্ট পরে এমন ভাবে হাত চালিয়ে যাচ্ছে যে, এমনি রান্নাঘরে এমন আয়োজনে অভ্যস্ত নয়। শুধু মনিবের খাতিরে কোন মতে কাজটা উতরে দিয়ে যাচ্ছে! ওদের রামু তার হাতে থালা প্লেট এগিয়ে দিচ্ছে না তো সবিনয়ে বড় সাহেবের হাতে ফাইল পত্র তুলে দিচ্ছে। হেসে উঠল মঞ্জু। সবাই মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। ছোট পিসি কোলের উপর প্লেট নিয়ে পেস্তা-বাদাম বাছছিলেন। চোখের রিমলেস চশমাটা নাকের উপর ঠিক করে বসিয়ে মঞ্জুর দিকে চাইলেন। মুখে অসন্তুষ্টি—তোমরা দুজনে নাকি ছাদে গিয়ে বসে আছ?

—অতিথির সামনে বসে কেবল কথা বললেই কি আপ্যায়ন বেশী ভালো করা হয়? একা থাকতে দিতে হয় তাকেও। এবার যাবো।

পেস্তাবাদামের খোসা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো ছোট পিসি।—ছেলে যে এমন এককথায় থাকল—আমার আশ্চর্যই লাগছে। তোমরা জান না আমি তো জানি, কত বড়ঘরের ছেলে আর কি ভাবে থেকে অভ্যস্ত সে। যদিও পিসিমার দিকে তাকিয়েই ছোট পিসি কথাগুলো বললেন তবু মঞ্জুর বুঝতে কষ্ট হলো না উদ্দেশ্যটা সেই। ছোটপিসির ধারণা ওরা দু'বোনে পাত্র অনুযায়ী যতটা খাতির যতটা সমীহ দেখানো উচিত তা দেখাচ্ছে না। ওদের ব্যবহারটা হচ্ছে সাধারণ।—ওঁদের লক্ষ্ণৌয়ের বাড়ীর যে এলাহি কাণ্ডকারখানার কথা শুনেছি ওঁর মুখে—ছিলেন তো গিয়ে কয় দিন। শুধু ওর জন্যই এ—থেমে গেলেন ছোট পিসি। বোধ হয় তারও বাজল। কারণ বহুবার বহু প্রকারে তিনি বুঝিয়েছেন সম্বন্ধ শুধু মাত্র তাদের জন্য।

হাঁ জানে মঞ্জুরা এ সম্বন্ধ পিসেমশাইয়ের খাতিরে। পিসেমশাই আর পাত্রের ব্যবসায়ী বাবার সঙ্গে কোথা দিয়ে যেন একটা স্বার্থের জট পাকিয়ে গেছে আর তারই ফল এটা। এ সম্বন্ধ হবার পর ছোট পিসির বুক চিরে একাধিক বার দীর্ঘশ্বাস পড়ে একটি মেয়ের জন্য। তবু একথা সত্য, এ বিয়ে তারই জন্য। মঞ্জু পিসিমার এই সাময়িক থেমে যাওয়ার ফাঁকে রওনা হলো।—আমি যাচ্ছি বসবার ঘরে। কিছু করবার হলে ডেকো। বৌদিকে আমি সুদর্শন বাবুর শোবার ঘরটা যে ঘরে হবে সেটা ঠিক করতে দিয়ে এসেছি।

ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিল মঞ্জু। বাড়ী থেকে ডানলোপী তোষক বালিশ আনতে গাড়ী পাঠাতে হবে তো। বাসুদেব উঠে দাঁড়ালো।—আমি যাচ্ছি। তার উৎসাহের কারণ ভালো মিষ্টির খোঁজ, সে গাড়ীটা নিয়ে ঘুরতে পারবে। সমস্ত দিন আজ সে এই করছে। তার ধারণা, এ বিষয়ে তার জুড়ি নেই। সবিদ্যাটা শেখাতে বললে বলে, এও মস্ত আর্ট। আর্ট যেমন বলে শেখানো যায় না—এত তেমনি। প্রতিভা থাকা চাই।

মঞ্জু এলো বসবার ঘরে। সুদর্শন ঠিক তেমনি ভাবে বসে সিগারেট টানছে। সামনের এসট্রেটা ছাই আর আদ্দেক-খাওয়া সিগারেটে ঠেসে গেছে। মঞ্জুকে দেখে সিগারেটের ছাইটা আঙ্গুলের টোকায় ঝাড়তে ঝাড়তে বললো—আসুন।

বসল মঞ্জু। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। একটু অপেক্ষা করল। তার পর জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—মেঘ করেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে বেশ, কোথাও বোধ হয় বৃষ্টি হচ্ছে।

সুদর্শন তাকিয়ে রইল ওর দিকে। কিন্তু কথা বলল না কিছু।

মনে মনে মাথা নাড়ল মঞ্জু। তখন মৌরীর কাছে অপ্রস্তুত ভাবে হঠাৎ ক্ষমা চেয়ে ফেলতে গেলেও ব্যক্তিটি অমন সহজে হাত-জোড় করার নয়।

॥ ৩ ॥

মৌরীর কাছে ওরকম হাতজোড় অবস্থায় মঞ্জু ওকে দেখে ফেললো বলে ততটা নয়, যতটা মৌরী ওভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলো বলে — প্রথমটায় কেমন যেন বোকাই বনে গিয়েছিল সুদর্শন। তবু সহজ ভাবটা বজায় রাখতে চেষ্টা করছিল সে। মুখে হাসি রেখেই চায়ের কাপটা নিয়েছিল হাত বাড়িয়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে ভালোলাগার প্রশংসাসূচক শব্দ করেছিল 'বাঃ'! দাঁড়িয়ে-থাকা মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

এই ঘটনার পর যে পথটা খোলা ছিল সুদর্শনের কাছে, সেটা এই—এই সহজ ভাবটাই বজায় রাখা বা সম্ভব হলে এটার মাত্রাটা আরো একটু বাড়িয়ে দেওয়া। প্রথম ধাক্কায় করেছিলও সে সেটাই। কিন্তু মঞ্জুর মনে হলো, সুদর্শনের চরিত্রটাই রোল-করা কাগজের মতো; ঝোঁকটাই গোটানোর দিকে। মেলে ধরলেও সময় নেয় না গুটিয়ে যেতে।

অনুপায় মঞ্জু জানালার দিকে তাকিয়ে বসে রইলো মুখে এমন একটা হাসির ভাঁজ ফেলে যেন, কোন মজার দৃশ্য ওর দৃষ্টিটাকে বাইরের দিকে আটকে রেখেছে। সুদর্শনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করাটা শুধু ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর অপেক্ষা।

অবশ্যি মঞ্জু যে একেবারেই কিছু না দেখছিল বা না শুনছিল তা-ও নয়। রান্নার মিষ্টি গন্ধ গলিপথ পার হয়ে গিয়ে কৌতূহল জাগিয়ে তুলছিল প্রতিবেশীর। ওদের বাড়ীতে আজ কি ব্যাপার? ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে, নানা রান্নার গন্ধ আসছে। মৌরীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে? ছেলে এসেছে। কি করে ছেলে? মস্ত ডাক্তার। এখনই 'মস্ত' হলো কী করে? ডাক্তার আর উকিল চুলে পাক না ধরতে মস্ত হয় কখনো? তা ডাক্তারীতে মস্ত না হলেও অবস্থায় এখনই মস্ত বিরাট ধনী? এ্যাঁ! তবে বুঝি ভালো? জিভটা সামলে ফেলতে হয় যার। তবে বুঝি আলাপ পরিচয়ের বিয়ে? নয়! ওর পিসেমশাই এর বন্ধুর ছেলে। এবার অনূঢ়া কন্যার দিকে তাকিয়ে মা কি ভাববেন কে জানে! হয়তো এমনি একটি আত্মীয়ের খোঁজ করবেন মনে মনে। হয়তো একটি নিঃশ্বাসও চাপাতে হবে। আছে, আছে কি আর না। কিন্তু কোন উপকার করবে তারা—সে আশায় বালি। হয়তো জানতে চাইবেন মা ছেলের বয়স। প্রায় সব জানার পর এবার 'এতো কে জানের' বিরক্তি প্রকাশ করবে মেয়ে। মৌরীর সৌভাগ্য সম্বন্ধে ধারণাটা অসমাপ্ত থেকে যাবে মা'র ছেলের বয়সটা না জানতে পেরে।

বাড়ীটা কি এতো কাছে? কথা কি তারা চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে বলছিল? না। স্বভাবগুলো মঞ্জুর ভীষণ চেনা।

স্যাণ্ডেলের শব্দ তুলে লম্বা বারান্দা পার হয়ে নীচে নেমে গেল বাসুদেব। আওয়াজ পাওয়া গেল ছোটপিসির গাড়ী বেরিয়ে যাওয়ার। ভারি সুবিধে হয়ে গেছে ছোড়দা'টার। ছোটপিসি না বললে তার গাড়ী চাইবার সাহস কখনই তো তার হতো না কিন্তু এর সন্দেশ, তার দৈ, ওর রসকদমের জন্য ছুটোছুটি তাকে তো করতেই হতো! মঞ্জুর দৃষ্টিটাকে বাসুদেব স্যাণ্ডেলের শব্দ বাইরে থেকে টেনে এনেছিল বারান্দায়—এবার সেটাকে ঘরে এনে সুদর্শনের দিকে তাকালো সে।

নীরবে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে সুদর্শন হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে চোখ রেখে।

নাঃ! তার মুখে, ঠোঁটে তার দুই চোখের কোঁচকানো দৃষ্টিতে যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে, লজ্জা বা অপরাধীর মনোভাব বলে তার অর্থ কিছুতেই করা যায় না। উলটে আরো মনে হচ্ছে, একটা অস্বীকারের চেহারা না দেখানো পর্য্যন্ত তার আহত আত্মমর্য্যাদা যেন কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না। মঞ্জু বুঝলো, কেউ কম যাবে না। যুদ্ধটা দু'পক্ষে করা হবে। হঠাৎ কেমন যেন একটা আনন্দ আর আত্মীয়তা বোধ করলো মঞ্জু সুদর্শনের প্রতি। মুখের উপর এসে-পড়া অগোছালো চুলগুলো হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বললো—কথা খুঁজে পাচ্ছিনে। কিছু বলুন।

অতি মনোযোগের সঙ্গে হাতের অর্দ্ধেক শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা য়্যাস্‌ট্রের ভেতর ঠেসে ঠেসে নেবাতে লাগলো সুদর্শন।—আমিও পাচ্ছিনে।

—তবে?

নেবানো সিগারেটটা য়্যাস্‌ট্রের ভেতর ফেলে এবার সোজা হয়ে বসলো সুদর্শন।—শুনি, মেয়েদের নাকি কখনোও কথার অভাব হয় না।

—হ্যাঁ, এবার অনেক কথা বলার মতো একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন বটে! বলতে পারি, বেচারী মেয়েরা কি করবে বলুন। চোখ রাঙ্গানো নেই, ভয় দেখানো নেই, হিসাব চাওয়া নেই—কলঙ্ক দেওয়া নেই—অবাধ

স্বাধীনতা ভোগ করছে তারা কেবল এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে। আয়ত্তেও এসে গেছে এ বিদ্যাটাই আরো বলতে পারি, বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, শক্তি অপক্ষয়ের এমন একটা পথ খুলে রেখেছিলেন বলেই ; নইলে এতো দিনে যে আত্মশক্তি তারা সঞ্চয় করতো—কিন্তু না। এসব কথার উত্তর প্রত্যুত্তরের জন্য একটা জোরালো প্রতিপক্ষ থাকা চাই। ও ছোড়দা না হলে আমার জমে না। বিষয়-বস্তু ভেদে মানুষভেদ আছে তো—আছে না? তার চাইতে বলুন এ সময়টা আপনি সাধারণত কি ভাবে কাটান বা কি ভাবে কাটলে আপনার ভালো লাগবে বলে মনে হয়? আমরা দেখি, আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যে তা সম্ভব কি না।

—এ সময়টা মানে সন্ধ্যের সময়টা?

—হ্যাঁ।

—আমার সন্ধ্যার আনন্দের আয়োজন?

—সন্ধ্যার আনন্দ বলে কোন চিহ্নিত আনন্দ আছে না কি?

—বিষয়-বস্তু ভেদে মানুষভেদের মতো সময়ভেদে চিহ্নিত আনন্দও আছে বৈ কি।

ঘাম দেখা দিতে চাইলেও ঘামবার মেয়ে মঞ্জু নয়। বললো—বেশ তাই।

একটু সময় তাকিয়ে রইলো সুদর্শন মঞ্জুর দিকে। তারপর বললো—মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে।

—বিষয়?

বাজার-দর নয়।

—ও তো আপনি জানেনই না! কিন্তু মেয়েদের দর?

—বাজার-দরের মতো মেয়েদেরও কোন বাঁধা দর আছে, আমার জানা নাই।

বাঃ, তা থাকবে না কেন? দর অর্থে তো টাকা-পয়সার দরই বোঝায় না কেবল। মর্য্যাদাটাও দর। আর বেশীর দিকে না হোক, কমপক্ষের দিকে একটা মাত্রাও নিশ্চয়ই তার আছে—কিন্তু তা যখন আপনার জানা নেই, তখন যে যেমন আদায় করতে পারে—তাই না? আদায় করতে না জানলে তবে তো ঠকতে হবে দেখছি।

পাখার হাওয়া থেকে আড়াল করে আর একটা সিগারেট ধরালো সুদর্শন—জীবনভর মানুষ শিখতে শিখতে চলে। আমি না হয় এ বিদ্যেটা এখানেই শিখবো।

—যে শিক্ষাটা সব প্রথমে হওয়া উচিত, সেটা যে কেন শেষ জীবন পর্য্যন্তও ছেলেদের হয় না, বুঝিনে—বলেই হেসে ফেললো মঞ্জু। বললো—না এ ঠিক হচ্ছে না। এক সন্ধ্যার অতিথি আপনি। যদিও আক্রমণটা আপনার দিক থেকেই আসছে, তবুও হার স্বীকার করা উচিত আমারই। বলেছি তো, আজ এ বাড়ীতে আপনার জন্য অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। দেখবেন আরো, অসম্ভব কিছু বললেই তা সম্ভব করে সবাই অসম্ভব খুশী হয়ে উঠবে। বলুন, কি ভালো লাগবে আপনার?

আকাশে যে আয়োজনটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছিল সেটা যেন শেষ হলো এতক্ষণে। ছাড়লো জোর ঠাণ্ডা বাতাস। উড়তে লাগলো জানালা-দরজার পরদা। রজনীগন্ধার থোকা থেকে ঝরে পড়লো মেঝেতে কিছু ভেজা ফুল। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে নরম মিষ্টি গন্ধে ছোট্ট ঘরটা উঠলো ভরে। সময় হলো এখন জোরালো বাতিটা নিবিয়ে সবুজ বাতিটা জ্বালিয়ে দেবার। কিন্তু তারপর ওর নিজের পক্ষে এখানে বসে থাকাটা যে হবে সাদা বাতিটার চাইতেও বেমানান! ডেকে আনবে না কি মৌরীকে?

ছুটে এসে রেডিওর চাবি ঘোরালো অমিতা। কি সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। রেডিওটা খোলোনি কেন?

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,
বেলা হলো মরি লাজে—

মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে অমিতা খুশীতে হাসলো।

পরদার নীচ দিয়ে দেখা গেল আলো পড়ে চকচকিয়ে ওঠা চলমান দুটো পা আর শান্তিপুরী ধুতীর গিলে করা কালো জরিপাড়। 'বার' থেকে ফিরলেন যতীন বাবু। প্রতিদিন আরো রাত হয়। আজ শুধু স্বাস্থ্য-রক্ষা করে এলেন। নইলে রাতে না হবে ক্ষিদে না হবে ঘুম। সুদর্শন চোখ তুলে বারান্দার দিকে তাকালো। মঞ্জু বলল—বাবা।

—ও!

কিন্তু যতীন বাবু এসে ঢুকলেন এ ঘরেই। চোখ দু'টো তার ঈষৎ লাল। মাথার চুল কিছুটা উসকো। কারণ ঝড়ো বাতাসটা তিনি পথেই পেয়েছিলেন।

হাতের সিগারেটটা য়্যাসট্রের ভেতর ফেলে উঠে দাঁড়ালো সুদর্শন। তাকে বসতে বলে নিজেও আসন গ্রহণ করলেন যতীন বাবু; আর মঞ্জু বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ছাদে মৌরীর কাছে।

তখন বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে। মৌরী ওর ইজিচেয়ারটা চিলেকোঠার ভেতর টেনে এনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে বৃষ্টি মুচছে শরীর থেকে।

—শ্রীমতী এবার বুঝি চিলেকোঠায় বসে প্রকৃতির বৃষ্টিভেজা রূপ দেখবেন?

—আজ্ঞে হাঁ। তা আপনি কি করতে বলেন শ্রীমতীকে?

—খামকা ভালমানষি দেখাস নে দিদি! যেন আমি বললেই তুই আমার কথা রাখবি? আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—মান-অপমান বোধটা কেবল তোরই আছে না আমারও থাকতে পারে?

—হয়েছে কি?

—এই ভদ্রলোকটি যে আজ এখানে রয়ে গেলেন, তা কি আমার জন্য?

—নিশ্চয়ই নয়।

—সন্ধ্যে থেকে ছাই আর আদ্দেক-খাওয়া সিগারেট দিয়ে ছাইদান ভরাট করতে করতে যে কথা এবং যার কথা উনি ভাবছেন, তার ভেতর কি আমি আছি?

—একেবারেই না।

—এ অবস্থায় আমার এঁকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করার কোন মানে হয় না, তাতে আমার মান থাকছে?

—একেবারেই না।

—এখন আমার কি করা উচিত?

—তাকে বসে বসে ভাবতে দিয়ে, উচিত নিজের কাজে চলে যাওয়া।

এবার হেসে গড়িয়ে পড়লো মঞ্জু।—এই দিদি, এরই ভেতর কি ভীষণ আপন ভাবতে শুরু করে দিয়েছিস তুই সুদর্শন বাবুকে?

বুঝে পেলো না মৌরী ওর কথার কি করে এ মানে হয়। বললো—এই মানে হয় আমার কথার?

—একমাত্র এই মানেটাই হয়।

চটে গেল মৌরী। বেশ হয়তো হয়। বিয়ে ভেঙ্গে ফেলা যখন যাচ্ছে না তখন আপন ভাবতে তো হবেই একদিন।

—তা তো হবেই। কিন্তু একদিন নয়, সেটা এখনই শুরু হয়ে গেছে—মা গো! হাসি থামিয়ে দম নিল মঞ্জু। চোখের জল মুছল আঁচল দিয়ে। তারপর বললো—তবে আর কেন ভদ্রলোকটিকে সবার কাছে অপদস্থ করছিস? এ তোর ঠিক হচ্ছে না। হচ্ছে কি? সবার মনে প্রশ্ন জাগছে না, সমস্ত দিন মেয়ে আমাদের অমন কথা বললো, কাছে রইলো। বিয়ের আগের আহ্লাদে বোকা-বোকা ভাবটা কেমন সুন্দর মুখের ওপর এসে যাচ্ছিল—হঠাৎ কি হলো! ছাদে গিয়ে মেয়ে অমন বসে রয়েছে কেন মুখ ঢেকে? তিনি যা করেছিলেন সবার চোখ বাঁচিয়েই তো করেছিলেন। জবাব দেবার যা তা তুইও সবার চোখ বাঁচিয়ে দে।

ভুরু দুটো কুঁচকে ছোট করে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রইলো মৌরী। মঞ্জু বললো—বল না?

—সব তো তুই বলছিস। শেষটুকুও তুই-ই বল।

—আমি তোকে বলছি, সহজ ভাবে এসে নীচে বসতে এবং কথা বলতে। রাজী?

একটু ভাবলো মৌরী। বেশ আসছি। তুই যা।

—আসবি?

—আসবো।

—ঠিক?

—হাঁ—হাঁ ঠিক।

নীচে নেমে এলো মঞ্জু। বাবা বসবার ঘরেই আছেন। কথা বলছেন সুদর্শনের সঙ্গে। কিছুক্ষণের জন্য সুদর্শনকে নিয়ে আর না ভাবলেও চলবে। নিজেদের ঘরে চলে এলো মঞ্জু। হাত দিয়ে পরখ করে দেখলো শাড়ীটা—না তেমন ভেজেনি। এক্ষুণি এটুকু শুকিয়ে যাবে বাতাসে। বাতি না জেলে অন্ধকারের ভেতরই চেয়ারটা টেনে এনে বসল মঞ্জু জানালার কাছে। এটুকুই বাকী ছিল। সমস্ত দিন কথা বলতে পারে ও; বলেও তাই। কিন্তু দিনের

ভেতর কিছুটা সময় ওর চাই—অন্তত যা না হলে দিনটায় খুঁত থেকে গেল বলে মনে হয় ওর, তা হলো চুপচাপ বসে কাটাবার মতো কিছুটা নির্জন অবসর। ভাবনার জগৎটাও বড় বিচিত্র ওর। তার চেহারাটা যেন পাঁচ বছরের শিশুর ঘাড়ে একটা ষাট বছরের বৃদ্ধের মাথা। মঞ্জু জানে, প্রকাশ্যে বার করলে ওর সঙ্গে মিলিয়ে ওর চিন্তা-জগতের এই রূপটা মানুষের কাছে বামন আকৃতির ঠেকবে এবং বামনকে মজা উপভোগ করার মতোই মুখ করে তারা তা উপভোগ করবে। তাই অপরের কৌতুক বন্ধ করতে সে নিজেই কৌতুক করে তাদের নিয়ে। কিন্তু যখন ও নিজে ভাবতে বসে—তখন সত্যি ভাবে—গভীর ভাবে ভাবতে চেষ্টা করে। বড় বড় বিষয়বস্তু তার। যে সব বিষয়বস্তুর শেষে একটা করে নীতি-শব্দ জোড়া থাকে কিন্তু নীতি যেখান থেকে দিনে দিনে সরে যাচ্ছে সহস্র যোজন দূরে।

ওলট-পালট হাওয়া বৃষ্টিটাকে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে। দূরের নারিকেল গাছটা তেল-জল না জোটা পাগলা ছেলের মতো বাতাসের সঙ্গে সমান তালে মাথা ওলট-পালট করে স্নান করে মনের আনন্দে। রেডিওটায় বেজে চলে সেতার। দু'তিনটা ঘর পার হয়ে আসতে গিয়ে আর বৃষ্টি বাতাসের শব্দে চাপা পড়ে রেডিওর যান্ত্রিক শব্দটা হারিয়ে সে আলাপ এ ঘর থেকে শোনায় যেন, বাদলা প্রকৃতির আপন নিভৃত আলাপের গুঞ্জনের মতো।

রান্না যোগান দেওয়ার কাজ শেষ করে ছোট পিসির অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এসে এবার হাঁপ ছাড়ে অমিতাও। ব্লাউজ বডিজ ভিজে গেছে ঘামে। ভিজে গেছে পেটী-কোটটা কোমর পর্যন্ত। উঠে দাঁড়ানো মাত্র সে ঘাম ফোঁটায় ফোঁটায় নেমে আসছে উচ্চ-কোমর বেয়ে। মুখটা দিয়ে বেরুচ্ছে যেন আগুনের শিষ। গরম মুখটাকে ঠাণ্ডা করলো অমিতা বৃষ্টির দিকে উঁচু করে তুলে ধরে বৃষ্টির ছাটে ভেজিয়ে। তার পর চলল ভিজে শাড়ী পায়ের পাতা থেকে টেনে তুলে ধরে স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে। এবার দরকার তার একটি ভালো স্নানের। শরীর থেকে পেঁয়াজ-রসুন-কাঁচাডিমের যে গন্ধ বেরুচ্ছে—নাক সিঁটকালো অমিতা, এ গন্ধ দূর করতে একটি আস্ত সাবান শেষ হবে। আর শরীর থেকে তাড়ালেই হবে না কি? নাকে লেগে রয়েছে না গন্ধটা? সেন্টও উপুড় করতে হবে ঠিক শিশিখানেক। অমিতা এমনিতেই একটু প্রসাধনপ্রিয়, তাতে পশ্চিমবাংলার মেয়ে ও—প্রসাধনটা ওদের রক্তে। তিনটে বাজতে না বাজতে আলতা-সিঁদুর-কাজল-লতা নিয়ে বসে পড়ে তারা। কালো চিক্কণ করে তোলে চুল সুগন্ধি তেলে। খোঁপা বাঁধে নানা ছাঁদে। কাজল টানে, আলতা পরে, টিপ দেয়। পরে ডুরে-শাড়ী নয়তো নীলাম্বরী। তার পর পান খেয়ে ঠোঁট দুটি রাঙ্গা করে তোলে বৈকালিক প্রসাধন শেষে। অমিতার বাবার চালচলন সাহেবি-ঘেঁষা। তাই তার প্রসাধন সরঞ্জামে আলতা সিঁদুর কাজল-লতা বাদ পড়লো কিন্তু ড্রেসিং টেবিল তার ভরে উঠলো বিলিতি প্রসাধনে। এখনও মা বাক্সভর্তি করে সব কিনে কিনে পাঠান। কিন্তু পূব-বাংলার মেয়ে মৌরী, মঞ্জু। এদের মাথার খোঁপা ঘাড়ে ভাঙ্গে—পিঠে আছাড় খায়। তৈলহীন রুক্ষ চুলের গুচ্ছ আদ্দেকই ওড়ে মুখের উপর। দুপুরের শাড়ী বদল হয়ে ওঠে না সন্ধ্যায়ও। অমিতা বলে—ছেলেরা তোমাদের দিকে ভুলেও তাকাবে না।

মঞ্জু বলে—ভুলেও তাকাবে না? কিন্তু তাকালে ভুলবে তো?

—না মুখ ফেরাবে।

—মুখ ফেরাবে। তবে তো অবহিত হতে হচ্ছে। দাঁড়াও কাল থেকেই উঠে-পড়ে লাগছি আমি। তোমার চুন হলদু—

—চুন হলুদ! চোখ বড় করে অমিতা।

—ঐ যে, দুপুরে স্নানের সময় তুমি মাখ—এই নাম যেন কি—নাম যেন কি—মাথা চুলকোয় মঞ্জু—এই বৌদি, সাহায্য করো না।

—বেসন-হলুদ।

—বেসন-হলুদ—কাল থেকে এ দুটো আমার চাই। ছেলেদের তাকানোটা আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ওদের দিয়ে কিছু করতে হলো—তা বিয়ে, কাজ আর তাকানো যাই হোক চেহারাটা তুমি বলছো মুখ্য? তাই স্বীকার। পিসিমা বলেন, যে ঠাকুর যে ফুলে তুষ্ট।

আর মৌরী? মৌরী মুখ গম্ভীর করে তোলে। এসব কথা তুমি আমার কাছে বলো না বৌদি। আমার দুঃখ হয় মেয়েজাতটার জন্য।

অমিতা বুঝতে পারে না! ছেলেরা রূপ চায় আর তার জন্য মেয়েরা রূপচর্চা করে, এতে দুঃখ হওয়ার, লজ্জা পাওয়ার কি আছে?

—ঠিক তো। মেয়েদের কেন, লজ্জা পাওয়ার থাকে তো আছে ছেলেদেরই, কি বলো?

তাই বা কেন থাকবে! অমিতা মঞ্জুর এ কথাও মানতে রাজী নয়। মঞ্জু হাসে। মৌরীর ঠোঁটের কোণে যে ভাঁজ পড়ে তা সামান্য অতি সামান্য কিন্তু বাঁকা।

যতই গরমিল থাক, সঙ্গ কিছুটা মিলিয়ে আনেই। অমিতার শরীরযত্নে ঢিলে ভাব এসে গিয়েছিল। স্নান শেষ করে ঘরে এসে নিঃশব্দে দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিল অমিতা। দশ মিনিট অন্তত—দশ-পনেরোটা মিনিট শুয়ে পিঠটা টান না করে ও কিছুতেই পারছে না। চটপট হাতে প্রসাধন শেষ করে, শাড়ী পালটে আলতো ভাবে শুয়ে পড়লো সে বিছানায়। আরামে বুজে এলো অমিতার দু'চোখের পাতা, আর সেই বোজা চোখের অন্ধকারে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠলো খানিক আগে দেখা আয়নায় ওরই চেহারাটা। সুন্দরী ও। ওর রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল জয়দেব। সেদিন ওদের বিয়ে দু'পক্ষের অভিভাবকই খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর কারণ বিয়েটা কাকে করছে তা নিয়ে নয়, জয়দেবের বয়সটাই ছিল না বিয়ে করার। একুশ হয়েছিল কি না তার সন্দেহ। আর ওদের তরফের আপত্তির কারণটা ছিল, ওরা বড়লোক। ওর বাবার লক্ষ্য ছিল হয় টাকা—নয়তো যোগ্যতা। কিন্তু এ দুটোর কোনটাই ছিল না জয়দেবের। সে তখন বি. এস-সি পড়ছিল ওর দাদার সঙ্গে। তবু দু'পক্ষের অভিভাবককেই তাদের বিমুখ মুখ ফেরাতে হলো। উদ্যোগ আয়োজন করে বিয়েও দিতে হলো। নতুন অতিথির জন্য মর্যাদার আসন প্রস্তুত করে রাখতেই যে হবে। সে আজ সাত-আট বছর আগের কথা। আজ ওদের দু'টি ছেলে-মেয়ে। থাকে ওরা বাবা-মার কাছেই। ভালোই তো। ছোটদের দৌরাত্ম্য ওর পোষায় না। আর জয়দেবের যা রোজগার। এবার ওর চোখে ভেসে উঠলো সুদর্শনের চেহারা, তার ডিগ্রি. তার টাকা। পুরানো কথা নতুন করে আজ মনে হওয়ার পেছনে কারণটাও অবশ্যি এটাই দৌড়ের আগে পিছু হটার মতো। মৌরীর চাইতে ও অনেক বেশী সুন্দর, অনেক বেশী বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু মৌরীর কাছে ওর চিরকালের জন্য হার হয়ে গেল। বিয়ে করে যে মেয়ে জিতে গেল সে মেয়ের বাজী জেতা হয়ে গেল সমস্ত জীবনের জন্য। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো অমিতা। অদৃষ্ট! অদৃষ্টে থাকলে কত অসম্ভবের ভেতর পথ করেই না ভাগ্য এগিয়ে আসে, আর নইলে!

অদৃষ্ট! অদৃষ্টটাই সব। ঠিক এই কথাটাই বলছিল কানাইলাল রামুকে। রান্না হয়ে গেছে তার। তৈরী রান্না সাজিয়ে রেখেছে সে উনানের চার পাশে ঘিরে। চপ-কাটলেট-ফ্রাই রেখেছে ডিসে বিস্কিটে গড়িয়ে। ভেজে দেওয়া হবে গরম গরম। কাজ শেষ করে ছোট পিসির ছেড়ে-যাওয়া শান্তিনিকেতনী মোড়াটায় বসে উদাস ভাবে বৃষ্টি দেখছিল সে। তার হাতে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা নিয়ে বসে যে ওর সঙ্গে গল্প জমাবে তেমন সাহস রামুর ছিল না। তবে এক হয়েও কোথা দিয়ে যেন তাব মনে হচ্ছিল এক নয়। কর্তার পরে গৌরবের দাপট আগে পড়ে তাদের স্ত্রীদের মুখে আর তার পরই পড়ে তাদের ভৃত্যদের মুখে। ছোট পিসির পরই কানাইলালের মুখেও তা পড়েছিল। রামু সসম্ভ্রমে দূরে বসে সময় কাটাচ্ছিল মেঝেতে ঠুক ঠুক করে চামচ বাজিয়ে। কৃতার্থ করে দিলো কানাইলাল তাকে আগে চা খাওয়াতে বলে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গিয়ে উনানে কেটলি চাপালো রামু। কিন্তু মুখ শুকিয়ে উঠলো। বৌদি বলেন, তার চা নাকি যাচ্ছেতাই হয়। কানাই এতো এতো সব ভালো ভালো রান্না জানে আর ও চাটুকুও ভালো বানাতে জানে না! হে ভগবান এ লজ্জা এ অপমান থেকে রক্ষা করো। নইলে আজকের মতো বেঁচে থাকবার ইচ্ছেটাই ওর উবে যাবে। ভালো চা বানানোর জন্য রামু প্রাণপণ চেষ্টায় লেগে গেলো। অমিতা যে ভাবে চা করে তার সব করলো সে। জল ফুটতেই নামিয়ে ফেললো। চা ঢালবার আগে টি-পটটাকে উনানে ধরে গরম করলো। চামচ মেপে চা দিল। টিকোজী দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট সময় অপেক্ষা করলো বসে বসে। কাপ গরমজল দিয়ে ধুয়ে না নিলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয় বৌদি, প্রতিদিন সে ভুলে যায়। আশ্চর্য্যরকম ভাবে কথাটা আজ মনে পড়ে গেল ঠিক সময়ে। বিলিতি দুধ ঢেলে চামচা দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে এবার রামুর মুখ উঠলো উজ্জ্বল হয়ে। চায়ের সোনালী রংটাই বলে দিচ্ছে ওর চা আচ্ছা হয়েছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে চানাচুর ভাজা চিবোতে আর কথা বলতে ইচ্ছে করবেই। এক আধটা কথা বলতে বলতে কথায় জমে উঠলো কানাইলাল। বলার মতো কথা কি ওর কিছু কম—সাহেবের খাওয়া পরার টাইম। চালচলনের কায়দা। মেমসাহেবের মেজাজ আর মর্জ্জি। মেমসাহেবের দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে তার রান্নার দক্ষতা, ভালো ভালো মাইনার ডাক আসা পর্য্যন্ত কত বিষয় কত কথা।

—ভালো ভালো মাইনা? তবু সে যায় না। কেন? জানতে না চেয়ে পারে না রামু।

কারণ আছে—বিশেষ কারণ আছে। বেশী টাকার কাজ ফেলে কি এমনি এমনি এখানে পড়ে রয়েছে? বড় লাভের জন্য ছোটখাট লাভ ছাড়তে হয়। ভাগ্যের সন্ধানে আছে সে। জানে কি রামু তার সাহেবের ক্ষমতার কথা?

কত তা' না জানলেও কিছু যে জানে, তা জানালো রামু।

সে কি জানে, সাহেব যাকে খুশী বিদেশ পাঠাতে পারে—ইংলেণ্ড জার্মাণী আমেরিকা? শুধু মাত্র সাহেবের মর্জি নির্ভর? জানে না? তবে ওর কাছ থেকে জেনে রাখুক রামু, বিদেশ পাঠাবার হর্তা-কর্তা হল তার সাহেব। তার দরজায় ধরণা না দিয়ে কারু পা বাড়াতে হয় না। কত কত ছেলেদের সে দেখছে এসে হাত কচলে দাঁড়িয়ে থাকতে—উপহার দিতে, ভেট দিতে। এমন কি—বিশ্বাস করবে কি রামু—বাজার করে দিতে, মেমসাহেবের ফরমাস খাটতে?

বেশ তো জানলো, বিশ্বাস করলো রামু কানাইলালের সাহেবকে খুশী না করে কারু বিদেশ যাওয়ার উপায় নেই। সে সুযোগের জন্য তবু সাহেবের দরজায় ধরণা দিতেই হয়। কিন্তু তার সঙ্গে কানাইলালের ভাগ্য-অন্বেষণের সম্বন্ধ কি?

—আছে আছে। সেও সেই সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণ্‌ছে আর বাবুর্চি জর্জ্জির কাছে ইত্যবসরে শিখে রাখছে ইংরেজীটা।

ততক্ষণে রামুর মুখের হাঁর ভেতর দিয়ে সাদা-সাদা দাঁত আর লাল রঙে জিভটা দেখা যেতে শুরু করেছে—বিদেশ সম্বন্ধে এটুকুই জানে, সেখানে একটা কিছু শিখতে যেতে হয়। কেউ বা ডাক্তার হতে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। আরো অনেক কিছু আছে বলেই—ও জানে না। কিন্তু কানাইলাল যাবে কি করতে?

ঢোলা পা-জামা-পরা পা ঝাঁকায় কানাইলাল।

কোন-কোন জিনিষটা শিখতে আর দেখতে বিদেশ না গেলে হয়? পত্রিকা পড়ে কি রামু? অক্ষর-পরিচয়হীন রামুর মুখ যে লাল হয়ে গেল, সে যে লজ্জায় মুখ নীচু করলো— সে সব লক্ষ্য করে না কানাইলাল।

তার ভেতরটাও তো চঞ্চলই। সে তো বুঝতে পারছে তার বিদেশ যাবার কথাটা রামুর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। কিন্তু কেন? সেদিন সে শুনেছে সাহেবরা একদল সব যাচ্ছে এবার বিদেশে ঘুরে দেখে আসবার জন্য। তবে রান্না শিখতেই বা আমার প্রয়োজন হবে না কেন? কানাইলালের পা'র ঝাঁকুনী আরো বেড়ে ওঠে। খানাপিনা যা হয় —তার রান্না, তার পরিবেশন, তার টেবিল চেয়ারে কাঁটা-চামচ—খাওয়া-বসা তার কোনটা দেশী? এ সব শিখতে হয় না। রপ্ত হতে হয় না বিদেশী রীতিতে। কত নির্ভুল শেখা সম্ভব এখানে বসে। কিন্তু ভুল হলে সাহেব যায় চটে। একদিন চটে গিয়ে মেমসাহেবকে বলছিলেন—দেও এটাকে বিলেত পাঠিয়ে। শিখে আসুক কি ভাবে ওদেশের স্ট্যুয়ার্টরা মনিবের যত্ন করে। মস্ত মস্ত লোক সব কেমন তাদের ওপর নির্ভর করে দেয় জীবন কাটিয়ে! নইলে ওকে দিয়ে পোষাবে না আমার। অভাবনীয় ভাবেই সুযোগটা এসে গিয়েছিল। বলেও ফেলতো সেদিনই কথাটা। কিন্তু বড্ড রেগে গিয়েছিলেন সাহেব—রাগের সময় কোন কথা বলতে নেই। একটু থামলো কানাইলাল। তারপর বললো—ওঁরা দেশের সেবা করেন, আমরা ওঁদের সেবা করি। ওঁরা দেশের সেবা করা শিখতে বিদেশ যান, আমরা যাবো ওঁদের সেবা করা শিখতে। ওঁরা বিদেশ থেকে না দেখে না শিখে আসলে দেশের কোন কাজ করতে পারেন না, বিদেশী কাজগুলো আমরা পারবো কি করে?

এতক্ষণ বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লো রামু।

বেশীক্ষণ শুয়ে থাকবার সাহস ছিল না অমিতার। কে জানে ছোটপিসি এখনও রান্না ঘরেই আছেন কি না! তাই যদি থেকে থাকেন তবে তিনি রান্নাঘরে আর ও ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে—না, এতো সাহস না দেখানোই ভালো। উঠে পড়েছিল ও। রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়তে হলো অমিতাকে। কান পেতে শুনলো কানাইলালের কথা। হাসি চেপে সোজা ছাদের দিকে যাচ্ছিল। রাস্তার আলোয় দেখতে পেলো অন্ধকার ঘরে জানালার কাছে বসে আছে মঞ্জু। বৃষ্টিটা তখন প্রায় ধরে এসেছে। যেটুকু পড়ছে তাতে ঝাপটা ভাব নেই। পিসিমা ঝাঁটা দিয়ে বৃষ্টির জল সরাচ্ছেন বারান্দার। মঞ্জুদের ঘরে এসে ঢুকলো অমিতা। বাতি জ্বালিয়ে দিতে হঠাৎ আলোয় হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো মঞ্জু।

অমিতা জিজ্ঞাসা করলো—মাথায় চিন্তা আছে কি কিছু?

—আপাতত শূন্য।

—তোমার বাপ-দাদাদের যে কথা স্বপ্ন দেখতে সাহস নেই, তোমার ছোটপিসির বাড়ীর ভৃত্য তা ভাবে—এর ভেতর চিন্তা করবার মতো কিছু আছে বলে মনে হয়নি তোমার?

কানাইলালের বলা কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। সে তখন বলছে, তার বিদেশের লক্ষ্য কি এ বাড়ীর কাজটাই ভেবেছে রামু। পাগল! তার লক্ষ্য দিল্লী। একবার ঘুরে আসতে পারলে দিল্লী তাকে ডাকবে না, কে বলতে পারে? কে বলতে পারে পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপানো লোভনীয় সব ডিনার টেবিলের পেছনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে না?

যে রামু কাচের কাপ-ডিস ভেঙ্গে বৌদির কাছে ধমক খেতে খেতে হাসে; দিদিমণিদের বন্ধুদের কাছে চায়ের নামে গরমজল সেদ্ধ ধরে দিতে গিয়ে ট্রে শুদ্ধু ফেরত আনতে আনতে— 'ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে', গেয়ে ওঠে— ফের ধমক খায়, ফের হাসে—সে রামুর মন আজ বিষণ্ণ।

অমিতা যখন ভিজে বারান্দা শুকনো নেকড়া দিয়ে মুছে দেবার জন্য রামুকে ডাক দিলো, ছাড়া-ছাড়া চেহারায় কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো রামু।

দৃষ্টি-বিনিময় হলো অমিতা আর মঞ্জুর। জিজ্ঞাসা করলো মঞ্জু—কাজটা এক্ষুণি ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে রামু? পিসেমশাই-এর মতো একজন সাহেবের খোঁজ আগে করে নিলে হতো না?

হতবাক হয়ে গেল রামু, দিদিমণি বুঝলো কি করে ওর মনের কথা!

—কি, অমন বোকার মতো চেয়ে রয়েছিস কেন? আগে একজন সাহেবের খোঁজ করে নিলে ভালো হতো না? তিন হাজারী না হোক, নিদেন দেড়-দুই।

রামুর কাছে তখন মঞ্জুর বোঝার বিস্ময়টাই বড় হয়ে উঠেছে— আপনি কি করে বুঝলে দিদিমণি?

—তোর মুখের লেখা পড়ে।

—মুখে আবার লেখা পড়ে নাকি! অবিশ্বাসের সঙ্গে হতে দিয়ে মুখটা মুছলো রামু।

—পড়ে না? তুই আমাদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলিস, বলিস সে ভাবে ছোট পিসির সঙ্গে? ও বাড়ীর কেষ্টর গলা জড়িয়ে ধরে হি-হি করে হাসিস, করিস কখনো সে রকম কানাইলালের সঙ্গে?

—না তো!

—কেন করিস না?

বোকার মতো তাকিয়ে রইলো রামু, মঞ্জুর দিকে।

—ঐ মুখের লেখা পড়ে। তুইও জানিস সে-লেখা পড়তে। পত্রিকা পড়ার চাইতে এ লেখা পড়া অনেক শক্ত। কানাইলালের চাইতে তুই কিসে কম? হাঁ, তার মতো অবশ্যি তোর সাহেব নেই। তাতে হয়েছে কি—কানাইলালের সাহেব তো আমারই পিসেমশাই— তোর যাওয়া আটকাবে কে? কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি বোকা তবে?

বিশ্বাস যে রামু করলো তা নয়, কিন্তু মনের দুঃখ-দুঃখ ভাবটা কেটে গেল। —কানাইলালেরই যে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হবে তারই বা বিশ্বাস কি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো রামু নেকড়া-হাতে, বারান্দা মুছতে।—'ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে।'

—আবার। জিভ কাটলো রামু।

বসবার ঘরের উদ্দেশ্যে আসতে আসতে মঞ্জু বললো—বৌদি ভাবছি কি জানো, ভাবছি, কানাইলালের পরিকল্পনাটা দিল্লী পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। হয়তো পরিকল্পনা কমিশনের মেম্বার টেম্বার হয়ে যেতে পারে।

বসবার ঘরে এসে দেখলো ওরা, একটুও গল্প জমেনি। প্রধান অতিথি যদি গল্পী না হয় তবে গল্প জমবেই বা কা'কে নিয়ে। বাসুদেব এ-ষ্টেশন থেকে ও-ষ্টেশন ঘুরিয়ে চলেছে রেডিওর চাবী। কখন শব্দ হচ্ছে ঘরর ঘর, কখন বেজে উঠছে বর্মি কথা বা ইন্দোনেশিয়ার সংবাদ। যতীন বাবুর সঙ্গে কথা বলছে সুদর্শন সবিনয়ে আজ্ঞে হ্যাঁ আর 'আজ্ঞে না' দিয়ে। জয়দেবকে ঘরে না দেখে গম্ভীর হয়ে উঠলো অমিতার মুখ আর ওদের সঙ্গে মৌরীকে না দেখেই হয়তো ঠোঁটের কোণে যে চুল পরিমাণ ফাঁক ছিল সেটুকুও সেঁটে গেল সুদর্শনের।

বসে অমিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে মঞ্জু বললো—যুদ্ধটা কড়া হবে দু'পক্ষে।

—যুদ্ধ! কোথায় কড়া যুদ্ধ হবে?

একটা নিঃশ্বাস টানলো মঞ্জু—কানে কানে কথার জবাবের নমুনা এই। রেগে উঠলো সে। কোথায় তা আমি কি করে বলবো। তবে হবে।

—যুদ্ধ, কখনোই আর যুদ্ধ হতে পারে না। রেডিও বন্ধ করে উঠে এলো বাসুদেব।

হেসে ফেললো মঞ্জু। না হবে তো না হবে। যুদ্ধ দিয়ে করবো কি আমি। না আছে একটা ঘোড়া না আছে একটা তলোয়ার। লক্ষ্মীবাঈ হওয়া তো ঘটছে না কপালে।

যতীন বাবুর জন্য বহুক্ষণ ধরে সিগারেট খাওয়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল সুদর্শনের। চেন স্মোকার যাকে বলে সুদর্শন তাই। কষ্ট হচ্ছিল তার। হঠাৎ খেয়াল হতেই যতীন বাবু উঠে গেছেন। সিগারেট ধরালো সুদর্শন। তার পর ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে চোখ দুটো কুঁচকে ছোট করে তাকালো মঞ্জুর দিকে— ঘোড়া আর তলোয়ার পেলেই আপনি বুঝি যুদ্ধে নেবে যেতে পারেন?

—পারি। তবে একটা ঘোড়া আর একটা তলোয়ার দিয়ে তো আর অসংখ্যের সঙ্গে লড়তে পারবো না? একজন লড়লে প্রতিপক্ষও একজন হতে হবে। অসংখ্য দিতে পারেন তো লড়বে অসংখ্যের সঙ্গে।

—লক্ষ্মীবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ হয়েছিলেন ইংরেজের সঙ্গে লড়ে। আপনি লড়বেন কার সঙ্গে?

—লড়বো কার সঙ্গে। লড়বার জন্য সময় সময় আমি যে দস্তুর মতো মানসিক যন্ত্রণা বোধ করি।

—আমি সরবরাহ করবো না হয় আপনাকে ঘোড়া আর তলোয়ার।

সুদর্শনের চোখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না পরিহাস তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করে না মঞ্জু। বলে—উঁহু, আপনার সরবরাহ দিয়ে আমার সংগ্রাম চলবে না। ও তো ব্যবসায়ীর ব্যবসা—

—এই মঞ্জু, ছোট পিসি—অমিতা ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে মঞ্জুকে চুপ করবার ইশারা করে। সুদর্শন হাতের সিগারেট আবার য়্যাসট্রের ভেতর ফেলে। বাসুদেব উঠে বড় কৌচটা ছোট পিসিকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তিনি বসেন না। আহ্বান জানান খাবার টেবিলে আসবার।

খাবার সময় নেমে আসতেই হলো মৌরীকে। বাবা নিজে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন তাকে।

॥ ৪ ॥

মৌরী নিজেই ভাবছিল, এবার না নামলেই নয়। যে সঙ্কোচটুকু বাধা হয়েছিল, সেটুকু কাটিয়ে ওঠা সহজ হতো মঞ্জু বা অমিতা সঙ্গে থাকলেই। তবু উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। এমনি সময় এলেন বাবা।

বাবার কাছে মেয়ের এ অনুপস্থিতি কিছুমাত্র বিস্ময়ের ছিল না। মেয়ের স্বভাব তিনি জানেন। নতুন পরিচয় যে সে সহজে করে না, করলেও সে পরিচয় যে তার নতুনের গণ্ডী ছাড়িয়ে এগোতে চায় না; আর না এগোনো পর্য্যন্ত দেখা পাওয়া যে তার কঠিন—এ তিনি ভালো রকমই জানেন। কিন্তু কন্যার এই স্বভাবের প্রশ্রয় যতীন বাবু আজ দিলেন না। ডাকটা দিলেন এসে তিনি আদেশের সুরে। অবশ্যি একেবারে নিখাদ নয়। সঙ্গে কিছুটা অনুনয়ের রেশও দিলেন মিশিয়ে—যেটাতে কাজ হয়। না যদি আসে কি করতে পারবেন, কি করতে পারবেন মেয়ে যদি তার আদেশ মান্য না করে? কিছুই না। যদিও বাপ-মার অবস্থাটা প্রায় সর্বত্রই কতকটা এই রকম, তবু যতীন বাবুর ক্ষেত্রটা কিছু আলাদা। পিতার প্রাপ্য অনেক পাওনা তিনি হারিয়েছেন নিজ দোষে।

আজও মৌরী বাবাকে দেখে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো। যদি আর একটু আগে ও নেবে যেতো, তবে বাবার এ আসাটা তো ওকে দেখতে হতো না। কিন্তু এর ভেতর কি দোষের আছে কিছু?

আছে। কেউ এলে তো ওকে ডাকা ছেড়েই দিয়েছেন বাবা। আজ কেন এলেন—কেন না এসে পারলেন না?

ওর আজকের অনুপস্থিতি আর রোজের অনুপস্থিতিটা কি এক?

এক নয়, এক নয়। জানে মৌরী রোজের সঙ্গে আজ মিলানো চলে না। পাঁচ জনের ভেতর একজন সে, গিয়ে যদি না বসে, কিছুই যায়-আসে না। যদি বা যায়, মূল্য তার ধরার ভেতর নয়। কিন্তু আজ যে ওর উপস্থিতিটাই অতিথি আপ্যায়নের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ওই যে আজ অতিথিকে খুশী করার প্রধান উপকরণ। আর ঠিক এই জন্য—এই জন্যই বাবাকে দেখে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো মৌরী—যদি আর একটু আগে ও নেবে যেতো।

এ ছাড়াও কারণ আছে। মেয়েকে ভালো পাত্রে বিয়ে দেবার ইচ্ছে বাপ-মায়ের স্বাভাবিক ইচ্ছে। কিন্তু বাবার দু'চোখের ভেতর যে আলো মৌরী এই অন্ধকারের মধ্যেও চকচক করে উঠতে দেখতে পাচ্ছে—তা

কেবল খুশীর আলো নয়, আনন্দের আলো নয়; ও জানে প্রচণ্ড লোভ মিশে আছে তার ভেতর। মেয়ের ক'টা বাড়ী ক'টা গাড়ী হলো, সে আঁচলের চাবি ডান দিক বা বাঁ দিক করে কত টাকা নাড়াচাড়া করবে, বাবার দৃষ্টি সে সব ছাড়িয়ে চলে গেছে রাজ্যের রাজকোষের দিকে। যে ঘরে মেয়েকেতিনি বিয়ে দিচ্ছেন সেখান থেকে রাজভাণ্ডার দূরের পথ নয়—অপেক্ষা ওর রওনা হবার। তার পর? তার পর তো শুধু চল্লিশ স্যুর মন্ত্রটি শিখে নেওয়া আর গাধার পিঠে গিনি মোহর তোলা—লুটের টাকা লুঠে আনা। এমন কি ধরা পড়লেও মর্জিনাকে ছুটতে হবে না মুচির খোঁজে—ঘাড়-গর্দ্দান সব ঠিক যায়গায় তো থাকবেই, হয়তো মিলে যাবে শিরোপাও।

কিন্তু তাঁকে সংশোধন করার শক্তি তো ওর নেই। নীরবে মৌরী নেবে এলো নীচে। ঢুকলো গিয়ে খাবার ঘরে। ওর দিকে তাকিয়ে অমিতা মুখ টিপে একটু হাসলো। মঞ্জু জানালো, স্বাগতম্। দুজনেই ভীষণ ব্যস্ত। এক্ষুণি সবাই এসে পড়লো বলে। একজন গ্লাসে গ্লাসে জল ঢালে বরফের টুকুরো ফেলে আর একজন চটপট হাতে টেবিলে সাজায় ডিস-প্লেট।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো মৌরী। নিজেদের নিত্যদিনের খাবার ঘরটা যেন নিজেই চিনে উঠতে পারছে না সে। কালো জঙ-ধরা শিকের জানালায় ঝুলছে সাদা লেশের পরদা। দিনের বেলা হলে যার চেহারাটা দেখতে হতো বস্তীর মেয়ে গায়ে মূল্যবান পোষাক ঝোলার মতো। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দেখাচ্ছে শুধু পরদাগুলোই। মাসের সওদারাখা বার্ণিস-ওঠা দেরাজটা ঢাকা হয়েছে জালি-নেটে। তার ওপর রয়েছে ফুলদানীতে নানা রং-এর মরশুমী ফুল। ফলদানীতে ফল নানা দেশী বিদেশী। টেবিলে মূল্যবান বিলিতি ডিনার সেট আর কাটগ্লাসের গ্লাস। এক কথায়, লেসে-নেটে ফুলে-ফলে বিলিতি ডিনার সেটে কাটগ্লাসের গায়ে ঠিকরানো হাজার পাওয়ারের আলোতে ঝলমলে ঘরটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো, ও যেন উপন্যাস বর্ণিত উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের কোন ডাইনিং রুমে এসে দাঁড়িয়েছে।

—তার জন্য আর কি করতে পারি আমরা?

ঘরের মূল্যবান যা কিছু সব ছোট পিসির বাড়ী থেকে আনা। যা নেই, তা দেখানোর লজ্জায় মুখ কালো হয়ে উঠতে চায় মৌরীর। বলে—আর দরকার নেই। এমনিতেই অনেক বেশী করে ফেলেছিস।

—তবে এবার আমাদের ছুটি। পরিবেশনের ভার তোর—এ্যাঁ? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো অমিতাও— ও তাই তাই— কেমন?

সুদর্শনকে নিয়ে ঢুকলো এসে সবাই খাবার ঘরে। বিস্ময়ে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল মৌরী, সরে গিয়ে দাঁড়ালো সে জানালার কাছে। আর ও নিজে না তাকিয়েও বুঝলো চেয়ার টেনে বসবার সময় বেশ স্পষ্ট ভাবেই ওর দিকে একবার তাকালো সুদর্শন।

মাছ-মাংসের ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে পিসিমা দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। ছোট পিসি গিয়ে দাঁড়ালেন সুদর্শনের পাশে গম্ভীর ভারিক্কী চালে। কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে পোলাউ আর ফ্রাই-ডিস হাতে এসে দাঁড়ালো অমিতা মঞ্জু। সাহায্য করতে লাগলো কানাইলাল। রামুর মনের ভার কমে গিয়েছিল। বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগলো সুদর্শনকে। অভ্যাগত অধম না উত্তম, তা কষবার কষ্টিপাথর হলো রামুর বাড়ীর ব্যবহারটা। বিশেষ করে বাড়ীর কর্তার মুখের চেহারা। যতীন বাবুর দিকে একবার তাকালেই ও বুঝতে পারে অতিথি ধনী না নির্ধনী। বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত না অতিবাঞ্ছিত। দুপুরের আয়োজনে ও তেমন ধরে উঠতে পারেনি, এখন মাথা নাড়ছিল মনে মনে—দিদিমণির বর মস্ত কেউ। রোমাঞ্চ হয় রামুর, যদি কানাইলালের সাহেবের চাইতেও বড় কেউ হয়!

খাওয়া চলতে থাকে, কখনো এ-কথা সে-কথা, কখনো অমিতা মঞ্জুর কিছুই না নেওয়ার অনুযোগ, বাবা পিসিমাদের আরো একটু নেওয়ার পীড়াপীড়ি, বাসুদেবের তার নিজের ডিসটার প্রতি সুদর্শনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিমাণ দেখিয়ে তাকে উৎসাহিত করবার ভেতর দিয়ে। অমিতার অত হাসি কথার ভেতর দিয়েও মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে যায় ওর মনের মেঘ। জয়দেব আজও ঠিক সময় এলো না— এক টেবিলে খেতে বসলো না। সমস্ত দিনের পরিমিতিবোধ ও এখনকার অটল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মৌরী সামঞ্জস্য করে উঠতে পারে না সুদর্শনের মাঝখানকার ব্যবহারটা। সবার মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে জানালায় হেলে দাঁড়িয়ে থাকে সে। পরদাগুলো কখনো মৃদু বাতাসে দোলে, কখনো জোর বাতাসে ওড়ে পড়ে কিছু ঝির-ঝির বৃষ্টি মাথায়-মুখে এসে যায় আরাম লাগিয়ে।

—এই দিদি! ধর ধর শীগ্‌গির। গেল হাতটা পুড়ে।

চমকে উঠে এগিয়ে এলো মৌরী আর ওর হাতে থালাটা তুলে দিয়ে পাখীর ডানা ঝাড়ার মতো ঝাড়তে লাগলো মঞ্জু ওর হাতটা–- গেছে, একেবারেই পুড়ে গেছে হাতটা।

অমিতা হেসে উঠলো খিল-খিল করে। ওটা তো বরফ-ঠাণ্ডা মিষ্টির থালা।

কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে মুখে হাওয়া দেয় মঞ্জু আর তার দিকে একবার তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেকে সহজ করে ফেলে মৌরী। বাবা মিষ্টি নেবেন না জানে, তবু প্রথমে গিয়ে দাঁড়ালো সে যতীন বাবুরই কাছে। সস্নেহ দৃষ্টিতে বাবা কন্যার দিকে তাকালেন —আমি কি মিষ্টি খাই মা।

মিষ্টি তিনি খান কিন্তু রাতের বেলা নয়। মিষ্টি দেখলে তার ফরাসী-প্রিয়া নাক কুঞ্চিত করে।

খাওয়া হয়ে গেলে আর যে কিছুতেই টেবিলে বসে থাকতে পারেন না, সে-কথাটা জানিয়ে অনুমতি নিয়ে উঠে পড়লেন যতীন বাবু। সুদর্শনের কাছে এসে মৌরী দাঁড়াতেই প্লেটের উপর হাত ঢাকা দিল সুদর্শন।

এগিয়ে এলো অমিতা—এ কি, মিষ্টি নেবেন না?

—আমি মিষ্টি খাইনে।

—তা হয় না। আমাদের মেয়ে প্রথম মিষ্টিহাতে এগিয়ে এসেছে, ফিরিয়ে দিতে পারবেননা।

নীরবে হাতটা ডিসের উপর থেকে সরিয়ে নিল সুদর্শন।

অমিতার বাধা দূর করতেই হয়ত পিসি নারা চলে গেলেন ঘর থেকে। যদিও পিছু হটে গিয়েছিল মৌরী, তবু এগিয়ে এসে সুদর্শনের জন্য মিষ্টি দিতে হলো তাকে।

একটা দিলে কেন মৌ! নিজে তুলে এনে মিষ্টি দিলো অমিতা সুদর্শনকে। বললো—আর বেজোর চলবে না। একটা তুলে নিয়ে ডিসটা ঠেলে সরিয়ে রাখতে দেখে অভিমান ভরে বললো—খেলেন না তো?

—পারছি না।

—আমি যে আরো কত পারি—কিন্তু লজ্জা করছে। মাথা চুলকায় বাসু।

চটছিল মৌরী অমিতার উপর। বাসুদেবকে দেওয়া হলে থালা রেখে চলে গেলো সে। ওর বিরক্তি বুঝতে বাকী রইলো না অমিতা মঞ্জুর। হাসলো ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে।

সুদর্শনের হাতে তোয়ালে তুলে দিচ্ছিল অমিতা—হন্তদন্ত ভাবে ঘরে এসে ঢুকলো জয়দেব। ফরসা জামা-কাপড় তার ছিটে বৃষ্টিতে ভেজা। কালো ঘন চুল আরো চকচকে দেখাচ্ছে জলে ভিজে ওঠায়। রুমাল দিয়ে ঘাড়-মাথা-মুখ মুছতে মুছতে মাপ চাইলো সুদর্শনের কাছে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললো—ঠিক সময়ে এসেছি—তোদের খাওয়া হয়নি তো? যা ক্ষিদে পেয়েছে।

ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে থাকা অমিতার মুখ দেখলে কে বলবে এতক্ষণ সে এতো হেসেছে, এতো কথা বলেছে।

অমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো সুদর্শন। বললো— ক'টার সময় বাড়ী ফিরলে স্ত্রীদের মুখের হাসি মিলায় না?

হেসে উঠলো জয়দেব। গম্ভীর মুখে জবাব দিলো অমিতা—স্ত্রীদের মুখের হাসিটা মূল্যবান মনে হলে অপরের কাছ থেকে সেটা জেনে নিতে হবে না। আর তা না হলে শত শিখিয়েও লাভ নেই। চলুন। সুদর্শনকে অনুসরণ করতে বলার ভঙ্গিতে ডেকে বেরিয়ে গেল অমিতা।

দ্বিতীয় বার টেবিল তৈরী হলো। অমিতা আজ অনেক খেটেছে। তাকে বসিয়ে, ছোট পিসিকে ডেকে, মৌরীকে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে, কানাইলালকে হাতে হাতে সাহায্য করে, পিসিমাকে খাইয়ে ছোট পিসির রওনা হবার সময় টিফিন কেরীয়ার ভর্তি মিষ্টি বাড়ীর জন্য গাড়ীতে তুলে দিয়ে—এমন কি আবার বৃষ্টি নামলে যে ঠাণ্ডাটা পড়বে তাতে একটা চাদর গোছের কিছু দরকার হবে, ফের গিয়ে সেটা সুদর্শনের বিছানায় রেখে এসে মঞ্জু একেবারে তাক লাগিয়ে দিল সবার। অমিতা গলা জড়িয়ে ধরলো মঞ্জুর। অনেক ধন্যবাদ ভাই তোমাকে।

ওরা দু'জন যখন শোবার ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো তখন রাত একটা বেজে গেছে।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে পত্রিকাপাঠরত জয়দেবের দিকে ফিরেয়ে তাকালো না অমিতা। যদিও ও জানে এ রাতে পত্রিকার পাতায় চোখ পেতে বসে থাকাটা ওরই পথ চেয়ে বসে থাকা। ঘরে এসে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে সব অপরাধ ক্ষমা করলেও এ অপরাধটা ক্ষমা করে না অমিতা—অন্তত সে রাতটা বৃথা করে দেয়ই সে। আজ রাত অনেক হয়ে গেছে। আজও জয়দেব বসে থাকবে এতটা আশা করেনি সে। যে জন্য বসেছিল জয়দেব তা হলো অমিতা অর্থাৎ খুশী হলো।

সোজা আলনার কাছে চলে গিয়ে শাড়ী পালটে শরীরে পাউডার ঢালে অমিতা—এক দিন জয়দেবের সঙ্গে রাগারাগি হওয়াতে মৌরীদের ঘরে চলে গিয়েছিল সে। মঞ্জু বলেছিল এক'দিন?

অনেক দিন। দেখবো আমার প্রয়োজন হয় কিনা।

কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য মৌরী বই-নিবিষ্ট দৃষ্টি তুলে ওর দিকে তাকিয়ে আবার বই-এ মন দিয়েছিল। সে দৃষ্টি অর্থ না বুঝতে পারার মতো বোকা অমিতা নয়। কলেজে-পড়া মেয়ে সে-ও। কিন্তু মৌরীর অনেক কথা অনেক ভাবই গায়ে মাখে না সে। প্রয়োজনের কথা বলেছ তো হয়েছে কি। জগৎটাই তো প্রয়োজনের পেছনে ছুটে চলেছে। শস্য বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে, গাছ আলোর দিকে বাহু মেলে দেয়, বীজ মাটি খোঁজে—প্রয়োজন বলে। চন্দ্র-সূর্য্য ফুল-ফল-জল; মানুষের প্রতিটি সম্পর্ক—জড় আর জীবজগতের যত চাওয়া কোনটা অপ্রয়োজনের? শুয়ে পড়লো সে। সে শোওয়া অপূর্ব। ও জানে উপাধানের উপর কি ভাবে খোলা হাতটা রাখলে, খোঁপাটা কতটা এলিয়ে দিলে, পা'র দিকের শাড়ী কতটা তোলা থাকলে, ফরসা ঘাড়-পিঠ বাহুর কতটা লালশাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেলে আকর্ষণের শক্তি জোরালো হয়। ও জানে, কি ভাবে সৌন্দর্য্য দিয়ে পুরুষকে মুগ্ধ করতে হয় আর সে জানা প্রয়োগ করতে সঙ্কোচ বোধ করে না একটুও। যুদ্ধ-বিগ্রহ হিংসা-দ্বেষ পুরুষ রূপবতীর জন্য যত করেছে, গুণবতীর আকর্ষণে কি কেউ তাদের তা করতে শুনেছে কোন দিন? ইতিহাসের পাতায় তো দূরের কথা, আজও পুরুষের হাতের সৃষ্টি সাহিত্যের পাতায় কই অমিতা তো রূপযৌবনের পায়ে মাথা কোটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না? গুণের কথা যে তারা এক-আধটু না লেখে তা অবশ্যি নয়— সে শুধু নিজেদের মান রক্ষার জন্য। পড়ে আর দেখে ও স্থিরনিশ্চয় হয়েছে যত দম্ভের কথাই বলুক, মেয়েদের গুণগত অনুৎকর্ষতার প্রতি যত বিদ্রূপবাণই বর্ষণ করুক— রূপের চাইতে বড় পুরুষের কাছে কিছু নেই। এর চাইতে খাতির তারা আর কিছুকে করে না। এ ছাড়া তারা আর কিছু চায় না। থাকলেও পীড়া অনুভব করে,—পীড়ন করে। মৌরীর এ কথাটা সে বিনা আপত্তিতে স্বীকার করে, খনার জিহ্বা কাটা যাবার ভেতর ঐতিহাসিক সত্য না থাক আছে পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক সত্য। আর তাদের চাওয়া দিয়ে তৈরী বলেই মেয়েরা গুণের ঘরে জ্ঞানের ঘরে আজও এমন দেউলে। সমস্ত দিনের অস্বীকারের পর এখন যে স্বীকৃতি স্বামীর কাছে সে পায়, সমস্ত দিনের অপমানের পর যে মান তার এখন মিলবে, সমস্ত দিনের পরাজয়ের পর যে জয় তার এখন তা কিসের? গুণ কি নেই ওর?

অলস ভাবে পাশ ফিরল অমিতা। শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে নিল পাখার হাওয়া। ঘুমিয়ে পড়া অমিতার কোন দায় নেই তা ঠিক করে দেবার। শব্দ কানে এলো জয়দেবের হাতের কাগজ ভাঁজ হবার— এখন যদি রিমঝিম বৃষ্টিটা আবার নামতো।

শোবার জন্য তৈরী হচ্ছিল মৌরীও। এ ব্যাপারটায় বিলাসী সে। একটি সিল্ক অন্তর্বাস আর একটি সিল্ক শাড়ী—দীর্ঘদিনের অভ্যাস ওর। অবস্থার অভ্যাস নয় বরং অবস্থা অতিরিক্ত অভ্যাসই তবু হয়ে গেছে। সমস্ত দিনের দশ বিশ গজ কাপড়ের বোঝা নামিয়ে খালি শরীরে শুধুমাত্র কয়েক মুঠো নরম সিল্ক জড়িয়ে শোয়া-- -এ যে কি আরাম। কাপড় বদলে সেই আরাম উপভোগ করতে করতে বিছানার উপর বসে চুল বাঁধছিল সে, মঞ্জুকে ঢুকতে দেখে বললো—হলো রাজকার্য্য পরিদর্শন?

হাত দুটো পেছনের দিকে নিয়ে হাতের তালুর উপর শরীরের ভার রেখে খাটে বসলো মঞ্জু। বললো— পিসিমা বলেন, হিমালয়ের উপর "ঋষি তপস্বীরা সব যোগাসনে বসে তপস্যা করছেন আর মাঝে মাঝে বলে উঠছেন 'স্বস্তি-স্বস্তি।' আমরা ভালো মন্দ যে কথাটাই বলি যদি তাঁদের সেই স্বস্তিবাক্য তার উপর এসে পড়ে, তবে তা ফলে যায়। ধর যদি তোর এই আমার রাজকার্য্য পরিদর্শনে বেরুবার কথাটার উপর ঋষিদের সেই 'স্বস্তি' পড়ে গিয়ে থাকে?

—তবে তুই রাজা হবি।

—হঠাৎ হঠাৎ তোরা যে আমার জীবনের কি ভবিষ্যৎ সত্যগুলো বলে ফেলিস, নিজেরাও জানিসনে। কিন্তু রাজা তো আর আজ-কাল হওয়া যায় না—মন্ত্রী।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজে শব্দ করলো মৌরী, হুঁ।

—আচ্ছা; রাজ্য থাকবে, প্রজা থাকবে, মন্ত্রী থাকবে, থাকবে সেনা আর সেনাপতি—সবই যদি থাকবে তো রাজা বেচারীরা দোষ করেছিল কি?

—হুঁ।

—অকর্ম সুকর্ম যাই হতো, হতো তো মন্ত্রীদেরই পরামর্শে।

—হুঁ।

—বুঝলি দিদি, এ মন্ত্রীদের চাণক্য বুদ্ধির চাল—রাজত্ব দখল করবার কৌশল। রাজাদের তাড়িয়ে রাজত্ব আর সিংহাসন দখল করেছে ওরা।

—দোহাই তোর মঞ্জু! মাথা ধরেছে এ্যাসপ্রো খেয়েছি।

—নে বাপু ঘুমো। উঠে বসে একমাথা জট চুলের ভেতর গায়ের জোরে চিরুণী চালাতে চালাতে গুন্ গুন্ করে উঠল মঞ্জু—

'সকলি তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে বলে করি আমি'—

—তুই কি পাগল হলি? রাত দুটোর সময় 'সকলি তোমারি ইচ্ছা' গাইতে বসলি।

—তাইতো। বৃষ্টি থেমে গেছে। তোর বিছানায় এক চাদর চাঁদের আলো, বাতাসে হাস্নুহানার মিষ্টিগন্ধ—নির্বাচনটা ঠিক হয়নি। 'মন, বলে চিনি চিনি' এটা গাইবো?

—মঞ্জু, সত্যি বলছি ভীষণ মাথা ধরেছে। অনুনয় করলো মৌরী।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চাইলো না মঞ্জুর। এ-পাশ ও -পাশ করলো অনেকক্ষণ। তারপর কেমন যেন একটা বুকচাপা অস্বস্তি ভাব একেবারে ছটফটিয়ে তুললো ওকে। চেষ্টা করলো সহ্য করতে অনেকক্ষণ, কিন্তু পারলো না। ঘুমিয়ে পড়েছিল মৌরী। মঞ্জুর ডাকে ঘুমভাঙ্গা লাল চোখ মেলে উঠে বসলো মৌরী বিছানার উপর। বললো— কি রে?

—বড্ড খারাপ লাগছে শরীরটা।

উৎকণ্ঠিত ভাবে উঠে বাতি জ্বেলে গিয়ে দাঁড়ালো মৌরী মঞ্জুর কাছে—কেন কি হয়েছে?

—ভালো লাগছে না।

মৌরী দেখলো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে মঞ্জুর। মুখটায় ঢেলে দেওয়া হয়েছে যেন একরাশ কালী। ঠোঁট দুটো একেবারে সাদা। তাড়াতাড়ি জল এনে মঞ্জুর মুখে মাথায় জলের হাত বুলোতে লাগলো মৌরী। বললো—এতো কাজ করা অভ্যাস আছে নাকি যে সহ্য হবে! বাড়াবাড়ি করতে গেলে এমনি হয়।

হাত দুটো বুকের ওপর রেখে চোখ বুজে পড়ে থাকে মঞ্জু। মৌরী ঠাণ্ডা ভেজা হাতটা ওর চুলের ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে চালিয়ে বুলোয়। বলে ইস্, আগুন বেরুচ্ছে মাথা থেকে। বেশ কতটা সময় এভাবে কাটিয়ে তারপর জিজ্ঞাসা করে মৌরী, ভালো লাগছে একটু?

—একটুও না।

আরো কিছুক্ষণ কাটলো এই ভাবে। পড়ে রইলো মঞ্জু চোখ বুজে। শরীরের ভেতর শত্রুপক্ষে যে যুদ্ধটা চলছে যেন তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে, সময় দিচ্ছে শান্তি স্থাপনের। তারপর যেন সেও অংশগ্রহণ করলো সংগ্রামে। ছুটে গিয়ে বেসিনের উপর মুখটা বাড়িয়ে ধরলো—তারপর কি পেট-নিংড়ানো বমি! কলের মুখটা চেপে ধরে ঝক্কি সামলায় মঞ্জু আর মৌরী হাত বুলোয় ওর পিঠে। এমনি হলো আরো ঘন ঘন তিন-চার বার। ভীত কণ্ঠে বললো মঞ্জু—কলেরা-টলেরা মতো কিছু নয়তো রে?

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো মৌরীর। এতক্ষণ সে ভেবেছে, দিনের অসহ্য গরম, ঝাল তেল মশল্লার গরম রান্না, অভ্যাস অতিরিক্ত কাজ—সব মিলে এটা হয়েছে। এবার ভয়ে সর্বশরীর মোচড় দিয়ে কি যেন একটা

গলা পর্য্যন্ত উঠে এলো মৌরীরও। সত্যি যদি তাই হয়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ। রাতের নির্জন পথটা ভেসে উঠলো চোখের উপর—কোথায় ট্যাক্সি। একটা ফোন —তাও পর্য্যন্ত নেই কোন চেনা বাড়ীতে। দোকানপাট সব বন্ধ— বন্ধ পোষ্ট অফিসের পাবলিক ফোন। আকাশ প্রান্তর টানা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মুহূর্তে ঝল্‌কে গেলো কথাগুলো মৌরীকে কাঁপিয়ে। মুখে বললো—যাঃ। কিন্তু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল টেবিলটার কাছে সময় দেখতে। অসুখে-বিসুখে মানুষে আগে তো ভোরটাকেই ডাকে। কিন্তু ডাকলেই তো আর সে আসে না—এখনও ভোর হবার বাকী আছে। মঞ্জুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো মৌরী—দূর পাগল; ওতে কি শুধু বমি হয়? ভাবিসনে। আমি এক্ষুণি আসছি।

বারান্দা দিয়ে হাঁটা দিল মৌরী। এখানে ওখানে জমে আছে বৃষ্টির জল। চাঁদের আলো পড়ে সে জল কোথাও চকচক করছে, কোথাও ধরে আছে সে জল পুরো চাঁদটাকে। টবের ফুলগাছের ছায়াগুলোকে বারান্দার মেঝের উপর দেখাচ্ছে নিপুণ শিল্পীর হাতের আঁকা ছবির মতো। জল চাঁদ আলো ছবি—উৎকণ্ঠিত পদক্ষেপে সব মাড়িয়ে চললো মৌরী।

ছোড়দার দরজা খোলা কেন? নিশ্চয়ই ভুলে গেছে বন্ধ করতে। ভালোই হলো—বাসুদেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো মৌরী। ছোড়দাকেই আগে তোলা যাক। কিন্তু দরজার সামনেই পড়লো হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে। খোলা দরজার কাছে বেতের চেয়ারে বসে আছে সুদর্শন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

উঠে দাঁড়ালো সুদর্শনও। আশ্চর্য্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো— কি ব্যাপার? তারপর ওর হতভম্ব ভাব দেখে তুললো ভ্রূ কুঞ্চিত করে। বললো—আমি যে এখানে, সেটা জানেন বলেই আশা করছি।

জানে কিন্তু ভুলে গিয়েছিল—উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল মৌরী—সুদর্শন, সুদর্শন ডাক্তার, সে এখানে, সে ছোড়দার ঘরে। তাকে ডাকতে ট্যাক্সি দরকার হবে না, ফোন লাগবে না। আনন্দে ও যে আবোল তাবোল কথা কিছু বললো না সে ও অতি সংযত বলে। শুধু একটা হাত দিয়ে আর একটা হাত চেপে ধরলো। বললো—একটু ভাঙ্গা গলায়ই বললো — মঞ্জু হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বমি করেছে বার পাঁচ ছয়, তাই ডাকতে এসেছিলাম ছোড়দাকে।

—ছোড়দাকে! সে কি ডাক্তার? হাতের সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাঞ্জাবী গায়ে চাপালে সুদর্শন! তারপর জামার হাত দুটোকে ঠেলে উপর দিকে তুলে দিতে দিতে বললো—চলুন।

সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে এবার সহজ স্বরে বললো মৌরী— ছোড়দাকে—

বাধা দিলো সুদর্শন। বললো—ডাকবেন ছোড়দাকে? কি দরকার। প্রয়োজন না হলে কেন খামকা বাড়ীশুদ্ধ লোককে ব্যস্ত করে তুলবেন। আগে দেখিই না আমি। কিন্তু মৌরীর থমকানো ভাব লক্ষ্য করে পড়লো দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলোর ভেতর দিয়ে একটা স্থির দৃষ্টি ফেললো মৌরীর মুখের উপর। তারপর হাসলো একটু। বললো আচ্ছা দাঁড়াচ্ছি। আপনি আপনার ছোড়দা বড়দা যাকে হয় ডেকে নিয়ে আসুন গিয়ে।

লাল হয়ে উঠলো মৌরীর মুখ। 'আসুন' বলে পা চালালো সে নিজেদের ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে একটু সময় মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুদর্শন। তারপর বসে হাত বাড়িয়ে নিজের হাতে টেনে নিল মঞ্জুর হাতটা। একবার তাকিয়ে একটু হেসে চোখ বন্ধ করলো মঞ্জু।

সুদর্শন রোগী দেখে। শিয়রে দাঁড়িয়ে মৌরী সুদর্শনের দেখা দেখে। কখনো তাকায় তার হাতের দিকে, কখনো তাকায় মুখের দিকে। লক্ষ্য করে সুদর্শনের মুখের চেহারা। সেখানে কোন চিন্তার ছায়া পড়ে কি না।

সুদর্শন নাড়ী দেখলো। লম্বা লম্বা আঙ্গুলে শাড়ী কাপড়ের উপর দিয়েই টিপে দেখলো পেটটা। বুক দেখার যন্ত্র নেই—হাতটা মঞ্জুর বাঁ দিককার বুকে রেখে হাতের চাপে পরখ করতে লাগলো হৃদ্‌স্পন্দনেব মাত্রা। মঞ্জুর নিঃশ্বাস ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলতে লাগলো সুদর্শনের হাতের মূল্যবান হীরেটা। মৌরী ওর নিজের বুকের ধক্ ধক্ শব্দটা যেন কানে শুনতে পেতে লাগলো। দৃষ্টি ফেরালো সে মঞ্জুর বুকের ওপর রাখা সুদর্শনের দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাতটার উপর থেকে। আর এতক্ষণে ওর হাত-পা অবশ করে দিয়ে মনে পড়লো, শুধু মাত্র শাড়ীর আঁচল ওর গায়ে জড়ানো। মঞ্জুর আচমকা ডাকে যে ভাবে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়েছিল—তাই আছে। ধক্‌ধকানো বুকটার উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত চাপা দিল মৌরী।

দেখা শেষ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে সুদর্শন জানালো— কিছুই নেই ভয় পাওয়ার। ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ওষুধ দিচ্ছি। বেরিয়ে গেল সে।

মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আগে একটা জামা গায়ে চাপালো মৌরী। তারপর নিরুদ্‌বেগ মন নিয়ে গিয়ে বসলো মঞ্জুর শিয়রে। 'ওষুধ দিচ্ছি' বলে যে ভাবে বেরিয়ে গেল সুদর্শন ও বুঝলো ওষুধ তার কাছেই আছে।

ফিরে এসে নিজে হাতে ওষুধ খাওয়ালো মঞ্জুকে সুদর্শন। কপাল ঘাড় কানের পাশ জল দিয়ে দিল বেশ করে ধুইয়ে। ভিজে-যাওয়া বালিশটা বদল করে দিল মৌরীর খাট থেকে বালিশ তুলে নিয়ে। চোখ তুলে খুঁজে দেখলো ঘরের সুইচবোর্ডটা কোথায়। পাখার স্পীডটা দিলো বাড়িয়ে। তারপর আবার চেয়ার টেনে মঞ্জুর হাতের নাড়ীতে তিন আঙ্গুলের টিপ রেখে বসলো।

ঠায় দাঁড়িয়ে মৌরী। কিন্তু সুদর্শন না চাইলো তার কাছে কোন সাহায্য, না কইলো তার সঙ্গে কোন কথা, না তাকালো একবার তার দিকে। মিনিট দু'-তিন পর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আর দরকার হবে না। এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে। বলেই চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—কাল সকালে চলে যাবো। আপনি নিশ্চয়ই তখন আসবেন না। বিদায় সম্ভাষণটা এখানেই জানিয়ে যাচ্ছি, নমস্কার।

আবার নিজেকে ভালো লাগিয়ে গেলো সুদর্শন। আর ভালো লাগিয়ে দিয়ে যাওয়াটা দিয়ে যাওয়ার চাইতেও বেশী নিয়ে যাওয়া। ওর মনটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সুদর্শন একেবারে তার ঘর পর্যন্ত। আর তার বেতের চেয়ার টেনে বসা, তার সিগারেট ধরানো, তার চোখ ছোট করে ধোঁয়া ছেড়ে চলার সঙ্গী হয়ে যে মৌরী আছে এ কথা জানতে পারলে সুদর্শনের পক্ষে শান্ত ভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চলা হয়তো সম্ভব হতো না।

শেষ রাতের আবছা অন্ধকারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে গেল মৌরী। রোগা চোখ দুষ্টুমিতে ভরে মঞ্জু তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। ঘুমোস নি?

—ডাক্তার 'ঘুমিয়ে পড়েছে' না 'ঘুমিয়ে পড়বে' কোনটা বলে গেলেন?

ঘুমের ওষুধ দিয়েছে সুদর্শন। পড়বে বলে গেলেও পড়াটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না মঞ্জু। হাত পা আসছিল অবশ হয়ে। চোখের পাতা দুটো হয়ে উঠছিল শিশের মতো ভারী। তবু ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল না ওর। সেরে উঠে ভারি ভালো লাগছিল। ভালো লাগছিল শেস রাতের হাওয়া আর ফুলের ভেসে আসা গন্ধ। ভালো লাগছিল, শাড়ীর কচি-কলাপাতা রংটার মতো ভালো লাগায় নরম হয়ে আসা মৌরীর মুখটা। ও জোর করে চোখ খুলে রাখছিল, কথা বলছিল। বললো আহা, অসুখটা যদি আমার না হয়ে তোর হতো। ডাক্তার রোগী দেখে কি আনন্দটাই না পেতেন?

—আচ্ছা তোর জন্যই না এই মাত্র ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলাম।

—তা আমি কি করবো অসুখ সেরে গেলে? স্বপ্নে হাসার মতো হাসলো মঞ্জু, আবার অসুখ করবে।—কিন্তু আর পারলো না, চোখের পাতা দুটো যেন নিজ থেকেই এক হয়ে গেল ওর। বাতি নিবিয়ে দিল মৌরী।

পরের দিন। সুদর্শনের ট্যাক্সি ছেড়ে দিতেই সামনে দাঁড়ানো রামুকে প্রচণ্ড ভাবে ধমকে উঠলেন যতীন বাবু—উল্লুক, দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি?

করকরে একটা দশ টাকার নোট বকশিশ দিয়ে গেছে ওকে সুদর্শন। চালে চলনে মেজাজে কানাইলালের সাহেবের চাইতে বড় দরের মনে হচ্ছিল রামুর সুদর্শনকে। এ বাড়ীরই তো জামাই কানাইলালের সাহেব। একটা আস্তো টাকা কোন দিন ওর ভাগ্যে বকশিশ মেলেনি। হাউই সার্ট আর ঢিলে পাজামা পরিয়ে মনে মনে প্রায় নিজেকে দিদিমণির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ রওনা করিয়ে দিয়েছে আর সেই খুশীই মুখে ফুটে উঠেছে—চমকে উঠলো রামু অযথা দুর্ব্যবহারে। কাঁদো-কাঁদো মুখে চলে গেল সে ভেতরে।

বুঝলো সবাই—জয়দেব বাসুদেব অমিতা। তারও চলে গেল একে একে। যতীন বাবু পায়চারী করতে লাগলেন এদিক ওদিক। রাতে ডাকতে গিয়ে মেয়ের মুখের যে চেহারা দেখেছিলেন লজ্জার মাথা খেয়ে আর তাকে ডাকতে যেতে পারেননি তিনি। কিন্তু এতোগুলো লোকের ভেতর এ বুদ্ধিটা কারু হলো না।

হয়েছিল। সবার হয়েছিল। পিসিমা পারেন নি যে কারণে যতীন বাবু পারেন নি। আর সবাই এসেছিল ফিরে।

ওষুধের ঘুম। অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছিল মঞ্জু। জেগে উঠে যখন শুনলো, রেগে বললো—বাড়াবাড়ির একটা মাত্রা আছে।

—সে মাত্রা সবাই ছাড়াচ্ছে বলেই আমি ভারসাম্য রক্ষা করছি।

—দোহাই দিদি থাম। মা তোকে কি মাত্রাটানাটাই হাতেখড়ির সময় শিখিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, মাত্রাবোধটাই সৌন্দর্যবোধের প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ।

আর কি বলতে পারে ও? ও কি বলতে পারে, চুলের ভেতর হাত চালাতে চালাতে শেষ রাতের অস্পষ্ট আলোয় এক আকাশ তারা পেছনে রেখে সুদর্শন যে বিদায় সম্ভাষণ ওকে জানিয়ে গেছে সে ছবিটার উপর দিনের চড়া ছবি ও চাপাতে চায় না। যে সুরটুকু কাল রাতে বাঁধা হয়েছে চায় না তাতে হাত ছোঁয়াতে —যদি ছিঁড়ে যায়।

॥ ৫ ॥

সুদর্শন এসে বাড়ীটাকে যে উৎসব-বাড়ীতে পরিণত করে দিয়ে গেল, সে চলে যাওয়ার পরও তা যেন মিলাতে চাইলো না। মনে হতে লাগলো বিয়ের পর মৌরী যেদিন চলে যাবে, সেদিন আর সম্ভব হবে না বাড়ীটার পক্ষে উৎসব করা। আর সেদিনই দু'চোখ ভরা বিদায়-অশ্রুর ভেতর এর রেশ মিলাবে, তার আগে নয়।

যতীন বাবু তো আনন্দে পাখা মেলে দেওয়া যাকে বলে, যেন তাই দিলেন। ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেন না, চেষ্টাও করেন না। কেনই বা করবেন? জীবনে চাপতে না পারার মতো আনন্দের দেখা ক'বার মেলে। উথলে পড়ে যাওযার অপচয়-ভয় তো আর নেই—তবে আর কি। বাজার করে, একে-তাকে আত্মীয়বন্ধুকে ডেকে খাইয়ে, মেয়েদের নিয়ে ছবি দেখে, এখানে-ওখানে বেড়িয়ে প্রতিদিন একটা নয়তো আর একটা কিছু জুড়ে দিয়ে জাগিয়ে রাখতে লাগলেন তিনি বাড়ীটাকে। অটুট স্বাস্থ্য। গর্বের সঙ্গে চলেন, বলেন, হাঁটেন। সব চাইতে বড় কথা আশাই যদি গতি আর জীবন হয়, তবে তিনি এখনও জীবন-যৌবনে পূর্ণ। বহু আশা তার। 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা' ও-জাতীয় কথা তাঁর কাছে নিছক কাব্য। সব চাইতে আগে চাই ধন। আর ধনের সঙ্গে মান তো বিংশ শতাব্দীর গাঁটছড়া বাঁধা। আর ও-দুটো থাকলে—খাতির আর ভালোবাসা? ঘরে-বাইরে, দেশে-বিদেশে কোথায় নেই?

স্বাধীনতার পর কত কি ঘটে যাচ্ছে। আজ যে কেউ নয়, কাল সে একজন কেউকেটা। যার নাম কেউ কোন দিন শোনে নি, কাল তার নাম কাগজের কলমে-কলমে। এ, ও, সে নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থ-কর্ম। কে তারা, কি গুণ, কোথায় দক্ষতা। অদক্ষতার দক্ষযজ্ঞে লণ্ডভণ্ড হচ্ছে দেশ। শিব সতীর জন্য যে প্রলয়নৃত্য করেছিলেন, সত্য আর মনুষ্যত্বের জন্য সেই নৃত্যপ্রলয় তার শুরু হলো বলে। তার আগে কিছু গুছিয়ে নিতে হবেই। কি বা কঠিন। গুণ নয় জ্ঞান নয়, শক্তি নয়—'একজন কেউ' হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন তো শুধু 'একজন কেউ হয়ে ওঠা ব্যক্তির পিছু ঠেলা'। এমন দুটো হাত খুঁজে বের করা, যার হাতের ইঙ্গিতে চললে ঐ চেয়ারগুলোর হাতল ধরা যায়। আর তার প্রাথমিক প্রয়োজন টাকা—প্রচুর টাকা। তারপর শতকরা একজনও শিক্ষিত নয়-এর দেশে ভোটের জয়যাত্রা।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেন যতীন বাবু, পত্রিকার পাতায় বাজেট আর বার্ষিকী পরিকল্পনার মোটা মোটা অঙ্ক পড়ে। সোনা গলা স্রোত—সুবর্ণ সুযোগ সব সোনা-গলা স্রোতের মতো বয়ে গেছে। যারা পাড়ি জমাতে পারছে, পারানির কড়ি তারা নিঃশেষ করে আনল বলে। আর কিছু দিন বাদে দেশটায় অবশিষ্ট থাকবে শুধু এঁদের উচ্ছিষ্ট কিছু ভিক্ষাপাত্র। যদি না এখনও এ চক্রে মাথা গলাতে পারেন তবে তার হাতেও উঠবে তারই একটি। অনুপায় অধৈর্যে দেয়ালে মাথা ঠোকার ইচ্ছাটা কেবল কাজে পরিণত করা বাকী রাখেন তিনি।

স্ত্রীকে খুশী করতে গিয়ে তার ভাইকে করার বদনাম মানুষের থাকলেও যতীন বাবুর ভগিনীপতিকে সে অপবাদ শত্রুও দিতে পারে না। এমন কাউকে তিনি কখনই কিছু করেন না, যাকে দিয়ে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি না হয়। ওখানে বড় আঘাত পেয়ে অভিমান বশেই চুপ করে গিয়েছিলেন যতীন বাবু। কিন্তু এবার আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। সরকারী দপ্তরটাকে পকেটে ভরার টাকা সুদর্শনের বাবার আছে—তাই ওটা তার পকেটে। দু'বার হাতে ফোনটা তুলে নেওয়া; সুদর্শনের মতোই শক্ত চিবুকে, চাপা ঠোঁটে দু-একটা কথা বলা, তাও পুরোটা নয়—আভাস দিয়ে ছেড়ে দেওয়া— তারপর কি না সম্ভব। সাধনায় নিষ্ঠা থাকলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য—একথা বিশ্বাস করার মতো দিন তার কাছে পায় পায় এগিয়ে আসছে।

আর এ বাড়ীর গিন্নী সম্বন্ধে সব চাইতে বড় কথা তিনি নেই। আর এ না থাকাটা দিয়েই তাকে এ উপাখ্যান থেকে দূরে রাখবো। নইলো তাকে অস্বীকার করা সম্ভব হতো না। গল্পের টানটাই বইতে চাইতো উল্টো উজানে।

কিন্তু গল্পের বাইরে রাখাই তো আর মনের বাইরে ফেলে দেওয়া নয়। বাড়ীর সবার মনে তিনি বেঁচে আছে ছেলে-মেয়েদের মনে যেটুকু বেঁচে আছেন সেটুকুই সত্যিকারের বাঁচা। সত্য চেহারার বাঁচা। যতীন বাবুর কাছে আছেন আতঙ্ক আর অশান্তির আধার হয়ে। একের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অপরের আশা আকাঙ্ক্ষার মিল কোন দিন হয়নি। কোন দিন পছন্দ হয়নি একের কাজ একের চলা অন্যজনের কাছে। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটো মন। সংঘর্ষে সংঘর্ষে আহত হতে হতে সম্পর্কটাই তাদের গিয়েছিল মরে। মৃত মানুষ আর মৃত সম্পর্ক— দুটোর সমান ওজন; বয়ে চলা সমান নিরর্থক। তবু যদি তাই চলতে হয় তবে তার যে ক্লান্তি, যে অবসন্নতা—মৌরী দেখেছে মার চেহারায় তা এসে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, সংসারটাকে তিনি ভালোবাসতেন— সে আশ্চর্য্য ভালোবাসা। সন্তান, সংসার, ঘরবাড়ী এমন কি আসবাব পত্র থেকে ধূলিকণা পর্য্যন্ত। একটা সুন্দর সংসার—প্রেমে, ভালোবাসায়, হৃদ্যতায় ভরা। এর চাইতে বড় কাম্য তার কিছু ছিল না। স্বামীর সঙ্গে ব্যর্থ হয়ে সে রচনায় বসেছিলেন তিনি সন্তানদের নিয়ে। এ বাসনা তার পুরতো কি পুরতো না তার সময় আসবার আগেই তাকে চলে যেতে হয়েছে। মৌরী ভাবে ভালোই হয়েছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ কালগুলো যাকে কিছুই দেয়নি, পরের জন্য এমন কি উপহার আর সে সাজিয়ে রেখেছিল! দরকারটাই বা কি। বাঁচবার দিনগুলো যাকে মরে থাকতে হলো, মরবার দিনগুলোর জন্য তার বসে না থাকলেও চলবে।

মঞ্জুর স্বভাবটা সমুদ্রের ঢেউ -এর মতো। যে বাধা সে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না তা যায় উছলে পার হয়ে। বাবাকেও সে পার হয়ে যায় উছলে। কিন্তু সহ্য হতে চায় না মৌরীর। সুদর্শন এসে যাওয়ার পর থেকে বাবা যা আরম্ভ করেছেন তা ওর কাছে দস্তুর মতো পীড়াদায়ক। তবু নরম থাকতে চেষ্টা করে—সব সম্পর্কই বাঁচিয়ে রাখবার পেছনে কিছু না কিছু চেষ্টা রাখতে হয়। সে চেষ্টাই করে মৌরী।

শুধু কি মেয়েই করে? বাবাও করেন। মৌরীর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা একেবারে মিলিয়ে ফেললেন তিনি। এমন কি, বাসুদেবের জন্য মেয়ে দেখে এসে ওরা যখন জানালো ঐ মেয়েই ওদের পছন্দ—-এক কথায় হাসিমুখে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা এতো সহজ ছিল না তার কাছে। অবস্থার চাইতে বড় তার কাছে কিছু নেই। অমিতাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন মা অমিতারই জন্য, কিন্তু যতীন বাবুর গ্রহণ করার পেছনে ছিল তার অবস্থা। সেখানটায় ছেড়ে দেওয়া তার কাছে মস্ত দেওয়া। কিন্তু উপহার দেওয়া আর ভেট দেওয়া তো এক বস্তু নয়। বাবার সমস্ত ব্যবহারে যেন একটা ভেটের উগ্র গন্ধ— মুখ ফেরাতে ইচ্ছে করে মৌরীর, কিন্তু ফেরায় না। বরং খুশী হয়েছে, এ ভাবটাই মুখে ছলছলিয়ে তোলে।

সে দিন এক বন্ধুর বাড়ী জন্মদিনের নেমন্তন্ন ছিল মঞ্জুর। সেখান থেকে বাড়ী ফিরলো যেন সে উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে। ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারটায় বসে পড়ে বললো—দিদি, একেবারে আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনে এলাম।

বই পড়ছিল মৌরী। চোখ তুলে জিজ্ঞসা করলো—কোথায়?

—বন্ধুর বাড়ী। উঠে বসল মঞ্জু। বললো—জানিস ছোড়দার জন্যে যে মেয়ে দেখেছি আমরা, সেই মেয়ে রত্নার বোন।

—তাই! আশ্চর্য্য হয় মৌরীও। তারপর বলে—কিন্তু এর ভেতর উপন্যাস কোথায়?

—ভেতরের গল্পে। আমি একটু আগেই গিয়েছিলাম। তখনও অন্য বন্ধুরা কেউ আসেনি। রত্নাকেও নানা কাজে বার বার ওঠাউঠি করতে হচ্ছে, তাই ও আমায় ওদের ফটো এ্যালবাম হাতে দিয়ে বললে, এটা একটু নাড়াচাড়া কর। আমার হয়ে গেল বলে। বসে বসে তাই করছিলাম। হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম ওদের এ্যালবামে আমাদের ভাবী বৌদির ছবি দেখে। রত্না এলে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ভদ্রমহিলা তোদের কে হন রে? ও ভাবলো কৌতূহলটা আমার সুন্দরের প্রতি। বললো, ভারি সুন্দর দেখতে নয়?

বললাম—সুন্দর তো নিঃসন্দেহে। কিন্তু কে? বন্ধু?

—না, ও আমার মাসতুতো বোন মমতা। আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—মমতা তোর মাসতুতো-বোন?

বেশ তো!

বিস্মিত হলো রত্নাও। বললো— তুই চিনিস নাকি ওকে?

বললাম—উনি যে আমাদের ছোড়দার নির্বাচিত বধূ রে রত্না। তোর বোন। বেশ মজা হলো তো— বেশ খুশী লাগছিল রত্নার বোন হয় শুনে। সেই খুশীতে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হলো, উৎসাহটা এক তরফা। ও-পক্ষ একেবারে চুপ। এমন কি চোখে পড়ার মতো গম্ভীর।

ভুরু ঘুরিয়ে তুলে মৌরী জিজ্ঞাসা করল—এর কারণ?

—আমিও সেটাই জিজ্ঞাসা করতে যাবো, ঢুকলো এসে হৈ-হৈ করে অন্য বন্ধুরা। তখনকার মতো চুপ করে যেতে হলো। কিন্তু ব্যাপারটা কি। রত্না কথাটা শুনে অমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন? ওর মা কত বার আসা-যাওয়া করলেন, সামনে বসে খাওয়ালেন— রত্না তাকেই বা খবরটা বললো না কেন? তবে কি এটা ওদের কাছে সুখবর নয়? কেন নয়! কি অস্বস্তি—

—গল্পটাকে আর একটু স্ফীত করা যায় না?

মাথা নাড়লো মঞ্জু। তা যায়।

—আচ্ছা করছি। ওর এই মাসিমা থাকতেন ঢাকায়। পাকিস্তান হওয়ার পর ওর মা বোনকে ঐ বয়সী মেয়ে নিয়ে ওখানে থাকতে নিষেধ করে লিখলেন তার কাছে চলে আসতে। মেসোমশাই বড় ছেলেকে নিয়ে সেখানেই রইলেন; মাসিমা মেয়ে নিয়ে এসে উঠলেন ওদের কাছে। গল্পটার সুরু এর পর থেকে। ওর কাকা ভালোবাসলেন বৌদির বোনকে— অর্থাৎ মমতাকে।

—তারপর?

—তারপর যে কাকা বিয়ের কথা বললে 'পাগল' বলে হেসে উঠতেন, সেই কাকাই পাগল হয়ে উঠলেন মমতার জন্য। ওদের বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য বসে থাকেন, সিনেমার টিকেট আনেন, হাত ভরা উপহার দেন দু'জনকে। মমতা বেরুতে না চাইলে সেদিন তাঁরও সন্ধ্যায় বেরুনো যায় বাদ পড়ে— বুঝতে বাকী রইলো না কারু। অসম্ভব খুশী হয়ে উঠলেন মমতার মা। এমন পাত্র তাঁর কল্পনার বাইরে। একে বড় লোক তাতে বড় চাকুরে। খুশী হলেন রত্নার মা-ও। ঘর-বাড়ী সংসার ফেলে আসা দুঃখী বোনের সুখে কেনই বা তিনি বাদ সাধতে যাবেন! কিন্তু বাদ সাধলো পাত্রী নিজে। যাও বা ওদের সঙ্গে বেরুতো, গল্প করতো, কাকা উপহার টুপোহার এনে দিলে রত্নার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে নিতে—তাও দিল বন্ধ করে। বুঝলি দিদি, রত্না বলে—যেমন শান্ত তেমনি ধীর—কথা একরকম বলেই না, বেরোয় না প্রয়োজন ছাড়া ঘরের কোণ থেকে, কিন্তু আশ্চর্য্য—ওরা ওকে অনুগ্রহ করে আশ্রয় দিয়েছে না ও-ই অনুগ্রহ করে ওদের কাছে আছে, সেটা যেন এক এক সময় খটকা লাগতো রত্নারই। রাগে শরীরে জ্বালা ধরতো নাকি ওর। কিন্তু ও পক্ষ এমন বরফের মতো ঠাণ্ডা যে ওর কাছে গেলে ফ্রিজিং পয়েন্টে নেবে আসতেই হবে। সে যাই হোক— একেবারে বেঁকে বসল সে। বিয়ে এখন কিছুতেই করবে না। মাসি জেদ ধরলো করতেই হবে। জেদটা তার গিয়ে দাঁড়ালো প্রায় অত্যাচারে। মমতার মার মুখ শুকিয়ে উঠলো ভয়ে। এমনি সময় হঠাৎ একদিন আর বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া গেল না মমতাকে।

—এ্যাঁ! বিস্ময়ে শব্দ করে উঠলো মৌরী। সঙ্গে যেন আরো একটা গলা।

অমিতা যে কখন এসে কোণে বসেছে, ওরা দু'জনের কেউ তা দেখেনি। সে-ও কোন কথা বলেনি। তার বিয়ের পেছনেও গল্প আছে, লজ্জার কথা আছে, লুকোবার মতো ঘটনা আছে। নিজের জীবনের কথা ভুলে সে কখনই অপরের ঘটনার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে না—হৃদয়শূন্য মতামত প্রকাশ করে না। এই এটাও শুধু বিস্ময়ের ভূকম্প। মতামত নয়!

মঞ্জু বললো—মা বিছানা নিলেন। তার করা হলো ঢাকায় ওরা বাবা দাদার কাছে। রত্নার মা রাগে ক্ষোভে উঠলেন নিষ্ঠুর হয়ে।

—ওর কাকা? কৌতূহলে ভেঙ্গে পড়ে জিজ্ঞাসা করলো অমিতা।

—খবরটা শুনে যেন জমে গেলেন। এমন জমে বসে থাকতে ও কাকাকে কখনো দেখেনি। ওর কাকা নাকি অত্যন্ত আমুদে আর চঞ্চল প্রকৃতির। বেচারীর মুখ একেবারে কালো হয়ে উঠলো। একটু হেসে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললেন—কি করুণ অবস্থা! বিয়ে করতে বললে কনে পালায়—অদৃষ্টে এ-ও ছিল রে রত্না! নাঃ, এমন নাটকের নায়ক হতে হবে কখনো ভাবিনি।

—কিন্তু এমন জোর আপত্তির কারণটা কি—বললো না রত্না? অমিতা জিজ্ঞাসা করে।

—রত্না বলে সেটা ওর কাছেও রহস্য। এর কারণ ও নিজেও বুঝে উঠতে পারেনি। ওর কাকা অবরণীয় পাত্র নয়। এত দিন ভেবেছিল মমতা নিশ্চয়ই অন্য কাউকে ভালোবাসে; আজই বুঝলে সেটাও ঠিক বোঝা নয়।

—আচ্ছা তারপর?

—তারপর যখন কোথাও খোঁজ মিলল না, তখন শেষ পর্যন্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাটাই সবাই ভাবছে, এমনি এক সন্ধ্যায় চায়ের ট্রে হাতে এসে সবাইকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে ঘরে ঢুকলো মমতা। রত্না বলে তখনকার ঘরের অবস্থাটা ওর সাধ্য নয় বর্ণনা করা। মাসিমার সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে মেয়ে ফিরে পাওয়ার আনন্দ। সে আনন্দে কাঁপছেন তিনি। কাকার মুখ উঠেছে সাদা হয়ে। সাদা ঠোঁট দুটো শুধু পুরুষ মানুষ বলেই হয়তো কাঁপছে না। মা কাঁপছেন রাগে। আর আমি মাকে চিনি—কি যে ঘটিয়ে তুলবেন সেই ভয়ে। কিন্তু যার জন্য এক ঘর লোক সবার ভেতরটা কাঁপছে, এক কাঁপছে না সে। যার জন্য একঘর লোকের সবার ভেতরে ঝড় বইতে সুরু করেছে, এক শান্ত সে। যেন বরাবরের কাজ করে যাচ্ছে ঠিক নিয়মে। যেমনি ট্রে থেকে তুলে তুলে চা ধরে দিত সবার হাতে, ঠিক তেমনি দিচ্ছে আজও। নিলাম সবাই কাকা, আমি, মাসিমা। নিলেন না মা। ও জানতো ওখানেই ঝড়টা আরম্ভ হবে। তাই সব চাইতে শেষে গিয়েছিল মার কাছে। উত্তেজনায় মার তখন শরীর থেকে সুরু করে মুখের চিবুক পর্যান্ত কাঁপছে। নিজেকে শান্ত করতে একটু সময় নিলেন তিনি। তারপর বললেন—কোথায় গিয়েছিলে? কাকা উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। হয়তো এই অপ্রিয় ব্যাপারটা এড়াবার জন্য। মাসিমা ভীরু মিনতি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মার দিকে।

হাতের কাপটা ট্রের উপর রেখে কৌচে গিয়ে বসল মমতা। তারপর জবাব দিল—চাকরীর খোঁজে।

—পেলে?

—পেয়েছি।

—পেয়েছি? স্তম্ভিত মা, স্তম্ভিত আমরা। একটু সময় মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মা বললেন—বি. এ এম. এ সব রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর তোমার গিয়ে দাঁড়াতেই চাকরী জুটে গেল? কাজটা কে দিলো, কি কাজ দিলো? অপেক্ষা করেও উত্তর না পেয়ে চেঁচিয়ে ধমকে উঠলেন—জবাব দিচ্ছ না কেন?

—পাশ করার দরকার হয়, তেমন কাজ পাইনি।

—তোমার চাকরীটার দরকার বুঝি রূপের? ঘৃণায় তার ঠোঁট বেঁকে উঠেছে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মাসিমা। মমতা বসে রইল স্থির ভাবে কোলের ওপর হাত রেখে।

দাঁতে দাঁত ঘষে মা বললেন—এটা জান তো, রূপ দেখিয়ে কাজ নিলে ওটা দিয়েই তার মূল্য দিতে হয়।

উঠে দাঁড়ালো মমতা। আর ক্ষিপ্তের মতো মা গিয়ে দাঁড়ালেন পথ আগলে—উঠলে যে?

—যাবো।

—যাবে? আচ্ছা যাওয়াচ্ছি তোমায়। কাঁপতে কাঁপতে মমতাকে কৌচের দিকে ঠেলে এক রকম ফেলে দিয়ে আমাকে হাত ধরে টেনে বের করে এনে দরজায় তালা লাগালেন মা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—শক্তি থাকে তো যাও এবার। সবাই তোমার মা নয়। দুষ্ট ঘোড়া শায়েস্তা কি করে করতে হয়, তা আমি জানি।

আলমারীর মাথা থেকে ট্যুরিং স্যুটকেশটা টেনে নামিয়ে তাতে জামা-কাপড় ঠাসছিলেন কাকা, সামনে এসে দাঁড়ালো রত্না—এ কি করছো?

—এবার আমিই পালাচ্ছি।

সবিদ্রূপে রত্না বললে—বাঃ, চমৎকার!

ওর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে কাকা মুখ তুলে ঠোঁটের একটা ধার দাঁত দিয়ে চেপে ছেলেমানুষের মতো আবেগ সামলালেন। তারপর বললেন—একটা লোককে আচমকা ঠেলে রঙ্গমঞ্চে তুলে দিলে পালানো ছাড়া আর কি করতে পারে সে?

তাকে থামাতে মুক্তি দিতে হলো মমতাকে। নিজের বর্বরতার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কাকা হাতজোড় করে মমতার কাছে কি যেন বলতে গিয়েছিল, মমতা কিন্তু বললো না। আর এই প্রথম রত্না দেখলো মমতার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। চলে গেল মমতা। কিছু দিন বাদে মেসোমশাই এসে কলকাতায় বাসা করে নিয়ে গেলেন মাসিমাকে। তারপর থেকে আর কোন যোগাযোগ নেই ওদের সঙ্গে রত্নাদের। সম্পর্কটাই উঠে গেছে এক রকম। মা ওদের নামও উচ্চারণ করেন না। রত্নাও ক্ষমা করে নি মমতাকে। সে তার কাকাকে ভালোবাসে। এমন অহেতুক অনাদর ওকেও আঘাত করেছে।

—এসব কত দিন আগের ঘটনা? অমিতা জানতে চায়।

—দু'বছরের বেশী নয় নাকি।

—কাকা এখনও বিয়ে করেন নি?

—না। কিন্তু করবেন রাজী হয়েছেন। কিন্তু সুন্দরী মেয়ে যেন কিছুতেই না হয়—এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

—বাঃ, এ তো হবে চোরের উপর রাগ করে পাতায় ভাত খাওয়া।

—তা হয়তো হবে। কিন্তু একবার ভেবে দেখো, অমন চোরের উপর রাগ করে যদি দেশশুদ্ধ সবাই পাতায় খেতে শুরু করতো, তবে এত দিনে সব চোর সাধু হয়ে যেতে বাধ্য হতো কি না।

কথা বললো না মৌরী—একটিও না। করলো না কোন মন্তব্য। যে বইটা পড়ছিল, সেটাই আবার তুলে নিল হাতে। যেন একটা বই শেষ করে আর একটা বই হাতে তুলে নিল—তার বেশী কিছু নয়।

॥ ৬ ॥

কিন্তু মনের খুঁতখুঁত মিটতে চায় না অমিতার।

মনের ধর্মই এই। আপনকাটা ছকের সঙ্গে বা আপন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে যতদূর চলতে পারে, ঘাড় নাড়তে নাড়তেই এগোয়। কিন্তু তা যদি না হলো তবে আর তার ঘাড় নরম হতে চায় না কিছুতেই। কেবলি খুঁতখুঁত করে, কেবলি প্রশ্ন তোলে— এ যদি তো এ কি করে হলো! তা যদি তো এ কেন হলো না! অমিতার মনেও এমনি একরাশ 'কেনর' ভিড়। কিন্তু ও জানে ওরা দু'বোন পারে, অনেক মানতে না পারা ঘটনা শান্ত মনে মেনে নিতে। কোন 'কেন' নিয়ে প্রশ্ন না তুলে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে অনেক দূর পর্য্যন্ত। তবে সেই বা কেন কৌতূহলে ছোট করবে নিজেকে? মৌরী বই টেনে নিয়েছিল, ও টেনে নিল টেবিলের উপর থেকে দুপুরের অসমাপ্ত কাশ্মীরী কাজের সেলাইটা। মৌরী মন দিয়েছে বই-এ, ও দিল হাতের কাজে। কিন্তু বন্ধ ঘরের আলাপের মতো মুখ-বন্ধ মনও নিবিড় হয় বেশী। কেনর ছোট ছোট ঢেউ মিলিয়ে নিয়ে ওর মন ডুব দিল চিন্তায়। মনে হতে লাগলো, এভাবে ঘর-বাড়ী পরিচিত পরিবেশ আর আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে যে মেয়ে ভয় পায় না, সংসার করার পক্ষে সে মেয়ের সাহসটা কিছু বেশী নয় কি? কি জন্য আর কেনতে দরকার নেই, শুধু এই পারাটাই কি সাংঘাতিক নয়? ওর যে তেমন একটা অবস্থার কথা কল্পনা করতে ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শরীর—কোথায় যাবে জানে না, ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

দোষ দেওয়া যায় না অমিতাকে। পথটা যাদের কাছে এখান থেকে ওখানে, আর এ জায়গা থেকে ও জায়গায় যাবার সাঁকো মাত্র, তারা পথের কাছে কিছু চায় না, সেও তাদের কিছু দেয় না। তারা ভয় পায় সেও তাদের কেবল ভয়ই দেখায়। অমিতা কি করে জানবে, তাকে বিশ্বাস করে যে বেরিয়ে পড়তে পারে তার জন্য সে যে কেবল সৌন্দর্য্য সম্পদ আর তৃষ্ণার জল নিয়েই বসে থাকে তা নয়— হাত ধরে ধরে কত সুহৃদ কত বন্ধুই যে মিলিয়ে দেয়। ঘর যত বলে দেয় কি তত? শান্তি-স্বস্তি, আনন্দ-প্রেম-ভালোবাসা— যেন তার চার দেয়াল ঠাসা ও-সব।

কিন্তু অমিতা যা নিয়ে ভাবছিল। সে ভাবছিল, এই মাত্র মঞ্জুর গল্পের ভেতর দিয়ে ও জেনেছে মমতা শান্ত—মমতা কথা-কম-বলা প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু এই প্রকৃতিগুলো সম্বন্ধেই আবার ওর বিশ্বাস কম, শ্রদ্ধা কম। কথা-বলা মানুষ বলে কয়ে নিজে পরিষ্কার, অপরেরও বুঝতে কষ্ট হয় না তাদের। কিন্তু ঐ চুপ-থাকা মানুষদের আপাত দৃষ্টিতে যত মধুর মনে হয় তত মধু বড় ভেতরে থাকে না। কিন্তু না যায় তাদের বোঝা, না যায় ধরাছোঁয়া। ঠাণ্ডা লড়াই আর ঠাণ্ডা মানুষ অমিতার মনে হয় এক। মমতাকে নিয়ে কি ও এতো মাথা ঘামাতো—কিন্তু মৌরীর যাবার দিন এলো বলে দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক সেই আসবে মঞ্জুরও। থাকতে হবে ওকে— অন্তত যতীন বাবুর জীবিত কালটা তো নিশ্চয়ই। সুখ্যাতি আর যশ অর্জন করে নেবে মমতা তার ঐ চুপ থাকা দিয়ে ওর জুটবে অপযশ। ও যে চুপ থাকতে পারে না। ভালোমন্দ মনে যা হোক বলে-কয়ে খালাস। কিন্তু মুখে কোন সংশয়ই প্রকাশ করলো না সে। যদি ওরা ওকে ভুল বোঝে? যদি ওরা ভাবে রত্নার কাকার ব্যাপারটা নিয়েই মনে খট্‌কা বেধেছে অমিতার, তবে লজ্জার শেষ থাকবে না। আজ আর মনে মুখে এক হয়ে অনেক কথা বলে বসলো না সে। টেবিল-বাতিটার আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে সূক্ষ্ম কাজের নক্সা ভরতে লাগল জামায়।

ওদের দু'জনার মাঝখানে মঞ্জুও চুপচাপ বসে রইলো খানিকক্ষণ। তার পর উঠে নেমন্তন্ন বাড়ীর শাড়ী কাপড় পালটালো। মাথার মস্ত খোঁপাটা থেকে বেলফুলের মালাটা নিল খুলে। ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে সেটাকে মাঝখানটায় ছিঁড়ে ফেলে করলো দু'খানা। তার পর মালা দুটো এনে দিল মৌরী আর অমিতার খোঁপায় জড়িয়ে। ঘাড় কাত করে অমিতার দিকে তাকিয়ে বললো— যাই বলিস দিদি, চেহারাটা কিন্তু অনেকখানি। দেখছিস বৌদিকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে? মালাটা এতক্ষণ আমার মাথায় যেন চোখ বন্ধ করেছিল। এবার সে চোখ মেলে মুখের দু'পাশ দিয়ে কেবল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, যে তাকে সুন্দর করলো আর সে যাকে সুন্দর করলো তাকে দেখতে।

রূপের প্রশংসায় খুশী না হয় কে? অমিতা ওর সুন্দর আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গি তুলে মালাটাকে কাঁটা দিয়ে আটকাতে আটকাতে কিছুটা অনুনাসিক সুরেই বললে—আহা, তোমরা যেন সুন্দর নও? কিন্তু এমন ক্ষেত্রে এটা বলা শোভন বলেই অমিতার এই বলা। নইলে সত্যি সে বুঝে উঠতে পারে না— মৌরী মঞ্জুকে সুন্দর বলা যায় কি না। মৌরীর দিকে আড়-নয়নে তাকালো অমিতা—সুদর্শন বাবুর আর দেরী সইছে না এমনি!

মঞ্জু—তাই! তা তুমি বুঝলে কি করে?

—আহা, ভারি, কষ্ট বোঝা। যেই সুদর্শন বাবু এখান থেকে গেলেন আর অমনি লক্ষ্ণৌ থেকে তার বাবার মত পালটানো চিঠি এলো—যদিও আমার ইচ্ছে ছিল মাঘ মাসেই কিন্তু বিয়েটা অগ্রহায়ণে হয় এটাই এখানকার ইচ্ছে। আর এখানের ইচ্ছেটাই যে শ্রীমানের ইচ্ছে—এটা বোকাও বোঝে।

—চেহারাটা যদি আর একটু খারাপ করতে পারতিস দিদি, তবে ছেলেদের ভালো লাগার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারতিস। কি করবি উপায় নেই। নাঃ, ভাগ্যটা দেখছি সর্ব রকমে আমারই ভালো। 'মুগ্ধ হয়েছি' বলে আমার সাধনায় বিচ্যুতি ঘটাতে কেউ পথ আগলে দাঁড়াবে না। যেদিন সিদ্ধি লাভ করে আমি ওদের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পাবো, সেদিন ওরাই ভীরু চোখ তুলে আমায় জিজ্ঞাসা করবে— 'দেখো তো—আমায় ভালো লাগে কি না?' হাসিমুখে আলনা থেকে শাড়ী টেনে নিয়ে মঞ্জু গিয়ে ঢুকলো স্নানের ঘরে। স্নানের ঘর থেকে ভেসে আসতে লাগলো গুন্‌-গুন্ করে গাওয়া গানের মতো গুন্‌-গুনে আবৃত্তি—

'ওগো বাঁশিওয়ালা,
বাজাও তোমার বাঁশি'—

জল-ঢালা আর থামার সঙ্গে সঙ্গে কখনো মঞ্জুর গলা স্পষ্ট কখনো ঢেকে যায় জলের শব্দে। আর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেই সঙ্গে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে—

'আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক— '

আবৃত্তি করতে জানে মঞ্জু। সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে মৌরীর—

'ওগো বাঁশিওয়ালা,
বাজাও তোমার বাঁশি,
তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এলো ঘোমটা-খসা নারী
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির—'

ফিটফাট হয়ে এসে ফের বসলো মঞ্জু মৌরীর কাছে। অমিতা অনেক আগেই চলে গিয়েছিল। মৌরীকে বললো—বইটা রাখবি একটু?

মঞ্জুর আবৃত্তিতে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় ভরপুর মৌরীর। ধীরে ধীরে বললো—বই আমি পড়ছিনে। কিন্তু কেন? আবার বাকী রইল কি?

— সব চাইতে বড় কথাটাই বাকী রয়ে গেছে।

হাতের বই আঙুলের চাপে বন্ধ করলো মৌরী।—সব চাইতে বড়? তবে বাকী রাখলি কেন?

—বৌদির জন্য। ওর খারাপ লাগত। কিন্তু তোর আবার তেমনি ভালো লাগবে।

উৎসুক হল মৌরী—শুনি।

এই রাতেও চুল ভিজিয়েই স্নান করে এসেছে মঞ্জু। সেই ভিজে চুল থেকে কয়েক ফোঁটা জল নেবে এসেছিল ঘাড় বেয়ে। আঁচল তুলে সে জল মুছতে মুছতে বললো—'মাসীর রূপ দেখিয়ে কাজ নিলে ওটা দিয়েই তার মূল্য দিতে হয়' এ কথার জবাব না দিয়ে মমতা চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল,—সত্যি কথাটা তা নয়। জবাব দিয়েছিল মমতা—অসম্ভব কড়া জবাব! মাসীর কথায় সোজা তার দিকে তাকিয়ে নাকি বলেছিল,—ওরা ওকে যে কাজটা দিতে চাচ্ছেন সেটাও তো ঐ রূপেরই জন্য। হতবুদ্ধি মাসীর মুখে কথা বেরুতে চায় না—তারা যে কাজটা ওকে দিতে চাচ্ছেন ? মমতা কি বিয়ের কথা বলছে ? তাই বলছে। আর এর পরই নাকি রাগান্ধ মাসীর ঐ তালাচাবি-টাবির ব্যাপার।

রত্নার কাকার সুন্দরী মেয়ে বিয়ে না করবার প্রতিজ্ঞার পেছনের রহস্য স্পষ্ট হলো মৌরীর কাছে। আঙ্গুলের চাপ থেকে বইটা নামিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললো—এতক্ষণ ভাবনার কিছু আছে ভাবিনি। ভেবেছি, কুড়ি-একুশ বছর বয়সটায় কেউ লাফ দিয়ে এসে হাজির হয় না। আর এ ত নয় যে, বিয়ের রাত থেকে জীবন খাতার পাতায় লেখা শুরু হয়। গত পরিচ্ছেদে যা আছে—আছে। এটুকু বুঝতে পারাই যথেষ্ট হয়েছে, গত পরিচ্ছেদের গল্পে মেয়েটি যে মুনশীয়ানা দেখিয়েছে তার কাছে কাঁচা গল্প পাবো না। কিন্তু এখন ভাবনায় পড়ে গেলাম।

মঞ্জু ভেবেছিল অসম্ভব খুশী হয়ে উঠবে মৌরী। ওরই মন মতো কথা তো। আর ওই কি না উল্টো কথা বলছে! কারণটা কি?

—মাসীর মুখের উপর যে মেয়ে বিয়েটাকে রূপযৌবনের বিনিময়ে খাওয়া-পরার কাজ বলতে পারে, সে মেয়ে সেজে বসে সেই রূপের পরীক্ষার ভেতর দিয়েই আবার বিয়েতে রাজী হয় কি করে ? আচ্ছা, যদি ধরেও নিই—বিয়ের প্রতি নয়, এই বিয়েটাতে মত ছিল না মমতার। আর অমন জোরালো জবাবটা সে মাসীর অসম্মানকর কথার ফিরতি জবাব দেবার জন্যই দিয়েছে। তবু ভাববার কথা থাকে। যে পাত্রে যতটা ধরে তার তার চাইতে বেশী ঢাললে শুধু নিজে নষ্ট হয় না—অনেকটা জায়গা জুড়ে নিয়ে নষ্ট হয়।

পাত্রের বেলাও ঠিক তেমনি। তাই ভাবছি, ছোড়দার পক্ষে না বেশী হয়ে যায়।

—তোর পাল্লা-বাটখারার মাপ বিয়ের বাজারে চালু হলে আর কাউকে বিয়ে করতে হবে না। একটি আশ্রয়হীনা মেয়ে মার হাত ধরে এসে আশ্রয় নিল মাসীর কাছে। মাসীর বিত্তবান বুদ্ধিমান দেওর তাকে ভালোবাসল, বিয়ে করতে চাইলো। একে ভাগ্য না মেনে যে মেয়ে ভাগ্য অন্বেষণে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে, তাকে আমি নমস্কার করি।

অমিতার খেতে আসবার ডাক কানে এলো। উঠে দাঁড়ালো মৌরী। বললো—এতটা আমি স্বীকার করতে পারছি না মঞ্জু!

— কেন?

—নিজে ভাগ্য জয় করলো সে কোথায় ? অপর দশ জন মেয়ের মতো বিয়ে দিয়েই তো সে তার ভাগ্য জয় করতে যাচ্ছে। এককে পছন্দ হয়নি অন্যকে—এই তো?

উঠে দাঁড়ালো মঞ্জুও। বললো—তোর এই 'এককে পছন্দ হয়নি তাই অন্যকে—এই তো।' এই 'এই তো' কথাটা ছোট্ট হলেও কাজটা ছোট্ট নয়। এর জন্য বাড়ী ছেড়ে পথে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে – যে কাজটা খুব সহজ নয়।

> 'বাংলাদেশের মেয়ে...
> অন্তরে বাহিরে মিল হয়নি—
> সেকালে আর আজকের কালে,
> মিল হয়নি মাথায় আর বুদ্ধিতে
> মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়—'

এমন দেশে ইচ্ছার সঙ্গে শক্তি আর সাহস দেখলে হাত আপনি কপালে উঠে আসে নমস্কার জানাবার জন্য। তার চলার পথটা আমার মতের সঙ্গে মিলল কি মিলল না, তার কিচ্ছু দরকার নেই।

এমন অনেক সময় হয়, কোন বিশেষ একটা গান বা বিশেষ একটা কবিতা ঘুরে-ফিরে কেবল মনের ভেতর যাওয়া-আসা করে। কে জানে সে সময়কার মনের অবস্থার সঙ্গে সে আসা-যাওয়ার কোন মিল থাকে কি না। কিন্তু মঞ্জুর বাঁশিওয়ালা আজ তার বাঁশি কিছুতেই থামাচ্ছিল না। অনেক রাত পর্য্যন্ত ছাদে ঘুরে বেড়ালো একা-একা—

'....বাঁশিওয়ালা
বাজাও তোমার বাঁশি
শুনি আমার নূতন নাম'—

পরের দিন আব্দারে ভেঙ্গে পড়লো মঞ্জু—চল দিদি, মমতার সঙ্গে একদিন আলাপ করে আসি। ছোড়দা'টা থাকলে ভালো হতো। ওকেও নিয়ে যেতাম। তুই কাছে বসে ঢালাঢালি করে দেখতে পারতিস পাত্রে ধরবে কি ধরবে না। কিন্তু ওতো আসবে সেই তার বিয়ের আগে। চল আমরা একদিন ঘুরে আসি। যাবি?

—দু'দিন বাদেই তো আসছে আমাদের এখানে। যত খুশী আলাপ করিস। এখন থাক।

—দু'দিন বাদে! এক মাসের উপর তো তোরই বিয়ের বাকী। আরো দেরী হতে পারে ছোড়দা'র—মাত্র কাজে যোগ দিয়েছে, ছুটি না পাওয়ারও নাকি সম্ভাবনা প্রচুর। একটু আলাপ-পরিচয় করে বাড়ীতে নিয়ে আসতে দোষটা কি? ইচ্ছে করে না তোর?

আমার ইচ্ছে করে না। মাথা নাড়লো মৌরী। এই বাড়ী-টাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া যদি বাবার কানে ঢোকে তবে বিয়ে হওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ছুতোর সূতোটুকুও তিনি পেলে ছাড়বেন না।

কিন্তু ধৈর্য্য ধরা মঞ্জুর কুষ্ঠিতে নেই। মনে হলে আর অকারণ অপেক্ষা সহ্য হয় না ওর। আচ্ছা বেশ তো, বাবা না হয় নাই জানলেন।

দু'বোন লুকিয়ে—যদিও মৌরীকে কথা দিয়ে সে কথা অমিতা পুরো রেখেছে। মমতার সেদিনের গল্প বলেনি, এমন কি জয়দেবকেও নয়। তবু তাকেও না জানিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লো মৌরী মঞ্জু মমতাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

—পথ চিনবি?

—কেন চিনব না? যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সামনে বাস থেকে নামবো। একটা রিক্সা নেবো। রিক্সাকে বলবো, চলো স্কুল-বাড়ীটার কাছে। ওখানে গেলে ঠিক আমি চিনে যাবো বাড়ী।

—তার চাইতে চল একটা ট্যাক্সি নিই। একেবারে যাদবপুর স্কুলে নিয়ে যেতে বলব। নইলে যদি ষ্টপেজ ভুল করে ফেলিস?

—ট্যাক্সি! বলিস কি! ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হবার প্রবাদ আছে। তুই যে সুদর্শন বাবুর গাড়ীর কথা শুনেই খোঁড়া হলি। ওঠ—ওঠ। বাসটা এসে দাঁড়াতেই ঠেলে মৌরীকে তুলে দিয়ে নিজে উঠল। ঘড়ির দিকে নজর রেখেই বেরিয়েছিল ওরা, যেন অফিস ভিড়টা শুরু হয়ে না যায়। তাই ভর্তি থাকলেও ভিড় ছিল না গাড়ীতে। বসতে পেলো। কিন্তু কতক্ষণ! দু-তিনটা ষ্টপেজ পার না হতেই ভরে উঠল গাড়ী। দু'টি প্রৌঢ়া মহিলা এসে দাঁড়ালেন ওদের আসনের হাতল ধরে। শরীরটাকে শক্ত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করছিলেন তারা। কিন্তু ঝর ঝরে বাসটা ঝাঁকানি দিতে দিতে চলেছিল, তাদের সর্বশরীর গাড়ী থামা-চলার সময়গুলোতে বেটাল হয়ে পড়তে পড়তে সামলাতে হচ্ছিল বহু কষ্টে।

উঠে দাঁড়ালো মৌরী-মঞ্জু। হাত দিয়ে নিজেদের আসনটা দেখিয়ে দিয়ে বললো—বসুন আপনারা এখানে।

যেন বেঁচে গেলেন এমনি ভাবে বসে পড়লেন মহিলা দু'টি। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন—বেঁচে থাকো মা।

দাঁড়িয়ে রইলো ওরা দু'টো আসনের হাতল ধরে। বাসের ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে ওদের শরীরটাও ঝাঁকানি খেতে লাগল, এক-বাস লোক। ঘাড় শক্ত করে কেউ সামনের দিকে কেউ আশ-পাশের দিকে তাকিয়ে। যেন ভেতরটা তাদের চোখের বাইরে—চৈতন্যের বাইরে। তারা বসবার সময় দস্তুরমতো দেখে বসেছে লেডিস্ সিটে বসেনি। তারপর প্রৌঢ়া দু'জন ঝাঁকানির সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কি না তারা দেখেনি, এখনও তারা দেখছে না দু'টি মেয়ের এই কষ্টসাধ্য দাঁড়িয়ে থাকা।

হাসি পেলো মঞ্জুর। এই করে ছেলেরা ট্রামে-বাসে। কিন্তু অমন ঘাড় টান করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকার ভেতর কেমন যেন একটা গায়ের জ্বালা-জ্বালা ভাব প্রকাশ হয় না? সব তাতেই তো সমান, তবে আবার কি।' ঘাড় এর চাইতে বেশী বলতে পারে না। মুখ খুলবার সুযোগ দিলে যেন সবিদ্রূপে বলে উঠবে—সমানাধিকারের দাবী তুলছ, আদায়ও করছ। এখন তোমরা অবলা নও সবলা। বলের সঙ্গে চলো, বলো, হাঁটো—প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো। ট্রামে-বাসের এই সামান্য মেয়েলি চাহিদাটুকু ছাড়তে পারো না কেন?

ঠিক তক্ষুণি যে কথাগুলো এই ভাবে চিন্তা করেছিল মঞ্জু তা নয়। স্টপেজে স্টপেজে গাড়ী থামছিল, ভিড় বাড়ছিল। দু'দিক থেকে ঠেসে ধরা চাপ থেকে শরীরটাকে একটু হলেও আলগা রাখবার চেষ্টায় নিজেদের সংকুচিত করতে করতে এইজাতীয় কতগুলো কথাই ওর মনে হচ্ছিল—নারীত্বের চাওয়া বলে যে কতগুলো চাওয়া আছে, সে চাওয়াগুলোকে কি সমানাধিকারের বিদ্রূপে অসম্মান করা চলে? এই নারীত্বের চাওয়ার ভিড়ের চাপ থেকে শরীরটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হয়। জীবনের সমস্ত পথ সমান পায়ে চলেও এমন সময় আসে যখন নারীকে ব্যথায় থমকে দাঁড়াতে হয় তার সন্তানের জন্ম দিতে। তখন কি তাকে বলা চলে—থামলে চলবে না, সমানাধিকারে সমান চলতে হবে?

প্রৌঢ়া মহিলা দু'টি বার বার মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর ওদের অবস্থা দেখে যেন নিজেরা লজ্জিত হয়ে উঠছিলেন। আসনে বসে-থাকা মানুষগুলোর প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন যেন নিজেদের ছেলে ভাই বা ভাগ্নে হলে কানে ধরে তুলে দিতেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বোস মা তোমরা। আমরা সামনের স্টপেজেই নামবো।

—সামনের স্টপেজে? যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কাছে?

—হাঁ মা।

—আমরাও সেখানেই নামবো।

গাড়ী থামলে ভিড় ঠেলে নেমে মহিলা দু'জনকে নামতে সাহায্য করলো ওরা। আজকালকার শিক্ষিত মেয়েরা যে কত ভালো হয়, মনে হলো তারই আলোচনা করতে করতে দু'জনে গিয়ে একটা রিক্সায় উঠে বসলেন। মঞ্জুও একটা রিক্সা নিল। মৌরী জিজ্ঞাসা করলো—এখন?

—এখন? রিক্সাওলাকে নির্দেশ দিল মঞ্জু—চলো স্কুলবাড়ীর কাছে। ঘড়িটা চোখের সামনে ধরে বললো—ছ'টা বেজে গেছে। এক ঘণ্টার উপর লেগে গেছে রে দিদি! আর দেখেছিস কেমন ঝট করে সন্ধ্যা হয়ে যায়!

—ফেরবার সময় তো রাত হয়ে যাবে, তখন কি করবি?

—ওঁরা আমাদের বাস পর্যান্ত নিশ্চয়ই তুলে দিয়ে যাবেন। তারপর তো নামবো বাড়ীর দোরগোড়ায়। রাত কি করবে আমাদের?

—তোকে কোন কিছুই করতে পারবে না।

—তুই চটেছিস আমার উপর?

বোনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো মৌরী। বললো—চটেছিই তো। এই ভিড়ের ভেতর ভাতসেদ্ধ হয়ে নেবে—রিক্সা করে ধূলো খেতে খেতে এই ভরা সন্ধ্যায় দু'জন হাজির হবো—পাগল ভাববে ওরা।

মঞ্জু মৌরীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগলো—বড়লোক মেজাজ এসে গেছে তোর। ভিড়, ধূলো, রিক্সায় মন বিগড়াতে আরম্ভ করেছে। বুঝলাম তোর সঙ্গে আমার বেড়ানোর পাট ঘুচলো।

আঁচলটা রিক্সার চাকায় আটকে যাবার মতো হয়েছিল সেটা তুলে কোমরে গুঁজে ভুরুতে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকা টান দিয়ে মঞ্জুর দিকে তাকালো মৌরী—মানে?

—মানে—তোর গাড়ীতে আমি চড়বো না। তুইও রিক্সায় উঠবিনে।

—আমি রিক্সায় উঠব কি না সে কথা থাক, তুই আমার গাড়ীতে উঠবিনে কেন?

—তারপর ভিড়, ধূলো, রিক্সা আর সহ্য হতে চাইবে না তাই।

রেল লাইনটা পার হয়ে কিছুটা ভেতরে ঢুকতেই যেন গ্রামে এসে পড়লো ওরা। ছোট-ছোট টিনের, কাঠের, মাটির বাড়ী। জবাফুল, গাঁদাফুল আর কলাগাছের ঝাড়, পুকুর। বাস থেকে নেমে যে বেলাটুকুর দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল—সন্ধ্যা হয়ে এলো বলে, এই পথটা শেষ না হতেই সেই সন্ধ্যা নেমে এলো। পথের আলোতে রাস্তা স্পষ্ট কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে গেল আশ-পাশের পুকুর-ডোবা-বাড়ী-ঘর-গাছপালা। এতটা ঝট করে সন্ধ্যা নেমে

আসবে মঞ্জু তা বুঝতে পারেনি! দিন যে ছোট হয়ে আসছে এ খেয়াল ওর ছিল না। কোথাও রাস্তার মোড়ে কোথাও ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে ছেলের দল। ওদের দিকে চোখ পড়লে যতদূর অনুসরণ করা যায়, অনুসরণ করতে লাগলো চোখে।

—আহা দিদি, তোকে যাদবপুর টি. বি হাসপাতালটা দেখি দিতে ভুলে গেলাম। বেশ মস্ত। তবু কিছু নয়। বাংলাদেশটার জন্য বাংলাদেশটা জোড়া একটা দরকার কি না?

—তুই কি এদিকে আসিস নাকি? মৌরীর দৃষ্টিতে সন্দেহ।

—এ তো যাদবপুর। আমি না যাই বিশ্বের কোথায়—অবশ্যি মনে মনে। টাকা নেই যে।

রিক্সাওলা রিক্সা থামিয়ে জানালো—এই স্কুলবাড়ী। আর মৌরীকে আশ্চর্য করে দিয়ে দু'-একবার এদিক-ওদিক নির্দেশ চালিয়ে মঞ্জু ঠিক গিয়ে মমতাদের বাড়ীর দরজায় নেমে রিক্সা-ভাড়া চুকিয়ে দিল। চারিদিক অন্ধকার। ঝিঁঝিপোকার ডাক, ব্যাঙের ডাক আর জ্বলছে-নিবছে জোনাকির আলো। বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো না ঐ অন্ধকার বাড়ীতে কোন মানুষজন আছে। বাড়ীটা একরকম প্রান্তঘেঁষা। সামনের জমিগুলিতে দু-একটা বাড়ী তৈরী হচ্ছে মাত্র। কোনটা কিছু উঠছে, কোনটার সবে একতলার ছাদ পড়েছে। আর দরজা-জানালা-শূন্য ঘরগুলোর ভেতর চাপ চাপ অন্ধকার ঢুকে যেন জমাট আসর বসিয়েছে।

—কেউ যদি বাড়ী না থাকে? মৌরীর গলা শুকিয়ে কাঠ।

—কি হবে? বারান্দায় উঠে কড়ানাড়া দিল মঞ্জু। এ বাড়ীতে না থাকে, ঐ যে আলো দেখছিস ওখানে আছে। আঙ্গুল দিয়ে মঞ্জু দূরের একটা আলোজ্বলা বাড়ী দেখিয়ে দিল।—রাস্তার দু'পাশটাও নিশ্চয়ই জনমানবশূন্য দেখে আসিসনি। ঐ মোড়ে একটা রিক্সা-স্ট্যাণ্ড আছে, তাও দেখেছিস নিশ্চয়ই। আবার কড়ানাড়া দিল। এবার ঘরে বাতি জ্বলে উঠল। জানালা দিয়ে একটা আলো এসে ছড়িয়ে পড়লো ওদের গায়েও। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাও খুলে গেল—কে? যিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন, ওদের সামনে সরে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবার জায়গা দিয়ে আহ্বান করল আসুন।

ওরা দু'জনে ঘরে ঢুকলো। এ যে মমতার দাদা, এটা বলে দেবার দরকার হয় না। এক চেহারা। শুধু বোনের চেহারা যেমনি মেয়েলী ভাই-এর চেহারা তেমনি পুরুষোচিত। বোনের দেহগঠন যতটা কোমল ভাই-এর দেহগঠন ততটা কঠিন। ওরা চিনল। কিন্তু এ চিনলও না বুঝতেও পারলো না এরা কে। মমতার বয়সী দেখে ধরে নিয়ে থাকবে তার কাছেই এসেছে, তাই বললো—মমতা তো বাড়ী নেই। তবে এক্ষুণি হয়তো ফিরবে। মাকে ডেকে দিচ্ছি। বসুন আপনারা।

বুঝে উঠতে পারলেন না প্রথমটায় মা-ও। সেই তো একদিন দেখেছেন। আর ব্যাপারটাও তো একেবারেই অভাবনীয়ও তার কাছে। ওরা পরিচয় দিতে বুড়োমানুষের ভীমরতি ধরার উপর গাল-মন্দ করতে করতে হাত ধরে সাদরে এনে বসালেন। বললেন—তোমাদের বসাবো, তেমন কিছু কি আমাদের আছে?

—আমরা কিন্তু বড়লোক নই। তেমন কিছু ভেবে থাকলে কিন্তু বড্ড ভুল ভেবে রেখেছেন।

মঞ্জু মৌবীকে দেখিয়ে বললো—ও 'আমরা' বলে আমাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বললেও আর বেশী দিন ও আমাদের এই 'আমরার' ভেতর থাকছে না। তবে এটা সত্যি আমরা বড়লোক নই।

—আর বড়লোক গরিব! আমরা তো আজ ভিক্ষুক মা! ঘর-বাড়ী পুকুর-বাগান সব ফেলে এসে আজ আমরা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়েছি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, থাক ও সব কথা।

মঞ্জু বললো—আমার কিন্তু আগ্রহ লাগছে শুনতে। আমরা যদিও দেশছাড়া, বহু দিন। তবু ওখানকারই মেয়ে। জন্মেছিও সেখানে।

—তাই বলো। নাড়ীর সঙ্গে যোগ থাকলে সে যোগ কি ছেঁড়া যায়? মায়ের সঙ্গে সন্তানের যোগ দাই-এর কাঁচিতে কি কাটা পড়ে? এই যে আসা এ যেন টেনে ছিঁড়ে তুলে নিয়ে আসা। খাওয়ায় স্বাদ পাইনে, বাতাস ঠাণ্ডা লাগে না। জল বিস্বাদ। মনের মিল খুঁজে পাইনে কারু সঙ্গে। আত্মীয়-পরিজনের চেহারা পর্যন্ত ঠেকে আরেক রকম। যেন তারাই সব চাইতে পর। কোথাও যেন প্রীতি নেই, প্রাণ নেই মা তোমাদের এখানে।

ওরা বুঝলো এই কথাগুলো মমতার মার মনে এমন অবস্থায় আছে যে, প্রথম নাড়ায়ই সেগুলো বেরিয়ে আসে। নইলে ইনি এত কথা বলার লোক নন।

হলোও তাই। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন—আমার ছেলের সঙ্গে তোমাদের আলাপ নেই। ও কিছু দিন এখানে ছিল না। বলে ডাক দিলেন—নীল, একবার এসো এ-ঘরে।

॥ ৭ ॥

নীল।

নামটা মজার ঠেকল মঞ্জুর কাছে। মার উদ্দিষ্ট ঘরের দিকে তাকাল সে। দুটো ঘর পাশাপাশি। মাঝের দরজায় ঝুলছে একটা পুরোনো শাড়ীকাটা পর্দা। কোন আবরু রক্ষা করতে পারছে না সে, তবু তার থাকাটা একেবারে নিরর্থকও নয়। চোখের কাজ না করলেও মনের কাজ করছিল। খোলা দরজা—ওটা আছে বলেই না ওরা অমন মুখ বরাবর বসে থাকতে পারছে। অবশ্যি এটা ওদের দিক, উল্টো পক্ষের তাতেও কিছু এসে যেত বলে মঞ্জুর মনে হ'লো না। ওর চঞ্চল দৃষ্টি আরো দু-একবার ওদিক ঘুরে এসেছে। তখনো দেখেছে, এখনো দেখলো, টেবিলের কাছে একটা হাত-ভাঙা চেয়ারে বসে সে যেন কি লিখে চলেছে—সামনে ছড়ানো মোটা মোটা কয়েকখানা বই। হাতের কলমটাকে যে ভাবে ছোটাচ্ছে, তাতে প্রাণী হ'লে মুখে তার ফেনা ঝরতো।

মার প্রথম ডাকে কোন সাড়া মিলল না তার কাছ থেকে! দ্বিতীয় ডাকে যে জবাবটা সে দিল সেটাও অভ্যাসের জবাব, যে অভ্যাসে ঘুমন্ত মানুষও অনেক সময় সাড়া দিয়ে ওঠে। তৃতীয় ডাকটা মাও দিল যেমন জোরের সঙ্গে, ছেলেও মুহূর্তে হাতের কলম নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আসছি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! ডান হাতটা মাথার ঘন চুলের ভেতর চালাতে চালাতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সামনের খোলা বইটার পাতা ওলটাতে লাগল সে। মা উল্‌টিয়ে থাকা পরদার পাশ দিয়ে ছেলের দিকে একটা অসন্তুষ্টি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ছেলে আবার চেয়ার টেনে বসে পড়ে কলম তুলে নিল হাতে।

মা উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন এবার—আশ্চর্য্য ডাকলে একবার উঠে আসা না পর্য্যন্ত! মমতা বাড়ী নেই, ওরা দুটি মমতার ননদ। যা হোক একটা চা-জলখাবারের ব্যবস্থা ক'রতে হবে আমায়। তুমি না এলে, ওদের একা ফেলে আমি যাই কি ক'রে? নিজের কাজ ছাড়া সব কিছুতে অবহেলা তোমার দিনদিন কেবল বাড়ছেই।

এতক্ষণে নীল সত্যি এ ঘরে এলো—যদিও ঘরে বসে লিখছিল সে। কিন্তু যেখানে বসে লেখে, লেখক কি সেখানে উপস্থিত থাকে। ঔপন্যাসিককে কি তার উপন্যাস পরিমণ্ডলের বাইরে খুঁজলে পাওয়া যায়? অভিযাত্রী যখন মেরুঝড় অতিক্রম করে, সমুদ্র, বরফ, পাহাড় ডিঙোয় তখন কি ভৌগোলিকই চেয়ারে থাকেন? ভারত ত্যাগের সময় ইংরাজ প্রতিনিধির সঙ্গ ছাড়তে চাচ্ছে না যে ঐতিহাসিক, ডাকলেই কি সে হাজির হ'তে পারে? অপ্রতিভ ভাবে উঠে দাঁড়ালো নীল, ও ঘর থেকেই একবার তাকালো, এ ঘরে উপবিষ্ট দুই বোনের দিকে, তারপর এসে ঢুকল এ ঘরে। সে জানে মার কথাগুলো বেশ স্পষ্টই শুনতে পেয়েছে ওরা। তাই কাছে এসে নমস্কার জানিয়ে বললো—অবহেলা শব্দটা মা এখানে ঠিক ব্যবহার করেন নি, বুঝতেই পারছেন। এটা মার আমার প্রতি তাঁর সাংসারিক নালিশের শব্দ এবং আজকের সকালেরই কোন অপরাধের। আমি কি করে জানব বলুন, আপনারা এ বাড়ীর এমন বিশিষ্ট অতিথি .

প্রতি-নমস্কার জানাতে গিয়ে ওরা লক্ষ্য ক'রল, এমন আশ্চর্য্য নীল চোখ আর কখনো দেখেনি। কোণের দিকে রাখা ছিল, তেলময়লায় কালো একটা ইজিচেয়ার। বোঝা যায় বাড়ীর কর্তার বসবার জায়গা সেটি। কারণ পাশেই রাখা আছে তামাক, টিকে, গড়গড়া। ব্যবস্থা নিজের হাত বাড়িয়ে ভরে নেবার, ভ'রে দেবার নিশ্চয়ই কেউ নেই। নলটা ইজিচেয়ারেই পড়েছিল। সেটা তুলে, গড়গড়ার গায় পেঁচিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করলো নীল—আমাদের এই বন্-বাদাড়ে বাড়ী চিনে আপনারা এলেন কি করে?

—রাস্তাঘাট চিনতে ওর জুড়ি নেই। মঞ্জু মৌরীকে দেখালো।

মৌরী বলল—আমরা এসেছিলাম আর একদিন।

—তাতে কি হয়? আমার এক বন্ধু দু'দিন এসেছে আমার সঙ্গে। এখনও রাতে আসবার কথা ব'ললে আঁতকে ওঠে।

—বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

—কেন? বিস্মিত চোখে তাকাল নীল।

—ছেলেদের অমন ভীরু হওয়া মানায় না।

হাসিমুখে বলল নীল—তা ঠিক্। কিন্তু আপনি করবেন কি তার? ভয় কমাবার মন্ত্র জানেন না কি?

—মন্ত্র? না। মাথা নাড়ল মঞ্জু। ওঝার বিদ্যে আমার নেই। আপনার বন্ধুকে তো আমি চিনিনে, ওঝা-বদ্যির আওতা পার হয়েছেন নিশ্চয়ই?

হেসে উঠল নীল। কী জবাব দিত সে, কে জানে। মার ডাক শুনে আসছি বলে উঠে গেল। মঞ্জু তাকালো মৌরীর দিকে, মৌরী, মঞ্জুর। মৌরী বলল,—কথা তুই বেশী না ব'লে একেবারেই পারিস না।

তা সে পারে না, চটপট স্বীকার করে নিয়ে মঞ্জু বললো—দিদি দেখে আসি ভদ্রলোক কি লিখছেন—এ্যাঁ? প্রায় উঠে দাঁড়ায় সে।

বাঁধা দিল মৌরী—ছটফট করবিনে মঞ্জু। গা ছেড়ে বসে বলল—এত ফ্যাঁকড়াও বের করতে পারিস তুই।

বসে রইল দু'বোন চুপচাপ। কিছু করবার না থাকলে চোখ এদিক-ওদিক ঘুরবেই। ওদের দৃষ্টিও ঘুরে ফিরে গিয়ে পড়তে লাগল রান্নাঘরে। একটা নীচু পাওয়ারের লালচে আলোতে বসে চা তৈরী করেছেন মমতার মা। মাঝে মাঝে একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাঁর গিয়ে পড়ছে বাইরের দিকে। তিনি জানতেন মমতার ফিরতে রাত দশটা বেজে যাবে। ততক্ষণ কিছুতেই ওরা বসবে না। তবু শঙ্কিত হচ্ছিলেন তিনি, এমন তো হয় মাঝে মাঝে, যে সময় বলে যায় তার চাইতে অনেক আগে এসে পড়ে। যদি আজ তাই হয়। বুকটা ধক্‌ধক্ শব্দ ক'রে ওঠে তাঁর। আরো তাড়াতাড়ি হাত চালান তিনি। নীল বাজার থেকে খাবার নিয়ে এলে, মা-ছেলে এক সঙ্গেই ঘরে এসে ঢুকলো। ওদের সামনে চা, মিষ্টি ধ'রে দিয়ে মা কৃতজ্ঞ-ঝরা কণ্ঠে ছেলেকে বললেন—ওদের দু'বোনকে আমি কি ব'লে যে আশীর্ব্বাদ করব জানি নে। জানি তো ওদের বাবার একটুও মত ছিল না। থাকবেই বা কেন, কে চায় সেধে গরীবের মেয়ে আনতে। শুধু ওদের দু'বোনের জন্যই—

—না, না, তা কেন? বাবার নিজেরই খুব ভালো লেগেছে মমতাকে। ব'লে উঠল মৌরী। আর মঞ্জু লক্ষ্য করলো মার কথায় নীলের ভ্রূতে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়েছে।

কিন্তু সেদিন মমতার সঙ্গে মৌরী-মঞ্জুর দেখা হ'লো না—আটটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও না। মঞ্জুর কোন আপত্তি ছিল না বসবার বরং ইচ্ছেই ছিল। সবে তো আটটা। ওরা তো হামেশাই দশটায় বাড়ী ফেরে। এই অচেনা পথটুকু? তা হয় রিক্সায় যাবে, নয়তো এঁরা কেউ বাসে তুলে দিয়ে আসবেন। আর একদিন আসবে—আরো দশ দিন ওরা আসতে পারে—কিন্তু আজকের আসাটা তো বৃথা হবে। কিন্তু ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে কোন ভরসা পাচ্ছিল না মৌরী। ওর মনে হচ্ছিল ঘড়ির ঐ 'আটটা' ভুল—ওটা বন্ধ হয়ে আছে। এখন গভীর রাত—নইলে রাত আটটায় রাস্তা কখনো এমন স্তব্ধ ভাব ধরে? চার দিক থেকে আসছে শুধু ঝিঁঝি পোকার আর ব্যাঙের ডাক, যা আরো বন্য ক'রে তুলছিল অন্ধকারটাকে। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে একেবারে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মৌরী—আজ উঠবো আমরা?

ওরা জানল না, মা মনে মনে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। বললেন—আগে একটা রিক্সা নিয়ে আসুক নীল।

মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়ে বলল—যেখান থেকে রিক্সা আনবেন, সেখান পর্য্যন্ত যদি আপনার সঙ্গে আমরা যাই। তবেই তো আমাদের একেবারে বাসে তুলে দিতে পারেন—তাই না?

কাছেই যে একটা রিক্সাস্ট্যাণ্ড আছে মঞ্জুর মনে ছিল না। নীলের ভোলবার কথা নয়—সে সেখান থেকেই রিক্সা আনতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে কিছু বলল না। গায়ে পাঞ্জাবী চড়িয়ে এসে বলল—চলুন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের স্তব্ধতা এবং অন্ধকার কোনটাকেই তেমন ভীষণ বলে মনে হ'লো না মৌরীর। আকাশভরা অসংখ্য তারা! তারা কেউ অন্ধকার নয়—নীরবও নয়। কিছু বলছে। কি বলছে? বলছে কি—ঘরে একটা-দুটো বাতি জ্বেলে বসে বসে কি পাহারা দাও? বাইরে যে সহস্রবাতি জ্বেলে বসে আছি আমি তোমাদের জন্য।—ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের উপর দিয়ে বয়ে শরীর ঠাণ্ডা ক'রে তুললো। গাছের পাতার ঝির-ঝির শব্দ সঙ্গীতের মত শোনাতে লাগল কানে। পায়ের নীচে কাঁচা মাটির পথ! আসবার সময় ধুলো আর ঝাঁকুনিতে যে অসহ্য ক'রে তুলেছিল, তাকেই এখন মনে হ'তে লাগল, নরম শরীর বিছিয়ে রেখেছে ওদের চলার জন্য। কিছু দূর গিয়ে এই কাঁচা পথটা কালো চওড়া পীচঢালা রাস্তার সঙ্গে মিলেছে। একটু থমকালো মৌরী—হৃদয়শূন্য একটা শহুরে হাত যেন একটি ভীরু গ্রাম্য মেয়ের হাত চেপে ধরে আকর্ষণ করছে। খালি রিক্সাগুলো ওদের কাছে এসে গতি মন্থর করে, বেল বাজিয়ে যেন জিজ্ঞাসা করে যেতে লাগল—নেবে নাকি? পথ অনেকটা। যখন বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছল, মঞ্জু মৌরী দুজনেই তখন ঘেমে জল।

নীল বললো—একটা রিক্সা নেওয়াই উচিত ছিল, খুব কষ্ট হয়েছে আপনাদের।

বাসের নম্বরের দিকে দৃষ্টি রাখতে রাখতে মঞ্জু বললো—ওর হয়েছে, হাঁটাটাকে ও ভয় করে।

একটা বাস ঠাসা ভীড় নিয়ে এসে দাঁড়ালো—তার দিকে তাকিয়ে সেটাতে ওঠার চেষ্টা ক'রল না ওরা। পাঞ্জাবী ড্রাইভার দুজন, দাঁড়াবার মত ফাঁকটুকুর দিকে তাকিয়ে ওদের লক্ষ্য ক'রে হাঁক ছাড়ল—গড়িয়া, পার্কসার্কাস, হাওড়া। চলে গেল সেটা। আবার শান্ত সব। ইতস্তত ছড়ান ছড়ান কিছু লোক। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে কেউ কেউ সিগারেট টানছে, কেউ এমনি। নীল এতক্ষণে একটা সিগারেট বের ক'রে অনুমতি চাইল, বিশেষ ক'রে মৌরীর দিকে তাকিয়ে, বোধহয় বড় বলে—ধরাতে পারি?

—ওকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন? আর কিছুদিন বাদে হাওয়াটা ধোঁয়ায় ভরা না থাকলে ওর নিঃশ্বাস টানতে হালকা ঠেকবে। ওর যার সাথে বিয়ে, তিনি এমনি সিগারেট খান।

—আপনারও বিয়ে নাকি? সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করলো নীল।

—বাঃ, ছোড়দা আর ওর কিছু দিন আগে-পরেই তো দিন হয়েছে। আপনি জানেন না?

—না। এবার হাসলো নীল, বললো—আপনি বাদ রয়ে গেলেন যে? ভালো দিন নেই আর কাছে?

নীলের ঠোঁটের পরিহাস মঞ্জুর দৃষ্টি এড়ালো না। গম্ভীর ভাবে জবাব দিল সে—ভালো পাত্র নেই কাছে।

জবাবটা শুনে দুই ঠোঁটে সিগারেটটা চেপে ধরে নীল তার নীলচোখের দৃষ্টি এমন ভাবে মঞ্জুর ওপর ফেলল—মঞ্জুর মনে হ'ল যেন দূর সমুদ্রের অনুসন্ধানী আলো এসে পড়ল ওর মুখের ওপর। বাসে উঠে মুখ বাড়িয়ে যখন—আচ্ছা—বলে বিদায় নিল—মঞ্জু দেখল, তখনও ঠিক সেই দৃষ্টি নীলের চোখে।

মমতাদের বাড়ী থেকে আসবার পর আর একদিন যাওয়ার কথা যে ওদের একেবারেই মনে না হ'লো তা নয়। কিন্তু মনে হওয়াটা কাজে পরিণত করে যে উৎসাহ তাতে নিশ্চয়ই তেমন জোর ছিল না। থাকলে মঞ্জুকে থামানো যেত না। এমন হয়। অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়নে ত্রুটি ঘটে না—তবু কোথাও এমন একটা ঠাণ্ডা ভাব থেকে যায়, যার ছোঁয়ায় অপর পক্ষের উত্তাপটাও আসে ঠাণ্ডা হয়ে। মঞ্জুরও বোধ হয় তাই হয়ে থাকবে। বিশেষ ক'রে আসবার সময় মেয়ের সঙ্গে দেখা না হবার জন্য মা যে খেদটা প্রকাশ করলেন—তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন মনে না এলেও—সে বলা ওদের আর একদিন যাওয়ার আগ্রহ জাগল না।

বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে থাকে। বাড়ীতে চলে তারই আয়োজন। যদিও কিছু ঘাড়ে-পড়া দিন নয় তবু অমিতা হাত উল্টে বলে—দুটো বিয়ে সাত দিন আগে পরে—কি ক'রে সামলাবে সব জানিনে। যতীনবাবুর কাছে একটা বিয়ের দিনই মুখ্য সেটা মৌরীর। বাসুদেবেরটা নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। ওটা সেরে দেবেন মৌরীর বিয়ের উদ্বৃত্ত দিয়েই। চোখ ধাঁধানো জৌলুষ হওয়া চাই মৌরীর বিয়ের। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থকে মোটা টাকা তুলে এনে চাষীর বীজ ছড়াবার মত ছিটিয়ে খরচ করতে লাগলেন—কারণ তিনি জানেন বীজের মায়া করে যে চাষী তার তোলা ধানে ভাণ্ডার ভরে না। বড় বড় যোগাযোগ—আসবে সব ধনীমানী। উপস্থিত থাকবেন সুদর্শনের বাবা যিনি ধনী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের অনতম। উঠে ঘরময় পায়চারী শুরু করে দেন যতীনবাবু। ছোট ঘর—দু'পা হাঁটলে দেয়াল নাকে ঠেকে, আবার ঘোরেন। চিন্তাও ঘোরে। মুখে দেখা দেয় আত্মগর্ব—খবরের কাগজে প্রকাশিত বিশিষ্ট অতিথিদের নাম আর উচ্চপদের তালিকা মনে করে। তার পক্ষ থেকেও গেইটে, আসরে রাখতে হবে অভ্যর্থনা করবার জন্য অমনি সব বড় পদের ব্যক্তিদের। নইলে সম্বর্ধনা আর সুন্দর অমায়িক ব্যবহারের মূল্য কি থাকবে যে কাগজে তোলা যাবে।

যতীনবাবু চোখ বুজে বর নয়, কনে নয়, বিয়ে নয়, দেখেন কেবল বিয়ের আসরটা। সাদা আর লাল সালুতে মোড়া জ্যামিতিক নক্সায় তৈরী আসর—কার্পেটে কুশন চেয়ার। চাঁদোয়ার প্রতি পদ্মে ঝুলছে পাখা—ফুলে ধূপে গন্ধে চারিদিক আমোদিত। ডেকোরেটার চাই একজন—নামকরা ডেকোরেটার। খেয়াল রাখতে হবে আষাঢ়ের বৃষ্টি যেন এক ফোঁটা ভেতরে না পড়ে সে আসরের।

অমিতার নেই নিঃশ্বাস ফেলবার সময়—সকালে চায়ের পাটটি ছুটোছুটির ভেতর কোনমতে সেরে বের হয় সে মার্কেটিং-এ। শাড়ী, গয়না, টয়লেট—দু দুটো বিয়ের। ভারটা যার উপর থাকে সেই বোঝে। মমতার পছন্দ, অপছন্দ কিছু জানা নেই। মৌরীর পছন্দ সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল জানে বলে, কিন্তু তাই কি সত্যি। কিছু না বললেও মুখের চেহারা দেখলে বুঝি বোঝা যায় না—মনমতো হওয়া, না হওয়াটা। একবারের জায়গায় বিশবার ছুটছে দোকানে, কোনবার অপরের মন উঠতে না দেখলে, কোনবার বা নিজেরই। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। শুধু বিরক্তি করে ওকে আষাঢ়ের বৃষ্টি। পথে বাজারে দোকানে ঝুপঝুপ নেমে নেমে এমন ত্যক্ত করে। বাবার গাড়ীটা সে আনিয়ে নিতে পেরেছে তাই রক্ষে। মেয়ের ননদের বিয়ের বাজার সওদা করার সুবিধা করার

সুবিধার জন্য বাপ অফিস করছেন হাসিমুখে ট্রাম-ট্যাক্সিতে। অমিতার দিকে তাকিয়ে মৌরীর মনে হয়, নিজের ঝোঁক মত কাজ পেলে, কাজ আর আনন্দ এমন এক হয়ে যায় বলেই বোধ হয় বলে— যে নিজের গুণ অনুযায়ী কাজ খুঁজে পায়, সে ভাগ্যবান।

জয়দেব কখনো স্ত্রীকে খুশী করতে, কখনো একেবারে কিছু না করার লজ্জা থেকে মুখ বাঁচাতে অমিতার সঙ্গে ঘোরে। আবার সময় বুঝে সরে পড়ে। ছোটপিসি রোজ সন্ধ্যায় আসেন। পিসিমা, বাবা, ছোটপিসিতে মিলে, খাবার মেনু, রান্নার জায়গা, নিমন্ত্রিতের লিষ্ট, পরিবেশনের পদ্ধতি— একে আনা, তাকে খবর পাঠানো; সব বিষয়ে পরামর্শ করেন রাত আটটা পর্য্যন্ত। তারপর আবার গাড়ী ছাড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়—পিসেমশাই -এর ডিনারের সময় হয়েছে। বাসুদেবের ছুটি পাওয়া নিয়ে যে চিন্তাটা ছিল, সেটাও মিটে গেছে তার চিঠি পেয়ে— এক মাসের পুরো ছুটি পাচ্ছে সে। আর রামু! সে আনন্দে হাতে ডিগবাজী খেতে খেতে বারান্দা পার হয়। অমিতার গাড়ী থামার শব্দ কানে আসতেই তিন-চার সিঁড়ি টপকে টপকে নেমে যায় নীচে। হাতে প্যাকেটের উপর প্যাকেট তুলে, বুকে চেপে ধরে, আবার তেমনি সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে গেয়ে ওঠে—ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল, হরদম লাগাতা ঝাড়ু তাভি এ্যায়সা হাল—এটাই গায় এখন রামু। ওদের আপত্তিতে ভজমনটা বন্ধ, ক'দিন সে খুব গলা ছেড়ে—আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা—গাইতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু পিসিমা গালমন্দ ক'রে প্রায় কাঁদিয়ে ফেলেছিলেন রামুকে—বিয়ে বাড়ীতে একি অলক্ষুণে গান? মঞ্জু এসে সান্ত্বনা দিয়ে ঠিক ক'রে দিল—এখন থেকে এটা গাইবে।

মঞ্জু আছে সর্ব্বত্র। বাবা পিসীমাদের আলোচনায়, অমিতার মার্কেটিং এ, পাঠনিরত মৌরীর পাশে—টুকিটাকি সাংসারিক কাজ ক'রে চলা মৌরীর সঙ্গে। আবার এরই ভেতর কোন কোন দিন ন'টায় কলেজে গিয়ে সন্ধ্যা পার ক'রে চিন্তায় কারণও ঘটিয়ে তোলে। দেরীর কারণ জানতে চাইলে, ডান হাতটা তলোয়ার চালানোর ভঙ্গীতে তেরছা চালাতে চালাতে বলে—এই আর এই ক'রে কেবল কচু গাছ কাটছি।

—কচু গাছ কাটছিস?

—হ্যাঁ। কচু গাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত হয়। আজ আমরা কলেজে পার্লামেন্টারী সভা বসিয়েছিলাম—তাতে বিরুদ্ধ দলের নেতা নির্ব্বাচিত হয়েছিলাম আমি। উদ্বাস্তু সাহায্য বন্ধ করা নিয়ে এমন আক্রমণ করেছিলাম সরকার পক্ষকে— জবাব যোগায়নি প্রধানমন্ত্রীরও। উঃ—তুই দিদি শুনতিস যদি, আমার পার্লামেন্টারী রিটোর্টগুলি! নকল সভা না হয়ে আসল হ'লেও জবাব দেবার কেউ আছে,—কই দেখতে পাচ্ছিনে। আণবিক, স্পুটনিক কোন যুগ নয়, এখন শুধু কথার যুগ চলছে আর কথার যুদ্ধ চলছে। কথা জানা চাই—কথা।

আর মৌরীর মনের কাঁটা সুদর্শন যে শুধু নিজের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল তাই নয়—ফুল ফোটাবার ব্যবসাও ক'রে রেখে গিয়েছিল। আষাঢ়ের আকাশভরা বর্ষণে সে ফুল তার মুদিত পাপড়ি একটি একটি ক'রে মেলে দিচ্ছিল। আর তাতে যে বিভোর ও না হচ্ছিল তাও নয়। করবার কিছু নেই—পিসীমা বাজার বন্দর ঘুরতে দেন না শ্রী নষ্ট হবে বলে। ওরও যেতে ইচ্ছে করে না। বসে বসে কখনো সুদর্শনের কথা ভাবে, বৃষ্টি থাকলে বৃষ্টি দেখে। বই পড়ে, নয়ত তাকিয়ে থাকে সামনের বাড়ীটার দিকে। এখানে নতুন ভাড়াটে এসেছে এ্যাংলো, দেখে তাদের বিদেশী জীবনযাত্রা। ছেলেটা বাড়ী থাকলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা রেকর্ড এত বেশী চালায় যে বিরক্তি ধরে যায়—রেকর্ডটার শুধু বিউটিফুল, বিউটিফুল, বিউটিফুল—এই তিনটি শব্দ ছাড়া, মৌরী পরের একটা শব্দও ধরতে পারে না। ভাবে, কি সুন্দর বলছে—প্রিয়ার মুখ না প্রকৃতির ছবি?

একদিন কলেজে যাবার মুখে পিয়ন মঞ্জুর হাতে মৌরীর নাম লেখা একটি ছোট প্যাকেট আর একটি সবুজ এনভেলাপ দিলে—প্রথমটায় বুঝতে পারল না কিছু। তারপর দুটোর কোণেই ছোট্ট ক'রে —ফ্রম সুদর্শন—লেখাটি দেখে বুঝল। চিঠি আর প্যাকেটটা নিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল ও। মৌরী, অমিতার কাছে গিয়ে রঙ্গীন শাড়ীর আঁচলটা নাচের ভঙ্গীতে ধরে পাক খেতে খেতে গেয়ে উঠল—বিউটিফুল, বিউটিফুল, বিউটিফুল। অমিতা জিনিষপত্র আলমারীতে তুলছিল। মঞ্জুর সাড়া পেয়ে ঘুরে বলল—আজ বিকেলে তবে তুমি আমার সঙ্গে মার্কেটে যাচ্ছ না?

—কেবল মার্কেট আর মার্কেট! দেখনা হাতে কি আমার?

—কি? অমিতা-মৌরী, দুজনেই তাকালো ওর হাতের দিকে।

মঞ্জু বললো—পালকের মত হাল্কা ওজনের একটি খাম, আর ছোট একটি প্যাকেট। কাল ওর জন্মদিন নয় বৌদি?

—হ্যাঁ, কিন্তু ও কি তোমার হাতে?

—উপহার।

—তুমি আনলে?

—দূর। সুদর্শনবাবু পাঠিয়েছেন।

প্যাকেট্‌টা থেকে উপহার বেরুলো, কিন্তু শুধু মৌরীর নয়—তিন জনেরই। সত্য বলে ভুল হয়, এমনি সুন্দর তিনটা কামিনী ফুলের গুচ্ছ তিনটে সোনার কাটায় গাঁথা। বাক্সটার গায় লেখা—উপহার অমিতা, মৌরী, মঞ্জুকে—মৌরীর জন্মদিনে—সুদর্শন। মুগ্ধ হ'লো ওরা, ওদের জন্য পাঠানোর ভেতর সুদর্শনের বুদ্ধির, যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় মিললো তাতে— তারিফ্ ক'রলো রুচির। আর সুন্দর উপহারটির জন্য হ'ল খুশী। এগুলো যেমন সত্য, তেমনি সত্য এক খণ্ড মেঘও এলো অমিতার মনে। কত সূক্ষ্ম, সুন্দর সুন্দর আনন্দের খবর জয়দেবের জানা নেই। মঞ্জু তক্ষুণি গুঁজলো সেটা মাথায়—চললাম। চিঠিটা যদি দেখাস তো এসে দেখব। সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে এল—অনেকদিন পর জয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—বলেছি না? আজ ওদের বাসায় যাব। ফিরতে দেরী হ'লে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিসনে যেন।

এই বলে আসার নিশ্চিন্ততার ভেতরও ঘড়ির দিকে নজর যে মঞ্জু না রাখছিল তা নয়। কিন্তু যখন খেয়াল হ'ল অনেকক্ষণ ধ'রে আটটা বেজে আছে—তখন শুনলো ওটা বন্ধ। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল—দশটা বাজে যে।

জয়া ওকে ট্রামে তুলে দিয়ে গেল। ট্রামের আধ-ঘণ্টার রাস্তা আচ্ছন্নের মত বসে রইল। জয়া ওর স্কুলের বন্ধু। কাল হঠাৎ দেখা হয়েছে। আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল দু'জনে দু'জনকে। কিন্তু কলেজে কেন পড়ছে না জিজ্ঞাসা করায় চোখে জল এসে গিয়েছিল জয়ার—জবাব দেয়নি সে। ঠিকানা চাইলে তাও দিতে যখন চাইল না, তখন সেটা মঞ্জু আদায় ক'রে নিয়েছিল। আর আজই এসে হাজির হ'ল। কিন্তু একি থাকা, একি বাঁচা! লাইটের ব্যবস্থা আছে, তবু আলো জ্বলছে না—জ্বলছে মোমবাতি। শরীরে একটা শুধু মানুষ কাঠামো নিয়ে ওর মা ধুকতে ধুকতে রাঁধছেন আর কাশছেন, কাশছেন আর থু থু ফেলছেন। সামনে বসে মা-রই আকৃতির দু'টি ভাই। কি তিনি রাঁধলেন, তাও বুঝল না—কি দিয়ে ওরা খেলো তাও দেখল না। ভাতটা ছিল, এটাই শুধু বুঝেছে। মা এরই ভেতর দু'টো কাপে চা দিয়ে গেলেন ওদের। মেয়ে কিছু আনবার আগেই চা দেওয়ার জন্য মার উপর বিরক্তি প্রকাশ করলো। কিন্তু মা আশ্চর্য্যরকম উদাসীন।

দশ বছরের ভাইটিকে নিশ্চয়ই কিছু আনতে পাঠিয়েছিল জয়া। দুটো সিঙাড়া এনে সে রাখলো মঞ্জুর কাছে। কিন্তু প্লেটের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠে গেল জয়া। ভাই-এর কান ধরে চাপা গলায় কি ব'লে কষে চড় মারলো দুটো। বুঝলো মঞ্জু। সিঙাড়া একটা ছোট, একটা বড়। প্লেটটার দিকেই তাকিয়েছিল মঞ্জু। এমনি সময় দরজার কড়া নড়ে উঠতেই ছুটে এসে ভেতরে ঢুকলো জয়া। ভাইকে ইসারায় বলে দিল—বল বাড়ী নেই আমি। পাওনাদার বাড়ীওলা? জয়ার মুখ অমন সাদা মরার মত হয়ে উঠল কেন? ভাই এর কথা—কাল তবে কিন্তু দোকানদারবাবু চাল ডাল কিছু দেবেনা দিদি—কথাটায় কানে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল কেন অমন?

একটা আচ্ছন্নভাবের ভেতর চলছিল বলেই, বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়ানো বিরাট গাড়ীটা মঞ্জু খেয়াল করলো না। কিন্তু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পুরোদস্তুর সাহেবী পোষাক পরা এক ভদ্রলোককে ইতস্তত করতে দেখে, গাড়ীটার দিকেও লক্ষ্য পড়লো তার। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো—কাকে চান?

প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক ওর দিকে তাকাল। এবার মঞ্জু দেখল—তার পা ঠিক থাকতে চাচ্ছে না, চোখের দৃষ্টি লাল, মুখ না খোলা সত্ত্বেও আসপাশ ভরে উঠেছে মদের কড়া গন্ধে। মঞ্জুর দিকে মাতাল চোখের দৃষ্টি ফেলে সে যেন মনে মনে স্মরণ করতে চেষ্টা করতে লাগল—কাকে চাই? তাইতো, কাকে চাই!—কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারে না। সন্ধ্যায় যখন বাড়ী থেকে বের হয়, তখন ঠিক করেছে একবার এ ঠিকানায় তার আসতে হবে। তারপর ফিরপোতে ঢুকে দু'এক পেগ খেয়ে নিতে গিয়ে অভ্যাস বশে ঢেলেছে আর খেয়ে চলেছে। কখন যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী আসবার সময় পার হয়ে গেছে—এ খেয়ালও যেমন তার নেই, এখানে আসবার কথাও তেমনি তার মনে ছিল না। এখানে এসে তাকে হাজির করেছে তার অচেতন মন— যে সহজে কিছু ভোলে না। কিন্তু সে নিজে সত্যি কিছু মনে করতে পারছিল না।

মঞ্জু লোকটির দিকে তাকিয়ে এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলল--তবে আজ আসুন। মনে পড়লে, কাল আসবেন।

লম্বা বেণী দুটোয় ঝাঁকি দিয়ে পেছনে সরিয়ে মঞ্জু ভেতরে ঢুকতে যাবে—লোকটি তার সামনে দাঁড়ালো, বললো—রাগ করবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কাকে চাইতে এসেছিলাম, স্রেফ ভুলে গেছি।

অতিরিক্ত পানটা হয়ত এর অতিরিক্ত বেশীভাবেই ধাতস্থ—তাই ঠিক ভাবে দাঁড়াতে এবং ঠিক ভাবে কথা বলতে পারছিল। বাহিক প্রকাশে কোন অভব্যতা ছিল না। কিন্তু যে জন্য ও বস্তু খাওয়া—মনটাকে হালকা করা, মেজাজে স্ফূর্তি আনা প্রবৃত্তির ক্ষুধাটা চড়িয়ে দেওয়া—একটা গোটা মানুষের গোটা মনুষ্যত্বের থেকে কিছু ঝেড়ে ফেলা—সেগুলো তো পুরো মাত্রায়ই কাজ করছিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল সে—দামী সেন্টের গন্ধে ডুবিয়ে দিল বিলিতি মদের উগ্র গন্ধটাকে। মুখ মুছে রুমালটা ফের পকেটে গুঁজে বললো—যাকে চাইতে এসেছিলাম, তাকে দেখলে ঠিক মনে পড়ে যেত কাকে চাইতে এসেছি, কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে বলি—আপনাকেই। সাহস হচ্ছে না।

মঞ্জুর মজা দেখার এবং মজা করার সখ এবং সাহস যে পর্য্যন্ত তাতে মনের অবস্থাটা স্বাভাবিক থাকলে কি জবাব দিত, বলে বসত বলা যায় না। মনটা ওর জয়ার ব্যাপারে এত বেশী চঞ্চল ছিল যে চঞ্চল মঞ্জুর বাহ্যিক চঞ্চলতাকে ঠেলে ভেতরের মঞ্জু এসে আবার ওর বাইরেটাও দখল করে নিয়েছিল। লোকটার ধৃষ্টতায় একবার তার দিকে শুধু চাইল মঞ্জু। বললো—ইচ্ছে করছে, তবে সাহস পাচ্ছেন না? আপনার সুস্থ বুদ্ধির এই অবশিষ্টটুকুকে ধন্যবাদ। বলে আবার মঞ্জু পা বাড়াচ্ছে—বাঃ! বলে ভদ্রলোক তার ডান হাতটা হ্যাণ্ডসেকের ভঙ্গীতে বাড়িয়ে দিল মঞ্জুর দিকে। যদিও মঞ্জুর ধারণা, ভয় পেয়ে সে শুধু পেছু হটেছিল, শব্দ করেনি—কিন্তু নিশ্চয়ই তা নয়। শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, নইলে মোড়ের ছেলে তিনটি ছুটে এসে লোকটার দামী ইংলিশ টাইটা অমন মুঠো ক'রে চেপে ধরবে কেন? মারধোর করবে না কি ওরা?—এই কি ক'রছ তোমরা? বলে কাছে এসে তাদের হাত ধরলো মঞ্জু। গাড়ীর দরজা খুলে ছুটে এল ড্রাইভার। যতীনবাবু বাড়ী ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন হক্‌চকিয়ে—আপনি! লোকটির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি।

॥ ৮ ॥

বাবাকে দেখে এবং তার মুখের বিস্মিত 'আপনি' শুনে আর কোন দিকে না তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল মঞ্জু। ওর মনটা গেল আরো বেসুরো হয়ে। মনে হলো বাড়াবাড়িটা করে ফেলেছে ওই। কোনো মানে হয় না এতটা ভয় পাওয়ার। লোকটা যখন মাতাল তখন কিছু ওলট-পালট ব্যবহার করবেই—তা যত সাবধানীই হোক। জয়ার বাড়ী থেকে মনে যে অন্ধকার নিয়ে ফিরেছিল সে-ই ভূত দেখাচ্ছে ওকে। হাফ সার্ট গায়, মালকোঁচা দিয়ে ধুতি-পরা লোকটাকে ও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে জয়াদের রকে—সেই লোকটা আর এই লোকটা যেন এক হয়ে গিয়েছিল ওর কাছে।

দোতলার বারান্দায় উঠতেই ছোট ছোট পায়ের দুপদাপ শব্দ তুলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো ওকে—অমিতার ছেলে-মেয়ে। মুহূর্তে মুছে গেল মঞ্জুর মন থেকে জয়ার বাড়ীর আর নিজের বাড়ীর দুটো খারাপ লাগা ঘটনা। হাতের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে, দু'হাতের বন্ধনে বেড়ে কাছে টেনে আনল মঞ্জু ওদের। একবার এর গালে একবার ওর গালে চুমু খেতে খেতে বলতে লাগলো—ও মা গো, পিসীর বিয়ের প্রথম 'নায়র' এসেছে গো! উলু পড়েছিল তো? জল দিয়ে পা ধুয়েছিল তো? তেল-সিঁদুর পান দিয়েছিল তো?

'নায়র' শব্দ বুঝল না ওরা। ওটা পূব-বাংলার কথা। কিন্তু সে জন্য আটকালো না। শিশু কি কথার জবাব দেয়? সে নিজের কথা বলে। পিসীর হাত ধরে বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে ভাই-বোনে কখনো এক সঙ্গে, কখনো একের কথা আরেক জন কেড়ে নিয়ে বলতে বলতে চললো—আজ দুপুরে দাদু গিয়ে ওদের নিয়ে এসেছেন। মা বলেনে ভালো সীর বিয়ে পর্য্যন্ত ওরা এখানে থাকবে। ওদের এক বড় মাসী আছেন জানে কি সী? জানে? তার ছেলে মেয়ে নানা আর ঝুমুর কে? তাও জানে! নেচে উঠল রিনু—ওরাও এসেছে সী। ঘরের দরজার কাছে এসে হঠাৎ মঞ্জুর শাড়ী ধরে টেনে তাকে থামিয়ে রিনু ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস-ফিস করে উঠল—গিয়ে ওদেরও চুমু খেয়ো কিন্তু সী! নইলে এমন হিংসের কথা বলবে ঝুমুর!

ঝুমুর তো দেখেনি আমি যে তোমাদের চুমু খেয়েছি।

—কে জানে বাবা! গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালো রিনু। যেন কোথা দিয়ে যে ঘটনার সাক্ষী থেকে যায় কে জানে, এই বলতে চায় সে। হেসে উঠল মঞ্জু।

ঘরে ঢুকে ওদেরই বয়সী দু'টি ছেলে-মেয়েকে চোখের ইসারায় দেখিয়ে স্মরণ করিয়ে দিল রিনু সীকে চুমুর কথা। নিছক সতর্কতা না পেছনে এর আতিথেয়তাও লুকোনো রয়েছে, বুঝল না মঞ্জু। হাসিমুখে ক্ষুদে মহিলাটির নির্দেশ পালন করল সে। অমিতা চার জনকে একরকম তাড়িয়ে নিয়ে চলল ঘুমোবার জন্য। আর মঞ্জু এসে বসে পড়লো মৌরীর পায়ের কাছে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল মৌরী এমন ভাবে, যেন বললো—কিছু বলব না।

—আচ্ছা, তোর উপায়টা হবে কি রে দিদি? এখন নয় যতই দেরী করি, ফিরে এলেই নিশ্চিন্ত হতে পারিস। কিন্তু শ্বশুরঘরে গিয়ে হয়তো সমস্ত রাত ঘুমোলিই না, আমার ফেরা না ফেরাটা বুঝলিনে বলে। তবু মৌরীকে অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকতে দেখে, দিদির দু'হাঁটু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওর হাঁটুর উপর নিজের মুখটা চেপে বললো—ঘটনা কি সব ঘড়ি ধরে ঘটে?

—ঘটনা বুঝি তোর জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী হয়?

—না,তা হয় না। লেখকদের গল্পের জন্য কি বিশেষ সব ঘটনা বসে বসে কেউ ঘটায়? অশেষ ঘটনাস্রোত থেকে বিশেষ ঘটনা তুলে নেয় তাঁদের দৃষ্টি। তাই না?

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। 'আসছি।' বলে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে যতীন বাবুর দিকে তাকিয়ে বললো—লোকটি কে বাবা?

হাতের ছড়ি আলনায় রেখে ধীর হাতে পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতে খুলতে জবাব দিলেন যতীন বাবু, চিনবিনে।

—সে তো নিশ্চয়ই। যদি চিনবই, তবে জানতে চাইবো কেন? বলে আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো সে।

যতীন বাবু পাঞ্জাবীর পকেট থেকে মানিব্যাগ খুলে আলনার কাছ থেকে গেলেন টেবিলের কাছে। রাখলেন সেটাকে টেবিলের উপর। ঘড়িটা খুলে রাখলেন তার পাশে। পাঞ্জাবীটা হাত উঁচু করে টেনে খুলতে খুলতে আবার এলেন আলনাটার কাছে। খুলে সেটাকে রাখলেন ব্রাকেটে। কাপড় ছেড়ে পরলেন লুঙ্গী। জুতো খুলে পায় দিলেন বিদ্যাসাগরী চটি। ইজিচেয়ারে শরীর টান করে বসে হাঁক ছাড়লেন— রামু, তামাক।

আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে রইল মঞ্জু। দু'গাল ফুলিয়ে কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে এসে হাজির হলো রামু। গড়গড়ায় কল্কে বসিয়ে আরো কয়েকটা জোর ফুঁ দিয়ে উঠে দাঁড়ালে। নলটা হাতে তুলে নিয়ে এতক্ষণে তাকালেন যতীন বাবু মেয়ের দিকে।—লোকটার পরিচয় দিয়ে তোমার কি হবে? জেনে রাখো লোকটা ভালো নয়।

চলে এলো মঞ্জু। অমন একটা মন্দলোক কেন এসেছিল, কি দরকার ছিল তার এখানে? সে কথা পর্য্যন্ত জানতে চাইলো না।

কিন্তু পরের দিন লোকটি তার নিজের পরিচয় নিজেই জানিয়ে গেল মঞ্জুকে। কলেজে যাবার সময় নীচের ঘরে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছিল মঞ্জু ব্যাগের ভেতর সব ঠিক আছে কি না—পয়সা, লাইব্রেরী-কার্ড, রুমাল। ঘরে একটা ছায়া পড়তে তাকিয়ে দেখে কালকের সেই লোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তেমনি দামী স্যুটপরা। কোটের বুকে গোঁজা লাল কাঠগোলাপ। ব্যাগের ফ্যাসনার টেনে দিতে দিতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো মঞ্জু।

দরজা ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকলো লোকটি। তার চক্‌চকে জুতোর মাথায় খেলতে খেলতে রোদটাও যেন লোকটির সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকলো ঘরে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালো সে। বললো—আমি আপনার কাছে এসেছি।

—আমার কাছে? এতটা বিস্মিত বুঝি মঞ্জু জীবনে কোন দিন হয়নি।

—হ্যাঁ। এবার মাথা, শরীর দুই-ই সোজা করে টান হলো লোকটি। বললো—আমার ক'টা কথা আপনাকে শুনতে হবে এবং সেজন্য একটু সময় আমি চাইব আপনার কাছে।

মঞ্জু দৃষ্টিটাকে হাতের ঘড়ির দিকেই নিতে যাচ্ছিল, লোকটি বলে উঠলো—জানি আপনার কলেজের সময় হয়ে গেছে, আর নয়তো এক্ষুনি সময় হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার আজ কলেজে যাওয়া হবে না।

—কলেজে যাওয়া হবে না!

—না। মাথা নাড়লো সে।

মুখের ভাবটাকে দৃঢ় এবং কঠিন করলো মঞ্জু। বললো—আচ্ছা তা দেখা যাবে। আপনার কি বলবার আছে বলুন?

—এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবো? লোকটির এই জিজ্ঞাসার ভেতর এমন একটা সুর ছিল যে, হেসে ফেললো মঞ্জু। কিন্তু তক্ষুনি হাসিটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললো—বসুন।

—আপনি?

—বসছি। বসল মঞ্জু।

লোকটি কিন্তু তক্ষুনি বসল না। পায়চারী করতে লাগল ঘরটার ভেতর। পরে মঞ্জু দেখেছে এটাই এর স্বভাব। দাঁড়িয়েই থাক আর বসেই থাক, কথা বলবার সময় হাঁটাহাঁটি শুরু করে দেবেই।

মঞ্জু দেখতে লাগল লোকটিকে। ফর্সা রং রোদে পুড়ে যে রকম তামাটে চেহারা নেয়, মুখের রংটা ঠিক তেমনি তামাটে। কপালটা বিশাল। এতোটা বড় হয়তো ছিল না। চুল উঠে গিয়েছে। খাড়া নাক। চোখের কোণে গাঢ় কালি। যেন রাত্রি তার চোখের পাতার বিশ্রাম-শয্যাচ্যুত হয়ে দিনের পর দিন গড়িয়ে গড়িয়ে এসে চোখের কোলে জমাট বেঁধেছে।

'লোকটা ভালো নয়' বাবার এই কথাটা হঠাৎ কানে আঘাত করলো মঞ্জুর। মুখের ঢিলে-হয়ে আসা ভাবটা আবার শক্ত করে তুললো সে। এখানে বসতে বলার যে অস্বাচ্ছন্দ্য ভাবটা ওর মনে ছিল, সেটা গেল দূর হয়ে। হ্যাঁ একটা অস্বস্তি ছিল ওর মনে। এটা ওদের বসবার ঘর নয়। ভেতর-বাড়ী যাতায়াতের পথ আর বাজে লোকের সঙ্গে কথা সেরে নেবার ঘর। একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার পড়ে আছে। আর আছে রামুর মাদুরে-জড়ানো বিছানাটা। যে ঘরে যে ঘুমোয় সে ঘরটা তার, এই রামুর ধারণা। তাই দেয়াল ভরে ফেলেছে সে বোম্বের নায়িকাদের ছবি দিয়ে। লোকটিকে যেন ঘরটা ধরে উঠতে পারছিল না। পারবেই বা কি করে? দরজায় দাঁড়ানো তার 'প্রেসিডেন্ট' গাড়ীটাও তো' ভাবনার জগতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলছিল। মঞ্জু নিজেকে বোঝালো, এই ভালো হয়েছে। লোকটা ভালো নয়। কিন্তু কৌতূহল সে সত্যি বোধ করছিল। ও বলেছে, বাবা বাড়ী আছেন। তা থাকুন। দরকার নেই তার। সে কথা বলতে এসেছে ওর সঙ্গে। চা না খেয়েই কেন ছুটে এসেছে, সে কারণটা ওর এখনো শোনা হয়নি। কিন্তু কথাটা নিশ্চয়ই সত্য। কোটে -গোঁজা কাঠগোলাপের লাল পাপড়ি কালো হয়ে ঢলে পড়েছে। রাতের কোটগায়ে চাপিয়ে আয়নার কাছে গেলে নিশ্চয়ই ওটা ওখানে থাকতো না। ঘরের ভেতর যে মিষ্টি গন্ধটা, তাও কালকের। রাতের স্প্রে-করা সুগন্ধ পরের দিন যেমন থাকে। মঞ্জুর মনে হলো, বাসী-পোষাক, বাসী-গন্ধ, বাসী-ফুল সমেত ঘুম থেকে উঠে আসা এই লোকটিও যেন বাসী।

লোকটি এসে চেয়ারে বসলো। কোন ভূমিকা না করে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললো—আমার এ কথাটা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে—কাল রাতে আপনারা যেটাকে অসম্মানের হাত-বাড়ানো ভেবেছিলেন, সেটা সত্যি তা ছিল না। আমি প্রচুর ড্রিঙ্ক করেছিলাম—করিও তাই। মাথাটা পরিচ্ছন্ন ছিল না, বুদ্ধির জায়গায় ছিল নেশা—মাথা-জমাট-বাঁধা নেশা। তার প্রভাবে বলে ফেলেছিলামও একটা গর্হিত কথা—এ-ও সত্য। কিন্তু আমি বর্বর নই। দশ-পনেরোটা বছর একটানা বিদেশে কাটিয়ে আনন্দ সম্ভাষণ অভিবাদন সব কিছুতেই হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা দাঁড়িয়ে গেছে স্বভাবে। কাল আপনার তিরস্কৃত জবাব 'সুস্থ বুদ্ধির অবশিষ্টটুকুকে ধন্যবাদ' কথাটা খুশী করেছিল আমাকে। তাই সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম—বিশ্বাস করলেন?

লোকটি সম্বন্ধে বাবার মতামতটা ছাড়া আর কোন কারণ খুঁজে পেলো না মঞ্জু অবিশ্বাসের। না, বাবার কথায় এমন মূল্য ওদের কাছে নয়। বললো—কেন করবো না। ভদ্রলোকের পক্ষে এটাই তো স্বভাবিক।

বিদেশী প্রথায় অভ্যস্ত হাতটা বুঝি কালকের মতোই আবার এগিয়ে আসছিল, তাকে ঢুকিয়ে দিল সে পকেটে। বললো—বাঁচালেন।

টেবিলের দিকে ঝুঁকে বসে কথা বলছিল লোকটি। এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। বললো—কাল রাতে একটুও ঘুমোতে পারিনি—নেশার লোকের ঘুম না হওয়া, বুঝতেই পারেন মনে কতটা অস্বস্তি থাকলে। নিজের অদৃষ্টে যে দুর্ভোগ আর অসম্মানটা ঘটল সে কথা মনে হলো না একবারও, কেবল মনে হতে লাগল, কি করে আপনাকে বোঝাবো, বিশ্বাস করাবো, আমার সত্য মনোভাবটা। ভোরবেলাও বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ভাবছিলাম—কখন দেখা করি, কি বলি, কি ভাবে ক্ষমা চাই। হঠাৎ ফোন এলো। আমার এক আত্মীয় পুলিসের বড় চাকুরে। বিস্মিত হয়ে তিনি জানতে চাচ্ছেন—ব্যাপার কী? কাল নাকি মাতাল অবস্থায় গিয়ে তুমি তোমাদের ভাড়াটের মেয়ের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করেছে? তিন জন সাক্ষী নিয়ে ওরা থানায় এজাহার করে গেছে। বলে গেছে আজ নালিশ করবে।

—বাবা থানায় এজাহার করেছেন? নালিশ করবেন আজ?

—আপনি জানেন না?

সে কথার জবাব দিল না মঞ্জু। বললো—আপনাদের ভিতর সম্পর্কটা আগে থেকেই তিক্ত হয়ে না থাকলে তো এমন হবার কথা নয়।

—আমার সঙ্গে নয়। আমার সঙ্গে আপনার বাবার পরিচয় খুবই কম। দু-একবার তাঁকে দেখেছি এই পর্য্যন্ত। সম্পর্কটা তিক্ত তাঁর আমার বাবার সঙ্গে, আমার ভাইদের সঙ্গে।

—কারণ?

—বাড়ীওলা-ভাড়াটে সম্পর্কটা কিছু বেশী-কম তাই হয়—হয় না কি?

—আপনি বাড়ীওলা?

গাল দুটোও অদ্ভুত রকম এক ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটি বললো—না। আমি বাড়ীওলার ছেলে। মা চোখের জল ফেলে তাতেও সন্দেহ প্রকাশ করে বসায়, হঠাৎ আবেগে তাঁদের ছেলে হয়ে কিছু করতে গিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন কি ঝামেলা।

বাড়ীওলার ছেলে হয়ে আমার কাজ নেই। তাঁর আরো পাঁচ ছেলে আছে, তিনি আছেন। আপনার বাবাকে বলবেন, তাঁরাই তাঁর প্রতিপক্ষ। উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আর আপনার সময় নেবো না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো এ লাভটা নিশ্চয়ই আমার মনে থাকবে—আর কোন দিন যদি আপনার সঙ্গে দেখা না-ও হয়। আচ্ছা আসি। এসে যে ভাবে অভিবাদন করেছিল তেমনি ভাবে সামান্য মাথা নুইয়ে লোকটি চলে গেলো।

মঞ্জু উঠে এলো উপরে।—দিদির বিয়ে পর্য্যন্ত তো তুমি ছুটি নিয়েছ?

—হাঁ। যতীন বাবু সিল্কের চাদরটা গলায় ঝুলোতে ঝুলোতে বললেন।

—আজ তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? কোর্টে?

আলনা থেকে ছড়িটা তুলে নিতে গিয়ে হাতটা থেমে গেল যতীন বাবুর—কে বললো তোকে?

এ কথার জবাব না দিয়ে মঞ্জু বললো—কালকের ঘটনা তুমি থানায় গিয়ে সাক্ষী-সাবুদ রেখে ডায়েরী করিয়ে এসেছ?

—রজত এসেছিল?

—সেই ভদ্রলোকের নাম যদি রজত হয়, তবে সে এসেছিল।

—তুই কথা বললি কেন? কাল বলিনি তোকে লোকটা ভালো নয়?

বিরক্ত হলো মঞ্জু, সেটা ওর স্বভাবে নেই। বললো—ভালো-মন্দ বেছে লোক কথা বলে না।

মেঝেতে ছড়ি ঠুকলো যতীন বাবু—হ্যাঁ, তাই বলে। একটা বদমাস মাতালের সঙ্গে ভদ্রমেয়েরা কথা বলে না। এর চরিত্রের তুমি কি জান?

—দরকার নেই আমার জেনে। চরিত্রের মন্দ দিকটা যে দেখবে সে বুঝবে সেটা। আমি ভালোটুকু দেখছি, সেটাই জানি। অশিষ্ট ব্যবহার সে আমার সঙ্গে কিছু করেনি, তাই আমরাও করবো না।

—তোমার ইচ্ছায়? ছড়ি-হাতে হনহনিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পাশ কাটিয়ে আরো জোরের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল মঞ্জু—আমাকে দরকার হবে, সে কথা মনে রেখো।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যতীন বাবু।

কোন কৌতূহল প্রকাশ করলো না মৌরী। কিছু শুনতে চাইল না মঞ্জুর কাছে। না, মনটা আর বিরূপ করতে চায় না সে। এখান থেকে যাবার দিন ওর এগিয়ে আসছে, যতখানি সম্ভব সবার প্রতি প্রসন্ন মন নিয়ে যেতে চায় ও। তার জন্য যদি চোখ বুঁজে বসে থাকতে হয় তো তাই থাকবে। যদি বোবা হতে হয় তো তাই হবে।

যতীন বাবু থ বনে যাওয়াটাকে নিয়ে গেলেন থমধরায়।

কয়েক দিন পর সন্ধ্যায় ভীষণ এক নালিশ নিয়ে এসে হাজির হলো বিনু। মঞ্জুকে টেনে দালানের এক কোণে নিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক নজর রাখতে রাখতে ফিস-ফিস করে বললো—জানো সী, ঝুমুররা বলছে কি আমাদের বাড়ীর খাওয়া নাকি ভালো নয়। চিংড়ি মাছে এলার্জি হয়। ওদের চিংড়ি খাওয়া বারণ, এখানে দু বেলাই নাকি চিংড়ি। আজ মাছ খায়নি ও, তাই পেট ভরেনি ওর।

—সত্যি তো! সাংঘাতিক লজ্জার কথা তো রিন্ রিন্! তোমার এ লজ্জা নিশ্চয়ই আমি ঢেকে দেবো। যাও তৈরী হয়ে এসো। আমরা ওদের রেষ্টুরেন্টে খাইয়ে আনবো—-কেমন?

উল্লাসে ছুট দিল রিনু।

অমিতার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে ওদের চার জনকে সঙ্গে করে উঠল গিয়ে মঞ্জু ট্যাক্সিতে। মৌরীকে ডেকেছিল, চার জনকে নিয়ে একা সামলাতে পারবিনে বলে তৈরী হতেও যাচ্ছিল মৌরী। কিন্তু যেই মঞ্জু বললো ট্যাক্সি করবো, অমনি ওর মত বদলে গেল—তবে আর কি ট্যাক্সিতে যখন যাচ্ছিস একাই পারবি। ইচ্ছে করছে না আমার। ট্যাক্সিতে বসে মনে মনে হিসাব করে মঞ্জু—আসা-যাওয়ার ভাড়া, চারটা আইসক্রিম—হয়ে যাবে।

—সী, ফিরপো।

—ফিরপো! এটাও ঝুমুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না কি!

ঠিক তাই। জানো সী, ঝুমুর ফিরপোতে খেয়েছে। আমরা কোন দিনও—এক দিনও খাইনি।

—আচ্ছা চলো।

গাড়ীর গদী নাচতে লাগলো ওদের নৃত্যে। ফিরপোতে ঢুকে ওদের নিয়ে চলে গেল মঞ্জু একেবারে ডান দিকের কোণে। বললো—চারটে বড় আইসক্রিম বলি, কেমন?

ঝুমুর গম্ভীর ভাবে বললো—আইসক্রিম ডিনারের শেষে খায় তো।

ডিনার! ঝুমুরের গোলগাল মুখের দিকে তাকালো মঞ্জু। ডিনার কি এখন খায়? রাত আটটায় হয় ডিনার। সে আমরা আর একদিন আসবো। আজ আইসক্রিম।

—সে দিন তো আমরা সন্ধ্যার সময়ই ডিনার খেয়েছিলাম।

অধৈর্য্য রিনু বলে উঠল—তুমি জিজ্ঞাসা করেই দেখ না সী!

মঞ্জু বুঝল শুধু আইসক্রিমে ওদের খুশী করা যাবে না। আইসক্রিম তো ওরা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে খেতে পারে। তার জন্য এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? বয় এলে অর্ডার দিল মঞ্জু—চারটে চিকেন পেটিজ। চারটে ফ্রাই।

—সী, তোমার?

টেবিলে টেবিলে লোক। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে হাসলো মঞ্জু। হাতের ইসারায় থামিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললো—এখানে কথা বলতে হয় না।

কিছুক্ষণ বাদে পাঁচটি ধোঁয়াওঠা সুপ-ডিস ট্রেতে সাজিয়ে বয় এলো ওদের টেবিলে। বাধা দিল মঞ্জু—এ অর্ডার আমার নয়।

বয় শুনল না, ডিসগুলো ছোটদের সামনে ধরে দিতে দিতে বললো—সাহেব অর্ডার দিয়েছে।

—কে সাহেব! তুমি ভুল করেছ। মাত্র বলতে যাচ্ছিল মঞ্জু, হন্তদন্ত ভাবে রজত এসে কাছে দাঁড়ালো।—হাঁ, হাঁ ঠিক আছে। ডিস দিয়ে বয় চলে গেল। মঞ্জুকে বিমূঢ় করে দিয়ে রজত নেপকিনের ভাঁজ খুলে খুলে বাচ্চাদের কোলে পেতে দিতে লাগল। হাতে তুলে দিতে লাগল চামচে। তারপর মঞ্জুর নেপকিনটা ধরলো এগিয়ে। ঠিক কালকের মতোই দামী সেন্টের গন্ধের সঙ্গে মিশে আসছে বিলিতি মদের গন্ধ। কিন্তু কি করতে পারে মঞ্জু? নাটকীয় কিছু নয় নিশ্চয়ই। পেছন দিককার টেবিলটায় যারা গ্লাস সামনে নিয়ে বসেছিল, নিশ্চয়ই রজত তাদের একজন।

অন্য টেবিল থেকে একটা চেয়ার টেনে এনে রজত বসলো। বাচ্চাদের মত ওর হাতেও তুলে দিল চামচেটা। নিতে হলো মঞ্জুকে।—আপনি বুঝি শক্ত জিনিষ খান না?

হাসল রজত।—খাই। ক'জন বন্ধুকে ডিনারে বলেছি। আপনাকে দেখে 'এখানে বড্ড ভিড়' এই বলে ওদের দিয়েই প্রিন্সস' -এ পাঠিয়ে বলেছি, আমি এই আসছি। এ সৌভাগ্যের কথা তো কল্পনা করিনি।

কাঁটা-চামচায় অনভ্যস্ত যে শুধু ছোটরা তা তো নয়। মঞ্জুও। রজত ছোটদের হাত থেকে ছুরি-কাঁটা নিয়ে মাংস ছাড়িয়ে কাঁটায় বিঁধে যেমন ওদের হাতে তুলে দিতে লাগল ঠিক তেমনি হঠাৎ মঞ্জুর হাতের ছুরি-কাঁটা নিয়ে রোস্টের বিরাট টুকরোকে বাগে এনে ছোট ছোট করে এগিয়ে দিতে লাগলো ওর দিকেও। শুধু বাচ্চাদের সময় সময় মুখেও তুলে দিচ্ছিল। মঞ্জুর বেলা বাদ রাখছিল সেটা। আশ্চর্যই লাগছিল মঞ্জুর।

খাওয়া হলে আগে গিয়ে নিজের গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়লো সে। বাচ্চারা উঠলে মঞ্জু বললো—একটা ধন্যবাদ দি, কি বলেন?

রজত হাতের সিগারেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে হাতটা মঞ্জুর দিকে বাড়াতে যাচ্ছিল। থেমে হেসে বললো—দেখলেন তো। এবার নিশ্চয়ই আর অবিশ্বাস করবেন না। তারপর বললো—আপনার সঙ্গে পরিচয়টা রাখতে চাই। আসবেন একদিন?

—কোথায়? আপনার বাড়ীতে?

—আমি বাড়ীতে থাকিনে।

—বাড়ীতে থাকেন না। কোথায় থাকেন তবে?

—গ্রেণ্ডে। আপত্তি আছে?

—অভিজ্ঞতা নেই। আপনার সঙ্গে পরিচয়টা হয়েছে অস্বাভাবিক ভাবে। আজকের দেখাটা হলো অভাবিত ভাবে। এর পরের সাক্ষাৎটাও তেমনি ভাবে হয়ে যাবে কোথাও। আচ্ছা—নমস্কার। মঞ্জু নমস্কার জানিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল।

সব শুনে সাবধান করলো মৌরী—কখনো এঁর হোটেলে যাবিনে বলে রাখছি।

—কি হবে গেলে?

—হবে আবার কি।

—তবে যাবো না কেন?

—দেখ মঞ্জু, ছেলেমানুষি করবি নে। ভদ্রলোক জলের বদলে মদ খান। থাকেন বাড়ীঘর ফেলে হোটেলে। সুন্দর জীবন কাটান না, ধরে নিতে পারি।

—তা জানিনে। আমার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করেন, এই বলতে পারি। অপরের সঙ্গে কি করেন তা নিয়ে দরকার কি আমার?

—না, অন্যের সঙ্গের ব্যবহার দেখেই বুঝতে হয়, ভবিষ্যতে তার কাছে কি ব্যবহার পাবো।

—মানি নে। স্বভাব যেমন একটা মস্ত সত্য কথা, তার চাইতে একটুও কম সত্য নয়, মানুষের চেহারা একটা নয়। ব্যক্তিভেদে মানুষ চেহারা বদলায়।

—জ্যাঠামো করবি নে।

—এটা উত্তর হলো?

—এটা ধমক হলো। ব্যক্তিভেদে চেহারা বদলায় তারাই, যাদের নিজস্ব কোন চরিত্র নেই।

—তোর তো নিজস্ব চরিত্র আছে। ব্যক্তিত্ব আছে। তোর এক চেহারা আমার সঙ্গে, বাবার সঙ্গে, ছোট পিসীর সঙ্গে? যারা যারা আসেন, যান, বসেন, সবার সঙ্গে? তাঁদের মতও কি তোর সম্বন্ধে সবার এক? কেউ বলে, আহা মৌরীর মত মেয়ে হয় না। কেউ বলে, এমন মেয়ের খুরে নমস্কার।

—ইস। যেমন নিজে বকতে পারিস, তেমনি অপরকে বকাতে পারিস। চরিত্রতত্ত্ব বিশ্লেষণে আর দরকার নেই। আমার কথা হলো, এঁর হোটেলে তুমি যাবে না।

॥ ৯ ॥

মঞ্জু গল্প বলছিল। চার জোড়া কচি-কচি চোখ তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে। যে বলছে আর যারা শুনছে, সমান তন্ময় তারা। তবে যারা শুনছে তাদের চাইতে যে বলছে তার তন্ময় ভাবটা যেন কিছু বেশী। দেখলে একটু বিস্ময়ই লাগে! মনে হয়, গল্প বলার ভেতর আবার এতো ডুবে যাওয়ার কি আছে? কিন্তু মঞ্জু শুধু গল্প বলে না। মনের মত গল্প নিয়ে বসে বসে আরো মনের মতো করে গড়ে। তাই তার গল্প বলায় কিছুটা গল্প লেখার তন্ময়তা এসে যায়।

হ্যাপি প্রিন্স—সুখী রাজকুমার। তারই গল্প বলছিল মঞ্জু। গল্পের রচয়িতা অস্কার ওয়াইল্ড হয়তো মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। হয়তো মজা উপভোগ করছিলেন, তাঁর গল্প মঞ্জুর মুখে শুনে।

সুখী রাজপুত্র—কি তার রূপ, কি তার গুণ! দুঃখ কা'কে বলে জানে না। চোখের জল চেনে না। এক রাজ্যের লোকের সুখী করবার ইচ্ছার কাছে বিপদ ভয়ে দূরে সরে যাবে—এই ছিল সেখানকার মানুষের ধারণা। কিন্তু সেই রাজপুত্রই কি না বিয়ের রাতে মারা গেল!

ভীষণ ভাবে আপত্তি জানিয়ে উঠল—ঝুমুর, রিণু—নান্‌ন। এ্যা মা, গল্প হবে তবে কি করে!

পুরুষ-শ্রোতা দু'টি বাধা দিল। যেন কেন হবে না। এক রাজপুত্রের অভাবে কি পরমাসুন্দরী কন্যার গল্প বন্ধ হয়ে যেতে পারে?

দুঃখে মর্মাহত দেশ এক অপূর্ব মণিমুক্তায় তৈরী মূর্তি স্থাপন করলো শহরের এক উঁচু স্তম্ভের উপর। আর সেই উঁচুতে দাঁড়িয়ে সুখী রাজপুত্র প্রথম নিজের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চার দিকে তাকালো। এতো দিন যারা তাকে দেখেছে, এখন সে দেখতে পেলো তাদের।

একদিন এক শীতকাতুরে সোয়ালো পাখী চলতে চলতে মূর্তিটি দেখে এসে বসল তার কাঁধের ওপর। বললো—আজ রাতটা আমি তোমার পায়ের নীচের ছোট্ট ফাঁকটুকুর গরমে আশ্রয় নেবো। আমরা চলছিলাম রোদের দেশের পানে। নদীর তীরে দুলছিল এক কৃশাঙ্গী লতা। তার সঙ্গে খেলতে গিয়ে দল ছাড়া হয়ে পড়েছি আমি। আজ আর চলতে পারছিনে। তোমার পায়ের তলার গরমে শরীরটা গরম করি।

বড় এক ফোঁটা জল এসে পড়ল তার গায়ে। আর এক ফোঁটা। আবারও। সোয়ালো তাকালো মূর্তির দিকে। আপনি কে? কাঁদছেনই বা কেন? জিজ্ঞাসা করল সোয়ালো।

—আমি সুখী রাজপুত্র।

—সুখী! তবে কাঁদছেন কেন?

—নগরের দুঃখ-দুর্দশা আমায় কাঁদাচ্ছে। নিজের সুখটাকে দিয়ে দেশটা দেখছিলাম—আমি অজ্ঞান ছিলাম, নির্বোধ ছিলাম। সোয়ালো, কি এখন ঘুমোবে?

—কেন মহাশয়?

—ঐ দেখ এক কবি। ওর দুঃখ আমি সইতে পারছিনে। শুনতে পারছিনে ওর গান—এই নিষ্ঠুর সমাজের বুকে।

কন্যা হবে দেহপণ্যা, লম্পটের ক্ষুধার ইন্ধন। ওকে তুমি আমার তলোয়ারের নীলকান্ত মণিটি তুলে দিয়ে আসবে?

সোয়ালো বিশ্রাম ছেড়ে শীতের আকাশে পাখা ঝাপটা দিয়ে উড়ল, নীলকান্ত মণি নিয়ে।

তার পরের দিন। আবার যাবার আয়োজন করছে সোয়ালো। শুনতে পেলো—আজ তুমি যাচ্ছ?

—হাঁ মহাশয়! আমার আত্মীয়রা এখন নীলনদের মিষ্টি রোদ পোহাচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল রাজপুত্র। ঐ দেখ টেবিলের কাছে একটি মেয়ে বসে বসে অবসন্ন হাতে, নিষ্প্রভদৃষ্টিতে সেলাই ফুল তুলছে। ঘরের এক কোণে তার পীড়িত উপবাসী ছেলে কাঁদছে একটি কমলা লেবুর জন্য। কিন্তু তার ঘরে জল ছাড়া কিছু নেই। আমার চোখের মণিটি যদি তুমি তাদের দিয়ে আসতে সোয়ালো।

—বড্ড ঠাণ্ডা। তবু আমি আজ থাকব এবং তোমার দূত হবো।

ফিরে এলো সোয়ালো নাচতে নাচতে। বললো—যদিও অসম্ভব শীত পড়েছে, তবু আমি বেশ গরম বোধ করছি।

—বন্ধু, তার কারণ তুমি একটা মহৎ কাজ করেছ।

পরের দিন আবার সোয়ালোর যাবার আয়োজনে আকুল হয়ে উঠল রাজপুত্র—সোয়ালো, সোয়ালো—আর একটি রাত কি তুমি থাকতে পারো না? ঐ দেখ, মেয়ে তার মাকে খাওয়াবার জন্য তার একমাত্র শীতের কোটটি বিক্রী করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরছে। তার শরীর সাদা হয়ে গেছে তুষারে। আমার অপর চোখের মণিটি তাকে তুলে দিয়ে এসো বন্ধু!

রাজপুত্রের এ চোখটি তুলে নিতে সোয়ালোর কান্না পেলো। অন্ধ হয়ে যাবে তুমি রাজপুত্র! তবু সে তা নিল রাজপুত্রের আদেশে।

পরের দিন কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে রাজপুত্র বললো—বন্ধু, তুমি কোথায়?

পায়ের কাছ থেকে কাঁপাগলায় উত্তর এলো—এই যে তোমার পায়ের কাছে।

—বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। এবার তুমি নীলনদের উদ্দেশ্যে রওনা হও।

সোয়ালো রাজপুত্রের পায়ে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বললো—আর আমার যাওয়া হলো না। আপনি অন্ধ। আমি আপনাকে দেশের গল্প শোনাবো।

গল্প শোনায় সোয়ালো—শহরের গল্প। অন্ধকার পথে অনাহারক্লিষ্ট শিশুর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের বর্ণনা দেয়। বর্ণনা দেয় ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত মানুষের সারের। শেষে একদিন তুষারে-ঢাকা ছোট্ট শরীরটা তার জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাজপুত্রের সোয়ালো সোয়ালো, প্রিয় আমার, এই আকুল ডাকেরও সাড়া মিলল না। রাজপুত্রের ধাতু-শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ফেটে পড়ল।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রিণু। কান্না থামল মঞ্জুর শেষ কথায়—দেবদূত গিয়ে ভগবানকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিষ উপহার দিল সোয়ালো আর রাজপুত্রের হৃদয় দুটি!

চোখ মুছে বললো—সবার দুঃখ আগে কেন রাজপুত্র দেখতে পায় নাই সী?

—অনেকখানি উপরে উঠলে তবে ও-সব দেখতে পাওয়া যায়। একরাশ ছাপানো চিঠি আর এনভেলাপ এনে মঞ্জুর টেবিলের উপর ফেলল অমিতা। বলল—নেমন্তন্নের চিঠিতে নাম-ঠিকানা লেখা হয়নি বলে বাবা ভীষণ রেগে গেছেন। আজ না হ'লে রক্ষে রাখবে না। আদ্দেক আমি নিয়েছি, বাকী আদ্দেক তোমাকে দিয়ে গেলাম। এই সাত দিন তোমার কলেজ বন্ধ রাখতে হবে। কাল থেকে নেমন্তন্ন করতে বেরুতে হবে। আজ নাম ঠিকানা লেখা শেষ করতে হবে। এই তোমার প্রতি পিতৃ-আদেশ, বুঝলে?

বুঝল মঞ্জু। অমিতা যতটুকু বুঝে বলে গেল, তার চাইতে অনেক বেশী বুঝল। হাসল সে। ওকে বলার কথা বাবা বৌদির মুখে বলে পাঠিয়েছেন মানে সেদিনের রাগ এখনও পড়েনি। পড়বার কথাও নয়। অমিতার কাছে ও শুনেছে, বাড়ীওলার সাথে শুধু যে অসম্ভব একটা তিক্ত সম্পর্ক চলেছে বাবার তাই নয়—কেস চলেছে কোর্টে। এমন অবস্থায় বাড়ীওলাকে জব্দ করবার এবং সমস্ত সুবিধা নিজের দিকে টেনে আনবার অভাবিত সুযোগ আপনা থেকে এসে গেল দেখে এটা তিনি সুসময়ের দান ভেবেছিলেন। হয়তো খুশীতে একা ঘরে হেসেওছিলেন। আর এমন হাতে আসা সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল কি না নিজের মেয়ের শত্রুতায়! ঈশ্বর-প্রেরিত ঘটনাটার সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না তিনি? কেস কি যতীন বাবুই করতেন, না ও পক্ষই করতে দিত? কেসটি ফাইল হওয়া মাত্র তার দরজায় ছুটে আসত রজতের বাবা। রজতের পাঁচ-পাঁচটা দাদা। পারিবারিক মর্য্যাদার প্রশ্ন। ছেলের প্রতি যত বিরূপই থাকুন, ছুটে আসতে হতোই। এই যতীন বাবুর হাতের মুঠোয়। প্রথমে শক্ত চাপে ধরে তারপর আস্তে আস্তে আলগা করতেন তিনি সে হাতের মুঠো।

উচ্ছেদ-মামলা তুলে নেওয়া— সে তো আছেই। হাঁ, কত বছর হয়ে গেল বাড়ী চুণকামকরা হয় না, রং হয় না। পুরোনো ঝরঝর পাম্প। জল টানে না। রোজ বিকল হয়। জলের কষ্ট—বাপের সঙ্গে ছেলেদের দৃষ্টি বিনিময় হতো। কি এসে-যেতো যতীন বাবুর তাতে? জলের কষ্ট যে কি কষ্ট, বাপ বুঝতো, ছেলেরা বুঝতো। কার্য্যসিদ্ধি করে নেওয়া এই তো ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই রাত্রেই গিয়েছিলেন থানায়। সাক্ষিসহ ডায়েরী করিয়ে এসেছিলেন। তার পরদিন যাচ্ছিলেন কোর্টে। ভাবতেও পারেন নি রজত নিজে মঞ্জুর কাছে উপস্থিত হয়ে এভাবে তার সব প্ল্যান ভেস্তে দিতে পারে। এ রাগ বাবার পড়তে চাইবে না। ক্ষোভ দূর হতে সময় লাগবে। 'ওর উপর ক্ষুব্ধ ভাবটাও চলবে আরও কিছু দিন। বাবার এই রাগ, ক্ষোভ, ক্ষুব্ধ ভাব—কোনটাই অযৌক্তিক নয়। শত্রুকে বাগে পেলে কে ছাড়তে চায় জব্দ না করে? আর তা যদি ছাড়তেই হয় তবে কে না মানসিক যাতনা বোধ করে?

খুশী করতে হবে বাবাকে। এই সাত দিন কলেজে যাবে না। কাল থেকে বেরুবে নেমন্তন্ন করতে। কথা শুনবে লক্ষ্মী মেয়ের মতো যা বলেন বাবা। প্রথমে চিঠিগুলো ভাঁজ করে করে ভরল এনভেলাপের ভেতর। তারপর নামের লম্বা লিষ্টটা সামনে রেখে চলল ঠিকানা লিখে। এক সময় দু'পাশে এসে বসল রিণু আর ঝুমুর। ওদের কথা থেকে বুঝল ওদের দু'ভাইকে অমিতা তার চিঠি ভাঁজ করার কাজে লাগিয়েছে। তাই ওরা দু'বোন ছুটে এসেছে ওর কাছে। মঞ্জুকে সাহায্য করতে লাগল ওরা। সে কি মনোযোগ! একজন ঠিকানা লিখবার জন্য চিঠি হাতে তুলে দেয়। আর একজন লেখা হয়ে গেলে নিয়ে পাঁজা সাজায়। ঝুমুর পারে কিন্তু মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে পারে না রিণু। আজ ভাল সী এমন গজা ভেজেছে আর ওরা এত খেয়েছে যে রাত্রিতে আর খেতেই পারবে না। মা বলেছেন, নেমন্তন্ন করতে যাওয়ার সময় ওদের নিয়ে যাবেন। কি আর হবে, গাড়ীতে বসে থাকবে তো শুধু ওরা। দাদু বলেছেন, বিয়ের দিন বরযাত্রীদের আতর-ভেজানো বেলফুলের মালা পরিয়ে দেবে ওরা। হঠাৎ হেসে উঠল রিণু, ছোট্ট গলায়—দাদারা এমন বোকা! বলে কি সী, আমরা ও মালা পরাব।

লেখা এনভেলাপটা ঝুমুরের হাতে তুলে দিয়ে, রিণুর বাড়ানো এনভেলাপটা নিয়ে লিখতে লিখতে মঞ্জু বললো—এ জন্যে বোকা হ'ল কি সে?

—বোকা হ'লো না?

—কেন হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—ছেলেরা মালা পরায় না। এটা মার বলা। তারপর যেটুকু জুড়ে দিল সেটা ওর নিজের কথা। বলল, ছেলেদের কি ছেলেরা মালা পরায়? মেয়েরা পরায়।

—তা বটে। আমি পারি তবে?

—রিণু পিসির হাতে চিঠি তুলে দিতে দিতে গম্ভীর ভাবে বলল—উঁহু।

—কেন? ওর দিকে তাকাল মঞ্জু।

—কি বোকা তুমি সী। তুমি বড় যে।

—ও, বড়রা বুঝি মেয়ে হলেও মালা পরাতে পারে না?

—কি ক'রে পারবে? বিয়ে হয়ে যাবে না?

—তা না হয় হয়েই গেল বিয়ে। লেখা খামটা বাড়িয়ে দিল ঝুমুরের দিকে।

—উঁহু, যদি ছেলে ভালো না হয়?

—এ্যাঁ। হাতের কলম রেখে চেঁচিয়ে উঠল মঞ্জু—বৌদি, তোমার পাকা মেয়ের কথা শুনে যাও।

চা-খাবার হাতে ঘরে এসে ঢুকল মৌরী।—কি বলছিস রে রিণু?

—কিচ্ছু বলিনি ভালো সী।

মঞ্জুর মুখ ছোট্ট মুঠোয় চেপে ধরল রিণু। মুখ থেকে হাত টেনে সরাতে সরাতে মঞ্জু বলল—কিচ্ছু বলিনি। বসে বসে বড়দের কথা শোনা, দাঁড়াও বের করছি তোমার।

কালি-ভেজা আঙুলগুলো মাথায় মুছতে মুছতে বাঁ হাতে খাবার তুলে নিল মঞ্জু। চোখের ইসারায় ঝুমুরকে ডেকে ছুট দিল রিণু। হেসে উঠল দু'বোন।

—দেখ কেমন খাবার তৈরী করেছি, পারবি?

—কেন পারব না?

—ইস, কত করিস তো দেখি। আমরা কেউ ঘরে ঢুকব না বলে রাখছি।

—এখন কি? বিয়ের দিন দশেক আগে করব। সব তৈরী আছে আমার। যাবার আগে তোদের রান্না ক'রে খাইয়ে যাওয়া থেকে, ডিগ্রী প্রণামী দিয়ে বর বরণ করা পর্য্যন্ত।

—ভুরু কোঁচকালো মৌরী—ডিগ্রী প্রণামী দিতে হবে কেন?

—গয়নার সাথে সেফ-ডিপোজিট ভল্টে তুলে রেখে দেবার জন্যে।

—রুচি, বুদ্ধি, বিবেচনা থাকলে, তা ও। টুং ক'রে একটা কাঁটা ডিসের ওপর রেখে বাঁ হাতে 'আবার খায় নাকি' বলে আবার দৌড়ে পালিয়ে গেল রিণু।

কিছু খাম মৌরীর দিকে ঠেলে দিতে দিতে মঞ্জু বলল—তোর কিন্তু এমন হাত গুটিয়ে বসে থাকার কিছু মানে হয় না। তোর বন্ধুদের নামগুলো অন্তত লিখে আমাকে সাহায্য করতে পারিস।

—দেব। গা ধুয়ে এসে নি।

হঠাৎ ছোটদের উল্লসিত কলরব ভেসে এল নীচ থেকে—কাকু, কাকু এসেছে। দু বোনও ছুটল নীচে। পিসীমা উঠলেন উলু দিয়ে।

তার পরের দুটো দিন একেবারে নাম সার্থক করা বৃষ্টি নামাল আষাঢ়। উপুড় করে ঢেলে দাওয়া ধারায় ঝর ঝরে ক'রে ঝরে চলল সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল, মুহূর্তের জন্যেও না থেমে। কিন্তু যতীন বাবু সে জন্যে কোন কাজ থেমে থাকতে দিলেন না। বৃষ্টি যদি কালও বন্ধ না হয়, তার পরও না হয়? আষাঢ় মাস, অসম্ভব কি? এরই ভেতর ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন ক'রে চলল ওরা। ঠাকুর এসে ঠিক করে গেল রান্নার ঠিকে। ডেকোরেটার এসে বৃষ্টিঝরা ছাদের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ ক'রে গেল, কটা পাখা, কটা কার্পেট, কত চেয়ার দরকার হবে।

যতীন বাবু বৃষ্টিটার ওপর বিরক্ত নন মোটেই। এই অন্ধকার দিন তাকে সামনে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের কথা বলছে। আষাঢ়ে বৃষ্টির ভয় তার ছিল। এমন বৃষ্টির পর সামনের দিন কটা শুক্‌নো হ'তে বাধ্য।

বারান্দার জমা জলে, পাতলা পায়ের ছপছপ শব্দ তুলে মৌরী ওর আজকের বই দেখে রান্না করা মটন কাবাব পরিবেশন করে চলল, সবার ঘরে ঘরে। বৃষ্টি ! বৃষ্টি! বৃষ্টি! এমনি একটা বৃষ্টি সুদর্শন চায় বেশি আষাঢ় রাতের জন্যে। হাঁ, সে কথা ও লিখেছে ওকে জন্মদিনের সম্ভাষণে। চাওয়ার এত জোর ছিল, অতিথি কিছু আগেই এসে পড়েছে। ঠোঁটের ভাঁজটা দাঁতে চেপে ভিজে হাওয়ার ঝাপটার শরীরটাকে শিউরে তুলে ঘরে গিয়ে ঢুকল মৌরী। খাটের ওপর বালিশে বুক চেপে মঞ্জু যেন কি লিখছিল। কলম রেখে উঠে বসল সে। মৌরীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রল, কি বলছেন সুদর্শন বাবু?

— সুদর্শন বাবু! তিনি এসেছেন নাকি?

—এসেছেন বলিনি। বলেছি, কি কথা হচ্ছে?

—বুঝল মৌরী। মুখটাকে হঠাৎ গম্ভীর ক'রে ফেলল সে। বলল, কথা বেতারে হচ্ছে বুঝি?

—মনের তারে হচ্ছে। ইথার-তরঙ্গ যে তরঙ্গের কাছে হার মানে। বেতার-তরঙ্গ যে গতিতে বার্ত্তা পৌঁছে দেয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে যে বার্তা নিয়ে আসে।

অন্য কথায় চলে গেল মৌরী। তুই দুপুর থেকে উপুড় হয়ে লিখছিস কি?

—লিখছি কোথায়? হাত দিয়ে কাগজগুলো নাড়াচাড়া ক'রল মঞ্জু। চেষ্টা করছি। ভেবেছিলাম এক ফাঁকে গিয়ে বিতর্কটায় যোগ দিয়ে আসব। তা ঐ দেখ। আঙ্গুল দিয়ে মৌরীকে খাটের ধারটা দেখিয়ে দিল মঞ্জু।

অসংখ্য ছেঁড়া কাগজে ভরে উঠেছে সে-জায়গাটা। মঞ্জু বলল— তবু পয়েন্ট খুঁজে পাচ্ছিনে। মাথার ভেতর বিয়ে কথাটা থাকলে কোন কাজ হ'তে চায় না, তা নিজেরই হোক আর অন্যেরই হোক। মেঘটাকে কত বলছি— দাও না আমাকে কিছু যুগিয়ে—তা কেবল বোকার মত চোখের জল ফেলছে। বুদ্ধি নেই, কেবল ভাবে-ভরা ফানুষ। কিন্তু চা কই, তোর মটন কাবাব কই?

—নিয়ে আসছে বৌদি।

মঞ্জু বাইরের দিকে তাকিয়ে সেদিকেই চোখ রেখে বলে চলল— এই যে বৃষ্টি! হয়ত এই বৃষ্টি লক্ষ্ণৌ শহরেও ঝরে চলেছে অবিরল ধারায়। ঝরে চলেছে সুদর্শন বাবুদের প্রাসাদ-বাড়ীর ওপর, তাদের গোলাপ-বাগিচার ওপর, কাচের সার্সি-দরজার ওপর। শোবার ঘরে লাল-হলুদ মেশানো ডানলোপিলো সেটটায় বসে আছেন সুদর্শন বাবু—হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সামনে চীনে শিল্পীর নিপুণ হাতের কাজ-করা চায়ের কাপ, তাতে সোনালী চা। সোনালী চা থেকে পাতলা কুয়াশার মত ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প। লেসের পরদা দুলিয়ে গোলাপ-বাগানের সহস্র গোলাপের গন্ধ-ভরা বৃষ্টিবিন্দু এসে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক স্প্রে করা গোলাপ জলের মত। সামনের শূন্য কৌচটাকে শূন্য মনে হচ্ছে না। হাতটা কৌচের ওপর রেখেছেন না তো যেন রেখেছেন তোরই হাতের ওপর। তারপর? কৌতুকে চোখ দুটো চক্‌চক ক'রে তুলে বাইরে থেকে মঞ্জু চোখ ফেরাল এবার মৌরীর দিকে।

মঞ্জু যে রোম্যান্টিক আবহাওয়াটা তৈরী করেছিল, তা যে মৌরীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কাঁপিয়ে না তুলছিল তা নয়। কিন্তু সুখের চাইতে দুঃখটাই যেন ওর হৃদয় মথিত ক'রে তুলল বেশী। ওর মনে হ'ল, মঞ্জু যেন এইমাত্র ওকে রেখে এল লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে। সে চলে গেছে, এখান থেকে, এ বাড়ী থেকে। সন্ধ্যার আঁধার নেবে আসবে, কুলায়ফেরা পরিচিত পাখীটা এসে বসবে ওদের জানালার ওপর। ঠোঁট দিয়ে ঝাড়বে পিঠ। মঞ্জু একা বসে বই পড়বে, নয়ত বসে থাকবে চুপ করে, সেই অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে-থাকা নারকেল গাছটার দিকে তাকিয়ে। নববধূ মমতা ওদের কাছে শুনবে ওরই গল্প, ওরই কথা। সাত দিন—আর সাত দিন এখানে আছে ও ওদেরই মাঝে, ওদের একজন হয়ে। এমন সন্ধ্যা, এই সম্পর্ক আর ফিরে আসবে না। টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়া চোখের জল রুখতে পারল না মৌরী! — আর সাত দিন পর, তুই কোথায় মঞ্জু, আর আমি কোথায়?

—ঘা পড়ল মঞ্জুর বুকের ভেতর। গলার মাংসপেশীগুলো ফুলে ফেঁপে বন্ধ হয়ে গেল ওরও। শব্দ ক'রে হেসে উঠল মঞ্জু।

—নাঃ, তুই একেবার কিচ্ছু না রে দিদি। কোথায় তোকে একটু আকুলতার মধুরতায় বিহ্বল ক'রে তুলতে চাইলাম, তা কি না উল্টো ফল হ'ল! গুনগুনিয়ে উঠল ও—অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভ'রে।

—আচ্ছা তুই চল না আমার সঙ্গে।

—কোথায়, তোর শ্বশুরবাড়ী? পাগল না কি?

— কেন হয়েছে কি তাতে? আগে তো নিয়মই ছিল।

— সে নিয়ম কি তোর আমার মত বুড়ো মেয়েদের জন্যে ছিল?

দরজা থেকে কথাগুলো শুনতে শুনতে অমিতা এসে ঘরে ঢুকেছিল। হাতের চা-খাবার টেবিলে নামিয়ে রেখে আশ্চর্য্য কণ্ঠে বলল— তোমার বিয়ের দশ দিন বাদে বাড়ীতে আর একটা বিয়ে, সে কথা ভুলে গেলে নাকি তোমরা?

—মাথা ঝাঁকাল মৌরী—একটুও ভুলিনি। সাত দিন বাদে দুজনেই রওনা হয়ে পড়ব।

—কলেজ আছে না আমার? চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিল মঞ্জু।

— পড়া-শুনা তো ছাই করিস। আজ নাটক, কাল এক্সকারসন, পরশু বিতর্ক, এই নিয়েই তো আছিস। আচ্ছা, দিল্লী আগ্রা বেড়িয়ে আসতে পাঠিয়ে দেব তোকে?

—দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা? দিল্লীর দরবার। মন্ত্রীতন্ত্র। লোভনীয়, লোভনীয় আমন্ত্রণ। বাসর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরও যদি তোর মত না পালটায়, তবে ঠিক যাব।

—পালটাবে না, নিশ্চয়ই পালটাবে না। উঠে মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরল মৌরী।

অমিতা উঠে কাবাবের ডিস হাতে তুলে দিয়ে বলল—কি পাগল মেয়ে বাবা।

আর কাঁটা ফুঁড়ে কাবাব তুলতে গিয়েই মঞ্জুর মনে পড়ে গেল সেদিনের ফিরপোর ডিনার, ওর হাত থেকে হঠাৎ ছুরি কাঁটা টেনে নেওয়া, বড় রোষ্টের টুক্‌রোকে ছোট ক'রে এগিয়ে দেওয়া।

রাত্রে চিন্তা করল মঞ্জু শুয়ে শুয়ে—ভদ্রলোকটিকে নেমন্তন্ন না করা অন্যায় হবে। দিদিকে কথাটা বললে কি বলতে পারে, সেটাই ভাবতে চেষ্টা ক'রল ও। সে নিশ্চয়ই বলে উঠবে— বেশ তো ছোড়দাকে পাঠিয়ে দে। কিন্তু সে নেমন্তন্নের কিছু অর্থ হয় না। নেমন্তন্ন করা উচিত ওর নিজের গিয়ে। কেনই বা যাবে না? ভয়? হাসল ও।

কিন্তু মমতাদের বাড়ী যত সহজে বের ক'রে মৌরীকে অবাক ক'রে দিয়েছিল, তত সহজে রজতের হোটেল খুঁজে বের করতে পারল না সে। এই তো গ্রাণ্ড হোটেল। কিন্তু ঢুকব কোথা দিয়ে? সব যে দেখতে পাচ্ছি দোকান। বারটা বাজে, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। দলে দলে ভিতরে ঢুকছে, নানা দেশী, বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ। এটাই কি তবে? দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়। সোজা এগিয়ে গেল ও। কি নামে খোঁজ করবে, ওদের বাড়ীওলার উপাধি কি, জেনে এসেছিল মঞ্জু। জিজ্ঞাসা করল—আর, গুপ্ত, কোন্ রুমে থাকেন? এতে জবাব না মিললে কিছুই আশ্চর্য্যের ছিল না। জবাব মিলল যে সেটাই আশ্চর্য্য। হয়ত রজত বলেই মিলল; তার মস্ত গাড়ী, ছিটানো বখ্‌শিসই তার কারণ। নাম শুনে মস্ত এক সেলাম ঠুক্‌লো সে। সেই ওকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করল রজতের কাছে। লিফ্‌টে উঠে ক'তলায় গিয়ে নামল, বলতে পারবে না মঞ্জু। বয়ের পেছনে গিয়ে, একটা বন্ধ দরজায় দাঁড়াল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বয় জানাল— দেখা হবে না।

— কেন, বেরিয়ে গেছেন?

—নাঃ। বলে আঙুল দিয়ে একটা লেখা দেখিয়ে দিল সে। মঞ্জু দেখল, একটা সাদা কার্ডবোর্ডে ছাপা হরফে লেখা— ডোন্ট্ ডিসটার্ব। লেখাটা পাকা ব্যবস্থার, ইচ্ছামত খোলা যায় এবং টাঙানো যায়। ঘরে আছেন ভদ্রলোক, আর দরজা থেকে এসে মানুষ ফিরে যাবে তার সুবিধের জন্যে? উল্টো পক্ষের সুবিধে-অসুবিধে আছে না? ও ভাবল, গ্রাহ্য করবে না। ধাক্কা দেবে দরজায়। কিন্তু যদি বয় আপত্তি করে? সম্মান থাকবে না। কাগজের টুক্‌রোয় নাম লিখতে গিয়েও থামল। রজত ওর নাম জানে না। একটু ভাবল সে।

তারপর নিজেদের বাড়ীর ঠিকানাটা লিখে বয়ের হাতে দিয়ে চলে এল মঞ্জু।

সন্ধ্যায় কাগজটা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল রজত। কেন তাকে ডাকা হয়নি, অস্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও গেল থেমে। তারই তো নিয়ম। এগারটার পর সে ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে, ডিনারের আগে পর্য্যন্ত তাই চলে। আর দরজায় ঝোলানো থাকে ঐ কার্ডটা। তাই সে জানতে চাইল—আবার আসবে কি না, বলে গেছে কিছু?

বয় জানাল, সে বলতে পারবে না। অন্য বয়ের হাতে দিয়ে গেছে। ডাক তাকে, এল সে। না মেমসাহেব কিছু বলে যায়নি।

পরের দিন—ডোণ্ট ডিসটার্ব লেখা কার্ডটা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে রেখে দিল। আর তার বয়—এটা খুঁজে না পেয়ে অফিস থেকে আর একটা এনে ঝুলিয়ে রাখল।

—আজও সেই কার্ডটা ঝুলছে? থমকে দাঁড়াল মঞ্জু। ভদ্রলোকটি ঘুমোন না কি এ সময়? ঘুমোন তো উঠবে! আর আসতে পারবে না সে। ব্লাউজ থেকে টেনে কলমটা বের ক'রে সেটা দিয়ে মঞ্জু টোকা দিল দরজায়। মনে আশা ছিল, তবু বিশ্বাস করতে না পারার আনন্দ নিয়ে অভিবাদন জানাল রজত—আসুন, আসুন।

ভেতরে ঢুকল না মঞ্জু। বলল—এখান থেকেই সেরে যাব।

— কেন?

—আপনারই নিষেধ ঝুলানো রয়েছে দরজায়।

মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল রজত কার্ডটা। কি সর্ব্বনাশ!

—ভাগ্যিস আপনি ইংরেজী এটিকেটের ধার ধারেন না। আসুন, ভেতরে আসুন, আমি আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।

—আমি তো বলে যাইনি, আজ আসব। ঘরে ঢুকল মঞ্জু।

—যদির ওপর। নিশ্চয় থাকলে তো দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। এই দেখুন। বলে রজত কাগজের ঝুড়িতে পড়ে থাকা কার্ডটা দেখাল ওকে। এটা সরিয়ে রেখেছিলাম। ওরা সাহেবের নিয়মের খবরটাই রাখে। অনিয়মের আগ্রহের খবর জানে না। বসুন।

ভেতরে ঢুকে মঞ্জু একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, চোখে বিস্ময় ঠেকে, এমন কিছু ঐশ্বর্য্যের চেহারা আজ আর বড় নেই। এয়ার কণ্ডিসন ঘর। মেঝে থেকে দেয়ালের অর্দ্ধেক অবধি কার্পেট আর ভেলভেটে মোড়া। ঘরটা সবুজে সবুজময়। শুধু দুটো আলাদা করা খাটের বিছানা, সাদা সিল্কের লেপ, বালিশ, তোষক। মাঝখানে থিয়েটারের ষ্টেজের মত এক দিকে নাইলনের ঘন কুচির পরদা টাঙ্গানো। সেই পাতলা আবরণ ভেদ ক'রে দেখা যাচ্ছে ওপিঠের ড্রেসিং টেবিল, আলনা, কাপড়-চোপড়, ট্রাঙ্ক, জুতো। দিনের আলোবর্জ্জিত ঘরে নিয়নের স্নিগ্ধতা। কে বলবে, বাইরে এখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য জ্বলছে? দুটো দিন পর আবার আলোয় সহর ভরে গেছে। অজগরের মত রাস্তাগুলো তার ভিজে শরীর শুকিয়ে নিচ্ছে সেই রোদে।

—তারপর? আমার এই সৌভাগ্যের কারণ? ঝুঁকে বসল রজত।

—বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এলাম।

—কার? তোমার? বলেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর একবার পায়চারী করে বলল রজত—তুমি বলে ফেললাম বলে কিছু মনে করো না। আপনি বলতে তোমাকে আমার কষ্ট হচ্ছিল। বয়সে অনেক ছোট তুমি। কি বল, পারি তো বলতে?

—বেশ তো বলবেন। বিশে আষাঢ়, সামনের শুক্রবার বিয়ে। মঞ্জু চিঠি বাড়িয়ে দিল রজতের দিকে।

মঞ্জুর হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়ল রজত। ফের ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে রেখে দিল টেবিলের ওপর। একটা ঢিলে সিল্কের পাজামা আর পাঞ্জাবীর ওপর ড্রেসিং কোট চাপান তার। খালি পায়ে কার্পেটের ওপরেই হাঁটছিল সে। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে ইংরেজী তারিখটা মনে মনে ঠিক করে নিয়ে বসল সে। বলল—নিশ্চয়ই যাব।

—ঠিক যাবেন কিন্তু। বলে এবার উঠে দাঁড়াল মঞ্জু।

—এ কি, উঠলে যে?

—এবার যাব আমি।

—বলো কি? উঠে পথ আগলে দাঁড়াল রজত। কিছু না খাইয়ে বাড়ী থেকে ছাড়ে না কি কেউ?

—এটা তো আপনার বাড়ী নয়?

—তাই সুবিধের অন্ত নেই। হুকুম করলেই হ'ল।

—তবু পাশ কাটাতে চেষ্টা ক'রল মঞ্জু। এটা কি খাবার সময় না কি?

—এটাই তো খাবার সময়।

—সে তো দুপুরের।

—তাই খাবে।

—পাগল না কি?

দু'হাত মেলে বাধা দিল রজত। বলল—বলছি বস।

—বাধা হ'ল ও বসতে। বলল—বড় জোর চা খেতে পারি।

—আচ্ছা বেশ তাই হবে। উঠে গিয়ে শিয়রের ফোনটা তুলে কি যেন কা'কে বলল রজত। তারপর তেমনি পায়চারী করতে করতে বলল—ক'দিন তোমার কথা আমি খুব ভেবেছি। তা অমন হয়। কি বল? তুমি কলকাতায়ই থাকবে তো?

—ক'দিনের জন্যে হয়ত লক্ষ্ণৌ যেতে পারি।

—তোমার কর্ত্তা লক্ষ্ণৌবাসী?

—এ্যা! এতক্ষণে বুঝল মঞ্জু, রজত ভুল বুঝেছে। বুঝতে পারে। ও তো কিছু বলেনি। মজা লাগল ওর। ভুলটাকে শোধরালো না সে।

বয় এসে ওদের মাঝখানের টেবিলটায় সাদা চাদর বিছালো। কাঁটা ছুরি চামচ চটপট হাতে সাজাল, প্লেট রাখল। চা ছাড়া কিন্তু কিচ্ছু খাব না।'

— কখনোই খেয়ো না।

—মে আই কাম ইন্? মিহি মেয়েলী গলা ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল একটি সুবেশা মেয়ে। গলা শুনে ভুরুতে যে ভাঁজটা ফেলেছিল রজত মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকলে সে ভাঁজটা মিলিয়ে ফেলল সে। বলল—এস বস।

মঞ্জুর মনে হ'ল যেন এক ঝলক আগুন ঢুকল ঘরে। লাল শাড়ী, ব্লাউজ, চুড়ি, গলার মালা, রিবন, ঠোঁট—সব লাল। মেয়েটি ইংরেজীতে বলে উঠল—আমি দুঃখিত।

ঠান্ডা গলায় রজত বলল, বস। বসতে গিয়েও যেন একটু থামল সে। রজতের দিকে তাকিয়ে যেন অনুমতি চাইল— বসব?

কিন্তু বসল রজত কিছু বলবার আগেই। 'তার পর হঠাৎ।' জিজ্ঞাসা করল রজত। মেয়েটি তার ছোট্ট আয়নার চুল ঠিক করতে করতে বলল—হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হওয়াটা, হঠাৎ কেমন যেন তোমার একেবারে কমে এসেছে। তাই দেখতে এসেছিলাম ব্যাপারটা কি? একটা অর্থপূর্ণ চাউনি দিল মেয়েটি মঞ্জুর দিকে।

মঞ্জুও তাকিয়েছিল ওরই দিকে এক লক্ষ্যে। সামনে পেছনে সমান 'ভি' সেপের কাটা ব্লাউজ। বাহু, বুক পিঠ, কোমর প্রায় সবই বে-আবরু। রজতের দৃষ্টি ঘুরে এল দু' দু'বার মেয়েটির শরীরের ওপর।

—খাবে? বলব দিতে? গলার স্বরটা যেন নরম হয়ে এসেছে রজতের।

—ড্রিঙ্ক কোথায়? এদিক ওদিক তাকাল সে—হাউ স্ট্রেঞ্জ! লাঞ্চ খেতে বসেছে—উইদাউট ড্রিঙ্ক! আমাকেও তাই অফার করছ?

এবার মঞ্জু উঠে দাঁড়াল সোজা। আর রজতের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, তোমায় এমন ডিসটার্ব করলাম বলে, আমি সত্যি দুঃখিত। আজ দরজায় দেখলাম তোমার সেই— ডোন্ট ডিসটার্ব কার্ডটা ঝুলছে না। একটু হাসল সে—আজই যে তুমি বেশী ডিসটার্বড হবে, এ আমি বুঝব কি ক'রে?

সে পেছন ফিরতেই রজত জিজ্ঞাসা করল—টাকা আছে তো সঙ্গে?

ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে উঠল মেয়েটি— ধন্যবাদ! এ জন্যেই তোমাকে এত ভালো লাগে রজত।

ড্রয়ার খুলে কি দিল রজত সেই জানে। হাসিমুখে চলে গেল মেয়েটি। মেয়েটির চলে যাওয়ার সময়টুকু অপেক্ষা করল মঞ্জু— তারপর সে-ও হাঁটা দিল। রজত এবার আর বাধা দিল না, শুধু বলল— চল তোমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

— গাড়ী? আপনি, বুঝি মনে করেন বাঙ্গলা দেশের সবারই গাড়ী আছে?

—আমার গাড়ী তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—ধন্যবাদ! আমি গাড়ীতে চড়িনে।

জবাবের কাঠিন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রজত!

যে মনোভাবটা নিয়ে রজতের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মঞ্জু, সেই মনোভাবটা নিয়েই উপরের লম্বা করিডোরটা পার হলো সে। কিন্তু লিফটে নামতে নামতে ওর মনে হলো, নিজেকে অমন হঠাৎ ও শক্ত করে তুলল কেন। কারণটা বুঝতে কষ্ট হলো না। দিদি এ অবস্থায় যা করতো অজ্ঞাত অনুসরণে ছোট বোন হিসাবে সেটাই সে করেছে— ভেতরে ভেতরে কাজ এগুচ্ছে তো দিদি মন্দ নয়! মনে মনে একটু হাসল মঞ্জু। লিফট থামিয়ে লিফটম্যান দরজা খুলে দিলে, দুদিকের সাজানো দোকানের মাঝখানের কার্পেট-বিছানো করিডোরটার উপর দিয়ে, বেশ রপ্ত পায়ে হাঁটা দিল সে। গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে ফুটপাতে। ফুটপাতের ছাদের তলা থেকে মুখটাকে একটু বাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে খুঁজে দেখতে লাগল ট্রাম-ষ্টপেজটা কোন দিকে।

—জী!

অপরিচিত কণ্ঠের 'জী' সম্বোধনে ফিরে তাকালো মঞ্জু। চিনল। এ রজতের ড্রাইভার। গলাটা পরিচিত নয়, কারণ এর কথা ও শোনেনি কিন্তু রজতকে যে ক'বার দেখেছে একেও দেখেছে সেই ক'বার। তাই মুখটা বেশ পরিচিত। ও তাকাতেই ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আপকো গাড়ীমে পৌঁছা দেনা পড়ে গা?

বিস্মিত হলো না মঞ্জু। প্রথম দিনের সেই অপ্রিয় ঘটনার সময় এই লোকটিই গাড়ীর দরজা খুলে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল তার সাহেবকে আড়াল করে। পরের দিনও তার সাহেবকে সে-ই নিয়ে এসেছিল ওদের বাড়ী। বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল ওদের ফিরপোর ডিনারের পর। আজও সে ওকে তার সাহেবের হোটেল থেকেই বেরিয়ে আসতে দেখেছে— পৌঁছে দিতে হবে কি না জিজ্ঞাসা করতে পারে সে। মঞ্জু বললো—কিন্তু খুবই অসুবিধার ভেতর। কারণ সে ওর ভাষা জানে না। কোন মতে হাত মাথা আর সেই হাঁ-এর সাহায্যে বোঝাল—পৌঁছে দেবার দরকার হবে না। ষ্টপেজটা কোন দিকে দেখিয়ে দিলেই হবে।

—ডান দিকে। পেছন থেকে জবাব দিয়ে পাশে দাঁড়ালো রজত।

ড্রাইভার তার রীতিমাফিক সেলাম ঠুকে চলে গেলো। রজত ডান দিকের রাস্তাটা মঞ্জুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো—চলো, তুলে দিয়ে আসি।

আপনি খাওয়া ফেলে উঠে এলেন?

অসন্তুষ্ট অতিথি ঘরে ছেড়ে চলে এলে সে খাওয়া আর কারু মুখে রোচে?

ট্রাম-ষ্টপেজটা ডান দিকে, তাই মঞ্জু ডান দিকে চোখ রেখে বললো—আমি তো আপনার অতিথি ছিলাম না! নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম, নেমন্তন্ন করে চলে যাচ্ছি।

নেমন্তন্নটাও তুলে নিয়ে যাচ্ছ নিশ্চয়?

সে কি! বড় বড় চোখ করে রজতের দিকে তাকালো মঞ্জু। নেমন্তন্ন ফিরিয়ে নেবো কেন? কি যে বলেন! নিশ্চয়ই যাবেন কিন্তু। নইলে ভীষণ দুঃখিত হবো। দু'দিন এসেছি মনে রাখবেন।

পর পর দুটো ট্রাম ঘর ঘর শব্দে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। দূরের ষ্টপেজটার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু বললো— আমি চলি। কিন্তু আপনি আর আসবেন না। খাওয়া ফেলে উঠে এসেছেন। আমার ভাবতেই খারাপ লাগছে। নমস্কার জানিয়ে সেদিন যাবার জন্য ফের অনুরোধ করে মঞ্জু হাঁটা দিয়ে দেখল, রজতও তার সঙ্গে হাঁটছে। বললো অযথা কষ্ট করছেন। ঐ তো ষ্ট্যাণ্ড। যাবো। ট্রামে আসবে উঠে পড়বো। কোন মানে হয় না এই রোদে হাঁটার। তাতে অনভ্যস্ত আপনি।

অযথা কষ্টের যত মানে হয়, তত মানে কি তোমার যথার্থ কষ্টের হয়? বাবার হাত থেকে আমার মান রক্ষা করলে— দুদিন কষ্ট করে এলে—একটা কৃতজ্ঞতা আছে না? আমাকে সর্বরকমে অপদার্থ ভেবো না তুমি।

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেটের টিন বের করে একটা সিগারেট তুলে ঠোঁটে চেপে টিনটা ফের পকেটে ভরল সে। তারপর দেশলাই বের করে ধরালো সিগারেট। জ্বলন্ত কাঠিটা ঝেঁকে নিবিয়ে ফেলে দিতে দিতে বললো—বিয়ের দিন গিয়ে নিশ্চয়ই নেমন্তন্নও খেয়ে আসবো—মিসেসের সঙ্গে মিষ্টারকেও দেখে আসবো; কিন্তু তোমাদের দুটিকে নেমন্তন্ন করবার সুবিধে সেদিন হবে, মনে হয় না। এমন কোন সঙ্গত কারণ নেই যে,

কবে আসবে যাবে তোমরা তা আমি জানব। তাই আজকেই তোমাদের নেমন্তন্ন জানিয়ে রাখছি। আজ তা খেলে না। মিষ্টারটিকে নিয়ে একদিন আমার এখানে লাঞ্চ, ডিনার যেটা সুবিধে তোমাদের—খেলে খুবই খুশী হবো। খবর যদি দাও তো গিয়ে নিয়ে আসতেও পারি।

ভদ্রলোকের ভুলটা মঞ্জুকে আমোদ দিচ্ছিল। সে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে জানালো—খবর-টবরের দরকার হবে না। হঠাৎ এসে উপস্থিত হওয়া যাবে। অসুবিধা তো নেই। হুকুম করলেই যখন হয়।

ষ্ট্যাণ্ডে এসে রজত রাস্তার উল্টোদিকস্কার অফিস-বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে সিগারেট টেনে চললো। আর বিয়ের দিন অভ্যর্থনারত ওকে দেখে রজতের দু'চোখ ভরা বিস্ময় কল্পনা করে মঞ্জুর ঠোঁটে খেলে গেল একটা চাপা কৌতুকের ঢেউ।

আবহাওয়াটার ভেতর কিন্তু তখন কোথাও এক কণা কৌতুক ছিল না—রহস্য ছিল না। মাথার উপর কড়া সূর্য্য। দুদিনের বৃষ্টিভেজা মাটি সূর্য্যতাপে শুকিয়ে নিচ্ছে তার পিঠের তল। সে জল অদৃশ্য বাষ্পাকারে উঠছে উপর দিকে। রোদের ভাপে তাপে মানুষগুলোর অবস্থা হয়েছে যেন সেদ্ধ হওয়া মতো। তার উপর রজতের অতিমাত্রারয় ঠাণ্ডাঘর থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে ও। স্যাঁতস্যাঁতে ঘামে শরীর ভিজে উঠলো মঞ্জুর। ওর রুমাল থাকে না। কেবল হারিয়ে যায়। শাড়ীর আঁচল দিয়ে ভেজা কপাল মুছল মঞ্জু। কি গরম! বলে অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টেনে চলা রজতের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ কেমন যেন মায়াবোধ করে সে। এরই ভেতর রোদে রজতের তামাটে মুখটা আরো তামাটে হয়ে উঠেছে। চুল উঠে-যাওয়া চওড়া কপাল ভিজে উঠেছে ঘামে। বাতাসশূন্য আবহাওয়াটা যেন চেপে ধরেছে তাকে। ওরই জন্য ঠাণ্ডা ঘরে ফেলে এই রোদে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। কিন্তু ট্রামের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। রোদের আলোয় চকচক করছে লাইন দুটো। খারাপ লাগতে লাগল মঞ্জুর।

ওর চঞ্চল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রজত বললো—ব্যস্ত হয়ে কিছু লাভ নেই। পর পর দুটো ট্রাম তোমাদের লাইনের গেছে। ট্রাম এলেও তোমারটা পেতে আরো আধ ঘণ্টা তো বটেই।

যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে ফের হাঁটা দিল মঞ্জু—দয়া করে আপনার চালকটিকে যদি আমায় একটু পৌঁছে দিতে আদেশ করেন—

হ্যাঁ, একেবারে বাজে আত্মম্ভরিতা। একটা অপেক্ষা-করা গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ে ট্রামের পথ চাওয়া।

ড্রাইভার ছিল না গাড়ীতে। হর্ণ বাজালো রজত। গাড়ীর দরজা খুলে দিল মঞ্জুকে উঠবার জন্য। উঠে বসে মঞ্জু বললো— রোদে আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ীটাও দেখুন রেগে আগুন হয়ে আছে।

গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে রজত বললো —একেবারে বিয়ের দিন ঠিক করে বসে আছ। নইলে গাড়ী চালানো বিদ্যাটি দিব্য শিখতে পারতে।

—বলেন কি! সত্যি? আমি কিন্তু গিয়ে ঠিক বিয়ে ভেঙ্গে দেবো।

—দিও। বলে হাসিমুখে দরজা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ালো রজত— সেদিন গিয়ে দেখবো কি করলে।

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়ীতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিয়েছে। গাড়ী ছেড়ে দিলে হাতল ঘুরিয়ে কাচের জানালাটা তুলে দিতে দিতে মঞ্জু মনে মনে বললো—মানুষের দেখার কতটুকু দেখাই বা ঠিক দেখা! মানুষের বোঝার কতটুকু বোঝাই বা ঠিক বোঝা। এই দেখা আর বোঝার কোন মূল্য নেই। আর কার সঙ্গে কে কি ভাবে চলছে। সে চলা ভালো না মন্দ, তা দেখার দায়, তার জন্য ব্যবহারের ধমক দেওয়ার দায়ও ওর নয়। ও যতক্ষণ ভালো দেখবে ততক্ষণ নিশ্চয়ই ও ভালো ভাববে। ভদ্ররীতির ব্যবহার করবে।

মঞ্জুকে দেখে ডাক দিল অমিতা—একেবারে খাবার টেবিলে চলে এসো। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

খাবার ঘরে এসে ঢুকল মঞ্জু। অমিতা মৌরীর দিকে তাকিয়ে বললো—বাঃ স্নান-টান করে জলেধোয়া পদ্ম দুটির মতো তোমরা দুজনে বসে আছে। আর আমি এই চেহারা নিয়ে তোমাদের মাঝখানে এসে বসবো? শুরু করো তোমরা। দু'মিনিটে স্নান সেরে আসছি।

ঠিক দু'মিনিটেই এলো মঞ্জু। শাড়ী-ব্লাউজের এখান ওখান ভিজে। মাথার জল টপ টপ করে ঝরে পড়ছে পিঠের উপর।

মৌরী গম্ভীর ভাবে বললো—স্নান করে এলেও তোকে কিন্তু একেবারেই জলে-ধোয়া পদ্মটির মতো লাগছে না।

—যে যেমন, তাকে সে রকম লাগবে। পদ্মের মতো নয়— আমাকে লাগবে বৃষ্টিভেজা অপরাজিতাটির মতো। রূপে অর্থে এক।

অমিতা বললো— যে ভাবে গা মাথা পা মুছেই এসেছ, তাতে বৃষ্টিতে ভেজাই মনে হচ্ছে তোমায়।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল—ঐ যে অত বড় একটা গাড়ী থেকে নামলি—গাড়ীটা কার?

কাসুন্দির ঝাঁঝে নাক-মুখ কুচকে বাঁ হাতের তালুতে মাথা ঘষতে ঘষতে মঞ্জু বললো—বন্ধুর।

—মেয়ে না ছেলে? দুষ্টু দৃষ্টিতে তাকালো অমিতা।

—ছেলে।

—বাঃ মস্ত সুখবর। এতো দিন বলোনি কেন?

— কি বলিনি কেন? দিদির বিয়ের পাঁচ দিন আগে বৃহস্পতিবার বেলা একটার সময় গাড়ী আছে, এমন একজন কেউ আমায় তার গাড়ী দিয়ে বাড়ী পৌছে দেবে?

চোখ পিটপিট করলো অমিতা—আরো একটু কিছু।

বাসুদেব হাতা কেটে বাঁ হাতে ভাত নিতে নিতে বললো— তোর বন্ধুকে বলিস, মৌরীর বিয়ের দিন গাড়ীটা দিতে। বর আনতে ঐ গাড়ীটা নিয়ে গেলে প্রেসটিজই বেড়ে যাবে আমাদের—কি বলো বৌদি?

মৌরী কোন কথা বলছিল না। মঞ্জু ওর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মুখ নিচু করে হাসল। আরো গম্ভীর হলো মৌরী। ঘরে এসে চাপা ঠোঁটে জিজ্ঞাসা করলো—কার গাড়ীতে এলি? সত্য কথা বলবি?

—সত্যটা লুকোই নি বলেই তুই সত্যটা বুঝছিস। মিথ্যা বলতে চাইলে কি তুই ধরতে পারতিস?

—আমি বা বুঝেছি তা তবে সত্য? তুই ঐ লোকটির হোটেলে গিয়েছিলি?

—গিয়েছিলাম। মাথা কাত করলো মঞ্জু। ভদ্রলোকটিকে বিয়ের একটা নেমন্তন্ন করা উচিত কি না তুই বল?

—সে নেমন্তন্ন তুই ইচ্ছা করলেই ছোড়দাকে পাঠিয়ে করতে পারতিস। সে যাক্, বন্ধু বললি কেন?

পাউডারের কৌটোটা নিয়ে পিঠে বুকে চুলে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে পাউডার ঢালতে লাগল মঞ্জু। আর মুখ নিচু করে করতে লাগল হাসি গোপন।

—কি বললি না, বন্ধু বললি কেন?

—লোকটিকে আমার সত্যি ভীষণ বন্ধু-বন্ধু মনে হচ্ছে।

বলেই মুখ তুলে হেসে ফেলল সে। আচ্ছা, এছাড়া বলতাম কি? একজন ভদ্রলোকের গাড়ী বললে, তক্ষুণি প্রশ্ন হতো, কে ভদ্রলোক। কি নাম। কোথায় থাকে। কি করে। তারপর তোর মুখের চেহারার মতোই হতো সবার চেহারা। ছোড়দা ভারিক্কী চালে বলতো—কাজটা ভালো হয়নি।

—কাজটা ভালো হয়নি, এ আমি তোকে বলছি। শুধু বলছি না, সাবধানও করছি। এতো বেপরোয়া ভাব ভালো নয়। কিছু ভয়-ডর থাকা ভালো।

ভিজে চুল বালিশে ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মৌরী।

হাতের পাউডারের কৌটোটা রেখে দিয়ে মঞ্জু বললো— মানুষ বাঘ নয় যে খেয়ে ফেলবে। আমি তোদের একথা কিছুতেই মানিনে দিদি! একজনের সুন্দর দিকটা সত্য নয়— সত্য শুধু তার অসুন্দর দিকটা। এ তোদের গড়ে রাখা ধারণা। সত্য দুটোই। তার একটা ফেলে আর একটা ধরে বসে থাকবো কেন?

দুটোই যখন সত্য, তখন একটার পর আরেকটা নিশ্চয়ই আসবে। সুন্দরের পর অসুন্দরের অবির্ভাব নিশ্চয়ই বাদ যাবে না?

বলা যায় না। মানুষ জীবনের বেশীর ভাগটাই অভিনয়ের ভেতর দিয়ে কাটায়। সে যেমন বহু রকম পার্ট করে তেমনি গল্প বুঝে ভূমিকাও নেয়। যতই সে সর্ব অভিনয়-পারদর্শী হোক, এক গল্পে এক সঙ্গে সব অভিনয় সে কখনই করে না। কারণ তাতে জমে না।

মৌরী চুপ করে রইল। খোলা জানালাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বারান্দার টবের ফুলে ফুলে সাদা হয়ে থাকা জুঁই গাছটা। আর এক টুকরো রোদ ঝক্‌ঝকে আকাশ। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল মৌরী। রোদ ও সহ্য করতে পারে না, বেশী আলো ও পছন্দ করে না। বিষণ্ন আলোর সুরটাই যেন ওর মনের সুরের সঙ্গে বেশী ঐকতান তোলে। ঘরের ভেতর জুঁই ফুলের যে ছায়াটা রোদের পরদায় এখন দুলছে রাতের বেলা চাঁদের আলোয় পরদায় এর দোলা দেখে কত সময় যে ওর কেটে যায় তার ঠিক নেই।

ওর চোখঢাকা হাতের দিকে তাকিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল মঞ্জু। বললো, জানালা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু মাদাম, আমি আলো জ্বালছি।

একটু শান্ত হয়ে শোয়া কিংবা বসা একেবারেই অসম্ভব?

—একেবারে। হেসে টেবিল-বাতিটা জ্বেলে মৌরীর দিকে শেডটা ভালো করে টেনে বই নিয়ে বসল সে। আস্তে আস্তে বিশ্বসংসার মুছে গেল ওর কাছ থেকে। কিসের নেমন্তন্ন? কার বিয়ে? কে মৌরী, কে রজত? সেই বা কে? হাতের বই-এর নায়িকা জোয়ান অব আর্কের মধ্যে মিশে এক হয়ে গেল ও। গরু চরানো মাঠে বসে শুনতে লাগলো ঘণ্টাধ্বনি ঢং—ঢং—ঢং। সাহস করো। এগিয়ে যাও। ফ্রান্সের বড় দুর্দ্দিন। বই থেকে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো উঠে এসে ওর কানেও সেই ঘণ্টাধ্বনি পৌঁছে দিতে লাগল দৈববাণী—ওগো বিধাতার বর কন্যা, সাহস কর। এগিয়ে যাও। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। দেশের বড় দুর্দ্দিন।

হঠাৎ সানাই -এর শব্দ এলো কানে। বন্ধ দরজায় ছোট্ট ছোট্ট হাতের দুমদাম কিল পড়তে লাগলো—শীগগির এসো সী। বাজনা এসেছে। বায়না নিতে এসে বাজিয়ে শুনাচ্ছে ওরা।

বই বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে দরজা খুলল মঞ্জু। ছোটদের সঙ্গে নেবে গেল নীচে। ছোটরা ছুটোছুটি করতে লাগল আনন্দে। ছোটপিসীর গাড়ী এসে থামল দরজায়। তিনি নেমে চলে গেলেন ওপরে। কিন্তু সানাইয়ের দেশমল্লারের সুর ছাপিয়ে মঞ্জুর কানে বাজতে লাগল সেই ঘণ্টধ্বনি—ঢং। ঢং—ঢং—এগিয়ে চলো সাহস করো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

মৌরী পড়েছিল ঘুমিয়ে। হঠাৎ সানাই-এর শব্দে জেগে গেল সে। আর অন্ধকারপ্রায় ঘরে সেই দেশমল্লার ঘুমভাঙ্গা মৌরীর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল—বরবেশী সুদর্শনকে। আসর-আলো লোকজন ফুলচন্দন ধূ-গন্ধ। নিয়ে এলো সানাই পুরোহিতের মন্ত্রধ্বনি—

ওঁ পূণ্যাহম্।
ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।
ওঁ স্বস্তি।

হে দেবতা, তুমি পরস্পরকে পরস্পরের আরো নিকট কর, পরস্পর যেন অনুরাগের সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে— প্রিয় বলিয়াই যেন প্রীতি করিতে পারে।

কিছুদিন আগে একটা ব্রাহ্ম বিয়ে ও দেখেছিল। সেই বাংলায় পড়া মন্ত্র ওর ভালো লেগেছিল। মনকে নাড়া দিয়েছিল।

কিন্তু এই পদ্ধতির বিয়ে ওদের হবে না। হবে নারায়ণ সাক্ষী রেখে হোম-যজ্ঞ পূজা-অর্চনার ভেতর। একটা মস্ত ভিড় আর হাসি-কৌতুকের মধ্যে ওকে তাকাতে হবে সুদর্শনের দিকে। করতে হবে দৃষ্টিবিনিময়। সে দৃষ্টিবিনিময় শুভ বিনিময় না অশুভ বিনিময় হচ্ছে কেউ বলতে পারে না। তবু এর নাম শুভদৃষ্টি। নামটা যেন বিজ্ঞ আর অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাবধানবাণী। যেন বলে দেওয়া— জীবন-মঙ্গলের বনিয়াদ এই দৃষ্টিবিনিময়। দেখার মধুতেই জীবন মধুময় হয়। দেখার বিষেই হয় বিষ। প্রেম প্রীতি সখ্য—বাঁচ নয়তো মর। মৌরীর মনে হলো, সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে এটাই শুদ্ধ, সুন্দর এবং সত্য অনুষ্ঠান। এটাই হলো জীবনের প্রতি মুনিজনের বিজ্ঞতম অঙ্গুলিনির্দেশ। আর সব অনুষ্ঠান খেলা। একেবারে খেলা। কখনো ওর হাতের উপর হাত রাখবে সুদর্শন। কখনো দাঁড়াবে সে পেছন থেকে ওকে দু'হাতে বেষ্টন করে। দুজনে একসঙ্গে অঞ্জলি ভরে আগুনে বর্ষণ করবে লাজ। দেবে লাজাঞ্জলি। অর্থাৎ দেবে লজ্জা বিসর্জন। কান দুটো ঝাঁ করে গরম হয়ে উঠল মৌরীর। বালিশে মুখ চাপল সে।

কিন্তু তাতে এই হলো, কল্পনা গতি নিল। মনের ছবি আরো স্পষ্ট হলো। কারণ কল্পনা আর মনের ছবি অন্ধকারেই ফোটে ভালো। বৌদির পরিকল্পিত বাসরঘরের একরত্তি সজ্জাও এই অসজ্জিত ঘর চাপা দিতে পারল

না। ওদের বসবার ঘরটা রূপান্তরিত হয়ে গেল বাসরঘরে। মেঝেতে পাতা আধ হাত উঁচু বিছানা। ফুলদানীতে ফুল ভর্তি কামিনীগুচ্ছ, কোণে টেবিলে শেড ঢাকা সবুজ আলো। ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে গেছে ঘর। তবু অমিতা ফুলের ওপর সব দায় রেখে যায়নি। 'ফোর সেভেন ওয়ান ওয়ানের' শিশি উপুড় করে ঢেলে গেছে বিছানায় আর মৌরীর গায়।

কিন্তু মৌরী জানে, সহজে সুদর্শন সেদিন সহজ হবে না। যত সহজে ওকে প্রথম পরিচয়ে কাছে টেনে নিয়েছিল, তত সহজে সুদর্শন ওর কাছে সেদিন আসবে না। কথায় ব্যবহারে ব্যবধান রাখবে। তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের উপর আরো কিছুটা গাম্ভীর্য্য চাপিয়ে, ওর দিকে তাকিয়ে বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট ধরাবে।

কামিনীফুল পাখার বাতাসে দুলবে, বিছানায় সিল্কের ঢাকনাটা ঢেউ তুলবে—ওর মনে হবে যেন ওর বুক থেকে ওঠা ঢেউগুলোই সব কিছুর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

—দিদি।

—এই যে। বলে তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসল মৌরী। যে মেয়ে বাবা! ঠিক বলবে, জেগে ঘুমিয়ে শুয়ে আর কত স্বপ্ন দেখবি। নয়ত বলবে—ভাবনার গ্রাউণ্ড মিউজিকটা সানাই ভালোই জমিয়েছিল? কিন্তু অপরাহ্নের আলো এসে পড়া মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল মৌরী— কি হয়েছে রে? তোর মুখ অমন কালো হয়ে উঠেছে কেন?

—হার হাইনেস এসেছেন।

মৌরী জানে, ছোট পিসীকে হার হাইনেস, হার ম্যাজেষ্টি সম্বোধন মঞ্জু তখনই করে, যখন কোন কারণে তার উপর বেশী রকম ক্ষুব্ধ হয়। জিজ্ঞাসা করল— কি খবর নিয়ে এসেছেন?

—মমতা বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল—তার খোঁজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার অবস্থা হয়েছিল।

—হ্যাঁ, বেশ তো। সে সব খবর তো আমরা জানি।

—আমরা জানতে পারি ওদের কাছে নূতন এবং মারাত্মক। তার পর আমাদের কাছে নূতন এমন খবরও তাঁর সংগ্রহে আছে। মমতা নার্সের কাজ করে, সে পাসকরা নার্স।

—নার্স!

—হ্যাঁ।

প্রথমটায় একটা ঝাঁকুনি খেলো মৌরীও। বললো—ছোট পিসীকে খবরটা দিল কে?

—তাঁর উঁচুদরের যে ডাক্তার দেওরটিকে তেমন তেমন অসুখে আমাদের বাড়ী ডাকা হয়— সেই ভদ্রলোক। মেডিকেল কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে নাকি মমতা ইতস্তত তাকাচ্ছিল! ভদ্রলোককে দেখে মমতা এগিয়ে আসে এবং তার অসহায় অবস্থার কথা বলে সাহায্য প্রার্থনা করে—নার্সিং পড়তে চায়। তারই সহানুভূতিতে মমতা আজ একজন মেডিকেল কলেজের ষ্টাফ নার্স।

দাদারা কোথায়?

ছোড়দা বসবার ঘরে। দাদা এখন বাড়ী ফেরেনি।

কথাটা গোপন করে নিশ্চয়ই ওরা অন্যায় করেছে। কিন্তু সেই জন্য এখন কিছু করবার নেই। আর হ্যাঁ— করাই বা হবে কেন? নতুন কিছু নিতে একটু সময় লাগে। এতদিন পাস করা মেয়েতে আপত্তি উঠত। শিক্ষয়িত্রী ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। অফিস কাজ জাতে উঠেছে তাই বা আর ক'দিন।

ওরা যখন বাবার ঘরে এলো ততক্ষণে যতীন বাবুর ট্যাক্সি রাস্তার ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে। তিনি নাকি বলে গেছেন, বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এসে তবে অন্য কথা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'বোন। ওদের দেখে পিসীমা হাত-পা নেড়ে যে কত কি বলে চললেন, তার কিছুই কানে নিল না ওরা। ছোটপিসী যদিও তার ভারিক্কী চাল যথাসম্ভব বজায় রেখেই বসেছিলেন কিন্তু আজ তারও কষ্ট হচ্ছিল। স্বামীর বিলিতি ডিগ্রী, ভারী মায়না, ভারী গাড়ীর অনুপাতে যদিও নিজের চলন বলনকে তিনি ওজনদার করে তুলেছেন কিন্তু সে ওজনটা ঠিক তার ভেতরের খাঁটী ওজন নয়। তাই সামান্য নাড়াতেই উপরে চাপানো ভারী ভাবটা তাঁর শরীর থেকে শাড়ীর আঁচল খসে পড়ার মতোই খসে পড়ে। ঠিক পিসীমার মতো

বাস্তব হাত-পা তিনি নাড়লেন না বটে কিন্তু প্রায় তাঁরই মতো ভাষায়, গলায়, উত্তেজনায় ওদের সম্ভাষণ করে বললেন—লোকটা এতো শয়তান কে ভেবেছিল, এ্যাঁ! বিয়েটা যদি হয়ে যেত! শিউরে উঠলেন তিনি। আমাদের আর মুখ দেখানোর উপায় থাকত কোথাও? ওরা ভেবেছে ওদের মতো হাঘর হাভাতে আমরা। বাপ মা দুটোই বজ্জাত—হাঁ, বজ্জাতি ছাড়া আর কি বলে একে? স্নেহসিক্ত কণ্ঠে মৌরীকে দেখিয়ে বললেন, আমাদের মেয়ের আজ বাদে কাল বিয়ে। নতুন কুটুম। তাতে অমন ধনী মানী ঘর। মান-সম্মান থাকত কিছু? আমি তো জানি, পাছে ছেলে ডাক্তারী পড়তে পড়তে নার্স টার্স বিয়ে করে এনে হাজির হয় এ ভয় সুদর্শনের বাবার ছিল। তারপর একটা চতুর হাসি হেসে বললেন— কিন্তু ওরা বাবা সেয়ানা ছেলে।

মৌরীর কোন রকম প্রবৃত্তি ছিল না কথা বলে। দৃঢ়সংবদ্ধ চিবুক, ততটুকুই সে নাড়ল যতটুকু না হলে কথা বলা সম্ভব নয়। বললো—এমন অপাঙ্‌ক্তেয় হওয়ার কারণটা কি নার্সদের?

—অপাঙক্তেয় হওয়ার কারণটা কি— মৌরীর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন ছোট পিসী। আমার দেওরের কাছে যা শুনি তা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা যায় না! ঘেন্নায় মরে যাই! নার্স হতে যে মেয়ে যায়—তা যতই ভদ্র ঘরের হোক, তার কি ইজ্জত কিছুও আর অবশিষ্ট থাকে?

—নেয় কে?

প্রশ্নটায় কেমন যেন হঠাৎ হকচকিয়ে গেলেন ছোট পিসী। নেয় কে মানে?

—তুমি তো বলছ না যে ইজ্জত আদবেই তাদের থাকে না। তুমি বলছ থাকে। কিন্তু শত থাকলেও ওখানে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তবে নিশ্চয়ই কেউ নেয়। আমি জানতে চাচ্ছি তারা কারা?

এতক্ষণ ছোট পিসী, মৌরী, মঞ্জু, অমিতা পিসীমা সবার উপর দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলছিলেন। এবার একলক্ষ্যে তাকালেন মৌরীর দিকে, দৃষ্টিটা ক্রূর। তোমার এ কথার জবাব আমায় দিতে হবে?

—হাঁ। আমার জানা দরকার।

মৌরীর স্পর্ধায় ধৈর্য রক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছিল ছোট পিসীর। এবাড়ীর মৌরীর কোন খাতির তাঁর কাছে নেই। কিন্তু আর পাঁচ দিন বাদে মৌরী যে বাড়ীর বৌ হয়ে যাচ্ছে সে বাড়ীর বৌকে খাতির না করার সাধ্য নেই ছোট পিসীর। ভেতরে ভেতরে সে খাতির করা তার শুরু হয়ে গিয়েছিল বলেই সহ্য করে গেলেন। শুধু সয়ে গেলেন তাই নয়—একেবারে ঘুরিয়ে নিলেন ব্যাপারটা। সব জঞ্জাল ঠেলে পরিষ্কার করে দিলেন যেন। এমনি ভাবে বললেন কোন দরকার নেই তোমার এ সবে। বাজে কথায় মন খারাপ করতে হবে না। দেখি, চিরুণীটা নিয়ে এসে বোস। চুল বেঁধে দি।

অমিতা টেবিলের বইপত্র গুছোতে গুছোতে বললো—হাঁ। থাক ও-সব কথা।

—না থাকবে না। বলছি যে আমার জানতে হবে। কেন, তোমার ডাক্তার দেওরকে জিজ্ঞাসা করনি যে, মেয়েদের ইজ্জত সেখানে নেয় কারা? কাদের জন্য ভদ্রঘরের মেয়েদের সেখানে যাবার উপায় নেই?

ছোট পিসী কল্পনাও করতে পারেন না, তাঁকে কেউ এ ভাবে আক্রমণ করছে। আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। ক্রুদ্ধ সাপের মতো কোমর সোজা করলেন—ছাত্র আর ডাক্তারদের সঙ্গে নার্সদের কি সম্পর্ক—তারা তাদের নিয়ে কি করে, আমি তার কতটুকু জানি। দু'দিন বাদে সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবে তুমি।

—ছোট পিসী! অমিতা চাপা কণ্ঠে যেন তিরস্কার করে উঠল। মৌরীর মুখের লাবণ্য কুঁকড়ে উঠল একেবারে বাসী আপেলের মতো। চিবুকের কাঁপুনীটা থামানোর জন্য চিবুকটাকে শক্ত করলো সে। দু'চোখ ভরা আগুন নিয়ে কি বলতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল। শুধু বললো—সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই করবো।

—তাই করো। যদি সুদর্শন বলে আপত্তির কিছু নেই— বেশ তো সময় আছে। প্রস্তুত আছে সব। নার্সের সঙ্গে ভাই এর বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসো। আমার জাত যাবে না তাতে।

আগুন—তা বাইরের আগুনই হোক আর মনের আগুনই হোক, ইচ্ছা করলেই থাবড়িয়ে নিবিয়ে দেওয়া যায় না। জ্বলে উঠল মৌরী। বললো—বিয়ে দিলে আসলে জাত যাবে না তোমারও আমারও। না দিলে আমার সঙ্গে তোমারও যাবে, কারণ তুমিও মেয়ে। মেয়ে হয়ে কান পেতে শোন। জিব দিয়ে ছড়াও। ছুটে এসে বিয়ে বন্ধ করে পারিবারিক মান রক্ষা করো। কোন দিন কি তোমার ডাক্তার দেওরের কাছে জানতে চেয়েছো, নিজের

ঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে যে কথা ভাবতে শিউরে ওঠ সেই কাজ করো তোমরা অপরের ঘরের মেয়েদের সঙ্গে কোন প্রবৃত্তির তাড়নায়? জিজ্ঞাসা করেছ কোন দিন, তোমাদের হীন প্রবৃত্তির জন্য যদি ভদ্রঘরের মেয়েদেরও ভদ্রঘরের বৌ হবার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়— এই সত্য হয়, তবে তোমরাও নও ভদ্র মেয়ে বিয়ে করার উপযুক্ত।

বাসুদেব এসে হাত ধরলো মৌরীর।— কি হচ্ছে মৌরী! আয় বসবার ঘরে। বাসুদেব ওকে নিয়ে এলো বসবার ঘরে।

ছোট পিসীর নেবে যাওয়া ও তার গাড়ী ছাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। পিসীমার নানা ক্রুদ্ধ মন্তব্য আসতে লাগলো কানে।

বসবার ঘরে এসে মৌরী বসে পড়লো কৌচে। ওর লাল হয়ে ওঠা গাল দুটো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। দু'হাতে মুখ ঢাকল মৌরী।

কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে, বুঝতে কষ্ট হলো না মঞ্জুর। অমিতা আরও পাশাপাশি বসে রইল চুপ করে। খানিক বাদে মুখ থেকে হাত সরালো মৌরী। ঘামে মাখা একটা লাল টুকটুকে মুখ। বললো—তুমি কি বল ছোড়দা?

—উহুঁ, কোন বিষয়ে? যেন হুঁস হলো বাসুদেবের।

—ও বাড়ীর রেডিও সমান করার বিষয়ে।

মৌরীর জবাব শুনে হেসে উঠল মঞ্জু অমিতা।

বাসুদেব বললো—বাঃ কি কথা জিজ্ঞাসা করছিস, না বললে বুঝব কি করে?

—বিয়ে ভেঙ্গে দেবে তুমি? জিজ্ঞাসা করল মৌরী।

—বাবা তো তাই বলে গেলেন।

এক রকম ধমকে উঠল মৌরী—ন্যাকামো করো না ছোড়দা! বাবা কি করতে গেছেন তা আমি জানি। তুমি কি করতে চাও তাই বল। বিয়ে বাবা করবেন না। তুমি করবে। আমি তোমার কাছেই জবাব চাচ্ছি। বিয়ে হচ্ছে কি?

—সবার অমতে?

—হাঁ, সবার অমতে। সবার মতের জন্য অন্যায় কাজ করবো। তা হয় না।

—তোমার ভয়টা কি। বিয়ে করে চলে যাবে কাজের জায়গায়।

—সবাইকে দুঃখ দিয়ে?

ক্ষেপে গেল মৌরী। তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে।—অসহ্য তোমার ন্যাকামো ছোড়দা! ওদের দুঃখ দিয়ে, ওদের অমতে। কে ওরা? একটা মেয়ের এই লাঞ্ছনার কাছে ওদের মনগড়া দুঃখের মূল্য কি? তোমার কথা ফাঁকি না রেখে স্পষ্ট করে বলো।

কৌচের পিঠে শরীর ছেড়ে দিল বাসুদেব।—আমি বুঝতে পারছিনে। নার্স কাউকে বিয়ে করছি এটার জন্য মনের প্রস্তুতিও দরকার নিশ্চয়ই।

—এই মন তৈরীর জন্য বা ভেবে দেখবার জন্য তুমি বাবাকে বাধা দিলে না কেন? বললে না কেন, আমি ভেবে দেখেনি। আর সব ভাবনা সব সময় শুয়ে বসে করবার সময় পাওয়া যায় না— দরকারও হয় না। তোমার মনের কথা কি বোঝা যাচ্ছে না মনে করো! ভাবা তোমার মুহূর্তে হয়ে গেছে বলেই বাবাকে তুমি বাধা দেওনি।

—তার জন্য লজ্জার কিছুও নেই নিশ্চয়? বাসুদেবের যেন সাহস হলো একটু নিজের যুক্তি বলার। লাঞ্ছনার কথা বলছিস। আমরা কি করতে পারি? ওরাই তো ডেকে এনেছে; আমাদের শুদ্ধ যে এই অবাঞ্ছিত অবস্থার ভেতর নিয়ে ফেলল, তার জবাব কে দেয়?

মৌরী বললো— আয়োজন করে মেয়ে দেখতে যাওয়ায় তোমার রুচিতে বড় বেধেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলে— আমরা কি। আজ তোমাকে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে—তোমরা কি? কতটুকু শিক্ষা তোমাদের সত্য। সাধারণ মেয়েদের চাইতে কোন সংস্কারে, মনের কোন যুক্তিতে, হৃদয়ের কোন উদারতায় তোমরা বড়?

মৌরী চুপ করলে বাসুদেব ভাবলো, যাক্ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে মৌরী। কিন্তু মঞ্জু জানে, মৌরী তার শেষ বক্তব্য এখনো বলেনি। বসে রইল সে। বসে রইল অমিতা। সন্ধ্যার আঁধারে ঘর কালো হয়ে উঠলো। কেউ বাতি জ্বালল না। পিসীমা সন্ধ্যাবাতি দেখাতে এসে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। আলোর প্রথম ধাক্কায় সবাই চোখ বুজল। রামু সবার সামনে সযত্নে চা দিয়ে গেল। এমন কি বিস্কুটও। মঞ্জু অমিতা হাসলো। মৌরী ওর চায়ের কাপ ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো। বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বিয়ে হয়ে গেলে পর যদি কথাটা প্রকাশ পেত তবে কি করতে? কিছুই তো করবার থাকত না—তাই না?

—হাঁ, তাই তো।

—তার চাইতে এই ভালো হয়েছে না?

—নিশ্চয়। এতক্ষণে ভীষণ উৎসাহ বোধ করল বাসুদেব। কাপে চুমুক দিয়ে বললো—বিয়ে ভেঙেই যায়, এতো হামেশাই হচ্ছে। বাজে বিয়ে হওয়ার চাইতে না হওয়া অনেক ভালো। বিয়েতে জীবন বিষ হয়ে ওঠে।

—সত্যি! বড্ড বাঁচা বেঁচে গেলাম আমরা— কি বলো?

—আমরা কি রকম?

—তুমি আমি।

—তুই!

— হাঁ, আমিও বৈ কী। আমার জীবনটা বুঝি জীবন নয়? আমারটা বুঝি বিষ হতো না?

—তোর বিষ হতে যাবে কেন?

—তোমার হতো কেন?

—দুটো এক নাকি?

—না এক নয়। একটা পাল্লায় ওজন অনেক বেশী। নার্সের কাজে সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয়, এই যদি সত্য—এই যদি সত্য যে এ কাজ— এই সেবার কাজ নারীর জাত যাওয়া—তবে যারা বাধ্য হয়ে অভাবে, পীড়নে জাত দেয় তাঁদের চাইতে অনেক— অনেক বেশী অপরাধী তারা যারা প্রবৃত্তির দোষে নেয়। তাই সম্ভ্রান্ত ঘরের বৌ হবার যোগ্যতা যদি মেয়েরা নার্স হলে সত্যি হারায়, তবে যাদের জন্য হারায় তারা আরো বেশী অযোগ্য ভদ্রঘরের। বিয়ে যদি ভাঙ্গে তবে যে কারণে একটা ভাঙ্গবে ঠিক সেই কারণে আরেকটাও ভাঙ্গবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মৌরী। বাসুদেব বোকা চোখে তাকাতে লাগলো একবার অমিতার দিকে, একবার মঞ্জুর দিকে।

কিন্তু মঞ্জু জানতো কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে। তাই ওর চোখের ওপর এখন এ বাড়ীটা ছিল না, ছিল মমতাদের বাড়ী। বাবা গিয়ে কি চেহারায় ঢুকছেন? কি ভাষায় কথা বলছেন? ব্যবহারটা তাঁর কি অসৌজন্যের পর্য্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে? ভদ্রতার মুখোশ কি এক আধটুকুও রেখেছেন, না একেবারেই বিসর্জন দিয়েছেন? মমতা কি বাসায়? ওর মা কি কাঁদছেন? অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কি মমতার বাবা ওর বাবার দিকে? দাঁড়িয়ে আছে কি নীল? তার দু'চোখে কি দু'টো গোটা সমুদ্র দুলছে?

॥ ১১ ॥

ফিরে এলেন যতীন বাবু।

তার ট্যাক্সি থামার এবং উপরে উঠে আসবার শব্দে সেই প্রথম বাড়ীটার স্তব্ধ নিশ্চল মানুষগুলো যার যার জায়গায় একটু নড়ে চড়ে বসলো। পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চায়ি করলো।

কিন্তু যে টগবগে তেজী ভাবটা নিয়ে যতীন বাবু ছুটে গিয়েছিলেন, সে ভাবটায় কি কিছু মন্দা পড়েছে? কিছু কমজোর ঠেকছে কি তাঁকে? তাঁর হাঁটা, ঢোকা, বসায় যে খুশী উপচানো ভাবটা প্রকাশ পাবে ওরা ভেবেছিল—কই তা তো প্রকাশ পাচ্ছে না।

গায়ের চাদর, হাতের লাঠি আলনায় রেখে যতীন বাবু হাঁক দিলেন তামাকের জন্য। তারপর ইজিচেয়ারে বসে খোঁজ করলেন ছোট পিসীর।

পিসীমা নির্বোধ নন। পিসী-ভাইঝির ঘটনার কিছুমাত্র উল্লেখ করলেন না। একটু দরকার ছিল তাই চলে গেছে—জানিয়ে ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন ওখানে কি হলো তা জানবার জন্য। এবং যতীন বাবুও হঠাৎ সোজা হয়ে বসে তাঁর মন্দা ভাবটার উপর চাবুক কষলেন যেন—ট্যাক্সি থেকে মাত্র দরজায় নেবে দাঁড়িয়েছি— পড়তো পড় মেয়েটা পড়ে গেল কি না আবার একেবারে আমারই সামনে! দাঁত বের করে হাসতে হাসতে কা'কে যেন সে বিদায় দিচ্ছে। আর লোকটা গাড়ী থেকে হাত বের করে নাড়ছে। গাড়ীটার পেছনে লেখা রয়েছে দেখলাম ডাক্তার। হুঃ, যত সব—

মৌরীর দুই জ্বালাভরা চোখের সামনে দীর্ঘ সমুন্নত দেহ নিয়ে হাত বাড়িয়ে এসে দাঁড়ালো যে, সে কে? গায়ের সাদা মোটা চাদর তার লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। হাত বাড়িয়ে বলছে— এসো, আমার কাছে এসো। এ ডাক কি সেদিন বিপ্রদাস শুধু লাঞ্ছিত অপমানিত কুমুকে দেয় নি? কুমু কি শুধু উপলক্ষ্য মাত্র? এ ডাক কি নারীর প্রতি কোন মহাপুরুষের আহ্বান?

এই বিরক্ত কণ্ঠ কার? বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে। বলছে—এমন বিয়ে হচ্ছে না কতো। জয়দেব? তা বলুক। একটুও শ্রদ্ধা বাড়লো না সেজন্য মৌরীর দাদার প্রতি। নিজে হলে ছোড়দা যা করেছে সেও তাই করতো। বড় বড় কথা এদের মুখের কথা—হৃদয়ের কথা নয়। সেটা ধরা পড়ে যখন বলা ছেড়ে করার মানুষটির ডাক আসে। তখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ব্যর্থ বিদ্যা, ব্যর্থ শিক্ষা, ঔদার্য্য দাক্ষিণ্য শূন্য অখণ্ড স্বার্থপরতা ভরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটা মন। এখনও যাদের অন্তরের কথা—চরিত্র জিনিষটা শুধু মেয়েদের জন্য। সতীত্বের মতো মেয়েদের বড় গুণ নেই। সেবা—তাও আর্ত্তজনে নয়? তাঁর আর তাঁর সংসারের সেবা ছাড়া নারীর অন্য কিছু করণীয় নেই। তাঁর হাঁ আর নার সঙ্গে মাথা নেড়ে চলা ছাড়া কোন কর্ত্তব্য নেই। রূপ-যৌবনটাই নারীর একমাত্র শক্তি আর সম্বল। যৌন আকর্ষণটাই তার একমাত্র আকর্ষণ। নারীর একমাত্র মূল্য—সে পুরুষের স্পৃহার কতটা ইন্ধন যোগাতে পারবে—তার প্রবৃত্তিকে কতটা বেশী তৃপ্ত করতে পারবে। এই মনোবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিও প্রবৃত্তির যেটুকু পার্থক্য ঘটেছে সেটুকু প্রকৃতিগত নয় শুধুমাত্র পরিমাণগত। আজও যদি বৈজ্ঞানিক প্রমাণে সাব্যস্ত হয় মৃত্যুর পর আত্মা কিছুদিন এই পৃথিবীর বটগাছে, শেওড়া গাছে বাস করে তবে, পুরুষের ভাবনার জগতে আবার উঁকি দেবে স্ত্রীটিকে কি করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়।

ও ঘরের কথা এগিয়ে চলেছে। যতীন বাবু বলছেন—বাবা এখানে নেই। তিনি গেছেন পাকিস্তানে কিছু জমিজমা বিক্রির চেষ্টায়। দেখা হলো ছেলের সঙ্গে। মনে হলো গোপন করার কথাটা ছেলে একেবারেই জানতো না। আমার কথা শুনতে শুনতে কঠিন ভাঁজ জমে উঠতে লাগলো তার কপালে। হঠাৎ উঠে আসছি বলে চলে গেল ভিতরে। ফিরে এলো প্রায় তক্ষুণি। হাত জোড় করে বললো—বাবা-মার করা অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এ ছাড়া আর আমার কিছু বলবার নেই। যতীন বাবু গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে বললেন—তোরা বার বার জিজ্ঞাসা করছিস কেবল, তুমি কি বললে, ওরা কি বললো। ওরা বলেনি— আমাকেও বলতে দেয়নি। গাড়ীতে বসে কত তৈরী হয়েছিলাম— মুখই খুলতে দিলে না ছেলেটা আমাকে। বলতে যেতেই তেমনি হাত জোড় করল আবার—আর থাক। আপনারও ভালো লাগবে না। আমাদেরও অসম্মানের বোঝা ভারী হবে। আমরা আপনাদের কাছে যারপর নাই অপরাধী। মার্জনা চাইতেও আমার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। তবু আশা করি, আপনারা আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন। একটা ছোট ছেলে এসে—যতীন বাবু বোধ হয় এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন। এবার পকেট থেকে বের করলেন একটা চৌকো লাল বাক্স। সেটা পিসীমার হাতে দিয়ে বললেন—বাক্সটা এনে আমার সামনের টেবিলে রেখে দিয়ে গেল। বুঝলাম আমাদের আশীর্বাদের গয়না। তুলে পকেটে ভরবো, তাও হাত উঠে না—ফেলে রেখে আসবো তা-ও হয় না—এমন একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়লাম! হাতের নলটা গড়গড়ার গায়ে জড়িয়ে রেখে হাত দুটো মাথার উপর তুলে চুপ করে বসে রইলেন যতীন বাবু। তাঁকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগলো, একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ তাঁর ভেতর কাজ করছে। সেটা কি? অপরাধীর দুঃখ প্রকাশ ও মার্জনা ভিক্ষার মধ্যেও তিনি নিজেকেই কোথাও দিয়ে ছোট বোধ করে এসেছেন? না করে আসবার পর তাঁর মনে দ্বিধা জেগেছে যেটা করে এলেন সেটা ঠিক হলো কি না? না ভালো কাজ মন্দ কাজের আনন্দ-পীড়ন তাদের কাছে ফাঁকি রাখে না বলে? ছোট্ট সোয়ালোও উপবাসী পুত্রের শিয়রে বসে থাকা মার অবসন্ন হাতে পদ্মরাগ মণি এনে নৃত্য করে। বলে, যদিও আজ নিদারুণ শীত। আমার পালক খসে পড়বার অবস্থা হয়েছে। তবু ভেতরে আমি বেশ গরম বোধ করছি বন্ধু।

যতীন বাবু একটা জোর গলাখাঁকারি দিয়ে যেন অস্বস্তিটাকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। চাদরটা ফের তুলে নিয়ে ফেললেন কাঁধে। লাঠিটা তুলে নিলেন হাতে। রওনা হলেন ছোট বোনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। এসব মানবীয় দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলবার জন্য তাঁর কাছ থেকে একবার ঘুরে আসাই যথেষ্ট। ছোট বোনের চোখের সাধারণের প্রতি অবজ্ঞা ভাবের রশ্মিটাই যতীন বাবুর ভেতরে প্রবেশ করে তাঁর শক্তি যোগায়। সাধারণের সুখ-দুঃখ নেই। সম্মানও না। ছোট বোনের এক-আধ ডোজেই যতীন বাবু চাঙ্গা হয়ে ফিরবেন ঘরে।

পিসীমাও নিরুদ্যম বিরস মুখেই ছিলেন এতক্ষণ। ভাই-এর হাত থেকে গয়নার বাক্সটা নিয়েছিলেন নির্লিপ্ত ভাবে। দু-একটা কথা যা বলছিলেন তা-ও বিমর্ষ মুখে। ভাবটা, তোমরা বাপু তোমার ছোট পিসীকেই যদি এমন দাঁতে চিবুতে পারো তবে আমি করি কি! আমায় তো গিলে ফেলবে। পিসীমাও উঠলেন ভাই-এর সঙ্গে বোনের বাড়ী যাবার জন্য। হাঁ, ওখানে গিয়ে তাঁরা দুজনেই নিজেদের ফিরে পাবেন।

তাঁদের বেরিয়ে আসবার শব্দে মৌরী-অমিতা-মঞ্জু তিনজনেই বারান্দার রেলিং ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকলো। তাঁর চলে গেলে অমিতা বললো—আমিও ভাই তোমাদের দাদাকে নিয়ে একটু মা'র ওখান থেকে ঘুরে আসছি। বাচ্চাগুলোকে অমন হঠাৎ করে পাঠিয়ে দিলাম—তাতে যে পাকা মেয়ে রিণু, কি বলতে কি বলবে ঠিক আছে কিছু? মা ব্যস্ত হয়ে আছেন। আমরা যাবো আর আসবো। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে যে শাড়ীটি পরা ছিল সেটাই একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে নিতে বললো— মৌ, তুমি ভাই মনটা ঠাণ্ডা করে ফেলো। ওরা যখন শান্ত ভাবে নিয়েছে—বুঝেছে কত বড় অন্যায়টা করেছে, তখন আর কি। শাড়ী ঠিক করে চিরুণীটা নিয়ে সামনের রুক্ষ এলো চুলগুলো ঝটপট হাতে পেছন দিকে ঠেলে দিতে দিতে বললো—আর ওদের মেয়ের যে রূপ! দেখবে আরো কত ভালো বিয়ে হয়ে যায়। অমন বিয়ে নিয়ে কত বিভ্রাট হয়—হয় কি তাতে। চিরুণীটা রেখে এবার ঘুরে দাঁড়ালো অমিতা— সম্বন্ধ পেলে আর যে দেরী করতে চায় না মানুষ এই জন্য। একটু হেসে বললো—এখন তোমার বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে রক্ষা পাওয়া যায় ভাই!

—বিয়ে নিয়ে কত গোলমাল হয়, ভেঙ্গে যায়—হয় কি তাতে। তবে আমার বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে যাওয়া নিয়ে এতো চিন্তার কি আছে?

—গোলমাল হয়ে গেলে আর কি করবে মানুষ? কিন্তু অযথা হোক, এ তো কেউ চায় না বা সাধ করে কেউ ভেঙ্গে দেয় না।

—আমারটা হলেও যথার্থ কারণে হবে এবং সাধ করে হবে না।

—সত্যি তুমি বিয়ে ভেঙ্গে দিবে তোমার?

—দিলে সত্যই দিতে হবে। মিথ্যা ভাঙ্গাটা কি বস্তু আমি জানিনে।

—তোমাকে পাগল ভাববে সবাই।

বসে ছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অমিতার হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসালো মৌরী তাকে। বললো—দাঁড়াও। আর একটু পরে গেলে কিছু হবে না। কেন আমায় পাগল বলবে, সে কথার জবাব দিয়ে যাও।

ঘাবড়ে গেল যেন সে। কথার টানে কোথায় নিয়ে ফেলবে তার ঠিক আছে কিছু? তারপর হয়ত কিছুই জবাব থাকবে না তার। বললো— ও বাবা, আমি তোমার কথার জবাব দিতে পারবো না।

—পারবে। আমি তীক্ষ্ণ জবাব, সাহিত্যিক জবাব, রাজনৈতিক রিপোর্ট— কিছুই চাচ্ছিনে। সোজা সরল কথায় তোমার মনের কথা বলো, কেন আমায় পাগল বলবে সবাই?

অমিতা বললো—একটি ভালো পাত্র পাওয়া—তাও আবার, সুদর্শন বাবুর মতো—এ শুধু ভাগ্যের দানে মিলেছে। চেষ্টায় মেলানো সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে। ছেলেমানুষী খেয়ালে এ বিয়ে হতে না দিলে আমরা কপাল চাপড়াবো মন্দভাগ্য বলে। আর লোকে নিশ্চয়ই বলবে পাগল। তোমার কারণটা অপরের কাছে হাস্যকর অকারণ মনে হবে। সুদর্শন বাবুর সম্বন্ধে তো তুমি কিছু শোননি?

—মমতার সম্বন্ধে তোমরা কিছু শুনেছ? দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে এক পাশে চেপে ধরে অমিতার দিকে তাকিয়ে রইল মৌরী।

—আমি বলছি তোর আগের প্রশ্ন থেকে সুরু করে। চেয়ারটা টেনে মঞ্জু এগিয়ে এলো।

—না তুই বলবিনে। তোর কথা আমি শুনতে চাচ্ছিনে তো? আমি চাচ্ছি বৌদির কথা শুনতে।

—আমার কথার অপরাধ?

—তোর কথা কথাই নয়—নয় ত শুধু কথাই। তুই না বলবি নিজের কথা—না বলবি মেয়েদের। শুধু আমার কথার গায়ে তীর বিঁধে বিঁধে তাদের ধরাশায়ী করে যুদ্ধ জয় করবি—এই তোর ইচ্ছে।

—তবে সেটা আমারও ইচ্ছে। আমি চললাম।

অমিতা চলে গেলে মৌরীর ঘরের ভেতর পায়চারী করার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে মঞ্জু বললো—যে ভাবে তুই দিদি, ঘরের মধ্যে পাক খাচ্ছিস, আমার মনে হয় তাতে তোর চিন্তার জট খুলছে তো না-ই, আরো বাঁধছে।

থামলো মৌরী। বললো—কাল আমি পুরী যাচ্ছি।

—কখন?

—যখন ট্রেন।

—আমায় ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসলেই হবে, না একেবারে হোটেল ঠিক করে, থেকে ফেরার সময় সঙ্গে করে ফিরতে হবে?

—কিছু করতে হবে না তোর। তুই টেরও পাবিনে।

এবার শিরদাঁড়া টান করলো মঞ্জু। বললো— দেখ দিদি, অমন হঠাৎ আবোল-তাবোল কিছু করে বসবিনে বলছি। তোকে কেউ পাঁজাকোলায় তুলে নিয়ে সাত পাক ঘোরাতে পারবে না। যা করবার এখানে থেকেই করতে পারবি। কলকাতা সহরে তুই অজানা পথ চলতে পারিস না—কাঁপুনি সুরু হয়ে যায়—তুই যাবি একা বাইরে! একা চলেছিস কোন দিন?

—চলিনি। কিন্তু কোন দিন চলতে হলে সেই কোন দিনটা তো একদিন আরম্ভ করতে হবে। সেই আরম্ভের দিনটাই আমার হবে কাল। কলেজ এক্সকার্সনে বহু গেছি। ব্যবস্থা করে নিতে পারবো।

—তুই এই বিয়ে হতে দিবিনে একেবারে স্থির করেই ফেলেছিস?

—হ্যাঁ, স্থির করে ফেলেছি।

—গুরুত্বটা ভেবে দেখেছিস?

এবার একটু কি হাসলো মৌরী? বললো— নেই-ই গুরুত্ব কিছু, তো ভাববো কি।

—কিছু গুরুত্ব নেই?

মাথা নাড়ল মৌরী—না—একেবারেই না। গোড়াতে সেইটে ভাবতে গিয়ে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। অন্ধকার ঠেকছিল সব। এখন দেখছি না তো, খুব সহজ। বড় জোর ঘণ্টা আধা ঘণ্টার ব্যাপার। এই তো মিটে গেল একটা। কেউ কি দরিয়ায় ভেসে গেলো? না কারু বাড়ীঘর মাথায় ভেঙ্গে পড়ল? বৌদি বললে, অমন কত হয়—হয় কি তাতে? বাবা বিবেকের ছোট্ট কাঁটাটা তুলে ফেলতে চলে গেছেন বোনের কাছে—এই জোর কদমে ফিরে এলেন বলে। কোথাও যখন কোন গুরুত্ব দেখতে পাচ্ছিনে তখন নিজেরটা বলে বেশী গুরুত্ব দেবো কেন?

রামু দু' কাপ ধোঁয়া-ওঠা চা এনে বসালো ওদের দু'বোনের সামনে। ওরা দেখেছে, অশান্ত দিনে রামু আশ্চর্য্য সেবাপরায়ণ। মৌরী যে চা খায়নি, সে যে কাপটা ঠেলে রেখে উঠে গেছে এ তার লক্ষ্য এড়ায়নি। দু'বোনের স্নেহভরা দৃষ্টি বকশিস নিয়ে হৃষ্টমনে বের হয়ে গেল রামু। মৌরীর এতক্ষণে মনে পড়লো আজ বিকেলে ও চা খায়নি। কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল সে। ভারি ভালো লাগলো চা'টা। জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সে। এক-আকাশ তারা জ্বলজ্বল করছে। কোথাও মেঘের চিহ্নটুকু নেই। দক্ষিণা বাতাস পথে নিমগাছটার সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দে তাকে কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে প্রচুর ফুল ঝরাচ্ছে। কিন্তু ফুল কুড়োনো বেচারার সামর্থ্যের বাইরে। কিন্তু কি সে পারছে না তার জন্য মুখ কালো করছে না। যা পারে তাতেই তার আনন্দ। গন্ধটা নিয়ে এসে খুশীতে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। চোখ বুজে বড় করে নিঃশ্বাস টানল মৌরী—যেন মধ্যাহ্নের পর এই প্রথম সে বাতাস গ্রহণ করল।

মঞ্জু চা খাচ্ছিল আর না খাবার অবসরকালটা হাতল ধরে কাপটাকে প্লেটের এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছিল। ভাবছিল সে। ওর স্বাচ্ছন্দ্য গতির চিন্তা এতো ঘোরপ্যাঁচেও একটু না জড়িয়ে পরিষ্কার ছিল। কিন্তু কোথায় যেন আটকে গেল মনে হচ্ছে। ঘটনাটা সম্বন্ধে ওর ধারণা ছিল এই— সেদিন যেমন ঐ ঘটনার ভেতর দিয়ে মৌরী

সুদর্শনকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখে নিয়েছিল সুদর্শনও মৌরীকে তাই নিয়েছিল। ডাক্তার সে। কারণ বুঝলে বিধান জানে। নিজের হারানো মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল সে বলিষ্ঠ অহমিকায়। যোগ্য ব্যক্তির অহংকারে আকর্ষণ আছে। মানুষকে সে টানে। সেই টানের আয়ত্তে পড়ে গিয়েছিল মৌরীও। আজ যখন মমতার বিয়ে ভেঙ্গে দেবার প্রতিবাদে কিছুতেই হতে পারে না বলে উঠে আসে, তখন ও জানে মৌরীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল মমতার সমস্যার সঙ্গে এক হয়ে জড়িয়ে যেতে পারে ও নিজে। কিন্তু ডাক্তার—ডাক্তার—ডাক্তার -এই ডাক্তার শব্দটা গিয়ে চাবুকের মতো আঘাত করে করে মৌরীর মুখ যখন সাদা করে তুলছিল তখনই মঞ্জু বুঝছিল—নতুন জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তবু ভাবনার কিছু আছে মনে হয়নি। মনে হয়েছে মৌরীর এই উৎক্ষিপ্ত উত্তেজনা কিছু চোখের জল ফেলে আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। বিশে আষাঢ়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠান বাইরের জন্যই বাকী আছে। হৃদয়ের অনুষ্ঠানে মৌরী তা শেষ করে ফেলেছে। সুদর্শন এখন মৌরীর কাছে শুধু একজন পাত্র নয়, একজন ব্যক্তি নয়, একজন ডাক্তার নয়। কল্পনায় সুদর্শনের বলিষ্ঠ হাত দুটোর ভেতর আনন্দে বহু বার সে মুখ লুকিয়েছে। কাঁদতে হলেও সে এখন মুখ আড়াল করবার জন্য সে দুটো হাতই খুঁজবে। হাত থেকে কাপটা নামিয়ে রেখে মঞ্জু মৌরীর দিকে তাকালো—ছোড়দা' আর তোর দুটো বিয়ে কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো বিয়ে ভাঙ্গা কি সত্যি এক?

—নয় কেন?

— ছোড়দা' আর মমতা—দুজনের সঙ্গে না আছে পরিচয় না দেখেছে একজন আর একজনকে। অভিভাবকদের ঠিক করা বিয়ে — অভিভাবকরাই ভেঙ্গে দিলেন। অসম্মানের প্রশ্ন বাদ দিলে আর কিছু থাকে না আর। তোদের সম্বন্ধটাও যদিও ওদেরই ঠিক করা কিন্তু তোরা দুজন—সুদর্শন বাবু আর তুই কি ছোড়দা আর মমতার জায়গায় আছিস? ওদের কাছে বিয়ে ভাঙ্গাটা শুধু বিয়ে ভাঙ্গা। তোদের কাছেও কি তাই হবে?

এক ঝলক রক্ত ছুটে এসে যেন আছড়ে পড়লো মৌরীর মুখটার উপর। কাপটার দিকে চোখ রেখে পর পর চুমুকে চা'টা খেয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে কাপটাকে ঠেলে দিল টেবিলের নীচে। আর এই অবসরে শান্ত করলো বুকটাকে। তারপর মুখ তুলে বললো— বেশ, না হয় তার চাইতে কিছু বেশীই হলো।

মঞ্জু দেখছিল সবই। এতক্ষণে কৌতুকে চোখ চকচক করে উঠল ওর। বললো—কতটা?

—আমি কি রিণু? হাত ছড়িয়ে 'এই এতো' আর হাত গুটিয়ে 'এই এইটুকু' করে পরিমাণ বোঝাবো।

হেসে উঠল মঞ্জু।—আচ্ছা তা না হয় নাই দেখানো গেলো। তবে এটা তুই স্বীকার করছিস যে, দুটো এক নয়। কেমন?

—তবু এক।

—তবু এক।

—হ্যাঁ, তবু এক।

একটা এলোমেলো পাঞ্জাবী গায়ে চাপিয়ে হাতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে ঘরে এসে ঢুকলো বাসুদেব। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে যেন আপন মনেই বললো সে—আটটা। যেতে—হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই। ন'টা হবে পৌঁছোতে। তা ভদ্রলোকের বাড়ী যাবার পক্ষে ন'টা কিছু অসময় নয়। ঘড়ি থেকে মুখ তুলে বললে— দে তো মঞ্জু, পথটা একটু বাত্‌লে।

—কোথায় যাচ্ছ না বললে পথ বাতলে দেবো কি করে?

—ঐ তো ঐ ওদের বাড়ী।

—বাঃ কি কাণ্ড! কাদের?

—আরে, বলছি তো মমতাদের।

—কখন বললে?

—ঐ তো বলেছি— বল বল, কি ভাবে যেতে হবে বল শীগ্‌গির করে।

এবার প্রশ্ন করলো মৌরী—ওখানে যাচ্ছ কেন?

—বিয়ে হবে এই বলতে!

—তুমি এখানেই বিয়ে করবে ঠিক করেছ?

—হ্যাঁ।

—কেন, আমার জন্য?

—তোর জন্য আবার কি!

—তবে কিসের জন্য তাই বলো। একটু আগেও তো মত ছিল না তোমার।

জবাবটা বাসুদেব দিল জুতসই মতোই। বললো, একটু আগে প্রস্তুত থাকতে হলে তারও একটু আগে ব্যাপারটা জানার প্রয়োজন হয়। তার পর খবরটা অপ্রত্যাশিত এবং আমাদের প্রচলিত সংস্কারে আঘাত করাও বটে—প্রথম ধাক্কায় বিমূঢ় হয়ে পড়াটা—অর্থাৎ কিংকর্তব্য ভাবটা নিশ্চয়ই দোষের নয়।

স্বীকার করলো মৌরী— বেশ।

উৎসাহ বেড়ে গেল বাসুদেবের—তার উপর গোপন করে মেয়ে গছিয়ে দেওয়া—আজ-কালও এই মনোবৃত্তির লোক থাকতে পারে ধারণাই ছিল না আমার। এরা তো ভয়ঙ্কর লোক! এরা পারে না কি। ওদের উচিত শাস্তি—

তাকিয়ে রইল মৌরী।

মঞ্জু বললো—আঃ ছোড়দা, যা বলতে এসেছিলে তাই বল না।

সামলে নিল বাসুদেব। রাশ টানল জিভের। ছিঃ ছিঃ কি মূর্খামী করেছে। তাড়াতাড়ি বললো—ঐ তো বলছিলাম; পরিষ্কার বলে নিলে কি দোষ ছিল?

আমি জোর করে বলতে পারি, প্রথম থেকে ব্যাপারটা বলে কয়ে নিলে আমার কিছুমাত্র আপত্তি হতো না।

আর তর্কে ঢুকলো না মৌরী। বললো—গোপন করা নিয়ে আর কথা বাড়িও না ছোড়দা, আমার ভালো লাগছে না। ওটা বুড়ো বাপ-মার কাণ্ড। আমরা অনায়াসে ক্ষমা-ঘেন্না করে দিতে পারি তাঁদের। ঠোঁটের কোণে একটা শ্লেষের ঝাঁজ ফেলে বললো— হয়তো আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে আশাটা কিছু বেশী ছিল। ভেবেছিলেন, একবার চুপচাপের উপর অভিভাবকের দরজা উতরে গিয়ে পাত্রের দরজায় উপস্থিত হতে পারলে সব বিপদ কেটে যাবে। তখন অভিভাবক বিমুখ হলেও পাত্র ঠিক থাকবে। তাই হয়তো দুটো বুড়োমন সব অসম্মান সব অশ্রদ্ধা মাথা পেতে নিতে রাজী হয়েছিল। উঠে দাঁড়ালো মৌরী। ওকে ক্লান্ত—অবসন্ন লাগছিল।

ঘড়িটা ব্যস্ত ভাবে দেখে নিয়ে বাসুদেব বললো— গেল প্রায় আধ ঘণ্টা এখানেই পার হয়ে। আর নয়। মঞ্জু তুইও চল না?

মঞ্জু মৌরীর মুখের দিকে তাকালো— বেশ তো যাই?

—না, আর আমি নাটকের অঙ্ক বাড়াতে রাজী নই। তুই কি মনে করিস এখন গেলেই ওরা ভাই-বোন অমনি রাজী হয়ে যাবে?

জবাব দিল বাসুদেব। কেন যাবে না? আমরা বলবো বাবার ব্যাপারটা আমাদের অজ্ঞাতে হয়েছে। এটা তো কিছু অসম্ভব নয়। তবেই তো মিটে গেলো। তোর ধারণায় বুড়ো বাপ মা যা ভেবেছিলেন—তাই হলো। ওদেরও ভাই-বোনের রাজী হওয়ার পেছনে ছোট বোধ করার কিছু রইল না। আর এতেও যদি না হয় বাস্—আমাদেরও আর কিছু বলবার থাকবে না। আমরা দায়মুক্ত?

—'ভালোই তো' এই কথাটা না বলা পর্য্যন্ত তোমার কথা অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাই ওটা আমিই বললাম। দেখো ছোড়দা, তোমার কথা তোমার ভাষা তোমার মুখ প্রতি মুহূর্তে বলছে তুমি কত তাক্ত ওদের ওপর। তাই তুমি যে কথা বলতে ওখানে যেতে চাচ্ছ, তা কত মিথ্যা ওরা না জানুক আমি তো জানি। অনর্থক কথা আমার আর ভালো লাগছে না। আসল কথাটা শোন—ওঁরা যে সব কথা বলছেন তাই যদি সত্য হয় তবে তোমার আমার কারু পক্ষেই এ বিয়ে মঙ্গলের হবে না। আর মঙ্গলেরই যদি না হলো, তবে না হওয়াই ভালো। আর না হওয়া যখন ভালো তখন হবে না। বড্ড গরম লাগছে স্নান করতে যাচ্ছি। শ্রান্ত পায়ে ঘামে ভেজা চুলগুলো হাতে জড়াতে জড়াতে চলে গেল মৌরী।

ছটফট করলো বাসুদেব সমস্ত রাত। উঠলো, বসলো, পায়চারী করলো। যদিও সে ভাবলো খুব চিন্তা করছে। কিন্তু তা নয়। চিন্তাশক্তি বিরল জিনিষ। মনটাকে অনিয়ন্ত্রিত দৌড়ঝাঁপ করিয়ে ছটফট করতে করতে ভাবে চিন্তা করছে। তারপর এক সময় শ্রান্তিতে অবসাদে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বলে, আমি আর ভাবতে পারিনে যা হয় হোক। যা হওয়ার তাই হয়। স্রোতের মুখের কুটোর মতো ঘটনার টানে ভেসে চলে। বাসুদেবও যখন বিছানায় শুলো তখন ঐ ঘটনার টানে ভাসবার জনাই যেন চিৎ হয়ে পড়লো।

একটা দুরু-দুরু বুক নিয়ে অমিতাও ঘুর-ঘুব করলো এঘর ওঘর সে-ঘর। বসে রইল জানালার কাছে। জয়দেব যতই বলুক এটা মৌরীর রাগের কথা—সে শান্তি পাচ্ছিল না। ওর মনে হচ্ছে—রাগের কথা নয় এ মৌরীর সংকল্পের কথা। যদিও অমিতা তার শাশুড়ীকে খুবই কম দেখেছে তবু মনে হতে লাগলো আজ যদি তিনি এসে একবার দাঁড়াতেন তবে বুঝি সব সুরাহা হয়ে যেত। একমাত্র মা'র কাছেই মেয়ে মাথা নত করতো।

রাত বেড়ে চলল। সমস্ত বাড়ীটা এতো নিঃসাড় যে, কোণের বসবার ঘরের ঘড়িটার টিকটিক শব্দ বুঝি কান পাতলে সব কটা ঘর থেকে শোনা যায়। আকাশে একটা এবড়ো-খেবড়ো মলিনমুখী চাঁদ। যেন তার নিতান্ত অনিচ্ছায় কেউ জোর করে টেনে হাজির করেছে। দক্ষিণা বাতাস তেমনি বয়ে আনছে নিমফুলের গন্ধ। অন্ধকার ঘরের দেয়ালে চাঁদের আলোর পরদায় দুলছে ছবির মতো ছায়া। দুজনেই বুঝছে কেউ ঘুমায়নি। ধীরে ধীরে মঞ্জু বললো—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, সুদর্শন বাবুর দুর্বলতা তুই বুঝতে পারছিস। তাই হঠাৎ সুযোগ এসে যাওয়ায় মজার খেলায় মেতেছিস। খেলাটা বড্ড বেশী খরচ-সাপেক্ষ আর মানুষগুলোর উপর জুলুমসাপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে—এই যা। নইলে আমোদ ছিল।

একটু হাসল মৌরী। যদিও মঞ্জু অন্ধকারে তা দেখল না।

॥ ১২ ॥

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মঞ্জু। তারপর তার পূর্বকথার রেশ ধরে বললো—ফাঁদে-পড়া ইঁদুরকেও শিকারী বেড়াল না খেলিয়ে স্পর্শ করে না যে বৃত্তির তাড়নায়, এটা কিন্তু দিদি তোর সেই বৃত্তির খেলা। তুই জানিস, তোর এই অসম্মানকর প্রত্যাখ্যানের জবাব দেবার জন্যও বটে, যাকে পাওয়া যত শক্ত হয়ে দাঁড়ায় তাকে পাওয়ার ঝোঁক তত তীব্র হয়—প্রেমের এই রীতির জন্যও বটে—ভদ্রলোক এর পর তোকে পাওয়ার জন্য একেবারে অশান্ত হয়ে উঠবেন। তাই তোর এই হাতে পাওয়ার খেলা।

সেবারও যেমন হেসেছিল, এবারও মৌরী তেমনি হাসল। কথার জবাব মানুষ অনেক সময় হাসিতে দেয়। কিন্তু অন্ধকার ঘরে যেখানে অন্য পক্ষ সেই হাসি দেখবে না, সেখানে তো হাসিতে জবাব হয় না। না, মৌরীর এই হাসি মঞ্জুর জন্য নয়। এটা মৌরীর মোহমুক্ত মনের বৈরাগ্যের হাসি।

কিন্তু মনের দেখার কাছে চোখের দেখা তো অতি স্থূল দেখা। মঞ্জুর অনুভূতির একটুও কষ্ট হলো না মৌরীর সেই অন্ধকারের হাসি দেখতে। বললো—হাসিটার ভেতর আর্টিষ্টিক সেন্সের পরিচয় আছে। সুদর্শনবাবু দেখলে আরো মুগ্ধ হবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তোর এই যে ধারণা, তোর সব ভাবা শেষ হয়ে গেছে; এ অবধি বসে চিন্তা করবার কিছুমাত্র অবকাশ না পেয়েও কেবল আমাদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে করতেই তুই শেষ করে ফেলেছিস তোর ভাবার কাজ—এর মধ্যে মস্ত গলদ রয়ে গেছে। চিন্তার কাজ আর মনের কাজ একেবারেই এক নয়—তা যতই তারা অভিন্ন হোক। যুক্তিবুদ্ধি যখন মহা হৈ-হাঙ্গামা বাধিয়ে ছোটাছুটি, মাথা ঝাঁকাঝাঁকি করে অবশেষে বলে—বাস্ এই আমি স্থির করলাম, মন তখন গুটি-গুটি পায়ে এসে আসন নিয়ে বলে—এবার তবে আমি এলাম। বুঝলি?

—অবশ্যই।

—এই বোঝায় তখন কুলোয় না মাদাম। ঝড়-থামা প্রকৃতির মত শান্ত স্নিগ্ধ নীরব সেই পরিবেশে মন তখন সুরু করে দেয় তার শিল্প কাজ। কত ছবি যে সে তখন আঁকে। যুক্তির দাপটে যারা ভয়ে লুকিয়েছিল প্রাণচাঞ্চল্য আরম্ভ হয় তখন তাদের মধ্যে। হৃদয় অক্লান্ত কল্পনায় যুগিয়ে চলে ছবি। রক্তের লাল কণিকা যোগায় রং, অনুভূতি ঢালে প্রাণ। যুক্তি ফিরে এসে দেখে তার পাঁচ শব্দের রংয়ের পাশে মনের আঁকা অসংখ্য রঙ্গিন ছবির সংসার। ক্রুদ্ধ যুক্তি উঠে চোখ রাঙিয়ে—কি এগুলো? ভয়ে ত্রাসে লজ্জায় সব উলটে পালটে ফেলে মন বলে—কোথায় কি? শুধু একটু খেলছিলাম। এখনও তোর ভেতরে ঝড় শেষ হয়নি। মনও তাই নিরুদ্দেশ। হৃদয় নিঃশব্দ। রক্ত স্তব্ধ। রাজপাট দখল করে ছোটাছুটি করছে গরম উত্তেজনা। সার যুক্তি যে কত অসার তা এখন তুই বুঝবিনে। জবাব আছে?

—আছে।

—দিবি নে?

—দেবো। তোর কথা যদি মেনেই নিই যে শান্ত হওয়া মাত্র আমার মন একেবারে সুদর্শনময় হয়ে উঠে তার দিকে ধাওয়া করবে, তবু আমি যে সঙ্কল্প করেছি তাতেই অবিচলিত থাকব। চাইলেই যেমন জীবনের বাসনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, চায় বলেই মনের বাসনাকেও তেমনি প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। তোর চিন্তা আর মন যেমন এক নয়, জীবন আর দুর্বলতাও তেমনি এক নয়। জীবনের হাত শুধু ভালো লাগার হাতে ছেড়ে দিলে তার হাল খুব ভালো হয় না। বলে কথার টানটা একেবারে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, কিন্তু তোকে আমার একটা অনুরোধ আছে মঞ্জু। মৌরীর গলায় আবেদন।

—কি?

—যদিও আমার প্রতিজ্ঞা ওদের কাছে আমি একেবারেই চুপ করে থাকব তা যতই কাণ্ডই ওরা করুক। তবে তা পুরো সম্ভব হয়ত না-ও হতে পারে। তুই অযথা কথা বাড়াসনে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি নাটকীয় কিছু করবো না। আর আমার মনে এখন কোন আর চাঞ্চল্যও নেই। মনস্থির করার সঙ্গে সঙ্গে মনও আমার শান্ত হয়ে গেছে।

—বৃথা কথা বাড়ানো—এই যখন বোঝা হয়ে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই আমি আর তা বাড়াবো না। কিন্তু তুই ভাবছিস আমি বাড়ীর দিক তাকিয়ে এ সব কথা বলছি। আমার কথা নয়। কিন্তু ভুল ভাবছিস। আমার সত্যি ইচ্ছে নয় যে, তুই এই বিয়ে ভেঙ্গে দিস। সেবিকার কাজ অপাংক্তেয় হয়ে আছে—এ কাজটার প্রতি আমাদের দেশের বিতৃষ্ণা আর অবহেলার অশিক্ষার ওপর আঘাত দিতেই হবে—এবং তার জন্য যা করণীয় অর্থাৎ ছোড়দা'র বিয়েটা দেওয়া তা যদি করতে পারি তবেই সেটা হবে—সরকারী ভাষায় যাকে বলে—এই—গঠনমূলক কাজ। তোরটা তো হচ্ছে ভাঙ্গার কাজ।

মৌরী বললে—তোর কথার জবাবে বলতে হয়, স্বইচ্ছায় গঠনের কাজে হাত না দিলে—জোর করে টেনে আনলে তাতে গড়ে না, আরো ভাঙ্গে। এবং তেমন কাজ করতে হলে নিজেরই করতে এগিয়ে যেতে হয়। অন্যের উপর চাপ দেওয়া চলে না। প্রথমতঃ হলো এই। দ্বিতীয়তঃ আমি সংস্কারক নই। আমি অন্যদের উদ্ধার করতে পারি তত শক্তি আমার নেই। শুধু চেষ্টা করতে পারি নিজেকে রক্ষা করতে—এই পর্যন্ত।

মঞ্জু হাল ছেড়ে দেওয়া একটা নিঃশ্বাস টেনে বললো, কাপড়ের জমীন তৈরীর মতো ভালোবাসার জমীন তৈরী হতেও বহু টানা-প'ড়েনের বুনন দরকার হয়। এটা বোধ হয় তোদের সেই জমীন তৈরীর কাজই চলছে—দেখা যাক্। পাশ ফিরল মঞ্জু। চেষ্টা করে একটু ঘুম আসে কি না।

ঘুম এলো না, ঘুমের চেষ্টাও মৌরী করল না। চোখ দুটো টিপে বন্ধ করে রেখে ভাবতে লাগল শুধু কাল কথাটা শোনারপর বাবা-পিসিমারা যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ডটা সুরু করবেন, সেই ঝড়টা সামলানোর এবং থামানোর উপায় কি।

কিন্তু ঝড় তো থামানো যায় না। তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে যেতে দিতে হয় বয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। আর গতির তীব্রতা বুঝে বাড়াতে হয় প্রতিরোধের দৃঢ়তা।—হাঁ, তাই করবে সে। তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। চার্চের ঘড়িতে শব্দ হলো দুটোর, তারপর আড়াইটের, তার পর তিনটের। মধ্যরাত্রির জনমানবশূন্য রাস্তায় মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে যায় গাড়ী, শোনে তার শব্দ। পাশের বস্তির গলিতে ঠুং ঠুং শব্দ তুলে এসে থামে রিক্সা, কানে আসে জড়িত জিবের হিসাব মিটানো। কখনো জড়িত গলার গান মিলিয়ে যায় গলির শেষে। কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠলে চলতে থাকে নানা দিক থেকে তার উত্তর প্রত্যুত্তর। পাশের এ্যাংলো বাড়ীটার গপীর শিকল বাজানো লাফ-ঝাঁপ থামতে চায় না। সাহেবের মোটা গলার ধমক খেয়ে কাতর কেঁউ কেঁউ শব্দ তুলতে তুলতে শেষে নীরব হয়। গীর্জার ঘড়িতে বাজে চারটে। সাড়ে চারটে। ভেসে আসে আজানের আহ্বান শব্দ। উঠে বসে মৌরী। দরজা খুলে এসে দাঁড়ালো সে বারান্দায়। ভোরের বাতাসের যে মৃদু দোলায় ঝির-ঝির শির-শির শব্দ তুলে গাছের পাতাগুলো দুলছিল সেই ঠাণ্ডা বাতাসটা ওর উত্তপ্ত মুখ-চোখ মাথার ওপর দিয়ে বয়ে বয়ে যেন ওকে শীতল করে দিতে লাগল। দু'-একটা পাখী এধার-ওধার থেকে দু'-একবার ডেকে উঠে আবার চুপ হয়ে গেল—এখনও ভোর হয়নি। আলো ফোটেনি। বাড়ীটার আলো জ্বলে উঠল। মোমবাতি জ্বেলে সুইচ টিপে স্টোভে বসালো চায়ের জল। ট্রেতে সাজাতে লাগলো চায়ের সরঞ্জাম—বিস্কিটের টিন—বাঁ হাতে নাইট গাউনের মাটিতে ঝুলানো ঝুলটা মুঠো করে ধরে। জামার বুকের বোতামগুলো পুরো খোলা। হাতের কাজের সঙ্গে দুলতে

লাগল তার নরম নিটোল বুকের মসৃণ ত্বক্। ঘুম ভাঙ্গা ফোলা ফোলা চোখে এখনও তার বিছানার টান। হঠাৎ বারান্দার কোণ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দে সে দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকল মৌরী। এ নিয়ে আজকের রাতে দুবার সে চোখ ফেরালো বাবার দিক থেকে। একবার যখন তিনি বারান্দা দিয়ে পাঞ্জাবীর হাতায় মুখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন। দ্বিতীয় বার এই এখন।

সকাল বেলা উঠে মঞ্জু প্রথমেই উপস্থিত হলো গিয়ে রান্নাঘরে অমিতার খোঁজে। অমিতা চায়ের সাজ নিয়ে বসেছিল। মঞ্জুর ছায়াটা ঘরে পড়তে বেশ একটু চমকে মুখ তুলে তাকাল।

—কি ভাবছিলে গো এতো? হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে মঞ্জু।

ডান হাতটা বুকের ওপর রেখে অমিতা বললে, আমার ভাই বুকটা কেবল ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। ওরা যখন শুনবে বাড়ীতে, তখন যে কি দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হবে। আমার ইচ্ছে করছে পালাই এখান থেকে।

মাথা নাড়ল মঞ্জু। তা সেজন্য আমাদের কিছুটা প্রস্তুত হয়ে থাকতেই হবে। আচ্ছা শোন। চা করনার ভারটা রামুর হাতে দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এসো তো?

—কোথায়?

—এসোই না। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক্।

—কি ভাবে? কি করে? আগ্রহের প্রাবল্যে একেবারে চেয়ার ঠেলে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অমিতা।

—এসো আমার সঙ্গে বলছি।

মঞ্জুর পিছু-পিছু চললো অমিতা। বসবার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে মঞ্জু—অর্গ্যানটা ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ।

—তবে আর কালবিলম্ব না করে বসে পড় ওটার কাছে।

—মানে! বলছ কি তুমি?

—বলছি গান গাইতে। হতভম্ব অমিতাকে হাত ধরে টেনে এনে মঞ্জুই বসিয়ে দিল অর্গ্যানের সামনের টুলটার ওপর। তার পর ঢাকনাটা খুলতে খুলতে বললে, সাপের ফণা নেমে আসে এমন মন্ত্রও নাকি আছে। মনের ফণা কাবু হয়, তেমন মন্ত্র কি কিছু নেই? রাতভোর ভেবেও কূল করতে পারছিলাম না। এইমাত্র পিসিমা তাঁর নিত্য নৈমিত্তিকের গায়ত্রী স্তোত্রটির সুর টানতে টানতে বারান্দা পার হলেন। সেই সুরটা আমার ভেতরে গিয়ে যে কি আঘাত করতে লাগল—কি ভাবে ভেতরটাকে ভেঙ্গে-চুরে একশা করে দিতে লাগল—সে বৌদি আমি তোমাকে কথায় বোঝাতে পারবো না। বুঝলাম, মন্ত্র পেয়ে গেলাম। এমনি একটা অনির্বচনীয় ভাঙ্গ-চুরে ভেঙ্গে চুরে ফেলা যায় কি না দিদির জেদটাকে—একবার তাই দেখা যাক। বাড়ীতে দক্ষযজ্ঞের ঝড় উঠবার আগে, আকাশে-বাতাসে একটা গানের তুফান তোল তো তুমি।

অর্গ্যানের খোলা ঢাকনাটার উপর হাত রেখে বসে রইল অমিতা। তার সব উৎসাহ নিবে গেছে। বললে, একেবারে ছেলেমানুষী কথা। লোকে শুনলে হাসবে। গান দিয়ে নাকি মন পাল্টাতে পারে কেউ!

হাতে-পায়ে একটা ভীষণ চঞ্চলতা প্রকাশ করলে মঞ্জু।—তোমাকে বোঝাতে পারছিনে ছাই আমার কথা। কি করে যে বোঝাই—আমি চাচ্ছি, ওব মনের সামনের যুক্তি-তর্ক জেদকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ওর মনের পেছনের দুর্বলতাকে সামনে এগিয়ে আনতে। গায়ত্রী স্তোত্রের সুর আমার ভেতরে গিয়ে যে ভাবে আছড়ে পড়েছিল—তেমনি আছড়ে-পড়া সুরে ওর অন্ধ জেদটাকে ভেঙ্গে-চুরে দিতে।

নিরুত্তরে কিন্তু যেন কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে, এই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অমিতা মঞ্জুর দিকে।

খুশীতে চক্ চক্ করে উঠল মঞ্জুর কালো চোখ। বললে—কিছুটা বুঝেছ? আচ্ছা, বাকীটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছি—কথার সঙ্গে সুর জুড়ে দিলে, সে-মনকে নিয়ে কোথায় না উধাও হয়ে যেতে পারে? এই মনটাকেই উধাও করে দেওয়া যাক ওর। মনটাকে পিষ্ট করে হলেও তার উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু নিরুদ্দেশ মন নিয়ে কিছু করা যায় না। তার মতো অসহায় দুর্বল অবস্থা মানুষের আর হতে হয় না। পায়ের নীচে মাটি না থাকলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

মুখ নিচু করে অর্গ্যানের রিডের উপর এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত একবার আঙ্গুল টেনে গেল অমিতা—যেন গানের অন্বেষণে। তারপর অর্গ্যানে সুরের ঝংকার তুলে যে কণ্ঠ মিলালো তাতে—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলে হে প্রিয়তম
চাও যে বারে বার—

সমুদ্রের বিরাট ঢেউ আচম্‌কা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে উল্‌টো-পাল্‌টা খাইয়ে যেমন চোরা টানে টেনে নিয়ে চলে গভীর সমুদ্র-পানে, মৌরীকেও যেন এই সুর আর কথা আছড়ে উল্‌টো-পাল্‌টা খাইয়ে চোরা টানে টেনে নিয়ে চললো কোন্ গভীরে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল ওর—

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই—

ওর বোবা-মনের যেন হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গেছে এবং আশ্চর্য্য হয়ে স্তম্ভিত হয়ে, ও নিজের কথা নিজের কানে শুনছে। মন এই কথাগুলো যেন বহুক্ষণ ধরে বলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে বলা কথায় হবার জো ছিল না। তাই সে এই সুরকেই বুঝি খুঁজছিল। অমিতা একের পর এক রেডিওর রেকর্ড পাল্টানো গানের মতো চলল নিরবচ্ছিন্ন গান গেয়ে। দু' হাতে চোখে হাত ঢাকা দিয়ে বসে রইল মৌরী। অন্তরার টান ওর অন্তরকে ভেঙ্গে-চুরে একাকার করে দিতে লাগল—

ব্যথা আমার কূল মানে না
বাধা মানে না
পরাণ আমায় ঘুম জানে না
জাগা জানে না—

শ্রান্ত অমিতা গান থামিয়ে ঘুরে বসতেই মঞ্জুর কাঁচা গলায়—

তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী—
আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি—

শুনে—হেসে ফেললো সে। ফের ঘুরে বসে অর্গেনে ঝংকার তুলে গলা মিলালো সে—'সুরের আলোয় ভুবন ফেলে ছেয়ে'—অমিতার তৈরী গলার সঙ্গে মঞ্জুর কাঁচা গলার মিলিত সঙ্গীত আর দক্ষ হাতের বাজনা বাড়ীটার নিরানন্দ বিমর্ষ ভাবটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, হাসি আনন্দ গান নিয়ে যেন দরজায় দরজায় ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিল। অমিতার হাসিমুখ দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—বাড়ীতে এ জাতীয় একটা কিছুর দরকার ছিল এটা স্বীকার করে, সে মনে মনে মঞ্জুকে ভারি প্রশংসা করছে।

তখন চা নিয়ে এলে মঞ্জু অমিতাকে দেয়নি, এবার উঠে গিয়ে সে নিজের হাতে চা তৈরী করে আনল বৌদির জন্য। রামুর হাতের মৌরীর জন্য পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিল, কোন কথা বলবি নে। শুধু চুপচাপ রেখে চলে আসবি।

রামু জানতে চাইল, জানবে কি করে দিদিমণি?

—আচ্ছা, শুধু বলবি চা। আর এসে বলে যাবি দিদিমণি কি করছে। রামু সংবাদ দিয়ে গেল, দিদিমণি চোখে হাত-চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। সে চা ছাড়া আর একটা কথাও বলেনি।

অমিতা চায়ে চুমকু দিয়ে বললে, বাড়ীটা হাল্কা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তোমার আসল উদ্দেশ্য কতটা সফল হবে, আমার সন্দেহ আছে। গানের প্রভাব যতই হোক, তা সাময়িক। সুর থেমে গেলে কথা বন্ধ হয়ে গেলে তার অনুরণনও থেমে যায়।

আশ্চর্য্য রামুর সহজাত বুদ্ধি। দৌড়ে এসে খবর দিল—বাবু কিন্তু বড় দিদিমণির ঘরে যাচ্ছেন।

বারান্দার যেখানে এসে মঞ্জু বাবাকে ধরলো, পেছন থেকে ডাক দিয়ে অনায়াসে তাঁকে থামাতে পারতো সে। কিন্তু কি বলবে? দিদির ঘরে এখন যেও, না কেন? ওর সঙ্গে এখন কথা বলো না কেন? অমিতা মঞ্জু দুজনে দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।

উৎফুল্ল মুখে যতীন বাবু গিয়ে ঢুকলেন মেয়েদের ঘরে। বাড়ীর এই গানের হৈ-হল্লা তাকে ভারি নিশ্চিন্ত করেছে। কালকের ব্যাপারটা নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে মনান্তর যে অনিবার্য, এ বিষয় সন্দেহ ছিল না তাঁর। মেয়েদের মতামত নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। শুধু চান বাধা আসার আগে আপনার কাজ শেষ করে ফেলতে। তার পর যদি গণ্ডগোল করে সে সময়টা তিনি চুপ থাকবেন! এই হলো তাঁর পদ্ধতি। তার পর যা হয় হোক। এবারও তৈরী ছিলেন তিনি, কিছু হবেই। প্রথমটায় তাই তিনি চমৎকৃতই হয়ে উঠেছিলেন গান শুনে। এমন শান্ত সমাপ্তি বা মেয়েদের এমন আত্মসমর্পণ তার মতের কাছে, এ তিনি আদপেই আশা করেন নি। কিন্তু বর্তমানে আপন ভাগ্যটাকে যতীন বাবুর এত বেশী প্রসন্ন মনে হচ্ছিল যে, এই ঘটনাটাকেও তিনি তাঁর সুপ্রসন্ন ভাগ্যের আনুকূল্য বলেই গ্রহণ করলেন। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা কমতে কমতে এমন একটা পর্যায়ে এসে তা আজ দাঁড়িয়েছে যে, কথা বলতে মেয়েদের ঘরে ঢুকতে তার অন্য দিন অনভ্যস্ত ঠেকে। আজ সেই দূরত্বটা পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে গেল তার মন থেকে। একেবারে 'মা' সম্বোধন করে ফেললেন তিনি মৌরীকে। উঠে দাঁড়ালো মৌরী। ওর শরীরটা কি ভালো নেই? ভালোই আছে। বেশ বেশ, ভালো থাকলেই নিশ্চিন্ত। তবে একটু তৈরী হয়ে নিতে হচ্ছে ওদের। কেন? ছোট পিসী এই এলেন বলে, একটি মেয়ে দেখতে যেতে হবে যে। ওরা দেখে এসেছেন। শুধু মৌরীর পছন্দ হলেই হয়। ছোড়দা' যাচ্ছে তো? যেন বর্তে গেলেন যতীন বাবু মেয়ের কথায়। যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন বাসুদেবকে যেতে বলায়। হাঁ হাঁ, তুমি যখন বলছ মা, সে নিশ্চয়ই যাবে। মৌরীর মুখের কাঠিন্য নজরেও পড়লো না তাঁর। বাসু বাসু বলে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কালোপেড়ে শান্তিপুরীর কোঁচানো কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে। জমীনের পাতলা আবরণ ভেদ করে দেখা যাচ্ছে শরীরের টকটকে ফরসা রং। খালি গা, ভরাট শরীর। মঞ্জু তাকিয়ে রইল বাবার দিকে। বয়স কি কখনো কখনো পেছন দিকেও চলে!

মৌরী যাচ্ছে। মৌরী বলেছে সে মেয়ে দেখতে যাবে, আর বলেছে, তাকে যাবার কথা। তবে কি মৌরীর ক্ষেপামি ঠাণ্ডা হলো? একটা বিদ্রূপের রেখা খেলে গেল বাসুর ঠোঁটে। বিয়ে—যার বাড়া কাজ মেয়েরা আর কিছু জানে না; জানে ঐ একটা, থাকে ঐ অপেক্ষায় তারা দেবে বিয়ে ভেঙ্গে। তাতে অমন বিয়ে। বাসুদেব বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকবার আগে যেন রুমাল দিয়ে হাসি টেনে মুছে তার পর ঘরে ঢুকল। গম্ভীর ভাবে বললো, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল তার কষ্ট হচ্ছে গম্ভীর থাকতে—কি, আবার শেষে কোন ঝামেলা টামেলা বাধাবি না তো?

—না।

—বেশ লক্ষ্মী মেয়ের মতো গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসবি।

—তোমার তৈরী পাত্রীর মতো আমাদের হাতের কাছে এমন গণ্ডায় গণ্ডায় তৈরী পাত্র হাজির থাকে না। 'রেডিমেড' মিলবে মনে হয় না। যদি মেলে বলব।

পলকে কালো হয়ে উঠল বাসুদেবের মুখ। যে হাসিটাকে সে রুমালে মুছে পকেটে ভরে দিল— সেই হাসিটা যেন পকেট থেকে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আয়নার কাছে বসে বাঁ হাতে গালের চামড়া টেনে টেনে ডান হাতে সেফটি রেজার চালাচ্ছিলেন যতীন বাবু তাঁর পাকা দাড়ির উপর। হাত চালনা থেমে গেল তাঁর বাসুদেবের কথায়। বিস্মিত ভাবে তাকালেন তিনি ছেলের দিকে। কি বলছে মৌরী, এ বিয়ে হবে না? একটা যখন ভেঙ্গেছে তখন আর একটাও ভাঙ্গবে? মৌরীকে খুশী করতেই যখন মমতার সঙ্গে সম্বন্ধে রাজী হয়েছিলেন যতীন বাবু কোন অনুসন্ধান টনুসন্ধান না করে— তখন ভাঙ্গবার আগেও তার মতটাই আগে নেওয়া উচিত ছিল। যদিও বাসুদেব নিজেও তার বিয়েটার চাইতে মৌরীর বিয়েটাকে বড় করে দেখছিল—এমন কি, সেই জন্য একটা দারুণ অপ্রবৃত্তির বিয়েতে পর্যন্ত সে রাজী হয়ে গিয়েছিল— সেটা ভুলে সে আক্রমণ করল যতীন বাবুকে।

বিশ্বাস করলেন না যতীন বাবু ছেলের কথা। এটার সঙ্গে ওটার যোগ কি? যোগসূত্রটা বাসুদেব বিকৃত মুখে দেখিয়ে দিলে বিমূঢ় ভাবে কিছুকাল তাকিয়ে রইলেন তিনি ছেলের দিকে। তারপর হাতের ক্ষুর নামিয়ে রেখে আদ্দেক কামানো ও সাবান মাখা মুখেই উঠে গিয়ে প্রবেশ করলেন মেয়ের ঘরে। অবিশ্বাস্য কণ্ঠে শুধোলেন—তুমি বলেছ, তুমি বিয়ে করবে না?

—হ্যাঁ। উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট জবাবে বললো মৌরী। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যতীন বাবু মেয়ের মুখের দিকে। বাসুদেবের বিয়ে নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে একটা বিরোধের জন্য তিনি তৈরী ছিলেন কিন্তু ঘটনাটা যে কোন রকমেই মৌরীর বিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে, এ তাঁর কল্পনায়ও ছিল না। সুইচ টিপে ঘরের আলো নিবিয়ে দিলেও বুঝি এমন মুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে যায় না। যে ভাবে যতীন বাবুর চোখের আলো নিবে গেল। অন্ধকার ঘরে জিনিষ হাতড়াবার মতোই তিনি কথা হাতড়াতে লাগলেন—বিয়ে করবে না বলছ?

—হ্যাঁ।

ঘোলাটে দৃষ্টিতে আবারও সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন যতীন বাবু—তুমি বিয়ে করবে না বলছ?

মৌরীও তেমনি একই ভাবে জবাব দিল—হ্যাঁ।

রামু খুশীতে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে নীচ থেকে ছুটে আসার ধাক্কায় হাঁ করে নিঃশ্বাস টানতে টানতে বললে, এই মস্ত মস্ত দুটো ট্রাক এসেছে বাবু—মেরাপ বাঁধার জিনিষ-পত্তর নিয়ে। মাল নামাচ্ছে তারা। আপনাকে ডাকছে। ঘরের সবার দিকে একটা আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে তাকালো সে। যেন—আর কি। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তো। মেরাপ বাঁধার জিনিষ নামছে—বিয়ের তবে আর বাকী কি?

টেবিলের একটা বই খাড়া করে শক্ত হাতে চেপে ধরল মৌরী—যদি এই মেরাপ বাঁধাবাঁধি আরম্ভ হয়—আমার কথা না শুনে, তবে আমি এক্ষুণি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো।

মঞ্জু বসে বসে নির্বিকার ভাবে খাতায় আঁকিবুকি করে চলছিল—তেমনি হাত চালাতে চালাতে ছোট্ট গলায় বললো—এই দিদি, তুই নাটকীয় কিছু করবিনে কথা দিয়েছিস?

যতীন বাবু এবার রাগে ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—এ কি ছেলেখেলা। বললেই হোল বিয়ে করবো না? ও সব উন্মাদের কথা রাখো। রামুর দিকে তাকিয়ে দাদাবাবুদের ডেকে মালপত্র ছাদে তুলবার নির্দ্দেশ দিতেই মৌরী ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝুলালো।

ক্রোধোন্মত্ত যতীন বাবু দিশেহারার মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন—কি, বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে—এতো সাহস? তোমাকে—তোমাকে আমি তালাবন্ধ করে রাখবো। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

হাসল মৌরী।

ঘরে এসে ঢুকলেন ছোট পিসী। বললেন, বুড়োধাড়ী মেয়েকে বিয়ে দেবে তুমি তালাবন্ধ করে? অমিতা প্রতিবেশীদের দিক্‌কার দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্জু তেমনি এঁকে চলল খাতাভরে কুকুর বেড়াল মানুষ। কখনো বাবা-পিসীমাদের কথাগুলো চলল ছুটোছাটা লিখে। যেমন অলস অবসর কাটাচ্ছে সে। ঘরে যা ঘটছে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার, তাই সে শুনছে না—পিসীমাদের চিৎকার গাল-মন্দ অশ্লীল মুখকরা—বাবার হল্লা আর বৃথা তর্জ্জন। মৌরী দৃঢ়ভাবে তেমনি দাঁড়িয়ে। জানালাটা বাতাসে কিছুটা খুলে গেছে। এক টুকরো রোদ তার মুখের উপর যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ে আছে।

ঘরের ভেতর কি ঘটল, কে যে কি বললো, কার কথা যে কে শুনল, কিছুই বুঝল না অমিতা। শুধু শেষ ফলাফলটা ধরল ছোট পিসীর কথায়। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে তিনি ভাইকে বললেন—টেলিগ্রাম দাও মেয়ে হঠাৎ মারা গেছে। কথায় বলে কুকুরের পেটে ঘি সয় না। এ বিয়ে সহ্য হবে কি করে ওর। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ডাকলেন ভাইকে—চল আমার সঙ্গে। আমি সামনে থেকে টেলিগ্রাম করিয়ে তবে যাবো। এ বিয়ে আমিই আর হতে দেবো না। ভাইকে একরকম টেনে নিয়ে চললেন তিনি। যে স্ত্রীকে চিরকাল অশান্তির আধার ভেবে এসেছেন—আজ জীবনের চরমতম অশান্ত ক্ষণে যতীন বাবুর মনে পড়তে লাগল কেবল তারই কথা। জীবনে যাকে বঞ্চনা ছাড়া কিছুই করেননি, আজ তাকে পেলে সর্বস্ব সমর্পণ করে তিনি পালাতেন—আর তবেই বুঝি সব দিক রক্ষা হতো।

মঞ্জু এবার হাতের কলম নামিয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। যাক দু'-দু'টো বিয়ে মিটল। যদিও হাঙ্গামা নেহাৎ কম হলো না, তবু যে অনেক হাঙ্গামা বাঁচলো তা-ও সত্যি।

মৌরী ব্যাগ খুলে তিন-তিনটা সারিডন একসঙ্গে মুখে পুরে দাঁতে চিবুতে চিবুতে কুঁজো থেকে জল গড়ালো। তারপর ঢকঢক করে পুরো এক গ্লাস জল খেলো।

মঞ্জু বললে—আর গোটাকয় বেশী মুখে পুরলে টেলিগ্রামটা কিন্তু সত্য করে দিতে পারিস দিদি।

দু'টো লাল ডগডগে চোখ তুলে মৌরী বললো—এতেও কুলোবে না। ছিঁড়ে যাচ্ছে মাথা। চিবুকের, কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম আঁচল তুলে মুছল মৌরী।

মঞ্জু বললো—পূবের জানালা দিয়ে এসে পড়া সকালের কচি রোদটা এতক্ষণ তোর মুখের উপর তার মৃদু তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলছিল। এবার ঘর থেকে পায় পায় বেরিয়ে গেল দক্ষিণের দরজা দিয়ে। হ্যাঁ, সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে দেবে লক্ষ্ণৌর প্রাসাদে সব খবর। যক্ষ পাঠিয়েছিলেন তার বিরহবার্তা মেঘদূত মারফৎ। তোর ছিন্ন প্রেমবার্তা নিয়ে যাবে রৌদ্রদূত। যেমন খবর তার তেমনি দূত হওয়াই তো উচিত।

মৌরী মাথায় জল চাপিয়ে পাখাটা বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল। মাছগুলো নিঃশব্দে সব শেষ করে মিনি মুখ পরিষ্কার করতে করতে মন্থর পায়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে ওদের ঘরের দিকেই আসতে লাগল। বেড়ালটার পুরো তুষ্টির মন্থর চলনের সঙ্গে ছোট পিসীর হাঁটাটা কি আশ্চর্য্য রকম মিল—মঞ্জু তাকিয়ে রইল তার দিকে। মিনি গুটিসুটি মেরে টেবিলের নীচে শুয়ে পড়বার আগে একবার ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে মিউ মিউ করে ডেকে নিল। যেন দেখল আক্রমণের সম্ভাবনা আছে কি না। তারপর আরামে চোখ বুজল। মঞ্জু যেন একাগ্র মনে কি ভাবল বেশ কিছুটা সময়। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে উঠে দাঁড়াতে কলমটা পড়ে গিয়ে যে শব্দ হলো, সেই শব্দে চোখ মেলল মৌরী।

মঞ্জু বললো—আচ্ছা, এবার তো বেশ মাথা উঁচু করে গিয়ে মমতাদের বাড়ীর দরজায় টুঁ মারা যায়—কি বলিস?

—তবে আমি মাথা উঁচু করা কাজই করলাম বল?

—অন্তত মাথা-পড়া কাজ করিসনি, সে তো নিশ্চয়ই। যাবো?

—বিয়ের ঐদিনটা পার হয়ে যাক, তারপর যাস।

—এখনও কোন সম্ভাবনা আছে নাকি?

—না। কিন্তু হাঙ্গামা এখনও অনেক আছে। সে সব মিটুক, তারপর।

—আচ্ছা।

॥ ১৩ ॥

মৌরী চোখ বন্ধ করে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে রইলো। মঞ্জু বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। কে কোথায় খোঁজ করে দেখা যাক। নীচের গেটে নামানো জিনিষপত্র—বাঁশ-সামিয়ানা-চেয়ার ইত্যাদি ফের তোলা হচ্ছে লরীতে। কুলীরা ভারবাহী। নামাতে বললে নামায়। তুলতে বললে তোলে। তবু বোঝা তুলতে তুলতে তারা বিস্মিত দৃষ্টিতে এক একবার তাকাচ্ছিল ওপর দিকে। পেন্সিল হাতে কর্মচারী গোছের লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি টেনে চলা লোকটিকে—বোধ হয় লরীর ড্রাইভার হবে—যেন বিজ্ঞের মতো বলে চলেছিল কত কি। হয়তো এ তো বাঁধাই হয়নি। বাঁধাছাঁদা—ডেকোরেশন শেষ করার পরও যে কত বিয়ে হয় না—সব ভেঙ্গে ফেলতে হয়—হয়তো এমনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাই শোনাচ্ছিল। বাড়ীর আশ-পাশের বারান্দা বা জানালাও একেবারে খালি ছিল না। এদিক-সেদিক কৌতূহলী মুখ ছিল। ওকে দেখে চোখের দৃষ্টিটাকে কেউ দিল অন্যমনস্ক করে। কেউ ঝুঁকে এমন ভাব করলো যেন, কাউকে ডাকছে বা খুঁজছে। কেউ গিয়ে ঢুকল ভেতরে। ইউরোপীয়ান মহিলাটি নিদারুণ শব্দ তুলে কাঁটা দিয়ে ডিম ফেটতে ফেটতে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। মঞ্জুও কারুর দিকে চোখ পড়তে না দিয়ে, পার হয়ে গেল বারান্দা। বারান্দার শেষ মাথার নীচের দিকে তাকিয়ে শুকনো মুখে দাঁড়িয়েছিল রামু। ওকে দেখে মঞ্জু বলে উঠল—তুই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস আর মাছ-তরকারী সব খেয়ে এলো তো বেড়াল!

—খাক্ গে।

—খাক্ গে! খাবো কি আমরা?

— কে খাবে আজ?

—উপোস থাকবো আমরা?

—ডাল তো আছে। তার পর করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো সে—দিদিমণির বিয়ে সত্যি ভেঙ্গে গেল?

ছোট পিসী যদি অমন মারা যাওয়ার কথা লিখবার কথা বলে না যেতেন, তবে মঞ্জু নিশ্চয়ই বলত— 'হবে'। কিন্তু এখন আর সে আশা রাখা চলে না। বললো—দেখা যাক। কিন্তু শুধু ডাল-ভাত খাওয়া চলবে না রামু। আলু, কুমড়ো যা হোক কিছু ভাজাভুজি কর গিয়ে। মন খারাপ করিসনে। তোর কাজকরা আদ্দির পাঞ্জাবী আর পাজামা পাবার ব্যবস্থা আমি করে দেবো—যা।

—আমি চাই না ওসব পরতে। বলে রামু চলে গেল। মঞ্জু উঁকি দিল বসবার ঘরে। কেউ নেই। গেল কোথায় সব। ছোট পিসী কি তার তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন নাকি সবাইকে।

অমিতাকে পাওয়া গেল তার ঘরে। দুটো জলে-ভেজা ফুলো ফুলো চোখ নিয়ে চুপ করে বসেছিল গালে হাত দিয়ে। ইস্। কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে বসে আছ!

দুটো কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে ভাঙ্গা গলায় অমিতা বললো—থামলে কেন? এরপর তোমার দাদার মতো বলো, তোমার বিয়ে তো ভাঙেনি।

মাথা নাড়ল মঞ্জু—না, তেমন কথা আমি কখনই বলব না। তোমার না ভাঙুক তোমার ননদের ভেঙেছে। তুমি অবশ্যই কাঁদতে পারো।

অমিতা ফের ভিজে-ওঠা চোখ দুটো আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বললে—আমার এতো খারাপ লাগছে— একটু থামল সে। তারপর বললো, একটু সম্ভাবনার আশা যে মনে রাখবো, ছোট পিসী তাও হতে দিলেন না। মারা যাবার কথা লিখবার কি দরকার ছিল? জানো, বাবাও ও-কথাটায় আপত্তি জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভগিনীর উগ্রমূর্তির দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। ছোট পিসীর নিজের মুখ স্বামীর কাছে এবং স্বামীর মুখ সুদর্শনের বাবার কাছে যাতে রক্ষা হয় ছোট পিসী এখন নিজেই তা দেখবে এবং করবে এই তার কথা। বড়কে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেছেন, আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করতে হবে। ছোটকে নিয়ে গেছেন, সবাই মিলে বসে আজই সব জায়গায় চিঠি ছাড়তে হবে, অনিবার্য কারণে বিয়ে স্থগিত রইল বলে। জানো, ছোট ছেলের হাতের মিষ্টি রাস্তায় পড়ে গেলে সে যেমন জায়গাটা ছেড়ে যেতে যেতে কেবলি পেছন ফিরে তাকায়—বাবা ঠিক তেমনি ভাবে যেতে যেতে কেবল তোমাদের ঘরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমার এমন কষ্ট হচ্ছিল তাঁর দিকে চেয়ে। আবার চোখে জলের আভাস দেখা দিল অমিতার। যাই বলো, মৌরী একাজটা ভালো করল না— একটুও না। একদিন ও নিজেই বুঝবে কিন্তু লাভ কি তাতে?

মঞ্জু বললো—যাই বলো, এবার কিন্তু ছোট পিসীর একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য আমাদের কাছে। মাথায় একটা পর্বত-প্রমাণ বোঝা বোধ করছিলাম—কেবল ভাবছিলাম, কি করে কি করি। সব দায়িত্ব যে ছোট পিসী নিলেন সে কি কম বাঁচা? সত্যি মঞ্জু অসম্ভব হাল্কা বোধ করতে লাগলো। যাক্, এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

ভাবতে হলোও না। নামানো মাল তোলা হলো, রওনা হওয়া মাল পথ থেকে ফেরত গেল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু পড়শীরা সবাই ঠিক সময়ে চিঠি পেলো, বিয়ের দিন পিছিয়ে যাওয়ার। এখন আত্মীয় মহলে এই থাক। তারপর বলা যাবে এ বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। লক্ষ্ণৌ থেকে সুদর্শনের বাবার টেলিগ্রাম পর্যন্ত হাতে এসে গেল সংবাদ শুনে মর্মাহত হবার। আর কি,—গয়নাপত্র শাড়ী-কাপড়? তাও তিনি শীগগিরই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন তাঁর মাসশাশুড়ীর মেয়ের বিয়ের জন্য কিনে নিয়ে। হাঁ—কপালের ঘাম মুছতে পারেন ছোট পিসী—নিশ্চয়ই পারেন আত্মপ্রসাদ বোধ করতে। অসুস্থ লিখলে আবার সুস্থ হবার প্রশ্ন আসতো না। তারপর তিনি মেয়েমানুষ। তিনি কি সুদর্শনের মনোভাবটা কিছু বুঝতে পারেন না? সে এসে উপস্থিত হতো না—। তারপর মানমর্যাদা কিছু অবশিষ্ট থাকত কি?

সুদর্শনের বাবার মর্মাহত হবার সংবাদ নিয়ে তাঁর আর্জেন্ট টেলিগ্রামখানা সাদাটে মুখে টেবিলের উপর পড়ে ছিল। অমিতাই হয়তো ওটা রেখে গিয়েছিল ওদের ঘরে। মঞ্জু সেটা খুলে আর একবার মনোযোগ দিয়ে পড়ল; তারপর ফের সেটাকে কাগজচাপা দিয়ে চেপে রাখতে বললো— ছোট পিসীর বুদ্ধিটা খেটে গেছে— আর যাবেই বা না কেন? এই খবর মিথ্যা হতে পারে এ কল্পনা করাও অসম্ভব। ড্রেসিং টেবিল থেকে মাথার তেলের শিশিটা তুলে নিয়ে চুলের গোড়ায় আঙ্গুল চালিয়ে তেল দিতে দিতে ঘরের এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে মঞ্জু বললো—ইস্, আমি যদি মুহূর্তের জন্যও একবার দিব্যদৃষ্টি লাভ করতাম!

—তবে কি হতো? অমিতার সেলাই-এর কাজটায় ফুল তুলছিল মৌরী। দাঁতে সূতো কাটতে কাটতে জিজ্ঞাসা করলো।

—সুদর্শন বাবু কি করছেন একবার দেখতাম। জীবনে এমন প্রচণ্ড ভাবে কাউকে একটি বার দেখে আসবার বাসনা আর কোন দিন জাগবে কিনা জানিনে। আলোর দিকে মুখ করে মৌরী ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিল— তেলহাতেই ওর চিবুকটা নিজের দিকে টেনে ধরে মঞ্জু বললো—আচ্ছা, সত্যি করে বল, তোর ইচ্ছে করছে না?

মঞ্জুর হাতটা সরিয়ে দিয়ে আঁচলে মুখের তেলটা মুছতে মুছতে মৌরী বললো—কলেজে যাওয়া বন্ধ করে বাড়ীময় ঘুর-ঘুর করছিস আর কেবল কথা বলছিস? এতো কথা বলতেও পারিস? তোর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হয় আমিই যেন কথা বলছি।

—ঘরে ঘরে সব গুম্ হয়ে বসে আছে; কি করবো শুনি? আমি ওভাবে থাকতে পারিনে। থাকাটাও দেখতে পারিনে। কিন্তু আমার কথা শুনে তোর মনে হয়, কত কথা যেন তুই-ই বলছিস আর ক্লান্ত লাগে—তাই না?

—হাঁ। ফের সেলাইটা তুলে নিল মৌরী হাতে।

—কাউকে বেশী খেতে দেখলে তোর মনে হয়, তোর খাওয়া হয়ে গেল। কাউকে বেশী কথা বলতে শুনলে, মনে হয় তুই-ই কথা বলেছিস—ক্লান্তি বোধ করিস। চার দিকে দেখে তোর বিয়েতে অরুচি এসে গেছে। দুদিন বাদে বলবি যা দেখছি চাইনে বাবা, ছেলেমেয়ে হওয়াও। জীবনের সব স্বাদে যদি তোর এই ভাবে বিতৃষ্ণা এসে যায়—তবে উপায়টা কি তোকে নিয়ে? অমিতাকে বারান্দা দিয়ে যেতে দেখে এগিয়ে গেল মঞ্জু দরজার দিকে—বৌদি, তোমাকে বললাম না স্নান করে তৈরী হয়ে নিতে? একটু তোমার মার ওখানে যাবো। বেচারী রিণুরা নিশ্চয়ই ভাবছে ওদের ভালো সী'র বিয়ে বুঝি হয়েই গেল ওদের বাদ দিয়ে।—সন্ধ্যার সময়? বেশ তাই যাওয়া যাবে। স্নান সেরে ভিজে চুল চেয়ারে উল্টো পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে ফের এসে বসল মঞ্জু মৌরীর মুখোমুখী। তুই সুদর্শন বাবুর উপর দস্তুর মতো অবিচার করলি দিদি! আচ্ছা, দেনাপাওনার জীবানন্দ চরিত্রটি তো তোর কাছে আকর্ষণীয় চরিত্র?

সেলাই এর দিকে দৃষ্টি রেখেই জবাব দিল মৌরী—হাঁ।

—কিন্তু কেন? যার চরিত্র বলতে কিছু নেই। যার মুহূর্ত কাটে না মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া। গৃহস্থ-বধুর সম্ভ্রম নষ্ট করাটা যার কাছে কিছুই নয়— যে মুখ বিকৃতি করে বলে, ভালো না লাগলে মেয়েদের আমি চাকর-দারোয়ানকে দিয়ে দি— যার ভেতর কোন মনুষ্যত্ব নেই—

সেলাই থেকে মুখ তুলল মৌরী— গোটা বইটায় যতগুলো চরিত্র আছে তার ভেতর সত্যিকারের মানুষ কে?

নীরবে মঞ্জু তাকিয়ে রইল মৌরীর দিকে।

মৌরী হাতের সেলাইটা পাশে রেখে দিয়ে বললো— গোটা বইটার নিষ্ঠাবান চরিত্রবান লোকগুলোর মনুষ্যত্ব যোগ করলেও কি ঐ চরিত্রহীন লোকটির মনুষ্যত্বের সঙ্গে তুলনা হয়, না পাশে এসে তারা দাঁড়াতে পারে?

অবাক কণ্ঠে মঞ্জু বললো—গৃহস্ত-বধূদের করুণ কান্না পর্যন্ত যার হৃদয় স্পর্শ করত না—

—পশু বলি হওয়ার সময় যে কান্না কাঁদে, সে কান্না কি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে? এ-ও ঠিক সেই জাতীয়। কিছু মানুষ আছে, যারা মনুষ্যত্ব নিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সবাইকে মানুষ বলে গণ্য করে না। যে মেয়ের রুখে দাঁড়ানোর ভেতর সত্যিকারের মানুষের দেখা মিলল, সেখানেই থমকালো সে—থামলো সে। তারপর থেকে একটি মেয়ের মনুষ্যত্বের প্রতি যে স্বীকৃতি যে সম্মান যে শ্রদ্ধা সে দিয়ে গেল, তা দিতে পারার মতো শক্তি ক'জনার আছে?

—জীবনের প্রৌঢ়ত্বে এসে সেই মেয়েটির দেখা না মিললে, সমস্ত জীবনেও হয়তো তার এই মনুষ্যত্বের দেখা মিলত না।

—তা হলে লেখক'ও তাকে নায়ক করে গল্প লিখতে বসতেন না। যেদিন তার মনুষ্যত্বের দেখা মিলল গল্পের সুরুও সেদিন থেকেই হলো— তার আগে নয়।

—বেশ, মনুষ্যত্বটাই যদি মনুষ্য-চরিত্রের সব চাইতে মূল্যবান কথা হয়—তুই তো সুদর্শন বাবুর সেটা না থাকার কোন পরিচয় পাসনি?

—বিশ্বকর্মা নাকি তাঁর বাঁ পা ঝাড়া দিয়েই বেশীর ভাগ মানুষ সৃষ্টি করেন। কিন্তু মানুষ যখন সাহিত্য সৃষ্টি করতে বসে তখন সৃষ্টি করে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাই মানুষের সৃষ্টির কাছে বিশ্বকর্মার বেশীর ভাগ সময়েই

হার হয়, সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রের কাছে বিশ্বকর্মার সৃষ্ট চরিত্র দাঁড়াতে পারে না। তাই জীবানন্দের মতো চরিত্রহীনের অন্ত নেই, কিন্তু তার মতো মনুষ্যত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন।

পরের দিন সকালবেলা খবরের কাগজ পড়া শেষ করে আড়-মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। বললো—তুই তো চন্দ্রসূর্যের মুখ দেখা বন্ধ করেছিস বলব না, কারণ সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ছাদে চাঁদই তোর সঙ্গী। কিন্তু সূর্যি ঠাকুরের সঙ্গে তো একেবারে আড়ি দিয়েই বসে আছিস। দিব্য ঝক্‌ঝকে চকচকে একটি রোদ উঠেছে। একটু বেরিয়ে পড়ি আমি।

—তোর বেরুনো ঠেকে কিসে? রোদ উঠলে দিব্য রোদ উঠেছে! মেঘ করলে—উঃ কি অপূর্ব মেঘ করেছে! বৃষ্টি নামলে তো কথাই নেই— আঃ ভিজতে কি আরাম। তা কোথায় বেরুবি— কলেজে?

মঞ্জু ততক্ষণে কাপড়ের আলমারীর দু'পাট খুলে দাঁড়িয়ে শাড়ী দেখতে দেখতে বলছে—লাল চলবে না। সবুজ চলবে না। বেগুনী—উঁহু। মেরুন ত অসম্ভব অসম্ভব। নীল—বলেই থেমে হেসে ফেলে বললো, বলতেই কেমন মানুষটাকে মনে পড়ে গেল! নাঃ, গায়ের রংটা কি অসুবিধায়ই না ফেলেছে! খুসীমত টেনে খুলে শাড়ী-জামা পরবো তার পর্য্যন্ত উপায় নেই। সাদার উপর হলুদ-লাল-সবুজ রং ছিটানো মতো একটা হাওয়াই অর্গেণ্ডির শাড়ী খুলে পরতে পরতে বললো—তুই ঠিকই বলেছিস দিদি— বিশ্বকর্মার চাইতে সাহিত্যিক অনেক বেশী দরদী। তারা নায়িকাদের রং রূপ দিতে কৃপণতা করেন না। পদ্মফুলের মতো রং, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট, চাঁপার কলির মতো আঙ্গুল—

বাধা দিল মৌরী। বললো—যাচ্ছিস কোথায় তুই? গ্রাণ্ডে?

আঁচলটা কাঁধে তুলে দিতে দিতে মৌরীর দিকে তাকালো মঞ্জু— ভাবছিস কি দিদি তুই?

—ভাবছি না ভয় করছি!

ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মঞ্জু বললো—কবি বলেছেন কি জানিস? বলেছেন—

> সবারে বাসবে ভালো
> নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।
> যাহা তোর আছে ভালো
> ফুলের মতো দে সবারে।

—তবে গ্রাণ্ডেই যাচ্ছিস তুই? দেখ মঞ্জু, আমি বলছি লোকটি ভালো নয়।

মঞ্জু তেমনি ভাবে জবাব দিল—

> যারে তুই ভাবিস ফণী
> তারও মাথায় আছে মণি।

আর কথা বলল না মৌরী। গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

মঞ্জু শাড়ী-জামা পরে, চটি পায়ে দিয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে মৌরীর গম্ভীর মুখের কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললো—

> ভালোবাসি ভালোবাসি
> এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে
> বাজে কেবল আমার বাঁশী—হাঁসি।

হালকা হাওয়ার মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু প্রায় তক্ষুণি আবার ফিরে এসে ঘরে মুখ বাড়িয়ে বলে গেল—মমতাদের বাড়ি যাচ্ছি।

মাছ-তরকারী কেটে রান্নার ব্যবস্থা দিয়ে দাটাকে কাত করে রেখে সেখানেই জল-চৌকিটার উপর চুপ করে বসেছিল অমিতা। জুতোর শব্দে বেরিয়ে এলো—তুমিও বেরুচ্ছ না কি?

—আমিও বেরুচ্ছি নাকি মানে? বাড়ীর আর সবাই কি বাইরে নাকি?

—তাই তো! বাবা পিসীমা সেদিন থেকে এক রকম ও বাড়ীই। আজ এইমাত্র চিঠি দিয়ে দুভাইকেও ছোট পিসী ডেকে নিয়ে গেছেন। তারা খাবেও ওখানে বলে দিয়েছেন।

—কি ভাগ্য দাদাদের— ছোট পিসীর কাছে নেমন্তন্ন! কিন্তু একবার খোঁজ নিয়ে দেখো তো চুপি চুপি— কাল ওবাড়ীতে কোন ডিনার পার্টি ছিল কি না— কিছু বাড়তি খাবার রয়ে গেছে কি না এবং ছোট পিসীর ফ্রিজটা নষ্ট কি না।

হাসল অমিতা। বললো— বোধ হয় তাই। কিন্তু আজ আমিও এ বাড়ীতে টিকতে পারবো না কিছুতেই।

—কেন আজ কি?

—বাঃ, আজ বিশে আষাঢ় নয়?

—ওঃ।

—হাঁ, আমার ভারি খারাপ লাগছে। সামান্য রান্না দিয়েছি। খেয়ে নিয়ে এসো, আমরাও বেরিয়ে পড়ি ঘুরে-বেড়িয়ে ছবি দেখে সেই রাতে ফিরবো— কেমন?

না করতে পারলো না মঞ্জু। বললো, বেশ। একটার ভেতরই ফিরবো আমি। তার পর বেরিয়ে পড়া যাবে।

— মৌরী যদি না যেতে চায়?

— সে ভার আমার।

— তুমি যাচ্ছ কোথায়?

—মমতাদের বাড়ী।

—হঠাৎ?

— হঠাৎ নয়। বাবার যাওয়ার সময় থেকেই ভাবছিলাম যাওয়ার কথা।

— কেন?

—মমতাকে এই কথা বলতে যে, তোমার দাদা আমার বাবার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু ওটা উল্টো ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। ক্ষমা চাইবো আমরা। আর সেটা চাইতেই আজ আমি এসেছি।

—যদি মমতা বাড়ী না থাকে?

— তার দাদাকে বলবো।

॥ ১৪ ॥

মঞ্জু যখন যাদবপুরের বাস-ষ্ট্যাণ্ডে নেমে রিক্সায় উঠল তখন আষাঢ়ের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের শান্ত আসা-যাওয়ার খেলা চলছে। এবং তাদের সেই শান্ত খেলার ছায়াটা শান্ত পায়ে আসা-যাওয়া করছে মাটির উপর। কখনো মঞ্জুর মাথার উপর এক আকাশ রোদ কখনো এক আকাশ ছায়া। বাস থেকে নেমে ও যখন রিক্সায় ওঠে তখন আকাশটা ছিল ছায়া ভরা, তাই হুডটা তুলে দেওয়ার কথা মনে হয়নি। খানিক বাদে রোদটি এসে মাথায় পড়তেই চেষ্টা করল সে রিক্সার হুডটা তুলে দিতে। পারল না। রিক্সাওলাকে বলবে, না আবার সে থামবে। সাইকেল থেকে নামবে, তুলবে—থাকগে। রোদ যে গরমটুকু ধরাচ্ছে ছায়া আর হাওয়া এসে তখনই প্রায় সেটা দূর করে দিচ্ছে, কষ্ট হবে না। রেল লাইন, রাস্তার দুপাশের দোকান বাজার, রাস্তার উপর ভোরের বাজারের অবশিষ্ট শুকনো মলিন শাক-তরকারীর ডালা-ঝুড়ি নিয়ে বসে থাকা দোকানীদের পার হয়ে সাইকেল-রিক্সাটা ছুটে চললো বেল বাজাতে বাজাতে। মমতাকে পাওয়া যাবে কিনা, মমতার মা ওকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন, ওর বাবা ফিরে এসেছেন কি? মা যদি ওকে দেখে মুখ ফেরান আজ? ও বুঝবে ওকে অসম্মান করার জন্য নয়। চোখের জল আড়াল করবার জন্য। যদি আরো সমব্যথী আত্মীয় বন্ধু বাড়ীতে থেকে থাকে! এতক্ষণে একটু যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল মঞ্জু— না, অশোভন বা বেখাপ অবস্থায় পড়লে নীল নিশ্চয়ই উদ্ধার করবে। এ সবই ভাবতে ভাবতে চলছিল—রিক্সাটা বাঁক নিয়ে উদ্বাস্তু কলোনীর কাঁচা রাস্তায় পড়লে, বিষম এক ঝাঁকুনী খেয়ে শক্ত হয়ে বসল মঞ্জু। সামনে কাঁচা রাস্তার এবড়ো-খেবড়ো পথ। আরো কিছু ঝাঁকুনী খেতে হবে।

আষাঢ়ের বৃষ্টি পেয়ে বৈশাখ-জৈষ্ঠের রোদ-দগ্ধানো গাছগুলো কচি নতুন পাতায় বেড়ে উঠেছে। বর্ষার ঝোপে ঝাড়ে দ... লতাপাতায় সবুজে দূর থেকে সমস্ত কলোনীটাকে দেখাচ্ছে, একটা বনের মতো। এগারোটা বাজে। পল্লীটার কর্মব্যস্ততাও বুঝি তাই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পুরুষরা চলে গেছে কাজে, নয়তো কাজের খোঁজে। ছেলেরা স্কুলে-কলেজে। মেয়ে-বৌরা কেউ গা-ছাড়া ভঙ্গিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কেউ কাঁচামাটির রকে দাঁড়িয়ে হলুদ-মাখা আঙ্গুলে চুলের বিনুনী খুলছে। কেউ বাসনের পাঁজা নিয়ে চলছে পুকুরঘাটের দিকে। পানা-ভরা পুকুরে এককোমর জলে দাঁড়িয়ে নারকেল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানান ভাঙ্গা ঘাটটা মেরামত করছে ক'জন লোক। রাস্তার পাশের টিউবওয়েলটার সামনে মেটেকলসী আর বালতির ভিড়। কামারের হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে রোগা শিরতোলা-হাতে জল পাম্প করছে মেয়ে-বৌরা। তাদের পেট-টিংটিং-এ ছেলেমেয়েগুলো মায়েদের জল ভরার সময়টুকুতে কেউ একটু খেলে নিচ্ছে। কেউ হাঁ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে শিশু-মুখে বৃদ্ধের অবসাদ আর বিষণ্ণতা নিয়ে। তার পর মায়েদের জল-ভরা হলে পেছন পেছন বাড়ী ফিরছে।

ঘন বসতিটা ছাড়িয়ে প্রান্তঘেঁষা মমতাদের বাড়ীর দরজায় নেমে রিক্সাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে ঢুকল মঞ্জু। পুঁই-ঝাঁকা থেকে টেনে টেনে নিবিষ্ট মনে পাতা খাচ্ছিল যে ছাগলটা, ওকে দেখে সে দু'পা সরে দাঁড়ালো মাত্র। বাড়ীতে কেউ নেই নাকি? মঞ্জু তাকালো বাড়ীটার দিকে। না, আছে। দরজা খোলা রয়েছে দু'টো ঘরেরই। ও বারান্দায় উঠল, ঘরে ঢুকল কিন্তু তবু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কা'কে ডাকবে— কি বলে ডাকবে ভাবছে—পাশের ঘর থেকে কথা কানে এলো। বোধ হয় সাময়িক বিরতিতে থেমেছিল। কোন পুরুষকণ্ঠ পূর্বকথার রেশ ধরে বলছে— কিন্তু ডার্লিং, ভালো থেকে এগুচ্ছে কিছু? সম্মান পেলে—বিশ্বাস মিলল?

গলাটা এমন চেনা-চেনা লাগছে কেন! লোকটি তখন বলে চলেছে, এর চাইতে অনেক বেশী দূর এগুতে পারতে—এমন কি বিদেশ পর্যন্ত। এ গ্রুপেই তোমায় ঢুকিয়ে দিতেন প্রফেসর বোস যদি তাঁকে একটু খুশীও করতে। আমার মতো তো সবাই নয় ডার্লিং যে, বিনামূল্যে বিকিয়ে বসে থাকবে।

কার, কার—কার গলা এটা! ভুরু ঘন করে তুলল মঞ্জু। এখানে কে ওদের চেনাজানা আসতে পারে—এ জাতীয় কথা বলতে পারে। কিন্তু কোথাও এ গলাও নিশ্চয়ই শুনেছে—নিশ্চয়ই।

—আমার কি এগুতো ডক্টর সেন, আমি তো তা জানিই। আপনার কি এগুতো সেটা কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিনে।

—আমার? কিচ্ছু না—কিচ্ছু না। তবে হাঁ, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কর্তাকে সুখী করতে পারলে আখেরে ভালো ফল দেয় বৈ কি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার কথা ভেবে আমি তোমায় প্রফেসর বোসকে খুশী করতে বলছিনে। আমার জন্য আমিই যথেষ্ট। এবার লোকটির গলায় যেন আবেগ এসে গেল—প্রথম যেদিন অচেনা অজানা একটি মেয়ে তোমায় গেটে দাঁড়িয়ে দ্বিধায় সঙ্কোচে ইতস্ততঃ তাকাচ্ছো দেখতে পাই তখন মমতা তোমার জন্য কোন মমত্ববোধই তো ছিল না তবু মমতা বোধ করেছিলাম। সেদিন থেকে বন্ধু হিসাবে তোমার ভালো করে আসছি, ভালো চেয়ে আসছি। চিরকাল তাই চাইবো। একটু থেমে বোধ হয় চুরুট বের করে দু ঠোঁটের চাপে চুরুটটা চেপে ধরে বললো, লোকটার অসীম ক্ষমতা। যদি তার তুষ্টি সাধন করতে পারো আমি বাজি রেখে বলতে পারি—

নিঃশ্বাস টানল মঞ্জু—ভদ্রলোকটি ছোট পিসীর সেই ডাক্তার দেওর। যার মুখে নার্সদের কীর্তি-কাহিনী শুনে ছোট পিসী ঘেন্নায় মরে যান, শিউরে শিউরে উঠেন। এতক্ষণ যে গলাটা চিনতে পারছিল না চুরুট-চাপা ঠোঁটের দুটো কথায় মুহূর্তে সে গলা চেনা হয়ে গেল ওর। কারণ ঐ ভাবেই ডাক্তার কথা বলেন প্রায় সর্বসময় অন্তত রোগীর বাড়ী গিয়ে। আর হাঁ, মমতার সঙ্গে তাঁর দেওরেরই প্রথম দেখা হয়েছিল, ছোট পিসীও তো তাই বলেন। নিঃশব্দ পায়ে তামাকের সরঞ্জামের পাশের তেলচটা ইজিচেয়ারটায় গিয়ে বসল মঞ্জু। মৌরী নিশ্চয়ই বলবে, ভয়-ডর তো নেই—ঘাবড়ানো কা'কে বলে তাও জানিস নে—সামনে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলি নে কেন? কিন্তু না— এমন মন্দ লোক আছে যাদের ঐ ভালোর মুখোসটুকুই একমাত্র ভালো। ওটা টেনে খুলে দিতে নেই। দিলে তাতে লাভের চাইতে লোকসানই হয় বেশী। এ বাড়ীর এই ঘরটা আর এই কোণটাই মঞ্জু চেনে। তাই ওখানটায় গিয়েই সে বসল। কথা শুনবার জন্য নয়। কিন্তু ওখানে বসলে কথা না শুনে উপায় নেই—বাধ্য হয়েই সে শুনতে লাগল।

মমতা বললো—সবাই বলে হাসপাতালে আপনার রোগী দেখার চাইতে বড় কাজ প্রফেসর বোসের পরিচর্যা করা, আর তার মন-মেজাজ দেখা।

—তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। যে দেশের যে আচার পালন করার মতো বাঁচতে হলে যে যুগে যে ধর্ম সেটাও অবশ্য পালনীয়। এ যুগে কর্মকর্তাদের কোন কাজ দিয়ে খুশী করা যায় না, একমাত্র তাঁদের খুশী করার কাজ ছাড়া। যারা বলে, খোঁজ নিয়ে দেখোগে, তারাও এই করছে। বড় হবার আর কোন উপায় নেই।

—বড় হবার নয়, বলুন ছোটর বড় হবার।

—না। বলবো বড়রও বড় হবার এই এক পথ। যত বড় গুণীই হোক খোসামোদ তদ্বির-তদারক আর কৌশল ছাড়া কোন পথ নেই আজ বড় হবার, প্রতিষ্ঠিত হবার—খ্যাতি অর্জন করবার। একদমে বলে যেতে লাগলো ডাক্তার— যে এসব পারে না সে যত বড়ই হোক ছোট হয়ে থাকে এবং মরে। যে পারে সে ছোট হলেও বাঁচে, প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।

—বড়রা ও-সব পারে না, তাই ছোটরাই আজ-কাল বড় হচ্ছে এবং ছোট ছাড়া বড় কাজ, মহৎ কাজ কিছু হচ্ছে না।

— দেখো ডার্লিং—

—প্লিজ ডক্টর সেন, আপনার ঐ বিতিকিচ্ছি সম্বোধনটা যুগধর্মের খাতিরেও আর আমি শুনতে পারছিনে।

— কেন, করেছে কি সে তোমার? সে তো আর ছুটে গিয়ে তোমায় জড়িয়ে ধরতে পারছে না? ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক শরীরটাকে জড়িয়ে ধরতে পারলে তবু যে কিছু পাওয়া যায়। যে সম্বোধনে মন সাড়া দেয় না—তার মূল্য কি? সে তো আমার চাইতেও করুণার পাত্র প্রিয়ে—থাক্ থাক্ তুমি বোস। আর না হয় ও- সব বেরসিক সম্বোধন করব না।

মৌরী হলে এ জাতীয় কথায় কানে হাত চাপা দিত। মঞ্জু চোখ দুটোকে শুধু কুঁচকে তুললো। ওরা এখনো জানে না, পুরুষের জগতে কাজ করতে নামলে এজাতীয় কথা দু'কান ভরে কত শুনতে হয় আর ওগরাতে হয়।

মমতা বললো—না সে জন্য উঠছি নে। ও-সব গা সওয়া হয়ে গেছে। আমি উঠছি আমার ডিউটির সময় হয়ে গেছে।

ডাক্তার নিশ্চয়ই পা নাড়তে নাড়তে কথা বলছে। তার ভারী জুতো কাঁচা মাটিতে ঈষৎ ঢব ঢব শব্দ তুলছে। উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল সে— বেশ বেশ যতটুকু পাওয়া যায়। প্রিয় সম্বোধনটুকুই বা মন্দ কি? মহার্ঘ খাবার স্বাদে গন্ধে মুখে পুরে দেবার মতো ভাগ্য কি গরিবের হয়? তাদের ঘ্রাণে নাক, দেখায় চোখ তৃপ্ত করেই তুষ্ট থাকতে হয়। এও সেই রকম। ডেকেই আনন্দ। শুধু শিশুই কি মাকে নামের নেশায় ডাকে— মানুষ তার প্রিয়কেও ডাকে। হাতের বই-টই কিছু একটার উপর জোর থাবড়া মারল ডাক্তার— বোস তুমি। ডিউটির জবাব দেবে তো আমার কাছে।

—যুগের গতি অনুযায়ী হাসপাতালের ডিউটি না করে কর্তাব্যক্তিকে খুশী করবার ডিউটিটাই আমাকে করতে বলছেন।

—দেখই করে! একবার এ বিদ্যেটা যদি আয়ত্তে এনে ফেলতে পারো তবে আজকের যুগে কোথায় ওঠ।

নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো। চলুন। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো মমতা।

—এই তোমার চেষ্টা করা! গম্ভীর কণ্ঠ ডাক্তারের—তোমার মাকে তোমার মাসিমা এসে নিয়ে যাবার পর থেকে দুবেলা আসছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। কথা বলি—কখনো জবাব দাও। কখনো চুপ করে থাকো। কখনো বলি এক কথা, জবাব দাও অন্য কথা—

—সত্যি একেবারে অনর্থক সময় নষ্ট হয় আপনার—চলুন। মমতার জুতোর শব্দ পাওয়া গেল— পা বাড়াবার।

এবার হাতের নিবন্ত চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ডাক্তার। সেটা এসে পড়ল মঞ্জু যে ঘরে বসেছিল সে ঘরে। উঠে মমতা বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল বিকৃত মুখে বাধা দিয়ে বললো—তুমি এখন আমায় যা বলবে সে আমার বহু শোনা। আমার কাছে তোমার আর প্রফেসর বোসের কাছে আমার জবাব দিতে না হওয়া, তোমার মার অনুপস্থিতি, দাদার বাড়ী না থাকা— এগুলো আমার কাছে মস্ত সুযোগ! তোমার কাছে নয়। তোমার বাধা তুমি নিজে। তোমার কাজের জবাব সব আগে তোমার কাছে— এই সব আর কি। অবহেলাভরে থামল ডাক্তার।

এবার বোধ হয় মমতা একটু হাসলো। বললো— না, এ কথাগুলো আর আমি বলব না। আমার কথায়, আমার চলায় ধাতস্থ হওয়া নিশ্চয়ই কঠিন। আপনাকে আমি পারলাম না কিন্তু আপনাদেরটায় আমি প্রায় তো ধাতস্থ হয়ে এলাম নয়? এবার চলুন। আর আমি এক মিনিটও দেরী করতে পারবো না। আপনি যদি আপনার হাজিরার খাতা এখানে এনে হাজির করেন—তবু নয়।

মঞ্জু একটু নড়ে-চড়ে সোজা হলো। এবার দরজা বন্ধ করতে মমতা নিশ্চয়ই আসবে এ ঘরে। এ ভাবে বসে থাকলে যে বিষম রকম একটা অপ্রস্তুত অবস্থার ভেতর পড়তে হবে, এতক্ষণ এ খেয়ালটা ছিল না— কি করা যায়! কিন্তু মমতার হাইহিলের ঠক ঠক শব্দ পেছন পেছন ডাক্তারের ভারী জুতার শব্দ বেরিয়ে গিয়ে নামল উঠোনে। দরজা খোলা থাকবে! সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করল ডাক্তার। মমতা বললে—কিছুই ক্ষতি ছিল না। মূল্যবান বস্তুর ভেতর রয়েছে তো দাদার কিছু বই। ও চোরে ছোঁবেও না। তবে আমি খালি রেখে যাচ্ছিনে। বলে বেশ কষ্ট করেই গলা তুলে ডাক দিল যেন কা'কে— ছট-টু-উ-উ। তক্ষুণি জবাব এলো—আই তা-ছি-ই। আর এই ছট্টুর আসবার অপেক্ষায়ই বোধ হয় দাঁড়িয়ে রইল মমতা। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—ভালো কথা, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি নাকি বিয়ে করছেন ডক্টর সেন?

—হাঁ। গম্ভীর এবং ক্ষুধিত ঠোঁটের জবাব।

আহত কণ্ঠে মমতা বললো—'হাঁ' বলছেন আপনি?

—আমি 'না' বললে কি চ্যাটার্জ্জীর বিয়ে থেমে থাকবে? আর তুমি সংবাদটা শুনে যতটা মর্মাহত হচ্ছ আর যার কথা ভেবে হচ্ছ সেই নমিতা একটুও আহত হয় নি। আজও চ্যাটার্জ্জী আর নমিতাকে নাইট ডিউটির পর আমি একসঙ্গে হাসিমুখে বের হয়ে আসতে দেখেছি—চা খেতে দেখেছি। নমিতারা জানে, বিয়ে আর ওদের ভেতর সংঘাত নেই কোথাও।

—ডাকতাছ কেন মমতাদি? একটা কচি গলা। ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে।

—আমি বেরুচ্ছি। দাদা না ফেরা পর্য্যন্ত বসবি। এই এক্ষুণি দাদা ফিরবেন। আমি এসে তোকে বিস্কিটের পয়সা দেবো এ্যাঁ?

সম্ভবত ছট্টু মাথা ঝাঁকুনির উপর জবাবটা সারলো। ওদের গাড়ীর দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। গাড়ীটা বেরিয়ে গেলে এবার উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। মমতারা চলে গেলে ও নিজেও চলে যাবে এই সে ভেবেছিল। কিন্তু মমতা বলে গেল, দাদা এক্ষুণি ফিরবেন। একটু অপেক্ষা করা যাক। আর ছেলেটাও ওকে দেখলে ঘাবড়ে যাবে হয়তো। ইজিচেয়ারটা ছারপোকায় ভরা। এতক্ষণ ওকে একটুও স্বস্তিতে বসতে দিচ্ছিল না। হাতের নানা জায়গা ফুলে উঠেছে লাল হয়ে হয়ে। ওটাতে আর বসতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু চৌকিতে গিয়ে বসলে খোলা দরজা দিয়ে ছট্টুর ওকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা আছে। অগত্যা ওকে ফের চেয়ারটাতে বসতো হলো।

ছট্টু পুঁইমাচাটা থেকে একটা কঞ্চি টেনে নিয়ে প্রথমে হৈ হৈ করে ছাগলটাকে তাড়ালো। তারপর গিয়ে বসল সিঁড়ির উপর। কঞ্চিটা নাড়তে নাড়তে একা-একা কথা কয়ে চললো সে— মমতাদি যদি চাইর আনার পয়সা দেয় তবে একটা চকলেট আইসক্রিম খামু। বলেই পায়ের দু হাঁটু চাপড়ে হা, হা করে হেসে উঠল সে খুশীতে। তারপরই আবার বললো, না, চকলেট আইসক্রিম খামু না। উঁহু একটা বাটির দামই চাইর আনা নিব। একটা দুধ আইসক্রিম খামু দুই আনার। কটুর লেইগা বিস্কুট নিমু চাইর পয়সার। বাবার লেইগা বিড়ি নিমু চাইর পয়সার— না হইল না। মায়ের লেইগা তো রইল না! আবার বাজেট ছাঁটতে বসল ছট্টু। দুধ আইসক্রিম যাউক গিয়া। চাইর পয়সার একটা জল আইসক্রিমই খামু। মার লেইগা চাইর পয়সার বরফে ঠাণ্ডা জর্দা পান নিমু— ঠিক হ্যায়। কঞ্চিটা দিয়ে কষে মাটিতে গোটা কয় বাড়ি মারল সে।

ইজিচেয়ারটার ছারপোকাগুলো নিশ্চয়ই উধাউ হয়ে যায়নি বা হঠাৎ আতিথেয়তাও শুরু করেনি। কিন্তু নিশ্চয়ই মঞ্জুকে তারা আর কামড়াচ্ছে না। নইলে এতক্ষণ তাদের অত্যাচারে স্থির হয়ে বসতে পারছিল না। কেবল এ কাত সে কাতে চেয়ারটা থেকে শরীরটাকে আলগা রাখতে চেষ্টা করছিল—এখন কেমন গা ঠেসে বসে সকৌতুকে কথা শুনছে ছট্টুর। ছট্টু তখন মমতা দি'যদি চার আনা না দিয়ে দু'আনা দেয় তবে কি ভাবে সামলাবে তাই ঠিক করছে এবং মুহূর্তে চার পয়সাকে ছেঁটে দু পয়সা করে বাজেট সামলে ফেলেছে। হৈ হৈ করে গরু ছাগল যা হয় একটা কিছু তাড়িয়ে আবার এসে সিঁড়িটায় বসল সে। আইচ্ছা, আমারে যদি কে'উ একটা মস্ত ঘোড়া দিত তবে—

চেয়ারটা নিঃশব্দে টেনে একেবারে জানালাটার কাছে নিয়ে এলো মঞ্জু। একটা ঘোড়া পেলে এই কচি ছট্টু কি করে তা শুনবার জন্য।

—আরে ছট্টু, তোকে আজও বাড়ী পাহারায় বসিয়ে রেখে গেছে তোর মমতা দি'? এতো বড় অত্যাচার—চালাচ্ছে সে তোর উপর?

চট করে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু চেয়ার ছেড়ে। যে পর্যন্ত কোণ ঘেঁসে বসে আছে কারণটা তার নীল বুঝতেও পারবে না, জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না। মনে মনে অবাক হবে। কয়েক পা এগিয়ে ঘরের মাঝখানটায় এসে দাঁড়ালো সে।

—নে চারটে পয়সা নে। লজেন্স খাস।

মঞ্জু দেখল নীল এ পকেট সে পকেট হাতড়াচ্ছে। তারপর পকেট থেকে শূন্য হাতটা টেনে বের করে এনে উসকো চুলের ভেতর চালাতে চালাতে বললো— না রে, ভাঙ্গতি নেই। বিকেলে আসিস।

পয়সার অপেক্ষায় ছট্টু নীলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বললো— দেও না। লজেন্স কিনলেই তো দোকানদার ভাঙ্গতি দিয়া দিব।

অপ্রস্তুত মুখে হাসল নীল। আমি কি বলেছি আস্ত আছে? যা, বললাম যে বিকেলে দেবো।

—ওঃ, বলে বিষম অপ্রস্তুত মুখ করে রাস্তার দিকে দৌড়োলো ছট্টু। ওর অপ্রতিভ মুখের ছুটে পালানোর দিকে তাকিয়ে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল নীল। তারপর এসে ঢুকল ঘরে। চার শিকের একটা ছোট্ট জানলা দিয়ে ঘরে যে আলোটুক এসে ঢুকছিল তাতে বাইরের তুলনায় ভেতরটাকে একেবারে অন্ধকারই বলা চলে। কিন্তু সে জন্য নীলের মঞ্জুকে চিনতে আটকালো না। প্রথম নজরেই সে ওকে চিনতে পারলো। কিন্তু মঞ্জুকে এখন এ বাড়ীতে দেখা এমনই অবিশ্বাস্য ঘটনা যে, দরজার কাছেই অপরিমেয় বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

—চিনতে পারছেন না?

ঘরে এসে ঢুকল নীল। আপনাকে চিনতে পারবো না? কি যে বলেন! বিশ্বাস করে উঠতে পারছিনে। হাতের বই ক'টা চৌকিতে নামিয়ে 'বসুন, বসুন' বলে ইজিচেয়ারটা কোণ থেকে টেনে আনতে গিয়েও হাতটা ফিরিয়ে আনল সে। বললো—না, চলুন ও ঘরে গিয়ে বসা যাক। দু' ঘরের মাঝখানের শাড়ীকাটা পরদাটা তুলে ধরল নীল।

এ ঘরটা নীলের। হাত সাত-আটকের বেশী হবে না, একটা ছোট্ট ঘর। এক দিকের ধার ঘেঁষে একটা টেবিল। টেবিলটা ঘরটার পক্ষে অতিরিক্ত বড়। সেটা কাগজ-পত্র-বইএ ঠাসা। ও ঘর থেকে বারবার এ টেবিলটাকেই দেখা যায়। ওরা প্রথম দিন নীলকে এখানে বসেই লিখতে দেখে গেছে। টেবিলটার নিচে বিছানো খবরের কাগজের উপর তাক তাক করে সাজানো প্রায় টেবিল-সমান উঁচু বই। আর উল্টো দিকের ধার ঘেঁষে রয়েছে একটা ছোট্ট তক্তপোশ। তার উপরের বিছানাটা একটা আধময়লা চাদরে ঢাকা। তার সঙ্গে লাগানো একটা বেতখসা রং-চটা বেতের চেয়ার। চেয়ারটার পিঠের তোয়ালেটা কুঁচকে মুচকে পড়ে গেছে নীচে। পেছনের বালিশটা আছে চেপটে। টেবিলের সামনের চেয়ারটা বেতের চেয়ারটার কাছে টানা। দুটো চেয়ারেরই পাশে মেঝের উপর দুটো কাপ। একটার তলানী চায়ে ভিজে আছে কিছু টুকরো-করা ছেঁড়া কাগজ আর একটাতে ফুলে ঢোল হয়ে আছে গোটা কয় চুরুট।

—বসুন, বলে বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল নীল মঞ্জুকে। মঞ্জু বসলে অপর চেয়ারটায, বসে পাঞ্জাবীর হাতটা ঠেলে উপর দিকে তুলে দিতে দিতে বললো—যাক্ কাউকে না পেয়ে যে আপনি চলে যাননি আর ছট্টু যে আপনাকে বুদ্ধি করে এনে ঘরে বসিয়েছে। পকেট থেকে একটা চারমিনারের প্যাকেট বের করে বললো—সেদিন তো অনুমতি নেওয়া হয়ে গেছে—ধরাতে পারি? মঞ্জুর দিকে তাকালো সে। মঞ্জু ঈষৎ মাথা কাত করে সম্মতি জানালে সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে বললো—আচ্ছা, বলুন তারপর খবর কি? দিদির বিয়ে হয়ে গেল? হাসিমুখটা একটু উপর দিকে তুলে এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—তারপর আপনার কাছে-ধারে ভালো পাত্র মিলল?

মুখ গম্ভীর করল মঞ্জু। বললো—মনে হচ্ছে।

—এসব ভালো পাত্রদের বাস কোথায় যদি একবার জানতাম।

—কি করতেন তবে?

—একবার দেখে নিতাম।

—তাঁদের অপরাধ?

একবার মুখটা সোজা করল নীল। বললো—আপনাদের মতো ভালো ভালো মেয়েদের নিয়ে গিয়ে ঘরবন্দী করে। তা দিদির বিয়ের নেমন্তন্নটা তো ফাঁকিই দিলেন, আপনার নেমন্তন্নটা খাচ্ছি কবে বলুন?

—আপনি যে দিন বলবেন।

—আমি যে দিন বলবো! হঠাৎ যেন বোকা বনে গেল নীল। আপনি কি আমার মত নিয়ে আপনার বিয়ের দিন স্থির করবেন নাকি?

—করবো।

—করবেন! নীল তাকালো ওর দিকে।—আশা করি মনে রাখবেন কথাটা?

—রাখবো।

— বেশ।

এদিকে রাখবো বলেই কিন্তু থমকে গিয়েছিল মঞ্জু। এক দিকে প্রশ্নের টান আর এক দিকে ওর মজা দেখবার প্রকৃতি ওকে ঠেলে এ কোথায় এনে ফেলল। 'বেশ' বলে আচমকা যেন ওকে জলে ফেলে দিল নীল।

কিন্তু হৃদয়হীন নয় নীল। জলে ফেললেও নাকানিচোবানি খাওয়ালো না। তক্ষুণি তুলে দাঁড় করিয়ে দিল পাঁকে। উঠে দাঁড়িয়ে বললো—দাঁড়ান, দেখি একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কি না।

'বা-ব্বাঃ', বলে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মঞ্জু। তাড়াতাড়ি হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে নীলের দিকে ওর হাতটা একটু বাড়িয়ে ধরে বললো— দেখুন, বারোটা বাজে। এখন আর চা খাবো না। যে কথাটা বলতে এসেছি, সেটা বলে আমি এবার উঠবো।

— সেটা আমার শোনা হয়ে গেছে।

সোজা হয়ে উঠল মঞ্জু। মানে, আমি কি আপনাকে ঐ আগের কথাগুলো বলতে এসেছিলাম নাকি?

হেসে ফেলল নীল। বললো—নিশ্চয়ই না। শোনা হয়ে গেছে বলাটা ভুল হয়েছে আমার। বলা উচিত ছিল বোঝা হয়ে গেছে। ও থাক। এ সময়টুকু আমরা অন্য কথা বলতে পারি এবং একটু চা-ও অনায়াসে খেতে পারি—অবশ্যি যদি ব্যবস্থা করতে পারি, তবেই। এক ঘণ্টার রাস্তা এলে অন্তত আধ ঘণ্টাও বসতে হয়। নইলে গৃহস্থকে অপমান করা হয়। নীল বেরিয়ে গিয়ে পুঁই-মাচাটার কাছে দাঁড়িয়ে মমতারই মতো ডাক দিল, ছট্-টু-উ-উ।

তেমনি চেঁচানো গলায় জবাব এলো—আইতাছি-ই।

—তোর মাকে জিজ্ঞাসা কর, দু'কাপ চা পাঠাতে পারবে কি না।

—জিগাইতাছি-ই—বলে সে বোধ হয় মার কাছে জেনে নিয়ে জবাব দিল—পারব-ও-ও।

—একটু তাড়াতাড়ি কিন্তু-উ।

—আইচ্ছা-আ-আ।

নীল এসে চেয়ারে বসে পকেট থেকে ফের সেই চারমিনারের প্যাকেটটা বার করল। কিন্তু খুলে দেখল, একটা সিগারেটও নেই। খালি প্যাকেটটাই সে পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল। ফেলে দিল সে সেটাকে বাইরে।

যদিও খুবই স্পষ্ট, নীল ও-সব কথায় ঢুকতে চায় না, তুলতে চায় না। তবু মঞ্জু না বলে পারল না। বললো—আপনি আমার বাবার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু সেটা উল্টো ক্ষমা চাওয়া হয়ে গেছে। অপরাধের বোঝা আমাদের। ক্ষমা চাইব আমরা। এ কথাটাই বলতে এসেছি আমি।

এবার হেসে উঠলো না নীল। শুধু একটু হাসল।—তবে আমাকেও কিছু বলতে হয়—বলে একরাশ ঘন চুলের ভেতর আঙ্গুল চালালো কিছুক্ষণ চুপচাপ। তার পর বললো—মমতা কেন বিয়েতে রাজী হয়েছিল, আজও আমি জানিনে। এ কাজে সে ক্লান্ত কি না, তাও বলতে পারব না। সেও বলেনি, আমিও জানতে চাইনি। বাবা-মার কথাটা বুঝি— সেটাই বলছি।

— সেটা আমিও বুঝি। তাই থাক।

—আপনি যখন আপনার পারিবারিক দায়িত্ব পালন করলেন আমাকেও তখন একটু করতে হয়। ক্ষমা চাইলেন, সে আপনাদের মহত্ত্ব। সত্যিকারের অপরাধ তো আমাদের।—হাঁ, মমতার পেশাটা সমাজে সম্মানিত নয়— মা-বাবার মনে এ নিয়ে শান্তি ছিল না। মেয়ের একটা বিয়ে দেবার জন্য আহার-নিদ্রার আহারটা তাঁরা ছেড়েছিলেন কতটা চিন্তায় আর কতটা অবস্থার চাপে বলতে পারবো না—ঘুম যে তাঁদের ছিল না এ ঠিক। যাক— তাঁরা জানতেন পেশার কথাটা যেমন আপনাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে তাঁদের ছেলেমেয়ের কাছ থেকে তেমনি গোপন রাখতে হবে গোপন রাখবার কথাটা। আমি এখানে ছিলাম না। মমতার বাড়ী-ঘর একরকম হাসপাতালই। কাজটা তাই শক্ত হয়নি। কিন্তু তাঁরা মিথ্যাচারী নন্ এ-ও সত্য। মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে কথা বলছিল নীল। হয়তো সিগারেটের অভাব বোধ করছিল সে। কথা শেষে চুল থেকে হাত নামিয়ে বললো—বাস। এখন অন্য কথা। এক মিনিট— বলে উঠে গেল নীল। কিন্তু আসতে যতটা দেরী করল-- আগে বুঝতে পারলে মঞ্জু নিশ্চয়ই উঠে বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতো কি বিষয়বস্তু ওগুলোর।

সিগারেট আনতে গিয়েছিল সে, একটা ধরিয়ে এসে বসে বললো, আপনি নাকি ইতিহাসের ছাত্রী?

—হাঁ। শুধু ছাত্রী নই—ইতিহাস আমার সব চাইতে প্রিয় বিষয়।

নীল একটু ঝুঁকে বসল ওর দিকে। ইতিহাস আপনাকে সব চাইতে বড় কথা কিছু শিখিয়েছে কি?

একটু সময় চুপ করে রইল মঞ্জু। বোধ হয় ভাবল। তারপর বললো—ইতিহাস আমায় সব চাইতে বড় কথা শুনিয়েছে।

—কি?

— কোন কিছুই থেমে থাকে না। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে দেশে ও সমাজে বিপ্লব দেখা দেয়—এই তার প্রকৃতি। থামল মঞ্জু। কিন্তু নীল ওর দিকে ঠিক তেমনি ভাবে তাকিয়ে চুপ করে রয়েছে— যেন আরো কিছু শোনার প্রতীক্ষা করছে, তাই বললো— হয়তো দেশ ও সমাজের অবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী একই রকম থেকে যেতে পারে আবার মুহূর্তে বিরাট পরিবর্তন এসে যেতে পারে— কিন্তু সে আসে। জলের বাষ্প হয়ে ওড়া আর বরফ হয়ে জমার আগের স্তরগুলো যেমন আমাদের অজ্ঞাতে প্রস্তুতির পথে এগোয়, বিপ্লবের প্রকৃতিটাও নাকি সেই রকম। এবং বিপ্লবই হলো নাকি নিঃস্ব নিপীড়িত মানুষের উৎসবের দিন। ইতিহাসের এই শিক্ষার পর যে দিকে তাকাই দুঃখ নয়, অভাব নয়, দেখতে পাই চলছে কেবল সেই ইতিহাসের উৎসব দিনের আয়োজন।

হীরের নীল আলোটার মতো একটা আলো যেন নীলের চোখে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল।

দু'হাতে দু'টো ভরা পেয়ালা নিয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে ঘরে এসে ঢুকল ছট্টু। পাটপাতা সেদ্ধ জলে দুধ মেশালে যে রকমের দেখতে হয় তেমনি চেহারার দু'পেয়ালা চা রাখল চৌকিটার উপর। চা রেখেই চলে যাচ্ছিল সে।

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরলো মঞ্জু। বললো, আরে শোন শোন! কাছে টেনে আনল মঞ্জু ওকে। বললো, একটা মস্ত ঘোড়া পেলে তুমি কি করো সে গল্পটা আমার শোনা হয়নি। সেটা আমাকে শুনতেই হবে। দেখব একটা ঘোড়া পেলে আমি যা করতাম তার সঙ্গে মেলে কিনা।

ছট্টু লজ্জায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালালো।

নীল বললো, একটা ঘোড়া পেলে আপনি কি করবেন?

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিতে নিতে মঞ্জু বললো, সঙ্গীদের সঙ্গে দিল্লী চলো দিল্লী চলো খেলবো।

—মৃত নগরের মৃত সঙ্গীদের নিয়ে কি এ খেলা জমবে আপনার?

মঞ্জুর দুষ্টুমিভরা গম্ভীর চোখে যে শান্ত ভাব কখনো দেখা যায় না তাই দেখা দিল। বললো, বিসমার্ক জার্মাণ সাম্রাজ্যটা গড়ে দিয়ে গেলেন। তাঁকে যখন সমস্ত ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো তখন একটা বিখ্যাত কার্টুন বেরিয়েছিল, 'ড্রপিং দি পাইলট।' আজ আমাদের অবস্থাও তাই। নিজেদের মৃত বলব কেন?

নীল ওর দিকে দৃষ্টিটা স্থির রেখে শরীর টান করল। গুণী নতুন যন্ত্র হাতে তুলে নেবার আগে যেমন তার সুর পরখ করে নীল তেমনি কিছু এতক্ষণ করছিল কি না কে জানে! সে বললো, আমরা একটা স্কুল করছি। যাবেন দেখে আসতে?

—স্কুল?

—হ্যাঁ। এক দিকে অবৈতনিক অপর দিকে অর্থাভাব। মাইনে দেবো মাষ্টারদের তেমন ক্ষমতা নেই। তবু করছি।

একটা দারুণ উৎসাহ বোধ করল মঞ্জু। স্কুল করা মানে নিজ হাতে একটা প্রতিষ্ঠান গড়া। সোজা কথা না কি। নীল একতাড়া কাগজ নিয়ে এলো। বলতে লাগল পরিকল্পনাটা ওদের কি? বেলা যে গড়িয়ে চললো সে ওরা খেয়াল করল না। দু হাতে ভাতের থালা ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এসে ঘরে ঢুকল ছটু। থালাটা টেবিলের কাগজ-পত্রের উপরই নামিয়ে রেখে টেনে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললো, দুইটা বাইজা গেছে। তুমি খাইবা না? মায় তোমার খাওনেরটা পাঠাইয়া দিছে। ছটুও তার স্নান-খাওয়া বোধ হয় খুব বেশীক্ষণ ধরে শেষ করে নি। পেটটা তার প্যান্টের উপর দিয়ে ফুলে উঠেছে। মাথার ভিজে চুলগুলো পাট পাট করে আঁচড়ানো।

এক রকম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু—দুটো!

নীল তার হাতের কাগজের উপর চোখ রেখেই বলল—খাচ্ছি। রেখে যা।

—জল ভইরা দিয়া যামু?

— যা।

ছটু রান্নাঘর থেকে তেমনি দু'হাতে ধরে একটা জলভরা গ্লাস এনে টেবিলে রেখে চলে গেল। মঞ্জু মনে মনে প্রমাদ গণল, দেবে আজ বৌদি। মুখে বললো—এবার আমি উঠলাম।

কাগজপত্র রেখে টেবিলটার কাছে যেতে যেতে নীল বললো— স্কুলটা একটু দেখবেন তারপর বাসে তুলে দিয়ে আসবো। দুটো বেজেছে তো হয়েছে কি?

—বাড়ীতে আজ ভীষণ দরকার আছে।

—বাড়ীতে মানুষের রোজ দরকার থাকে। নীল ওর ভাত ঢাকা দিয়ে আনা থালাটায় ভাত ডাল তরকারী আদ্দেক আদ্দেক তুলে মঞ্জুর দিকে এগিয়ে ধরল।

দাঁড়িয়েছিল মঞ্জু— এ কি। বলে দু'পা পিছিয়ে যেতে গিয়েও থালাটার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে। থালার মাঝখানে লাল মোটা চালের ভাত। তার উপর ডাল ঢেলেছে নীল, পাশে একটু তরকারী। থালাটা ধরল মঞ্জু। অপর থালাটায় ঠিক এই ভাবে ডাল তরকারী ঢেলে নিয়ে মঞ্জুর দিকে তাকালো নীল। কোথায় বসা যায় বলুন তো? আচ্ছা দাঁড়ান। রাখুন এই এটার উপর। নীল চৌকির উপরের দৈনিক কাগজটা দেখিয়ে দিল। নিজে রাখল টেবিল থেকে একটা কাগজ টেনে। দাঁড়ান আর এক গ্লাস জল নিয়ে আসি। জল আনতে গেল নীল। মঞ্জু থালাটা নামিয়ে রেখে বসল। ও এতটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে নীলকে থামিয়ে, সে জলটা ভরে আনছে—এ কথাটা পর্যান্ত বলতে ওর খেয়াল হলো না। জলের গ্লাস দুটো মাটিতে রেখে বসে বললো—নিন খেয়ে নিন, দুর্দান্ত ক্ষিদে পেয়েছে। গ্রাস গ্রাস ভাত মুখে তুলে দিতে লাগল নীল। দু'এক গ্রাস খেয়েই গলাটা বাঁ হাতে চুলকোতে লাগল সে। মঞ্জু যদিও বুঝল গলার চুলকানিটা বাইরের নয় ভেতরের—তরকারীর কচু গলায় হুল ফোটাতে চলেছে। ঝট করে গলাটা পার করে দেবার জন্য গিলে ফেলতে লাগল মঞ্জু গ্রাসগুলো। দুর্দান্ত ক্ষিদে পেয়েছে বলছেন। আপনার তো 'পেট ভরবে না'।

—দু'জনারই আদ্দেক আদ্দেক হোক।

দরজায় শিকল তুলে মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে নীল যখন বেরুলো, তখন আড়াইটা বেজে গেছে।

মঞ্জু যখন স্কুল দেখে মিটিং শুনে বাড়ী ফিরল অমিতা গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করল ওকে দেখে। বললো—এই তোমার একটার ভেতর ফেরা?

—সত্যি বৌদি! একেবারে অনিচ্ছায় হয়ে গেছে। আজ দুটো ছবি দেখব—ছ'টা ন'টা।

—মমতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—এ্যাঁ—এই এ্যাঁটা করে মঞ্জু ভেবে নিল কি বলবে। হ্যাঁ। সে অনেক কথা। পরে হবে। এখন না বেরিয়ে পড়তে পারলে টিকিট পাওয়া যাবে না কিন্তু।

সবে আসল ছবিটা আরম্ভ হয়েছে, হঠাৎ ডেকে উঠল মঞ্জু—দিদি!

—কি হলো আবার?

—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

— কেন? বিস্মিত ভাবে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে মৌরী তাকালো মঞ্জুর দিকে।

—চকলেট কিনবো।

চাপা গলায় ধমক দিল মৌরী—ফাজলামো করবিনে।

—হাঁ রে, সত্যি বলছি ভীষণ ইচ্ছে করছে।

চুপ করে রইল মৌরী।

মঞ্জু যাবার আগে মাথা নিচু করে ফিস-ফিস করে বলে গেল— এই যাবো আর আসবো। তবে একটু দেরী হলে হল ছেড়ে বেরিয়ে পড়িসনে বা চিন্তা করিস নে। বুঝলি?

বুঝল না ওরা কিছুই। শুধু বুঝল মঞ্জু চকলেট কিনতে যাচ্ছে না। মৌরী অমিতা পরস্পরের দিকে তাকালো। দুজনের চোখই বললো, ধন্য মেয়ে!

মঞ্জু হাঁটা দিল গ্র্যাণ্ডের দিকে। নিউ এম্পায়ার আর গ্র্যাণ্ড এই তো এক মিনিটের পথ। কতক্ষণ লাগবে ফিরতে। একেবারে ভুলে গিয়েছিল যে রজতকে চিঠি দেওয়া হয়নি, খবর দেওয়া হয়নি। সে এসে উপস্থিত হবে না ত?

॥ ১৫ ॥

নিউ এম্পায়ার হলটা থেকে বেরিয়ে এসেদাঁড়ালো মঞ্জু হলটার বাইরের ঢাকা বারান্দার নীচে। ভেতর আর বাইরের তাপমাত্রার তারতম্যটা যেন ওর ঠাণ্ডা শরীরটার উপর উপুড় করে কতকগুলো গরম সীসে ঢেলে দিল। থামল মঞ্জু। বোধহয় গরমটাকে শরীরে সইয়ে নিতে। তারপর হলটার সামনের অপেক্ষমান গাড়ীগুলোর ভেতর পথ করে বেরিয়ে এসে পড়ল রাস্তায়। পার হলো রাস্তাটা। নিয়ন আলোয় আলোকিত দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটা দিল সোজা।

পানের দোকানে বরফের মস্ত চাঁই-এর উপর ঠাণ্ডা হচ্ছে লাল মসলা ছড়ানো ছাঁচি পান, মিঠে পান। পানের চার পাশ দিয়ে বরফ থেকে রেখায় রেখায় ঠাণ্ডা ধোঁয়া উঠছে সাদা কুয়াশার মতো। দোকানটার এক পাশে ঝুলোনো মোটা দড়ির আগুনটা ফুঁয়ের জোরে বাঁচিয়ে রাখার মতো বাতাসে জ্বলছে নিবছে। একটি মেয়ের হাতে স্ট্র সমেত কোকাকোলার বোতল তুলে দিল তার সঙ্গী। আয়না থেকে চোখ ফিরিয়ে মিষ্টি হেসে হাত বাড়ালো মেয়েটি। দোকানটা পার হতে হতে জর্দা কিমামের মিষ্টি গন্ধে দুবার বেশী নিঃশ্বাস টানল মঞ্জু। বই-এর দোকানের পাশ দিয়ে মোড় ঘুরে পড়ল গিয়ে চৌরঙ্গীর ছাদ-ঢাকা প্রশস্ত ফুটপাতে।

আশ্চর্য নগরীর অত্যাশ্চর্য ফুটপাথ। কত খেলাই না চলছে এখানে। কানের কাছে মুখ নিয়ে চলতে চলতে যে বলে যাচ্ছে 'প্যারিস পিকচার স্যার', সে লোক চিনতে ভুল করছে না। লোক চিনতে ভুল করছে না ঐ যে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এক মাথা বাবরি চুলওয়ালা লোকটা বিড়ি টানছে সেও। এ্যাংলো. বাঙ্গালী, নেপালী—দু'ঠোঁট ফাঁক করা মাত্র সে পৌঁছে দেবে তাদের ঠিক জায়গায়। অভিজ্ঞ চোখ মুহূর্তে বুঝে নিচ্ছে ঐ যে ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে ত্রস্ত ভীরু চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে মেয়ে ক'টা, তারা সদ্য সংগৃহীত কোন বণিকের পণ্য! বিচিত্র বস্তু পশরা নিয়ে ঘুরছে সব ফেরিওয়ালা। পথচলতি মানুষ আর ফেরিওয়ালার সংখ্যা বুঝি সমান। রুমাল চাই? চশমা? ফুল-মালা? খেলনা—আরো কত, কত কি। 'নেন না দিদি একটা চার পয়সার মালা। সারা দিন খাই নাই।' সঙ্গে চলতে চলতে ক্রমাগত বলতে থাকে একটা লোক। প্যারিস পিকচারওলা আর চার পয়সার ফেরিওলা— যেন কলকাতা নগরীর দুটো চোখ। একটা ধক-ধক করছে প্রবৃত্তিতে। আর একটা জ্বলছে ক্ষুধায়। আর এই দুই আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে সব মানুষ।

'দিদি মালাটা।' বেল কুঁড়ির মালাটা বাড়িয়ে ধরলো লোকটা ব্যথাকরুণ দৃষ্টিতে। থামতেই হলো মঞ্জুকে। ব্যাগ খুলে পয়সা দিয়ে মালাটা হাতে জড়িয়ে নিল সে। 'কলম নেবেন? বিলিতি কলম?' পাশ কাটালো মঞ্জু। ওর চলার টানা গতির সঙ্গে পথের সন্ধ্যার ঢিলে চলার গতি একটুও মিলছিল না। রজত যদি রওনা হয়ে পড়ে! ভদ্রলোক তো বুঝে উঠতেই পারবেন না ব্যাপারটা কি? আর বাবার মেজাজের যে অবস্থা, তিনি কি ব্যবহার করে বসবেন তাই বা কে জানে! এ ক'দিন মনে না হওয়ার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আজ যখন সকাল বেলা বেরুবার সময় দিদি ওকে গ্র্যাণ্ডে আসছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল তখন নিশ্চয়ই ওর মনে-পড়া উচিত ছিল। তবু সময় মতো না হলেও একেবারে সময় পার করে যে মনে হয়নি—এই রক্ষে। আরে জয়া

নয়।— দাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জু। না, জয়া হলে ওকে দেখে চলে যেত না। উপুড় হয়ে ছেঁড়া কাগজ কুড়োচ্ছিল যে পিঠকুঁজো লোকটা তাকে পাশ কেটে, বাবরি চুলওয়ালা বিড়ি টেনে চলা লোকটার পাঞ্জাবী ছুঁয়ে হোটেলের দরজায় ঢুকে গেল মঞ্জু। লোকটা দুটো লালচে চোখ তুলে একটু তাকালো।

ডিনারের সময় হয়ে এসেছে। পুরুষেরা জোড়ায় জোড়ায় চলেছে করিডোর দিয়ে। তাদের ভারী জুতো আর হাইহিল পুরু কার্পেটের উপর ভোঁতা শব্দ তুলছে। দেশী বিদেশী নির্বিশেষে মুখে ইংরেজী ভাষা। সঙ্গিনীরা বলছে, সঙ্গীরা শুনতে শুনতে হাঁটছে। পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতে পরস্পর স্মিত হেসে একটু মাথা কাত করছে। এগুতে পারল না মঞ্জু। তাদের পেছনই চলতে হলো। এসে গেছে। এখন আর তাড়া বোধ করছে না সে। রজত চলে গিয়ে থাকলে তাকে এই করিডোরটা দিয়েই বেরুতে হবে তো। নিশ্চিন্ত মঞ্জু। সবার পেছন পেছন এসে পড়লো 'খোলা হাওয়ার রেস্তোঁরা—শাহেরাজাদ' এর সামনে। রাতে হোটেলের চেহারাই যেন আলাদা। আর এটা তো হোটেল নয়— যেন কুঞ্জবন। লনভর্তি মাথা-ঝাঁকড়া নিচু নিচু গাছ আর লতাপাতার কুঞ্জ। তারি এটার ধারে ওটার নীচে পাতা রয়েছে গ্লাস, টপ-ওলা টেবিল আর বেতের চেয়ার। মাথার উপর তারা ভরা নীল আকাশ। ফুল পাতার ফাঁকে ফাঁকে আকাশের তারারই মতো মিটমিট করে জ্বলছে ছোট ছোট লাল-নীল-সবুজ আলো। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে নানা রং-এর সংমিশ্রণের এক রহস্যময় অস্পষ্টতা। পামপাতার মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া। গানের উঁচু পর্দার সুর ভেসে আসছে কানে।

সে দিন সকালের দেখা শূন্য চেয়ারগুলো ভরে উঠেছে লোকে। গ্লাসটপের টেবিলগুলো ভরে উঠেছে গ্লাসে গ্লাসে। ওয়েটার ট্রের উপর গ্লাস আর সরু কোমরের উপর গোল মাথাওলা কাচের ওয়াইন-গ্লাস নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করে চলেছে—রাম্, হুইস্কি, জিন আর লেডিজ ড্রিঙ্ক শেরী স্যাম্পন। সোনালী আর জাম-কালো রং-এর টলটলে পানীয়ের গ্লাসগুলোর গা ঘেমে উঠেছে ঠাণ্ডায়। আর কোন খাবার থাক আর নাই থাক, চৌকো চৌকো চিজের টুকরো, বাদাম আর ভিনিগারে ভেজানো পেঁয়াজ রয়েছে সবার সামনে। গান শুনতে শুনতে, গল্প করতে করতে গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে সবাই। অল্পে-অল্পে গ্লাস খালি হচ্ছে। গ্লাসের রংটা ধরছে গিয়ে চোখে। আর দু'-এক পেগের পর ধরবে মনে। গান থামবে। বেজে উঠবে অর্কেস্ট্রা। শুরু হবে নাচ।

ওর করিডোর সঙ্গিনীরা ডানদিকে ঘুরে 'শাহেরাজাদ'-এ প্রবেশ করে চেয়ার টেনে টেনে বসতে লাগল। মঞ্জুর স্বভাব-কৌতূহলী মন তার চলার গতিটাকে দিল একটু মন্থর করে। দেখতে দেখতে চললো সে। পামগাছের অন্ধকার কোণে ফেনাভরা গ্লাস সামনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে একটা লোক। ফেনার বুদবুদ ক্রমেই মিলিয়ে আসছে তবু মুখে তুলছে না। একটি মেয়ে গা ছেড়ে চেয়ারে মাথাটাকে কাত করে দিয়েছে। সঙ্গের ভদ্রলোকটি বিব্রতমুখে হাতে ঠাণ্ডাজল নিয়ে নিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে কপালে। এদিক ওদিক থেকে কিছু কিছু দৃষ্টি তাদের উপর গিয়ে পড়ছে। ভেতরের প্ল্যাটফর্মের উপর মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইছে একটি মেয়ে। লিপস্টিক-রাঙ্গানো ঠোঁটের ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে ঝক্‌ঝক্ করে উঁকি দিচ্ছে তার সাদা দাঁতের সারি। লাল টকটকে গাউনটা তার কোমর থেকে নেমে ঠেকছে এসে মাটিতে কিন্তু উপর অঙ্গ বলতে গেলে নিরাবরণ। অদ্ভুত ঠেকছিল সব মঞ্জুর অনভ্যস্ত চোখে। ছবিতে দেখেছে বটে এসব। কিন্তু ছবির দেখা আর সত্যি দেখা তো এক নয়?

'আপ কিধার যায়েঙ্গে?' একটা বেয়ারা এসে দাঁড়ালো সামনে। কণ্ঠে কোন সম্ভ্রম নেই দৃষ্টিতে নেই, বিনয়। এই রং, রূপ আর সাজের হাটের মেলায় চটি পায়, ছাপার শাড়ী পরা সাদা মাঠা ঠোঁট-গালের মঞ্জু যে এ জগতের কেউ নয় বোধ হয় সেটা বুঝেই মঞ্জু স্থির চোখে তাকালো লোকটার দিকে। কেন, আমি কি ভুল পথে এসেছি? আমি রুম নম্বর সেভেণ্টিথ্রিতে যাবো।

রুম নম্বরটা শোনামাত্র মস্ত এক সেলাম ঠুকলো লোকটা। সসম্ভ্রমে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল লিফটের সামনে। লিফটম্যানকে রুমনম্বর বলে মঞ্জু লিফটের আয়না-ঘেরা দেয়ালে নিজের বেশবাস আর রংশূন্য প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হাসল। বেয়ারা যে ওকে 'এই আয়া' বলে সম্বোধন করে বসেনি—এই যথেষ্ট। রুজ লিপস্টিকে গাল ঠোঁট রাঙ্গিয়ে সিফন জর্জেটে সেজে, সঙ্গীর হাতে হাত জড়িয়ে, পায় হাই হিলের ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলতে তুলতে আর মুখে ইংরেজীর তোড় ছুটাতে ছুটাতে এখানে ঢুকছে দৃশ্যটা মনে হতেই শব্দ করে হেসে ফেলল মঞ্জু। লিফটম্যান আশ্চর্য্য হলো না। শুধু একবার তাকিয়ে দেখল বেশী খেয়েছে কি না। ঝাঁকি দিয়ে লিফট থামলো। লোহার দরজা টেনে ধরে সরে দাঁড়ালো লিফটম্যান। মঞ্জু নেমে এয়ারকণ্ডিসণ্ড লম্বা বারান্দাটা পার হয়ে গিয়ে রজতের বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে টোকা দিল।

রজত তখন ধুতি পরে পাঞ্জাবীর বোতাম লাগাতে গিয়ে ঠেকে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল। বোতামের মাথাগুলো কিছুতেই সে ঢুকিয়ে উঠতে পারছিলো না মুখবোজা ঘরগুলোতে। ধুতি পাঞ্জাবী সে এক রকম পরেই না। সর্বরকম নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ সে স্যুট পরেই সারে। সবার সসম্ভ্রম দৃষ্টির সামনে বিরাট গাড়ী থেকে নামে। কড়া ইস্তিরিকরা সাদা পোষাক পরিহিত ড্রাইভার দরজা খুলে ধরে। বিশ-পঁচিশ মিনিট বসে। সজ্জিত নববধূ বা কনেকে হাসি মিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে দেখে। অবাক করা মহার্ঘ উপহার হাতে তুলে দেয়। ঘরে ফিরে শান্তির হাত ঝাড়া দিয়ে বলে, বাস্ এইবার বসা যাক। যেন দুঃসাধ্য কাজ শেষ করে এলো। কতকটা তাই। যেদিন সকালে নোট বই খুলে নেমন্তন্নের ব্যাপার রয়েছে দেখতে পায়, সেদিন একটুও প্রসন্ন বোধ করে না সে। কিন্তু আজকের তারিখটা রজতকে নোট বই-এর স্মরণ করিয়ে দিতে হয়নি।

সকালবেলা চোখ খুলে কফির পেয়ালা মুখে ধরেই প্রথম যে কথাটা মনে পড়েছে তা হলো, আজ মঞ্জুর বিয়ে। যেতে হবে। স্যুট পরা চলবে না। ধুতিপাঞ্জাবী বাড়ী থেকে আনিয়ে নিতে হবে। আশ্চর্য্য মানুষের মন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মঞ্জুকে সে নববধূর পোষাকে এনে সামনে দাঁড় করালো। তারপর দূরে দাঁড়িয়ে এক লক্ষ্যে দেখতে লাগল বিয়ে। শুয়ে শুয়ে পাক্কা এক ঘন্টা ভাবলো উপহারটা কি নেওয়া যায়। সন্ধ্যার কিছু আগে বেরিয়ে হ্যামিলটনের দোকান থেকে গিয়ে কিনে আনল একটা নীলার মালা। যেন সূর্য্যের উজ্জ্বল নীল রং টেনে নেওয়া কতকগুলো টলটলে জলের ফোঁটা এক সঙ্গে গাঁথা। মূল্য জানলে বিস্মিত হতে হবে। অনায়াসে কাচ ভাবা যাবে মূল্য না জানলে। আর কিনল এক প্রস্থ সুগন্ধি চন্দন কাঠের বোতাম। কিন্তু সে বোতাম সে এখন কিছুতেই পরিয়ে উঠতে পারছিল না পাঞ্জাবীর ভেতর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে তার এই ঠাণ্ডা ঘরেও। এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। 'কাম-ইন' বলে একটা বিকৃত মুখের শেষ চেষ্টা করল সে। তারপর বোধ হয় দর্জিটাকেই বেটা ভূত বলে গাল দিয়ে তাকালো দরজার দিকে। মঞ্জুকে দেখে বিস্ময়ে তার হাত খসে পড়ল পাঞ্জাবী থেকে। একি!

—এলাম।

—এলে!

—হ্যাঁ। গম্ভীরভাবে ভেতরে ঢুকল মঞ্জু। বললো, ভেবে দেখলাম বিয়ের চাইতে আপনার প্রস্তাবটাই আমার পক্ষে কাজের হবে বেশী।

এগিয়ে এলো রজত—আমার প্রস্তাব? কি প্রস্তাব করেছিলাম আমি?

—বাঃ সেদিন বললেন না, একেবারে বিয়ে ঠিক করে বসে আছো, নইলে গাড়ী চালানোটা শিখতে বলতাম?

বিয়েটা ওর ছিল না—ছিল ওর দিদির, এই গোড়ার কথাটাই যে জানে উল্টো, তাকে বিয়ে না হবার খবরটা সোজা পথে দিয়ে ফেলতে পারবে কেন মঞ্জু! কৌচে বসে বললো— দেখবেন এখন যেন আবার পিছপা হবেন না।

—না। এ ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই ওঠে না। উচিতের ক্ষেত্রেও পিছপা আর পিছটানের ব্যাপারে আমার মতো নির্বিকার নির্বিকল্প ব্যক্তি তুমি আর দ্বিতীয় পাবে কিনা সন্দেহ। বাহান্ন ইঞ্চির কাঁচি ধুতির লোটানো কোঁচা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে এসে বসল রজত। এটা সে বুঝল—যাই হোক, যাই ঘটুক, অতর্কিতে কিছু ঘটেনি। আর তেমন ঘটলেও সব প্রথম মঞ্জু তার কাছে ছুটে আসতে যাবে কেন? কোঁচাটা তুলে পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে বললো— অন্তত এটুকু বোঝা যাচ্ছে, বিয়ে তোমার আজ হচ্ছে না, তা যে কারণেই হোক। এ ক'দিন হয় মনে ছিল না, নয়তো সম্ভব করে উঠতে পারনি খবরটা জানিয়ে ওঠার। একটু ঝুঁকে বসে মঞ্জুর দিকে তাকালো সে। বললো— ধরো, লগ্ন বয়ে চলেছে, বর এলো না। কিন্তু কন্যাকে সে-রাতে পাত্রস্থ করতে হবেই। কেন—জিজ্ঞাসা করো না। সেকালের সমাজের ভয়ের মতো একালের জন্যও একটা কিছু এসে যাওয়া উচিত ছিল। নইলে বেনারসীর ওড়নায় মুখ ঢেকে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে নায়কের কাছে দাঁড়ানোর মতো থ্রিলিং উপাদানটাই যে যাচ্ছে বর্তমানের গল্প-ভাণ্ডার থেকে নষ্ট হয়ে— এ খেয়ালটা কেউ করছে না। আমরা গল্পের খাতিরে ধরে নিচ্ছি, আজকের দিনেও কন্যাকে এই রাতেই সপ্তপদী গমন করতেই হবে। নইলে—নইলে যা হোক একটা কিছু ভীষণ ব্যাপার ঘটবে। সবার অলক্ষ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলো কন্যা ওড়নায় মুখ ঢেকে। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা ছোট্ট চাপা নিঃশ্বাস মিলিয়ে দিল সে বাতাসে।

তার পর তড়িৎ পায় পথ অতিক্রম করে, তার চন্দনে কুমকুমে সাজানো মুখ আর কাজলটানা ডাগর দুটি চোখ তুলে দাঁড়ালো এসে নিতান্ত অপদার্থ একটা মুখের দিকে তাকিয়ে। কম্পিত ঠোঁটের কথা তার কম্পিত হাত থেকে জিনিস খসে পড়ার মতোই পড়তে লাগল খসে খসে। দিশেহারা হয়ে উঠল লোকটা। কম্পিত ঠোঁটের কাঁপুনি কন্যার দুটি আঙ্গুলের মৃদু স্পর্শে থামিয়ে দেবে—সাহস নেই। যদি সব মিথ্যে হয়ে যায়। যদি সব মিলিয়ে যায়। তার পর সেই লগ্নের হাত ধরে কত শুভ লগ্নের আর কত অজানা ঐশ্বর্যের সন্ধানই যে সেই অপদার্থ লোকটা পেলো—একেবারে মানুষ হয়ে গেল সে। 'রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা?' বলে মঞ্জুর দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো রজত।

বসে থাকতে সে পারে না। আজ যে সে বসে কথা বলছিল, সেটা বোধ হয় কিছুটা অনভ্যস্ত পোষাকের জন্য—কিছুটা বোধ হয় গল্পটা বলতে বলতে সে একটু আবিষ্টই হয়ে পড়েছিল সেই জন্য।

যদিও মঞ্জু কৌতূহলের সঙ্গেই গল্প বলা শুনছিল রজতের। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি বোধও তার ছিল। প্রথমতঃ গল্পটা। দ্বিতীয়তঃ দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাকে উঠতে হবে। যাবার আগে রজতের ভুলটা আজ ভেঙ্গে দিতে হবে। নইলে আর তার সঙ্গে দেখা হবার কারণ ঘটবে না হয়তো। রজত উঠতেই মঞ্জু বললো—এবার আমি উঠবো।

রজত ঘরের কোণের দিকে গিয়ে ফোনটা তুলে নিয়েছিল হাতে, মঞ্জুকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ফোনে যেন কার সঙ্গে কথা বলে নিল সে। তার পর এসে বসে বললো—বোস। কেন এক্ষুণি উঠতে হবে? রাত হয়ে যাচ্ছে, না কাজ আছে?

— বৌদি আর দিদি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

— বৌদি আর দিদি অপেক্ষা করছেন? কোথায়? নিয়ে এলে না কেন?

—ওরা ছবি দেখছে। আমি উঠে এসেছি।

—তাই বলো। কোন্ হলে?

—নিউ এম্পায়ারে।

—একেবারে বাজে ছবি। ওটা বসে দেখার চাইতে উঠে আসাই উচিত। অযথা ফের গিয়ে বসে দণ্ডভোগ করবে কেন? শেষ হয়ে আসুক, তার পর যেও। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ছবিটার চাইতে অনেক বেশী এন্টারটেন করবো।

হাসলো মঞ্জু— তা হলেও ওরা রয়েছে। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। আমি আপনার একটা ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেবার জন্য বসে আছি। আপনি সেদিন একেবারে অকারণে হঠাৎ কেন জানি ভেবে নিলেন মৌরী নামটা আমার—

—মৌরী তোমার নাম নয়?

— না। আমার দিদির নাম। তারই আজ বিয়ে হবার কথা ছিল। আমার নয়। আপনি ধরে নিলেন আমার বিয়ে—আমিও আমোদ পেয়ে গেলাম।

মঞ্জুর আজ বিয়ে না হবার খবরটা রজতের মনে এতক্ষণ কোন নতুন ভাবের সঞ্চালন তোলেনি। হয়তো তারিখ পিছিয়ে গেছে। আজ হয়নি আর এক দিন হবে। কিন্তু আদপেই বিয়েটা মঞ্জুর ছিল না— এবার একেবারে প্রকাশ্য খুশীতেই হাত বাড়িয়ে দিল রজত মঞ্জুর দিকে। কিন্তু মঞ্জুর কোলের উপর ন্যস্ত হাতে কোন ভাববৈলক্ষণ্য না দেখে পরিহাসতরল কণ্ঠে অভিমান ফুটিয়ে তুলে বললো— তোমার হাত দুটো নিশ্চয়ই কাঠের তৈরী। প্রাণ নেই একটুও।

বয় এসে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল। তার হাতে ট্রের উপর এক ডিস ভর্তি ধোঁয়া-ওঠা খাবার। ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কতক্ষণ পরে চা আনতে হবে জেনে নিয়ে সে চলে গেল।

—এসব আমার জন্য নাকি? চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল মঞ্জুর।

—হ্যাঁ। তোমার ছবি শেষ হতে আরো দেড় ঘণ্টার উপর দেরী আছে। এক ঘণ্টা বসলেও আধ ঘণ্টা ওদের সঙ্গে ছবি দেখতে পারবে। তোমার মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে তোমার এখন কিছু খাওয়া দরকার।

—সে কি!

— হ্যাঁ তোমার ক্ষিদে পেয়েছে। দেখোই প্লেটটা টেনে নিয়ে আমার কথা সত্য কি না। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আজ তোমার ভালো করে খাওয়া হয়নি— বা একেবারেই হয়নি। বিশ্রাম করোনি। কেবল ঘুরছ।

মঞ্জু সত্যি বিস্মিত ভাবে রজতের দিকে তাকিয়ে রইল।

— সেদিনও কিছুতেই খেলে না—আজও না খেলে আমি দুঃখিত হবো। প্লেটটা নিজ হাতে সে এগিয়ে দিল মঞ্জুর দিকে।

মঞ্জুর মনে পড়ে গেল ফিরপোতে রজতের সেই প্রথম দিনের খাওয়ানোর কথা। রিণুদের সঙ্গে ওর হাত থেকে পর্যন্ত ছুরি-কাঁটা নিয়ে নিয়ে বড় বড় রোস্টের টুকরো ছোট করে কাঁটায় গেঁথে হাতে তুলে দেওয়া। কাউকে যদি ভালো লাগতে থাকে তবে একথা ভেবে, ও কথা ভেবে, সে ভালো লাগা ও ঠেলে রাখতে চায়ও না। যেন দিদির কথার জবাবটা আগে মনে মনে তৈরী করে নিয়ে তার পর সে কাঁটা চামচ তুলে নিল হাতে। এক টুকরো তাজা মাংস মুখে দিয়েই শুধু আশ্চর্য নয়— কেমন যেন সম্মোহিত—বিস্ময় বোধ করল মঞ্জু। সত্যি ওর ক্ষিদে পেয়েছে— ভালো রকম ক্ষিদে। যে ক্ষিদেয় যে কোন খাবার অমৃত মনে হয়। নীলের দেওয়া ডাল ভাত দু'-গ্রাসের বেশী সে মুখে তুলতে পারেনি। চালের পচা গন্ধ, তরকারী শুধু কচুর—ওকে তৃতীয় গ্রাস মুখে তুলতে দেয়নি। নীলের অলক্ষ্যে জল ঢেলে থালাটা ঠেলে রেখে দিয়েছিল ও চৌকির নীচে।

বাড়ী ফিরে সময় ছিল না। মনেও হয়নি, হৈ-হৈ করে দিদিকে টেনে— বৌদিকে খুশী করে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ওর নীলের সেই বড় বড় গ্রাসের ক্ষুধার্ত খাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। মুখের চিবানো বন্ধ হয়ে গেল ওর। সেই ভাঙ্গা স্কুল দালানটার ঘরে এখনও নিশ্চয়ই নীল ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট মনে তার কাজ করে চলেছে। মোটা দাগ ধরা কাপে কালো রং-এর এক বাটি চা হয়তো কেউ রেখে গেছে—হয়তো বা যায়নি। তারও যে ক্ষিদে পেয়েছে সে খেয়াল তার নেই। কিন্তু একথা মনে করে কি খাওয়া বন্ধ করা চলে। পাগল। আর একটা মাংসের টুকরো তুলে নিয়ে মুখে দিল মঞ্জু।

রজত কৌচের পিঠে ঠেস দিয়ে বসে একটা নয়া সিগারেটের টিন ঢাকনাটা ঘুরিয়ে কাটতে কাটতে বললো— তোমার নামটাই জানা হয়নি। এবার তোমার নামটা শুনি?

মঞ্জু হাতের ছোট্ট রুমালটা দিয়ে মুখের দুটো পাশ মুছতে মুছতে বললো— মঞ্জু।

—মঞ্জু? তোমাকে কেউ এ পর্যন্ত বলেনি যে, এ নাম তোমায় মানায় না? টিনটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট তুলে নিল রজত।

—না।

—ভারি আশ্চর্য! সিগারেটটা ধরিয়ে কাঠিটা ছাইদানে ফেলে বললো— তোমার মঞ্জু নামের কোন অর্থ হয়! তোমাকে যে নামটা আশ্চর্য রকম মানাতো সে নামটা কবি তাঁর কাব্য প্রতিভার জোরে অস্থানে এমন অথর্ব ভাবে ব্যবহার করে গেছেন যে, সেটা আর ব্যবহার করবার উপায় নেই। লাবণ্যর নাম বন্যা—মানায়? কারুর জীবনে ভালোবাসার ঢল আনলেই যদি বন্যা নাম দেওয়া যায় তবে তো সব মেয়েই বন্যা। ও দিয়ে নাম হয় না। বাবা মা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে সন্তানের নামকরণ করবার সুবিধে পান না। কিন্তু তারপর যদি কারুর নাম দেবার জন্য কারুর আগ্রহ হয় তবে শুধু আপন খুশীতে দিলেই চলবে না—ব্যক্তির সঙ্গে মিলের কথাটাও তাকে অবশ্যই ভাবতে হবে।

সিগারেটের ছাইটা ছাইদানে ঝেড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো রজত। চুলের একটা গোছ একবার আঙ্গুলে জড়াতে আর একবার খুলতে খুলতে কার্পেটের উপর খালি পায় পায়চারি করতে লাগলো। একটু সময় কাটল চুপচাপ। তারপর বললো—অত বড় গাড়ীটা তোমায় পাঠিয়ে লাভ নেই। সামলাতে পারবে না। তার চাইতে পাতলা ছোট্ট একটা গাড়ী হলে শিখে নিয়ে কলকাতা শহর চষে বেড়াতে পারবে।

মুখের মাংসের টুকরো যেন গলায় ঠেকে গেল মঞ্জুর—কি?

হাসল রজত! সে বুঝল মঞ্জু শুনেছে ঠিকই কথাটা। তবু বললো আবার। তোমার জন্য একটা ছোট গাড়ীর কথা বলছিলাম।

ভয় পেয়ে গেল যেন মঞ্জু। হাতের কাঁটা-চামচ নামিয়ে ডিসটা ঠেলে দিল সে। বললো—এবার আমি উঠবো।

—ডিসটা ঠেলে দিলে কেন? আমি ত আর এক্ষুণি রুমালে বেঁধে তোমার ব্যাগে ভরে দিচ্ছিনে গাড়ীটা? তারপর যে কথাগুলো বললো সে— সে কথাগুলো শোনাতে লাগল কিছুটা আত্মগত করার মতো। কথাগুলো তুমি কি ভাবে নেবে বুঝে উঠতে পারছিনে। ঐ দেখো, বলে হাত দিয়ে ঘরের কোণে রাখা দুটো সোডাওয়াটারের বোতল রাখবার খোপকাটা কাঠের বাক্সের মতো বাক্স দেখালো সে মঞ্জুকে। ঐ বাক্স দুটো ভর্তি আছে হুইস্কি শ্যাম্পেনে। তেমন বন্ধু সমাগম ঘটলে ক'সন্ধ্যা উতরোবে বলতে পারিনে। ভালো লাগে কি না জানিনে। জানতাম না হলে চলবে না—একদিন এক সন্ধ্যাও কাটবে না। কিন্তু আজ দেখলাম এ পর্যন্ত কাটল। তারপর হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে সে ঝাঁকি দিয়ে ঝেড়ে ফেলল তার তদ্গত ভাবটা। বললো—সত্যি তোমার মতো মেয়ের পক্ষে গাড়ী চালানো শেখাটা খুব কাজের হবে। কিছুতেই আমি মনে মনে মানিয়ে উঠতে পারছিলাম না তোমার সঙ্গে বিয়ের কথাটা।

—মানিয়ে উঠতে পারছিলেন না। একেবারে তো অরক্ষণীয়া কন্যা বানিয়ে তুলতে চাচ্ছিলেন।

হেসে উঠল রজত—ওটা অনুপায় হয়ে। হঠাৎ টেবিলের উপর রাখা মঞ্জুর বেলকুঁড়ির মালাটার দিকে দৃষ্টি গেল তার। ওটা মঞ্জুর হাতের ব্যাগটার পেছনে পড়ে ছিল, তাই এতক্ষণ দেখেনি। ওটা দেখে মনে পড়ে গেল রজতের তার কেনা মালাটার কথা। ড্রয়ার থেকে কালো রং-এর সোনালী কাজকরা বাক্সটা এনে মঞ্জুর হাতে দিয়ে বললো—একেবারে মনে ছিল না। এটা তোমার জন্য কিনেছিলাম আজ দেবো বলে।

— কি এটা?

— দেখো খুলে।

কথায় কথায় খেতে খেতে ডিসটা শেষ করে এনেছিল মঞ্জু। সেটা একটু সরিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বাক্সটা খুলল। পাথর না চিনুক বাক্সের গায় হ্যামিলটন নামটা পড়তে পারে সে। আর ওটা যে কি পর্যন্ত মহার্ঘ বস্তুর বিপণি তাও সে জানে। মূল্যটা কত? চোখ দুটো ছোট করে জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু।

—তুমি যেমন দেও। দিলে অমূল্য। না দিলে কাচ।

—কিন্তু আমি গয়না পরিনে। উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু বাক্সটা টেবিলে ঠেলে দিয়ে।

রজত বুঝল এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বললো—এবার উঠবেই?

—হাঁ।

—আর কিছুতেই বসবে না? হাসিমুখে মাথা নাড়ল মঞ্জু না করার ভঙ্গিতে।

—আর আসবেও তো না?

— তা কেন আসবো না?

— কবে? দিদির বিয়ের দিন ফের স্থির হলে?

হেসে উঠল মঞ্জু। না তার আগেই আমি চেষ্টা করবো আসবার কারণ বের করবার। যতদিন সেটা না হয়।

—অকারণ আসা যায় না?

—যায়। কিন্তু অনর্থক আসার অর্থটা এমন সাংঘাতিক রকমের অর্থপূর্ণ করে তোলে মানুষ যে, তার ভেতর মাথা গলায় নাকি কেউ! আচ্ছা, বলে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ঘরের ভারি কাঠের দরজাটা টেনে বেরিয়ে গেল মঞ্জু হাসিমুখে।

রজতের যখন খেয়াল হলো মঞ্জুকে সে অনায়াসে নিউ এম্পায়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারতো, তার বহু পূর্বে সে এই দু'মিনিটের পথ পৌঁছে গেছে। তার হাতের বেল কুঁড়ির মালাটা পড়ে আছে টেবিলের উপর।

॥ ১৬ ॥

ছবি শেষ হয়ে গেল। ভিড়—-পায় -পায় এগিয়ে চললো। সঙ্গে সঙ্গে হলের নানা দিক থেকে চেয়ার সোজা করে দেবার শব্দ উঠতে লাগল খট্‌খট্। অগত্যা উঠে দাঁড়ালো ওরা দুজনেও। বাইরে এসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো ওরা মঞ্জুর অপেক্ষায়। সবার মাথার উপর দিয়ে চোখ খুঁজে বেড়াতে লাগল মঞ্জুকে। সন্ধ্যার শো'র ভিড় খালি হয়ে গেল। ভিড় বাড়তে লাগল রাতের শো'র। কিন্তু কোথায় মঞ্জু! একে তো ছবিটা একেবারে বাজে। চোখ

বন্ধ করেই থাকতো মৌরী, যদি না চোখ বুজলেই আজকের সন্ধ্যার ব্যর্থলগ্ন আর সুদর্শন এসে ওর মুখোমুখি না দাঁড়াতো, ওর মনের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে না দিত। তার উপর মঞ্জুর এই যথেচ্ছ চলতি মনমেজাজ রীতিমতো তাক্ত করে তুলছিল ওর। একটুক্ষণ বাদে হন্তদন্ত অবস্থায় মঞ্জুকে ডান দিকের ফুটপাত থেকে হলের দিকে মোড় ঘুরতে দেখে নেমে এলো অমিতা-মৌরী। মঞ্জুর দিকে না তাকিয়ে, একটা কথাও না বলে হাঁটা দিল মৌরী ট্রাম স্টপেজের দিকে।

মঞ্জু বলে উঠল— কোন দিকে চললি দিদি? ডান দিকে ঘোর।

ভুরু দুটোকে বিরক্তিতে কোঁচকালো মৌরী।

—ভুল চলছিনে।

—বাঃ, চলছিনে কি রকম? 'লাইট হাউসে' যাবো তো। দুটো ছবি দেখবো আজ—এই কথা ছিল না আমাদের বৌদি?

অমিতা খুশীর সঙ্গে মাথা নাড়ল—হাঁ, তা অবশ্যি ছিল।

— সেই জন্য টিকিট কাটতে গিয়েই তো আমার এতো দেরী হয়ে গেল। বহু লোকের পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। আর একটু পর হলে আর টিকিটই মিলত না। ছবিটা নাকি ভালো।

মৌরীর ইচ্ছে হলো বলে— তোরা যা। আমি বাড়ী চললাম। কিন্তু বললো না। অযথা পথের উপর কথা বাড়বে। যেতে ওকে হবেই। মনমেজাজ মৌরীর আশ্চর্যরকম দখলে। নীরবে সে অনুসরণ করলো ওদের।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলো মঞ্জু—ছবিটা ঠিকই একেবারে বাজে নাকিরে দিদি?

মৌরীর একবার ইচ্ছা হলো বলে, এই 'ঠিক'টা তোকে বললো কে। কিন্তু বললো না। শুধু 'হু' দিয়ে জবাব দিল সে।

অমিতা বললো—যাচ্ছেতাই। না দেখে শাস্তিভোগ থেকে বেঁচেছ।

চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। চেকার আসন দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। ওরা বসল। কাজু বাদাম, সলটেড বাদাম, চকলেট, দেশী ভুট্টার খৈ-এর বিলিতি চেহারার প্লাস্টিক প্যাকেট ইত্যাদির ট্রে গলায় ঝুলিয়ে যারা ঘোরাঘুরি করছিল তাদের একজন কাছে এসে নিচু গলায় 'চকলেট্', সলটেড বাদাম? বলে দুটো প্যাকেট বাড়িয়ে ধরলো। একটা চকলেট কিনে দু ভাগ করে মৌরী আর অমিতার হাতে দিল মঞ্জু। অমিতা জিজ্ঞাসা করলো—তুমি নিলে না?

—আমি ভীষণ খেয়েছি।

হঠাৎ চকলেট খাওয়া বন্ধ করে অমিতা বলে উঠলো—আচ্ছা, রাত বারোটার সময় আমরা তিনজন একা ট্যাক্সি করে যাবো কি করে?

—তিন জনে একা! হেসে উঠল মঞ্জু। তোমরা আর মানুষ হবে না বৌদি।

চোখের দু'টো কোণ দু আঙ্গুলে টিপে, মুখটা উর্দ্ধমুখী করে মাথাটা চেয়ারে রেখে বসে রইল মৌরী। মঞ্জুর ঐ হাসির পর এ বিষয়ে আর কথা না বলাই ভালো।

অমিতা বললে—মনে করে একজনকে আসতে বলে এলেই হতো।

—কি হতো?

—ওরা একজন কেউ আমাদের নিয়ে যেতে আসতেন।

ফের একই কথা জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু— কি হতো তবে?

হেসে ফেললো অমিতা। চকলেটের একটা টুকরো ভেঙ্গে মুখে দিতে দিতে বললো—তবে আর একা মনে হতো না।

গম্ভীর কণ্ঠে মঞ্জু বললো— দেখো বৌদি, মনটাকে আপদ-বিপদে কেবল করুণ আর্তনাদ তোলার জন্য তৈরী না করে তাকে দিয়ে কিছু কিছু ডন-বৈঠক করিয়ে অন্তত পথঘাটটুকু চলার মতো পোক্ত করে তোল তো।

—শরীরের ডন-বৈঠকটা বুঝি। মনেরটা কি রকম তা জানিনে তো!

—একই রকম। অলস না রেখে ওঠ-বস দৌড়-ঝাঁপ, ডামির সঙ্গে লড়াই এর রেওয়াজ করানোটা যেমন শরীরের ব্যায়াম; মনের ব্যায়ামও তেমনি। অলস স্বপ্নে ফেলে না রেখে শক্তকাজ করানো। বিপদ-বিপত্তির ডামির সঙ্গে লড়াই-এর রেওয়াজ রাখা।

অমিতা অবশিষ্ট চকলেটটা মুখে ফেলে হাতের রাংতাটা দিয়ে কাপ বানাতে বানাতে বললো—তা বটে। শরীর তৈরী না করলে সে যেমন শক্তির পরিচয় দিতে পারে না। মনও তৈরী না করলে আর্তনাদই কেবল করতে পারে, আত্মরক্ষা করতে পারে না। তাই স্বীকার করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অমিতা।

দুটি ইউরোপীয়ান তরুণীকে নিয়ে এসে চেকার ওদের লাইনের শেষ চেয়ার দুটো টর্চের আলো ফেলে দেখিয়ে দিয়ে গেল। মৌরী চোখ থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে বসল। তিন জনই পা হাঁটু মুড়ে পথ করে দিল। ভারী নিতম্ব আর গাউনের মস্ত ঘের প্রায় ওদের শরীরের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে তারা হাত দিয়ে পেছনের বব-চুল ফাঁপিয়ে দিতে লাগল। সেন্টের মৃদু গন্ধে ভরে উঠল জায়গাটা। অমিতা একবার দেখে নিল তাদের। তারপর ফের মঞ্জুর দিকে তাকালো। মনটাকে বলিষ্ঠ করা গেল ডামির সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু শরীরটা?

আলো নিভে গেল। পর্দায় পড়ল ভারতীয় সংবাদ-ছবির অশোক চিহ্ন। চুপ করতে বলার বিরক্তি-ব্যঞ্জক দৃষ্টি নিয়ে মৌরী আগেও একবার ওদের দিকে তাকিয়েছিল। আবারও তাকালো। মঞ্জু সংক্ষেপে জবাব সারলো—দুর্বল মনের মানুষ বলিষ্ঠ শরীর নিয়ে যা না করে উঠতে পারে, দুর্বল শরীর নিয়ে বলিষ্ঠ মনের মানুষ তার চাইতে অনেক বেশী করতে পারে—লড়তেও পারে।

কোথাকার কোন মন্ত্রী যেন কোথাকার কোন ইমারতের ভিত স্থাপন করছেন। চক্‌চকে মুখ। দুরন্ত পোষাক। নিজস্ব ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত দেহে বার্দ্ধক্য রোখা তারুণ্য। শশব্যস্তে একজন এক কর্ণিক সিমেন্ট তুলে দিল তাঁর হাতে। একজন সবিনয় মুখে এগিয়ে ধরে রইল একখানা ইট। দু'তিন জোড়া হাত এগিয়ে রইল তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। কর্ণিকের সিমেন্টটুকু বিছিয়ে তার উপর রাখলেন তিনি ইটখানা। দলবল সহ এগিয়ে চললেন তিনি। নিউজ রিলের ক্যামেরা ঘুরে চললো তার সঙ্গে সঙ্গে।

সংবাদ-ছবি। সংবাদ পত্রের মতোই পরিবেশন করে চললো টুকরো খবরঃ ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ার আওয়াজ তুলতে তুলতে চার ইঞ্জিনের বিশেষ ব্যবস্থায় তৈরী বিমান তার বিশাল পাখা ছড়িয়ে নেমে এসে শরীর রাখল মাটিতে। স্মিতমুখে বেরিয়ে এলেন সফর শেষ করে ফিরে আসা কোন এক প্রথম স্তরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী। প্রতীক্ষারত শহরের সরকারী বেসরকারী বাছাই করা ভিড়ের হাতের মালা স্তূপীকৃত হয়ে উঠতে লাগল তাঁর গলায়। ক্যামেরা কাঁধে খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা লম্বালম্বা পা ফেলে ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক ওদিক। পুলিশী ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে নতুন মডেলের গাড়ীগুলো আলোর দ্যুতি ঠিকরাতে ঠিকরাতে গিয়ে প্রবেশ করল লাটভবনে। আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশের এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান আজ উন্নত করেছে—আমাদের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ডিনার পার্টির ভাষণের আবেগকম্পিত ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল সিনেমা হলের দেয়ালে দেয়ালে—'আমরা দ্রুত সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। আমাদের পাঁচ হাজার ক্রোড় টাকার দ্বিতীয়—।'

জল-জল-জল। বদলে গেল পর্দার পটভূমি। প্যানোরেমিক স্ক্রিণের বিশাল বুক জুড়ে থই থই করে উঠল দিগন্তলীন সমুদ্রপ্রায় জলরাশি। তার এখানে ওখানে দেখা যেতে লাগল কোথাও উঁচু গাছের কেবলমাত্র জেগে থাকা মাথা। কোথাও হালে ছাওয়া চালাটুকু! ডিঙ্গি—নৌকোয় হাঁড়িকুড়ি মাদুরে জড়ানো কাঁথা বালিশ গরু ছাগল ভুলে, গরু ছাগলের সঙ্গে একমাথা হয়ে মিশে বসে আছে বন্যা-তাড়িত মানুষ। মাথার ওপর অঝোরে ঝরে চলেছে বৃষ্টি। ভিজছে মানুষগুলোর অনাবৃত মাথা, অনাবৃত শরীর। ভিজছে কাঁথা-বালিশ গরু-ছাগল। দু'একজন ডালা কুলো মাথায় দিয়ে চেষ্টা করছে মাথাটুকু বাঁচাতে। ডাঙ্গায় চলছে রিলিফের কাজ। বিতরণ করা হচ্ছে চাল, ডাল, গুঁড়োদুধ। কুব্জদেহী মানুষ জলকাদার উপর আঁচল বিছিয়ে বসে আছে উবু হয়ে। দেখে বুঝবার উপায় নেই কে নারী কে পুরুষ, কেইবা বালক কেইবা বৃদ্ধ। সম্বলের ভেতর আছে শুধ তাদের কতগুলো বয়সের অঙ্ক— যে অঙ্কগুলো কেবল দুঃসহ জীবনকে দীর্ঘ করতেই পারে আর কিছু করতে পারে না। যৌবনটা যদি বিক্রীর সামগ্রী হতো তবে সেটা বিক্রি করেই হয়তো এরা অন্ন ভিক্ষা করতো। ভারতীয় নেতাদের সৌভাগ্য-আকাশের একমাত্র অন্তরায় যেতো মুহূর্তে দূর হয়ে।

হঠাৎ কেন যে মঞ্জু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তা সে নিজেও জানে না। ও উঠে দাঁড়ানো মাত্র অমিতা মৌরীর দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে ওর উপর পড়তে যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার বসে পড়লো মঞ্জু।

—তোর মাথাটা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গেল!

রাত বারোটায় ট্যাক্সিতে বাড়ী ফেরবার যে ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছিল ওরা, এইমাত্র বাড়ী ফিরে, বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে ওদের এতক্ষণে মনে পড়লো, পথের ভয়ের কথা প্রায় ওরা ভুলেছিল। মঞ্জুকে অমিতা বলেছিল বাঙ্গালী ড্রাইভার দেখে গাড়ী ধরবার কথা। কিন্তু শুনে মঞ্জু এমন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়েছিল যেন, অর্বাচীন আর কাকে বলে। ট্যাক্সি পেলে যেখানে বর্তে যাবে সেখানে ড্রাইভার শিখ না বাঙ্গালী, চোখ দুটো তার লাল না সাদা, চেহারাটা লোক ভালো বলে বলছে না বলছে মন্দ বলে! সত্য। মঞ্জুর চেষ্টায় তো হলোই না পাক্কা আধ ঘণ্টা ছুটোছুটি করে ফুটপাতের ট্যাক্সি ধরে দেওয়া। ছেলেগুলোর একজন যখন ওদের জন্য একটা গাড়ী ধরে নিয়ে এলো তখন ট্যাক্সি পাওয়াটাই সব। ড্রাইভারের কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠে না। তবু শিখ ড্রাইভারের গোঁফদাড়িঢাকা মুখ, তার বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, তার মোটা লোহার বালা পরা ষ্টিয়ারিং-এ রাখা মজবুত হাতের দিকে চোখ পড়ে, গাড়ীতে মাথা গলাতে বুক টিপটিপ করছিল ওদের। কিন্তু মিটার তুলে দিতে ড্রাইভারদের স্পষ্ট বাংলায় জিজ্ঞাসা, 'অপনারা কোথায় যাবেন।' আর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর আপ বাংলা জন্‌তার মতো অপূর্ব হিন্দী শুনে তার সহাস্য মুখের 'হাঁ আমি বাংলা জানে।' জবাব ওদের ভয়ের মিটারের পারা একটানে অনেকটা নামিয়ে এনেছিল। তারপর ডাইনে আর বাঁয়ে, আর ডাইনে পথ বাতলে দেবার মাঝে মাঝে মঞ্জুর দু একটা উৎসুক প্রশ্নের জবাবে যখন সে ওদের মুহুর্মুহু চমকিত করে দিয়ে বলতে লাগল, তার মেয়ে কমল বেথুন কলেজে পড়ে। ছেলে প্রীতম সিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রীতম তার মাকে জানিয়ে দিয়েছে সে বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করবে এবং সেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা জানে, 'পেয় আজি এ প্রাতে নিজহাতে কি তোমারে দেব দাম, পরভাতের গান।'

বলে সে যখন আবৃত্তি করে উঠল তখন ভয়ডরের কথা ওদের মনেও নেই। মেয়ের অভ্যাস করা শুনতে শুনতে বাবার মুখস্থ হয়ে যাওয়া অদ্ভুত উচ্চারণের আবৃত্তি শুনে অনাবিল আনন্দে তিনজনেই হেসে উঠেছিল ওরা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মৌরী বললো—মঞ্জুর ভাগ্যে এমন ড্রাইভার মিলেছিল।

—আমার না তোদের? সময়টা ভালো কাটলো—বিদেশীর মুখে বাংলা শুনে আনন্দ হলো সে ভিন্ন কথা। কিন্তু বাড়ীতে নির্বিঘ্নে পৌঁছোনোর জন্য কলেজে পড়া ছেলেমেয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের নাম জানা ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রয়োজন হয় না, এ কথায় তোরাতো গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেই চলবি।

সিঁড়িতে বাতি জ্বলছে। খালি গায়, খালি পায় জয়দেব হাঁটাহাঁটি করছে। অমিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে মঞ্জু বললো— দাদার মুখের চেহারাখানা দেখো।

—তুমি আমাকে হলের ভেতর যে কথাগুলো বলেছিলে বুক ফুলিয়ে সেগুলো শুনিয়ে দেবো। সত্যি তো এতো কি কেবল ভয় আর ভয়। 'বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে খায়' মনের এই বাঘের ভয় আমাদের দূর করতেই হবে। এক রাতেই হেন বীর রমণী হয়ে উঠল অমিতা। ঘরে ঢুকে গেল সে। জয়দেব পেছন পেছন ঢুকতে ঢুকতে বললো—তোমরা তিনজনে রাত বারোটার সময় ছবি দেখে একা ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরলে?

আবার সেই তিনজনে একা। মঞ্জু হেসে নিজেদের ঘরের দিকে যেতে যেতে বাসুদেবের বন্ধ দরজায় বেশ জোরহাতে কয়টা থাবড়া দিয়ে বলে গেল, তোমার বৌ নেই বলে বোনদের জন্য বারান্দায় হাঁটাহাটি করবে না এ কি রকম কথা।

শোবার আগে চুল বাঁধতে বসে মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করল মৌরী— এবার শুনি, তুই হঠাৎ উঠে ওভাবে কোথায় গিয়েছিলি?

মঞ্জু চুলটুল না বেঁধেই টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। আজ সমস্ত দিনটা গেছে একরকম শুধু দুটো পায়ের উপর। ঘুমে ক্লান্তিতে শরীর ওর আসছিল অবশ হয়ে। ঘুমচোখে জবাব দিল— কালকে বললে হয় না? শুধু তখন কোথায় গিয়েছিলাম এই তো সব নয়। আজকের সমস্ত দিনের কথাই তো জমে আছে। রাত ভোর হয়ে যাবে বলতে বসলে।

— সে সব কথা থাক, কালকেই শোনা যাবে। সন্ধ্যেরটা কেবল শুনি। ঐ লোকটির হোটেলে গিয়েছিলি সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন?

অগত্যা পাশ ফিরল মঞ্জু। বললো, বিয়ের নেমন্তন্ন করে এসেছিলাম কিন্তু না হবার কথাটা কি জানানোর খেয়াল ছিল আমার? তখন মনে পড়ে গিয়েছিল বলেই না তবু রক্ষে।

—হল থেকে একটা ফোন করে দিলেই পারতিস।

—এ সব কথা ফোনে বলা যায়? বিশেষ করে এই শেষ মুহূর্তে যখন তৈরী হচ্ছেন। শোভন হতো সেটা?

—অন্তত এই রাত করে তার হোটেলে যাওয়ার অশোভনতার চাইতে নিশ্চয়ই বেশী শোভন হতো। জট ভেঙ্গে চিরুণী রেখে বিণুনী পাকাতে পাকাতে বললো মৌরী।

—রাত কোরে বলে কি। তখন তো সবে সন্ধ্যে। এখন গিয়ে যদি বলতাম, ট্যাক্সি মিলছে না। আপনার গাড়ীটা দিয়ে একটু পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন—হাঁ, তবে নিশ্চয়ই তুই রাত বলতে পারতিস। বলে ঘুমঘুম ভাবের দুটো লালচে চোখের আড়দৃষ্টি ফেললো সে মৌরীর দিকে।

—গেলিনে কেন?

—তোর ভয়ে।

—তোর দিক থেকে এই রাতে ওখানে যেতেও কোন আপত্তি ছিল না?

—একেবারেই না। এইমাত্র যেমন প্রমাণ পেলি ট্যাক্সিভীতিটা তোদের একেবারেই অহেতুক। যদি তুই রাজী থাকিস তো চল, তোকে এক্ষুণি নিয়ে গিয়ে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি, তোর এই ভদ্রলোকভীতিটাও একেবারে অহেতুক। যথার্থ ভদ্র ব্যক্তির কাছে যে ব্যবহার আশা করা যায়, যখনই যাই না কেন, সেই ব্যবহারই পাবো তাঁর কাছে। আবার তির্যক দৃষ্টি ফেলল মঞ্জু মৌরীর মুখের উপর—আর লোকটি উদারও আশ্চর্য্য রকম। আমাকে একটা গাড়ী তো আজই দিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। হ্যামিলটনের বাড়ীর দামী মালাটা—তা হবে নাকি হাজার দুই তিন টাকা মূল্যের —আমিই ঠেলে রেখেছি।

হাতের বেণী রচনা বন্ধ হয়ে গেল শুধু নয় যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল মৌরীর। মঞ্জুর বোজা চোখের নির্বিকার মুখের দিকে কতটুকু সময় তাকিয়ে রইল সে স্থির চোখে। তারপর বললো— আমি বলে রাখছি, আর তুই ওখানে যেতে পারবিনে।

—না যাবো কেন আর।

খুশী হলো মৌরী। বললো—তুই আবার তবু বলছিস ভদ্র। এসব লোক এমনি লোভ দেখিয়েই এগোয়। হাতের মুঠোয় আনে। আর দুদিন বাদেই দেখতে পেতিস সে তোকে ভালোবাসার কথা জানাচ্ছে। উঠে বাতি নিবিয়ে দিয়ে গায়ের ব্লাউজ বডিজ খুলতে খুলতে বললো—এদের এগুনোর পদ্ধতিই এই।

—দুদিন বাদে কেন, সে কথা তো আজই জানিয়েছেন।

—এ্যাঁ। এর এগোনোর গতিটা দেখছি কিছু বেশী দ্রুত। তা তুই কি বললি?

—আমি আর কি বলবো। চুপচাপ শুনে গেলাম।

—চুপচাপ বসে লোকটার মুখে ঐ সব কথা শুনলি তুই।

—শুনবো না কেন। 'ভালোবাসি' কথাটার মতো ভালো কথা বিশ্বে আর ক'টা আছে? ওটা শুনতে 'সাট-আপ' বলে চেঁচিয়ে উঠবো বা দুহাতে কান চাপে ছুটে পালাবো—আমি কি উন্মাদ?

অন্ধকারে মৌরীর মুখ দেখা না গেলেও তার নড়াচড়াটা দেখা যাচ্ছিল। সেটা যে বন্ধ হয়ে গেছে স্পষ্ট বোঝা গেল। মঞ্জুর চোখের ঘুমও তখন উধাও হয়ে গেছে। উঠে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে জলটা চায়ের মতো অল্পে অল্পে খেতে খেতে বললো—জীবনে আমি একজনকে মাত্র ভালোবাসবো, আমাকেও কেবলমাত্র একজনই ভালোবাসাবে, ভালোবাসা এ তত্ত্বে বিশ্বাসী নই আমি—শ্রদ্ধাশীল নই আমি। দু'জনে মুখোমুখী গভীর দুঃখে দুঃখী বা গভীর সুখে সুখী যাই হই, চারিদিকে নেই যেন কেউ আর—এটা কল্পনায় ভাবতে গেলেও আমার শরীর শিউরে ওঠে। ভাই-এর মতো— বোনের মতো, মার মতো—-বাবার মতে, ছেলের মতো—মেয়ের মতো—স্নেহ ভালোবাসার সব ক্ষেত্রেই একটা, 'মতো' বলে কথা আছে—আছে না?

মৌরী চুপ।

মঞ্জু এক চুমুক জল খেয়ে নিয়ে বললো—এই 'মতো'টা দিয়ে মানুষ তার প্রীতির সৌহার্দ্যের গণ্ডি বাড়িয়ে তোলে এবং জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সেই বিস্তৃত বেড়টা নিয়েই সে সুখে দুঃখে আনন্দ বেদনায় এগোয়। কিন্তু

ভাই-বোন, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে একা। 'মতো'র ফাঁকটা ভরাট করবার মাটি মনের ভাণ্ডারে মেলে না। অন্ধকারের ভেতর দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করে মৌরীর মুখটা দেখবার চেষ্টা করতে করতে বললো—ভালোবাসার ক্ষেত্রে—একান্ত জনের ক্ষেত্রেও ঐ 'মতোতে' বিশ্বাসী আমি। সেতারের একটা তারই বাজে কিন্তু ঝঙ্কারের তারগুলো ফেলে দিলে গুণী হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবে না। সফটকর্ণার অর্থাৎ মনের সুরোলো কোণগুলোও হলো গিয়ে মনের ঝঙ্কারের তার—নিশ্চল মৌরীর ছায়াটার দিকে তাকিয়ে হাতের গ্লাসটা টেবিলে রেখে উঠে গিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরল মঞ্জু মৌরীকে। বললো—যাক্ আছিস। আমি ভেবেছিলাম ঘেমে গলে জল হয়ে বুঝি তুই গড়িয়ে গেছিস। ঘাবরাস নে দিদিভাই। আমার—

'যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভেজাবো না গো আমি
বেণী ভেজাবো না—
এধার ওধার সাঁতার পাথার
করি আনাগোনা।
জলে নামবো, জল ছড়াবো,
জলে ডুব দেবো
কারুর কথা শুনবো না।
যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভেজাবো না—'

মৌরীকে শক্ত হাতে তেমনি জড়িয়ে ধরে তার বুকে এলোমেলো চুল শুদ্ধ মাথাটা ঘষতে ঘষতে মঞ্জু গান ধরল ছোট্ট গলায়।

চায়ের টেবিলের আসরটা এতদিন ধরে ভাঙ্গাই চলছে। যতীনবাবু আর বাসুদেবের চেয়ার দুটো খালি থাকে। পিসীমা এসে দাঁড়ায় না। জয়দেব আসে। কিন্তু কালকের রাত করে ফেরা নিয়েই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, একটা মন-কষাকষি হয়ে গিয়ে থাকবে অমিতার সঙ্গে তার। আজ সেও অনুপস্থিত। অমিতাও ডেকে পাঠায়নি। রামুর হাতে তিনপ্রস্থ চা খাবার শুদ্ধ ট্রে তুলে দিয়ে ফুলোফুলো মুখে বলেছে, যা দিয়ে আয় বাবুদের সব ঘরে ঘরে।

মৌরীর চেহারাও আজ ভিন্ন রকম। তার মুখের জমা পাথরের মতো চিবুকে আর চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে এতদিন যা ছিল তা হলো সংগ্রামের ভাব। আজ যেন চিবুকটা তার কিছু নরম। দৃষ্টিটা তেমন বাইরের দিকে তীর ছোঁড়া নয়। ভেতরের দিকে ফেরানো এবং ভাবিত। রজতকে নিয়ে মন ওর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। মঞ্জুকে ভয় দেখানো বৃথা। যদি বলা যায় ঐ বনে যাসনে মঞ্জু, বাঘ আছে। বসে থাকলেও সে তক্ষুণি উঠে দাঁড়াবে—বাঘ? কই দেখি। যদি এখন সে বলে, লোকটি ভালো নয়। এঁর পাতা ফাঁদে পা দিসনে। অমনি সে হয়তো বলে বসবে, ফাঁদ? সেটা কি বস্তু দেখিতো। কালকে যদিও মঞ্জু বলেছে, না আর ওখানে যাবো কেন। কিন্তু কোন নিশ্চয়তা নেই যে মঞ্জুর এ কথায়—এ সত্য মৌরীর চাইতে কে বেশী জানে।

অমিতা ওদের তিনজনের চা ঢালতে ঢালতে বললো—এখন তোমার কালকের গল্প শুনি। মমতার সঙ্গে তো বললে দেখা হয়েছিল?

মঞ্জু বেছে কড়া টোস্টের জন্যে একফালি রুটি তুলে নিয়ে মাখন মাখাতে মাখাতে বললো—হাঁ দেখা হয়েছিল। জান, আমার মনে হয় বৌদি, এ বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে। সামনের দাঁত তিনটে দিয়ে টোস্টটায় কামড় দিল মঞ্জু।

— কেন গো? ঔৎসুক্যে অমিতার চা উছলে পড়ে গেল। চা ঢালা বন্ধ হয়ে গেল। মঞ্জুর দিকে তাকালো সে।

চেয়ারের সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে, পেছনের পা দুটোতে দোল খেতে খেতে মঞ্জু যেন ভাবতে লাগল।

ফের চা ঢালতে ঢালতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইল অমিতা। তারপর চা ধরে দিতে দিতে বললো—কেন এ কথা বলছ?

—বলছিলাম এই জন্য—বলে মঞ্জু আবার চুপ করতেই ভয়ঙ্কর বিরক্তিতে ধমকে উঠল মৌরী— কি ন্যাকামোই করছিস।

— বাঃ, ভেবেচিন্তে বলতে হবে না।

— তোকে ঘটনা বলতে বলা হচ্ছে। তোর চিন্তা নয়।

—বিয়ে না হয়ে ভালো হয়েছে এটা কি আমি ঘটনা বললাম? এটা তো আমার চিন্তাই।

— সে চিন্তাটাই তোর মাথায় কোন ঘটনার বীজ পড়ে গজালো সেটাই শুনতে চাচ্ছেন বৌদি।

—তুই?

—আমার কণামাত্র আগ্রহ নেই। বলে হাতের পত্রিকা টেবিলে রেখে চেয়ার ঠেলে উষ্মার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মৌরী।

ঠক্ করে চেয়ারটার সামনের পাদুটো ফেলে সোজা হয়ে বসে হাত চেপে ধরলো মঞ্জু মৌরীর। তার এই উষ্ণভাবের পেছনের কারণটা মঞ্জু বুঝল। কিন্তু কি অযথা। রজত ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনটা কি ওদের।

বস্তুতঃ মঞ্জু সময়টা নিচ্ছিল কথাটা মনের ভেতর গুছিয়ে নেবার জন্য। কিছুটা ছাঁটকাট চালাতেই হবে। নইলে অবিচার করা হবে অনুপস্থিত সুদর্শনের উপর। অপরের খাতা বিচারে নির্বিচারে তার খাতায়ও শূন্য বসিয়ে রাখবে মৌরী। কে ডাঃ চ্যাটার্জ্জি বিয়ে করতে যাচ্ছে এবং নমিতা নাম্নী মেয়ের সঙ্গে তা নিয়ে কোন সংঘাত আছে কি না; কে ডাঃ বোস। তাকে খুশী করলে কি হতো দরকার কি। ডাঃ সেনকেও মঞ্জু ততটুকুই হাজির করল তার কথায়। যতটুকু মমতার প্রয়োজনে না এনে উপায় নেই। ডাঃ চ্যাটার্জ্জিকে নয়, ডাঃ বোসকেও নয়, সেনকেও নয়—মঞ্জু বন্ধুর মতো আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন সুদর্শনকে।

অমিতা বললো— তুমি ভাই ও কথা বললে কেন, বিয়ে না হয়ে ভালো হয়েছে? মেয়েটির তো বেশ উঁচু দরের চরিত্র।

—উঁচু মাথার মতোই উঁচু চরিত্রের জন্য প্রবেশপথের গেট উঁচু হতে হয়। নইলে কেবল মাথা ঠোকাঠুকিই সার হয়।

অমিতা এ বাড়ীর বধূ। আহত হলো সে। আত্ম অভিমানে আঘাত লাগল তার। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চায়ের পাট ট্রেতে তুলে নিয়ে চলে গেল সে ভাঁড়ারের কাজে।

মৌরী বলল—মমতা তো তক্ষুণি চলে গেল। তারপর তবে এই পাঁচটা পর্যন্ত ছিলি কোথায় তুই?

—সেখানেই।

—সেখানেই!

—হ্যাঁ। যখন শুনলাম মমতা বলে গেল তার দাদা এক্ষুণি আসছেন তখন তার দাদার অপেক্ষায়ই বসলাম। মানে বসাই তো ছিলাম। আর উঠলাম না।

পাশের বাড়ীর রেডিওটায় বহুক্ষণ থেকেই গান বেজে চলছিল। সেটায় এবার বেজে উঠল সানাই। সানাই-এর সুরে একই সঙ্গে মৌরী মঞ্জু এমনই অন্যমনস্ক হয়ে গেল যে, মুহূর্তের জন্য একজন আর একজনের কথা গেল বিস্মৃত হয়ে।—আজ একুশে আষাঢ়ের ভোর। আজকের এই ভোর ছিল মৌরীর জীবনে পুরুষস্পর্শে জেগে উঠবার প্রথম ভোর। তার মনের আনন্দ-বেদনার সুরে সুর ভরে নিয়ে সানাই-এর এ বাড়ীতে আজ কেবল কেঁপে কেঁপে বেজে চলবার কথা ছিল।

কিন্তু একুশে আষাঢ়ের ভোর এরও বহুপূর্বে চোখ মেলেছিল লক্ষ্মৌ শহরে, সুদর্শনের ঘরে। সুদর্শনকে একটিবার দেখে আসবার যে দিব্যদৃষ্টিটুকুর জন্য মঞ্জু কাতর হচ্ছিল, যদি সে তা এখন লাভ করতো, তবে দেখতে পেতো ঠিক এই মুহূর্তে সুদর্শন তার হাতের বিংশতিতম সিগারেট শেষ করে একবিংশতিতম সিগারেট হাতে তুলে নিচ্ছে।

॥ ১৭ ॥

যতীন বাবুর টেলিগ্রামখানা যে দিন সন্ধ্যায় এসে লক্ষ্মৌ পৌঁছিল তার পরের দিন সকালে সুদর্শনদের কলকাতা রওনা হবার কথা। সমস্ত বাড়ীময় চলছিল সেই আসন্ন বরযাত্রা-পর্বের বিরাট আয়োজন। সুদর্শনের ঘরেও সেই

আয়োজনই চলছিল, সুদর্শনও ঘরেই ছিল। তবে মঞ্জু দিব্যদৃষ্টি লাভ করলে আজ এই বিশে আষাঢ়ের ভোরে, তাকে যে ভাবে বসে ঊনবিংশতিতম সিগারেট শেষ করে বিংশতিতম সিগারেট ধরাতে দেখতে পেতো সে দিন তা দেখতে পেতো না। দেখতে পেতো, মেঝের উপর মস্ত একটা ফাইবারের সুটকেশের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সুদর্শনের ছোটবোন দাদার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গোছগাছ করছে আর সুদর্শন বোনের কাজের দিকে লক্ষ্য রেখে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে, মাঝে মাঝে এটা ওটা নির্দ্দেশ দিচ্ছে আর মনের মধ্যে মৌরীর কথাই নাড়া চাড়া করছে।

এ কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়। বিয়ের দুদিন আগে অবসর পেলেই যে বরকনের কথা ভাবতে বসবে, এর চাইতে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে? কিন্তু সুদর্শনের নিজের কাছেই এক এক সময় বিস্ময় লাগে মৌরীর সঙ্গে পরিচয়ের এই একমাস ধরে। সে মৌরীর কথা ছাড়া আর দ্বিতীয় বিষয় কিছু ভাবেনি। সেই এক সন্ধ্যার— একটা রাতের ঘটনা কত রকম ভাবে কত বার যে সে উলটে পালটে ভেবেছে। সে ছেলেমানুষের মতো বলে উঠেছিল, ভাবছি বাবাকে গিয়ে মস্ত এক প্রণাম করবো।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মৌরী— কেন?

—আনন্দে। কৃতজ্ঞতায়। তার নির্বাচনে মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু আমাকে কি রকম লাগল জানতে চাইলেও আপনি তো নিশ্চয়ই মুখ খুলবেন না।

চুপ করেই ছিল মৌরী।

—কি বলবেন না তো?

—এ সময়টুকুর ভেতর কি আর একজনকে চেনা যায়।

—যেটুকু যায়।

—পোষাক ভালো। চেহারা মন্দ নয়। ড্রইংরুম আলাপে দখল আছে।

হেসে ফেলেছিল সুদর্শন—ড্রইংরুমের পাশের ঘরের সাক্ষাৎটার জন্যই তবে আর সব জানা তোলা রইল। আর এই ড্রইংরুমের পাশের ঘরের উল্লেখের মাত্র একটা অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করেছিল সে। বুকের ওপর টেনে এনেছিল মৌরীকে। মৌরীর তখনকার সেই বিহ্বল দৃষ্টি। ছেড়ে দেওয়ার পর সেই তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা।

বসে থাকতে পারে না সে আর তখন। উঠে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করে দেয়। তার শিরা-উপশিরা আর রক্তপ্রবাহের ভেতর যেন একটা না একটা পাগলা মত্ততার স্রোত বয়ে চলে, সেই মধ্যরাতে শুধু একমাত্র শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়িয়ে এসে দাঁড়ালো শেষরাতে কাছে পাওয়ার জন্য।

বাবা যখন সেদিন অফিসঘরে ডেকে নিয়ে যতীন বাবুর টেলিগ্রামটা সুদর্শনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সুদর্শন সেটা পড়ে প্রথম কিছুই না বুঝতে পারার দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল—মানে?

বাবা মুখের পাইপটা নামিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে সহানুভূতি জানিয়েছিলেন—এই বেদনাদায়ক ঘটনার জন্য তিনি সত্যই বেদনা বোধ করছেন!

টেবিলের ওপর টেলিগ্রামটা কাগজচাপা দিয়ে চেপে রেখে চলে এসেছিল সুদর্শন নিজের ঘরে। অনেকগুলো মিলিত বাজনা উচ্চগ্রামে এবং দুর্দ্দান্ত ঝড়ের সুরে বাজতে বাজতে যখন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, তখনকার সেই হঠাৎ নিঃশব্দের মতো সুদর্শনের অনুভূতি যেন নিঃসীম নিঃশব্দে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। ঘরে এসে বসবার সময় নিতান্ত অভ্যাস বশেই একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বসেছিল সে।

বাড়ীর ভেতর একটা বিস্ময় আর হতভম্ব ভাব বয়ে চলেছিল। বৌদিরা-বোনরা বলেছিল—এমন কাণ্ড শুনিনি দেখিনি। শুধু গল্পে পড়েছি।

মা বলেছিলেন—যা হবার তা ত কেউ আটকাতে পারে না— তবু যে বিয়ের পর না হয়ে যা ঘটবার আগেই ঘটে গেল এ-ও রক্ষে।

মার কথা শুনে সুদর্শনের মনে হয়েছিল, আজ না ঘটে যদি বিয়ের পরেই এই দুর্ঘটনাটা ঘটতো তবু এখনকার চাইতে নিজেকে অনেক বেশী সৌভাগ্যবান মনে করতো সে। আজ তবে মৌরীর মৃত্যুসংবাদটা তার কাছে শুধু সংবাদ হয়েই আসতো না। মৌরীর শোকযাত্রা তার জন্য অপেক্ষা করতো। সে গিয়ে মৌরীর দুটো ঠাণ্ডা হাত

টেনে নিয়ে তাতে মুখ ঢেকে বসে থাকতে পারতো যতক্ষণ তার খুশী। কেউ বাধা দিত না। কেউ অস্বাভাবিক ভাবতো না। কিন্তু আজ তার সামান্য শোকও সবার কাছে হাস্যকর ঠেকবে। দুদিন পরে হলে যেটা মানাতো, দুদিন আগে সেটা কারুর চোখেই মানানসই ঠেকবে না।

চায়ের কাপ নিয়ে বৌদি কখন ঘরে ঢুকেছিলেন, সুদর্শন টের পায়নি। কাপটা টেবিলে রাখার শব্দে তারাভরা আকাশ থেকে চোখটা ফিরিয়ে ঘরের দিকে আনতেই, মুহূর্ত আগে-পরে হলেও চোখে যে জলের আভাসটুকুও দেখা যেত না—কল্পনায় মৌরীর মৃত হাতে মুখ ঢেকে তখন সুদর্শনের দু চোখে তার যে আভাসটা এসে গিয়েছিল সেটা দেখে ফেললেন বৌদি। চা রেখে চলে গেলেন তিনি। তার চাপা গলা শোনালেন—এই রেডিওগ্রামটা বন্ধ করো না। একটু বাদেই দেখা গেল সামনের বারান্দায় হৈ হল্লা চেঁচামেচি করে যে ছেলে-মেয়েগুলো খেলা করছিল, তাদের যেন কে সরিয়ে নিয়ে গেল সেখান থেকে।

মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছিল সুদর্শন বৌদিকে। কাল যার এ বাড়ীতে বধূ হয়ে আসবার কথা ছিল, এই সম্মানটুকু তার নিশ্চয়ই প্রাপ্য।

কিন্তু টেলিগ্রাম সে তো যে কেউ বিয়ে ভেস্তে দেবার জন্য শত্রুতা করে পাঠাতে পারে। চিঠি—একটা চিঠি না হলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সমস্ত বাড়ী উন্মুখ হয়ে রইল যতীন বাবুর চিঠির জন্য। গোছগাছ বন্ধ রইল কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে ফেলা হলো না। তারপর দিন এক্সপ্রেস ডেলিভারিতে সে চিঠিও এসে গিয়ে এ ব্যাপারের সমাপ্তি টেনে দিল সবার মনে। দিল না কেবল সুদর্শনের। উনিশে আষাঢ়ের পাওয়া চিঠি এই বিশে আষাঢ়ের সকালের ভেতর প্রতি ঘণ্টায় কি একবার করে চোখের কাছে মেলে ধরেনি সে! এ যেন কন্যার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান পিতার পত্র নয়। চিঠিটাতে যেন ব্যথার চাইতে ক্ষোভের সুর বেশী। দুঃখের চাইতে আশা ভঙ্গের। বেদনার চাইতে চাপা রাগের। শোককাতর কথা আছে কিন্তু কোথাও পিতৃহৃদয়ের আর্ত ক্রন্দনধ্বনির সাড়া মিলছে না।

নিরুপায় যতীন বাবু বাধ্য হয়ে কি এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন?

বেঁকে বসেছে মৌরী? যতীন বাবুর চিঠিটার অন্তর্নিহিত সুর সে কথাই বলছে না?

কিন্তু যতীন বাবুর চিঠি যা বলে যুক্তিতে তা টিকতে চায় না। তার সঙ্গে পরিচয়ের পর তাকে ভালো না লেগে থাকলে, সে কথা জানাবার বহু সময় পেয়েছিল মৌরী। বিয়ের দুদিন আগের জন্য কেন সে চুপ করে থাকবে? জন্মদিনে সে উপহার পাঠিয়েছিল, চিঠি লিখেছিল। উত্তরের প্রশ্ন ওঠে না তাই সে কথা সুদর্শনের মনেও আসেনি। তাই এগুলো দিয়ে অবশ্যি কোন কিছু প্রমাণ হয় না। তবে কি মৌরী সে দিন থেকেই তার অরাজীর কথা জানিয়ে দিয়েছিল? পরিবারের লোকেরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছে—আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেটটা মিথ্যা জ্বলেপুড়ে ছাই হতে হতে যখন আঙ্গুলে এসে তাপ লাগলো তখন সেটা ছাইদানে ফেলে উঠে দাঁড়ালো সুদর্শন। 'ফাইব ফিপটি ফাইবের' ভরা টিনটা হাতে লেগে পড়ে গড়াতে গড়াতে ঠেকল গিয়ে দেয়ালে। সিগারেটগুলো ছড়িয়ে রইল মেঝেতে। চাকরটা এসে উঁকি দিলে, তাকে ইসারা করলো সেগুলো তুলে নিয়ে যেতে। সে সেগুলো তুলে আর একটা নতুন টিন কেটে রেখে দিয়ে গেল সামনে।

বোন এসে বললো, চলো না বেড়িয়ে আসবে ফরেষ্টে? তিস্তার পাঁচ হাজার ফিট উপরে ফরেষ্ট বাংলোর সেই নির্জন পাহাড় আর নদীর রমণীয় পরিবেশে একবার গেলে তুমি দেখো আর আসতেই চাইবে না এই ধূলো-বালির রাজত্বে। এর পর ডাক্তারী শুরু করলে তো যখনই বলবো শুনবো কেবল কাজ আর কাজ। চলো—এ্যাঁ?

নির্জন। শুধু পাহাড় নদী আর অবারিত আকাশ। রাজী হয়ে গেল সুদর্শন। কলকাতা, এই লগ্নে যখন তুমি এমন অশুভ চেহারায় দেখা দিলে তখন এখন থাক। তবে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

শুনে ভগিনীপতি এসে ঘরে ঢুকলেন। চোখের ইঙ্গিতে যেন সুদর্শনকে কি একটা রহস্যের আভাস দিয়ে বললেন, তুমি ব্রাদার অবিবাহিত স্ত্রী বিয়োগে যে রকম মুষড়ে পড়েছ রমণীয় পরিবেশ ছাড়াও রমণীর প্রয়োজন আছে মনে হচ্ছে। পাহাড়ের পাহাড়ী মেয়ে—সুদর্শন ভগিনীপতির স্থূল ঠোঁটের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরল তার দিকে।

মৌরী মঞ্জুর মনে হতে লাগলো কতকগুলো ঝোড়ো ঘটনা যেন ওদের উপর দিয়ে ঝড়ের মতোই বয়ে নিয়ে ফুরিয়ে গেল। কোথায় সে সব ঘটনা আর কোথায়ই বা সে সব ঘটনার নায়ক নায়িকারা। পর্দার ছবির মতো যেন ঘটনা শেষে মিলিয়ে গেল তারা। বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে কে বলবে মাত্র পক্ষকাল পূর্বেও এ বাড়ীর

একটি লোকের মুখে খাওয়া ছিল না। চোখে ঘুম ছিল না। মনে শান্তি ছিল না। আজ সে এমনি শান্ত ঠাণ্ডা স্বাভাবিক। রামু রান্নাঘরে মাছের ঝোলের সম্বরা গন্ধে কাশছে। পিসিমা আহ্নিকে বসেছেন। বাবা দাদা বেরিয়েছেন বেড়াতে। অমিতা গেছে তার ছেলেমেয়েকে দেখে আসতে। বাসুদেব এখানে নেই। সে চলে গেছে তার কাজের জায়গায়। ছুটি শেষ হবার আগে এবং মৌরীর দিক থেকে এক রকম মুখ ফিরিয়ে থেকেই। ছাদে পায়চারী করছিল মৌরী মঞ্জু কলেজ থেকে ফিরে একটা পাটি বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়ে বললো—যাক্ গেল তো সব চুকে বুকে। এখন তুই কি করবি ঠিক করলি শুনি? এইভাবে ছাদে পায়চারী আর ঘরে ইজিচেয়ার—বই? না আর কিছু।

মৌরীও শুয়ে পড়ল আকাশের দিকে মুখ করে। বললো— তুই কি করবি?

—তুই কি করবি—আমার ঠিক তো কিছু বেঠিক হয়নি। আমার সে খসড়া তৈরী করাই আছে।

—শুনি?

—জীবনের খসড়াই হোক আর ছবির খসড়াই হোক আগে দেখাতে নেই বা বলতে নেই। খসড়া সব সময়ই হয় বেশী বলে নাতো কম বলে। ঠিক বলে না কখনোই।

—আমি ঘরের লোক। বেশী হলে খুশী হবো। কম হলে কাউকে বলবো না।

—আচ্ছা। তোরটা বল আগে?

—আমি পড়বো।

—এম-এ?

—না। আইন।

—আইন!

—হ্যাঁ।

—উকিল হবি? উত্তেজনায় উঠে বসল মঞ্জু।

—ব্যারিষ্টার হবো।

—উঃ দিদি। বলে উঠে একটা ঘুরপাক খেয়ে এলো মঞ্জু। অদ্ভুত—অদ্ভুত—অদ্ভুত। এই তো জীবন। আইনটা তোর পক্ষে কেমন হবে দুদিন আগে হলে আমার মনে সন্দেহ জাগতো। এই কয়দিনের লড়াই-এ তোর কথার ধার দেখে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি তোর উপযুক্ত লাইনই হবে এটা। বক্তৃতার বেগ যা আছে—ঠিক আছে। শুধু আবেগটা একটু কমাতে হবে। আবার তক্ষুণি মাথা ঝাকাতে ঝাঁকাতে বললো, না তাই বা কেন। আবেগ ছাড়া যে বেগ সে তো যন্ত্রের বেগ। মানুষের বেগে আবেগটাই তো হওয়া চাই প্রধান—

মৌরী বললে—এবার শুনি তোর বাসনাটা?

—আমার?

> 'হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা—
> রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
> উত্তরীয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে
> জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে কণ্ঠ হতে—নির্বারিত স্রোতে।'

রামু এসে ছাদের দরজায় মুখ বাড়ালো। মঞ্জুকে লক্ষ্য করে বললো—একজন দিদিমণি এসেছেন তোমার কাছে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মঞ্জু নীচে। জয়াকে দেখে, আরে জয়া তুই! বলে এগিয়ে তার দুটি হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে বললো—ঠিকানা দিয়ে, পথঘাট চিনিয়ে কতবার বলে এলাম আসিস একদিন। সেই একদিন এই এতোদিনে হলো? আয় বোস। জয়াকে চেয়ারে বসিয়ে নিজেও চেয়ার টেনে বসল মঞ্জু। তারপর কেমন আছিস? ভালো?

—আমাকে দেখে কি মনে হয়?

—তোকে দেখে? জয়ার গভীর কালীপড়া চোখ ও তার দুটি ক্লান্ত পাতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মঞ্জু। তারপর বললো— ভালো নয়।

প্রথমে নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল জয়া। কিন্তু তারপরই তার সমস্ত মুখ-চোখের কেমন যেন রূপান্তর ঘটে গেল। অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টিটা। বললো—কেন? যদিও শাড়ীটা কোঁচকানো মোচড়ানো তবু শাড়ীটা বেশ দামী তো? হাত দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা তুলে দেখালো জয়া।

তাকিয়ে রইল মঞ্জু।

—হাতের বালা দুটো যে গিল্টির তা কি বোঝা যাচ্ছে! গলার মালার, কানের দুলের সাদা পাথরগুলো যে কাচ তা কি ধরা পড়ছে? পায়ের স্যাণ্ডেলটার কাঁচা চামড়ার আঁস্‌টে গন্ধটা কি ওখানে থেকে পাচ্ছিস—তবে?

তেমনি ভাবে তাকিয়ে রইলো মঞ্জু জয়ার দিকে।

জয়া মাথার এলোমেলো চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে কানের দুপাশে ঠেলে দিতে দিতে বললো—চুলগুলো অগোছালো ছিল। এই তো দিলাম ঠিক করে। ভালো দেখাচ্ছে না এখন? হেসে উঠল সে।

'কার চুল এলোমেলো কি বা তাতে এলো-গেলো,
কার চোখে কত জল কি হবে মেপে?'

হাসিমুখ আর জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো জয়ার। চেয়ারে পেছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে দিল সে। একটা আস্ত নিঃশ্বাসে টেনে সেটা ফেলতে ফেলতে বললো—

'জেনে কি বা প্রয়োজন অনেক দূরের বন,
রাঙা হোল কুসুমে না বহ্নিতাপে?'

আমাকে দেখে কি মনে হয়? জিজ্ঞাসা করেছিল যে জয়া যে ভাব নিয়ে, এ যেন সে জয়া নয়!

একটু চা খাওয়া মঞ্জু!

॥ ১৮ ॥

দস্তুরমতো দুর্বোধ্য ঠেকছিল মঞ্জুর জয়াকে। সে কিছুই বুঝে উঠতে না পারায় একটা দৃষ্টি নিয়ে জয়ার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। জয়া চা খাওয়ানোর কথা বলতেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সে। এই চা দেবার কথা মঞ্জু নিজেই কখন বলে আসতো—হয়তো এতক্ষণে চা খাবার এসেও যেতো কিন্তু জয়াই ওকে সব ভুলিয়ে বসিয়ে রেখেছিল। ওর কথা, ওর চোখের অস্বাভাবিক ধারালো দৃষ্টি ও সে দৃষ্টির আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসা ভাব, চেয়ারে মাথা হেলিয়ে একটা মস্ত নিঃশ্বাস টানা এবং ফেলার সঙ্গের আবৃত্তি—চকিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিল মঞ্জু। জয়া চা চাইতে 'আসছি' বলে উঠে গেল সে চায়ের ফরমাস করে আসতে। ফিরে এসে দেখলো জয়া ঠিক সেই ভাবেই হেলানো মাথায় বসে আছে। মঞ্জুও কি করা যায় কি বলা যায়, কিছুই ভেবে না পেয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর যেন কিছু বলার জন্যই বললো, জানিস জয়া, এই কিছুদিন আগে একদিন চৌরঙ্গির ফুটপাত দিয়ে আমি যাচ্ছি—রাত তখন এই সাতটা সাড়ে-সাতটা হবে। হঠাৎ মনে হলো তুই দাঁড়িয়ে। এমন আশ্চর্য্য মিল তোর সঙ্গে যে, আমি তোর নাম ধরে তাকে ডেকে পর্য্যন্ত উঠেছিলাম। কিন্তু মেয়েটি ডাক শুনে, ফিরে তাকিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা দিল। বুঝলাম ভুল করেছি। কিন্তু সত্যি বিস্ময়কর মিল ছিল তোর সঙ্গে মেয়েটির চেহারার।

মাথাটা চেয়ারে যে ভাবে রাখা ছিল, ঠিক সেই একই ভাবে রেখে জবাব দিল জয়া—আমি—তাই নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে মিল থাকবে।

—তুই?

—হাঁ।

—তবে আমায় দেখে অন্য দিকে চলে গেলি কেন?

এবার মাথা সোজা করে সাপের মতো কোমর টান করল জয়া। হঠাৎ উত্তেজনায় যেমন কতকটা লাল রক্ত মুখে ছুটে এসে গাল দুটোকে লাল করে তোলে, তেমনি কোথা থেকে যেন কতকটা দুষ্ট রক্ত ছুটে এসে ওর সাদাটে কাগজের মতো ঠোঁট দুটোকে মিশকালো করে তুললো। জবাব দিল সে—ওটা আমার দুরন্ত ব্যবসায়িক সময় যে।

এতক্ষণ জয়ার মুখের ভাব পরিবর্তন মঞ্জুর দৃষ্টি এড়ায়নি, কিন্তু এবার ওর মুখের রং পরিবর্তনটার দিকে মঞ্জুর দৃষ্টি পড়ল না। মঞ্জুর সমস্ত বিস্ময় আর আগ্রহ ধাওয়া করল জয়ার কথার দিকে। নতুন কথা—নতুন চিন্তা মুহূর্তে সে দিকে নিজেকে ছুটিয়ে দিতে মঞ্জুর সময় লাগে না। বললো—ব্যবসায়িক সময়! মানে তুই ব্যবসায় নেমেছিস? মা ভৈঃ! রইল পড়াশুনা। রইল বাঙ্গালীর সংস্কৃতি—হবো মোরা ব্যবসায়ে মাড়োয়ারী সমান। বল তুই কিসের ব্যবসা করছিস? আমিও করবো। ওঃ, দস্তুরমতো মৌলিক চিন্তা রে জয়া। তোকে অভিনন্দন করছি—হাত বাড়িয়ে দিল মঞ্জু জয়ার দিকে।

জয়া সে হাতে হাত মিলালো না। গম্ভীর কণ্ঠে বললো— বাজারের চাহিদা বুঝে ব্যবসা স্থির করতে হয়।

— সে তো ব্যবসার গোড়ার কথা। সবাই জানে। সে চাহিদাটা কিসের, কিসের সব চাইতে বেশী আর তুই-ই বা কিসের করছিস? আঃ, সত্যি আইডিয়াটা কি যে অপূর্ব লাগছে আমার।

জয়া মঞ্জুর অধৈর্যে আর চঞ্চলতায় হাসল। সে হাসি এতো সুন্দর এতো স্বাভাবিক যে, জয়ার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে যে ভয়টা এসে যাচ্ছিল সেটা কেটে গেল মঞ্জুর। ওর হাসিটা যেন শিশুর অজ্ঞতার প্রতি বড়দের হাসি।

না না জয়ার কিছু হয়নি। জয়ার এই ক্লান্তি, এই বিষণ্ণতা, এই কালিঢালা চোখের নীচ— এ-সব অনভ্যস্ততার দুঃশ্চিন্তার। নৈরাশ্যের । নতুন পথের দূর যাত্রার।

জয়া বললো—বাজারের চাহিদা বুঝে যেমন ব্যবসা ঠিক করতে হয় সেটা বুঝতেও আবার তেমনি বহু ঘা খেতে হয়—অন্ততঃ আমি তো তাই খেয়েছি। প্রথমে মা আর মেয়েতে মিলে বসে বসে হাতের কাজ করলাম। কাশ্মীরী, গুজরাটী, মণিপুরী নক্সার উপর রেশমী রঙ্গীন সুতার ঘর বুনতে বুনতে কিছু রঙ্গীন কল্পনাও করলাম ঘরের অভাব দূর করার। সেলাইটা মা-মেয়েতে জানি। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সব কাজ একটা ব্যাগে ভাঁজ করে তুলে নিতে নিতে ভাবতে লাগলাম। একাজ যে দেখবে সেই পছন্দ করবে, তারই চোখে লাগবে। না কিনে কখনই পারবে না। প্রথম বোঝাটা ঠিক হলো। যে দেখল সেই কাজের প্রশংসায় বার বার ঘাড় মাথা নাড়তে লাগল, কিন্তু দ্বিতীয় বোঝাটা ঠিক হলো না। একজন যদি একটা ট্রে-ঢাকনা কেনে তো বিশ জন কিছুই কেনে না। দেখে পছন্দ করে। ভেতরে যায়। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ভেতর থেকে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে। পছন্দকরা জিনিষগুলো হাতে তুলে দিয়ে বলে, না ভাই, বাবু মানা করছেন। হাতে হাতে জিনিষ ময়লা হয়ে উঠল—দাগ ধরলো, মা বললেন, আগুন জ্বালিয়ে দাও এগুলোতে।

—বাজে। ছেড়ে দিয়েছিস তো ও রকম সেলাই নিয়ে ঘোরা?

—হ্যাঁ।

—বেশ করেছিস। একে ব্যবসা বলে না ছাই বলে।

আবারও হাসল জয়া। বললো—তারপর গিয়ে একটা দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এলাম তাদের ষ্টেশনারী জিনিষপত্র বিক্রি করে দেবার। টাকায় এক আনা কমিশন। এবার আরো চমৎকার। হাত ওল্টালো জয়া— সেলাই নিয়ে গিয়ে দরজায় দাঁড়ালে তবু দেখি বলে ভেতরে নিয়ে বসাত। এবার বাবুরা দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র হাতের কাগজ নিয়ে গিয়ে বিরক্ত মুখে ভেতরে ঢোকেন। মেয়েরা শুধু মুখটুকু বাড়িয়ে বলে দেয়, দরকার নেই। অনুরোধ করলে, অনুনয় করলে একটু যে ব্যথিত তারা না হয় তা নয়। বলে, এ সব তো আর বিলাসী জিনিষ নয়, দরকারী জিনিষই। কিনতে হয় প্রতি মাসে মাসে। কিন্তু উনি মানা করছেন। বলছেন ওর জানা-শোনা দোকান থেকে নিয়ে আসবেন। কি করবো ভাই!

মঞ্জু বলে উঠল, বাজে, একেবারে বাজে এগুলো। কেউ নেয় নি—নিলেই বা কি হতো? এগুলোকে কি ব্যবসা বলে নাকি! এটাও গেছে তো?

— তা গেছে।

—বাঁচা গেছে। এখন কি করছিস তাই শুনি?

—এখন? এখনেরটা একেবারে মোক্ষম ব্যবসা। এখন আর কোন বাবু বা উনি বৌ-মেয়েকে দিয়ে বিরক্ত মুখে যেতে বলে পাঠান না—তবে তারা অবশ্যি বাড়ীতে যাওয়া বা দেখা করাটা পছন্দ করেন না। তাদের জন্য অপেক্ষা করতে হয় রাস্তায়। আর এই প্রথম দেখলাম চাহিদার অন্ত নেই। তিক্ত মন পরীক্ষকের হাতের কলমের নির্দয়-কাটা দাগটার মতো নীচের ঠোঁটটাকে তেরছা করলো জয়া—

অন্ধকার ঘরের মতো জয়ার চোখ দুটো এমন গভীর অন্ধকার ঠেকতে লাগল মঞ্জুর কাছে যে, সে যেন সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারল না। বুঝে উঠতে পারল না, কি বলছে জয়া—অর্থই বা কি তার কথায়।

রামু চা আর খাবারের ডিস রেখে গেল। জয়া কাপটা কাছে টেনে এনে তাতে একটু চুমুক দিয়ে বলল—বাঃ; ভারি মিষ্টি গন্ধ তো চা-টার! কি চা খাস রে তোরা?

অন্যমনা মঞ্জু ওর কাপটা কাছে টেনে নিতে নিতে বলল—ও সব আমি জানিনে। বৌদি জানেন।

—বৌদি! অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল জয়া। তোর বৌদি আছেন নাকি?

—হ্যাঁ। আমার দুই দাদা। বড়দা' বিয়ে করেছেন।

—তোর বড়দা' তোর বৌদিকে খুব ভালোবাসেন, না? সেই অদ্ভুত হাসিটা জয়ার আরো যেন বেড়ে উঠতে লাগল। হাসতে হাসতে বললো, তুই আমাকে পাগল ভাবছিস? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভাবছিস। নইলে চুপ করে থাকতিস নে। এক্ষুণি বলে উঠতিস, বাঃ, সে তো নিশ্চয়ই। চায়ের কাপটা হাতে ছিল জয়ার। সে তো নিশ্চয়ই বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাসির দমক এমন বেড়ে গেল যে কোন মতে চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। তার পর দমবন্ধ হয়ে আসা হাসি হাসতে লাগল দু হাতে বুক চেপে ধরে। অতিকষ্টে হাসিটা থামিয়ে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললো—মেয়েগুলো এমন বোকা যে সেজন্য আমার হাসি পায়। চোখ-মুখ মুছে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসে চায়ের কাপটা সবেমাত্র জয়া আবার টেনে নিতে যাচ্ছিল, বাইরে জুতোর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল কারু আসার। ধরা কাপ ছেড়ে তো জয়া দিলই, মুখের ভাব পরিবর্তন যা হলো তার তা আরো বিস্ময়কর। ত্রাসে ভয়ে যেন সে নীল হয়ে গেল। কেউ এলো মঞ্জু?

জয়ার মাথার গোলমাল সম্বন্ধে মঞ্জুর মনে আর কোনো দ্বিধা ছিল না। সে খাবারের ডিসটা এগিয়ে দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললো— কেউ যদি হয় তাতে হয়েছে কি? তুই চা খাবার খেয়ে নে।

—বাড়ীর ছেলেরা কেউ যদি হয়! যেন স্বগতোক্তি করল জয়া। যদি মুখচেনা বেরিয়ে যায়? পাতলা রোগা শরীরটা তার যেন বার দুই তিন শিউরে উঠল। মঞ্জু কিছু বুঝে উঠবার আগেই শাড়ীর আঁচলটা দিয়ে মুখের একটা দিক আড়াল করে পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে তড়িৎ পায় দরজার দিকে হাঁটা দিল সে। 'আমি পালাই' এই কথাটা তার শুনতে পাওয়া গেল দরজার মুখে। পড়ে রইল খাবার। পড়ে রইল চা। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু। ওকে একা ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হলো? কথাটা মনে হতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো মঞ্জু রাস্তায়। রাস্তার দু'ধার দেখতে দেখতে এসে উপস্থিত হলো সে একেবারে ট্রামলাইন পর্য্যন্ত, কিন্তু জয়ার দেখা পেলো না। ফিরে এসে নীচের ঘরের টেবিলের পাশের ভাঙ্গা চেয়ারটার উপর দুহাতে মাথা চেপে ধরে বিমূঢ়ভাবে বসে রইল সে। জয়া যেন ওকে ধরে, ওর বুদ্ধি অনুভূতি চেতনা—সব কিছুকে ধরে কষে এমন কয়টা ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে যে তারা কেউ আর ঠিক জায়গায় নেই।

পরের দিন বেলা আড়াইটে তিনটে। কলেজ থেকে অন্যমনস্ক মনে বেরিয়ে এলো মঞ্জু। পথও চলতে লাগলো অন্যমনস্কের মতো। ট্রামের উদ্দেশ্যে সে চলছিল। উঠেও বসত সে ট্রামেই। কিন্তু যে ফুটপাতটা ধরে সে হাঁটছিল তার ধারঘেঁষা পার্কটার একটা মাথা-ঝাঁকড়া গাছের হলদে ফুল ছিটানো ছায়া ঢাকা তলা যেন ওকে দাঁড় করিয়ে ডাক দিল একটু বসে যাওয়ার জন্য। লোহার রেলিংঘেরা পার্কটায় ঢোকবার জায়গা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছিল মঞ্জু। ঘুরে গিয়ে পার্কের গেট ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল। সূর্য্য তখন প্রায় মাথার উপরই। গাছের তলাগুলো ছাড়া কোথাও ছায়া নেই। সেই হলদে ফুলছিটানো গাছটার তলায় এসে ঘাসের উপর বসে হাতের কলেজ-ফাইল আর কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখল সে পাশে। পা দুটোকে দিল সামনের দিকে টান করে মেলে। গাছের গোল ছায়ার ঘেরটা ছাড়িয়ে পায়ের পাতা দুটো এসে পড়ল রোদে। পিঠটা রাখল সে গাছের গায়ে। হাত দুটো কোলের উপর।

কাল সমস্ত রাত সে জয়ার জন্য উদ্বেগ বোধ করেছে। কলেজের সময়ের অনেকটা আগে বেরিয়ে তাই সে গিয়েছিল জয়ার খবর নিতে। বাইরের রকের উপর গালে হাত রেখে বসেছিল জয়ার দশ বছরের ভাই। ওকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। চিনতে পেরেছিল।

তখন যদিও কিছুই মনে হয়নি কিন্তু এখন মঞ্জুর মনে হচ্ছে, ওকে দেখে তার মুখে যে ভাবটা ফুটে উঠেছিল তার চেহারাটা যেন কতকটা দুর্ভাবনাগ্রস্ত রোগীকে নিয়ে রাত কাটানোর পর ভোরের আলো দেখার মতো! তাড়াতাড়ি দুহাতে ঠেলে ভেজানো দরজা সে খুলে দিয়েছিল। বলেছিল, দিদি ঘরে। একটা দুর্ভাবনার চাপ যেন

বুক থেকে নেমে গিয়েছিল, যাক জয়া ঠিক মতই বাড়ী এসেছে। তুমি এ ভাবে বসে কেন? কথাটা শুধু বলার জন্যই বলে ভেতরে চলে গিয়েছিল সে। গিয়ে ঢুকেছিল জয়ার ঘরে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই প্রথমে যার অসন্তুষ্ট দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখি হলো তিনি জয়ার মা। দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি শ্লথভঙ্গিতে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে থাকা জয়ার চৌকির পাশে। যে শাড়ী-জামা পরে জয়া ওদের বাড়ী গিয়েছিল সেই কাপড়-জামা পরা। ডান হাতটা ঝুলে পড়েছে চৌকির বাইরে। বাঁ হাতটা চাপা পড়েছে পিঠের তলায়। খোঁপাটা ভেঙ্গে খুলে কাঁটা-ফিতেশুদ্ধ লুটোচ্ছে মাটিতে। মুখটা কিছুটা হাঁ করা বিকৃত। যেন তাকে জোর করে তেতো ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। আর ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয়ে শুইয়ে দেবার সাহস নেই, তাই মেয়ের গড়িয়ে পড়ে না যাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে দাঁড়িয়ে আছেন মা। মঞ্জুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে দরজার কাছেই তিনি জানিয়ে দিলেন ওকে, জয়া ঘুমোচ্ছে। ডাক্তারের নিষেধ আছে ওকে জাগাতে।

শুনে এবং তাঁর অসন্তোষ লক্ষ্য করে তক্ষুণি চলে আসতে যাচ্ছিল মঞ্জু। কিন্তু জয়ার মাকে ওরই দিকে এগিয়ে আসতে দেখে থামলো সে। দরজার কাছে এসে মেয়ের দিকে নজর রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করলেন জয়ার মা—কাল জয়া তোমার ওখানে গিয়েছিল?

—হাঁ।

—কখন?

—সন্ধ্যের সময়।

—কতক্ষণ ছিল?

—ঘণ্টাখানেকের বেশী হবে না।

—ওঃ আচ্ছা! বলে তিনি তাঁর স্বস্থানে ফিরে যাবার জন্য পেছন ফিরলেন। জয়ার চোখ-বসে-যাওয়া, কালিঢালা মুখটার দিকে স্থির লক্ষ্যে একবার তাকিয়ে মঞ্জুও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দুদিন আগেও যে জয়াকে দেখেছে, আর কাল যে জয়াকে দেখেছে তারা যেমন এক নয়, এ বাড়ীতে এসে যে জয়ার মাকে দেখেছিল সে জয়ার মা আর এই জয়ার মা এরাও যেন এক নয়। সে দিনের জয়ার মা ছিলেন উদাস অনাসক্ত। ছেঁড়া নোংরা শাড়ীটা বেআব্রুর পর্যায়ে চলে গেছে কি না, ভাতের থালায় ছেলেমেয়েদের শুধু ভাতই দিচ্ছেন কি না, ডাল মসলার ছিটেয় ভরা হাতলভাঙ্গা কাপে বন্ধুকে চা দেবার জন্য, আর শুধু চা দেবার জন্য মেয়ে ক্ষেপে উঠল কি না, দু আনার সিঙ্গাড়া আনতে গিয়ে তা থেকে দুটো পয়সা চুরি করে ছেলে দিদির হাতে মার খেলো কি না—কিছুতে দরকার নেই তার। কিছুতে প্রয়োজন নেই তার। কাশতে কাশতে দুহাতে বুকটা চেপে ধরে কাঠির মতো শরীরটার টুকরো চারটাকে একসঙ্গে কোথাও ঠেস দিয়ে রেখে, চোখ বুজে বসতে পারলে আর সব বাড়তি। ঠেস দেওয়া পিঠের দেয়ালটুকু ছাড়া দুনিয়াটা বাড়তি। দীর্ঘদিন অক্ষুধা আর অরুচি রোগে ভোগার পর তিনি যেন বিরাট ক্ষুধা নিয়ে জেগে উঠেছেন। এই এক মাসে চেহারার পরিবর্তনও হয়েছে তার আশ্চর্য্য রকম। শরীর ভরেছে। ঢিলে চামড়া টান হয়ে শরীরের ফর্সা রংটা বেরিয়ে এসেছে। বয়স কমে গিয়ে দেখাচ্ছে তাকে জয়ার বড় বোনটোনের মতো। রকের উপর তেমনি গালে হাত রেখে বসেছিল জয়ার ভাই। ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। ওর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। প্রথমটায় খেয়াল করেনি মঞ্জু। তারপর বিস্মিত হয়ে তাকালো ওর দিকে —আমায় কিছু বলবে?

—দিদির সঙ্গে দেখা হলো আপনার?

—না তো। তোমার দিদি ঘুমিয়ে আছেন যে।

—ডাকলেন না কেন?

মঞ্জু সস্নেহে ওর মাথায় হাত রাখল—ঘুমের মানুষকে অমন তুলতে হয় না।

— ঘুমের মানুষ কোথায়! দিদিকে তো ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে।

—ওই হলো। রাতের ঘুম না হওয়াটা তো ভালো নয়। তাই রাতে যাদের ঘুম না হয় তাদের ওষুধ খাইয়েই ঘুম পাড়াতে হয়। তাদের আর জাগাতে নেই।

—রাতে কোথায়! দিদিকে তো ওষুধ খাইয়েছে এই কতটুকু আগে—জোর করে। দিদি বাড়ী ফিরেছে তো এই মাত্র।

পা দুটো যেন থেমে যেতে চাচ্ছিল মঞ্জুর। থামতে দিল না। নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে চলতে লাগল সে।

—আপনি আবার আসবেন তো?

—আসবো।

—কাল?

—কাল—ভাবতে হলো মঞ্জুকে। জয়ার মার কথাই ভাবতে হলো তাকে। ওর আসা যে তিনি পছন্দ করছেন না সে কথাটাই। ওর আসাটাই কি কেবল—না কারু আসা-যাওয়াই তিনি চাচ্ছেন না? ছেলেটির একটা হাত হাতে তুলে নিল মঞ্জু। বললো— কাল না হলেও নিশ্চয়ই আমি আসবো।

গাছের ছায়ার ঘেরটা পার হয়ে বাইরে গিয়ে পড়া পায়ের পাতা দুটো রোদে গরম হয়ে উঠতে লাগল। পা দুটোর গরমে আর রোদের তাপে তেতে লাল হয়ে উঠতে লাগল মঞ্জুর গাল-মুখ। তবু সে সরল না নড়ল না। কোলের ওপর তেমনি দু হাত রেখে বসে রইল।

'আমাদের দাবী মানতে হবে।'

মোড়ের মাথা থেকে সমবেত জনতার ধ্বনি কানে আসতেই মঞ্জু পা গুটিয়ে মুখ ঘোরালো রাস্তার দিকে। বড় বড় পোষ্টার নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসতে লাগল একটা মিছিল। ছুটে এসে পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়ালো মঞ্জু। একসঙ্গে বহু জনতার সমাবেশ, তাদের সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি, তাদের সমুষ্টিবদ্ধ হাতের দাবী— এ সব দেখলে ওর ভেতরটায়ও যেন কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। ওঠানামা করতে থাকে ভেতরটা সংঘবদ্ধ জনতার পায়ের তালে তালে। ওর ইচ্ছে করে ও চিৎকার করে বলে ওঠে—না, না ভুল বলছ তোমরা। মুষ্টিবদ্ধ হাতের শূন্য ছুঁড়ে দেওয়া আমাদের দাবী মানতে হবে নয়। ওতে আমাদের শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া দাবী শূন্যেই মিলিয়ে যায়। দুদিনের মিছিল আর প্রতিবাদে ফুরিয়ে গিয়ে ঘরে এসে বসে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বলি, আমাদের দাবী ওরা মানল না। ও কথা নয়। মুষ্টিবদ্ধ হাতের ধ্বনি অপর হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে বলো, 'আমাদের দাবী আমরা মানাবো।' দাবী মানা না মানা ওদের মর্জ্জির উপর খেয়াল-খুসীর উপর ফেলে না রেখে দাবী মানানোর দায়টা নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। তবেই না দুদিনের মিছিলে ফুরিয়ে যাবো না। 'মানবোটা' যতক্ষণ না মানিয়ে উঠতে পারবো থেমে যাওয়া আমাদের থাকবে না। নইলে, আমাদের দাবী মানতে হবে।—মানব না।— মানতে হবে।—মানব না। তার পর? তারপর ওরা দিল না, ওরা শুনল না। ওরা মানল না। না—না এ সমস্ত ভিক্ষার নৈরাশ্যবাণী। এ ফাঁকা কথা। মিছিলটা ধ্বনি তুলতে তুলতে চলে গেলেও চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

—নমস্কার।

চমকে ডান দিকে ঘাড় ফেরালো মঞ্জু। দেখল নীল হাসিমুখে নমস্কার জানাচ্ছে ওকে।

হাত তুলে নমস্কার করতে করতে বললো—আপনি! বাঃ, ভারি সুন্দর দেখা হয়ে গেল তো!

নীল পার্কের রেলিং-এর উপর হাত রেখে বললো—আপনার কিন্তু কোন আগ্রহ ছিল না দেখা করার! থাকলে ইচ্ছে করলেই আপনি খোঁজ নিতে পারতেন।

হাসল মঞ্জু—আপনার দিক থেকেও কোন আগ্রহের পরিচয় আমি পাইনি।

কিন্তু ছিল। আপনাদের বাড়ী একদিন এসে উপস্থিত হবে কি না। সে কথাও ভেবেছি। কিন্তু আপনারা যদি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন। যে যাক্, খবর কি বলুন?

মঞ্জু নীলের হাতরাখা রেলিংটাকে দেখিয়ে বললো—হয় এটার এ পিঠে আপনাকে আসতে হয়, নয়তো আমাকে এটার ওপিঠে যেতে হয়। এভাবে কি কথা চলে? আপনি এ পিঠে এলে তো এসে পড়বেন ফুটপাতে। তখন আবার বসবার জয়গা খুঁজতে হবে।

তবে আপনি ভেতরে আসুন।

নীল যেন একটু ভাবনায় পড়ল, কি করবে।

—কি সময় নেই?

—আমি কি জানতাম আপনার সঙ্গে আজ দেখা হবে! মুখে এ কথা বললেও নীল পার্কে ঢোকবার গেটটা কোথায় দেখে নিয়ে দাঁড়ান আসছে বলে সে ভিন্নমুখী চলল।

সূর্য্য তখন অনেকটা পশ্চিমে ঢলে এসেছে। গাছের ছায়াটা এতক্ষণ যেখানে ছিল সেখান থেকে সরে গিয়ে লম্বা হয়ে পড়েছে। পূব দিকে। মঞ্জুকেও দিক্ পরিবর্তন করতে হলো। পূব দিকের লম্বাটে ছায়ার উপর গিয়ে বসল সে।

নীল এসে হাতের ভারী মোটা ফাইলটা পাশে রেখে বসল। বসেই পকেটে হাত ঢোকালো সিগারেটের জন্য।

মঞ্জু বললো—আপনার কাজ ছিল বুঝি?

গোল্ডফ্লেকের ভরা টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিতে নিতে নীল বলল—তা ছিল একটু।

—তবে তো আপনাকে ডেকে বসিয়ে ভালো করলাম না?

—দেখা যাক। একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে সেটা ধরাতে ধরাতে জবাব দিল নীল।

—কি দেখা যাবে?

—ডেকে বসিয়ে ভালো করলেন কি না।

—সেটা দেখবেন কি ভাবে?

—একটু কাজ ক্ষতি করে বসে যদি আর একটা তার চাইতে বেশী কাজ হয়।

—আমার কাছে?

—আপনি একজন কম কেউ নাকি। কম কাজের মানুষ নাকি।

বিস্ময়ে গালে বাঁ হাতের দুটো আঙুল রাখল মঞ্জু—আপনি আপনার স্কুলের জন্য টিচার খুঁজতে বেরুন নি তো?

উচ্চস্বরে হেসে উঠল নীল। বললো—স্কুল হলে বলা যায় না কি করতাম। তবে ও বালাই চুকে গেছে।

—বলেন কি! আপনি খুঁজতেন আর নাই খুঁজতেন—আমি নিজেই যে শিক্ষয়িত্রীর আবেদনপত্র নিয়ে হাজির হবো ভাবছিলাম— সত্যি বলছি। সত্যিই বলছিল মঞ্জু। ও মনে মনে ভেবে রেখেছিল নীলের স্কুলে গিয়েও কলেজের অফ পিরিয়ডে পড়িয়ে আসবে।

আকাশের দিকে মুখ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নীল বললো, না, স্কুল করা হলো না। বাড়ীটা যার তিনি তার ভোজপুরী দারোয়ান দিয়ে আমাদের ভাঙ্গা টেবিল-চেয়ারগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। ভাঙ্গাবাড়ী বলেই যে তার ভেতর ইচ্ছেমতো মাথা গলানো যায় না, পাকা গোঁফে তা দিয়ে পাকা বাঁশের লাঠি হাতে তার দারোয়ান সে কথাই ঘোষণা করছে।

—ওটার গেটই বা কোথায়, তালা দেবার দরজাই বা কোথায়? ওটা তো ভাঙ্গা ভুতুড়ে বাড়ী যাকে বলে তাই।

—পরিচিত ওটা ওনামেই। বাড়ীটা দেখে যখন একটা স্কুল করার কথা মনে এলো, খোঁজ-খবর করেও বের করতে পারলাম না বাড়ীটা কার। কি নাম তার। কোথায় সে থাকে। জানবেই বা কে। কোন এক বিলাসী জমিদারের শহর ছাড়ানো বনের বাগানবাড়ী। সামনে ধারে লোকালয় বা বসতি কিছুই ছিল না। উদ্বাস্তুরা এসে নতুন আস্তানা গড়েছে। নূপুরের শব্দ আর সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে ভূতের ভয়েই হয়তো কেউ বাসা বাঁধেনি, তবে দরজা জানালা ঝুলে টুলে যা দু-একটা অবশিষ্ট ছিল তা তুলে নিয়ে তারা কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি যে মালিকের নাম-ঠিকানা কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারলাম না কিন্তু তারা ঠিকানা ঠিক খুঁজে বের করে গিয়ে উপস্থিত হলো। আর লাঠি হাতে দারোয়ানের এসে উপস্থিত হতেও সময় লাগল না।

এক বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেছেন, বহু জিনিষ আমরা ফেলে দিতাম, যদি তুলে নেবার লোক না থাকত। হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নীল পশ্চিম আকাশের যে দিকটার দিকে তাকিয়ে রইল সেদিকে তাকিয়ে থাকতে চোখের তখনও কষ্ট হবার কথা। আগুন গলানো মেঘের ভেতর থেকে সূর্য্যের যে ছোট্ট গোলাকৃতিটুকু দেখা যাচ্ছিল তার তেজও চোখের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু সমুদ্র যেমন সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে থাকে ঠিক তেমনি যেন নীলের গভীর নীল দু'চোখ সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

বেদনাবোধ করল মঞ্জু। বললো—আপনারা মালিকের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন?

মঞ্জুর দিকে দৃষ্টি ফেরালো নীল—আমার আগ্রহ ছিল না। অন্যেরা করেছিলেন।

—কি বললো সে? কি করতে চায় সে বাড়ীটা দিয়ে?

—সে কিছুই করতে চায় না। যে কিছু করতে চায় সে কিনে নিক। নয়তো ভাড়া দিক।

—এই পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে তাকে কেউ ভাড়া দিয়েছে?

—রাগ করে লাভ নেই। এই বিশ-ত্রিশ বছর কেউ চাইতে আসেনি। এলে নিশ্চয়ই সে আমাদের চাইতে বেশী দাক্ষিণ্য লাভ করতো না।

চুপ করে রইল মঞ্জু। পার্কে বড়দের ভিড় আরম্ভ না হলেও ছোটদের ভিড় তখন শুরু হয়ে গেছে। ঝিয়েরা বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়ে বসে গেছে গল্প করতে। বাতাসে কিছু গুঁড়ো ফুল ঝরিয়ে দিয়ে গেল ওদের কোলে মাথায়। ফুলগুলো কোল থেকে একটা একটা করে হাতে তুলে নিতে নিতে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, প্রথম দিন গিয়ে আমরা দেখেছিলাম বিশ্ব পেছনে রেখে বসে আপনি যেন কি লিখছেন। আপনি লেখেন।

নীল গোল্ডফ্লেকের টিনটা মঞ্জুর দিকে বাড়িয়ে ধরল। লিখি না তো কি। এই যে চারমিনারের বদলে গোল্ডফ্লেকের টিন দেখছেন এটা আমি লিখে উপায় করেছি জানেন? আরে আরে দাঁড়ান—হাত তুলে থামানোর ভঙ্গি করলো নীল। মুখ-চোখ অমন উদ্ভাসিত করে তুলবেন না। লিখি, তাই বলে আমি লেখক নই। কোন স্বনামধন্য লেখকের সঙ্গে পরিচিত হাবার গৌরব আপনি বোধ করবেন না। বরং নামটা যে আপনি জানেনই না—আমার সেই লজ্জা ঢাকতে আপনাকে কথা খুঁজতে হবে। কাগজের অফিসে কাজ করে এমন কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। যাই! বসি। গল্প করি। সময়ে অসময়ে তাদের রিপোর্ট তৈরী করতে সাহায্য করি। দু'-একটা নিজস্ব ছুটোছাটা লেখাও যে না বের হয় তা নয়। তবে সম্প্রতি এক বড় লোকের সুনজরে পড়ে গেছি। তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁর মনের কথা, বলার কথা বুঝে নিয়ে বিস্ময়কর ভাবে তা আমি প্রকাশ করতে পারি। আর একটা সিগারেট বের করে সেটা ধরিয়ে নিয়ে বললো—একটিন করে গোল্ডফ্লেক সিগারেট তিনিই রোজ আমার জন্য এসে টেবিলের উপর রেখে দেন। গাড়ী পাঠান। গিয়ে পৌছানো মাত্র একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করেন। দু-একটা এ-কথা সে-কথার পরই কি লিখতে চান তা বলতে চেষ্টা করেন। তারপর টিনটা আমার দিকে আরো ঠেলে দিয়ে লাইটার জ্বেলে আমার সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে, 'এবার লিখুন আপনি' বলে একেবারে ঘর ছেড়ে চলে যান। এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘরে মূল্যবান সিগারেট টানতে টানতে নিজেকে আমার সম্রাট মনে হতে থাকে।

মঞ্জু বললো—তাঁর মনের কথাগুলো আপনি আশ্চর্য্য রকম গুছিয়ে লিখতে পারেন। তার মানেই হলো আপনি যা লেখেন সেগুলোকেই তাঁর নিজের কথা মনে হয়।

—পাগল নাকি। তার চিন্তা, আমার চিন্তা—তার বলার কথা আর আমার বলার কথা কি এক? তা নয়। তার চিন্তাকেই আমি রূপ দেই। দু'-চারটে কথায়ই তার বক্তব্য আমার বোঝা হয়ে যায়। সেগুলোকেও আমি জোরের সঙ্গেই যুক্তির সঙ্গে দাঁড় করাই।

—অপরের চিন্তা নিয়ে চিন্তা করা, লেখা—এ আপনার পীড়াদায়ক মনে হয় না?

—তার চাইতে অনেক বেশী পীড়াদায়ক চিন্তা মনে হয় বসে বসে পেটের চিন্তা করাতে। নির্বোধ আর ঘ্যানঘেনে প্রিয়জনের অবুঝ দাবীর মতো তার সেই একঘেয়ে ঘ্যানঘেনানি চাওয়া। তাকে শান্ত না করে, ঠাণ্ডা না করে কোন উপায় নেই তার দিকে থেকে মনটাকে একটুও দূরে সরিয়ে নেবার।

আপনি সেদিনও এই লেখাই লিখছিলেন?

—না। ওটা এখনও কোন লেখা নয়। লেখার আয়োজন মাত্র।

যদি লিখে উঠতে পারি, তবেই আমি লেখক কি না তার পরীক্ষা হবে, এ সব তো বাজে।

॥ ১৯ ॥

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—আপনার সেই ধনী ব্যবসায়ীর নাম কি?

হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল নীল—ও বলা চলবে না। ওটা আমাদের ট্রেড সিক্রেট—যাকে বলে ব্যবসায়িক সততা। কিন্তু কেন, আমার লেখা পড়বার জন্য?

—হাঁ।

—ও-সব লেখা কি পড়বেন। অন্যের চিন্তায় অন্যের নামে লেখায় কি কিছু থাকে। নিজ নামের দায়িত্ব না থাকলে কি লেখা উৎরোয়? একটু থামল নীল। তার পর বললো—আর উৎরানো লেখা জীবনে লিখে উঠতে পারবো, তারই বা সম্ভাবনা কি! লক্ষ্মীর বর লাভ যদি বা সম্ভব হয় সরস্বতীর বর লাভ—ও দেবীকে প্রসন্ন করা, সে বড় দুরূহ কর্ম। তিনি তোষামুদে তুষ্ট হন না। বিরক্ত হন বেশী ডাক-খোঁজে। কাজ কাজ কাজ—কাজের

গুপ্তযুগের যুগে কাজ দেখিয়ে খুশী করবার জন্য সমস্ত দিন উপুড় হয়ে তিন দিস্তা কাগজ লিখে ফেললে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, তিনি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটাকে। বুঝলেন, বলার কথা আছে বলতে চাই কিন্তু পারছি নে এ যন্ত্রণা ভোগ যেন বোবার যন্ত্রণা ভোগ, ডস্টয়েভস্কি তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন, লেখা বলতে কি বোঝায় তা কি তুমি জানো বন্ধু? এই ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভোগ যে তোমায় কখনো ভুগতে হয় না সে জন্য তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারো।

বলেই নীল হাইফেন দিয়ে লেখা টানবার মতো গলার সুরের টানে শুধু একটা ব্যবধান রেখে একেবারে বিষয়ান্তরে চলে গেল—তার পর মমতা বাড়ী আর হাসপাতাল, হাসপাতাল আর বাড়ী নিয়মিত করে চলেছে। তার ডিউটির সময়গুলো ছট্টুর মা'র প্রেরিত অন্নে এবং ছট্টুর নিজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে আমার নির্ঝঞ্ঝাট কাটছে। বাবা এসে মাকে নিয়ে গেছেন দেশে। তাঁদের বাসনা, তাঁরা পাকিস্তানবাসী হবেন। ব্যাস, শৈশব কাল বাদে আমার সংবাদের আর কিছু নেই। এখন আপনার কথা শুনবো। টিনটা খুলে একটা সিগারেট বের করে সেটা ধরাতে লাগল নীল।

প্রথমটায় বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল মঞ্জু। তার পর বুঝে হেসে ফেললো। প্রথম থেকেই কথার গতিটা আজ নীলকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে, তাই নীল এবার কথার চাকাটা জোর হাতে ষ্টিয়ারিং ঘুরোবার মতো করে ঘুরিয়ে দিল ওর দিকে। মঞ্জু দস্তুরমতো ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—এমন ভালো আলোচনাটাকে এ ভাবে নষ্ট করে দিতে হয়! সাহিত্য থেকে এমন সংবাদ টেনে নিয়ে এসে আমার কথা শুনতে চাইলেন যে, আমাকে এখন অগত্যা খবরই বলতে হয়।

—নইলে?

—নইলে আপনার বলার কথার ভাষা খোঁজার মতো আমিও আমার করার ইচ্ছার পথ খোঁজার কথা শোনাতাম আপনাকে। বলতাম, আমার আরাধ্যা দেবী লক্ষ্মী নন, সরস্বতী নন, এমন কি তিনি কোন দেবীই নন। তিনি মানবী। স্বপ্ন দেখি আমি জোয়ান অব আর্কের। তার গরুচরানো মাঠে বসে গির্জার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে দৈববাণী শোনার মতো দৈববাণী শোনার জন্য এই মাঠে এতক্ষণ ধরে আমি কান পেতে বসেছিলাম। যদি এই মাঠের ঘূর্ণি হাওয়ার ভেতর তেমনি আকাশবাণী আমি একটিবারের জন্যও শুনতে পেতাম 'ওগো বিধাতার মেয়ে এগিয়ে যাও। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।' হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শোনাতে পারতাম এ সব কথা। কিন্তু এখন আমাকে সোজা খবরে চলে গিয়ে বলতে হবে, আমার দিদি ঠিক করেছে— সে আইন পড়বে। আমারও প্রচণ্ড উৎসাহ তাতে।

বাধা দিল নীল। আমার ভুলটা তো শুধরে এনেছিলেন। আবার নিজেই দিচ্ছেন কেন নষ্ট করে?

—আর হয় না। সামনের দু'দিকে ঝুলানো বেণী দুটা পেছন দিকে সরিয়ে দিতে দিতে মঞ্জু বললো, সাহিত্যে মূল্য নাই থাক খবরের ভেতরও মূল্যবান খবর নিশ্চয়ই আছে। আমার দিদি মমতার বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় যে তার নিজের বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন সে খবরটা সেদিন আপনাকে আমার বলা হয়ে ওঠেনি।

মুখের সিগারেটটা হাতে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল নীল— সে কি!

—হাঁ।

— কেন? দুটোর সঙ্গে যোগ কোথায়?

—দিদির মতে যোগ আছে। নার্সের কাজে সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয় এই যদি সত্য—এই যদি সত্য যে এই সেবার কাজ নারীর জাত যাওয়া, তবে যারা বাধ্য হয়ে দেয় তাদের চাইতে অনেক বেশী অপরাধী তারা যারা প্রবৃত্তির দোষে নেয়। তাই সম্ভ্রান্ত ঘরের বৌ হবার যোগ্যতা যদি নার্স হলে মেয়েরা হারায় তবে যাদের জন্য হারাবে তারা আরো বেশী অযোগ্য ভদ্রঘরের। বিয়ে যদি ভাঙ্গে তবে যে কারণে মমতার ভাঙ্গবে ঠিক সেই কারণে ওরটাও ভাঙ্গবে। বলাই বাহুল্য যে, আমার দিদির পাত্র ছিলেন ডাক্তার। তাই একটা যখন ভাঙ্গলো তখন আর একটাও। ওকে কেউ টলাতে পারলো না।

একটা দমকা বাতাস পার্কের শুকনো ধূলো ঝাঁটিয়ে নিয়ে ওদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। মুখে আঁচল চাপা দিল মঞ্জু। কিন্তু নীল খেয়াল করলো না। বাতাসে ওলট-পালট খেতে খেতে উড়ে আসা একটা কাগজের টুকরো অন্যমনস্ক ভাবে হাতে তুলে নিয়ে বললো—অকল্পনীয় ঘটনা এমন ভাবে ঘটে চলে বলেই না মানুষের কল্পনা-জগৎ কোন সীমার বাধা মানে না। আর তাই না তার এতো সমৃদ্ধি। কিন্তু আশ্চর্য! মঞ্জুর দিকে তাকালো নীল—

এতো বড় কথাকে আপনি শুধু খবরের মূল্যে নিয়ে ফেলেছেন। সংবাদের সাধ্য কি এ ভার বয়? কাজ ক্ষতি করে বলেছিলাম, দেখুন সে বসা কেমন সার্থক হলো। আপনার উপাস্যা দেবীর নাম শুনতে পেলাম। শুনলাম এক-মাঠ রোদের দিকে তাকিয়ে নৈসর্গিক শক্তির কাছে একটিবার কি দৈববাণী শোনার জন্য আপনি কান পেতে বসেছিলেন, সে আশ্চর্য্য কথা। যুগান্তের ধ্বনি শুনতে পেলাম আপনার দিদির মুখের কথায়। ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে আপনার দিদির সেই কথাগুলো বলে চলার আশ্চর্য্য ছবিটা আমি কল্পনায় ধরতে চেষ্টা করছি। অল্পই দেখেছি তাকে। তবু ছবিটা আমার চোখের উপর চোখে দেখা ঘটনার মতোই একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ততক্ষণে পার্ক ভ্রমণার্থীদের ভিড়ে ভরে উঠেছে। বাদামওলা বেচছে বাদাম, গরম মুড়িওলা ঝাল-মসলার মুড়ি। ঠোঙ্গা হতে সব খাচ্ছে আর ঘুরছে। নয়ত বসে গল্প সুরু করেছে। ট্রামে লোক ঝুলে চলেছে। পথে লোকের মিছিল। পশ্চিমে সাদা আর সোনালী রং-এর মেঘের ভেতর টুপ-টুপ করে ডুবে চলেছে সূর্য্য। এই এক মুহূর্ত আগে যে তেতলা বাড়ীটার মাথার উপর তাকে দেখা যাচ্ছিল এখনই তাকে আর সেখানে দেখা যাচ্ছে না। সারা দিনের কাজের পর ঘরমুখো মানুষের মতোই যেন তার সেই কর্মক্লান্ত লাল মুখের ঘরের দিকে ছুটে চলা।

কিছুক্ষণ বাদে দূরের দৃষ্টি কাছে এনে মঞ্জুর দিকে তাকালো নীল। বললো—কিন্তু অপরাধের একটা বোঝাই ভারি ছিল, তার উপর দেখছি আবার আর একটা চাপলো। আপনাদের পরিবারে দু-দুটো শুভপরিণয়ের এমন অশুভ পরিণতির জন্য দায়ী আমরা—এ কথা ভাবতে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।

—শুভ পরিণয়ের অশুভ পরিণতি পরিণয়ের পরের চাইতে আগে ঘটে যাওয়াই মঙ্গল, দিদি হলে আপনার কথার এই জবাবই দিত। কথার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জু পাশ থেকে ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝুলালো। কলেজ ফাইলটা তুলে নিল হাতে। তারপরে কোলের উপরের ফুলগুলো মুঠোয় ভরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

নীলও তার ফাইল হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—একেবারে নোটিশ না দিয়ে, এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় একজন ভদ্রলোককে মাঠে বসিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াতে হয়।

হাসিমুখে দুজনে হাঁটা দিল। চলতে চলতে নীল জিজ্ঞাসা করল—দিদি হলে কি বলতো সেটা বললেন, আপনার নিজের জবাবটা কি?

—আমি অশুভ শঙ্কায় কোন ঘটনা থেকে পিছুপা হইনে। ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে পা বাড়াবো না, এ হলে সমস্ত জীবন থেমে থাকতে হয়। আমি ভালোলাগা দিয়ে এগুতে ভয় পাইনে। দিদি ভালোলাগাকে হালের মাঝি করতে রাজী নয়।

—আপনি রাজী?

—নিশ্চয়। নিজের ভালোলাগার প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা।

—এখন একটু চা খেয়ে নেবার জন্য যদি কোথাও ঢুকি— কেমন লাগবে আপনার?

—ভালো লাগবে। হেসে জবাব দিল মঞ্জু। কিন্তু বাড়ীতে আজ আমি দেরী হবার কথা বলে তো আসিনি, উল্টে আরো বলে এসেছি চারটার ভেতর ফিরছি। ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললো, প্রায় ছ'টা বাজে। দিদিটা বড্ড ভাবে। আচ্ছা, কাল এ্যাঁ?

—কাল! নীলের প্রত্যাশায় যেন এতটা ছিল না।

—হ্যাঁ। মাথা নাড়ল মঞ্জু। কাল আমার ক্লাশ তিনটে পর্যন্ত। তারপর—তারপর কোথায় আসবো?

—আজ যেখানে বসেছিলাম সেখানে?

—আচ্ছা সেখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো আমি। ঠিক তিনটের সময় কিন্তু—

—আপনার অপেক্ষা করতে হবে না। ভদ্রলোকের লেখার প্রুফ দেখার কাজটা ঐ গাছের ছায়ায় বসে সেরে রাখতে রাখতে আমিই আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।

ভদ্রলোকের লেখার প্রুফ! হেসে উঠল মঞ্জু। কিন্তু পরের দিন এসে বসে অপেক্ষা করেও মঞ্জু নীলের দেখা পেলো না। মঞ্জু কিন্তু আশ্চর্য্য হল না। মানুষ অপ্রত্যাশিত ভাবে কত ঘটনার ভেতর জড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আশ্চর্য্য বোধ করল। মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা। এবার ওরই খোঁজ নেওয়া উচিত। নইলে সে নিশ্চয়ই বলতে পারে, কই এমন একটা অস্বাভাবিক অনুপস্থিতির পরও একটা খোঁজ নিলেন না, লোকটা মরে টরে গেল কিনা! অপর কেউ হলে এই খোঁজ নিতে যাওয়াটা পরের দিনের সকাল নয়তো দুপুরের জন্য স্থগিত রাখত। কিন্তু মঞ্জুর মনে হলে অপেক্ষা করা সয় না। উঠে বসল সে ট্রামে।

ওর এই অভাবিত উপস্থিতি দিয়ে নীলকে ও চমৎকৃত করে দেবে, এটাই খুশী মনে ভাবতে ভাবতে দরমার দরজা ঠেলে বেশ চঞ্চল পায়ে ভেতরে ঢুকেছিল মঞ্জু। কিন্তু ওর সেই চঞ্চলতায় টান পড়লো দু'জন ডাক্তারের সঙ্গে মমতাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ব্যাপার কি! ভীরু পায়ে বারান্দায় উঠে এলো সে। মঞ্জু দেখল মমতা ওকে চিনতে পারলো না। তার অপরিচিত দৃষ্টিতে একটুও চেনার ভাব দেখা দিল না। দরজার সামনেটা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে সে শুধু ভেতরে ঢুকে যাবার জায়গা করে দিল ওকে। আর ভেতরে ঢুকবার মুখে ডাক্তারদের গম্ভীর কণ্ঠের রায় শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল মঞ্জু। আশার কথা কিছুই বলতে পারছে না তারা। হয়তো আর জ্ঞানই ফিরে আসতে না পারে। দরজার কাছ থেকেই চৌকির দিকে তাকালো মঞ্জু। কাত হয়ে শুয়ে আছে নীল দেয়ালের দিকে মুখ করে। গলা পর্যন্ত টানা রয়েছে একটা সাদা মোটা চাদর। তেলশূন্য লালচে ঘন চুল মাথার উপর ফুলে আছে অনেকটা উঁচু হয়ে। শিয়রের কাছে এসে নীলের ঘাড়ের ছাঁটা চুলের চামড়ার সঙ্গে মিশে যাওয়া খাস রংটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু স্তব্ধ হয়ে—মরণটা সত্যি এত সহজ? এই তাজা শরীর, সতেজ ঘাড়, বলিষ্ঠ কব্জি, দীর্ঘ দেহ মানুষটার ভেতরের কোন যন্ত্রটা হঠাৎ এমন বিগড়ে গেল যে, সে আর তাকে উঠে দাঁড়াতে দেবে না! তার নীল চোখের গাঢ় দৃষ্টি ফেলে বলতে দেবে না, অপরের চিন্তা নিয়ে চিন্তা করার পীড়ার চাইতে অনেক বেশী পীড়াদায়ক চিন্তা বসে বসে পেটের চিন্তা করা। হেসে উঠে বলতে দেবে না, আমায় না জানিয়ে আপনি বিয়ের দিন স্থির করবেন না আপনার? বেশ মনে থাকে যেন কথাটা। অন্যমনস্ক কণ্ঠ তার আর কোন দিনও উচ্চারণ করবে না, অকল্পনীয় ঘটনা এতো ঘটে বলেই না আমাদের কল্পনা কোন সীমার বাধা মানে না। কখন যে সে নীলের মাথার চুলে হাত ডুবিয়েছে কখন যে তার হাত নীলের হাল্কা চুলের বোঝা মুঠো করে ধরেছে আর সে-মুঠোয় ধীরে ধীরে হাতের চাপ বেড়ে চলেছে, মঞ্জু জানে না।

নীল পাশ ফিরল। দুটো লাল চোখ উপর দিকে টেনে মেলে তাকালো মঞ্জুর দিকে।

এই তো জ্ঞান ফিরেছে—তরিৎ-পায়ে সংবাদটা মমতাদের দেবার জন্য মঞ্জু বাইরের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু নীল ততক্ষণে দু'হাতে চোখ রগড়ে গায়ের মোটা চাদরটাই খালি শরীরে জড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হতভম্ব দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকালো মঞ্জু।

নীলের চোখেও বোকা দৃষ্টি। সত্যই কি ওর চুলগুলো এতক্ষণ মঞ্জুর ঐ লম্বা লম্বা আঙ্গুলের মুঠোয় চেপে ধরছিল? শরীরের শিরা উপশিরা টান হয়ে ওঠা অনুভূতিটাকে হাতের মুঠোর চাদরটার মতো মুঠো করে ধরলো নীল। পাগল! তার রাত-জাগা মাথা আর কাঁচা ঘুম ভাঙ্গা চোখ শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকা মঞ্জুর সঙ্গে বালিশে টান পড়া চুল এক করে বিভ্রম দেখেছে। মঞ্জুকে বসতে বলে বললো, দাঁড়ান, গায়ের এই চাদরটা ফেলে আগে পাঞ্জাবীটা চাপিয়ে নিই।

অসুস্থ মানুষের মাথায় হাত রাখা আর সুস্থ মানুষের মাথায় হাত রাখা এক অনুভূতির জিনিষ নয়। দুটো অনুভূতিই যার যার কাজ করে গেলও ঠিক মতই। কিন্তু মঞ্জু আমল দিল না। বললো—আপনার অসুখ নয়?

—অসুখ? কেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম বলে? এখানকার মশার সঙ্গে তো পরিচয় নেই আপনার? তারা দলে এতো ভারী যে, আপনাকে সোজা তুলে নিয়ে গিয়ে ডোবায় নামিয়ে ফিষ্টি জুড়ে দিতে পারে।

মমতা এসে ঢুকল ঘরে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। বাতি জ্বালিয়ে দিল সে। মমতার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল নীল—ডাক্তার বোস আর সেন এলেন না?

—এসেছিলেন।

—এসেছিলেন? আমায় ডাকলিনে কেন? কি বললেন ওরা দেখে?

—ডাকিনি, দু'রাত পুরে সবেমাত্র একটু ঘুমিয়েছ—তারপর আজকের রাতও সামনে রয়েছে। টেবিলের কাছে গিয়ে কিছু টাকা আর একটা প্রেসকিপসন বই চাপা দিয়ে রাখতে রাখতে মমতা বললো—আমার ডিউটির সময় হয়ে গেছে। এই ইন্‌জেকসনটা এনে রেখো, ডাক্তার বোস আটটা সাড়ে আটটার সময় এসে ইন্‌জেকসনটা দিয়ে যাবেন। আমিও তখন আসবো।

—ওরা দেখে কি বললেন?

ভাই-এর দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে অন্য দিকে চোখ ফেরালো মমতা।—না, তারা আশার কথা কিছুই বলতে পারছেন না যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরছে। চোখভরা জল দুটো পাতার ভাঁজে ধরে রাখতে রাখতে

মমতা বের হয়ে গেল ঘর ছেড়ে। শুধু বেরিয়ে যাবার মুখে একবার মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসবার মতো মুখ করল। যেন বলে গেল, তোমায় চিনিনে। দাদাও পরিচয় করিয়ে দিলেন না। কিন্তু আমাদের বাড়ী এসেছ। একেবারে বিনা সম্ভাষণে চলে যাওয়ায় অভদ্রতা আমি করতে পারবো না। আমি যাচ্ছি, সেটাই বলে গেলাম।

এই বিষাদিত আবহাওয়ার ভেতরও অপরিচিতের প্রতি মমতা যে বিষণ্ণ হাসিটুকু তার সৌজন্যের পরিচয় হিসাবে দিয়ে গেল, সেটা দেখে মঞ্জু মুগ্ধ হলো। প্রথম দিনের দেখায়ই মমতা মুগ্ধ করেছিল তাকে। দ্বিতীয় দিনের দেখায় সেটা আরো বেড়েছিল। আজ আরো বাড়লো। ক্ষতি—মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে ওদের পরিবারের, মমতাকে আর সুদর্শনকে হারিয়ে।

মঞ্জুর দিকে ফিরল নীল, বললো—ছট্টুর ভারি অসুখ। ছেলেটার অসুখটা মনটাকে একেবারে বিকল করে দিয়েছে। হতাশায় হাত ওল্টালো নীল—বাঁচবে না, ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবো না—বুঝতে পারছি ডাক্তাররা সেই রায়ই দিয়ে গেছে। গায়ের চাদরটা খুলে পাঞ্জাবীটা গায়ে চাপালো সে। পায়চারি করার অভ্যাস নেই তার। কিন্তু আজ সে হাত দুটো পেছনে রেখে পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভেতর।

মঞ্জু বসল। জিজ্ঞাসা করল—অসুখটা কি?

দাঁড়ালো নীল। বললো—ডাক্তাররা বিশ-বাইশ অক্ষরের কি নাম যেন বলেছে একটা মনে নেই। আসলে অসুখটা অনাহারই বলতে পারেন। শাকপাতা সেদ্ধ আর আকাঁড়া চালের ভাত —দশ বছরের জীবনের একমাত্র খাদ্য-তালিকা যদি এই হয়— শরীরে কি থাকতে পারে? জীবনীশক্তি আসবে কোথা থেকে? শরীরে রক্ত বলে কোন পদার্থ নেই। কিছু দিন ধরে ঘুরে ঘুরে কেবল জ্বরে ভুগছিল আর হাত-পা জলে ফুলে উঠছিল। মমতা হাসপাতাল থেকে অষুধ-টষুধ কিছু কিছু এনে খাওয়াত। সেরে উঠতো আবার হতো—এই চলছিল। কিন্তু এবার জ্বরের সঙ্গে নতুন উপসর্গ এসে জুটেছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর সেই যে আজ তিন দিন ধরে অজ্ঞান হয়েছে আর জ্ঞান ফেরেনি—আর ফিরবেও না। টেবিলটার কাছে গিয়ে নোটগুলো আর প্রেসক্রিপসনটা নাড়াচাড়া করল নীল। তারপর সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতে করে এসে বসল চেয়ারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টেনে চললো নীরবে।

বাইরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মঞ্জুও। কিন্তু ভেতরে তার সেই ছোট মাথার বড় বড় চিন্তাগুলো যেন সব ফণা তুলে দুলতে সুরু করে দিল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করতে লাগল মঞ্জু। ওর মাথার ভেতর যেন নিঃশেষে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে অক্ষম একটা আগুনের শিখা তার নাগালের বাইরে পুঞ্জীভূত আবর্জনার দিকে তাকিয়ে বৃথা আক্ষেপে নিজেই জ্বলে পুড়ে খাক্ হতে লাগল।

একটা ময়লা পিতলের ধারতোলা থালার ওপর মোটা কাপে দু'কাপ চা আর দুটো লম্বা এস বিস্কিট নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানের ছোকরা চাকরটা। থালাটাশুদ্ধ ওদের সামনে মাটির উপর নামিয়ে রেখে চলে গেল সোজা টেবিলটার কাছে। বুকপকেট থেকে বের করে গোটা দু-তিন টাকা রাখল টেবিলের উপর। ধারের পকেট থেকে দু'প্যাকেট চারমিনার বের করে চাপা দিল টাকাটা। তারপর টেবিলের মাঝখানে রাখা নতুন গোল্ডফ্লেকের টিনটা তুলে নিয়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে। যেন বাঁধা কাজ করে গেল সে।

চেয়ারের হাতল দুটোয় দু হাতের চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল মঞ্জু— এবার আমি উঠবো।

হাতের শেষ-হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নীল বললো— চা-টা খেয়ে নি। তারপর চলুন। আমাকেও ইনজেকসনটা আনতে আপনাদের ওদিকেই যেতে হবে। একটা কাপ তুলে নিয়ে মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করল সে—আপনি?

—ইচ্ছে করছে না।

—তবে থাক। উঠে দাঁড়িয়ে দু-তিন ঢোকে চা-টা খেয়ে নিল নীল। সে ভেবেছিল ছট্টুকে দেখতে যাবার কথা মঞ্জু নিজেই বলবে। কিন্তু তার দিক থেকে কোন আগ্রহ প্রকাশ পেলো না দেখে আশ্চর্য বোধ করল নীল। তবু বললো—যাবার আগে ছেলেটাকে এক চুপি দেখে যেতে হবে। বাড়ীর সবগুলো লোক ভারী আনাড়ী। চলুন আপনিও। টেবিল থেকে টাকা আর প্রেসক্রিপসনটা তুলে নিতে যাচ্ছিল সে মঞ্জুর স্পষ্ট 'না' জবাবে স্তম্ভিত হয়ে তাকালো তার দিকে।

—ছট্টুকে আপনি চেনেন, ভালোবাসেন হয়তো, সে আপনার কেউ হয়। নইলে এই ঘাসপাতা সেদ্ধ আর আকাঁড়া চালের ভাত খাওয়া, রক্তের বদলে শরীরে জল জমে হাত-পা মুখ ফুলে ওঠা ছেলে এই শহরের কথা

বাদ দিন, এই আপনাদের পাড়ারই ঘরে ঘরে কত রয়েছে। আজ ছট্টু যাচ্ছে, কাল আর একজন যাবে। যে নামের লেবেল এঁটেই যাক আপনি যেমন জানেন ছট্টুর মৃত্যু না খেতে পাওয়ার। ওরাও যে নামের লেবেল এঁটেই যাক কারণ সেই না খেতে পাওয়াই।

শুধু ছট্টুর কথা ভেবে কি হবে? তাকে একচুপি দেখে এলে কি পরিচয় মিলবে হৃদয়ের? তারই বা কি এগুবে তাতে? বাঁচবে? বলুন। তবে এই যে গিয়ে বসবো আর সে উঠে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আমিও উঠবো না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় অদ্ভুত একটা হাসির সঙ্গে বললো—তবে হাঁ, ছট্টুকে যে করেই হোক আর ক'টা দিন আপনাদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত। সামনেই আসছে রাষ্ট্রীয় শিশু উৎসবের দিন। অন্তত যাবার আগে গুটিকয় শিশুর উজ্জ্বল মুখ, সুন্দর স্বাস্থ্য, রঙ্গিন পোষাক দেখে যাক সে। শুনে যাক শিশুরাই যে জাতীর ভবিষ্যৎ সেই বাণী। তবু কিছু সান্ত্বনা নিয়ে যেতে পারবে।

মঞ্জুর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে কতটুকু সময় দাঁড়িয়ে রইল নীল। তার পর টাকা প্রেসক্রিপসন তুলে পকেটে ভরলো। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই-এর বাক্স নিল হাতে। বাতি নিবিয়ে দরজায় লাগালো তালা। রাস্তায় বেরিয়ে এসে শুধুমাত্র যে ভাবে হাঁটে, তার চাইতে সামান্য বেশী পা চালিয়ে গিয়ে মঞ্জুর সঙ্গ ধরে পাশাপাশি চলতে লাগল নীরবে।

নীলের দিকে তাকিয়ে কিছুটা লজ্জিত আর অপ্রতিভ কণ্ঠে মঞ্জু বললো—আমি এক এক সময় এতো বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠি যে, জানেন, বাড়ীর লোক দেখে হাসে।

—কেন?

—বাঃ, কি অর্থ হয় এই উত্তেজনার? কি করতে পারি আমি? কিছুই তো নয়। তবে এই বৃথা উত্তেজনায় লাভ কি?

—অনেক। উত্তেজনা জিনিষটা অন্তরের উত্তাপের বাইরের প্রকাশ। ভেতরে আগুন না থাকলে কি উত্তাপের সৃষ্টি হয়?

আবার একটা রাত মঞ্জুর উপর দিয়ে গেল যে, সে ঘুমোতে পারলো না। সকালবেলা উঠেই এক ড্রাম বাসি ঠাণ্ডা জলে স্নান করল। তার পর তৈরী হলো ছট্টুকে দেখতে যাবার জন্য। হাঁ এই সাতসকালেই যেতে হবে তাকে। কাল পাগলাটে ক্ষেপে বেরিয়ে এসেছিল। আর বাসার দরজায় এসে ওর খেয়াল হয়েছিল সত্যি ও ছট্টুকে না দেখেই চলে এসেছে। এটা কি'করে যে সম্ভব হলো ও নিজেই বুঝে উঠতে পারলো না। কিন্তু আজ এক্ষুণি ওকে যেতে হবে।

বিস্মিত হলো মৌরী—আজ পিকনিক? কই আগে বলিসনি তো?

হাঁ এই বলা থাক—পিকনিক। কে ছট্টু, কি অসুখ, কবে গিয়েছিল সে সেখানে, অত কথা বলার সময় নেই মঞ্জুর।

অমিতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘুমভাঙ্গা চোখে হাই তুলছিল, বন-ভাত আছে, রাতে ফিরবে? আচ্ছা। মঞ্জু সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছিল, অমিতার ডাকে ফিরল। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা সেই যে একদিন সন্ধ্যের সময় মাতাল অবস্থায় আমাদের বাড়ী এসেছিলেন, সেই বাড়ীওলা ভদ্রলোকের নামই তো রজত, তাই না?

মাতাল শব্দটা কানে আঘাত করল মঞ্জুর। ভুরুতে সামান্য টোল ফেলে জিজ্ঞাসা করল, হাঁ। কিন্তু কেন?

—কাল সন্ধ্যের সময় তার লোক তোমার নামে একটা মস্ত নেমন্তন্নের কার্ড আর একটা চিঠি নিয়ে এসেছিল। তোমার সই চাই। তুমি বাড়ী নেই। আমিই সই করে রেখে দিয়েছি।

—এসে দেখবো।

স্নানকরা ঠাণ্ডা শরীরে ভোরের হাওয়ায় খালি বাসে টানা পথটা পার হতে আরাম লাগতো, আরাম লাগতো রিক্সার পথটা পার হতো যদি মনটা এ আরমটা উপভোগ করার মতো অবস্থায় থাকতো। কিন্তু শরীরের আরাম মন গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বাইরের জিনিষ বাইরের বস্তুই থেকে যায়। মঞ্জু কিছুই বোধ করল না।

নীলদের বাড়ীর কাছে এসে কান্নার শব্দ কানে আসতেই কান খাড়া করল সে।

আশ-পাশের বাড়ীর কেউ দাঁতন করতে করতে, কেউ কথা বলাবলি করতে করতে ছট্টুদের বাড়ীটার দিকেই তাকাচ্ছে। একটা শ্রান্ত গোঙ্গানো কান্না থেমে থেমে কেঁদে চলেছে। যেন অনেক কেঁদেছে। কাল সমস্ত রাত কেঁদেছে। আর পারছে না। শরীরের শক্তি ফুরিয়ে গেছে। অশ্রান্ত ভাবে মাথা কুটে চলছে ভেতরটা।

দরজা যখন খোলা রয়েছে তখন ভেতরে কেউ আছে নিশ্চয়ই। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অপরাধী পায় ভেতরে ঢুকল মঞ্জু। দাঁড়ালো সিঁড়িটার সামনে। এই বারান্দার সিঁড়িটার উপরই ছট্টু সেদিন কঞ্চি হাতে বসে ছিল। ও জানে না ছট্টু তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ একটা জল আইসক্রিম খেয়ে যেতে পেরেছে কি না। কিন্তু সে জন্য তার দুঃখ নেই। মঞ্জুর দুঃখ একটা ঘোড়া পেলে সে কি করতো সে কথাটা তার শোনা হলো না। বসে রাজকন্যার গল্প শোনাবার মতো অবসর বা আনন্দ কোনটাই নিশ্চয়ই ছট্টুর মার ছিল না। রাজকন্যার সন্ধ্যানে ঘোড়া ছোটাবার স্বপ্নও নিশ্চয়ই ছট্টুর মনে গড়ে ওঠেনি। সে একটা ঘোড়ার সন্ধান তবে করেছিল কি কিনে আনবার জন্য?

দু'হাতের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে চৌকির ওপর শুয়েছিল নীল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নিঃশব্দেই চেয়ারে বসেছিল মঞ্জু। কিন্তু মানুষের নিঃশব্দ চলা-বসারও বোধ হয় শব্দ আছে—মুখ তুলল নীল। উসকো চুল দু'হাতে পেছন দিকে ঠেলে উঠে বসে একটু সময় চৌকির উপরই বসে রইল সে। তারপর নেমে এসে বসল চেয়ারে। বললো—আপনি আজ একবার যে আসবেনই এ আমি জানতাম। এমন কি এই সকালেই তাও। আপনার অপেক্ষাই করছিলাম, এ-ও বলতে পারেন। নইলে এতক্ষণে বেরিয়ে পড়তাম আমি। আঙ্গুল দিয়ে ঘরের দেয়াল আর মেঝে দেখিয়ে বললো— দেখছেন না, দেয়াল ভিজে, মেঝে ভিজে, মানুষগুলোর চোখ-মুখ ভিজে—এই ভিজে স্যাঁত-সেঁতে আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছি আমি।

আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টির জল মাটির ভেতর যা ঢুকেছিল, তাদের রোদের টানে তা এখন উপর দিকে উঠে আসছে। দেয়াল মেঝে, এমনকি ছাদের চত্বর পর্যন্ত ঘেমে উঠেছে। আর একটু রোদ চড়লে টপটপ করে জল গড়াতে থাকবে দেয়ালের গা বেয়ে, ঠিক গাল বেয়ে চোখের জল গড়াবার মতো—উঠে দাঁড়ালো নীল চেয়ার থেকে। চলুন বেরিয়ে পড়ি। চৌকির নীচ থেকে পা দিয়ে চটিটা টেনে বের করে এনে তার ভেতর পা ঢুকালো। আধময়লা পাঞ্জাবীর হাতটা গুটোলো। টেবিলের উপর থেকে তালাটা হাতে নিয়ে বললো, চলুন।

জয়ার মা'র মুখের অপ্রসন্ন দৃষ্টি হয়তো আরো ক'টা দিন মঞ্জুকে তাদের বাড়ী যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারতো কিন্তু আর পারলো না। ছট্টু জয়ার দশ বছরের ভাইটির ডাকের জোর অনেক বেশী বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। এখান থেকে বেরিয়ে সে ওখানেই যাবে, এটা মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল। চলতে চলতে বললো—ছট্টু আমাকে আমার আর এক ছোট্ট বন্ধুর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে— সেখানে যাবার কথাই ভাবছিলাম। আরো আগেই সেখানে আমার যাওয়া উচিত ছিল।

—ছোট্ট বন্ধু? কে?

—আর একদিন বলবো।

—এখন নয় কেন?

—এখন পর্যন্ত আমি নিজেই জানিনে, নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি তাদের কথাটা ঠিক কি।

—বেশ। চলুন কোথাও একটু চা খেয়ে নি আগে। তারপর আপনি আপনার পথে, আমি আমার—

কাঁচা রাস্তা পার হয়ে ওরা এসে পড়ল বড় রাস্তায়। দু'পাশের দোকান-ঘরগুলোর নীচে রাস্তার উপরই সকাল-সন্ধ্যায় জমে এখানে চাল ডাল তরকারী থেকে আরম্ভ করে জামা কাপড় ডালা কুলোর বাজার। তখন সবে কিছু কিছু লোকজন জিনিষ পত্তর আসতে শুরু করেছে। কেউ চালের বস্তা নামিয়ে ময়লা চাদর বিছিয়ে ঝর ঝর করে ঢালছে চাল। কেউ তরকারীর বোঝা নামিয়ে কপালের ঘাম মুচছে। কেউ কেউ বিকিকিনি শুরু করে দিয়েছে। চায়ের দোকান জমে উঠেছে। দোকানের ছোকরা চাকরটা তরতর করে কালো নেকড়া দিয়ে টেবিল মুচছে। তাস দেওয়ার মতো অমলেটের প্লেট দিয়ে যাচ্ছে সবার সামনে। রেডিওটাতে ভজন শেষ হয়ে শুরু হয়েছে গান্ধীচর্চা—

'জনসাধারণের করের টাকার একটা পয়সাও রাষ্ট্রের প্রধানরা বিলাসে ব্যসনে অপব্যয় করিতে পারিবে না, বাপুজীর এই বাণী'—কিছু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনছে। মঞ্জুর মনে হলো জয়া শুনলে এখন নিশ্চয়ই খিল খিল করে হেসে উঠে বলতো— মানুষ এমন বোকা না তাই আমার এতো হাসি পায়।

—রাম রাম বাবুজী!

দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

নীলের দিকে তাকিয়ে লোকটি বললো—আমি আপনাকে চেনে লেকিন আপনি হামাকে চেনে না। হামি ঐ বাগানবাড়ীর দাঁড়োয়ান আছে বাবুজী।

—ওঃ।

—হাঁ। বলে মস্ত মাথাঝাঁকুনি দিল সে। বললো, স্কুলঘর বানাতে চেয়েছিলেন যেটাকে উস ঘর।

—বুঝেছি। তা আমাকে কিছু বলবে? থেমেছিল নীল। হাঁটতে শুরু করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো সে-ও-হাঁ জী! মালিক বোলেছে আপনাকে একবার মেহেরবানি কোরে দেখা কোরতে। কোবে সময় হোবে বলে দিলে মালিক আপনার সঙ্গে বাত করবেন।

একটু ভেবে নিয়ে বললো, আচ্ছা আমি পরে জানাবো তোমায় সে কথা।

কিন্তু কথা হয়ে গেলেও সে চলে গেল না। সঙ্গে যেতে যেতে বললো—মালিকক্কা সাথ একঠো বোঝাপড়া কোরে লেন বাবুজী! স্কুল বহুৎ আচ্ছা কাজ আছে। মালিককে হামিও বোলেছে ও বাড়ী তো নয়—ওতো বিলকুল জঞ্জাল। দিয়ে দিন ভালো কাজ হোবে।

এমনি সময় আকাশরং একটা মস্ত গাড়ী ওদের পাশ কেটে বেরিয়ে গেল। গাড়ীটা দেখেই সেটাকে হাতের ইসারায় থামতে চেষ্টা করল নীল। কিন্তু ড্রাইভারের দৃষ্টি সে ইসারা দেখল না।

—আপনাকে নিয়ে যেতে গাড়ী পাঠিয়েছেন বুঝি আপনার সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক?

—হাঁ। একটু এখানে দাঁড়াতে হবে। দু'পা পেছিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়ালো নীল। দারোয়ানকে বিদায় দিল সে গিয়ে জানিয়ে আসবে বলে। মঞ্জুকে বললো, গাড়ীটা এক্ষুণি ফিরে যাবে এই রাস্তায়।

আপনাকে যখন অন্য জায়গায় যেতেই হবে তখন আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাই আমার বন্ধুর কাছেই। ভাদ্র শেষ হয়ে এলো। আশ্বিনে পূজো। সহরে পূজো সংখ্যার মরশুম শুরু হয়ে গেছে। নামী সংখ্যাগুলোর সব ক'টায় নাম যায় এই তার বাসনা। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমিও। লেখা মানেই কিছু টাকা।

গাড়ীটাকে ফিরে আসতে দেখে নীল এবার দূর থেকেই হাত তুলে থামলো। ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে নেমে এসে দাঁড়ালো সেলাম দিয়ে। জানালো বাবুর জরুরী তাগিদের কথা। নীলের মুখে সম্মতির লক্ষণ দেখে দিল দরজা খুলে। মঞ্জুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল নীল আগে উঠবার জন্য। মঞ্জু উঠে বসলে উঠে বসল সে-ও। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললো—পথ বলে দেবেন।

মঞ্জু রাস্তার নাম বলে কতটুকু সময় বাইরের অপসৃয়মান গাছপালার দিকে তাকিয়ে থেকে ভেতর দিকে চোখ ফেরালো— আচ্ছা, স্কুল করা সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ কি কমে গেছে?

—কেন?

—কই আপনি তো ঐ বাড়ীর মালিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না?

বিনে পয়সায় বিলিয়ে দেবার জন্য বা দান করবার জন্য তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন না, এটা আপনি ধরে নিতে পারেন। দারোয়ানের শুভবুদ্ধির ছোঁয়া তার মালিকের গায় লেগেছে, এ আপনি মনেও করবেন না। বুদ্ধির জগতে একমাত্র স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া আর কোন বুদ্ধির সঙ্গে এঁদের পরিচয় নেই। হয়তো তিনি দামটা কিছু কমানোর প্রস্তাব করবেন। কিন্তু দশ টাকা বিশ টাকা আর হাজার টাকা যাদের কাছে সমান অঙ্ক তাদের এই ডাকের প্রতি কি আগ্রহ থাকতে পারে? হাতের শেষ-হয়ে-আসা সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো—যা আমার আয়ত্তের বাইরে, যা নয় বা হবার নয়, সে বিষয়ে আমার আগ্রহ আর আকর্ষণ যতই থাক আমি যে কি আশ্চর্য্য রকম চুপ করে থাকতে পারি, আপনার কাছে সে পরীক্ষা আমি আরো দেবো।

কিছু বোঝার কিছু না বোঝার দৃষ্টিতে মঞ্জু নীলের দিকে তাকালো।

—ঠিক বুঝলেন না? ঠিক সময় ঠিকটা বুঝিয়ে দেবো।

পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়ীটা যে বাড়ীর কাছে দাঁড় করিয়ে মঞ্জু নেমে দাঁড়ালো সেটা কার বাড়ী—মঞ্জুদেরই না তার সেই ছোট্ট বন্ধুর, নীল জানে না। জিজ্ঞাসাও করল না। মঞ্জু নমস্কার জানালে সে বললো—আপনার যাওয়া-আসার পথে সেই পার্কটা তো অবশ্যই পড়ে?

—হাঁ।

—আপনার সেই গাছটার ছায়ায় এসে যদি প্রুফ দেখার কাজটা সারবার জন্য আমি কখনো বসি আর ফেরবার পথে আপনার সে দিকে চোখ পড়ে যায়— দেখা হয়ে যেতে পারে তো?

—পারে।

—পথটা পার হবার সময় একটু নজর রাখবেন—বলে নমস্কার জানিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সে গাড়ী চালাতে।

॥ ২০ ॥

গাড়ীতে উঠে বসে গাড়ীর নরম গদীর ছোঁয়া পেয়ে দুশ্চিন্তায় উৎকণ্ঠায় আর রাত জাগায় শ্রান্ত শরীর মন নীলের প্রথম যা চেয়েছিল তা হলো, হাত পা ছেড়ে একেবারে গা ঢেলে চোখ বুঁজে বসে থাকতে। কিন্তু মঞ্জুর সঙ্গে পরিচয়টা তার এতই নতুন যে, মঞ্জুর উপস্থিতিতে তেমন ঢিলে অলস বসা কিছুতেই চলে না—আর চোখ বন্ধ করা তো নয়ই। তাই এতক্ষণ তাকে হাত-পা গুছিয়ে গাছিয়ে নিতান্ত ভদ্রলোকের মতোই বসে থাকতে হয়েছে। এবার মঞ্জুকে নামিয়ে দিয়ে পা দুটোকে টান আর শরীরটাকে কোণাকুণি করে দিয়ে গদীর উপর দেহভার রাখল নীল। পার্ক সার্কাস থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোড — অনেকটা সময় এই আরাম আর নৈঃশব্দ্য চোখ বুজে ভোগ করতে পারবে সে। তারপর রইল আপন বক্তব্য বলার অক্ষম চেষ্টায়—ভদ্রলোকের ভাষা খোঁজা দেখা। রইল চিন্তার ভঙ্গিতে চুলের ভেতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে তার সময় নষ্ট সহ্য করা। রইল পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে শুনতে শান্ত ধৈর্য্যে কলম তুলে নেওয়া।

কিন্তু গাড়ীটা বাঁক নিয়ে বেরিয়ে যাবার এবং তার চোখ বুজবার আগে দৃষ্টিটা নীলের একবার স্বাভাবিক ভাবেই মঞ্জুর ওপর গিয়ে পড়েছিল। তার মনে হলো, মঞ্জু যেন হাত তুলে গাড়ীটাকে থামার ইঙ্গিত করতে গিয়েও কি ভেবে আবার হাতটা নামিয়ে নিল। ড্রাইভারকে গাড়ীটা ব্যাক করতে বলে ফের উঠে ভব্য হয়ে বসল নীল।

কিন্তু তার হাত তোলা যে নীলের চোখে পড়েছে মঞ্জু তা বোঝেনি। গাড়ীটার পিছু হটাও সে খেয়াল করেনি। হঠাৎ মোড় ঘুরে গাড়ীটা এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে পড়তে সে আশ্চর্য্য হয়ে তাকাল নীলের দিকে। জিজ্ঞাসা করল —কি?

—আপনি কিছু বলবেন আমাকে? জানালা দিয়ে মুখ বের করে জিজ্ঞাসা করল নীল।

—কি বলবো? কেন? না তো।

—গাড়ীটাকে থামতে বলতে যাচ্ছিলেন না আপনি?

—ওঃ। এতক্ষণ মঞ্জু ধরতে পারলো নীল তার হাত তোলা দেখেছে আর তা দেখেই গাড়ী ফিরিয়েছে। বললো, তা অবশ্যি যাচ্ছিলাম, কিন্তু না—আপনার জন্য ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। আপনার দেরী করিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

—কি মুসকিল, কথাটা কি, তাই বলুন না। এটা আমার চাকরি নয়, অফিসের হাজিরাও আমি দিচ্ছিনে। দেরী হতে পারে। ইচ্ছে না করলে না যেতে পারি—দরজা খুলে নেমে আসতে যাচ্ছিল নীল।

তাকে নামতে বাধা দিয়ে মঞ্জু বললো—আপনি নামবেন না। আমি যেখানে যাবো সেখানে আসিনি। একেবারে যাচ্ছেতাই— নিজের উপর বিরক্তি প্রকাশ করল মঞ্জু, যাবো বন্ধুর বাড়ী, পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে নেমেছি নিজেদের বাড়ীর।

—এই? যাক্ তবু ভালো যে একেবারে অপরের বাড়ীর দরজায় নয়। তা আপনি ফের বন্ধুর বাড়ীই যাবেন তো?

—হ্যাঁ, তাই যাবো। কিন্তু আমি ট্রামে যাবো?

—কেন, ট্রামে যাবেন কেন?

—খামকা আপনার সময় নষ্ট করার দরকার কি। আপনি চলে যান। আমি ট্রামে যাচ্ছি। গাড়ীতে আমি চলাফেরা করিনে—ওটা আমার অভ্যাসও নেই।

—আর আমার আবার এটা এমন অভ্যেস যে, গাড়ী ছাড়া ট্রামে বাসে নিজে তো চাপতে পারিইনে—অপরকে চাপতে দেখলেও ভয়ানক খারাপ বোধ হয়। গাড়ীর দরজা খুলে ধরল সে—আসুন।

এবার মঞ্জু উঠে এলো। এতো দ্বিধা-টিধার ধার মঞ্জু ধারেও না। ভুলে এসেছে, গাড়ীটা থামাতো, দরজা খুলে উঠে বসত। আর কিছু নয়, সে শুধু ভাবছিল তার জন্য যদি নীলের কোন সংকোচের কারণ ঘটে, সেটা বড় লজ্জার হবে।

মঞ্জু গাড়ীতে উঠে বসলে নীল ড্রাইভারকে কোথায় যেতে হবে বলবার জন্য জিজ্ঞাসা করল মঞ্জুকে, আপনার বন্ধুর বাড়ী বৌবাজার? সেখানে গাড়ী যেতে বলব কি? কারণ আপনি গাড়ীতে উঠে প্রথম ওখানকার নামই করেছিলেন।

—হাঁ বৌবাজার, সারপেণ্টাইন লেন। তারপর এবার আর মঞ্জু পথ বলে বলে নিয়ে যাবার অপেক্ষা রাখল না। কোথায়, কোন গলিতে যেতে হবে সেটা প্রথমেই বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিল ড্রাইভারকে।

গাড়ী পার্কসার্কাস পার হয়ে সার্কুলার রোডে পড়ে বৌবাজারের সারপেণ্টাইন লেনের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। নীলের তিন দিন তিন রাতের খাড়া মেরুদণ্ডটা তার নিজের গরজে এমনভাবে গিয়ে গদীর ওপর আশ্রয় নিল যে, নীল যেন মেরুদণ্ডের হাড়টার প্রতি মমতা করেই আর তাকে খাড়া করে বসল না। একটু হেলে বসেই মঞ্জুর দিকে তাকালো সে। ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে বললো— আমি বুঝতে পারছি আপনার গাড়ীতে ওঠার অস্বাচ্ছন্দ্যবোধটা কোথায়। অপরের গাড়ী— আপনার জন্য এখান-ওখান করে— আমার না কোন সংকোচের কারণ ঘটে। প্রথমতঃ এখানে সে প্রশ্নই আসছে না। যেখানে আসে এঁদের কাছে আমি সেখানেও তা বড় বোধ করিনে।

—কারণ?

— কারণ আমাদের কাছে এই দুটো বোধ বড় কাজ করে না— যেমন কাজ করে না বাড়ীর মেয়েদের চাকর বাকর ঝিয়েদের কাছে লজ্জা সংকোচ বোধের অনুভূতিটা। আর তারই জবাবে আমিও আমার এই দুই অনুভবের দরজা এঁদের ব্যাপারে সেঁটে রাখি।

নিজের মনের কোন অবস্থা অস্পষ্ট ভাবের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ যদি অপরের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, তবে মানুষের মুখে যে ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয়, মঞ্জুর মুখে সেই উজ্জ্বলতা দেখা দিল। কিন্তু কাল থেকে মনটা ওর কথা বলার দিকে পেছন ফিরে ছিল বলে উৎসাহের প্রাবল্যে সে অনেক কথা বলে ফেলল না। শুধু একটা চাউনি মঞ্জুর গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এলো নীলের তিন চার দিনের তেলহীন রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল থেকে তার ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে, মুখ থেকে তার আধময়লা পাঞ্জাবীর উপর, পাঞ্জাবীর উপর থেকে কালো চোখ তার নীলের ধুতির কালো পাড়ের প্রান্তর বেয়ে নীলের দুপায়ের দুরকম চটির উপর থেমে ফের ঘুরে গিয়ে স্থির হলো তার মুখের উপর। আর এই চোখের নামা এবং ওঠার ভেতর নীলের চুলে হাত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতিটা যে মঞ্জুকে একটু ঝাঁকি দিয়ে না গেল তা নয়। কিন্তু জাহাজ নিয়ে দোলাখাওয়া সমুদ্রের বুকে তলিয়ে যাওয়া ডিঙ্গির মতো এ সব অনুভূতিও ওর বুকে তলিয়ে যায় দু-চার দোলায় দুলেই।

— কি?

—কিচ্ছু না।

—আমার পোষাক দেখছেন তো? দু জোড়া চটির দুপায়ের দুটো ছিঁড়ে গিয়ে আস্ত দুটোয় এমন আশ্চর্য জোড়া মিলে গেল যে, বর্তমানের দুর্ভাবনাটা এড়াতে পেরে বেঁচে গেলাম।

—আপনার তাই মনে হয়—আমি আপনার পোষাক দেখছি?

তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে নীল বললে—হাঁ? মানুষকে বোঝার ব্যাপারে পোষাকের সাহায্য নিতেই হয়। ওটা বাদ দিয়ে মনুষ্যচরিত্র অনুশীলন চলে না। পোষাক একটা বড় সাংঘাতিক জিনিষ। সে অবস্থা বলে, রুচি বলে, স্বভাব বলে, চরিত্র বলে,—এক কথায় মানুষের গোটা পরিচয়টা বলে।

—তাই? আমার পোষাক আমার কথা কিছু বলে?

— বলে না? এত বেশী বলে যে তত আবার সবার বলে না।

—সত্যি! আচ্ছা, যদি, আপনি গিয়ে কখন সেই গাছতলায় প্রুফ দেখতে বসেন, এবং পথ চলতে গিয়ে আমার সে দিকে চোখে পড়ে যায়— আমি গিয়ে বসি, সেদিন শুনব সে কি বলে এবং ঠিক বলে কি না।

— সে ঠিকই বলে, আমি ঠিক বুঝি কি না সেটাই হলো কথা।

সময়টা সকাল। কলকাতার শহর তখনও ডাল-ভাত নাকে-মুখে গুঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েনি। পথে নিঃশ্বাসের চাপ কম। রোদটা নরম। এক কানের পাশ ঘেঁসে চলতে চলতে কানটা গালটা তাতিয়ে তুলছে। মাথার ওপর চড়ে বসা দু'কানের নাগাল এখনও সে পায়নি। তারই এক টুকরো নরম রোদ এসে মঞ্জুর কোলের ওপর ছোট্ট গোলাকৃতি হয়ে পড়ে আছে কোলে রাখা জিনিসের মতো।

গাড়ী জোড়া গির্জা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। লাল স্কার্ট আর লাল ব্লাউজ পরে একদল কনভেন্ট গার্ল লাইন দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় ফুটপাত অতিক্রম করে গেল পিঠে পিকনিক ব্যাগ ঝুলিয়ে। রেডক্রশের যে লম্বাটে ধরনের গাড়ীটা ওদের সঙ্গে চলতে চলতে ওদের ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল, সেটার সঙ্গে ফের দেখা হলো ক্যাম্বেল হাসপাতালের কাছে। দরজাটা খোলা। ভেতরে স্ট্রেচারে রোগী। এখনও লোক এসে পৌঁছয়নি নিয়ে যাবার। ষ্টেথোসকোপ গলায় ঝুলিয়ে কয়েকজন ডাক্তার ছাত্র-ছাত্রী কথা বলতে বলতে টপটপ করে আউটডোরের সিঁড়ি ভেঙ্গে ঢুকে গেল ভেতরে। ছোট পিসির সংবাদ মতো সুদর্শন এখন তিস্তার সৌন্দর্য দেখছে হাজার ফিট ওপরে বসে। কে জানে সে রমণীয়তা কেমন। মঞ্জু দেখেনি। মমতা মেডিকেল কলেজের চওড়া বারান্দা দিয়ে হাইহিলের ঠক ঠক শব্দ তুলে হাতে ডেটল-ভিজানো থার্মোমিটার নিয়ে ঘরে ঘরে রোগীদের তাপ পরীক্ষা করছে— না তো, মনে পড়ে গেল মঞ্জুর—আজ নিশ্চয়ই সে ডিউটিতে যায় নি। সে আছে ছট্টুর মার কাছে। হয় তো ছট্টুর মাকে একটু চা খাওয়াবার চেষ্টা করছে নয় তো সরবৎ।... প্রাচীর কাছে এসে ছক কাটা ঘরে আঁকা নায়ক-নায়িকার বিরাট মুখ দু'টোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পথ বলে দেবার জন্য ঝুঁকে বসল মঞ্জু ড্রাইভারের দিকে। আর তার নির্দেশ মতো ড্রাইভার তার গাড়ীর শরীর বাঁচাতে বাঁচাতে সারপেণ্টাইনের সার্থকনামা গলির ভেতর, তরকারী বোঝাই লরী আর ঠেলাগুলোই এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল সাবধানে। এমন পচা গলিতে যে সে তার গাড়ী ঢোকায় নি সেই অবজ্ঞা ভাব ক্রমশই ফুটে উঠতে লাগল ড্রাইভারের মুখে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডান হাতটা দরজার উপর ফেলে রেখে বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ঘুরাতে লাগল সে। তারপর ডাষ্টবিন উপচে পড়া স্তূপীকৃত পচা আবর্জনা আর আলুর বাজারের আলু-পচা গন্ধে ঠাসা একটা গলির ব্যারাক-বাড়ীর দরজায় মঞ্জুর কথামতো গাড়ী থামিয়ে হাই তুলল।

গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভারেরই নেমে গিয়ে দরজা খুলে দেবার রেওয়াজ বলে সেই অপেক্ষাই করছিল নীল, কিন্তু সে যে তা না করে স্টিয়ারিংএ হাত রেখে একটা অলস হাই তুলে বসে রইল—তার মুখের অবজ্ঞা ভাবটা জ্যামিতিক অসুবিধার দরুণ নীল দেখতে না পেলেও এটা সে লক্ষ্য করল। ড্রাইভারের নজরে যদি নীলের এই লক্ষ্য করাটা পড়ত তবে সেই দৃষ্টিটাই তাকে মুহূর্তে এনে দাঁড় করিয়ে দিত দরজার কাছে, কিন্তু সেও জ্যামিতিক কারণেই নীলের দেখাটা দেখতে পেল না। দুটো হাত ওপর দিকে তুলে ফের হাই তুলল সে।

দরজার হাতলটা ধরে উপরে নীচে চাপ দিচ্ছিল মঞ্জু, কিন্তু ঠিক কায়দা মতো চাপ না পড়ায় দরজা খুলছিল না।

চট করে নেমে ঘুরে গিয়ে দরজা খুলে ধরে নীল বললো, একবার দেখে নিন বাড়ী ঠিক আছে কি না।

তা আছে। নেমে নমস্কার জানিয়ে মঞ্জু বললো, আচ্ছা।

—আচ্ছা। প্রতি-নমস্কার জানালো নীল।

শাড়ীর কোঁচাটা একটু তুলে ধরে গলির ছিটানো নোংরা বাঁচিয়ে জয়াদের বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল মঞ্জু।

—সরি স্যার।

কানের পাশ থেকে আচমকা দুঃখ প্রকাশ শুনে সে দিকে মুখ ফেরালো নীল। দেখল বিষম অপ্রস্তুত মুখ করে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার। কিছুই বলল না সে তাকে। দরজা তার হাতে ধরা, খোলাই ছিল, গাড়ীতে উঠে বসল সে।

গাড়ী চালাতে চালাতে ফের অনুতপ্ত গলায় দুঃখ প্রকাশ করল ড্রাইভার—ভেরি সরি স্যার! রমেশ আই, এ ফেল। সে নিয়মিত কাগজ পড়ে! গাড়ী চালাতে চালাতে নীলের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করে মন্তব্য প্রকাশ করে। সমীহ করে সে নীলকে। বললো আমার দরজা খুলে না দেওয়াটা অন্যায় হয়ে গেছে স্যার।

নীল একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই-এর কাঠিটা ঝেঁকে নিবিয়ে বাইরে ফেলতে ফেলতে বললো— অন্যায়টা আর কোথাও নয় রমেশ, সর্বত্র তুমি যা করো এখানে যে তুমি তা করলে না এই না করার পেছনে যে মনোভাবটা তোমার কাজ করেছে, অন্যায়টা শুধুমাত্র সেখানে। ঘাড় হেঁট করল রমেশ।

জয়ার সেই দশ বছরের ভাই জয় আজও বসেছিল রকে। তার গভীর উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টি পড়ে ছিল গলির প্রবেশপথের উপর। প্রতীক্ষা করছিল সে তার দিদির। যে রাত্রে তার দিদি বাড়ী না ফেরে সে রাত বিনিদ্র কাটিয়ে ভোর না হতে এসে সে এমনি বিমর্ষ মুখে বসে থাকে রকের উপর। আজও তাই বসেছিল। বসে বসে ভাবছিল

সে কত-কিছু—অনেক কিছু। সেই ভাবনার ভেতর সব চাইতে বড় হয়ে যা ছিল তা হলো কেবল একটা পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা। যেখানে গাড়ী আসবে না। দিদিকে নিয়ে যাবে না। মা আর ঐ শয়তান লোকটা দিদিকে ধরে ঘুমের ওষুধ খাওয়াবে না। একে কি ঘুম বলে। একটা কান্না যে ঠেলে উঠে আসতে চায় জয়ের দিদির ঘুম দেখলে। সে কত সময় হাত নাকের কাছে নিয়ে দেখে নিঃশ্বাস বইছে কি না। তারপর দিদির সেই জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলা, ঘুরানো ফেরানো একই আবৃত্তি—

"ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বসে বৃথা ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ রচনা"—

যা ওর শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন দিদির মুখের এই আওড়ে চলা একঘেয়ে আবৃত্তি, একঘেয়ে কান্নার মতো ক্লান্তিকর লাগে তার, যদি দিদিকে নিয়ে সে কোথাও উধাও হয়ে যেতে পারতো—

মার হাতের মার খাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় যেমন তার হাতের নাগালের বাইরে ছুটে পালানো, অদৃষ্টের হাতের মার খাওয়া থেকে আত্মরক্ষারও এই একই উপায় মনে আসে তার। অদৃষ্টের হাতের নাগালের বাইরে পালানো যে এক বস্তু নয়— মা তাড়া করেন দরজা পর্যন্ত, অদৃষ্ট তাড়া করে পৃথিবীর শেষ মাটিটুকু পর্যন্ত— এখনও জয়ের তা জানা হয় নি। সে জানে না পালিয়ে পালালে সে সঙ্গে সঙ্গে যায়। তার টুঁটি চেপে ধরতে হয় যেখানে দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ করে সেইখানে দাঁড়িয়ে।

মঞ্জুদের গাড়ীটা দেখে শুকনো মুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল জয়। মনে করেছিল দিদি এসেছে। কিন্তু যে মঞ্জুকে দেখে তার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার কথা, যে মঞ্জুর কথা এ ক'দিনে সে যে কত বার ভেবেছে যার সীমাসংখ্যা নেই— সেই মঞ্জুকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল তার মুখ। আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সে মঞ্জুর নামার দিকে।

কারণ আছে। এই গাড়ী থেকে নামা ব্যাপারটাই আস্থা হারিয়েছে তার। এটা আর তার দৃষ্টিতে সহজ নেই, স্বাভাবিক নেই, সুন্দর নেই। তার দিদি যে দিন থেকে এই গাড়ীতে উঠতে আর গাড়ী থেকে নামতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই তার চেহারা বদলে গেছে, পোষাক বদলে গেছে, হাবভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। সংকেত মিলছে মাথার গোলমালের। যে দিদিকে ছাড়া ওর মুহূর্ত কাটতে চাইত না তাকে দেখলে এখন ওর ভয় করে। তাই আজ মঞ্জুকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে তার চোখে আর সে দিনের মতো আলো দেখা দিল না— কোন স্বাগত আহ্বানের সাড়াও মিলল না। পথের ময়লা বাঁচিয়ে পা ফেলতে গিয়ে দৃষ্টিটা এতক্ষণ মঞ্জুর নিবদ্ধ ছিল রাস্তার দিকে। সে দাঁড়িয়ে থাকা জয়কে দেখতে পেলো রকের কাছে এসে। এক পা সিঁড়িতে রেখেই জিজ্ঞাসা করল সে— দিদি কেমন আছে?

—ভালো।

জয়ের এই একান্ত নিরুৎসাহ ভাব খেয়াল করল না মঞ্জু। খুশীর সঙ্গে বললো—ভালো? বা, বেশ ভালো খবর। রকের উপর উঠে জয়ের একটা হাত সস্নেহে হাতে তুলে নিল সে। তারপর যেন ওর সঙ্গে ভেতরে যেতে যেতে শুনবে এমনি ভাবে ভেতরের দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, তোমার নাম কি?

কিন্তু জয় নড়ল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পা দুটো শক্ত করে রেখে জবাব দিল—জয়।

ওর পায়ের টানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জুও—জয়? ভারি সুন্দর নাম তো? তোমাকে ডেকে ডেকেই তো সব সংগ্রাম জয় করে ফেলতে পারবো আমি—পারবো না? সকৌতুকে তাকালো মঞ্জু জয়ের মুখের দিকে। তার মুখের শুকনো মলিন ভাব লক্ষ্য করে তাকে খুশী করবার জন্য উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল— ও, তুমি তো জান না—এই ছোট্টটি ছিলে তো। ইংরেজরা এতোবড় যুদ্ধটা জিতে গেল তো শুধু চায়ের কাপ থেকে— প্লেনের গা পর্যন্ত কেবল ভিক্টোরিয়া ভি লিখে লিখেই না। বুঝলে না? আচ্ছা সে সব গল্প তোমায় আমি শোনাবো। এসো— ধরা হাত আকর্ষণ করে মঞ্জু বললো— জয় তোমার নামের ভেতর। সব কিছুতে তুমি জয়ী হবে জয়— মস্ত বড় হবে তুমি—বিদ্যায় বুদ্ধিতে মনুষ্যত্বে। শেষের দিকে ওর ভারী হয়ে ওঠা গলা আর চোখের কোণে এসে যাওয়া জল ওকেই বিস্মিত করে দিল। এই অহেতুক ভাবাবেগে একা থাকলে হয়তো জোরেই হেসে উঠত সে। এখন মনে মনে হাসল মঞ্জু।

কিন্তু মঞ্জু খেয়াল করল না যে, সে বুঝুক আর নাই বুঝুক মনের কোন ভাবান্তর বা ভাবাবেগই অহেতুক নয়। ছট্টুর যে মৃত্যুবেদনা তার ভেতর চাপা আছে— যে ব্যথা সে এখনও প্রকাশ করে উঠতে পারেনি— সেই ব্যথাই প্রকাশের পথ খুঁজছে তার।

মঞ্জুর কথার সামান্য অংশই বুঝল জয়। কিন্তু কথা না বুঝলেও সুর তার অন্তর স্পর্শ করলো। তার সংশয়িত মন; তার শঙ্কিত সন্ধিৎসু দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এলো। তার নামের যে এতো শক্তি এমন কথা জয় আর কোন দিন কারু মুখে শোনেনি। একটা উত্তেজনার পাতলা স্রোত তির-তির করে বয়ে গেল ওর ছোট্ট শরীরটার ভেতর দিয়ে। যে হাত মঞ্জু ওর ধরে ছিল, সে হাত এবার আঁকড়ে ধরল দুই হাতে। ভেতরে যাবার জন্য পা-ও বাড়ালো— কিন্তু হঠাৎ থেমে পড়ল সে। মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে শুকনো ঢোক গিলল সে— দিদি এখনও ফেরেনি।

আর ঝাপটা খেল না মঞ্জু। একটু সময় চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল—কখন ফিরবে বলতে পারো? দেরী হবে?

এবার জয়ের জবাবে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলো। না, না, দেরী হবে কেন। আরো শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরল সে মঞ্জুর হাত— দিদি এক্ষুণি আসবে। চল না তুমি ঘরে গিয়ে বসবে। আমি তো দিদির জন্যই দাঁড়িয়ে। সে জানে জয়ার ফেরবার কোন নিশ্চয়তা নেই; এক্ষুণি ফিরতে পারে আবার দু ঘণ্টা পার হয়েও যেতে পারে—মিথ্যা কথাই বলল সে।

—শিশুকণ্ঠের এই ব্যাকুলতা আঘাত করল মঞ্জুকে। এই খোঁজ নিতে আসার সার্থকতা কি, যদি বাইরে থেকেই চলে যাবে সে? এই যে কচি হাত দুটো সাঁড়াশীর মতো ওকে আঁকড়ে ধরে আছে, সে কি নির্ভর— আর নির্ভয় চাচ্ছে না—আশ্রয় খুঁজছে না? মন স্থির করে ফেলল মঞ্জু— শুধু যে এই বাড়ীর ভেতর ঢুকবে সে তা নয়, এই বাড়ীর ঘটনার ভেতর ঢুকবে সে। যেটুকু বোঝার বুঝেছে, বাকীটুকুও বুঝতে হবে তাকে। জয়ার মা তার অসন্তুষ্টি দিয়ে বিরক্তি দিয়ে সাধ্য নেই আর ওকে তাড়াতে পারেন।

এই এতক্ষণ তো সদর দরজায় দাঁড়িয়েই কাটল—বাকী অপেক্ষাটাও সে তো জয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এখানে দাঁড়িয়েই করতে পারে—একটু ভাবলো মঞ্জু। কিন্তু জয়ার ফেরবার সময়ের যে কোন স্থিরতা নেই, এটা সে বুঝেছিল। অপেক্ষাটা দীর্ঘ সময়ও করতে হতে পারে। গলির এই একগলা পচা আবর্জনার দুর্গন্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না ওর। জয়া না ফেরা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করল সে। পা টিপে টিপে শেওলা ঘসে মেজে ধুয়ে রাখা এক চিলতে ভিজে বাঁধানো উঠোন পার হয়ে মঞ্জু উঠে এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। বারান্দায় দাঁড়িয়েই তাকালে এদিক ওদিক—আর এদিক ওদিক বলতে তো বারান্দার উপরের জলে জলে ভিজে তলা-খসে যাওয়া কপাটের একটা স্নানের খুপরী আর ওর সম্মুখ বরাবর ঘরটা। রান্নাঘরের বালাই নেই। উঠোনের ওপর যে নিকানো উনোনটা রয়েছে সেটাই বারান্দায় তুলে এনে যে রান্না হয়, সেটা সে প্রথম দিনই দেখে গেছে। ঘরের ভেতর তাকালো মঞ্জু। কেউ নেই। জল ঢালার শব্দ আসছে স্নানের ঘর থেকে। নিশ্চয়ই স্নান করছেন জয়ার মা। ভারি স্বস্তিবোধ করল মঞ্জু। ভালো হলো। বেশ হলো। ওকে দেখেই যদি ওর চলে যেতেই হয়, এমন কোন ব্যবহার করে বসতেন —ওকে হয়তো চলে যেতে হতো। দরজার বাইরের সাক্ষাৎ বাইর থেকেই বিদায় দিয়ে দেওয়া সহজ—ভদ্রতার মুখোশ বজায় রেখেও সেটা করা চলে। কিন্তু বসা লোককে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আরো কিছুটা বেশী এগুবার দরকার হয়—ততক্ষণেও যদি জয়া না এসে পড়ে তখন দেখা যাবে।

ঘরে ঢুকে জয়ার বিছানাটার উপরই বসতে যাচ্ছিল মঞ্জু। কিন্তু নতুন বিছানা ঢাকনা দিয়ে সেটা এতই পরিপাটি করে ঢাকা যে সেটাতে না বসে কোথায় বসা যায়, সেটাই দেখবার জন্য ঘরের ভেতর একবার চোখ বুলিয়ে আনল সে। নেই কিছুই। এই চৌকিটা আছে। একটা টুলের উপর কোণ ঘেঁসে রাখা রয়েছে কিছু বিছানাপত্র। একটা টেবিলের উপর বই খাতা আর তার পাশে একটা লোহার চেয়ার, এইতো। কিন্তু যা আছে তা হলো শেওলা-ধোয়া উঠান থেকে ঘর পর্যন্ত পরিচ্ছন্নতা—একটা অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা। মঞ্জুর মনে হলো, সৌন্দর্য্যবোধের নয় সব কিছুর ভেতর দিয়ে যেন প্রকাশ পাচ্ছে বিস্ময়কর একটা সংসার-বুভুক্ষা। কাজের ভেতর দিয়ে যেন কেউ সংসারটাকে কেবল ঘ্রাণে আর স্পর্শে আস্বাদ করছে। টেবিলের পাশের লোহার চেয়ারটা নিয়ে বসল মঞ্জু।

আজ তার চা খাওয়া হয়নি। ছট্টুকে দেখতে যাবার জন্য সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল চায়ের অপেক্ষা না করেই। তারপর এতক্ষণ তার চায়ের কথা মনেও ছিল না, অবসরও মেলে নি। অন্য কোথাও হলে এখন তার এক কাপ চায়ের কথাই মনে আসত। কিন্তু জয়ার ফেরা নিয়ে, তার মানসিক অবস্থা নিয়ে, জয়ার মার ব্যবহার নিয়ে যতই সময় যেতে লাগল ততই ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করতে লাগল সে। একটা পরিবারের ব্যক্তিগত ঘটনা জানবার অন্যায় অভব্য কৌতূহল মেটাবার জন্য এখানে সে বসে নেই। আজ সে তার এই উনিশ-কুড়ি বছরের জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরে, জ্ঞানের বাইরে, চিন্তার বাইরের এক অজ্ঞাত জগতের মধ্যে মাথা গলিয়ে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করবার সাহস করতে যাচ্ছে— যে ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে কোলে রেখেছিল সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে—আবার বসে পড়ল তক্ষুণি।

স্নানের ঘরে স্নান করবার, জল ঢালবার, কাপড় কাচাকাচি করবার শব্দ বেশ কতক্ষণ চলে, তারপর বন্ধ হলো। এক হাতে কাচা-কাপড় আর এক হাতে জল-ভরা বালতি নিয়ে স্নানের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন জয়ার মা। বালতিটা সশব্দে বারান্দায় নামিয়ে রেখে হাতের কাচা-কাপড় মেলে দিতে লাগলেন দড়িতে — সার্ট, শাড়ী, ধুতি। ধুতিটা ছেঁড়া ময়লা। এটা পরেই বোধ হয় এতক্ষণ তিনি সকালের পাট সেরেছেন। এখনকারখান ধোয়া ফর্সা। সার্ট আর ধুতিটা যেমন তেমন মেলে শাড়ীটার জমি পাড় আঁচল পাট করে দিতে লাগলেন তিনি সযত্নে। হয় ইস্তিরির কাজটা সহজ করে রাখছেন নয়তো উপায় নেই ইস্তিরি করার, তাই যথাসম্ভব কোঁচকানো ভাবটা ভিজে অবস্থায়ই দিচ্ছেন ঠিক করে। তারপর কাঁধের গামছা হাতে নিয়ে, দু'হাতে সেটা টান করে ধরে মাথাটা পেছন দিকে ফেলে সশব্দে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে এসে ঢুকলেন ঘরে। মঞ্জু তাকে বারান্দায় বের হতে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, তিনিও ঘরে ঢুকে মঞ্জুকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন থমকে।

পলকে তার মুখের চেহারা দেখে ফেলল মঞ্জু। গৃহস্থের সময়-অসময় সুবিধে-অসুবিধে হিসাব না করে এসে উপস্থিত হয়ে উত্যক্ত করলে মানুষের মুখের চেহারা যেমনটা হয়ে ওঠে, তার মুখের চেহারা ঠিক তেমনি ভাব ধারণ করেছে। ভিজে চুল বাইরে রেখে সাদা কাপড়ের আঁচলটা এ-কাঁধ থেকে ও -কাঁধ পর্য্যন্ত তরুণী মেয়েদের মতো টেনে দিতে দিতে বিরস কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—জয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার?

—হয়েছে তো।

— সে বলেনি জয়া বাড়ী নেই?

প্রথম ধাক্কায় একটু থতমতই খেল মঞ্জু—একটা ঢোকও গিলতে হলো তাকে— হাঁ, সে কথা সে বলেছে—আমি অপেক্ষা করছিলাম— তা সে বলল কি না জয়া নাকি এক্ষুণি ফিরবে—তাই।

ছেলের উদ্দেশ্যে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বাইরের দিকে নিক্ষেপ করলেন মা। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—হতচ্ছাড়া ছেলে। তারপর মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব মিষ্টি গলায় বললেন— না মা, জয়ার জন্য বসে থেকে কিছু লাভ হবে না। আমি জানি তো তাকে; একবার বেরুলে তার ফেরার সময়ের একেবারেই ঠিক থাকে না— বসে থেকে কেন তুমি মা অযথা সময় নষ্ট করবে। হাতের গামছা দরজার উপর রেখে দিয়ে দরজার কাছেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন ওকে এগিয়ে দেবার জন্য।

মঞ্জুর লক্ষ্য এড়ালো না তার দুদিনের ব্যবহারের তারতম্য। সেদিন ছিল জয়ার মার হাবভাব ধীর-গম্ভীর। অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হয়ে মঞ্জু যা দেখে ফেলল গাম্ভীর্য্য দিয়ে তার মর্যাদা রাখা—এই ছিল তার সেদিনের চলন। আর আজকের ব্যবহারটা হলো তাড়ান। জয়া এক্ষুণি না আসতে পারে—আবার এসে পড়তেও তো পারে। কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল মঞ্জু।

কিন্তু সে চুপ করে থেকে সময় নষ্ট করতে পারে, জয়ার মা তা পারেন না। তুমি তো কলেজে পড়ো?

মঞ্জু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে না জানাতে তিনি তাড়াহুড়ো গলায় বলে উঠলেন—হাঁ আমি জানি তো। তবেই দেখ তোমার কলেজও রয়েছে। আচ্ছা, আমি জয়াকে বলব তুমি এসেছিলে। যাবে খন সে তোমার ওখানে আর এক দিন। আমারও সকালের দিকে এতো কাজ, বসবার উপায় নেই—একটু হাসবার মতো মুখ করলেন তিনি—আচ্ছা এসো—সামাজিক মানুষ যখন সমাজে বাস করেও মানুষ বর্জন করে চলার নীতি গ্রহণ করে, তখন বুঝতে হবে বাধ্য হয়েই তাকে তা করতে হচ্ছে—তার জীবনযাত্রা সমাজ-সমর্থিত পথে চলছে না বলেই তাকে তা করতে হচ্ছে—তার গোপনীয়তার প্রয়োজনের কাছে সামাজিক সৌজন্য গৌণ হয়ে যায় বলেই তাকে

তা করতে হচ্ছে— যে ব্যবহারের পেছনে প্রয়োজন আছে যুক্তি আছে সে ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত। আর ব্যবহারটা যদি যুক্তিসঙ্গতই হলো তবে আর কি —ঠিক করে নিল মঞ্জু নিজেকে মোলায়েম গলায় বললো, আজ অনার্স ক্লাশ নেই কিনা—তাই, এই কলেজে যাবো ঠিক করে জয়ার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলাম।

মুখের চেহারা একেবারেই ভিন্ন আকার ধারণ করল জয়ার মার। এবার যে তিনি ওকে কি বলতেন আর না বলতেন, ওকে চলে যেতে হতোই কি না—মঞ্জু জোর করে কিছু বলতে পারে না, যদি না তক্ষুণি বাইরে জুতোর শব্দ শুনে তিনি তড়িৎপায়ে দরজার দিকে ধাওয়া করতেন। টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এলো মঞ্জুও। সে বুঝতে পারল না বুকটা কেন তার এমন ধড়াস ধড়াস শব্দে ওঠানামা করতে লাগল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়া জয়ার মার পাশ দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সে। দেখলো, সামনে জয়া। পেছনে বিবর্ণ মুখে জয়। জয়ার শাড়ীর আঁচল খসে পড়েছে শরীর থেকে। বসে পড়েছে সে ভিজে রকের উপর— টেনে না তুললে এক্ষুণি সে যেন লুটিয়ে গড়িয়ে পড়বে মাটিতে। ত্যক্ততায় মুখ বিকৃত করে তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে একটা লোক। সেদিন যে বেঁটেখাটো লোকটাকে মঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল জয়াদের বারান্দায়, এ সে নয়। ঢোলা পাজামা আর গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী পরা এই লম্বা লোকটা অন্য কেউ। লোকটার বয়স বছর ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না। চুলগুলো ঠিক পাহাড়ের গায়ে কাটা খাঁজের মতো উঠে গেছে কানের পাশ থেকে উপর দিকে। দুই গালে গভীর ব্রণের দাগ।

লোকটা জয়াকে টেনে প্রায় আলগা করে তুলে নিয়ে এসে বিছানার উপর ফেলল না তো যেন নিষ্ঠুর হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর পাঞ্জাবীর গা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ঘুরে দাঁড়ালো ওদের দিকে। তার নির্বাক মুখ থেকে এ অবধি একটা শব্দও বেরোয়নি এখনও বেরোলো না। লোকটার বাঁকা ভেতরে ঢোকানো ঠোঁটদুটো দেখলেও এই কথাই মনে হয় যে সে দুটোকে সে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া খোলে না।

মঞ্জু জানে না এ রকমটাই রোজকার ঘটনা কি না। স্তম্ভিত মঞ্জু স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল দলা পাকানো জয়ার দিকে তাকিয়ে। ঘটনা মুখোমুখী দাঁড়াবার আগ মুহূর্তে বুকের ভেতর যে অসহ্য দাপাদাপিটা শুরু হয়েছিল তার থেমে গেছে সেটা। স্থির হয়ে এসেছে হাত পা শরীর দিয়ে যে খরখরে কাঁপুনিটা আরম্ভ হয়েছিল, জয়াকে উঠোনে পড়ে থাকতে দেখে সেটাও। আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা ওর এবার জয়ার উপর থেকে ঘুরে স্থির বিদ্যুৎরেখার মতো এসে পড়ল লোকটার মুখের উপর।

॥ ২১ ॥

ভিজে রকের উপর জয়া যখন বসে পড়েছিল এবং লোকটা তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছিল, মঞ্জু তখন ভেবেছিল আর এক মুহূর্তও জয়ার মা ওকে এখানে বরদাস্ত করবেন না। কোন পর্দা না রেখে সরাসরি বলে বসবেন ওকে চলে যাবার কথা। হয়তো অধৈর্য্য কণ্ঠে বলে উঠবেন, জয়া অসুস্থ হয়ে ফিরেছে। ওকে নিয়ে আমরা বড্ড ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তুমি এখন যাও বা এমনি চরম কথা কিছু। আর বলেই নিরস্ত হবেন না, চলে যেতে ওকে বাধ্য করবেন তিনি। তার দিক থেকে এই অবস্থায় করবার ছিলও একমাত্র এই। কিন্তু কেন যে তিনি তা করলেন না, উপস্থিত বুদ্ধির অভাবেই কি না, মঞ্জু বুঝে উঠতে পারলো না। লোকটা জয়াকে এনে বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই তিনি দ্রুত, উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, তুমি—তুমি ওকে টেনে হিঁচড়ে এ ভাবে নিয়ে এলে কেন এ্যাঁ? আর ওই বা অমন করছে কেন? করছ কি তুমি ওকে এ্যাঁ? মঞ্জুর মনে হলো তাঁর যেন ওর উপস্থিত সম্বন্ধেও হুঁস নেই কোন।

দুটো ছোট ছোট লাল চোখ মেলে লোকটা জয়ার মার উত্তেজিত জিজ্ঞাসার জবাব দিল অতি ঠাণ্ডা গলায়। বললো— সে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই করে নাই। সে আগেও বলেছে এখনও বলছে জয়ার মাথা খারাপটা সত্য নয়, এটা জয়ার নষ্টামি। নইলে সব সময় ভালো থেকে সকাল বেলা কি না তার পাগলামো শুরু হলো আর রোখ চেপে বসল বাড়ী না ফেরবার। আর তারপর তার সেই কি হৈ হুজ্জোতে কাণ্ড। বাধ্য হয়েই ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে ঘুমের ওষুধ এনে খাওয়াতে হয়েছে তার, জয়াকে নিয়ে আসবার জন্যই। কিন্তু তাতে ফল হয়েছে আরো উল্টো। জয়া শরীরের ভার একেবারে মরা মানুষের মতো ছেড়ে দিয়েছে। একলা একটা মেয়েমানুষ তার মতো জোয়ানের ঘাম ঝরিয়ে দিয়েছে শুধু গাড়ীতে তুলতে আর নামাতে। লোকটা নয় যেন স্থির শরীর শুধু তার

ঠোঁট দুটো যন্ত্রের মতো নড়ে কথাগুলো বলে গেল। আর বললোও বহুক্ষণ ধরে বহু অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয়েছে জয়ার তাই। নইলে জয়ার মার কথার জবাব দেওয়া না দেওয়া নিয়ে তার কিছু এসে-যায় না। সে জবাব দিত না অর্থাৎ দেওয়াটা প্রয়োজনের ভেতর গণ্য করতো না। অপ্রয়োজনে কথা বলা তার স্বভাবে নেই।

লোকটার কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা তাড়ির গন্ধে ভরে উঠেছিল। দু পা পিছু সরল মঞ্জু।

কথা শেষ করে একবার তার দৃষ্টিটা লোকটা ঘুরিয়ে আনল মঞ্জুর উপর। বোধ হয় নতুন কোন সন্ধান মিলল কিনা সেটাই বুঝে নিতে। কিন্তু মঞ্জুর দৃষ্টির সঙ্গে চোখ মিলতেই চোখ ফিরিয়ে নিল সে। তারপর বুকপকেট থেকে টেনে বার করল একটা পাঁচ টাকার নোট, আর তলার পকেট থেকে বের করল একটা ছোট্ট কাগজের পুরিয়া। পুরিয়াটা বোধ হয় ঘুমের ওষুধের। সে দুটো বড়ি না খাওয়ালে জয়া কিছুতেই ঘুমোবে না। নীরবেই লোকটা তার হাতের নোট আর ঘুমের ওষুধ জয়ার মার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিল বা সবেমাত্র বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল—আশ্চর্য্য! যে জয়া বিছানার উপর দু'হাতে দেহের ভার রেখে কেবল ঝিম খাচ্ছিল আর নড়বড়ে মাথাটা ঘাড়ের উপর খাড়া রাখতে চেষ্টা করছিল, সেই জয়া দুটো লাল বোজা চোখ টেনে মেলে ঘাড়টান করল ক্রুদ্ধ মোরগের মতো। ছোঁ মেরে তুলে নেবার মতো করে হাত বাড়ালো লোকটার বুকপকেটের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে জড়িত জিবে বলে উঠল—পাঁচ টাকা কেন—কেন মাত্র পাঁচ টাকা দেবে তুমি?

মুহূর্তের মধ্যে লোকটার মুখের রেখায় দেখা দিল ভীষণতা। এক হাতে বুকপকেট চেপে অপর হাতে জয়ার মাথায় ধাক্কা মেরে চাপা গলায় দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল সে—বজ্জাত।

পড়ে গেল জয়া চৌকির উপর। কিন্তু যেমন পড়ল তেমনি উঠল। লোকটার বুকপকেটের দিকে ফের হাত আর গলা বাড়িয়ে চিল-চেঁচানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল— কেন, পাঁচ টাকা দেবে কেন তুমি আমায়, বদমাস চোর শয়তান—

এবার লোকটা তার বুকের কাছে এগিয়ে আসা জয়ার সরু লিকলিকে গলাটা মোটা মোটা আঙুলের থাবার ভেতর ধরে যে জোরের সঙ্গে ঠেলে দিল সে ঠেলা সামলাতে পারল না জয়া। বিছানার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে কাতর শব্দ করে উঠল সে।

আয়োজন চলছিল অনেকক্ষণ ধরেই। এবার ব্লাষ্ট ফার্ণেসে যেন আগুন ধরে উঠল। দু কান আর দু গাল দিয়ে মঞ্জুর ছুটে বেরুতে লাগল যেন আগুনের হল্কা। জয়ার কণ্ঠে আর্তস্বরের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হাতের সশব্দ চড় এসে পড়ল লোকটার গালে এবং এই আচম্বিত আক্রমণে বিমূঢ় লোকটা ঘুরে দাঁড়াবার আগেই মঞ্জুর হাতের দ্বিতীয় চড় এসে পড়ল তার গালে—বেরোও বদমাস—এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও এ বাড়ী থেকে।

একটা মেয়েমানুষের এই অভাবনীয় দুঃসাহস ও স্পর্দ্ধায় দিশেহারা প্রথম মুহূর্তটা কাটিয়ে উঠেই এবার ফের এগিয়ে আসা হাতটা মঞ্জুর কঠিন মুঠোয় চেপে ধরল লোকটা। মঞ্জু না হলো বিচলিত না হলো চঞ্চল। তার ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা বোধ কিছুই নয়, গনগন করে জ্বলছিল কেবল আগুন। ডান হাত চেপে ধরলে, বাঁ হাতে চড় কসে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল সে, বেরোও বলছি। নইলে তোমাকে আমি জুতো মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলে দিয়ে আসবো রাস্তার ঐ ডাষ্টবিনে।

এবার চাপা বাঁকানো ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে সামনের দাঁত দুটো বেরিয়ে এলো লোকটার। বেড়ালের মতো সাদা চোখের চার পাশের লাল শিরাগুলো টান হয়ে চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধক করে। মঞ্জুর হাত ছেড়ে দিয়ে এবার সে দু'হাত বাড়ালো মঞ্জুর দিকে।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন জয়ার মা। কিন্তু ততক্ষণে লাফিয়ে পড়েছে জয় লোকটার উপর। দীর্ঘ ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত করে যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ে তার শিকারের নাগাল পেয়েছে। এখন সে একে দাঁতে কেটে নখে চিরে ফেড়ে, একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

তারপর শরীর থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য ছেলেতে মায়েতে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলতে লাগল, ছেলের প্রতি মা যে ভর্ৎসনা আর চিৎকার বর্ষণ করতে লাগলেন, লোকটা তার শরীরের উপর দাঁতে নখে কামড়ে ধরা জয়কে বলিষ্ঠ হাতের ঝটকায় ফেলে দেবার বিফল প্রয়াস করতে করতে বিকৃত মুখে, কুৎসিত ভাষায় যে অশ্রাব্য গালি উচ্চারণ করতে লাগল—কোমরে হাত রেখে, দাঁতে দাঁত চেপে শুধু নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মঞ্জু তাকে দেখতে লাগল। নীল, আহা নীল এই তো সবে মাত্র তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল সে। যদি সে উপস্থিত থাকত এখন! একটু আগের ঘটনা মানুষ যদি একটু আগেও জানতে পারতো।

লোকটা যখন তার সমস্ত বলপ্রয়োগে মরণকামড় কামড়ে ধরা জয়কে তার শরীর থেকে—আলগা করে আনতে সমর্থ হলো জয় ততক্ষণে তাকে ছিঁড়ে কামড়ে আঁচড়ে খাবলে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। ক্ষিপ্ত উন্মত্ত লোকটা দুহাতে তুলে ধরে জয়কে দেয়াল লক্ষ্য করেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। দু'হাতে আকড়ে ধরলেন মা ছেলেকে।

কিন্তু মার বাহুর বেষ্টন টেনে খুলে ফেলতে পলক সময়ও লাগল না জয়ের। মার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেল সে জানালার কাছে। জানালার দুই শিকের ভেতর উদ্‌ভ্রান্ত ঘর্মাক্ত মুখটা চেপে ধরে সংজ্ঞালোপ পাওয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো এক সুরে পরিত্রাহি কণ্ঠে সে কেবল চিৎকার করতে লাগল—পুলিশ, পুলিশ, পুলিশ—যদি পুলিশ এসে হাজির হতো যদি লোকটাকে পুলিশ তার চোখের উপর দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেত তবু বোধ হয় জয়ের এই জ্বরগ্রস্ত চিৎকার থামতো না।

ছেলেকে আজ তিনি একেবারে শেষ করে ফেলবেন এমনি একটা কথা বলতে বলতে হন্তদন্তভাবে গিয়ে ছেলের মুখ চেপে ধরলেন মা। গলির মুখে এগিয়ে আসা কয়েকটা পাড়ার ছেলের কৌতূহলী মুখের ওপর ধড়াস করে দিলেন জানালাটা বন্ধ করে।

পাড়ার ছেলেদের পরিচিত বাড়ী। কোন শ্রদ্ধাই হয়তো ছিল না তাদের বাড়ীটার প্রতি বা কাউকেই তারা শ্রদ্ধা করতে জানে না। হৈ হৈ করে উচ্ছৃঙ্খলভাবে হেসে উঠল তারা। কয়েকটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ যেন তীরের মতো বন্ধ জানালা ফুঁড়ে এসে পড়ল ঘরের ভিতর।

চাই ভাদুরি আম, কলা পেঁপে—জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল ফেরিওলা। বোধ হয় জয়ার মা এখানে জানালা দিয়ে কখনো কখনো সওদা করে থাকেন। ভালো জিনিষ ছিল মা—

নিজেকে সংবরণ করল লোকটা—প্রত্যাখ্যাত প্রবৃত্তিটাকে দমন করল নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে। শুধু ডান গালটা তার কেঁপে উঠতে লাগল বার বার। লাঞ্ছিত দেহের দিকে, ছিন্নভিন্ন জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে স্থির করল সে। তারপর ধূর্ত শঠ দৃষ্টিটা পলকমাত্র মঞ্জুর উপর ফেলে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্য পা বাড়ালো বাইরের দিকে।

—দাঁড়াও। আদেশের সুরে ডাক দিল মঞ্জু।

থেমে পড়ল লোকটা। ডাক্তারী বই-এর আঁকা স্ফীত লাল রোগগ্রস্ত চোখের মতো চোখের পাতায় ভাঁজ ফেলে তাকালো মঞ্জুর দিকে।

দু'পা এগিয়ে এলো মঞ্জু। প্রতিটি কথার ওপর গলার ওজন চাপিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল—শুনে যাও। এ যাওয়াই তোমার শেষ যাওয়া। এ বাড়ীতে আর কোন দিনও তুমি মাথা গলাতে চেষ্টা করবে না। যদি করো তবে তার জন্য সংঘাতিক শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমায়। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি থানায়—

থানার কথায় যেন লোকটার চোখে তাচ্ছিল্য খেলে গেল। থানা পুলিশের কথাটা আগ্রাহ্য করে সে তাকালো জয়ার মার দিকে। যেন থানা পুলিশ নয় তিনি কি বলেন এটাই জানতে চায় সে।

ধমকে উঠল মঞ্জু। আমি বলছি এ বাড়ীতে তুমি আর ঢুকবে না—ঢুকবে না—ঢুকবে না। বাস যাও—আঙ্গুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল সে।

এতক্ষণ মঞ্জুকে যে জয়ার মা কিছু বলেন নাই, তা খাতির করে সৌজন্য প্রকাশের জন্যও নয়। ফুরসুত মেলেনি তাঁর। এবার তিনি গলা দিয়ে শ্লেষ্মাজড়িত তিন চার রকমের আওয়াজ বের করে ওর প্রতি যে বাক্য বর্ষণ করতে লাগলেন তার একটাও শ্রুতিমধুর নয়, ভদ্রজনোচিতও নয় এবং অবশেষে তিনিই মঞ্জুকে দরজা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, এটা তার বাড়ী। কে আসবে না আসবে সেটা তিনি দেখবেন। সে এখন যেতে পারে।

আকুল ভাবে মার মুখে হাত চাপা দিচ্ছিল জয়—তাকে কাছে টেনে নিয়ে এলো মঞ্জু। বললো—আমি যাবার জন্য আসিনি। যদি তা আসতাম তবে অনেক আগেই চলে যেতাম।

—তবে—তবে কি জন্য এসেছ তুমি? কপালের গলার নীল শিরাগুলো ফুলে উঠল জয়ার মার। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি মঞ্জুর মুখের দিকে। গলা তাঁর ভেঙে গিয়েছিল বহুক্ষণ পূর্বেই। ধরা গলায় ফের ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি—তবে কি জন্য এসেছ তুমি? কেন এসেছ তুমি?

—কি চুপ করে রইলে কেন ? কই এত দিন তো তোমায় দেখিনি। যখন দিনের পর দিন উপোসে মরছিলাম কই দেখিনি তো তখন তোমাকে ? এখন—এখন সবে তো মাত্র ক'টা দিন ধরে পেট ভরে খাওয়ার মুখ দেখছিলাম—কেঁদে উঠলেন তিনি আকুল ভাবে, কোথা থেকে তুমি এসে হাজির হলে কি ভাবে খাচ্ছি সেটা দেখতে—এ্যাঁ ?

—আমি শুধু দেখতে আসিনি।

—আর কি করতে এসেছ ? এ লোকটার বাড়ী ঢোকা বন্ধ করতে ? এ লোকটা যে মন্দ— তাকে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া যে যায় না এটা বলতে ? এ কথা এতটুকু মেয়ে তুমি বোঝ— তোমাদের আর দশ জনের মারা বোঝেন আর আমরা মা মেয়ে একথা বুঝিনে ?

—মা, আচ্ছা আমি কাল সকালে—

—না, না আসবে না তুমি, শুধু কাল নয়; মঞ্জুর গলার প্রচণ্ড ধমকে থেমে গেল লোকটা। কোন দিনও আসবে না তুমি। যদি আস তবে আমার ক্ষমতা কতটা তা তোমাকে আমি টের পাইয়ে দেবো। আমাকে তুমি একা ভেবো না।

জয়ার মা কেঁদে-কঁকিয়ে কি বলতে যেতেই তাকে থামিয়ে দিল মঞ্জু। দাঁড়ান এই লোকটাকে—আগে বের করে দিয়ে নি, তারপর আমার কথা বলব।

মঞ্জুর এই আমি একা নই কথাটায় আশ্চর্য্য কাজ দিল। বেরিয়ে গেল লোকটা। মঞ্জুর যেতে হলো না। জয় ছুটে গেল দরজা বন্ধ করতে। জয়ার মা কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বেরিয়ে এলো—খাওয়ার পথ বন্ধ করে দিতে পারো তুমি খাওয়ার উপায় না করে দিয়ে ? এখন আমি কি করবো—কি— করবো। হা ঈশ্বর ! একটা অসুস্থ মেয়ে একটা কচি ছেলেকে নিয়ে আমি কোথায় যাবো, কি খাওয়াবো।

এত বড় করুণ-হতাশ কণ্ঠস্বর কারু গলা দিয়ে বেরুতে মঞ্জু আর কোন দিন শোনেনি। বুকটা মোচড় দিয়ে ভেঙ্গেচুরে এলো যেন মঞ্জুরও। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—যতদিন পথ না করতে পারি ততদিন আমি খাওয়াবো আপনাদের। সে যেন তার যা কিছু আছে সব উজাড় করে দিতে পারে কিন্তু কি-ই বা আছে তার ! এই তো দু গাছা বালা। তাও পুরো সোনার নয়, লোহার উপর সোনা জড়ানো। ঘড়িটা তাও বৌদির। আর ব্যাগে ? পুরো একটা টাকাও হয়তো নেই। ব্যাগটা আর খুলল না। ঘড়ি-পরা হাতের বালাটা টেনে খুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল জয়ার মার দিকে।—এটার লোহা খুলে সোনাটা ওজন করিয়ে নেবেন। আনা আট-নয়ের বেশী সোনা অবিশ্যি ওতে হবে না—তা হোক; একটু থামল মঞ্জু। আট আনা সোনার দাম কত হতে পারে, তাই কি ছাই জানে সে। একটু ভাবতে চেষ্টা করল, মৌরীর বিয়ের সময় কোনাকাটা করতে গিয়ে সোনার ভরিটা যেন কত শুনেছিল—পারল না মনে করতে। আন্দাজের উপর বললো—তা গোটা ত্রিশেক টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আপাতঃ চলুক তো ক'দিন। আপনাদের ঐ গলির মাথায়ই একটা স্যাকরার দোকান রয়েছে। গেলেই দিয়ে দেবে।

মঞ্জুর বালা শুদ্ধু হাত ঠেলে সরিয়ে দিলেন জয়ার মা। কান্নাবদ্ধ-কণ্ঠে বললেন, এ সমস্ত দরদ কি আমার দেখা হয়ে যায়নি, মনে করো ? ঢের দেখা হয়ে গেছে। দু'দিনের বেশী চার দিনের ধকল সয় না, এসব পরোপকারের গায়ে। তোমার টিকির দেখাও মিলবে না, দু'দিন বাদে এ আমি জানি—খুব জানি।

একটু হাসল মঞ্জু। ইচ্ছে হলো বলে—আজকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে আমাদের কালকের অভিজ্ঞতার মিল হয় না—শুধু মেলে না নয়, প্রচণ্ড গরমিল ঘটে যায় আর অভিজ্ঞতার গৌরবের পুঁজি নিয়েও আমাদের কেবল অনভিজ্ঞের মতো উলট-পালট খেতে হয় আর মত পাল্টাতে হয়, একথা আমি আর আপনাকে নতুন কি শোনাবো ? কিন্তু কিছুই বলল না মঞ্জু। কি হবে। বলে তো বিশ্বাস আনা যাবে না তার মনে। একটু সময় চুপ করে রইল সে। তারপর বললো—আচ্ছা, দিচ্ছি আমিই ঠিক করে।

—কি ঠিক করে দেবে তুমি শুনি ? কি ছাই হবে, আজ তোমার এ হাতের বালা কাল ওহাতের বালা আর পরশু তোমার ঘড়ি বিক্রি করে খেয়ে ? ক'দিন চলবে ওতে। আমার কি এসব ছিল না কিছু। মুখে আঁচল চাপা দিলেন তিনি—এই রাক্ষুসী ক্ষুধার সঙ্গে পরিচয় নেই তোমার। কিছু পরিচয় নেই। তুমি জান না এই রাক্ষুসী দুবেলায় দাঁত বের করে—মমতা নেই নিবৃত্তি নেই। এই রাক্ষুসীর সঙ্গে যুঝবে কতটুকু শক্তি তোমার ?

'পেটের চিন্তা— নির্বোধ ঘ্যানঘেনে প্রিয়জনের অবুঝ দাবীর মতো তার একঘেয়ে—ঘ্যানঘেনে চাওয়া। তাকে শান্ত না করে, ঠাণ্ডা না করে সাধ্য কি তার দিকে থেকে মনটাকে একটুও তফাতে নিই বা মুখ ফেরাই'—এক মাঠ রোদ আর ধুলোর ঝড়ো হাওয়ায় সঙ্গে নীলের কথাগুলো যে জয়ার মার সঙ্গে এক তান তুলে উড়ে গেল মঞ্জুর কানের পাশ দিয়ে। মা !

বিস্ময়ে চোখের আঁচল সরিয়ে জয়ার মা তাকালেন মঞ্জুর মুখের দিকে। এগিয়ে এসে নত হয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মঞ্জু বললো—আজ থেকে আমাকেও আপনি আপনার মেয়ে মনে করবেন। যত ছোট্ট মাই হোক বাচ্চাকে রক্ষা করতে তার যেমন শুধু ইচ্ছার জোরেই শক্তির অকুলান হয় না, আমরও ইচ্ছার জোরেই শক্তি হয়ে উঠবে। দেখুন না আপনি। আজ থেকে আপনাদের সব ভার, সব ভাবনা আমার।

বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জয়ার মা।

আর এতক্ষণে জয়ার দিকে তাকাবার অবসর মিলল মঞ্জুর। জয়ার ঘুমের ওষুধে কাজ হয়নি। তাকে আরো দুটো বড়ি খাওয়াতে হবে। মঞ্জু ভেবেছিল, সে বিছানার উপর বসে তেমনি ঝিম খাচ্ছে। এ পর্যন্ত তার কোন সাড়াশব্দ মেলেনি। কিন্তু দেখল জয়া পা ঝুলিয়ে চৌকির উপর সোজা হয়ে বসে বিস্মিত বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। যেন ঘটনাটা বুঝতে পারছে না বা কিছুটা পারছে কিছুটা পারছে না। চোখের দুকোণ ভরে উঠেছে জলে। হয়তো তার মাকে কাঁদতে দেখে। হয়তো নয়। হয়তো জ্ঞানবুদ্ধির বোঝার চাইতেও যে বড় বোঝা—হৃদয়ানুভূতির বোঝা সেই বোঝাই তার চোখে জল নিয়ে এসেছে। মঞ্জুর চোখের সঙ্গে চোখ মিলতে সে হাসল। কিন্তু সেটা হাসি না কান্না, মঞ্জু যেন ধরে উঠতে পারলো না। কারণ তার মুখের হাসির সঙ্গে গালের উপর গড়িয়ে পড়া চোখের জলের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। কাছে গিয়ে জয়ার মাথাটা বুকের উপর টেনে এনে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল মঞ্জু। অস্ফুটস্বরে বললো—কি, ঘুম আসছে না? আচ্ছা আর দুটো বড়ি খাইয়ে দিলেই ঘুম আসবে। কিন্তু তার আগে একটা কথা আমাকে তোর দিতে হবে জয়া। কথা দিতে হবে, আমার সঙ্গে ছাড়া এই ঘরের দরজার এক পা বাইরেও তুই পা বাড়াবি নে। কারু সঙ্গে নয়, কিছুতেই নয়, কোন কারণেই নয়। আমায় কথা দিলেই দুটো ওষুধ, বাস, তারপর ঘুম। আর সন্ধ্যায় চুল বেঁধে গা ধুয়ে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে হাওয়া খাওয়া আর গরম মুড়ি খাওয়া-কেমন? কী, কথা দিলি তো আমার সঙ্গে ছাড়া কোথাও একপা বেরুবি না—জয়ার মুখটা তুলে ধরে তার সম্মতি আদায় করতে গিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাছে জেগে যায় তাই কিছুক্ষণ তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু। তারপর যেমন করে ঘুমের শিশুকে বুক থেকে সযত্নে নামিয়ে মা বিছানায় শুইয়ে দেয় ঠিক তেমনি ভাবে মঞ্জু জয়ার মাথাটা বুক থেকে নামিয়ে বালিশে রাখল। চৌকি থেকে ঝুলে থাকা পা দুটো অতি সন্তর্পণে তুলে দিল চৌকির উপর। শাড়ীটা দিল পা অবধি টেনে। ঘরের কোণের টুলের উপর তোলা বিছানা থেকে দুটো বালিশ এনে একটা চাপা দিল পিঠের দিকে আর একটা সামনে। ইসারায় জয়কে ডেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। জয়ের হাত ধরে মাথা নিচু করে চাপা গলায় বললো—আজ থেকে এ বাড়ীর কাজ তোমার আর আমার। তুমি আর আমি সব করবো—এ্যাঁ?

মঞ্জুর হাত দুহাতে মুঠো করে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল জয়। আর এই প্রথম মঞ্জু তার শিশুমুখে এমন কোন প্রকাশ দেখল যা শিশুর।

মঞ্জুকে দেখে অমিতা একরকম চেঁচামেচি করে উঠল—এ কি, তুমি মারামারি করে এলে নাকি গো?

—মারামারি? কি যে বলো! কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে রেখে মৌরীর ইজিচেয়ারটার উপর অবসন্ন ভাবে বসে পড়ল মঞ্জু।

—'কি যে বলো' কি। তোমার চুল ওলট-পালট, হাতে-মুখে ময়লা। ব্লাউজের পিঠটা গেছে ছিঁড়ে—

—যাঃ। যতদূর সম্ভব ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল মঞ্জু। পিঠটা দেখতে পেলো না। হাতটা বেঁকিয়ে নিয়ে গেল পিঠের যতটা পর্যন্ত যায়। সত্যি তো! পিঠের মাঝখান যে ছিঁড়ে গেছে অনেকটা। আয়নার কাছে উঠে গিয়ে দেখল, লম্বা ছেঁড়াটার ভেতর দিয়ে নীচের বডিজ আর খালি পিঠটা বেরিয়ে পড়েছে। এই নিয়ে স্যাকরার দোকান, রাস্তা, বাজার সব ঘুরে এলো সে। যাক গে—কারা দেখেছে মনে করে এখন লজ্জা পেয়ে লাভ কী। ফের বসে পড়ল মঞ্জু। জিজ্ঞাসা করল—খাওয়া হয়ে গেছে তোমাদের? দিদি কোথায়?

হয়েছে কী তোমার? খাওয়া হয়ে যাবে না—বেলা ক'টা বাজছে?

—ক'টা?

—দুটো।

—দুটো!

—তার বেশী ছাড়া কম নয়। তোমার না পিকনিক ছিল?

—পিকনিক কী?

তাকিয়ে রইল অমিতা মঞ্জুর দিকে।

—ওঃ, বলে হেসে উঠল মঞ্জু। না পিকনিক টিকনিক কিছু নয়। বাজে কথা বলে গিয়েছিলাম, মানে ঠিক বাজে কথা নয়, আমি গেলাম না শেষ পর্যন্ত এই আর কী। কিন্তু দিদিকে দেখছিনে যে?

—সে তোমার ওপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে গেছে। তোমাকে নাকি কবে থেকে সে তার 'ল' কলেজের প্রসপেকটাস এনে দিতে বলছে। তুমি দিচ্ছ না। তাই সে আজ খাওয়া দাওয়া সেরে দশটার সময়েই বেরিয়ে গেছে প্রসপেকটাস আনতে।

ভালো করেছে। একটু নড়াচড়া করা দরকার ওর। কিন্তু আমায় এখন খেতে না দিলে কিন্তু আমি মরে যাবো বলে রাখছি বৌদি।

ভাদ্রমাসের পচা গরমে ভাত ঘেমে পচে ওঠে, তাই অমিতা চাল কম দেয় তবু বেশী দেয় না। কি খেতে দেয় এখন সে মঞ্জুকে।

—দেখো তো কি মুশকিলে ফেললে। বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে।

একা ঘরে পাথরের ওজন নিয়ে চেপে এলো মঞ্জুর মাথায় চিন্তা। চোখ বন্ধ করা মাত্র সে গিয়ে উপস্থিত হলো জয়াদের বাড়ী। লোকটাকে বের করে দিয়ে প্রথমটায় ভারি উল্লাসবোধ করেছিল সে। যেন বড়ই সহজে সব সমাধান হয়ে গেল। বড়ই অনায়াসে ঘটনাকে সে তার নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারল। কিন্তু সেই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি তার। এই জয় উল্লাসবোধ করবার নয়। এখনও বহু সংগ্রাম তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে জানে না সে কি করবে। কি দিয়ে কি হবে। এদের অন্নবস্ত্র যোগাবে সে কি দিয়ে। তবু সে সব ভারই নিয়ে এসেছে। বিনা দ্বিধায় নিয়ে এসেছে। সে নেওয়ার ভেতর এতটুকু ফাঁক নেই। এতটুকু মিথ্যা নেই। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করে আর সে নিজের মুখে গ্রাস তুলতে পারবে না। জয়ার মার কথাই ঠিক। এ দুটো বালায় কি— ? একটা টুইশন তাকে সর্ব প্রথম যোগাড় করে নিতেই হবে ...

সুদর্শনের জন্য আনা পোলাও -এর চাল এক মুঠ পড়েছিল। সেই চাল, আলু, পটল, কুমড়ো সঙ্গে মাড়ে-ভাতে ফুটিয়ে তাতে নুন মিষ্টি মাখন আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটা দস্তুর মতো উপাদেয় খাদ্য তৈরী করে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো অমিতা। এ কি? তুমি তেমনি বসে আছো? আমি বলে তোমার খাবার একেবারে এ ঘরে নিয়ে এলাম। পড়ার টেবিলে প্লেট নামালো অমিতা।

উঠে পড়ে থালার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল মঞ্জু। ভাগ্যিস তোমার কাঁকর-মেশানো চালের কড়কড়ে ভাত আর ঠাণ্ডা মাছের ঝোল কিছু অবশিষ্ট ছিল না। স্নানের ঘরে ঢুকে ঝুপঝাপ জল ঢেলে গা মাথা না মুছে চুল না আঁচড়ে এসে বসে পড়ল টেবিলে।

—ভালো কথা। তোমাকে তো সেই কালকের রজত বাবুর নেমন্তন্ন চিঠিটা দেওয়া হয়নি। দাঁড়াও নিয়ে আসছি। চিঠি নিয়ে এসে মঞ্জুর হাতে দিল সে। চিঠিটা যদিও নেমন্তন্নের তবুও খোলা নয়—কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল অমিতা।

॥ ২২ ॥

অফিস এনভেলাপের মতো লম্বাটে ধরনের একটা এনভেলাপ। কিন্তু চেহারাটা অফিস এনভেলাপের মতো হলেও কাগজটা নয়। চিঠিটা খুলবার আগে মঞ্জুকে এনভেলাপটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু দেখতেই হলো এবং একটু সময় তাকিয়ে থাকতেও হলো। কারণ চোখ দুটোই থেমে রইল তার।

ধূসর রং-এর অতি মূল্যবান এ্যান্টিক কাগজের এনভেলাপ। কোন গুণীর হাতে আঁকা গাঢ় ধূপ রং -এর একটা লতা সাদা ফুলের রাশি নিয়ে সেই ধূসর রং-এর এনভেলাপটাকে লতিয়ে লতিয়ে জড়িয়ে রয়েছে। যেন চিঠিটার মুখ আঠা দিয়ে নয়, লতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া ওপরে লেখা ওর নামের অক্ষর দুটোর প্রথমটা যেন লতা ধরে ফুলের দিকে হাত বাড়াচ্ছে, দ্বিতীয়টা ফুলের নাগাল পেয়ে তার ভেতর মুখ রেখেছে। এমনিতেই দামী জিনিষের একটা নিজস্ব দামী চেহারা আছে—তার সঙ্গে যদি আবার ব্যক্তির রুচি আর শিল্পীর নৈপুণ্য যোগ হয় তবে যে তার কি চেহারা হয়—এনভেলাপটার দিকে তাকিয়ে যেন মঞ্জু তাই একটু দেখে নিল। তারপর যে

চামচেটা দিয়ে গরম ভাত নেড়েচেড়ে ঠাণ্ডা করে করে মুখে তুলছিল তারই ডাঁটটা দিয়ে টেনে টেনে এনভেলাপের মুখটা খুলে তার ভেতরের চার ভাঁজ করা ইংরেজী নেমন্তন্ন পত্রটা বের করল। পত্রটাও সাদা কাগজে লেখা সাদা পত্র নয়। তার গায়ও অস্পষ্ট রেখায় নির্ভুল হাতের আঁকা ছবির পর ছবি। কোথাও একটি মেয়ে তার সাপের মতো শরীরটায় একটা জোর পাক খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তার ঘাগরার ঘের ঘুরছে সারেঙ্গীবাদক তবলাবাদক আর সমঝদারদের নাক ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কোথাও একটা হাত গালে আর একটা হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে উঁচু পর্দায় তান ধরার ভঙ্গীতে উক্ত দেশী গায়িকা। কোথাও সাঁওতালী নারী-পুরুষের মিলিত গ্রাম্য নৃত্য। আর এই অস্পষ্ট ছবিগুলোর ওপর সামনে এগিয়ে আসা লেখায় লেখা রয়েছে নেমন্তন্ন-পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং প্রোগ্রাম।

মঞ্জু অমিতার হাতে চিঠিটা তুলে দিয়ে খাওয়ায় মনোযোগ দিল।

—পড়বো?

মুখের আদ্দেক পথে চামচেটা থামিয়ে একটু আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে অমিতার দিকে তাকালো মঞ্জু। তারপর চামচেটা মুখে ঢুকিয়ে বললো—ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত চিঠিগুলি বাদ দিয়ে যেও — নইলে একটু— লজ্জা করবে আমার। চিঠিটা একটু রোমান্টিক কিনা।

—তবে না হয় থাক না। চিঠিটা বাড়িয়ে ধরল অমিতা মঞ্জুর দিকে। কিন্তু সেই বাড়িয়ে ধরার চিঠিটা মঞ্জুর দিকে যতটা এগুলো তার চাইতে তার কাছেই বেশী রইল।

—থাকবে? আচ্ছা থাক। না—থাকবারই বা কি আছে। মাঝের পাতার হাতে লেখাটুকু না পড়লেই তো হলো।

কিন্তু চিঠি খুলে আনিচ্ছাসত্ত্বেও চিঠির বাঁ দিকেই সর্ব প্রথম নজর গিয়ে পড়ল অমিতার। হেসে উঠল সে।— বড় তো চিঠি।

—কেন কম হলো কিসে? দুই ভ্রূ বাঁকিয়ে তুলে মঞ্জু অমিতার দিকে তাকালো।

—'এসো' এই তো একটি কথা—ভদ্রলোক লিখেছেন দেখতে পাচ্ছি।

—আর কি লিখবেন?

—কিন্তু এটাকে তো রোমান্টিক চিঠি বলে না।

—বলে না!

মাথা ঝাঁকালো অমিতা ডাইনে বাঁয়ে—না।

চামচে প্লেটে শব্দ তুলে দূরের ভাত কাছে টেনে আনতে আনতে গম্ভীর কণ্ঠে মঞ্জু বললো—এর চাইতে রোমান্টিক চিঠি আর কি হতে পারে? এই একটিমাত্র কথা 'এসো'-কে ভেঙ্গে দশপাতার রোমান্টিক চিঠি লেখা যায়। এঁরা কি তা করতে পারেন? বয়স ব্যক্তি এবং মর্যাদা অনুযায়ী প্রকাশভঙ্গি হবে তো।

চিঠি থেকে চোখ তুলে বড় বড় করে অমিতা তাকালো মঞ্জুর দিকে। এ যে বিরাট ব্যাপার গো! লাঞ্চ পার্টি, ককটেল পার্টি—যাবে নাকি তুমি এ্যাঁ?

খাওয়া শেষ করে চামচ প্লেট টেবিলের তলায় নামিয়ে রাখল মঞ্জু। জল খেলো পুরো গ্লাস ভর্ত্তি। তারপর আঁচল দিয়ে মুখে মুছতে মুছতে চেয়ার ঠেলে উঠে একেবারে খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ল টান হয়ে চোখ বুজে। আর সে ভাবে বন্ধ চোখেই বললো, দেরী আছে। সেপ্টেম্বরের আট তারিখ আসতে বাকী আছে আরো আট নয় দিন। এই শনিবারের পরের শনিবার। ভেবে দেখা যাবে। তুমি ভাই লক্ষ্মীবৌদি, যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেও। আর অমিতা দরজা বন্ধ করে বারান্দাটুকু পার হয়ে গিয়ে ওর ঘরে ঢুকবার আগেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ল মঞ্জু।

ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে শরীর গলিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মিনি বেড়ালটা। টেবিলের তলায় নামিয়ে রাখা মঞ্জুর খালি ডিসটা শুঁকল খানিকক্ষণ নাকে, তারপর অন্ধকারপ্রায় ঘরে আয়াস করে টেবিলের উপর শোবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে পায়ের ধাক্কায় রজতের নেমন্তন্ন-চিঠিটা ফেলে দিল টেবিলের নীচে। আর বিকেল বেলা রামুর ঝাঁটার ঠেলায় সে চিঠি গিয়ে পড়ল খাটের নীচে। ধূলো পড়ে চিঠিটার উপর লেখা মঞ্জুর নামটা ঢেকে উঠতে যদিও দু চার দিন সময় লাগল—মঞ্জুর মন হতে সে চিঠির কথা মুছে গেল তক্ষুণি। সেই যে বেলা তিনটায়

বৌদির হাতের উপাদেয় জাউ ভাত খেয়ে সে ঘুম দিল। সেই ঘুম ভাঙ্গল তার পিসিমার সন্ধ্যা-আরতির কাঁসর ঘন্টা আর শঙ্খের গম্ভীর শব্দে। চোখ মেলেই প্রথমে মনে হলো এবার উঠে তৈরী হয়ে জয়াদের বাড়ী ওকে একবার যেতেই হবে—যাওয়াটা নিতান্ত দরকার। কিন্তু না চাইল শরীরটা ওর বিছানা ছেড়ে উঠতে না চাইল পা দুটো চলতে। লোকটার সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হওয়া না হওয়ার উদ্বেগ অশান্তি মনে নিয়েও মঞ্জু পড়ে রইল বিছানায়ই। পাশবালিশটা জড়িয়ে ধরে এপাশ ওপাশ করতে লাগল আর তারই ভেতর বার বার চোখ গিয়ে পড়তে লাগল ওর ল' কলেজের প্রসপেকটাস পাঠরতা ইজিচেয়ারের উপবিষ্ট মৌরীর দিকে। ওর জাগার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের প্রসপেকটসের উপর থেকে মৌরীর দৃষ্টি যে ওর উপর ঘুরে গেল এবং কপালে আর ভ্রূতে তার অসন্তোষ আর অপছন্দের ঢেউ খেলে গেল, মঞ্জুর লক্ষ্য তা এড়ালো না। অমিতার কাছে সব খবরই শুনেছে। সে—মানে যে মিথ্যেগুলো মঞ্জু বলেছে অমিতাকে। অমিতা বিশ্বাস করেছে, মৌরী করেনি। সেটাই মৌরী তার কপালের ভাঁজে, তার ভ্রূর কম্পনে বোঝাল মঞ্জুকে। বুঝল মঞ্জু। মৌরীর দিকে তাকিয়ে চোখ দুটোকে মিটমিট করতে লাগল সে। কিছু বলে মৌরীকে ঠাণ্ডা করা দরকার। কিন্তু মৌরী বলে, সত্যটা কি, আমার পক্ষে তা বাড়ী বসে বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু মিথ্যাকে মিথ্যা আমি বুঝতে পারি। আমার কাছে মিথ্যা বলবিনে মঞ্জু! আমার ভারি খারাপ লাগে যাদের ভালোবাসি তাদের মুখে মিথ্যে শুনলে।

কিন্তু সত্য বলবার উপায়টা কি? এখন যদি জয়াদের বাড়ীর ঘটনার সত্য বর্ণনা সে মৌরীর কাছে দেয় তবে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। সে কি আর বাড়ী ছেড়ে বাইরে এক পা শীগগির বেরুতে পারবে? আতঙ্কে কালো হয়ে মৌরী তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে না। পথে পেলেই লোকটা তার ওপর লাফিয়ে পড়বে এবং ওকে পথে পাওয়ার জন্যই যে গুণ্ডাটা আহার-নিদ্রা ছেড়ে ওত পেতে বসে আছে এই বিশ্বাস থেকে মৌরীকে কেউ হটাতে পারবে? এমন কি বাড়ীর খোঁজ করেও যে সে কেন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে এসে হাজির হবে না মৌরী তাও বুঝে উঠতে পারবে না। দুষ্ট লোক শয়তান লোক তো তাই করে। মিথ্যা যে তাই কত সময় উল্টো পক্ষের কথা ভেবেই বলতে হয় মৌরী তা বোঝে না। সে সব মিথ্যাকেই এক জাতে নিয়ে গিয়ে ফেলে এবং মিথ্যা মাত্রকেই একেবারে জাতিচ্যুত করতে চায়। কিন্তু মৌরী স্বীকার করুক আর নাই করুক, মানতে চাক্ আর নাই চাক মঞ্জুর বিশ্বাস সমাজ সংসার থেকে আরম্ভ করে স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রগুলোকে পর্যন্ত ভাঙ্গন ধরার হাত থেকে— ভেঙ্গে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী এবং মিথ্যার ভিত অনেক বেশী জোরালো সত্যের ভিতের চাইতে।

—হ্যাঁ তা নয় তো কি? আজকের ভালোবাসা ভালোলাগা কাল নাও থাকতে পারে। কিন্তু মিথ্যা ভালোবাসা—চিরকাল বাসা যায়।

পরের দিন সকাল বেলা ইতিহাসের মোটা মোটা গোটাকয়েক বই নিয়ে অতি মনোযোগের সঙ্গে মঞ্জু পড়তে বসলো। অপর টেবিল থেকে তাকিয়ে একটু বাঁকা হাসল মৌরী।

—হাসলি যে বড়?

—পড়তে বসেছিস দেখে।

—বাঃ পড়তে হবে না? একটা প্রথম শ্রেণীর অনার্স চাই-ই চাই যে।

—কিন্তু আমি তো তোর প্রফেসর নই, তোর পরীক্ষার খাতাও আমার কাছে আসবে না। আমার কাছে বই নিয়ে বসে লাভ কি?

বই ঠেলে রেখে ঘুরে বসল মঞ্জু মৌরীর দিকে।—দেখ দিদি, তুই কেবল সকলের ফাঁকি ধরতে পারিস আর বুঝিস তাই না? আমরা আর পারি নে? তোর দুই চোখের তলায় যে মেঘের রং দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠছে সে বুঝি ল' কলেজে ভর্তি হবার চিন্তায়? এই যে সবুর সইছে না—আমি বলেছি এনে দেবো তবু চলে গিয়েছিস প্রসপেকটাস আনতে। বই কিনেছিস পুরোনো দোকান চষে। সকাল হতেই স্নান সেরে তৈরী হয়ে বসে গিয়েছিস পড়তে কিন্তু এখনও ভর্তি হবারই সময় আসে নি—এ বুঝি পাশের চিন্তায়?

—তোর কি মনে হয়?

—ফাঁকি।

—মানে?

—মানে হলো ঐ যে বলেছিলাম, যুক্তি পেছন ফিরলেই মন তার রং তুলির ছবি আঁকার কাজ আরম্ভ করে দেবে। সে এখন তাই দিতে চাচ্ছে আর তুই তাকে বই-পত্তর নিয়ে ধমকে রাখতে চাচ্ছিস। আর মনমতো কাজ—করতে না পারায় মনের মেঘ তোর চোখের দু'কোণ জুড়ে এসে জমছে।

—ঐ ভদ্রলোক কি তোকে উকিল রেখে গেছেন নাকি?

—যাননি। কিন্তু গেলে ভালো করতেন। তবু আমার কাজ আমি করছি—বা তার কাজ আমি বন্ধুর মতো করে রাখছি যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব। সময় যদি আসে ভালো ফিজ আদায় করা যাবে। সুপার কন্‌ষ্টেলেশনের সিজিন টিকিট একটি অন্তত আদায় করতেই হবে। আঃ, তার পর কায়রো—জুরিখ—জেনেভা—লণ্ডন ভাবতে পারি নে রে দিদি—কল্পনা করতে পারি নে।

—ভদ্রলোকটিকে যখন তোর এতোই পছন্দ তখন তুই তাকে বিয়ে করে ফেল না? তবেই তোর স্বপ্নও সহজেই সফল হয়ে যায়।

—ইস্‌ দিদি রে। একেবারেই তোর মুখে মানায় এমন কথা হলো না এটা। সে যাক্‌, আমার পাত্র ঠিক আছে—আরে ভালো কথা, রজত বাবুর নেমন্তন্নের চিঠিটা বৌদি দেখিয়েছিল তোকে? পাত্র কথাটার সঙ্গে সঙ্গে রজত বাবুর নামটা মনে এলো বলে তুই যেন আবার ভেবে আকুল হোস নে যে তাকেই আমি পাত্র ঠিক করেছি। চিঠিটা ভদ্রলোকের ছবিতে—কাগজে—আহ্বানে মূল্যবান তাই দেখেছিস কিনা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—কিন্তু তোর নির্বাচিত ব্যক্তিটির নাম আগে শুনি?

—নাম-ঠিকানা কি করে বলি বা কি করেই বা দেখাই বল। ঠিক রয়েছে মনে মনে। মনের ঠিকের সঙ্গে বাস্তব ব্যক্তির সাক্ষাৎ—নাঃ এখনও ঘটেনি।

মনের নির্বাচনকে বিশ্বাস করিস নে। তার মতো অবিশ্বাসী নেই। বাস্তব ভালো লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে দিব্য ভালোমানুষের মতো চেহারা পাল্টাতে থাকে। ঐ যে বাস্তব সাক্ষাৎ ঘটেনি কথাটা বলতে গিয়ে একটু থামতে হলো, নাক ঝেড়ে নাঃ বলতে হলো, ঐ ফাঁক দিয়েই একেবার বিপরীত চেহারার কেউ এসে যাবে যার সঙ্গে মনের নির্বাচিত ব্যক্তির কিছুই মিলতে চাইবে না—সাবধান।

—এমন খোলাখুলি ভাবে নিজের মনের কথাটা বলে দিলি?

—কি বললাম আমার মনের কথা খুলে?

—সুদর্শন বাবুকে ভালো লেগে গেছে।

—যা খুসী তাই বানিয়ে বানিয়ে বলবি।

—তোর মনের নির্বাচনে আস্থা হারানোর জ্ঞানটা সেই কথাই বলে। কিন্তু তোর মনের নির্বাচনে ভুল ছিল না—ভুল করেছিস তুই—এ তোকে আমি বলছি।

মঞ্জু কলেজে বেরুবার মুখে মৌরী জিজ্ঞাসা করল—কোথায় তোর সেই মূল্যবান নেমন্তন্ন-চিঠি? খুঁজে পেলাম না তো। তা দরকার নেই চিঠির। বৌদি বলল, লাঞ্চের আর কক্‌টেল পার্টির নেমন্তন্ন। গিয়ে উপস্থিত হবি না তো? তারিখ কবে?

—তুই যদি রোজ একবার করে না-যাবার কথাটা স্মরণ করিয়ে না দিস তবে যাবো না—কারণ আমার মনেই থাকবে না সে কথা। কিন্তু কেবল মনে করিয়ে দিলে কি করব বলতে পারিনে।

অনার্স ক্লাশটা করেই মঞ্জু গিয়ে উপস্থিত হলো জয়াদের বাড়ী। গিয়ে দেখল সেই এক মহাকাণ্ড। জয়ার মা জয়াকে শোবার ঘরেই ঘড়া গড়া জল ঢেলে স্নান করিয়ে তুলে তার চুল মাথা মুছছেন। ঘর থৈ-থৈ করছে জলে। কি ব্যাপার? না, সেই যে মঞ্জু কাল জয়ার কানে মুখ রেখে বলে গেছে, এক পাও ঘর ছেড়ে সে মঞ্জুর সঙ্গে ছাড়া বেরুতে পারবে না—কারু সঙ্গেই না—কোন কারণেই না; সেই কথায় অটল হয়ে বসে আছে জয়া। তাকে শোবার ঘরের দরজার উল্টো পিঠেও মা নিয়ে যেতে পারছেন না। বাধ্য হয়েই মেয়েকে ঘরে স্নান করাচ্ছেন তিনি। মঞ্জু আসবার সময় যখন বুঝিয়ে আসে ঘর থেকে নয়, বাইরের দরজার বাইরে সে যাবে না। তখন জয়া সহজেই বুঝে মাথা নাড়ে কিন্তু পরদিন গিয়ে একই কথা শুনতে হয় তাকে, ঘর থেকে বের করা সম্ভব হয়নি জয়াকে। কিন্তু এ ছাড়া তার চাল-চলন প্রায় স্বাভাবিকই বলা চলে। জয়া পাগল নয় এ যেমন সত্য সে যে সুস্থ নয় তাও তেমনি সত্য। ভালো একটা মানসিক চিকিৎসার দরকার। দরকার তার ভালো খাওয়ার। একটা প্রাইভেট টিউশনির

জন্য না বলল এমন বন্ধু নেই—এমন পরিচিত নেই। অমিতার কাছে হাত পাতল। মৌরীর কাছে ধার চাইল। ডান হাতের বালাটা খুলে রেখে দিল পরতে ভালো লাগে না বলে। তারপর একদিন সেটাকে বেরুবার সময় ভরল ব্যাগে।

মৌরী অমিতা নেমন্তন্নের কথা মনে করালো না। মঞ্জুরও পুরো সপ্তাহের ভেতর একবারের জন্য মনে পড়ল না সেই পার্টির কথা বা সবুজ কালীতে মোটা পার্কারের মোটা অক্ষরের লেখা রজতের সেই সাগ্রহ আহ্বান -'এসো'। দিনগুলো যেন ওর মুখে লাগাম পরিয়ে ওকে নিয়ে ছুটে চলল। কিন্তু ঠিক আটই সেপ্টেম্বর সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গেই যখন ওর মনে পড়ল আজ আটই সেপ্টেম্বর। আজ রজতের সেই পার্টির দিন—যখন রজতের 'এসো' লেখাটা রজতের চোখের নীরব ডাকের মতো হয়ে ওর সামনে ভেসে উঠল, তখন মঞ্জু সত্যি একটু আশ্চর্য্যই হয়ে গেল। আশ্চর্য্য হলেও না-যাওয়া সম্বন্ধে সে এতই স্থিরনিশ্চয় যে, একবারও সে কথা নিয়ে আর মাথা ঘামালো না। সময়মত স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে, বালিশের তলায় চেপে রাখা দু'দিনের পরা তাঁতের শাড়ীটা পরে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল সে কলেজে। শনিবারের কলেজ। একটার সময় ক্লাশ থেকে বেরিয়ে কলেজ লনে এসে দাঁড়াতেই আবারও ওকে বিস্মিত করে দিয়ে যখন নেমন্তন্ন পত্রের সেই 'এসো' ডাকটা রজতের গলায় ডাক দিল 'এসো মঞ্জু'। আমোদ বোধ করল মঞ্জু। ভারি আশ্চর্য্য তো। নিজের শাড়ী কাপড় জামা জুতো ব্যাগ সব কিছুর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আনল সে—নাঃ, এর জন্য আবার শাড়ী কাপড়ের কথা ভাবতে হবে নাকি? বেশ যাওয়া যাবে। গেলও।

কিন্তু গিয়ে উপস্থিত হয়ে একটু ভড়কেই গেল যেন সে। অভ্যর্থনারত যে মেয়েটি মিষ্টি হেসে একটি করে লক্ষ্ণৌর 'ব্রেকপ্রিন্স' ছেলেদের কোর্টের আর মেয়েদের খোঁপায় পরিয়ে দিচ্ছিল, তার হাত মুহূর্তের জন্য থমকে গেল মঞ্জুর কাছে এসে। কিন্তু ঐ মুহূর্ত মাত্রই। তারপই তেমনি হেসে মঞ্জুর ভেঙ্গে-পড়া খোঁপাটি বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে গুঁজে দিল সে তার মাথায় একটি ছোট্ট গোলাপ। হাতে দিল একটি সুবাসিত সিল্কের রুমাল। এটা বোধ হয় মেয়েদের জন্য বিশেষ উপহার। তারপর হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রবেশ-পথ। সব চাইতে কোণের দিকটা বেছে নিয়ে গিয়ে বসল মঞ্জু। বসে আবার তাকালো মঞ্জু সংবর্ধনারত মেয়েটির দিকে। যেন আঁকা ছবি! লাল সোনা-বুটির বাসন্তী রং বেনারসী শাড়ীর কোচা পদ্মফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে আছে পায়ের কাছে। আঁচল দুলছে মেঝে ছুঁয়ে। লিপস্টিকরঞ্জিত লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে একটু মিষ্টি হাসি যেন মেপে রেখে দিয়েছে। গায়ের রংটা মিশে গেছে গাড়ীর রং -এর সঙ্গে। ছবি—কিন্তু ছবি নয়, তাই ছবির চাইতে সুন্দর লাগছে। কিন্তু শুধু এই একটি মেয়েই তো নয়! মঞ্জু হলঘরের যে দিকে চোখ ফেরাতে লাগল, কেবল ঠিক এই একই রকম ছবি যেন দেখতে লাগল। শুধু শাড়ীর রং আর ব্লাউজের ছাঁটকাটের যা তফাৎ। মেলায় ডালা সাজিয়ে বসবার আগে শিল্পী যেন অতি যত্নে একই রকমের কতগুলো সুন্দর সুন্দর পুতুল গড়িয়ে নিয়ে এসেছে। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

একটা হোটেলের ভেতর যে কি এলাহি কাণ্ড-কারখানা আছে মঞ্জু যেন কল্পনা করে উঠতে পারে না। এই একটা করিডোর দিয়ে ঢুকে যেন দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। শাহেবাজাদির 'ওপেন এয়ার রেঁস্তোরা—দেখেই সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল—এর ভেতর আবার এমন একটা রাজকীয় ভোজনকক্ষ এলো কোথা থেকে! বিরাট হলঘরটার চারদিকটা টেবিলে চেয়ারে সাদা টেবিলক্লথের ঢাকনায় আর ফুলদানীতে ফুলে সাজানো। মাঝখানটার মস্ত একটা চত্তর খালি। সেখানে দলে দলে সবাই ঘুরছে—কথা বলছে। পরিচিত হচ্ছে—পরিচিত করছে। এক পাশে লম্বা লম্বা টেবিলের উপর কত রকমের যে খাবার, তার নামও মঞ্জু জানে না, জানার কথাও নয়। কোনটা ফরাসীদেশীয়, কোনটা চৈনিক, কোনটা বা বিলিতি। প্লেট ডিস কাঁটা-চামচে পাঁজা করা সাজানো হয়েছে—বুফেপার্টি। তোল নাও খাও—যার যেমন ইচ্ছে আর অভিরুচি।

এখনও খাওয়ার দিকে সাড়া পড়েনি। সবার হাতে হাতে ঘুরছে তরল পানীয়ের গ্লাস। বয়-বাবুর্চি ঘুরছে ছোট ছোট ট্রে-তে ভর্তি গ্লাস নিয়ে। ফুরুচ্ছে আর হাতে তুলে দিচ্ছে। চোখ লাল হয়ে উঠেছে। কারু কারু পা টলছে। মেয়ে-পুরুষ কেউ বাদ যাচ্ছে না। মঞ্জু বার দুই-তিন ভীড়ের ভেতর রজতকে দেখল—হ্যাণ্ডশেক করছে। অতিথিদের সাদরে ভেতরে নিয়ে আসছে। কারুকে বসাচ্ছে। কারু সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বয়কে ডাকছে। নিজ হাতে গ্লাস তুলে দিচ্ছে। হাসিমুখে আবার আর এক দলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রবেশপথের কাছে গিয়ে

সেই অভ্যর্থনারত মেয়েটির পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে। আবার এসে ভেতরে ঢুকছে। দুটি মেয়ে একটা দূরের টেবিলে বসে লেডিস ড্রিঙ্ক নিচ্ছিল আর খাচ্ছিল—খাচ্ছিল আর নিচ্ছিল। মঞ্জু সেদিকেই তাকিয়েছিল এক লক্ষ্যে। কারণ একটি মেয়েকে এর ভেতর সে চেনে অর্থাৎ এক দিন দেখেছে— সেই প্রথম যেদিন রজতকে সে নেমন্তন্ন করতে আসে, সেদিন এই মেয়েটিই এসেছিল। রজত যাকে ড্রয়ার খুলে টাকা দিয়েছিল। একটিই পরিচিত মুখ দেখছে বলেই হয়ত মঞ্জু সেদিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ দৃষ্টির আকর্ষণেই বোধ হয় পাশের দিকে তাকাল। দেখল, রজত পাশের চেয়ারে বসে ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে আছে। ও তাকাতেই নিজেকে সহজ করে ফেলে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল—কখন এলে?

বাঁ পিঠের আঁচলটা টেনে ডান কাঁধের উপর দিয়ে নিয়ে আসতে আসতে মঞ্জু বললো—অনেকক্ষণ।

রজতের দিকে তাকালো মঞ্জু। মাথায় পাতলা চুল—একটু উসকো-খুসকো। যেন ঝোড়ো বাতাস মাথার উপর দিয়ে বয়ে না গেলেও পাতলা হাওয়ার ঝাপটা এরই ভেতর দু-একটা গেছে। চোখ দুটোও সামান্য লাল হয়ে উঠেছে। কাঠ চাঁপা রং -এর স্যুট। কোটের বুক থেকে মুখ বাড়িয়ে ব্রেকপ্রিন্স যেন রজতকে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করছে—প্রিন্স আমি না তুমি? ঠোঁট দুটো দেখলে মনে হয় এতক্ষণ ভিজে ছিল—এখন শুকিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। তক্ষুণি গ্লাস নামিয়ে রেখে গেল বয়। তাকালো মঞ্জুর দিকে। রজত আদেশ করল—লিমন। বয় ছুটল লিমন আনতে। আর তক্ষুণি এনে নামিয়ে দিয়ে গেল লিমনের গ্লাস।

গ্লাসটা মুখে তুলতে গিয়েও কেন যেন তুলল না রজত। টেবিলে রাখা গ্লাসটা হাতে ধরে রেখে বলল—তুমি এসেছ বলে আমি ভারি খুসী হয়েছি মঞ্জু। আমার কেবল মনে হচ্ছিল তুমি এলে না। আর খারাপ লাগছিল। কলেজ থেকে এসেছ একেবারে?

নিজের সজ্জার দিকে ফের আর একবার চোখ বুলিয়ে এনে মজা-পাওয়া ভাবে হাসল মঞ্জু। বললো—এই রূপ রং আর সরসতার ভেতর আমাকে একেবারেই মানাচ্ছে না বুঝতে পারছি-উঠব?

—মানুষের দুর্বলতা নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই মঞ্জু বুঝলে। দাঁড়াও আসছি—বলে কাদের ঢুকতে দেখে যেন রজত তাড়াতাড়ি উঠে গেল। তাদের ভেতরে এনে কারু কারু সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বয়ের হাত থেকে ড্রিঙ্কের গ্লাস তুলে নিয়ে নিজ হাতে ধরে দিতে লাগল রজত।

মদ আর মদ—চোখে আর হাতের গ্লাস যেন লাল রং এর ঢেউ খেলছে সবার। এর পরই বোধ হয় শুরু হবে লাঞ্চ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মঞ্জু। এঁরা কোন জগতের মানুষ? মঞ্জুদের জগতের সঙ্গে এঁদের জগতের মিল আছে কি? মঞ্জুদের শরীরের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিল আছে কি এঁদের শরীরের রক্ত-মাংসের? মিল আছে কি সুখ-দুঃখ ব্যথাবেদনা, আশা-নিরাশার? এঁরা কোথায় বাস করে? কি ভাবে? কি চায়? এ্যাঁ, এঁদের চাওয়ার বস্তু কি পৃথিবীতে—টাকা? চাকরী? ক্ষমতা?

চেয়ারে এসে বসল রজত। রাখলাম একা বসিয়ে কতক্ষণ তাই না? সিগারেট ধরালো সে। কি ভাবছিলে এমন তন্ময় হয়ে?

—ভাবছিলাম ভাগ্যিস খেলে বড়লোকদের পেট ভরে। ঘরের এমাথা ওমাথা লম্বা টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো খাবারের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল মঞ্জু। তারপর রজতের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনে চলে গেল একেবারে অন্য প্রশ্নে। আচ্ছা, ঐ যে মেয়েটি দরজায় সবাইকে ফুল পরাচ্ছে সে মেয়েটি কে? মঞ্জুর এ প্রশ্নের কারণ আছে। পার্টিটা যখন রজতের তখন তার আত্মীয় কেউ হতে পারে। তাই কিনা সেটাই জানতে চাইল সে। অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল রজত—আমি চিনিনে। টাকার বিনিময়ে এরা এসব কাজ করে।

—আহা, আপনার হাত দিয়ে গেল এ কাজটা! আর একদিন আগে। আপনার সঙ্গে দেখা করলে এ কাজটা আমি পেতে পারতাম? যদিও চেহারাটা—তা এটুকু খাতির আপনি করতেন না আমাকে? নিশ্চয়ই করতেন। ইস। একটা মস্ত কাজ হাতছাড়া হয়ে যাবার মতো করুণ মুখ করল মঞ্জু।

তাকিয়ে রইল রজত। এই উঠে যাওয়ার ভেতর আরো দু-এক ঢোক হয়ত খাওয়া হয়ে গেছে তার। চোখ দুটো আর একটু লাল আর একটু স্ফীত হয়ে উঠেছে।

—আচ্ছা, একটু নড়ে চড়ে বসে জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু—আপনার কত— কত টাকা খরচ হবে এই পার্টিতে? অ-নে-ক তাই—না?

—টাকার অঙ্কটা জানতে চাইছ?

—বললে শুনতে চাইছি।

—রজত ছাইদানে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। হাজার পাঁচ সাত।

—হাজার পাঁচ সাত! বিস্ময়টা ভেতরে ঠেলে মঞ্জু। তা পাঁচ হাজারও যা সাত হাজারও তো তাই ও একই কথা তো—সেই তো।

যদিও রজত বার বার উঠে গিয়ে সঙ্গ দিয়ে অভ্যর্থনা করে—কথা বলে আপ্যায়ন করে আসতে লাগল তবু ভিড়টার দৃষ্টি সকৌতুকে ঘুরে যেতে লাগল মঞ্জু আর রজতের উপর দিয়ে। চোখে চোখে—জিজ্ঞাসা উঠতে লাগল—এই মেয়েটি কে? রজত মুখের স্বাদ বদলে নিচ্ছে একটু। বিম্বাধর চেপে মন্তব্য করল একটি মেয়ে।

প্লেট কাঁটা চামচের শব্দ উঠল। হাতে হাতে প্লেট নিয়ে যার যার মনমতো খাবার তুলে নিতে লাগল ডিসে। রজত এগিয়ে গিয়ে নিজ হাতে তুলে দিতে লাগল সবার ডিসে এটা ওটা সেটা। তারপর এসে বসল ফের মঞ্জুর কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বয় এনে রাখল মঞ্জুর কাছে খাবার ডিশ। তোমার পছন্দ আমি জানিনে। আমার পছন্দমতোই তাই নিয়ে এসেছি। দেখো খেয়ে।

—কিন্তু আজ আমার উপোস।

—উপোস? কিসের? হাতের গ্লাস নামিয়ে সোজা হয়ে বসল রজত।

—আজ আমার প্রার্থনার দিন।

—কিসের প্রার্থনার দিন?

—ভগবান! মানুষকে শুভবুদ্ধি দেও। ব্যাগটা তুলে নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল মঞ্জু। ব্যাগটা টেনে নিল রজত।

—বেশ তা করো আর আমার জন্য না হয় একটু বিশেষ ভাবে আলাদা করে করো। কিন্তু তার জন্য উপোসের দরকার কি?

—উপোস না করলে প্রার্থনায় জোর ধরে না। ব্যাগটা—

ব্যাগটার জন্য রজতের দিকে হাত বাড়িয়ে একেবারে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। আপনাকে আটকে রাখছি—আমারও ভালো লাগছে না আর। আমি এখন যাই?

সেদিন পার্টিশেষে রজতকে তার বন্ধুরা যতই বার বার সাবধান করতে লাগল, রজত খালি পেটে র'ড্রিঙ্ক গুলো আর গলায় ঢেলো না। কৌচে মাথা রেখে জড়িত জিভে রজত ততই এক জবাব দিতে লাগল—আজ আমার উপোসের দিন। আমি আজ উপোস করে কেবল প্রার্থনা করবো।

॥ ২৩ ॥

সমস্ত পার্টিটা মঞ্জুর কাছে এতোই অরুচিকর লেগেছিল যে, ও নিয়ে কথা বলতে ওর আর মন ছিল না। নইলে বলে না গেলেও এসে বলতো। বরং বলতো আরো রং চড়িয়েই—যদিও রজতের এই রাজকীয় লাঞ্চ পার্টির রাজকীয় অপব্যয়ের উপর আর কিছু কারিগরি চালাবার শক্তি ওর ছিল না। তবু দু'চোখ বড় বড় করে তুলে মুগ্ধ-বিস্ময়ের ভাণ করে বর্ণনা দিত সেই পরমাশ্চর্য খাদ্যতালিকার। দরজায় স্বাগত সম্ভাষণরতা মডেলের মতো দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি হতে আরম্ভ করে প্রতিটি বিভিন্ন নারী-পুরুষের বিভিন্ন রকমের পোষাক-পরিচ্ছদের আর চলন-বলনের ব্যয়ের অঙ্কের। বলত, আহা তোরাই দেখলিনে! আমার এমন দুঃখ হচ্ছে, আপসোস হচ্ছে। এ্যাঁ, বলব আর একদিন এমনি একটা পার্টির আয়োজন করতে? ওদের পক্ষে কি আর এমন। আমাদের পাঁচ সাত টাকা ওদের পাঁচ শত হাজার টাকা, এক কথা তো—বলবো? দেখবি প্রতিটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে তোর কেবল মনে হবে—

> ''নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
> হে অনন্তযৌবনা উর্বশী।
> মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল,
> তোমার কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,

তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।'

যাবি দিদি? আমি বললে ভদ্রলোক ঠিক আর একদিন এমনি একটা পার্টির ব্যবস্থা করবেন। এতো ভালো না—একেবারে ভীষণ। তারপর লজ্জার রং মিশিয়ে থেমে থমকে যেন বলতে চায় না, ভেতরের আবেগ চেপে রাখতে পারছে না বলেই বলে ফেলছে, এমনি করে বলত রজতের কথা আর দেখত মৌরীর মুখের চেহারা বদল। ক্ষেপানোর এমন একটা বিষয় হাতে পেয়েও যে ছেড়ে গেল মঞ্জু, তা একেবারেই তিক্ত বোধে।

তবু কিন্তু মঞ্জুকে দেখা গেল একদিন রজতেরই হোটেলের করিডোর দিয়ে দ্রুত পায় প্রবেশ করতে এবং রজতের বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে টোকা দিতে।

আজ ছুটির দিন দেখে সকাল বেলা বেরিয়েছিল সে তার এক বন্ধুর দেওয়া দুটো ঠিকানা নিয়ে টুইসনের খোঁজে। দু'জায়গা থেকেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে তাকে। ইয়োরোপীয় দেশগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে পড়তে উপায় করার নানা সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করতে করতে পথ চলছিল মঞ্জু আর ক্ষুব্ধ ভাবে ভাবছিল, একটা বি. এ অর্নাসের ছাত্রী সে, একটা সামান্য রোজগারের পথ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেও করে উঠতে পারছে না।

রত্না কিন্তু হঠাৎ করে একটা বেশ ভালো টুইশন পেয়ে গেছে। একটি এ্যাংলো মেয়েকে বাংলা শেখানো। সপ্তাহে তিন দিন। পঁচাত্তোর টাকা মাইনে। ও যদি এমনি একটা জোগাড় করতে পারতো। হঠাৎ পথের মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জু। রজতের সেই লাঞ্চে বহু ইয়োরোপীয়ান মহিলার ভিড় দেখেছে সে। তাদের ভেতর তো কারু বাংলা শেখার প্রয়োজন না থাক, সখ থাকতেও পারে। যদি না-ও থাকে তবে কথাটা মনে হচ্ছে না বলেই হয়ত নেই। বললে উৎসাহবোধ করতে পারে। বিশেষ করে কথাটা যদি আবার রজত বলে। হ্যাঁ নিশ্চয়—রত্নার মতো একটা কাজ রজত ওকে ঠিক করে দিতে অনায়াসে পারে, এই মুহূর্তে পারে।

মঞ্জু যখন গিয়ে রজতের ঘরের মেহগনি কাঠের ভারি দরজার বন্ধ কপাটে টোকা দিয়ে দাঁড়ালো, তখন দশটা বেজে না গেলেও বাজে। এই কিছুক্ষণ হলো মাত্র বিছানা ছেড়ে সোফায় এসে বসেছিল রজত। বয় লেবুর রস দেওয়া র' কফি দিয়ে গেলে বসে বসে তাতে গলা ভিজোচ্ছিল আর বিস্বাদ—বিস্বাদ যেন তার রাত ভোর স্পিরিট ঢালা জিবে মনে শরীরে, বিস্বাদ যেন তার পুরো জীবনটার প্রতি এমনি ভাবে প্রতিটা চুমুকের সঙ্গে মুখ বিকৃত করতে করতে বাঁ হাতে রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলোকে পেছন দিকে ঠেলছিল। এমনি সময় দরজায় টোকার শব্দ হলো। যে ভাবে ঝুঁকে বসেছিল তেমনি ভাবে বসে থেকে চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বিরস গলায় সাড়া দিল সে—কাম ইন—কাম ইন। মঞ্জু ভেতরে ঢুকে বেশ কয়েক পা ঘরের ভেতর এগিয়ে এলে মুখ তুলল সে। প্রথম মুহূর্তটায় যে মঞ্জুকে কোন সম্ভাষণ করে উঠতে পারলে না রজত সেটার কারণ বোধ হয় অবিশ্বাস্য আনন্দ। তারপর একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে আহ্বান জানালো—আরে এসো এসো।

মঞ্জু আরো কয়েক পা এগিয়ে এলে সন্নত ভঙ্গিতে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিল বসতে।

মঞ্জু বসলে সে-ও বসল মঞ্জুর মুখোমুখি কৌচে। টেবিলের উপরের টিনটা থেকে একটা সিগারেট টেনে বের করে দুই ঠোঁটের চাপে ধরে লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বলল—'প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু, দিন যাবে আজ ভালো' কি বলো?

লাইটারের পলক আলোয় রজতের মুখের যা সব আগে মঞ্জুর চোখে পড়ল তা হলো, তার দুই চোখের কোল-গড়ানো গভীর কালি—সুর্মা-ঢালা কালি।

লাইটার নামিয়ে মঞ্জুর দিকে তাকালো রজত—কফি খাবে?

—না। কফির গন্ধ আমার ভালো লাগে না।

—বাঙ্গাল আর কা'কে বলে। আচ্ছা, চা আসছে। চা-ই খেয়ো। মঞ্জুর দিকে একটু ঝুঁকে বসল রজত—তারপর বলো দেখি শুনি, তোমার সে দিনের প্রার্থনায় জোর ধরেছিল?

হাসল মঞ্জু।

—অবশ্যি তুমি বলবে তোমার প্রার্থনার জোর ছিল কি না তার পরখ তো হবে আমাদের দিয়ে। আশা হয় তোমার?

—হয়। হাসিমুখে জবাব দিল মঞ্জু। তবে প্রার্থনার ফললাভ তো হাতে হাতে হয় না কিন্তু একদিন না একদিন নাকি হয়। ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

—করবে অপেক্ষা?

সরল ভাবে 'হাঁ' বলতে গিয়ে রজতের চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মঞ্জু।

হাসল রজত। ছেলেমানুষি করছি। যেন আপনাকে আপনি বলে উঠে পড়ল রজত সোফা ছেড়ে। হাঁটাহাঁটি করতে করতে বললে—আমি তো জানি আমাকে ধমক দিয়ে নিজে তুমি বাড়ী ফিরে গিয়ে দিব্য পেট পুরে খেয়েছ। তাই তোমার প্রার্থনায় জোর না ধরলেও আমারটায় নিশ্চয়ই ধরেছিল। একে তো নির্জলা উপোস করেছিই। তার উপর জানতো, সাধনায় বসবার আগে সাধকরা সিদ্ধি গাঁজা ভাঙ্গ কারণ যা হোক একটা নেশায় বুঁদ হয়ে বসেন। তাতেও ত্রুটি রাখিনি আমি। আচ্ছা, সেদিন তোমার খুবই খারাপ লেগেছিল না?

—লেগেছিল।

—কিন্তু কেন?

—ভালো লাগছিল না বলে।

হেসে ফেলল রজত।— তোমার কি ভালো লাগে বলো?

—ভাবতে হবে।

—বেশ ভেবেই বল। বলল রজত।

—এতো তাড়াতাড়ি হবে না। মনে সর্বদাই তো কত চাওয়ার ভিড় লেগে রয়েছে কিন্তু যদি দৈববাণী হয়, 'বর দাও।' তখন কি আমরা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারি কি ছাই।

—পারো না?

—না। মাথা নাড়ল মঞ্জু। পারি না। আমি আকুল হয়ে ভেবে দেখেছি, খুঁজে পাইনে। সব চাওয়া কেবল যেন তুচ্ছ হয়ে উঠে চোখের উপর দিয়ে, একের পর এক করে মিলিয়ে যেতে থাকে। হাসল মঞ্জু। আপনারটাও ভেবে দেখতে সময় লাগবে। এটা ওটা একটা কিছু বলে ঠকে যেতেও তো পারি।

দৃষ্টিটাকে একটা কিছুর ওপর রেখে রজতকে অন্যমনস্ক ভাবে বসে বসে চুল পেছন দিকে ঠেলতে দেখে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—কি ভাবছেন এতো?

—তোমাকে। তোমার কথা অনেক সময়েই আমি এমনি ভাবি। আচ্ছা মঞ্জু, তুমি কখনো কাউকে খুব ভেবেছ—ভীষণ ভাবে ভেবেছ?

তৎক্ষণাৎ টেনে টেনে জবাব দিল মঞ্জু—হাঁ—আ—আ।

—কে সে?

—বলবো?

—বলো।

—আমার নজরটা সব দিকেই সাংঘাতিক রকমের উঁচু। সাধারণ মানুষে আমার মন নেই। রাজা মহারাজাদের কাল তো কালিদাসের কালের মতো হারিয়েই গেল। অগত্যা মন্ত্রীদের মধ্যে যিনি মহামন্ত্রী তাঁর কথাই ভীষণভাবে ভাবি আমি। প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে মালা গাঁথা, প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে সে মালা আমার জলে ভাসানো। শীতে গাঁথি শ্বেতপদ্ম। বসন্তে কামিনী। বর্ষায় সন্ধ্যামালতী। গ্রীষ্মে ভাসাই কাশের গুচ্ছ। চোখের জলের চাইতে পবিত্র বারি নেই। তাই সে মালা রাতে চোখের জলে ভিজিয়ে রেখে ভোরে ভাসাই জলে। যেদিন আমার মালা আমার নিঃশ্বাসের, আমার চোখের জলের উষ্ণতা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাঁর গলায় ছাপিয়ে পড়তে পারবে— সেইদিন ধন্য হবো আমি।

—এসো দিচ্ছি আমি মালা দেবার ব্যবস্থা করে।

—উহুঁ, তেমন দেওয়া নয়—দশের মধ্যে একজন হয়ে দেওয়া নয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ব্যর্থ হবে তবু আমার মালা, আমার মালা বলেই এসে প্রসন্ন হাস্যে গলায় না পরা পর্যন্ত সে মালা জলেই ভেসে যাবে।

— আচ্ছা, তোমার মালা তিনি তোমার মালা বলেই একান্তে গলায় পরলেন। কিন্তু তারপর করবে কি তাকে নিয়ে তুমি? সকালেবেলা আলু-পটল মাছের ফর্দ হাতে বাজারে পাঠাবে?

— না। তাঁর রাজকাজই তিনি করবেন। শুধু দিনের কাজের শুরুতে চুপি চুপি কানের কাছে মুখ নিয়ে বলবো, রাজকাজে যাবার আগে আমার কথাটা একটু শুনে যেও গো।

হেসে উঠল রজত— তোমার রাজার কানে কানে বলা কথাটা কি, নিশ্চয়ই সেটা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে শোভন হবে না। কিন্তু তারপর?

— তারপর? তারপর আর আমি ভাবতে পারিনে। রাজার রাজত্বের চেহারাই যাবে বদলে। ওঃ, আপনি ভাবছেন তো কি ধৃষ্টতা কি স্পর্দ্ধা মেয়েটার! কিন্তু শিক্ষিত নার্সের চাইতেও যেমন মঙ্গল ইচ্ছার জোর আর হৃদয়ের জোরে মূর্খ মা সন্তানের পক্ষে অনেক বেশী মঙ্গলের হয়ে থাকেন, তেমনি রাজার রাজত্বের মঙ্গলের পক্ষেও সব চাইতে বেশী মঙ্গলের কাজ করতে পারে শুভ ইচ্ছার জোর, আর হৃদয় পারে না?

—রাজার গলায় মালা দেওয়া তোমার ঘটুক আর নাই ঘটুক—তুমি অনেক কাজ করবে মঞ্জু—নিশ্চয়ই অনেক কাজ করবে।

যেমন বসেছিল তেমন বসে থেকেই ডান হাতটা মঞ্জু রজতের দিকে বাড়িয়ে বললো, করবো একটা প্রণাম?

—আরে, কি পাগল! একেবারে উপুড় হয়ে মঞ্জুর বাড়ানো হাতটা দু'হাতে মুঠো করে ধরল রজত।

ওয়েটার এসে প্রাতরাশ হাতে ঘরে ঢুকলে মঞ্জুর হাত ছেড়ে দিল রজত। হাতের ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ওয়েটার চলে গেল।

—এই এগারোটার সময় ভোরের খাওয়া? আমি এ সময়ই চা খাই। আজ নিশ্চয়ই তোমার উপোসের দিন নয়।

—না, বলে এগিয়ে বসে ট্রেটা মঞ্জু টেনে নিল কোলের কাছে। তারপর ফলের ডিসটার ফল নামিয়ে খাবারগুলো কিছু কিছু প্লেটে তুলে নিয়ে নিজের জন্য রেখে বাকি সব ধরে দিল রজতকে।

—এটা কি হচ্ছে? আমি খেলে কি আনিয়ে নিতাম না। সকালে আমি শুধু চা খাই। ওদের দেবার নিয়ম দিয়ে যায়।

—আচ্ছা আজ খান। ডিম-রুটির ডিসটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল—সকালে এমন না খাওয়াটা কিন্তু ভালো নয়। দুপুরে খান ক'টায়?

—একটা দুটো তিনটে।

—আঁ! দু'চোখ বড় করল মঞ্জু। আমার দিদির তত্ত্বাবধানে থাকলে দেখিয়ে দিত লিভার নষ্ট করা, আপনার এই খালি পেটে চা-কফি খাওয়া।

মাথা একেবারে এ-কাত ও-কাত করল রজত— স্বাস্থ্য খারাপ হয় এমন কাজ আমি কখনো করিনে। লিভারের উপর আমার মায়ার খবর তুমি কি জানবে? চা-কফি খাবার আগে দুখানা এরারুট-বিস্কুট খেয়ে নিতে আমার কোন দিনও ভুল হয় কিনা ডেকে জিজ্ঞাসা করো ওয়েটারকে। চামচে দিয়ে ডিমের পোচটা তুলে মুখে ফেলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল রজত। আচ্ছা মঞ্জু, সেই আশ্চর্য্য নীল চোখের ছেলেটি কে? যদিও তার চেহারায় আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু তার চোখের নীল রংটাই সেদিন আমার দৃষ্টি টেনেছিল সব চাইতে বেশী। কে সে?

হাতের টোষ্ট নামিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু—কোথায় দেখলেন আপনি তাকে?

—কফি-হাউসে।

—আমার সঙ্গে?

—অবশ্যই।

—কখনোই কফি-হাউসে আমার সঙ্গে তাকে আপনি দেখতে পারেন না।

—তবে লেকে?

—তাও না।

—পার্কে?

—কোন পার্কে? তারপর রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো— না তা-ও দেখেন নি। মিথ্যে বলছেন।

—মিথ্যে বলছি? এই চেহারার কারু সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই?

—তা আছে। কিন্তু কোথায় দেখলেন, তাই বলুন?

— সেদিন তুমি যখন না খেয়ে বেরিয়ে এলে আমি তোমার পেছন পেছন এসেছিলাম। তুমি দেখনি। একেবারে একরোখে চলেছিলে তো? হঠাৎ মস্ত একটা গাড়ী থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে তোমায় নমস্কার জানালে, তুমি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে বলে উঠলে—'আরে, আপনি কোথা থেকে! ভারি মজা তো!' তখন আমি তোমাদের পেছনেই ছিলাম।

—তাই বলুন। আবার টোস্ট হাতে তুলে নিল সে। গাড়ী থেকে নামলেও সে কিন্তু আপনাদের জগতের কেউ নয়।আমাকে বাঙ্গাল বলছিলেন তো, ইনি তার চাইতেও বাঙ্গাল। দেশ ছেড়ে এখানে এসেছেন দেশভাগেরও বহু পরে।

—তারপর?

—তারপর বাস করেন উদ্বাস্তুদের গোয়ালে। খান আকাঁড়া চালের ভাত আর কচুর তরকারী।

রজত ওর দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনতে শুনতে যে একে একে তার ডিসের সমস্ত খাবার ওর ডিসে তুলে দিতে লাগল, মঞ্জুর লক্ষ্যে তা পড়ল না। সে খেতে খেতে নিজের ঝোঁকে বলে চললো— মনে আছে দিদির বিয়ের দিন সন্ধ্যায় খবর দিতে এসেছিলাম বিয়ে না হবার। আপনি এক ডিসভর্তি সুস্বাদু খাবার সামনে ধরে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত দিন তোমার খাওয়া হয়নি।' সেদিন এই ভদ্রলোকটির স্কুল তৈরীর কল্পনা পরিকল্পনা শুনতে শুনতে দিন এমনই গড়িয়ে গিয়েছিল যে, তার মধ্যাহ্নের খাদ্য-তালিকার প্রধান মেনু সেই অনবদ্য কচুর তরকারীর স্বাদ গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু সে তরকারী গলায় এমনই হুল ফোটাতে লাগল যে আমার পক্ষে দু'গ্রাসের বেশী তিন গ্রাস মুখে তোলা সম্ভব হলো না। শুধু এঁর ক্ষুধার্ত খাওয়ার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম।

—স্কুল কেমন চলছে তার? বেকনের টুকরোগুলো মঞ্জুর ডিসে তুলে নিজের প্লেট খালি করে রজত হেলে বসল সোফায়।

—স্কুল হয়ই নি।

—কেন?

সংক্ষিপ্ত ভাষণে নীলের স্কুল পরিকল্পনা কাজে পরিণত না হবার ঘটনা বলে খাওয়া শেষ করল মঞ্জু। তারপর টি-পট থেকে চা ঢেলে রজতের হাতে একটা কাপ তুলে দিয়ে নিজের কাপটা হাতে নিয়ে সোফায় পিঠ রাখলো সে-ও। বর্তমানে ইনি এখন সাহিত্যিক নামপিপাসী কোন এক ধনীর মজদুরি করছেন। তার ঠাণ্ডা ঘরে মূল্যবান সিগারেট আর বিলিতি নক্সাতোলা কাপে চা খেতে খেতে নাম শুদ্ধু লেখা বিলি করে চলেছেন। সামনে পুজোর মরশুম, তাই নাকি এখন তার নিঃশ্বাস ফেলবার সময় মিলছে না। বলেন, উপাদেয় খাবার খাই। গাড়ীতে যাতায়াত করি। ঠাণ্ডা ঘরে বসি—সম্রাটের মতো কাটছে দিনগুলো। বেচারা!

—এই সৌভাগ্যবান বেচারার নাম?

—কি? বলে রজতের দিকে তাকাতেই রজতের কৌতুকোজ্জ্বল চোখের সঙ্গে চোখ মিললে হেসে ফেলল মঞ্জু। তার নাম? তার নাম নীল। চা'টা ঢক-ঢক করে খেয়ে নিয়ে কাপটা রাখতে রাখতে বললো—যত বাজে কথায় সময় নষ্ট করছি। যে জন্য আসা তাই এখন বলা হলো না। আমি কিন্তু একটা বিশেষ দরকারে আজ আপনার কাছে এসেছিলাম।

—বেচারার সঙ্গে পরিচয় করা যাবে একদিন কিন্তু বিশেষ দরকারে এসেছিলে? কি বলোতো? অত্যন্ত উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করে মঞ্জুর দিকে ঝুঁকে বসল রজত।

—একটা কাজ চাই।

—কাজ? যেন 'কাজ' শব্দটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারল না রজত।

—হ্যাঁ কাজ। একটা ছোটখাটো কাজের ভীষণ দরকার আমার। অবশ্য কলেজের ফাঁকে। আমার এক বন্ধু একটি এ্যাংলো মেয়েকে বাংলা শেখানোর চমৎকার কাজ জোগাড় করেছে। সেটা দেখেই আমার মনে এলো আপনার সে দিনের পার্টিতে বহু বিদেশিনী সমাবেশ দেখেছিলাম। এমনি একটা কাজ হয়তো জোগাড় হয়ে যেতে পারে আপনার কাছে এলে। আর শুধু বিদেশীরাই বা কেন, দেখলাম দেশীরাও তো প্রায় অনেকেই আপনারা— বাংলা জানেন না।

—আমরা বাংলা জানিনে?

—কোথায় জানেন। ইংরেজিতেই তো নিজেদের ভেতরও কথা বলছিলেন।

— সে কি জানিনে বলে?

চুলের গোছা আঙ্গুলে জড়াতে আর খুলতে খুলতে বিব্রত কণ্ঠে রজত বললো—মুসকিলে ফেললে দেখছি।

স্বভাব মানুষের সব কিছু ঠেলে আগে এসে দাঁড়ায়। এই করতে গিয়ে যে সে নিজের দরকারী কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে খেয়াল মঞ্জুর রইল না। বললো—জানেন, যাঁরা নিজেদের ভেতরও নিজের ভাষা ছেড়ে ইংরেজী ব্যবহার করেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। বলে ঠোঁটে মুখে একটা অবজ্ঞার ব্যঞ্জনা প্রকাশ করল মঞ্জু। কিন্তু যাঁরা তা করেন না তাঁরাও অন্যভাষী হলেই সোজা চলে যান ইংরেজীতে। আজও এ কেন করে চলেছেন আপনারা?

বিস্মিত কণ্ঠে রজত বললো—যাদের কথা তুমি শরীর থেকে আরশোলা ঝেড়ে ফেলে দেবার মতো মুখ করে ঝেড়ে ফেলে দিলে, তারা কেন তাদের মায়ের মুখের কথা ছেড়ে অপরের মায়ের মুখের কথায় কথা বলে, এ তুমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতে পারো। কিন্তু যারা বিদেশী তাদের সঙ্গে ইংরেজী বলা ছাড়া উপায় কি?

—উপায় না বলা। আগবাড়িয়ে যদি কেউ নিজেদের ভাষায় কথা বলতে শোনে তবে সে তো তাদের মস্ত সুবিধার কথা। কষ্ট করে অপর ভাষা শিখতে বসবে তারা কেন? স্তানের দিকে তাকিয়ে কোন শিক্ষাটা আমাদের। কিন্তু ইংরেজী না জানলে যেমন ইংরেজদের দেশে বসবাস অসম্ভব হয়, হিন্দি না জানলে হিন্দিভাষীদের রাজ্যে, তেমনি বাংলা না জানলে বাংলা দেশে চলাও অসম্ভব হবে— এই তো হওয়া উচিত —এই তো করে তোলা উচিত।

মঞ্জুর মুখের চারপাশে এসে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দাঁড়ানো বিন্দু-বিন্দু উত্তেজনার ভিড় দেখতে লাগল রজত।

—কিন্তু আপনাদের ভেতরই যদি থাকে অবজ্ঞা থাকে অনাদর, তবে কি করে কি হবে?

রজতকে আঙ্গুলের টোকায় সিগারেটের ছাই ঝাড়তে দেখে বলল— কি, হাতের ঐ সিগারেটটার ছাই ঝাড়ার মতোই ঝেড়ে ফেলে দিলেন তো কথাগুলোকে আমার একেবারে টাটকা টাটকা?

—না। তুমি একথাই তো বলতে চাচ্ছ যে, প্রয়োজন হয় বলে প্রয়োজনের চাপেই আমরা শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় ভাষাগুলো শিখে থাকি। বাঙ্গলা ভাষার পেছনেও একটা প্রয়োজনের চাপ বা তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে—আর কোথাও না হোক বাংলাদেশটুকুর মধ্যে নিশ্চয়ই। ঠিক। কি করতে হবে বলো?

—আমি বলবো কি করতে হবে!

—তুমিই বলবে। আমার কাছে তো এ-সব অচেনা জগতের চিন্তা।

—তবে সে কথা বলা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমি উঠবো। বৌদিরা অপেক্ষা করবেন খাওয়া নিয়ে। যদি আপনার বান্ধবীদের কেউ বাংলা শেখেন তবে আমি শেখাতে পারি এবং বর্তমানে দেশের প্রয়োজনে নয়, নিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই বলছি। পাছে রজত কথাটার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, তাই ব্যাগ খুলে দু'টুকরো কাগজ বের করে রজতের সামনে ধরে বললো, এই দেখুন না দু'-দুটো কাজের জন্য ঘুরে নিরাশ হয়ে তারপর আপনার কথা মনে পড়েছে, আপনার কাছে এসেছি। একটা টাকা রোজগারের উপায় না করতে পারলে চলবেই না যে।

রজত সোফায় বসেই হাত বাড়িয়ে পাশের দেরাজটা টেনে খুলল। তারপর তার ভেতর থেকে বের করল একটা চেক-বই আর একটা কলম। টেবিলের উপর লম্বা চেক-বইটা মেলে ধরে প্রথমে লিখল মঞ্জুর নাম। তারপর একটা টানা সই দিল নিজের। কাগজটা ছিঁড়ে কাগজ চাপা দিয়ে রাখল মঞ্জুর সামনে।

বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু— কি এটা?

—চেক। তোমার প্রয়োজনটা আমি জানিনে। অঙ্কটা তুমি বসিয়ে নিও।

চেকটা হাতে তুলে নিল মঞ্জু। কিছুক্ষণ নীরবে রজতের নাম সইটা দেখলে, তারপর চোখ তুলে বললো— পাঁচ দশ বিশ হাজার—বসাবো?

—বসাও।

—কিন্তু তারপর আর যে কোন দিনও আমাকে দেখে দিন ভালো যাবার কথা আপনার মুখে আসবে না?

—আসবে।

—আসবে?

—হাঁ আসবে। তুমি রোজ এসো।

—এমনি সাদা চেক সই করে দেবেন একটা করে?

—দেবো।

—তারপর?

—তারপর যে দিন না পারবো সে দিন তুমি খাওয়াবে আমায়।

— আমি? কিন্তু টাকা নিয়ে তো আমি জমিয়ে রাখবো না? তখন আপনার এক সন্ধ্যার উপকরণ সংগ্রহের সাধ্যও যে আমার মত বিশটা মঞ্জুর হবে না।

—ছেড়ে দেবো।

— পারবেন না।

—পারবো। দেখো তুমি।

—শুভস্য শীঘ্রম্। আজ থেকেই। বার বার চেক কাটার দরকারটা কি। কেটে দিন একবারে। আপনার কিছু নয়।

হাসল রজত—না 'আমার কিছু নয়।

আজ সন্ধ্যায় আসবো আমি দেখতে। ঠিক?

উঠে মঞ্জুর সোফার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রজত তার তামাটে হাতের লম্বা লম্বা আঙ্গুলে মঞ্জুর মাথাটা সস্নেহে একটু চাপড়ালো। তারপর দু-হাত পেছনে রেখে পায়চারি করতে লাগল ঘরের এ-মাথা ও মাথা।

টেবিলের উপর থেকে রজতের কলমটা তুলে নিয়ে ময়ূরের উল্টানো পেখমের মতো গোটা নয় দশ পেখমধরা নয়ের সারি চেকটার মধ্যে লিখে কলম বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু।

— নিলে না!

—কাজের খোঁজ নিতে আসবো। মনে থাকবে তো আপনার?

—থাকবে। সেই খোলা দেরাজটার ভেতর একসঙ্গে ভাঁজ করা সামনে যে দশ টাকার নোটের পাঁজাটা ছিল সেটা তুলে মঞ্জুর ব্যাগটা ওর হাত থেকে নিয়ে তার ভেতর ভরে দিতে দিতে রজত বলল—ধার দিলাম। কাজ পেয়েই শোধ দিও।

এ টাকা যে ওর পক্ষে এখন কি, জানে শুধু মঞ্জু। কিন্তু এ ঘর থেকে টাকা হাতে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। এর চাইতে অসুন্দর দৃশ্য ওর ধারণা ও আর কোন দিন কিছু দেখেনি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

ব্যাগটা নিজ হাতে মঞ্জুর কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে রজত বলল—সব কিছু নিয়ে এতো অযথা ভাবতে নেই। বিশেষ করে তোমার মুখে চিন্তা মানায়, ভাবনা মানায় না একেবারেই।

প্রয়োজনের চেহারা এক এক সময় এমন দুর্দান্ত হয়েই দেখা দেয়, যখন অসুন্দরকে শুধু বুঝি চোখ বুজে আর ঢোক গিলেই এড়াতে হয়।

বাড়ীতে ঢোকার আগে টাকাগুলো ব্যাগ থেকে বের করে রুমালে জড়িয়ে বুকের ভেতর ঢোকালো মঞ্জু। কোথায় রাখবে, কে দেখে ফেলবে কে জানে! কথায় বলে, সাবধানের মার নেই। সে টাকা আর মঞ্জু বেরই করল না জামার ভেতর থেকে। বিকেলে গা ধুতে গিয়ে মনের ভুলে গায়ের জামা খুললে ঘামে ভেজা রুমালশুদ্ধ টাকা পড়ে গিয়েছিল মেঝের উপর। টাকাটা তুলে হাতে নিয়েও কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সে। যদি ও দেখতে না পেত, খেয়াল না করত! এই তো মৌরী এসে দরজায় দাঁড়িয়ে তাড়া দিয়ে গেল তাড়াতাড়ি করবার জন্য। ও বেরুতেই তো সে এসে ঢুকতো। তার চোখেই তো পড়ত রুমালে জড়ানো এই টাকা। সেই তো উপুড় হয়ে তুলত। তারপর পাগল হয়ে উঠত না সে। ক্ষেপামি শুরু করত না সে! শুনত কোন যুক্তি? মানত কোন কারণ? রজতের এই দেওয়ার পেছনে কোন মতলব নেই, ওর এই নেওয়ার পেছনে কোন অমর্যাদা নেই—দুই ঠোঁটে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো বিদ্রুপের ঢেউ তুলে ছুড়ে ফেলে দিত না কথাগুলোকে মৌরী ঢেউ-এর মাথারই বস্তুর মতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মঞ্জু যেন যে দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, তার ত্রাস আর অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ার আরাম এই দুই অনুভূতির উপর দিয়ে একবার সখের পদচারণা করে এলো।

॥ ২৪ ॥

সান্ধ্যস্নানান্তে মঞ্জু পোষাকটা এমন ভাবেই করলে যেন বাড়ীতে থাকার আর পড়াশুনা করতে বসারই বোঝায়। আবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যদি শাড়ী কাপড়টার উপর চোখ বুলোতে বুলোতে কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়, যায় না, এ ভাবে একটু পার্কটায় ঘুরে আসা? তবেও যেন কেউ আপত্তি তুলতে না পারে। ছুটির দিন সমস্ত সকাল দুপুর বাইরে বাইরে কাটিয়ে ফের সন্ধ্যায় স্পষ্ট করে বেরুবার জন্যই বেরিয়ে পড়বে বাড়ী থেকে, এতো সাহস মঞ্জু মৌরীর কাছে রাখে না। এখন বেরুতে হলে একটু ফাঁকি দিয়েই বেরুতে হবে। আজ একেবারে এক্ষুণি না বেরুলে যে তার চলতো না তা অবশ্যি নয়। কাল সকালে কলেজে যাবার আগে সে অনায়াসে জয়াদের বাড়ী টাকাটা পৌঁছে দিয়ে যেতে পারতো; তার পক্ষে সুবিধেও ছিল সেটাই। আজকের সন্ধ্যার পড়াটা নষ্ট হতো না। কিন্তু প্রথমত টাকাগুলো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে বুকে করে, দ্বিতীয়ত দুঃসময়ে কারু হাতে প্রত্যাশার অতিরিক্ত টাকা তুলে দিতে পারার ভেতর যে একটা আনন্দ আছে সেই আনন্দটা কিছুতেই বিলম্ব সইতে চাইছিল না। তৃতীয়ত ওর ভেতরে এমন একটা চঞ্চলতা ছিল যে ওকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। এতোগুলো টাকা ওকে কেউ এভাবে দিতে পারে, ইচ্ছেমতো টাকা তুলে নেবার জন্য দিতে পারে সাদা চেক—ওকে দেবার জন্য একজনের এমন হাত বাড়িয়ে আসতে দেখার নতুন স্বাদটা কেবলি ওর হাত-পায়ের ভেতর চঞ্চলতার ঢেউ তুলে তুলে বয়ে যাচ্ছিল।

চমকলাগা ঘটনায় প্রথম পর্যায়ে মানুষের অনুভূতিটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তার কাজ আরম্ভ হয় কিছু পরে। রজতের চেক দেওয়া, সেটা দেখা, পড়া, টাকার অঙ্ক লিখবার শূন্য সাদা জায়গায় নয়ের সার বসিয়ে যাওয়া থেকে, রজতের ওর ব্যাগে টাকা ভরে ওর কাঁধে নিজের হাতে ঝুলিয়ে দেওয়ার সময়গুলো পর্যন্ত মঞ্জুর সমস্ত অনুভূতিটাও ছিল ভোঁতা হয়ে। কিন্তু তারপর দুপুর বেলা যখন বিছানায় শুয়ে তার চোখ বুজবার অবসর মিলল তখন জীবনের এই নতুন আস্বাদনটা যে তার মনকে আন্দোলিত করে চলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তা যতই জানুক মঞ্জু, এমন—না গোণা টাকা রজত দিয়ে থাকে। তার এই দেওয়ার মধ্যে কোন বিস্ময় নেই, কোনো নতুনত্ব নেই। বিস্ময় যদি থেকে থাকে তো রয়েছে ওর এই নেওয়ার মধ্যে,—যতই জানুক সে কথাটা জানলে মৌরী পায়রার মতো গলায় কণ্ঠনালী ফুলিয়ে তুলে প্রশংসার ভঙ্গিতে যে মাথা নাড়বে তার সবটাই নির্ভেজাল শ্লেষ বিদ্রূপ পরিহাস, শিকারীর শিকার ধরবার পদ্ধতির প্রতি তারিফ। মন এতো ওটা এটা সেটা জানার ধার ধারে না। বরং উল্টোটা জানতে চায় না, জানতে অস্বীকার করে। কে কি রকম মানুষ তার চাইতে বড় কথা মনের কাছে মানুষের কোন ব্যবহারটা তার কাছে কেমন লাগে। বদরাগী মানুষের অহেতুক মেজাজ কী আমাদের মেজাজ খারাপ করে তোলে না? মুখ খুললেই মুখ আলগা কথা বলা লোকের অশ্লীলতা কী আমাদের মার্জিত রুচিকে পীড়িত করে না? তোষামোদকে মিথ্যা জেনেও কী মন খুশী হওয়া থেকে বিরত থাকে? মিথ্যাচরিত্রের মানুষের মিথ্যাচরিত্রের কথা জেনেও তার মিথ্যা ভালোবাসার কথা শুনতে কী আমরা ভালোবাসিনে?

সত্যি, মনের কাজ অত চরিত্র বিচার করে হয় না। যে ব্যবহারের যে কাজ তাই করে চলে। উত্তেজিত হবার মতো হলে করে তোলে উত্তেজিত। চঞ্চল করে তোলার মতো হলে করে তোলে চঞ্চল। সুন্দর হলে করে মুগ্ধ। ভালো লাগার হলে যায় ভালো লাগিয়ে দিয়ে। তাই সব জানা সত্ত্বেও এমন দেওয়ার সে স্বাদ মঞ্জুর মনে কিছু এলোমেলো হাওয়া বয়ে আনলই। চুলগুলো সামনে এনে, বুকের উপর ফেলে মুখ নিচু করে জট্‌মট্ শুদ্ধ বিনুনি পাকিয়ে চললো সে।

একটা মস্ত সবুজ রং-এর শুকনো তোয়ালে ভিজে ঘাড়ের দুদিক দিয়ে চাদরের মতো ঝুলিয়ে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মৌরী। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে কানের পেছনের জল মুছতে মুছতে বললো, জানিস মঞ্জু, ল'টা দস্তুর মতো ইনটারেস্টিং সাবজেক্ট। পড়ছি আর বিষয়টা যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। 'আইনের চক্ষে চক্ষুলজ্জা নেই' কথাটা কি সুন্দর। একজন আইনজ্ঞ কাউকে পেলে বসে বসে তার কাছে পাঠ নিতাম।

মনোযোগী শ্রোতা নীরবে কথা শুনে চলতে পারে কিন্তু অন্যমনস্ক শ্রোতার মনোযোগ বোঝাতে অবান্তর কথায় যেতে হয়। বিনুনিতে আঙ্গুল ঘোরাতে ঘোরাতে মঞ্জু বললো, চক্ষুলজ্জা না থাকা কথাটাকে তোর সুন্দর কথা মনে হলো! তোর নিদারুণ মাত্রা-বোধটা তো চক্ষুলজ্জারই রূপান্তরিত চেহারা।

আপত্তি জানালো মৌরী, কখনোই নয়।

জানে মঞ্জু কখনোই যে নয়। তবু কথা বলতেই হবে তাকে। নইলে এক্ষুণি ওর দিকে তাকিয়ে মৌরী জিজ্ঞাসা করে বসবে, কি ভাবছিস অত?

বললো কেন নয়?

—মাত্রাবোধটা হলো রুচিবোধ সৌন্দর্য্যবোধ, এ একেবারে ভেতরের বস্তু। চক্ষুলজ্জাটুকু তো নিতান্ত একটা দু চোখের পাতার ব্যাপার। সত্যিকারের সংস্কৃতির তার দরজা পর্যন্ত কখনো গিয়ে দাঁড়াতেই হয় না।

—তবু দরজা-জানালার পর্দার মতোই দরকারী জিনিষ ঐ চোখের দু পাতার লজ্জাটুকু বা তার চাইতে দরকারী। টুকু বলেই ঐটুকুও না থাকলে তার বন্ধুত্ব ভয়াবহ।

তক্ষুণি মাথা কাত করে স্বীকার করল মৌরী— সে নিশ্চয়। আর আমি এদিক দিয়ে কথাটা বলিওনি। ল'জার্ণালে এই আইনের চক্ষে চক্ষুলজ্জা না থাকার উপর এমন কয়েকটা ইনটারেস্টিং দৃষ্টান্ত পড়লাম না, তুই শুনলে—

গল্প শোনার জন্য মঞ্জু শীতের মধ্যরাতে লেপ ছেড়ে উঠে আসতে পারে কিন্তু এখন আর পনেরোটা মিনিটও সে দিতে পারে না। এই মিনিট কটাই বাইরের সন্ধ্যার শেষ আলো আলো ভাবটার উপর আর যতটুকু অন্ধকার ঢেলে দেবে, তাতেই বেরুবার কথা বললে দু চোখ কপালে তুলবে মৌরী— এই রাতে! তা বলুক না মঞ্জু ঘরের কোণের পার্কটার কথা।

হঠাৎ একেবারে মৌরীর কাছে গিয়ে তার চুলের দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্যে তাকাতে তাকাতে বলে উঠল মঞ্জু— দিদি তোর মাথায় পাকা চুল না কি?

—যাঃ।

—হ্যাঁ, দেখলাম যে!

—কোথায়? মৌরী আয়নার একেবারে কাছে এগিয়ে গিয়ে চুলের ভেতর ফাঁক করে দেখতে দেখতে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললো— পাকলেই বা কি।

মঞ্জু ততক্ষণে মৌরীর চুলের সামনেটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিয়ে বললো— না, ভিজে চুলে বাতির আলো পড়ে চক্ চক্ করে উঠেছিল। কিন্তু পাকলেই বা কি মানে? কেন অসময়ের সব কিছু মিষ্টি লাগার মতো অসময়ের পাকা চুলও মিষ্টি নাকি?

হেসে উঠল মৌরী। ঘাড়ের তোয়ালে নামিয়ে রেখে চিরুণী হাতে নিয়ে চুলের জট ছাড়াতে বললো— বেশ মিষ্টি। কাঁচা-পাকায় মেশানো নয়, একদম সাদা, নয়তো একদম সোনালি চুল আমার অপূর্ব লাগে। পিসিমার মাথার সোনালি চুলগুলো তো আমার দস্তুরমতো লোভের বস্তু। কেটে নিয়ে গুছি বানাতাম যদি আমার চুলের রং অমনি করে তুলতে পারতাম। মনে মনে স্থির করে রেখেছি, পিসিমার ঐ চুল আমি রেখে দেবো। তার পর এক দিন ঐ রং তো ধরবেই চুলে।

উসখুস করছিল মঞ্জু। মৌরীর কথা শেষ হতেই উপুড় হয়ে খাটের তলা থেকে চটিজোড়া বের করে এনে পা ঢোকাতে ঢোকাতে বললো— এত দিন বলিসনি কেন? কত অমন সোনালি চুলের গুছি জোগাড় করে দিতাম। তার পর ব্যাগটা হাতে নিয়ে মৌরীর দিকে আর তাকালো না সে।—এই কাছেই এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা বই নিয়ে এক্ষুণি আসছি রে। বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়ে একেবারে বারান্দা দিয়ে লম্বা হাঁটা দিলো।

আর মঞ্জু চলে গেলে আয়নার দিকে তাকিয়ে ফের চুল আঁচড়াতে গিয়েও বাতির আলোয় রূপালী ঢেউ খেলে চলা সাদাচুলের দিকে তাকিয়ে হাতের চিরুণী নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মৌরী—হাঁ, সে সত্যি বসে আছে 'উত্তর-ত্রিশে'র দিনগুলোর জন্য। যৌবন পার হয়ে 'উত্তর ত্রিশে'র কবির ভাষায় বলে উঠবে সে, বেঁচেছি— যৌবন পার হয়ে এসে বেঁচেছি আমি। বেঁচেছি আমি নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত থেকে, ক্ষণিক আকস্মিক হাওয়ায় আন্দোলিত হওয়া থেকে। একটি মুহূর্তের একটি অনুভূতি আর মনকে আমার কানে ধরে নাচাতে পারবে না। আর আনন্দকে খামখা মন-খারাপের হাওয়া এসে মলিন করে তুলবে না। আজ আমি ভাব-উচ্ছলতাকে বাঁধতে পেরেছি বুদ্ধির দৃঢ়তায়। অনুভূতির সঙ্গে মিলে গেছে আমার পর্য্যবেক্ষণ। দেহের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ শক্তি এখন আমার দখলে। জেনেছি আমি আজ তাদের সুমিত প্রয়োগ— বেঁচে গেছি আমি। সোনালি

রংধরা চুলে কপাল-টানা খোঁপা থাকবে তখন তার মাথায়। চোখে থাকবে পুরু কাচের চশমা। মুখে থাকবে মধ্য বয়সের গভীর গম্ভীর একাগ্রতা—এইরূপ, এই বুদ্ধি, এই বয়সের জন্য বসে আছে সে। কিন্তু তার মধ্যে এ কে! সুদর্শন। একেবারে আচমকা ঘরে ঢুকে সুদর্শনকে পেছনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে একটা আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একেবারে চমকে পেছন ফিরল মৌরী। যেন সুদর্শনের উষ্ণনিঃশ্বাসে ওর ঘাড়ের অলকগুচ্ছকে দুলিয়ে দিল— শুধু তাই নয়, ঠিক প্রথম দিনের মতো দুরন্ত সাহসে ওর লম্বা ঘাড়ের উপর চেপে ধরলো সে তার চাপা ঠোঁট। হাতের চিরুণী ফেলে দিয়ে ক্ষুব্ধ ভাবে গিয়ে চেয়ারে বসে রইল মৌরী ঠিক আত্মজার অবাধ্য ব্যবহারে অসন্তুষ্ট অভিভাবকের মতো। যুক্তি মানে না, ভালো মন্দ নিজেও বোঝে না— কেউ বোঝালেও শোনে না— এমন কারু সঙ্গে ঘর করার মতোই অপূর্ব আরাম এই নির্বোধ মনটাকে নিয়ে ঘর করা।

একসঙ্গে এমন ভাঁজকরা এক পাঁজা টাকা জয়ার মা শীগগির দেখেন নি। কথা তো নয় যেন একটা কাগজ ছেঁড়া ফ্যাস-ফ্যাসে আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে— কত টাকা এখানে?

তাই তো! কত টাকা এখানে জানে না তো মঞ্জু। গুণে দেখেনি তো সে। গুণে দেখবার কথা মনে হয়নি তো তার। জয়ার মার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গেলার আন্দাজ সময় নিতেই হলো মঞ্জুকে। এতে আছে, আচ্ছা দিন আর একবার দেখে দিচ্ছি ভালো করে। যেন যতই গুণে আনা যাক, টাকা কারু হাতে দেবার সময় সামনা-সামনি আর একবার গুণে তবেই দিতে হয়। জয়ার মার হাত থেকে টাকা নিয়ে গুণতে গুণতে এতক্ষণে ওর চৈতন্য হলো, টাকা গুণে না আনার মতো একটা বোকামিই যে সে করেছে তা নয়। একসঙ্গে এতোগুলো টাকা এনেও করেছে আরো একটা বোকামি। তার বোঝা উচিত ছিল দশ-পাঁচ করে এনে হাতে দিতে পারার সংখ্যার ভেতর হঠাৎ এই পাঁজা-ভাঁজ টাকা স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ডেকে আনবে, এ টাকা কোথায় পেলো সে বা কে দিল তাকে এ টাকা। আর এ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে জয়ার মা যে কি না কি ভেবে বসবেন তাই বা কে জানে?

হলোও ঠিক তাই। তার জিজ্ঞাসার জবাবে মঞ্জুর আটকে যাওয়া বিব্রত ভাবটা জয়ার মার দৃষ্টি এড়ালো না। 'ঘর পোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।' ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। কোন বিপজ্জনক পথে অজ্ঞাতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে না তো মঞ্জু। তার মতো বুড়ো মানুষটাই কি প্রথম বুঝে উঠতে পেরেছিলেন কিছু! তার ভদ্র মন তো ইচ্ছে করে এ পথ বেছে নিয়েছিল না— এমন কি অনিচ্ছা করেও নয়। অজান্তে গিয়ে পড়েছিলেন, ঠিক অন্ধকারে গিয়ে খানায় পড়ার মতো পড়েছিলেন। উপার্জ্জনের চেষ্টা করেছিলেন তিনি মেয়েকে নিয়ে নানা ভাবে। পারেন নি। মুদী বাকী দেওয়ার বিস্তৃত জালে জড়িয়ে ফেলে যখন প্রতিদিনের অন্ন তার দয়ার উপর নিয়ে দাঁড় করালো তখন কোথা দিয়ে যে কি ঘটে চলতে লাগলো প্রথমে কি তিনিই তা বুঝে উঠতে পেরেছিলেন। আর শুধু কি তিনিই—এখানকার দু'দিককার রাস্তার ফ্ল্যাটগুলোর বন্ধ ঘর তো ঠিক তারই মতো না, না, বুঝতে বুঝতে গিয়ে এই একই লোকের ফাঁদে পা দিয়ে আজ পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়েছে। মুদীর ব্যবসাটা মুদী দোকান নয়, আসল ব্যবসা তার পাড়ার অভাবী ঘরগুলোকে ধার দিয়ে, বাকী দিয়ে তাদের তরুণী কন্যাদের খপ্পরে এনে ফেলা— বুঝেছিলেন কি তিনি কিছু। এতো কিছু বোঝবার মতো শক্তিও ছিল না তার। চারটে শুকনো হাড় তখন তার দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুধু ধুঁকতো। তারপর খাদ্য পেয়ে, পথ্য পেয়ে শরীরের রক্তকণিকাগুলো যখন বল ফিরে পেয়ে সতেজে শরীরময় চলাফেরা করতে করতে তাকেও দেয়াল নির্ভর ছেড়ে পিঠটান করে দাঁড় করিয়ে দিল, তখন তার সেই মরতে মরতে বেঁচে ওঠা রক্তকণিকাগুলো বেঁচে থাকার কথা ছাড়া কোন কথাই শুনতে চাইলে না। আর সেদিনই তিনি প্রথম জানালেন মানুষ বাঁচার পায় সব সম্ভ্রম সব বৃত্তি বলি দিতে পারে। তবু তারও মধ্যে বড় প্রশ্ন ছিলেন তিনি নিজে নন, সন্তান। এক সন্তানকে বলি দেওয়ার জন্য মন প্রস্তুত করেছিলেন তিনি আর এক সন্তানের দিকে তাকিয়ে। তাই মঞ্জু লোকটাকে চড় মেরে তাড়িয়ে দিলে—আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি একূল ওকূল দু'কূল যাওয়ার চরম আতঙ্কে। সব দায় নেবার মঞ্জুর দেওয়া ভরসায়ও কোন ভরসা, কোন বল পাননি। কিন্তু আজ মঞ্জু তার সব চাইতে বড় বল। আজ মঞ্জু তার ফের সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারার সম্ভবনাময় স্বপ্ন। দয়া ধর্ম দান উদারতায় আজ আর বিশ্বাস নেই জয়ার মার। একমাত্র জৈব দুর্বলতার কারণ ছাড়া কোন কারণ বিশ্বাস করেন না পুরুষের দয়ার।

আজও অর্থনৈতিক জগতের একচ্ছত্র অধিপতি পুরুষ। সে ছাড়া কে দেবে মঞ্জুকে টাকা। আর তাই যদি হয় তবে তার দুর্বলতার ভিতের উপর পা না রাখলে তার মুঠো এতটুকুও খুলবে না—এতটুকুও না। আকুল উৎকণ্ঠায় বলে উঠলেন তিনি— কে দিলে মঞ্জু তোমায় এ টাকা, কে দিলে?

বুঝলো মঞ্জু সবই বুঝলো। মৌরীর ধারণা রজতের মতো লোকেরা এই এক মতলবেই যা করে সব করে। জয়ার মার অভিজ্ঞতা আরো বেশী, তাই তাঁর ধারণা সবাই, সবাই তাই। রজত বলে পুরুষের জগতে কোন আলাদা জাত নেই। এই কি সত্য বলে মেনে নিয়ে মঞ্জুর রজতের হাত থেকে টাকা নেওয়ার অপমানে মুখ নিচু করতে হবে?

না—দুর্বলতার দেওয়া মাত্রই নোংরা এই যদি তার বিশ্বাস হতো তবে যদিও রজত ধার শোধ দেওয়ার কথা বলেই টাকা দিয়েছে, মঞ্জুও শোধ দেবার কথা মনে রেখেই টাকা নিয়েছে—তবুও এ টাকা মঞ্জু গ্রহণযোগ্য মনে করতো না। তাহলেও সত্য বলা যায় না। জয়ার মার দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু খাওয়ার অভিনয় করলো মঞ্জু— যেন বলবার ইচ্ছে ছিল না, তবু বলতে হচ্ছে এমনি ভাবে বললো— মার না ইয়া মোটা একটা হার ছিল। বুড়ো আঙ্গুল আর মধ্যমার বেড়ে একটা মোটার পরিমাপ দেখালো সে।

মনের ভেতরটা যেন শান্তিতে একবার চোখ বুজে নিল জয়ার মার। তবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি— সেটা তুমি লুকিয়ে বিক্রি করে এলে নাকি?

ঠিক আছে। এতক্ষণে গুছিয়ে বসে গুছিয়ে বলে চললো মঞ্জু। না, বিক্রি করতে যাবো কেন? রেখে টাকা এনেছি। সামনের মাসেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো। ও হাঁ—ভালো কথা, আপনাকে বলাই হয়নি যে আমি একটা টুইশনের কাজ পেয়ে গেছি। আর একটাও হয়ত সামনের মাসে পেয়ে যেতে পারি। একটা হলে পঁচাত্তোর টাকা পাবো। দুটো হলে পাবো পঁচাত্তোর পঁচাত্তোর করে দেড়শ'। (ভেতরে ভেতরে রজতের সাহায্যে এমন দুটো কাজ পাওয়া কিছুই যে অসম্ভব কথা নয়— হলেও হয়ে যেতে পারে এবং পঁচাত্তোর পঁচাত্তোর দেড়শ নয়, একশ একশ করে দু'শ টাকাও মাইনে হতে পারে। ইউরোপীয়ান মহিলারা এমনি মাইনেই দেয়। এই একটা উত্তেজনায়ও মঞ্জুর বুকটা যেন বার কয় দ্রুত তালে চলে নিল। যেন এ সংসারটার বেকার গৃহস্বামী সে।) বললো কাজ এ মাসে হলেও মাইনে পাবো তো সেই সামনের মাসে। এ মাসটা চলতে হবে তো আমাদের। বাড়ীভাড়া জমে আছে, আরো কত কি জমে আছে। সামনের মাসে মাইনে পাবো, এ টাকা থেকেও হয়তো থেকে যাবে— নিয়ে আসবো হার ছাড়িয়ে। জানতেই পারবে না কেউ। না রে জয়া? জয়ার দিকে তাকালো সে। ঘরের মাঝখানে একটা মোড়ায় বসেছিল জয়া। কিছু জড়িয়ে আনা কোঁচকানো মোচড়ানো একটা পুরোনো কাগজের পাতা টান করে নিয়ে বসে নিবিষ্ট মনে যেন সে কি দেখছিল। মঞ্জুর সম্বোধনে চোখ তুলল। মঞ্জু বললো—সিন্দুকের ভেতর মরা সাপের মতো পড়ে থাকে তো বিড়ে পাকিয়ে। মাঝে মাঝে সেই অন্ধকার বিবর থেকে বেরিয়ে এসে যদি মানুষের কাজে এসে যেতে পারে, তবে ওরই নিজেকে ধন্য মনে করা উচিত, নয় জয়া?

জয়া যেমন হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইল। কোন সাড়া এলো না তার কাছ থেকে।

মঞ্জুর কাজ হয়ে যাওয়ার কথা শুনে এক দিকে যেমন খুসীর অন্ত রইল না জয়ার মার, অপর দিকে তেমনি পরীক্ষার বছর দু'দুটো মাষ্টারি করলে মঞ্জুর নিজের পড়ার যে ক্ষতি হবে সে কথা ভেবে খুশীর অনেকটাই যেন উবে গেল তার। তক্তপোষের তলা থেকে তোরঙ্গটা টেনে বের করে টাকাটা তুলে রেখে দাওয়ায় গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ আগে ধরিয়ে রেখে যাওয়া ধোঁয়া ওঠা উনোনটার অসমান কয়লাগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে দিয়ে ওদের জন্য চায়ের জল চাপালেন উনোনে। হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সক্ষোভে যেন বলে চললেন আপন মনে কত কি। তার ভেতর একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে কানে এলো মঞ্জুর— নিজের মেয়ের সর্বনাশ তো করে বসে আছিই। আবার না অন্যের মেয়ের ভবিষ্যৎটাও নষ্ট করি।

জয়ার দিকে তাকালো মঞ্জু। মার এ জাতীয় কথা সহ্য করতে পারে না জয়া। শোনামাত্র কখনো ওঠে তার মুখ একেবারে সাদা হয়ে, আবার কখনো ওঠে সে দুরন্ত ক্ষেপে। জয়াকে বাঁচিয়ে কথা বলতে পারেন না জয়ার মা। সে সতর্কতাবোধও তাঁর নেই। কিন্তু মার কথা জয়ার কানে গেছে মনে হলো না। এতক্ষণ তার দৃষ্টিটা ছিল হাতের কাগজের দিকে, এখন দৃষ্টিটা পাঠিয়ে দিয়েছে সে বাইরের অন্ধকারের দিকে। সে আজকাল শূন্য-দৃষ্টিতে

বসে বসে কেবল ভাবে আর ভাবে। কি ভাবছে জিজ্ঞাসা করলে ততোধিক শূন্য দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্জু চৌকি থেকে উঠে গিয়ে মেঝেতে বসে ওর পিঠের উপর হাত রাখল। কি খবর আছে এই সাত বাসি খবরের পাতায় দেখি।

—খবর নয় ছবি দেখছি।

— কিসের ছবি? উঁকি দিল মঞ্জু।

পত্রিকাটা তুলে দিল জয়া মঞ্জুর হাতে।

ছবিটা মঞ্জুর না-দেখা নয়। বহুদিন আগে বেরিয়ে গেছে কাগজে। পতিতাবৃত্তি বন্ধের প্রতিবাদে পতিতাদের নীরব প্রতিবাদের ছবি। রাস্তা পরিক্রমা করে এসে মাঠের উপর বসে আছে এক মাঠ মেয়ে, ঘোমটায় মুখগুলো প্রায় আবৃত করে নিয়ে।

আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল জয়া ঘরে মঞ্জুকে চমকে দিয়ে, বাইরে বসে থাকা মাকে চমকে দিয়ে। তারপর যেন তার সেই পাগলা হাসি থামতে চায় না আর। দেখলি ছবিটা?

যেন ছবিটা সত্যি হাসি পাওয়ার, এমনি ভাব দেখিয়ে জয়াকে খুশী করতে হাসল মঞ্জুও।

আর তক্ষুণি গম্ভীর হয়ে গেল জয়া। তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল— হাসলি যে তুই? হাসিটা মুখের ভেতর— সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে জয়ার পিঠে হাত বুলোতে লাগল মঞ্জু—এমনি হেসেছি আমি।

—এমনি হাসবি কেন?

আমতা-আমতা করল মঞ্জু— ঠিক এমনি নয়। তোকে হাসতে দেখে হেসেছি।

—আমি কেন হেসেছি তুই জানিস?

—না তো।

—তবে কারণ না জেনে পাগলের মতো হাসতে গেলি কেন? তুই কি পাগল?

—সত্যি অর্থ হয় না; কিন্তু এক এক সময় কারণ না জানলেও কাউকে ভীষণ হাসতে দেখলে হাসি এসে যায় না?

ঠাণ্ডা হলো জয়া। আমি হেসেছি কেন জানিস?

সাংঘাতিক একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে রইল জয়া মঞ্জুর দিকে।

ক্ষীণভাবে মাথা নেড়ে মঞ্জু বললো— না।

— কি করে জানবি। খাচ্ছিস, পরছিস, সুখে আছিস। কিন্তু চিন্তা করবার যে কত কি আছে তোরা ভেবে দেখিস না। কেউ ভেবে দেখছে না। আচ্ছা এই দেখ—কাগজটা মেঝেতে পেতে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো— এটা দেখার পর সেই থেকে আমি কেবল ভাবছি— বলে হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল জয়া।

দুই ঠোঁট এক করে বসে রইল মঞ্জু, যদি এই চুপ করে থাকার ভেতর জয়া বিষয়টা ভুলে যায় সেই অপেক্ষায়।

কিন্তু আশ্চর্য্য! সুশৃঙ্খল চিন্তায় ফিরে এলো জয়া তার পূর্ব-বক্তব্য। বললো—আমি কেবল ভাবছি, এরা ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসেছে। কিন্তু পুরুষগুলো কি নির্লজ্জ রে—এই ছবিটা নিয়ে সবার চোখের উপর ঘোমটা ছাড়া ঘুরছে! গালের দু'পাশের, কপালের, দু চোখের তলার কালো রেখাগুলো আরো গভীর দেখাতে লাগল জয়ার।

এবার পত্রিকাটা টেনে নিয়ে আবোল-তাবোল ভাঁজ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল মঞ্জু টেবিলের উপর। আদেশের সুরে বললো— জয়া, এ সব নিয়ে আর কখনো মাথা ঘামাবে না তুমি। আমি যেমন এ জগতের নই তুমিও তেমনি এ জগতের কেউ নও।

আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল জয়া—আমি নই এ জগতের?

— না তুমি নও এ জগতের। পড়াশুনা আরম্ভ করতে হবে তোমার, পরীক্ষা দিতে হবে— তোমাকে।

— কি করে? কি করে পরীক্ষা দেবো আমি? যেন কেঁদে উঠল জয়া—আমার কিছু মনে থাকে না— কিছু না।

— মনে না থাকলেই যদি পড়াশুনা না হয় তবে আর কি। আমি ছেড়ে দিই পড়া। কারণ আমারও কিছু মনে থাকে না। এই তো এই মাত্র দেখলি গুণে আনা টাকাও দিতে গিয়ে ফের গুণে দিতে হলো। ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে বৌদি দিদিরা বলেন, আমার নাকি জুড়ি মেলা ভার।

—না, না, ব্যাকুলভাবে মাথা নেড়ে উঠল জয়া। তোর ভুলে যাওয়া এক জিনিষ নয়। মাথাটাকে এক এক সময় ফাঁকা বেলুনের মতো মনে হয়—মনে হয় যেন শূন্যে উড়ে গেল বলে— মরে গেলাম বলে।

জয়ার মা চা আর মুড়ি ভাজার বাটি নামিয়ে রেখে গেলেন। মঞ্জু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভাজা মুড়ি মুখে ফেলে চলে গেল একেবারে অন্য কথায়— দাবা খেলা জানিস?

— দাবা? দু চোখ বড় করলো জয়া।

— হ্যাঁ দাবা! দিন রাত হাবি-জাবি ভাবলে মাথা এমনি শূন্য মনে হয় সবারই। দাঁড়া, দাবা খেলা শিখিয়ে দেবো তোকে। দেখবি মনের একাগ্রতা কেমন বেড়ে যাবে। অন্য কোন কথা মনে আসবে না। নে চায়ের কাপ নে। জয়ার হাতে কাপ তুলে দিল মঞ্জু। টেবিলে বসে থাকা জয়কে ডাক দিল—চলে এসো জয়, তোমার চা খাবার নিয়ে এখানে। টেবিলের সামনে সেই প্রথম থেকে বই নিয়ে বসেছিল জয়। শুধু বসে নয়, মঞ্জু জানে সে পড়ছিলও। স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না সে, তার বই নেই। তার খাতা নেই তবু সে পড়ছিল— কোন দিকে মন না দিয়ে পড়ছিল। শুধু ওর প্রথম ঘরে ঢোকার সময় একবার চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। তারপর এতক্ষণের ভেতর সে তার বই-এর পাতা থেকে চোখ তুলেছিল মাত্র আর একবার —দিদির অসুস্থ হাসি শুনে। মঞ্জুর সাদর আহ্বানে হাসি মুখে চা আর মুড়ির বাটি দু'হাতে নিয়ে উঠে এসে বসল সে মেঝের উপর। তার দিকে তাকিয়ে মঞ্জুর মনে হলো, ফ্রন্টে যুদ্ধরত সৈনিকের মুখের সতর্কতা সন্দেহ অবিশ্বাস আতঙ্কের মতো যে রেখাগুলো সে প্রথম এসে জয়ের মুখে দেখেছিল, সে রেখাগুলো যদিও আজ মিলিয়ে গেছে তার মুখ হতে, তবু এখনও সেখানে যুদ্ধশান্তির শান্ত স্পর্শ লাগেনি। বহু জীবন জিজ্ঞাসায় ভেতরটা যেন তার উদ্বেলিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা নিয়ে সে কারু কাছে যায় না— যাবে না। যার জবাব খুঁজে বের করাটা রেখে দিয়েছে সে নিজের জন্য।

যেদিন ফ্রন্টে শান্তি ঘোষিত হয়েছিল সেদিন হাতের অস্ত্র নামাতে পেরেই কি শান্ত হতে পেরেছিলেন রেমার্ক? পারেন নি। হয়তো শান্ত হতে পেরেছিলেন কিছুটা শুধু মাত্র সে দিন, যেদিন 'অলকোয়াইট' শেষ করে হাতের কলম নামিয়ে দিলেন। সুকান্তের মুখের অশান্ত রেখায় হয়তো শান্তির ঢিলে ভাব আসতো তখন, যখন তার কলম ছুটে চলতো—

> কলম বিদ্রোহ দ্যাখনি তুমি?
> রক্তে কিছু পাওনি শেখার?...
> কলম বিদ্রোহ আজ—
> ...এতো বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
> দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
> স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
> শুনছো? শুনছো উদ্দাম কলরব—

শুধু বুঝি তখনই তার মুখের তীরের মতো রেখাগুলো দাঁড়াত স্থির হয়ে!

এই কিছু বেশী টাকা জয়ার মা'র হাতে দিয়ে আসতে পেরে দিন-না-চলা বেকার গৃহস্বামীর কিছু দিন নির্ভাবনায় কাটাবার মত সংস্থান করে উঠতে পারার আরামবোধ করতে লাগল মঞ্জু। মাথাটাই যেন হাল্কা মনে হতে লাগলো তার। সে খেয়াল করলে না, এ টাকা ক'টা আর কাজ পাওয়ার একদিনের একটা ভিত্তিহীন অনিশ্চিত আলোচনায় যতটা হাল্কাবোধ করা যায়, তুলনামূলক বিচারে তার হাল্কাত্ববোধের পরিমাণটা অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে। আসলে ঐ টাকা নয় একটা কাজ হওয়ার ভরসাও নয়— সে যা সম্ভাবনা রয়েছে তো রয়েছেই। আর যদি না হয়? মন তাতেও আর অন্ধকার দেখছে না—এই হলো আসল কথা। রজত আছে, এমন একটা হিসাব, তার অবচেতন মন হিসাবের খাতায় ধরে বসে আছে এবং যে অসহায়বোধ সে করছিল তা এখন আর সে করছে না। "আছে"— পেছনের এই থাকার জোরের মত জোর আর কিসে?

টেবিল ঝেড়ে, বইপত্র গুছিয়ে এমন সুশৃঙ্খলায় পড়াশুনা আরম্ভ করে দিল মঞ্জু, বিস্মিত হয়ে গেল মৌরীও। যার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, নিষ্ঠাও তার চোখেই সবার আগে ধরা পড়ে। খুশী হয়ে উঠল মৌরী—হ্যাঁ এ ভাবে পড়লে আমি বলছি, ঠিক তুই একটা ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে যাবি।

জানে না— মঞ্জু জানে না, ফার্ষ্ট ক্লাশ না সেকেণ্ড ক্লাশ, কি সে পাবে। সে জানে পড়াশুনো তাকে ক'রতে হবে। যত কিছুই করুক, তার ভেতরে এ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে, তাকে পথভ্রষ্ট হ'তে হবে। বড় হ'তে হবে তাকে, অনেক বড়। কাজ ক'রতে হবে তাকে— অনেক কাজ। আর এই সবের একমাত্র পাথেয় হ'লো অর্থপুঁজি নয়, বিদ্যার পুঁজি। এ পুঁজি তার সঞ্চয়ে সঞ্চয়ে ভ'রে তুলতে হবেই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়টা মঞ্জুর ওপর নিয়ে এসেছিল একটা অশান্ত হাওয়ার ঢেউ। যেমন বৈশাখ নিয়ে আসে সঙ্গে ক'রে ঝড়। ঠাণ্ডা হয়ে বসবার অবসর মিললো না তার। সময়ের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের আঁক-কষা নির্ভুল হিসাবের মত দুর্ভাগ্য মানুষের— তার জন্মপত্রিকায় তেমন নির্ভুল আঁক হয় না। যদি হ'তো তাহ'লে এমন আয়োজন ক'রে পড়তে না বসে মঞ্জু তৈরী হ'তো সামনের দুর্দৈবের জন্যে।

॥ ২৫ ॥

দিন দশেক পরের কথা।

অফ্ পিরিয়ডে কফি-হাউসে কাপ কাপ কফি সামনে করে বসে মঞ্জুর সব বর্তমান বছরের নোবেল পুরস্কার পাওয়া বইখানা নিয়ে তর্কের তুফান বইয়ে দিচ্ছিল। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। নিছক সাহিত্য আলোচনায় সাধারণত হাওয়াটা এতোটা উত্তপ্ত হয়ে হয়তো ওঠে না, কিন্তু বর্তমানে সাহিত্য পুরস্কারের পেছনে সাহিত্যের মান বিচারের চাইতেও বেশী থাকে রাজনীতি। আর যেখানে রাজনীতি সেখানেই আর না রইল ব্যক্তি, না রইল ব্যক্তির বিদগ্ধ নাম, নিজস্ব মত। রইল কেবল দল আর দলীয় মত। হোক সাহিত্য হোক শিল্প, যে কোন আলোচনার চেহারাটাই গিয়ে দাঁড়ায় তখন তার দলীয় লড়াই-এর মতো। কফি হাউসের টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসে মঞ্জুদের মধ্যেও যা চলছিল তাকে সাহিত্য আলোচনা বলে না—বড়দের এই গোষ্ঠীমতের লড়াই এরই একটা ছোট সংস্করণের জোর মহড়া চালাচ্ছিল ওরা। এমনি সময় হঠাৎ একটা নিতান্ত অপরিচিত ছেলেকে হন্তদন্ত ভাবে উপস্থিত হয়ে এসে একেবারে ওদের টেবিলের পাশে দাঁড়াতে দেখে তর্কের তোড় বন্ধ হয়ে গেল ওদের। একসঙ্গে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ছেলেটির ব্যস্ত-সমস্ত মুখের উপর।

—মঞ্জুদি'—

অপরিচিতকে ওর দিকে তাকিয়ে ওকেই সম্বোধন করে মঞ্জুদি' বলে উঠতে শুনে বিস্মিত ভাবে বুকে হাত দিয়ে নিজেকে দেখালো মঞ্জু— আমাকে বলছেন?

মাথা নাড়লো সে—হ্যাঁ আপনাকে বলছি। শীগ্‌গির উঠে আসুন। ভীষণ জরুরি খবর আছে।

—ভীষণ জরুরি খবর আছে আমার কাছে? বলতে বলতে ছেলেটির মুখের উপর ফেলে-রাখা ওর না-চেনা না-বোঝা দৃষ্টিটা সরিয়ে এনে ত্বরিৎহাতে বই খাতা ব্যাগ গুছিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবতে লাগল, কে ছেলেটি? কে পাঠিয়েছে তাকে ওর কাছে? প্রথমে মুখটা যতটা অদেখা মনে হয়েছিল, এখন যেন ততটা অদেখা মনে হচ্ছে না। ওদের পাড়ার ছেলে? আসতে-যেতে দেখে কিন্তু চেনে না। কথাটা মনে হতেই হাত-পায়ের জোড়াগুলো যেন সব আল্‌গা হয়ে আসতে চাইল মঞ্জুর— কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বাড়ীতে। বাবা-দাদা বাড়ী নেই। আকস্মিক দুঃসংবাদের খবর নিয়ে পাড়ার ছেলে ছুটে এসেছে ওকে নিয়ে যেতে? কি হয়েছে না শুনে আর চলতে পারছে না মঞ্জু। কফি-হাউসের দরজা আর সিঁড়ির স্বল্পপরিসর জায়গাটায় পা দিয়ে থেমে পড়লো সে। ভেতর থেকে গলার স্বরটা টেনে বের করে এনে জিজ্ঞাসা করলো— কি জরুরি খবর? কে পাঠিয়েছে আপনাকে আমার কাছে।

সিঁড়ির দিকেই মোড় ঘুরতে যাচ্ছিল ছেলেটি। মঞ্জু দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা কি জানতে চাইলে দাঁড়িয়ে পড়লো সে-ও। মঞ্জুর দিকে ফিরে বললো—জয়াদি'র মা পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার কাছে। আর পাঠানোর কারণটা বলতে গিয়ে ছেলেটি থেমে পড়ে যে মুহূর্ত সময়টুকু নিল, তারই মধ্যে মঞ্জুর মনের ভেতর খেলে গেল— হ্যাঁ, ঠিক। জয়াদের বাড়ীর উল্টোদিকের পানের দোকানটায় যে ছেলেগুলো সকাল সন্ধ্যা দুপুর কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে, পান খায়। যাদের এতো বাজে লাগে ওর যে পাছে ওদের উপর দিয়ে চোখ পড়ে এই জন্য পানের দোকানটা পার হয় মঞ্জু ঘাড়টা একেবারে উল্টো দিকে ফিরিয়ে তাদেরই ভেতর একে ও দেখেছে— না তাকানোর ভেতরও যে তাকানোটুকু হয়ে যায় তারই মধ্যে দেখেছে।

সম্ভবত এই থমকানো মুহূর্তটা নিল ছেলেটি কথাটা এখানে দাঁড়িয়েই মঞ্জুকে বলবে না গাড়ীতে গিয়ে বলবে, এটাই ঠিক করে নিতে, তারপর বললো, জয়াদি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। সিরিয়াস অবস্থা—

আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল জয়া! সিরিয়াস অবস্থা তার। বিমূঢ়তার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল মঞ্জু—শীগগির, শীগগির গিয়ে আগে একটা ট্যাক্সি ধরুন আপনি। ও, সঙ্গে আছে ট্যাক্সি। এবার একেবারে ছেলেটিকে পেছনে ফেলে দৌড়ে নেমে চললো সে। এই গাড়ীটা তো। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে— জেনে নিয়েই উঠে বসল গাড়ীতে। না, না ওখানে নয় আপনি ভেতরে আসুন। ছেলেটি সামনের আসনে বসতে গেলে ডেকে এনে তাকে বসালো পেছনের আসনে। ছুটে চললে অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—

—এ্যাঁ, কি ভাবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল জয়া? বিষ খেয়ে? কোথায় পেলো সে বিষ? কে দিলে তাকে বিষ যোগাড় করে এনে? কখন করলে সে এ কাণ্ড? এ্যাঁ, বিষ খায়নি। তবে? হাতের কব্জির শিরা সাংঘাতিক ভাবে কেটে দিয়েছে ব্লেড দিয়ে? ছেলেটি তার হাতের কব্জির উপর আঙ্গুল টেনে জয়াকে কি গভীর ভাবে হাতের শিরা উপশিরা ব্লেডে টেনে কেটে দিয়েছে দেখালে, 'মা গো' বলে দু' হাতে চোখ ঢাকল মঞ্জু । যেন হোস পাইপের জলের তোড়ের মতো জয়ার ছিন্ন শিরার মুখ দিয়ে রক্তের তোড় ছুটে এসে ছিটকে পড়েছে ওর গায়ের উপর। খানিক বাদে বাদে ভেজা হাত দুটো নয়তো যেন রক্তভেজা হাত দুটো নামলো মঞ্জুর মুখ থেকে—কখন একাণ্ড করলে জয়া?

তারপর ছেলেটির মুখ থেকে মঞ্জু যে বিবরণ শুনে চললো যা হলো এই, দুপুরের নির্জন অবসরে কখন যে জয়া এ কাণ্ড করেছে টের পাননি জয়ার মা। ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। ছেলের ভীতি বিহ্বল কণ্ঠের ডাকে জেগে উঠে দেখেন অজ্ঞান জয়া পড়ে আছে বিছানার উপর। তার কাটা হাতটা যেখানটায় পড়ে আছে সেখানকার চাদর ভিজে উঠে রক্তের ফোঁটা নীচে গড়িয়ে পড়ে পড়ে একটা রক্তের ধারা সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে ঘর থেকে বাইরের দিকে। দেখে তিনি আর্তকান্নায় যে চিৎকার করে ওঠেন সে কান্না সর্বপ্রথম শুনতে পায় সে। সে-ই গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনে। তারপর জয়ার মা'র দেওয়া ঠিকানা নেয় মঞ্জুর খোঁজে। প্রথমে যায় বাড়ীতে। সেখানে শোনে সে কলেজে। আসে কলেজে। কিন্তু কলেজেও না পেয়ে কি যে সে করবে এই ভেবে না পাওয়া মুহূর্তে একটি ছেলে হদিস দেয় তাকে এই কফি-হাউসের। বলে, একবার খুঁজে দেখুন। অফ-পিরিয়ড চলছে, হয়তো সেখানেই পাবেন। তারপর আসে সে এখানে।

—ডাক্তারকে কি বলতে শুনে এসেছে সে?

সে শুনে এসেছে ডাক্তার বলছেন, একটুও সময় নষ্ট না করে— এক্ষুণি হাসপাতালে রিমুভ করে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। নইলে বাঁচানো দুষ্কর হবে। ক্রমেই সব রক্ত নিঃশেষে বেরিয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে জয়াদি'র।

—ড্রাইভার জলদি—খুব জলদি— মঞ্জু ড্রাইভারের আসনের ওপর দুই হাত রেখে সামনে এগিয়ে এসে রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার অপূর্ব হিন্দীতে বোঝাতে চাইলে; তার এই তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ওপর যে একটা জীবনের মরা-বাঁচা নির্ভর করছে সেই কথা।

কিছুই দরকার ছিল না। ড্রাইভার বাংলা যথেষ্ট বোঝে। সে সব শুনেছে এবং বুঝেছে। হর্ণের উপর হর্ণ বাজিয়ে যেন নিজের গুরুতর ত্বরার কথা সঙ্কেতে বলতে বলতে এবং একটু পথ ছেড়ে দেবার অনুরোধ করতে করতে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে চললো সে।

কিন্তু মানুষের ভেতরটা যখন ত্বরা করার উদ্বেগে ছুটতে থাকে, তখন তার সেই মনের ছোটার সঙ্গে যন্ত্রে ছোটা তাল রেখে চলতে পারে না। তখন মনে হতে থাকে, রাস্তায় নেমে পড়ে নিজে ছুটে চলতে পারলেই বুঝি বেশী তাড়াতাড়ি হয়। মোড়ের মাথার লাল বাতি, চৌমাথার ট্রাফিক পুলিশের হাত, মোটরের ভিড় যখন তারও উপর কেবলই সে চলাকেও বার বার দিতে থাকে থামিয়ে, তখন যে মানুষ গাড়ী থেকে নেমে পড়ে সত্যি নিজে ছোটে না, সেটুকুই বুঝি পাগলের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির তফাৎ। আর শুধু এই বিশেষ অবস্থার বিশেষ ক্ষেত্রেই নয়—ইচ্ছে করলেই সব করা যায় না, ইচ্ছে করছে বলেই করতে গেলে যে পাগলামী হয়, এই বোঝার সম্বলটুকু নিয়েই তো সর্বক্ষেত্রে মানুষ পাগলের সঙ্গে নিজের তফাৎটুকু বাঁচিয়ে চলে।

বসে থাকতেই হলো মঞ্জুকে, স্থির হয়েই বসে থাকতে হলো তাকে। শরীরটা গদির উপর নামমাত্র রেখে সমুখের আসনের পিঠটা ধরে স্তব্ধ হয়েই বসে রইলো মঞ্জু, যতক্ষণ না গাড়ী জয়াদের বাড়ীর গলিতে প্রবেশ করলে। আশেপাশের কোন বাড়ীতে যে দুরন্ত রকমের কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তার পরিচয় গাড়ীটা গলিতে ঢোকার পর থেকেই মিলতে লাগলো তার মোড়ের মাথার গভীর জটলায়, জয়াদের বাড়ীর সমুখের রাস্তার এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ভিড়ে, মানুষগুলো দাঁড়ানোর শ্লথ ভঙ্গিতে আর মুখের কারুণ্যে। মুহূর্তপূর্বের নির্মম-উদাসীন প্রতিবেশী মুখগুলো যেন মুহূর্তের মধ্যে মায়ায় মমতায় উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় পর্য্যবসিত হয়ে উঠেছে পরমাত্মীয়ের মুখে।

না থাক চেনা, না থাকা জানা, না থাক পরিচয়, তবু তারা তো কেউ কারু অপরিচিত নয়। সব কথা না জানুক অনেক কথাই তারা জানে পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে। পানের দোকানের সামনে বাড়ীর মেয়েটাকে পৌঁছে যে ছেলেটি নিত্যদিন বিদায় নিয়ে যায়, তার খবর বাড়ীর লোক না জানুক, জানে প্রতিবেশী। দোকানে ধার, বাড়ী ভাড়া বাকী, পত্রিকার বিল, গোয়ালার ঋণের খবর না জানতে পারে আত্মীয়গোষ্ঠী, কিন্তু জানে প্রতিবেশী। পর পর দুদিন কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া এসে দম বন্ধ করে না তুললে প্রতিবেশীর দৃষ্টি তাদের নিজেদের অজ্ঞাতেই গিয়ে ধাক্কা দেয় উপবাসী জানালার উপর। তারা কেউ কাউকে চেনে না কিন্তু জানে সবাইর কথা সবাই। জানে জয়ার সম্বন্ধেও। তারা দেখেছে, এক দিন এক বিষণ্ন সন্ধ্যায় এক বিষণ্নমুখী মেয়েকে এসে এই বিশ টাকা ভাড়ার ঘরের দরজায় রিক্সা থেকে নেমে দাঁড়াতে, মা-ভাই-এর হাত ধরে সযত্নে নামাতে, ঠেলাওলার মজুরি মিটিয়ে দিয়ে মলিন ভাঙ্গাচোরা মালপত্রগুলোকে মা আর ছোট্ট ভাইটির সাহায্যে টেনে টেনে ঘরে তুলতে। তারপর দেখেছে মোটা ছিট কাপড়ের ভরা থলিতে কি সব নিয়ে তাকে যাওয়া-আসা করতে, তার চোখের তলার কালীকে গড়িয়ে গড়িয়ে গালের উঁচু হাড় বেয়ে নেমে আসতে, তার ফর্সা রংকে দিনে দিনে রোদে পুড়ে কালো হয়ে চোখের তলার কালির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে। তারা দেখেছে দু'পা ভেতরে ঢুকলে যেখানে আর কিছু না হোক অন্ততঃ ঘরের আড়ালের বিশ্রামটুকু মেলে, সেখানে নিজের বাড়ীর খোলা রাস্তারই রকের চিলতেটুকুর উপরই বসে পড়ে তাকে বিশ্রাম করতে, আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে। তারপরের দ্রুত পটপরিবর্তনও অদেখা নেই কারু। হঠাৎ হঠাৎ করে দেখতে দেখতে প্রায় সবারই দেখা হয়ে গেছে তার রাতের বেরুনো আর প্রাতের ফেরা। আর ইদানীং রাস্তার উপর সে যে কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করতো, তাকে নিয়ে যে টানা-হেঁচড়া রাস্তার উপরই চলতো তা আর দেখতে বাকি ছিল কার? কুৎসা চলেছে ওকে নিয়ে। শিস্ দিয়েছে পানের দোকানের বিড়িটানা ছেলেগুলো। কিন্তু সেই সব নিষ্ঠুর নিষ্করুণ মুখগুলোই আজ মমতায় কি আশ্চর্য্য নরম—কি আশ্চর্য্য করুণ!

হায়! মানুষের বুকে এই মমত্ববোধটুকু জাগতে যদি এতো কিছুর দরকার না হতো। যদি 'আহা' শব্দটা যতটুকু হাওয়া নিয়ে তাদের বুক থেকে বেরিয়ে আসে তাতেই ফুরিয়ে না যেতো।

এতোদিন জয়াকে তারা বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখেছে, বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করেছে। রায় দিয়েছে। দাওয়ায় বসে পড়তে দেখে সহানুভূতির সঙ্গে বলেছে, বেচারা মেয়েটা। এই দুর্দ্দিনের সংসার কি এভাবে টেনে চালাতে পারবে? মরবে। আবার গাল দিয়ে উঠেছে রাত বিচরণ করা জয়াকে নির্দয় ভাবে। গেছে-একেবারেই জাহান্নমে গেছে মেয়েটা! যেমন প্রবৃত্তি তেমনি পথ বেছে নিয়েছে। কাজের সঙ্গে কারণ যোগ করবার সময় কোথায় তাদের। কিন্তু আজ প্রথম তারা প্রথম দিনের সেই বিষণ্নমুখী মেয়েটির মা-ভাই এর হাত ধরে এসে দরজায় দাঁড়ানোর দিনটি থেকে আরম্ভ করে তার থলি কাঁধে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় এর দরজায় তার দরজায় ঘোরা থেকে, তার প্রতিদিনে এক গ্রাস অন্নের জন্য সংগ্রাম, তার পাগলামো, তার উচ্ছৃঙ্খল হাসি, তার আজকের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে শয্যায় শোয়া পর্যন্ত প্রতিটি ছিন্ন ঘটনাকে এক সঙ্গে গাঁথলো। প্রবৃত্তির পথে চলে নয় চরম অপ্রবৃত্তির চলা চলতে গিয়ে আজ সে সেই চলা থামিয়ে দেবার জন্য স্নায়ুতন্ত্রী কেটে ফেলেছে আপন হাতে। কাদম্বিনী মরে প্রমাণ করেছিল মরে নাই। এ মরে প্রমাণ করতে চাইছে সে মরেছিল। কাজের সঙ্গে কারণ যোগ করে আজ তাদের বুক থেকে যে দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলো বের হয়ে আসতে লাগল তা কি শুধুই জয়ার জন্য? না। তাদেরই বা কি এমন রমণীয় সমৃদ্ধ জীবন! সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের ক্ষুধিত বঞ্চিত জীবনগুলোও এসে মিশে গিয়ে নিঃশ্বাসকে টেনে দীর্ঘ করলো।

চোখের কোণে কোণে তাদের যে আলোর কণিকা জ্বলে উঠতে লাগল যদিও তা জোনাকির আলো ব্যতীত কিছুই নয়। তাপ নেই, বিদ্যুৎ নেই, আগুন নেই। জ্বলে উঠতে পারে না জ্বালিয়ে দিতে পারে না—মৃত। তবু সেই মৃত আলোগুলো যখন মোড়ের মাথায় জটলায় রাস্তার সম্মুখের ছোট ছোট ভিড়ে, একতলা দোতলার বারান্দায় দরজায় জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা চোখে চোখে জ্বলে উঠতে লাগল তখন সেই বিন্দু বিন্দু মৃত আলোর কণাগুলোর ভেতর একবিন্ধ করে প্রাণ ভরে দেওয়ার জন্য ভগবানের দরজায় মাথা কুটতে ইচ্ছে করতে লাগলো মঞ্জুর।

এতক্ষণ মঞ্জু গাড়ীতে বসে বসে কেবল এখানে এসে পৌঁছোনোর তাগিদে ছটফট করেছে। এখন এসে গিয়ে নিজেকে ভারি নিরবলম্ব মনে হতে লাগলো ওর। কি করে কি করতে হবে, কি করে হাসপাতালে যেতে হবে— কোন হাসপাতালেই বা নিয়ে যাবে। যে অনবধানতার কথা কাগজে পড়ে, তাদের গাফিলতি আর উদাসীনতার দরুন প্রাণহানির যে কলঙ্কজনক সব ঘটনার কথা শুনতে পায়—যদি সেখানে গিয়েও সঙ্কটকালের ত্বরিৎ ব্যবস্থা না মেলে। তবু চোখে অন্ধকার যে মঞ্জু দেখছিল না তা সে কোন ব্যাপারেই চোখে অন্ধকার দেখে না বলেই। কিন্তু ছেলেটিকে সঙ্গে রাখতে হবে। তার নাম জানতে চাইলো মন—আচ্ছা, আপনার নামটা কি?

—অমল।

—আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। আমি যে কি ভাবে কি করবো, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে। আপনি থাকলে তবু আমি জোর পাবো।

যেন কৃতার্থ করল মঞ্জু তাকে, এমনি ভাবে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো ছেলেটি।

কিন্তু এখানে নামা হলো না ওদের। গাড়ী থকে নামবার মুখেই একটি ছেলে ছুটে এসে বাধা দিলো। বললো, একেবারে এঁকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে চলে যা অমল। মিঃ চৌধুরী—মাথা চুলকে বোধ হয় জয়ার নামটা মনে করে নিল সে—জয়াদি'কে নিয়ে সেখানে রওনা হয়ে গেছেন। তোদের আসামাত্র সেখানে চলে যেতে বলে গেছেন ওঁরা।

ফের বন্ধ গলি থেকে গাড়ী পেছু চলতে লাগল। মঞ্জু দেখল, যদিও মস্ত একটা তালা ঝুলছে জয়াদি'র দরজায় কিন্তু খোলা। হায় দিশেহারা জয়ার মা তালার মুখটা টিপতে ভুলে গেছেন নয়তো হাতে তার এমন জোর এখন নেই যে তার হাতের টিপে তালার মুখ বন্ধ হয়। নেমে বন্ধ করে আসবে? না। মূল্যবান জিনিষ খোয়া গেলেও এখন সময় দেওয়া যায় না—আর এতো নেই-ই কিছু। যায় যাবে। রজতের দেওয়া টাকার যা হাতে আছে জয়ার মা'র এবং যে টাকা ক'টা এখন বর্তমান মুহূর্তে ওর একমাত্র ভরসা সে টাকা তো জয়ার মা সঙ্গেই নিয়ে গেছেন।

কতই বা দূর, গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে সারপেন্টাইন লেন থেকে মেডিকেল কলেজ। দু'মিনিটে পৌঁছে দিলো ওদের ড্রাইভার মেডিকেল কলেজের প্রশস্ত সিঁড়ির চত্বরে। মঞ্জু ট্যাক্সি-মিটারটার দিকে একবার তাকালোও না। সে বিলক্ষণ জানে, যে অঙ্কই মিটারে উঠে থাক ওর ব্যাগের সাধ্য নেই তা মিটিয়ে দেবার। এ ছাড়াও দরকারও হতে পারে ট্যাক্সির। এমন অবস্থায় একটা ট্যাক্সি হাতের কাছে থাকা ভালো। ড্রাইভারকে ওয়েটিং চার্জের সঙ্গে বকশিস কবুল করে নেমে পড়ল মঞ্জু। কিন্তু তার পর? কোথায় এখন ওরা খুঁজবে ওদের, কাকে জিজ্ঞাসা করবে জয়াদের কথা?

কি করা যায় জিজ্ঞাসা নিয়ে দুজনে দুজনের দিকে তাকালো।

—চলুন ইমারজেন্সি কেস কোথায় নিয়ে যায় খোঁজ করি। অমল বলতেই মঞ্জু 'চলুন' বলে হাঁটা দিল তার সঙ্গে। কিন্তু খোঁজ করার জন্যও কোন দিকে যেতে হবে সেটা জেনে নেওয়া দরকার। ও মশাই শুনুন, বলেই অমল চেঁচিয়ে উঠল ঐ তো ওরা মিঃ চৌধুরীরা দাঁড়িয়ে। মিঃ চৌধুরীদেরও অমলের দিকে চোখ পড়ে গেল। ডেকে উঠলেন তাঁরা। একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে দুজনে উঠে এলো চত্বরের সিঁড়ি পার হয়ে উপরে।

না, কিছুই করে উঠতে পারছে না তারা। শুধু দুটো কুলী এসে জয়াকে ষ্ট্রেচারে করে নামিয়ে নিয়ে ইমারজেন্সি রুমের টেবিলে শুইয়ে রেখে গেছে। ব্যস! কোথায় ডাক্তার! কোথায় নার্স! ডাক্তার নাকি আর একটি ইমারজেন্সি রোগীকে অপারেশন করছেন।

—চলুন।

মঞ্জুকে নিয়ে এলো তার ইমারজেন্সি রুমে। জয়ার মা কখনো কাঁদছিলেন, কখনো ঘর-বার করছিলেন। কখনো মেয়ের কাছে গিয়ে তার হিমশীতল হাত-পা হাতে নিয়ে ঘষছিলেন গরম করে তুলবার জন্য। কখনো নাকের কাছে হাত ধরে দেখছিলেন শ্বাস বইছে কি না। মঞ্জুকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। মুখে আঙ্গুল চেপে থামতে ইশারা করে মঞ্জু এক মুহূর্তের জন্য জয়ার রক্তশূন্য সাদা কাগজের মতো মুখটার দিকে তাকালো। তাকালো জয়ার ব্যাণ্ডেজবাঁধা রক্তভেজা হাতটার দিকে। রক্ত যে কেবল বেরিয়েই গেছে সব তাই নয়। যেটুকু অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ যে রক্ত ক'বিন্দুর জন্য এখনও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে জয়ার, তাও নিঃশেষে বেরিয়ে চলেছে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কোমরে আঁচল গুঁজল মঞ্জু।

বারান্দায় বেরিয়েই যে অফিস-পিয়নটার সঙ্গে দেখা হলো তার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়লো মঞ্জু। তোমাদের ডাক্তার বাবুকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?

— কোন ডাক্তার বাবুর কথা বলছে সে? ডাক্তার বাবু তো একজন নয়?

এক-বোঝা ওষুধ ব্যাণ্ডেজ হাতে হনহন করে ছুটে চলে গেল একজন নার্স তাদের পাশ দিয়ে। আর ছুটে চলা নার্সের পেছনের বাতাসটা যেন মঞ্জুর কানে কানে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল তুমি মমতার খোঁজ করছ না কেন? সে যে মেডিকেল কলেজের ষ্টাফ নার্স একজন—মনে নেই তোমার? মিস সেন, মিস সেনকে চেন তুমি? নার্স মিস সেন—মমতা সেন? যেন লোকটা মিস মমতা সেনকে চেনে বললে তবেই সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে তার।

চেনো? আমাকে তবে তার কাছে একটু নিয়ে চলো না। করুণ মিনতি করল মঞ্জু।

আর্ত আবেদন শোককাতরতা কোন অনুকম্পাই আর এদের মনে সারা জাগায় না। চলতে চলতে জবাব দিল সে— সে জরুরি কাগজ নিয়ে চলেছে। তার পক্ষে নিয়ে-যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ নার্স কোয়ার্টার এখান থেকে দশ পনরো মিনিটের পথ। ঘণ্টা খানে হবে ডিউটি শেষ করে সে দিদিমণি তার কোয়ার্টারে চলে গেছেন।

—দশ-পনেরো মিনিটের পথ! আসতে যেতে আধ ঘণ্টা। ফোন—ফোন করা যায় না একটা? সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলো মঞ্জু।

—যায় কিন্তু সেখানে ফোন করতে হলে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে গিয়ে আগে অনুমতি নিতে হবে।

— কোথায় সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘর?

আঙ্গুল দিয়ে একটা দিক দেখিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। মিনতি করলো মঞ্জু—তুমি আমাকে দয়া করে অন্ততঃ অফিসঘরটায় পৌঁছে দেও। আমি তোমাকে বখশিশ দেবো।

এবার কাজ হলো।

অতি বিনয়ের সহিত, সঙ্গে করে নিয়ে এসে সে পৌঁছে দিল মঞ্জুকে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরের দরজায়। মঞ্জু ব্যাগ থেকে ওর কলেজের যাতায়াত খরচার টাকাটা বের করে পিয়নের হাতে তুলে দিয়ে গিয়ে অফিসরুমে ঢুকল। সামনের চেয়ারটায় যিনি বসেছিলেন মঞ্জু জানে না তিনিই সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কিনা, তবু সে তাঁরই কাছে আবেদন জানালো—তাকে নার্স-কোয়ার্টারে একটা ফোন করবার অনুমতি দেবার জন্য। মঞ্জু জানে না নার্সদের ফোন করার এই অনুমতির নিয়মের কতটা কড়াকড়ি। তার মুখের অস্থিরতায়, তার গলার স্বরের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেই এতো অনায়াসে অনুমতি মিলে গেল কি না। ভদ্রলোকটি নিজে উঠে ডায়েল ঘুরাতে ঘুরাতে জিজ্ঞাসা করলেন, কা'কে চান আপনি?

—মমতা সেনকে।

একেবারে মমতা সেনকে ডেকে ওর হাতে ফোন তুলে দিয়ে ভদ্রলোক গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

—হ্যালো কে? কে আপনি? একটা মিষ্টি গলা ভেসে এলো মঞ্জুর কানে।

—আপনি—আপনি কি মমতা সেন?

—হ্যাঁ। বলুন।

—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন কি না বুঝে উঠতে পারছিনে। আমার নাম মঞ্জু। আপনাদের বাড়ীতে আমি গিয়েছি। একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছিল কিন্তু পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়নি।

এক ঝলক নিচু মিষ্টি হাসির সঙ্গে জবাব এলো—আমি খুব চিনতে পারছি আপনাকে। আপনার কথা আমি দাদার মুখে শুনেছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

—আমার এক বন্ধুকে অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় আপনাদের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তার হাত কেটে গিয়ে অতিরিক্ত রক্ত পড়ে গেছে। কিন্তু এক ঘণ্টার উপর হয়ে চলল আপনাদের ইমারজেন্সি রুমের টেবিলের উপর সে পড়ে আছে অজ্ঞান অবস্থায়—কি যে করবো—

—তাই! আমি এক্ষুণি আসছি। আপনি ইমারজেন্সি রুমে চলে যান। ফোন রাখার শব্দ হলো ঠক করে।

ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটা মঞ্জুর প্রতীক্ষমান চোখের উপর দিয়ে বার পাঁচ-সাতের বেশী ঘুরে আসতে পেলো না। পোনের মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে চলে এসে ঘরে ঢুকল মমতা। ভোর ছ'টা থেকে বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত একটানা ডিউটি দিয়ে—কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে সে সবে স্নান-খাওয়া সেরে একটু বিছানায় শরীর এলিয়েছিল। মঞ্জুর ফোন পেয়ে যেভাবে ছিল সে ভাবেই চলে এসেছে, শুধু ভিজে চুলের রাশি হাতে জড়িয়ে কয়েকটা কাঁটা গুঁজে। এক ঘণ্টা পরে না দিয়ে আগেই কেন খবরটা মঞ্জু ওকে দিল না—মঞ্জুকে এ কথাটাই বলতে বলতে চলে গেল সে একেবারে জয়ার টেবিলের কাছে। প্রথমেই সে জয়ার ডান হাতটা হাতে নিয়ে নাড়ী দেখলো। তারপর দেখলো কালো হয়ে আসা তার আঙ্গুলের ডগাগুলো। এক নজর তাকালো তার নীল হয়ে আসা ঠোঁট দুটোর দিকে। তারপর এমন অবস্থায় করণীয়টা আগে করে নিলো সে; জয়ার হাতের রক্তভেজা ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলে আর্টারি ফরসেপ নিয়ে এসে মুখটা আটকে দিয়ে নিল রক্ত পড়ার পথ বন্ধ করে। নিতান্তই হাতের সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা। কিছুক্ষণ রক্ত বেরুনোর পর রক্ত জমে গিয়ে নিজ থেকেই থামে, কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে ফের রক্ত জমে জমে চাপ সৃষ্টি হয়ে রক্ত ক্ষরণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত। আর এই ভাবে কিছুক্ষণ পড়া আর কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার ভেতর চলছিল বলেই জয়ার এই নিঃশ্বাসটুকু এখনও বইছিল। নইলে কখন সব চলা থেমে যেত তার। কিন্তু আর সময় নেই। একটা গ্লুকোজ সেলাইন এখন—এই মুহূর্তে দেওয়া দরকার—যদি মেয়েটিকে বাঁচাতে হয়। কিন্তু গ্লুকোজ সেলাইন দেওয়া নার্সদের—বিশেষত জুনিয়ার ট্রেইণ্ড নার্সদের পক্ষে একেবারেই আইন-বিরুদ্ধ। তবে তারা যে একাজ না করে বা কোন রকম আইনবিরুদ্ধ কাজ না করে তা মাত্রও নয়। নিজের হাতে গ্লুকোজ সেলাইনও সে দিয়েছে। ডাক্তার উপস্থিত থাকতেন এই মাত্র। কিন্তু এখন লোকচক্ষুর উপর সে কিছুতেই একাজ করতে পারে না। কিন্তু যার অবসর আছে, যে সময় দিতে পারে নিজের কাজ ছেড়ে আসবার এমন একজন ডাক্তার খুঁজে পেতে আনতে আধ ঘণ্টা সময় পার হয়ে যাবেই—যে আধ ঘণ্টা সময় রোগীর বিপদের কথা ভাবলে কিছুতেই দেওয়া যায় না। ফের জয়ার নাড়ী দেখল মমতা তার ডান হাতটা তুলে নিয়ে। তারপর দাঁত দিয়ে পাতলা ঠোঁটটা কামড়ে ধরে দ্রুত হাতে তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা করে চলল রোগীকে গ্লুকোজ সেলাইন দেওয়ার। হ্যাঁ সে-ই জয়াকে সেলাইন দেবে। তারপর যখন এই আইনবিরুদ্ধ কাজের জবাব তার কাছে চাওয়া হবে, তখন তার জবাবের কথা ভাবা যাবে।

॥ ২৬ ॥

মন স্থির করতে যেমন সময় নিল না মমতা, তেমনি স্থির করেও সময় নষ্ট করলে না। প্রাথমিক পরীক্ষার পর রোগীকে তেতলায় তুলে নিয়ে যাওয়াটা পর্যন্ত বাদ দিলে। এখানেই সেলাইন স্টার্ট করবে সে। এ্যানিমিকের রোগী, তাতে রক্ত চলে গেছে প্রচুর—আর দেরী করা নয়। হাঁটা দিলো সে ডক্টরস্ রুমের দিকে—ওষুধপত্র যন্ত্রপাতির ঘরের দিকে।

তেমন প্রয়োজনে এই টেবিলে সেলাইন দেওয়াটা আইনবিরুদ্ধ কাজ নয়। কিন্তু কোন ডাক্তারের উপস্থিতি ছাড়া নার্সের পক্ষে— বিশেষ করে জুনিয়ার ট্রেণ্ড নার্সের পক্ষে রোগীকে সেলাইন দেওয়াটা যে হাসপাতাল-আইন-বিরুদ্ধ কাজ, এটা মঞ্জুর জানার কথা নয়, জানেও না। ঝুঁকি এবং মনের জোর নিয়েই যে মমতা একাজে প্রবৃত্ত হলো সেটাও সে বুঝল না। সে শুধু দেখল, এই যে এঘর থেকে ও ঘরের দিকে হাঁটা দিল মমতা সে হাঁটার সঙ্গে তার কিছুক্ষণ পূর্বের হাঁটার কণামাত্র মিল নেই। নার্সদের চলার যে বিশেষ ধরনের একটা শরীর টান করা আর টানা-চলায় তড়িৎ ভঙ্গির গতি আছে, এবারের চলায় মমতার শরীরে সেই টান ভাব, পায়ে সেই তড়িৎ গতি এসে গেছে।

'এখন যা করবার মমতা করবে।' নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভেতরও এ নিশ্চয়তা কম নয়। মা একটু শান্ত হয়ে মেয়ের পায় হাত বুলোতে লাগলেন। প্রতিবেশী ক'জন আর অমল তিন-তিনটে রক্তমাখা দেহ এনে কুলীরা যেখানে নামালো দু'পা এগুলো সেদিকে। মঞ্জু জয়ার বরফের মতো ঠাণ্ডা কপালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। আহত দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলে, এই লোকগুলো আবার কতক্ষণ এ ভাবে পড়ে থাকবে কে জানে।

মমতা যেমন গেল প্রায় তেমনি ফিরে এসে হাতের ট্রে শিশিবোতল নামিয়ে রাখল একটা টেবিলে। একটা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক জয়ার টেবিলের পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিল একটা লম্বা ষ্ট্যাণ্ড।

মমতা ট্রে থেকে টলটলে জল ভরা একটা বোতল তুলে নিয়ে ঝুলিয়ে দিলে সেই ষ্ট্যাণ্ডের হুকে। তারপর দক্ষ পরিচ্ছন্ন হাতে মিনিট পোনেরোর ভেতর জয়ার শরীরে সেলাইন সঞ্চরণ করে চটপট হাতে এক টুকরো কার্ডবোর্ডের সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করে ফেলল জয়ার হাতটা। ফোঁটায় ফোঁটায় টলটলে লবণ-জল রবারের নল বেয়ে নেবে এসে সূচের মুখ দিয়ে বেয়ে চলল জয়ার ধমনীর ভেতর।

এ হাতে সেলাই ও হাতের কব্জিতে আর্টেরি ফরসেপ—হাতের মাঝখানের নাড়ীতে তিনটি আঙ্গুল রেখে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নাড়ীর স্পন্দন শুনলো মমতা অনেকটা সময়। তারপর মঞ্জুকে বললো—এবার আমি একটু একজন ডাক্তারের খোঁজে যাচ্ছি—

—হাতটা ধরে রাখবো আমি, যাতে নাড়াচাড়া করতে না পারে? জানতে চাইলে মঞ্জু।

—দরকার নেই। ব্যাণ্ডেজ এমন ভাবে বাঁধা আছে ও নাড়াতে পারবে না। আচ্ছা, আমি আসছি।

মমতার ডিউটির সময় ছিল না এটা। ঢিলেঢালা পোষাকটা বোধ হয় সে ওষুধপত্র আনবার আগেই আঁচলে জড়িয়ে প্রায় কোমার-বন্ধনীর মতোই শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়েছিল। আর মাথার উড়ন্ত চুল গুলোকে বেঁধে নিয়েছিল একটা রুমাল দিয়ে। তার দিকে তাকিয়ে মঞ্জুর মনে হলো, মমতা সুন্দর কিন্তু সেটাই তার সব নয়। তার সেই সৌন্দর্য্য যেন তার গুণের কাছে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে আছে—আর মমতার সব রূপ যেন সেইখানে।

হ্যালো, ব্যাপার কি? পরিচিত কেস নাকি? ডক্টরস্ রুমের দিকে এগুতে গিয়ে একেবারে মমতার মুখোমুখী পড়ে গিয়ে থেমে পড়লেন এক ডাক্তার।

ডাক্তারকে দেখে যেন বর্তে গেল মমতা। সাগ্রহে বলে উঠল— বাঃ, এই তো কেমন আপনাকে পেয়ে গেলাম। মিঃ সেন একটু এদিকে আসুন।

চিনল মঞ্জুও। একেই সে সেদিন মমতাদের বাড়ীতে দেখেছিল।

মমতার মুখ থেকে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত এই আগ্রহান্বিত আহ্বান ডাঃ সেন কিন্তু এর পূর্বে আর কোন দিনও শোনেননি। মমতার দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে শায়িত জয়ার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।— কি হয়েছে?

জয়ার কাটা হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরল মমতা নীরবে।

মঞ্জু তাকে জয়ার আত্মহত্যা করতে যাওয়ার কথা বলেনি বা বলবার সময় পায়নি। কিন্তু মমতা ব্লেডে কাটার চেহারাটা দেখেই যেমন বুঝে নিয়েছিল এটা সুইসাইড্ কেস, ডাঃ সেনও তেমনি কাটা দেখেই সেটা বুঝে নিলেন। জয়ার হাতের মাঝখানের শিরার ওপর ঠিক মমতারই মতো করে তিনটি আঙ্গুল ছুঁইয়ে তারই মতো ঘড়ির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাক্তার অনেকটা সময়। কালো হয়ে আসা আঙ্গুলের ডগা নখ গোটা দুই তিন তুলে তুলে দেখলেন টিপেটিপে; তারপর টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন,— ব্লাড্ ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা করে ফেল। ডাঃ সিন্হা কোথায়?

—ডঃ সিনহা হেড ইনজুরী কেস নিয়ে চলে গেছেন ওটিতে। তাইতো—

— একে সেলাইন দিলে কে? ডাঃ দাস?

— আমি। বিনীত কণ্ঠে বলল মমতা।

—তুমি? ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ডাক্তার জয়ার দিকে।

—উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হয়েছে। সবিনয় কণ্ঠে বললো সে।

সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে মমতা—এমনিভাবে প্রশংসার দৃষ্টি ফেললেন ডাক্তার মমতার মুখের উপর।

সবাই-ই বুঝল আইন-বিরুদ্ধ ভাবে মমতা নিজ দায়িত্বে সব করেছে। মঞ্জুদের সবার দৃষ্টিতেই কৃতজ্ঞতা প্রশংসা ফুটে উঠল।

—এ কেস্টা আপনি একটু দেখুন ডাঃ সেন। এখন কাউকে পাওয়া যাবে না—এই মেয়েটি আমার বিশেষ বন্ধু। কিছুটা বন্ধুত্বের দাবী, কিছুটা প্রীতির সুর— যেন মিশিয়ে দিল মমতা তার আবেদনের সুরে।

অত্যন্ত দুরুহ একটা ডেলিভারি কেস নিয়ে ডাক্তার সেনকে আজ গলদ ঘর্ম হতে হয়েছে সমস্ত দিন। তারপরও স্বাভাবিক ডেলিভারি সম্ভব হয়নি। মেয়েটির স্বাস্থ্যের অবস্থা, হার্টের কন্‌ডিশন দেখে অপারেশন এড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার্জিক্যাল অপারেশন থিয়েটারেনিয়ে মৃত শিশু বের করতে হয়েছে ডাক্তারকে সিজারিয়ান করে। এই মাত্র রোগীকে বেডে পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ব্লাড সেলাইন স্টার্ট করে বাড়ী ফেরবার মুখে একটু দরকারে এখানে এসেছিলেন ডাক্তার। একে সমস্ত শ্রম ব্যর্থ করে শিশু হয়েছে মৃত, তাতে মার অবস্থা আশঙ্কা-জনক— দিনটাই ব্যর্থ মনে হচ্ছিল ডাক্তারের। পরিশ্রান্ত পিঠটা হাত পা মেলে শুয়ে পড়তে চাইছিল কোথাও। কিন্তু মমতার মনস্তত্ত্ববোধটা বৃথা গেল না। তার গলার সেই প্রীতির সুর—আবার এক নজর তার দিকে তাকাতে বাধ্য করলো ডাক্তারকে। সার্টের গুটোনো হাতা অভ্যাসবশেই ঠেলে তুলে দিতে দিতে জয়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ডাক্তার। ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে আসা নাড়ীর গতিটা দেখল আবার। দেখল বুকের স্পন্দন। তারপর বললো— কোরামিন।

মমতা ছুটলো কোরামিন আনতে।

—হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার। বাইরে যাওয়া-আসা কথাবার্তায় সরগরম। এ্যাম্বুলেন্স থামার শব্দ হয়। দুপ্ দাপ্ শব্দ তুলে কতকগুলো পা ছুটে আসতে থাকে এদিকে। ষ্ট্রেচার এনে নামায় কুলীরা। টেবিল গুলো ভর্ত্তি হয়ে হয়ে শেষে শুধু সিমেন্টের ওপর শরীরগুলো নামিয়ে রেখে খালি ষ্ট্রেচার নিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে কুলীরা।

কি হয়েছে?

আহা, বিষ খেয়েছে!

ইস্, রাজমিস্ত্রী, কাজ করতে করতে আচম্‌কা তিনতলার ছাদ থেকে ছিট্‌কে পড়ে গেছে!

মাগো, গাছে চড়ে খেলা দেখতে গিয়ে গাছ উপড়ে পড়ে চাপা পড়েছে ওপরের লোক নীচের লোক!

এ্যাঁ, গাড়ীর তলায় চাপা পড়েছে?

মদ খেয়ে মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছে!

কেউ কাতরাচ্ছে। কেউ গোঙাচ্ছে। কেউ পড়ে আছে নিথর হয়ে। জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না। যাদের জ্ঞান রয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে করে ঘটনা জানতে আর নোট নিতে চেষ্টা করছে। যারা অজ্ঞান তাদের আর এই জিজ্ঞাসাবাদটুকুও সম্ভব হচ্ছে না। নেড়েচেড়ে নার্সরা একটু প্রাথমিক এটা ওটা দেখে তুলে দিচ্ছে ষ্ট্রেচারে। ডেটল, লাইজল, ইথার, ক্লোরোফরমের মিশ্রিত যে হাল্‌কা গন্ধটা হাসপাতালের গেটে ঢোকার পরই নাকে আসে, তারই উগ্র গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে চারিদিকের বাতাস।

জয়াকে উপরে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন ষ্ট্রেচার আনা হলো—তখন যেন এখান থেকে বেরুতে পেরে বাঁচল মঞ্জু।

সরু ছোট্ট প্যাসেজটা গিজগিজ করছে লোকে। শেষ হয়ে গেছে ভিজিটিং আওয়ার। রোগীদের আত্মীয় বন্ধু সব বেরিয়ে যাচ্ছে। কারু হাতে খালি টিফিন কেরিয়ার। কারু হাতে খালি কৌটো। আর এখন হাসপাতালের ভেতর থাকা চলবে না বাইরের লোকের। জয়ার মাকে নিয়ে ওদেরও বাইরে চলে আসতে হলো। এক মঞ্জুকে নিয়ে নিল মমতা সঙ্গে করে। জয়াকে নিয়ে লিফ্‌টে তোলা হলো। ওরা চলল সিঁড়ি ভেঙ্গে। এতক্ষণে বুঝলো মঞ্জু ইমারজেন্সী রুমটা কিছুটা কাজ করে যেন একটানা তেতলায় তুলে নেবার আগের নিরীক্ষণ-কেন্দ্র হিসাবে। তেমন গুরুতর ক্ষেত্রে সেখানে চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে, যেমন মমতা জয়ার সেলাইন স্টার্ট করে দিয়েছিল— নইলে তেতলার ব্লকেই নিয়ে আসতে হয় সবাইকে।

কিন্তু মঞ্জু যে ভেবেছিল ঐ ঘরটা ছেড়ে সে বাঁচলো—তা একেবারেই মিথ্যে। উপরে উঠে দেখল এটা—আরো ভীষণ। কারু হাত কেটে ফেলা হয়েছে। কারু পা। কারু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখ একেবারে গলা পর্য্যন্ত ঢাকা। কারু পা উপর দিকে টানা। কারু হাত। কারু নাকের ভেতর দিয়ে নল ঢোকানো। কারুর কাছে অক্সিজেন সিলেণ্ডার। সারি সারি ষ্ট্যাণ্ডে ঝুলছে রক্ত, লবণজল। প্যাসেজ থেকে শুরু হয়েছে রোগীদের খাটিয়া পাতা। তাতেও কুলোচ্ছে না। মাটিতে মেঝেতে এখানে ওখানে পড়ে আছে সব। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, বিছানা-পত্র আবহাওয়া। এই হাসপাতাল? মানুষের আরোগ্যনিকেতন?

করিডোরের বেডগুলোর পাশ দিয়ে কুলীরা ষ্ট্রেচার ডান দিকে ঘুরালো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলো মঞ্জুও। এখানেই মেয়েদের ওয়ার্ড। সেই এক অবস্থা—এক চেহারা। জয়ারও খাটিয়া মিলল না। নামিয়ে রাখা হলো তাকে নীচের একটা গুটোনো নোংরা তোষক টান করে।

কোন উপায় নেই।

পেইং ওয়ার্ডের কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল মমতা। নেমে গেলেন ডাক্তার। অবস্থা বুঝতে কতক্ষণ লাগে?

সেই মেঝের বিছানায়ই ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিলেন ডাক্তার। দিলেন মরফিয়া। করলেন কাটা হাত সেলাই। তারপর বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন করিডোরে।—তুমি থাকবে এখন এই মেয়েটির কাছে?

—থাকা দরকার হলে থাকবো।

—দরকার মানে, ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার সেন—এখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। নটা নাগাদ আমার চেম্বারে একটা রিং করে তুমি এর অবস্থাটা জানাবে আমাকে। তখন আমি বলে দেবো, আজই আর একবার ব্লাড দেওয়া দরকার, না কাল সকালে দিলেই চলবে। আর তুমি যদি না থাকো তবে ওয়ার্ডনার্সকে বুঝিয়ে বলে যাবে— থামলেন ডাক্তার। আচ্ছা, আমিই বলে যাচ্ছি। তোমার কথায় তেমন গুরুত্ব নাও দিতে পারে।

— আমিই থাকবো। ন'টার পর আপনাকে অবস্থা জানাবো আমি।

একটু চিন্তা করলেন ডাক্তার—আজ সমস্ত দিন ডিউটি দিয়েছেন, কাল সকালে আবার তোমার ডিউটি রয়েছে—

একটু হাসল মমতা—এটাও ডিউটিই। ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত থাকতে আমার কিছু কষ্ট হবে না। আমি আপনাকে ঠিক ন'টায় ফোন করবো।

ডাক্তার বুঝলেন, —তিনি যে আরো কিছু সময় রোগীর কাছে এ্যাটেনডেন্স দরকার মনে করছেন, মমতা তার কথায় সেটা বুঝেছে।

—আই উইশ ইওর সাকসেস্। বলে জুতোর শব্দ তুলে করিডোর পার হয়ে গেলেন ডাক্তার।

সে দিনের জয়াদের বাড়ীতে দেখা ডাক্তার আর এই ব্যক্তি কি একই লোক? মঞ্জুর মনে হতে লাগল যেন এক নয়। তা ভিন্ন লোক বৈ-কি। এখানে সে ডাক্তার।

মমতার সঙ্গে থেকে যেতে চাইলো মঞ্জুও। কিন্তু মমতা দিলে না। তুমি, তা তোমাকে এতক্ষণ আপনি বলছিলাম কিন্তু বলতে একটুও ভালো লাগছিল না। ছোট তো। তুমিই বলি, কি বলো? তোমার থাকার কোন দরকার নেই। দরকার থাকলে কি আমি কখনোই যেতে দিতাম তোমাকে? ভয়ের কারণ কেটে গেছে। আমার থাকার প্রয়োজন হলো,— অবস্থা দেখছ তো হাসপাতালে। কি করবে ডাক্তার, কি-ই বা করবে বেচারা নার্স অর্থাৎ আমরা। সামনের গুরুতর কেস পেছনের গুরুতর রোগীর কথা ভুলিয়ে দেয় জানি তো। তাই রয়ে গেলাম। ফের ব্লাড দিতে হয় তো, দেওয়া হয়ে গেলেই চলে যাবো আর না দিতে হলে তো কথাই নেই। তুমি শুধু শুধু কেন রাত করবে? তারপর তোমাকে রাখাটাও একেবারে নিয়ম-বিরুদ্ধ যে—

—কাল সকালে ক'টার সময় আসবো?

সেটাও যেন নাই করতে যাচ্ছিল মমতা। বলতে যাচ্ছিল একেবারে হাসপাতালের ভিজিটিং সময়ে এলেই চলবে। কিন্তু থেমে গেল। রক্ত আনতে হয়েছে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে, আবারও হয়তো আনতে হবে। 'ওষুধ এসেছে। ইন্‌জেকসান এসেছে। জয়ার মার আঁচলের টাকায় তার অনেক কিছুর মূল্য দেওয়াই বাকী থেকে গেছে।' নিজ দায়িত্বে আনিয়েছে মমতা। কাল টাকা দিতে হবে। বললো—তা তোমার সময় মতো এসো। কাল আমার ডিউটি সকালে। লেবার-রুমে থাকবো। খোঁজ করলেই ডেকে দেবে।

মঞ্জু যখন হাসপাতালের দালান থেকে বাইরে এলো তখন ওর মুখের রংও ঐ ইমারজেন্সী-ওয়ার্ডের ঘরে, বাইরে, প্যাসেজে, টেবিলে, মেঝেতে পড়ে থাকা লোকগুলোর মুখের মতোই কালো চটচটে ঘামে ভেজা। শরীরের অবস্থা ঐ লোকগুলোর মতোই বুঝি অর্ধমৃত। ইমারজেন্সী ওয়ার্ড নয় তো যেন যমের কড়াই থেকে হাত পা গুলো সুস্থ ছিল বলে ও ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

জয়ার মা সমস্ত পথ গুণগুণ করে যত কথা বলে গেলেন, তা সবই মমতার প্রশংসা। এমন রূপ, এমন গুণ, একত্র হয় না কখনো, যদি না দেবী হয়। মমতা নিশ্চয়ই শাপ-ভ্রষ্টা দেবী। আহা, কি ভালো মেয়ে।

—হাঁ, নিঃসন্দেহে ভালো মেয়ে। আর এই শুধু ভালো বলায় যেন কিছুই বলা হয় না মমতার সম্বন্ধে। ওর আরো জানতে ইচ্ছে করে—কেনই বা মমতা রত্নার কাকাকে বিয়ে করতে বলায় একদিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। কেনই বা সে আর একদিন ওর ছোড়দাকে বিয়ে করতে মত দিয়েছিল। গালে একটু হাসির টোলই যেন খেলে গেল—মঞ্জুর। এবার ছোড়দা এলে সে তাকে বলবে— ছোড়দা, তুমি কি হারাইয়াছ তাহা তুমি জানো না।

পাশের বাড়ীর মিঃ চৌধুরী— যিনি উদ্যোগী হয়ে জয়াকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন এবং যার বাড়ীর মেয়েরা জয়াকে নিয়ে তাদের কাছে রেখেছিলেন। এখন জয়ার মাকেও চৌধুরী তার বাড়ীতেই নামিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে নিশ্চিন্তবোধ করলো মঞ্জু। এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? ওরা নেবে গেলে এবার রূঢ় গলায় ড্রাইভার জানতে চাইলো— সে কোথায় যাবে।

সেই বেলা তিনটে থেকে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। এই থামা ওয়েটিং চার্জের চাইতে চলায় তাদের দ্বিগুণ লাভ। কিন্তু মঞ্জুকে সে খুঁজে বের করতে পারে নি। আর খুঁজবেই বা কোথায়—এদিক ওদিক তাকানো ছাড়া। অমলরা বেরিয়ে এলে তাদের ভাড়া মিটিয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু ওরা দেবে কোথা থেকে? বাধ্য হয়ে গজগজ করতে করতে থেকে যেতে হয়েছিল তাকে।

বুঝল মঞ্জু সবই। না ভেবে-চিন্তেই সে বলে ফেলল—গ্র্যাণ্ডে চলো।

—গ্র্যাণ্ড হোটেলে? মঞ্জুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে জানতে চাইলো সে। একটু অবাক হওয়া ভাব তার জিজ্ঞাসায়। যেন— বেশবাস আদব-কায়দা কিছুই তো মঞ্জুর গ্র্যাণ্ডে যাওয়ার সাক্ষ্য দেয় না; ওকে ঐ সমাজের কেউ বলে বলে না।

জবাব দিল মঞ্জু—হাঁ, গ্র্যাণ্ডে।

বহুৎ আচ্ছা।

গাড়ী ছুটে চলল।

যদিও মঞ্জু ভাবলো সে না ভেবে-চিন্তেই গ্র্যাণ্ডের কথা বলেছে, কিন্তু—তা কি কখনো হয়? মন প্রস্তুত না হয়ে কোথাও এক পা বাড়াতে চায় না, বাড়ায় না। জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া অবশ্য যায় কিন্তু তার পেছনে জোর থাকে, বলপ্রয়োগ থাকে, জুলুম থাকে। হঠাৎ করে কিছু করে বসলেই যে আমরা ভাবি, না ভেবে-চিন্তে করেছি—এটা ভুল। হঠাৎ করা কাজের পেছনে মনের প্রস্তুতি থাকে সব চাইতে বেশী।

ওর এখন এমন একটা জায়গা চাই, যেখানে সাত রকম প্রশ্ন করে ওকে কেউ বিরক্ত করবে না, কোন সন্দিগ্ধচিত্ততা নিয়ে ওর দিকে কেউ তাকাবে না।

যদি সে কথা বলতে না চায়, একটা কথাও না বলে, বসে বসে নীরবে সিগারেট টেনে চলবে।

মুখ দেখে ওর দুরন্ত ক্ষিধের কথা বুঝতে পেরে খাবার এনে কাঁটায় গেঁথে হাতে তুলে দেবে।

ড্রাইভারের কবুল করা বকশিস, ট্যাক্সি মিটারের অঙ্ক, কালকের বেশীটার প্রয়োজন, কোন কিছুর জন্যই ওকে আর ভাবতে হবে না—

এর কোন্ কথাটা মনের অজানা?

তবে কোথায় যেতে হবে সে জানবে না কেন?

প্রস্তুত হয়েই বা তবে থাকবে না কেন?

গ্র্যাণ্ড ছাড়া যে মঞ্জুর আর কোথায় এখন যাওয়া হতে পারে না, এটা মন জানতো। প্রস্তুত হয়েও ছিল সে। আর কোথাও নিতে হলেই তাকে— জোর ক'রে নিয়ে যেতে হতো।

হোটেলের দরজায় গাড়ী এসে থামলে মঞ্জু নেমে পড়লো।

নেমে পড়লো ড্রাইভারও। জানালো আর সে এক মিনিটও অপেক্ষা করতে পারবে না। তার টাকা মিটিয়ে দিক মঞ্জু।

ড্রাইভারের বলার ভঙ্গিতে, মুখের চেহারায় কোন সম্মান ছিল না। শঙ্কিত হলো মঞ্জু।

এমনি সময় রজতের গাড়ী এসে থামল মঞ্জুর ট্যাক্সির পেছনে। মঞ্জুকে দেখে নেমে এসে সসম্ভ্রমে সেলাম জানালো, রজতের ড্রাইভার।

এতো বড় গাড়ী থেকে অমন ব্রাসো ঘসা ঝক্‌ঝকে বোতাম আঁটা, সাদাপোষাক পরা ড্রাইভারকে নেবে এসে মঞ্জুকে সেলাম জানাতে দেখে যেন গুটিয়ে গেল ট্যাক্সিচালক। হাত কচলে জানালো, মঞ্জু যেন মেহেরবাণী করে টাকাটা এক্ষুনি তার পাঠিয়ে দেয়।

হাঁফ ছেড়ে গ্র্যাণ্ডের পরিচিত পথে হাঁটা দিলে মঞ্জু।

তেমনি জোড়ায় জোড়ায় দেশী-বিদেশী নারী-পুরুষ চলেছে করিডোর দিয়ে। খোলা হাওয়ার রেস্টুরেণ্টে তেমনি বাজছে অরকেস্ট্রা। তেমনি একটি মেয়ে মাইকের মুখ কিউটেক্সরঞ্জিত আঙ্গুলে আলতো হাতে ধরে গান গাইছে। তার মুক্তোর মতো দাঁত রাঙ্গা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। বয় ঘুরছে ট্রে হাতে। সব কিছু পাশ কেটে সোজা চলে গিয়ে লিফ্‌টে উঠল মঞ্জু। কিন্তু রজতের ঘরের দরজার বাইরে সঙ্কীর্ণ করিডোর ঘেঁসা টেবিলটা পেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থেমে পড়ে সরে দাঁড়াতে হলো তাকে। জন তিন চার নারী পুরুষের একটা ছোট দল হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলো রজতের ঘর থেকে। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রজতের ঘরের উদ্দেশে বলল—নাইট ইজ ষ্টিল ইয়ং— ওহো, রজত নিষেধ জারি করেছে তো নিজেদের ভেতর ইংরেজী বলায়। বুঝলে রজত, রাত্রি এখনও নবীন—আবার আসছি আমরা।

জবাব এলো ভেতর থেকে— ও, সিওর।

—সিওর নয়, বলো নিশ্চয়। সকৌতুকে পাল্লাটা ঠেলে ঘরের ভেতর ডাক দিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে, 'সরি' বলে মাথা টেনে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর হাসির রোল তুলে চলে গেল সবাই লিফ্‌টের দিকে।

ওরা লিফ্‌টে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু অপেক্ষা করে। এখানে ওরই বিশ্রামের জন্য ওরা ঘরটা কিছুক্ষণের জন্য খালি করে দিয়ে গেল। ভাগ্যটাকে একটা ধন্যবাদই দিয়ে ফেলল মঞ্জু।

কিন্তু কোথায় যে সত্যিকারের ভাগ্য, তা যদি মানুষ বুঝতে পারতো তবে তো কথাই ছিল না। মঞ্জু লোকটির রজতের ঘরের ভেতর মাথা ঢুকিয়েই 'সরি' বলে মাথা বের করে এনে হো হো করে হেসে ওঠার কারণটা ধরে উঠতে পারেনি। নিষ্প্রয়োজন বোধে তাই টোকাঠোকা না দিয়েই দরজার ভারী নিঃশব্দ পাল্লাটা ঠেলে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়লো সে। কিন্তু ঢুকেই হক্‌চকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো মঞ্জুকে।

রজতের ডবল স্প্রীং-এর খাটের ডানলোপী গদীর ভেতর শরীর তলিয়ে দিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে বসে আছে একটি মেয়ে। তার সিগারেট ধরা অলস হাতটা শিথিল ভাবে পড়ে আছে খাটের বাইরে। বোধ হয় রজতের শরীরে যাতে না লেগে যায় সে জন্যই হাতটা দূরে রেখেছে মেয়েটি। রজতের দুহাত বেষ্টন করে আছে মেয়েটির খালি কোমর। মুখটা মেয়েটির মুখের উপর।

কি করে বেরিয়ে যাবে ঠিক করে উঠবার আগেই মেয়েটির চোখ পড়ে গেল মঞ্জুর দিকে। রজতের মুখটা হাত দিয়ে সামান্য ঠেলে দিয়ে, নেশাগ্রস্ত শরীর এলিয়ে দিল সে—বিছানায়।

বললো,— রজত, সামওয়ান হ্যাজ কাম। কারু আসাটা মেয়েটির মতোই গ্রাহ্য করলে না রজত। যেমন ছিল প্রায় তেমনি ভাবে বসে থেকে—শুধু মাথাটা পেছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে স্ফূর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো সে— হ্যালো, কে?

বেরিয়ে যাওয়া হলো না মঞ্জুর। থাকতে হলো দাঁড়িয়েই।

—মঞ্জু! মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো— রজত বিছানা ছেড়ে। বিমূঢ় মঞ্জুর দিকে তার মাতাল চোখ দুটোও কিছু সময় তাকিয়ে রইল বিমূঢ় হয়ে। তারপর পা টলা পায় এগিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল মঞ্জুর দিকে—আঃ মঞ্জু, তুমি— তুমি এখন এখানে এসেছ কেন? এখন—এখন তোমাকে আমি কোথায় বসাবো, কি করে তোমার সঙ্গে কথা বলবো? না— না। তুমি এখন চলে যাবে মঞ্জু। কথাগুলোর—আদ্দেক বোঝা গেল। আদ্দেক চাপা পড়ল তার ভারী জিবের তলায়।

চলো, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি। চলতে গিয়ে কৌচের পিঠ ধরে টাল সামলালো। তারপর বললো —চলো।

হঠাৎ সোজা হলো মঞ্জু।

—চলো।

—না।

লাল চোখ দুটো তুলে বিস্মিত ভাবে মঞ্জুর দিকে তাকালো রজত—যাবে না বলছ?

মঞ্জু মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ, সে তাই বলছে।

বিহ্বল কণ্ঠে রজত বললো— কি করবে?

মঞ্জুর মুখের বিমূঢ়তা কেটে গিয়ে এখন যেন সেখানে বিদ্যুৎ খেলছে। বললো— বসবো।

॥ ২৭ ॥

রজতের দেওয়া টাকা জয়ার মার হাতে তুলে দিয়ে মঞ্জু নিরুদ্বেগ মনে বইপত্র গুছিয়ে পড়ায় মন দিয়েছিল। যে মেয়ে জানে তাকে কাজ করতে হবে—অনেক কাজ, যে মেয়ে জানে তাকে বড় হতে হবে—অনেক বড়, যে মেয়ে মুখের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসকে কানে কানে বলে যেতে শোনে, 'ওগো মেয়ে এগিয়ে চলো' সে মেয়ে আর যে কাজেই ফাঁক রাখুক আর ফাঁকি দিক, পড়ার ব্যাপারে ফাঁক রাখে না ফাঁকি দেয় না। জয়াদের দিকে একটু নিশ্চিন্ত হতে পেরেই বিক্ষিপ্ত মনটাকে মঞ্জু গুটিয়ে নিয়ে এসে নিবিড় করেছিল বই-এর পাতায়। কিন্তু ওর গ্রহযোগটাই বোধ হয় এমন চলছিল যে তারা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। জয়ার আত্মহত্যা করতে যাবার খবর পেয়ে ফের দৌড়োতে হলো ওকে বইপত্র ফেলে। কিন্তু কেবল দৌড়োদৌড়ি ছোটাছুটি, দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠার উপর দিয়েই ব্যাপারটা যদি মিটত তবুও ভালো ছিল। জয়ার প্রাণটুকুকে শুধু বিপদসীমা পার করে আনতে যখন ওর অমন নিশ্চিন্ততার টাকা কটা এক সন্ধ্যায় হাসপাতালের হাওয়ায় হাওয়া হয়ে উড়ে গেল তখন এতদিনে সত্যি চোখে অন্ধকার দেখল মঞ্জু। এখন কি করে কি করবে সে? কোথা থেকে সে একদিকে জয়ার হাসপাতালের ওষুধ-পথ্যের যোগান দেবে, অন্যদিকে জয়াদের বাড়ীর প্রতিদিনের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে চলবে। না, বাঁচবার উপায় নেই—আগে যাদের বাঁচবার উপায় ছিল না আজও তাদের বাঁচবার উপায় হয়নি। ছট্টু বাঁচেনি—নীল তাকে বাঁচাতে পারেনি। জয়া, জয়, জয়ার মাও বাঁচবে না— সেও তাদের বাঁচাতে পারবে না। সে পাগল— সে পাগল— সে উন্মাদ, তাই এ দুঃসাহস তার হয়েছিল।

ও পালাতো। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে মৌরীর চিলেকোঠার দরজা সেঁটে দিত। কারু সাধ্য ছিল সেখান থেকে ওকে টেনেও বের করে আনতে পারে। ও জানতো না জয়ার চিকিৎসা হচ্ছে কিনা—অনাহারী ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসে জয়ার মা ওর পায়ের শব্দের জন্য পল-দণ্ড গুণছেন কিনা। ও জানতো না ওর বাকী রেখে আসা ওষুধের বিল নিয়ে মমতা কি করল আর ওকে কি ভাবলো, ও জানতো না জয়া হাসপাতাল থেকে রক্তশূন্য রোগা দুর্বল পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ওকে খুঁজত কিনা। ওকে না দেখে ওর ফ্যাকাসে মুখের সাদা ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠত কিনা। যদি ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে সে গ্রাস ওর গলা দিয়ে নামতে না চাইতো, যদি তা উগরে ফেলে দিতে হতো তবু না— তবু সে ঘরের দরজা খুলত না, কিছু জানত না। কিংবা হয়ত ওর কানে এগিয়ে চলার বাণী বয়ে আনা বাতাসকে ওর রুদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিত। তারপর আঁচল দিয়ে কপালের স্বেদবিন্দু মুছত। কি যে সে করত আর কি যে সে করত না কে জানে, যদি না 'রজত আছে' এই একটা কথা ওর ভেতর মনে অন্তঃসলিলা নদীর মতো বইতে না থাকত।

অবশ্যি শুধু যে ঐ সেদিনের টাকা দেওয়ার জন্যই রজতের উপর একটা ভরসা ও মনে মনে পোষণ করছিল তা নয়। রজতের বহু বিদেশিনী বান্ধবী আছে। তারা যদি কেউ বাংলা শিখতে চায় এবং রজত তাকে তেমন একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেয় তবে তার অশেষ উপকার হয় শুনে রজত বলেছিল, সে নিশ্চয়ই দেখবে। তাই খোঁজ নিতে মঞ্জু এর মধ্যে আরো কয়েকদিন আসা-যাওয়া করেছে রজতের কাছে। আর এই যাওয়া আসার ভেতর দিয়ে মানুষটি সম্বন্ধে ওর মনে যে ধারণাটা গড়ে উঠেছে সেটা সুন্দরও বটে, প্রীতিপূর্ণও বটে। লোকটি বুদ্ধিতে ব্যবহারে আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। এঁর কাছে এসে বসে সময় ভালো কাটানো যায়। এঁর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। বিনা দ্বিধায় এসে হাজির হওয়া যায় প্রয়োজনে—একটি মানুষকে বন্ধু বলে গ্রহণ করার জন্য আর কী চাই? বিশ্বাস?

হ্যাঁ, বিশ্বাস বলে একটা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু আছে বৈ কী। প্রেমে প্রীতিতে ভালোবাসায়, কাজে কথায় আন্তরিকতায় বা মনুষ্যত্বের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল—একজনকে যে চেহারায় দেখছি, যে ভাবে চলছি তার যে ব্যবহারটুকু আমাকে তার কাছে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনে হাজির করে দিচ্ছে সেটুকুর ওপরও নির্ভর থাকা চাই বৈ কী। কিন্তু বিশ্বাসের প্রতি কোন অবিশ্বাসই এখন পর্য্যন্ত ওর মনে গড়ে ওঠেনি। এ বয়সটাই হলো মঞ্জুদের বিশ্বময় বিশ্বাসের বাতাস বইতে দেখার। মৌরী ওকে রজত সম্বন্ধে যতই অবহিত করুক, মঞ্জু রজতকে সুজন হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

আর রজতের মঞ্জুকে ভাল লাগার বোধ হয় কোন সীমা ছিল না। মঞ্জু যেন তার কাছে এক অপরিচিত বিস্ময়। মঞ্জু এলে জোর করে ধরে রাখত সে তাকে। আর কথার পর কথা তুলে শুনত কেবল মঞ্জুর কথা। কোন কথা আজ আর বাকী নেই মঞ্জুর যা রজতের শোনা না হয়ে গেছে। ছোড়দা বড়দা বৌদি থেকে মৌরী সুদর্শন নীল কেউ আজ অপরিচিত নয় রজতের কাছে—অপরিচিত নয় জয়া, জয়, জয়ার মা। ছোড়দার বিয়ে ভাঙ্গার কাহিনী শুনে গেছে সে চুপচাপ সিগারেট খেতে খেতে। মমতার রূপের কথা শুনে চোখ দুটো কুঁচকে ছোট করে একটু মুখটেপা হাসি হেসে বলেছে, আচ্ছা! মৌরী সুদর্শনের গল্প শুনতে শুনতে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার কি মনে হয় ডাক্তার আর আসবে না? তোমার তাই মনে হয়। দিদির মৃত্যুসংবাদ যে মিথ্যে তা সে বুঝবে কি করে, ভাববে কি করে? কতটুকু বোঝ তুমি শুনি? আমি বলছি, দেখো ডাক্তার ঠিক একদিন এসে উপস্থিত হবে। আচ্ছা, আমার কথা তোমার দিদিকে বলেছ? —বলেছ! কি বলেন তিনি আমার বিষয়ে?

হেসে উঠেছিল মঞ্জু।

—এমন করে হেসে উঠলে যে?

—এমনি।

—ওঃ, লোকটি আদবেই পছন্দ করেন নি বুঝি? তা গল্প যা শুনলাম তাতে আমাকে তার পছন্দ হবার কথাও নয়। তুমি যে আমার এখানে আস এ কথা তিনি জানেন?

—না, জানেন না।

—জানলে আসতে দিতেন না?

—বাধা দিতেন।

—তোমার দিদি তো তোমার ভীষণ প্রিয়?

— ভী-ষ-ণ।

—তবে—তবে তার কথা শোন না কেন?

—যতই প্রিয় হোক আর যতই ভালবাসা থাক একজনের সব কথা আর একজন কিছুতেই সব শুনে চলতে পারে না বলে।

—তবে তুমি তোমার দিদির অবাধ্য হয়েই এখানে আস?

—কিছুটা—

—আই অ্যাম লাকি!

নীলের কথা শুনতে শুনতে কৌতুকে কৌতূহলে আর ঔৎসুক্যে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে রজতের চোখ—নীল ধনীর লেখা লিখে দেয়। কাজটা সে এত খুশীমনে করছে যে দেখে দুঃখ হয় মঞ্জুর। নিজের লেখা অপরের নামে দেওয়া— ক্ষোভের কথা নয়? কিন্তু নীল বলে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে মূল্যবান সিগারেট টানতে টানতে, মূল্যবান কাপে চা খেতে খেতে নিজেকে তার মনে হয় সম্রাট। অপরের চিন্তা নিয়ে চিন্তা করতে লিখতে পীড়াদায়ক মনে হয় না তার? মঞ্জু জানতে চাইলে জবাব দেয়, তার চাইতেও অনেক বেশী পীড়াদায়ক চিন্তা মনে হয় তার বসে বসে পেটের চিন্তা করা। নীল বলে, নির্বোধ ঘ্যানঘেনে প্রিয়জনের অবুঝ দাবীর মতো নাকি তার একঘেয়ে ঘ্যানঘেনানি। তাকে ঠাণ্ডা না করে উপায় কি অন্য কোন কাজে মন দেয়—

চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে মঞ্জুর কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে ওঠে রজত— ভেরি ষ্ট্রং রাইভেল!

নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক অবতারিত কথা ধরে উঠতে পারল না মঞ্জু। রজতের করুণ করে তোলা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল— রাইভেল—মানে?

—রাইভেল মানে প্রতিদ্বন্দ্বী।

—এখানে কথাটা কোথা থেকে এলো?

—শুধু কথা কেন আসবে। ব্যক্তিও আছেন। তোমার কথার ভেতর দিয়ে যাকে দেখতে পাচ্ছি আমি তারই কথা বলছি— কোয়াইট এ পারসোনালিটি।

—তাই বলুন, পারসোনালিটি। রাইভেল বলছেন কেন।

—তা আমি কি করবো বল। তিনি আমার কাছে যে রূপে দেখা দিলেন।

ছট্টুর কথা, তার চার পয়সার বাজেট মিলনোর গল্প শুনে গেছে রজত নীরবে। জয়ার কাহিনী শুনেছে মঞ্জুর সামনের গণ্ডিটুকুর তিন চার হাতের ভেতর পায়চারি করতে করতে। মঞ্জুর কাজ খোঁজার ব্যাপারটা এতদিন রজতের বোধগম্যতার বাহিরে ছিল। ওদের বাড়ীর অবস্থা সে জানে। যতীনবাবু মঞ্জুর উপার্জ্জনে নির্ভর নন। এতদিনে মঞ্জুর টাকার প্রয়োজনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলো রজতের কাছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলো সে— যে আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?

যত মন দিয়েই শুনে যাক, শ্রোতা কোন গল্পের ভেতর প্রবেশ করছে আর কোন গল্পের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে, গল্পকারের পক্ষে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ছট্টুর কথা যত হৃদয়বেদনা নিয়েই মঞ্জু বলুক, রজত গভীরভাবে শুনছে শুধু সে বলছে বলে—জয়ার কাহিনী তার অন্তর স্পর্শ করছে ঠিক যেমন একটা সার্থক উপন্যাস আমাদের অন্তরানুভূতিকে নাড়া দিয়ে যায় ঠিক তেমনি— এ বুঝছিল মঞ্জু। কিন্তু সেজন্য রজতের প্রতি ধারণার মান তার নেমে এলো না। কারণ রজতকে সে যা চিনেছিল সে চেনায় কোন আঘাত এতে পড়ল না। রজতের 'আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?' জিজ্ঞাসার জবাবে বলল সে—আপনার বিদেশী বান্ধবীদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন?

—আর কি করতে পারি বল?

—আর কি করতে পারেন। সব করা তো আপনাদের দিকে তাকিয়েই থেমে রয়েছে। না করতে পারেন কি আপনারা।

—আমার করার কথা বলছিনে। আমি ভাই একেবারেই অন্য জগতের মানুষ। তোমার করায় আমি কি কাজে আসতে পারি তাই বল।

—বন্দুক চালাতে জানেন?

একটুও বিস্মিত হলো না রজত মঞ্জুর প্রশ্নে। জবাব দিল—না।

লড়াই করতে পারেন?

—উঁহু।

—তাও না। একটু যেন ভাবল মঞ্জু। তার পর, আচ্ছা আসুন পাঞ্জা কষে দেখা যাক গায়ের জোরটা আপনার কেমন। সামনের টেবিলটার ওপর কনুই রেখে পাঞ্জা লড়ার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল সে রজতের দিকে। রজত হাত মিলালে এক চাপে তার হাতটা টেবিলে নামিয়ে ফেলে বলল—ভাবছেন বুঝি ইচ্ছে করে হারলেন?

—নয়?

—কখনো নয়। হার —হার ইচ্ছে করে মানুষ তখনই হারে যখন ঠিক জানে হার অনিবার্য।

হেসে উঠল রজত। বললো, আর কোন কারণে হার স্বীকার করে না?

উঁহু। কিন্তু আপনি কি করে আমার কাজে আসবেন বলুন। মানুষের কাজে আসে হয় গায়ের জোর নয় টাকার জোর তো?

—অপর জোরটা পরীক্ষা করে দেখো।

—টাকার?

—হাঁ।

—সেটার পরীক্ষা নেওয়াও আমার হয়ে গেছে।

—বলো কি! সেটার পরীক্ষা নেওয়াও তোমার হয়ে গেছে! কবে হলো? পরীক্ষার রেজাল্ট কি?

—ভালো নয়।

—ভালো নয়! এবার কার কাছে হারলাম গো?

হেসে ফেলল মঞ্জু। বললো— হেরেছেন আমার কাছেই। হার কি এক চেহারার হয়। কোথাও হয় শারীরিক শক্তির কোথাও হয় মানসিক শক্তির। ভাবছেন তো, মেয়েটা বলে কি। এই সেদিন সদ্য সদ্য সাদা চেক সই করে দিলাম, একগোছা টাকা দিলাম আরও দেওয়ার প্রস্তাব বাড়িয়ে ধরে বসে আছি—তা ছাড়াও কত দেওয়া দিতে আপন চোখে মেয়েটা দেখছে— সেই মেয়ে আমাকে এমন কথা বলে! কিন্তু আপনিই বলুন, এগুলো কি কোন শক্ত দেওয়া না শক্তির দেওয়া? টাকার পরিমাণের তুলনায় এমন কিছু অঙ্কের দয়া দান সবাই করতে পারে। আমি পাঁচ পারি— কেউ পারে দশ, আপনি না হয় পারেন হাজার। কিন্তু পারেন দিতে সব?

রজত মুখ খুলতে যাবার আগেই মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, উঁহু, পারেন না। হ্যাঁ নেও, হুঁ নেও করতে করতে সরে পড়েন।

—সরে পড়ি—

সরে পড়েন না তো কি। মনে নেই সেই সাদা চেক দেওয়ার দিনের কথা? বললাম, যা খুশী অঙ্ক বসাবো? বললেন, বসাও। বললাম, তারপর যে আর আমাকে দেখে দিন ভালো যাওয়ার কথা আপনার মুখে আসবে না। বললেন, আসবে। তুমি রোজ এসো। বললাম, এমনি একটা করে চেক রোজ দেবেন? বললেন, দেবো। তারপর যে দিন পারবো না, তুমি খাওয়াবে আমায়। কিন্তু যেই বললাম, তবে অনর্থক নিত্যদিন চেক কাটার হাঙ্গামাটা রেখে লাভ কি? একবারেই দিয়ে দিন না সব। আজ থেকে আপনার কিছু নয়— সব আমার। শুনে এমন ঘাবড়ানোই ঘাবড়ে গেলেন—ঐ যে বললাম, হ্যাঁ নেও, হুঁ নেও করতে করতে তাড়াতাড়ি দেরাজ থেকে কিছু নোট এনে ব্যাগে ভরে দিয়ে বিদায় করলেন আমাকে—

হাঃ, হাঃ করে সমস্ত ঘর ভরে তুলে হেসে উঠেছিল রজত—ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বুঝি।

কথায় বার্তায় কৌতুকে পরিহাসে এমন একটা মধুর এবং পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক মঞ্জুর সঙ্গে রজতের গড়ে উঠেছিল যে, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই রাতেও বিনা দ্বিধায় চলে এসেছিল মঞ্জু রজতের এখানে—যদিও এর আগে কখন সে এখানে রাতে আসেনি, এসেছে কলেজে যাবার মুখে। যে সময়টায় রজতের কাছে অভ্যাগতের ভিড় থাকেনা এবং তার দরজায় লটকানো থাকে 'ডোণ্ট ডিসটার্ব' কার্ড। তবু তখন যে কেউ কেউ না এসেছে বা দু'একজন মহিলাকে আসতে বসতে মঞ্জু না দেখেছে তা নয়। কিন্তু সেই আসা যাওয়া বসায় কখনো এমন কিছু দেখেনি যাতে মন বিরূপ করে তোলে; রুচি কুণ্ঠিত হয়। তাই কোন জানান না দিয়ে রজতের ঘরে এসে প্রবেশ করতে তার মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি—না, এমন একটা অবস্থার সামনা সামনি হবার জন্য কিছুমাত্রও প্রস্তুত ছিলনা সে।

তা সংসারে মানুষ কটা ব্যপার সামলাবার জন্য প্রস্তুত হবার সময় পায় বা প্রস্তুত হয়ে ঘটনার মুখোমুখি হয়। কটা ঘটনা আগে থাকতে সঙ্কেত দিতে দিতে আসে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের মতো ঘটনার গায় তো কোন ঘণ্টা বাধা থাকেনা। সে জন্য কিছু নয়। জীবনে আকস্মিকতার যেমন শেষ নেই তেমনি তা সামলাতে মানুষ শিখে ফেলেছে। এই অবস্থায় একমাত্র করণীয় যা ছিল মঞ্জুর পক্ষে সেটাই করছিল সে অর্থাৎ যেমন অজ্ঞাতে প্রবেশ করেছিল তেমনি অজ্ঞাতে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর ছেড়ে। কিন্তু মঞ্জু যখন দেখল— যে রজত যেমন ছিল তেমনি থেকে শুধু মুখটাকে একটু ঘুরিয়েছিল আগন্তুককে দেখবার জন্য, ওকে দেখামাত্র সেই রজতের নিবিড় বাহুবন্ধন মুহূর্তে বিকল হয়ে খসে পড়ল মেয়েটির শরীর থেকে তখন চলে যাওয়ায় উদ্যত মঞ্জু হঠাৎ যেন রজতের এই দুর্বলতার ভিতের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল শক্ত হয়ে।

পরম স্নেহের পাত্রীকে নিজের বেচাল দেখে ফেলতে দেখলে গুরুব্যক্তি দুঃসহ লজ্জায় মরে যেতে যেতে যে ভাবে উল্টো তিরস্কারে তিরস্কৃত করে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবে ওকে তখন বলে উঠল রজত— আঃ মঞ্জু, তুমি এখন এসেছ কেন এখানে! তুমি যাও! তখন মেরুদণ্ডটান করে জবাব দিল মঞ্জু— না।

লাল টক্‌টকে মুখটা আরো লাল হয়ে উঠল রজতের— তুমি যাবে না বলছ?

মঞ্জু তাই বলছে। হাঁ, মনুষ্যচরিত্রের সব চাইতে বড় দুর্বল দিকই বোধ হয় এটা, সে যদি একবার অপরের দুর্বলতার দিকটা টের পেয়ে যায় তবে পুরো মূল্য পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারে না— অনেক বেশী নিয়ে ফেলে।

হুইস্কির বোতল, সোডার বোতল পড়ে রয়েছে। টেবিলে টেবিলে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে খালি খালি ওয়াইন গ্লাস। প্লেটে প্লেটে পড়ে রয়েছে ভাজাভুজির ভুক্তাবশিষ্ট। ছাইদান উপচে পড়ে ছাই আর পোড়া সিগারেট নোংরা করে তুলেছে কার্পেট। কোণের দিকে কেসের ভেতর আনকোরা বোতলগুলোর সোনালী রাংতা-মোড়া মাথা আছে সারি সারি উঁচু হয়ে। কৌচের ওপর পড়ে আছে গোটাকয় নেটের স্কার্ফ। উচ্ছৃঙ্খল ঘরটার উপর চোখ বুলিয়ে আনতে আনতে মঞ্জুর মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল সে —বসবো।

এক সঙ্গে পা ফেলে চলার মতো মঞ্জুর দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রজতের রক্তাভ চোখ দুটোও অস্থিরভাবে ঘুরে এলো ঘরটার ভেতর—খালি বোতল, ভরা বোতল, গ্লাস, প্লেট, মেয়েদের ফেলে যাওয়া স্কার্ফ ওর বিছানার ওপর আধশোয়া মেয়ে— সাদা জরির নাইলনের শাড়ীটা তার দেহের উপর নিয়ন আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে যেন একটুকরো রূপালী রোদের মতো। আর দেখা যাচ্ছে ঠিক যেন নগ্ন দেহের উপর রোদের চাদর ঢাকা একটা পড়ে থাকা নিরাবরণ দেহ— ছটফট করে উঠল রজত—প্লিজ মঞ্জু, প্লিজ—আমি অনুনয় করছি, ওঠ লক্ষ্মীটি।

শরীরটাকে আরো ছেড়ে দিয়ে বসতে বসতে শান্ত গলায় জবাব দিল মঞ্জু— আমার কিছু কথা আছে।

—না, এখন আমার কাছে তোমার কোন দরকার থাকতে পারে না—কিছু দরকার থাকতে পারে না মঞ্জু। গাড়ী বলে দিচ্ছি। পৌঁছে দিয়ে আসবে তোমায়—ওঠ। হঠাৎ যেন মাথার নেশাটাকে ঝেঁকে ফেলে দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করল রজত।

কিন্তু আশ্চর্য্য স্বল্প একটু হাসির উত্তরে আগ্রাহ্য করলো মঞ্জু তাও।

অসহায় ভাবে ফের তাকালো মঞ্জু মেয়েটির দিকে। ঠিক তেমনি আধশোয়াভাবে শুয়ে আছে সে। তার এক হাতে সিগারেট। পাশে নিচু সাইড টেবিলের ওপর ওয়াইন-গ্লাস। তখনো সে নিমীলিত চোখে সিগারেটে টান দিয়ে ওপর দিকে ধোঁয়া ছাড়ছে, কখনো মাথাটা ঈষৎ উঁচু করে গ্লাস তুলে নিয়ে তাতে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে। কোন ভাবান্তর ঘটেনি তার। ঘরে সে ছাড়া যে কেউ আছে তাও জানে না সে। একা শুয়ে অলস সময় কাটাচ্ছে সে।

কিন্তু সেটা যে সত্য নয় বোঝা গেল এবার। রজতের অসহায় দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিছানার উপর উঠে বসল সে। প্রথমে টেবিলের উপর থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে হুইস্কিটুকু এক সঙ্গে ঢক করে ঢেলে দিল গলায়। তারপর গ্লাসটা টেবিলের ওপর ঠক করে রেখে দিয়ে নেমে দাঁড়ালো খাট থেকে। একটু সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে টলমলে শরীরটাকে নিল ধাতস্থ করে। শাড়ীর আঁচলটা কাঁধ থেকে পড়ে যেমন কার্পেটের ওপর লুটোচ্ছিল তেমনি ভাবে সেটাকে লুটোতে লুটোতেই আসছিল সে রজতের কাছে, কিন্তু নিতান্তই স্খলিত আঁচল পায় পায় বিরক্ত করছিল বলেই হয়ত তারপর সেটাকে কাঁধের ওপর তুলে দিল। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল— নাচের টিকিটটার একটু সদ্‌ব্যবহার করে আসতে যাচ্ছি রজত—কিন্তু কথাটা শুনে এমন সন্ত্রস্তভাবে এগিয়ে এসে তার বাহু চেপে ধরে ওর যাওয়ায় বাধা দিল রজত যে অবাক হয়ে গেল মেয়েটি। রজতের আজকের ব্যবহার প্রথম অবধিই দুর্বোধ্য ঠেকছিল তার কাছে। সেটা আরো একমাত্রা বাড়ল। সে ভেবেছিল, উঠে গিয়ে রজতকে কিছু সাহায্য করতে পারে এবং রজতের অসহায় দৃষ্টি তার কাছে এ কথাটাই বলতে চাচ্ছে— আর উচিত তো সেটাই। রজতের এই আতঙ্কিত বাধার কোন অর্থ বুঝে উঠতে পারল না সে। বলল—বড্ড বেশী খেয়েছ তুমি রজত। কিন্তু আতঙ্কিত হবার কারণ ছিল রজতের।

মাথার জ্ঞানবুদ্ধি বোধ তার তলিয়ে গেছে মদের তলায়। সর্বদেহে বইছে তার ঘনিষ্ঠ নারীসঙ্গের উত্তেজনা; এ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই দুর্দান্ত মাতাল মন নিয়ে সাহস নেই রজতের মঞ্জুর সাহচর্যে বসে থাকে। কারণ রজত জানে, শিশু যেমন আগুন নিয়ে খেলতে ভয় পায় না আগুনকে সে চেনে না বলেই মঞ্জুর অনেক খেলা, অনেক সাহস সেইজাতীয়। মেয়েটিকে হাত ধরে কৌচে বসিয়ে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম চটচটে মুখটা মুছতে মুছতে রজত বললো—তুমি বোস।

কিন্তু রজত হাত ছেড়ে দিতেই ফের উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। বললো— ডোণ্ট বি সিল্লি। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছিনে। শুনলে না ওরা যে বলে গেল— নাইট ইজ স্টিল ইয়াং— বলে ঝরঝর করে হেসে উঠল সে। তারপর দেহের প্রতিটি ভঙ্গির সচেতন আহ্বানে যেন রজতের শরীরময় সাগর তাণ্ডব তোলার ঢেউ খেলিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

দুই হাতে চুলগুলো মুঠো করে ধরে কিছুক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল রজত। তারপর কৌচে বসে মাথাটা কৌচের পেছন দিকে ফেলে চোখ বন্ধ করল।

মঞ্জু টেবিলের উপর নামিয়ে রাখা ওর ব্যাগটা ফের কোলের ওপর টেনে নিয়ে তার উপর থুতনী চেপে বসে বলল—আচ্ছা ইয়াং না হলে আপনাদের কিচ্ছু ভালো লাগে না, না? কেন মধ্যরাতটা কম সুন্দর নাকি—আর শেষ রাতটা তো রমণীয়। শেষ রাত যখন বধূবরণের মতো লাল টুকটুকে ভোরের টুকরোটুকুকে বরণ করে তুলে রাজ্যপাট ছেড়ে নিজেকে নিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে থাকে, দেখেননি তো তার সেই উদার বিদায়।

রজত যেমন ছিল তেমনি থেকে ক্লান্ত গলায় বলল—তুমি কি বলবে বল।

কিন্তু কি বলবে মঞ্জু। সে কি কথা বলার জন্য এসেছিল। সে এসেছিল বিশ্রামের জন্য। এসেছিল আর্থিক প্রয়োজনের নিশ্চিন্ততার জন্য। আর এটার জন্য না এলেও পেটের ভেতর এমন একটা দুর্দান্ত ক্ষুধা জ্বলছিল যে, আসামাত্র রজত যে খাবার ডিসটা এগিয়ে দেয় সেটারও দরকার ছিল। কিন্তু সব কথা সে ভুলেই গেছে এখন।

সত্যি এই এক আশ্চর্য্য বস্তু মানুষের মন। সে যে কখন কি করে, কেন করে তার কিছুই প্রায় সে নিজেই বোঝে না। মঞ্জুও কিছু বুঝে নয়, ভেবে নয়, কি করছে—কেন করছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র চৈতন্য থেকে নয়, শুধু করে যেতে লাগল—কারণ অন্য কিছু সে করতে পারল না। নেশার ঝোঁকে চলার চাইতে কম জোরালো নয়—ঝোঁকের নেশায় চলা।

রজতের তুমি কি বলবে বল সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে যাক্‌গে বলে মঞ্জু ওর পূর্বকথাটা ঝেড়ে ফেলল যে, যেন এসে পর্যন্ত দু-দুবার নবীনা রাত্রির স্তুতি শুনেছে বলেই ফালতু কথাটা বলে ফেলেছে। কিন্তু এবারও ওর যে জন্য আসা সেই জরুরি কথা উত্থাপন করছে। কোলের ব্যাগটা ফের টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে মঞ্জু বললো—আচ্ছা, আজকাল নাকি ফোনে ফোনে সব কিছু হয়—হয়?

জবাবে রজত শুধু বলল—বল।

—হয় কিনা তাই বলুন না।

—সব না হোক অনেক কিছু হয়। তুমি কি করতে চাও বল।

মাথা ঝেঁকে উঠল মঞ্জু—আপনি মাথাটা অমনি করে পেছনে ফেলে রাখলে, আমি কি দেয়ালের সঙ্গে কথা বলব?

মাথা তুলে বলল রজত। বলল—বল, ফোনে ফোনে তুমি কি করতে চাও?

—একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে চাই—আজই—এক্ষুনি।

মঞ্জুর কথা শুনে এবার যেন রজতের মদের নেশা ছুটে গেল। বলল—কার বিয়ের?

—আমার।

—তোমার। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রজত বললো—পাত্র আমি তো?

—অবশ্যই—কিন্তু ঘাবড়াবেন না। আপনাকে আমি হোটেল ছেড়ে গৃহবাসী হতে বলব না। পানীয় ছেড়ে জলপান করতে বলব না। বৈচিত্রময় জীবন ছেড়ে নীরস একঘেয়ে জীবনে টেনে নিয়ে যাবো না। প্রতিদিন দিনে রাতে সন্ধ্যায় একই মুখ দেখে কাটাতে হবে এমন পীড়াদায়ক শাস্তি কখনোই আপনাকে ভোগ করাবো না—এমন কি আপনার সময়কে আনন্দময় করতে যে বান্ধবীরা আসেন তাদের মর্যাদা মূল্যের ব্যবস্থা পর্যন্ত আমি ঠিক রাখব। জীবন আপনার যেমন ছিল ঠিক তেমনই থাকবে।

—তোমার পার্টটা তবে হবে কি?

—আমার পার্ট? জীবনে একটা মেন রোল অবশ্যি আমি করবো—তবে সেটা এটা নয়। এ ক্ষেত্রে আমার রোলটা হবে একটা সাইড রোল—

—যেমন?

—যেমন—একটু থেমে মঞ্জু বলল, যেমন আপনার অর্থ-সম্পদের কিছুটাও যাতে সদব্যয়ে যায় তার তদারক করব আমি। আপনার টাকাগুলোর প্রতি আমার বড় লোভ—ঘরের চারদিকে আবার একবার চোখ বুলিয়ে আনতে আনতে বলল—দেখুন না, সমস্ত ঘর ময় কেবল টাকা উড়ছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে বুক আগলে পড়ে থাকি।

বহুক্ষণ ধরেই রজতের জিভ গলা শুকিয়ে আসছিল। কিন্তু তবু ওয়েটারকে ডেকে ড্রিঙ্ক চাইল না সে। একটা গ্লাসে কিছুটা জল পড়েছিল, কয়েক টুকরো বরফ চামচে দিয়ে তুলে তার ভেতরই ফেলে দিয়ে গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর কার্পেটের উপর তার অভ্যস্ত হাঁটাহাঁটি করতে করতে গ্লাসের ঠাণ্ডা জলে জিভ গলা ভেজাতে লাগল।

মঞ্জু কতটুকু সময় রজতের পায়চারি করা আর জল খাওয়া দেখল চুপ করে। তার পর বলল—আমার প্রস্তাবটা কিছু বিবেচনা করে দেখবেন না?

রজত কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছিল। হেসে ফেলল সে। বলল—তবে বিয়ের আয়োজন করি কি বল?

হাঁপ ছাড়ার মতো একটা নিঃশ্বাস ফেলল মঞ্জু—যাক বাঁচালেন। আজ আপনি কেবলি আমায় অপমান করে চলেছিলেন। ঐ মেয়েটির কাছে অপমান করেছেন কেবল—চলে যাও, চলে যাও, বলে। এখন করছিলেন বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে। অবিশ্যি এখন ঘরে কেউ ছিল না কিন্তু অপমানটা তো ছিলই। কিন্তু এই প্রস্তাবটা কিন্তু আপনিই আগে করেছিলেন—রজতকে কথাটা শুনে ওর সামনে জিজ্ঞাসু চোখ দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বলল—কেন আপনার মনে নেই, দিদির বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার সংবাদ সে রাত্রে দিতে এলে, আপনি আমার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে ভেবে কি বলেছিলেন? বলেছিলেন—ধরো লগ্ন বয়ে গেল, বর এলো না। সবার অলক্ষ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলো কন্যা বেনারসির ওড়নায় মুখ ঢেকে। তারপর তরিৎপায় পথ পার হয়ে তার চন্দনে কুমকুমে সাজানো মুখ আর কাজলটানা চোখ দুটি তুলে দাঁড়ালো এসে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে, মনে নেই?

মনের মধ্যে মোহ ধরে আসছিল রজতের। কিন্তু মোহ সৃষ্টি করবার জন্য মঞ্জু কোন কথাই বলছে না। মোহ টিকতে দিবে কেন মঞ্জু? তার কথার রেশ টেনে বলে যেতে লাগল—ধরুন আজকের রাতটাই সে রাত। কিন্তু চোখে কাজল টানার আর চন্দন কুমকুমের আয়োজন করার আজ কন্যার অবসর মেলেনি। তবে কিছু আগে জানলে সে একটি তাজা লাল টিপ পরে আসতে পারতো—জয়া তার দুই অঞ্জলি ভরে সে আয়োজন করে রেখেছিল। এমন কি, শাড়িটা রাঙ্গিয়ে আনাও অসম্ভব হতো না। বুঝতে পারছেন না তো? না আপনাকে বলা হয়নি, বলার অবসরই বা পেলাম কোথায়? জয়া আজ আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

জয়া-কে, ধরে উঠতে পারল রজত কিন্তু এক টুকরো বরফের উপর হাতুড়ির ঘা মারলে যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে তা চারদিকে ছিটকে পড়ে রজতের মোহটুকুও তেমনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছিটকে পড়ল আত্মহত্যা শব্দটার আঘাতে। দু চোখ বড় করে তুলে জিজ্ঞাসা করল সে, জয়া কে?

দু ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ হলো মঞ্জুর। মঞ্জুর ঠোঁটের এই দৃঢ় ভাঁজের সঙ্গে জয়ার গল্প বলে চলার সময়কার ঠোঁটের ভাঁজের কোথায় হয়ত মিল ছিল—জয়ার সব কথা মনে পড়ে গেল রজতের।

হাতের গ্লাসটা একটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কোচে বসে মঞ্জুর দিকে ঝুঁকে পড়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—তারপর?

—তারপর একটু হাসল মঞ্জু। গায়ের শাড়ি গুছোতে গুছোতে বলল—তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, রক্ত দেওয়া হল। সেলাইন দেওয়া হল, আরো কত কি করা হলো। তারপর? তারপর হাসপাতালে তাকে কিছু ভালো দেখে শ্রান্ত মঞ্জু সোজা আপনার কাছে চলে এলো। আপনি তাকে কিছুতেই বসতে দিতে না চাইলেও জোর করে সে বসল আর এখন সে যাবার জন্য উঠছে। টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা তুলে তার ফিতেটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিতে দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আর তারপর? হয়তো জয়া বাঁচবে—হয়তো বাঁচবে না। সেদিন আপনি বলেছিলেন আপনারা হলেন নাকি একেবারে অন্য জগতের মানুষ। সত্যই তাই। আর আপনাদের মতো অন্য জগতের মানুষদের হাতেই আজ সব অর্থ সব শক্তি। তাই এ জগতের মানুষদের দুঃখেরও

শেষ নেই—মরণেরও শেষ নেই। আচ্ছা নমস্কার—আপনার সঙ্গিনীকে উঠিয়ে দিয়েছি—আপনি বসে বসে হুইস্কির বদলে জল খাচ্ছেন, আপনাদের রাত আর পণ্ড করবো না আমি। আশা করি যে সময়টা জোর করে বসে পণ্ড করে গেলাম সে সময়টুকুর জন্য বিশেষ ক্ষতি হবে না। আবারও আপনার এই স্বর্গীয় আসর এক্ষুণি গুলজার হয়ে উঠতে পারবে।

রজত জয়ার আত্মহত্যার কাহিনী শোনবার জন্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে যে ভাবে ঝুঁকে বসেছিল ঠিক সেই ভাবেই বসে রইল অনড় হয়ে।

মঞ্জু দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—আপনার সঙ্গিনীর নাচ ভালো লেগে গেলে ফিরতে হয়তো তার কিছু দেরী হয়ে যেতে পারে। যদি বলেন, আর কাউকে আমি পাঠিয়ে দিয়ে যেতে পারি। সেদিন জয়াকে না চিনলেও আজ আমি একটু চেষ্টা করলেই ওদের চিনতে পারব।

কতক্ষণ যে রজত কৌচের পিঠে মাথা রেখে চোখ বুজে বসেছিল কে জানে! দল-বল ফিরে আসতে উঠে বসল সে। ওয়েটার এসে পটপট শব্দে নতুন বোতল টেনে টেনে খুলে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ঢেলে সবার হাতে ধরে দিতে লাগল। মেয়েটি এসে গ্লাস হাতে রজতের কৌচের হাতায় বসে তার গলায় হাত রেখে আব্দারের ভঙ্গিতে ঠোঁট ফুলিয়ে তুলে বলল—দেখো রজত, বলে বোস না যেন আমি আর মদ খাবো না—চা খাবো। বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে।

এক বন্ধু ঘরে ঢুকে বসতে বসতে বলল, বুঝলে রজত, আসার সময় নীচে একটা ভিড় দেখে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য একটু উঁকি দিয়েছিলাম। দেখলাম, তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসে যে মেয়েটি সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আর এক পাঞ্জাবী ড্রাইভার সবাইকে উদ্দেশ করে উগ্র কটু কণ্ঠে বলছে, মেয়েটি নাকি তাকে আজ সমস্ত দিন হাসপাতালে আটকে রেখেছে। তারপর বলেছে, গ্র্যাণ্ডে এসে টাকা দেবে। আর এতক্ষণ এখানে বসিয়ে রেখে এখন বলছে, বাড়ী চলো। সেখানে টাকা দেবো। তার ভাড়া উঠে গেছে ত্রিশ টাকার উপর। সে যাবে না। তাকে এখুনি টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বুঝলে রজত, আশ্চর্য্য মেয়ে। এতগুলো চোখের উপর ধীর শান্ত পায় এগিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলো এক পুলিশ। তাকে দিয়ে নম্বর টোকাল। তারপর গাড়ীতে উঠে বসে বলল—চলো। তার সেই চলা আর তার সেই দৃপ্তকণ্ঠে 'চলো' বলা সে যেমন বিস্ময়কর তেমনি প্রশংসনীয়। যেতে হলো ড্রাইভারকে, তবে তার যাওয়াটা হয়তো মেয়েটির জন্য নয় পুলিশের ভয়ে কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি তার সাহস দেখে!

রজত উঠে কতকগুলো র হুইস্কি গলায় ঢেলে বিকৃত মুখটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে ফের গিয়ে নীরবে কৌচে বসল।

॥ ২৮ ॥

সেই যে মঞ্জু রজতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এলো তো একেবারেই এলো।

কিন্তু মঞ্জুর এতোটা আহত হবার কি ছিল— সে তো জানতো রজত মদ খায়? সে তো জানতো রজতের সে খাওয়ায় কোন পরিমাণবোধ নেই? সে জানতো শুধু দেশী বান্ধবী নয়। বিদেশিনী বান্ধবীরও অভাব নেই রজতের?

হাঁ, সবই জানতো সে। কিন্তু মানুষের কোন জানাই তার আপন জানার বাহিরে এক পাও বাড়াতে পারে না। তাই মঞ্জুর ধারণায় রজতের সব বন্ধুত্বের চেহারাই এসে থেমেছিল ওর সঙ্গেই রজতের বন্ধুত্বের চেহারায়। আর তা ছাড়াও জানা এবং শোনার সঙ্গে চোখে দেখার তফাৎ অনেক। কান যে কথা অনায়াসে অগ্রাহ্য করে—চোখ তা দেখে থমকে দাঁড়ায়।

জানার আর চোখে দেখার ভেতর আসমান-জমিন তফাৎ যদি না হতো তবে আজকের মানুষ এমন সুস্থমনে ঘরে বসে খেতে-ঘুমোতে পারতো না—কখনই পারতো না—পাগল হয়ে উঠতো তারা। মানুষ জানে না কোন কথাটা? বাস্তুহীন মানুষগুলোর মাথা গুজবার আশ্রয়টুকু থেকে শুরু করে খাওয়া, পরা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—যাবতীয় ব্যাপার নিয়ে এক 'সেবা' শব্দের দুর্গে বসে, এক 'সেবা' শব্দের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে যে, আমেরী আর অর্থলোভী

খেলা যথেচ্ছাচারে বর্তমান রাজনৈতিক পুরুষরা খেলে চলেছেন,—চোখের আড়ালটাই তো তাদের একমাত্র বাঁচোয়া। নইলে চোখের ওপর একটা সামান্য চোরকেও চুরি করতে দেখলে তাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে না তারা? অপকর্মকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না তারা?

—জানায় যা সয়ে যাওয়া যায়, দেখায় তার আদ্ধেকও সয় না—মঞ্জুর তারুণ্যের শুচিতাও যে দেখায় রজতের এ জিনিষ গ্রহণ করতে পারবে না তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

নেবে এসে শেষ শক্তিটুকু দিয়ে মঞ্জু পুলিশ ডাকল, গাড়ীর নম্বর নিল এবং ড্রাইভারকে ওকে বাড়ী পৌঁছে দিতে বাধ্য করল। তার পর গাড়ী চললে গদিতে মাথা রেখে একরকম শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। ক্রুদ্ধ পাঞ্জাবী ড্রাইভার এমন গতিতে গাড়ীটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চললো যে, যদি না পুলিশের কাছে গাড়ীর নম্বর থাকতো আর দুর্ঘটনা ঘটলে ওর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী এবং ড্রাইভারের বিনাশ এক সঙ্গেই ঘটবে ... এই না হতো, তবে মঞ্জুর পক্ষে এভাবে চোখ বুজে থাকা সম্ভব হতো না। মাঝে মাঝে যা দু'একবার চোখ খুলল সে তা শুধু পথ বলে দিতে।

বাড়ী গিয়ে দিদি আর বৌদিকে আজ জয়ার সব কথা বলবে প্রথম ধাক্কায় মঞ্জু মনে মনে তাই স্থির করে ফেলল কিন্তু পর মুহূর্তেই মত পরিবর্তন করলো সে। কি লাভ হবে বলে? কিছু কিচ্ছু না। যদিও বৌদির হাতে টাকা আছে। বাবা মার কাছ থেকে সে নিয়মিত মাসোহারা পায়। প্রথম হৃদয়াবেগে সে হাত করবেও কিছু কিন্তু তার সেই আগ্রহ মন্দীভূত হয়ে আসতে সময় লাগবে না। তাই তার কাছে দান হিসাবে নেওয়ার চাইতে ধার হিসাবে নেওয়ারই সুবিধা বেশী। আর মৌরী? তার সামর্থ্য তো ওরই মতো। সে হয় ত স্তম্ভিত হয়ে যাবে—বিরক্ত হয়ে উঠবে মঞ্জুর একটা গোটা সংসার টেনে চলার দুঃসাহস দেখে। না, দরকার নেই। আজকের ট্যাক্সি ভাড়াটা সে এক বন্ধু ধার চাইছে বলেই বৌদির কাছ থেকে নেবে।

দিদি বৌদি বাড়ী নেই। অন্যদিন হলে সমস্তদিন বাদে রাতে ফিরে এতে আরাম বোধ করতো সে। কিন্তু আজ শরীর ছেড়ে এলো মঞ্জুর। টাকা—টাকা কোথায় পাবে সে। নির্জন বাড়ী। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। তার মাসী পিসিমাও বাড়ী নেই? থাকলে কি তিনি এমন বৃথা ঘরে ঘরে বাতি জ্বলতে দিতেন। শুধু রান্না ঘর থেকে জোর খুন্তি নাড়ার শব্দের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে রামুর গান—মঞ্জুরই শেখানো সেই গান, 'হরদম্ লাগাতা ঝাড়ু, তবি এচ্ছা হাল—হিঃ হিঃ, এত্তা জঞ্জাল—'

গিয়ে রান্না ঘরের দরজায় উঁকি দিল মঞ্জু—রামু, কেউ বাড়ী নেই রে? গলা দিয়ে যেন স্বর বেরুতে চায় না মঞ্জুর।

হাতের খুন্তি উপর দিকে তুলে ছাদটা দেখিয়ে রামু বলল—আছে ছাদে।

—কে দিদি বৌদি?

—না পিসিমা। আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল রামু—হয়ত মঞ্জুর দেরী করে ফেরা বা খাওয়ার কথা, কিন্তু ততক্ষণে মঞ্জু ছাদের দিকে ছুটেছে। যে পিসিমার কাছ থেকে টাকা নেবার কথা এতক্ষণ তার একবারও মনে হয়নি—ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায় বলেই মনে হয়নি, এখন সেই পিসিমা আছেন শুনেই যেন সে হাতে স্বর্গ পেলো। ড্রাইভারের রুক্ষ হাতের হর্ণের শব্দ কানে নিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উপস্থিত হলো ছাদে। ব্যস্তসমস্ত ভাবে পিসিমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—শিগ্‌গির পিসিমা—শিগ্‌গির—গোটা চল্লিশেক টাকা ধার দেও তো আমায়। আমার এক বন্ধুর ভীষণ দরকার। কালই ফিরিয়ে দেবে সে তোমার টাকা।

মঞ্জুর মুখের রেখায় রেখায় এমন কিছু ছিল পিসিমার মুখ দিয়েও টাকা না দেওয়ার কথাটা বেরুতে পারল না। যদিও কালই ফিরিয়ে দেবার কথাটা তিনি আদপেই বিশ্বাস করলেন না—তবু জপের মালা থলিতে ভরে উঠে দাঁড়ালেন। নীচে এসে টাকা বের করে দিতে দিতে একটা সৎপরামর্শ দেওয়ার মতো চোখের ইঙ্গিত করে চাপা কণ্ঠে বললেন—গোটা কুড়ি দে। চল্লিশ চাইলেই চল্লিশ দিবি কেন—বল মাসের শেষ হাতে নেই—

অধৈর্য্য মঞ্জু বলে উঠল—দাওনা। বলছি তো কাল দিয়ে দেবে। তেমন দরকার না হলে তোমার কাছে চাইতাম নাকি—

'তোমার কাছে চাইতাম নাকি' কথাটায় ক্ষুব্ধ হলেন পিসিমা। মুখ গোমরা করে টাকা বের করে দিলেন তিনি। টাকা হাতে নিয়ে এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছুটল মঞ্জু নীচে। জয়ার চিন্তার চাইতেও যেন বেশী

বিপদে ফেলেছিল এই ট্যাক্সিভাড়ার চিন্তাটা। এবার টাকা না পেলে সে যে কি করতো। শিউরে উঠল মঞ্জু। না, ড্রাইভারের দোষ কিছু নেই। আজ তার উপর জুলুমই চালিয়েছে মঞ্জু। বিগড়ে তো যাবেই সে। বকশিশ শুদ্ধ টাকা ড্রাইভারের হাতে তুলে দিয়ে সত্যি সত্যি দুঃখ প্রকাশ করলো মঞ্জু। বললো, তার কাছে কিছুই ছিল না বলে বাধ্য হয়েই তাকে জোর করে বাড়ী পৌঁছে দিতে বাধ্য করেছে সে—সর্দারজী যেন কিছু মনে না করে। তার কাছে টাকা থাকলে সে নিশ্চয়ই সর্দারজীর সমস্ত দিনের ক্ষতি পূরণ করে দিত। তারপর যাওয়ার সময় গেল সে সর্দারজীকে নমস্কার জানিয়ে।

যদিও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রূঢ় হাতেই মঞ্জুর হাত থেকে একরকম টাকাক'টা টেনে নিয়ে গুণতে শুরু করেছিল সর্দারজী— কিন্তু মঞ্জুর কথা শুনে থেমে গেল তার হাত। আর তারপর সমস্ত ফিরতি পথটা মঞ্জুর শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্লিষ্ট— ছোট্ট মুখটা বারবার তার চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল আর বারবারই সে সশ্মশ্রু মাথাটা নাড়তে নাড়তে মনে মনে নিজের ব্যবহারে নিন্দা করতে লাগল এই বলে যে, এই ছয়-সাত ঘণ্টায় এদের পরস্পরের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে আর কিছু না বুঝুক এটা তো সে নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে, আত্মহত্যা করতে যাওয়া মেয়েটি এর বন্ধু ছাড়া আর কিছুই নয়। একে রাস্তার উপর অপমান করাটা তার ঠিক কাজ হয় নাই— না হয়, কাল এসে ভাড়া নিয়ে যেত সে।

কিন্তু মঞ্জু কি তারপর এবার সত্যি গিয়ে মৌরীর চিলেকোঠায় দরজা বন্ধ করলো?

না। সময় যেমন কারু জন্য বসে থাকে না, কোন কাজও তেমনি কারু জন্য ঠেকে থাকে না। হয়তো একজনের সাহায্যে যে কাজ যত সহজে, যত অনায়াসে হতো তা হয় না— দেরী হয়, বিলম্ব ঘটে কিন্তু ঠেকে থাকে না— কারুর জন্য কেউ থেমে যায় না। মঞ্জুও থেমে গেল না রজতের জন্য। পরের দিন মমতাকে সে যে সময় দিয়ে এসেছিল হাসপাতালে উপস্থিত হবার, ঠিক সেই দশটার সময় গিয়ে হাজির হলো সে হাসপাতালের দরজায়। আর সেখানেই দেখা হলো নীলের সঙ্গে। সে ভাবলো হঠাৎ কিন্তু হঠাৎ নয়, নীল ওরই জন্য অপেক্ষা করছিল। আপন চিন্তায় চলছিল মঞ্জু— নেমে পড়ল নীলের ডাকে—আরে থামুন, থামুন। একেবারে সোজা ঢুকে যাবেন না। আমি আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি যে। ঠিক তেমনি একটা ফাইল হাতে এগিয়ে এলো নীল ওর কাছে।

—আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন এখানে। আপনি জানলেন কি করে আমি এখানে আসবো?

— কেন, আপনি কি ভুলে গেলেন নাকি মমতা আমার বোন—

না, মমতা যে নীলের বোন একথা মঞ্জু ভুলে যায়নি ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্য্য একবারও মনে পড়েনি তার সে কথা। হয়তো আর্থিক প্রয়োজনের ব্যাপারে নীলকে মনে পড়ার কথা নয় বলেই তার কথা ওর মনে হয়নি। কিন্তু মনে না পড়লেও ভারি খুশী হয়ে উঠল মঞ্জু নীলকে দেখে। একেবারে হাসপাতালের গেটের মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মঞ্জু— দুপা সরে রেলিং ধারে গিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'তাই তো। তা কালকে যে অবস্থার মধ্যে ছিলাম— মনে পড়বার কথাও নয় কিছু।'

নীলের হাতে তেমনি এক মস্ত ফাইল বই। ডান হাত থেকে সেটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে রেলিং ধরে দাঁড়ালো সে। বললো, মমতা আমায় জিজ্ঞাসা করছিল মেয়েটি আপনার কেউ হয় কি না। কিন্তু আমিও তো সে কথা জানিনে। কে মেয়েটি? আমার যেন মনে হচ্ছে এদের কথার একটা আভাস আমায় একদিন আপনি দিয়েছিলেন—তাই কি?

হাঁ, নীল তার সেই ধনী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির গাড়ীতে ওকে জয়াদের বাড়ীর দরজায় যেদিন নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেদিন নীলকে মঞ্জু বলেছিল, এদের কথা আর একদিন সে নীলকে বলবে। এখন পর্যন্ত সে নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। নীলের জিজ্ঞাসার জবাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো মঞ্জু—হাঁ, বলেছিলাম।

—চলুন তবে কোথাও বসে ব্যাপারটা শুনি। মেয়েটি ভালো আছে। তাকে মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে— ওদিকে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু মমতার সঙ্গে একবার দেখা করতে ওকে ভেতরে যেতেই হবে। পিসিমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সংবাদ বাড়ীর কারু জানতে বাকী নেই। সকালে উঠেই আবার ফের বৌদির কাছে ধার চাওয়া তাই মঞ্জুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্লাডব্যাঙ্কের টাকা ও নিয়ে আসতে পারেনি—মমতাকে সেটা একটু জানিয়ে আসতে হবেই। নইলে

সে ভাববে কি ওকে। বলল—দাঁড়ান, আমি আসছি একটু মমতার সঙ্গে দেখা করে। বলেই গলায় ষ্টেথিসকোপ ঝোলান একদল ক্লাসফেরৎ ছাত্রের ভেতর দিয়ে, হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা লাল ক্রশচিহ্নিত মস্ত মস্ত গোটা দু'তিন এম্বুলেন্সের পাশ নিয়ে মঞ্জু হন্ হন্ করে ঢুকে গেল ভেতরে।

নীলের নয়া ধরানো সিগারেটের পুরোটা শেষ হতে হতেই ফিরে এলো মঞ্জু। বলল— চলুন।

দুজনে নেমে এলো রাস্তায়। কলকাতার ভিড়ের আজকাল আর ভারী পাতলা নেই। লেগেই আছে ভিড়। নইলে এখনও অফিস কাছারীর সময় হয়নি, এখনই রাস্তা ফুটপাত ভর্ত্তি, গিজগিজ করছে। লোকজনের পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে মঞ্জু বললো, আপনার বোনকে না পেলে জয়াকে— মানে মেয়েটিকে বাঁচাতেই পারতাম না। কি ব্যবস্থা হাসপাতালের দেখুন, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের কেস, এক ঘণ্টার ওপর পড়ে রয়েছে ইমার্জেন্সি ঘরের টেবিলের ওপর —কোথায় বা ডাক্তার, কোথায় বা নার্স— কোথায় বা কি। কি যে করবো বুঝেই উঠতে পারছিলাম না— কিছু করতেও পারতাম না যদি মমতাকে না পেতাম। বেচারী, মাত্র তার ডিউটি শেষ করে কোয়ার্টারে গিয়েছিল। কিন্তু আমার ফোন পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছে।

একটা চায়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে নীল জিজ্ঞাসা করল— এটায় ঢুকবেন?

—চলুন।

বসে চায়ের অর্ডার দিয়ে নীল জানতে চাইল ঘটনা। বললো, এবার বলুন দেখি মেয়েটি কে— কেন সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল?

ঠিক রজতের কাছে একদিন যেভাবে জয়ার কথা সে বলেছিল ঠিক তেমনিভাবে তার কথা আজ মঞ্জু নীলের কাছে বলল। শুধু এর ভেতর থেকে যেটা কেটে বাদ দিল তা হলো রজতের প্রসঙ্গ। বাদ দিত না, নীলের কথা যেমন রজতের কাছে বলেছিল, তেমনি করেই বলত মঞ্জু নীলের কাছেও রজতের কথা। যদি আর একদিন আগেও এই গল্প সে নীলের কাছে করতে বসতো তবে তার ভেতর রজত বড় আসন পেতো।

নিবিষ্ট মনে শুধু শুনে গেল নীল। তারপর মঞ্জু থামলে একটু সময় চুপ করে থেকে বলল— কলেজ আছে তো?

— আছে। তবে যাবো না।

— কেন, টাকার খোঁজে বেরুবেন?

—উপায় কি!

—কোথাও গেলে টাকা পাবেনই এমন নিশ্চয় জায়গা আছে?

— না।

—তবে চলুন আমার সঙ্গে। ব'লে বেল বাজিয়ে বয়কে ডাকল নীল।

— কোথায় যাবো আপনার সঙ্গে? টাকার খোঁজে?

নীল হেসে বললো, না, খুঁজে বেড়াবার মতো টাকা অনুসন্ধানের অত ঠিকানা আমার জানা নেই। চলুন ন্যাশনেলে যাওয়া যাক্। পুজোর মরসুম চলছে— কালও কয়েকজন এসেছিল লেখা চাইতে। লেখা পেলে টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে তারা লেখা নিয়ে যাবে। চলুন লাইব্রেরীতে— বই পত্তর ঘেঁটে কিছু বিষয়বস্তু বের করা যাক। অন্তত এর ধড়, ওর মাথা, তার হাত পা জোড়া দিয়ে কিছু প্রথম শ্রেণীর নিবন্ধ তো নিশ্চয়ই তৈরী করে ফেলা যাবে। আর যদি জব চার্ণক ঘেঁটে, পুরোনো কবর খুঁড়ে কিছু গল্প বের করে ফেলতে পারি তো কথাই নেই। বড়দের জন্য বিলিতি ভূতের গল্প লিখে ফেলব দেখবেন ডজনখানেক।

ডজন না হলেও দিন-দশেকের ভেতর গোটা সাতেক লেখা তৈরী করে ফেলল নীল। মঞ্জুকে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখে বলল—জনতা প্রডাকশন গাড়ী মেশিন, স্টোভ ইত্যাদির মতো এ হলো জনতা প্রডাকশন লেখা।

—না, না বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, চমৎকার হয়েছে লেখাগুলো।

—ভালো না হলে সম্পাদক নেবেন কেন, পাঠকই বা পড়বে কেন।

—তবে বলছেন যে, জনতা প্রডাকশন।

এ কথার জবাব দিল না নীল। বললো, কথাটা হচ্ছে কি জানেন, অর্থাভাব একেবারে ব্রহ্মতালুতে এসে না ঠেকলে এসব লিখতে ইচ্ছে করে না। বড্ড সময় নষ্ট হয়—আমার আসল কাজ একেবারে বন্ধ থাকে।

মঞ্জু জানে না নীলের আসল কাজটা কি। সে বলে না। জিজ্ঞাসা করলে হাসে। তবে মঞ্জু এটুকু জানে তার ধ্যান, জ্ঞান, সাধনার বিষয় একটা কিছু আছে। যার ভেতর মগ্ন হয়ে থাকে সে সব চাইতে বেশী সময়। অন্য লেখা লেখে সে অনুপায় হয়ে। কখনো নিজের জন্য, কখনো অপরের জন্য। এখন যেমন মঞ্জুকে কিছু সাহায্য করা যায় কিনা— তার জন্য লিখছে। নীলকে— সাহায্য করতে গিয়ে এই ন্যাশানেল লাইব্রেরী যেন মঞ্জুর মনে নেশা ধরিয়ে দিল। কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। নীলের প্রয়োজন থাক আর নাই থাক ও নীলের সঙ্গে সঙ্গে বই নিয়ে বসে। তারপর নীলের কাজ হয়ে গেলে এক সঙ্গে ফেরে। চারটার সময় জয়াকে দেখতে যায়। ছটার সময় ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেলে বেরিয়ে এসে কখনো কিছুক্ষণ কোন পার্কে বসে নীলের সঙ্গে — কখনো বা বাড়ী চলে আসে। এই হলো ওর বর্ত্তমানের রোজনামচা।

মৌরী দিনকয় অত্যন্ত রাগের সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে রইল মঞ্জুর দিক থেকে। না বলল কথা, না জিজ্ঞাসা করল কিছু। তারপর আর পারলো না। রোজকার মতো সেই বেলা নয়টায় প্রস্তুত হয়ে মঞ্জুকে বেরুতে দেখে কঠিন গলায় ডাক দিল মৌরী—মঞ্জু!

থেমে পড়ল মঞ্জু। একটু মুখ টিপে হেসে মৌরীর দিকে ফিরে জবাব দিল মঞ্জু—আজ্ঞে।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুচকালো মৌরী। মঞ্জুর ইয়ার্কি যেন অসহ্য ঠেকল তার কাছে। একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, তুই ঠিক করেছিস এবার পরীক্ষা দিবিনে, এই তো?

—কেবল মনগড়া কথা নিয়ে মনগড়া ভাবনা ভাববি আর মন খারাপ করে গুম্ হয়ে থাকবি। কেন পরীক্ষা দেবো না? আমার প্রতিদিন—প্রতি ঘণ্টায় পড়া এগুচ্ছে—জানিস।

—এই বিশ দিনের ভেতর ত্রিশ মিনিট একত্রে তুই বই নিয়ে বসিসনি—আর যাকে বলে ঊষায় বেরুচ্ছিস, নিশায় ফিরছিস— তোর পড়া এগুচ্ছে কি করে?

—এই সেদিন তো পরীক্ষা দিলি। লাইব্রেরীর কাজ বলে একটা বস্তু আছে তো? তোর ধারণাই নেই সে কাজ আমার কতটা এগিয়ে গেছে—দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে খাতাগুলো এনে।

এমনি সময় মঞ্জু দেখতে পেলো বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে রামু প্রাণপণে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। বাইরে বেরিয়ে এলো মঞ্জু। রামু মৌরীর ঘরের কাছ থেকে আরো কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে বসবার ঘরটা হাত দিয়ে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল— দিদিমণি, জামাইবাবু।

—জামাইবাবু! জামাইবাবু আবার কে এলো তোর?

তাড়াতাড়ি নিজের মুখে আঙ্গুল চাপা দিয়ে মঞ্জুকে আস্তে কথা বলতে ইসারা করল রামু। তারপর তেমনি চাপা কণ্ঠে বললো— দেখেই যান না।

রামুর কারুর আসার সংবাদ নিয়ে এমন চাপাচাপির অর্থ ধরে উঠতে না পেরে গিয়ে বসবার ঘরের পর্দা সরিয়ে ডাক দিল মঞ্জু।

ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল, তাঁকে দেখে মঞ্জু হেন ব্যক্তিও প্রথম ধাক্কায় পর্দা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসতে যাচ্ছিল। কিন্তু লোকটি দেখে ফেলল তাকে। বাধ্য হয়েই একমুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকতে হলো মঞ্জুকে। কিন্তু কি করবে, কি বলবে যেন বুঝে উঠতে না পেরে বোকা বোকা মুখে বলে উঠল— আরে, কি ভাগ্য আমাদের! বসুন—বসুন।

॥ ২৯ ॥

ভাঙ্গাচোরা মুখে সুদর্শনকে অভ্যর্থনা করতে করতে মঞ্জুর মনে পড়ে গেল রজতের কথাটা। সত্যি তো, রজত তো বলেছিলেন; দেখো ডাক্তার ঠিক আসবে!

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল সুদর্শন। মঞ্জুর দিকে আরো দু পা এগিয়ে এলো সে। যতীন বাবুর চিঠি পড়ে মৌরীর মৃত্যু খবরের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা মাত্র সেই যে সে স্থিরসংকল্প করেছিল একদিন এখানে আসবে

সে, ব্যাপার কি জানতে — তার সেই সংকল্পের সঙ্গে আরো একটা দুর্দমনীয় কিছুর টান দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে আজ তাকে একেবারে যেন টেনে এনে এখানে হাজির করে দিয়েছিল। বাড়ীটা অচেনা নয় সুদর্শনের। এক তলার রামুর ঘর থেকে মৌরীর চিলেকোঠা পর্যন্ত সব চেনা তার। নীচে কাউকে দেখতে না পেয়ে সরাসরি উপরের বসবার ঘরে চলে এসেছিল সে। কিন্তু বাড়ীটাতে ঢোকার পর থেকে ভেতরে যেন একটা হুলুস্থুলু কাণ্ডকারখানা চলছিল তার। যদি সংবাদটা সত্য হয়! যদি ওকে দেখে মৌরীর বৃদ্ধা পিসিমা চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। বৌদি চোখে আঁচল চাপা দেন। রুদ্ধকণ্ঠ মঞ্জু বেদনায় কথা বলতে না পারে। শোক-মুহ্যমান পিতার আর্ত আক্ষেপ আছড়ে পড়তে থাকে তার কাছে। একটা পরিবারকে অনর্থক কাঁদিয়ে যাওয়ার জন্য এসে উপস্থিত হলো না

তো সে?

কিংবা—কিংবা যদি একেবারে মৌরীর সঙ্গেই সব প্রথম সাক্ষাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় তার? নিতান্তই যে একটা ছেলেমানুষি দাপাদাপি শব্দ বুকের মধ্যে চলছিল, মঞ্জুর কথা শুনে সব গণ্ডগোল শান্ত হয়ে গেল এবং তার ঠোঁটের চিবুকের যে অননুকরণীয় অভিজাত ভাবটা এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়েছিল, ফের পুরো ওজনে প্রথিত হলো তারা। মঞ্জু ঠিক যতটা বিব্রত হয় ঠিক ততটাই আগ্রহান্বিত, আরে বসুন বসুন। কি ভাগ্য আমাদের। অভ্যর্থনার জবাবে দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে একটু হাসল সে। বলল, ভাগ্য?

আনন্দ বেদনা দু দিকেই যায় এমনি একটা সুরে ও ভঙ্গিতে মঞ্জু বললো— বাঃ, ভাগ্য নয়, একেবারে অভাবিত ভাগ্য যে।

— কার?

দেখা গেল জবাবের জন্য মঞ্জুকেও ঠেকে যেতে হলো। হয়তো ঠেকতে হতো না, যদি এর ভেতর বড়রা জড়িত না থাকতেন। ছোট পিসি, ছোট পিসেমশাই-এর সঙ্গে হয়তো সুদর্শনের দেখা হয়েছে। তাঁরা হয়তো দুঃখ বেদনা অশ্রু বর্ষণের ভেতর দিয়ে হৃদয়বিদায়ক ঘটনাটারই আরো বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন সুদর্শনের কাছে—এই অবস্থায় ঝট করে কিছু করে বসা সমুচিত হবে না।

জবাবের জন্য অপেক্ষাও করলো না সুদর্শন। বসতে বসতে ধীর কণ্ঠে বলল— তা আপনারা সব ভালো?

এ প্রশ্নেরই বা কি জবাব দেবে মঞ্জু? তাই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট বলে উঠল সে—আপনি বসুন। আমি বাড়ীর ভেতর খবর দিয়ে আসছি।

বেরিয়ে এসে মঞ্জুর মনে হলো গাছের পাতাটুকু পর্যন্ত না নড়া গ্রীষ্মের স্তব্ধ সন্ধ্যার মতো ওদের বাড়ীটা যেন নিস্পন্দ রূপ ধরে আছে। যে যেখানে আছে স্থির হয়ে আছে। হাত পাটুকুও যেন কেউ নাড়াচাড়া করছে না।

পর্দার ফাঁক দিয়ে বারান্দায় চোখ পেতে বসেছিল অমিতা। মঞ্জুকে দেখামাত্র তার হাত ধরে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে এলো তাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে চাপাকণ্ঠে বললো, রামু বলে গেল, জামাইবাবু এসেছেন?

হেসে ফেলল মঞ্জু—আর জামাইবাবু! তা তুমি এমন ঘরে বসে হাঁপাচ্ছ কেন?

—সত্যি নাকি বলোই না।

—তুমি চলো দেখবে।

—ওরে বাবা! অমিতা আরো ক'পা ভেতরে ঢুকে গেল। ভাগিস আমি সামনে পড়ে যাইনি।

— কি হতো তুমি পড়লে?

—কেঁদেই ফেলতাম ভয়ে।

কপালে করাঘাত হানল মঞ্জু—একেবারে পারফেক্ট—ঐটুকু হলেই তো হয়ে যেত। ভদ্রলোকের অহংকৃত প্রথিত ঠোঁট দেখতাম বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে কি না।

অধৈর্য্য ব্যাকুলকণ্ঠে অমিতা বলল— কি করবে এখন তুমি তাই বলনা?

চিবুকে হাত বুলাতে লাগল মঞ্জু— তাই তো ভাবছি। বাবা অফিসে চলে গেছে?

— না। মাত্র বেরুচ্ছিলেন! রামুর মুখে শুনে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

—দাদা?

— ঐ যে। হাত দিয়ে ঘরের কোণ দেখিয়ে দিল অমিতা।

মঞ্জু দেখল অফিসের জামা কাপড় পরা অবস্থায় ছাদের ঘরের কোণে করুণ মুখ করে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

অন্য কোন কারণে দাদাকে এইভাবে অফিসের জামা কাপড় পরে চোরের মতো ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখলে মঞ্জু হেসে লুটোপুটি খেত— এখনও ঠেলে হাসি হাসছিল কিন্তু হাসল না মঞ্জু। মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। অমিতা উদ্‌গ্রীব চোখে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

মাথা তুলল মঞ্জু— ঠিক আছে।

— কি ঠিক করলে গো?

— ভদ্রলোকটিকে নিয়ে গিয়ে সোজা ভদ্রমহিলাটির ঘরে পৌঁছে দেবে। তারপর যা হয়—

শব্দ না করে ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল অমিতা। সেই বেশ হবে— চমৎকার হবে। মুখটা আহ্লাদে করে তুলে বলল, নিন সুদর্শনবাবু নিজে বোঝা-পড়া করে—নিষ্পত্তি করে। আমরা তো স্বর্গই হাতে পাবো— না গো? নিরুপায় হয়েই তো আমরা অমন মিথ্যে কথা বলেছি এ্যাঁ? এই অবস্থায় সবাই তাই করতো না? আমাদের দোষ কি— এ্যাঁ? ওঃ, কি মজা। মুখে একমুঠো কাপড় চাপা দিয়ে অমিতা হাসির শব্দ থামালো।

অমিতার ঘর থেকে মঞ্জুদের ঘরের ব্যবধান বিশ গজের বেশী নয়। এই পথটুকু আসতে আসতেই আশ্চর্য্য ভাবে তৈরী করে ফেলল মঞ্জু নিজেকে। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদের খবর শুনে ছুটে আসবার মতো এসে মৌরীর টেবিলের দু কোণ ধরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে উঠল— একটা সাংঘাতিক দুঃসংবাদ শুনে এলাম রে দিদি!

মঞ্জু খাতা আনতে গিয়ে আর ফিরে এলো না দেখে মৌরী ওর নিজের কাজে মন দিয়েছিল। টেবিলে মাথায় এক করে বসে যেন কি লিখছিল সে— উৎকণ্ঠার সঙ্গে মুখ তুলল— কি হয়েছে?

চঞ্চল গলায় বলে উঠল মঞ্জু— সুদর্শনবাবু তার বোনের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন তো। সেখানে কোন এক পাহাড়ী পথে নাকি তার গাড়ী একেবারে হাজার ফিট নীচে পড়ে—

মৌরীর মুখের লাল কণাগুলো যেন পলকে সাদা কণায় পরিণত হয়ে গেল। ঠোঁটটা কেঁপে উঠেছিল বলেই কিনা কে জানে—হাতের কলমটা ঠোঁটে চেপে ধরল সে।

গাড়ী আর মানুষটার গুঁড়িয়ে যাওয়ায় কথাটা বলে উঠতে পারল না বলেই যেন সেখানটায় থেমে গিয়ে মঞ্জু বলল— কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য কথা হলো, যারা ঘটনাটা দেখেছে তারা নাকি জোর দিয়ে বলছে, লোকটি ইচ্ছে করে খাদের দিকে গাড়ী চালিয়ে দিয়েছিল। নইলে ও-পথে দুর্ঘটনা ঘটে না কখনোই। তার মানে তো আত্মহত্যা!

—এ্যাঁ? কী সাংঘাতিক কথা মা গো! দু চোখ বন্ধ করল মঞ্জু।

এবার হেসে ফেলল মৌরী। তোর লাইব্রেরীর কাজ দেখতে চাওয়ার জন্য এমন গল্প তৈরী করে আনলি।

—গল্প তৈরী করে আনলাম? কি যে বলিস। এমন গল্প মাথায় আসে নাকি কারু। টেবিলের ধরা হাত ছেড়ে দিয়ে বলল— যাই ঘটনাটা শুনি গিয়ে। আমি না শুনেই ছুটে এসেছি।

—আচ্ছা, এর মানেটা কি হচ্ছে মঞ্জু?

— কোনটার? মারা যাওয়ার মানে জিজ্ঞাসা করছিস না দুর্ঘটনার মানে জিজ্ঞাসা করছিস? দু চোখ বিস্ফারিত করে জানতে চাইল মঞ্জু।

চুপ করে গেল মৌরী।

আর ওকে চুপ করে বসিয়ে রেখে এসে প্রবেশ করলো সে বসবার ঘরে।

টেবিলের উপর রক্ষিত ত্রিকোণ-কাটা কাচের কাগজ-চাপাটার ভেতর দিয়ে যে সূর্য্যচ্ছটাটা নানা বর্ণে এসে টেবিল-ঢাকনাটার উপর পড়ে রামধনু সৃষ্টি করেছিল, তারই দিকে তাকিয়ে বসেছিল সুদর্শন। তার চিন্তাধারাটা এখন একেবারেই অন্য ধারায় বইতে শুরু করেছিল। এতদিন তার সমস্ত মন একমুখী হয়েছিল। সংবাদটার সত্য-মিথ্যা যাচাই এর প্রতি। ওরা দু'পুরুষের লক্ষ্ণৌবাসী। আত্মিক যোগাযোগ যতই থাক, বাহ্যিক যোগাযোগটা এসেছিল বাংলার সঙ্গে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে। স্বজন-বন্ধু যাঁরা আছেন, তাঁরাও এতই উচ্চ মহলের যে, মৌরীরা সে-

সব সমাজে অপরিচিত তো বটেই, অপাঙক্তেয়ও বটে। কানে কানে রাস্তা তৈরী করে ঠিক খবরটা ঘরে এসে পৌঁছবে তাই না ছিল তার সম্ভাবনা— না ছিল সুদর্শনের তত অপেক্ষার ধৈর্য্য। কিন্তু এখন চিন্তায় উজানটান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তার। মৌরীর এই অস্বীকৃতির পেছনে যে অসম্মান ছিল, যে অসম্মানের কাঁটাটা সংবাদটার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা মাত্র তার মুখ কঠিন করে তুলেছিল, এতক্ষণে সে কাঁটাটা ফের বিঁধতে শুরু করেছিল তাকে। সে জানে এখন বাড়ীর ভেতর কি ঘটবে। মৌরীকে নিয়ে নব উদ্যমে আবার উঠেপড়ে লাগবে সবাই। কিন্তু তার জেদের কাছে হার মানতে হবে সবাইকে। লজ্জায় সংকোচে কেউ আর তার কাছে আসবে না। শেষ পর্যন্ত যে আসবে সে হলো মঞ্জু। বসে কথা খুঁজবে, সে, কিংবা বিব্রত অপ্রতিভ মুখে বাড়ীর মুখপাত্র হয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ও পক্ষের আক্ষেপের কারণ থাকতে পারে— লজ্জা পাবার কিছু নেই— না কিছু নেই তাদের লজ্জা পাওয়ার। সব লজ্জা, সব অসম্মান তার। বসে থাকতে পারলো না বলেই সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছিল সুদর্শন। মঞ্জু এসে প্রবেশ করলো ঘরে। আর ওকে দেখেই হাত জোড় করে একটা নমস্কার জানাল সুদর্শন। বললো- –আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। কিছু না বলে বাড়ীতে ঢুকলেও না বলে তো চলে যাওয়া যায় না। আচ্ছা আসি তবে।

—বাঃ সে কি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

— আসুনই না আমার সঙ্গে। তারপর সুদর্শনকে নীরব দেখে বললো— কি হলো? আসবেন না?

দুই পাঞ্জাবীর পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে শরীর টান করল সুদর্শন। বলল—চলুন।

কি ভেবে মঞ্জু কি করেছিল তা জানে মঞ্জু। কিন্তু এতে করে একটা বড় কাজ হয়েছিল এই যে, মৌরীর দুর্বলতাটাকে মঞ্জু একেবারে উপর তলায় টেনে তুলে রেখে গিয়েছিল। টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নতনেত্রে নিশ্চলভাবে বসেছিল মৌরী। ঘরের ভেতর কারা ঢোকবার শব্দ পেয়ে মঞ্জু ভেবে মুখ তুলল সে। আর চোখ তুলতেই একেবারে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ানো সুদর্শনের দৃষ্টর সঙ্গে চোখ মিলে গেল তার। চমকে উঠে দাঁড়ালো মৌরী। শরীরের ধাক্কায় চেয়ার গেল পড়ে। হাতের কলম পড়ল ছিটকে। কাঁধের আঁচল পড়ল খশে।

সুদর্শন ওর লুটিয়ে পড়া আঁচলটার দিকে একবার তাকালো বটে— কিন্তু সেটা তুলে দিতে গেল না।

এগিয়ে এসে চেয়ারটা তুলল। কলমটা তুলে নিয়ে নিবটা চোট পেয়েছে কিনা দেখল পরীক্ষা করে, তারপর সেটার মুখ বন্ধ করে রেখে দিল টেবিলের উপর। তারপর চেয়ারের পিঠে হাত রেখে মৌরীর দিকে একটা বিশেষ মনোযোগের দৃষ্টি ফেলে বলল— মনে হচ্ছে ভূত দেখেছেন আপনি। কিন্তু ভূত তো আপনার দেখবার কথা নয়। সে তো দেখবো আমি।

নিজেকে সামলাতে আর কতক্ষণ লাগে। সুদর্শনের কলম রাখা, চেয়ার তোলার মধ্যেই আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠল মৌরী। আর শুধু যে আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠল সে তাই নয়— যেন আরাম বোধ করতে লাগল। জবাব দিল সে— ভূত আমিও দেখতে পারি।

— কি করে? আমি মারা গেছি এমন সংবাদ তো আমি আপনাকে দেইনি?

— এইমাত্র মঞ্জু আমাকে সেই রকমেরই একটা খবর দিয়ে গিয়েছিল।

— তাই বলুন! বুদ্ধিমতী মেয়ে মঞ্জু। জানে জ্যান্ত এসেছি শুনলে দরজা সেঁটে দেবেন। ভূতকে তো আর দরজা বন্ধ করে আটকানো যায় না— তাই দরজা খোলা পেয়েছি। তা আপনার আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। জোর করে বিয়ে করবো বলে আসিনি—আর তা সম্ভব নয়। একটু চুপ করে থেকে বলল— তা ঘর পর্যন্ত যখন এসে পৌঁছোনোই গেল তখন গৃহকর্ত্রীর অনুমতি পাই তো একটু বসে যাই।

নিজেকে আরো কিছুটা সহজ করে নিল মৌরী— এখানে আপনাকে বসাতে পারি তেমন কেন ব্যবস্থা নেই। চলুন বসবার ঘরে।

—তার মানে, আপনি রেহাই পেলেন। সবার মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে চুপচাপ চলে আসবেন আর নয়তো নিতান্ত ভদ্রতার দায়ে চুপচাপ বসে তাকবেন— বা আমার প্রতি সেই দায়টাও আপনি পালন করতে অপারগ হবেন। কিন্তু আমার দরকার আপনাকে। আপনার উপর আমার একটা নালিশ আছে। দেখা যখন হয়েই গেল,

তখন সেটা জানিয়ে যাই। তার বঙ্কিম ঠোঁটে ভাঁজ ফেলল সুদর্শন— চেয়ারের কাঠ যত শক্তই হোক অপমানের কাঁটা হয়ে তা কখনই গায় বিঁধবে না। স্বচ্ছন্দে বসা যাবে। চেয়ারটা ওর দিকে পেছন ফেরানো ছিল। সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বসল সে। দাঁড়িয়ে থাকা মৌরীকে বসতে বলতে গিয়েও গেল থেমে। তারপর এতক্ষণে সিগারেটের টিন আর দিয়াশলাই বের করল সে। একটা সিগারেট দু আঙ্গুলে টেনে বের করে হাতের টিনটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল— কাউকে ভালো লাগা না লাগার উপর কোন কথা চলে না। আর বিয়ে ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই জীবনের এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, একদিন আগে কেন, পাত্র অপাত্র হলে বিয়ের পিঁড়ি থেকেও কনে উঠে আসতে পারেন। আপনার বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ, আপনি আমাকেই তো পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে পারতেন। তাতে আমার মানটা যা হোক কথঞ্চিৎ রক্ষা পেত —আপনার অভিভাবকদেরও এমন অহেতুক মিথ্যার ভেতর ঢুকতে হতো না। আপনার সংকল্পের কথা কেন আপনি সেই রাতেই আমায় জানিয়ে দিলেন না— তেমন সময় যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল।

সে রাতের সংকল্প যে এটা নয় সে কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মৌরী। তবে সুদর্শনের ওকে সেই অকস্মাৎ বুকে টেনে নেওয়া, ওর ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করা ও গ্রহণ করেছিল এ কথাই বলা হয়ে যায় না। হৃৎপিণ্ডটা চঞ্চল শব্দ করতে লাগল মৌরীর। কিন্তু সুদর্শন এমন ভাবে প্রতীক্ষা করে রইল জবাবের জন্য যে চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়েই জবাব দিতে হলো ওকে। দৃষ্টিটা দেয়ালের দিকে রেখে বললো— না, এ সংকল্প আমার সেদিনের নয়।

বিস্মিত সুদর্শনের সিগারেট-ধরা মুখের হাত নেমে এলো নীচে। বিমূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সে— তবে?

— সে অন্য কারণ।

— অন্য কারণ! শুনি কারণটা?

পিসিমার সঙ্গে ঐ দিনের কথোপকথন মনে পড়ে গেল মৌরীর— না, একে মনে পড়ে যাওয়া বলে না। ও যেন ছোটপিসিকে আর নিজেকে স্পষ্ট দেখতে লাগল—ক্রুদ্ধ পিসি ঠোঁটে বিষ ঢেলে বলছেন, ছাত্র আর ডাক্তারদের সঙ্গে নার্সদের কি সম্পর্ক, তারা তাদের নিয়ে কি করে না করে আমি তার কতটুকুই বা শুনেছি। দুদিন বাদে সুদর্শনকে জিজ্ঞাস' করলেই তুমি জানতে পারবে সব। বৌদি তিরস্কার করে উঠেছিল— 'ছোট পিসি'! বলে। ওর মুখ কুঁকড়ে উঠেছিল বাসীফুলের মতো। চিবুকের কাঁপুনী থামাতে সমস্ত মুখটা কঠিন করে তুলতে হয়েছিল ওর। ও শুধু বলেছিল— সুযোগ পেলে সে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে। হঠাৎ যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল মৌরী। ওর ইচ্ছে হলো সুদর্শনকে আশ্চর্য্য করে ও চেয়ারে গিয়ে বসে সুদর্শনের মুখোমুখি হয়ে। সামনের চুলগুলো পেছনে ঠেলে সোজা তার মুখের দিকে তাকায়— যেমন তাকানো এর পূর্বে আর কোনদিনও সে সুদর্শনের দিকে তাকায়নি। তার পর জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ঐ যেমন হঠাৎ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি হঠাৎ নিবে গেল। ওর দ্বারা সম্ভব হবে না— সম্ভব হবে না এই কারণে নয় যে, ও লজ্জাবোধ করছে। যত কথাই মনে উঠুক, ওর ধারণা কখনই বলে উঠতে পারবে না ও এত কথা।

মৌরীর চঞ্চল ভাব আর সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করলো সুদর্শন। বললো—কিচ্ছু দ্বিধা করবেন না, বলুন। আমিই যখন নায়ক, শাস্তিটাও যখন পুরো আমার উপরই এসে পড়েছে, তখন আমার কারণ জানতে চাওয়ার অধিকারও আছে—

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত শুধু এইটুকুই বললো মৌরী, আপনি মঞ্জুর কাছ থেকে শুনে নেবেন। কিছু না বলেও যেন বলার ঝড় ওর মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেছে এমনি ভাবে আঁচল তুলে মুখ মুছল সে। এতক্ষণ অন্তত এ স্বাচ্ছন্দ্যবোধটা সুদর্শনের ছিল যে, কেন কি হয়েছে সে জানে। এবার সেটুকুও গেল। তবু যে কারণে মৌরী সংকোচবোধ করছিল, এটা সে রাতের সংকল্প নয় বলতে, ঠিক সেই কারণেই সুদর্শনের চোখে, মুখে ঠোঁটে যেন একটা আবেগ এসে থমকে দাঁড়ালো। ওকে আলিঙ্গনের, ওকে তার মুখচুম্বনের অধিকার মৌরী দিয়েছিল। সে গ্রহণ করেছিল ওর অসংযমকে। কথাটা মনে হতে মৌরীর হৃৎপিণ্ডটাও তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু দুর্নিবারকেও মানুষের রোধ করার শক্তি ধরতে হয়। সব আনন্দ কেবল ঝাঁপিয়ে পড়েই আহরণ করা যায় না— অপেক্ষা করতে জানতে হয়—সাধনা—হ্যাঁ সাধনা করতে হয়।

প্রথমে দরজায় উঁকি দিয়ে মঞ্জু যেন একটু দেখে নিল ব্যাপার-সেপারটা কি। তার পর চা জলখাবারের ট্রে হাতে টিপে টিপে পা ফেলে এসে ঢুকল ঘরে। হাতের ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো— এমন টিপে টিপে পা ফেলে এলাম বলে কিন্তু আপনারা আবার কিছু ভাববেন না। হাতের চা জলের জন্য এ সাবধানতা। বলে হাসিমুখে খাবার ডিস তুলে ধরল সুদর্শনের দিকে। ওবার এসে আগে চা তার পর মিষ্টি খেয়েছিলেন, দেখলাম বউনিটা ভালো হয়নি। এবার তাই আগে মিষ্টি তার পর চা— নিন ধরুন!

॥ ৩০ ॥

মঞ্জুর এই সকৌতুক সহাস্যভঙ্গির খাবার ডিস বাড়িয়ে ধরা প্রথমবারের বউনি বদল করে নেবার পরিহাস-তরলতায়, মনটা পাতলা হয়ে বড় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করল সুদর্শন— মানে এই অস্বস্তিজনক অবস্থার মধ্যেও যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা যায়। নইলে যদিও মৌরীর মুখে আপন অভিযোগের উত্তর শুনে প্রথম ধাক্কায় হৃদয়টা তার ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট উত্তালতা প্রকাশ করে ফেলেছিল, কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষণকালের জন্য মাত্র। তার পরমুহূর্তেই একটা নিদারুণ অস্বাচ্ছন্দ্যের আবর্ত যেন তার ভেতর থেকে পাক খেয়ে উপরে উঠে এসেছিল— মঞ্জুর কাছে শুনতে হবে? কেন? এ কথার অর্থ কি? মৌরী নিশ্চয়ই তার বলবার কথা শুনে নিতে বলছে না মঞ্জুর কাছ থেকে। তবে? তবে কি তার বোঝার ভেতর মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে? কেবল মৌরীর আপত্তি আর মৌরীর অনমনীয় জেদের ব্যাপার নয় এটা? তার এই আসা দিয়ে সে বাড়ীর লোকদের অপ্রস্তুত করে তুলেছে!

তা কারণটা সম্বন্ধে সে যখন একেবারেই অজ্ঞ বনে গেছে, তখন তার মনে এটা ওটা সেটা ওঠা সম্ভব এবং তারই ভেতর যখন এই বাড়ীর দিকস্কার প্রশ্নটা মনে উঠেছিল তখন সত্যি সুদর্শনের মনে অসোয়াস্তির অন্ত ছিল না। কিন্তু মঞ্জুর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলো সে। না, তার বোঝায় কোন ভুল ঘটেনি। কারণ যাই হোক, যজ্ঞ পণ্ডের পুরোহিত একা মৌরীই। সব সঙ্কোচ, অস্বস্তি-অশান্তি তক্ষুনি অন্তর্হিত হয়ে গেল সুদর্শনের মন থেকে। মৌরীর কাছে তার অহংকার আভূমি নত হতে পারে। তাকে জয় করে নিয়ে যাবার জন্য সে বারংবার আসতে পারে। প্রিয়কে জয় করা চলে, এমন কি— হ্যাঁ, হরণ করা পর্যন্ত চলে। মঞ্জুর পরিহাসের জবাবে সুদর্শনও একটু পরিহাস-তরলকণ্ঠেই জবাব দিল—সাহসটা গতবার বড্ড মার খেয়ে গেছে। আর বারের কোন কিছুই আর এবার নয়।

কথাটার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটা এতই স্পষ্ট যে কতক্ষণ হেসে নিল মঞ্জু। তারপর হাসি থামিয়ে যেন সুদর্শনের কথায় সম্মতি জানাচ্ছে সে, এমনি ভাবে মাথাটা ডান দিকে অল্প একটু কাত করল।

সুদর্শন মঞ্জুর হাতের মিষ্টির ডিশটা দেখিয়ে বলল— এই খাওয়াটাওয়াও এবার বাদ।

এবার আপত্তি জানালো মঞ্জু— দূর, তা হয় না।

— তবে শুধু এক কাপ কফি দিন।

— কফি!

কফি উচ্চারণটির সঙ্গে মঞ্জুর কণ্ঠের দ্বিধাগ্রস্ত লম্বাটানটা যেই খেয়াল হলো সুদর্শনের, কফির আয়োজন এবাড়ীতে না হওয়াই সম্ভব। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে— আচ্ছা, চা দিন। কিন্তু আর কিছু নয়।

মঞ্জু চায়ের কাপ সুদর্শনের হাতে দিল না। হাতের খাবার ডিশটা ট্রের উপর নামিয়ে ট্রেটা নিজের দিকে একটু টেনে নিল সুদর্শনের কাছে থেকে। তারপর একেবারে ছেলেমানুষের মতো মাথাটা এ কাতে সে কাতে দোলাতে দোলাতে বলল— না। আপনি ভালোবাসেন না সে কারণ তো আছেই। তা ছাড়া বউনি বদল করবো যখন স্থির করেছি তো করেছিই। তারপর মাথা দোলান বন্ধ করে মুখে চোখে স্বরবিন্যাসে রহস্যময় দিক-প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় চাল-চলন পদ্ধতির প্রতি না বোঝার মতন ফুটিয়ে তুলে বললো— কোন অঘটন যে কখন কিসের জন্য ঘটে, কে জানে। কেউ দোষ চাপান সময়ের ঘাড়ে। বলেন, দিনটা নিশ্চয়ই শুভ ছিল না। কেউ চাপান মানুষের ঘাড়ে। বলেন, যাত্রাকালে যেন কার মুখ দেখেছিলো। কেউ চাপান খাদ্যে। বলেন, যাত্রাকালে নির্বিচারে যা-তা সব খেলে আর দেখলে অযাত্রা হবেই। তাই আমি স্থির করেছি এবার সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবো এবং এই জন্য পরিণতির জন্য এবার ওবারের সমস্ত— সমস্তকিছু বিনা বিচারে স্রেফ বাদ দেব। তারপর চায়ের ট্রেটার দুদিকের হাতল ধরে সেটা তুলে নেবার মতো করে ধরে দাঁড়ালো— যেন এক্ষুনি সেটা নিয়ে সে রওনা হবে। কিন্তু একেবারে না তুলে বলল, কী বিতিকিচ্ছি কাণ্ড এ্যাঁ—একজন বিশিষ্ট ভদ্রজনের আসার সংবাদ শুনে বাড়ীর আপামর

ভদ্রজন সব ছুটে গিয়ে কেউ শোবার ঘরে, কেউ ঠাকুরঘরে, কেউ ছাদে। কেউ আলমারীর আড়ালে ঢুকছেন।

মঞ্জুর কথা শেষ হবার আগেই তার বড় বড় বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সুদর্শন। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের পাশটা চেপে ধরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মৌরীও তার মুখটা আরো কিছুটা ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

বড় বড় ব্যক্তিদের ছোটাছুটি করে ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়বার পেছনে যে লজ্জা ছিল, সব যেন ধুয়ে মুছে গেল। মঞ্জু ট্রে টা দু হাতে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো—কফি করতে কতক্ষণ লাগবে। এইতো সোজা চলে যাবো বাবার কাছে। বলবো, শীগ্‌গির—শীগগির টাকা বের করো। আকুল ব্যাকুল চোখে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে চঞ্চল হাতে ব্যাগ খুলে টাকা বের করে দেবেন বাবা। এক দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে ধরবো একটা ট্যাক্সি। চলে যাবো মার্কেটে। ধুমধাম হাতে বাছাই করে নেবো এই দুজনার মতো একটা ডেন্টি কফি-সেট। তারপর ফের সোজা কোয়ালিটি। বাস্—গরম মিল্ক কফিতে পট ভর্তি করে ট্রেশুদ্ধ কোলে চাপিয়ে নিয়ে ছুটবো বাসামুখে। কতক্ষণ আর লাগবে? বড় জোর এক ঘন্টা? আপনাদের তো মনে হবে আমি বুঝি গেলাম আর এলাম। আপনারা ততক্ষণ কথা— না, কথা বলে লাভ নেই। ও কথা বলতেও জানে না— বোঝেও বড্ড কম। তার চাইতে আপনি ততক্ষণ-চোখের ইশারায় টেবিলের উপর পড়ে থাকা সঞ্চয়িতাটা দেখালো মঞ্জু— ঐ সঞ্চয়িতাখানা নিয়ে বসুন। আমি দেখেছি সাধারণত ডাক্তারদের ভেতর বেশ একটা সাহিত্যিক মন থাকে। ঘরের একটা কোণের দিকে চোখ রেখে চোখ দু'টো পিট-পিট করতে করতে একটু ভাবলো মঞ্জু। তারপর সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলল—

> অনন্তের সমুদ্র মন্থনে
> গভীর রহস্য হাতে তুমি এলে আমার জীবনে।
> উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতাখানি
> আপনার চারিদিকে টানি—

আঃ, একেবারে লাগসই! দেখুন তো, বোধ হয় সানাইতে—

প্রথমতঃ মঞ্জুর কথায় বাধা দিয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়ত মঞ্জুর থাকাটাই চাচ্ছিল বলে চুপ করেই ছিল মৌরী। কিন্তু আর পারলো না। বাইরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এসে তাকালো মঞ্জুর দিকে। একটু ক্লান্ত একটু রুষ্টস্বরে বলে উঠল সে— উঃ মঞ্জু!

হাতের ট্রের ভারটা ফের টেবিলের কোণের উপর রেখে সুদর্শনকে সম্বোধন করলো মঞ্জু— ঐ দেখুন, বললাম না— কথাও বোঝে না। কি করে বুঝবে? কেবল কবিতা। কবিতা পড়লে কি জ্ঞানবুদ্ধির ওজন বাড়ে?

> ছাদে যেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়, সীমানা-হীন!
> তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা— স্বপন সব হবে বিলীন।
> তার চেয়ে এস বসি দুজনাতে, জানালা পাশে,
> ও ধারের ছোট গলিটারে দেখি—

বাস হলো তো? পড়ো কবিতা। বললাম, চার্চিলের 'ওয়ার স্পীচেজ' পড়। পড়লিনে। পড়লে বুঝতিস কথার শক্তি কা'কে বলে। একটানা একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঞ্জু। যদি আমাদের রাজন্যবর্গের শুধুমাত্র এই একটা শক্তিও থাকত। পত্রিকাগুলোর বুক ভর্তি থাকে কেবল তাঁদের মুখভর্তি কথায়। কিন্তু হা, ঈশ্বর। গতি নেই, বেগ নেই, স্পন্দন নেই—স্পর্শ নেই—এগুলো কি কথা। শুধু পারিভাষিক শব্দের মৃত সারি। প্রাণ যাদের ভেতর নেই— কথাও তাদের প্রাণ পায় না। পড়ি আর আমার কান্না পায় মৃত কথার সঙ্গেই মৃত মানুষগুলোর কথা ভেবে। হঠাৎ সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত শিশুর মতো চোখ-মুখ কুঁচকে মুচকে তুলে হেসে ফেলল মঞ্জু। বলল—কথাটা হলো কি জানেন, গাছের পাতায় যদি জমা জল থাকে তবে যেমন নাড়া পড়লো তো টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ল— তা গায়, মাথায় মাটিতে যেখানেই হোক। মনের মধ্যকার জমা কথারও সেই এক অবস্থা। ছোঁয়া পড়ল কি বাস— সমস্ত শরীর একদিকে হেলিয়ে দিয়ে 'বাস' শব্দটি উচ্চারণ করলো সে। তারপর

ট্রেটা একটানে তুলে নিয়ে বুকের কাছে ধরে, মৌরীর মুখটা তেরছা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে ঠোঁটে-মুখে হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ঘরঠাসা রুদ্ধ নিশ্চল ভাবটাকে উজ্জীবিত করে তুলবার জন্য যেন কিছুক্ষণ ওলট-পালট হাওয়া বইয়ে তারপর হাওয়া তাড়িত মেঘখণ্ডের মতোই ঘর ছেড়ে চলে গেল মঞ্জু।

কিন্তু মঞ্জুর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কলরব শান্ত হয়ে গিয়ে পূর্ণ নিস্তব্ধতাটা ফের এসে চেপে বসল ওদের মাঝখানে। আর এই হঠাৎ নীরবতা বড্ড বেশী নিথর করে তুলল ঘরের আবহাওয়াকে। কিন্তু নিরুপায় তো সুদর্শনও। সেই কি বেশী কথা বলে? ওর স্বভাবটাও তো রোল করা কাগজের মতো। মেলে ধরলেও ঝোঁকটা থাকে গুটানোর দিকে। আর মেলে রাখতে হলে রাখতে হয় চাপ। তার জানা কারণটা গেছে বেঠিক হয়ে, অন্য কারণটা এখনও জানা হয়নি, ভেতরে একটা ভাবনার চাপ তার ছিল। সেই চাপ তার চিবুকের দৃঢ়তাকে কিছুটা ঢিলে করেও রেখেছিল কিন্তু ঐ কথা নিয়ে মৌরীকে কিছু এক্ষুনি ফের জিজ্ঞাসা করতে মোটেই ইচ্ছে করল না তার। মঞ্জু থাকতে যে সিগারেটটা ধরিয়েছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে। ছাইদানের খোঁজে টেবিলের দিকে তাকালো সে। কিন্তু ঘরটা মৌরী-মঞ্জুদের। ছাইদান এখানে থাকার কথা নয়, ছিলও না। জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও থেমে গেল, কে জানে কোথায় গিয়ে পড়বে। বাধ্য হয়েই মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে নিবালো সেটাকে। ঘরটা সুদর্শনের অপরিচিত নয়। এই দু বোনের বিছানা— টেবিল চেয়ার বই-পত্তর, আলনার শাড়ী কাপড় জামা—সবই সে সেই রাতে মঞ্জু অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে এসে দেখেছে। টেবিলের উপর ফাইলে বেঁধানো স্তূপীকৃত পত্রিকার কাটিং। সেদিনও ছিল। আজ আছে। সেগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দেখল সুদর্শন। ইংরেজী বাংলা সাপ্তাহিক দৈনিক বাদ নেই। এই কাগজের কাটিংগুলোর মালিক নিঃসন্দেহে মঞ্জু। টেবিলের ওপর থেকে শেষ পর্যন্ত সঞ্চয়িতাখানাই তুলে নিতে নিতে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে থাকা মৌরীকে অনুরোধের সুরে বললে,— আপনার এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার পক্ষে খুবই যে অস্বস্তির কারণ হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন?

বসল মৌরী।

কিন্তু তার পর? সুদর্শন যে মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলতে না লাগল আর— মৌরী তার জবাব না দিল তা নয়। কিন্তু আসলে মৌরী বসে বসে কখনো শাড়ীর আঁচল কোলের ওপর ফেলে ভাঁজ করতে আর ভাঙ্গতে লাগল। কখনো নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের কিটেক্সের লাল রংটার দিকে তাকালো। তিন চার দিন আগে পরিয়ে দিয়েছিল আলতা। মাঝে মাঝে উঠে গেছে। বিশ্রী দেখাচ্ছে। শাড়ীটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে টেনে পা ঢাকল। সুদর্শনের লুটানো কোচা, ঝক্‌ঝকে পাম্পসুর উপর গিয়ে চোখ পড়তে লাগল তার মাঝে মাঝে। আর সুদর্শন উলটে পালটে চলল সঞ্চয়িতার পাতা। সে বইটাকে নয়, বইটার অধিকারিণীকেই যেন বইটার ভেতর দিয়ে দেখছিল। বইটির একটি পাতাও যে পড়া শুধু তাই নয়— প্রতিটি পাতা যে বহু বার পড়া তার চিহ্ন বিদ্যমান প্রতি ছত্রে ছত্রে। হাতের আঙ্গুলের ধূসর দাগ পাতায় পাতায়—পাতায় পাতায় খাদ্য-বস্তুর নিক্ষিপ্ত কণার হলদে ছিটে। কোথায় দুটি পাতার মাঝখানে চেপ্টে আছে কপালের ঝরা কুমকুম। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় দিনের বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটে হয় মালিকের হাতে নয় কোলে। বইটির মধ্যে যেন মৌরীর কোলের উত্তাপ, হাতের স্পর্শ, চুলের গন্ধ মাখানো রয়েছে। এই যে মঞ্জু বললো, ভেতরে প্রাণ থাকলে তবে কথা প্রাণ পায়। যদিও মঞ্জু যে অর্থে কথাটা বলেছে তা একেবারেই ভিন্ন—তবু অন্য অর্থে সুদর্শনের মনে হলো মৌরীর প্রাণের উত্তাপে যেন কবিতাগুলো সব প্রাণ পেয়ে উঠে এসে ঘরের মধ্যে ঘুরছে, দাঁড়াচ্ছে, বসছে। এই যেমন মৌরী বসে আছে ঠিক তেমনি ভাবে এসে বসছে। এই একটু আগে যেমন দেয়ালে পিঠ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল মৌরী, ঠিক তেমনি ভাবে দেয়ালে পিঠ রেখে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাচ্ছে। ছায়াছবির নামতালিকার পঙ্‌ক্তিগুলোকে যেমন অনেক সময় স্রোতে ভাসমান বস্তুর মতো ভেসে ভেসে পর্দার গায়ে মিশে যেতে দেখা যায়, ঠিক যেন তেমনি করে সুদর্শনের মেলে ধরা পাতা থেকে কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো উঠে এসে ভাসতে ভাসতে মিশিয়ে যেতে লাগল মৌরীর মধ্যে।

সুদর্শন চলে গেলে ঘরের মাঝখানে ঠিক পাখার নীচে চেয়ার টেনে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে বসে কিছুক্ষণ

হাওয়া খেল মঞ্জু। তারপর উঠে বসে বলল— উঃ, এক একটা দিন কি—হাঙ্গামাটাই যায়। বাজে হাঙ্গামার কথা বলছিনে, আনন্দেরও তো হাঙ্গামা আছে। তা দিলাম তো তোর— খুড়ি, আমাদের সুদর্শন বাবুকে কফি খাইয়ে। তারপর গলার স্বরটাকে একটু নীচু করে এনে কৌতুক চোখে জিজ্ঞাসা করল— ডাক্তার কবিতা পড়েছিলেন?

—ডাক্তার কবিতা পড়েছিলেন! দেখ মঞ্জু, যাকে বলে প্রগল্‌ভ— বাচাল, দিনকে দিন তুই তাই হয়ে উঠছিস। আমি সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু তোকে।

— ডাক্তার তাই বললেন?

— না। ডাক্তার বললেন তোর মাথার ভালো রকম চিকিৎসার দরকার।

— তোর মাথার চিকিৎসার কথা কিছু বলেন নি?

— না।

— তবেই ঠিক আছে। বাড়ীতে ডাক্তার এলেই আমার দেখাতে ওষুধ খেতে ইচ্ছে করে। আর ঘরের ডাক্তার হলে তো কথাই নেই। করা যাবে মাথার চিকিৎসা। কিন্তু ডাক্তার আজ সন্ধ্যায় কখন আসছেন?

— কেন, সন্ধ্যায় আবার আসতে যাবেন কেন?

— কেন আসতে যাবেন?

— হাঁ, কেন আসতে যাবেন।

—আজ সকালে এসেছিলেন কেন?

— বোকা বলে।

— বোকা বলে?

— হাঁ, বোকা বলে।

— এই সময়ের ভেতর তাঁকে তুই তবে বুদ্ধিমান বানিয়ে ছেড়েছিস বল?

— বোকাকে কি আর বুদ্ধিমান বানান যায়?

— তাই যদি না যাবে, তবে বলছিস কেন সন্ধ্যায় আসতে যাবেন কেন? আসবেন ঐ তোর কথায় বোকা বলে।

— না মঞ্জু, আমি সত্যি তোকে বলছি। সব কিছুরই একটা সীমা আছে—

চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল মঞ্জু। বললো— না ভদ্রে, সীমা বলে কোথাও কিছু নেই— আকাশ-বাতাস জল-মাটি আলো গ্রহ-নক্ষত্র কোথাও না। পৃথিবীর প্রকৃতিতে সীমা বলে কোন শব্দ নেই, মানুষের প্রকৃতিতেও না। বেরুনো তো হলো না। ঘুমোই বাপু একটু। বিছানায় শুয়ে পড়ে পাশবালিশ জড়িয়ে মড়িয়ে ধরে চোখ বুজল সে। বসে রইল মৌরী।

সকালের যে রোদটা পূবের জানালা দিয়ে এতক্ষণ শিকের ছায়া বুকে নিয়ে মেঝের ওপর পড়ে ছিল. বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দক্ষিণের দরজা দিয়ে এসে সে রোদটা এবার ঘরে ঢুকেছে। সুদর্শনের জুতোর তলায় পেষা সিগারেটটার পাশ কাটিয়ে তেরছা ভাবে চলে গেছে টেবিলের তলা পর্যন্ত। সেখানে মিনি বেড়ালটা অনবরত সুদর্শনের কফিকাপটা শুঁকছে। যেন বুঝে উঠতে পারছে না দুধ না আর কিছু। চলে যাচ্ছে— ফের ঘুরে আসছে।

অমিতা ঝুপ করে একবার ঢুকেই মৌরীকে স্নানের তাড়া দিয়ে অমনি বেরিয়ে গেল। বলতে বলতে গেল, কি অসময়ে শুয়েছ। ওঠো না মঞ্জু। খেয়েছ বলে কি হয়েছে। আমাদের সঙ্গে খাবে তো চা।

মৌরী উঠে স্নানের ঘর থেকে তেলের শিশি নিয়ে এলো। ডান হাতে শিশি নিয়ে বাঁ হাতে চুলের গোড়ায় অল্প অল্প তেল দিতে দিতে লাগল পায়চারী করতে। গন্ধতেলের সুগন্ধে সুবাসিত হয়ে উঠল ঘরের হাওয়া।

কিন্তু মঞ্জু শুয়ে থাকবে কতক্ষণ? চোখ-মুখ কচলে উঠে বসল বিছানার উপর। বললো, বৌদিটা ঠিক বলেছে। সত্যি ভীষণ খিদে পেয়েছে তো? কেক পেষ্ট্রির প্লেটটাতে তো ভদ্রলোক একবারের বেশী দুবার হাত ছোঁয়াননি— প্রচুর রয়ে গেছে—

মৌরী মঞ্জুর একটা কথাও শুনছে বলে মনে হলো না। শোনেওনি। মঞ্জুকে উঠতে দেখে সে পায়ের হাঁটা আর হাতের তেল দেওয়া বন্ধ করে বলল— দেখ মঞ্জু, আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি তোকে— বাড়ীর কেউ যেন—

তোকে কিছু না বলতে আসেন। খাটের ঝুলানো পা মেঝেতে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। বলতে হবে না। তাঁরা কেউ কিছু বলতে আসবেন না তোকে। তোর স্নান-খাওয়া যখন বাকী আছে, তখন ঘর ছেড়ে অবশ্যই একবার বেরুতে হবে তোকে আর বাবাদের যখন অফিসে যাওয়া হয়নি. বাড়ীতে রয়েছেন তখন উভয়পক্ষে সাক্ষাৎ ঘটছেই— দেখবি, মুখের ভাবসাব সবার জমাট। শুধু মুখ নয় চেহারাটাও সবাই বোবা করে রেখেছেন। অর্থাৎ— তারা কিছুর মধ্যে নেই। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছিলাম কি — না থাক। বলতে গিয়েও থেমে গেল মঞ্জু। ঐ বৌদি যা বলেছেন, নিন সুদর্শন বাবু নিজে বোঝা-পড়া করে— না গো? আমরা তো তাই চাই— এ্যাঁ? আমরা কি করতে পারি— না? আমরা আর এর মধ্যে নেই হ্যাঁ? হাঁ, তাই ঠিক। আমরা এর মধ্যে নেই— একেবারেই না। যেন মৌরীকে নয় নিজেকেই মঞ্জু জোর দিয়ে বোঝায় কথাটা। অর্থাৎ ও নিজেও আর কথা বলবে না এবিষয়ে মৌরীর সঙ্গে একটি— একটিও না।

॥ ৩১ ॥

সুদর্শন সম্বন্ধে মৌরী যে কেবল বাড়ীর লোকদেরই সতর্ক করে দিলে তাই নয়, নিজেকেও অসাবধান হতে দিলে না। এ অভিজ্ঞতাটা তার এমন দীর্ঘ দিন আগের নয় যে সে বিস্মৃত হবে— অনেক চিন্তা আছে যার রাশ একবার আলগা করে দিলে শেষে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুদিন বাদে যার সঙ্গে বিয়ে তার ভাবনাব রাশ ঢিলে করে দেয় না কে? মৌরীও দিয়েছিল। বরবেশী সুদর্শনের পাশে বধূবেশে নিজেকে কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হয়েছিল সে একবার নয়, বহু বার। সানাই-এর সুরের সঙ্গে মিলিত পুরোহিতের কণ্ঠের ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ ঋদ্ধ্যাতাম্, ও স্বস্তির সেই মন্ত্রধ্বনি, সেই পরস্পরকে আরো নিকট করার, আরো প্রেমে অনুরাগে যুক্ত হবার, প্রিয় বলেই প্রীতি করবার মন্ত্র, বাইরের সাতপাক ঘোরা বাকি থাকলেও, মনের ঘোরায় চৌদ্দপাকে জড়িয়ে ফেলেছিল তাকে। আজ যদিও ওর বিশ্বাস সেই মনের পাকখাওয়া সে খুলে ফেলেছে, কাঁচা কল্পনার রং ধুয়ে ফেলেছে—কিন্তু তাই বলে মনকে মৌরী আর মনে পড়িয়ে দিতে পারে না সে সব কথা। পারে না বাসরশয্যায় সুদর্শনের পাশে নিজেকে কল্পনা করে যে ঢেউ এর স্রোত বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, সেই ঢেউ উঠবার মতো অসতর্ক মুহূর্ত আসতে দিতে। একবারের তরে চিন্তায়ও সুদর্শনকে সম্মুখে এসে দাঁড়াতে দিলে না সে। এমন কি দুপুরে বিছানায় গিয়ে ঘুমোবার জন্য চোখ পর্যন্ত বন্ধ করতে সাহস করলে না। বই নিয়ে বসল সে। গোটা চারেকের সময় বই বন্ধ করে আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলল, ঝাড়া তিনশ পাতার বই একটানে শেষ করলাম, তুই পারবি?

ছোটপিসী যে সুদর্শনের এই আসার খবরটা মোটেই খুশীর সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবেন না তা যতীন বাবু জানতেন। বোনের কালো হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন বাবুর সাহস হলো না যে সংবাদ বোন খুশীর সঙ্গে নিতে পারছে না, সে সংবাদে মনের আনন্দ প্রকাশ করেন। শুষ্ক মুখে হাতের লাঠির উপর থুতনী চেপে বসে রইলেন তিনিও।

তা অন্তরে সুখ হোক আর নাই হোক, বাইরে সুখের খবর করে তুলতে হয় এমন সংবাদের সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে বহু। তাই কিছুক্ষণ মুখ কালো করে বসে থাকলেও ছোটপিসী যে কথাটা বললেন, সে কথাটা ভালো কথাই। এর পরও সুদর্শন এসেছে বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারপর শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বললেন,—কিন্তু তোমার মেয়ে কী বলছে? আবার ত তাড়ালে না তো তাকে? ভাই -এর বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটালেন তিনি— তা যে মান্য মেয়েরা তোমার করে তুমি জানবে কি বলবে কি- দাঁড়ালেই বা করবে কি। যা করবার তারা করবে। তোমার ইচ্ছায়ও হবে না, আমায় ইচ্ছাও না। ওদের ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার নেই। কিন্তু সুদর্শনকে আমাদের তো সব কথা খুলে বলতে হবে? সে জানুক কি ঘটেছিল। তুমি বলেছ তো তাকে সব বৃত্তান্ত? বলোনি! কেন? বাড়ী ছিলে না তুমি সুদর্শন যখন এসেছিল?

যতীন বাবুর ইচ্ছে হচ্ছিল বলেন, না তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। হয়তো তাই বলতেনও যদি না কথাটা প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। স্বীকার করতে হলো তাকে, সবাই-ই বাড়ীতে ছিলেন, তবে কেউ তারা ঘর থেকে বেরুননি।

মানে? বাড়ীসুদ্ধ তোমরা সবাই ঘরের ভেতর পালিয়েছিলে। কথাটা ছোটপিসী যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। ঠোঁট দুটো হয়ে উঠল তার যেন ঘৃণা-ব্যঞ্জনার ছবি। বললেন, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। আমাকেই সুদর্শনকে ডেকে সব কথা বলতে হবে। এত বড় মিথ্যে কথা আমরা কেন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, এটা তাকে জানানো আমাদের কর্তব্য। নইলে সে ভববে কি—আমাদের মান থাকবে তার কাছে? উঠে-পড়ে অনর্থক এটা-ওটা করতে করতে আরো কত কী বলে যেতে লাগলেন—যেটা উচিত মনে করছেন, সেটা তিনি করবেন—তার পর আর এই ব্যাপারের ভেতর তিনি নেই। যা খুশী করুক তার মেয়েরা। তাড়াতে হয় তাড়াক। খাতির করতে হয় খাতির করুক। কিন্তু যতীন বাবুর কানে কোন কথাই প্রবেশ করছিল না। তিনি ভাবছিলেন একেবারে অন্য কথা। মেয়ে কি করবে তা তিনি জানেন না কিন্তু তিনি কি করবেন তা স্থির করে ফেলেছিলেন যতীন বাবু।

তার একেবারেই অভিপ্রায় ছিল না সুদর্শনকে কিছু বলার। মৌরী ডাক্তার এবং নার্সকে মিলিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছে, বিয়ে ভেঙ্গে দেবার কারণ হিসাবে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেছে, সে সময় তাদের পক্ষে সুদর্শনের কাছে উচ্চারণ করতে যাওয়ার মধ্যেও সঙ্কোচ ছিল অপরিসীম। কোন জিজ্ঞাসা নিয়ে যখন সুদর্শন তাদের কাছে আসছে না, তখন সেই তো সসম্মানে মুক্তি দিয়েছে তাদের। তবে আর কেন তার ভেতর তারা ঢুকতে যাবেন? কিন্তু তার মতামতের স্বীকৃতি বা সম্মান যেমন মেয়েদের কাছে নেই, তেমনি বোনের কাছেও তো নেই। বিরস মুখে বসে রইলেন যতীন বাবু দু হাতের মুঠোয় লাঠির মাথা চেপে ধরে।

যদিও পরের দিনই ছোটপিসী চায়ের নেমন্তন্ন করে পাঠালেন সুদর্শনকে। কিন্তু সে বিনীত জবাব পাঠালো, নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো সুদর্শন। কিন্তু হঠাৎ তাকে এক আত্মীয়ের অপারেশন কেস নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে বলে তার সব কিছুই উলটে-পালটে গেছে। তিনি যেন কিছু মনে না করেন, সময় পাওয়া মাত্র সে আসবে।

কিন্তু এসব কথা মঞ্জুরা কিছুই জানলে না। কারণ, যতীন বাবু বাড়ীতে কোন কথাই বললেন না। মঞ্জু ভাবলে, হলো কী? কোথায় সেই সন্ধ্যায়ই ফের সুদর্শন আসবে, এই তার ধারণা ছিল, তা সেদিন সন্ধ্যায় তো দূরের কথা তারপরও পুরো পাঁচ দিন কেটে গেল সুদর্শনের দেখা নেই। চলতে ফিরতে কথাটা সর্বক্ষণ মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে লাগল মঞ্জুর। চিন্তিত ভাবে এসে জিজ্ঞাসা করলে অমিতা, মৌরী নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছে যে, সুদর্শন বাবু আর আসবেন না—তাই মনে হয় না তোমার, এ্যাঁ?

না, মঞ্জুর তা মনে হয় না। প্রতিটি চরিত্রকে পরিণত সামঞ্জস্যের সমাপ্তিতে টেনে নিয়ে পাঠক-মন তৃপ্ত করতে হবে, বিশ্বগল্পকার তেমনি দায়িত্ব স্বীকার করেন না। যেখানে সেখানে যথেচ্ছ সমাপ্তি টানাই তাঁর স্বভাব—তবু সুদর্শনকে যখন আর একবার এনে হাজির ক'রেছেন তখন এ আসাতেই এ গল্পের শেষ নিশ্চয়ই হতে পারে না।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশে মেঘ-রৌদ্রের খেলা চলছিল। ঝাঁক-ঝাঁক বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটা যেমন একবার ঝরঝর করে নেবে আসছিল তেমনি আবার হঠাৎ করেই থেমে যাচ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝক্ঝকে রোদে ভরে উঠছিল। পিসীমা মুখপোড়া বৃষ্টিকে গালাগাল করতে করতে কতবার যে তাঁর রোদের জিনিষ ঘরে ঢোকালেন আর বার করলেন তার ঠিক নেই। মঞ্জু আজ ঘরেই ছিল। তার ঘরে থাকবার কারণ অবিশ্যি যে বৃষ্টি নয় সে তো বলাই বাহুল্য। ক'দিন যাবৎ নীলকে সে উদ্বিগ্ন এবং চিন্তাকুল দেখছে। আজ দুদিন হল সে ন্যাশানেলেও আসছে না। এই দুদিন নোট নেওয়া আর নীলের জন্য প্রতীক্ষা করা দুটোই একসঙ্গে করে গেছে মঞ্জু। কিন্তু ওর লাইব্রেরী কাজের উৎসাহে কেমন যেন ক্রমশই ভাটা পড়ে আসছিল। একবার নীলের খোঁজে তার ওখানেই যাওয়ার দিকে ঝুকেছিল মনটা। কিন্তু গেল না। এ দুদিন জয়াকে দেখতে গিয়ে মমতার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে,

গল্প হয়েছে। কিন্তু দুদিন দেখা না হওয়ার জন্য তার খবর জানতে চাইতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেছে মঞ্জু। বলার মত কারণ কিছু থাকলে বা ঘটলে মমতা তাকে বলত।

এই সঙ্কোচবোধটা মঞ্জুর ভেতরের দুর্বলতা কী? হয়তো। নইলে মঞ্জুর মতো মেয়ে ভীরু হয়ে উঠবে কেন?

ঘড়ির কাঁটা নয়ের ঘরে যেতে না যেতে স্নানের ঘরে ছোটা, ফিতে দাঁতে চেপে ভিজে চুল বাঁধা, তোষকের তলা থেকে আর আলনার উপর থেকে শাড়ী এনে খাটের ওপর ফেলে খুঁতখুঁতে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা. লাট শাড়ী মনঃপুত না হওয়ায় আলমারী থেকে ধোয়া শাড়ী বের করা, তাও না থাকলে দু পাট খোলা আলমারীর শাড়ীশূন্য গহ্বরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অমিতার কাছে শাড়ীর জন্য যাওয়া আর সর্ব শেষে ভাতের জন্য রান্নাঘরের দরজায় চেঁচামেচি শুরু করা—কোন কিছুই করতে না দেখে মৌরী যেন স্মরণ করিয়ে দিল মঞ্জুকে—ন'টা বেজে গেছে কিন্তু অনেকক্ষণ।

আগের দিনের দৈনিক পত্রের একটা লেখা নিবিষ্ট মনে বসে কাটছিল মঞ্জু। বলল—কি হয়েছে তাতে।

—তোর বেরোনোর সময় চলে গেছে।

—এখন বেরুব না।

— বলিস কি! তোকে না দেখলে নাকি রাস্তা-ঘাট কাঁদে, পিসীমা বলেন।

—ঠিকই বলেন। বাহিরের বড় বড় টপটপে বৃষ্টির ফোঁটার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু বলল—কাঁদছে তো তারা। দেখছিস নে।

বেলা চারটার সময় জয়াকে দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল মঞ্জু। ঘরে এসে প্রবেশ করল অমিতা। বাড়ী ঢোকার পথটুকুর মধ্যেই এক পশলা বৃষ্টি এসে ওর শাড়ী-জামা ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। শাড়ীটা ভিজে দ্বিতীয়বার পরার অযোগ্য হয়ে গেছে বলেই বোধহয় একেবারে মেঝের ওপরই বসে পড়ল সে। আঁচল দিয়ে ভিজে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বললো—আর আপত্তি-টাপত্তির কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

—কি বিষয়ে? জিজ্ঞাসা করতে করতে মঞ্জু অমিতার ভিজে শরীরের দিকে তাকিয়ে বাইরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল কেমন বৃষ্টি পড়ছে দেখবার জন্য।

—আরে বৃষ্টি দেখা রাখো। এখন তোমার বেরুনো হচ্ছে না। অনেক কথা আছে।

—কি বিষয়ে? বাড়িয়ে দেওয়া হাতের তালু ভিজে গিয়েছিল মঞ্জুর। ভিজে হাতটা মুখে বুলোতে বুলোতে অমিতার সামনে এসে দাঁড়ালো সে—কি বিষয়ে এত কথা?

—এই মেয়েটির বিয়ের বিষয়ে। মৌরীকে দেখালো অমিতা।

কোলের ওপর একরাশ ব্লাউজ নিয়ে বসে মৌরী কোনটার টুকিটাকি ছেঁড়া সেলাই করছিল, কোনটার টিপ-বোতাম লাগাচ্ছিল। সে চোখও ফেরালো না ওদের দিকে। সে জানে, ছোটপিসী আজ হঠাৎ বাবা, দাদা, বৌদিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তবে এই জন্যই হয়ত।

জানতো মঞ্জুও। এবং মৌরীর মতই সে জানত না কারণটা কি। এবার ঔৎসুক্যে আরো এগিয়ে এলো মঞ্জু—ওখানে সুদর্শন বাবু আজ এসেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তার পর?

—তার পর সব সমস্যা জলের মতো সমাধান হয়ে গেল নিজে নিজে। আর এতেও যদি না হয় তবে বুঝতে হবে, নিছক ছেলেমানষী জেদের ব্যাপার এটা।

—বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করো এবং মন্তব্য বাদ দাও। অমিতা নিরপেক্ষ দর্শকজন মাত্র, সেকথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

হাতের সূঁচ-সুতো থেকে মুখটা পুরোও তুলল না মৌরী, শুধু যেন পাগলের কাণ্ড দেখছে এমনি ভাবের একটা তির্যক দৃষ্টি, একবারের জন্য ফেলল অমিতার মুখের উপর। তারপরই সে হাতের কাজে মন দিল।

বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত অমিতা করতে পারলে না, সে চেষ্টাও সে করলে না। সে বললো—ছোটপিসী সুদর্শন বাবুর আসবার কথা শুনেই নাকি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—মানে, চায়ের নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এক আত্মীয়ের অপারেশনের জন্য তখন সুদর্শন বাবু এসে উঠতে পারেনি। বাবা আমাদের এসব কথা কিছু

বলেননি তো—আর আমরা অযথা কত কি ভেবেছি—না গো?

—এতো কত কী ভেবেছ কেন? চোখ দুটো দুরন্ত রোদের দিকে তাকানোর মতো করে কুঁচকে তুলে মৌরী তাকালো অমিতার দিকে।

গ্রাহ্যই করলে না অমিতা মৌরীকে। মনের পেছনে খুশী থাকলে যেমনটা হয়। ঠাট্টা-বিদ্রূপ পরিহাস সব পিছলে পড়ে। দায়িত্ব-সম্পন্ন গৃহিণীর মতো ভারিক্কি চালে জবাব দিল—কত কি ভেবেছি ভাই নিজের গরজে। মা নেই ঘরে। দুটো মেয়েকে ঘরে ঘরে পাত্রস্থ করতে হবে—এ কি সহজ কথা! এমন পাত্র পেয়েও কপালদোষে হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখলে মাথা ঠিক থাকে কখনো? তবু বৌদি বলে, মা হলে পাগলা হয়ে উঠতেন না—না মঞ্জু?

—ঠিক।

ওদের দুজনার চালে রেগে উঠতে গিয়েও হেসে ফেলল মৌরী।

রামু বৈকালিক চা পরিবেশন করে গেল।

অমিতা চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বললো—আজ সুদর্শন বাবু এসেছিলেন। কথাবার্তা আমাদের সামনে হোক ছোটপিসীর এই ইচ্ছে—নইলে শেষে না তিনি আবার কোন দোষের তলায় পড়েন। কেন, কি বৃত্তান্ত কিছু জানিনে ছোটপিসী ডেকেছেন শুনেই সে কি বুককাঁপুনি। ভেবেছিলাম শরীর খারাপ বলে পাঠাবো। কিন্তু তোমার দাদা এমন চোখ লাল করে উঠলেন না, যেতেই হলো। তারপর ওখানে গিয়ে—হলঘরে ঢুকে— যেই না দেখলাম সুদর্শন বাবু শুকনো মুখে বসে আছেন—তখন বুকখানার যা অবস্থা হলো না—, বুকে হাত চেপে ধরে অমিতা যেন বোঝাতে চাইলে, সে চেপে ধরে কেঁপে ভেঙ্গে পড়া থেকে বুককে বাঁচিয়েছে।

—সংক্ষেপ—

হাতের কাপে চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল অমিতা। তারপর বললো—বাবা কিছুতেই সেখানে থাকলেন না। আমি আর তোমার দাদা বসলাম। কথা আরম্ভের ভূমিকাই বল আর ভণিতাই বল, ছোটপিসী অনেকক্ষণই করে নিলেন কিন্তু আমি শুনিনি—

—বেশ করেছে। কিছু সংক্ষেপ হলো?

—না বাপু, এতো তাড়া করো না। কথা কি একটা, অনেকতো। তুমি বোস।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে কথা বলছিল মঞ্জু। কিন্তু এবার জয়াকে দেখতে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হলো তার। সে ভালো আছে। চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু দরজায় চোখ পেতে বসে থাকবে জয়া ওর জন্য। শেষে ভাবিত হবে। এমন তো একদিনও হয়নি। কিন্তু কি করা যায়! ঘণ্টাখানেক পর আর হাসপাতালে ঢোকার উপায় থাকবে না। সাক্ষাৎ-সময় পার হয়ে যাবে। অমিতার মতোই মেঝের উপর বসে পড়ল সে। তারপর পা দুটো মৌরীর ইজিচেয়ার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে তার কোলের উপর তুলে দিয়ে বলল– -আঙুলগুলো একটু টেনে দে তো দিদি। আর অমিতাকে বলল—আচ্ছা, তাড়া করবো না। কিন্তু তোমার উপর ঘটনার ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলো বাদ দিয়ে—এ্যাঁ?

অমিতা বললো—জানো, ছোটপিসী এমন করে মমতার বাবা মার চাতুরী করে নার্স মেয়ে গছানোর চেষ্টার কথা বললেন যে আমিই অবাক হয়ে শুনেছিলাম। আমরা তো দূরের কথা, মমতার বাবা-মাও হয়তো এ ভাবে ভাবেননি। বললে বিয়ে হবে না, তাই বলেননি—এই তো। আমার খুব খারাপ লাগছিল—

—তারপর?

—আবার!

—কি আবার?

—তাড়া দিচ্ছ।

—কোথায় তাড়া দিচ্ছি! জিজ্ঞাসা করছি, তারপর কি হলো? বললো, ছোটপিসী বললেন, মেয়ে-নার্স জেনে সে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে তারা বাধ্য হলেন। কিন্তু এদিকে যেকথা তারা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, তাদের মেয়ে তাই বলে বসল—দুটো বিয়েকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলল। বললো—একটা ভাঙ্গলে নাকি আর একটাও ভাঙ্গবে! কেন, কি জন্য? একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্ক কি? আমরা তো আকাশ থেকে পড়লাম। কিন্তু

মেয়ে কাঁদিয়ে ছাড়লে আমাদের। তার সেই এক কথা— বলে মৌরীর সেদিনের কথাগুলোকে যথেষ্ট রেখে ঢেকে, ছেঁটে-কেটেই যদিও ছোটপিসী উপস্থিত করলেন সুদর্শন বাবুর কাছে, তবু তার ভেতর এ কথাটা তো স্পষ্ট হয়েই উঠল মৌরীর বক্তব্যটা কি।

নার্সের কাজে সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয়, এই যদি সত্য—এই যদি সত্য যে এই সেবার কাজ নারীর জাত যাওয়া, তবে যারা বাধ্য হয়ে দেয় তাদের চাইতে অনেক বেশী অপরাধী। তারা যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় নেয়। এই যদি সত্য মেয়েরা নার্স হলে ভদ্রঘরের বৌ হয়ে আসবার যোগ্যতা হারায়, তবে যাদের জন্য হারায় তারা আরো বেশী অযোগ্য ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে— তাই যদি ভাঙ্গে তবে একটা যে কারণে ভাঙ্গবে, অপরটাও সেই কারণেই ভাঙ্গবে—

—ঠিক।

—কে বলেন জানো? সুদর্শন বাবু। স্তব্ধ হয়ে একেবারে পাথরের মতো জমে বসে কথা শুনছিলেন, ছোটপিসীর শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে 'ঠিক' শব্দটা বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট শুনেছি। শুনব না কেন বল—এই তো চার হাতের লম্বা সোফা, এই সুদর্শন বাবু বসেছেন আর এই তো আমি বসেছি। মাঝে তো মাত্র হাত দেড়েকের তফাৎ।

—তারপর?

—তারপর আর কি? সুদর্শন বাবুর মন্তব্য শুনে আমার এমন আনন্দ হলো যে আর কোন কথা আমি শুনিনি ছোটপিসীর।

—সুদর্শন বাবু আর কি বললেন?

—তিনি একটা কথাও বলেননি। চায়ের আয়োজন করেছিলেন ছোটপিসী প্রচুর। কেউ কিছু বুঝলে না। তোমার দাদা বাবা খেতে পারলেন না। আমি আনন্দে এতো খেয়েছি যে ছোটপিসী নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন। নিজের প্লেটটা খেয়ে তোমার দাদার প্লেটটা থেকে তুলে নিয়েছি। বলে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

অমিতা যেন খেয়ে ছোটপিসীকে ভীষণ জব্দ করে এসেছে।

ওর অবস্থা দেখে হেসে ফেলল মঞ্জু। বললো—কিন্তু তোমার প্রথম কথাগুলোর মানে কি হয় তবে? আর আপত্তির কারণ নেই। সব সমাধান হয়ে গেছে?

—বাঃ, হলো না?

—কি ভাবে হলো?

—ঐ যে বললাম, আমি স্পষ্ট শুনেছি, ছোটপিসীর মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন বাবু বলে উঠলেন, ঠিক।

—তাতেই সমাধান হয়ে গেল?

—কেন, হবে না? মৌরীর যা মত তাই যদি সুদর্শন বাবুরও মত হলো, তবে বিরোধ রইল কোথায় শুনি?

দুচোখ বড় বড় করে ওরই দিকে জবাবের প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকা অমিতার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু এবার বলে উঠল—ঠিক। তারপর মৌরীকে জিজ্ঞাসা করল—শুনেছিস সব কথা?

—নিশ্চয়।

—বৌদির অভিমত, যদি মতের সঙ্গে মত মিলে গেল, তবে আর বিরোধ রইল কোথায়—তাই কি?

—নিশ্চয়।

—খুশী মনে ধন্যবাদ জানাতে পারি তোকে?

—বাধা কোথায়?

—বাধা কোথাও নেই, তোর মধ্যেও না—তাই দুঃখ হয়।

মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছিল অমিতা। কাত হলো সে। বললো, বাঃ, ওর ভেতরে বাধা না থাক, থাকলেও দূর হয়ে যাক, তাই তো আমরা চাচ্ছি। ওর মধ্যে বাধা না থাকলে দুঃখ হতে যাবে কেন?

—সেই জনাই দুঃখ হবে। কাউকে ভূতে পেয়েছে শুনলে আমরা দুঃখ বোধ করি। কেন করি, কারণ, আমরা

মনে করি ভূত বলে কিছু নেই। যা নেই তাতে পেয়ে বসেছে দেখলে তাতেই দুঃখ পাচ্ছে দেখলে সব ক্ষেত্রেই দুঃখ হয়। তারপর, যদি এই সত্য হয়, তবে এই, যদি ঐ সত্য হয়, তবে সেই, যদি সেই সত্য হয় তবে এই। বুঝলাম মহিলাটির 'যদি' গুলো 'যদি' ঠিক হয় তবে কথাগুলো তার সব ঠিক—সুদর্শন বাবুর ঠিকটাও ঠিক। কিন্তু আসলে দাঁড়াচ্ছেটা কি? সব গিয়ে দাঁড়াচ্ছে 'যদির' উপর—যার নিজের পায়ের তলায় দাঁড়াবার মতো এক বিন্দু মাটি নেই। ভদ্রলোকটিকে মহাশয়া হারিয়ে দিয়ে বসে আছেন 'যদির' ব্রিফে, তাতে কেস জেতা তো দূরের কথা কেস ফাইল অবধি করা যায় না।

কতক্ষণ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে কি যেন ভাবল অমিতা। তারপর উঠে বসে ভাবতে ভাবতেই বললো—দেখো, আমি ভেবে দেখলাম, বলে আবার যেন কি চিন্তা করতে লাগলো।

টিপ-বোতাম সূঁচ-সুতো সেলাই -এর বাক্সে ভরে গুছিয়ে গাছিয়ে, কোলের উপরের জামাগুলো হাতে তুলে উঠে পড়ল মৌরী।

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—কোথায় চললেন আপনি?

—ছাদে।

—হ্যাঁ, যাও বাছা, ঐ তোমার উপযুক্ত জায়গা। ছাদে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকো গিয়ে।

পূর্বদিনের রোদ গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির খেলা আজ আর আকাশে ছিল না। সমস্ত দিন ধরেই বৃষ্টি ঝরছিল; বাতাস বইছিল। এখন সন্ধ্যায় আকাশটা কেমনধারা যেন একটা আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল পৃথিবীর দিকে। পিসীমা বলছিলেন আশ্বিনের বাদল-বাতাসকে বিশ্বাস নেই। আকাশের চেহারাটা নাকি ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার স্মৃতিতে জেগে উঠছিল সেই ছাব্বিশ সনের ঝড়ের ছবি। পদ্মা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষার জল যে ঝড়ে মানুষের মৃতদেহে ভরাট হয়ে উঠেছিল। বিকেলে যেই বাড়ী থেকে বেরুতে যায়, তাকেই বাধা দেন পিসীমা। কিন্তু কে শোনে? এবার একে একে বেরিয়ে গেছে সবাই। অমিতা যাও বা বাড়ী ছিল, এই একটু আগে তার বাবা গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে গেছেন তাকে। যে আকাশের দিকে তাকিয়ে পিসীমার চোখ বড় দেখাচ্ছিল, সেই আকাশের দিকে তাকিয়েই কিন্তু আবার রামু শিব-পার্বতীর ঝগড়া দেখছিল। ঐ যে আকাশটা অমন লালচে—ও হলো শিবের রক্ত নেত্রের ছটা। দুগ্‌গা মা বায়না ধরেছেন বাপের ঘরে আসবার, তাই ধমকাচ্ছেন মহাদেব। সেই ধমকের তো শব্দ ঐ মেঘ-গর্জন। মা দুগ্‌গা কাঁদছেন, আর পৃথিবীতে জল ঝরছে। আবার যাবার বেলা, বিজয়ার দিন যে কাঁদাটা কাঁদবেন মা এক ফোঁটা মাটিও থাকবে না।

চুপচাপ বসেছিল মৌরী। হঠাৎ রামু ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে বললো—দিদিমণি জামাইবাবু।

—জামাই বাবু আবার কে? মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল মৌরী। সে ভাবলে রামু কাউকে বাইরের ঘরে বসিয়ে সংবাদ দিতে এসেছে।

দরজার বাইরে ওরই পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শনকে দেখিয়ে রামু বললো—এই যে।

এই যে মানে? রামু কা'কে সঙ্গে করে একেবারে এখানে নিয়ে এলো! বিরক্তির টানে ভ্রূকে বাঁকিয়ে তুলল মৌরী। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সে আর ওঠামাত্র চোখ পড়ল গিয়ে সুদর্শনের উপর। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল তার। রামুর এই সম্বোধনের কথা সে জানত না। তাকে কেউ বলেনি।

মৌরীর মুখের চেহারা দেখে পালালো রামু।

ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে এসে অপরাধীর মতো হাতজোড় করে দাঁড়ালো সুদর্শন। বললো—অপরাধটা সম্পূর্ণ আমার। এর জন্য ওকে ধমকালে আমার গায়ে বড্ড লাগবে। ও দেখেছে এই ভদ্রলোকটিকে আপনার কাছে পৌঁছে দেবার এই একমাত্র উপায়। কিন্তু আমি তো বুঝছিলাম ফলাফলটা মধুর হবে না রামুর পক্ষে। তবে বিশ্বাস করুন, জামাইবাবু ডাকটা আমার শেখানো নয়। বলেন তো ওটার জন্য ডেকে আমি ধমকে দিতে পারি রামুকে।

সে দিন এসে যে চেয়ারটায় বসেছিল সেটাই টেনে নিয়ে নিজেই বসল সুদর্শন। আজ সে তার স্বভাব বিপরীত ভাবে একটু চঞ্চল, একটু উচ্ছল। আর সে অন্ধকারে নেই। এখন সে আলোতে। সে কি ঘটেছিল তা জেনেছে, নিজে কি করবে তা ঠিক করে ফেলেছে। তার আহত আত্মমর্যাদা নিরাময় বোধ করছে। মৌরী তার কাছে এই

ঘটনার ভেতর দিয়ে যেমন আরো বড় হয়ে উঠেছে, তেমনি আরো ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। জানে না মৌরী তার কথার পেছনে যে সত্য রয়েছে, তত বড় সত্য একটা বিশেষ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর গোণা কয়টা মাথার জন্য নয়। তার ব্যাপ্তি যাবে গোটা সমাজের মাথা ছুঁয়ে।

বসে পকেটে হাত ঢোকালো সুদর্শন সিগারেট বের করবার জন্য। তারপর শূন্য হাতটা পকেট থেকে বের করে এনে বললো—মাথায় যখন কেবল এক চিন্তা এক কথা জায়গা জুড়ে বসে থাকে তখন যে মানুষের কি দুরবস্থা হয়— দেখুন, ফেলে এসেছি সিগারেট।

মৌরীকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে যতই মনস্থির থাক, মুহূর্তে মুখের সব ঔজ্জ্বল্য যেন দপ্ করে নিবে গেল সুদর্শনের। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল সে-ও।

তার অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে পড়ল মৌরী। ধীরকণ্ঠে বললো—আপনার সিগারেট চাই তো?

কথাটা প্রণয়বাক্য নয়। কিন্তু সর্বশরীর রোমঞ্চিত হয়ে উঠল সুদর্শনের। সিগারেট চাই তো। মৌরী যেন তার লখ্নউ -এর বাড়ীতে, তার ঘরে। সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ার কথা শুনে চাকরকে সিগারেট আনার আদেশ দিতে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে তাদের বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতাগুলো ওরই মতো উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করছে। বলছে, মৌরী আমিই তোমার শাড়ীর রংটা আমার পাতার রঙ্গে রাঙ্গিয়ে রেখে এসেছি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারব বলে। বুকের উপরের টেনে দেওয়া প্রান্ত পাড়টা ফুলের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে রেখে এসেছি তোমার বুকের পাহাড়-রাস্তা বেয়ে তোমার কাঁধে ঠোঁট ছোঁয়াতে পারবো বলে।

বাইরে মেঘ বৃষ্টি বাতাস, ঘরে সায়াহ্নের অস্পষ্টতায় ঐটুকু ব্যবধানে দাঁড়িয়ে মৌরী—ভেতরটা উদ্দামতা প্রকাশ করতে লাগল সুদর্শনের। কোন মতে বললো—দরকার নেই।

দরকার নেইটা নিতান্ত বাজে কথা। কিন্তু সুদর্শনই যদি বলে প্রয়োজন নেই, তবে ওর জোর করার কি আছে? কিন্তু নিরস্ত হতে গিয়েও আবার হলো না। বললো, মঞ্জুর মতো কফির ব্যবস্থা আমি করতে পারবো না। কিন্তু সিগারেট আনিয়ে দিচ্ছি।

মৌরী চলে গেল। সুদর্শনের মনে হলো, নদ-নদী-গিরি সমুদ্রের মধ্যে যেমন প্রকৃতিগত কতকগুলো বাধা আছে, মৌরীর মধ্যেও যেন তেমনি কতকগুলো প্রকৃতিগত বাধা আছে। সেগুলোকে ভর করে চললে জীবনেও তার কাছে যাওয়া যাবে না।

মঞ্জু আর রামু একেবারে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে 'উঃ' করে থেমে পড়ল। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রাগতকণ্ঠে মঞ্জু বললো—এমন ছুটে কোথায় চলেছিস?

—সিগারেট আনতে।

—সিগারেট কার জন্য?

—জামাইবাবুর জন্য।

ধমকাতে গিয়েও হেসে ফেলল মঞ্জু। বললো, সুদর্শন বাবু বলতে পারিস নে?

মাথা চুলকোতে লাগল রামু। বললো—লজ্জা করে।

পত্রিকার কাগজ মাথায় চাপিয়ে রামু চলে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল মঞ্জু। কোন বান্ধবীর বাড়ী গিয়ে বসে আড্ডা দেওয়া আর ডালমুট ভাজা খাওয়া যাক। বৃষ্টি। তাতে কি হয়েছে? যেমন বাদলা পথ দিয়ে বাইর থেকে বাড়ী ফিরল, ঠিক তেমনি করে আবার আর একজনের বাড়ীতে অনায়াসে চলে যাওয়া যাবে। চুপচাপ বেরিয়ে গিয়ে ট্রামে চেপে বসল মঞ্জু। ট্রামের শার্সি দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পিঠের জামা-কাপড় ভিজিয়ে তুলল তার। একটু সরে বসে শার্সির নীল কাচের পিঠে বৃষ্টির জল পড়া দেখতে লাগল সে। কিছুক্ষণ বাদে একজন যাত্রীকে জানালা তুলে দিতে দেখে, সে-ও তুলে দিল জানালা। বৃষ্টির জোর নেই। প্রায় থেমে গেছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশেব দিকে তাকালো মঞ্জু। আকাশের চেহারাটায় এমন একটা মত্ত ভাব ছিল যে তার দিকে তাকিয়ে মনও মাতাল হয়ে উঠতে চায়। আকাশটা দেখতে দেখতে দুটো ষ্টপেজ চলে গিয়ে হঠাৎ তৃতীয়

ষ্টপেজে নেমে পড়ল মঞ্জু। নীলের ওখানে গিয়ে তাকে বিস্মিত করে দেবে সে। নাঃ, বৃষ্টিটা একেবারে থামেনি। গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে। একটা দোকানে উঠে দাঁড়ালো সে। নীল তাকে দেখে আশ্চর্য্য হবে, আর রজত? যদি সে এখন গিয়ে রজতের ঘরে উপস্থিত হয়—তার হাতের গ্লাস ছিটকে পড়ে মেঝেয় চৌচির হবে?

॥ ৩২ ॥

ঘড়-ঘড় শব্দে ট্রাম এগিয়ে আসতে লাগল। কত নম্বর? গলা বাড়িয়ে, মাথা কাত করে গাড়ীর নম্বরটা দেখতে চেষ্টা করল মঞ্জু। 'পঁচিশ'। যদিও বান্ধবীর ওখানে যাবে বলে উল্টো পথে অনেকটা দূরই চলে এসেছে, তবু লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে 'পঁচিশ নম্বরে' চেপে বসলে বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে রজতের ওখানে পৌঁছে তার হোটেলের করিডোর-পথ অতিক্রম করে রজতের দরজায় টোকা দিতে পারে সে। ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়ী থামাল। যারা নামবার ভিজে-পথে সন্তর্পণে পা ফেলে নামল। যারা উঠবার তারা তেমনি সন্তর্পণে পা ফেলে হাতল ধরে উঠল। পা বাড়ালেই ট্রামের চত্বর। দু'জন ভদ্রলোকের মধ্য দিয়ে মাথা গলিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ল মঞ্জু। কিন্তু না— ট্রামটা যখন মোড়ের মাথায় বাঁক ঘুরে চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মঞ্জু বুঝল ও ট্রামে চাপেনি। হ্যাঁ, শরীর দিয়েই বুঝল মঞ্জু, ও যায়নি। দোকানঘর থেকে নেমে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

অবচেতন-মন যেখানে একেবারে ট্রামে চেপে বসেছিল, মঞ্জুর চেতন-মন কিন্তু সেখানে বুঝে উঠতেই পারলে না রজতের হোটেলে যাওয়ার মতো একটা উদ্ভট আজগুবী চিন্তা ওর মনে কি করে এলো! ভাবলো, হবে হয়তো নীলকে ওর হঠাৎ-উপস্থিতি দিয়ে চমকে দেবার কথাটাই ওকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার কথা—ওকে দেখে যে আজ শুধু চমকেই উঠবে না, দেখেও বিশ্বাস করতে চাইবে না।

চিন্তা আর স্বপ্ন আনাগোনার অর্থ বিশ্লেষণ আমরা বড় একটা করিনে। যখন করি, তখনও এভাবেই করি। এতে কিছু অর্থ যে বোঝা না যায়, তা নয়। কিন্তু সবটা যায় না। গূঢ় অর্থ মনের নিগূঢ়েই থেকে যায়। মঞ্জুরও যে তাই গেল না কে বলবে! অপরের মনস্তত্ত্ব বোঝার যত অহমিকাই করুক, সে জন্য নিজের মনটাও ধরার মধ্যে থাকবে এমন কোন কথা নেই। ডাক্তার কি তার নিজের রোগ ডাক্তার বলেই ধরে উঠতে পারে? না ডাক্তার, ডাক্তার বলেই নিজেই চিকিৎসায় সুবিধা করে উঠতে পারে? গভীরে যদি এমন কোন কথা থেকেই থাকে মঞ্জুর যে, তার এই যাওয়ার ইচ্ছাটা রজতকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দেওয়া ছাড়াও আরও কিছু নিভৃত-অর্থ বহন করে। মঞ্জু তা নির্ণয় করে উঠতে পারেনি— তার জন্য অগৌরবের কিছু নেই। মনের অপ্রকাশিত গুণই প্রকৃত এবং জোরালো এ বিশ্বাসে ভ্রান্তি আছে। অনেক সময় তা আদপেই ঠিক নয়। মঞ্জুর ক্ষেত্রে তো নয়ই। কারণ, যে গ্রাহ্য করাটা বিদিতে-অবিদিতে মানুষের চলা-ফেরাকে কাটছাঁট করে চলে, সেই গ্রাহ্য করাটাই ওর চরিত্রে অনুপস্থিত। ও যখন সেটা করে বুঝতে হবে অন্তরে বাইরে সেটারই প্রাবল্য চলছে। তাই মাতাল আকাশের দিকে চোখ পড়তেই ট্রাম থেকে নামিয়ে নীলের ওখানে নিয়ে চলেছে মঞ্জুকে তার মনের যে ব্যক্ত অংশ, মনের অব্যক্ত অংশের কাছে তার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

দু'-তিনটে ট্রাম এলো, থামলো, চলে গেল। গেল কয়েকটা বাস। আটের-বি বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

একটা ঝিরঝিরে বৃষ্টি ভারী কুয়াশার মতো উড়ে চলে গেল শরীরের উপর দিয়ে। ভিজে শরীরে বাতাস শীত ধরিয়ে দিলে। আঁচলটা গায়ে জড়িয়েও আরাম হলো না। একবার বৃষ্টিটায় সামান্য জোর ধরেছিল। তাতে ট্রামের কাচের শার্সি চুইয়ে জামা আর শাড়ী কিছুটা ভিজিয়ে দিয়েছিল। তা এখনও শুকোয় নি—একটা মস্ত হাঁচি বেরিয়ে এলো। হাতে রুমাল নেই। ব্যাগটা নাকে-মুখে চেপে ধরে বিজ্ঞানসম্মত হাঁচি দিল মঞ্জু। পাশের আনমনা ধূমপানরত ভদ্রলোকটি চমকে উঠলেন। একটা খালি ট্যাক্সির ড্রাইভার ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে গাড়ীর গতি মন্থর করল। ডাকবে? ক'টা টাকা যাবে কিন্তু সময় বাঁচবে অনেক। আজ তার ব্যাগে টাকা আছে। জয়ার

কিছু ওষুধপত্রের বাকী বিল মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মমতার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দিতে পারেনি। মমতা আজ একটা জরুরী কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ততক্ষণে ট্যাক্সি দূর। সামনে দাঁড়িয়ে ঝক্‌ঝক্ শব্দ তুলছে—যাদবপুরের বাস। একগাদা ভিড়ের সঙ্গে-সঙ্গে পায়-পায় চলে গিয়ে বাসে উঠে পড়ল সে। ব্যাগটা বুকের উপর চেপে ধরে ভিড়ের চাপের মধ্যে লেপটে দাঁড়িয়ে রইল।

নীলকে যদি না পায় বাড়ীতে? যদিও সে জানে সাধারণতঃ নীল বিকেলে বাড়ী ফিরে আর বেরোয় না। নিজের কাজ নিয়ে থাকে। তবু সংবাদ না দিয়ে এলে বাড়ী না পাওয়ার যে একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়— সেটা তো আছেই। যদিও পাওয়া যাবে এই আশাতেই যাচ্ছে—তাই বলে নীলকে বাড়ী না পেলেই কি ওর এই বেরিয়ে পড়া বৃথা কষ্ট ভোগ করা হবে? না। বাসে ঘুরতেও ওর অপূর্ব লাগে! জানালার ধারটিতে একটু বসবার জায়গা পেয়ে বাইরের দৃশ্য— চোখের ওপর নিয়ে ছুটতে পারলে তো কথাই নেই—অপূর্ব! আরো অপূর্ব যদি দিনটা হয় বৃষ্টি-মেঘ-বাদলের। উঃ—ভদ্রলোকটি একেবারে ওর পা'টা মাড়িয়ে দাঁড়িয়েছেন। ব্যথার মুখে সবিনয় হাসি টেনে ভদ্রলোককে পা'টা সরাতে বলল মঞ্জু। অপ্রতিভ মুখে পা টেনে নিয়ে, পেছনের লোকটিকে ঠেলে একটু সরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন তিনি। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গাড়ীর মধ্যে দেহটাকে ঠেসে দিলেন এক পাঞ্জাবী মহিলা। বাস্, আর কারু দেহের সঙ্গে কারু দেহের চুল পরিমাণ ফাঁক রইল না। মঞ্জু বুকের ওপর চেপে-ধরা ব্যাগটা সরিয়ে মহিলাটিকে ঐ ব্যাগের স্থানটুকুও ছেড়ে দিল। চলতে চলতে বার কয় বাসের ঝাঁকি সামলানো মহিলাটির মাংসল বাহু চেপে ধরে। পঞ্চনদের ললনা দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের ওজনে।

যাদবপুর—গাড়ীর গায়ে সজোরে থাবড়া মেরে হেঁকে উঠল কন্‌ডাক্টার। বার কয় বাহু চেপে ধরার ভেতর দিয়ে যে অপরিচিত দৃষ্টিবিনিময় হয়েছিল তাতেই মঞ্জুকে নামবার উদ্যোগ করতে দেখে পরিচিতের মতো জিজ্ঞাসা করলেন মহিলা, সে এখানে নামছে কি না। মাথা নাড়া আর হাসির ভেতর জবাব সেরে নেমে পড়ল মঞ্জু।

তারপর সেই দোকান, বাজার, পথ। এ পথের কোথাও কোন সজ্জা নেই, চমৎকারিত্ব নেই, শোভা নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই। দোকানগুলো প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে দাড়িয়ে আছে। দোকানীরা টুলে নয়ত লোহার চেয়ারে বসে বসে পা নাচাচ্ছে। নিয়ন যদিও কিছু কিছু দোকানে জ্বলছে কিন্তু অধিকাংশ দোকানেই জ্বলছে বাল্‌ব। নিয়নের পাশে সে আলোকে দেখাচ্ছে কেরোসিনের আলোর মতো হল্‌দে নিষ্প্রভ শ্রীহীন। ব্যবসাকেন্দ্রটুকুতে তবু এ-ও আছে। তারপরে ছাড়াছাড়া দালান কোঠা-বাড়ী। আর তার খোলা গবাক্ষপথে বা খোলা দরজাপথে দেখা পাওয়া আলো। বাঁধানো রাস্তা যেখানে কাঁচা পথে পড়েছে সেখান থেকে সুরু ভিজে মাটি। ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল। ঝিঁঝি পোকার ডাক, ব্যাঙের ঐকতান। দরমা-টিন-মাটির চালাঘর। লণ্ঠনের মিটিমিটি আলো!

এ পথে মঞ্জু প্রথম দিন এসেছিল, সে-ও ছিল এক উত্তীর্ণ সন্ধ্যা, মমতাকে দেখতে এসেছিল মৌরী আর সে। ভীতু মৌরী ভয় পাচ্ছিল প্রতিপদে। নীলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন সেটাই। দরজা খুলে দিয়েছিল নীল। অপরিচিতের সংক্ষিপ্ত অভ্যর্থনায় 'বসুন' বলে ওদের বসিয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। তারপর মমতার মা ডেকে আলাপ করিয়ে দিলে দু'-দু'টো বিয়ের কথা শুনে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করেছিল মঞ্জুকে— 'আপনার নয় কেন? ভাল দিন নেই আর কাছে?' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল ও, 'ভালো পাত্র নেই কাছে।' ওর জবাব শুনে নীলের দৃষ্টি হঠাৎ যেন ওর সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিল। ওর মুখের ওপর চোখের অনুসন্ধানী আলো ফেলেছিল সে। মঞ্জু জানে না নীল কি দেখেছিল। কিন্তু মঞ্জু নীলকে সেই আলোতেই দেখে নিয়েছিল।

কাঁচা পথে এসে পড়তেই রাস্তার বাতি সব একসঙ্গে জ্বলে উঠল। বোঝা গেল মেঘ যতই সন্ধ্যাকে আগবাড়িয়ে নিয়ে আসুক, সন্ধ্যা নামল সবেমাত্র এই।

এই বাদল-সন্ধ্যা, এই ভিজে-হাওয়া, এই তুষার-সদৃশ বৃষ্টি ঝোপ-ঝাড় কাঁচা পথে রিক্সার টুং-টুং সঙ্গীত— সব কিছু এতো ভালো লাগছিল যে, গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল মঞ্জুর। প্রকৃতি যেন ওর ভেতরের আনন্দের সঙ্গে সমতালে ওকে ভালো লাগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ তার আয়োজন নিয়ে।

ওর আনন্দের সব চাইতে বড় কারণ ও আজ জয়ী। জয়া ভালো হয়ে গেছে। জয়ার মন সুস্থ হয়ে উঠছে। জয়ার বিশ্বাস ও মরেই গিয়েছিল। একবিন্দু রক্তও দেহে আর অবশিষ্ট ছিলনা। ওকে বাঁচিয়েছে মঞ্জু-মমতা-

মৌরীরা তাদের রক্ত দিয়ে। প্রথম প্রথম আকুল হয়ে এই একই প্রশ্ন সে ওদের বার বার করেছে, মমতা, তুমি রক্ত দিয়েছ? মঞ্জু কে কে রক্ত দিল রে আরো? তোর দিদি-বৌদিরা? ওদের সবার রক্ত ওর ধমনীতে— জয়ার উপর এই কথার আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষ্য করে প্রথমে ওরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর জয়ার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা শুরু করেছে এই পথে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একই কথা ওরা নানা ভাবে শোনাব জয়াকে। ডান হাতের পাঁচ আঙ্গুল ঢুকিয়ে বুকের উপর দু'হাত রেখে চোখ বুজে থাকে জয়া। যেন নিঃশব্দে অভাবিত সুখ উপভোগ করে।

জয়ার এই সুখ, জয়ার এই নিরাময় মনের আর শরীরের, মঞ্জুর কাছে এ কেবল একটি মেয়ের সুখই নয়, বাঁচাই নয়। ওর শক্তির জয়, ওর ব্রতের জয়। জয়া আত্মহত্যা করে ওকে যেন হারিয়ে দিতে বসেছিল।

আর মঞ্জুর আনন্দের কারণ, যে সব ঘটনা ওদের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে ফুরিয়ে গিয়েছিল। পর্দার ছবির মতো যার নায়ক-নায়িকারা ঘটনার শেষের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে। কিন্তু হারানোর ব্যথা রেখে গিয়েছিল হৃদয়ে— আবার তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছে। তারা জীবনে ফিরে আসছে। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু, বাড়ীতে ডাক পড়বেই সজ্জাকারের। যে সামিয়ানা নামিয়ে তা তুলে ফেলতে হয়েছিল গাড়ীতে, আবার তা নামবে এসে বাড়ীতে। পুলকে বাবা ধরাখানাকে হাতের মুঠোর সরার মতো দেখবেন। বাসরঘরে বসেও দূর লক্ষ্যে মৌরীর দিকে তাকিয়ে থাকবে সুদর্শন—নীরবে সিগারেট খেয়ে চলবে সে। রমণীর রমণীয় সৌন্দর্য্য দূরে বসে সম্ভোগ করবে না বিজয়গৌরব উপভোগ করবে বসে সে— মঞ্জু জানে না। কিন্তু এক একজন ব্যক্তিকে দিয়ে যেমন এক-একটি কাজ কিছুতেই ভাবা যায় না, তেমনি সুদর্শনকে দিয়েও মঞ্জু কিছুতেই ভাবতে পারে না, দূরে বসে দূর নিরীক্ষণে মৌরীকে দেখতে দেখতে গোটাকয় সিগারেট নিঃশব্দে শেষ না করেই মৌরীর কাছে সাদর সম্ভাষণ নিয়ে এগিয়ে এসেছে সুদর্শন।

কিন্তু না, মমতাকে মঞ্জু বাসুদেবের পাশে কল্পনা করছে না। ইচ্ছে করে নয়, আজ আর এ কল্পনা সে করতেই পারে না। মমতাকে হাসপাতালে তার কর্মক্ষেত্রের মধ্যে যদি মঞ্জুর দেখবার সৌভাগ্য না হতো তবে ঘটনাটা নিয়ে মনস্তাপ মঞ্জুর থাকতো। কিন্তু আজ নেই— একেবারেই নেই। সাদা পোষাক পরিহিত— সাদা মস্তকাবরণ -আবৃত মমতা। রোগীদের শয্যাপার্শ্বে ঘুরছে। এর শিয়রে, তার পায়ের কাছে, ওর পাশে দাঁড়াচ্ছে। চলতে চলতে থেমে পড়ে রোগীর মুখটা লক্ষ্য করছে। শিয়রে ঝোলানো রোগীর অবস্থা লেখা বোর্ডটা হাতে নিয়ে পড়ছে। টান হাঁটা দিচ্ছে বড় ডাক্তারের উদ্দেশে— এ রূপ আশ্চর্য্য। এ রূপ অতুলনীয়। এই সেবা—না ঐ 'সেবা' শব্দ আর নয়। খাদ্য এলার্জির মতো মঞ্জুর শব্দ এলার্জি হয়েছে। ঐ 'সেবা' কথাটা শুনলেই শরীরে মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটে ওর। সে ক্রিয়াটা যে কি হয় বোঝাতে পারবে না। নিজেও বোঝে না। অস্থৈর্য? চাঞ্চল্য? অস্থিরতা? কি জানি। বোঝাতে পারে না ও।

ওর ধারণা, 'সেবা' শব্দটা ক্রমবিবর্তনের পথে। তার আভিধানিক অর্থ বদলে যাচ্ছে। তার রূপান্তর ঘটছে অমাত্যের স্বৈরাচারের সাঁজোয়ায়, ধনীর ভুয়া বিনয়ের মুখোশে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বাস করে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়ীতে ভ্রমণ করতে করতে এঁরা প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা (কি জানে আরো কত কত?) বিজ্ঞাপন ছড়ান—'আপনাদের সেবা করতে সাহায্য করুন।' অর্থাৎ জিনিষের চারগুণ দাম এবং এই বিজ্ঞাপনের টাকা গুণে দিন। আপনাকে আরো নিঃস্ব আর আমাকে আরো ধনী হতে আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। আর সৌজন্যের বেলায় কাজ করে বর্মের— লৌহবর্মের চাইতেও প্রচণ্ড যার রোধশক্তি। অস্ত্রে বেঁধেনা নয়, ও শব্দের শস্ত্র বুকে এঁটে রাখলে কেউ অস্ত্র নিক্ষেপ করে না।

পাড়াটার ভেতর ঢোকার পর থেকেই কেমন যেন লণ্ডভণ্ড, তছনছ দেখাচ্ছিল পল্লীটাকে। সবাই যেন বাইরে। কথা বলছে। জটলা করছে। দাঁড়িয়ে আছে। ছত্রাকার জিনিষপত্র, ছেলেতে, মেয়েতে বুড়োতে মিলে কুড়িয়ে ঘরে তুলছে।

মনের ভেতর এতো ছবি, এতো কথা নিয়ে চলছিল মঞ্জু যে, চোখের দেখাটা রিক্সার গতির সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, সরে যাচ্ছিল মন থেকে। দেখছিল। বুঝছিল না। নীলের দরজায় নেমে এতক্ষণে চোখের উপর ভেসে-যাওয়া দৃশ্য স্পষ্ট হলো। বাড়ীটা যেন সমগ্র সামগ্রীর একটা নিদর্শন হয়ে পড়ে আছে। হাঁড়ি-কলসী বাসনপত্র টেনে ছুঁড়ে ফেলা। চাল ডাল ছড়িয়ে আছে স্যাঁতসেঁতে কেঁচোয়-তোলা ভিজে মাটির মধ্যে এ াকার হয়ে।

বিস্মিতভাবে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের দিকে তাকলো মঞ্জু। দেখল দু' কনুই টেবিলে রেখে, দু'করতলে মাথা চেপে ধরে চেয়ারে বসে আছে নীল। ভাড়া চুকিয়ে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল মঞ্জু। কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলো— কি হয়েছে?

আশ্চর্য্য হলেও ধীর ভাবেই হাত নামালো নীল মাথা থেকে। প্রতিপ্রশ্ন করলো সে— কি ব্যাপার— এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে?

—আমার দিকে ব্যাপার কিছু নেই। ইচ্ছে করলো। এলাম। কিন্তু আপনাদের এখানের ব্যাপারটা কি? আপনাদের সবার ঘরের জিনিষ বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কে?

হাতের ব্যাগ চৌকির ওপর নামিয়ে রেখে নীলের বিছানার উপর বসল মঞ্জু। কিন্তু যেখানটায় বসল, সেখানটায় চালচোয়ানো জল পড়ে একেবারে ভিজে আছে। একটু সরে বসতে বসতে তার দিকে তাকিয়ে-থাকা অন্যমনস্ক নীলের দিকে তাকিয়ে ফের জিজ্ঞাসা করল সে— হয়েছে কি?

নীল তবু একটু সময় চুপ করে রইল। যেন যে ভাবনাটা ভাবছিল সে, সেটাকে সরিয়ে রাখতে সময় লাগল। তারপর মুখ খুলতে যেতেই, কে যেন বাইরে থেকে হেঁকে উঠল, ওহে নীল, তোমার জিনিষপত্র সব যে বাইরে পড়ে রইল। ঘরে তোল। বলতো তোমার মাসিমাকে পাঠিয়ে দি। দেবো?

ঘর থেকে তেমনি হেঁকে জবাব দিল নীল, দরকার নেই। নষ্ট হবার মতো কিছু নেই। আমি তুলছি পরে।

॥ ৩৩ ॥

এ সব ছত্রাকার জিনিষের ভেতর নষ্ট হবার মতো কিছু নেই। পরে সব ঘরে তুলছে সে—নীলের এই জবাব শুনে বাইরের কণ্ঠস্বর বাখারির সীমানা-বেড়ার উপর দিয়ে গলা বাড়ালো, —না, না নীল, জিনিষগুলো ঘরে তোল তুমি এ সবের প্রয়োজন বুঝবে না। কিন্তু তোমার মার কাছে এর একটা হাঁড়ি শিশিও দরকারী। খুব জোর বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। এখন না তুললে যাবে কিন্তু সব নষ্ট হয়ে।

অগত্যা উঠে গিয়ে নীলকে বলতেই হলো— আচ্ছা তুলছি আমি।

মঞ্জু উঠে দাঁড়ালো— চলুন আমি আপনাকে সাহায্য করি।

—আপনি বসুন। ফের ঘরে এসে ঢুকল নীল। বললো— আমি এখন ওসব তুলতে যাচ্ছি নাকি।

—আচ্ছা, আপনারই বা দরকারটা কি? আমিই তো তুলে রেখে আসতে পারি— না?

—আরে পাগল নাকি! বসুন আপনি। আছে কি বলুন। কতগুলো হাঁড়ি-কুঁড়ি-টিন এই তো। মা চলে যাবার পর ওগুলোর মুখও খোলা হয়নি। ভেতরে কিছু থাকবার কথা নয়। হয় তো নেই-ও। থাকলেও আজ আর তা খাবার যোগ্য নেই। বৃষ্টি আসে তো ধোয়া হয়ে থাকবে। মমতা এসে যদি মনে করে ওগুলো অপরিহার্য তো ঘরে তুলবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। বসুন।

বসল মঞ্জু। বললো— বেশ। তবে শুনি এখন হয়েছেটা কি? কে বা কারা আপনাদের গোটা পাড়াটার সংসার এমন করে বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে গেল?

ঘরের ভেতর হাঁটাহাঁটি করতে করতে কথা বলা, কথা শোনা, ভাবা এ অভ্যেসটা রজতের। নীলের নয়। কিন্তু মঞ্জু দেখলো, আজ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে তিন হাত ঘরটুকুরই এদিক ওদিক বারকয় হাঁটাহাঁটি করলে নীল। তারপর যে চেয়ারটার বসে টেবিলের উপর কনুই আর দু'হাতের তালুতে মাথা চেপে বসেছিল, সেটায় না বসে এসে বসল সে মঞ্জুর কাছের চৌকির সঙ্গে লাগানো বেতের চেয়ারে। বসেই আবার উঠল। সিগারেট আর দেশলাইটা নিয়ে এলো টেবিল থেকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে দেশলাই আর প্যাকেটটা একটু ছুঁড়ে দেওয়া ভাবে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বললো— জবর-দখল কলোনী কাকে বলে নিশ্চয়ই জানেন?

—জানি।

—এটা হলো সেই জবর-দখল কলোনী। অনাবাদী পতিত জমি তার সাপখোপ জঙ্গল নিয়ে পড়েছিল মনুষ্য বসতি থেকে বহু দূরে। একদল রাজনৈতিক-বলির মানুষ এলো। আশ্রয় নিল। জঙ্গল কাটলো। বন পরিষ্কার করলো। দরমা-মাটি-টিন-বাঁশের চালা তুলে ঘর বানালো। ঘর—একটা দুঃখের তির্যক রেখা গালের ওপর হাসির টানে টেনে নিলে নীল—ঘর, কিছুই নয়, তবু একটা আশ্রয়। জীবন-যাত্রার একটুকরো নিশ্চিন্ততা। আড়ালে বসে উপোষ করবার আর মৃত্যু এলে রূঢ় রাস্তার উপর না মরে একটু নির্জনে নিঃশব্দে চোখের পাতা দুটি বুজবার একবিন্দু মর্যাদা— এই তো। হঠাৎ রাশ টেনে আবেগ সংযত করলে নীল। একেবারে বাস্তব কণ্ঠে বললো— তা

জমির মালিক ইচ্ছে করলে প্রথমেই হয়ত কথা দিতে পারতো। কিন্তু দেয়নি। পড়ো জমি, পড়ে আছে। আরো বহুকাল ধরে পড়ে থাকবে। তার চাইতে মানুষ আসুক। বাড়ি গড়ে উঠুক। জমি যাবে কোথায় যতক্ষণ পূর্বপুরুষের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কেনা পঞ্চাশ বিঘে জমির দলিলটি মুঠোয় রয়েছে।

হাতের সিগারেটটা ঘরে ফেললেও ক্ষতি ছিল না। আরো ক'য়টা সিগারেটের টুকরো মেঝের ওপর ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে। দরজা খোলা ছিল বলেই বোধ হয় বাইরের দিকেই এবার সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলল নীল। বললো—অবশ্যি মালিক ব্যক্তিটি জানেন, খুব সহজে সুবিধে করে ওঠা যাবে না। তাই পথ বেছে নিয়েছেন অতর্কিতে হামলা করে তছনছ করে দিয়ে যাওয়ার। আমাদের শক্তি হবে না লড়াই করবার, না লাঠির দ্বারা, না আইনের দরজায় অর্থের দ্বারা।

মঞ্জু বসে রইল।

নীল উঠে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। নীরবে কতটুকু সময় পায়চারি করলো। তারপর এক সময় বলে উঠল— গিয়েছিলাম ভদ্রলোকের কাছে। কিন্তু এক মারোয়াড়ী জমির টাকা নিয়ে বসে আছে। সে এখানে রং-এর কল বসাবে। ভদ্রলোকটিরও আশু টাকার প্রয়োজন। কংগ্রেস নমিনেশন পেয়েছেন। সামনের ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন—

—ও, সেবার জন্য তৈরী হচ্ছে ন—বুঝি বলতে যাচ্ছিল মঞ্জু। প্রথম মুখ খুলতে যাচ্ছিল মঞ্জু কিন্তু খুললো না সে। 'সেবা' শব্দটা উচ্চারণ করতেও আজকাল ওর ঘৃণা হয়— হ্যাঁ, ঘৃণা হয় মঞ্জুর। শুধু উচ্চারণ করতে নয়— শুনলেও দুকানে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছে করে ওর। মঞ্জুর মনে হয়, 'সেবা' কথাটা যদি আজ হারিয়ে যায় তবে, দেশটা বিনির মতো কেঁদে উঠবে "হারিয়ে গেছি আমি" বলে।

মাটির দিকে চোখ রেখে পায়চারি করতে করতে নীল যেন নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগল— এখন কথা হলো, মানুষগুলোকে নিয়ে যাই কোথায়! ষ্টেশনে, বেতিয়ায়, বিহার, দণ্ডকারণ্যে— কোথায়?

—নীল আছো নাকি হে? ডাক এলো বাইরে থেকে। নীল সাড়া দিলে তারা দরমার দরজা ঠেলে এসে ভেতরে ঢুকে উঠোনে দাঁড়ালো। এখন কি করা কর্তব্য—পরামর্শ করতে এসেছে তারা নীলের সঙ্গে।

মঞ্জুকে একটু বসতে বলে উঠোনে নেমে এলো নীল। যেমন বসেছিল তেমনি দু'হাত কোলের উপর রেখে টান হয়ে বসে রইল মঞ্জু। যেন ছবি তুলতে বসেছে সে।

ঘরের আলোটা যে ক' জনার মুখের ওপর এসে পড়েছে, তাদের দিকে তাকিয়ে রইল মঞ্জু। উদ্বিগ্ন কাতর শঙ্কায় ভরপুর কতগুলো মুখ— দেখছ তো নীল দেশের ব্যাপার? দিনে ডেকে নিয়ে, রাতে পাগলা কুকুর লে- হাতি ছেড়ে দিচ্ছে। ঘরে দিচ্ছে আগুন লাগিয়ে। কে ভেবেছিল এমন অবস্থা হবে বলো? তবে কি....এ অবস্থায় ষ্টেশনে...কিন্তু কথা হলো তোমার মা মাসিমারা...ষ্টেশনের ঐ— বাদলা-বাতাস তাদের গায় জড়ানো কোচার খুঁট, মাথার চুল উড়িয়ে বয়ে যেতে লাগল। শাঁখের একটা দীর্ঘ টানা শব্দ উঠে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। নীলেদের বাড়ীর সামনে টিউবওয়েলটায় ঘটাং ঘটাং শব্দ উঠতে লাগল জল তোলার। আসবার পথে যে মেয়ে-বৌদের হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করে কলের জল পাম্প করতে দেখে এসেছিল তাদের জল তোলা এখনও চলছে। আজ হাঙ্গামার জন্য হয়তো কারুরই সন্ধ্যায় জল তোলা সম্ভব হয়নি।

যে মেঘটার কথা বলে এই কিছুক্ষণ পূর্বে নীলকে বৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করে কে যেন জিনিষপত্রগুলো ঘরে তুলতে বলে গিয়েছিল, সেই মেঘটা এখন আকাশ কালো করে গুমোট বেঁধে রয়েছে কিনা মঞ্জু জানেনা। নীলের ঘরের দরজা এমন উঁচু নয় যে আকাশ দেখা যাবে। মেঘ থেকে থাকলেও বৃষ্টি নামেনি। আকাশ ভরা বৃষ্টি যে কোন মুহূর্তে মাথায় নেমে আসার কথা ভাবছেও না কিন্তু এরা। এখানে তো নীলের ঘর রয়েছে, দাওয়া রয়েছে। মাঠের উপর থাকলেও বোধহয় ভাবতো না। গিয়ে আশ্রয় নিত গাছের তলায়। পাতাগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করতো এদের মাথাগুলো বাঁচাতে। কিন্তু পারতো না।

এই যে কোচার খুঁট গায়ে তুলে দিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া চোয়ালে, বিধ্বস্ত চেহারায় যারা দাঁড়িয়ে আছে, ব্যক্তি হিসাবে মঞ্জুর এঁরা কেউ চেনা নয়। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে সবাই ওর চেনা, জানা, দেখা। পূব বাংলার মেয়ে সে। এঁরা অপরিচিত হবে ওর কাছে কি করে। ঐ যে জল তুলছে মেয়েরা টিউবওয়েলে ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে, ও

তাদের দেখেছে নদীর জলে কলসী ডুবিয়ে জল তুলতে! ভরা জল ছলছলিয়ে ঘরে ফিরতে। ভরা পদ্মার টানে ভরা কলসী উপুড় করে ফের জলকে আনতে যেতে।

পদ্মা— পাড়াপাড় লীন পদ্মা তার ঢেউ, তার উত্তাল জলরাশি নিয়ে ছুটে চলেছে সমুদ্রসঙ্গমে। ঘূর্ণিজল মস্ত মস্ত ঘূর্ণি সৃষ্টি করে, পাক খেতে খেতে ছুটে চলেছে যেন কোন অতল পানে। লম্বা লম্বা জেলে নৌকো জাল ফেলছে। মাছ ধরছে? ইলশে মাছ ধরা জালের ছোট ছোট বাঁশের খুঁটি ঢেউ এর দোলায় ডুবছে ভাসছে। রূপালী রোদ চিক্‌চিক্ করছে নদীর বুকে রূপার ঢেউ তুলে। পাড় ভেঙ্গে পড়ার শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে ঝপ্ ঝপ্। গ্রামান্তরের নৌকো এসে লাগছে পাড়ে। সতর্ক মাঝি নৌকো বাঁধছে সাবধানে! ছেলেরা নৌকো থেকে লাফিয়ে পাড়ে নামে— মেয়েদের নামাচ্ছে হাত ধরে ধরে—

কুশল জিজ্ঞাসা করতে করতে, সংবাদ দিতে আর নিতে নিতে, এর বাড়ীর উঠোন, তার বাড়ীর পুকুর পাড়ে, ওর বাড়ীর ধানের গোলার পাশ দিয়ে যেতে দেখেছে মঞ্জু যাদের এরাই তো তারা। মঞ্জুর অচেনা হবে কি করে এরা। আজ তাদের সেই বাড়ীঘর, জোত জমি, বাগান পুকুর কোথায় গেল? এরা নিঃস্ব হল কেন। এক টুকরো জমি, এক কলসী জলের জন্য এরা মেয়ে-পুরুষরা বিভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছে কেন?...দেখছ তো ব্যাপার স্যাপার, দিনে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে; রাতে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে— আর তারপর লোকগুলোর উর্দ্ধশ্বাস দৌড়ের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছে, ঐ দেখো ঘরমুখো বাঙ্গালী। ছুটছে ঘরের দিকে। আমরা কি করবো।

সবাই চলে গেল নীল এসে ঘরে ঢুকল। দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বললো, মাথাটা জমাট বেঁধে আছে। একটু চা না হলে চলছে না। চলুন কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক।

নীরবে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু।

দরজায় তালা দিতে দিতে নীল হাসল। বললো, জানি নেওয়ার মতো কিছুই নেই তবু তালা না দিয়ে শান্তি নেই—সত্যি মানুষ একটা অদ্ভুত সৃষ্টি।

দরজায় তালা ঝুলিয়ে পেছন ফিরে দেখল মঞ্জু উঠোনের ছড়িয়ে থাকা টিন কৌটো তুলে তুলে বুক হাতে জড়ো করছে।

— এ কি করছেন!

— জিনিষগুলো তুলে রেখে যাই। একটা ছড়ানো সংসারের ওপর দিয়ে কি কোন মেয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে?

নীল এগিয়ে এলো আরো কাছে।—আচ্ছা, আপনিই বলুন, এগুলো এখন তোলার মানে হয় কোন? যারা টেনে ফেলে দিয়ে গেছে, তারাও দু আঙ্গুলের বেশী চার আঙ্গুলে ধরার—সম্মান দেয়নি। টিনগুলোর গড়িয়ে পড়া মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে উঠোনময় ছোটাছুটি করেছে যত আরশোলা—আমার যা কষ্ট হয়েছে সে ওই আশ্রয়চ্যুত আরশোলাগুলোর জন্য। নইলে ঘর দোর—পরিষ্কার হয়ে তো আমি রক্ষা পেয়েছি।

তবু মঞ্জু বললো— ঐ দাওয়ার উপর রেখে যাই?

—আপনি কিন্তু আমার আত্মসম্মানে আঘাত করছেন। আপনি রাখুন— বলে মঞ্জুর রাখার অপেক্ষা করলে না। নিজেই নীল তার হাত থেকে কৌটোগুলো নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠোনের ওপর তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে দিয়ে বললে, নিন মুছুন হাতটা। ইস্; দেখুন তো শাড়িটার কি হাল করেছেন।

মঞ্জু হাত দিয়ে কাপড়টা ঝাড়লে। বেরিয়ে আসতে আসতে একবার আকাশের দিকে তাকাল। তেমনি কালো— মেঘে ঢাকা আকাশ। মাটি ভিজে আরো এক আধবার গুঁড়ো বৃষ্টি বোধহয়— ঝরে গেছে। দুজনে নীরবে পথ চলতে লাগল। রাস্তার বাতির ব্যাসের তলাটুকুতে একটু উজ্জ্বল আলো। তারপর সেই আলো তরল হতে হতে কিছু দূরে মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে। আবার কতটুকু ব্যবধানে আবার একটি আলো। তার তলার ব্যাসটুকু তেমনি আলোকিত। তারপর সেই আলো আমার তেমনি তরল হতে হতে অন্ধকারে ফের মিশে গেছে। দুজনে মাথার উপর আকাশ ভরা মেঘ, পায়ের তলায় কাঁচারাস্তার জল কাদা মাটি আর এই আলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। যে নীলকে দেখে সেই থেমে পড়ে। ভীত অসহায় চোখে তাকায় তার

মুখের দিকে। জিজ্ঞসা করে, এখন কি করা যায়, মারোয়াড়ী যে টাকা দিতে চাচ্ছে, তার কিছু কম মজুত ওরা যদি ধরে দেয় তবে ও মালিক জমি তাদেরই দিয়ে দেবে। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারা। সে কথা আর ভেবে কি হবে?

তবে অন্যত্র গিয়ে —ক্ষেপা হাতির পায়ের তলায় পিষে মরতে হবে— নয়তো আগুনে পুড়ে। এখানেই থাকার একটা কোন উপায় যেন বের করে নীল।

বাজারের ওপরের চায়ের দোকানটায় ঢুকে দুটো চেয়ার টেনে বসল ওরা। চায়ের অর্ডার দিলে নীল। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে— কথা হচ্ছে কি— জানেন, মানুষগুলো মানে আমরা বোধ হয় মরেই গেছি। দেশই বলুন আর ব্যক্তিই বলুন, মরে না গেলে কি কেউ পড়ে পড়ে এমন মার খায়, না এতো পর্বত-প্রমাণ ধৃষ্টতা সহ্য করে।

—না, মার খাওয়া ছাড়াও অন্য কারণ থাকতে পারে।

— যেমন?

— যেমন ধরুন, গ্রামে ডাকাত পড়েছে। গ্রামের লোকে ঘুমে অচৈতন্য। ডাকাত দল গ্রামের সব ধনরত্ন লুঠে নিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। এমনি সময় এক গৃহস্থ সবার আগে জেগে উঠলো। ডাকাতদের হাত থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে আনবার জন্য, তাদের বিতাড়িত করবার জন্য সংগ্রাম করলো এবং সব চাইতে বেশী মূল্য দিল— সংগ্রাম শেষে সেই গৃহস্থের সাময়িক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যদি গ্রামের লোকেরা তাকে নিষ্ঠুর আঘাতে মেরে ফেলতে চায়। ছলে বলে কৌশলে ঠকায়, বঞ্চনা করে, প্রতারিত করে— তখনকার মতো তার নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি? অক্ষমের মার দুর্বল মুহূর্তের জন্যই তোলা থাকে। এবং সে মার বীরকেও এক এক সময় সহ্য করতে হয়।

নীল তাকিয়ে রইল মঞ্জুর মুখের দিকে।

মঞ্জু কয়েক ঢোক চা খেয়ে নিয়ে বললো— কিন্তু এ মার খাওয়া কখনোই চিরকালের জন্য হতে পারে না। বড় জোর গৃহস্থের স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার কালটুকু পর্যন্ত। তবে হাঁ, যদি গৃহস্থের শক্তি ফিরে পাওয়ার ভয়ে মাথাটা তার ধড় থেকে আগেই কেটে ফেলা যায় অর্থাৎ যে জন্য সেই চেষ্টাই করছে সবাই মিলে— এবং যার জন্য তার ওপর কোপের ওপর কোপ; ছুরির পর ছুরি চালানো হচ্ছে তবে অবশ্যি ভিন্ন কথা। একটু থামল মঞ্জু। তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর বললো কিন্তু শক্তিমানকে নিঃশক্তি করে ফেলাকেই যারা নিজেদের অধিকার বজায় রাখার একমাত্র উপায় মনে করে— নিজেদের শক্তির ওপর এই যাদের শ্রদ্ধা, তারা কি শুধু আপাত অধিকার বলে পারে একটা গোটা জাতকে মেরে ফেলতে? তাও পেছন থেকে ছুরি চালিয়ে? অসম্ভব।

একটা দমকা জলো বাতাস এসে ঢুকলো ঘরে। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটা উড়ে গিয়ে পড়ল একটি লোক— বোধ হয় এই বাজারেরই কোন দোকানদার হবে তার চায়ের কাপের ওপর। কাপটা উল্টে চা নিয়ে গড়িয়ে পড়লো লোকটির কাপড়ে! দোকানের ঠাণ্ডা চা—শরীর পুড়ল না। জামাকাপড় নষ্ট করে দিলে। উঠে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় ঝাড়তে লাগল লোকটি— বললো, গেল তো পণ্ডিতমশাই গরিবের ছ'টা পয়সা জলে।

যে ছোকরা ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে টেবিলের চা মুছে নিচ্ছিল তাকে ষ্টলের ম্যানেজার পণ্ডিতমশাই আদেশ করলো, বিশ্বনাথকে এক কাপ চা আর এক পিস কেক— তোমাকে দাম দিতে হবে না বিশ্বনাথ, আমি খাওয়াচ্ছি তোমাকে। বিগলিত মুখে লোকটি ফের বসে পড়ে পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করলো— তা, পণ্ডিতমশাই সেদিন আপনার ইস্ত্রী এসেছিলেন এখানে? ওরা সবাই বললো খুব সোন্দর নাকি দেখতে?

পণ্ডিতমশাই-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। — কে-কে বললো হে? নরেন্দ্র দেখেছে? হ্যাঁ, কমলার চেহারাটা— চোখটা আড় করে পণ্ডিতমশাই মঞ্জু আর নীলের দিকে এক পলক তাকালো। তার স্ত্রী যে রূপসী সে কথাটা ওরা শুনছে কিনা সেটাই বোধহয় দেখলে—

মঞ্জু আর নীল আরো এক কাপ চা খেয়ে উঠে পড়লো। বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে।

— কি করে যাবেন?

একটু ভাবলো মঞ্জু। তারপর বললো, এ বৃষ্টি থামবে না শীগগির। বরং আরো জোরে আসবে। ঐ তো

বাস ষ্ট্যাণ্ড— আমার কষ্ট হবে না। আপনারই বাড়ী ফিরতে হবে অনেক পথ ভিজে।

কিন্তু পথে নেমে ক'য়েক পা যেতেই একটা খালি ট্যাক্সি দেখে হাত তুলে থামালো মঞ্জু। দরজা খুলে নিজে উঠে বসে, নীলকে ডাকলো—আসুন।

গাড়ীতে উঠে বসল নীলও। রুমাল দিয়ে ভিজে হাত মুখ মুছতে মুছতে বললো— উঠলাম তো। তারপর? আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো?

—আমাকে পৌঁছে দিতে হয় না।

— তবে আপনি আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছেন?

— না।

—তবে?

—চলুন তো।

—কোথায়—দিল্লী নয়তো?

—কেমন হয় গেলে?

॥ ৩৪ ॥

নীল হেসে বললো— মন্দ হয় কি।

ড্রাইভার জানতে চাইলে কোথায় যেতে হবে।

মঞ্জু বললো —ষ্ট্রাণ্ড রোডে— গঙ্গার ধারে।

হর্ণ দিতে দিতে আর পিছু চলতে চলতে একটা ফাঁকা জায়গায় শরীর ঘুরিয়ে নিয়ে গাড়ী শহরের পথ ধরলে। মঞ্জু এমন দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল যেন সে গভীরভাবে দিল্লী যাবার কথাটাই চিন্তা করছে।

নীল গাড়ীর গদীতে পিঠ রেখে আরাম করে বসে বললো, বাঁচালেন। আপাততঃ দিল্লী ছোটার চাইতে, গঙ্গার ধার দিয়ে ছোটা অনেক বেশী কাজের হবে।

মঞ্জু একটু হাসলো।

চুলগুলো দুহাতে মুঠো করে ধরে মাথাটায় কষে একটা ঝাঁকুনি দিলো নীল— ছাদচাপা ঘরে বসে থেকে থেকে বুদ্ধিও যেন কেমন চাপ্টা খেয়ে গেছে। দেখা যাক, এবার খোলা হাওয়ায় ছুটে কিছু সচল হয় কিনা। কোন হদিস পাই কিনা। আপনিও ভাবুন।

বাইরের দিকে চোখ রেখেই জবাব দিল মঞ্জু—আমি ভেবে কি করবো। আমার ভাবায় কি এগুবে বলুন?

—কারু ভাবায়ই কিছু এগুবে না। না আপনার। না আমার। না আর কারু। সমস্ত চিন্তা-জগৎ থেমে পড়েছে।

— কার কাছে। নীলের দিকে চোখ ফেরালো মঞ্জু।

—দুর্জনের কাছে? দুর্বুদ্ধির কাছে। পাহাড় উড়িয়ে পথ তৈরী করলে তবেই চলার কাজ আরম্ভ করা যায়। এই দুর্জন আর দুর্বুদ্ধির পাহাড়ও যতক্ষণ না উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে, ততদিন বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞানের চলার পথ নেই— এগুবার উপায় নেই।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরালো নীল। দেশলাই-এর কাঠিটা গাড়ীর গায়ে লাগানো ছাইদানে ফেলে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। বাইরে জোর বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ীর কাচের শার্সি বন্ধ। ধোঁয়াটা বেরুবার পথ করতে না পেরে গাড়ীর ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। নীল সেটা লক্ষ্য করে বললো—আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

মঞ্জু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে— কিসের জন্য?

— বন্ধ গাড়ী। ধোঁয়াটা বেরুতে পারছে না।

— ও! না।

কিন্তু আরও দু-একবার ধোঁয়া ছাড়ার পর গাড়ীর ভেতরকার ধোঁয়াটে ভাবটা দেখে, হাতল ঘুরিয়ে কাচের শার্সি নামিয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিল নীল। তারপর ফের কাচটা তুলে দিতে দিতে বললো, কাল আমাদের

একটা মিটিং আছে— মিটিং মানে বক্তৃতা টক্তিতা কিছু নয়। সবাই মিলে একত্র হয়ে পরামর্শ করা কি করা যায় আর না যায়। আপনি আসুন না?

— কখন?

—এই বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায়।

— আসবো।

দোকান-বাজার-হাট, কর্দমাক্ত পথ, কাঁচা ড্রেন ডোবা পুকুর পেরিয়ে গাড়ী শহরের পথও পার হয়ে এসে স্ট্রাণ্ড রোডে পড়লো। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়েছে। ড্রাইভারের সামনের কাচের উপরকার কম্পাসের কাঁটার মতো কাঁটাটা অনবরত এদিক আর ওদিক করে করে কাচের গায়ের জল মুছে চলেছে। তবু ভারি বৃষ্টিতে ঝাপসা পথঘাট দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গাকে চেনা যাচ্ছে না। তার বুকের উপর নোঙর বাঁধা ষ্টীমার, নৌকো, বোটের আলোগুলোকে দেখাচ্ছে অন্ধকারের বুকে ইতস্তত ফুটে থাকা আলোর মতো। বৃষ্টি-ঝাপসা পথে সতর্ক হাতে গাড়ী চালাচ্ছে ড্রাইভার। মাঝে মাঝে এমনি সতর্ক হাতে চালানো গাড়ী ট্যাক্সি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে হেড লাইটের আলো ফেলে ফেলে। বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে গাড়ীর মধ্যে। কৃষ্ণের ফটোর গলায় ঝোলানো বেলকুঁড়ির মালা দুটো বাতাসে দুলছে। মঞ্জু আসন থেকে কিছুটা এগিয়ে এলো। মুখটা সামনে এনে দু'হাতে উড়ন্ত চুল চেপে ধরে বসে রইল। জল বাতাস হু হু করে বয়ে চললো ওর মুখের উপর দিয়ে। ঠাণ্ডায় জমে উঠল ওর মুখটা। যেমন বসেছিল তেমনি থেকেই বললো—আঃ বেশ লাগছে।

ওদের গাড়ী অন্য আর একটা গাড়ীকে পাশ কাটালো। পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ী টাল খেলো। মঞ্জু কাত হয়ে পড়তে পড়তে নীলের হাঁটু ধরে ফেলে টাল সামলালো।

নীল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলো। দু'বার দেয়াশলাই-এর কাঠির টানটা বাক্সের বাইরে পড়ল, তিন বারের-বার কাঠির বারুদের মুখ বাক্সের বারুদের ওপর রেখে শক্তহাতে টান মেরে দেশলাই জ্বালাল। সিগারেট ধরাল। কাঠিটা গাড়ীর গায়ের ছাইদানে ফেললো।

কৃষ্ণের ফটোর গলায় ঝোলানো বেলকুঁড়ির মালাটা বৃষ্টির ছাঁটে ছাঁটে এতক্ষণে ফুলে উঠেছে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ— কি মিষ্টি গন্ধটা! একটা মালা দিন না। ছেলেমানুষের মত হাত বাড়িয়ে একটা মালা চাইলো মঞ্জু ড্রাইভারের কাছে।

এ ভাবে কেউ বোধ হয় কোনো দিন ড্রাইভারের আরাধ্য দেবতার গলার মালা চায়নি। মঞ্জুর দিকে একবার তাকালো সে। বোধ হয় মনে মনে একটু হেসেই একটা মালা তুলে দিলো তার হাতে।

নাকের কাছে মালাটা মুঠো করে ধরে মস্ত একটা নিঃশ্বাস টানলো মঞ্জু—আঃ, দেখুন। মুঠোসুদ্ধ নীলের নাকের কাছে নিয়ে মালাটা ধরলো সে— দেখুন কি মিষ্টি গন্ধ।

গাড়ীর ঝাঁকুনীর সঙ্গে মঞ্জুর হাতটা নীলের ঠোঁট স্পর্শ করলে, বুকটা ধক্ ক'রে উঠলো মঞ্জুর। তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে এনে মালাটা খোঁপায় জড়াতে লাগলো সে। নীল সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে আসনের উপরে সোজা হয়ে বসলো! মালাটা খোঁপায় জড়িয়ে হঠাৎ লম্বা সোফায় মুখোমুখি হয়ে বসবার মত মঞ্জু নীলের দিকে ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করলো— আচ্ছা, আপনারা কেবল যাওয়ার কথাই ভাবছেন কেন? না যাওয়ার দিকটা ভাবা যায় না?

— তাই যদি ভাবা যাবে, তবে তো আর ভাববারই কিছু থাকে না?

— ভাবা যাচ্ছে না টাকার জন্যে তো?

— নিশ্চয়।

— টাকাটা সংগ্রহ করা যায় না?

— কি ভাবে?

— এই ধরুন, আপনাদের প্রতিটি ঘর থেকে জমির দাম হিসবে কিছু তোলা হ'লো তার পরেরটা যার।

এর জবাবে নীল যেভাবে কথাগুলো বললো তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল সে নিজেই এই পথটা নিয়ে অনেক চিন্তা করছে এবং এখনও ক'রছে। সে বললো— যদিও কিছুই দেবার শক্তি নেই আমাদের তবু ধরলাম, ধার করে, কর্জ করে, চেয়েচিন্তে এনে দিলাম আমরা এবং তাতে মোট টাকার সিকি অংশ উঠলো। অর্থাৎ আমরা

পঞ্চাশ ঘর মিলে 'শ' দুই করে দিয়ে, পঞ্চাশ হাজার টাকার দশ হাজার না হয় পনের হাজার টাকা যোগাড় করলাম। তারপর!

—নাঃ তারপর আর কিছু নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। যেন বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর বৃষ্টির জলের উপর দিয়ে গাড়ী চলার শব্দ ছাড়া যেন জগতে কোনো শব্দ নেই।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার মত ক'রে মঞ্জু বললো— ঐ যে ধারের কথা বলছিলাম? বর্ত্তমানের জন্যে ধার পাওয়া যায়না কোথাও?

—আমাদের বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতে কোনো তফাৎ নেই। এমন কি, এই পুরুষের ধার সামনের পুরুষ এসে শোধ করবে তেমন সম্ভাবনাও অন্ধকারে। তা শোধ না দিয়ে না হয় সুদই গোনা গেল যদি ধার পাওয়া যায়। কিন্তু আমার তেমন একজন ব্যক্তিও জানা নেই যার কাছে গিয়ে আমি এত টাকা ধার চাইতে পারি।

আবার মঞ্জু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নীলের ঘরে দু-হাত কোলের ওপর রেখে যেভাবে স্থির হয়ে বসেছিলো ঠিক সেই ভাবে দু-হাত কোলের ওপর রেখে স্থির হয়ে বসলো।

—একটা কাজ চাই। ওর মুখে একটা কাজ চাওয়ার কথা শুনে যেন কাজ শব্দটার অর্থ বুঝে উঠতে পারছে না, এমনি দৃষ্টিতে রজত তাকিয়েছিলো ওর মুখের দিকে।

—কাজ?

— হ্যাঁ কাজ। একটা কাজের ভীষণ দরকার আমার। একটা টাকা রোজগারের উপায় না করলেই চলছে না আমার।

রজত সোফায় বসে থেকেই পাশের দেরাজ খুলে একটা চেকবই আর কলম টেনে বের ক'রেছিলো। তারপর একটা টানা সই দিয়ে চেকটা বই থেকে টিপে টিপে লাইনে লাইনে ছিঁড়ে নিয়ে কাগজ চাপা দিয়ে রেখেছিলো মঞ্জুর সামনে। মঞ্জু বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো—এটা কি?

— চেক্। তোমার প্রয়োজন কত তা তো আমি জানিনে, অঙ্কটা তুমি বসিয়ে নিয়ো।

মঞ্জু পরিহাস ক'রেছিলো।

—আমার খুশীমত বসাব?

—নিশ্চয়।

—দশ, বিশ, ত্রিশ হাজার বসাব?

—বসাও।

ওর পরিহাসের জবাব দিয়েছিলো রজত বিনা পরিহাসে।

বাড়ীর রাস্তায় ট্যাক্সি ঢুকল না। রাস্তা তখন জলের তলায়। মোড়ের মাথায়ই নেমে পড়তে হ'লো মঞ্জুকে। নেমে পড়ছিলো নীলও। বাধা দিল মঞ্জু।

—আপনি নামছেন কেন?

—আপনাকে পৌঁছে দিতে।

—এই জলে নেমে কুড়ি হাত পথ আর পৌঁছে দিতে হবে না আমাকে। বলতে বলতে ব্যাগ খুলে একটা দশ টাকার নোট বের ক'রে বিনা দ্বিধায় মঞ্জু নীলের বুক-পকেটে ভ'রে দিলো সেটা। তারপর নিজে ড্রাইভারকে নির্দ্দেশ দিলো —বাবুকে পৌঁছে দাও।

আপত্তি করলে না নীল। জল-সাঁতার বাসে উঠে ভীড়ের চাপে দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে এখন যেন ইচ্ছে করছিল না তারও। চোখ বুজে একটা একটানা গতির ভেতরই বসে থাকতে ইচ্ছে করছিলো।

ভিজে জুতো হাতে, ভিজে শরীরে, পায়ের তলার ভিজে কাপড় ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে যখন ঘরে এসে দাঁড়ালো মঞ্জু, তখন ওর দিকে তাকিয়ে মৌরী বলে উঠলো—ধন্যি মেয়ে! এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে বাড়ী এসেও বেরিয়ে গেলি কেন?

— তোর জন্যে। দে টাকা দে। এসপ্লানেড আর বালীগঞ্জ, বালীগঞ্জ আর এস্প্লানেড—ট্রামে বসে কেবল চক্কর খেয়েছি। অনেক পয়সা গেছে।

—কে বলেছিলো তোকে?

—বলবে আবার কে? সুদর্শন বাবুকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করবার জন্যে আমি বদ্ধপরিকর। আচ্ছা কাপড় ছেড়ে এসে সুদর্শন-সংবাদ শুনছি। স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল মঞ্জু।

রাতের খাওয়ার টেবিলটার দিকে তাকিয়ে একটু সময় চুপ করে বসে রইল মঞ্জু। সুদর্শন সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়াটার ভেতর একটা খুশী এনে দিয়েছে— যেন তারই প্রমাণ এই খাওয়ার টেবিলটা। ঘিয়ে-ভাজা ভুনোখিচুড়ি মিষ্টিগন্ধ ছড়াচ্ছে, রামু গরম গরম ডিমভাজা মাছভাজা বেগুনী পরিবেশন করছে। কেউ না কেউ নীলের ঘরেও একথালা ভাত আর একটা কিছু তরকারী রেখেই গেছে। ক্ষুধার্ত্ত নীল উপুড় হয়ে নিশ্চয়ই তা গ্রাসে গ্রাসে মুখে তুলছে।

পরের দিন সকালবেলা মঞ্জু নীলের সেই কথাগুলোই কানে নিয়ে বসে চায়ের কাপে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছিল— কোথায় যাই লোকগুলোকে নিয়ে—বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, কোথায়?

উত্তেজিত অমিতা কাগজ হাতে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল ঘরে। মঞ্জুর হাতে কাগজটা ধরে দিয়ে কান্নাভাব গলায় বললো— দেখো কি হয়েছে আসামে! বড়দি তার বড় বড় মেয়েগুলোকে নিয়ে ওখানে। জানিনা কি হয়েছে, আমি মার কাছে যাই। তোমরা একটু রান্না-বান্নাটা দেখো। পাগলের মত বেরিয়ে গেল অমিতা।

মঞ্জু, মৌরী উপুড় হয়ে পড়লো কাগজের ওপর—

ঃ আসামে বাঙ্গালী-হত্যালীলা!—বাঙ্গালীর বাড়ীঘর আগুনে ভস্মীভূত— বাঙ্গালী নারীর ওপর অত্যাচার— আসামের প্র-শাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

খানিক বাদে পত্রিকা রেখে উঠে গেল মঞ্জু টেবিলের কাছে। কোলের উপর মেলে ধরলো তার উদ্ধৃতির খাতা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখ থামলো গিয়ে তার একটা উদ্ধৃতির ওপর। এই উদ্ধৃতিটা যে সে কতবার পড়লো তার অন্ত নেই।

গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্ত্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাঙ্গলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্ব্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়ঃনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে জালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণ দেহের রোগের মতো তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্যে সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টি সম্মুখে উর্দ্ধে তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে....

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ ক'রতে পারেনা। এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূলে ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ যতকিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্ব্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে, এই চাই। আপাত পরাভাবকে অস্বীকার করার যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকে দেখতে পাই বাঙ্গলা দেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখীন। এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের ওপর চড়েই

বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হোতে হবে।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব ''যদি'' কেন প্রকাশ করব সংশয়। মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচাতেই হবে। বাঙ্গালী অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না, ...সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙ্গালী মারের ওপর মাথা তুলবে।...

বাঙ্গলাদেশের ইচ্ছার মূর্ত্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙ্গালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্য্যস্ত করা সম্ভব কি না, এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করেনি, বিচার করেনি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা ক'রেছিলো। তার পরবর্ত্তীকালের প্রজন্মে ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাঙ্গালার তরুণদের চিত্তে।...তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মত প্রমাণ ক'রে গেছে বাঙ্গলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসীলেপন করুক তার তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে? বার বার— বার বার পড়ে চললো মঞ্জু। যেন রবীন্দ্রকাব্যগুলো মুখস্থ করবে সে।

॥ ৩৫ ॥

তারপর এক সময়— একরকম নিজের অজান্তেই হাতের খাতা বিছানার উপর নামিয়ে রেখে মঞ্জু যখন এসে জানালার শিক ধরে— দাঁড়ালো, তখন প্রায় সে চোখ বুজে বলে যেতে পারে।

...বাংলা দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাহিরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি। কাজের লোককে তারা দূরে ঠেলে, আপনকে করে পর, স্বপক্ষকে পেছন থেকে করতে থাকে বলহীন।...যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টির সম্মুখে ঊর্দ্ধে তুলে তার মান বাঁচাতে হবে তখন আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করে, নিজেদের প্রতি বিদ্বেষ করে শত্রুপক্ষের স্পর্দ্ধাকে তোলে প্রবল করে—'

জানালার দুটো শিক দুহাতে মুঠো করে ধরে মুখটা জানালায় চেপে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

সকালে ঘুম থেকে উঠে চুল আর মুখটা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া— এ ধাতে নেই মঞ্জুর। এক মাথা উড়ো চুল নিয়ে রোজ গিয়ে চায়ের টেবিলে বসে, রোজ বিরক্তি প্রকাশ করে মৌরী। তবু মঞ্জুর স্বভাব শোধরায় না। একদিন আয়নার কাছে গিয়ে চুলটা আঁচড়ে মুখটা পরিষ্কার করে এলো তো দশদিন আর সে-মুখো হয়না সে। আজও তার এলোমেলো চুলের বিনুনী দুটো পড়ে রয়েছে ঘাড়ে পিঠে। ছোট ছোট উড়ো চুলগুলো পড়ে রয়েছে মুখের এপাশে ওপাশে।

কাল প্রায় সমস্ত রাত বৃষ্টি গেছে। গলিতে দাঁড়ানো জল এখনো নেমে যায়নি। কাপড় কোমরে গুঁজে, পাজামা প্যান্ট হাঁটুর উপর টেনে তুলে ধরে কাজের মানুষ কাজের তাড়ায়— আসা যাওয়া করছে জল ঠেলে। ফেরিওয়ালা হেঁকে চলেছে, 'ঢাকাই বাখরখানি।' 'জেলীম্যান মেমসাহেব জেলীম্যান' কেক— প্যাটি... আকাশভরা মেঘ। বৃষ্টি আবার আসবে। দিনের উপায় যা কিছু হোক করে নেওয়ার জন্য দোতলা তেতলার দিকে চোখ তুলে তাকাতে তাকাতে একটানা সুরে ডেকে চলেছে তাঁরা। জানলায় দাঁড়ানো মঞ্জুকে দেখে একবার করে তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে আর ডেকে উঠছে, 'বাখরখানি' 'জেলীম্যান' মেমসাহেব জেলীম্যান কেক— প্যাটি...

কিন্তু মঞ্জু এসর্ব কিছুই দেখছিল না। তার দৃষ্টির সামনে জল দাঁড়ানো গলি নয়, পাগলা আনন্দে ওলট-পালট খেয়ে স্নান করে চলা ওদের সেই নারকেল গাছটা নয়। দু'পায়ে জল ঠেলে চলা এই মানুষগুলো নয়, হেঁকে চলা ফেরিওয়ালা নয়-- মেঘভরা আকাশ নয়। যতদূর দৃষ্টি চলে মঞ্জুর সামনে ধূ-ধূ করছে জনশূন্য মাঠ, আর অবারিত প্রান্তর। আকাশে জ্বলন্ত সূর্য্য। নীচে উত্তপ্ত মাঠে ইতস্তত চরে বেড়াচ্ছে গরু ভেড়া ছাগল। গরু চরানো মেয়ে বসে আছে গাছের তলায় গালে হাত রেখে। সূর্য্যতাপে লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। মাথায় সোনালি চুল তার রোদের আলোয় জ্বলছে আর হাওয়ায় উড়ছে আগুনের শিখার মতো। নীল চোখের দৃষ্টি তার নীল আকাশে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এক এক বার দমকা বাতাস উঠছে। সে দমকা বাতাস এক প্রান্ত থেকে আর

এক প্রান্তে বয়ে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে। গরুচরানো মেয়ের কানের পাশে শব্দ উঠছে সোঁ- সোঁ। সে মেয়ে শুনছে— শোন, শোন, শোন। ওগো মেয়ে শোন। সাহস করে এগিয়ে যাও। আমি তোমার সহায় হব। দেশের বড় দুর্দ্দিন। দূরে গীর্জ্জার পেটা ঘড়ি বেজে চলেছে ঢং-ঢং-ঢং।

মঞ্জুর দুই গাল আর দুই ভুরুর উপর গভীর দাগ ফেলে চললো সমান্তরাল রেখায় চলে যাওয়া জানালার শিক দুটো। দূর থেকে যদি কেউ এখন মঞ্জুকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখে, মানুষ ভাববে না, ভাববে ছবি। কালো মেয়ের একটা কালো মুখের ছবি। প্রথম দৃষ্টিতে ভাববে, শিল্পীর হাতে অতি সযত্নে আঁকা ছবি। মুখকে রমণীয় করার দিকে শিল্পীর কোন আগ্রহ ছিল না। প্রশস্ত কপালের উপর এলোমেলো গোটা কয়েক গোলাকৃত রেখায় ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন চুলের। মুখের ডৌল তুলতে হাতের তুলিটা একবার ঘুরিয়ে এনেছেন অবহেলায়। কাঁধ আর শাড়ীর আভাস দিয়ে গেছেন শুধু তুলি ব্রাস করে। কিন্তু না। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে চম্‌কে উঠতে হবে তাকে। এঁকেছেন শিল্পী— ঐ আলো পড়া চোখ দুটো যে রশ্মি ছড়াচ্ছে, ঠোঁটের ডান কোণে পড়ে থাকা রোদের টুকরোটা ঠোঁটে যে ধার তুলছে—আপন শক্তির প্রকাশ শিল্পী রেখে গেছেন সেখানে।

সকাল এগিয়ে চললো। পাশের ঘর থেকে পিসীমার হাতের ঘন্টার ধ্বনি এসে মিলে যেতে লাগলো মঞ্জুর কানের সেই গীর্জ্জার পেটা ঘড়ির ঢং ঢং শব্দের সঙ্গে। করপোরেশনের লোক এসে রাস্তার আণ্ডার ড্রেনের মুখ খুলে দিল। জল তোড়ে নেমে চললো নীচের দিকে। পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে ঘিরে দাঁড়ালো বস্তীর ছেলেমেয়েরা জল নেমে যাওয়া দেখতে। মেঘের ফাঁক দিয়ে একটুকরো রোদ মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করতে লাগলো বিষণ্ণমুখী মেয়ের মুখের হাসির মতো।

জল নেমে গেলে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে রাস্তায় হাঁটা দিল মঞ্জু। ঘুরবে ঘুরবে কেবল ঘুরবে সে। কেবল নিরুদ্দেশ ঘোরায় ঘুরে বেড়াবে সে আজ।

মেডিকেল কলেজের সামনে এসে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে পড়লো মঞ্জু। রক্ত-বিকির দীর্ঘ লাইনটার দিকে তাকিয়ে নেমে পড়েছে সে। এ লাইন তার পরিচিত। লাইন দিনকে দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে এক রকম তার চোখের ওপর। কত টাকা করে দেয়? যাই দিক টাকা উপায়ের একটা সন্ধান যেন হঠাৎ মিলে গেল তার। লম্বা লাইনের ভেতর দাঁড়িয়ে পড়ল গিয়ে সে। একজন করে ভেতরে যায় রক্ত দিতে, সবার সঙ্গে সঙ্গে এক পা করে এগোয় মঞ্জু আর ভাবে মৌরী জানতে পেলে চেঁচামেচি করে একসা করবে। তারপর ঘরে শিকল তুলে তালা বন্ধ করে বলবে, 'থাকো'। নীল যদি এখন পথ চলতে গিয়ে ওকে এখানে দেখতে পায় তবে কি করবে। কিছুই করবে না। কিছুই বলবে না। শুধু নীরবে এসে সেও দাঁড়াবে সব পেছনে। ওর রক্ত দেওয়া হয়ে গেলে, বাড়িয়ে দেবে সে তার হাত। তারপর বাইরে এসে বলবে, চলুন কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক।

আর জতের গাড়ী যদি এখন এখান দিয়ে যায়? সে ওকে দেখতে পায়? না, সে বুঝবেই না এটা এখানে কিসের লাইন। সে ভাববে 'বোম্বাইকা বাবু' দেখার টিকিট কাটার লাইন পড়েছে এটা। মঞ্জুও দাঁড়িয়েছে এসে ঐ 'বোম্বাইকা বাবুর' টিকিট কাটাতে। আচ্ছা, রজতের বন্ধ দরজার কাছে পৃথিবী কি তেমনি থেমে আছে? তার ঘরে কি সেই একই উল্লাস ফুর্তি হুল্লোড় চলছে? গ্লাসে গ্লাসে তেমনি সোনালি মদ পরিবেশন করে চলেছে ওয়েটার। কৌচে কৌচে তেমনি হেলে মনোহর ভঙ্গিতে বসে রয়েছে সব রূপসী রমণী?

'প্রিন্স অব ওয়েলস্' ব্লক— বৃটিশ যুগে ছিল নাকি কেবল ইউরোপীয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট। কালো আদমীদের প্রবেশের অধিকার ছিল না সেখানে। তখন তার চেহারাও নিশ্চয়ই তার নামানুযায়ী ছিল। এখনকার মতো মলিন দীনহীন চেহারা ছিল না। তারই মাটির তলার অন্ধকার ঘরে ব্লাড-ব্যাঙ্ক। যদিও আলো জ্বলছে তবু ভেতরে ঢুকে প্রথমটায় সব অন্ধকার দেখলো মঞ্জু। কিন্তু ওর দেখা না দেখায় কি আসে যায়। তার হাত ততক্ষণে ডাক্তারের হাতে চলে গেছে। ব্যস্ত ডাক্তার তার আঙ্গুল স্পিরিট ভেজানো তুলো দিয়ে মুছছে। মঞ্জু বসলে আঙ্গুলে সুই ঢুকিয়ে মাপমতো রক্ত টেনে নিয়ে, ফের আঙ্গুলটা স্পিরিটে মুছে ছেড়ে দিল তাকে। আর একটা বাড়ানো হাত টেনে নিল হাতে।

বাইরে বেরিয়ে এসে সূই ফোঁড়া আঙ্গুলটা মঞ্জু দেখল। পিঁপড়ের কামড়ের মতো, একটা ছোট্ট লাল বিন্দু। লাগেওনি একটু। একটু দাঁড়ালো। মাথাটা কি ঝিমঝিম করছে? না কিছুনা। তাই যদি করবে তবে ঐ হাড্ডিসার কঙ্কাল, না খাওয়া মানুষগুলো রক্ত দিচ্ছে কি করে। হাতের মুঠোর দশ টাকার নোটটা ব্যাগে ভরল। মন্দ কি হল।

কিন্তু মাথার ভেতর এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ঘুরিয়ে এনে মিলিয়ে উঠতে পারেনা মঞ্জু—খাওয়ার জন্য রক্ত বেচা, আবার সেই রক্তের জন্যে খাওয়া। আবার খাওয়ার জন্যে রক্ত বেচা, আবার সেই রক্তের জন্যেই খাওয়া—বৃত্তটা কি মিলছে? বৃত্তটা কি ঘুরছে? এই বৃত্তটাই কি কৃষ্ণের হাতের সুদর্শন চক্রের বৃত্ত?

রজতের মস্ত মেহেগনি কাঠের ভারি পাল্লার দরজার আঙ্গুলের টোকা দিয়ে যেন সেই টোকার শব্দে চৈতন্য হলো মঞ্জুর—সে রজতের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে এখানে এলো কি করে। ট্রামে উঠে? বাসে চেপে? না কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে সোজা শূন্য দিয়ে তুলে এনে রজতের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দিলো! রজতের বন্ধ দরজার কাছে পৃথিবী তেমনি থেমে আছে কি না, তার ঘরে সেই রকম হুল্লোড়-উল্লাসই চলছে কি না—গ্লাসে গ্লাসে মদ, কৌচে কৌচে রূপসী নারী তেমনি বসে আছে কিনা, যদিও এ কথা তার মনে এসেছিল কিউতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেজন্য মঞ্জু সে সব সত্য কিনা দেখবার জন্য এখানে এসে উপস্থিত হতে পারেনা—কখনই পারে না।

ততক্ষণে—ভেতর থেকে রজত বার কয় উপর্যুপরি ডেকে ফেলেছে—কাম ইন—কাম ইন—

না, মঞ্জু যাবে না। পলকে রজতের ঘরের অভ্যন্তরটা চোখের উপর ঘুরে গেল ওর। হয়তো সবে মাত্র রজত ঘুম ভেঙ্গে উঠেছে। কফির পেয়ালা সামনে করে তিক্ত বিরক্ত মুখে বসে আছে রাতের অবসাদ অবসন্নতা নিয়ে—না! নিঃশব্দে নিঃসাড়ে চলে যাবার জন্য ফিরছিল মঞ্জু, কিন্তু তক্ষুনি রজতের পরিচিত বয়টাকে কিছু ধোয়া কাপড় জামা হাতে উঠে আসতে দেখে থামল সে। লোকটা নিশ্চয়ই তাকে এইমাত্র আসতেও দেখেছে। এখন এসে দরজার কাছ থেকে এ ভাবে ফিরে যেতে দেখলে কি ভাববে কে জানে। না আর চলে যাওয়া যায় না। লোকটাও ততক্ষণে এসে দরজা খুলে ধরে সসম্ভ্রমে বলছে, যাইয়ে মেম সাব।

ভেতরেই যেতে হলো মঞ্জুকে।

কিন্তু না—রজত কফির পেয়ালা নিয়ে বিতৃষ্ণ মুখে বসে নেই। যে চেহারাটা রজতের সব চাইতে বেশী পরিচিত মঞ্জুর কাছে, তার কথা মনে হলেই যে চেহারাটা মঞ্জুর সব আগে চোখের উপর ভেসে ওঠে, সেই ভাবেই দেখল রজতকে। হাত দুটো পেছনে রেখে, সামনের দিকে অল্প একটু ঝুঁকে কার্পেটের উপর খালিপায় পায়চারি করছে সে। এই মাত্র এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে। তাই মঞ্জুর ঘরে ঢোকা দেখতে পেলো না।

কাঁধের ব্যাগ নিঃশব্দে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সোফায় বসলো মঞ্জু। আর ফের ওদিক থেকে এদিক ঘুরে, মঞ্জুকে সোফায় বসে থাকতে দেখে একেবারে চমকে উঠল রজত বিস্ময়ে আনন্দে বলে উঠল, আরে মঞ্জু!

রজতের কণ্ঠে আনন্দের কোন পরিমাণ ছিল না। বয়টাও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে একবার তার মুখের দিকে তাকালো।

রজত এসে মঞ্জুর সামনে দাঁড়ালো। বললো—তুমি এখন আমার ঘরে, আমার সামনে বসে রয়েছ, এ আমি ভাবতেই পারছি নে.....

একেবারে ছেলেমানুষি আহ্লাদ প্রকাশ।—মঞ্জু বহুদিন বাদে এসেছে। জয়ার আত্মহত্যার দিন সেই যে হাসপাতাল থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মঞ্জু রজতের কাছে বিশ্রামের জন্য এসে তাকে মত্ত এবং তার শয্যায় অর্দ্ধশায়িত তার মত্ত বান্ধবীকে দেখে চলে গিয়েছিল, আর সে এমুখো হয়নি। সংকল্প ছিল তার, আর এ মুখো হবেও না। রজতও বুঝেছিল তা। তাই কি ওকে দেখে তার এই বিস্ময় প্রকাশ? কিন্তু না। রজতের খুশী আর বিস্ময় দুটোই এতো বেশী যে ওতে বেড় পেলোনা মঞ্জু। বললো—আমি আর আসবো এটা হয়তো আপনি ভাবেননি, তাই আমাকে দেখে আপনি আশ্চর্য্য হতে পারেন কিন্তু এতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার মনে করছেন কেন আমার আসা—এটা আমি কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিনে।

রজত বসতে বসতে বললো—তোমার আসাটা নয়—তোমার এই মুহূর্তের আসাটাকে সত্যি একেবারে একটা অবিশ্বাস্য আশ্চর্য্য ঘটনা মনে হচ্ছে আমার। কারণ, এই মুহূর্তে ঘরের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম তোমার জন্য।

রজতের বলার ভেতর এমন একটা কিছু ছিল যে মঞ্জু যথার্থই এবার বিস্মিত হলো।

রজত বললো—আমি তোমাকে কি ভাবে যে চাচ্ছিলাম তার পরিমাণ তুমি জাননা। তাই সেই আমার চাওয়ার সঙ্গে তোমার এই আসাটা যে কি আশ্চর্য্য ঘটনা তুমি বুঝে উঠতে পারবে না। আমি ভাবছি—অবাক হয়ে ভাবছি, সে কোন শক্তি, যে আমার চাওয়ায় তোমাকে এনে আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল!

রজতের কথার ওজন হাল্‌কা করতে চাইল মঞ্জু। হেসে বললো—ভৌতিক কাণ্ড নয় তো?

হাসল রজতও। বললো—না। মরে যখন যাইনি তখন ভৌতিক নয়। তবে আধিভৌতিক তো নিশ্চয়ই। সোফার উপর কাত হয়ে পড়ে থাকা ব্লাক অ্যাণ্ড হোয়াইট-এর কৌটাটা তুলে নিয়ে তার মধ্যে দুটো আঙুল ঢুকিয়ে একটা সিগারেট তুলে নিল সে। তারপর টিনের মুখটা বন্ধ করে সেটাকে ফের সোফার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো—তা যার কাণ্ডই হোক, যদি এমনি অবিশ্বাস্য ঘটনা কিছু কিছুও ঘটত, তবেই তো আর পৃথিবীটাকে বসবাস করার পক্ষে এমন নিদারুণ একঘেয়ে ঠেকত না—লাইটারে টিপ দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিল রজত। তারপর বললো—তুমি তো আবার কফি পছন্দ করো না। চা বলি।

বলতে হলো না। বয় এসে ঢুকল ট্রে হাতে। ওদের সামনে চায়ের ট্রে নামিয়ে চলে গেল নীরবে।

—দেখলে, কেমন কাজ শিখিয়েছি। সাহেবের কাছে কে এলে, কি পরিবেশন করতে হবে তা পর্যন্ত জানে। চা না কফি, অরেঞ্জ স্কোয়াস না বিয়ার।

রজতের কথা, তার এই কাত হয়ে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া, তার মুখের হাসি—সব কিছুর আড়ালে কেমন যেন একটা অনির্দিষ্ট বেদনার সুর রয়েছে মনে হলো মঞ্জুর। যা ইতিপূর্বে রজতের ভেতর সে আর কখনো দেখেনি। পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে তার হাতলটা আঙুলে ঘুরিয়ে নিজের দিকে এনে এ কথাটাই ভাবতে ভাবতে কাপে চুমুক দিতে লাগল সে। তারপর রজতকেও চুপ দেখে জিজ্ঞাসা করল—আমার কথা কেন ভাবছিলেন, তা তো বললেন না?

ছাইদানে ছাই ঝাড়ল রজত হাত বাড়িয়ে। বললো—তোমার কথা আমি কারণ ছাড়াই ভাবি। তবে আজ ভাবছিলাম, চলে যাবার আগে একবার দেখা করার জন্য।

—চলে যাবার আগে মানে?

—'কে যেন বলে মোরে চলো দূরে

কে যেন কানে কানে কয়

আয় নয় আর নয়'—

বুঝলে মঞ্জু? ভেবেছিলাম, চুপচাপ চলে যাবো। কিন্তু আজ যাওয়ার দিনটি যখন এসে উপস্থিত হলো, তখন একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্য সে যে কি চঞ্চলতা বোধ করতে লাগলাম—

—আজ যাচ্ছেন!

—আজই যাচ্ছি। চারটার সময় আমার প্লেন। কাল এ সময় লণ্ডনে বসে লাঞ্চ খেতে না পারলেও, রাতের ডিনারটা করতে পারবো। তারপর অবশ্য কবে যে কোন দেশের কোন হোটেলে আমার চাল বরাদ্দ রয়েছে, তা আমিও জানিনে। এ হলো আমার খবর। এখন তোমার খবর বলো। জয়া কেমন আছে?

—ভালো।

—হাসপাতালে না বাড়ীতে সে?

—এখনও হাসপাতালে।

—ভোরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাতে ক'টা মাষ্টারি করছ?

—একটাও নয়।

—কেবল দিন-রাত টাকার ভাবনা করছ?

চুপ করে রইল মঞ্জু।

—ডাক্তার এসেছিল?

—ডাক্তার কে?

—তোমার দিদিরযার সঙ্গে বিয়ের কথা।

—ও! হাঁ।

—তাই বলো। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সোজা হলো রজত। বললো—বলেছিলাম না, ডাক্তার আসবেই। তা, তোমার দিদি কি বলছেন? বেচারা ডাক্তার তার প্রসাদলাভ করেছেন তো?

—মনে হয় করবেন।

—ডাক্তার এখন এখানে?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের বাড়ীতে রোজ আসেন?

—হাঁ।

—জানো আমি তোমাদের এমনি আসরে কতদিন গিয়ে যে মনে মনে উপস্থিত হয়েছি তার ঠিক নেই। তোমার দিদির সঙ্গে আলাপ করেছি। বৌদির হাত থেকে চা নিয়ে গিয়ে তোমার পাশে বসেছি। ডাক্তারকে সাত দিনের ভেতর বিয়ের তারিখ ফেলতে বলেছি। হাসপাতালে জয়াকে দেখতে গেছি। সেখানে মমতার সঙ্গে পরিচয় করেছি। শুধু কি তাই— সোফা ছেড়ে উঠে পড়লো রজত। পায়চারি করতে করতে বললো—ছট্টুর কথা ভেবেছি। জয়ার সঙ্গে কথা বলেছি—তোমাদের সেই ভাঙ্গা বাগানবাড়ীটা স্কুলের জন্য দেখে এসেছি। আরো কত কি যে করেছি তার ঠিক নেই। আচ্ছা মঞ্জু!

মঞ্জুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রজত— তুমি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলে তুমি দৈববাণী শোন বলে—

—ঠাট্টা করে বলিনি। আমি শুনি।

রজত তাকিয়ে রইল মঞ্জুর দিকে। মঞ্জু বললো—রামকৃষ্ণদেব কালী দর্শন করতেন। চৈতন্যদেব কৃষ্ণ। মীরা হাসতেন, কাঁদতেন, গাইতেন গোপাল দর্শন করে—মিথ্যে কি এ সব?

—তুমি কি শোন?

নিরুত্তর বসে রইল মঞ্জু।

—বল? আকুলতা প্রকাশ পেলো রজতের গলায়। আমি আজকের দিনটি সঙ্গে নিয়ে যাবো মঞ্জু! বলো।

রজতের মুখে তার চলে যাবার কথাটা আচমকা শোনার পর থেকে বুকের ভেতরটায় যে মঞ্জুর কি হচ্ছিল, তার রূপটা সে নিজেই ধরে উঠতে পারছিল না। একটার পর একটা রক্তের ঢেউ যেন ছলাৎ করে এসে বুকের উপর আছড়ে পড়ছিল। কোনমতে সংযত কণ্ঠে সে জবাব দিয়ে চলেছিল রজতের কথার। একটু সময় চুপ করে থেকে বললো—শুনি কে যেন বলে আমাকে, দেখো কি আশ্চর্য্য রকম প্রস্তুত সবাই। কারু দরজায় ঘা দিতে হবে না, কাউকে ডাকতে হবে না, সাড়া পাওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়বে সবাই—

—তার পর?

—তার পর হয় জনস্রোত আমরা জলস্রোতের মতো সব পাঁক ধুয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলবো। নয়তো এই পাঁকের ভেতরই ছিটিয়ে চলবো আমরা পদ্মবীজ।

—তার পর?

—তার পর আর কি? এ দু'লোক মধুময় হবে, মধুময় হবে পৃথিবীর ধূলি। দিন মধুময় হবে, মধুময় হবে রাত। বাতাস মধুময় হবে; মধুময় হবে নদী—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তৌষধিঃ।।
মধুনক্তমুতোষসো
মধুমৎপার্থিবং রজঃ।
মধুদৌরস্তু নঃ পিতা।।
মধুমান নঃ বনস্পতিঃ
মধু মান অস্তু সূর্য্যো।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রজত। যেন হিমালয়ে তপস্যারত ঋষি-কণ্ঠ-নিঃসৃত বেদমন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগল তার কানে—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তৌষধিঃ।।
মধুনক্তমুতোষসো—

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল।

এরই ভেতর কখন এসে যেন বয় ড্রিঙ্কের সাজ-সরঞ্জাম রেখে গিয়েছিল। এবার নিয়ে এলো মধ্যাহ্ন-আহার। কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে টেবিল ঝেড়ে খাবার সাজিয়ে দিয়ে বয় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। পালিশকরা জুতোর মচমচ শব্দ তুলে ঘরে এসে প্রবেশ করলো রজতের ম্যানেজার। মৃদু কণ্ঠে স্যার বলে সম্বোধন করে কিছু কাগজপত্রের একটা ফাইল তার সামনের টেবিলের উপর রেখে কলম বাড়িয়ে ধরল রজতের দিকে। ম্যানেজারের হাত থেকে কলম নিয়ে কাগজের ওপর একটু করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে সই দিয়ে চলল রজত আর একটু নুয়ে দাঁড়িয়ে সই করা পাতা উল্টে নতুন পাতা বের করে দিতে লাগল ম্যানেজার। সই -এর পর্ব শেষ হলে ম্যানেজার কিছু ব্যবসায়িক নির্দেশ নিয়ে যাবার সময় তেমনি মৃদু গলায় জানিয়ে গেল, দেড়টা বেজে গেছে। আর এক ঘন্টার ভেতর তাদের দমদমের উদ্দেশ্য রওনা হয়ে পড়তে হবে। নইলে আজ জৈনদের নাকি একটা মিছিল বের হবে। তার আগে ঐ পথটা পার না হলে গাড়ী আটকে যাবার সম্ভাবনা আছে। ম্যানেজার ফাইল নিয়ে চলে গেল।

বয় গিয়ে খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে অকারণে এটা ওটা নাড়াচাড়া ও এদিক ওদিকে করতে লাগল। উদ্দেশ্য, সাহেবকে খাবার কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

উঠে দেয়ালে লাগানো পাতা খাবার টেবিলের দিকে যেতে মঞ্জুকে ডাকল রজত—এসো। একটু খেয়ে নাও আমার সঙ্গে। তারপর আমায় দমদম প্লেনে তুলে দিয়ে বাড়ী যাবে।

মঞ্জু বসল গিয়ে খাবার টেবিলে। সুপডিসটা টেনে ভরা এক চামচে সুপ প্রথমেই তুলে ধরল রজত মঞ্জুর মুখের কাছে। হাঁ করতে হলো মঞ্জুকে। পর পর আরো কয়েক চামচ সুপও তাকে মুখে নিতে হলো এমনি হাঁ করে করে। তারপর বাকীটা নিজে খেয়ে, সুপপ্লেট বয়ের হাতে তুলে দিয়ে কাঁটায় গেঁথে মাংসের টুকরা তুলে দিল রজত মঞ্জুর হাতে। মাংসের টুকরোটা গালে ফেলে ফেলে চিবুতে চিবুতে চোখ নত করে কান্নাঠাসা গলায় ঢোক গিলতে লাগল মঞ্জু।

বয় ওর জন্য জল এনে রাখল টেবিলে। শস্ ঢেলে দিল ডিসে। বরফ তুলে দিলে জলে। খাওয়া হলে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেল বয়। কিছুক্ষণ বাদে মস্ত মস্ত সুটকেস দুটো এসে বের করে নিয়ে গেল দুটো লোক। রজত পাশের ঘর আর এঘর করে পোষাক পরতে পরতে বললো—এক দিন ভয় দেখিয়েছিলে তুমি আমাকে, 'দিতে পারেন সব' বলে। আজ আমি যদি বলি, সব নেও। পারবে সব নিতে পারার সাহস দেখাতে? কাজ করতে হলে টাকা চাই। সে টাকা বাবা কাকা দাদা মামা বা স্বামীর না হলে ছোঁয়া চলবে না, এ কুসংস্কার বা মিথ্যে সম্মানবোধ নিশ্চয়ই তোমার নেই। সবার টাকার মতো শুভাকাঙ্খীর টাকা, বন্ধুর টাকাও সমান গ্রহণীয় এটা নিশ্চয়ই তোমারও মত। তাই ব্যবস্থা করে গেলাম। ঘুরে এসে দেখবো, তোমার প্রতিষ্ঠিত স্কুল। তোমার কাজ। তোমার জয়াকে। তোমার জয়াকে আর তোমাকে—কোটটা হাতে নিয়ে সিগারেটের টিনটা কোটের পকেটে ভরে শূন্য ঘরটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল রজত কিছু রয়ে গেল কিনা।

আর দেরাজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মঞ্জুর রজতের শূন্য ঘরটার দিকে তাকিয়ে কান্নায় গলা বুজে এলো। কাল আর এসময় রজতকে এ ঘরে পাওয়া যাবে না।

দরজায় টোকার শব্দের সঙ্গে ডাক শুনতে পাওয়া গেল—স্যার।

— কামিং, বলে সাড়া দিল রজত। তারপর ধরা গলাটা একটু কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে রজত যেন আপন মনেই বলতে বলতে মঞ্জুর দিকে এগিলো এলো—প্রেম নিয়ে অনেক খেলেছি। আজ যদি সে আমাকে নিয়ে খেলা সুরু করে থাকেই—আই মাষ্ট অনার হার। মঞ্জুর হাতটা হাত বাড়িয়ে করমর্দনের ভঙ্গিতে ধরতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ মঞ্জু রজতের অতি কাছে এগিয়ে এসে তার মুখটা রজতের মুখের দিকে তুলে ধরে চোখ বুজল।

একটু সময় আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইল রজত। তারপর মঞ্জুর মুখটা দুহাতে তুলে ধরে তার কাগজের মতো সাদা ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বহু অনিচ্ছার ভোগও অভ্যাস বশে করেছে রজত—আজ যেন অমৃতভাণ্ড মুখ থেকে নামিয়ে রাখল। মঞ্জুর মুখ ছেড়ে দিয়ে তার দুই কাঁধ শক্ত করে ধরে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বললো—নীলের জন্য যৌতুক রইল। চলো। মঞ্জুর হাত উত্তপ্ত মুঠোর মধ্যে ধরে রজত বেরিয়ে এলো বাইরে।

হৃদয় পাতো

॥ ১ ॥

কাচ্চি। এই কাচ্চি....

মেমসাহেবের ডাক শুনে লম্বা বারান্দা দৌড়ে পার হয়ে এসে কাচ্চি শিবানীর সামনে দাঁড়ালো। একটু তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস টানতে টানতে বলল, কী মা?

মা!

ভিজে মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছছিল শিবানী। মুখ থেকে তোয়ালে সরিয়ে অবাক চোখে তাকালো আয়ার দিকে। মেমসা'ব ডাকে অভ্যস্ত কানে আয়ার মা ডাকটা এতো আল্‌গা ঠেকল যে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, হঠাৎ মা ডাকছিস যে তুই?

ততোধিক বিস্ময়ে গালে হাত ঠেকালো আয়া—কাল আপনি নিজেই না বললে, এখন থেকে আমাকে মা বলে ডাকবি। ফের মেমসা'ব বলে ডাকলে মাথা গুঁড়িয়ে দেবো।

মনে পড়েছে। ঝরঝর শব্দে হেসে উঠল শিবানী। বলল, ও, তাই বলেছিলাম বুঝি!

বলেছিলে তো। সাহেবও ছিলেন ঘরে।

সাহেবও ছিলেন বুঝি ঘরে। হাসির তোড় আরো বেড়ে গেল শিবানীর। আয়া কি করে বুঝবে সাহেবও ছিলেন নয়, সাহেব ছিলেন বলেই ওর এই বলা। চোখের উপর ভেসে উঠল শিবানীর আয়ার প্রতি মা ডাকের আদেশ শুনে ইন্দ্রনাথের ক্রুদ্ধ মুখটা। ঐ জন্য—শুধু ঐ জন্যই। শুধুমাত্র ইন্দ্রনাথকে উত্যক্ত করবার জন্য এসব হলো ওর নিত্য-নতুন আবিষ্কার।

হাসি থামিয়ে তোয়ালে চেপে চেপে ভিজে মুখ মুছতে লাগল শিবানী। নয়তো যেন ইন্দ্রনাথের সেই ক্রুদ্ধ মুখের উপর নিজের মুখটা একবার এখানে, একবার ওখানে চেপে ধরতে লাগল। না—এ ইচ্ছেটা এখনও একেবারে, মরে যায় নি শিবানীর। এক এক সময় ইচ্ছে করে, ভীষণভাবে ইচ্ছে করে ইন্দ্রনাথের মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্পিত ঠোঁটের ঝড় বইয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু পারে না। ভালোবাসতে দেয় না ইন্দ্রনাথ। ভালোবাসতে চাইলেই ভালোবাসা যায় না। এক একজন মানুষের স্বভাবের ভেতরই আশ্চর্য রকম বাধা থাকে তাকে ভালোবাসবার। দিতে গিয়েও হাত গুটিয়ে ফিরে আসতে হয় তাদের কাছ থেকে।

আপনার চা এখানে আনব? মেমসাহেবের ডাকের কারণটা বুঝতে না পেরে জানতে চাইল আয়া।

আয়ার প্রশ্নে একটু চমকেই তোয়ালে থেকে মুখ তুললো শিবানী। ভাবালু হয়ে পড়েছিল সে। ভাবিষ্ট হয়ে পড়েছিল সে!

তোয়ালেটা কাচ্চির হাতে দিয়ে চিরুণী তুলে নিতে নিতে বলল, না। চা আমি ও-ঘরে গিয়েই খাবো। তোকে যেজন্য ডেকেছি তাই কর।

কি জন্য ডেকেছ তাই বল? খোঁপা বেধে দেবো? কাচ্চি এগিয়ে এলো শিবানীর কাছে।

মাথা সরিয়ে নিল শিবানী। যা, তোকে চুল বাঁধতে হবে না। তুই বাগানটা দেখ। দেখ কোন রং-এর ফুল আজ সব চাইতে বেশী চোখ টানছে। তারপর সেই রং-এর শাড়ি বের করে রাখ।

হ্যাঁ এই ভাবেই আজকাল শাড়ির রং নির্বাচন করে শিবানী। আগে তাকে শাড়ির রং নিয়ে বহু ভুগতে হয়েছে। একের পর এক শাড়ি ব্লাউজ খুলেছে, পরেছে আর ছেড়েছে। নাঃ, আজ মানাচ্ছে না এ রংটা। নাঃ মানাচ্ছে না এ

রংটাও। তারপর স্তূপীকৃত ভাঙ্গা শাড়ি রেখে বেরিয়ে গেলে কাচ্চি গর্জাতো শাড়ি পাট করতে করতে। কিন্তু সে দুর্ভোগের দিন কাচ্চির আর আজকাল নেই। শিবানী তার দিনের রং বার করবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে ফেলেছে। একদিন বহু শাড়ি খোলা আর ছাড়ার পর একটা ঘোর গোলাপ রং-এর শাড়ি পরে খুশী মনে বাগানের পথ দিয়ে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শিবানী। আজ বাগানের সমস্ত ফুলের ভেতর হলুদ রং-এর সিজিনফ্লাওয়ারের বেডটা যেন দশ দিকে বাসন্তী রং ছড়িয়ে দুলছে। গোলাপ আজ বাগানে নিষ্প্রভ। তক্ষুনি উঠে গেল শিবানী উপরে। আলমারী খুলে বের করল বাসন্তী রং -এর কাশ্মীরী শাড়ি। কাচ্চি মেমসাহেবকে ফের শাড়ি পালটাতে দেখে—রইল হাঁ করে তাকিয়ে। হেসে ফেলল শিবানী। বলল, ভগবানকে খুব বুঝি ডেকেছিস। তোর দুঃখ এতদিনে তিনি ঘোচালেন। এবার থেকে তোকে আর শাড়ির বোঝা পাট করতে বসতে হবে না। আমার শাড়ির রং বেছে দেবে আমার বাগানের ফুল। যেদিন যে ফুল সেদিনের আকাশ-মাটির সঙ্গে মিলে সব আগে চোখ টানবে, মন মাতাবে, সেই রং হবে আমার সেদিনের রং, বুঝলি? না বুঝে থাকিস তো যা। তুই এটুকু বুঝে রাখ, তোর শাড়ি পাট করার দুঃখ ঘুচেছে।

কাচ্চি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাগানটা দেখতে দেখতে বলল, ওঃ মেমসাব, আজ তোমার ডালিয়া ফুল বাগান আলো করে রয়েছে। অন্য ফুল চোখেই লাগছে না।

ডালিয়া তো বুঝলাম। কী রং?

কী জানি, তোমরা পিঙ্ক বলো না মভ বল জানিনে।

উঠে এলো শিবানী। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, ঠিক বলেছিস। মভ রং-এর ডালিয়া আজ বাগান আলো করে রয়েছে। সূর্যমুখী পর্যন্ত চোখে লাগছে না। বের করে রাখ মভ রং-এর জরির বুটিদার চন্দেরী শাড়িটা।

শিবানী কিন্তু কোন বিয়েবাড়ী যাচ্ছে না। কোন পার্টিতে যাচ্ছে না। কোন উৎসববাড়ীতে যাচ্ছে না। যাচ্ছে অফিসে। অফিস করাটা যেমন তার কিছু একটা করবার জন্যই করা, পোষাক করাটাও তাই। দু'টোই সে করার কিছু নেই বলেই করে। থাকলে হয় তো কোনটাই করত না।

আয়াকে পোষাক বের করে রাখবার আদেশ দিয়ে শিবানী চা খাবার জন্য খাবার ঘরের দিকে চলল। ইন্দ্রনাথের ক্রুদ্ধ মুখটা এখন মিলিয়ে গেছে। ভরা বাগানের ফুলের রং তার দু'চোখে, গুন্‌গুনিয়ে উঠল সে,—

'আকাশ বাতাস কেমন করে জানল
কাহার গলে দিলাম তুলে
আমার বরমাল্য—আকাশ'...

ফের কলিটা টানতে যেতেই বাধা পেয়ে থেমে গেল শিবানী।

আকাশ বাতাসেরও জানবার কথা নয় এমনিভাবে কার গলায় মালা দিলে?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শিবানী স্বামীর জিজ্ঞাসায়।

ইন্দ্রনাথ বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লাইটার জ্বেলে পাইপ ধরাতে ধরাতে ফের জিজ্ঞাসা করল, কার গলায়?

প্রথমটায় বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না শিবানীর। অবাক দৃষ্টিতে তাকালো ইন্দ্রনাথের দিকে। তারপর হেসে উঠল ভীষণ ভাবে। সত্যি! এ ভাবে একজনের গলায় মালা পরিয়ে দিলে বেশ হয় তো! গভীর নিঃসাড় রাতে, নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে চমকে উঠে এগিয়ে যাবো মালা হাতে। বুকের একান্ত কাছে গিয়ে কম্পিত হাতে পরিয়ে দেবো গলায় বেলফুলের মালা। মাথা কাৎ করল শিবানী, মালা এ ভাবেই পরানো উচিত। এক সভা লোক। একমাথা আলো আর হৈ-হৈ রৈ-রৈ-এর ভেতর মালা পরানোর আসল সুরটাই যায় হারিয়ে আর তাই বোধ হয় সমস্ত জীবনেও আর সুর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কথা শেষে হাসল শিবানী।

পাইপ দাঁতে চেপে চোখ দু'টো ছোট করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী চোখ ফেরালো অন্য দিকে।

ইন্দ্রনাথের পাইপ দাঁতে চাপা, চোখ ছোট করা বিশেষ ভঙ্গির এই তাকানোটা শিবানীর ভারি বিশ্রী লাগে। কেমন নাটুকেপনা নাটুকেপনা লাগে। শুধু এটাই নয়, অরুচিকর ঠেকে শিবানীর কাছে ইন্দ্রনাথের অনেক কিছু। ইন্দ্রনাথের সাহেবীয়ানা অসহ্য ঠেকে তার।

সে নিজে বৃটিশ রাজত্বের পি. এম. জি অফিসারের মেয়ে। মেম গভর্নেস তাকে ইংরেজী পড়িয়েছে। নাচ শিখিয়েছে। পিয়ানো শিখিয়েছে। তবু সে যেমন বাঙ্গালী মেয়ে ছিল তেমনি আছে। ইন্দ্রনাথের নকল সাহেবীয়ানা লজ্জিত করে তাকে। পীড়া দেয় তাকে। পাঁচ বছর বিলেতে বাস করে ইন্দ্রনাথ কোন মতে কিছুকাল কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাইপ দাঁতে চেপে চোখ মুখ কুঞ্চিত করে বাঙ্গালী বাপ মা ভাই বোনের সঙ্গে এক বাড়ীতে ছিল। তারপর জর্জকোর্ট রোডে এই বাড়ী করে ওকে নিয়ে চলে এসেছে। বাবা আপত্তি করেন নি। ইন্দ্রনাথের বুদ্ধিতেই তার ব্যবসার আয়ের অঙ্ক লক্ষ থেকে লক্ষ-লক্ষের পথে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইন্দ্রনাথ একবার দিল্লী ঘুরে আসে আর সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের আয়রন ফ্যাক্টরী আর মেটাল প্রেসি-এর বিরাট অর্ডার। অন্য ছেলেরা যত বাধ্য, বিনীত, ভালো হোক, বাপের কাছে সব চাইতে মূল্যবান ছেলে ইন্দ্রনাথ। সে মদই খাক আর মেম নিয়েই ঘুরুক বা পৈত্রিক বাড়ী ছেড়ে জর্জকোর্ট রোডে বাড়ী করুক, তাকে বাপ ঘাঁটান না।

কিন্তু শিবানী ঘাঁটায়। তার কারবার, কারবার নিয়ে নয়, মানুষটাকে নিয়ে। তার কারবার ব্যবসা নিয়ে নয়, জীবন নিয়ে।

ইন্দ্রনাথের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে খাবার-ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল শিবানী। এখন বেলা আটটা। দশটায় ওর অফিস। পাক্কা দু'ঘণ্টা এখন ওকে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে কাটাতে হবে—না, ঠিক দু'ঘণ্টা নয়। এক ঘণ্টা। আর একটা ঘণ্টাকে সে স্নান-খাওয়া পোষাকে টেনে নিয়ে যাবে।

সমস্ত দিনের ভেতর ওদের স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎকালটা আজ কেবল এ সময়টুকুর মধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর ইন্দ্রনাথ যাবে অফিসে। ফিরবে গভীর রাতে আর এমন অবস্থায় ফিরবে যে, শিবানীকে উঠে দু'জনার ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে। ধীরে ধীরে ব্যবধান বাড়তে বাড়তে আজ যে ওরা কতদূরে চলে গেছে তা বোধ হয় নিজেরাও জানে না। এক এক সময় স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখে শিবানী, কোনো বেদনাবোধ নেই ওর স্বামী সম্বন্ধে। কোনো প্রয়োজনবোধ নেই ওর স্বামী সম্বন্ধে। এক সময়ের মুহূর্ত গোণা স্ত্রী আজ হিসেবও করে না স্বামীর সঙ্গ-বঞ্চিত দিনটা সাত না সতেরো।

শুধু এই প্রাতঃকালীন সময়টা নিয়ে ওর অবস্থা হয় যেন কতকটা ষ্টেজে নতুন অভিনয় করতে নামা অভিনেতার হাত দু'টো নিয়ে অস্তিতে পড়ার মতো। এ-ভাবে, ও-ভাবে কোন ভাবে রেখেই যেমন হাত দু'টোকে নিয়ে নতুন অভিনেতা স্বস্তি পায় না। শরীর থেকে আলগা ঠেকে তার হাত দু'টোকে, শিবানীরও ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অতিবাহিত করার এ সময়টা নিয়ে তেমনি অবস্থা দাঁড়ায়। এভাবে, ওভাবে যে ভাবে কাটাক শরীর-মন থেকে বিচ্ছিন্ন ঠেকে সময়টা।

চাকরীটা নিয়েছিল শিবানী নিতান্তই খেয়ালে। কিন্তু ভালো লাগছিল না তার কাজ। একেবারেই না। কিন্তু ছেড়ে দেবে ঠিক করেও আর ছেড়ে দেওয়া হলো না। ইন্দ্রনাথের জন্যই হলো না। প্রথম ক'দিন শিবানীর চাকরী নেওয়াটা ইন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারে নি। ভেবেছে বেরুচ্ছে কোথাও। যাচ্ছে কোথাও। তারপর প্রতিদিন ঠিক দশটায় বেরুতে দেখে জিজ্ঞাসা করে যখন শুনল শিবানী চাকরী নিয়েছে, ক্ষেপে গেল প্রচণ্ড। ওর চাকরী নেওয়া যে ইন্দ্রনাথকে এমন ক্ষিপ্ত করবে, চঞ্চল করবে, শিবানী তা কল্পনাও করে নি। আর তাকে পায় কে। এতদিন ও কেবল একা যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এবার এই অস্ত্রে কেটে চলবে ইন্দ্রনাথকে শিবানী। কাজ ছাড়া ওর হলো না। ইন্দ্রনাথের যন্ত্রণা ভোগটাই ওর কাজের আনন্দ। প্রতিদিন অফিসে যাবার প্রেরণা। ইন্দ্রনাথকে যন্ত্রণা দিতে পারলে ওর ভেতরটা ভারী খুশী হয়।

বাবুর্চি চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে গেল। ইন্দ্রনাথ এসে শিবানীর উল্টো দিকের চেয়ারে বসল। চায়ের আয়োজন এখন নিতান্তই সামান্য। একটা প্লেটে কিছু বিস্কিট মাত্র। ইন্দ্রনাথ স্নান করে ভারী ব্রেকফাষ্ট খেয়ে তার ফ্যাক্টরীতে যাবে। লাঞ্চ খাবে সেখানে, নয় ত' কোন সাহেবী হোটেলে। শিবানী আর একটু বাদেই খাবে ভাত। আগে শিবানী একটা হাফ-বয়েল ডিম খেত। এখন তাও খায় না। চা ঢেলে ইন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে দিল শিবানী। ঠেলে দিল বিস্কিটের প্লেটটা। নিজে শুধু এক কাপ চা নিয়ে অল্প অল্প ঠোঁট ছোঁয়াতে লাগল। ইন্দ্রনাথ চোখের সামনে মেলে ধরল পত্রিকার পাতা। সে একটু নড়লে চড়লে শব্দ করলেই শিবানীর বুকটা ধক্ করে ওঠে, এ বুঝি সুরু হলো ওর চাকরী ছেড়ে দেওয়া নিয়ে ইন্দ্রনাথের রাগারাগি চেঁচামেচি। তাড়াতাড়ি চা শেষ করে উঠে পড়ল শিবানী। হল ঘরে গিয়ে বসল পিয়ানোর ডালা খুলে। অলস হাতে আঙ্গুল বুলিয়ে চলল পিয়ানোর উপর।

ভাবছিল শিবানী।

কিন্তু সত্যি কী কিছু ভাবছিল সে?

সুর কানে নিয়ে কী চিন্তা করা যায়?

বোধ হয় না।

না, তবে শিবানীও ভাবছিল না।

ভাবনা তার বহু ভাবা হয়ে গেছে। এখন আর সে ভাবে না। চলে, কেবল নিজের খুশী মতো চলে। মর্জি মতো চলে। থেমে সে কিছুতেই যাবে না। কিছুতেই না। জীবন তার যদি কোন আনন্দ, কোন সার্থকতা সঙ্গে নিয়ে আসতে না পেরে থাকে, তার চলার আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তার চলা যদি এমন চলা হয়, পথের শেষে দেখে, যেখান থেকে রওনা হয়েছিল সেখানেই আবার ঘুরে এসে পড়েছে, এক পাও এগুতে পারে নি, তবু সে চলবে। অসহ্য ওর কাছে জীবনের স্থবির অচলত্ব। পিয়ানোয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর তুলতে তুলতে সময় পার করতে লাগল শিবানী। আর কিছুটা সময় এমনি করে পার করতে পারলে—কিন্তু তা কী আর পারা যাবে।

গেলও না। ইন্দ্রনাথকে শিবানীর বাজনা উত্যক্ত করে তুলছিল। হাতের পত্রিকা ছুঁড়ে ফেলে এসে হলঘরে ঢুকল সে। ঠিক! যা ভেবেছে। শিবানীর কোলে সেই বেড়ালছানাটা বসে রয়েছে গুটিশুটি। এই বেড়ালছানাটা নিয়ে শিবানীর বাড়াবাড়িটা কিছুদিন ধরে অধৈর্য করে তুলছিল ইন্দ্রনাথকে। বেড়ালটাকে গল্প বলবে, তাকে থাবা টিপে টিপে পিয়ানো শেখাবে। দু'টো পা ধরে দাঁড় করিয়ে আর দু'টো পায়ে বল নাচ শেখাবে—রাগে শরীর রি রি করে ইন্দ্রনাথের।

শিবানীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো, সেই থেকে বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে ঠুং ঠাং করে চলেছ! আশ্চর্য!

ঠুং ঠাং নয়, টুং টাং। কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাপে পিয়ানোর সুরের ঝঙ্কার তুলে উঠে পড়লো শিবানী। কোলের বেড়ালছানাটা ধুপ করে পড়ে গেল নীচে। তাড়াতাড়ি সেটাকে ফের কোলে তুলে নিয়ে গালে গাল লাগিয়ে বলে চলল শিবানী। তোকে এ বাড়ীর কেউ দেখতে পারে না। বাবুর্চি মাছ-মাংসের বেমিল মেলায় তোর ঘাড়ে দেয় দোষ চাপিয়ে। কাচ্চি কাপড় ছিঁড়ে বলে, তুই নষ্টামী করে ছিঁড়েছিস। মালি তাড়া করে, তুই বাগান নোংরা করিস। আর বাড়ীর কর্তার তো কথাই নেই; তিনি ভাবেন দু'জনকেই আছড়ে মারা যায় কী ভাবে।

গাল থেকে বুকে নামিয়ে বেড়ালটার মাথায় হাত বুলোয় শিবানী। সে আরামে ঘর ঘর আওয়াজ তোলে গলায়। শিবানী বলে চলে, তা তেমন অবস্থায় তোর কী? দিবি তো দোতলা থেকে একতলায় পড়েই ম্যাও ম্যাও করে লম্বা দৌড়। আর আমি মরে থাকব হাড় গোড় ভেঙ্গে দলা পাকিয়ে। তা ফিরে এসে কিন্তু আমার জন্য কাঁদবি। বুঝলি? কেউ যেন বলতে না পারে শিবানীর শোকে একটা বেড়ালও কাঁদেনি। এই এমনি করে কাঁদবি—বেড়ালছানাটাকে পিয়ানোর টুলটার উপর বসিয়ে তাকে শোক প্রকাশের ভঙ্গী শেখাতে গেল শিবানী, ইন্দ্রনাথ বেড়ালটার গলা দু' আঙ্গুলে টিপে ধরে ঝুলোতে ঝুলোতে নিয়ে গিয়ে জানালা টপকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, আপাতত একজনকে আছড়ে ফেলে সাধ মেটানো গেল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমার কী তোমার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হবে?

নিশ্চয় হবে। গা ছেড়ে কোচে বসে পড়ল শিবানী। দু'আঙ্গুলে দু'চোখ টিপে ধরল।

এটা তোমার কথা শোনার ভঙ্গী?

নয়? আচ্ছা! শরীর তুলল শিবানী।

এই? সোজা পিঠ টান করে বসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো ইন্দ্রনাথের দিকে।

একটু হাসল ইন্দ্রনাথ।

শুধু এইটুকু—শুধু মাত্র এইটুকুতেই শিবানীর বুকের উপর দিয়ে একটা রক্তের ঢেউ বয়ে গেল। দু'হাতের ভেতর টেনে আনা যায় না ইন্দ্রনাথের মুখটা? যায় কিন্তু রাখা যাবে না শরীরটা। কোচে ঢেলে দিতে গিয়েও ফের সোজা করল শিবানী। বলল, বলো কী বলবে।

আমি কি বলব, তা তুমি জানো।

জানি? কই না তো?

তুমি জান না আমি কি বলব? বেশ আমিই বলছি। তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে কাজ ছেড়ে দেবে—দিয়েছিলে কি না?

দিয়েছিলাম।

তবে?

কি তবে?

কাঁধ শরীর ঝাঁকা দিল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী অন্যদিকে চোখ পাতল।

ইন্দ্রনাথ বলল, তবে ছাড়ছো না কেন? অফিসে যাচ্ছ কেন? রেজিগ্‌নেশন লেটার পাঠাচ্ছ না কেন?

পাঠাব।

কবে?

শিবানী যেন বর্তমান উপন্যাসের মত ভাঙ্গা সংলাপে পাতা বাড়াচ্ছে—অর্থাৎ সময় পার করছে। বলল, দেখি।

এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ। বলল, আদবেই তোমার চাকরী ছাড়ার ইচ্ছে আছে কি না সেটাই স্পষ্ট করে বল।

আছে।

তবে রেজিগ্‌নেশন লেটার লিখে দাও। আমি ম্যানেজারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আজ নয়। উঠে পড়ল শিবানী।

মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথের। উঠে পড়ল সেও। কেন, আজ নয় কেন?

অসহায় ভাবে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল শিবানী। তারপর বলল, যেদিন আমার সম্মান দেখব তোমার কাছে, সেদিন তোমার সম্মান দেখবে আমার কাছে।

তোমার চাকরী ছাড়ার জন্য দাসখৎ লিখে দিতে হবে নাকি আমাকে?

শিবানী জানালা দিয়ে দূরের কৃষ্ণচূড়া ফুলে ঢাকা গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। ...ইন্দ্রনাথের মুখ দু'হাতে কাছে টেনে আনা যেত কিন্তু রাখা যেত না...

দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, কাজ ছাড়বে না এ জানি। অফিসের চাকরীতে অনেক রস—এ কী আর আমি জানিনে। ক'জন বন্ধু পেয়ছ শুনি?

শিবানী পেছন ফিরে পা বাড়ালো।

ভালোবাসতে দেয় না এঁরা।

ইন্দ্রনাথ ঘুরে এসে দাঁড়ালো তার সামনে। মুখ চোখ দিয়ে তার আগুন জ্বলতে লাগল-তুমি আমাকে গ্রাহ্য করো না কেন আমি জানতে চাই?

তুমি আমাকে গ্রাহ্য করো না কেন আমি জানতে চাই— দু'পা ইন্দ্রনাথের প্রতি এগিয়ে এসে কথাগুলো ঘুরিয়ে বলল শিবানী।

হঠাৎ একটু হকচকিয়েই গেল ইন্দ্রনাথ শিবানীর কণ্ঠস্বরে আর ভঙ্গীতে। বলল, মানে, তোমাকে গ্রাহ্য করি না মানে?

মানে, আমার অফিসের সময় হয়ে গেছে। ফের কাল আবার এ সময়ে। চলে গেল শিবানী। আশ্চর্য অস্বীকৃতি। নিরুপায় ক্রোধে পায়চারি করতে লাগল ইন্দ্রনাথ হলঘরের এ-মাথা ও-মাথায়। চুরুট ধরালো একটা। যে ভয় পায় না তাকে ভয় পাওয়ানো যায় কী করে? তাকে শায়েস্তা করা যায় কী করে। সে চায় শিবানী তার মতে চলবে। শিবানীর চাওয়া তাকেও শিবানীর মতে চলতে হবে। শিবানীর পছন্দে চলতে হবে। হুঃ! করে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করলো ইন্দ্রনাথ।

অফিসে যাওয়ার মুখে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে শিবানী দেখে নিচ্ছিল ব্যাগ খুলে, রুমাল, কলম, টাকা পয়সা সব ঠিক মত নিয়েছে কি না, ইন্দ্রনাথ এসে দাঁড়াল সামনে।

এখানেই ইন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। সে চট করে নিজেকে শান্ত করে ফেলতে পারে। পারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই তার কথা চালিয়ে যেতে। সংকোচ বোধ করে না। অপমানও না। স্ত্রীর কাছে আবার মান অপমান, সম্মান অসম্মান কী। তাকে বাধ্য, আজ্ঞাবহ করাটাই হলো কথা। একমুখ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কখন ফিরবে জানতে পারি?

পারো। একটু সময় ব্যাগের এটা ওটা নাড়াচাড়া করে, মুখ তুলে শিবানী বলল, তা তুমি কখন ফিরছ?

আবার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল ইন্দ্রনাথের। আমি যদি রাত তিনটেয় ফিরি? সকালে ফিরি? চারদিন পরে ফিরি?

আমিও রাত তিনটেয় ফিরতে পারি; কাল ভোরে ফিরতে পারি। চারদিন নাও ফিরতে পারি। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে চলল শিবানী।

শিবানীর জুতোর শব্দ বারান্দা পার হয়ে ল'নে পড়ে। ইন্দ্রনাথের মনে হয় তার ব্রহ্মতালুর ওপর দিয়ে শিবানী জুতোর খট খট শব্দ তুলে হেঁটে চলেছে।

গাড়ীতে বসে এবার গাড়ীর গদিতে মাথা রাখল শিবানী। এতক্ষণে সে ক্লান্তবোধ করছে। ও জানে না শত শততম দিনের একঘেয়ে অভিনয়ে অভিনেতারা ক্লান্তিবোধ করে কি না। কিন্তু বাস্তব জীবন একঘেয়ে অভিনয়ে ক্লান্ত করে। মারাত্মক রকম ক্লান্ত করে। মরে যেতে ইচ্ছে করার মত ক্লান্ত করে।

॥ ২ ॥

পরের দিন সকালবেলা চোখ মেলেই সর্বপ্রথম যে কথাটা মনে পড়ল শিবানীর তা হলো আজ ওর জন্মদিন। কিন্তু কাল এ কথা তার মনে ছিল না, মনে নিয়ে ঘুমায়ও নি। জন্মদিনের তারিখটা ভুলেই থাকত সে যদি না মার উপহারের পার্শেলটা কাল সন্ধ্যায় এসে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত। সাতাশ বছর পূর্ণ হলো ওর। পার হয়ে গেল কতগুলো দিন। একটা বিগত দিনকে যেখানে ফিরিয়ে আনা যায় না, সেখানে ব্যর্থ—একেবারে ব্যর্থ অপচয়ে খসে পড়ছে জীবন থেকে একটি একটি করে কত অসংখ্য দিন। ব্যয় না করলে কিছুই ফুরায় না— তবে কেন দিন ফুরোবে। তবে কেন ও ফুরোবে। দিনের আরম্ভকে দু'হাতে ঠেলে ফিরিয়ে দিতে চায় শিবানী—এসো না, আজ এসো না। কোন প্রয়োজন নেই আজ তোমাকে আমার। কী করব তোমাকে নিয়ে আমি। কিন্তু তবু দিন আসে। জীবনের গোণাগুণতি নবীন পাতাগুলো হতে একটি একটি করে পাতা খসিয়ে নিয়ে যায়—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায় শিবানীর।

ব্রতকথায় গল্প শুনেছে, রাজকন্যা রাজমহিষীরা অবাঞ্ছিত লোকের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুল আহ্বানে ঈশ্বর স্মরণ করে নদীতে ডুব দিয়ে প্রার্থনা করতেন, ফিরিয়ে নেও, ফিরিয়ে নেও ঠাকুর আমার যৌবন, আমার রূপ। ভগবান তাদের আকুল ডাকে সাড়া দিতেন। ডুব দিয়ে উঠেই তারা দেখত তাদের রাজকন্যা, রাজমহিষী রূপ নেই, যৌবন নেই। তারা কুরূপ, কুৎসিত। তারপর যেদিন জীবনের মহাক্ষণ দেখা দিত, আসত জীবনে বাঞ্ছিত সম্মিলনের সময়, অঞ্জলিবদ্ধ হাতে গিয়ে ভগবান স্মরণ করে আবার নদীতে ডুব দিতেন তারা। বলতেন, আমার রূপযৌবন ফিরিয়ে দেও ঠাকুর। নইলে আমার সুখ নেই।

অবগাহন শেষে গচ্ছিত যৌবন নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেন তারা।

হায়! শিবানী যদি তার রূপ যৌবন আজ এমনি ভাবে ঈশ্বরের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারত আর পূর্ণ প্রাণে চাওয়ার দিনে ঈশ্বরের কাছে হাত পাতলেই পেত!.... কেন, কেন, কেন— কেন খরচ না করলে অর্থ ফুরোয় না, বিষয় ফুরোয় না, সম্পত্তি ফুরোয় না তবে দিন ফুরোবে ও ফুরোবে। কেন, কেন, কেন। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে আসে শিবানীর —এ কী নির্মম ফুরোনো।

পাশের ঘরে ইন্দ্রনাথের ওঠবার সাড়া পেয়ে—বালিশে মুখ চাপল শিবানী।

শিবানী যখন এ উপন্যাসের নায়িকা তখন তার রূপবর্ণনাটা বোধ হয় একটু দিয়ে নেওয়া দরকার। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে তার রূপবর্ণনায় পাঠকসাধারণকে আমি সুখী করতে পারব না।

কৈশোরে, যৌবনে, কার্যে, বিশ্রামে, জাগরণে, নিদ্রায় যে মনোমোহিনী নারীমূর্তি আপনাদের স্মরণপথে যাতায়াত করে তেমন বঙ্কিম-বর্ণিত নায়িকারূপ তার নয়। যারা রূপের পূজারী, এখানেই বই বন্ধ করতে পারেন।

আর যারা তা নন, তাদের শুধু এ কথাটাই বলতে পারি—তারা ঠকবেন না। রূপ যেখানে থামে শিবানীর রূপ সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে। শিবানীর মা তার অন্য দু'মেয়ের উজ্জ্বল বর্ণের দিকে তাকিয়ে যখন শিবানীর কালো রং-এর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতেন তখন বাবা পরেশনাথ বলতেন, কালো নয় ও আলো। তোমার অন্য দু' মেয়ের ভেতর এমন আলো আছে কারু? আমার শিবানীর রূপ দেখতে হলে তৃতীয় নয়ন চাই। শিব যে রূপের তলায় বুক পেতে দিয়েছেন।

পরেশনাথের পোষ্ট অফিসের বদলির চাকরী। কিছুটা সে জন্যও বটে, কিছুটা স্কুলে দেওয়াটা তার মনঃপূত নয় বলেও বটে, তিন মেয়েকেই তিনি বাড়ীতে পড়িয়েছেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ভর্তি করেছেন কলেজে। শিবানীর যখন কলেজে ভর্তি হবার সময় এলো আর পরেশনাথ নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাকে ভর্তি করে ঐ নামই রেখে এল তখন সবাই ভাবল বড় দু'মেয়ে কল্যাণী-ইন্দ্রাণীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছোট কন্যার জন্য পরেশনাথের এই নাম নির্বাচন। কিন্তু পরেশনাথ সগর্জনে প্রতিবাদ করে বললেন, শিবানী নাম রাখলাম আমি ওর চেহারার মহিমার জন্য। এ নাম ছাড়া এত বিদ্যুৎ ধরবে কে।

মোটকথা শিবানী মিত্র রূপসী নয়। বিলিতি য়ুনিভারসিটিতে পাশকরা মেয়ে বাঁশরী সরকারের মত তারও রূপসী না হলে চলে। শ্রীমতী বাঁশরী সকারের মত প্রকৃতিটা তারও বিদ্যুৎশক্তিতে সমুজ্জ্বল আর আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য।

যখন ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শিবানীর পরিচয় হয় তখন পরেশনাথ মারা গেছেন। বড় দু' মেয়ের বিয়ে তিনিই দিয়ে গেছেন। শিবানীর বিয়ে আর দিয়ে যেতে পারলেন না। সে জন্য কোন দুশ্চিন্তা নিয়েও তিনি চোখ বোজেন নি। কিন্তু বড় রকমের না হলেও একটা উদ্বেগ ছিল শিবানীর মার। তাঁর ক্ষোভের সঙ্গে কেবল মনে হতো, রূপসী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেলেন পরেশনাথ, আর কালো মেয়েটি রইল তাঁর জন্য। শিবানী বড় আর দু'মেয়ে কেন ছোট হলো না। তৃতীয় নয়ন কার থাকবে, কে তার মেয়ের কালো রূপ শিবের চোখ নিয়ে দেখবে। ইন্দ্রনাথ যখন তার শিবের মতো রং আর ঐ নাম নিয়ে এসে শিবানীকে প্রার্থনা করল, শিবানীর মার মনে হলো ইন্দ্রনাথই স্বয়ং শিব। নইলে অমন ঘোর সাহেব কালোর আলো দেখল কী করে। তৃতীয় নয়নের অন্বেষণে ইন্দ্রনাথের কপালের দিকেও হয়ত একবার তাকিয়েছিলেন তিনি। ভিখারী হয়ে নয় রাজৈশ্বর্য সঙ্গে নিয়ে এসে শিব তাঁর কন্যা প্রার্থনা করছে—মনে মনে স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। দ্বিধা করার প্রশ্ন আসে না। দ্বিধা করলেনও না মত দিতে।

কিন্তু দ্বিধা করেছিল শিবানী নিজেই। একটু নয় অনেকটা— অনেকটা সংশয়িত দ্বিধায় থেমে ছিল সে।

কিন্তু কেন?

তার কী ভালো লাগত না ইন্দ্রনাথকে?

লাগত। তখন ইন্দ্রনাথের এতোগুলো মন্দ দিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। ভালো লাগত শিবানীর ইন্দ্রনাথকে।

তবু দ্বিধা করছিল?

করছিল। মন্দ দিকগুলোর সঙ্গে পরিচয় না ঘটলেও স্বভাব মাঝে মাঝে মানুষের প্রকাশ হয়ে পড়েই। ইন্দ্রনাথের ভেতরের স্বভাবটাও মাঝে-মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ত আর থমকাতো শিবানী। এই থমকানোই হয়ত একদিন একেবারে থেমে পড়ায় চলে যেত, কিন্তু ইন্দ্রনাথের স্বভাবে আর কিছু থাক আর নাই থাক, আছে লেগে থাকবার ক্ষমতা। এ ক্ষমতাটা না থাকলে হয়ত শিবানীকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না।

তবে কী শিবানী কেবল ইন্দ্রনাথের লেগে থাকার জন্য তাকে বিয়ে করছে?

তা কী হয়? তা কী কেউ করে?

অবশ্যই 'ভালো-লাগা' ছিল শিবানীর ইন্দ্রনাথের প্রতি।

অবশ্যই 'ভালোবাসা' ছিল শিবানীর ইন্দ্রনাথের প্রতি।

যখন আকাশে কালো মেঘ করে আসত, বাতাসে ঝড়ের শব্দ উঠত, শিবানী চঞ্চল হয়ে উঠত বেরিয়ে পড়বার জন্য, আর তক্ষুণি গাড়ী নিয়ে উপস্থিত হয়ে চমকে দিত ইন্দ্রনাথ ওকে। তখন ভীষণ ভালো লাগত ইন্দ্রনাথকে ওর। দু'হাত তুলে আনন্দে বলে উঠত, কী মজা! গাড়ী এনেছেন তো?

নিশ্চয়।

বেরুবেন? ঝড়ের ভেতর বেরুতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। মা গাড়ীটা বেচে দিয়ে এমন বিপদে ফেলেছেন।

নিশ্চয় বেরুব। সে জন্যই তো এলাম।

এটা বাজে কথা। আপনার সঙ্গে তো এই সবে পরিচয়। আপনি জানলেন কী করে ঝড়ের ভেতর বেরুতে আমি ভালোবাসি?

যদি বাসেন—

ও—হেসে উঠল শিবানী। তৈরী হয়ে এসে বলল, যত দূর খুশী যাবো?

যত দূর খুশী।

তাড়া লাগাবেন না ফেরবার জন্য?

একটু সময় চুপ করে থাকত ইন্দ্রনাথ। সন্ধ্যার কিছুটা অবশ্যই শিবানীকে দেওয়া যায়। দিতে এসেছেও সে। কিন্তু পুরোটা...

ঐ তো ভাবনায় পড়ে গেলেন তো খুব? ভেবেছিলেন গাড়ী দেখে নেচে উঠেছে, বাচ্চাদের মতো একটু গাড়ীতে তুলে এনে ছেড়ে দেব।

হেসে ফেলেছিল ইন্দ্রনাথ। বলেছিল, চলুন তো দেখা যাক কে আগে ফেরার কথা বলে। আপনার মার কাছে জবাব দেবেন আপনি।

অবশ্যই সে দায়িত্ব আমার।

লম্বা ড্রাইভ দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। ডায়মণ্ড হারবারের কূল পর্যন্ত। জলে বৃষ্টিতে ভিজেছিল ওর সঙ্গে সমান তালে। ভালো লেগেছিল শিবানীর।

কিছু খাবেন কোথাও নেমে?

খাবো...আচ্ছা।

গাড়ী থেমেছিল একটা রাস্তায়। হঠাৎ বিনীত কণ্ঠে অনুমতি প্রার্থনা করেছিল ইন্দ্রনাথ—আমি একটু ড্রিঙ্ক নিতে পারি?

ড্রিঙ্ক!

ঘাবড়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ শিবানীর বিস্ময়ে। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, না না। থাক।

ভদ্রলোক ওর জন্য অনেক কষ্ট করেছেন আজ। ওকে খুশী করার জন্য জলে-বৃষ্টিতে কাদায় দামী স্যুট, দামী জুতো নষ্ট করেছেন। ওর জন্য না হলে ইন্দ্রনাথ কখনই ভেজবার জন্য আর ঝড় দেখবার জন্য ডায়মণ্ড হারবারের দিকে ছুটতেন না—

শিবানী না হয় একটু ছাড়ল তার দিক ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে। কি হবে ওর কাছে বসে একদিন ড্রিঙ্ক করলে। ভাবল অনুমতি দেয়। কিন্তু দিল না। কিছু হবে বলে নয়। কিছু হবে না জেনেও। প্রথমত এ ছাড়াটুকুই হবে অনেকখানি ছাড়া—অনেকখানি ঢিলে দেওয়া। দ্বিতীয়ত অনেক চলা আছে সে চলা বলে। একটি ছেলে যদি একটি মেয়ের কোমরে হাত জড়িয়ে সন্ধ্যায় গঙ্গার পারে হাওয়া খায়—তবে সে চলা বলে। যদি প্রতিদিন একটি ছেলে-মেয়েকে একসঙ্গে রেস্তোঁরায় খেতে গল্প করতে দেখা যায়, তবে সে চলা কিছু বলে। যদি কোন মেয়েকে নিয়ে কাউকে ড্রিঙ্ক করতে দেখা যায় তবে সে চলাও কিছু বলে। এই চলাটা যতক্ষণ সত্য নয়, ততক্ষণ কী করে সে ইন্দ্রনাথকে তার সামনে গ্লাস হাতে নিতে দিতে পারে? সেদিন ওর সঙ্গে বসে ঠাণ্ডা ক্রিম কফি খেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। তখন বোঝে নি আজ বোঝে শিবানী কতটা কষ্ট সেদিন ইন্দ্রনাথ তার জন্য করেছিল। প্রায় প্রতি টেবিলে সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গিনীর হাতে সাদা, সোনালী, লাল, নীল বর্ণের রকমারী পানীয়ের গ্লাস। ওয়েটার আসছে যাচ্ছে ট্রের উপর নানা চেহারার, নানা লেবেল আঁটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে— সেখানে বসে ইন্দ্রনাথকে কিঁনা অল্প অল্প ঠোঁট ডোবাতে হয়েছিল সেদিন কফির কাপ নিরীহ বালকের মতো!

তবে কী শিবানী জানত না ইন্দ্রনাথের মদ খাওয়ার অভ্যাসের কথা?

জানত।

কিন্তু ও নিয়ে সে ভাবিত হয়নি। বাবাকে সে ড্রিঙ্ক করতে দেখেছে। ডিনার টেবিলে পরেশনাথ স্ত্রী-মেয়েদের সঙ্গে বসেই ড্রিঙ্ক করতেন। অফিস থেকে ফিরে একটা দীর্ঘ সময় নেওয়া স্নান সারতেন। তারপর সিল্কের বর্মি লুঙ্গীর উপর আদ্দির পাঞ্জাবী চাপিয়ে এসে বসতেন বারান্দায়। হাতে থাকত হুইস্কির গ্লাস। ওদের নিয়ে বসতেন আসর জাঁকিয়ে। একদিকে সিগারেটের পর সিগারেট ধরাতেন আর একদিকে আস্তে আস্তে চুমুক দিতেন গ্লাসে। শিবানী দেখত, সারাদিনের সাদা বাস্তব মানুষটা ধীরে ধীরে কেমন রঙ্গিন হয়ে উঠছে। চোখে ঘোর আসছে। কণ্ঠে আবেগ। কথায় দরদ। অন্তর মেলে ধরছেন ওদের কাছে। দিনের পরেশনাথের চাইতে রাতের পরেশনাথের ভেতর অনেক বেশী উত্তাপ দেখতে পেতো শিবানী। রোমাঞ্চ জাগাত রাতের পরেশনাথ তার মনে। সুন্দর লাগত। ভালো লাগত। আবেশময় লাগত তখন বাবাকে ওর।

ইন্দ্রনাথ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। একদিনের বেড়ানো ওদের প্রতিদিনে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে ইন্দ্রনাথ এক-আধটুকু যে ড্রিঙ্ক করেও আসছে, তা শিবানী বুঝতে পারল। সে ড্রিঙ্ক করা খারাপ লাগা তো দূরের কথা, আরো রোমাঞ্চ জাগাত শিবানীর দেহ-মনে। যেমন রোমাঞ্চ জাগাত রাতের পরেশনাথ তেমনি রোমাঞ্চ জাগাত ইন্দ্রনাথ। অনেক বেশী রোমান্টিক লাগত— লাগত অনেক বেশী সুন্দর।

ড্রিঙ্কের কুৎসিত দিকটার সঙ্গে তার তখন ঘরোয়া পরিচয় ছিল না। জানা ছিল না এ বস্তু মানুষকে কোথায় তলিয়ে নিয়ে যায়। জানা ছিল না কত ক্লেদ এ বস্তু টেনে আনে জীবনে। আজ শিবানী বোঝে সমাজ যে বস্তুকে ঘৃণা করার রায় দেয়, তা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার পরই দেয়। আজ শিবানী ড্রিঙ্ক করাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে শুভরাত্রির দিন থেকে।

ইন্দ্রনাথ অনেক—অনেকগুলো দিন শিবানীকে দিয়েছিল, বিয়ের পর আর পারল না। পারার দরকারটাই বা কী। বিয়ে তো হয়ে গেছে। এখন আর ড্রিঙ্কের গ্লাস হাতে নেওয়ার জন্য শিবানীর অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। গ্লাসের পর গ্লাস, পেগের পর পেগ সে খেয়ে যেতে পারে তার ইচ্ছেমত। অবশ্য প্রথম যখন ইন্দ্রনাথ বিয়ে-বাড়ীর নেমন্তন্নের পাট মিটলে, অতিথি-অভ্যাগতের দল চলে গেলে গাড়ীটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছিল চৌরঙ্গীর দিকে, তখন তার মনে মহৎ বাসনা ছিল দু-তিন পেগের বেশী আজ সে খাবে না। কিন্তু দুইয়ের পর তিন পেগ যখন হয়ে গেল, তখন ইন্দ্রনাথকে ইন্দ্রনাথ নয়— চালনা শুরু করে দিল পেগের গ্লাস। যখন টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, তখন বারবার বলতে লাগল, ঠিক হলো না...এটা ঠিক হলো না। ফুলশয্যার ফুলের বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে শিবানীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল, আজকের দিনটা ক্ষমা করো শিবানী। আর কখনও হবে না...কখনও না।

সেদিন ক্ষমা করেছিল শিবানী।

তারপরও অনেকবার ক্ষমা করেছে সে। অনেকদিন ক্ষমা করেছে। কিন্তু এখন আর করে না। বিশেষ করে একটা রাতের পর থেকে আর করে না।

তখনও ওরা ওদের এই জর্জকোর্ট রোডের বাড়ীতে আসেনি। ইন্দ্রনাথদের বাড়ীতে দু'দুটো বিয়ে হয়ে গেছে ক'দিন আগে। বাঙালী বাড়ীর বিয়ের হৈ হট্টগোল এমনই নিদারুণ ব্যাপার যে, বিয়ে মিটে গেলে বাড়ীর স্বাভাবিক অবস্থাটাকেই কেমন যেন হঠাৎ নীরব নিঃসহায় ঠেকে। যদিও রাত খুব বেশী হয়নি তবু এরই ভেতর খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে নিয়ে যে যার ঘরে গিয়ে এ ক'দিনের অনিদ্রা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য শুয়ে পড়েছিল। বেশীর ভাগ ঘরের আলোই ছিল নেভানো। বাড়ীটাকে অসহায় ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল। বাতাস যেন কিছু নেই, 'কেউ নেই' সুরের দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। কিন্তু বাড়ী থেকে একটি লোকও কমেনি। মেয়েকে যেমন পরের ঘরে দিয়ে আসতে হয়েছে তেমনি পরের মেয়েকে ঘরেও আনা হয়েছে। তবে?

গাড়ীবারান্দার ছাদে বসে নববিবাহিত দেবর কালীনাথ আর নববধূ ললিতার সঙ্গে গল্প করতে করতে এ কথাটাই ভাবছিল শিবানী। কেন এই আকাশে বাতাসে কিছু নেই, 'কেউ নেই'-এর সুর? এ কী কেবল ওর মনের সুর, না সবার মনেই এই সুর বাজছে? বাড়ীর মেয়ে চলে গেছে—বাড়ীর বাতাসে নেই নেই সুর কিছুদিন থাকবেই। কিন্তু ওর মনে কেন এ সুর কাঁদবে? ওর তো মেয়ে চলে যায়নি। এই তো ইন্দ্রনাথের দেওয়া মুক্তোর মালাটা ওর গলায় শুভ্র হাতের মতো ভালোবাসায় জড়িয়ে আছে। ইন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণছে সে। ইন্দ্রনাথ এলেই আর ও একা নয়— তবে...তবে কথার ফাঁকে আকাশের দিকে চোখ পড়লেই কেউ নেই, কিছু নেই-এর কান্না ওর গলা ঠেলে উঠে আসতে চাইছে কেন?

অনেকক্ষণ ধরেই ভেতরে ভেতরে উসখুস করছিল কালীনাথ। নতুন বৌ নিয়ে রাতেরবেলা বৌদির কাছে বসে থেকে আনন্দ পাবার কথাও নয়। মস্ত মস্ত দুই হাই তুলে কালীনাথ বলল, ঘুম পেয়ে গেছে। তুমি ঘরে যাবে না বৌদি?

ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়েছিল শিবানী। সে সামনে বসে থাকা কালীনাথ আর নববধূ ললিতার কাছ থেকে মনের দিক থেকে এত দূরে ছিল যে, তার খেয়ালই হয়নি, ওরা দুজন ওর জন্যই বসে রয়েছে। ও না ওঠা পর্যন্ত ওরা উঠে যেতে পারছে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। কী কাণ্ড দেখ তো? তোমরা আমার জন্য বসে রয়েছো—

ললিতা আপত্তি জানাল, বাঃ তা কেন হবে। আমরা তো গল্প করছিলাম।

কাল আবার গল্প হবে। ব্যস্ত হয়ে উঠল শিবানী। তোমরা ঘরে যাও।

কালীনাথ চলে গেল।

শিবানী তাড়া দিল ললিতাকে, তুমি যাও ললিতা।

ললিতা উঠে পড়ে বলল, আপনি যাবেন না?

শিবানী কী করে বলবে, সে ইন্দ্রনাথের অপেক্ষায় বসে আছে। বলল, যাবো একটু বাদে। হাওয়াটা ভারী ভালো লাগছে। একটু বসব আরো।

ললিতা ক'পা গিয়েছে এমনি সময় গাড়ী থামবার শব্দ হলো। ললিতা থেমে পড়ে বলল, কে যেন এলেন।

ললিতা নবাগতা। সপ্তাহও হয়নি সে এসেছে। সে জানে না ইন্দ্রনাথ বাইরে ছিল। বলল, এত রাতে কে এলেন?

শিবানী হেসে বলল, বাইরের কেউ নয়। এ বাড়ীরই ছেলে।

এবার একটু দুষ্টু হাসি দেখা গেল ললিতার ঠোঁটে। যেন সে বলতে চাইল, বলছিলেন হাওয়াটা ভালো লাগছে কিন্তু আমি বুঝে ফেলেছি কেন বসেছিলেন।

ইন্দ্রনাথ উঠে এলো ওপরে। কিন্তু তখন তার কোথায় কী বা কে কিছুই দেখবার মতো অবস্থা ছিল না। ডাইনে বাঁয়ে টাল খেতে খেতে ঘরের দিকে গেল।

উঠে দাঁড়াল শিবানী।

ইন্দ্রনাথ শরীরটাকে দরজার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালে।

আঁতকে উঠে ললিতা তাকাল শিবানীর দিকে।

শিবানী স্তব্ধ।

দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় শরীরটাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে ফেলল বটে ইন্দ্রনাথ কিন্তু ধাক্কাটা সামলাতে পারল না। মেঝের উপর পড়ে যাচ্ছিল, অস্ফুট কণ্ঠে শব্দ করে ছুটে গেল ললিতা। ইন্দ্রনাথের পড়ন্ত শরীরটা দু'হাতে ধরে ফেলল।

ললিতার দু'কাঁধ ধরে নিজেকে সামলালো ইন্দ্রনাথ। সে ভেবেছিল শিবানী। কিন্তু ললিতাকে দেখে চিনতে না পেরে বিস্ময়ে বলে উঠল, তুমি কে ? তোমাকে তো চিনতে পারছিনে!

ললিতা ইন্দ্রনাথকে কোচের দিকে নিয়ে যেতে যেতে ছোট করে বলল, আমি নতুন এসেছি।

কবে এসেছ? এ্যাঁ কবে? যেন গভীর ঘুমের জগৎ থেকে কথা বলছে ইন্দ্রনাথ।

দিন ক'য়। ইন্দ্রনাথকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে পেছন ফিরতে যাচ্ছিল ললিতা, ইন্দ্রনাথ হাত চেপে ধরল তার। এমনিতেই ভয় ভয় করছিল ললিতার, এবার আতঙ্কে কেঁপে উঠল সে।

কেঁপে উঠল ছাদের উপর শিবানী। ছুটে এসে ঘরে ঢুকল সে। কিন্তু না নিজের, না ললিতার, না ইন্দ্রনাথের কারু সম্মান রক্ষা করতে পারল না সে। ততক্ষণে ইন্দ্রনাথের জড়িত জিহ্বা বলে ফেলেছে, নতুন মেয়ে, একটা চুমু খেয়ে যাও না।

॥ ৩ ॥

সেদিন অসহ্য অপমানে মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছিল শিবানীর। প্রথম মুহূর্তে মনে হয়েছিল ইন্দ্রনাথের গালে চড় কশিয়ে দেয়, ঠিক যেভাবে রাস্তার লোক হলে এখন চড় কশাত। ইচ্ছাটাকে সে দিন সামলাতে হয়েছিল শিবানীর। তবু দু'পা সে এগিয়েছিল কেন সে বলতে পারে না— কি করত তাও সে জানে না—কিন্তু ততক্ষণে নববধূ ললিতা। আশ্চর্য রকম উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেলেছে—সত্যি আশ্চর্য রকম।

শিবানী ভেবেছিল ললিতা ইন্দ্রনাথের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাবে। এ অবস্থায় তার পক্ষে আর কিছুই করার থাকতে পারে না। কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে দেখল, ললিতার ভীত দৃষ্টি মুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠল। ইন্দ্রনাথের হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা তো সে করলই না বরং আরো দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো। ইন্দ্রনাথের মাতাল হাতের মুঠোয় যেমন জোর ছিল না তেমনি জোর ছিল না তার হাতের আকর্ষণের ভেতর। তাই ইন্দ্রনাথের টানের ঝোঁক সামলাতে শরীরটাকে ঐটুকু শক্ত করার বেশী কিছু করতে হলো না ললিতাকে। টাল সামলেই ইন্দ্রনাথের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল সে! তারপর বসে পড়ল ঝপ করে ইন্দ্রনাথের পায়ের কাছে। ইন্দ্রনাথের পা টেনে নিতে নিতে শিবানীকে সম্বোধন করে বলল, শিবানীদি, আপনি দাদার গলার টাই আর কোট খুলে নিন, আমি জুতো মোজা খুলে নিচ্ছি। ভীষণ ঘামছেন। বোধ হয় অসুস্থ বোধ করছেন।

যেন ইন্দ্রনাথ ওকে চুমু খেতে বলার কথা ও শুনতে পায় নি। বা এমন কথা ইন্দ্রনাথ উচ্চারণ করে নি। যেন ইন্দ্রনাথ মাতাল নয়—অসুস্থ। ও অসুস্থ হয়ে ফেরা ভাসুরের পায়ের তলায় বসল সেবা করবার জন্য।

ততক্ষণে শিবানীর দিকে ইন্দ্রনাথের চোখ পড়েছে। পা টেনে নিয়ে দু'চোখ বুজে লম্বা কৌচের উপর টান হয়ে শুয়ে পড়ছে ইন্দ্রনাথ! নতুন দেখা ভ্রাতৃবধূর মুখ যেমন সে ঘোর চোখে চিনতে পারে নি—অপরিচিত মুখের সঙ্গে নিজের শোবার ঘরটাকেও তেমনি ইন্দ্রনাথের ঠেকেছে অপরিচিত। এখন বুঝতে পেরে—কিংবা হয়ত কিছু বুঝতে না পেরেও কেবল শিবানীকে দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সে। মাতাল যেমন নিজেকে ছেড়ে দেয় তেমনি সামলায়ও। চোখ বোজা আর ঘুমের ভেতর বড় ফাঁক থাকে না মাতাল মানুষের। মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল ইন্দ্রনাথ।

বাইরের বারান্দা দিয়ে একটা চটির শব্দ প্রায় দরজা পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গেল। প্রতীক্ষারত কালীনাথ বধূর খোঁজে এসে বধূ দাদা-বৌদির ঘরে বুঝতে পেরে ফিরে গেল। শিবানী দেখল, ইন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়েছে—কালীনাথ ললিতাকে ডাকছে—তবু ললিতা গেল না।

কেন?

সে আরো, আরো সহজ স্বাভাবিক আবহাওয়া করে দিয়ে তবে যেতে চায়।

কাল যেন ওরা দু'জন (ইন্দ্রনাথের কথা ললিতা একেবারেই ভাবছে না। সে জানে কাল এসব কোন্ কথাই তাঁর মনে থাকবে না।) ললিতা ভাবছে ওর আর শিবানীর কথা। ওরা যেন কাল পরস্পরের সম্মুখীন হতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ না করে।— কালকের সকালের আলোয় যেন ওরা দু'জন লজ্জায় পরস্পরের কাছে মুখ লুকোতে না চায়।

ললিতা ইন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পায়ের জুতো-মোজা খুলতে খুলতে বলল, এ ভাবে জুতোটুতো সুদ্ধ ঘুমোতে বড্ড কষ্ট হবে। আমি খুলে দিচ্ছি।

ললিতা ইন্দ্রনাথের পায়ের জুতো মোজা খুলল। তারপর পায়ের কাছ থেকে ঘুরে মাথার কাছে এসে গলায় টাই-এর ফাঁসটা দিল ঢিলে করে। মাথার তলায় ঢুকিয়ে দিল একটা বালিশ খাট থেকে তুলে এনে।

ও কী ভীষণ ঘামছেন। সব ভিজে গেছে! আঁচল দিয়ে ইন্দ্রনাথের কপালের ঘাম মুছে দিতে লাগল ললিতা।...না, ললিতা শোনে নি ইন্দ্রনাথ কী বলেছেন।

কিংবা সে জোর করে বলতে পারে, ইন্দ্রনাথ কিছু বলেন নি।

যদি বলতেন তিনি আর ললিতা শুনত তবে কী সম্ভব ছিল ললিতার পক্ষে ইন্দ্রনাথের কপালের ঘাম আঁচল দিয়ে মোছা?

ললিতা কী নির্লজ্জ?

কিচ্ছু ঘটে নি।

ইন্দ্রনাথের কপালের ঘাম মুছে উপরের দিকে তাকাল ললিতা— কী কাণ্ড। পাখা খোলা নেই! ঘামবে না তো কী!

তরতর করে ঘরের কোণে গিয়ে রেগুলেটারটা 'অনে' ঘুরিয়ে দিল সে। তারপর শিবানীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, শিবানীদি—আপনার গায়ে সন্ধ্যেবেলা ভীষণ মিষ্টি একটা সেণ্টের গন্ধ পাচ্ছিলাম-—সে সেণ্টটার নাম কি?

শিবানী এবার একটু হাসল।

কিন্তু তাও দেখল না ললিতা। আবার বলল, সেন্টটা কী?

শিবানীকে জবাব দিতে হল। বলল, স্যানেল।

স্যানেল! কই এ নামের সেন্ট তো দেখি নি। কোথায় পাওয়া যাবে? মার্কেটে?

না। এখানে কোথাও পাবে কি না আমি জানি নে। আমাকে একজন প্যারিস থেকে এনে দিয়েছেন।

ও, তাই বলুন। একটু শিবানীর দিকে এগিয়ে গিয়ে গভীর নিঃশ্বাস টেনে বলল ললিতা—ইস্, গন্ধটা এখনও তেমনি তাজা রয়েছে। যেন এইমাত্র দিয়ে এলেন। কী মিষ্টি আর নরম গন্ধটা; আঃ! বিলিতি না হলে এমন গন্ধ হয়।

তুমি নেবে একটা শিশি?

একটা শিশি নেবো? অনেকগুলো আছে নাকি?

এক একটা বাক্সে দু'রকম গন্ধের দু'টো করে শিশি আছে। সত্যি যদি তোমার ভালো লেগে থাকে, তোমার পছন্দমত গন্ধ নিতে পারো।

কই দেখি?

শিবানী ড্রেসিং টেবিলের কাছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ললিতাও গেল। ড্রয়ার থেকে সেন্টের বাক্সটা বের করে ললিতার কাছে মেলে ধরল শিবানী। ললিতা সবগুলো শিশির উপর চোখ বুলিয়ে গন্ধের নামগুলো পড়ে গেল একবার—তারপর একটা শিশি তুলে নিয়ে গেল ললিতা চলে গেলে মনে মনে মেয়েটিকে সাধুবাদ দিয়েছিল শিবানী।

তারপর সারা রাত নির্ঘুম চোখে বসে বসে কেবল ভেবেছিল।

আগে সে ভাবত।

এখন আর ভাবে না।

আগে সে ইন্দ্রনাথকে ক্ষমা করত।

এখন আর ক্ষমা করে না।

এখন সে কেবল নিজের খুশী মতো চলে। মর্জি মতো চলে। থেমে সে কিছুতেই যাবে না—কিছুতেই নয়। জীবন যদি তার কোন আনন্দ, কোন সার্থকতা সঙ্গে নিয়ে না এসে থাকে, ওর চলার আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ওর চলা যদি এমন চলা হয় যে, পথের শেষে দেখে যেখান থেকে ও যাত্রা শুরু করেছিল—পরে এসে আবার সেখানে পড়েছে—এক পা—এক পা'ও এগুতে পারে নি, তবু সে চলবে। অসহ্য ওর কাছে জীবনের স্থবিরত্ব। ওর এই দুরন্ত চলা—ইন্দ্রনাথের বেহালার পৈতৃক-বাড়ীতে থাকলে সম্ভব হতো না। যত খাতির আর সমীহই ইন্দ্রনাথকে তার পরিবার করুক, শিবানীকে পরিবারের ইচ্ছে-অনিচ্ছে ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে কিছুটা মেনে চলতেই হতো। পুরোনো পরিবারের পারিবারিক কানুনকে কিছুটা সম্মান দেখাতেই হতো। আর ওর সংগ্রাম ইন্দ্রনাথের সঙ্গে, তার পরিবারের সঙ্গে নয়। ওদের পারিবারিক মর্যাদার ধারণা আর সংস্কারকে অযথা আহত করে চলতে পারত না শিবানী। জর্জ কোর্ট রোডের বাড়ীতে সে স্বাধীন।

জর্জকোর্ট রোডের বাড়ীতে সে স্বাধীন?

কী করে?

তার স্বামী?

স্বামী?

যতদিন স্বামী ওকে না মানছে আর মান্য করছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মান্য মান্য—সম্মান।

হ্যাঁ সম্মান করার কথাই বলছে শিবানী।

বলছে, স্বামী যতক্ষণ না স্ত্রীকে সম্মান করছে—ততক্ষণ স্ত্রীরও স্বামীকে সম্মান করার প্রশ্ন আসছে না।

যেদিন ইন্দ্রনাথ এসে বলবে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা— সেদিন শিবানীও বলবে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—প্রেম-সঙ্গীতের এটাই আসল সুর।

নারী-পুরুষের জীবন-সঙ্গীতেরও তাই এ তানই আসল তান। এ ঐকতান যেখানে ধ্বনিত হয় না সেখানে মিলিত জীবন ব্যর্থ।

শিবানীর বিশ্বাস এ ঐকতান ওঠে না বলেই সর্বত্র আজ কেবল ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের চাপা দীর্ঘশ্বাস উঠছে আর পড়ছে। একটু যার শোনবার কান আছে সেই শুনতে পায় সে সব দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। একটু যার দেখবার চোখ আছে সেই দেখতে পায় এ সব মুখের সুখ মুখাবরণ মাত্র।

হিন্দুকোড বিলের এক মস্ত সমর্থক ছিল শিবানী। বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল সমর্থন করে পত্রিকায় ওজস্বী ভাষায় প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে। আচার্য কৃপালনীর 'ম্যারেজ ল রিফর্ম ইন্ ইণ্ডিয়া' পড়ে রাগে ক্ষেপে উঠেছে। শ্রীকৃপালনী বিবাহ-বিচ্ছেদ বিলের সমর্থক ছিলেন না। পরিষদে বিরুদ্ধতা করেছেন। প্রবন্ধটিতে নিজ মত যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তক্ষুণি কলম নিয়ে বসেছিল শিবানী উত্তর লিখতে ঃ

কৃপালনীজীর মতে নিতান্ত অসময়ে এ বিল পাশ হয়ে মেয়েদের জীবনে দুঃখ-দুর্ভোগ নাকি বাড়িয়ে চলবে বই কমাবে না। কারণ, আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও অর্থনৈতিক উপযুক্ততায় পৌঁছোয় নি।

এই উপযুক্ত না হয়ে ওঠার মন্তব্য আমরা দেশ স্বাধীনতার ব্যাপারেও বহু জনের মুখে শুনেছি। তাঁদের মতে আমাদের আজকের সব দুঃখের মূল—অনুপযুক্ত দেশের হাতে স্বাধীনতা অর্পণ। আরো কিছুকাল ইংরেজ অধিষ্ঠানই নাকি ছিল মঙ্গলের। শ্রীকৃপালনীজী নিশ্চয়ই এই মতাবলম্বীদের সঙ্গে একমত হবেন না। তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, মনুষ্যত্বের অপমান আর লাঞ্ছনা ভোগার চাইতে দুঃখ-দুর্ভোগের ভেতর দিয়ে চলতে চলতেই আমার দেশ উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

আমরা মেয়েরাও তাকে সে কথাই বলব। আরো বলব—বিশ্বের বেশীর ভাগ কাজই এগুতে এগুতে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয়। উপযুক্ত হয়ে এগুবার অপেক্ষায় বসে থাকলে সমস্ত জীবনেও উপযুক্ত হওয়া হয়ে উঠে না। আর দুঃখের ভয়? দুঃখর ভয় কিছু শেখায় না। কেবল ভয় বাড়ায়, কেবল আতঙ্কিত করে। কাছে গিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরলে তবেই ভয়, ভয় পায়।

কৃপালনীজী জিজ্ঞাসা করছেন, বিচ্ছেদ ঘটে গেলে এ সব মেয়েদের অবস্থাটা কী হবে? তাদের বিয়ে করবে কে? সন্তান সমস্যাটা তো দুরন্তই আর সন্তান না থাকলেও বিয়ে করবার বেলা কুমারী কন্যায় পুরুষের বিশেষ পছন্দ।

হায় ঈশ্বর! কুমার কী মেয়েরাই কম পছন্দ করে? দোজবরে একাধিক সন্তানের পিতাকে বিয়ে করতে নারীমনই কী আনন্দে পাখা মেলে দেয়? পুরুষের কাছে আপন সম্ভোগের মূল্য এতো বেশী যে, তারা চিরকাল নারীমন দাবিয়ে রেখে, এমনি সব অপূর্ব এক তরফা যুক্তি দিয়ে তরুণী আর কুমারী লোভ করে আসছে—ভোগ করে আসছে।

নারী নাকি বুড়ো হয় পুরুষের চাইতে অনেক আগে। সব পুরুষের তাই মত— কৃপালনীজীরও। তিনি বলছেন, মেয়েরা বুড়ো হয় পুরুষের চাইতে অনেক আগে। তখন তারা আশ্রয় পাবে কোথায়?

তা যায়। দেখা গেছে, যে দেশ যত অসভ্য আর বর্বর সে দেশের নারীর যৌবনকাল তত অল্প। এমন সব দেশও নাকি আফ্রিকায় আছে, যেখানে কুড়ি বছর বয়স পার হলে নারীকে মেরে ফেলা হয়। আমাদের দেশ সে অবস্থা থেকে কতদূর এগিয়েছে জানি নে,—আদবে এগিয়েছে কি না তাও বলতে পারি নে। কতগুলো কথা আছে শুনলে যেন কেমন গাটা ঘৃণায় কুঁকড়ে ওঠে। পুরুষের কুমারী পছন্দ করা, নারীর আগে বুড়িয়ে যাওয়া— সে জাতীয় কথা। নারীর মর্যাদা তো দূরের কথা, পুরুষের মর্যাদারই কী কিছু অবশিষ্ট থাকে?

নারীর থাকার চিন্তা? পূর্বকালে কুলীন কন্যারা কী যৌবনে কী বার্ধক্যে থাকত কোথায়? বর্তমানে বিধবা নারী থাকে কোথায়? স্বামী-ঘরচ্যুত নারীর সংখ্যা এখনও কম নয়, তারা আছে কোথায়? সুখের আশায় ঘর বেঁধে দেন যারা— সে ঘর দুঃখের হয়ে উঠলে ফের বুকে ফিরিয়ে আনেন তাঁরাই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রয়োজনে যা চলছিল, তাই চলবে।

যদি এ বিল পাশ করতে হয় তবে কেবল নারীর জন্য পাশ করবার পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীকৃপালীনী। নারী পারবে প্রয়োজনে বিচ্ছেদ চাইতে— পুরুষ নয়। পুরুষের হাতে এ আইনের অপব্যবহার হবার সম্ভবনা বেশী।

শিবানীর কলম ঝড়ের বেগে ছুটে চলল ঃ আমরা বলি, তাও ভালো—তাও ভালো। যা করবার ছেড়ে দিয়ে করতে হবে, বেঁধে রেখে পারবে না— সেই মস্ত মুক্তি, মস্ত মুক্তি।

প্রায় গোটা পৃথিবী যে আইন মেনে নিয়েছে আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকব সেখানে কিসের গর্বে? পুরোনো ঐতিহ্য? সমাজের কাছে থেকে তার বর্তমানটাই বড় কথা।

তাই যুগে যুগে তার রূপ বদলায়। আগে টাকা ছিল, এখন না থাকলেও চলবে। অনেক খেয়েছি আগে, আর না খেলেও চলবে—এ যেমন হয় না, তেমনি পুরোনো দিনের দিকে তাকিয়ে বর্তমান পার করা যায় না। আর পুরোনো ঐতিহ্য ? তাই বা কী ? কত মর্মন্তুদ ঘটনা যে মেয়েদের জীবনে ঘটেছে ইতিহাসের পাতা ওল্টালে তা দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু লাভ কী। অতীত— অতীত। সে পাঁক ঘেঁটে ঘটনা টেনে বার করবার উৎসাহ নেই— বাড়িয়ে তুলে ঐতিহ্য বলে গৌরব করতেও নারাজ। শুধু বর্তমান গড়ে উঠুক দশটা সভ্য জাতির মতো— এই আমরা চাই।

লেখা একেবারে কাগজের অফিসে পাঠিয়ে তার পর ঠাণ্ডা হয়েছিল শিবানী। তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হলে দিদিকে লিখেছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হয়ে আমাদের মেয়েদের জীবনে যে কী উপায়হীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে দিল— কী নিঃসীম অন্ধকারে দিল আলো জ্বালিয়ে তা বুঝতে আমাদের আরো কিছু সময় লাগবে। বহুক্ষণ অন্ধকারে কাটালে অতর্কিত আলো চোখ সহ্য করতে পারে না— চোখ নিজে বুজে থেকে অন্ধকার খোঁজে জানি আমাদের আরো কিছু সময় তেমনি যাবে—তবু আলো-আলোই রে দিদি।

শিবানীর কী তবে এখন নিজের চোখ বন্ধ রেখে অন্ধকার খোঁজার সময় চলছে?

না আজ তার ও পথটাকেই অন্ধকার ঠেকছে।

মা!

কাচ্চি এসে শিয়রে দাঁড়ালো শিবানীর। আস্তে আস্তে আবার ডাকল, মা উঠবে না?

কাচ্চির মা ডাকটা ভালো লাগে।

শিবানীর প্রশ্রয় পেয়ে ইন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সে তাই মা-ই ডাকে তাকে। ইন্দ্রনাথের সামনে মা ডাকার সাহস তার হয় না। তখন সে ডাকে মেমসা'বই।

শিবানী যে জেগেছে, দু'বার এপাশ-ওপাশ করে কাচ্চিকে তা বুঝিয়ে দিল, কিন্তু সাড়া দিল না।

শিবানী জেগেছে দেখে জানালাগুলো খুলে দিল কাচ্চি। রোদ এসে ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল।

পুবের রোদটা যেন হঠাৎ উষ্ণ হাতে গলা জড়িয়ে ধরল শিবানীর। আলোর তীব্রতায় চোখ মুখ কুঁচকে বিছানার উপর উঠে বলল সে। ধমক দিল কাচ্চিকে, বুদ্ধু একটা তুই। ঘুমন্ত মানুষের মাথার উপরের। জানালা এ ভাবে দুম্ করে খুলে দিতে হয়!

ঘুমিয়ে কোথায় তুমি মা। তুমি তো জেগেই ছিলে, জানালা খুলে না দিলে কী তুমি উঠতে?

সত্যি—শিবানী জেগেছে তো অনেকক্ষণ। জন্মদিনের সকালটায় চোখ মেলতে ইচ্ছে করছিল না তার। দিনটাকে সে ফেরৎ পাঠাতে চাচ্ছিল—শুধু জন্মদিনের দিনকে নয়, প্রতিটি দিনকে সে দু'হাতে ঠেলে ফেরৎ পাঠাতে চায়।

দিন কী ফেরৎ যায়!

যায় না যে সে কথা শিবানী মানে।

তবে?

মানুষের যত মাথা খোঁড়া তো অসম্ভবের পায়।

একে অসম্ভব—অসম্ভব। তাতে তার চোখ নেই। কান নেই। দেখতেও পায় না। শুনতেও পায় না যে।

জানালা দিয়ে দিগন্তের ঘন নীল আকাশের দিকে চোখ পাতল শিবানী ঃ অসম্ভব নয় দেখতেও না পেল, শুনতেও না পেল কিন্তু যিনি দেখতে পান, শুন্তে পান—এমন কেউ কী নেই...

নাও এসো চুল খুলে দি—শিবানীর মাথা টেনে নিয়ে বিনুনি খুলতে বসল কাচ্চি। যে দিন উঠতে দেরী করে ফেলে বিছানার উপর বসেই শিবানীর চুল খুলে দেয় কাচ্চি। শিবানী একেবারে স্নান করে চায়ের টেবিলে যায়। বেণী খুলতে খুলতে কাচ্চি বকবক করে চলল, আজ তোমার জন্মদিন, কোথায় সকাল করে উঠে স্নানটান করে, ঠাকুর প্রণাম করবে—

আমার জন্মদিন তোকে এ খবর দিল কে?

বলবে আবার কে। আমি বুঝি জানি নে শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে তোমার জন্মদিন আর বৈশাখের মাঝামাঝি বিয়ের দিন। তোমার মার কাছ হ'তে দুবারই উপহারের শাড়ি-কাপড়-জামা আসে। ঐ তো কাল সন্ধ্যায় এসে রয়েছে, এখন পর্যন্ত দেখোও নি মা কী পাঠিয়েছে। স্নান করে মা'র পাঠানো শাড়ী পরো—বুঝলে মা।

ইন্দ্রনাথের কাছে কাচ্চি ঝি বা আয়া। কাচ্চি নামটাও ইন্দ্রনাথেরই দেওয়া। নইলে তার নাম কচি। ইন্দ্রনাথ এমন বাঙ্গালী 'কচি' নাম নরম গলায় ডাকতে পছন্দ করল না। সে বাঙ্গালী ঝি রাখতেই রাজী ছিল না। শিবানীর জন্য রাখতে হয়েছে। শিবানী বলে, হিন্দুস্থানী আয়া রাখব! ঘরে বসে দিন-রাত হিন্দী বলিয়ে নেবে জোর করে — বোকা আর কাকে বলে। এক গুচ্ছের মাদ্রাজী হিন্দুস্থানী আয়ার ভেতর মনোনীত করল শিবানী কচিকে। ইন্দ্রনাথ কচি নামকে করে নিল কাচ্চি। কাচ্চি জানে সাহেবের ওকে একটুও পছন্দ ছিল না। ইন্দ্রনাথের কাছে তাই সে খুব সতর্ক হয়ে চলে। কিন্তু শিবানীর সঙ্গে চলনটা তার কিছুটা সখীর কাছ ঘেঁষা। সম্মান করা আছে, সমীহ করা আছে। ভালো-মন্দ বলা আছে, আব্দার-অভিমান করা আছে। শিবানীর মা'র উপহারের প্যাকেটটা তার হাতে এনে ধরে দিয়ে বলল, নাও খোল। আমি দেখছি, তোমার মুখ ধোবার জল জুড়িয়ে গেছে কি না।

শিবানী রাতে শোবার আগে আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঈষদুষ্ণ জলে মুখ ধোয়। জল একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখে কাচ্চি বাটি হাতে ছুটল গরম জল আনতে।

সত্যি মা'র উপহার পড়ে রয়েছে টেবিলের উপর বিকেল থেকে। এখন পর্যন্ত ও খুলেও দেখে নি। কালকে বাড়ী ফিরেছিল অনেক রাতে। সেই সকাল ন'টায় বেরিয়ে ফিরেছিল বারোটার পর নাইট শো'তে ছবি দেখে। বড্ড ক্লান্ত লাগছিল। প্যাকেটটা আর খোলা হয় নি। অনিচ্ছার কাজ আর অনিচ্ছার সঙ্গ মানুষকে এতো ক্লান্তও করে! তবু অমল ওর বস। সে যখন এসে, কখনো বেড়াতে যাবার, কখনো ছবি দেখতে যাবার, কখনো বা কোথায় গিয়ে বসে খাবার আমন্ত্রণ জানায় তখন আপত্তি করে না সে। না তেঁতো, না মিষ্টি, একটা স্বাদহীন সময় কাটিয়ে বাড়ী ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কাল তাই পড়েছিল। কালকে ও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথকে দেখে। বারোটা শিবানীর পক্ষে রাত হলেও ইন্দ্রনাথের কাছে নয়। সে এমন সময় বাড়ী ফেরে না কখনও। কিন্তু কাল উপরে এসে দেখল বারান্দায় সবগুলো বাতি জ্বলছে। ইন্দ্রনাথ সেই আলোকিত বারান্দায় পাইপ হাতে ধীর পায়ে পায়চারী করছে। শিবানীর বারান্দা অতিক্রম করে ঘরে যাওয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ইন্দ্রনাথ পাইপ দাঁতে চেপে।

এটা কি ইন্দ্রনাথের শিবানীর জন্য প্রতীক্ষা করা ছিল?

না। শিবানী জানে, ওকে ইন্দ্রনাথ দেখছে এ কথাটাই শিবানীকে বোঝাচ্ছে ইন্দ্রনাথ।

শিবানী জানে, ইন্দ্রনাথের দাঁতে চাপা পাইপের গায়ে দাঁতের দাগ বসে গেছে।

এক্ষুণি সে ঘরে গিয়ে তার খাস-বেয়ারাকে ডাক দেবে, আব্দুল...

॥ ৪ ॥

শিবানী যা ভেবেছিল, হলোও ঠিক তাই। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সে শুনতে পেলো, ইন্দ্রনাথের দাঁত চাপা গলার ডাক, আবদুল!

ডাকটা চাপা কিন্তু থিয়েটারের অভিনেতাদের ভেতরে টেনে নেওয়া কণ্ঠ যেমন গিয়ে পেছনের শেষ শ্রোতাটির কানেও পৌঁছে, ইন্দ্রনাথের এই চাপা দাঁতের ডাকও আবদুল এ বাড়ীর যেখানেই থাকতো শুনতে পেতো। কিন্তু সে কাছাকাছিই ছিল। থাকেও সে তাই। সাহেব যতক্ষণ বাড়ী থাকে, ততক্ষণ সাহেবের ডাকের সীমার বাইরে আবদুল কখনও যায় না। আর এখন তো সে সাহেবের এই ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। তার খালি পায়ে ত্রস্ত-ব্যস্ত শব্দ বারান্দা পার হয়ে গেল তক্ষুনি।

শিবানী ঘরে ঢুকে আর বাতি জ্বালল না। টানা বারান্দায় চার চারটা নিওন আলো একসঙ্গে জ্বলছিল। তার আলোই ঘরে এসে পড়ছিল। দেখল, কাচ্চি ঘরের মাঝখান জুড়ে আঁচল বিছিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়াল সে। মাথার কাঁটা টেনে খুলতে খুলতে ভাবতে লাগল, ইন্দ্রনাথ কখন ফিরেছে। নিশ্চয়ই খুব বেশীক্ষণ নয়। ওর অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে কাচ্চি ঘুমিয়ে পড়ার পর ইন্দ্রনাথ এসেছে। না'হলে কখনই কাচ্চি এ ভাবে ওর ঘরে ঘুমোত না। বরং শঙ্কিত হয়ে জেগে বসে থাকত।

ইন্দ্রনাথের ফেরার খবর সে জানে না। হয়ত কিছু আগে মাত্র এসেছে। তবু রাত বারোটায় আসা অবশ্যই ইন্দ্রনাথের সন্ধ্যারাতে বাড়ী আসা। তা যাই হোক— খোঁপার শেষ কাঁটাটা টেনে তুলে হাতের কাঁটাগুলো ড্রেসিং

টেবিলের উপর ফেলে দিল শিবানী—ইন্দ্রনাথ কখন এসেছে সেটা কিছু বড় কথা নয়। সে দু'ঘণ্টা আগে আসতে পারে। পারে চার ঘণ্টা পরে আসতে। ও যে আজ দেরী করে এসেছে এটাই ওকে ভীষণ তৃপ্ত করে তুলল। এই যে ইন্দ্রনাথ দেখল, রাত বারোটা বেজে গেছে, ও এখনো বাড়ী আসেনি। তারপর শব্দ পেলো গাড়ী থামবার। ওকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ী চলে যাবার—ব্যস্! নইলে ইন্দ্রনাথ যদি আজ এসে দেখত শিবানী চুপচাপ বসে আছে বা বই পড়ছে তবে ক্ষোভের সীমা থাকত না শিবানীর। ওর সকালবেলার সেই কথা—'আমিও রাত দু'টোয় ফিরতে পারি, তিনটেয় ফিরতে পারি—তিনদিন না ফিরতে পারি', জবাব মুহূর্তে শূন্য হয়ে যেত ইন্দ্রনাথের কাছে।

কিন্তু কাচ্চি করছে কী! দু'হাত উপরে তুলে রাতের জড়তা ভাঙ্গল শিবানী—এখনও কাচ্চি ওর মুখ ধোবার গরম জল নিয়ে আসতে পারলো না। ঘাড়টা একাত-ওকাত করল— কেমন যেন লাগছে ঘাড়ে। বোধ হয় বেমোচড়ে শুয়েছিল নয়তো কাল সিনেমা হলে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। হলের ঠাণ্ডাটা খুব বেশিই ছিল। ঘাড়ে কাচ্চিকে দিয়ে একটু উইণ্টোজেন মালিশ করাতে হবে...কাচ্চিটা বড্ড ঢিলে, আবদুলের মতো চটপটে নয়। আবদুল খাসা চাকর। খাস বেয়ারা হবার উপযুক্ত। নিঃশব্দ চতুর, বুদ্ধিমান। প্রভু যদি কেউ হতে চায় তো তার এমনি ভৃত্যই চাই। কাজেকর্মে চতুরতায় আবদুলের সঙ্গে কাচ্চির তুলনাই চলে না কোন রকম। আর কথা? কাচ্চির কথা থামানো এক এক সময় কষ্টসাধ্য হয়। সে সাবধান সাহেবের কাছে— ওর কাছে একেবারেই নয়। শিবানী যদি আবদুলের কম কথা বলার উল্লেখ করে, তবে কাচ্চি ভারি বিস্মিত হয়। বলে, আবদুল কথা বলবে কার সঙ্গে? সাহেবের সঙ্গে?

শিবানী চটে ওঠে কাচ্চির বড় বড় চোখ করা বিস্ময় দেখে। বলে, তবে তুই আমার সঙ্গে এত কথা বলিস কেন?

কাচ্চি নির্বিকার ভাবে জবাব দেয়, তুমি যখন মেমসাহেব তখন কি তোমার সঙ্গে কথা বলি? সাহেবের কাছে কী তোমার সঙ্গে কথা বলি? —ঘরে বলি। যখন মা ডাকি তখন বলি। ভীষণভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায় কচ্চি, যখন মেমসাব ডাকি তখন কক্-খনো কথা বলিনে। বলি? তুমিই বল মা?

মেমসাব ডাকে যখন তখন কথা বলে না, যখন মা ডাকে তখন কথা বলে, এ জবাবের আর উত্তর হয় না। শিবানীও যেন হেরে যায় কাচ্চির কাছে। যাই হোক, মানুষটা ভালো কাচ্চি। আর ভালোর চাইতে ভালো কী হতে পারে?

কাচ্চির অপেক্ষায় দুই হাঁটুর উপর থুতনি চেপে বসে রইল শিবানী, পুবের জানালা দিয়ে এসে পড়া রোদের ফালিটার দিকে তাকিয়ে।

সমস্ত বাড়ীটা নিঃশব্দ। ভোরবেলাকার ব্যস্ততার কোন সাড়া উঠছে না কোথাও। কোনদিনই ওঠে না। কিন্তু ওদের সংসার চাকাও ঘুরতে আরম্ভ করে সকাল থেকে সব সংসারের মতই। ভোর পাঁচটায় উঠে আবদুল বেড-টি তৈরী করে। দুই হাতে দুই ট্রে নিয়ে এসে মেমসাহেবের ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। টোকা দেয় দরজায়। কাচ্চি এলে তার হাতে তুলে দেয় একটা ট্রে, আর একটা নিয়ে সে চলে যায় ইন্দ্রনাথের ঘরে। মালী লেগে যায় বাগানের কাজে। সামনে ফুলের বাগান, পেছনে সব্জীর। মালীর হাতের খুরপি বিশ্রাম পায় না। জলের ঝারি নামে না। তার হাতের খুরপি খুচ খুচ শব্দে মাটি খুঁড়ে চলে। বাবুর্চি প্ল্যাসটিকের মস্ত থলে ঝুলিয়ে ছোটে বাজারে। ভোরবেলাকার প্রথম পর্ব এই। তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্ব। আটটা বাজে। সাহেব, মেমসাহেব ওঠেন। আবদুল আর কাচ্চি তৎপর হয়ে ওঠে গৃহস্বামী আর গৃহস্বামিনীর পরিচর্যায়। বাবুর্চি তার গ্যাসচুল্লী একটার জায়গায় জ্বালিয়ে দেয় দু'টো। বাবুর্চির সাহায্যকারী ছোকরাটা ছুটোছুটি করে সাহায্য করে চলে তাকে। দুটি ব্যক্তির জন্য যেখানে এতগুলো লোক খাটে সেখানে বাঙ্গালী বাড়ীতে হৈ-হট্টগোল বাধলেও সাহেববাড়ীতে বাধে না। ইন্দ্রনাথ সাহেব। তাই তার সংসার-চাকা ঘুরছে কিন্তু শব্দ উঠছে না।

এখন দ্বিতীয় পর্বের কাজ আরম্ভ হয়েছে শিবানীর সংসারে। কাচ্চি আর আবদুল সাহেব মেমসাহেবের প্রাতঃকালীন কাজ একটার পর একটা করে চলেছে। বাবুর্চি তার এক গ্যাসচুল্লীতে চাপিয়ে দিয়েছে মুরগীর সুপ। এক হাঁড়ি জলের ভেতর মুরগীর টুকরো, ছেঁচা পিঁয়াজ, আদার কুচি আর গোটাকয় কাঁচামুগের ডাল টগবগ করে ফুটছে। আর এক চুল্লীতে সে কর্ণফ্লেকের জন্য দুধ জ্বাল দিচ্ছে। ইলেকট্রিক টোস্টারে রুটি ঢুকিয়ে পটপট শব্দে চাবি ঘুরিয়ে রাখছে লো'তে নিয়ে। কখন সাহেব মেম উঠবে কে জানে। আজ রবিবার। ব্রেকফাস্ট খাবে

শিবানীও। অফিস থাকলে সে শুধু এক কাপ চা খায় আর কিছু নয়। ডিম ফাটিয়ে ডিমের খোল দু'ফাঁক করে ফ্রাই প্যানে বেকন-এর উপর ঢালতে ঢালতে বাবুর্চি রবিবারের লাঞ্চের কোর্সের কথা ভাবছে। মালী ফুল সাজাচ্ছে ঘরে, বারান্দায়, উপরে, নীচে।

একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো শিবানীর ঘরে।

মালী বোধ হয় বেলফুলের মস্ত এক ঝাড় বেঁধে ওর জানালা বরাবর বারান্দায় রেখে গেল ওর এই গন্ধটুকু পাওয়ার জন্যই। শিবানী যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো বেলফুলের উপর মালী প্রচুর জল ছিটিয়ে দিয়েছে। ফুলগুলো জলে ভেজা। প্রতিটি পাপড়ির ভাঁজে ভাঁজে টলটল করছে ফোঁটা ফোঁটা জল। দক্ষিণে বাতাস ফুলের সুবাস ঢালা জলবিন্দু তুলে নিয়ে নিয়ে এখন ওর ঘরের ভেতর বয়ে যাবে—ঈষৎ বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল শিবানী—আঃ! যত দামী সেন্টই হোক, তাজা ফুলের গন্ধের কাছে লাগে না। তখনকার দিনে সম্রাট সম্রাজ্ঞীরা মহার্ঘ সব আতর নির্যাস থাকতেও একটি তাজা গোলাপ যে হাতে রাখতেন, তা এই জন্য। এখন থেকে ও সেন্টঢালা রুমাল নয়—তাজা গোলাপ রাখবে বেরুবার সময়।

বেগম আর সম্রাজ্ঞীদের হাতে ফুল ধরা ছবির মতো নাকি?

তা কেন। খোঁপায় গুঁজবে।...কিন্তু খোঁপাটা দূর হয়ে যায় বড্ড। ওটুকু ফুলের গন্ধ মাথা ঘুরে সামনে আসতে আসতে ফুরিয়ে যাবে। ছেলেরা ফুল গোঁজে তাদের কোটের ফ্লাওয়ার বাটনে। সেটা বেশ নাক বরাবর হয়। আচ্ছা...কাঁধের শাড়ির উপর লম্বা সুন্দর একটি ব্রোচ দিয়ে ফুলটা এঁটে দিলে কেমন হয়? শাড়িও বিন্যাস্ত থাকবে, ফুলের গন্ধটিও সামনা বরাবর পাওয়া যাবে।

আজকাল রেওয়াজ নেই ব্রোচ আঁটবার?

শিবানী ওসব রেওয়াজ-টেওয়াজ মানে না।

কাঁধে ফুল গোঁজা দেখলে সব হাসবে?

তা ওকে দেখলে হাসবে, সিনেমার নায়িকাকে – দেখলে আরম্ভ করবে—এ তো জানা কথা। এই যে মাথার উপর বাজারের ঝুড়ি উপুড় করে তাতে চুল জড়িয়ে খোঁপা করছে তাতে হাসছি না আমরা? ওরা কী গ্রাহ্য করছে? ও কাঁধে ব্রোচ এঁটে তাতে ফুল গুঁজলে কে হাসবে ওরই বা তা গণ্য করবার কী আছে। হ্যাঁ ঠিক ও কালকে গোলাপ এঁটে বেরুবে কাঁধের শাড়িতে।

ও মা, তুমি এখনও বিছানায় বসে! গরম জলের প্যান হাতে ঘরে ঢুকল কাচ্চি।

শিবানী উঠে দাঁড়াল খাট থেকে। বলল, বসে থাকব না তো করব কী? মুখ ধোবার গরম জল আনতে গেছিস তো গেছিসই। এতক্ষণ গরম জলে চাল ছেড়ে দিলে ভাত ফুটে যাবার কথা।

কাচ্চি গরম জলের প্যান নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে গেল। সেখান থেকে তার কথা শোনা যেতে লাগল, দেরী কী আমার জন্য? তোমার ঐ নচ্ছাড় পুষির জন্য। আসছি জল নিয়ে, হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে দিলে পায়ের উপর এক থাবা। তুমি বলবে, ওটা ওর খেলা। আর আমার তো প্রাণ যায়। পায়ের উপর কী যে থাবা দিলে—লাফিয়ে উঠলাম— গেল প্যানসুদ্ধ জল হাত থেকে পড়ে। হাত পা যে পুড়ে যায়নি সেই মহাভাগ্য। ফের গরম জল করে তবে তো এলাম। তোমার আদুরে ছানা, মারবার তো জো নেই। মিউ মিউ করে নাকি-কান্না জুড়ে দেবে—

বেড়াল ছানাটা কাচ্চির পেছন পেছন এসে ওর দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে মিউ মিউ করছিল। ছানাটাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল শিবানী। বলল, ওমা, তোর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম রে পুষি! ছিলি কোথায়?

জবাব দিল কাচ্চি। থাকবে আবার কোথা ও। তুমি বিছানায় গেলে রাগ কর, এটা খুব বোঝে। তাই তুমি না ওঠা পর্যন্ত পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে।

শিবানী কাচ্চির কথা শুনছিল না। সে বেড়ালছানাটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে যাচ্ছিল, কাল রাতে ঘুমিয়েছিস কোথায়? মারেনি তো তোকে কেউ? দুধ খেয়েছিস?

কাচ্চি বেরিয়ে এলো স্নানের ঘর থেকে। বলল, আমার ঘরে দিব্যি বিছানা দিয়েছ —সন্ধ্যা হতে না হতে গুটিগুটি শুয়ে পড়েন তিনি। যা আরামের বিছানা।...

কাচ্চি ঘর গুছোনোয় হাত দিল।

শিবানী পুষিকে নামিয়ে দিয়ে গিয়ে ঢুকল স্নানের ঘরে।

স্নানান্তে মায়ের পাঠানো নতুন শাড়ি পরল সে। তারপর ভিজে চুল পিঠে ছেড়ে পুবদিককার জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো জন্মদিনের সূর্যকে প্রণাম করতে। শ্রাবণ মাসের আকাশ। গাছের মাথার রোদ ঝক্‌ঝক্ করলেও সাদা কালো মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের গায়। এই রোদ সরে গিয়ে এক্ষুনি হয়ত এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবে কিংবা হয়ত রোদ যাবেও না। রোদের উপর দিয়েই ঝম্‌ঝম্ করে এক ঝাঁক বৃষ্টি উড়ে চলে যাবে। শ্রাবণে সূর্য যেন পূর্ণ তেজে কখনই ওঠে না। ভিজে মাটির মতো তার শরীরটাতেও যেন ভিজে ডেবডেবে ভাব থাকে। এরকম ভিজে স্যাঁতসেঁতে সূর্য শিবানীর ভালো লাগে না। ও যদি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে জন্মাত। প্রতিদিন অবশ্যি এই সূর্যের কথা ওর মনেও থাকে না। শুধু পূজা বা উৎসবের দিনগুলোতে মনে হয়। তাও মনে হয় বাড়ীতে কোন ঠাকুরঘর নেই বলে। চোখ বুজে প্রার্থনা করবার কোন স্থান নেই বলে। থাকলে সেখানেই গিয়ে নিশ্চয় সে প্রণাম করত। ঠাকুরঘর নেই—সূর্যই কী আছে! গাছের মাথায় মাথায় রোদ খেলছে ঐটুকু। তার পরই তো সব বাড়ীর সার— চোখ বন্ধ করল শিবানী সূর্যপ্রণাম করবার জন্য। কোন মন্ত্র নয়—কোন শব্দ নয়, কথা নয়, শুধু স্তোত্রের সুর গুন গুন করে টেনে চলল সে। সকাল বেলা ঠাকুমার মুখের যে স্তোত্রপাঠ শুনে সে জাগত। তারপর শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে কান পেতে শুনত। শুনতে শুনতে সুর শব্দ ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠাকুমা সংস্কৃত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণ করতেন না—ও নিজেও শুদ্ধ উচ্চারণ জানে না। তাই স্তোত্রগুলোর সুরটাই সে কখনো মনে মনে, কখনো বা গুন গুন করে টেনে তার মনের অর্ঘ দেবতার পায়ে অর্পণ করে। পদের জন্য কিছু ঠেকে থাকে না। সুরই তাকে মুহূর্তে নিয়ে পৌঁছে দেয় সেই উচ্চ জায়গায় যেখানের হাওয়া নির্মল—যেখানে যাওয়ার শক্তি শব্দ রাখে না। ঠাকুমা ওকে শব্দ দিয়ে যেতে পারেন নি, কিন্তু সুর দিয়ে গেছেন। বড়টাই দিয়ে গেছেন।

যার আনন্দ শিহরণ এক লহমায় ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় তাকে। সে আনন্দ ঝংকারে ঝংকৃত হতে হতে বলে উঠতে পারে, এ জীবন আনন্দের। বিশ্ব আনন্দের! সংসার আনন্দের!

মা!

কাচ্চির ডাকে চোখ মেলে শিবানী ঘরের দিকে ফিরল।

কাচ্চি বলল, কী করছ মা। সাহেব কখন তৈরী হয়ে গিয়ে খাবার ঘরে বসেছেন। বাঃ কী সুন্দর শাড়ি পাঠিয়েছেন দিদিমা! কী সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে। কাছে এসে প্রণাম করল কাচ্চি শিবানীকে।

শিবানী বুঝল তার জন্মদিনের প্রণাম হলো এটা।

শিবানী ড্রেসিং টেবিলের টুলের উপর বসল। এ জীবন আনন্দের, বিশ্ব আনন্দের, সংসার আনন্দের মনে হলেও এই মুহূর্তে মর্ত্যের মাটিটা কিছু শক্তই ঠেকতে লাগল শিবানীর কাছে। ইন্দ্রনাথ ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে এখন তার কাছে গিয়ে বসতে হবে। ওর জন্মদিনের কথা ইন্দ্রনাথ কখনো বিস্মৃত হয় না। আজও নিশ্চয়ই হয়নি। ঠিক মূল্যবান কোন উপহারও সে নিশ্চয়ই এনেছে। হয়ত উপহারের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েই টেবিলে বসেছে। ও গেলে সেটা ওর দিকে ঠেলে দেবে এক আঙ্গুলে। এই এক আঙ্গুলে ঠেলে দেওয়াটা যে অবহেলার নয় তা প্রমাণ দেবে উপহারটার টাকার অঙ্ক। সে অঙ্ক ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে মেলে না। আরো যা বলবে তা হলো, তোমার জন্যে যত টাকাই খরচ করি— আমার কাছে তা কিছু নয় হয়ে যায়। কত বড় অঙ্কের উপহার আমি কত তুচ্ছ ভাবে দিতে পারি দেখ। একদিন ছিল, ইন্দ্রনাথের দেওয়া মুক্তোর মালা গলায় পরে ওর মনে হতো ইন্দ্রনাথের গলায় জড়ানো হাত। তার হাত যেমন ওর গলা থেকে খুলতে ইচ্ছে করত না, তার দেওয়া মালাও না। কিন্তু আজ তার দেওয়া উপহার ওর পক্ষে হাত বাড়িয়ে নেওয়াও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

মা, সাহেব অপেক্ষা করছেন যে—

আসছি। তুই যা। আসছি বলে কাচ্চিকে সে বিদায় দিল। কিন্তু তেমনি বসে রইল টুলের উপর। ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছে! কাল রাতে ওর মন কী ইন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করছিল? কাল রাতে কী হয়েছিল?

শিবনী ঘরে প্রবেশ করল। আরো বার দুই হাঁটল ইন্দ্রনাথ বারান্দার এমাথা ওমাথা। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল, আবদুল!

আবদুলের ত্রস্ত-ব্যস্ত পায়ের শব্দ ইন্দ্রনাথের ঘরের দিকে চলে গেল।

শিবানী ঘরের বাতি জ্বালল না। বারান্দার সব কটা আলো জ্বলছিল। তাতেই ওর ঘর আলোকিত ছিল। কাচ্চিটা মেঝের উপর অকাতরে ঘুমোচ্ছে—ঘুমোক। বাতি জ্বাললেই জেগে যাবে। দরকার কী। কাচ্চিকে তো প্রয়োজন নেই ওর। ও খেয়ে এসেছে। ঘুমোক কাচ্চি। নিঃশব্দে চলাফেরা করে শাড়ি-কাপড় ছাড়ল। নাইটকোট পরল। বারান্দার দিককার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সে। আবদুলের চলার সঙ্গে তার হাতের থালার উপরকার বোতল গ্লাসের ঠোকাঠুকির আওয়াজ উঠতে লাগল। ঠুন ঠুন, ঠুং ঠাং; ঠুন ঠুন, ঠুং ঠাং।

ইন্দ্রনাথের ঘরের ভেতরটা শিবানী এতটুকুও দেখতে পাচ্ছে না। দু'ঘরের মধ্যখানে ভারী পর্দা ঝুলছে? তাতে তার চোখ বন্ধ। তবু সে বোজা চোখে ভারী পর্দাটানা ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে লাগল শব্দ মিলিয়ে মিলিয়ে। আবদুল তার হাতের থালা ঘরের দেয়াল ঘেঁষা টেবিলটার উপর রাখল। হুইস্কির বোতল তুলে চাবি দিয়ে টেনে মুখ খুলল। গ্লাসে ঢালল। গ্লাসটার তলার দিকে টলটল করছে সোনালীরঙ মদ। এবার যেটার মুখ আবদুল চাবি দিয়ে টানছে, সেটা ঠাণ্ডা ঘামে ভেজা সোডার বোতল। হুস্ করে বেরিয়ে কিছুটা টেবিলের উপর নিশ্চয়ই পড়ল' আবদুল তাড়াতাড়ি গ্লাসে ঢেলে দিল। কড়া সোনালীরঙের মদ তরল হতে হতে ফিকে হয়ে গ্লাস ভরে গেল। সেই ভরা গ্লাস তুলে নিয়ে ইন্দ্রনাথের আরাম কেদারার পাশে ছোট্ট কাচের টেবিলটার উপর রাখল আবদুল। এগিয়ে দিল হাতের কাছে সিগারেটের টিন আর লাইটার। কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে টেবিলে যে ক' ফোঁটা সোডার জল পড়েছিল সেটা মুছে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। থালার উপর রইল হুইস্কির বোতল আর মেঝের উপর রইল বরফ ভর্তি কাচের গামলার ভেতর ঠাসা, আরো গোটা তিন চার সোডার বোতল। এরপর ইন্দ্রনাথ নিজেই ঢালবে, খুলবে, নেবে। কিন্তু তা' হলেও যতক্ষণ ইন্দ্রনাথ না বিছানায় যাবে, আবদুল শোবে না। দোতলার সিঁড়ির মুখে সে ঠিক ঝাড়ন কাঁধে নিয়ে বসে থাকবে। ইন্দ্রনাথ যদি ডাকে তবে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে হাজির দেখবে তাকে।

আবদুল ইন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার বাতি সব নিভিয়ে দিল। শিবানীর ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। সমস্ত বাড়ী এখন অন্ধকার। এক ইন্দ্রনাথের ঘরে পুরু শেডে ঢাকা আলো জ্বলছে। চড়া আলো নয়। অন্ধকার-অন্ধকার ভাবের আলো।

ইন্দ্রনাথ পায়চারি করছে। একবার ছোট্ট কাচের টেবিলটার কাছে যাচ্ছে। গ্লাস তুলে এক চুমুক খাচ্ছে। ফের গ্লাসটা টেবিলে রেখে হাঁটছে।

শিবানী ভাবছিল উঠে দরজা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু বাধল। ইন্দ্রনাথ ঘরের ভেতর হাঁটছে—এ অবস্থায় একটা লোকের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয় কী করে!

রাত বাড়তে লাগল। ইন্দ্রনাথ নিজেই মদ ঢালতে আর সোডা খুলতে লাগল। শিবানী চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল এখন চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথের ঘরের দিকে। দু'ঘরের মধ্যখানের পর্দাটা দুলছে না। ভারী বলে বেশী সময় স্থির হয়েই থাকছে। মাঝে মাঝে এক-আধবার বাতাসের চাপ জমে উঠলে ওলট-পালট খাচ্ছে কখনো তলার দিকটা, কখনো পুরো পর্দাটা। ইন্দ্রনাথ সিল্কের স্লিপিং পাজামা পরেছে...হাতের ঘড়িটা খোলেনি...তার পরিপাটি চুল এখন অবিন্যস্ত...মাঝে মাঝে বা হাত চুলের ভেতর চালাচ্ছে...ঘড়ির প্ল্যাটিনামের ডায়েলটা চোখে পড়ছে মাথার পেছনের অন্ধকারে। স্লিপিং সার্টের ঢিলে হাতটা কনুই-এর কাছে নেবে গেছে। পাতলা লালচে লোমে ভরা দুটো ফরসা বলিষ্ঠ হাত—না, ও হাত দুটো এখন দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু— এ হাত দুটো ও চেনে—ওর শরীর চেনে। ওকে জড়িয়ে ধরার সময় হাতের লালচে লোমগুলো সব ফুলে ওঠে এ হাত দুটোর...

শিবানীর শরীরের রোঁয়া কেশর ফুলালো।

ইন্দ্রনাথ নতুন এক গ্লাস ঢালল। তার স্লিপারের শব্দ ওর ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে যেন একবার থামল—আবার ঘুরে চলে গেল।

ইন্দ্রনাথ কী ওর ঘরে আসবে!

ইন্দ্রনাথের পায়ের শব্দ ঘরের শেষ মাথায় চলে গেলে শিবানী ডাকল, কাচ্চি।

এক ডাকেই ধড়ফড় করে উঠে পড়ল কাচ্চি। কথা বলতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেলল সাহেবের ঘরে বাতি জ্বলতে দেখে। তাড়াতাড়ি আঁচল গুটিয়ে উঠে এলো শিবানীর কাছে। ফিস্‌ফিস করে বলল, তুমি কখন ফিরলে মা? আমায় তোলনি কেন?

দরকার হয়নি তাই তুলিনি। খাবার জল দে একগ্লাস।

তুমি খাবে না?

খেয়ে এসেছি।

বাতি জ্বালব?

না।

কাচ্চি এত ফিস্‌ফিস করে খাটের উপর উপুড় হয়ে কথা বলছিল যে তার সঙ্গে কণ্ঠের সমতা রাখতে গিয়ে শিবানীর জবাবও অত্যন্ত নীচু গলায় হয়ে যাচ্ছিল।

জল নিয়ে এলো কাচ্চি। জল খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিলে ইন্দ্রনাথের ঘরের দিকে তাকিয়ে তেমনি চাপা গলায় বলল, হাত পা কোমর টিপে দেবো একটু?

দরকার নেই। তুই ঘুমোগে যা।

চলে গেল কাচ্চি।

কাচ্চিকে ও তুলে দিল কেন? যে কাচ্চির ঘুম ভাঙ্গবে বলে ও বাতি না জ্বালিয়ে শাড়ি-কাপড় ছাড়ল নিঃশব্দ পায়—তাকে তুলে জল চাওয়ার মতো তেষ্টা কী ওর পেয়েছিল? না ও কাচ্চিকে তুলে দিল চলে যাবার জন্য?

কান দুটো গরম হয়ে উঠল শিবানীর— ও কী ইন্দ্রনাথের আসবার জন্যে প্রস্তুত হলো?

ও কী ইন্দ্রনাথের জন্য কাল রাতে প্রতীক্ষা করেছিল?

তার লালচে লোম ঢাকা হাত দু'টো কী ওকে প্রলুব্ধ করে তুলেছিল?

তুলেছিল।

এসেছিল ইন্দ্রনাথ?

না, আসেনি।

কিন্তু এখন ইন্দ্রনাথ ওর জন্য অপেক্ষা করছে। তার হাতে মূল্যবান উপহার আছে। আর দেরী করলে এক্ষুনি অধৈর্য হয়ে ফের ডেকে পাঠাবে সে শিবানীকে।

তা ডেকে পাঠাক আর না পাঠাক—ওকে তো এখন যেতেই হবে ইন্দ্রনাথের কাছে। তার সামনে বসতে হবে। কথা বলতে হবে এটা ওটা সেটা—নয়ত বিরাজ করবে স্তব্ধ নীরবতা। আজ রবিবার— সমস্তটা দিন সামনে—

ডাক এলো দরজার বাইরে থেকে, মেমসাব।

কে আবদুল?

জী... ফোন।

আসছি। উঠল শিবানী।

॥ ৫ ॥

ফোন যখন এসেছে তখন ও ঘরে যেতেই হবে।

উঠল শিবানী।

এরকম একটা ডাক না এলে শিবানী এখন ঘর হতে বেরুতে পারত না। ইন্দ্রনাথের সামনে যেতে পারত না কাল রাতে যার স্পর্শের জন্য, যার সান্নিধ্যের জন্য মনে মনে কাঙ্গাল হয়ে উঠেছিল তার চোখের ছোঁয়াতেও আজ ঘেন্না করছিল ওর। কাল রাতে যাকে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে দেখে চোখ তৃপ্তি মানছিল না— আজ তার মুখ দেখতে হবে বলেই ঘর ছেড়ে বেরুতে পারছিল না সে। বেরুতও না। কাচ্চি আবার ডাকতে এলে তাকে আদেশ করত ওর চা এখানে এনে দেবার জন্য। শুনে কাচ্চির ঘাড়ের শিরা এক মুহূর্তের জন্য একটা অবাধ্যতার গোঁয়ে টান হয়ে উঠত। তার মনঃপুত হতো না শিবানীর এ আদেশ। জন্মদিনের সকালেই শিবানীর এই যুদ্ধ ঘোষণা। পুরুষমানুষের কত রকম চলতি ও কত রকম মতিগতি হয়। মেয়েমানুষের কী তার সঙ্গে সমান তালে পাঁয়তারা কষলে চলে! তবে সংসারটা ভূতের নৃত্যক্ষেত্র হয়ে উঠে না। বারমুখো পুরুষের বাইরে থাকার সময়টা যতই রাগ হোক, ঘরে এলে সে রাগ বুঝেসুঝে খাটাতে হয়। যদিও মুখে সে এখন কিছুই বলত না। কোন কথা কখন বলতে হয়, আর বলতে হয় না সে কাচ্চি বেশ জানে। এখন সে চলে যেত শিবানীর আদেশ পালন করতে। কথাগুলো বলতো শিবানীর অলস সময়ের পরিচর্যার সময়। চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে বা পায়ের তলায় গোলাপজল মেশানো গ্লিসারিন মালিশ করতে করতে।

কিন্তু ঘরে বসে চা খেলেই কী সে ইন্দ্রনাথের মুখ দেখা থেকে রেহাই পেতো?

পেতো না।

ইন্দ্রনাথ তার ঘরে এসে উপস্থিত হতো। উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করত, অসুখ করে নি তো? হয়ত আরো ক'পা কাছে এগিয়ে আসত ওর দিকে...তাড়াতাড়ি নানা দিকে ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে থাকা নতুন শাড়ি দু-হাতে চেপে চেপে ঠিক করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল শিবানী। যেন নইলে ইন্দ্রনাথ এক্ষুণি তার ঘরে এসে উপস্থিত হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসত।

নতুন শাড়ির মিষ্টি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বেড়ালছানাটাও চলল শিবানীর পায় পায়।

বন্ধঘরের দরজা-জানালা খুলে দিলে যেমন মুহূর্তে বাইরের মুক্ত বাতাস এসে বন্ধ ঘরের দূষিত হাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে যায়, বাইরে বেরিয়ে আসতেই বাইরের আলোহাওয়ার স্পর্শে শিবানীর মনের ভেতরকার তিক্ত বিষাক্ত ভাবটাও যেন ঠিক তেমনি করে উড়িয়ে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতর কামনা-বাসনা, রাগ, জ্বালা, ব্যর্থতা যেন চার দেয়ালের চাপে ওর মনের উপর চেপ্টে বসেছিল। বাইরের আকাশ মনের আকাশও বড় করে দিল শিবানীর। তাই সে দেয়। নইলে আকাশ নিজে যত বড়ই হোক মানুষের কাছে বড় থাকত না।

চারদিকে তাকাল শিবানী। চক্‌চকে ঝকঝকে রোদে বারান্দা ভরে গেছে। লম্বা লম্বা টেবিলগুলোর উপরভাগে রাখা ফুল আর টবে রাখা দেশী বিলাতি পাতাবাহারের গাছ বাতাসে দুলছে... বিলিতি কাপড়ের পর্দাগুলোর ফুল পাতাগুলো সত্যকারের তাজা ফুল মনে হচ্ছে...পেতলের ভাসগুলোতে রোদ ঠিকরে পড়ে সোনার মত জ্বলছে...

জী... ফোন...

আসছি—ঈষৎ অপ্রতিভ ভাব খেলে গেল শিবানীর কণ্ঠে। পায়ের গতি বাড়িয়ে বলল, ধরতে বলেছ তো?

জী হ্যাঁ।

হঠাৎ রোদে ভরা বারান্দার উপর এসে পড়ল শ্রাবণের আকাশ থেকে এক মস্ত কালো মেঘের ছায়া। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝাপ্টা মারল শিবানীর মুখের উপর..হঠাৎ ভীষণ হাল্কা লাগতে লাগল শিবানীর নিজেকে। সামনের ভাস থেকে ফুলপাতাসুদ্ধ একটা ডাল তুলে মাথায় গুঁজল। যদিও সে বসবার ঘরে ঢুকে সোজা গিয়ে ফোন হাতে তুলে নিল কোন দিকে না তাকিয়ে, তবু সে দেখল হাত তিন চার দূরের সোফাটায় ইন্দ্রনাথ চোখের উপর পত্রিকা মেলে বসে আছে। একেবারে পুরো দেয়াল-মুখ করে না দাঁড়ালেও, মুখটা শিবানী দেয়ালের দিকেই তেরচা করে রাখল। ফোনে মুখ রেখে বলল, হ্যালো...

ওপিঠ থেকেও এলো 'হ্যালো।'...

পুরুষকণ্ঠ। গলাটা ধরে উঠতে পারল না শিবানী। বলল, আপনি কাকে চান?

শিবানী দেবী আছেন?

কথা বলছি—

ও, আচ্ছা! শশব্যাস্ত কণ্ঠ ভেসে এলো, নমস্কার, নমস্কার—

নমস্কার।

শিবানী দেবী আপনার সঙ্গে—

আপনি কে কথা বলছেন?

আমি...আমি...কণ্ঠস্বরটা যেন মাথা চুলকাচ্ছে।

শিবানী নাম শোনবার অপেক্ষায় রইল—

—আমার নাম..থামল সে।

ভ্রূ কোঁচকালো শিবানী।

লোকটি বলল, এ ভাবে হঠাৎ নাম বললে আপনি আমাকে ঠিক ধরে উঠতে পারবেন না—

গলার স্বর কঠিন হল শিবানীর। বলল, আপনার নাম ঠিক ধরে উঠতে না পারলেও আপনার কথাগুলো ঠিক ধরে উঠত পারব বুঝি—

না— না, তা বলছি নে। তা বলছি নে... যেন দু'হাত কচলাচ্ছে সে— হঠাৎ ঝপ্ করে যদি চিনতে না পারেন তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু না, পরিচয়টা আমার প্রথমেই দিয়ে নেওয়া উচিত ছিল..আমি দুঃখিত। আই এ্যাম সরি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত— আই এ্যাম ভেরি সরি শিবানী দেবী। আচ্ছা, আপনার মিঃ দত্তরায়কে মনে আছে?

মিঃ দত্তরায় ? মনে করতে চেষ্টা করল শিবানী নামটা। মিঃ দত্তরায়..

ঐ তো, চিনতে পারছেন না তো ?

একটু কুণ্ঠিত-কণ্ঠেই শিবানী বলল, মিঃ দত্তরায়...ঠিক ধরে উঠতে পারছি নে।

জানতাম পারবেন না। আপনারা একেবারে নিষ্ঠুরভাবে ভুলে যেতে পারেন...আরে আরে, ফোন ছেড়ে দেবেন না, একটু সূত্র ধরিয়ে দিলেই আপনি চিনতে পারবেন আমাকে। তারপর গভীর সুরে বলল...আপনার দিদির বিয়ের রাতে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আর সেই রাত থেকে আমি আপনার কী বলব... গ্রেট এ্যাডমায়ারার...একজন একেবারে...মানে মুগ্ধ—ভক্ত যাকে বলে—

ফোনটা নামিয়ে রাখতেই যাচ্ছিল শিবানী কিন্তু হঠাৎ দ্রুত গলার 'আরে আরে' শব্দ দুটোর সুরের টানে চিনে ফেলল শিবানী গলাটা। নীরেন—ওর দিদি ইন্দ্রাণীর স্বামী। নীরেনের স্বভাবটাই এই রকম। হয়ত নিজের কোন কথা নেই। দিদি ফোনটা ধরে দিতে বলেছে। আর সে ফোন ধরে স্বর পাল্টেফাজলামো জুড়ে দিয়েছে। ওর বুঝতে পারাটা বুঝতে দিল না শিবানী। চার হাত ফারাক ইন্দ্রনাথ বসে। তার কান এ দিকেই পাতা আছে। সে-কানে গরম সীসে ঢালবার এমন সুযোগ কী শিবানী ছাড়তে পারে। আস্তে করে বললো, আপনি আমার একজন মস্ত এ্যাডমায়ারার...মুগ্ধ ভক্ত, আর আমি আপনাকে নিষ্ঠুরের মতো ভুলে গেছি...তরল কণ্ঠে তরুণীর মত হেসে উঠল সে।

ইন্দ্রনাথের হাতের কাগজে পাতা উল্টাবার যে খসখস শব্দ হচ্ছিল তা থেমে গেল।

নীরেন বুঝল শিবানী ধরে ফেলেছে।

শিবানী বলে চলল। থেমে থেমে এমন ভাবে বলে চলল যেন উত্তর প্রত্যুত্তর চলছে, আপনি কৃতজ্ঞ আমার প্রতি ? কেন ? ও, আপনি ভেবেছিলেন, আপনি আমার একজন মস্ত মুগ্ধ ভক্ত শুনে চটেমটে আমি ফোন ছেড়ে দেবো ? না, না তা কেন। প্রথমে চিনতে পারি নি বলে সত্যি দুঃখিত আমি—মিট করব ? বেশ তো কোথায় মিট করতে চান বলুন ?

ভীষণ ভাবে হেসে উঠল নীরেন। বললো, আরে —উল্টে তুমিই দেখছি আমায় টালাতে শুরু করলে—

—নাও হয়েছে সরো—নীরেনের হাত থেকে ফোন টেনে নিল ইন্দ্রাণী। বলল, ফোনটা একটু ধরে দিতে বলেছি, তা ফোন ধরে কী আরম্ভ করেছে!

ঠিক আছে। বলে খুব হাসল শিবানী।

তোদের চা খাওয়া হয়েছে ?

না। বেড টি হয়েছে। ব্রেকফাস্ট হয় নি।

ছিঃ ছিঃ, দেখ তো কতটা সময় অযথা আটকে রাখল তোকে। ইন্দ্রনাথবাবু নিশ্চয়ই তোর জন্য চা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

আমরা ছুটির দিন ব্রেকফাস্ট একটু দেরীতেই খাই।

আচ্ছা শোন, আজ দুপুরে কী ইন্দ্রনাথবাবুর কিছু প্রোগ্রাম আছে তোর জন্মদিনের জন্য ?

না তো।

তবে আমার এখানে চলে আয়। ইন্দ্রনাথবাবু তো আসবেন না জানিই। তাই তার কথা বলছি নে। তুই চলে আয়। দুপুরে এখানে খাবি—কেমন ?

আচ্ছা।

মার পাঠানো শাড়ি পেয়েছিস ?

হ্যাঁ—

আমিও তোর জন্য একটা শাড়ি কিনেছি। চমৎকার আকাশ রং -এর। আকাশ রংটা তোকে ভীষণ মানায়। তোর জামাইবাবু বলছে তোর নাকি শাড়িটা একেবারেই পছন্দ হবে না। আমি বলছি হবেই। ইন্দ্রনাথবাবু তোকে কী দিল রে ? আচ্ছা, সে এলে শুনব। তুই তাড়াতাড়িই চলে আসিস—এখন রাখছি কেমন ?

আচ্ছা।

ইন্দ্রাণী ফোন ছেড়ে দিল।

কিন্তু শিবানী দিল না। কানের ওপর কড়-ড-ড়, কড়-ড়-ড়, কড়-ড়-ড় শব্দ হতে লাগল আর সে মাউথপিসে মুখ রেখে আশ্চর্য সুরে বলল, আমার জন্মদিন আপনি জানলেন কী করে? বলেছিলাম আমি? আপনি মনে রেখেছেন? কী কাণ্ড!

লাঞ্চ? কোথায়? আচ্ছা। শাড়ি? ছিঃ ছিঃ এ কিন্তু ভারী লজ্জায় ফেললেন আমাকে। আচ্ছা, সকাল সকালই আসব। ক'টায়? আপনি বলুন ক'টায় আসব। বারোটার মধ্যে? আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বারোটায় আসব—কথার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাত করল শিবানী—একটুও এদিক ওদিক হবে না... নমস্কার। ফোন রেখে ইন্দ্রনাথের দিকে তেরচা দৃষ্টিতে একবার তাকাল শিবানী। দেখল তার মুখের সামনে দু'হাতে ধরা পত্রিকার পাতাটা একেবারে স্থির।

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং

আবার ফোন বেজে উঠল।

ইন্দ্রনাথের হাতের কাগজ এতটুকু নড়ল না।

শিবানী যে ক'পা গিয়েছিল, সে ক'পা আবার এগিয়ে এসে ফোন ধরল। বললো, হ্যালো।

কে, শিবানীদি'?

হ্যাঁ।

আমি ললিতা—

বুঝতে পারছি। বল কী খবর? এই সাত সকাল যাকে বলে এই সময়?

বাঃ, আজ তোমার জন্মদিন নয়?

জন্মদিনের অভিনন্দন জানাচ্ছ?

না। দূর থেকে অভিনন্দন জানালে আমার হবে না—

হেসে উঠল শিবানী। দূর থেকে অভিনন্দন জানালে তোমার হবে না?

না হবে না— কিছুতেই হবে না। তোমার যত প্রোগ্রামই থাক, আমাকে তার ভেতর থেকে সন্ধ্যা, রাত, সকাল, দুপুর যখন হোক একটা সময় দিতেই হবে— কোন সময়টা দেবে তাই বল?

দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত যখন হোক একটা সময় তোমাকে আমার দিতেই হবে যেন গভীরভাবে ভাবতে লাগল শিবানী। বললো, এই মাত্র একজনের লাঞ্চের নেমন্তন্ন নিয়ে ফেললাম--

তবে রাত্রে?

রাত্রে?

হ্যাঁ।

ডিনার?

না বাপু ডিনার নয়। সাহেব মানুষ নই, ডিনার খাওয়াতে পারব না। ডাল-ভাত-মাছ পিঁড়ি পেতে বসে খাবে নতুন শাড়ি পরে। জান, তোমার জন্য এমন এক সাত বাজার খুঁজলেও মেলে না শাড়ি কিনেছি, যার দাম তুমি কিছুতেই বলতে পারবে না। এমন কী আন্দাজ করে যে আমার দেওয়া উপহারের মূল্যটা বের করে ফেলবে, তাও পারবে না।

হেসে উঠল শিবানী।

ললিতা বলল, হ্যাঁ, আমি দাম যাচাইকারীদের হার মানাবার প্রতিজ্ঞায় সাত সপ্তাহ, সাত সাত বাজার ঘুরে শাড়ি কিনেছি। আমাদের বাড়ীর সবাই হার মেনেছে। তোমাকেও হার মানতে হবে।

খুব ভালো। খুব ভালো। প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। কতগুলো প্রবৃত্তি আছে আমাদের যার সংশোধন সত্যি দরকার। আর তার ভেতর উপহারের দাম আন্দাজ বা যাচাই করার প্রবৃত্তিটা শোধরাবার প্রয়োজন সর্বপ্রথম। কিন্তু কথা হলো, আমি কী আজ শাড়ির গাঁটরী নিয়ে বাড়ী ফিরব।

আমি তোমাকে সাহায্য করব। এখন বল কখন আসছ? এ্যাঃ ভুলেই গিয়েছি বলতে, আমি যে মার কাছে এসেছি। আমি কিন্তু আমার মার বাড়ীতে তোমায় ডাকছি। তুমি আবার আমার শ্বশুরবাড়ী—বলেই হেসে বলল, তোমার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উপস্থিত হবে না। মা'র বাড়ী চেন তো? তুমি না চিনলেও তোমার ড্রাইভার চেনে। আমাকে অনেকবার পৌঁছে দিয়েছে।

আমি চিনি।

কখন আসছ?

সন্ধ্যা সাতটা।

বেশ। আচ্ছা—থামল ললিতা।

আর কিছু বলবে?

মা বলছিলেন দাদাকে বলতে—

মিঃ সেনকে বলতে চাচ্ছ?

আমাদের এমন ঘরোয়া কথার ভেতর দাদাকে তোমার মিঃ সেন বলাটা কেমন যেন ভীষণ কানে বাজছে—বড্ড সাহেব হয়ে যাচ্ছ—

এগুলো সাহেব হওয়া নয়। অভ্যাসের ব্যাপার।

আমি দাদাকে মিষ্টার টিষ্টার বলতে পারব না।

এ না পারাটাও অভ্যাসের ব্যাপার। সে যাক্। তুমি মিঃ সেনকেও ডিনারে বলতে চাচ্ছিলে—আমি জানি মিঃ সেন তোমার এ নেমন্তন্ন খুশী হয়েই নিতেন কিন্তু উপস্থিত মিঃ সেন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে একটু বাইরে গেছেন—

ও, আচ্ছা। কিন্তু তুমি অমন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলার মতো কথা বলছ কেন শিবানীদি'?

ভাষা ফরম্যাল হচ্ছে?

ঘরোয়া ভাষা হচ্ছে না—

ঘরোয়া ভাষাটা বড্ড ঢিলে হয়ে গেছে আমাদের। জায়গা নেয় বেশী। সময় নেয় বেশী। ঘরোয়া ভাষাটাকে আমাদের কিছু খাপানো দরকার হয়ে পড়েছে—কিন্তু একথাটা এতো সংক্ষিপ্ত কথায় বোঝানো যাবে না। দৃষ্টান্ত সহযোগে বোঝাতে হবে। তাই অন্য সময়—ব্রেকফাস্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বাবুর্চি এবার বসে পড়েছে। ছাড়ছি।

আচ্ছা। ঠিক সাতটায় এসো কিন্তু।

হ্যাঁ।

এবারও ফোন রেখে ঘুরে দেখল শিবানী ইন্দ্রনাথের হাতের পত্রিকা বাতাসশূন্য স্তব্ধ প্রকৃতির গাছের পাতার মতো স্থির। এবার সে চোখের কোণ দিয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকায় নি। পুরো দৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিল। কারণ তার চোখের সামনে কাগজ ধরা। পাশের কাঠ রং-এর পালিশ করা কাচ ঢাকা টেবিলটার উপর কাল ভেলভেট মোড়া বাক্সটা তাই এবার চোখে পড়ল শিবানীর। তক্ষুনি সেটার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল সে।

বয় বাবুর্চি তৎপর হলো—

ইন্দ্রনাথ ধীর পায় জুতোর মচমচ শব্দ তুলে এসে টেবিলে বসলো। ছুরি কাঁটা প্লেট চামচের শব্দ ছাড়া বাড়ীটার কোথাও কোন শব্দ নেই মনে হতে লাগল। প্রথম যখন ইন্দ্রনাথ কথা বলল, তখন একটু চমকেই শিবানী প্লেট থেকে মুখ তুলল।

ইন্দ্রনাথ বলল, শুধু আমি এখানে নেই বললে কেন—একেবারে মরে গেছি বললেই পারতে।

গম্ভীর কণ্ঠে শিবানী বলল, অসুবিধে ছিল। উপস্থিত মানুষকে অনুপস্থিত করে সামলানো যায়, কিন্তু জ্যান্ত মানুষকে মৃত বলে সামলানো যায় না। আর তা ছাড়া...আজ আমার জন্মদিন। বন্ধুরা নানা প্রোগ্রাম করেছে—ডিনার লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছে, মারা যাওয়ার কথা বললে সব পণ্ড হতো। দৌড়ঝাঁপ করে সব ছুটে আসত...

শিবানীর মুখের ওপর পড়ে থাকা ইন্দ্রনাথের দৃষ্টিটায় যদি রেখা টানা যেত তবে রেখাটা শিবানীর বাঁ চোখ বাঁ ভুরু কেটে নাকের উপর দিয়ে ডান দিকের চিবুকে এসে নামত।

ডবল ডিমের পোচ আর বেকন চামচে দিয়ে তুলে তুলে চেটেচুটে খেয়ে ন্যাপকিনে মুখ মুছল শিবানী।

ক্রিং...

ফোনের বেল একবার ক্রিং করে বেজে উঠতেই একরকম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। খাবার ঘরের পর্দা ঠেলে বসবার ঘরে এসে ফোন ধরার মধ্যে বেলটা আর একবারের বেশী বাজতে পারল না।

শিবানী সরে যাওয়া পর্দার ভেতর দিয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইন্দ্রনাথ তার ভারী গলা আরো ভারী করে বলল, হ্যালো—

...

মিসেস সেন?

...

আপনি?

...

অমল বোস?

...

হার বস?

...

বন্ধু! আই সি... কিন্তু তিনি মারা গেছেন।

...

আজ্ঞে—

...

হ্যাঁ, তিনি মারা গেছেন।

...

আজ—

...

এই মাত্র—আপনি মিসেস সেনের বন্ধুদের সবাইকে খবরটা দিন। আপনারা না আসা পর্যন্ত ডেডবডি আমি নিচ্ছি নে—

বেশ করে চেয়ার ঠেসে বসে ইন্দ্রনাথ সিগারেট ধরালো। বললো, দেখা যাক তোমার শোকাকুল বন্ধুদের আমি সামলাতে পারি কি না।

ইন্দ্রাণী বলল, একা না পারলে, আমি তো রয়েছিই—

॥ ৬ ॥

শিবানীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এবার সে উঠতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রনাথের খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত বসাটা ওর উচিত— যখন চায়ের টেবিলে এসে বসেছেন। সে তাকাল ইন্দ্রনাথের সামনের খাবারের দিকে। দেখল সে একরকম কিছুই খায় নি। ডিসগুলো দেখলে মনে হয়, খাওয়ার তার ইচ্ছে ছিল না বা তার খাবার ক্ষিধে ছিল না তা নয়। যেন তার জিবে সব কিছু বিস্বাদ ঠেকেছে। কর্ণফ্লেকের দু'চামচে মুখে তুলে ঠেলে রেখেছে। টোস্টে কামড় লাগিয়েছে। ডিম ভেঙ্গেছে, নাড়াচাড়া করছে। বেকনে কাঁটা ফুঁড়ে রেখেছে মুখে তোলে নি—সব ছড়াছড়ি হয়ে পড়ে রয়েছে ডিসে ডিসে। কিন্তু সে উঠতে পারে। ইন্দ্রনাথ আর খাবে না এ ঠিক। টেবিলে দু'হাতের ভার রেখে উঠতে যাচ্ছিল শিবানী কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ল টি-কোজির তলায় চায়ের পট তেমনি চাপা পড়ে রয়েছে টেবিলের মধ্যখানে। চা-ই খাওয়া হয় নি! চা বানাতে ইচ্ছে করল না শিবানীর। আবার কাউকে ডাকতেও ইচ্ছে করল না। অর্থাৎ মুখ খুলতে ইচ্ছে করল না, নইলে যদিও মনে হচ্ছে কেউ কোথাও নেই কিন্তু বাবুর্চী ঠিক দরজার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকলেই এসে চা ঢেলে দিয়ে যাবে কিংবা আর কিছুক্ষণ বাদে সে নিজেই আসবে দেখতে যে, চা ঢেলে দিতে হবে কি না। হয়ত আরো কয়েকবার সে দেখে গেছে উঁকি দিয়ে। হাত বাড়িয়ে গরম ঢাকনাটা টেনে তুলে টি-পট বের করে এনে চা ঢালতে লাগল শিবানী। ইন্দ্রনাথ এতক্ষণে বেশ তৃপ্ত মুখে শিবানীর চা ঢালা দেখতে লাগল। তৃতীয় ফোনটা ধরে শিবানীর খোদ 'বস'কে পেয়ে গিয়ে এবং তাকে 'শিবানী মরে গেছে' বলে ইন্দ্রনাথ বড় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করছিল। ভেতরের জ্বালাটা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছিল। শিবানীর চা তৈরী হতেই নিজের কাপটা সামনে টেনে এনে হাতে তুলে নিয়ে তাতে একটা খুশীর চুমুক লাগাল। তারপর কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, বড় ভুল হয়ে গেছে। আর ভুলই বা বলি কী করে। কথাটা তো আমার নয় তোমার। তোমার বুদ্ধির কাছে কী আর আমি! ইস্, যদি আমার সঙ্গে তুমিও ওদের সামলাবে এটা বলতে পারতাম, তবে এতক্ষণে হয়ত ওরা সব এসে পড়ত!

আমি ফোন করে বলব?

হা হা করে হেসে উঠল ইন্দ্রনাথ। বলল, না, তুমি বললেও আর ওরা আসছে না। কুকুরের পিঠে লগুড়ের বাড়ি পড়লে যেমন কেঁউ কেঁউ করতে করতে লেজ গুটিয়ে পালায়, তোমার অমল বোস তেমনি লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না। কেবল চিঁ চিঁ শব্দে আজ্ঞে...আজ্ঞে করছিল।

তুমি প্রভু যে!

কী? প্রভু শব্দটা ধরে উঠতে পারল না যেন ইন্দ্রনাথ।

শিবানী বলল, প্রভু— মাষ্টার। তুমি আমার মাষ্টার যে।

—মাষ্টার না হই মিষ্টার তো অবশ্যই—আর সেটাই জানিয়ে দিতে চাই আমি কুকুরদের। হাসিমুখে মস্তক আন্দোলিত করল ইন্দ্রনাথ। তার স্বামিত্ব অসম্ভব তৃপ্তিবোধ করছিল।

চায়ের কাপ ধরা ছিল শিবানীর হাতে। ইন্দ্রনাথের কথায় সঙ্গে সঙ্গে কাপটা ঠক করে নামিয়ে রাখল প্লেটের উপর। তারপর ডান হাতটা ইন্দ্রনাথের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, হাত মেলাচ্ছি। গীতায় বলে সব আগে নিজেকে জানো, তবেই অন্যকে জানা হবে।.. তুমি আশ্চর্যভাবে নিজেকে জেনেছ বলেই না নিজেদের জাত সম্বন্ধে এমন উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করতে পেরেছে! হাত মেলাচ্ছি আমি।

শিবানীর ইন্দ্রনাথের দিকে এই হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা ছিল তার ব্যাঙ্গোক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রাখা একটা ভঙ্গী মাত্র। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে হাত মেলাবার বাসনা তার মনে এতটুকুও ছিল না। হাত বাড়িয়েই বাড়ানো হাত টেনে আনছিল, ইন্দ্রনাথ ধরে ফেলল শিবানীর প্রসারিত হাতটা।

হাতটা ইন্দ্রনাথের মুঠো থেকে বের করে আনবার একটা শান্ত চেষ্টা করল শিবানী। কিন্তু পারল না। মাখন মাখা রুটির প্লেটটার উপর পড়ে হাতের চুড়ি আর হাত মাখন-মাখা হয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ শক্তভাবে ধরে রাখল শিবানীর হাতটা।

রবিবারের সকাল। ইন্দ্রনাথের পরিচ্ছদ প্যান্ট কোট, টাই নয়। তার পরিধানে দুধ-গরদের ঢিলে পাজামা আর তেমনি দুধ গরদের ঢিলে পাঞ্জাবী। বাড়ীতে থাকার সকাল-সন্ধ্যার— অবশ্যি সন্ধ্যায় বাড়ীতে থাকার বা ফেরার মতো অসম্ভব ঘটনা যদি কখনো ঘটে তবে এই তার পোশাক। চেয়ারে বসা ইন্দ্রনাথের পাজামা পরা শরীরের অংশটা দেখা যাচ্ছে না। শরীরের উপরের অংশটাই দেখা যাচ্ছে। গরদের পাঞ্জাবীতে তাকে বিয়ের বরের মতো লাগছে। পাখার জোর বাতাসে পাঞ্জাবী নৌকোর পালের মতো ফুলে উঠছে, মিলিয় যাচ্ছে। মাথার ব্যাকব্রাস করা পাটচুল দু'একটা উঠে এসে একবার কপালের উপর পড়ছিল আবার সরে যাচ্ছিল। পাঞ্জাবীর হাতটা কিছু উপরে উঠে গিয়েছে। ফরসা হাতের লালচে লোম তামার তারের ছিটানো কুচির মতো ঝকঝক করছে হাতের উপর ...কুচোগুলো যেন বিদ্যুৎশক্তি ভরা...

কোন এক জায়গায় চোখ রাখতে হয় বলেই টেবিলের উপর চোখ পেতে রয়েছে শিবানী। টেবিলটা ওর চোখের উপর আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল আলপনা আঁকা মঙ্গল ঘট বসানো বিয়ে চত্বরে। মঙ্গলকলসীর উপর ইন্দ্রনাথের হাত, তার হাতের ওপর ওর হাত—

ওঁ পুণ্যাহম্!

ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্!

ওঁ স্বস্তি!

হে দেবতা, তুমি পরস্পরকে পরস্পরের আরো নিকট করো। পরস্পর যেন অনুরাগের সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে— প্রিয় বলিয়াই যেন প্রীতি করিতে পারে...

বাইরের প্রকৃতিটা এতক্ষণ বাইরেই ছিল। শিবানীর বারান্দা অতিক্রমের সময়ের দেখা কালো মেঘের টুকরোটা যে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, ওব মুখে ঝাপটা মারা ঠাণ্ডা বাতাসটা যে সঙ্গে করে বৃষ্টি নিয়ে এসেছে, বাইরে যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে—এ সব দেখলেও শ্রাবণ আকাশের এই বাদল রূপ হৃদয়ে কোন ধ্বনি তুলছিল না এতক্ষণ শিবানীর। এবার বাইরের সুরটা ভেতরে ঢুকে হৃদয়ে ধ্বনি তুলতে লাগল শিবানীর—

ওঁ পুণ্যাহম্!

ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্!

হে দেবতা, তুমি পরস্পরকে পরস্পরের আরো নিকট করো। পরস্পর যেন অনুরাগের সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে! প্রিয় বলিয়াই যেন প্রীতি করিতে পারে—

সব নেমন্তন্ন তুমি ফিরিয়ে দাও শিবানী—ইন্দ্রনাথের গম্ভীর গলা যেন বহু ভেতর থেকে বেরিয়ে ঠোঁটের বাইরে এসেই মিলিয়ে গেল।

শিবানী হাতটা ফের একবার চেষ্টা করল টেনে আনবার।

না,— বলে হাতটা শিবানীর আরো চেপে ধরল ইন্দ্রনাথ। বলল, সব নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দাও শিবানী। আজকের দিনটা সম্পূর্ণ আমার।

শিবানীর মনে পড়ল মা'র অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে একবার সে মা'র কাছে যাচ্ছিল। তখন সবে কয়েক মাস হলো ওদের বিয়ে হয়েছে। ইন্দ্রনাথ যাচ্ছিল না। সে এসেছিল ওকে তুলে দিতে। ট্রেন ছাড়বার পরও ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল ইন্দ্রনাথ শিবানীর জানালা-ধরা হাতটা শিকসমেত মুঠো করে ধরে। ক'দিনের জন্যই বা যাচ্ছিল, তবু মা'র কাছে যাবার দুর্দান্ত বাসনাটা হঠাৎ যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, শিকল টেনে নেমে পড়ে। গাড়ীর গতি বাড়ল। ইন্দ্রনাথ শিবানীর হাত ছেড়ে দিয়ে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল জোর পায়। একটু বিষণ্ণ মলিন হাসল। ইন্দ্রনাথকে আর দেখা গেল না। বুকটা একের পর এক উত্তাল ঢেউ তুলতে লাগল ভেতরে, আর সেই ঢেউ-এর জল যেন গড়িয়ে এসে পড়তে লাগল চোখ বেয়ে, গাল বেয়ে। সত্যি—ইন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ বেদনায় সেদিন কেঁদেছিল শিবানী। মাকে ভালো দেখে সাত দিনের জায়গায় তিন দিনের দিন চলে এসেছিল। আনন্দে কৌতুকে মা'র চোখের কোণ চক্‌চক করে উঠেছিল মেয়ের মুখের কুণ্ঠিত লজ্জিত উচ্চারণে চলে যাবার কথা শুনে।

সেই ইন্দ্রনাথ আজ তার কাছে আজকের দিনটা চাচ্ছে। হয় সবগুলো দিন, নয় একদিনও না। আর এ তো ইন্দ্রনাথের ওকে চাওয়া নয়, ওকে যেন অন্য কেউ না পায় সেই কৌশল করা।

মন যেটুকু নরম হয়ে এসেছিল, ফের কঠিন হয়ে গেল। কালকের রাত রাগ, জ্বালা, অসম্মান নিয়ে আবার এসে উপস্থিত হলো। বলল, আজ রবিবার, আজ আমার জন্মদিন—এ সবই তোমার জানা ছিল কিন্তু আমায় কিছু বলনি আগে। আমি নেমন্তন্ন নিয়ে ফেলেছি।

শিবানীর কঠিন গলার জবাবের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথের হাতের মুঠো ঢিলে হয়ে এসেছিল। হাত টেনে এনে উঠে পড়ল শিবানী। ন্যাপকিন নিয়ে ছুরি আর হাতের মাখন মুছতে লাগল।

ইন্দ্রনাথ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমাকে আগে থাকতে নেমন্তন্ন করে রাখতে হবে তোমাকে!

নেমন্তন্ন নয়— একে বলে জানিয়ে রাখা—এই শব্দ নিয়ে ঝামেলা করল না শিবানী। বলল, হবে বৈ কি।

তুমি অপরের সঙ্গে আমার কোন তফাৎ দেখছ না?

বলে কী! দু'চোখ বিশাল করে এতক্ষণে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শিবানী ইন্দ্রনাথের দিকে। তোমার সঙ্গে অপরের কোন তফাৎ দেখছি নে, আমি। তোমার সঙ্গে আমি মিলই খুঁজে পাই নে একবারে। যার সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়, তাকেই একবার তোমার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে আমি পারি নে। কিন্তু তুমি অনন্য হয়েই রইলে আমার কাছে। বলেই হেসে উঠল শব্দ করে। বলল, এই যে তুমি আমার হাত ধরেছিলে, আমার শরীর কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু কই আর কেউ ধরলে তা এমন শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে না।

বুকের পুরো আবেগটাকে নিঃশেষে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো শিবানী।

ঘরে এসে কাচ্চিকে বলল, দে তো একটা চমৎকার খোঁপা বেঁধে। যেন যে আমার খোঁপা দেখবে সে-ই রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ড্রেসিং-টেবিলের টুলের উপর বসে পা দু'টো টান করে সামনের দিকে মেলে দিয়ে বসল শিবানী।

কাচ্চি ফিতে কাঁটা চিরুণী নিয়ে পেছনে এসে চুলের গোছা হাতে নিয়ে বলল, যাবে তো গাড়ীতে। রাস্তার লোক দেখবে কী করে তোমার খোঁপা?

তা বটে! কাচ্চির কথাটা যেন হৃদয়ঙ্গম করল শিবানী।

মস্ত জয়পুরী খোঁপা বেঁধে একটু দূরে গিয়ে ঘাড় মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে কাচ্চি বলল, যা খোঁপা বেঁধেছি না মা। যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে তবে সত্যি বিস্তর লোক জখম হতো গো মা।

হেসে উঠল শিবানী।

শিবানী শাড়ী বার করল। গয়না বার করল। শাড়ীর সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাগ বের করল। কিন্তু সত্যি বলতে এ সব কিছুরই প্রয়োজন ছিল না শিবানীর। সে যাচ্ছে এখন তার দিদির বাড়ী দুপুরে খেতে। যে ভাবে ছিল মায়ের পাঠানো নতুন শাড়ী পরে সে ভাবেই সে যেতে পারত। যেতও সে পোষাকেই। তাই সে যায়। কিন্তু আজ এ বেশে সে বেরুতে পারে না। ইন্দ্রনাথ জানে শিবানী তার বন্ধুদের সাথে বড় হোটেলে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছে। পোষাকটা সেই রকম হওয়া চাই। কচি ধান রং-এর বন্যা বইয়ে দিল শিবানী পরল ধান রং-এর জরিপাড় শাড়ী ব্লাউজ। গয়না পরল ঠিক সেই রকম ধান রং-এর পান্নার সেট। কানে তিন ফোঁটা সবুজ দুলের মত দুলতে লাগল বড় বড় তিনটে পান্না। হাতে নিল সেই রং-এর ব্যাগ রুমাল। পায় দিল সবুজে সোনালীতে জড়ানো হিল তোলা চটি। দিদি পোষাক দেখে ভাববেন শিবানী ওখান থেকে যাবে অন্য কোথাও বুঝি। যাবে না শুনে বিস্মিত হবেন। পোষাকটা খুব চড়া রকমই করেছে শিবানী। সত্যি সত্যি বন্ধুদের সঙ্গে লাঞ্চে গেলে এতটা কখনই করত না। কিন্তু মিথ্যার সব সময়ই চড়া সুর দরকার হয়।

গলার পানার কণ্ঠীটা ঠিক করে পেতে দিতে দিতে কাচ্চি বলল, মা, তোমাকে যা দেখাচ্ছে না— ইস্...

কাচ্চির দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল শিবানী। বলল, সুন্দর দেখাচ্ছের পর ঐ 'ইস্' শব্দটা কী রে?

কাচ্চি জবাব দিল না।

শিবানী বুঝল ইন্দ্রনাথ যদি দেখত—এই ভাবটাই প্রকাশ করেছে কাচ্চি।

কিন্তু শিবানী জানে ইন্দ্রনাথ দেখবেই। ইন্দ্রনাথ বারান্দায়ই আছে। সে কী শান্তমত ঘরে বসতে পারছে। শিবানী অশান্ত ইন্দ্রনাথের দু'চোখে জ্বালা ধরিয়ে সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে— তাই না ওর এই সাজ। তবেই না ওর এই সজ্জা সার্থক। দিদির বাড়ী গিয়ে তো টেনে খুলেই ফেলব সব।

ঘরের দরজায় পাতলা ভেলভেটের চটির নরম শব্দ এসে থামল। ইন্দ্রনাথের বেডরুম শ্লিপারের শব্দ খুবই চেনে শিবানী। দরজার দিকে পেছন ফিরে থাকলেও বুঝতে পারল ইন্দ্রনাথ এসেছে।

কাচ্চি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

শিবানীকে কোন রকম সময় না দিয়ে আস্তের উপর তার কোমর বেড়িয়ে ধরে তাকে উঁচু করে তুলে নিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকল ইন্দ্রনাথ।

॥ ৭ ॥

ইন্দ্রনাথ যে ওকে একেবারে এভাবে কোমরে হাত বেড়িয়ে তুলে তার ঘরে নিয়ে আসবে, শিবানী তা ভাবতে পারে নি। ইন্দ্রনাথ আর কোনদিন এ রকম করে নি। ঘরের দরজায় ইন্দ্রনাথের ভেলভেটের চটির নিঃশব্দ শব্দ এসে থামতে শিবানীর অন্তরাত্মা তিক্ততায় বিষিয়ে উঠেছিল এই মনে করে, ইন্দ্রনাথের সেই অঙ্গবিন্যাসগুলি ফের আবার দেখতে হ'বে যেগুলি দেখতে দেখতে শিবানীর দু'চোখ পচে গেছে। সেই দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলা। সেই কাঁধ ঝাঁকানো। সেই দু'চোখ তীক্ষ্ণ করে তুলে নির্নিমেষ লক্ষ্যে তাকিয়ে থাকা।

সেই দরজার মুখ জুড়ে সমান্তরাল রেখায় দাঁড়ানো। যেন পাশ কাটিয়েও শিবানীর পক্ষে ঘর থেকে বেরুনো সম্ভব না হয়। যেন বেরুতে হলে ইন্দ্রনাথকে দরজা ছেড়ে দিতে শিবানীকে বলতেই হয়। পেছনের অনুভূতিটা যেন ঘিন ঘিন করে উঠেছিল শিবানীর।

ইন্দ্রনাথ ওকে বাঁধতে চায়! কিন্তু হায়, যে কাজটা সব চাইতে সহজ, উল্টো পথে চলে সে কাজটাই কত কঠিন করে তুলছে ইন্দ্রনাথ!

'হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব'—

গান দিয়ে দরজা খুলবার বিদ্যে ইন্দ্রনাথের অজ্ঞাত। সে জানে হাতের ধাক্কাটার কথা। হৃদয়ের দরজা আর ঘরের দরজা খুলবার পদ্ধতি যে এক নয় ইন্দ্রনাথ তা জানে না।

কিন্তু আজ ঐ বিদ্যেটি কোথা থেকে এসে ইন্দ্রনাথের উপর ভর করল?

খাওয়ায় টেবিলেই আজ ইন্দ্রনাথের হাত ধরা, কথা বলা শিবানীর হৃদয়ে বিয়ের রাতের সেই মরে যাওয়া মন্ত্রকে—সপ্তসুরে বাজিয়ে তুলেছিল—

ইন্দ্রনাথ কি প্রেমিক হয়ে উঠল আজ?

ইন্দ্রনাথ শিবানীকে মাটি থেকে অনেকটা উপরে তুলে নিয়েছিল। শিবানীর পা মেঝের উপর থেকে আধবিঘত আন্দাজ উপরে ঝুলছিল; আর শিবানীর ঠোঁট দু'টো গিয়ে ইন্দ্রনাথের ডান দিকের ঘাড় স্পর্শ করছিল।

না শিবানী চোখ বুজল না। এত সহজে আত্মসমর্পণ করবার মতো বিশ্বাস তার নেই ইন্দ্রনাথের উপর।

সে তাকিয়ে রইল।

ইন্দ্রনাথের ঘাড়ের ছাঁটা চুলের সবুজ আভা, ঘাড়ের উপর জমে ওঠা বড় বড় ফোঁটার ঘাম, গায়ের দামী সেন্টের মৃদু সৌরভ— ফের আর একবার বন্য হয়ে উঠবার তাগিদ তুলল শিবানীর ভেতরে। ইন্দ্রনাথের ঘাড়টা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার উপর দু'ঠোঁট চেপে ধরতে ইচ্ছে করল অদ্ভুত এক তৃষ্ণায়।

কিন্তু এবারও আত্মসমর্পণ করল না শিবানী।

এবারও চোখ বুজল না শিবানী।

কিছুই করল না সে।

ওর ভারেই হয়ত ইন্দ্রনাথের ঘাড়ের ফুলে ওঠা মোটা মোটা নীল শিরা দু'টোর দিকে তাকিয়ে রইল খোলা চোখে। যে বিষে সে ইন্দ্রনাথকে সকাল বেলা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই বিষের জ্বালারই ক্রিয়া এগুলি ইন্দ্রনাথের। প্রেমের ক্রিয়া নয়। ইন্দ্রনাথ প্রেমিক হতে জানে না। কোন পুরুষ জানে, তাও শিবানী বলতে পারে না।

বয়সের ক্ষুধা নিয়ে হাঁকপাঁক করে বেড়ায় তরুণরা আর দৃষ্টিক্ষুধা নিয়ে হাঁকপাঁক করে বেড়ায় বৃদ্ধরা। এরা কি প্রেমিক?

কেউ না।

কতগুলি বয়সের তাড়না। কতগুলি শরীরের ক্ষুধা। কতগুলি অভ্যাস ছাড়া এসব আর কিছু নয়। একটা রোম্যান্টিক মন দুর্লভ বস্তু। যদি কোন মেয়ের সেই চাওয়া থাকে তবে তাকে কাঁদতে হয়।

এ ঘর থেকে ও ঘরে ঢোকার মুখের দরজার ভারি পর্দাটা শিবানীর মুখের উপর দিয়ে সরসর করে চলে গেল চুল নষ্ট করে দিয়ে। কপালের মাদ্রাজী ঝুরা-কুমকুমের টিপটা লেপ্টে দিয়ে।

শিবানীকে খাটের উপর ছেড়ে দিয়ে মাথার চুলটা পেছন দিকে ঠেলতে ঠেলতে ইন্দ্রনাথ তার ভারি আর দ্রুত হয়ে আসা নিশ্বাস-প্রশ্বাসটা সহজ করে নিতে লাগল। শিবানী যতই হাল্কা হোক, কবুতর ওজন নয়; ইন্দ্রনাথের শরীর যতই মজবুত হোক একজনকে বয়ে আনার কিছুটা পরিশ্রম আছেই।

খোলামেলা ওর ঘর থেকে ইন্দ্রনাথের বন্ধঘরে এসে প্রথমটা সব অন্ধকার দেখল শিবানী। ইন্দ্রনাথের ঘর সব দিক বন্ধ—শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। আলো না জ্বাললে কাচের জানালার ভারি পর্দাগুলি সরিয়ে না দিলে প্রায় রাতের অন্ধকার বিরাজ করে ঘরে। এয়ারকুলার মেশিনের লোভনীয় ঠাণ্ডাকেও শিবানী দূরে ঠেলে রেখেছে শুধুমাত্র ঘরের জানালা বন্ধ করে দিতে হবে বলে। বিছানায় শুয়ে যদি আকাশ দেখা না গেল, চাঁদ দেখা না গেল, ভোরের শুকতারা দেখা না গেল, তবে মরণ ভালো অবশ্যি শিবানী ভাবে না কিন্তু মন ভরে না তার সে ঠিক শুয়ে শুয়ে চাঁদের আকাশ পরিক্রমা দেখে। এই এ জানালায় পুরো চাঁদই ঝকমক করছে, কিছুক্ষণ বাদেই অন্য জানালায় সরে গেছে। তার কিছু বাদে আর এক জানালায়। যেন একেবারে চোখের ওপর চাঁদকে হেঁটে যেতে দেখে শিবানী। ওর মনে হয়'ও নিজেও ঘরে নেই। চাঁদের সঙ্গে ফুরফুর বাতাসে মহাবিশ্বে হাঁটছে। এ যে কি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয় তখন মনের, শক্তি নেই ভাষায় প্রকাশ করে। শরীরের ঠাণ্ডা কি সত্যি ঠাণ্ডা করতে পারে কোন জ্বালাকে? মন ঠাণ্ডাই হলো সত্যিকারের ঠাণ্ডা। মনটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় শিবানীর। যে ব্যবস্থায় ঘরের জানালা রুদ্ধ করে দেয়, সে ব্যবস্থায় যত আরাম, যত বিলাস থাক, তা শিবানীর জন্য নয়।

নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেটুকু দ্রুত হয়েছিল, তা শান্ত করে নিয়ে ইন্দ্রনাথ একবারে শিবানীর পায়ের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘরজোড়া নরম কার্পেট, সেখানে শোয়াতে কিছু আসে যায় না—শিবানী নিজে সরে বসতে যাচ্ছিল কিন্তু সে সরে বসবার আগেই ইন্দ্রনাথ তার দু'পা দু'হাতে টেনে নিয়ে মুখের ওপর চেপে ধরল। অস্বস্তিতে চিড়বিড় করে উঠে পা টেনে নিতে চেষ্টা করল শিবানী। পারল না। ইন্দ্রনাথ চেপে ধরে রইল। সেই ভাবেই বসে থাকতে হল শিবানীকে। নিজেকে শান্ত করল শিবানী—কি আর হয়েছে। ধুলো মাটি থাকে বলেই পা—পা। তাকে হাতের মত মুখে চেপে ধরা যায় না। ওর পা এখন ওর হাতের তালুর চাইতেও পরিষ্কার। কাচ্চির হাতে ঘষা মাজা ধোয়া ইয়ার্ডলির লোশন মাখা।

ঘরে শুধু এয়ারকুলার মেশিনের অতি মৃদু একটা শোঁ শোঁ শব্দ উঠতে লাগল।

যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে থেকেই হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রনাথ তার খাটের গায়ের সুইচ্ টিপে বেডলাইটটা জ্বেলে দিল। মুহূর্তে যেন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। শিবানীর মনে হলো, ছাই রং-এর স্নিগ্ধকার অন্ধকার ঘরটার ভেতর যেন হঠাৎ সমুদ্রের একটা সবুজ রং-এর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ছড়িয়ে গেল। ঘরের বিছানা বালিশ গদি পর্দা সব কিছু সাদা ভেল্‌ভেটের। দীর্ঘ লম্বা ভেল্‌ভেটের পর্দাগুলি মোটা মোটা ভাঁজে সিনেমা থিয়েটারের হলের স্ক্রিনের মতো নিথর হয়ে পড়ে আছে বাতাস বন্ধ করে। এমন কি মেঝের কার্পেটটা পর্যন্ত সাদা। আর এই সাদা কার্পেট আর ভেল্‌ভেটের ওপর সবুজ আলোটা জ্বলে উঠে সমুদ্রের সুষমা ছড়িয়ে দিল যেন।

এবার বুঝল শিবানী, হ্যাঁ, অনেকদিন বাদে সে এ ঘর দেখছে। এ বাড়ির ভেতর সব চাইতে কাছে কিন্তু সবচাইতে অপরিচিত ঘর তার এটা। ঘরের পর্দার রং বদল হয়েছে। কার্পেটের রং বদল হয়েছে। হলদে আর কমলা রং-এর বদলে সব সাদা হয়েছে। কবে হয়েছে শিবানী জানে না, দেখে নি। সমস্ত বাড়ির আলো-হাওয়া ফুল-ফল গাছপালার আবহাওয়া থেকে ইন্দ্রনাথের এই ঘরটা যেন বিচ্ছিন্ন—জার আমলের এক প্রমোদকক্ষ। আর ও বসে রয়েছে উপভোগের জন্য দস্যুবৃত্তি করে নিয়ে আসা বন্দিনী।

ঘরের ঠাণ্ডাটা কি ইন্দ্রনাথ হিমাঙ্কে রেখেছে। দেয়ালে টাঙ্গানো ব্যারোমিটারে কত ডিগ্রি চলছে কে জানে। পা দু'টো ঠাণ্ডা হতে পারে নি। ইন্দ্রনাথের হাতের গরম, নিশ্বাসের গরমে গরম রয়েছে। কিন্তু হাত দু'টোর আঙুলের ডগাগুলি বরফের টুকরোর মতো লাগছে। শাড়ি, জামা, পেট, পকেট যেন রেফ্রিজেটার থেকে বের করে পরেছে। একবার কাশল শিবানী। কাশির শব্দে এতক্ষণে যেন শব্দের কথা মনে পড়ল শিবানীর। ভাষার কথা মনে পড়ল, কথার কথা মনে পড়ল শিবানীর।

ওর পা ঢাকা ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার পা দু'টোকে এভাবে আর কতক্ষণ বেঁধে রাখবে। উঠে একটা দড়ি গামছা যা পাও, তাই নিয়ে এসো। তারপর তাই দিয়ে বেঁধে রাখো। আমি চেঁচাবো না।

পা দু'টো মুখের উপরে থেকে সরিয়ে দুই গালে চেপে রেখে ইন্দ্রনাথ শিবানীর দিকে তাকাল। বলল, চেঁচাবে না?

না।

কিন্তু হাত দু'টো তো বাঁধুনি খুলে ফেলবে।

হাত দু'টোও বাঁধ।

সে ডবল খাটুনি---এই বেশ।

আমার পা ধরে গেছে।

তাড়াতাড়ি পা ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দাও, হাত দু'টো দাও।

ও, আমার হাত হোক, পা হোক তুমি তোমার খুঁটিতে বেঁধে রাখবে?

বাইরের দরজায় টোকা পড়ল। ইন্দ্রনাথ সাড়া দিতে আবদুল জানাল, মেমসাহেবের ফোন এসেছে।

ছোটো স্প্রিং এর মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। বলল, আমি যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে শিবানীও উঠে দাঁড়াল দীপ্তভঙ্গিতে। বলল, ফোন এসেছে আমার। তুমি যাবে কেন?

হ্যাঁ, আমিই যাবো। ইন্দ্রনাথের চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠতে চাইল।

শিবানীর চোখমুখও বিদ্বেষে বিষিয়ে উঠল। এই—এই ইন্দ্রনাথের আসল চেহারা। এইজন্যই নিজেকে টেনে রেখেছে শিবানী। আত্মসমর্পণ করে নি। কিন্তু আত্মসমর্পণ না করুক, প্রশ্রয়ে সে নরম হয়ে গিয়েছিল--- সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যেন সেই রাগে আর আক্রোশেই চেঁচিয়ে উঠল শিবানী, তুমি যাবে কেন। আমার ফোন আমি যাবো। বদ্ধঘরের চার দেয়ালে তার গলার শব্দগুলি যেন বাড়ি খেলে। এতটা উত্তেজিত হবার আগে একবার ভাবলে না শিবানী যে, সে নিজেই সকাল থেকে ইন্দ্রনাথকে সন্দিগ্ধচিত্ত করে তুলেছে। মিথ্যে অভিনয়ে কেবল তার সন্দেহকে চমকে দিয়েছে। এখন যদি ইন্দ্রনাথ সন্দেহে জ্বলতে থাকে তবে দোষ তার নয়।

ইন্দ্রনাথ তাকিয়ে রইল শিবানীর দিকে! সে তাকানো নির্নিমেষই কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়। একটা বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে শিবানীর দিকে। শিবানী যাবার জন্য পা বাড়ালে নীরবে সরে দাঁড়াল।

আবারও একবার ইন্দ্রনাথ যেন ছুঁয়ে ফেলল শিবানীর মনকে।

যদি ইন্দ্রনাথ জুলুম করত তবে জোর করত শিবানী। নীরবে সরে দাঁড়িয়ে সে যেন শিবানীকে হারিয়ে দিল। অত জোরে চেঁচিয়ে, এমন দীপ্তভঙ্গিতে পা ফেলে গিয়ে ও কার ফোন ধরবে। শিবানী তো জানে, এগারোটার ভেতর যাবে বলেছিল সে দিদিকে। দেরি দেখে দিদিই ফোন করেছে।

আবদুল জানে কতটা সময় অপেক্ষা করার পর উল্টোপক্ষ ফোন ছেড়ে দেয়। সে সে-সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পর ফোন তুলে কানে লাগিয়ে দেখল ঘরর ঘরর শব্দ হচ্ছে। অর্থাৎ উল্টোদিক থেকে ফোন ছেড়ে দিয়েছে। মিনিট দশেক বাদে আবার ফোন বেজে উঠল। আবার দরজায় টোকা দিয়ে আবদুল জানাল, মেমসাহেবের ফোন এসেছে।

শিবানী যে ফোন ধরতে যাবে না—ইন্দ্রনাথ ভাবে নি। সে গিয়ে আরাম কেদারায় বসে সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে একবার করে সিগারেটে টান দিচ্ছিল আর মুখ উঁচু করে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে চলছিল। শিবানীকে না যেতে দেখেও কিছু বলল না। শিবানীও তেমনি দাঁড়িয়েই রইল। আবার এসে আবদুল ফোন এসেছে জানাতেই আপনা থেকেই শিবানীর দৃষ্টি গিয়ে ইন্দ্রনাথের মুখের উপর পড়ল। সে ভেবেছিল একটা বাঁকা হাসি দেখবে সে মুখে। কিন্তু ইন্দ্রনাথের কোন ভাবান্তরই দেখল না। সে যেমন সিগারেটে একটা করে টান দিচ্ছিল আর অন্যমনস্কভাবে মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছিল, ঠিক তাই করে চলল। শিবানী বেরিয়ে এলো। ওর কানের, গলার, হাতের পান্নার গয়নাগুলি যেন রোদের আলোয় হেসে দুলে উঠল। বসবার ঘরে এসে অলস হাতে ফোন তুলে নিল শিবানী। বলল, হ্যালো...

কে শিবানী?

দিদি?

হ্যাঁ, কোথায় ছিলি, ফোন করে করে ছেড়ে দিলাম।

ও, তুমি ফোন করে ছিলে বুঝি?

হ্যাঁ। তা দেরি করছিস কেন? চলে আয় না।

এই...আচ্ছা....শোন....

ও রকম আমতা আমতা করছিস কেন?

না, বলছিলাম কি... শোন –

ব্যাপার কি রে?

না ব্যাপার-ট্যাপার কিছু নয়। আমি বলছিলাম—রাগ করো না কিন্তু দিদি – আব্দারে ভেঙ্গে ফেলল গলার স্বরটা শিবানী, দুপুরে আসতে পারছি নে—

সে কি রে!

একটু অসুবিধে হয়ে গেল হঠাৎ। আমি পরে তোমায় কারণ টা বলব। রাগ করো না লক্ষ্মীদিদি।

থমথমে কণ্ঠে ইন্দ্রাণী বলল, ইন্দ্রনাথ আসতে দিচ্ছে না বুঝি?

না...এই...

বুঝতে পারছি—কি একটা বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়েও ইন্দ্রাণী সামলে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, তবে থাক। অশান্তি করে এসে দরকার নেই। তোর জন্মদিন। তোকে নিয়ে সে যদি আনন্দ করত, তবে তো খুশির কথাই ছিল—যাক গে। কালকের অফিস ফেরত একবার আসবি তো?

বাঃ, আসব না। খাওয়া ছাড়তে পারি, শাড়ি ছাড়তে পারব না। নিশ্চয় আসব। কাল অফিস ফেরত এসে তোমার দেওয়া শাড়ি পরে দু'বোনে ছবি দেখব—কেমন?

ক্ষুণ্নমনা দিদি হেঁসে উঠল। বলল, ঠিক আছে। রাখছি?

আচ্ছা। তৈরি থেকো কিন্তু ছবি দেখতে যাবার জন্য।

থাকব।

এবার ললিতার কাছে ফোন করল শিবানী। ললিতা আছে? ও বাড়ি নেই? মার্কেটে গেছে। আচ্ছা, তুমি ওর ছোট বোন সুজাতা কথা বলছ তো? দেখেছ কেমন গলা চিনি আমি। আচ্ছা, শোন, তুমি ললিতাকে বলবে, আজ একটা বিশেষ দরকারে আটকা পড়ে যাওয়ায় সন্ধ্যায় আসতে পারছি নে। ও যেন কিছু মনে না করে।...ভীষণ

খারাপ লাগছে তোমার? উঁহু, তোমার খারাপ লাগা নিয়ে আমি একটুও ভাবিত নই। তোমার সঙ্গে আমার কি কথা ছিল দুষ্টু মেয়ে? আমার সঙ্গে একদিন এসে সমস্ত দিন থাকবার কথা ছিল না? তাই তোমার সঙ্গে আমার রাগ। তোমার দিদির সঙ্গে আমার ভাব তো, তাই তার কথাই আমি ভাবছি—

ছোট মেয়ে বেচারা জবাব দিয়ে উঠতে পারলে না। হেসে উঠল শিবানী। বলল, এই তো হাসছি দেখছ তো? তাই খুব একটা ভীষণ রাগ তোমার উপর নেই। একদিন এসে আমার সঙ্গে কথামত থাকলেই ভাব হয়ে যাবে। দিদি নিয়ে আসে না? ও, তবে তো গোড়ায় ভুল। রাগ তো তবে দিদির ওপর। বেশ দিদিকে বলো, সেই রাগেই আজ আমি আসব না। যাঃ কি—হ্যাঁ তো—আচ্ছা দিদিকে বলো কেমন—হেসে ফোন নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল শিবানী। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল—

এবার?

এবার কি করবে সে?

কিসের জন্য যে সব নেমন্তন্ন ও না করে দিল তার কোন স্পষ্ট ধারণা শিবানীর নেই। শুধু এটুকুই সে বুঝতে পারছে, সকালবেলা ইন্দ্রনাথকে উত্তেজিত করে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র যে উগ্র বাসনাটা তার মনে ছিল, সেটা এখন একেবারেই অনুপস্থিত। উৎসাহ যদি অনুপস্থিত হয়ে যায়, কর্তব্য বা প্রয়োজনের তাগিদও যদি না থাকে— তবে পা দু'টোকে চালনা করা বড় কঠিন। সে কিছুতেই চলতে পারে না।

তা চলাটা বাদ দেওয়া গেল। ঘরে এসে বসাও গেল—ঘরে এসে বসল শিবানী। কিন্তু তারপর? ইন্দ্রনাথের ঘরটা যে তাকে ভেতরে ভেতরে টানছে সেটা বুঝতে পারল শিবানী কিন্তু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সম্পর্কটা এমনই হয়ে গেছে যে, আজ ইন্দ্রনাথ এসে ওকে যেভাবে তুলে তার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে এসে তুলে নিয়ে উঠলেই শিবানী ইন্দ্রনাথের ঘরে যেতে পারে। হেঁটে যেতে পারে না। নিজে নিজেই হেসে ফেলল শিবানী কথাটা মনে করে।

হাতে একপাঁজা ইস্তিরি করা শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল কাচ্চি। শিবানীকে যেন সে দেখলই না। তৈরি হয়ে কেন ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে জিজ্ঞাসাও করল না। শিবানী বেরিয়ে গেলে যেমন খালি ঘরে নিজের মনে কাজ করে, তেমনি হাতের শাড়ি-ব্লাউজ আলমারীতে ভরে গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল। ছাড়া জামা-কাপড় তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শিবানী বুঝল, কাচ্চি এই আবহাওয়াটায় এতটুকু নাড়া দিতে চায় না। যদি ভেঙ্গে যায়। যদি শিবানী ঝট করে উঠে বেরিয়ে পড়ে। কাচ্চির গিন্নীপনায় হাসল শিবানী। একবার উঠল। একবার বসল। একবার ভাবলে কাপড়-জামা ছেড়ে ফেলে; আবার তক্ষুণি ভাবলে, না—এক্ষুণি হয়ত ইন্দ্রনাথ উঠে এসে বিদ্রূপে ঠোঁট মুখ শাণিয়ে তুলে বলবে, কি বন্ধুদের বুঝি আর বিলম্ব সইছে না। লাঞ্চের নেমন্তন্ন—এগারোটা থেকেই ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে। ওকেও তক্ষুণি তো বেরিয়ে পড়তে হবে। শ্রাবণ আকাশটার মতই আজ ইন্দ্রনাথ অনিশ্চিতরূপ ধরেছে। বুঝতে পারছে না শিবানী ইন্দ্রনাথকে।

কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেল ইন্দ্রনাথের কোন সাড়াশব্দই পেল না শিবানী। একটু বিস্মিতই হলো সে। সে হয়ত ভেবেছে ও বেরিয়ে গেছে। এটা আরো বিস্ময়ের কথা। শিবানীকে এত নিরুপদ্রবে বেরিয়ে যেতে দেবে সে—সত্যি আশ্চর্য! আজ ইন্দ্রনাথ কেবলি ওকে অবাক করছে।

কাচ্চিটা এলে ওর সঙ্গে কথা বলে। শুনতে পেলে ইন্দ্রনাথ বুঝত ও বেরোয় নি। কিন্তু সেই যে কাচ্চি গেছে আর আসছে না।

আবদুল! ইন্দ্রনাথ ডাকল।

শিবানীর হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎই আছাড় খেল ভেতরে।

আবদুল! ইন্দ্রনাথ তার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ফের ডাকল আবদুলকে। শিবানীর ঘরটা অতিক্রম করতে গিয়ে জানালার উড়ন্ত পর্দার ফাঁকে চোখ পড়তে দেখল শিবানী বসে আছে—ড্রেসিং-টেবিলের সামনের টুলের ওপর। দুই চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল ইন্দ্রনাথের। শিবানীর ঘরে এসে প্রবেশ করল সে। বলল, তুমি বেরোও নি যে?

এ কথার জবাবে শিবানী কি বলতে পারে না আমি বেরুচ্ছি না? হাতের ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল শিবানী। বলল, সত্যি বড্ড দেরি হয়ে গেছে—এইবার বেরুব।

ইন্দ্রনাথ আর কিছু বলল না। শিবানীর ঘর থেকে বেরিয়েই দেখল আবদুল দাঁড়িয়ে। তাকে বাড়িতে খাচ্ছে না জানিয়ে ফের গিয়ে তার ঘরে ঢুকল।

শিবানী খাবে না আগেই জানা ছিল। এবার ইন্দ্রনাথও জানিয়ে দিল সে খাবে না। তবে আর খাবে কে। দোকানের ঝাঁপ ফেলার মতো বাড়ির কর্মচাঞ্চল্য যেন ঝপ্ করে বন্ধ হয়ে গেল। বাবুর্চি জিনিষপত্র কিছু রান্নাকরা, কিছু তৈরি করা, কিছু কাঁচা—সব এনে ফ্রিজে ঢোকালো।

এ কিন্তু এ বাড়ির নতুন ঘটনা নয়। প্রায়ই ওদের রান্না ফ্রিজে ঢোকাতে হয়।

ইন্দ্রনাথ খাবে না মানে, সে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কাচ্চি এসে ঘরে ঢুকতেই শিবানী খেঁকিয়ে উঠল, তুই কি মরে গেছিস?

কেন?

তোর টিকিটিও যে দেখতে পাচ্ছি নে।

এই তো এসেছি। বল কি করতে হবে।

শান্ত ঠাণ্ডা কাচ্চি। অবাক চোখে তাকাল শিবানী কাচ্চির দিকে। আজ কি বাড়ির সবাই ওর বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াই চালাচ্ছে! শিবানী বলল, তুই যেন একেবারে নেতিয়ে গেছিস।

কাচ্চি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তবে তার এখনকার এ চুপ করে থাকা—ঠিক চুপ করে থাকা নয়। তার যা বলবার, তা সে বলবেই শিবানীর অলস সময়ে। এখন নয়।

কাচ্চি বলল, কি করব বল?

কিছুই শিবানীর বলার ছিল না কাচ্চিকে। তাই ফের ধমকে উঠল, যা, চলে যা। কিচ্ছু দরকার নেই তোকে।

খোঁপাটা ঢিলে হয়ে গেছে। ফের বেঁধে দেব?

আবার ধমকে উঠল শিবানী, যা বলছি।

কপালের টিপটা ঘষে গেছে। দিয়ে দেব?

ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল শিবানী কাচ্চির দিকে।

কাচ্চি চলে গেল।

ফের ডাকল তাকে শিবানী। বলল, জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিয়ে যা।

সবগুলো?

হ্যাঁ, সবগুলো।

জানালা বন্ধ করে কাচ্চি চলে গেল।

এইবার যা করতে পারে শিবানী তা হলো কাপড়-জামা ছেড়ে শুয়ে পড়ে চোখ বোজা। কিন্তু ইন্দ্রনাথ চলে না যাওয়া পর্যন্ত বিছানায় গা দিতে পারে না শিবানী। দিলে ইন্দ্রনাথকে ডাকার মতো যেন হয়ে যায়। শিবানী বসে রইল ইন্দ্রনাথের বেরিয়ে যাবার অপেক্ষায়। কিন্তু তার বেরুবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মাঝের দরজার পর্দাটা শিবানীর ঘরের পাখার বাতাসে মাঝে মাঝে অল্প দুলে উঠছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না ঘরের। তা দেখা না যাক শোনা তো যাবে। আবদুলের যাওয়া আসার। সাহেবকে কোট, জুতা, মোজা পরতে সাহায্য করার। কই কিছুই তো সাড়া মিলছে না! ঘরটা যেন ঘুমিয়ে আছে।

একটা বাজে। বেয়ারা-বাবুর্চি-আয়ার বিশ্রী অবস্থা। সাহেব, মেমসাহেব বেরিয়েও যাচ্ছেন না। খাচ্ছেনও না। ওরা খেতে পারছে না। যেতে পারছে না। গা ছেড়ে বসতে পারছে না।

নিশ্চয় ড্রিঙ্ক নিয়ে বসেছে ইন্দ্রনাথ। উঠে গিয়ে পর্দা ফাঁক করল শিবানী। নাকে মুখে ঠাণ্ডা ঝলক এসে লাগল। দেখল, যা ভেবেছে ঠিক তাই। ইন্দ্রনাথের সামনের টেবিলে সোনালী মদের টলটলে গেলাস। হাতে সিগারেট। ঠিক আগের মতই সিগারেট টানছে আর কত কি ভাবতে ভাবতে যেন ধোঁয়া ছাড়ছে।

পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে চলে আসছিল শিবানী, ইন্দ্রনাথের তক্ষুণি চোখ পড়ল তার উপর। গেলাস হাতেই উঠে এল সে। এসে দরজার পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। চোখ দু'টো একটু লাল। একটু ঘোর লাগা। হাতের ঘড়ি দেখে বলল, বেলা একটা। তোমার আশা ছেড়ে দিয়ে তোমার বন্ধুরা মনের দুঃখে লাঞ্চে বসে গেছে শিবানী।

বোধ হয়।

তুমি খাবে কি?

তোমার হোটেলের লাঞ্চটাইমও আর বেশীক্ষণ থাকছে মনে হয় না।

সে জন্য আমার তাড়া নেই।

কেন? তুমি তো বাড়িতে খাচ্ছ না বললে।

আমি খাব না বলেছি হোটেলে লাঞ্চ খেতে যাবার জন্য নয়। আমি খাব না বলে।

ওগুলো খাবে? চোখ দিয়ে হাতের গেলাসটা দেখাল শিবানী।

আসলে ব্যাপারটা তাই। কিন্তু ইন্দ্রনাথ স্বীকার করল না। বলল, তা নয়। ক্ষিদে পেতে দেরি হবে মনে হচ্ছে, তাই এটা বলে ওদের খেয়ে নিতে বললাম। যদি ইচ্ছে করে, খাবো তখন। বোধ হয় সকালের খাওয়াটাই বেশী ভারি হয়ে গেছে।

বাজে কথা। ব্রেকফাস্ট খাও নি, সে আমি দেখেছি।

হঠাৎ ভীষণভাবে হেসে উঠল ইন্দ্রনাথ। বলল, আমি সকালে কিছু খাই নি তুমি দেখেছ! আর এ যে একেবারে স্ত্রীর মতো কথা হয়ে গেল। গেলাসের মদটা এক নিশ্বাসে গিলে গেলাসটা ছুঁড়ে দিল শিবানীর খাটের গদির উপর। তারপর একবার ডান হাতে আর একবার বাঁ হাতে পাঞ্জাবীর হাতা গোটাতে গোটাতে বলল, শীগগির তুলে নাও কথাটা—

দু'পা পিছোলো শিবানী। বলল, কথাটা তুললে তো আর সম্পর্কটা উঠবে না। সম্পর্ক তুলতে আদালতে যেতে হবে।

তা সম্পর্কটা পাতাবার জন্য পুরুত ডাকা হয়েছিল, তুলবার জন্য না হয় উকিল ডাকা যাবে—কিন্তু কতজন ডাকবে? শত উকিলের শত ওকালতির প্যাঁচেও কুলোবে না তোমাকে আমার কাছ থেকে নেওয়া—

শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না, নাই বা লাগিল তোর।

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া—

কি যেন—কি যেন, মাথা চুলকাল ইন্দ্রনাথ— কোন কালে যেন কবিতাটা পড়েছিলাম—

আসল লাইনটাই ভুলে গেলে—

আসল লাইন? কোন্‌টা?

তুই যে আমার বন্দী অভাগী, বাঁধিয়াছি কারাগারে—

না,ওটা আসল লাইন নয়। আসল লাইন হলো—

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া,
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া।

—বলতে বলতে এগিয়ে এসে শিবানীকে বুকের উপর টেনে নিল। এদিকে, ওদিকে, ডাইনে বাঁয়ে চোখে-মুখে উপর্যুপরি চুমু খেতে খেতে সকালবেলার মত আবারও শিবানীকে আলগা করে তুলে তার ঘরে নিয়ে এলো ইন্দ্রনাথ।

শিবানীদি'...উচ্চস্বরে ডাক এলো বারান্দা থেকে।

—ললিতা! ইন্দ্রনাথকে ঠেলে সরিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে চাইল শিবানী খাট থেকে। ললিতা ওর ঘরে আসবার আগেই চাইল নিজের ঘরে চলে আসতে—

ইন্দ্রনাথ দিল না।

কলেজী মেয়ের মতো পায়ের চটিতে চটপট চটপট শব্দ তুলতে তুলতে ললিতা এসে ঢুকল শিবানীর ঘরে। বলল, কি অন্ধকার রে বাবা। কোথায় তুমি শিবানীদি'? ঘরে? নীচে? ওপরে? না বাইরে? বলে হেসে উঠল। বেরিয়ে এসে ডাকল, কাচ্চি।— বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আপন মনে বলল, আরে, গেল কোথায় সব!

ঝাড়ন কাঁধে ব্যস্ত পায় আবদুল এলো।

ললিতা বলল, মেমসাহেব বেরিয়ে গেছেন?

আবদুল জানাল, সে ঠিক বলতে পারছে না। তবে বোধ হয় এতক্ষণে বেরিয়েই গেছেন।

কাচ্চি কোথায়?

আবদুল এদিক-ওদিক তাকাল।

ললিতা মনে মনে মুখ ভেঙ্গাল। তুমি জান না। তুমি জান বুঝি কেবল তোমার সাহেবের সংবাদটি। আর তোমার সাহেব যখন বাড়ি নেই তুমিও এ মুল্লুকে নেই। মুখে বলল, আমি বসছি। তুমি একটু দেখ তো কাচ্চি কোথায়।

আচ্চা—বলে যাওয়ার সময় আবদুল জানিয়ে গেল, সাহেব ঘরে আছেন।

সাহেব ঘরে আছেন! দাঁড়িয়ে পড়ল ললিতা। শিবানী সকালবেলা বলল যে ইন্দ্রনাথ তার ব্যবসার কাজে বাইরে গেছে! নিজেকে বিষম বিপদগ্রস্ত মনে হলো ললিতার। এখন কি করবে সে। ইন্দ্রনাথের সাথে তার অবশ্যই দেখা করে যেতে হয়। কিন্তু তার ঐ বদ্ধঘরে ঢোকবার কথা মনে হতেই বুকটা দুরদুর করে উঠল ললিতার। শিবানীর উপস্থিতিতে সে ইন্দ্রনাথের কাছে সহজ হতে পারে হয়ত কিন্তু শিবানীর অনুপস্থিতিতে কিছুতেই সহজ হতে পারে না সে তার কাছে। ইন্দ্রনাথের জন্যই পারে না। ললিতার যে রূপটা প্রথমদিনই মত্ত ইন্দ্রনাথকে লোলুপ করে তুলেছিল, তার সেই মেয়েলি রূপটার প্রতি ইন্দ্রনাথের ভেতরে একটা লোভ যে রয়ে গেছে— নারী বলেই ললিতা তা বোঝে।

কি করবে না করবে ভেতরের দিশেহারা ভাবটা কিছু স্থির করবার আগেই ললিতার পা হাঁটতে শুরু করল। পায়ের চটির সেই চটপট চটপট শব্দটা একেবারে কমিয়ে ফেলে ললিতা এমনভাবে নীচে নেবে এলো, যেন পা টিপে টিপে পালাল সে।

কিন্তু গাড়িতে বসে লজ্জায় মরে যেতে লাগল সে। এটা করল কি সে? বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? অপমানটা ইন্দ্রনাথকে বেশী করে। ফেলল না?

॥ ৮ ॥

মনটা খারাপ হয়ে গেল ললিতার ইন্দ্রনাথের ওখান থেকে এ ভাবে চলে এসে। ব্যাপারটা সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এমন বিশ্রী চলা ও চলল কি করে! বাড়ির চাকর-বাকরগুলি কি ভাবলে! তার সঙ্গে সাহেবের সম্পর্কটা ওরা জানে। আর আগের দিনের ভাসুর ভাদ্রবৌ -এর মতো যে ওরা চলে না তাও জানে। আর তা জানে বলেই শিবানীর অপেক্ষায় ও বসবে শুনে আবদুল ওকে সাহেবের ঘরে থাকার সংবাদটা দিয়েছে—অর্থাৎ সাহেব—ঘরে আছেন। আপনি ও ঘরে গিয়ে বসুন। আর তা শোনামাত্র কি না ও আবদুলের চোখের উপর দিয়ে পালিয়ে এলো চটির শব্দ পায়ের তলায় চেপে! এ আসার অর্থ বুঝতে কি ওদের এতটুকু অসুবিধে হবে। হঠাৎ যেন ললিতা আবদুলজাতীয় বেয়ারাগুলির উপরই ক্ষেপে গেল—এমন মিশরের মামির মতো মুখের চেহারা করে রাখবে, যেন—ফসিল। মানুষকে ওদের সম্বন্ধে সচেতন থাকতে ভুলিয়ে দেবে একেবারে। এদিকে ধূর্তমীতে নাড়ী টনটনে। হ্যাঁ, ধূর্তমী নয়ত কি! তোর কি দবকার ছিল বলবার, সাহেব ঘরে আছেন। জানিস না সাহেব এখন মদের গেলাস নিয়ে বসে রয়েছেন। আমি তো তোর মত বেয়ারা নই যে, 'সাব' বলে বার্তা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। ইন্দ্রনাথ যত বড় সাহেবই হোক, 'নক' করে না ডাকা পর্যন্ত বেডরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—এমন দাবী কোনদিন করে নি ওদের কাছে। আমাকে তো নিতান্ত ভদ্রতাসূচক একটা জানান দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে পড়তে হবে। আর ওটা ঘর তো নয়, যেন মায়াপুরী। প্রভাবের জগতে একটা ঘরের প্রভাবও যে কত ভীষণ হতে পারে ইন্দ্রনাথের এই শোবার ঘরটা না দেখলে ললিতা জানত না। ঘন ভাঁজের সাদা ভেলভেটের পর্দার উপর পাতলা সবুজ আলোর ঢেউ-এ ভরা ঘরটা যেন ডাকে—

'যদি গাহন করিতে চাও, এসো নেমে এসো হেথা গহনতলে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দেও সলিল মাঝে।।'

ঘরটাকে ওর ভয় করে, ঘরটা নেশার ঘোর লাগিয়ে দিতে পারে মনের ভেতর।

আচ্ছা- ওর এই চলে আসাটা যে ইন্দ্রনাথ দেখে নি তাই বা কে বলতে পারে? সাহেব যে ঘরে রয়েছে সে কথাটা যত আস্তেই আবদুল বলে থাক একটা শব্দ তো উঠেছেই মধ্যাহ্নের স্তব্ধ বাড়িটার বুকে। ইন্দ্রনাথ তা শুনে

যদি বের হয়ে এসে থাকে— নিজে না বের হয়ে এসে থাকলেও, যদি আবদুলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে থাকে কে এসেছিল? নিজের ওপর বিরক্তবোধ করতে লাগল ললিতা। সকালটা খুব ভাল লেগেছিল তার। শিবানীর অন্য কোথাও নেমন্তন্ন থাকবে না। এটা খুব আশা করছিল না-ও সে। তাই শিবানী নেমন্তন্ন নিতেই খুশি হয়ে হৈ হৈ করে মার্কেটে বেরিয়ে পড়েছিল কেনাকাটা করতে। এই বেলা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে কত যে সওদা করেছে তার ঠিক নেই। ফুল কিনেছে একঝুড়ি। সব শিবানীর প্রিয় ফুল। এখন এসব দিয়ে করবে কি সে। ছাই করবে। গাড়ির গদিতে পিঠ ছেড়ে দিল ললিতা।

গাড়ি থেকে নেমে সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে এসে বাড়ি ঢুকল। বৌদি বললেন, সব সওদাপাতি নামিয়ে রেখেই কোথায় ছুটেছিলে? মার্কেটে কিছু ফেলে এসেছিলে?

সংক্ষিপ্ত জবাবে 'না' বলে গায়ের ঘামে ভেজা জামা-কাপড় টেনে টেনে খুলতে লাগল ললিতা।

বৌদি ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলল না। ঝুড়ির ফুলগুলি তুলে নিয়ে বলল, ইস! এ ভাবে জানালার কাছে ফুলগুলি রেখে গিয়েছিলে! রোদ পড়ে শুকিয়ে উঠেছে—

তোমরা রয়েছ কি করতে?

তা আমরা যে জন্য রয়েছি তা তো করছি! কিন্তু জানতে তো হবে।

এখন জানলে কি করে?

তোমার ঘরে এলাম বলে।

আরো আগে আসো নি কেন?

ভাসে ফুল সাজাচ্ছিল ললিতার বৌদি মঞ্জুলা। ফুল থেকে চোখ তুলে হেসে বলল, এখন গলা চুলকিয়ে ঝগড়া করছ? কোথাও থেকে হেরে এলে নাকি? ফুল মেলাতে মেলাতে চোখ তুলে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাতে লাগল খাটের উপর গুম্ হয়ে বসে থাকা ললিতার দিকে। তারপর আহ্লাদি ঢং-এ মাথা কাত করে বলল, হ্যাঁ, যা বলেছি ঠিক তাই। তুমি যখন অন্যমনস্কভাবে বসে বাঁকা ভাবে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করতে থাকো, তখনই আমি বুঝতে পারি তুমি কি যেন ভাবছ।

তোমার বুদ্ধির কি আমি এমনিই প্রশংসা করি। চিন্তার লক্ষণ মুখে দেখলেই তুমি বুঝে ফেল লোকটা চিন্তা করছে।

মেঝের উপর বসে ঘরের দেয়ালে পিঠ রেখে বই পড়ছিল ললিতার ছোটবোন সুজাতা। শিবানী যার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল। দিদির মুখে মঞ্জুলার বুদ্ধির প্রশংসার নমুনা শুনে হেসে উঠল কিটকিট করে।

ললিতা বলল, শুধু কি এই! কেউ নাক ডাকতে থাকলে তুমি বুঝে ফেল সে ঘুমিয়েছে। কেউ জল খেতে চাইলে তুমি বুঝে ফেল তার তেষ্টা পেয়েছে—

কিশোরী সুজাতা হাসিতে গড়িয়ে পড়ল।

মঞ্জুলা ফুলদানীর ভেতর একগুচ্ছ ফুল ঢুকিয়ে ঝুড়ি থেকে আরো ফুল তুলে তুলে ফুলদানীর এদিক-ওদিক গুঁজে দিতে দিতে বলল, হ্যাঁ, নাক ডাকলে আমি ঠিকই বুঝতে পারি লোকটি ঘুমিয়েছে। কিন্তু জল খেতে চাইলেই আমি বুঝব তার তেষ্টা পেয়েছিল— এ কিন্তু নয়। চোখ বাঁকিয়ে সুজাতার দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলা বলল, কি বল সুজাতা, সব সময় কি কেবল জলের তেষ্টার জন্যই সবাই এসে জল খেতে চায়?

হাসি থেমে গেল। চোখের পাতা দুটো ভয়ে যেন কেঁপে উঠল সুজাতার। বৌদির দিকে তাকাল সে।

মঞ্জুলা বলল, আজ রবিবারের রাস্তার গ্রাউণ্ডের জমাট ক্রিকেট খেলা ফেলে বারবার যে অরুণের কেবল তেষ্টা পাচ্ছিল আর জল খেতে আসছিল— সে তেষ্টা কি তার জলের?

যদিও গরম রক্তের ঝলক লাফ দিয়ে উঠে এসে সুজাতার দু'গালের কাঁচ চামড়া আগুন বর্ণের করে ফেলল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর ছড়ানো দু'পা নিদারুণ বিক্ষোভের ভঙ্গিতে ছুড়তে ছুড়তে নাকিসুরে বলতে লাগল সে, —এ্যাঁ ম্যাঁ—বৌদিটা কি অসভ্য কথা বলছে দেখো দিদি।

ললিতা বলল, খেলতে খেলতে যা পায় তা জলের তেষ্টাই।

মুখ টিপে হাসল মঞ্জুলা—কই, আর কারু তো তেষ্টা পায় নি এমন। জল খেতেও আসে নি তারা।

—সবাই কি এক বাড়িতে আসবে।

হেসে উঠল মঞ্জুলা। ঠিক বলেছো। দিলীপ গেছে নমিতাদের বাড়ি। অলক রাণীদের—

এ্যাঁ মাঁ গোঁ—এ্যাঁ মাঁ গোঁ বলে নাকিসুরে চেঁচাতে লাগল সুজাতা। কি অসভ্য বৌদিটা। দাঁড়াও বলে দেব সবাইকে। কেউ আমরা আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। রাণী, নমিতা, গোপা, আমি কেউ না— কেউ না— দেখ—

তোমাদের থিয়েটারের ড্রেস তৈরি করে দেবে কে?

অনেক বৌদি আছে আরো—

পারবে আমার মতো?

বোধ হয় মঞ্জুলা থিয়েটারের পোষাক তৈরিতে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারিণী। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল সুজাতা—কেন তুমি যা-তা বলবে!

মঞ্জুলা হাতের ফুল ফেলে ছুটে এসে ননদের সামনে মেঝের উপর বসে পড়ল। সুজাতার মুখ ঢাকা হাত টেনে নিতে নিতে বলল, ঠাট্টা বোঝে না কি মেয়ে গো? বৌদি বলে তুমি আর ডেকো না আমায় তবে—

ললিতা তাকিয়ে রইল সুজাতার লালচে ক্রন্দনরত মুখটার দিকে। কৈশোর কি যৌবনকে ডরায়? যৌবনের দরজা কেঁপে কেঁপে খুলে পড়তে চায়, কৈশোর কি দু'হাতে টেনে বন্ধ করে রাখতে চায় সে দরজা? শুধু ডরায়? না কৈশোর যৌবনকে ঘৃণাও করে? যৌবনধর্মের কোন ইঙ্গিতও যে সে সইতে পারে না, কেঁদে কেটে হাট বাধায়, এ কি ভয় না ঘৃণা?

ক্রিকেট খেলোয়াড় কেউ বোধ হয় বাউণ্ডারী হিট করলো। আনন্দের হুল্লোড় উঠল রাস্তায়।

মা এসে ঢুকলেন ঘরে। রান্নাঘরে খাবার তৈরি করছিলেন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকছে না দেখে দু'বার চাকর দিয়ে তাড়া লাগিয়েছেন তবু কারু সাড়াশব্দ না পেয়ে সুজি-ময়দা মাখা হাত ধুয়ে উঠে এসেছেন। বললেন, ব্যাপার কি? আজ তোরা খাবিটাবি নে নাকি? বেলা কোথায় গড়িয়েছে দেখেছিস। বিকেলে আবার বাড়িতে লোকজন আসবে না?

ললিতা খাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। সত্যি ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। মার্কেটে সওদা করতে করতেই ক্ষিধে চাড়া দিয়ে উঠেছিল। গোটা দুই প্যাটিজও সে খেয়েছে অবশ্য কিন্তু তাতে কি পেট ভরে। এখন ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। মঞ্জুলাকে নিজেই তাড়া লাগাল, চলো চলো বৌদি। তারপর মাকে বলল, কিন্তু রাতের জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। কেউ আসছে না।

মা আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি— কেন, তোর জা আসবে না?

না। সুজাতা বলে নি তোমাদের?

সুজাতা খনখনে গলায় প্রতিবাদ জানাল, বারে, তুমি যে গেলে শিবানীদির ওখানে নিয়ে আসবে বলে—

এতক্ষণে মঞ্জুলা ললিতার মেজাজ খারাপের হদিস পেলো। ওর মনও খারাপ হয়ে গেল। অনুনাসিক সুরে গাঁইগুঁই করে বলতে লাগল, ওমা, আমি অত খেটে দিনভোর বসে নানা রং-এর ফুল-লতা-পাতার নক্সা কেটে সব্জির স্যালাড বানালাম শিবানীদির জন্য—

মা নিজেও এর ভেতর কয়েক রকমের মিষ্টি তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু তা নিয়ে মঞ্জুলার মত ব্যাকুল হলেন না। নানা নক্সার কাটা সব্জির স্যালাট হলো বেশিটাই খাবার টেবিলের সজ্জা। সজ্জাটা নিমন্ত্রিতের জন্য। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি না এলে তা বৃথা হয়ে যায়। তিনি তৈরি করেছেন খাবার। বাড়িতে খাবার লোক আছে এবং তিনি মেয়ের জা'র জন্য ব্যস্ত নন। তিনি তাঁর জামাই এলেই খুশি। বললেন, তা কালীনাথ আসছে তো?

সাজান টেবিলে গিয়ে বসে মা, মেয়ে, বৌ উপুড় করা প্লেট তুলে নিল। ঝি পরিবেশন করতে লাগল। সুজাতার দিকে তাকিয়ে ললিতা বলল, তুইও খাস নি এখনও?

মা বললেন, তোর সঙ্গে খাবার জন্যই তো বসে রয়েছে। নইলে বাপ ডেকেছিল, দাদারা ডেকেছিল—

আয় আমরা একসঙ্গে খাই। সুজাতার প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ললিতা চেয়ারশুদ্ধু টেনে সুজাতাকে নিজের কাছে নিয়ে এলো সাদরে। ওর ঘাড়ের উপর বাঁ হাত রেখে বলল, দাও সুশীলা আমাদের দু'বোনকে এক প্লেটে দাও।

মা বললেন, কই বললি না তো কালীনাথ আসবে কি না।

তোমার কালীনাথকে বলেছি নাকি যে আসবে।

কেন, বলিস নি কেন?

আজকে আমার জা'কে খাওয়াব ভেবেছিলাম। তা দাদা আসতেন তো ওকেও বলতাম। দাদা আসবেন না জেনে তোমার জামাইকেও আর বলি নি। ভেবেছিলাম, আমরা দু'জনাতেই খুব গল্প করব।

তোর জা' আসবে বলেও এলো না কেন?

তাই তো ভাবছি আমিও। সে তো এমনটা করার মেয়ে নয়। বাড়ি গিয়েও পেলাম না।

সুজাতা চাখুম চুখুম করে মাছভাজা খেতে-খেতে বলল, শিবানীদিকে আমার ভীষণ ভালো লাগে—ভীষণ। নিয়ে যেও না একদিন আমাকে শিবানীদির বাড়ি।

যাবো।

ঐ তো কবে থেকে বলছ যাবো—যাবো। কই নিয়ে তো যাচ্ছ না। এবার একদিন না নিয়ে গেলে আমি ছাড়বই না—হ্যাঁ, কিছুতেই ছাড়ব না দেখো তুমি! শিবানীদিও রাগ করেছেন তোমার উপর আমায় নিয়ে যাও নি বলে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, বলেছেন সেইজনাই আজ এলেন না।

হেসে উঠল সবাই।

অপ্রস্তুত ভাবে সুজাতা বলল, এটা সত্য আমি ভাবছি বুঝি! তা মোটেই না গো। কথাটা ঐ ভাবে বলেছেন সেটাই বললাম তো। তোমরা যে ফোনে ইনিয়ে বিনিয়ে বল, 'ও, আপনি আসছেন আমাদের বাড়ি? এখন? নিশ্চয় নিশ্চয়। খুব খুশি হবো এলে।' তারপর ফোন রেখেই বল, 'কি জ্বালাতন বাবা।' আবার কখনো, 'ও আসতে পারছেন না? ভীষণ খারাপ লাগছে।' তারপরই ফোন রেখে বল, 'বাঁচা গেল'—শিবানীদি অত মিথ্যে করে বলেন না। আমায় নিয়ে যাচ্ছ না বলে তিনি ঠিক রাগ করেছেন তোমার উপর।

সুজাতার মুখটা গালের উপর টেনে নিয়ে ললিতা হাসতে হাসতে বলল কত কথা শিখেছে চোদ্দ বছরের মেয়ে দেখ না।

বোনকে চোদ্দ বছরে ক'বছর রাখবে? মাছ চচ্চড়ি দিয়ে মস্ত এক মাখা দিতে দিতে মা বললেন।

কেন? ওর বয়স চোদ্দ পুরো হয়ে গেছে?

পনেরো পুরো হয়ে গেছে।

ললিতা বলল,—এক বছর তো মাত্র খাড়া করিয়ে রেখেছি। তাও ভুলে।

মঞ্জুলা বলল, মোটেই কিন্তু আমাদের সুজাতাকে দেখলে তা মনে হয় না। মনে হয় বারো-তেরো।

তোমরা তো বাইশ বছরের মেয়েদেরও গাউন পরিয়ে আজকাল বারো করে রাখো। বেশি ঝাল মাখায় মার হেঁচকি উঠে গিয়েছিল। ঢকঢক করে জল খেলেন তিনি।

পনেরো পুরো হয়ে গেছে শুনে ললিতা বার দুই তাকাল সুজাতার দিকে।

শরীরটা নিয়ে আড়মোড় খেতে খেতে সুজাতা বলল, তুমি অমন বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন দিদি?

তোর লজ্জা করছে?

হ্যাঁ তো—করছে তো। হাত তুলে চুল সরাবার ছলে চোখ ঢাকল. বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত চুলকোবার ছলে বুক ঢাকল—টেবিলের তলায় শরীর আড়াল করে বললে, অন্যদিকে তাকাও তুমি।

ললিতা সত্যি ওকে নতুন দেখছিল যে। এতদিন এই তেরো চোদ্দ বছরের ধারণাটাই ললিতার দৃষ্টিটাকেও সুজাতার ওপর তেরো চোদ্দ বছরের মতোই করে রেখেছিল। এখন দেখল সুজাতার খাড়া নাকে, বড় বড় দু'চোখের কোলে, ঠোঁটে, শরীরের কাণায় কাণায় জোয়ার এসে গেছে।

অদ্ভুত সুন্দর একটা উজ্জ্বল তামাটে রং সুজাতার। সচরাচর এ জাতীয় রং একেবারেই চোখে পড়ে না। একবার একটা হোটেলে খেতে গিয়ে ললিতা একটি ইটালীয়ান তরুণীর এমনি রং দেখেছিল। সেদিন মেয়েটির ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না সে মেয়ে হয়েও। আজ দেখল সুজাতার গায়ের রং যেন কখন

ওই ইটালীয়ান তরুণীটির মতো হয়ে গেছে। ওই ইটালীয়ান মেয়েটির মতোই খাড়াখাড়া টানটান চুল মুখের দু'পাশে উড়ছে।

হঠাৎ ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ল ললিতার।

ললিতা অবাক হয়ে গেল, ললিতা হতভম্ব হয়ে গল, ললিতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—সুজাতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ল কেন!

ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর বিরাট ছ'তলা দালানের উপরতলার এক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে শিবানী কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছিল হাত ঘুরিয়ে। টাইপিস্ট মিস জেনি টাইপ মেশিনের কি বোর্ডের উপর দ্রুত নৃত্যের ভঙ্গিতে আঙুল চালাতে চালাতে সেটা লক্ষ্য করে লিপষ্টিক-রাঙা ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল। কিছু প্রয়োজনীয় চিঠি টাইপ করে সেগুলো বড়সাহেবের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল জেনি। হাইহিলের খট্ খট্ শব্দ তুলে শিবানীর কাছ দিয়ে যেতে যেতে বলল, হামি দেখছে তুমি খুব ছুটির ঘণ্টার জোন্য ব্যস্ত আছে—তাই না? মুচকি হাসল জেনি।

এই ঘরে শিবানী আর মিস জেনি দু'জনই শুধু বসে। শিবানী কিছুতেই ইংরেজীতে কথা বলবে না। সে বলে, জীবনটা তো বাংলা দেশেই কাটাবে— দেশের জল-বাতাস, ভাত-মাছ খাচ্ছ। আজকাল শাড়ি পরেও মাঝে মাঝে আসছ দেখছি। দেশের ভাষাটা দোষ করলে কি? তোমার ভাষাটা কাজ চালাবার মতো আমি শিখে নিয়েছি। তুমি আমার ভাষাটা কথা চালাবার মতো শিখে নাও। নইলে কাজটা চলবে আমার-তোমার সঙ্গে ঠিকই কিন্তু কথা চলবে না একটিও মিস জেনি।

মিস জেনি মাথা নেড়ে বলেছে, হামি বাংলা জানে থোড়া থোড়া।

শিবানী বলেছে, থোড়া থোড়া নয়, বল একটু একটু।

মিস জেনি পুনরাবৃত্তি করেছে ইংরেজী সুরে বাংলা শব্দ—এ-ক-টু এ-ক-টু।

শিবানী খুশি হয়ে বলেছে, ঠিক আছে। এই ভাবেই তোমায় আমি বাংলা শিখিয়ে ফেলব।

শিবানীর উপর-অফিসার অমল বোস এক একদিন এসে শুনে ফেলেছে মিস জেনির বাংলা শিক্ষা। সহানুভূতির চুকচুক শব্দ করে মিঃ বোস বলেছে, পুওর গার্ল। ভালো মানুষ পেয়ে তোমার উপর মিসেস সেন্ কি বাংলার হামলাই না চালাচ্ছেন।

মিস জেনি গর্বিতভাবে বলেছে, জানেন মিঃ বোস, হামি অনেক শিখে ফেলেছে।

শিবানী অমনি সংশোধন করে দিয়েছে—হামি নয় আমি। শিখে ফেলেছে নয়, শিখে ফেলেছি।

মিস জেনি হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলছে, হামি নয় আমি। শিখে ফেলেছে নয়, শিখে ফেলেছি—

মিঃ বোস বলেছে, ধন্যবাদ আপনাকে মিসেস সেন। কি অসীম ধৈর্য্য আপনার। কিন্তু কোন সার্থক কাজের পেছনে ধৈর্যটা ঢাললে আমি অবশ্যই প্রশংসা করতাম। এ তো শুধু সময় আর শ্রম নষ্ট করছেন।

শিবানী জবাব দিয়েছিল, যদি আজ এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হয় তবে ঈশ্বরের কাছে মনুষ্যজীবন ধারণ করে কি কাজ আমি করেছি বা করতে চেষ্টা করেছি জিজ্ঞাসিত হলে, এই একটি কাজই আমি বলতে পারব।

মিঃ বোস শিবানীর কথাগুলি হাসির না গম্ভীর হবার বুঝে উঠতে না পেরে মুখটা দুই অবস্থার মাঝামাঝি এক রকম করে সিগারেট টেনেছে। তারপর হাতের সিগারেটের ছাই ছাইদানে ঝাড়তে ঝাড়তে বলেছে, আপনি বড্ড সেন্টিমেন্টাল মিসেস সেন—আই মিন ভাবপ্রবণ। সেন্টিমেন্ট কথাটার বাংলা করলে কিছুটা শিবানী খুশি করবার জন্য, কিছুটা বাংলাটা যে সে জানে তা বোঝাতে।

মিস জেনি যতই ভাবুক বাংলা শিখে গেছে কিন্তু ওদের দুজনার কথার একবর্ণও সে ধরতে পারে নি। টাইপ মেশিনের কি-বোর্ডের উপর নৃত্যের ভঙ্গিতে দ্রুত হাত চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে কেবল চোখ তুলে তাকিয়েছে।

হাতের লাল-নীল পেন্সিলটা নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে শিবানী বলেছে, মিঃ বোস, অনেক মূল্যবান বস্তু আমরা হেলাফেলায় হারিয়েছি। ভাষাটাকে আর হেলাফেলা করবেন না। কোন্ রন্ধ্র দিয়ে যে সর্বনাশের শনি প্রবেশ করে কেউ বলতে পারে না। কুলি, বয়, বাবুর্চি, বেয়ারা, আয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই তো করেছেন, করছেনও কিন্তু ওরাই না হিন্দীকে রাজাসনে বসাচ্ছে আজ।

হোয়াট্? ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছে বোস। শিবানীর সঙ্গে বাংলা বলার ইচ্ছে থাকলেও বিস্ময়ে ইংরেজীই বেরিয়ে গেছে মিঃ বোসের মুখ দিয়ে।

শিবানী বলেছে, স্টেশনে কুলি-মজুর, অফিস-আদালতে দারোয়ান-বেয়ারা; হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, রান্নাঘরে বয়-বাবুর্চি, শোবার ঘরে শিশুকোলে আয়া— মুখে মুখে সমস্ত ভারতময় যদি হিন্দী না ছড়াত তবে আজও হিন্দীকে তার ঘরেই বসে থাকতে হতো। সিংহাসনে বসবার জন্য তাকে পাঁয়তারা কষতে হতো না। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যা পারেন নি ওরা তা পেরেছে—বুঝছেন তো ছাপাখানার চাইতে মুখের জোর বেশি? তাই মাতৃভাষাটাকে মুখ থেকে বিদায় দেবেন না মিঃ বোস। বরং অন্য মুখে তা দিতে চেষ্টা করুন। অন্তত এখনও আদা-নুণ খেয়ে লাগলে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে—

—আপনি বড় সেন্টিমেন্টাল—আবার বলল মিঃ বোস।

শিবানী বলল, সেন্টিমেন্টাল নয়, বলুন জাত্যাভিমানী।

মিস জেনি এক তাড়া চিঠি হাতে বড়সাহেবের ঘর থেকে তেমনি হাইহিলের খট্ খট্ শব্দ তুলে ফিরে এসে তার টাইপরাইটার মেশিনের সামনে গুছিয়ে বসল। মেশিনে কাগজ ঢুকিয়ে চিঠির ওপর চোখ রেখে কি-বোর্ডের ওপর আঙুল চালাতে চালাতে বলল, একেবারে তৈরি যাবার জোন্য?

শিবানী কাগজপত্র গুছিয়ে কাজ শেষ করে বসেছিল। আজ তার কাজে মন লাগছিল না। ইন্দ্রনাথ কালকে ওকে একটা অপূর্ব রাত উপহার দিয়েছে। সেই রাতটার চারপাশেই শিবানীর মনটা ঘুরছিল কেবল। বার বার ভুল করে কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বসেছিল সে। বেয়ারাকে দু'কাপ গরম কফি আনতে বলেছে। ওর জন্য আর মিস জেনির জন্য। বেয়ারা এখনও কফি নিয়ে আসে নি। এলে কফি খেয়েই উঠে পড়বে শিবানী। ইন্দ্রনাথ যে ওকে কালই শুধু একটা অপূর্ব রাত উপহার দিয়েছে তাই নয়, আজ বলে গিয়েছে সে পাঁচটার ভেতর বাড়ি চলে আসবে। তারও আগে গিয়ে ইন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে দেবে এই শিবানীর ইচ্ছে। কিন্তু তারও বহু সময় আছে। সবে তিনটেমাত্র। বেয়ারা গরম ধোঁয়াওঠা কফির পেয়ালা দু'জনের কাছে নামিয়ে রেখে গেল। শিবানী পেয়ালা সামনে টেনে নিল। মিস জেনি টাইপ থামিয়ে কফির পেয়ালা হাতের তালুর ওপর তুলে নিয়ে শিবানীকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে পেয়ালায় চুমুক দিল। জিজ্ঞাসা করল, তুমি বাড়ি যাচ্ছো?

হ্যাঁ।

তোমার বাড়িতে কে আছেন?

বলত কে কে আছেন?

তা বোলতে পারব না। তুমি বোলনি ত'।

স্বামী আছেন— দুষ্টু চোখে তাকাল শিবানী মিস জেনির দিকে।

মাই গড়— জেনির হাতের কফির পেয়ালা জেনির শরীরের চমকে ঠক ঠক শব্দ তুলল।

হেসে উঠল শিবানী। শিবানী জেনির কাছে বলেছে, সে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকে। কিন্তু অতিকষ্টে রয়েছে। তার ওখানে থাকতে একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু উপায়ও নেই না থেকে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তার কাছে না থাকলে নিন্দে হবে। শিবানী মিসেস যখন, তখন ওর একটা স্বামী অবশ্যই আছে। কিন্তু শিবানী না বলা পর্যন্ত জেনি তা জিজ্ঞাসা করতে পারে না। জিজ্ঞাসা করাটা ওদের ভদ্রতাবিরুদ্ধ। বিধবাও হতে পারে কিন্তু জেনি জানে বাঙালী বিধবারা এত রঙিন পোষাক পরে না।

কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে জেনি বলল, মিসেস সেন, তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করেছ এতোদিন? আমি বুঝতাম তুমি খুব বড়লোক আছ। তোমার গয়নাগুলি সব সাচ্চা পথর আছে।

শিবানী হাসি থামিয়ে বলল, না মিস জেনি, আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস করি নি। সত্য কথাগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্যভাবে বলেছি—ঘরের দরজা খোলার শব্দ হতে সে দিকে তাকিয়ে শিবানী আশ্চর্যকণ্ঠে বলে উঠল, আরে ললিতা?

মিস জেনি কাজে মন দিল।

ললিতা ওর হাতের ব্যাগ শিবানীর টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, হ্যাঁ আমি ললিতা।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দাঁড়াও তোমার জন্য কফি আনতে বলে দিই। বেল বাজাল শিবানী। বেয়ারা এলে তাকে কফি আনতে আদেশ করল। তারপর—ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ অফিসে?

তোমাকে ধরতে।

মার লাগাবে বলে?

না। কিন্তু তাও অফিস থেকে তো উঠছিলে দেখতে পাচ্ছি। আর একটু হলে বোধ হয় তাও পেতাম না তোমাকে?

তা পেতে না সত্যি। কিন্তু মুখ অমন থমথমে কেন? রাগ?

রাগ? শুধু রাগ নয়। তোমার সঙ্গে কথাও বন্ধ।

আচ্ছা। হাসল শিবানী। বলল, সে কথাই বলতে এসেছ অফিসে?

নইলে তুমি জানবে কি করে যে আমি রাগ করেছি। তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছি। দেখা তো হবে তোমার সঙ্গে ছ'মাস বাদ। অতদিনে রাগের কথা ভুলে যাব না। তাই মেজাজ গরম থাকতে থাকতে— দেখাতে এলাম।

জোরে হেসে উঠল শিবানী! বলল, 'না না, ছ'মাস বাদে দেখা হবে, আমি কি বোকা না কি? আমার জন্মদিনের শাড়ি রয়েছে না তোমার কাছে—সেই তোমার সাত বাজার ঘোরা—কারুর দাম বলতে না পারা শাড়ি। ওটা দেখবার জন্য আমার ভেতরটা কি আকুলি-ব্যাকুলি খাচ্ছে তা মেয়ে হয়ে তোমার বোঝা উচিত।

মিস জেনি টাইপ করতে করতে লক্ষ্য করে ললিতাকে দেখছিল। শিবানী পরিচয় দিল, আমার সিষ্টার-ইন-ল ললিতা—মিস জেনি।

সুস্মিত মুখে মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে পরিচয় গ্রহণ করল মিস জেনি। নামটা দু'ঠোঁট চোখা করে আবৃত্তি করল, লোলিটা। তারপর ললিতার দিকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিপাত করতে করতে বলল, তোমার সিষ্টার-ইন ল' খুব সুন্দর—

বিস্ময়ে খুশিতে দু'চোখ বড় হয়ে উঠল ললিতার— কি সুন্দর বাংলা বলছে।

এতক্ষণ শিবানীর দুই চোখের কোলে আবেশ খেলেছিল। একটা সুন্দর রাতের স্বপ্নাবেশে ঢাকা ছিল তার দু'চোখের তারা।

ললিতা মিস জেনির বাংলা বলার প্রশংসা করে উঠতেই সে স্বপ্নছায়া সরে গিয়ে জ্বলজ্বল করে উঠল চোখ। যেন ছায়াঢাকা তালপুকুরে রোদ পড়ল। জাত-অহঙ্কারে দুই ভুরু বাঁকিয়ে শিবানী বলল, এই একটি কাজ আমি করেছি। মিস জেনিকে বাংলা বলতে শিখিয়েছি। এখনও ইংরেজী সুর আর উচ্চারণের ঢংটা রয়ে গেছে— এরপর তাও থাকবে না। কিন্তু মিস্ জেনি এখনই এতো প্রশংসা শুনছে যে, উৎসাহ তো ওর বেড়ে গেছেই, ওর বন্ধু-বান্ধবদেরও লোভ এসে গেছে বাংলা শিখে প্রশংসা পাওয়ার জন্য—ইস্, বাংলা বলতে পারার অহঙ্কারের নেশাটা যদি একবার ওদের মধ্যে ধরিয়ে দিতে পারি!

কফি নিয়ে এলো বেয়ারা।

শিবানী বলল, এত দেরী হলো কেন?

বেয়ারা বলল, জী হুজুর!

শিবানী বলল, আচ্ছা যাও।

'যাও' শব্দটা বেয়ারা বুঝল। চলে গেল সে।

ললিতা বলল, ওর জবাবটার মানে কি হল?

কিছুই হলো না। নতুন এসেছে, আমার কথা একটাও বুঝতে পারে নি, জবাব দেবে কি।

তবে বাংলা বললে কেন?

ও আমার ভাষা বোঝে না বলে আমি যদি আগেই ওর ভাষা বলতে আরম্ভ করি, তবে ও আমার ভাষা শিখবে কোন গরজে? তা যাক্— অনেক কথা তো বলা হয়ে গেল। এখন নিশ্চয়ই কথা না বলার প্রতিজ্ঞা তুলে ফেলা যায়। অফিসে যখন এসেছ নিশ্চয়ই কোন দরকারী কথা আছে। ঘড়ি দেখল একবার শিবানী।

সেটা লক্ষ্য করল ললিতা। ললিতা বলল, না, কোন প্রয়োজনের তাড়ায় তোমার অফিসে আসি নি। তোমাকে পাওয়ার জন্য এসেছি।

কেন বাড়িতে?

বাড়িতে তোমাকে পাওয়া যায়?

যায় না?

না। কফিতে চুমুক দিল ললিতা।

শিবানী বলল, না?

আজ্ঞে না। কালকে তোমার ওখানে আমি গিয়েছিলাম।

পাও নি আমাকে?

বা, পেয়েছি কি না পেয়েছি তুমি জান না?

কি আশ্চর্য! বাড়ি ছিলে না তাই পাই নি।

বাড়িতে না থাকলে না পাওয়াটা নিশ্চয়ই আশ্চর্য না কিন্তু আমি বাড়িতে ছিলাম—

বাড়ি ছিলে? নাঃ—কখনো নয়। কোথায় ছিলে? আমি তো তোমাকে কোথাও দেখলাম না।

কোথায় কোথায় খুঁজেছিলে?

খুঁজতে যাবো কেন—তুমি কি লুকিয়ে থাকবে?

তবে পেলে যে না বুঝলে কি করে?

তোমার ঘরে তুমি ছিলে?

আরো ঘর আছে বাড়িতে।

কিছুটা আবদারের ভঙ্গিতে ললিতা বলল, না বল না—কখনো তুমি বাড়ি ছিলে না। মিথ্যে কথা বলছ।

ছিলাম।

ললিতার চোখে ভয় থর থর করতে লাগল। কোথায় ছিল শিবানী? তার সেই পালিয়ে আসার চলাটা শিবানীদি' দেখেছে! ভীরু কণ্ঠে বলল, তোমার ঘরে অবশ্যই ছিলে না?

বললাম যে আমার বাড়িতে আরো ঘর আছে।

অনেকটা নিরুদ্বেগ বোধ করল ললিতা। অন্য কোথাও থাকলে শিবানীদি' নিশ্চয়ই ওর চলে আসাটা দেখে নি—চলে আসবার কারণটাও জানে না। বিস্মিতভাবে বলল, তুমি আমাকে দেখেছিলে?

দেখি নি। চটির শব্দ শুনেছি। ডেকেছ তা শুনেছি—

তুমি এলে না কেন!

লজ্জায়।

লজ্জায়!

হ্যাঁ। হেসে উঠল শিবানী। বলল, হায় ভগবান! এমনই অবস্থা হয়েছে আমার না যে, স্বামীর ঘরে থাকলে লজ্জায় মুখ বের করতে পারি নে। পাছে কেউ দেখে ফেলে।

তুমি ও ঘরে ছিলে? আর আমি ফিরে এলাম তোমায় না পেয়ে। কি কাণ্ড।

ঐ দেখ, তুমিও ঐ ঘরে আমি রয়েছি ভাবতেও পার না বলেই ওখানে খোঁজ কর নি— তোমার সঙ্গে তো কালকের ব্যাপারের মিটমাট যা হোক একটা হয়ে গেল। কিন্তু দিদিটাকে যে কি বলি! বলেছিলাম একেবারে তৈরি হয়ে থেকো। তোমায় নিয়ে ছবি দেখতে যাবো আজ।

যেতে পারছ না?

না। বলে উঠে দাঁড়াল শিবানী। বলল, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

॥ ৯ ॥

যদিও অফিসবাড়িগুলির ভিড় ভাঙতে আরম্ভ করেছিল। কিছু কিছু লোকজন ফাইলপত্র হাতে বেরিয়ে এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়াচ্ছিল, ট্যাক্সি ধরছিল, তবু পাঁচটা বাজতে বিলম্ব ছিল বলে শিবানীদের ট্যাক্সি পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

ট্যাক্সিওলাকে বালিগঞ্জ যেতে বলে দ্রুত করে বসে ফের ঘড়ি দেখল শিবানী।

ললিতা লক্ষ্য করল তা।

ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে ঘাড় কপাল মুছল শিবানী। আজ ইন্দ্রনাথের আগে বাড়ি ফিরবে এই তার ইচ্ছে।...একটা ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামলে বেশ হয়।

ললিতা গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে, না তুমিও একটু নামবে?

কোলের ব্যাগের ওপর দৃষ্টি ছিল শিবানীর। হাতের রুমাল ব্যাগে ভরতে ভরতে বললো, কি বললে? বোঝা গেল সে কিছুটা অনামনস্ক ছিল। ললিতা কিছু বলছে, কিন্তু কি বলেছে বুঝতে পারে নি।

ললিতা বলল, জিজ্ঞাসা করছিলাম আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবে না তুমিও একটু নামবে?

জবাব দিতে যেটুকু সময় নিল শিবানী তাতেই অভিমানাহত কণ্ঠে ললিতা বললো, তোমাকে নিয়ে যাবো বলে এসেছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার কোথাও যাবার বিশেষ তাড়া রয়েছে।

কোথাও যাবার বিশেষ তাড়া—বলে থেমে হাসল শিবানী।

কোথাও যাচ্ছ তুমি?

না তো।

বাড়ি যাচ্ছ?

বাড়ি যাচ্ছি।

বাড়ি যাচ্ছ! তবে অত ঘন ঘন ঘড়ি দেখছ কেন? বলে এবার হাসল ললিতাও। বললো, ভয় নেই কোথায় যাচ্ছ জানতে চাইব না, সঙ্গে যেতেও না—

ঘরে ফেরার জন্য ঘন ঘন ঘড়ি দেখা যায় না?

তা যায়—

তবে? আমার পক্ষে তেমন কারণ কিছু থাকতে পারে না!

ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ করল ললিতা।

শিবানী বললো, তোমার নিশ্চয় ধারণা আমি এমন কোথাও যাচ্ছি যা তোমার পক্ষে জিজ্ঞাসা করা চলে না, আমার পক্ষেও বলা চলে না।

অপ্রস্তুত ভাবটাকে উল্টেপাল্টে ফেলে দেবার জন্যই যেন ঘাড় মাথা এদিক-ওদিক নাড়তে নাড়তে ললিতা হেসে বললো, নিশ্চয় ধারণা। অন্ধকার বাড়ি না হয় নাই হলো, হলো না হয় নিওন আলোর ঝলমলে বাড়ি—কে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা একা একা মরতে বসে থাকবে। তেমন ঘড়ির কাঁটা মেলানো তাড়া যদি তোমার না থাকে তবে বাপু একটিবার নামো। সুজাতা লক্ষ্মীছাড়ির কাছে নইলে মুখ আমার একেবারেই যাবে। কালকে তোমাকে আনতে পারি নি। আজ ভেবেছিলাম নিশ্চয় পারব। তা আজও যদি তোমায় নিয়ে যেতে না পারি তবে সুজাতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে, তুমি একবার বাড়ি, একবার অফিস দৌড়োদৌড়ি করে মরলে কি হবে—তোমাকে শিবানীদি ভালোই বাসেন না। এ কথা আমার পক্ষে কানে শোনাও যন্ত্রণাদায়ক।

হেসে উঠল শিবানী। বললো, চলো। তাড়া আমার একটু রয়েছে বটে— কিন্তু তোমাদের তো আমি বিশ্বাস করাতে পারবো না যে, সেরেস্তার কাজ সেরে ক্লান্ত স্বামী ঘরে প্রত্যাবর্তন করবেন। আমাকে এক্ষুণি গিয়ে ক্ষুধার্ত স্বামীর জন্য আহার্য প্রস্তুত করতে হবে। হাতমুখ প্রক্ষালনের গাড়ু গামছা জল ঠিক করে রাখতে হবে। তামাকু সেজে দু'ঠোঁট চোখা করে টিকের ফুঁ দিতে দিতে বিশ্রামরত ব্রাহ্মণের হাতে হুঁকো তুলে দিয়ে পাখা হাতে ব্যজন করতে হবে! কাজের প্রয়োজন নেই। ভাবের প্রয়োজন? সে তো আরো অবিশ্বাস্য—

ললিতা শিবানীর দিকে একলক্ষ্যে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা, তুমি সত্যি বাড়ি যাচ্ছিলে? কালকেও বললে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন তুমি বাড়ি ছিলে। তবে চলো, আমাকে তোমার পৌঁছে দিতে হবে না; নামাতেও হবে না। আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি বাড়ি। এই ড্রাইভার—

গাড়িকে জর্জকোর্ট রোডের দিকে ঘোরাতে বলতে যাচ্ছিল ললিতা। ধমক দিল শিবানী। ড্রাইভারকে যে পথে যাচ্ছিল সে পথে যেতে নির্দেশ দিয়ে ললিতার দিকে দু'চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললো, করুণা প্রকাশ হয়ে গেল না ললিতা?

করুণা প্রকাশ? কার প্রতি—তোমার? ছিঃ ছিঃ, এ ধৃষ্টতা আমার হবে না। সজোরে প্রতিবাদ করল ললিতা।

আমার প্রতি না হোক আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কটার প্রতি?

তা বলতে পারো; তবে তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বলে নয়, এই সম্পর্কটার প্রতিই আমার করুণা। এ সম্পর্কটা না জানে দিতে, না জানে নিতে। কিছুই মেলে না এ সম্পর্কটার কাছে শেষ পর্যন্ত এক ভাত-কাপড় ছাড়া—

শিবানী বললো, তা এই বাজারে নিরুদ্বেগে ভাত-কাপড় মেলা তাই বা কম কি!

কম! কে বলে কম? সম্পর্কটা যতই খাবি খাক বেঁচে যে থাকে তা তো শেষ পর্যন্ত ঐ পেটে ভাত-জলটুকু পড়ে বলেই।

শিবানীর হাসি দেখে মুখ আরো গম্ভীর করে ললিতা বললো, হাসির কথা একটুও বলছি নে শিবানীদি। আগের দিনের মেয়েরা আমাদের চাইতে অনেক বেশি প্র্যাকটিকাল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য দিয়ে মাথা তো ঠাসা থাকত না। বাস্তব বুদ্ধি ঢোকবার সহজ রাস্তা সহজেই মিলে যেত। তাঁরা মান-অভিমান-রাগের পালায় স্বামীদের কাছে এক একখানা অলঙ্কার আদায় করে ছাড়তেন। সবাই ভাবে এটা তাঁদের অলঙ্কার-প্রীতি ছিল। কিন্তু তা একেবারেই নয়। ওঁরা বুঝতেন এটুকুও বাক্সে না তুললে পাওয়ার ঘর একেবারেই শূন্য থেকে যাবে। বুঝতেন সূক্ষ্মবুদ্ধি দিয়ে সূক্ষ্ম রাস্তায় ঘোরাফেরার চাইতে মোটা বুদ্ধিতে মোটা রাস্তায় চলা অনেক বেশি বাঁচার পথ। ঠাকুমা-দিদিমাদের পথটাই আমারও পছন্দ। এ মাসে সাত জোড়া শাড়ি কিনেছি। দু'সেট জড়োয়া গয়না আদায় করেছি। আর খাওয়ার? বাড়ির ডাল ভাত ঝোল খাওয়া নিয়ে নাক কোঁচকাই। বড় বড় রেঁস্তোরায় যাই। ক্র্যাব চপ, মুরগীর গ্রেভি, চিকেনফ্রাই, ফ্রাইড রাইস খেয়ে বাড়ি ফিরে ভরপেটে নাক ডেকে ঘুম লাগাই। কর্তা আজ ফোন করেছিলেন দুপুরে। বললেন, রাতে আসছেন। শুনেই দরাজ গলায় অর্ডার দিলাম, চারটা মুরগীর রোস্ট, দু'ডজন ক্র্যাবচপ আসবার সময় ওয়ালডফ থেকে নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। ও পক্ষেরও সহজ হলো, আমারও ভগ্নমন হবার শঙ্কা রইল না। কিন্তু যদি দক্ষিণ হাওয়া সঙ্গে করে আনবার অর্ডার দিতাম—তবেই হয়েছিল! পেটও ভরত না, মনও না।

আরে—চমকে গেল যেন শিবানী। কিছুক্ষণ আগেই না ও আষাঢ়ের আকাশের কাছে কিছু ঝির ঝির বৃষ্টি চেয়েছিল রাতটা রমণীয় করে তোলার জন্য।

আরে থামো থামো। সামনে ড্রাইভারের আসনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ললিতা। কোথায়—চলে এসেছ তুমি এঁ্যা। গাড়ি ঘোরাও। এ রাস্তাই নয়।

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ড্রাইভার বললো, আপনারা বলে দেবেন তবে তো আমি ঠিক রাস্তায় যাবো।

এই বলে দিচ্ছি—

কিছু ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে বাড়ির দরজায় গাড়ি থামল। ললিতা দরজা খুলে নেমে পড়ে শিবানীকে নামালো। ছোট একটুকরো সবুজ ঘাসের জমি বাড়িটার সামনে। জমিটুকু পার হয়েই বসবার ঘর। ওরা দু'জন ঢুকছে—দু'টি মেয়ে গীটার হাতে প্রবেশ করল। ললিতা বলল, সুজাতারা নাটক করছে। তার রিহার্সেল হয় আমাদের বাড়ি। তারই বাদকদল ওরা।

তাই নাকি। কি নাটক করছে ওরা?

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' করছে ওরা।

আচ্ছা! এ নাটকটা আমার এতো ভালো লাগে! চলো ওদের মহড়া দেওয়া দেখে আসা যাক।

বসবার ঘরের পর্দা ঠেলে শিবানীকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো ললিতা। বললো, বোস, আগে এখানে বসে একটু চা খেয়ে নি। তারপর ওপরে নিয়ে যাবো ওদের রিহার্সেল দেখতে। শিবানীকে বসিয়ে ললিতা ভেতরে চলে গেল শিবানীর আসবার সংবাদটা দিতে আর চায়ের ফরমাস করতে। ফিরে এসে বসে বললো, তুমি কোনোদিন নাটক করেছ শিবানীদি?

করেছি!

কি নাটক?

বাঁশরী।

বাঁশরী? বলেই গরগর করে মুখস্থ বলে চললো ললিতা, 'শ্রীমতী বাঁশরী সরকার বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাশ করা মেয়ে। রূপসী না হলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য—' আরে কান্ড! তোমার সঙ্গে আকৃতি-প্রকৃতিতে মিলিয়ে নাটক নির্বাচন করে তার নায়িকা করেছিল তোমায় কে গো? যে করেছিল সে নিশ্চয় তোমাকে ভালোবাসত।

ভীষণ শব্দ করে হেসে উঠল শিবানী।

ললিতা মাথা নেড়ে বললো, যা বলেছি। তোমার ঐ হাসিই বলে দিচ্ছে আমি ঠিক বলেছি। কে গো সে? তুমি কি! যে তোমাকে চিনে ভালোবেসেছিল তাকে বরণ করলে না কেন?

ঈষৎ জলে চোখের কোণটা ভিজে উঠেছিল। পাশে রাখা ব্যাগটা টেনে কোলে তুলে নিয়ে রুমাল বের করে শিবানী চোখের কোণ মুছলো।

ললিতা বললো, এই হাসির চোখের জলের সঙ্গে কিছুটা কান্নার জলও মিশে যায় নি তো শিবানীদি?

আরো বারকয়েক চোখের কোণ দু'টো রগড়ে রগড়ে মুছলো শিবানী। তারপর সোফায় পিঠ রেখে কিছুটা আয়েস করে বসে বললো, বোধহয় গেল।

তবে তো তুমি ধনী! তোমাকে করুণা করবে কে।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোনদিন অভিনয় করো নি ললিতা? আমার মনে হয় তোমার ভেতর অভিনয় ক্ষমতাটা বেশ রয়েছে।

কপালে টোকা মেরে ললিতা বললো, এই কপাল। রূপ কিছু ছিল, এই মাত্র তোমার মিস জেনির মুখে প্রশংসা শুনেও এলাম। তুমি বলছ, মনে হচ্ছে তোমার আমার ভেতর অভিনয় ক্ষমতা আছে, কিন্তু সে খ্যাতি কি মিলবে। দাও না তুমি সুযোগ করে। একটু বিখ্যাত হই। তুমি ছবি প্রডিউস করো, আমি হই নায়িকা। টাকা মারা যাবে না। আমি তোমাকে অভিনয়ের প্রশংসাপত্র দেখাতে পারি। কলেজে 'গান্ধারীর আবেদন' হয়েছিল। তাতে গান্ধারীর পাঠ করে হৈ হৈ ফেলে দিয়েছিলাম, চাও তো প্রশংসা-পত্র দেখাতে পারি। কলেজ ম্যাগাজিনে দু'কলম লিখেছিলেন আমাদের সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদিকা। একটা ছবি প্রডিউস করো না শিবানীদি, জীবনের একটা সাধও অন্তত মেটাই—

শিবানী সোজা হয়ে বসে বললো, 'গান্ধারীর আবেদন' তোমার মনে আছে ললিতা? শোনাতে পারো?

পারি। বলো আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবে?

আগে পরীক্ষায় পাশ করো।

আচ্ছা। কোন জায়গাটা শুনবে?

এর কি আর জায়গা বাছাই করার উপায় আছে! যেখান থেকে শোনাবে তাই অপূর্ব অদ্ভুত লাগবে।

তোমার দেরি হয়ে যাবে না তো?

তুমি আরম্ভ করো না—শিবানী আবৃত্তি শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসল। এক নজরে ঘড়ি অবশ্যি দেখে নিল। ভেবেছিল ইন্দ্রনাথের আগে যাবে। তা যখন হলো না, এখন একটু এদিক-ওদিক সময়ের জন্য কিছু আসে যায় না। শিবানীর ভালো লাগছিল। 'গান্ধারীর আবেদন' যদি কেউ ভালো আবৃত্তি করতে পারে তবে কি তা না শুনে পারা যায়!

ললিতা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা একটু মুছে নিয়ে বললো, আচ্ছা, এখান থেকে শোনাই ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দু'টো পাঠই এক সঙ্গে করে যাবো দু'রকম গলা করে।

গান্ধারী। এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি—
হে কৌরব? কুরুকুলপিতৃ-পিতামহ
স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ,
নরনাথ। ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে—
কৌরবকল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম তারে করিবে শাসন
ধর্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে—আমি পিতা—

গান্ধারী। মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তাই সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা সেই মতো করি
বহুবর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি

দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে—লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ? তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ!

ধৃতরাষ্ট্র। কি রাখিব তারে ত্যাগ করি?

গান্ধারী। ধর্ম তব।

ধৃতরাষ্ট্র। কি দিবে তোমারে ধর্ম?

গান্ধারী। দুঃখ নব নব।
পুত্রমুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিবে কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া?...
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইও না; ন্যায়ধর্মে করো না বিমুখ—
ত্যাগ করো পাপী দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রিয়ে, সংহর, সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর,
ব্যর্থব্যথা। পাপী পুত্র ত্যজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি—

শিবানী আবিষ্ট হয়ে শুনছিল। ললিতার কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন ওর বুকের রক্তে ঢেউ তুলছিল। এবার ললিতার স্বর সুর পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠে— লোমকূপের তলা দিয়ে যেন শিরশির করে রক্তস্রোত বয়ে চলল শিবানীর—

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো। বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-'পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মতো কাল যবে
জাগে তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত-জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ তার পথ-তলে।
ছিন্নসিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্তশতদলে

অঞ্জলি রচিয়া থাক জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি. কাঁদিবে ধরণী.
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী হায়-রে অনাথা,
হায় হায় বীর-বধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস লুটি অবনত-শিরে
মুদিয়া নয়ন। তারপরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম. নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি ঃ নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্তি, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নিবৃত্তি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

ললিতা থামল। আঁচল দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে নিল। জিজ্ঞাসা করল, পাশ? আমি কিন্তু অনেক বাদ দিয়ে দিয়ে বলেছি। পুরোটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগত। মনেও নেই সব।

শিবানী কথা বলল না। ওর মনে হচ্ছিল ঘরের মধ্যে যেন তখনও এই কথাগুলি আবর্তিত হচ্ছিল।

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি 'পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখ দিন —

ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন ললিতার মা বৌদিও। ললিতার আবৃত্তি শেষ হয়ে যাবার পর তাঁরাও ঘরে ঢুকে এসে বসতে পারছিলেন না। ঘরে যেন এতটুকু স্থান নেই প্রবেশ করবার। সুরে-শব্দে-ধ্বনিতে অর্থে ঘরটা ঠাসা।

ললিতা ডাকলে তবে ওঁরা এসে বসলেন।

মা স্মিতমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। মঞ্জুলা অভিযোগ জানালো তার অত কষ্টের তৈরি স্যালাড নষ্ট হলো বলে। শিবানী মার কুশল প্রশ্নের উত্তর দিল। মঞ্জুলার অভিযোগের উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করল, না আসতে পারার জন্য। একথা সেকথায় একটুক্ষণ বসে মা-বৌদি উঠে গেলেন চা-খাবার নিয়ে আসবার জন্য; ওঁরা চলে গেলে ললিতা বললো, তোমার তাড়া ছিল। জোর করে টেনে এনে দেরি করে দিলাম অনেক। যদিও দেরি করে দেওয়ার দোষটা আমার নয়। তুমি কবিতা শুনতে না চাইলে এত দেরি হতো না। আমি বলি কি, চা খাবার পর আমরা চলো পালাই। আজ আর সুজাতাদের রিহার্সেল শুনতে যাবার দরকার নেই। তবে আরো দেরি হয়ে যাবে। রিহার্সেল তো রোজই হচ্ছে। আর একদিন বেশ সময় হাতে নিয়ে গিয়ে বসব ওদের মাঝে— কি বল?

শিবানী আপত্তি জানিয়ে বললো, বলো কি, আমাদের নায়িকাকে না দেখেই যাবো কি!

নায়িকা! হঠাৎ যেন শিবানীর মুখের নায়িকা সম্ভাষণটা ভীষণভাবে আঘাত করলো ললিতার কানে। সে বুঝতে পারলো সুজাতাকে শিবানী দেখেছে বলেই না জেনেও ধরে নিয়েছে সে-ই নায়িকা হবে। কিন্তু কালকে খাবার টেবিলে সুজাতার যৌবনস্নাত ইতালিয়ান রূপটার দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ যেমন ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ে যাওয়ায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল; আজও শিবানী সুজাতাকে নায়িকা বলামাত্র ঠিক কালকের মতো ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ে গেল বলে আবারও স্তম্ভিত হলো সে। মনের এই অসংগত ক্রিয়াটার উৎপত্তিস্থল কোথায়, দিশে করে উঠতে পারলো না ললিতা। হয়ত ওর রূপটার প্রতি ইন্দ্রনাথের যে লোভটা আছে তারই প্রতিফলনে সুজাতার দিকে তাকিয়ে ওর মনে এই কাণ্ডটা ঘটছে। সুজাতা ওর বোন—ওরই চেহারার প্রতিচ্ছায়া—

তাই হবে।

হ্যাঁ তাই। শান্তিবোধ করতে লাগল ললিতা।

মনের এই সংকেতটা দৈবঘটিত কিছু ইশারা কি না—ভীত করে তুলেছিল ওকে। মনস্তত্ত্বের সূত্র হাতে পেয়ে স্বস্তিবোধ করলো। বললো, তুমি শিবানীদি' লক্ষ্মীর পরীক্ষার কাহিনী ভুলে গেছ। সুজাতারাণী কল্যাণী সেজেছে। কিন্তু, রাণী এ নাটকের নায়িকা নয়। নায়িকা ক্ষীরোঝি।

নায়িকা রাণীকল্যাণীই। ক্ষীরোঝি মুখ্য চরিত্র। কিন্তু আমি সেদিক থেকে বলি নি। আজকে সুজাতার জন্যই আসা, তাই ওকে নায়িকা বলেছি।

ও, তা চলো। তোমার যদি দেরি সয় আমি তো তোমায় যতক্ষণ পাবো ততক্ষণই খুশি।

কিন্তু চা খাওয়া হয়ে গেলে শিবানী নিজেই মতটা পাল্টে ফেললো। বললো, তোমার কথাই ঠিক। আজ থাক। ওদের জমাট রিহার্সেল নষ্ট করে দেবো গিয়ে কিন্তু বসব না, থাকব না। তার চাইতে আর একদিন এসে বেশ জাঁকিয়ে বসা যাবে ওদের মধ্যে।

শিবানী ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে শুনতে পেলো দোতলার ঘরে জোর মহড়া চলছে। শোনা যাচ্ছে রাণীকল্যাণীর ডাক, ক্ষীরো, ক্ষীরো, ক্ষীরো!

আর ক্ষীরোর তীক্ষ্ণকণ্ঠের উত্তর— কেন ডাকাডাকি, নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দেব না কি?

যদিও সময়টা বেশ কেটেছে। অন্য যে কোনো দিন হলে সন্ধ্যারাতটা ললিতাদের বাড়িতেই কাটিয়ে দিত শিবানী, কিন্তু আজ বিলম্ব করবার মাত্রও ইচ্ছে ছিল না। দুরন্ত বাসনা ছিল ইন্দ্রনাথের আগে বাড়ি ফিরবে। মনটা গাঁটছড়া বাঁধা ছিল ওর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। কিন্তু হলো না। নিশ্চয়ই এতক্ষণে ইন্দ্রনাথ এসে গেছে। তা এসে গিয়ে থাকলেও খুব বেশিক্ষণ হবে না যে এসেছে। এই তো সবে সাড়ে ছটা। ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্রুতপায়ে লন বাগান অতিক্রম করে টপ টপ সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে এলো শিবানী। আশার সঙ্গে একটা নিরাশা অর্থাৎ সন্দেহের কাঁটাও ছিল শিবানীর মনে। কে জানে হয়ত দেখবে ইন্দ্রনাথ আসে নি এবং শেষ পর্যন্ত আসবেও না। কিন্তু বারান্দায় পা দিয়েই দেখতে পেলো ইন্দ্রনাথ নিয়ন উদ্ভাসিত বারান্দায় পায়চারি করছে। তার পরিধানে কালকের সেই দুধগরদের ঢিলে পাজামা আর পাঞ্জাবী। পায় ভেলভেটের চটি। হাতে পাইপ। সমস্ত বাবান্দার বাতাস ইন্দ্রনাথের শরীরের স্প্রে করা আতরের মৃদু সৌরভে আমোদিত। ওকে দেখেই স্মিতমুখে এগিয়ে এসে ওর হাত বাড়িয়ে দিলো ইন্দ্রনাথ—

শিবানীর মনে হলো বিশ্বে এটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠতম দেওয়া— হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

॥ ১০ ॥

আলো-ঝলমলে খোলা বারান্দায় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চাইতে বেশি এগোনো চলে না। শিবানীর হাতটা মুঠো করে ধরেই ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ। গলার স্বরটা নকল গাম্ভীর্যে ভারী করে তুলে বললো, ভীষণ দেরী—

একটা আড়ষ্ট ভাব কেমন যে দু'জনার মধ্যখানে থেকেই যাচ্ছিল। ইন্দ্রনাথের কাটা-কাটা কথার প্রশ্ন আর তার উত্তরে কাটা কথার জবাব দেওয়া এটাই এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, ভেতরটা যে এখন শিবানীর কলকণ্ঠে বলে উঠতে চাইছিল, জানো, আমার একটুও দেরী করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি ঠিক করেছিলাম কি জানো? ঠিক করেছিলাম তোমার আগে বাড়ি আসবই। কিন্তু ললিতার জন্য পারলাম না। গিয়ে একেবারে অফিসে হাজির। তারপর টেনে নিয়ে গেল বাড়িতে। গেল দেরী হয়ে। তুমি অনেকক্ষণ এসেছ? কিন্তু পারলো না বলতে। শুধু একটু হেসে বললো, সত্যি বড্ড দেরী হয়ে গেল।

শিবানীর ঘামে-ভেজা জামা-কাপড়ে বড্ড নোংরা লাগছিল নিজেকে। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, আমি আরো একটু সময় নেবো তোমার। স্নানটা সেরে এসে বসব।

তার সঙ্গে চলতে চলতে ইন্দ্রনাথ বললো, আমি কখন এসেছি জানো?

শিবানী তাকালো ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললো, ঠিক সাড়ে চারটায়।

আমার দু'ঘণ্টা আগে—

না, পাক্কা আড়াই ঘণ্টা আগে। তুমি এসেছ সাতটায়— দেখো ঘড়ি। হাতটা শিবানীর চোখের কাছে নিয়ে তুলে ধরল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী বললো, আমি সত্যি দুঃখিত।

আমি বসে বসে কি ভাবছিলাম জানো?

আবার তাকালো শিবানী ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললো, ভাবছিলাম স্ত্রীরা তো এমন কত অপেক্ষা করে স্বামীদের জন্য। কিন্তু স্বামীরা স্ত্রীদের জন্য অপেক্ষা করতে হলে এমন অধৈর্য হয়ে পড়ে কেন!

শুধু অধৈর্য নয় বলো, রাগ, ত্যক্ত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত—

আরে না না। সব সময় অতো কিছু হয় না। কিন্তু সব সময় অধৈর্য যে হয় সেটা ঠিক।

ওর ঘরের দরজার কাছে এসে গিয়েছিল শিবানী। ঘরের পর্দাটা ধরে দাঁড়িয়ে বললো, ভাবনার উত্তর পেলে?

এক রকম পেলাম।

কি রকম?

কিছুই না। সোজা অভ্যাস আর নিয়মের ব্যাপার।

এ ছাড়া আর কিছুই নয়?

দেখতে পাচ্ছি নে। পাইপের তামাক বোধ হয় নিভে গিয়েছিল। পাইপের মাথাটা ডান হাতে মুঠো করে ধরে বাঁ হাত দাড়িতে বুলোতে বুলোতে ইন্দ্রনাথ বললো, এই যদি নিয়ম হতো যে, স্বামীরা ভাত বেড়ে অফিস ফেরৎ স্ত্রীদের জন্য অপেক্ষা করবে, তবে নিশ্চয়ই স্বামীদের অপেক্ষারত না দেখলে স্ত্রীরা সইত না। নিয়মের সুবিধেটা আমরা বরাবর পেয়ে আসছি তাই না পেলেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে চায়।

হাতে ধরা পর্দা দুলে উঠল এমনি করে হেসে উঠল শিবানী। বললো, নিয়মের নিয়মটা আবার কি তা জানো?

কি?

নিয়মের নিয়ম হচ্ছে অনিয়মের সঙ্গে সে এক পা' একত্রে চলে না।

তাই! দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী বললো, কিন্তু নিয়মের ব্যাপার কথাটা যত তুচ্ছভাবে বললে, নিয়মের ব্যাপার জিনিষটা তত তুচ্ছ নয়। বিশ্বচরাচর যদি নিয়মের বাঁধনে বাঁধা না থাকত তবে— কেবল লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটত। জীবন সৃষ্টি হতো না। হলেও তিষ্ঠুতে পারত না। মানুষও যদি তার জীবনকে নিয়মের বাঁধনে বেঁধে না রাখে তবে কেবল লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে। কোনো সুষমা তো থাকেই না, তার ছায়ায় বাঁচাও চলে না। তাই নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধার সীমা নেই আমার। কালকে স্বামীর জন্য ভাত বেড়ে পাখা হাতে বসে থেকে প্রমাণ দেবো তার—

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে হাতের বেষ্টনে বেড়িয়ে ধরে শিবানীকে কাছে টেনে তক্ষুণি আবার ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ। যেন ধন্যবাদ দিল, নয় তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

শিবানী ঢুকে গেল তার ঘরে।

ইন্দ্রনাথ গিয়ে বসল বারান্দায় বেতের চেয়ারে। নিভে যাওয়া পাইপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল বেতের গোল টেবিলটার ওপর। সেই টেবিলের ওপরই রাখা ছিল সিগারেটের টিন। সেটা তুলে নিয়ে তার থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চাপলো। টিনটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো। পা দু'টো চটিশুদ্ধ সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে পা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সিগারেট খেতে লাগল। এইমাত্র শিবানী যা বললো, তার অর্থ অতি স্পষ্ট। সে বললো, কাল সে স্বামীর জন্য ভাত বেড়ে বসে থেকে প্রমাণ দেবে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা তার কত। মানে সে অফিসে যাবে না। শিবানীর অফিসে যাওয়া নিয়েই তো যত মানসিক যন্ত্রণা ইন্দ্রনাথের। তার তো খুশি হওয়া উচিত শিবানীর এই সংকল্পে।

খুশি সে হয়েছে। খুশির প্রকাশও সে করেছে শিবানীকে বুকে টেনে এনে। কিন্তু তবু যতটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠার তার কথা ছিল, ততটা যেন সে হতে পারলো না। ভেতরে ভেতরে আনন্দের টানের স্রোতটা নিরানন্দের দিকেই বইতে লাগলো। কাজ ছেড়ে দেবে এ কথা শিবানী বলে নি। সে কেবল ইঙ্গিত করে গেল কাজ ছাড়ার জন্য তৈরি সে। কিন্তু তার আগে সে বলে নিয়েছে, নিয়মের সব চাইতে বড় নিয়ম অনিয়মের সঙ্গে এক পা' একত্রে চলে না। সে নিয়মে চলবে তবেই না শিবানী নিয়ম মানবে।

হঠাৎ যেন নিজের উপর ত্যক্ত বোধ করলো ইন্দ্রনাথ। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো নীচের বাগানে। উঠে পায়চারি করতে লাগল দু'হাত পেছনে রেখে। তার চরিত্রে অনিয়মের বীজ ঢুকিয়ে দিলো কে? বেশ তো লাগছে শিবানীর সঙ্গ। কিন্তু এই ভালোলাগার স্বাদ ক'দিনেই জোলো হয়ে যায় কেন? তার চরিত্রে কি বিশেষ কোন দুষ্টবীজ পোঁতা আছে? তার কি মূল চরিত্রই এটা, না ইংরেজী প্রবাদে যে বলে, 'হ্যাবিট্ ইজ দি সেকেণ্ড নেচার' সেই অভ্যাসের গড়া দ্বিতীয় চরিত্র তার এটা?

ইন্দ্রনাথের অন্তরে সত্যসত্যই দু'দিন ধরে শুভেচ্ছা জেগেছে, সন্দেহ-যন্ত্রণা, রাগ-জ্বালা, রেশারেশি আর দ্বন্দ্ব-কলহ ছেড়ে স্নিগ্ধশান্ত সুন্দর জীবন বরণ করার।

আবদুলকে হুইস্কির বোতল আর সোডা গ্লাসের ট্রে হাতে তার ঘরের দিকে যেতে দেখে একবার যেন বাধা দিতে গিয়েও থেমে গেল ইন্দ্রনাথ। আবদুল চলে গেল। একটা বিরাট গাড়িকে হেডলাইটের জোরালো আলোয় বাগান আলো করে গেটে প্রবেশ করতে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত করলো ইন্দ্রনাথ। এ নিশ্চয়ই সেই মিঃ চোপরার গাড়ি। লোকটা ওদের তৈরি মালের হোলসেল অর্ডার পাবার জন্য একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগেছে।

গাড়িবারান্দায় ঢুকে গাড়ির হেডলাইটের আলো আস্তে আস্তে নিভে গেল। গাড়ির দরজা খোলা এবং বন্ধ হবারও শব্দ পাওয়া গেল। বেয়ারা কার্ড নিয়ে এসে ইন্দ্রনাথের হাতে দিল। হ্যাঁ ঠিক যা ভেবেছে—মিঃ চোপরা। একবার ভাবলে যাবে না। তারপরই আবদুলকে ডেকে ড্রেসিং গাউনটা নিয়ে আসতে বললো। আবদুল ড্রেসিং গাউন এনে পেছন থেকে গায়ে তুলে দিলো। ইন্দ্রনাথ সিগারেটের টিন আর লাইটার হাতে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

শিবানী স্নান প্রসাধন সেরে যখন এসে বারান্দায় বসলো তখন ইন্দ্রনাথ ওপরে আসে নি। শিবানী মনে মনে গাল দিল লোকটাকে, আসবার আর সময় পেল না বলে।

আবদুল দু'হাতে ধরে একটা প্যাকিং বাক্স তুলে নিয়ে এল ওপরে। শিবানী কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। সে জানে, এটা কিসের বাক্স। যে লোকটা এসেছে সে নিশ্চয়ই মদের বাক্স ভেট দিলো। এমনি ভেট অনেক আসে ইন্দ্রনাথের। যেমন অনেক দেয় তেমনি পায়ও অনেক ইন্দ্রনাথ।

শিবানী যদিও হাসলো না। সে তো আর ইন্দ্রনাথের কিছুক্ষণ আগের মনোভাব জানত না। হাসলেন বিধাতাপুরুষ। কিংবা হয় তো তিনি হাসতে পারলেন না। তাঁর হাতে ইন্দ্রনাথের মতো সিগারেট নেই যে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পায়চারি শুরু করবেন। কিন্তু ডাঁটিতে-ধরা পদ্মফুলটি নিশ্চয়ই আছে। হয় তো সেটা ইন্দ্রনাথেরই মতো নিজের ওপর ত্যক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন হাত থেকে, ইন্দ্রনাথের সিগারেট ছোঁড়ার মতো। তারপর মেঝের ওপর পায়চারি করতে করতে আর চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবছেন, ইচ্ছা তো আমিই জাগাই। কিন্তু মানুষের ভেতর শুভ-ইচ্ছা জাগিয়ে আবার আমি নিজেই সে ইচ্ছাকে নষ্ট করে দিই কেন? আমার চরিত্রের ভেতরেও কি কোন দুষ্টবীজ পোঁতা আছে!

কাচ্চি এসে গরম ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ রাখল শিবানীর সামনে। ইন্দ্রনাথ বা বিধাতাপুরুষের মানসিক দ্বন্দ্বের খবর শিবানী রাখে না। খুশিমনে চায়ের কাপ টেনে নিল সামনে। একবার ভেবেছিল খাবে না। অপেক্ষা করবে ইন্দ্রনাথের জন্য। কিন্তু সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। এটা ইন্দ্রনাথের চায়ের সময় নয়। চায়ে মন উঠবে না তার। রশি ধরতে হলে অনেক ঢিলে দিয়ে ধরলেই যে ছেঁড়বার ভয় কম থাকে, একথা শিবানী জানে। কাপ তুলে নিয়ে অল্প অল্প ঠোঁট ছোঁয়াতে লাগল শিবানী।

যদিও সন্ধ্যাটা আজ একেবারেই রমণীয় নয়। মেঘ-বাতাসশূন্য আকাশ। গাছের পাতাগুলো যেন নিশ্চল হয়ে আছে আঁকা ছবির পাতার মতো। এই যে বাথটাবের ঠাণ্ডা জলে শরীর ডুবিয়ে রেখে ঠাণ্ডা হয়ে এলো সে—এরই মধ্যে আবার তাপ বেরুচ্ছে শরীর থেকে। মাথার ওপর যে পাখাটা ঘুরছে তা থেকে যেন হাওয়া নয়, গরম বাষ্প বের হচ্ছে। কিন্তু তবু বাড়িটা আজ আশ্চর্য প্রাণচঞ্চল আর উৎফুল্ল। বাইরের হাওয়া নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই, ভেতরের হাওয়াটা আজ বড় সুন্দর! বড় প্রসন্ন। আর সেই প্রসন্নতাই যেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

আবদুল বাক্স রেখে ঠাণ্ডা অরেঞ্জ স্কোয়াশের গোটা তিনচার বোতল আর স্ট্র থালায় সাজিয়ে নীচে নেবে গেল।

কাচ্চি হাতের তালুতে ল্যাভেণ্ডারের তরল ক্রিম নিয়ে এসে বসল শিবানীর পায়ে ক্রিম মাখাতে। এটা শিবানীর বৈকালিক প্রসাধনের সব চাইতে আরামের অঙ্গ। কাচ্চিরও এটা গল্প করার, বয়-বেয়ারা বাবুর্চিদের সম্বন্ধে নালিশ জানাবার, আব্দার করবার সময়। শিবানী সহানুভূতি বোধ করে কাচ্চির প্রতি। বেচারার কথা বলার কেউ নেই বাড়িটাতে। কাজের লোকগুলি সব হিন্দীভাষী। ঝগড়াটা এক রকম জগাখিচুড়ি ভাষায়—বা ভাষার চাইতে হাতনাড়া আর মুখভঙ্গীর সাহায্যে কাচ্চি ভালোই চালিয়ে যায়, কিন্তু দু'টো সুখ-দুঃখের গল্প পা ছড়িয়ে বসে কারুর সঙ্গে করতে পারে না। কাচ্চি জানে সেই রয়েছে কেবল শিবানীর জন্য। নইলে সে এই 'হায় হায়' ভাষীদের সব ক'টাকে তাড়িয়ে মনের সুখে কথা বলা যায় এমন সব লোক নিয়ে আসত।

কাচ্চির ধারণা সব কথার শেষে একটা 'হায়' শব্দ যোগ করলেই হিন্দী হয়ে যায়। তাই হিন্দী ভাষাটাকে সে বলে 'হায় হায়' ভাষা!

আজ কাচ্চি শিবানীর সঙ্গে গল্প করবার জন্য এসে বসে নি। সে জানে সাহেব এক্ষুণি যে কোন সময় এসে পড়বেন। তবে আবদুল যখন এইমাত্র ঠাণ্ডা সরবতের বোতল নিয়ে নীচে গেল, তখন কিছুটা সময় দেরী আছে। এই ফাঁকে শিবানীর পায়ে ক্রিমটা মেখে দেবার জন্য সে এসে বসেছে। পায়ের আঙ্গুলের ভেতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্রিম ঘষতে ঘষতে কাচ্চি বললো, আজকের রাঁধবার মেনু আমি করে দিয়েছি।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে শিবানী কাচ্চির মুখে মেনু শুনে হাসলো। বললো, মেনু তুই করে দিয়েছিস। বাবুর্চি শুনলো তোর কথা?

বাবুর্চির সঙ্গে কাচ্চির একেবারেই বনে না। তার ধারণা ঐ লোকটা সব চাইতে বেশি ম্লেচ্ছ। কোনো বিচার-আচার নেই। বাবুর্চির সম্বন্ধে কাচ্চির অনেক নালিশ। সে বাজার চুরি করে। ডিমের গোঁজামিল দেয়। রাঁধা মাংস চুরি করে নিয়ে যায়; বলে, সমস্তদিন খালি বাড়িতে লুটেপুটে খায় লোকটা। তাই শিবানী জিজ্ঞাসা করলো, বাবুর্চি শুনল তোর কথা? তুই যেমন তাকে দেখতে পারিস নে, সেও তো তোকে দেখতে পারে না।

কাচ্চি বললো, শুনত আর কি! বুদ্ধি খাটিয়ে বলেছি বলেই শুনেছে বাছাধন।

কি রকম?

বলেছি, মেমসাব বলে গেছেন, 'এই এই মেনু হবে আজ।'

আচ্ছা!

কাচ্চি গৌরবে ঘাড় খাড়া করে বললো, তবে! কিন্তু কেন করেছি এটা? শুধু শুধু ওকে ঘাঁটাতে যাবো কেন। করেছি ম্লেচ্ছ তো, দিনকালের কোন জ্ঞানগম্মি নেই ওদের। আজ কি গরম পড়েছে সেটা বুঝবে না, সাহেবকে খুশি করবার জন্য সব গরম রান্না করে বসে থাকবে। কি রাঁধতে দিয়েছিস শুনি?

মুরগীর রোস্ট বলেছি—পাতলা ঝোলই বলতাম কিন্তু সাহেব ভালোবাসেন না যে একেবারেই। তাই রোস্টই করতে বলেছি খুব কম ঘি দিয়ে। পোলাউ করতে মানা করেছি। তোমরা যে ফাইডাইস না কি বলো তাই করতে বলেছি ভাত রেঁধে নিয়ে। ওটা পেটগরম করবে না; ভেটকি মাছের ভাজা করতে বলেছি। আর কচি আম দিয়ে পাতলা অম্বল করতে বলেছি একবাটি।

হেসে ফেলল শিবানী।

অবাক হলো কাচ্চি। বললো, হাসলে যে মা? হ্যাঁ, কাঁচা আমের ঝোল খুব শরীর ঠাণ্ডা করে।

শিবানী বললো, তা বেশ করেছিস। সাহেব নিশ্চয়ই একবাটি কচি আমের ঝোল চুমুক দিয়ে খাবেন। বলেই হেসে ফেলল শিবানী। টক যে নেশার মানুষ খায় না তা জানবে কি করে কাচ্চি।

অপ্রস্তুত মুখ করে বসে রইল কাচ্চি। বললো, সাহেব খাবেন না?

তা সাহেব না খান আমি তো খাবই—তুই মুখ কালো করছিস কেন?

আবদুল একটুকরো কাগজ এনে হাতে দিলো শিবানীর। সাহেব দিয়েছেন।

কাগজটা হাতে নিয়ে বুকটা ধক্ করে উঠল ওর। এটা কি বেরিয়ে যাওয়ার খবর পাঠানো ইন্দ্রনাথের! কিন্তু কাগজটা পড়ে ভারী আমোদবোধ করলো সে। একেবারে নতুন স্বাদ। ইন্দ্রনাথ লিখে পাঠিয়েছে— লোকটা দেরী করিয়ে দিচ্ছে। এক্ষুণি আসছি—

কাচ্চিও গলা লম্বা করে শিবানীর হাতের চিরকুটটার দিকে তাকিয়ে আচমকা সভয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেললো, কি মা?

সাহেব যদি বেরিয়ে যাবার কথা লিখে থাকেন, এই মুহূর্তে বুঝি বাড়িটা তবে মরে যাবে।

কাচ্চির মনোভাব বুঝল শিবানী। কে কাচ্চির বুকে ওর প্রতি মায়ের মমতা ভরে দিয়েছে। সস্নেহে তার দিকে তাকালো শিবানী।

কিন্তু কাচ্চি ততক্ষণে উঠে পড়েছে। হাতের উল্টো পিঠে চুয়ানো ল্যাভেণ্ডারের তেলতেলে ভাবটাকে দু'হাতে ঘষতে ঘষতে বললো, হাত দু'টো মা আমারও মাখম হয়ে গেল। যাই এক বালতি কাপড় জামা জলেতলে তল করে রেখে এসেছে। এক্ষুণি না ধুলে যাবে রং নষ্ট হয়ে। তখন বলবে আবার কাচ্চি কি করে আমার দামী শাড়িটার এ সর্বনাশ করলি।

কাচ্চির এই বুদ্ধিটার জন্যই শিবানীর ওকে আরো পছন্দ। কথা যেমন বলে এবং বলায় এক এক সময় আবার না বলে এবং না বলিয়ে চমৎকার পার হয়ে যায়।

হাতটা এ-গাল ও-গাল বুলালো কাচ্চি— বললো, হাত দু'টো তোমার ক্রিম খেয়ে খেয়ে মাখম হলে হবে কি, গালের চামড়াটা যেন ধরি তোলা শিল পাথর।

যা মুখে মাখবার জন্য তোকে একটা ক্রিম দেবো।

কিছু হবে না এই কালো কুৎসিত মুখে মেখে।

কালো তো আ—

কি যে বলে মা! যেন আঁতকে উঠে থামিয়ে দিল কাচ্চি শিবানীকে।

কালো আমি তাও বলতে পারবো না?

তুমি কালো মা! তোমার চাইতে সুন্দর আমি দেখি নি—

কাচ্চি, ভালোবাসিস বলে অমন ডাহা মিথ্যে কথাটা বলিস নে রে।

এ কথার কি জবাব দিত কাচ্চি কে জানে। নীচের গাড়িবারান্দা থেকে গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল সে।

ইন্দ্রনাথের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসতে শিবানীর মনে পড়লো একটা ইংরেজী কথা: পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর হলো একটি সুন্দর ফুল, তার চেয়ে সুন্দর হলো একটি সুন্দর মুখ, কিন্তু তারও চেয়ে সুন্দর হলো একটি সুন্দর মন।

ইন্দ্রনাথের যদি এসে পড়ার সম্ভাবনা না থাকত তবে শিবানীর এমন ডাহা মিথ্যে বলিস না'র জবাবেকাচ্চি সবেগ মস্তক আন্দোলনে বলতে চাইত সে মিথ্যে বলছে না; তার মনোভাবে প্রকাশের এমন সুন্দর একটা কথা আছে, তা তো কাচ্চি জানে না।

ইন্দ্রনাথ বারান্দায় এসে আর বসলো না। তলার গেঞ্জী, গরদের পাঞ্জাবী ভিজে ড্রেসিং গাউন পর্যন্ত ভিজে ওঠা পিঠ-বুক দেখিয়ে বললো, দেখো অবস্থা। বসবার ঘরেও এয়ারকুলার না বসালে চলবে না। এসো আমার ঘরে।

ইন্দ্রনাথ গিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলে তার পেছন পেছন গিয়ে ঢুকলো শিবানী। ঘরে ঢোকামাত্র শরীরটা জুড়িয়ে গেল। শিবানীর মনে হলো ঘুরে ঢুকল না তো যেন শীতল ঝরণার জলে শরীর ডোবালো সে। আরামে বলে উঠলো শিবানী, আঃ।

পেছন থেকে দু'কাঁধে ধরে শিবানীকে নিয়ে ইন্দ্রনাথ তার আরাম কেদারায় বসিয়ে দিলো; বসে শিবানী বললো, তুমি? ওর পায়ের তলার কার্পেটের ওপর বসতে যেতেই ইন্দ্রনাথকে বাধা দিলো।

শিবানী বললো, না এখানে নয়।

কেন?

আজ অনেক গল্প করব—

এখানে বসে গল্প করার আপত্তি কি?

এ ভাবে গল্প জমে না।

দেখো কেমন জমাই—

না, ইন্দ্রনাথকে দু'হাত ধরে আটকালো শিবানী। তুমি আবদুলকে বারান্দা থেকে একটা বেতের চেয়ার এনে দিতে বলো।

হাসল ইন্দ্রনাথ। বললো, ঠিক আছে।

কলিংবেল টিপতেই আবদুল এসে হাজির হলো। তাকে দিয়ে চেয়ার আনিয়ে বসলো ইন্দ্রনাথ। তারপর ড্রিঙ্কের থালাটা অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে বললো, তোমার বিশ্বপ্রকৃতি যে-নিয়মের বিধানে চলছে, তারই ছোটখাটো নিয়মের বিধানে ওটা ওখানে এসে রয়েছে। আমি কিন্তু এখনও ছুঁই নি।

কারণ?

শিবানীর জিজ্ঞাসার কোনো জবাব দিলো না ইন্দ্রনাথ। কি যেন ভাবতে লাগল শিবানীর দিকে তাকিয়ে।

শিবানী বললো, কিছু যেন ভাবছো মনে হচ্ছে।

ভাবছি মনে হচ্ছে—

তাই তো মনে হচ্ছে।

একটু ভাবছিলাম—

আমি আসবার আগে আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভেবেছ। আসবার পরও আবার সামনে বসে বসে ভাবছ। আমার সঙ্গে ভাবটাই ভাবনার ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।

শিবানী উঠে দাঁড়ালো। বললো, দেখা যাক তোমার ভাবনায় আমি সাহায্য করতে পারি কি না।

শিবানী জানে ইন্দ্রনাথের মনের দ্বন্দ্বটা কোথায় হচ্ছে। সে গিয়ে ড্রিঙ্কের থালাটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর চাবি তুলে নিয়ে সোডার বোতলটা খুলবার চেষ্টা করল টেনেটুনে। পারলো না। হুইস্কির বোতলটাও নয়। নিরাশ হয়ে বললো, না, আমার দ্বারা হবে না। তোমার আবদুলকেই ডাকো।

ইন্দ্রনাথ দেখছিল শিবানী কি করে। বললো, আবদুলের দরকার হবে না। খুলতে হলে আমিই পারব।

খুলতে হবে যখন তখন খুলে দাও। আমি না হয় ঢালতে সাহায্য করি।

এখন থাক। শুধু থাক বলতে পারলো না ইন্দ্রনাথ। নিজের উপর এত জোর নেই।

শিবানী বললো, আচ্ছা বিরস মুখে বসে থাকবে। তার চাইতে—

বিরস মুখে বসে থাকব কেন। বললাম তো, দেখই না কেমন গল্প জমাই। তুমি কি ভাবো আমি মদের মুখেই কেবল সরস।

ছেড়ে দেবে?

ইচ্ছে—

আমার জন্য?

তোমার জন্য।

হেসে উঠল এবার শিবানী। বললো, আগে আমাকে ধরেই নাও তারপর না হয় একে ছেড়ো।

তোমাকে ধরি নি?

পাগল। একে কি ধরা বলে।

একে কি বলে?

একে বড় জোর ধরার মহড়া দেওয়া হচ্ছে বলা চলে—

উঠে এসে শিবানীর দু'কাঁধ দু'হাত বলিষ্ঠ চাপে চেপে ধরে ইন্দ্রনাথ বললো, একে ধরা বলে?

উঁহু, একেও না।

শিবানীকে বুকের উপর টেনে এনে আরো বলিষ্ঠ চাপে চেপে ধরলো ইন্দ্রনাথ। বললো, একে?

শিবানী ঐ অবস্থায়ই মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, উঁহু, একেও না।

ইন্দ্রনাথকে যেন পাগলামোতে পেয়েছে। শিবানীর চোখে, মুখে, ঠোঁটে, চুলে চুম্বনের ঝড় বইয়ে দিতে দিতে তাকে নিয়ে কেদারার উপর বসিয়ে দিলো। আগের দিনেরই মতো কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ে তার দু'পা বুকে তুলে নিয়ে চেপে ধরে বললো, একে ধরা বলে?

শিবানী শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। তার শরীর দিয়ে যেন এই ঠাণ্ডা ঘরেও আগুন বের হচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, উঁহু, একেও বলে না।

মদ খায় নি তবু মনে হতে লাগলো ইন্দ্রনাথের—ভীষণ নেশা করেছে সে। চট করে ফের উঠে বসলো সে। শিবানীর কোলের ওপর দু'হাত রেখে বললো, আমায় নিশ্চয়ই অত মূর্খ তুমি ভাবছ না যে, তুমি কোন ধরাকে ধরা বলছ আমি বুঝতে পারছি নে। সে ধরাটা তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও শিবানী—

দু'চোখ বন্ধ করে শিবানী বোধ হয় ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ প্রার্থনা করলো।

শিবানীর এই প্রার্থনা শুনে কি বিধাতাপুরুষ আবারও নিজের ওপর তাক্ত হয়ে হাতের পদ্মফুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন? মেঘের ওপর পদচারণ করতে করতে ভাবতে লাগলেন, শুভ-ইচ্ছা তো মানুষের মধ্যে আমিই জাগাই, কিন্তু জাগিয়ে আবার সে ইচ্ছাকে নষ্ট করে দিই আমি কেন? আমার চরিত্রেও কি কোন দুষ্টবীজ পোঁতা আছে?

॥ ১১ ॥

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু বেলা যে হয়েছে ইন্দ্রনাথের ঘরে তা বুঝবার উপায় নেই। সে ঘরে বাইরের প্রকৃতি প্রবেশ করতে পারে না। তার পরিমণ্ডল তার নিজস্ব সৃষ্টি। তার আলো-অন্ধকার গরম-ঠাণ্ডার নিয়ন্তা সে নিজে। দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দা যে সকালের আলোয় ঝলমল করছে, শিবানীর ঘরের শূন্য বিছানায় যে তার শিয়রের জানালাটা রোদের ছায়ায় পিঠ রেখে শুয়ে খাড়া শরীরটাকে একটু আয়াস করিয়ে নিচ্ছে বা দিনটা যে কি গরম নিয়ে আসছে, যার আভাস এই সকালের রোদ হাওয়ায় পাওয়া যাচ্ছে— সে সব কিছুই বোঝবার উপায় নেই ইন্দ্রনাথের ঘরে। সেখানে জমাট ঠাণ্ডায়—ব্যারোমিটারের পারা ষাট ডিগ্রিতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার সমুদ্রের বুকের উপর ঢেউ তোলা চাঁদের আলোর মতো আলো ঢেউ তুলছে, ঘরজোড়া ভেলভেটের পর্দার ভাঁজে ভাঁজে।

দেয়ালে ঘোর তামা-রং এর শেডে ঢাকা শূন্য পাওয়ারের সবুজ ক্ষীণ আলো জ্বলছে। একটা নিস্তেজ আলোর বিচ্ছুরণ, ঠিক আলোটার বরাবর কার্পেটের উপর সামান্য জায়গায় বৃত্তাকারে পড়ে ঘরের অন্ধকারের কালোত্বটাকে ফিকে করছে মাত্র, তার বেশি একটুও নয়। তার বেশি চাহিদাও নেই ঘরের অধিকর্তার তার কাছে। ঘুমের আগেই যেন দুজনার দৃষ্টির মধ্যখানে নিঃসীম অন্ধকার জমাট বেঁধে না থেকে, মুখের কথার সঙ্গে যেন দু'জনের চোখের প্রতিফলন মিলতে পারে—ক্ষীণ-আলোর কাছে যে এটুকুই শুধু চাহিদা ঘরের অধিকর্তার—তা বুঝতে পারা যায়।

ইন্দ্রনাথের এই ঘরে, ইন্দ্রনাথের শয্যায় চোখ মেলে শিবানী প্রথমটায় ঠাহরই করে উঠতে পারলে না, ও কোথায়। ভীষণ অপরিচিত ঠেকতে লাগল জায়গাটাকে ওর। শুয়ে শুয়েই তাকিয়ে রইল ঘরটার দিকে। চোখ যা দেখছে ঘুমের ঘোরভরা মাথাটা যেন তা ঠিক ধরে উঠতে পারলে না কিছু সময়। ঘুমের জড়তা কাটিয়ে মাথা কাজকরা আরম্ভ করলে তবে বুঝল শিবানী— এটা ইন্দ্রনাথের ঘর। মনে পড়ে গেল গত রাতটাকে।

সুখী মুখটাকে নরম বালিশটার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎ শরীরটাকে কাৎ করল শিবানী।

বাড়িটাতে মধ্যবিত্ত বাড়িগুলির মতো সকালে বিকেলে বাসন মাজা, জল তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া বা ঠিকে ঝি আসার, গয়লার দুধ আনার মতো সময়-নির্ধারক কোন শব্দ ওঠে না। যদি বা ওঠে এক-আধটুকু তাও এই বন্ধ ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। ইন্দ্রনাথ উঠে গেছে দেখে শিবানী বুঝল সকাল হয়েছে। সকালে ওঠাই ইন্দ্রনাথের অভ্যেস।

তা হোক গে সকাল।

ওর সকালে ওঠা অভ্যাস নয়। ও উঠবে না এখন।

গায়ের মোটা চাদরটা জুত করে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমোবার ইচ্ছার সঙ্গে আর একটা ইচ্ছাও ছিল। ইন্দ্রনাথের ঠোঁটের ছোঁয়ায় ও চোখ মেলবে।

সে যেন কত যুগ আগের কথা—

ইন্দ্রনাথ ওর দেরিতে ওঠার অভ্যাসটা সযত্নে জিইয়ে রাখত— শুধু ওর ঘুমন্ত চোখে ঠোঁট ছোঁয়াবার জন্যে। ও ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে উঠতে চাইলে উঠতে দিত না সে কিছুতেই। বলত, দু'জনে উঠে এক সঙ্গে মার্চ করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তার কি মানে। তুমি একেবারেই রসজ্ঞ নও শিবানী। এক সঙ্গে ওঠা হবে না। হয়

স্বামী ঘুমিয়ে থাকবে স্ত্রী এসে স্বামীকে জাগাবে, নয় তো স্ত্রী ঘুমিয়ে থাকবে স্বামী এসে স্ত্রীকে জাগাবে। দাম্পত্য-জাগরণের এই রীতি হওয়া উচিত।

তখন ওরা বেহালার বাড়িতে। ইন্দ্রনাথ বিয়ের পর প্রথম ওকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল তার বেহালার পৈতৃকবাড়িতে বাবা মা'র কাছে। এক ঘরেই তখন ওরা থাকত। অনেক অমিল, অনেক বিরাগ সত্ত্বেও এক ঘর মেলাতে চায়। ওদের সেই এক ঘর, এক শয্যাও ওদের ছিন্ন মনকে অনেক জোড়া লাগিয়েছে। তারপর তৈরি হলো জজকোর্ট রোডে ওদের এই হাল-ফ্যাসনের বাড়ি। তৈরি হলো স্বামী-স্ত্রীর জন্য পাশাপাশি দুই ঘর। আর এই ভিন্নঘর চলল কেবল দু'জনের মধ্যখানের ব্যবধান বাড়িয়ে। একদিনের রাগ যেখানে হয়ত একদিনেই মিটে যেত, নয় তো বড় জোর দু'দিনে, সেখানে জমা হয়ে উঠতে লাগল তা। অপরাধী ইন্দ্রনাথের প্রথম দিনের ভয় দ্বিতীয় দিনে আরো বাড়ল—তৃতীয় দিনে আরো। দুই ঘরের মধ্যখানের ভারি পর্দাটা উঠল পাথরের দেয়াল হয়ে। কখনো বিরাগ-বিতৃষ্ণার। কখনো সঙ্কোচ-দ্বিধা-চক্ষুলজ্জার।

না, যে সম্পর্কটার সবকিছু অভিন্ন— অর্থাৎ যে সম্পর্কের প্রাণবায়ুই অভিন্নত্বের ভেতর নিহিত, সে সম্পর্কটার ভিন্ন ঘর, ভিন্ন শয্যা ভালো নয়। পাশ্চাত্য দেশের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূজা সবখানে যথার্থ নয়।

ডানলোপিলোর গদি তলিয়ে এ-পাশ থেকে ও-পাশে ফিরল শিবানী। ইন্দ্রনাথের বালিশটা টেনে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে বুকের তলায় ঠাসল। ঘুমের আমেজটা একেবারেই চলে গেছে আর ঘুম আসবে না বুঝল শিবানী। কিন্তু থাক ঘুমের আমেজ, আমেজ এখন শিবানীর সর্বশরীরে। বুকের তলার বালিশটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে হাত দু'টো কপালের উপর রেখে শুয়েই রইল সে।

আজ ওর তাড়া নেই।

অফিস?

না, অফিসে ও আজ যাবেই না। ইচ্ছেই করছে না। ভালোই লাগবে না।

কবেই বা ওর অফিসকে, চাকরীকে, অফিসের বস অমল বোসকে ভালো লেগেছে। মিঃ বোস যখন ওর দিকে অভিমানে মুখ ফুলিয়ে তাকান তখন ওর যেমন হাসি পায়, তেমনি বিরক্তিও লাগে; মনে হয়—হায়! যে তোষামোদ আর অধ্যবসায় পুরুষ অন্য নারীর মন পাওয়ার জন্য খরচ করে সে অধ্যবসায়টা সে যদি স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্য খরচ করত তবে সংসারগুলি কি প্রাণের মাধুর্যে ভরপুর হ'য়েই না গড়ে উঠতে পারতো!

প্রেমে প্রীতিতে মধুরতায়; সম্ভোগে সাহচর্যে এমন একটা গভীরতম এবং প্রয়োজনীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন দায়িত্ববোধই যেন গড়ে ওঠে না পুরুষের মনে।

কিন্তু কেন ওঠে না?

তার জন্য দায়ী কে?

পুরুষ না নারী?

দায়ী নারী নিজেই।

স্ত্রীর মন বলে যে কোন একটা পদার্থ রয়েছে এ-শিক্ষা নারী কোনদিন দেয় নি পুরুষকে। এখনও দেয় না।

কেন দেয় না?

গভীরভাবে সে কথাটাই ভাবতে লাগল শিবানী।

স্বামীর মন পাওয়ার জন্য যে শিক্ষা নারী তার মেয়েকে দুধের বয়স থেকেই দিতে আরম্ভ করে, স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্য ছেলেকে তেমন শিক্ষা দিতে তাকে দেখা যায় না কেন? স্বামীর ঘরে যাত্রা করিয়ে দেবার কালে অশ্রুমুখী কন্যার মুখটি কাছে টেনে এনে সংশয়াকুল ভীরু মা যেভাবে আশীর্বাদ করেন, স্বামীর মন ও ভালোবাসা পেয়ে স্বামী সোহাগিনী হও, পুত্রের মুখ কাছে টেনে মা'কে সে আশিসবাণী উচ্চারণ করতে শোনা যায় না কেন? কেন তার মুখে শোনা যায় না স্ত্রীর মন ও ভালোবাসা পেয়ে কল্যাণময় আনন্দের নীড় রচনা কর! কন্যার জীবন-যাত্রার পক্ষে স্বামীর মন পাওয়াটা নারীর যেমন অপরিহার্য মনে হয়, পুত্রের জীবন-যাত্রার পক্ষে স্ত্রীর মন পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নটা নারীর এমন অবান্তর আর অপ্রয়োজনীয় মনে হয় কেন?

সেই আদিকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আজও নারীমন ঠেকে আছে এক স্থানে। মা হিসাবে মেয়ের জন্য যে সুখ নারীর নিয়ত প্রার্থনার বস্তু, বধূর জন্য সে সুখ তার অন্তর থেকে উত্থিত হতে চায় না কিছুতেই।

বোকা বোকা-কি বোকাই না মেয়েগুলি!

বোঝে না তার কন্যাকে স্বামী-সোহাগিনী হতে বলার আশীর্বাদ একেবারেই মিথ্যে, যতক্ষণ না স্ত্রীকে সুখী করার শিক্ষাটি পুত্রদের দিয়ে উঠতে পারছেন।

আসতে পারি—জিজ্ঞাসা করল কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। কথার সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে এসে ঘরে প্রবেশ করল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী উঠে পড়তে যাচ্ছিল—

নিষেধ করল ইন্দ্রনাথ। বলল, প্লিজ, উঠো না। আমি কেদারাটা নিয়ে এসে খাটের পাশে বসছি। গল্প করব।

কেদারাটা তুলে এনে খাটের সঙ্গে লাগিয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। বলল, আমি আজ 'বেডটি' বারান্দার চেয়ারে বসে খেয়েছি। তোমারটা তোমার আয়া নিয়ে আসছিল, আমি নিষেধ করেছি। তোমাকে ভীষণ ঘুমোতে দেখে গিয়েছিলাম। আয়া এসে তুলে ফেলুক, চাই নি। ভেবেছিলাম আমি জাগাব। বলে ইন্দ্রনাথ শিবানীর দিকে তাকাল।

শিবানীর দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হলো তার দৃষ্টি।

না, ইন্দ্রনাথ ভোলে নি আগের কথা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ। বলল, এখন আবদুলকে তোমার বেডটি নিয়ে আসতে বলে এসেছি।

শিবানী ইন্দ্রনাথের দিকে পাশ ফিরে গদির ওপর কনুই আর হাতের তালুতে মাথা রাখল।

কালকে আমি ড্রিঙ্ক করেছিলাম শিবানী?

অবাকভাবে শিবানী তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথের দিকে।

আবার জিজ্ঞেস করল ইন্দ্রনাথ, করেছিলাম?

তোমার মনে নেই করেছিলে কি না-করেছিলে?

না।

মাথা খাড়া করে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকাল শিবানী। যদিও সে আশ্চর্যবোধ করছিল তবু পরিহাসের সুরেই বলল, আমার সঙ্গে ভাব করা নিয়ে ভাবনা করা পর্যন্ত সইবে কিন্তু পাগল হয়ে যাওয়াটা সইবে না। তার চাইতে অ-ভাবই আমার ভালো।

হাসল ইন্দ্রনাথ চোখ মিটমিটে দৃষ্টিতে শিবানীর দিকে তাকিয়ে।

ইন্দ্রনাথের এই আকর্ষণীয় হাসিটা যেন শিবানী ভুলেই গিয়েছিল।

শিবানীর কোমরে একটা হাত রাখল ইন্দ্রনাথ। বলল, তুমি বলই না খেয়েছিলাম কি না।

যদি বলি, না?

তবে—যেন ভাবতে লাগল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী তাকিয়ে রইল তার দিকে একলক্ষ্যে।

ইন্দ্রনাথ সিগারেট থেকে একমুখ ধোঁয়া টেনে নিয়ে ছেড়ে দিতে দিতে বলল, তুমি যখন বলছ আমি যদি না বলি। তার মানে হচ্ছে কাল ড্রিঙ্ক করেছি আমি। খুব বেশি খেয়েছিলাম?

এখন তো তাই দেখছি। পরিমাণ বেশি না হলে সব ভুলে গেলে কি করে।

সব ভুলে গেছি? তা-কি হয়। এক ড্রিঙ্ক করার কথাটা ছাড়া আর সব মনে আছে। তার মানে ওটাতে আমার কাল মন ছিল না তাই মনে নেই। কালকের পুরো নেশাটা ছিল আমার এখানে। বলে শিবানীর শরীরের ওপর ন্যস্ত হাত দিয়ে শিবানীকে চাপড়ালো ইন্দ্রনাথ।

এবার শিবানী বুঝল এই কথাটা বলার জন্যই ইন্দ্রনাথের আগের কথাগুলি বলা।

প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার সময় যে সন্দিগ্ধ, অবিনীত, ঈর্ষালু ইন্দ্রনাথকে দেখে, সে আর এ ইন্দ্রনাথ কি এক!

ইন্দ্রনাথ বলল, এসে দেখলাম কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছ। নিশ্চয়ই কড়িকাঠ গুণছিলে না। কড়িকাঠ নেই-ই। ভাবছিলে? কি ভাবছিলে?

কি ভাবছিলাম— বলে এবার হাতের তালু থেকে থুতনি তুলে শরীর ছেড়ে শুয়ে পড়ল শিবানী। ইন্দ্রনাথ এসে ওকে যে ভাবে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিল, ঠিক সেই ভাবে ছাদে চোখ রেখে বলল, ভাবছিলাম স্বামীর মন পাওয়ার জন্য মেয়েদের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, ছেলেদেরও স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্যে সে রকম প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে, এ সত্যটা স্বীকৃত হচ্ছে না কেন।

তারপর?

শিবানী উত্তর দিতে যাচ্ছিল—

দরজায় নক করার শব্দ হলো।

ইন্দ্রনাথ শিবানীর শরীরের উপর থেকে হাত তুলে নিল।

শিবানী বুকের শাড়ির কাপড় গুছিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে কাত হয়ে হাতের উপর মাথা রাখল।

যদিও আবদুল চা নিয়ে এসেছে, বুঝেছে, তবু ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল, কে?

সাব চা।

নিয়ে এসো।

আবদুল এসে চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। হাতের ট্রে মেঝের কার্পেটের ওপর নামিয়ে ঘরের কোণ থেকে কাচের নিচু সাইড টেবিলটা এনে খাটের পাশে রাখল। কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে কাচটাকে ফের পরিষ্কার করল। তারপর কার্পেটের ওপর থেকে ট্রে তুলে সাইড টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেল।

শিবানী অর্ধশায়িত অবস্থায় থেকেই বাঁ হাতে চা বানাতে লাগল। টি-পটের মাথা থেকে টি-কৌসি তুলে ফেলল। উপুড় করা কাপ দু'টো চিৎ করল। পটের চা চামচে নিয়ে নাড়তে গিয়েও হাতের চামচ নামিয়ে রাখল। ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত পাতলা লিকার খায়। না নেড়ে চায়ের ওপরের সোনালী রং-এর জলটা তার কাপে ঢেলে দিয়ে তারপর চামচে দিয়ে বেশ করে নেড়ে নিজের কাপে কড়া চা'টা ঢালল। চিনি মেশাল। দুধ মেশাল। ইন্দ্রনাথের কাপটা ট্রের ওপর রেখে নিজের কাপটা অতি সন্তর্পণে ভারসাম্য বজায় রেখে রাখল বিছানার ওপর।

ইন্দ্রনাথ বলল, পড়ে যাবে।

না পড়বে না—বলতে গিয়ে যেটুকু নাড়া খেল তাতেই ডানলোপিলো দুলে উঠল, চায়ের কাপ ঝাঁকুনি খাওয়ার শব্দ তুলল প্লেটের ওপর। তাড়াতাড়ি কাপটা হাতে তুলে নিয়ে শিবানী হাসল।

ইন্দ্রনাথ সাইড টেবিলটা আরো এগিয়ে দিল ওর দিকে কাপ রাখবার জন্য।

ইন্দ্রনাথ গা ছেড়ে কেদারায় হেলান দিয়ে বলল, আজ ছুটি। অফিসে যাচ্ছি নে। অন্য কাজে বেরুচ্ছি নে। কিচ্ছু করছি নে। এ ঘর থেকে নড়ছি নে। ব্রেকফাস্ট এখানে খাবো। লাঞ্চ—তা তখন ভেবে দেখা যাবে। এখন কেবল গল্প—বল, তোমার মিঃ বোসের গল্পই শোনা যাক—

মিঃ বোসের গল্প! দু'ঠোঁট কঠিন হয়ে উঠল শিবানীর। কাপের ওপর থেকে চোখ তুলে তাকাল—ইন্দ্রনাথের দিকে।

না, সে মুখে কোন হিংসা, জ্বালা, চোখে কোন কুটিলতা নেই। শরৎ আকাশের মতো পরিষ্কার সে মুখ। আরাম বোধ করল শিবানী। আর কিছু নয়। এক্ষুণি ওর সকালের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে ভারি কষ্ট পেতো সে।

আবার দরজায় নক করার শব্দ হলো।

ভ্রূ কুঞ্চিত হলো ইন্দ্রনাথের।

ইন্দ্রনাথ সাড়াদেবার আগেই আবদুল জানাল, নতুন ম্যানেজার সাহেব এসেছেন দেখা করতে। জরুরি কথা আছে।

ও, বলে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শিবানী একবার করে চায়ে চুমুক দিতে লাগল আর মাঝখানের সময়টা চামচ দিয়ে কাপে প্লেটে টুং-টাং শব্দ তুলতে লাগল জলতরঙ্গের সুরে।

মিষ্টি শব্দটা ওর মনের সুরের সঙ্গে বেশ একটা ঐকতান তুলতে লাগল যেন।

ইন্দ্রনাথ তার নবনিযুক্ত ম্যানেজার অরুণের সঙ্গে বারান্দার যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেটা ঠিক শিবানীর শিয়র। যদি মাঝখানের দেয়ালটা তুলে নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে অরুণ শিবানীর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবানী অরুণকে চেনে না।

ইন্দ্রনাথের ম্যানেজার বদল হবার সংবাদ সে রাখে না।

ইন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে কার্পেট বদল, পর্দা বদল দেখে বুঝেছিল অনেকদিন বাদে সে ইন্দ্রনাথের ঘরে এলো, তেমনি হয় তো যেদিন অরুণকে দেখবে সেদিন বুঝবে ইন্দ্রনাথের ম্যানেজার বদলের খবরও অনেকদিন পরে সে জানল।

কিন্তু খুব বেশিদিন দরকার হলো না। শীগ্‌গিরই অরুণকে শিবানীর চিনতে হলো। আর সে চেনা স্তম্ভিত করে ফেলল ওকে।

শিবানী তার অফিস টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে খুব তোড়ে কলম চালিয়ে যাচ্ছিল। স্তূপীকৃত হয়ে তার টেবিলের উপর জমে রয়েছে অফিসের যোগাযোগ পত্র, বেশ কিছু চিঠির জবাব দিয়ে ফেলা সম্বন্ধে সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদিও ওর বস মিঃ বোস নিজেই কাজে যে ঢিলেমিটা ও দিয়েছে তাতে ভীত হবার কিছু নেই। অবশ্যি ভীত শব্দটা শিবানীর ক্ষেত্রে একেবারেই খাটে না। চাকরিটা ওর না প্রয়োজনের, না সখের। প্রথমত কিছু করার জন্য করা। কিন্তু কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে বাড়িতে বসে বইপড়া এর চাইতে ঢের বেশি ভালো। কিছু করা, যা সত্যি সত্যি কিছু করা। দ্বিতীয়ত ইন্দ্রনাথকে যে যন্ত্রণাটা দেবার জন্য ওর কাজ করা তাও মনে হচ্ছে আর টেনে চলতে পারছে না। চাকরিও ধাতে সয় না, অমল বোসদের জাতটাকেও ধাতে সয় না ওর। ইন্দ্রনাথ যদি হঠাৎ এমনি করে ওর হাতে নিজেকে সমর্পণ না করত তবে হয় তো ইতিমধ্যে ও কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে বই নিয়ে নিবিড় হয়ে বসত।

কিন্তু ঠিক এখন আর কাজ ছাড়া যায় না।

কিছু অপেক্ষা ওকে করতেই হবে। নইলে ওর কাজ ছাড়ার সঙ্গে এখন যে কারণটা যোগ হবে সেটা সত্য নয়।

এই ভুলের উপর দাঁড়িয়ে অযথা ইন্দ্রনাথও অস্বস্তি বোধ করবে।

তারও লজ্জা রাখবার ঠাঁই মিলবে না যদি ইন্দ্রনাথের এই আত্মসমর্পণ দু'দিনের হয়।

ওর কাজ নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করা যেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের একটা অঙ্গ ছিল ইন্দ্রনাথের সেখানে এ ক'দিনের ভেতর একটা কথাও সে বলে নি এ নিয়ে।

নিজের ওপর তার বিশ্বাস নেই।

কিন্তু কোন ফাঁকিও নেই তার ভেতর।

তাই নিজের সম্বন্ধে নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত সে নীরব থাকবে।

ঠিক এখন আর কাজ ছাড়া চলে না শিবানীর।

আর যতক্ষণ কাজ করছে ততক্ষণ অবশ্যই দায়িত্ব পালন করতে হবে ঠিকমতো। জরুরি কাজ ফেলে রাখা চলবে না। মিঃ বোস ওর ওপরওলা হতে পারে কিন্তু তাঁরও ওপরওলা আছেন। আজ অফিসে এসে শিবানী একটুও সময় নষ্ট করে নি। প্রথমে চিঠির পর চিঠি খুলেছে আর পড়েছে। যে চিঠিগুলিকে বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সেগুলোকে এক জায়গায় রেখেছে। বাকীগুলিকে অন্য জায়গায়। তারপর একের পর এক চিঠি টেনে নিচ্ছে আর জবাব লিখে চলছে। সবগুলির জবাব লেখা হলে একসঙ্গে গেঁথে মিস জেনির হাতে তুলে দেবে। মিস জেনির ম্যানিকিওর করা ফর্সা লম্বা আঙুল নৃত্যের ছন্দে টাইপরাইটার মেশিনের চাবির ওপর নেচে বেড়াবে আর চিঠিগুলি টাইপ হয়ে বেরিয়ে আসবে।

মিস জেনি আর শিবানী দু'জনার সামনেই দু'টো শূন্য কফির পেয়ালা। কাজের অবসরে হয়ত এরই মধ্যে এক সময় কফি খেতে খেতে দু'জনেই একটু গল্প করে নিয়েছে। আবার এখন মগ্ন হয়ে কাজ করছে।

একটা জুতোর শব্দ মচমচ শব্দে এগিয়ে আসতে লাগল।

জুতোর চলাটা ওদের দু'জনেরই চেনা।

মিঃ অমল বোস আসছেন ওদের ঘরে।

কিন্তু প্রতিদিনের চলা যেমন মিঃ বোসের 'আসছি' বলতে বলতে হেঁটে চলে আসে আজকেরটা যেন তা নয়। আজকের জুতোর শব্দটা যেন মচ্ মচ্, মচ্ মচ্ শব্দে বলছে, অধিকারীর চোয়ালের হাড় শক্ত।

মিস জেনি এবং শিবানী দু'জনেই শব্দটার ভিন্ন সুর লক্ষ্য করল। মিস জেনির ও নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই। মিঃ বোস ওর কাছে আসছেন না। কিন্তু যার কাছে আসছেন সেই শিবানীরও তিলমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। তার হাতের কলম থামল না। কাজের ওপর থেকে মন এতটুকু সরল না। মিঃ বোস এসে ঘরে প্রবেশ

করলে মিস জেনি হাতের কাজ সমান তালে চালাতে চালাতে তারই ভেতর মাথা নেড়ে নড করল। শিবানী করল না। করল না এজন্য নয় যে সে মিঃ বোসের সঙ্গে অভদ্রতা করতে চায়। করল না এইজন্য যে, মিঃ বোস তার চলা থেকে চোয়ালের হাড়ে পর্যন্ত যে বক্তব্য নিয়ে এসে ঘরে ঢুকছেন সেই বক্তব্যটাকে সে প্রশ্রয় দেবে না এতটুকু মাথা নেড়েও।

মিঃ বোস শিবানীর সামনের চেয়ারের পিঠ ধরে এসে দাঁড়ালেন। বোধ হয় শিবানীর বসতে বলার জন্য একটু সময় নিলেন। কিন্তু মুহূর্তমাত্রই। তারপর চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন মিসেস সেন কি খুব ব্যস্ত?

না—হাতের কাগজের উপর মাথা নিচু করে সমানভাবে লিখতে লিখতে উত্তর দিল শিবানী। তারপর একটানে আরো লাইন দুই লিখে কলমের মুখ বন্ধ করে মাথা তুলল। একটু হেসে বলল, একটু বসিয়ে রাখলাম। কিছু মনে করবেন না।

মিঃ বোস গম্ভীর থমথমে গলায় বললেন, না।

যেন অভিমানী কিশোর।

বিশ্রী লাগল শিবানীর। লিখতে লিখতে আঙুল ধরে গিয়েছিল। বাঁ হাতে ডানহাতের আঙুলগুলি ঈষৎ দলাইমলাই করতে করতে ভেতরের বিশ্রী তিক্ততাকে যেন একটু থিতিয়ে নিতে লাগল শিবানী।

আমাকে দেখলেই কি আজকাল আপনি বিরক্ত বোধ করেন মিসেস সেন?

সে কি — এ কি বলছেন আপনি!

হাতের ব্যঞ্জনায় হতাশা প্রকাশ করে মিঃ বোস বললেন, কি যে আমি বলতে চাইছি, তা নিজেই বুঝছি নে।

তবে আগে নিজেই সেটা বুঝে আসুন—রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে শিবানীর এ কথাটাই বলতে ইচ্ছে করছিল—কিন্তু বলল না। তার ভদ্রতাবোধ বাধা দিল।

মিস জেনির সমক্ষে মিঃ বোসের এই ভাবভঙ্গি—কথা অত্যন্ত অপছন্দ লাগছিল শিবানীর। যদিও মিস জেনি যতই বাংলা কথা বলুক, দু'জন বাঙালীর কথোপকথন বোঝবার সাধ্য তার নেই। কিন্তু ভাষা না বুঝুক ভাবটা তো বুঝছে। বিশ্বে শব্দের অভিধান যতই বিভিন্ন থাক ভাবের অভিধান এক। ভাব বোঝার জন্য ভাষা দরকার হয় না। যদিও জেনি চোখ নিচু করে একাগ্রমনে টাইপ করে চলেছে। অর্থাৎ সে বলছে, আমি তোমাদের ভাষা বুঝি নে। ভাবটাও চোখ তুলে দেখছি নে। আমার দিক থেকে তোমরা নিঃসঙ্কোচ থাকো।

কিন্তু তার এই বলাটাই বলে দিচ্ছে ভাষা আর ভাব ছাড়াও বোঝার জগতে অনুভূতির বোঝা বলে একটা কথা আছে এবং বোঝার জগতে যার শক্তি এতটুকু দুর্বল নয় ভাষা আর ভাবের চাইতে। বরং সময় সময় সে ভাষা আর ভাবকে ছাড়িয়ে চলে যায়।

মিঃ বোস হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর কাগজ-চাপাটা তুলে নিয়ে তার ভেতরকার লাল টকটকে ফুলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর কিছুক্ষণ সেটাকে টেবিলের উপর লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে ছেড়ে দিতে লাগলেন।

বিশ্রী—কি বিশ্রী যে লাগতে লাগল শিবানীর—

মিস্ জেনি হয় তো শিবানীর অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝতে পেরে কিংবা হয় তো প্রয়োজনেই কাগজ-পত্র হাতে নিয়ে হাই হিলের ঠক্‌ঠক্ শব্দ তুলতে তুলতে বেরিয়ে গেল।

যতই হোক একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে মিঃ বোসও সহজ বোধ করতে পারছিলেন না। এবার জেনি বেরিয়ে গেলে কাগজ-চাপা রেখে টান হয়ে বসলেন। বললেন, আজ সাত দিনের ওপর হয়ে গেল হয় এসেও ফিরে যাচ্ছি নয় তো দেখাই পাচ্ছি নে। সিনেমার টিকিট জেনেশুনে নষ্ট করলেন—

একটু হেসে শিবানী বলল, আপনাদের বৃথাই অপিস মস্ত মস্ত টাকার অঙ্ক গুণে দেয়। আপনাদের কখনোই কাজ করতে দেখি নে কিন্তু। কেবল ঠাণ্ডাঘরে বসে বসে আরাম করেন।

আপনি বলতে চাচ্ছেন এটা কাজের সময়?

দেখুন কত চিঠি পড়ে রয়েছে। হাত দিয়ে চিঠি-পত্র ছড়ান টেবিলটা দেখাল শিবানী।

বেশ তো আপনি কাজ করবেন। আপনাকে কিছুতেই ধরে উঠতে পারছি নে তাই এখন এলাম এ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা করে রেখে যেতে। আজকে অফিস ছুটির পর অমনি চলে যাবেন না। আমার একটু কথা আছে মিসেস সেন—দরকারী কথা।

নাঃ, এদের কিছুতেই দমান যায় না। হতাশ বোধ করল শিবানী।

মিঃ বোস শিবানীকে নীরব দেখে আশান্বিত হলেন। শিবানীর দিকে ঝুঁকে পড়ে অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, প্লিজ মিসেস সেন, আপত্তি করবেন না।

আজ হবে না।

যতটুকু সামনে ঝুঁকেছিলেন তার চাইতে বেশি পেছনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন মিঃ বোস শরীরটাকে। অনুনয় সুর উবে গেল। কিছুটা ক্রূরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

কাজ আছে।

কোথায়?

অসহ্য ঠেকল প্রশ্নটা শিবানীর। একমুহূর্ত চুপ করে রইল সে। তারপর বলল, বাড়িতে।

বাড়িতে! যেন ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠতে যাচ্ছিলেন মিঃ বোস।

দৃঢ় কঠিনকণ্ঠে শিবানী বলল, হ্যাঁ বাড়িতে।

এ সাতদিন ধরে রোজ বাড়িতেই দরকার চলছে।

লোকটার গালে একটা চড় কষিয়ে দেওয়া যায় না? না যায় না। এটা অফিস।

তা এত দরকার ক'দিনের মধ্যে হঠাৎ বাড়িতে জোগাড় করলেন কোথা থেকে মিসেস সেন?

ঘরেই ছিল।

তাই!

হ্যাঁ। জানতাম না তো!

আমার ঘরের কথা তো আপনার জানবার কথা নয় মিঃ বোস, তাই সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু নিজের ঘরের কথাই যে জানেন না আপনারা।

জানি নে?

না জানেন না।

তা আপনি আমার ঘরের কথা জানলেন কি করে?

আপনার ঘরের কথা আর আমার ঘরের কথা এক বলে— বা অধিকাংশ ঘরের কথা এই বলে। সত্যি মিঃ বোস আমি এক এক সময় অবাক বিস্ময়ে ভাবি, এই যে মিঃ চক্রবর্তীর স্ত্রীর পেছনে মিঃ ব্যানার্জি ছুটছেন, আবার মিঃ ব্যানার্জির স্ত্রীর পেছনে মিঃ মুখার্জি ছুটছেন; মিঃ সেনের স্ত্রীর পেছনে মিঃ বোস আর মিঃ বোসের স্ত্রীর পেছনে মিঃ মিত্র—ব্যাপারটা কি— হঠাৎ কেমন যে আবেগ এসে গিয়েছিল শিবানীর গলায়। সেই জন্যই হয় তো ঝট করে থেমে গেল সে। বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে অর্ডার দিল, কফি, তিনকাপ। বেয়ারা চলে গেলে পার্কার পেনটা হাতে ঘুরোতে ঘুরোতে পরিহাসের সুরে বলল, আমি ভাবছি বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করব। থিসিস লিখব।

মিস জেনি এসে ঘরে ঢুকে হাসিমুখে গিয়ে তার টাইপ মেশিনের সামনে বসল।

বেয়ারা এলো তিনকাপ কফি নিয়ে।

মিস জেনির কাছে পেয়ালা রাখতেই সে অবাক কণ্ঠে বলল, আমার জোন্যে? আমি তো ছিলাম না ধন্যবাদ।

মিঃ বোস কফির পেয়ালায় দু'এক চুমুক দিলেন কি দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে কবে পর্যন্ত এ্যাপয়েন্টমেন্ট হতে পারে?

আমি জানাব।

ঠিক জানাবেন তো?

হাসল শিবানী, বলল, জানাব।

॥ ১২ ॥

শিবানী যে নিবিষ্টতার সঙ্গে কাগজপত্র গুছিয়ে বসে কাজে মন দিয়েছিল সেই নিবিষ্টতা ছিঁড়ে দিয়ে গেল মিঃ বোস। মিঃ বোস চলে গেলেও আর মন দিতে পারলে না হাতের কাজে। কলমের বন্ধ মুখটা কলমের ভেতরেই ঘোরাতে ঘোরাতে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগল শিবানী।

মিস জেনি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বারকয় লক্ষ্য করল তাকে। তারপর বাঁ হাতের তালুর উপর কফির পেয়ালাটা প্রায় ঠোঁট ছোঁয়াবার ভঙ্গিতে মুখের কাছে ধরে রেখেই বলল, আচ্ছা মিসেস সেন—বলেই থেমে গেল মিস জেনি।

শিবানী কলমের মুখ ঘোরানো বন্ধ করে জেনির দিকে তাকালো।

মিস জেনি তার ইংরেজী উচ্চারণে টেনে টেনে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো মিসেস সেন তোমায়?

করো।

কিছু মনে কোরবে না?

না।

তবু যেন একটু ইতস্তত করতে লাগল জেনি কথাটা বলার আগে। কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করাটা ওদের সমাজে একেবারেই ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

'প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রীতি রাখো, কিন্তু তার বাড়ির বেড়া ডিঙিও না'—ইংরেজ দেশের প্রবাদ।

বোধ হয় সেইজন্যই একটি বাঙালী সঙ্গিনী হলে যেভাবে কথাটা মনে হওয়া মাত্র ঝপ করে বলে ফেলত, মিস জেনি তা পারলে না। দ্বিধা করলো একটু। তারপর দ্বিধাটা ঝেড়ে ফেলে বলল, মিসেস সেন, মিঃ বোসকে যে পছন্দ করো না তুমি— এ তো সত্য?

না।

সত্য নয় এ?

না সত্য নয়।

মিঃ বোসকে পছন্দ করো তুমি?

তাও করি না।

পছন্দ করো না, অপছন্দও করো না।

না।

তবে করো কি?

কিছু যে একটা করতেই হবে তার মানে কি?

মিস জেনি চুপ করে রইল।

চুপ করে রইল শিবানীও।

ঠাণ্ডা কফিটা একচুমুকে খেয়ে নিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে জেনি বলল, না, মিসেস সেন, তুমি যাই বলো—আমি নিশ্চয় জানে যে মিঃ বোসকে তোমার ভালো লাগে না।

মিস জেনি, তুমি কিন্তু শব্দ পাল্টে ফেললে।

কি রোকম?

পছন্দ-অপছন্দ কথা দু'টো ভাসমান শব্দ। ও কথার উত্তর ভাসা কথায় দেওয়া চলে। কিন্তু ভালো লাগা কথাটা অনেক গভীরের। ওখানে ভাসা কথায় উত্তর চলে না। তুমি যদি পছন্দ করা না-করার কথা জিজ্ঞাসা না করে ভালো লাগা না-লাগার কথা জিজ্ঞাসা করতে তবে ঐ উত্তর আমি দিতাম না।

তবে কি উত্তর দিতে? আমি যদি জিজ্ঞাসা করতাম মিঃ বোসকে যে তোমার ভালো লাগে না, এ তো সত্য — তবে কি বলতে মিসেস সেন?

বলতাম সত্য।

ডোন্ট মাইণ্ড— কিছু মনে করো না মিসেস সেন। তবে তুমি খেলছো কেন মিঃ বোসকে নিয়ে?

খেলছি!

খেলছো না?

একেবারেই না মিস জেনি—একেবারেই না। না-এর ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে-দোলাতে শিবানী বলল, একেবারেই খেলছি নে আমি। খেলাটাই কি জীবনে কম আনন্দের স্থান না কি—যদি সত্যিকারের খেলার সঙ্গী মেলে? কিন্তু সত্যকারের জীবনসঙ্গী মেলার মত সত্যিকারের খেলার সঙ্গী, মেলাও দুর্লভ। ও মেলে না। আর

তাই যদি না মিলল তবে খেলে আনন্দ কি? এ খেলা নয়। এ কেবল যখন চতুর্দিক গড়ের মাঠ ঠেকে তখন যদি কেউ ডেকে বলে, চলো, একটু গড়ের মাঠটা ঘুরে আসি—তখন 'চলো' বলে উঠে পড়া। এখানে খেলা নেই। পছন্দ নেই, অপছন্দও নেই। কিছুই নেই। থাকে যদি তো আছে একটু বেড়ানো। তা-ও বড় করুণ।

'মিসেস' কথাটাই বলে দিচ্ছে শিবানী বিবাহিতা। তারপর শিবানী স্বামীর কথাও বলেছে। তবে কেন শিবানীর চারদিক শূন্য— কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। বেড়া ডিঙিয়েছে কিন্তু বেডরুম ডিঙোতে পারে না মিস জেনি।

মিস জেনি গালে হাত রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে শিবানীর কথা শুনছিল।

শিবানী একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, কি বললাম বুঝলে?

জেনি মাথা নেড়ে জানাল সে বুঝেছে।

কিন্তু শিবানীর সন্দেহ গেল না। এতগুলি বাংলা কথা—যতই স্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে ধীরে সে বলে যাক, জেনির পক্ষে বোঝা সহজ নয়। বলল, বলত কি বলেছি?

মিস জেনি ইংরেজিতে শিবানীর কথাগুলি গড়গড় করে বলে গেল।

শিবানী চেয়ার থেকে উঠে একটু ঝুঁকে জেনির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আঃ! চমৎকার—চমৎকার!

জেনি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করল শিবানীর সঙ্গে।

শিবানী চেয়ারে পিঠ ছেড়ে বসে বলল, আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি মিস জেনি। কিন্তু আমার কাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যেন বাংলা বলা ছেড়ে দিও না—বুঝলে?

মিস জেনির কানে শিবানীর পূর্বের কথাগুলি ঢুকলই না। সে একরকম আঁতকে উঠে বলল, কাজ ছেড়ে দেবে তুমি মিসেস সেন! কেনো?

ভালো লাগে না।

না, না তা হবে না—মিস জেনি ব্যাকুলকণ্ঠে বলল। কিসের জোন্য ছাড়বে? মিঃ বোসের জোন্য? লোকটা উত্যক্ত কোরেছে? আমি তাকে ঠিক করে দেবে।

শিবানী বলল, না জেনি, সেজন্য নয়। আমার চাকরী করতে ভালো লাগে না।

বিষণ্ণমুখে জেনি বলল, আমি জানে তুমি ধনী-লোকের স্ত্রী আছো।

হ্যাঁ, সেইজন্যই তো চাকরী করা।

না, আমি বুঝতে পারছে সে জোন্যই তুমি কাজ কোরবে না। দরকার না থাকলে কোরবে কেন। এখনই ছেড়ে দেবে?

না। কবে ছাড়ব ঠিক বলতে পারছি নে।

আমার খুব খারাপ লাগবে তুমি চলে গেলে।

আমারও তোমার কথা খুব মনে হবে— বলেই হেসে শিবানী বলল, এমন দুঃখু-দুঃখু মুখ করে আমরা চিরবিদায়ের সুরে কথা বলছি কেন মিস জেনি বল তো? তুমি আমার ছাত্রী। তুমি যাতে বাংলা বলা ছেড়ে না দাও, ভুলে না যাও— এ যে আমায় দেখতেই হবে। আচ্ছা, মিস জেনি বলত আমার বাড়িতে যদি আমি একটা বাংলার ক্লাশ খুলি তবে কেমন হয়? তুমি ছাত্রী যোগাড় করে আনতে পারবে না?

উৎসাহে লাফিয়ে উঠল মিস জেনি— সে বেশ হবে। অনেক নিয়ে আসব আমি ছাত্রী।

অত উৎসাহ বোধ করো না মিস জেনি, ছাত্রী যোগাড় কাজটা সহজ হবে না। তাদের আসবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে আমাদের। কি করে ওদের উৎসাহিত করা যায় বল তো? যারা নিয়মিত ক্লাশ করবে তাদের ভালো ভালো শাড়ি উপহার দেব আমরা— কেমন হয়?

মিস জেনি হাসিমুখে বলল, শাড়ি! ওঃ, সে বড় সুন্দর উপহার —লোভনীয় উপহার হবে। দেখবে দলে দলে ছাত্রী আসবে তোমার কাছে। আমি তো একদিনও গর-হাজির হোব না। রাঙানো নখে বব চুলের ভেতর হাত চালাতে-চালাতে বলল, কিন্তু এই বব চুলে শাড়ি ভালো লাগে না। খোঁপা করব তোমাদের মতো চুল রেখে। তোমাদের শাড়ি আর খোঁপা দু'টোই ভারি সুন্দর জিনিস মিসেস সেন।

তুমি যেদিন মিস থেকে মিসেস হবে সেদিন তোমাকে খোঁপা বেঁধে বেনারসী পরিয়ে দেবো আমি—

খুশিতে ঝলমল করে উঠল মিস জেনি। বলল, তোমাদের কনে-পোষাক সত্যি বড় সুন্দর। আমিও বিয়ের সময় তোমাদের পোষাক পরব। তুমি করে দেবে—ঠিক?

ঠিক। শিবানী কলম খুলে কাগজপত্র কাছে টেনে আবার কাজে বসবার যোগাড় করতে লাগল।

মিস জেনি টাইপ মেসিনের ভেতর কাগজ ঢোকাতে-ঢোকাতে বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে মিসেস সেন, তুমি আর অফিসে আসবে না।

না মিস্ জেনি—আরো কিছুদিন আমি কাজ করব।

অফিস থেকে ফিরে বেশ তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো শিবানী।

শিবানী এখন নিঃসঙ্কোচে গিয়ে সোজা ইন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে পড়ে। তার বিছানায় শুয়ে পড়ে অনর্গল কথা বলে যায়। অফিস, অফিসার মিঃ বোস, মিস জেনির কথা থেকে দরোয়ানটার বৌর অসুখ, বেয়ারাটা বোকা, ওর দেশের জমি ওর ভাই ঠকিয়ে নিয়েছে, কেরাণী সুধীরবাবুর শালীর গানের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা, কিছু বাদ থাকে না।

উড়বার মুখেই যেমন চড়ুই পাখিগুলি কেবল এ-ডালে, ও-ডালে, সে ডালে উড়ে উড়ে বেড়ায় শিবানীর কথাগুলিও যেন তেমনি মনের সুখে কেবল কথার এ-ডালে, সে-ডালে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ইন্দ্রনাথ অভিনিবেশ সহকারে কখনো সিগারেট টানতে টানতে, কখনো ড্রিঙ্কের গ্লাসে শান্ত চুমুক দিতে দিতে শুনে চলে। হঠাৎ মাঝপথে হয় তো শিবানী হেসে উঠে বলে, কেমন সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেছি আমরা! তাই না?

ইন্দ্রনাথ বলেছে, তোমার কি এতদিন আমাদের সম্পর্কটাকে মিথ্যা মনে হয়েছে?

একেবারে। ইন্দ্রনাথের মাথার লম্বা লম্বা চুল হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে শিবানী বলেছে।

তখন ইন্দ্রনাথকে যেন কিছু আনমনা দেখিয়েছে। আবার বলেছে সে, একেবারেই মিথ্যা মনে হয়েছে তখন আমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটাকে তোমার?

হ্যাঁ, একেবারেই মিথ্যা মনে হয়েছে। শিবানীর এই জবাবের পর সূর্যের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া একখণ্ড কালো মেঘের মতো একটা মেঘের ছায়া যে ইন্দ্রনাথের চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেছে তা শিবানী দেখে নি বা দেখলেও না দেখার ভাণ করেছে। ইন্দ্রনাথের এই পরিবর্তনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় কি ওর মনেই নেই।

ইন্দ্রনাথ বলেছে, আমার ত্রুটি ঘটতে পারে। তখন আবার ফের তোমার আমাদের সম্পর্কটা মিথ্যা মনে হবে।

হাওয়ার শুকনো পাতা ঝরাবার মতো ঘর ভরে কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন শিবানী। বলেছিল, বাঃ, যা-তা বললে সম্পর্ক যা-তা হয়ে যাবে না? চাল-চলন ব্যবহার যত শোভন হবে ততই না সম্পর্ক সুন্দর হবে। মা-বাবা, ভাই-বোনের যে রক্তের সম্পর্ক তাই মিথ্যে হয়ে যায় যদি ব্যবহার না জানে, আর এতো পাতানো সম্পর্ক। যাবে না মিথ্যা হয়ে তুমিই বলো? রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেকে কি লিখেছিলেন জানো? লিখেছিলেন, স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারেরও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে তা জানতে হবে তোমাকে। জানতে হবে স্ত্রীর জীবনযাত্রার বিচিত্র খাদ্য স্বামীকেই যোগাতে হয়। জানতে হবে, স্বামীর ইচ্ছা বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনবোধের সমাপ্তিতেই স্ত্রীর ইচ্ছা বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনবোধের সমাপ্তি ঘটে না। তার মন বলে একটা নিজস্ব মন আছে। সে মনকে পাওয়া বা হারানোর প্রশ্ন আছে—

তোমার মুখস্থ!

কোথায় মুখস্থ! এ কি মুখস্থ বললাম! যেমন যেমন মনে এলো বলে গেলাম। বেশিটাই ভুলে গেছি। আচ্ছা আমি রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা পড়ে শোনাব খন। দেখো কি অপূর্ব চিঠি। জীবনটা সুন্দর করে তোলা যে একটা মস্ত সাধনার ব্যাপার— যেন সেই সাধনার বাণী ঐগুলি।

বাণী মানুষের মনে স্থায়ী কাজ করে বলে তোমার মনে হয়?

ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রেখেছিল শিবানী। আস্তে বলেছিল, হয়।

আমার হয় না। ইন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে বলেছিল।

পাল্টা প্রশ্ন করেছিল শিবানী, বীজ থেকে গাছ হয়?

প্রশ্নটা ধরে উঠতে না পেরে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, বুঝতে পারলাম না প্রশ্নটা।

সোজা তো। বুঝতে না পারার কি আছে। বীজ থেকে গাছ হয় কি না বল না।

হয়।

হলো না। এক কথায় ওভাবে বীজ থেকে গাছ হয় বলা চলে না। মাটি সরেস না হলে বীজ থেকে গাছও গজায় না, ফলও মেলে না। মনীষীদের বাণীও সেই রকম। যে ক্ষেত্রে পড়ে সে ক্ষেত্রটির ওপর নির্ভর করে—কাজ হওয়া, ফল মেলা। কাজেই যদি না আসত তবে মনীষীদের বাণী আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার জিনিস হতো।

আমার জমিটা কি তোমার তৈরি জমি মনে হচ্ছে?

দুষ্টু চোখে মিটি মিটি হেসেছিল শিবানী। বলেছিল, জমি সব সময় তৈরি না-ও পাওয়া যেতে পারে। অনেক সময় তৈরি করে নিতেও হয়।

শিবানী জানে না ইন্দ্রনাথ সেদিন মনে মনে বলেছিল কি না যে, তাই নাও শিবানী। কিন্তু হঠাৎ আদরে আদরে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ শিবানীকে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে আজ শিবানী ইন্দ্রনাথের ঘরে সোজা ঢুকে গেল না। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি নেই। তার মানে ইন্দ্রনাথ এখনও ফেরে নি। মিঃ বোস এসে যে ওর কাজের মনোযোগটা নষ্ট করে দিয়েছিল, তারপর আর শিবানী কাজ করতে পারে নি। গোটক'য় চিঠির জবাব লিখে মিস জেনির হাতে দিয়ে পাঁচটার আগেই চলে এসেছে।

স্নান করল শিবানী গুনগুন সুরে গান করতে করতে। প্রসাধন করল বারান্দায় বসে পিঠে চুলের বোঝা ছড়িয়ে কাচ্চির সঙ্গে গলপ করতে করতে। তারপর একটা বই নিয়ে এসে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে বলল, দে কাচ্চি, আর এককাপ চা দে। আর আলোটা জ্বেলে দিয়ে যা।

কাচ্চি আলোর সুইচে টিপ দিল। নিয়ন আলো বার দুই দপ দপ করে জ্বলে উঠল। শিবানী বই মেলে বসল আর কাচ্চি গেল চা আনতে।

কয়েক পাতা পড়ে চোখ তুলে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল শিবানী। রাস্তার বাতিগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। এবার সন্ধ্যা হলো। হাতের বইটা রেখে উঠে শিবানী গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়ালো। ইন্দ্রনাথ এলে আজও তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। ললিতাদের বাড়ি থেকে দেরি করে এলে প্রতীক্ষারত ইন্দ্রনাথ সেদিন যেভাবে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আর ওর মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো বড় দেওআর কিছু নেই।

কাচ্চি চা এনে দিল।

এতক্ষণে তুই চা নিয়ে এলি!

যেন কেউ শুনে ফেলবে এমনি চুপি চুপি গলায় কাচ্চি বলল, নতুন ম্যানেজারবাবু কোনদিনও চা'র সঙ্গে কিছু খান না। দিলেও ফিরিয়ে দেন। আজ বলে পাঠিয়েছেন কিছু খাবার পাঠাতে। আবদুল বলল, দুপুরে নাকি খাওয়া হয় নি ম্যানেজারবাবুর।

কেন?

তা বলতে পারব না। কিন্তু তোমার বাড়িতে মা কেবল কেকপেটি, বিস্কুট-রুটি— ও সবে কি ভাতের ক্ষিধে মেটে। তোমাদের বাবুর্চি যত রান্নাই জানুক লুচি ভাজতে জানে না। দিলাম আমি চট্ করে ক'খানা লুচি ভেজে। তোমাকে এনে দি মা, গরম দু'খানা?

গরম লুচি যদিও বাসি লুচির মতো লাভ্‌লি নয়, তা—নিয়ে আয় দু'খানা।

লাভলি শব্দটার অর্থ না বুঝলেও ওটা যে প্রশংসাসূচক শব্দ -এটা জানে কাচ্চি। বলল, তোমার যা—কথা মা। বাসি লুচি গরম লুচির চাইতে ভালো এমন কথা শুনি নি।

তুই কি করে শুনবি? রমলাকে চিনিস তুই? তার কথা শুনেছিস তুই?

রমলা গরম লুচির চাইতে বাসি লুচিকে ভালো বলে? এমন মেয়ে তো দেখি নি বাবু।

তুই দেখবি কি করে। এ মেয়ে তো ভগবানের সৃষ্টি নয়। সাহিত্যিকের সৃষ্টি। তাকে দেখতে হলে পড়তে জানতে লাগে—তা সাহিত্যের ভালো লাগা আর বাস্তবের ভালো লাগা সব সময় এক নাও হতে পারে। তাই গরম লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগে নিয়ে আয়।

কাঞ্চি চলে গেল। শিবানী চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ফের গিয়ে চেয়ারে বসল। মনের ভেতরে একটা চঞ্চলতা যেন হঠাৎ আসা-যাওয়া লাগিয়ে দিয়েছিল। লক্ষণটা ভালো নয়। ইন্দ্রনাথের এবার এসে যাওয়া উচিত। এতটা দেরি এর ভেতর আর সে করে নি।

মেমসা'ব— আবদুল এসে সেলাম দিয়ে জানাল, ম্যানেজার সাহেব বললেন সাহেব খবর দিয়েছেন একটু দেরি হতে পারে আসতে।

যা বোঝবার বোঝা হয়ে গেল শিবানীর। কিন্তু এই মুহূর্তে যে ভেতরটা ওর জ্বলে উঠল তা—আর কিছুর জন্য নয়, ইন্দ্রনাথের সাধারণ ভব্যতাটুকুর অভাবে। ম্যানেজারের মুখে খবর পাঠানো! আজ তার মাথায় ফের এসে শয়তান চেপেছে। তাই সাহস হয়নি চিঠি লিখবার। নিজেকে সংযত করে জিজ্ঞাসা করল, ম্যানেজার কোথায়?

আবদুল জানাল, হলঘরে চা খাচ্ছেন।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আবদুল চলে গেল।

শিবানী যে কিছু ভাবতে লাগল তা নয়। চুপচাপ শুধু বসে রইল। একবার কেবল তার মনে হলো কাঞ্চি নিশ্চয়ই আবদুলের কথা শুনেছে। নইলে গরম লুচি নিয়ে আর এলো না কেন। প্রথমে ভেবেছিল ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাবে। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে নিজেই নীচে নেবে গেল সে।

অরুণ তখন সবেমাত্র প্লেট কাছে টেনে খাবার উদ্যোগ করছিল, শিবানীকে দেখে প্লেট থেকে হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর দু'হাত এক করে নমস্কার জানালো।

অরুণের সবিনয় নমস্কারের বিনিময়ে অতি সংক্ষেপে দায়সারা ভঙ্গিতে একটা প্রতিনমস্কার দিল শিবানী। এমন দায়সারাভাবে নমস্কারের বিনিময় কিছুটা অহঙ্কার প্রকাশের জন্যই করল শিবানী। আজকের এই আসাটা তাকে ছোট করছিল। সে বড় হলো।

অরুণকে সে এর আগে দেখে নি। সে শুনেছে নতুন ম্যানেজার বা ইন্দ্রনাথের নতুন পি. এ-র কথা—বাস্, এই পর্যন্ত। এই প্রথম দেখল। দেখে অবাক হল। প্রথম ধাক্কায় অবাকটা অবশ্যি শিবানীর অরুণের পোষাকের উপর দিয়েই গেল। ধুতি, পাঞ্জাবী-পরা চপ্পল পায়ে এমন বাঙালী ছেলেকে ইন্দ্রনাথের ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত দেখবে, এটা আশা করে নি। তারপর অবশ্যি অরুণ ওকে অনেক বিস্মিতই করল।

খাওয়া ফেলে উঠে পড়েছে—আর একটু সময় পার করে আসা উচিত ছিল ওর। কিন্তু ম্যানেজার সাব চা খাচ্ছেন—আবদুলের এ কথা খেয়াল ছিল না। কিন্তু এখন আর----'আচ্ছা, আপনি খেয়ে নিন। আমি পরে আসছি বলে' শিবানীর চলে যাওয়া চলে না। যেভাবে এসে ঘরে ঢুকেছে, ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা না করলে ফিরে গিয়ে ঘুরে এসে আর জিজ্ঞাসা করা যায় না, ও যা জানতে চায়। ও জানতে চায় ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ম্যানেজারের বাড়ি ফেরবার আগে কখন দেখা হয়েছিল। কিছুই না। কোন মানে নেই এ জিজ্ঞাসায়। কোন সম্মান নেই এ জিজ্ঞাসায়। তবু যে শিবানী এটা জানবার জন্যই এসেছে, এ কেবল ওর অধৈর্য চরিত্রের প্রতিক্রিয়া। উত্তেজনা ঘটলে কিছু না করে ও শান্ত থাকতে পারে না। কাজটা আত্মমর্যাদায় বাধছে, তাই আত্মমর্যাদাকে সে অহঙ্কারের বর্ম দিয়ে আবৃত করে রেখেছে।

অবহেলার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ সেনের সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়েছে?

আমি বাড়ি আসবার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলাম অফিসে।

আপনি কখন বাড়ি এসেছেন?

আধঘণ্টা হবে।

মিঃ সেন আপনাকে যে সংবাদ আমায় দিতে বলেছিলেন সে সংবাদটা নিজে গিয়ে না দিয়ে বেয়ারাকে দিয়ে বলে পাঠালেন কেন?

অরুণ সোজা হয়ে পাঞ্জাবীর দু'পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, সেজন্য আমি সত্যি দুঃখিত।

মিঃ সেন কোথায়?

আমি যখন এসেছি তখন পর্যন্ত অফিসে ছিলেন।

এ পর্যন্ত একরকম ছিল। এবার মাত্রজ্ঞানকে একেবারেই জলাঞ্জলি দিল শিবানী।

মিঃ সেন এখন কোথায় গেছেন আপনি বলতে পারেন?

অরুণ চুপ।

তার মানে অরুণ জানে কিন্তু বলতে দ্বিধা করছে? খুবই স্বাভাবিক। শিবানী গম্ভীর গলায় বলল, আপনি জানেন কি—তিনি কোথায় গেছেন? জানলে বলুন। যেন গলার গাম্ভীর্যের চাপে অরুণের দ্বিধাকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইল।

কিন্তু অরুণ তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এর মানে কি? অরুণের না বলাটা দ্বিধা নয়? সে জানে কিন্তু বলবে না—এই বোঝাতে চায় সে? মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলে উঠল শিবানীর। কঠিনকণ্ঠে বলল, আমি জানতে চাইছি—আপনি বলুন। যেন আদেশ করল শিবানী।

এবার এতক্ষণে খুব স্পষ্ট করে শিবানীর দিকে একবার তাকাল অরুণ। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শান্তগলায় বলল, তা হয় না।

তা হয় না!! উত্তরটায় যেন জমে গেল শিবানী। বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল অরুণের দিকে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপরই দৃঢ়পায়ে বাইরের দিকে যেতে যেতে আদেশ করল অরুণকে, আসুন আমার সঙ্গে—রাস্তায় এসে ট্যাক্সি করবে—শরীরের গতিতে এ জোর নিয়ে আঁচলটা শক্তমুঠিতে ধ'রে হল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল শিবানী।

কিন্তু থামতে হ'লো তাকে, গাড়ি-বারান্দায় ইন্দ্রনাথের প্রকাণ্ড ডিম্‌লাবটা। আজ নিজের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়েছেন ইন্দ্রনাথ। প্রশস্ত গাড়ি-বারান্দার সিঁড়িগুলি টপ টপ করে নেমে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে অরুণকে বলল, আপনি গিয়ে উঠে বসুন। মিঃ সেনকে বিশেষ জরুরি দরকার আমার। আমায় সেখানে নিয়ে যাবেন।

অরুণ এতক্ষণ কিছুই বুঝছিল না। কেবল নীরবে শিবানীকে অনুসরণ করছিল। এবার নির্দেশ শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু দাঁড়াবার সময় ছিল না। ড্রাইভার ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছে। শিবানী উঠে বসেছে। অরুণকেও সামনের আসনে গিয়ে উঠে বসতে হলো।

ড্রাইভার গাড়ি বের করে এনে জানতে চাইলো কোথায় যাবে।

শিবানী অরুণের পেছনের দিকে একলক্ষ্যে তাকিয়ে থেকে আদেশ করলে, বলুন কোথায় যাবে।

এক মুহূর্ত—

তারপরেই ড্রাইভারের আসনের দিকে সরে আসতে আসতে অরুণ বললে, আপ উতার জাইয়ে লালাজী। হাম্ চালায়েঙ্গে।

॥ ১৩ ॥

এক এক সময় যেমন ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হয়— তার স্পিডোমিটারের কাঁটাটা একলাফে গিয়ে শত সংখ্যায় দাঁড়িয়ে গতির চাপে থরথর করে কাঁপতে থাকে— চিন্তারও তেমনি এক একটা সময় এসে উপস্থিত হয় একটানে গতি বাড়িয়ে দেওয়ার। তখন সময় থাকে না সময় নিয়ে ভাবতে বসবার। অরুণের এখন সেই অবস্থা। ড্রাইভার রাস্তায় গাড়ি বের করে এনে জানতে চাইছে, কোথায় যাবে।

শিবানী ওকে বলতে বলছে, বলুন কোথায় যাবে। কিন্তু কোথায় যেতে বলবে অরুণ?

অরুণ কি আগরওয়ালার রডন স্ট্রীটের সুরম্য ফ্ল্যাটে নিয়ে হাজির করতে পারে শিবানীকে!

নির্জন সাহেবপাড়ার নির্জনতম কোণে—চারিদিকের বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে নয়তলা বাড়ির সর্ব-উপরতলার সুসজ্জিত রম্য ফ্ল্যাটটি মিঃ আগরওয়ালার। বসে বসে প্রতি মাসে হাজার টাকা করে ভাড়া আর তিন শ'টাকা করে বেয়ারাদের মাইনে গোণে আগরওয়ালা। সজ্জিত বাড়ি খালি পড়ে থাকে। বেয়ারাগুলি ঝক্‌ঝকে শোফাশেটির উপর ঝাড়ন বুলায় আর হাই তোলে, ঘুমায়। কিন্তু আগরওয়ালাকে যারা চেনে, তারা জানে ব্যবসার

মূল চাবিকাঠিই হলো আগরওয়ালার এই ঘর। লিফটের অটোমেটিক চাবি টিপে উঠে এসে এঘরে আপ্যায়িত হয়ে ফের লিফটের অটোমেটিক চাবি টিপে নেবে যান যাঁরা, তাঁদের হাত দিয়েই অটোমেটিকভাবে মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক লোন এসে যায় আগরওয়ালার হাতে। এসে যায় মোটা অঙ্কের কনট্রাক্ট। ইনকাম ট্যাক্সের লক্ষের ঘরের নোটিশ, আদায়ের বেলা নেবে আসে দশ-পাঁচ হাজারে। আগরওয়ালা বলে এটা তার লক্ষ্মীর ঘর। তারপর মুচকি হাসি হেসে বলে, মা-লক্ষ্মীদের রাখি কি না, তাই পূজাটা ভালই পাওয়া যায়। প্রায় যা চাওয়া যায় তাই মিলে যায়।

ইন্দ্রনাথের ব্যবসার একটা সোল এজেন্সি আগরওয়ালার চাই। সে চাওয়াটাও তাকে তাই ইন্দ্রনাথকে এ ঘরে এনেই চাইতে হবে। সেদিন মদের বাক্স ভেট দিয়ে গোড়াপত্তন করে এসেছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করে আসছে ইন্দ্রনাথকে তার রডন ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে আনার। কিন্তু ইন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করছিল তাকে। 'এ সব আর নয়' এ মনোভাব দিয়ে পুরো না হোক, একটা না, না, না—দিয়ে যে ইন্দ্রনাথের অন্তরটা ভরা ছিল অরুণ তা জানত। কারণ অরুণকেই ফোন করে আগরওয়ালাকে বলতে হয় ইন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ গ্রহণের অসমর্থতার কথা। কিন্তু আগরওয়ালা অত সহজে হার মানবার লোক নয়। যদি তাই হতো তবে তিন তিনবার ব্যবসায় গণেশ উল্টিয়ে ফেলেও আবার এমন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না।

শান্তা কাউল—খাস কাশ্মীরী মেয়ে। মেয়ে নয় যেন কাশ্মীর উপত্যকার আপেল। মাটিতে পড়ে-থাকা আপেল একটা। আগরওয়ালা যখন এই শান্তাকে নিয়ে ইন্দ্রনাথের অফিস কামরায় সেদিন ঢুকেছিল তখনও যেন তার গোলাপী রং-এর গালে, গলায়, শরীরে কাশ্মীরের গ্রামের মাটি মাখা ছিল। আগরওয়ালা যেন স্নানটাও করতে দেয় নি শান্তাকে —পাছে মাটি ধুয়ে গিয়ে চেহারার বন্যতা চলে যায়। সদ্য মাটি থেকে তুলে আনার চিহ্ন নষ্ট হয়ে যায়। পোষাকও ছিল অপরিচ্ছন্ন। তার পরা সালোয়ার পাঞ্জাবী দু'টোই ছিল ময়লা। গায়ের পাঞ্জাবীটা একেবারে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে ছিল ঘামে ভিজে। বুকের দু'পাশে ঝুলছিল দু'টো লম্বা লম্বা বেণী। সে দু'টোও যেমন উসকো তেমনি ধুলোবালি জর্জরিত। যেন তিন চার দিনের ট্রেনের পথ চলার ধুলো আর কয়লার গুঁড়ো তার মাথায় জমে আছে। একদিন বেণী খোলা হয় নি। চিরুণী পড়ে নি। পোষাক বদল হয় নি।

এয়ার কণ্ডিশন কামরার দরজা ঠেলে আগরওয়ালা যখন এ হেন মাটিমাখা শান্তাকে নিয়ে ইন্দ্রনাথের তকতকে ঝকঝকে অফিস কামরায় প্রবেশ করল তখন বিস্মিতই হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। সে তখন সবেমাত্র এক লাঞ্চপার্টি থেকে ফিরেছে। বিদেশীদের সঙ্গে পার্টি ছিল। তাই সাধারণত লাঞ্চে যতটা ড্রিঙ্ক করে তার চাইতে কিছুটা বেশিই হয়ে গিয়েছিল ড্রিঙ্ক করাটা। ইন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টিতে ঈষৎ লালের সঙ্গে একটা স্বপ্নালু ঘোর মিশেছিল। শান্তার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আগরওয়ালাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করছিলো, কি ব্যাপার মিঃ আগরওয়ালা?

মনে মনে একটু হাসল আগরওয়ালা। শান্তাকে নিয়ে আসবার সময়টা যে আগরওয়ালা লাঞ্চের পর বেছে নিয়েছিল তা কি এমনি এমনি। বিদেশীদের সঙ্গে পার্টি থাকা আর ড্রিঙ্ক করাটা বেশি হয়ে যাওয়া আগরওয়ালার ভাগ্য। কিন্তু লাঞ্চের পর কিছুটা যে নেশাধরা মাথা ইন্দ্রনাথের থাকবেই - এ তার হিসেবের মধ্যেই ছিল। আগরওয়ালা নমস্কার জানিয়ে ইন্দ্রনাথের অর্ধচন্দ্রাকৃতি অফিস-টেবিলের উল্টো দিকে খুশিমনে আসন গ্রহণ করল। তারপর শান্তাকে দেখিয়ে বলল, মিঃ সেন, সদ্য কুলুভ্যালি থেকে তুলে নিয়ে এসেছি একে— এইমাত্র ট্রেন থেকে নামল— বেটি, নমস্কার জানাও বাবুকে।

শান্তা টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ কুঁচকে ছোট করে ইন্দ্রনাথকে দেখছিল—দু'হাত এক করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, নমস্তে জী।

অরুণ ইন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী। সাহেবদের প্রাইভেট জীবনের—অর্থাৎ গোপন জীবনের ভার তো তাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীদের হাতেই থাকে। অরুণ বুঝল ওর উপস্থিতি নিয়ে তাই আগরওয়ালা মাথা ঘামাচ্ছে না।

কিন্তু অরুণ উঠে গিয়েছিল।

আগরওয়ালা শান্তাকে নিয়ে চলে গেলে ডেকে পাঠিয়েছিল ইন্দ্রনাথ আর অরুণ গিয়ে দেখেছিল ইন্দ্রনাথ যেন ক'দিন আগের ইন্দ্রনাথ আর নেই কিন্তু সে কথা অন্য কথা। তা ভাববার সময় নেই এখন অরুণের। এখন

ড্রাইভার ওর দিকে তাকিয়ে আছে, তাকে কোথাও যাওয়ার নির্দেশ না দিলেই নয়। কিন্তু কোথায় যেতে বলবে সে তাকে! রডন স্ট্রীটের ওই ফ্ল্যাটে তো শিবানীকে নিয়ে যেতে পারে না সে! মাথার স্পীডোমিটারের কাঁটা শূন্যের ঘরে পড়েছিল। ভাবনা-চিন্তা না করেই একটানে কাঁটাটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে অরুণ অবশ্যি ড্রাইভারকে বলল, আপ উতার যাইয়ে লালাজী, হাম চালায়েঙ্গে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ড্রাইভার ওর হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে নেবে গেল। অরুণ ফার্স্ট গিয়ারে পা রেখে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি চালিয়েও দিল কিন্তু মানুষের মাথাটা যন্ত্র নয় যে, চিন্তার গতি একবার বাড়িয়ে দিলে সেই একই গতিতে চলতে থাকবে। ফের চিন্তার কাঁটা হাত-পা ছেড়ে অসহায়ভাবে যেন শূন্যের ঘরে ঝুলে পড়ল অরুণের। ড্রাইভারের কাছে নয় মান বাঁচানোর পথ বের করা গেল কিন্তু এখন কোথায় যাবে সে!

জর্জকোর্ট রোডের নিয়ন আলোসজ্জিত মসৃণ পথ চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। এর কত ধারা কত দিকে চলে গেছে। কোন দিকে যাবে সে। যে দিকেই যাক না কেন যাবে সেদিকে? কোথায় গিয়ে থামবে? গাড়ি, ট্যাক্সি আর পথ-চলতি মানুষকে এদিক-ওদিকে পাশ কাটাতে কাটাতে নিরুপায় হাতে ডিমলার গাড়ির বিশাল দেহটা শম্বুকগতিতে চালিয়ে নিয়ে চলতে চলতে ভাবতে লাগল অরুণ।

আর গাড়ির ভেতরে বসে জয়ের অহংকার বোধ করতে লাগল শিবানী। ও জিতে গেছে। ও জিত্‌টা যদি ও অরুণের সঙ্গে না জিততে পারত তবে এতক্ষণে ওর মর্যাদাকে কেওড়াতলার ঘাটে শ্মশানযাত্রায় পাঠিয়ে দিতে হতো। ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়েও ভালই করেছে লোকটি। শিবানী দেখেছে, বেয়ারা-বাবুর্চি-ড্রাইভার এরা যতই ফসিলের মতো মুখ করে থাক—সব বোঝে।

রাস্তার আলো কখনও এসে পড়ছে শিবানীর মুখের উপর, কখনো সরে যাচ্ছে। মনের ভেতরে যেন ওর যুদ্ধ চলছে। এদিকে অরুণের কাছে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দুরন্ত জেদ কাজ করছে, অন্যদিকে নিদারুণ উত্তেজনা বোধ করছে ইন্দ্রনাথের কাছে যেতে। ইন্দ্রনাথকে কোথায় দেখবে কে জানে। কি অবস্থায় দেখবে তাই বা কে জানে। নানা সম্ভাব্য ছবি সে কল্পনায় দেখতে লাগল আর ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় ঠোঁট কামড়াতে লাগল বসে বসে।

আজ শিবানী বড় যত্ন করে সেজেছিল। তার আজকের সান্ধ্য সাজের ভেতর ঐশ্বর্যের উগ্রতা ছিল না, ছিল যুঁই ফুলের শুভ্রতা। ইন্দ্রনাথ সাদা পোষাক একেবারেই পছন্দ করে না— এ খেয়াল তার ছিল। কিন্তু আজকের গোমট গরম আবহাওয়ায় রং যে একেবারেই অচল! এই সাদা দিয়েই আজ ইন্দ্রনাথকে সে মুগ্ধ করবে—এ ইচ্ছাই সে মনে রেখেছিল। সাদা পোষাকের ওপর সাদা মুক্তোর হার পরতে পরতে শিবানী যেন ইন্দ্রনাথের কণ্ঠের 'বাঃ' শব্দটাও শুনতে পেয়েছিল।...

গাড়ি নিয়ে কি অরুণ নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে না ইন্দ্রনাথই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ হলো তো অরুণ চলছেই— কেবল চলছেই। কতবার লাল আলো জ্বলে উঠল দেখে গাড়ি থামল। নীল আলো জ্বললে গাড়ি চলল। কতবার ফাঁকা রাস্তা পেয়ে গাড়ির গতি বাড়ল, কতবার ট্রাম, বাস, মানুষ, রিক্সার ভিড়ে থেমে থেমে এগুলো কিন্তু এমন কোন ঠিকানায় যাচ্ছে অরুণ যে এখনও ঠিকানা মিলল না!

অরুণও বুঝছিল কোন একটা জায়গায় এখন গাড়ি নিয়ে দাঁড় না করালেই আর চলছে না। এভাবে আর কত ঘুরবে। একবার বিরক্তির সঙ্গে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ভাবলে দেবে নিয়ে ছেড়ে আগরওয়ালার ফ্ল্যাটেই শিবানীকে। তারপর যা ঘটে ঘটুক। ওর কি। চাকরী ওর চলে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ওর ট্রেন ধরার কথা ছিল। ইন্দ্রনাথের কাছে আনুগত্যের প্রশ্নই নেই। তবে সে ভূতের মতো ঘুরে মরছে কেন? তা ছাড়া অনেক আগেই অরুণ তার কাজ চলে যাওয়ার কথা বলে শিবানীর হাত থেকেও তো বাঁচতে পারত। যে পথে যাচ্ছিল সে পথ থেকে হঠাৎ মোড় ঘুরে সোজা রডন স্ট্রীটের দিকে চলল অরুণ।

শিবানীকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে সে সোজা হাওড়া স্টেশনে পালাবে। এ আবহাওয়া ওর সইবে না।

রডন স্ট্রীটের অভিজাত সাহেবপাড়ার ফ্ল্যাটে-ফ্ল্যাটে তখন আলো জ্বলছে। শান্ত নির্জন স্তব্ধ পরিবেশ। মনে হয় যেমন জনশূন্য পথ তেমনি বুঝি জনশূন্য বাড়িগুলিও। কেবল বাড়িগুলির আলো বলছে, না মানুষ আছে।

আগরওয়ালার নয়তলা ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে একবার পার হয়ে গেল অরুণ। এখানেই এখন ইন্দ্রনাথ আছে। কিন্তু থামতে পারলে না। গাড়ি থামিয়ে শিবানীকে বলতে পারলে না, সোজা লন পার হয়ে ভেতরে ঢুকে যান। নাম বললেই দারোয়ান আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

না, তা হয় না।

শিবানীকে যে জবাব দিয়েছিল, নিজেকেও সেই জবাব দিতে হলো অরুণের।

আপনি কি আমাকে পথে-পথে ঘোরাচ্ছেন নাকি? শিবানীর তীক্ষ্ণ-কর্কশ কণ্ঠের আচমকা প্রশ্নে একটু চমকেই গিয়েছিল অরুণ।

ক্ষিপ্রগতিতে অপ্রস্তুতকণ্ঠে বলে উঠল, না—না। আমি আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি—

জবাবটা অরুণ কিছু একটা জবাব দেবার জন্য আর এ ছাড়া কিছু বলবার নেই বলেই দিয়েছিল। কিন্তু জবাবটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে একেবারে বিস্মিত আনন্দিত করে দিয়ে একটা বাড়ি ভেসে উঠল ওর চোখের উপর। এতক্ষণ যে কেন শিবানীকে ওখানে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেবার কথা মনে হয় নি, বুঝেই উঠতে পারলে না অরুণ। সে জায়গাটার কথাই তো তার সর্বপ্রথম মনে হওয়া উচিত ছিল। গাড়ি চালিয়ে দিল অরুণ।

শিবানী ওকে না চিনুক, না দেখুক, শিবানীকে অরুণ এই ছ'মাসের চাকরী জীবনে অনেক দেখেছে এবং অনেক দেখা দিয়ে একটা মানুষকে যতটুকু চেনা যায় তা চিনেছে। কার সঙ্গে শিবানীর হৃদ্যতা—কার বাড়ি যেতে, কার সঙ্গে গল্প করতে শিবানী বেশি ভালবাসে সে কথা সে জানে এবং জানে ললিতা তার ভেতর প্রধান। ললিতা এখন যে বাপের বাড়ি এ কথাও অরুণের অজানা নয়। কালকেই কালীনাথকে ওরা নামিয়ে দিয়ে গেছে এখানে।....ইস্ কখন ও শিবানীকে এখানে নিয়ে আসতে পারত।

গাড়ি যেখানে থামল স্তম্ভিত হয়ে শিবানী দেখল সেটা ললিতাদের বাড়ি। অসহ্য রাগে-অপমানে কি যে সে করবে বুঝে উঠবার আগেই ললিতা গাড়ি থামার শব্দে বসবার ঘর থেকে মুখ বাড়ালো। শিবানীকে দেখে দৌড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

নামতে হলো শিবানীকে।

শিবানীর দুই হাত জড়িয়ে ধরে ললিতা বলল, কি সৌভাগ্য আমার। ভাবতেই পারছি না তুমি নিজে নিজে চলে এসেছো।

চলতে চলতে শিবানী বলল, বাঃ। তোমার কাছে আমার জন্মদিনের শাড়িটা রয়ে গেছে না? দিয়েছো সেটা আমাকে? আর পড়ে থাকলে ঠিক এক সময় লোভ সামলাতে পারবে না। পরে ফেলবে। তাই নিয়ে যেতে এলাম।

তুমি শাড়ি নিতে এসেছ? অবিশ্বাসের সঙ্গে বললে ললিতা।

অবশ্যই।

কিন্তু শিবানী এ কথা ললিতাকে বিশ্বাস করাতে পারলে না। সে মাথা নেড়ে বলল, তা কখনও হয়। এমন রমণীয় সন্ধ্যায় এমন রমণীয় সাদা সাজে সেজে মুক্তোর মালা গলায় পরে তুমি বেরিয়েছ—আমার কাছ থেকে শাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য—

শুধু শাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বেরুব কেন। বেরিয়ে ছিলাম, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম—

ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল দু'জনে। ললিতা হেসে বলল, এখান দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে তা আর জিজ্ঞাসা করব না। আরো কিছু আবোল তাবোল বলে বসবে। অপ্রস্তুত অবস্থায় এমনি হয়। এমন কথা বেরিয়ে আসে যে তার জবাব দিতে গিয়ে আরো অপ্রস্তুতের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। নইলে তো দিব্য বলতে পারতে, সেজে-গুজে তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম ললিতা। এমন অবিশ্বাস্য মনে হতো না।

বসল দু'জনে।

শিবানী সত্যি নিজেকে স্বাভাবিক করে ফেলতে পারছিল না।

ললিতা শিবানীর দিকে তাকিয়ে সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলল, কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে যেন তুমি আচমকা এসে পড়েছ—কেউ এনে তোমাকে হঠাৎ এখানে ছেড়ে দিয়েছে।

শিবানী ললিতার সে কথার জবাব দিল না, মাথার ওপর নূপুরের ঝমঝম শব্দ হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করল, নাচছে কে?

সখীরা।

নাটক তো হচ্ছে লক্ষ্মীর পরীক্ষা। তাতে সখীদের নাচ কোথায়?

ওরা ঢুকিয়েছে। ক্ষিরো যখন রাণী হলো তখন তার রাজসভায় ওরা নাচ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তা রাণীর কাছে নাচ— এ সন্দেশের তবক-মোড়ানো সোনালী-রূপালী পাতের মতো। শোভা বাড়ে বৈ কমে না। তাই আপত্তি করি নি। শিবানী যখন অন্য কথায় চলে গেল, ললিতাও তখন আর ও কথায় গেল না। বলল, বোস, মাদের খবর দিয়ে আসি।

ললিতা চলে গেল।

শিবানীর ভেতরটা যেন অপমানের যন্ত্রণায় জ্বলতে লাগল। ইন্দ্রনাথকে দিয়ে তাড়াবে লোকটাকে। কিন্তু অরুণ যখন এমন বিশ্বস্ত অনুচর ইন্দ্রনাথের, তখন ইন্দ্রনাথ ওর কথা শুনবে কেন। ইন্দ্রনাথের মতো চরিত্রহীন লোকদের সবারই অরুণদের মতো একজন করে অনুচর থাকে। তাদের উন্নতি আরো ধাপে-ধাপে বেড়ে চলে। ইন্দ্রনাথ কখনই তাড়াবে না ওকে। আরো হয় তো পুরস্কৃত করবে অরুণের মুখে ঘটনা শুনে।

॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রনাথের নতুন ম্যানেজারের বাঙালী পোষাক দেখে শিবানী বিস্ময়বোধ করেছিল তখনই। এখন সে বুঝতে পারলো কেন ইন্দ্রনাথের মিশনারী স্কুল-কলেজ পড়া, ইংরেজী নকলে গড়া সুট, টাই, স্যু পরা ম্যানেজারের জায়গায় এমন ধুতি-পাঞ্জাবী-চপ্পল পায়ে দেওয়া ম্যানেজার রাখতেও মন উঠেছে! লোকটা চতুর—এ কথা ইন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছে বলেই পোষাকের এমন অকৌলীন্য মেনে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পূর্বেও জয়ের আনন্দ বোধ করেছিল শিবানী। ইন্দ্রনাথ কোথায় আছে জানতে চাওয়ায় যে লোক বলেছিল, 'তা হয় না'— সেই লোককে শুধু ইন্দ্রনাথ কোথায় আছে বলা নয়, সে যেখানে আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে ওকে পৌঁছে দিতে বাধ্য করেছে শিবানী— মনে হয়েছিল লোকটাকে দিয়ে এটা না করাতে পারলে ওর সম্মানকে কেওড়াতলার শ্মশানযাত্রায় পাঠাতে হতো। লোকটার ঐ জবাবের পর—ও যদি ঘরে গিয়ে ঢুকত তবে মর্যাদার কি কিছু অবশিষ্ট থাকত— কি এর কাছে, কি বাড়ির লোকগুলির কাছে। এখন ইন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে কি হবে না হবে, কি ঘটবে না ঘটবে সে এখন বোঝা যাবে। ঘরে যে তৃতীয় ব্যক্তি থাকবে হয় সে বেরিয়ে যাবে ওকে দেখে, নয়ত ইন্দ্রনাথই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবে ওকে নিয়ে। তারপর বোঝাপড়া ওদের মধ্যে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

কি বোঝাপড়া করত শিবানী ইন্দ্রনাথের সঙ্গে?

জানে না—শিবানী জানে না। শিবানী ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আগে অনেক কল্পনা করেছে। প্রথম প্রথম করেছে প্রেমের। তারপর রাগের, দুঃখের, ক্ষোভের, ঝগড়ার। কিন্তু এত কল্পনার ভেতরও এ কল্পনা তার মনে কোনদিনও উদয় হয় নি যে, ইন্দ্রনাথের পিছু তাড়া করে ছুটছে সে। ভাবতেও পারত না সে কথা। স্বপ্ন দেখলেও শিউরে উঠত ঘৃণায়।

কিন্তু এমনিই হয়—

সবার না হোক, এমন জীবন আছে, যা সে কল্পনা করতে পারে না, ভাবতে পারে না, স্বপ্নে দেখতেও ঘৃণা বোধ করে, ঘটনা তাকে কেবল সে-সবের ভেতরই নিয়ে ফেলে। শিবানী জানে তার অদৃষ্টটা সেই রকম। নইলে যে রুচিগর্হিত কাজ সে কল্পনা করতে পারে না তাই করছিল—তাও একা নয়। একজন অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে জোর করে টেনে সঙ্গে নিয়ে! যেন এ লোকটার যে রুচিবোধ আছে, ওর সেটুকুও নেই। যেন এই যে লোকটা বুঝছে এ ভাবে গিয়ে উপস্থিত হওয়াটা নিতান্ত কুরুচির পরিচয়—শিবানীর সে বোধটুকুও নেই। এমনি নিম্নমানের মেয়ে ও।

কিন্তু শিবানী এও তো মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছিল। লোকটা তাও হতে দিল না।

নিজে উঁচুতে উঠল না, ওকে উঁচুতে তুলল লোকটা ওকে ইন্দ্রনাথের কাছে না নিয়ে গিয়ে।

না, এসব কিছু নয়। উঁচু-নীচু সুরুচি-কুরুচি— কিচ্ছু নয়। এগুলি হলো এসব লোকের মোসাহেবি। চাটুবৃত্তি আর চাকরি বজায় রাখা। হাঁটুর উপর তোলা আট হাত কাপড় পরা ফতুয়া গায়ের সরকার হলে, হাত কচলে

ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে-ককিয়ে দয়া প্রার্থনা করে শিবানীর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করত। পঞ্চাশ ইঞ্চি বহরের ধুতি আর হাঁটু- ঝোলানো পাঞ্জাবী-পরা ম্যানেজ'র বলে সে কাজটাই চতুরতার সঙ্গে করলো।

একটু নড়েচড়ে বসল শিবানী, সোফায়।

যদিও ললিতা এইমাত্র শিবানীর সজ্জাটাকে রমণীয় বলতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাটাকেও রমণীয় বলেছে, কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা একেবারেই রম্য ছিল না। একটু হাওয়া নেই। গাছপালা এমন নিথর নিশ্চল যে, সেদিকে তাকালে আকাশটাকেও মনে হয় যেন জমাট বেঁধে আছে। পাখার তলায় বসেও শিবানীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল। অনামনস্ক হাতে ব্যাগ খুঁজল শিবানী রুমালের জন্য। কোলের উপর সোফার পাশে হাতড়ালো। না পেয়ে মনে পড়ল, সে বেরুবার জন্য নেমে আসে নি, নেমে এসেছিল ভেতরের অস্থৈর্যে স্থির থাকতে না পেরে। কোন বিষয়েই সে প্রস্তুত ছিল না, না লোকটার সঙ্গে এ ভাবে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য—না তার সঙ্গে বেরুবার জন্য।

কপালের ঘাম হাতে লাগায় রুমালের কথা মনে হয়েছিল, না পেয়ে ভুলে গেল শিবানী রুমালের প্রয়োজনের কথা। মনে মনে যতই গাল দিক শিবানী লোকটাকে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে পরা-—সরকারের সঙ্গে এক করে, কিন্তু তাতে শান্ত হতে পারল না। মনের গালিতে মনের জ্বালা নিরসন হয় না।

আর হার হারই।

অপরকে ভুল বোঝান সহজ, কিন্তু নিজেকে ভুল বোঝান সহজ নয়।

সে পরাজিত হয়েছে লোকটার কাছে।

অহংকার দিয়ে সম্মান বাঁচাতে গিয়ে অসম্মানের অতল তলায় তলিয়ে গেছে সে।

না, মাথা তোলারই আর উপায় নেই।

ও গিয়ে এখন গাড়িতে উঠবে। লোকটা গাড়ি চালাবে। বাড়ির সিঁড়ি-বারান্দায় নিয়ে গাড়ি দাঁড় করাবে। ও নেমে উপরে চলে যাবে?

সম্ভব?

অসম্ভব! ভেতরের অসহ্য ছটফটানিতে শিবানী উঠে দাঁড়াল। তারপরই আবার বসে পড়ল।

তবে কি করবে?

ও চাকর দিয়ে বলে পাঠাতে পারে অরুণকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে। তারপর ও যে করে হোক যাবে—হোক ট্যাক্সিতে। হোক ট্রামে-বাসে।

আরো হাস্যকর। আরো পরাজয়। আউট হাউসের উপরতলায় ইন্দ্রনাথের পি-এ'র ঘর। সেখান থেকে সমস্ত লন বাগান গাড়িবারান্দা দেখা যায়। অরুণ সেখান থেকে দেখবে, সে ট্যাক্সি থেকে নামছে? নয়ত হেঁটে লন পার হচ্ছে? তার মানেটা কি দাঁড়াবে? রাগ করে ও গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে! হ্যাঁ রাগ। চটে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিতে হলে চাকর দিয়ে বলে পাঠানো যায়। ওকে দিয়ে তপ্ত কণ্ঠে বলতে হয়, চলে যান আপনি গাড়ি নিয়ে এখান থেকে। তাই আদেশ করবে গিয়ে সে অরুণকে। সোফায় হাতের চাপ দিয়ে উঠতে গিয়েও উঠল না শিবানী।

না, বসে থাক।

কথায় বলে, একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর। একা ইন্দ্রনাথেই রক্ষা ছিল না তাতে এমন অনুচর মিলেছে তার। আর ইন্দ্রনাথকে পায় কে!

ইন্দ্রনাথকে পাওয়ার চেষ্টা কি ও করত? করত না। অনেক দিন ধরে তার প্রতীক্ষা করা শিবানী ছেড়ে দিয়েছিল। ওর বিবাহিত জীবনের এই পাঁচ বছরের ভেতর প্রথম দু'বছর প্রতীক্ষা করেছে শিবানী প্রেমের সঙ্গে, আকুলতার সঙ্গে। তারপর কিছুদিন করেছে ধৈর্যের সঙ্গে। তারপর এই তিন বছর ধরে আর করে না। এক সময়ের মুহূর্ত গোণা স্ত্রী আজ আর খেয়ালও করত না কতদিন চলে যাচ্ছে বিনা সাক্ষাতে। কিন্তু আবার প্রতীক্ষা করতে আরম্ভ করেছিল শিবানী। যদিও সে ইন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, নির্ভয়ও হচ্ছিল না। তবু—তবু বড় গাঢ় এবং গভীর অনুরাগ ফের এসে গিয়েছিল শিবানীর সে প্রতীক্ষায়---। ইন্দ্রনাথের ভেতর একটা আকর্ষণী-শক্তি আছে বলেই না শিবানী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাকে ভালোবেসেছিল। বিয়ে করেছিল। যখন ইন্দ্রনাথ দূরে সরে যায় তখন তার করবার কিছু থাকে না। কিন্তু যখন ইন্দ্রনাথ তাকে কাছে টানে তখন —

ঝন্...

মেঝের উপর একগোছা চাবি পড়ার শব্দে একটু চমকেই পায়ের কিউটেক্স মাখা নখের উপর থেকে চোখ তুলল শিবানী।

শিবানীকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে দেখে মেঝে থেকে চাবির গোছা তুলে নিয়ে অপরাধী মুখে ললিতা বলল, সরি!

সরি কেন?

তোমাকে জাগিয়ে দিলাম।

আমি ঘুমোচ্ছিলাম!

ঘুম থেকে নয়। চিন্তা থেকে।

চাবির গোছা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে এসে সোফায় বসল ললিতা। বলল, এর ভেতর আরো তিনবার ঘুরে গেছি।

সত্যি! তবে সরি তুমি বলছ কেন, সরি বলব তো আমি।

ললিতা একটা রুমাল বাড়িয়ে ধরল।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, এটা কি?

রুমাল—

আচ্ছা! বলে হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে রুমাল নিল শিবানী। কপালের ঘাম রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, রুমাল যখন গিয়ে নিয়ে এসেছে, তখন তিনবার না হোক একবার যে অন্তত ঘুরে গেছ— আমি টের পাইনি তা সত্যি।

না, তিনবার। ঘড়ি দেখো। সাতটায় এসেছ। এখন প্রায় আটটা। তোমাকে বসিয়ে রেখে যাবো আর এক ঘণ্টার ভেতর বার তিনেক ঘুরে যাবো না! চা নিয়ে এসেছিল। তাও ফিরিয়ে দিয়েছি। এবার দিতে বলি। ললিতা উঠে গিয়ে চা দিতে বলে এলো।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, তোমার মা বৌদিরা বাড়ি নেই বুঝি?

বৌদি বাড়ি নেই। মা আছেন। কিন্তু পাশের বাড়ির গিন্নী এসেছেন। খুব জমিয়ে দুজনে গল্প করছেন দেখলাম। তাই আর ডাকলাম না। ওঁদের জমাট গল্প নষ্ট হবে—আমাদেরও মাকে মাঝে নিয়ে গল্প জমবে না। চলে এলাম।

চা-খাবার নিয়ে এলে ললিতা চাকরকে যাবার সময় বলে দিল, ড্রাইভারকে চা-খাবার নিয়ে গাড়িতে দিয়ে আসিস মাধু।

শিবানী মুখ খুলতে গিয়েও মুখ শক্ত করে ফেলল। একটুবাদে বলল, চা-খাবার কেন আনলে—

খাবে না?

ইচ্ছে করছে না।

চা-টা? তাও নয়?

আচ্ছা, কেবল চা-টা দাও। সোফা থেকে শরীর তুলে হাত বাড়াল শিবানী।

ললিতা ওর হাতে কাপ তুলে দিয়ে বলল, যোগাযোগের কুমুর একটা ছবিকে নবীন বলেছিল, এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল ঠিক সেই শুভ যোগটি ওই ছবিতে ধরা পড়ে গেছে। আজ তোমাকে ঘুরে ঘুরে দেখে যাচ্ছিলাম আর আমার মনে হচ্ছিল, লক্ষ্মীর প্রসাদ নয় কিন্তু ঠিক তার উল্টো একটা বিদ্যুৎ-খেলানো তলোয়ারের রূপ তোমার মুখের ওপর যেভাবে স্থির হয়ে আছে, এমন দৈবাৎ দেখা যায়। তুমি নাকি বাঁশরি নাটকে বাঁশরির পার্ট করেছিলে। আজ যদি তোমার সেই অভিনয়ের দিন হতো তবে তুমি অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জয় করতে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে খুব মনোযোগ দিয়ে ললিতার কথা শুনছিল শিবানী। সে কথা শেষ করতেই হাতের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের প্রতি আমার এতটুকু লোভ নেই ললিতা। অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার কেউ পাচ্ছে শুনলে আমার হাসি পায়। আমার ধারণা এতবড় ফাঁকির পুরস্কার আর দ্বিতীয় নেই।

কেন! বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল ললিতা।

প্রতিটি মানুষ নিপুণ অভিনেতা। প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সুনিপুণ অভিনয় করে চলেছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নয় কে? তুমি, আমি, ও, এ, সে, সবাই—সবাই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। এর ভেতর কেউ যখন ক'রিল ছবিতে বা থিয়েটারে অভিনয় করে পুরস্কার পায়, তখন আমার হাসি পায়!

তুমি কিন্তু আজ অভিনয়ে উতরোতে পারো নি।

আমি অভিনয় করিই নি। তুমি না হয়ে যদি তোমার বাড়ির আর কেউ বেরিয়ে আসতেন, তবে আমি নিশ্চয়ই অভিনয় করতাম এবং সে অভিনয়ে ভুল ধরার সাধ্য তোমাদের রথী মহারথী পরিচালকদেরও থাকত না। তারপর হঠাৎ ছাদের দিকে চোখ তুলে শিবানী হেসে বলল, নাচের রিহার্সেল এখনও হচ্ছে? অভিনেতৃবৃন্দ ক্লান্ত হচ্ছে না?

এর মধ্যে একবার বিশ্রাম আর অন্তর্বর্তী খাওয়া হয়ে গেছে।

মাধু চায়ের কাপ-ডিস নিতে এসে ফিরে যাচ্ছিল খাওয়া হয় নি দেখে। ললিতা ডেকে বলল, সব তুলে নিয়ে যা। খাবেন না। ড্রাইভারকে চা-খাবার দিয়েছিলি তো?

মাধু জানাল, দিয়েছিল সে, কিন্তু সে খায় নি কিছু।

আচ্ছা যা।

মাধু ডিস-কাপ তুলে নিয়ে চলে গেল।

ত্রয়োদশীর চাঁদটা যেন জানালার কাছাকাছি প্রায় এসে দাঁড়িয়েছিল। যদি ঘরে আলো না থাকত তবে ঘরটা জ্যোৎস্নায় ভরে যেত। বাইরে বোধ হয় হাওয়া ছেড়েছে। জানালার পর্দাটা আগের চাইতে অনেক বেশি উড়ছে। এতক্ষণ ঘরের বাতাসে এতটা উড়ছিল না। বাড়ি যেতে হলেই গাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে—তাই বোধ হয় শিবানী উঠতে পারছিল না। নইলে তার এখন সত্যি কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ললিতার সঙ্গেও না।

ললিতা বুঝতে পারছিল তাই সে চুপ করেই রইল।

একটুক্ষণ বাদে শিবানী বললো, বা, এমন চুপ যে!

কেবল কথা বলতে হবে তার কি মানে আছে?

...তোমার খবর বল। সোফায় পিঠ রেখে একটু গা ছেড়ে বসল শিবানী।

আমার খবর—ললিতা একটু ভাবল যেন। তারপর ঠোঁট উল্টে বললো, কিস্-সু নেই।

একেবারেই কিছু নেই?

না, একেবারেই নেই। এ মাসে একদিন হোটেলে খাই নি। একটা ছবি দেখি নি। একখান নতুন গয়না গড়াই নি। একটা শাড়ি কিনি নি—

খবরের জগৎ তবে তো সত্যি শূন্য দেখছি। বলে একটু হাসল শিবানী। কিন্তু তার মুখের হাসির সঙ্গে যে তার অন্তরের যোগ ঘটল না, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ললিতা চাবির গোছা কোমরে গুঁজে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'অভিনয়ে কিন্তু উতরোতে পারলে না শিবানীদি'। ওবার বলেছিলে, অভিনয় কর নি। এবার আর তা বলতে পারছ না! যত সহজ বলছ, তুচ্ছ বলছ, অভিনয় তত সহজ নয়।

অভিনয় সহজ তো আমি বলি নি। আমি বলেছি, প্রতিটি মানুষ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। আমরা প্রতিটি মানুষ দিনরাত যে অপূর্ব অভিনয় করে চলেছি তার কাছে সিনেমা নাটকের অভিনয়—তার আবার পুরস্কার। বক্তা পরিহাস করছে। তার পরিহাস তো মাঠে মারা যায় নি, আমার হাসি এটুকুই বলতে চেয়েছে তার চাইতে বেশি বলতে চায় নি। যদি চাইত তবে পারত। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে?

চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কেন, তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে যাবে কেন? তুমি ভাবছ আমি মারামারি কাটাকাটি করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি?

না। কাটাকাটি করলে জামাকাপড়ে রক্ত থাকত। তা আমি পৌঁছে না দি না দিলাম। চলো, গঙ্গার পাড়টা একটু গাড়িতে চক্কর খাইয়ে তুমি আমায় পৌঁছে দিয়ে বাড়ি চলে যাবে। অসহ্য লাগছে ঘরের মধ্যে।

শিবানীকে তবু উঠতে না দেখে ললিতা ছেলেমানুষি আব্দারে গলায় বললো, কই উঠছ না শিবানীদি। ওঠ না। তারপর এগিয়ে এসে শিবানীর হাত ধরে টেনে বললো, এমনিতেই আজকাল শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করি। তাতে আজকের গরম যেন দমবন্ধ করে আনছে। একটু বাইরের হাওয়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে এসো না বাপু।

শিবানীকে উঠতে হলো।

আজ তার কপালে যেন কোন কাজ মসৃণভাবে হবে না। ড্রাইভারের বদলে অরুণ তার গাড়ি চালাচ্ছে—এটা স্বাভাবিক নয়। অরুণ যখন ললিতাদের বাড়ি চেনে তখন ললিতাও হয় তো তাকে চেনে—কিংবা হয় তো চেনে না—এ কথাটা বড় নয়। সব চাইতে বড় কথা যেটা, সেটা হলো ললিতার বিস্ময় লাগবে, ড্রাইভারকে চা খাবার গাড়িতে দিয়ে আসবার নির্দেশ তো সে ওর কাছে বসেই দিয়েছে। একে যে চা গাড়িতে এনে দেওয়া যায় না, একথা কেন শিবানী ওকে বলে নি।

ললিতা তো বুঝবে না অবজ্ঞা উপেক্ষা দিয়ে মাথা উঁচু রাখা ছাড়া ওর আর মাথা উঁচু রাখার কোন উপায় নেই।

যাক্ গে— ওদিক থেকে মনটাকে ঘুরিয়ে ফেলল শিবানী। ললিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে কোন রকম অস্বস্তিজনক অবস্থায় ফেলবে না। ললিতার সঙ্গে চলতে চলতে বললো, এমনিতেই হাঁসফাঁস করো মানে?

শরীর ভালো নেই।

কি হয়েছে?

এই—কিছু নয়।

এই বললে শরীর ভালো নেই। আবার বলছ কিছু নয়— ললিতার দিকে তাকালো শিবানী, বাচ্চা হবে?

খোঁজ করো কিছু?

আচ্ছা! এত বড় খবর রয়েছে আর বলছিলে খবর নেই। তাই মার কাছে এতদিন ধরে রয়েছ।

ফের তাকালো সে ভালো করে ললিতার দিকে। বললো, বেশ তো বোঝা যায়, আমারই বোঝা উচিত ছিল।

তাকালে তো বুঝবে। তুমি কি তাকাও আমাদের দিকে?

হাসল শিবানী। তাকাই নে বুঝি! তা ক'মাস হলো?

ছ'।

এতদিন! এ পর্যন্ত তুমি বল নি। কেউ বলে নি? কি অন্যায়!

কেন বলবো? কোন আগ্রহ আছে তোমাদের আমাদের সম্বন্ধে। আমি ছুটে ছুটে যাই বলে তবু আমার সঙ্গে কিছু সম্পর্ক আছে—বলেই ঠোঁট ভারী করল ললিতা, বললো, তাও ভারি। জন্মদিনে নেমন্তন্ন করলাম এলে না পর্যন্ত। সেদিন গিয়ে অফিস থেকে ধরে নিয়ে এলাম—বসলে না পর্যন্ত।

আজ?

আজ তুমি এসেছ কি আর কেউ তোমাকে আচমকা ছেড়ে দিয়েছে আমাদের দরজায়, বুঝতে পারছি নে। তবে আমি যে তোমাকে অনেকটা সময় পেলাম তা ঠিক।

গাড়ির গদিতে পিঠ রেখে সিগারেটের পর সিগারেট টানছিল অরুণ আর গরমে ঘামছিল। ওদের দেখে সোজা হয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসল।

গাড়ির দরজা খুলে ললিতাকে ওঠাল তারপর নিজে উঠে ঝপাং শব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে শিবানী কঠিন কণ্ঠে আদেশ করল, রেড রোড ধরে গঙ্গার ধারে যান।

পুরো কথাটা বাংলায় বলার জন্য তো বটেই, শিবানীর গলার অহেতুক কাঠিন্যেও আশ্চর্য হয়ে ললিতা ড্রাইভারের আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির দিকে তাকাল। অরুণকে সে কালকেই প্রথম দেখেছে কালীনাথকে নামিয়ে দিতে এলে। যদিও অরুণ গাড়ি চালাচ্ছিল না। ড্রাইভারই গাড়ি চালাচ্ছিল। সে গাড়িতে ছিল। কালীনাথের কাছে কালই জেনেছে এই ছেলেটি ইন্দ্রনাথের নতুন পি-এ। আজকের পুরো ব্যাপারটাই ললিতার এতো বোধের বাইরে লাগছে যে, সে একেবারে চুপ করে গেল।

বালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে ভবানীপুর পড়ল তারপর চৌরঙ্গী পার হয়ে অরুণ শিবানীর নির্দেশ অনুসারে রেড রোডে পড়ল। রেড রোডে পড়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি ছেড়ে দিল অরুণ।

গাড়ির ভেতর চুপচাপ বসে রইল দু'জন। ললিতা মুখের উপর উড়ন্ত চুলগুলি দু'হাতে চেপে ধরে বসে রইল। শিবানী তা-ও করলো না। তার খেয়ালও নেই যে, মুখের উপর চুলগুলি অসহ্য নাচানাচি করছে।

ললিতাকে পৌঁছে দিয়ে শিবানী যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি থামতেই দরজা খুলে নেমে পড়ল শিবানী। আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন— তেমনি কঠিন সুরে অরুণকে আদেশ করে বসবার ঘরে এসে ঢুকল সে। ঢুকে ঘরের চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে আনল। ঘরটার চারদিকে না বলে বাড়ির আবহাওয়াটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে আনল বললে ঠিক হয়। যেন নিস্পন্দ বাড়ি। গাছের পাতাগুলির মতো স্থির হয়ে আছে। কোথাও কিছু নড়ছে না।

॥ ১৫ ॥

বাড়িটা যেন নৈঃশব্দ্যের রাজ্য।

শিবানীর মনে হলো ও অরুণকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে এ বাড়ির লোকগুলি তারপর আর নড়ে নি চড়ে নি হাঁটে নি চলে নি। যে যেখানে ছিল সেখানেই প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে!

শিবানীকেও যেন বাড়িটা প্রভাবান্বিত করে ফেলল।

সে-ও বাড়ির লোকগুলির সঙ্গে যেন একীভূত হয়ে গেল। সামনের সোফাটার মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে। অবশ্যি শিবানী এখন আর মোটেই এখানে দাঁড়াত' না। সোজা তার নিজের ঘরে চলে যেত, যদি না—অরুণকে আদেশ করে আসত দেখা করে যেতে। অরুণের চাটুকারিতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে সে তার অপমানের উত্তর দিয়ে যাবে।

ওদিকে শিবানীর দেখা করে যাবার আদেশ শুনে স্টিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল অরুণও।

ক্ষিধেয় সে দস্তুরমতো দুর্বল বোধ করছিল। সকালবেলার চায়ের পর তার অদৃষ্টে আজ এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় খাওয়া জোটে নি। ইন্দ্রনাথ তার ইংরেজ সহযোগীদের সঙ্গে লাঞ্চে বেরিয়ে গিয়েছিল লাঞ্চ টাইমের অনেক আগে। ওর হাতে চাপিয়ে দিয়েছিল অনেক কাজ। ইন্দ্রনাথ ফিরে এলে— তারপর অফিসের ক্যান্টিনে গিয়ে খেয়ে নেবে—এই ছিল অরুণের ইচ্ছে। কিন্তু লাঞ্চ থেকে ইন্দ্রনাথ ফিরে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগরওয়ালা এল মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে। যদিও সে আগরওয়ালার কথার মাঝখানেই উঠে এসেছিল তবু খেতে যেতে পারে নি। আগরওয়ালার উপস্থিতিতেই যদি ইন্দ্রনাথের ওকে প্রয়োজন হয়, যদি ডাক পড়ে, তাই অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। ডাক পড়েছিলও। আগরওয়ালা চলে যেতেই ওর ডাক পড়েছিল। কিন্তু ইন্দ্রনাথের ডাকের জন্য প্রস্তুত থাকলেও, ডেকে যে কথা তাকে ইন্দ্রনাথ বললে সে কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না অরুণ। রিভলবিং চেয়ারটায় ঈষৎ এদিক-ওদিক করতে করতে ইন্দ্রনাথ বললে, মিঃ চক্রবর্তী, আমি আপনার নামে একটা ফ্ল্যাট নিচ্ছি। আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।

কথাগুলির কোন উত্তরের প্রত্যাশা ছিল না ইন্দ্রনাথের দিকে। সে তার কথা বলেই রিভলবিং চেয়ারের এদিক-ওদিক করা থামিয়ে সোজা হয়ে বসে চেক বই-এর উপর কলম নিয়ে উপুড় হয়েছিল।

কিন্তু অরুণ বিস্মিতকণ্ঠে বললে, আমার নামে ফ্ল্যাট! সে বুঝতেই পারলে না কিছু।

ইন্দ্রনাথ মুখটা কিছুটা বিস্তৃত করে বললে, হ্যাঁ। আমার নামে নেবার একটু অসুবিধে আছে তাই আপনার নামেই নিচ্ছি—কি বলেন।

বাস্। এর চাইতে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলে না ইন্দ্রনাথ। বা এক কথা তাকে যে দু'বার বলতে হলো সেটাই বেশি ঠেকল কি না তার কাছে কে জানে, খসখস করে একটা বড় অঙ্কের চেক লিখে পাতাটা বই থেকে খসিয়ে অরুণের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, এই চেকটা নিয়ে আপনি চৌরঙ্গী ম্যানসনে চলে যান—এক্ষুণি। আমার গাড়ি নিয়ে যাবেন।

ইন্দ্রনাথ চেক বাড়িয়ে ধরেছে— চেকটা নিতে হলো অরুণকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, মিঃ স্মিথের হাতে চেকটা দেবেন। তার সঙ্গে যা কথাবার্তা হবার—তা আমার হয়ে গেছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি শুধু চেক দিয়ে বাড়ি ভাড়ার রসিদটা আপনার নামে ঠিকমত কাটিয়ে নিয়ে আসবেন। দেরি করবেন না। এক্ষুণি চলে যান।

কিন্তু এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে অরুণ চলে যেতে পারে নি। আর তাকে যেতে না দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল ইন্দ্রনাথ দারুণ বিস্মিত হয়েছে। ওর নামে ফ্ল্যাট নেবার আগে এই যে ওর মত চাওয়া এ তো আর কিছু নয়—ব্যাপারটা ঠিক আমাদের কারু ঘরে ঢোকবার আগে 'আসছি কিন্তু' বলে ও-পক্ষের সাগ্রহ আহ্বান সম্বন্ধে নিশ্চয় থাকার এবং নিশ্চয় থেকে অনুমতির অপেক্ষা না করে ঢুকে পড়ার মতো। অর্থাৎ শুধু একটু জানান দিয়ে নেওয়া। তার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে অরুণ আদেশ পালন করতে চলে গেছে এ ছাড়া আর কিছু সম্ভবত ইন্দ্রনাথের মনেও আসেনি। তার কাজে লাগার মূল্য যে কি তা বুঝবে না, বুঝে বিগলিত হবে না অরুণ—এত বড় অর্বাচীন ভাবে নি ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের মাথায় তখনও মদের নেশা এবং সে বিষয়ে সে সচেতনও আছে। নিজেকে সংযত রেখে অরুণের দিকে তাকিয়ে ধীরকণ্ঠে বললে, আপনার কিছু বলবার আছে?

অরুণও ইন্দ্রনাথের মতই ধীরকণ্ঠে বললে, ফ্ল্যাটে কে থাকবে?

যেন 'থ' হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ অরুণের কথা শুনে। এমন একটা প্রশ্ন যে অরুণ তাকে করে বসতে পারে, তার ধারণার অতীত। অরুণের ধৃষ্টতায় রাগে, অপমানে, কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে না ইন্দ্রনাথ। কিন্তু ইন্দ্রনাথের চরিত্রে একটা মস্ত প্রশংসনীয় জিনিস আছে, সে সহজে ব্যবহারের ভারসাম্য হারায় না। নেশার মাথায়ও যতক্ষণ বুদ্ধি উপস্থিত থাকে ততক্ষণ সে নিজেকে ঠিক রাখে। নেশার মাথাটা যখন মাতাল কণ্ঠে 'ইউ গেট আউট, ইউ গেট আউট' বলে অরুণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, স্বভাবের অন্য দিকটা তখন তাকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে রাখল। একটু সময় পরে হাত দিয়ে টেবিল দেখিয়ে শুধু বললে, চেকটা রাখুন।

অরুণ চেকটা নামিয়ে রাখল। এ ছাড়া সে করতেই বা পারে কি! প্রথম ধাক্কায় যদিও সে ধরে উঠতে পারে নি, তার নামে ফ্ল্যাট নেবার মানেটা কি। কিন্তু তারপর বুঝতে সময় লাগে নি। আজকাল যত নোংরামির আঁস্তাকুড় তো এই নানা নামে-বেনামে ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটবাড়িগুলিই। ইন্দ্রনাথকে অরুণ মদ খেতে দেখেছে। মাতাল হতে দেখেছে। দেশী-বিলিতি যে মেয়ে যখন চোখে ধরেছে সুযোগ-সুবিধা এবং সম্মতি মিললে কোমর বেষ্টন করে তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে দেখেছে। কিন্তু ফ্ল্যাট ভাড়া করে তাতে মেয়ে নিয়ে তোলা! ইন্দ্রনাথ কি আরো নীচে নামছে! যে লোক দু'দিন আগেও আগরওয়ালার ফ্ল্যাটে যাওয়া প্রত্যাখ্যান করেছে, সে আজ নিজে ফ্ল্যাট নিচ্ছে! আগরওয়ালা এই যে আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, তার এটা তবে এই জয়ের হাসি! ইন্দ্রনাথ যখন ওর হাতে চেক দিয়ে মিঃ স্মিথের কাছে গিয়ে কি করতে হবে না হবে বলছিল তখন অরুণ এ কথা-গুলিই ভাবছিল। শিবানীকে সে খুবই কম দেখেছে। তবু তার চোখের উপর হঠাৎ কিছুদিন যাবৎ শিবানীর শাড়ির উড়ন্ত আঁচল আসতে-যেতে যে খুশি ছড়িয়ে যাচ্ছিল তা ভেসে উঠল। ইন্দ্রনাথের আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হবার সংবাদটা যে সে নিজে গিয়ে দেয় নি তার কারণও কিছুটা এই। শিবানীকে সংবাদটা দিতে খারাপ লাগছিল তার। বেদনাবোধ করছিল সে।

চেক ফিরিয়ে দেওয়ার ফলাফল কি হবে অরুণ জানত না। তবে ভাল কিছু যে হবে না, সে তো নিশ্চয়ই। অরুণ দেখল ইন্দ্রনাথ কলম তুলে নিল। আর একটা চেক লিখল তেমনি একটানে। তারপর চেকটা ফস্ করে একটানে ছিঁড়ে নিয়ে অরুণের হাতে দিয়ে বললে, আজ মাসের দশদিন। কিন্তু পুরোমাসের মাইনেই আমি আপনাকে দিলাম। মিঃরায়কে আপাতত আপনার হাতের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন—আচ্ছা।

নিজের কামরায় এসে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল সে। চাকরীটা যাওয়ায় খারাপ ভালো কিছুই লাগছিল না তার। চাকরী একটা গেছে আর একটা হবে। আমাদের দেশের চাকরীর বাজারটাকে কি এতই সুলভ ভাবছিল অরুণ? না, তা ভাবছিল না। বরং দুর্লভ যে কত, সে কথা সে জানে। কিন্তু ওর সবুর সইবে। বিয়ে করে নি। মা, ভাইবোনের বৃহৎ পরিবারের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বাবা চোখ বোজেন নি। বরং বোন ক'টার ভালো বিয়ে দিয়ে, মার ষোড়শ শ্রাদ্ধ নিজ হাতে করে এবং নিজের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থার সঙ্গে উপরন্তু ওর জন্য গোটা দুই বাড়ি রেখে চোখ বুজেছেন। বড় রকমের কিছু নয় কিন্তু এখন পর্যন্ত একার পক্ষে যথেষ্টেরও বেশি সংস্থান রয়েছে ওর। তাই চাকরী যাওয়া নিয়ে সে কিছু ভাবছিল না। তবু সে কিছু ভাবছিল। মিঃ রায়কে ডেকে কাজ বুঝিয়ে দেবার আগে সে যে কেন এতক্ষণ চুপ করে বসে রইল তা অরুণের কাছেও স্পষ্ট নয় কিন্তু সে যে অনেকক্ষণ চুপ করে

বসেছিল তা সত্য। দীর্ঘদিন বাদে অবশ্য ওর এখনকার এই ভাবনাটা হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠে ওকে ভীষণ অবাক করে দিয়েছিল কিন্তু সে অনেকদিন পরের কথা—অনেকদিন পরে হবে। এখন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে তারপর মিঃ রায়কে ডেকে সে তার হাতের কাজ বুঝিয়ে দিল। মিঃ রায় অনেক দিনের লোক। পাকা লোক। কেবল বললেন, আপনার একাজ যে বেশিদিন টিকবে না আমি জানতাম। একটা ভালো এম-এ ডিগ্রী রয়েছে—-কোথাও প্রফের্সারি নিয়ে, বইপত্তর নিয়ে থাকুন গিয়ে। মনের সুখে থাকতে পারবেন মশাই। যার যে কাজ।

মিঃ রায়কে কাজ আর কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতেই পাঁচটা বেজে গেল। এর ভেতর আর তার খাওয়ার কথা, ক্ষিধের কথা মনেও পড়ে নি। এখন যখন পড়ল তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সবাই চলে গেছে। ক্যান্টিন প্রায় বন্ধ হবার মুখে। আর ক্যান্টিনে গিয়ে বসে খাবার ইচ্ছেও তার ছিল না। অরুণ যখন অফিসের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে—ইন্দ্রনাথ তখন নিজের গাড়ি বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে আগরওয়ালার গাড়িতে উঠছে। অরুণকে দেখে ইন্দ্রনাথ যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। যাকে অঙ্গুলী হেলনে এইমাত্র তাড়িয়ে দিয়েছে, তাকে দেখে অপ্রস্তুত —ইন্দ্রনাথ গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাড়ি যাচ্ছেন? বেশ, তবে—মিসেস সেনকে গিয়ে বলবেন, আমার ফিরতে আজ একটু দেরি হতে পারে।

এই সংবাদটা শিবানীকে দেবার ইন্দ্রনাথের কোন প্রয়োজন ছিল না; ইচ্ছেও ছিল না। কিংবা তার চাইতে বলা ভালো—সাহসই ছিল না। কিন্তু ওই যে সাহস ছিল না তাই সাহস দেখাল সে অরুণের কাছে। অরুণের কাছে কেন দেখাল? কারণ ওরই কাছে যে অপ্রস্তুত বোধ করছিল সে।

অরুণ মনে মনে হেসেছিল। মানুষের অহমিকাটা কি অদ্ভুত জিনিস!

বাড়ি এসে স্যুটকেশ জিনিসপত্র গুছিয়ে একটা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগে টুকিটাকি ভরে রেখে সে গিয়েছিল শিবানীকে খবরটা দিতে এবং কিছু খেয়ে নিতে। খেয়ে নিয়েই সে বেরিয়ে পড়বে পুরীর গাড়ির উদ্দেশ্যে। ঠিক ক'টায় গাড়ি ও জানে না। তবে সন্ধ্যার পর আটটা-টাটটার গাড়িটা ছাড়ে এটা সে জানে। তার ঢের সময় আছে। এখন তার সব আগে দরকার কিছু খেয়ে নেওয়া।

কিন্তু ওকে খেতে দিল না শিবানী। মুখের গ্রাস নামিয়ে সামনের খাবার ফেলে ওকে উঠে যেতে হলো শিবানীর সঙ্গে। তারপর চা-খাবার আর একবারও এসেছিল তার ভাগ্যে। ললিতা পাঠিয়ে দিয়েছিল গাড়িতে। সে তখন অসহ্য গরমে গাড়িতে টিকতে না পেরে রাস্তায় নেমে পায়চারি করছিল। আর ক্ষুধার তাড়নায় বিশ্বের খাদ্যবস্তু চোখের উপর প্রত্যক্ষ করছিল এমন অবস্থায় হাতের কাছে খাবার— কে ড্রাইভার ভেবে গাড়িতে খাবার পাঠাল, আর গাড়িতে বসে খেতে দেখে কারা ওকে ড্রাইভার ভাবল এ নিয়ে মাথা ঘামাত না অরুণ। সে ঠিক খেয়ে নিত। কিন্তু মুশকিল হলো, এই যে আরো ক'টা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তার ড্রাইভাররা নেমে এখানে-ওখানে বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে—তারা কেউ ওকে ড্রাইভার ভাবছে না। এইমাত্র একজন এসে ওকে সা'ব সম্বোধন করে একটা ইংরেজী ঠিকানা পড়িয়ে নিয়ে গেছে। এ অবস্থায় সা'ব তো বাইরে গাড়িতে বসে খাবার খেতে পারে না।

সমস্ত দিন অনাহারে দুর্বলবোধ করছিল অরুণ। এ-বাড়ির ব্রেকফাস্টটা অত্যন্ত ভালো তাই বিকেল পর্যন্ত একরকম চলছিল কিন্তু এখন আর চলছে না। শিবানী ওকে তার সঙ্গেই দেখা করবার আদেশ করে গেলে অরুণের মনে হলো যাবে না। গাড়ি থেকে নেমে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকবে। স্যুটকেশ আর ব্যাগ তুলে নিয়ে চলে যাবে সোজা হাওড়া। তারপর এ-পরিবারের সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাত ঘটবার কোন কারণ নেই। অত্যাচারের একটা সীমা আছে। হ্যাঁ, ও পালাবে। পুরী এক্সপ্রেস চলে গেছে—তা চলে যাক। পুরী প্যাসেঞ্জার তো রয়েছে। ওটাতেই উঠে পড়বে সে।

গাড়ি থেকে নেমে সে তার আউট-হাউসের দোতলায় নিজের ঘরটার দিকেই তাকাল। কিন্তু স্যুটকেশ হাতে নিয়ে সে পালিয়ে যাচ্ছে—দৃশ্যটা কল্পনা করতেই তার ভারি হাসি পেয়ে গেল। যদি শিবানী দেখতে পেয়ে, এই দারোয়ান, উস্‌কো পাকড়ো পাকড়ো বলে চেঁচিয়ে ওঠে!

হেসে ফেলল অরুণ।

দৃষ্টিটা ঘরের ভেতর ছড়িয়ে দিয়ে অরুণ গিয়ে দাঁড়ালো শিবানীর সামনে।

শিবানী নিজেও দাঁড়িয়েছিল। অরুণকেও বসতে বললে না। চোখ-মুখ বিদ্রূপে শাণিয়ে তুলে বললে, আপনার মতো বিশ্বস্ত অনুচর মিঃ সেনের আর ক'জন আছেন বলতে পারেন?

শিবানীর কথা শুনে অরুণের চোখের দৃষ্টিটা যে-রকম হয়ে উঠতে চাইছিল এবং যেভাবে গিয়ে সে দৃষ্টি শিবানীর মুখের উপর পড়তে চাইছিল তা সংবরণ করল অরুণ। যেমন ছড়ানো ছিল দৃষ্টিটা তেমনি ছড়ানো রেখেই বললে, আমি নতুন এসেছি তাই বলতে পারছি নে।

তবে পুরোনো হোন। জানুন। জেনে আমাকে বলবেন। আমি সবাইকে পুরস্কৃত করব। আর তার প্রথম পুরস্কারটা হবে আপনার প্রাপ্য।

বিশ্বস্ততার প্রথম পুরস্কার আমি থাকতে আর কারুর পাবার উপায়ও নেই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে পুরস্কার নেবার সৌভাগ্য আমার হলো না।

এমন অভিব্যক্তিহীন মুখে এবং কণ্ঠে অরুণ কথাগুলি বললে যে, সে পরিহাস করলে, না সত্য সত্য বললে বোঝাই গেল না। অরুণের অবশ্যি আরো একটু ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল বলে, আমার দুর্ভাগ্য, আপনার হাত থেকে সে পুরস্কার নেবার সৌভাগ্য আমার হলো না। কিন্তু 'আপনার হাত থেকে' কথাটা সামলে নিল। শিবানীর শাণান বিদ্রূপের উত্তরে যে বিদ্রূপ করবার তীব্র বাসনা তার জেগেছিল, সে বাসনাকে কিছুক্ষণ পূর্বে চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠা সংবরণ করার মতোই, সংবরণ করলে।

অরুণের কথা শুনে তখন কিন্তু শিবানীব চোখের কোণে বিস্ময় দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে বিস্ময়টাকে সে স্পষ্ট হতে দিলে না। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, কেন হবে না?

মিঃ সেন আমাকে জবাব দিয়েছেন। আমি চলে যাচ্ছি।

এবার শিবানীর দু'চোখের এ-কূল-ও-কূল দুকূল ছাপিয়ে যতটা বিস্ময় দুলে উঠতে চাইল ততটা বিস্ময় ফুটতে দিলে না সে। বিস্ময়ের পাশে বিদ্বেষও বজায় রেখে গম্ভীরকণ্ঠে বললে, আপনাকে, জবাব দিয়েছেন মিঃ সেন?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি যদি আপনার কাজ করতাম তবে ডেকে কথা না বলে এক্ষুণি আমাকে তাড়াতেন।

তাঁর নির্দেশ শোনেন নি আপনি?

আমার পক্ষে শোনা সম্ভব ছিল না।

শিবানীকে নীরব দেখে অরুণ বললে, কাজ দিয়ে আপনাকেও সন্তুষ্ট করতে পারলাম না, মিঃ সেনকেও না; সেজন্য আমি সত্যি দুঃখিত।

মিঃ সেনকে কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট কেন যে আপনি করতে পারলেন না সেটাই তো আমার আশ্চর্য্য ঠেকছে। এতক্ষণ তো তাঁর খুশী হওয়ার মত অনেক কাজ করলেন আপনি, আমি দেখতে পেলাম। কি নিয়ে মিঃ সেনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন আপনি?

অরুণ চুপ।

শিবানী বুঝলে এ জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে না। যেমন মেলেনি ইন্দ্রনাথ কোথায়, সে জিজ্ঞাসার জবাব। অপমানটা আবার আঘাত করলো। আবার দু'চোখে বিদ্বেষ ঘনিয়ে এলো। কঠিনকণ্ঠে বললে শিবানী, আপনি প্রথমেই বলেন নি কেন আপনার চাকরী চলে যাবার কথা?

আজ মাসের দশ তারিখ। মিঃ সেন মাইনে দিয়েছেন পুরো মাসের। আমি এখনও আপনাদের কর্মচারী। যতক্ষণ আছি যা আদেশ করবেন অবশ্যই আমাকে তা পালন করতে হবে।

না, এ লোকটার সঙ্গে সে পারলো না। ভেতরটা হতাশায় যেন হাত পা ভেঙে পড়ল শিবানীর। এর সঙ্গে আজ তার পুরো হার রয়ে গেল। কিন্তু মুখে সে রূঢ়কণ্ঠেই বললে, আচ্ছা, যেতে পারেন আপনি।

অরুণ চলে গেল।

শিবানী দেখল বারান্দায় বেরিয়েই অরুণ হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে নিল।

নিজের ঘরে এসে বসে ভাবলে শিবানী অরুণ এমন কি কাজে আদিষ্ট হয়েছিল যে সে আদেশ পালন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না?

ইন্দ্রনাথ কি হুকুম করেছিল তাকে?

কি কাজ করাতে চেয়েছিল সে তাকে দিয়ে?

ও জানে না। অরুণ ওকে বলে নি।

কিন্তু তবু সে কথা জানে শিবানী। ঘটনার ইতিবৃত্তি না জানলেও বোঝা যা যায় তা জানার চাইতে এতটুকু কম হয় না। একটি ভদ্র ডিসেন্ট ছেলের পক্ষে কিছুতেই করা সম্ভব নয় এমনি কিছু করতে বলেছিল নিশ্চয়ই ইন্দ্রনাথ অরুণকে।

স্বামীর লজ্জায়, নিজের লজ্জায় কেমন যেন ছোট লাগতে লাগল শিবানীর নিজেকে অরুণের কাছে। ওরা দু'জনই যেন ভীষণ নীচ প্রমাণিত হয়ে গেছে তার কাছে। অনুচরবৃত্তি আর নির্বিচার আজ্ঞাপালন অরুণের দ্বারা সম্ভব হয় নি বলেই যে তার পক্ষে সম্ভব হলো না ইন্দ্রনাথের চাকরী বজায় রাখা, এ বুঝতে আর শক্তটা কি।

হায় ভগবান! বিশ্বস্ত অনুচর, সহচর বলে গালাগাল করে, বিদ্রূপ করে এই লোকটাকে অপমানিত করতে গিয়েছিল সে!

এতক্ষণ শিবানী ভাবছিল তাকে নাজেহাল করেছে অরুণ। এখন ভাবলে অরুণকে নাজেহাল করেছে সে। লোকটার চাকরী গিয়েছে। কে জানে বেচারার বাড়ির অবস্থা কেমন। হয়ত মনে উদ্বেগের অন্ত নেই। কাচ্চি বলেছিল, ম্যানেজারবাবুর সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি। নিশ্চয়ই মনের অবস্থা এমন যে লোকটা খেতে পারে নি। তারপর সমস্ত দিন শেষে এসে খেতে চেয়েছিল—খাবার প্লেট সামনে টেনে মুখে খাবার তুলেছিল মাত্র। ও তাকে প্লেট থেকে টেনে তুলে নিয়ে গেছে। ললিতাদের বাড়িতে গাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দিতে দেখেও মুখ খোলে নি। সে খাবার ফেরৎ আসতে দেখেও নীরব থেকেছে। জেনেশুনে ক্ষুধার্ত লোকটাকে নিষ্ঠুরের মতো উপোস রেখেছে—আজ সে নীচতার শেষ সীমায় চলে গিয়েছিল যেন। লোকটা আজ সমস্ত দিন উপোসী— ভেতরটা ব্যস্ত হয়ে উঠল শিবানীর। কাচ্চিকে ডাকল সে। কাচ্চি এলে বিরক্তভরা কণ্ঠে বললে, তোরা সব কোথায় রয়েছিস? দেখাই নেই? রাত দশটা বাজে— খাওয়া-দাওয়া হবে না?

তোমাকে খেতে দিতে বলব?

হ্যাঁ বলবি ম্যানেজারবাবু কোথায় খায়?

তাঁর ঘরে।

তাঁর খাবার দেওয়া হয়েছে?

দেখে আসছি।

একটু বাদে ফিরে এসে কাচ্চি জানাল, ম্যানেজারবাবু চলে গেছেন।

চলে গেছেন!

হ্যাঁ। স্যুটকেশ ব্যাগ কিছু নেই।

খেয়ে গেছেন?

না। বাবুর্চি বলল সে খাবার নিয়ে গিয়ে দেখে ম্যানেজারবাবু নেই।

শিবানীর মনে হলো, বিশ্বের জনারণ্যে যেন একটি খাঁটি লোক কাছে পেয়েও আবার হারিয়ে ফেলল। আর একে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

॥ ১৬ ॥

মা তুমি না খাবে বলছিলে। কাচ্চি বলল শিবানীর অন্যমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে।

খাবো।

খাবার দেওয়া হয়েছে।

শিবানী উঠে দাঁড়াল।

মাথার কাঁটাগুলি টেনে টেনে ড্রেসিং-টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে খোঁপাটা খুলে ফেলল। বোধ হয় কাঁটাগুলি আলগা হয়ে গিয়ে ঘাড়ে-মাথায় ফুটছিল। নইলে খোঁপা খুলবার কোন দরকার ছিল না। খোলা খোঁপা ফের

হাতে জড়িয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাচ্চি দেখল শিবানী ছাদের দিকে যাচ্ছে। বুঝল ওর কথা শিবানীর কিছুই কানে যায় নি। খাবো—উত্তরটা একটা যান্ত্রিক উত্তর মাত্র।

শিবানী ছাদে উঠে গেছে নিশিতে-পাওয়া লোকের মতো। তার মাথা এখন চিন্তা দিয়ে ঠাসা। সেখানে কোন কথা ঢুকছে না। কাচ্চি জানে আরো বহুক্ষণ ঢুকবে না। ফের ছাদে গিয়ে শিবানীকে খাবার তাগিদ দিয়ে লাভ নেই। যখন নেমে আসবার তখন সে আপনি নেমে আসবে। এখন ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

এই এখনটা যে কতক্ষণ তা বলা কঠিন। হতে পারে দু'ঘণ্টা। হতে পারে একঘণ্টা। হতে পারে রাত তিনটে—হ্যাঁ, রাত তিনটেও হতে পারে।

এমন অনেক হয় শিবানীর। কখন হবে এ রকম—ডাক্তার যেমন রোগীর চোখের ঘোর থেকে জ্বর কত উঠবে বুঝতে পারে—কাচ্চি তেমনি শিবানীর চোখের রং দেখলে বুঝতে পারে। আজ তার বোঝা উচিত ছিল। অবশ্যি তা হলে কাচ্চি তার অনেক আগেই ছাদে উঠে যাবে। বসে থাকবে শিবানীর পেছনটিতে, নয় তো আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তার কাছে-ধারে।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। বর্তমানে কাচ্চির অনেক কাজ। রাত দশটা বেজে গেছে। বাবুর্চি খানসামার হাজিরার কাজ। সকাল ছ'টায় আসে, রাত দশটায় চলে যায় তারা। তারপর ইন্দ্রনাথের খাবার তদারক করে আবদুল। শিবানীর কাচ্চি।

শিবানীর খাবার টেবিলে সাজানো রয়েছে। সেগুলি তুলে রাখতে হবে। যখন শিবানী নেমে আসবে, ফের গরম করে পরিবেশন করবে। সাহেব আজ আর খাবেন বলে মনে হয় না। তবু আবদুল কিছু ফ্রাই ফ্রিজে রেখে গেছে তুলে। যদি হঠাৎ সাহেব রাতে-বেরাতে ফিরে খাবার চেয়ে বসে তবে যেন অসহায় বোধ না করে—আবদুল সে বিষয়ে দু-একবার ঠেকে গিয়ে এখন খুব সচেতন। ডিনারের নেমন্তন্ন আছে, খাবো না বলে গিয়েও সাহেব—রাতে-বেরাতে খাবার চেয়ে বসেন, এমনও হামেশাই ঘটে। তাই আবদুল কিছু না কিছু খাবার তুলে রাখেই।

টেবিলের সাজানো খাবার তুলে রাখতে রাখতে কাচ্চির এতো দুঃখ হতে লাগলো! আজ সে বড় আহ্লাদ করে মেনু করে দিয়েছিল। কত মাথা খাটিয়েছিল। কচি আমের অম্বল খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়।

তাই সে গ্রীষ্মের দাপট দেখে কচি আমের অম্বল করতে দিয়েছিল। বাটিভরা অম্বল তেমনি পড়ে রইল। কাল বাবুর্চি মোছের তলায় হাসবে। বলবে, তুমি খেয়ে ফেল আয়া। শরীর এমন ঠাণ্ডা হবে যে. তোমায় লেপ গায়ে চাপাতে হবে। ম্লেচ্ছ জাত কি সাধে বলে! শরীরকে কেবল তাতাতেই জানে—আর তাতাতেই চায়। ঠাণ্ডা রাখতে, ঠাণ্ডা করতে জানেও না, চায়ও না। কাঁচা আমের অম্বল, সুক্তোর ঝোল, তিতে ঝোল রাঁধতে বললে প্রথম হঠিয়ে দিতে চায়। তারপর অবহেলা করে রাঁধে। তারপর যখন সাহেব মুখে তোলে না, শিবানী কাচ্চির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু খায়, বাকি সব পড়ে থাকে তখন মোছের তলায় হাসে। কালকেও হাসবে অম্বলের বাটি হাতে নিয়ে। টক করে বাটিভরা অম্বল কাচ্চি বেসিনের ভেতর ঢেলে দিল। আমের ঝোলটা পড়ে গেল। আমের টুকরো আটকে রইল বেসিনের মুখে। সেগুলি তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে কাচ্চি যেন আরামবোধ করলে। তারপর তার যা কাজ বাকি ছিল একে একে সারলে।

শিবানীর খাবার ইলেকট্রিক-রেঞ্জের ভেতর ঢুকিয়ে মৃদু তাপের চাবি ঘুরিয়ে খাবার গরম থাকার ব্যবস্থা করলে। নিজের খাওয়ার কথা ভাবলে। সবাই খেয়ে নিয়েছে। আবদুলও খেয়ে নিয়ে সাহেবের অপেক্ষায় বসে আছে সিঁড়িতে। সেও খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু শিবানী যতক্ষণ না খাচ্ছে ততক্ষণ সে খায় কি করে। যদি সাহেবের মতো শিবানী বাইরে থাকত; তার বাইরে খেয়ে আসার সম্ভাবনা থাকত, না খেয়ে এলে বাড়ি এসে খেতো, তবে কাচ্চিও আবদুলের মতো খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু এ যে শিবানী না খেয়ে রয়েছে। সে খায় কি করে।

কিংবা হয় তো এ জন্যেও নয়। আবদুলের সাহেব ডাকার মতো সেও যদি শিবানীকে মেমসাব ডাকতো শিবানীও ও ইন্দ্রনাথের মতো সাহেব হতো—তবে ভাত গলা দিয়ে নামতো, সেও খেয়ে নিতে পারতো। এখন যতক্ষণ শিবানী উপোস থাকছে ততক্ষণ ভাত তার গলা দিয়ে নামতে চাইবে না—তাই সে চেষ্টা করে লাভ

নেই। একগ্লাস জল খেয়ে এসে সে শোবার ঘরে ঢুকল শিবানীর। বিছানার বেডকভার তুলে শয্যা প্রস্তুত করলে পরিপাটি করে। ড্রেসিং-টেবিলের উপর চুলের কাঁটাগুলি ছিটিয়ে-ছড়িয়ে ফেলেছিল শিবানী। সেগুলি এদিক-ওদিক থেকে তুলে কাঁটা-ক্লিপ সেপ্টিপিনের ছোট্ট ট্রেটাকে গুছিয়ে রাখলো। ঘরের আরো যা একটু-আধটু গোছগাছ করার ছিল তা করে ঘরের উঁচু পাওয়ারের বাতিটা নিভিয়ে নিচু পাওয়ারের সবুজ বাতিটা জ্বেলে দিলে। তারপর কি ভেবে কে জানে কাচ্চি শিবানীর আর ইন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যিখানের ভারী ভেলভেটের পর্দাটা একটু সরিয়ে ইন্দ্রনাথের ঘরটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

এই শূন্যঘরটার দিকে তাকিয়ে কেন যে সে দাঁড়িয়ে রইল তা সে জানে না। হয় তো শূন্য ঘরটাকে নয়, ও এক'দিনের কথায় মুখরিত ঘরটাই সে দেখছিল ঈষৎ চোখের জলের ঝাপসা অস্পষ্টতার ভেতর দিয়ে। সে বুঝছিল এ ঘর আর শীগগির মুখরিত হবে না। এ ক'দিনের মধ্যে কতবার তাকে ট্রেতে সাজিয়ে দু'জনার খাবার এখানে বয়ে আনতে হয়েছে। শিবানীর কত ছোটবড় ডাকে বার বার ছুটে আসতে হয়েছে। সাহেবের কত অনুরাগ আর আনুগত্যের প্রকাশ হঠাৎ চোখে পড়ে গেছে আর শিবানীর চোখে-মুখে লজ্জার আভা খেলে যেতে দেখেছে।

কি সুখের হাওয়াই না বইতে শুরু করেছিল।

সেই সুখের হাওয়ায় সেও ভেসে বেড়াচ্ছিল। শিবানী ওর কাছে শুধু মনিব নয়, শুধু মানবী নয়, শিবানী ওর কাছে দেবী। শিবানীর দু'চোখের দৃষ্টিতে বরাভয়। তাই শিবানী তার গায়ের কালো রং-এর উল্লেখ করে কিছু বললে, সে আঁতকে ওঠে। সে গান শুনেছে,—

> কালো মেয়ের পায়ের তলায়—
> দেখে যা আলোর নাচন!
> রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব—
> যার হাতে মরণ বাঁচন—।

শিবানীর মুখের ওপরও এমনি আলোর নাচ কি দেখতে পায় না সাহেব?

কি করে পাবে!

সাহেব তো শিব নয়।

তাই শিবানীর রূপ সাহেব দেখতে পায় না।

সাহেবকে ক্ষমা করে ফেলে কাচ্চি সে মুহূর্তে আর দায়িত্ব গিয়ে চাপে আরও বেশি করে শিবানীর ওপর। তুমি দেবী।

তুমি ক্ষমা করো মা সাহেবকে।

আজও ক্ষমা করো!

শিবানী যেন ক্ষমা করলো। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যঘরটা যেন মুহূর্তে কাচ্চির চোখে ভরে উঠল। হেসে উঠল। গেয়ে উঠল শিবানীর কণ্ঠের গুনগুন গান—

> আমার মনে নবীন মেঘের সুর লেগেছে—

সিঁড়ির মুখে সাহেবের প্রতীক্ষারত উপবিষ্ট আবদুলকে— মেমসা'ব ছাদে গেছেন তাই সে ছাদে যাচ্ছে জানিয়ে ছাদে উঠে এলো কাচ্চি।

শহরের দালান-কোঠা মানুষ-ঠাসা বাড়িগুলির মাথার ওপর একটুকরো রেলিং ঘেরা বাঁধানো জমি—যার বুক বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খর রোদে তেতে-পুড়ে ফেটে উঠে। বর্ষায় জল-বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শেওলার আস্তরণ পড়ে স্যাঁতসেঁতে হয়—ছাদ বলতে এই যে ছবিটা চোখের উপর ভেসে ওঠে, এ ছাদ তা নয়।

কর্পোরেশনের আইন মানা কোনমতে চার হাত জমি ছেড়ে দেওয়া মধ্যবিত্ত পাড়ার ঘিঞ্জি বাড়ি— এগুলি নয়। এগুলি অভিজাত পল্লীর প্রচুর জমি ছেড়ে দেওয়া বাগানওলা বাড়ি। এখানে খোলা ছাদেও আশে-পাশের খোলাদৃষ্টি এসে পড়তে পারে না গায়ের উপর। পাড়া নির্জন। বাড়িগুলি শান্ত। ছাদগুলি আরো। এ সব পল্লীর ছাদে এসে বসলে এই কলকাতা শহরের বুক ঠাসা মানুষের মাথার উপর বসেও কিছু নির্জনতার স্বাদ উপভোগ করা সম্ভব। শিবানী প্রাণ ঢেলে জায়গাটাকে তৈরি করে নিয়েছে। রোদ বৃষ্টি কোনটাই যেন তার ছাদে এসে বসা বন্ধ করতে না পারে সেজন্য ছাদের পুব কোণ উঁচু করে বাঁধিয়ে নিয়ে তার উপর বসিয়েছে এক মস্ত জাপানী

ছাতা। ছাতার মাথার উপর লতিয়ে দিয়েছে চামেলি যুঁই আর সন্ধ্যামালতী লতা। সমস্ত ছাদ ঘিরে নানা দেশী-বিলেতি ফুলের টব। ছাতার তলায় আছে আরামকেদারা, টেবিল, দু-চারখানা বই রাখার সেলফ্। আছে আলোর ব্যবস্থা। এমন কি যদি গুমট গরম পড়ে। বাতাস না থাকে ছাদেও। তাই আছে লম্বা স্ট্যাণ্ডে বসানো পাখা। ড্রইং-রুম, সবার বসবার ঘর। এটা শিবানীর একার বসবার জায়গা। এটা ওর চুপ করে বসে থাকবার জায়গা। আকাশ দেখবার জায়গা। বৃষ্টি দেখবার জায়গা।

যে চাঁদটা সন্ধ্যাবেলা ললিতাদের বাড়ির জানালা দিয়ে একটুকরো ক্ষীণ আলো পায়ের কাছে ফেলেছিল, সে চাঁদটা এখন গোল হয়ে মাথার উপর উঠে এসেছে। চাঁদের সাদা আলোটাকে সকাল ভেবে কাকগুলি বাড়ির নিমগাছটা থেকে এক-একবার কা-কা করে ডেকে উঠছে। পাখা ঝাপটে বের হয়ে এসে এ-ডাল ও-ডাল করছে কিন্তু তারপরই ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে যাচ্ছে। শিবানীর ছাদের নিঃশব্দের জগতে মাঝে মাঝে এই ভ্রান্ত কাকের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ উঠছে না। এসে পৌছোবার মতো শব্দ এখন এ পল্লীর কোথাও হচ্ছেও না। অভিজাত পল্লী এটা। শিবানীর কানকে উত্যক্ত করে না এরা; করাটাকে বর্বরতা জ্ঞান করে। রেডিও ছাড়ে নিজেদের কানের মতো করে—পড়শীদের ক্ষিপ্ত করে তুলবার মতো করে নয়। যদিও বা দিনের বেলা বা সন্ধ্যারাতে উচ্চগ্রামে দু'টো ডাকহাঁক আর রেডিওগ্রামের বাজনা কানে আসে আটটার পর আর তাও আসবে না। হাসি-গল্প-গানের চৌহদ্দি তারা নিজেদের চারদেয়ালের গণ্ডির বাইরে তো যেতে দেবেই না, দুর্দান্ত রাগ, কথা কাটাকাটি ঝগড়াও নিচু গলায়, কথা দাঁতের তলায় চেপে করে। সভ্য নাগরিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে এরা সচেতন।

শিবানী টের পেলো কাচ্চির এসে পেছনে বসা। বসে বসে হাই তোলা। শুয়ে পড়া। ঘুমিয়ে পড়াটা আর আগের গুলির মতো—অনুভবে বুঝতে হলো না। কাচ্চির গভীর নিঃশ্বাসের মৃদুমন্দ ফোঁসফাঁস্ ধ্বনিই তা ঘোষণা করতে লাগলো।...কাচ্চি অদ্ভুত বুদ্ধিমতী। ও যদি ওদের মতো লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেতো তবে নিশ্চয় কিছু করতো। গাছের মাটি থেকে রস টেনে নেবার মতো মেয়েটা যেন শিবানীর শিক্ষা-দীক্ষা থেকে আলো টেনে নেয়। এক-এক সময় বিস্মিত করে দেয় কাচ্চি ওকে তার বোঝার এবং তা প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়ে।

কাচ্চির ঘুম দেখে শিবানীর ইচ্ছে করতে লাগল এই যে শুয়ে-পড়া মাত্র ঘুম—এই ঘুমটার জন্য দু'হাত জোড় করে সে ঈশ্বরের দরবারে প্রার্থনা করে।

এখন যদি শোবামাত্র কাচ্চির মত ও দু'চোখে ঘুম নেমে আসত, তবে সে নিশ্চয়ই গিয়ে শুয়ে পড়ত।

দু'চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়েই হোক আর এখানে ওখানে যেখানে বসে চোখ মেলেই হোক আজকের রাত ওকে জেগে কাটাতে হবে জানে বলেই বসে রয়েছে। নইলে ঘুমের মতো শান্তিকে ঠেলে রেখে ও কি অশান্তচিত্ত নিয়ে এখানে বিলাস করবার জন্য বসে থাকত। ঘুম না এলে রাতে বিছানায় শুয়ে সে এপাশ-ওপাশ করতে পারে না। তার চাইতে বই পড়ে, আকাশটাকে সমুদ্র কল্পনা করে তাই নিয়ে তীরে বসে সুন্দর কাটিয়ে দিতে পারে।

দেয়ও। আজ বলে নয়। অনেক রাতই অনেক সময় শিবানীকে জেগে পার করতে হয়। মন নাড়া খেলে ঢেউ উঠল আর ঘুম গেল। মনটিও খাসা-— যেন অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর! ঢেউ-এর নৃত্য লেগে আছেই। কোথাও এককণা প্রশান্তি নেই। কোনদিক থেকে একটুখানি হাওয়া লাগল কি অমনি উদ্দাম ঝড় উঠল। আজ ওর এতো উত্তাল হয়ে উঠবার কি কোন যুক্তি আছে?

ও কি একদিনের তরেও ইন্দ্রনাথের উপর ভুলেও আস্থা স্থাপন করেছিল?

না।

একবারও কি ভেবেছিল সত্যকে পেলাম?

না।

তবে কি ইন্দ্রনাথ মিথ্যা দিয়ে ভুলাচ্ছে ভেবেছিল?

না, তাও ভাবে নি।

সত্য আর মিথ্যা দু'টো দু'প্রান্তের শেষ কথা। মাঝখানে আরো কিছু কথা থাকে যা সত্য নয় বলেই মিথ্যা হয় না। মিথ্যা নয় বলেই সত্য হয় না। এটা ইন্দ্রনাথের একটা চেষ্টা। চেষ্টাটার ভেতর মিথ্যা ছিল না তাই ইন্দ্রনাথের

সত্য চেষ্টাটাকে সম্মান দিচ্ছিল সে। আর এ তো বাইরের সম্মান দেওয়া নয়। এর ভেতরই তো তার প্রাণ। তাই সে ইন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার ইচ্ছাটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছিল....

না, ওর আজকের এই তীব্র অশান্তপনার ভেতর ওর নিজের দিকে পা রেখে দাঁড়াবার মতো কিছু যুক্তি আছে। এ কেবল তার ভাবপ্রবণ মনের- — যে মন তাকে ব্যাধির মতো ভোগায় তারই প্রকাশ নয়। যে মাটিটুকুর উপর দু'পা রেখে দাঁড়াতে চাচ্ছি, যে খুঁটিটাকে জীবন বলে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছি—হঠাৎ যদি দেখা যায় পায়ের তলার সেই মাটি, হাতের মুঠোর সেই খুঁটি দু'টোই ভুয়া তবে কিছুটা ছটফটানি প্রথম ধাক্কায় ক্ষমার্হ।

ক্ষমা করা গেল তোমায় শিবানী।

নিজেকে মার্জনা করে দিলো শিবানী।

কিন্তু তারপর শিবানী? স্বভাবটা তো রয়েই গেল তোমার। আজকের ক্ষমা দিয়ে কি তাব কিছু সংশোধন হলো? স্বভাবকে সংশোধন করো শিবানী। নিজের ভেতর সমাহিত হও। নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করার সাধনা করো। তবেই আর বাইরের জন্যে ছটফট করতে হবে না। বাইরের কাছে কাঙালপনা করে সুখ চাইতে গেলে সে পেয়ে বসে। তার দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না।

'বাণী বাজাও মম অন্তরে'

অন্তরের বাণী বাজিয়ে তোল শিবানী তবেই আর বাইরের তুফান তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। নিজের ভরা মনটির মাঝখানে নিবিড় হয়ে বসে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসার উপরে স্থির হয়ে থাকতে পারবে।

চোখ বুজে স্মরণ করলো শিবানী— ঠোঁট নেড়ে মন্ত্রের মতো বলতে লাগল, আমাদের যা কিছু সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সবচেয়ে বড় আনন্দ—তার ভাণ্ডার যদি বাইরের থাকে তা হলে আমাদের ভারি মুশকিল, কেন না, বাইরের পথে বাধা ঘটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছে থেকে ভিক্ষে চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করে শান্তি পেতে পারি। নইলে নিজেও অশান্ত হই, চারিদিককেও অশান্ত করে তুলি। এই সংসার থেকে যে-প্রীতি যে কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েছি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গম্ভীর ভাবে কৃতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে কিছু জিনিস পাই নি, সেদিক থেকে যা কিছু বাধা আসছে, তারই ফর্দটাকে, লম্বা করে তুলে যদি খুঁতখুঁত করি, ছটফট করতে থাকি তা হলে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর-বাহিরকে আবৃত করে মাত্র।

স্থির হব, প্রসন্ন রাখব তা হলেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে করে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না।

অনেকটা সময় চোখ বুজে রইল শিবানী।

রাত বাড়তে লাগল। সব বাড়ির বাতি নিভে গেছে। কেবল দু-একটা গাড়ি বারান্দায় অথবা গেটের মাথায় বাতি জ্বলছে।

কাচ্চি একবার জেগে ধ্যানস্থ শিবানীকে দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজল।

একসময় ঝকঝকে আকাশের দিকে ঝকঝকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল শিবানী। সাদা সাদা তুলো পেঁজা মেঘ ধীরমন্থর গতিতে ভেসে চলেছে। ওর আরামকেদারায় বসা গা-ছাড়া ভাবের মতই তাদের চলায়ও একটা গা-ছাড়া ভাব। যেন চলছে বলেই চলছে। থামতে হলেই থামবে। চাঁদের আলোটাকেও ভীষণ মৃত লাগতে লাগল শিবানীর। যেন কোন সুন্দরী নারীর রক্তশূন্য মৃত মুখের সাদা ফ্যাকাশে রং আলোটার। কথাটা মনে হতেই পিঠটা কেমন শিরশির করে উঠল—

বাজে মিল যত!

মন যখন বাজে হয়ে থাকে তখন এমনি সব বাজে মিল মনে আসে।

মন যদি এমনি বাজে হয়েই থাকবে তবে চোখ বন্ধ করে বলল কি সে? কিই-বা মন্ত্রের মতো করে বলল?

আরামকেদারা থেকে পিঠ তুলে সোজা হয়ে বসল শিবানী—ভাবতে লাগল—

বেশ লাগছে—

অপূর্ব লাগছে—

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে যেন আনন্দের সাড়া পেলো শিবানী। ভারি আশ্চর্য তো। আনন্দ যেন ঘুমিয়েছিল, ডাক শুনে সাড়া দিচ্ছে। না ডাকলে বুঝি তারও সাড়া পাওয়া যায় না। আবার ভাবলে সে—

বেশ লাগছে—

অপূর্ব লাগছে—

এই ঝকঝকে চাঁদ, তারাভরা আকাশ, আলোভরা ছাদ, ঝিরঝিরে হাওয়া, টবে টবে রং-বেরং-এর হাওয়ায় আন্দোলিত ফুল, জাপানী ছাতার চারপাশে ঝুলেপড়া দোদুল্যমান থোকা থোকা যুঁই, চামেলী, সন্ধ্যামালতীর গুচ্ছ তাদের সুমিষ্ট আঘ্রাণ, সব কিছু—সব কিছু অপূর্ব রমণীয়। আঃ!

আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান—

কে ইন্দ্রনাথ? ওর জীবনে তার এতো কি মূল্য? কেনই বা সে এতো মূল্য দিয়ে রেখেছে? একটা লোকের ওপর বাড়তি মূল্য চাপিয়েই যত অ-সুখ জীবনে সেধে ডেকে আনে মেয়েরা। মেয়েদের এ এক আশ্চর্য আত্ম-নিপীড়ন প্রীতি। এ থেকে ওদের উঠে আসতে হবে।

কি আসে-যায় ইন্দ্রনাথ না ফিরলে? মদ খেয়ে ফিরলে? মাতাল হয়ে অন্য কোথাও পড়ে থাকলে? কিম্বা একেবারেই তার জীবনে অনুপস্থিত থাকলে?

আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান—

গান শুনে দু'চোখ কচলে কাচ্চি উঠে বসল। কান পেতে গান শুনতে লাগল। ওর দিকে নজর পড়লে শিবানী উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। চল খেতে দিবি।

নীচে নেমেই দেখতে পেলো, ইন্দ্রনাথ মাতাল পায়ে বারান্দা পার হচ্ছে। আবদুল তার পেছন পেছন চলছে।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে শিবানী আওড়ালো—

আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান—

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রনাথের বেটাল পদক্ষেপ, বিস্রস্ত বেশবাস আর বিশৃঙ্খল চেহারার দিকে দু'চোখ পড়তেই চোখ বন্ধ করে—

'আকাশভরা সূর্য তারা,
বিশ্বভরা প্রাণ —'

মনে মনে আউড়ে যেন শিবানী জর্জকোর্ট রোডের এই বাড়িটা থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে বিশ্বের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আশ্বস্থ করে নিল নিজেকে।

ফের ছাদে উঠে এলো সে। এখন নিচে নামতে গেলে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। হয়তো সেটা এড়াতে। হয়তো তাও ঠিক নয়। ফের ছাদে উঠে এলো সে. হয়তো মাতাল বিস্রস্ত ইন্দ্রনাথকে দেখে মনটা ওর যেন ক্লেদাক্ত হয়ে উঠতে চাচ্ছিল, তা থেকে মুক্ত হতে।

ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বার বার বলতে লাগল, অপূর্ব লাগছে! চমৎকার লাগছে! এই আকাশ, এই বাতাস, এই আলো—এই টবে টবে আন্দোলিত রং-বেরং-এর ফুল, ফুলের মিষ্টিগন্ধ, চমৎকার লাগছে সব—

'ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে'—

সত্যি মন মেতে উঠল শিবানীর। ঝকঝকে চাঁদের আলোভরা আকাশের দিকে চকচকে দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুরের ছন্দের অবগাহনে যেন নিজেকে স্নান করাতে লাগল শিবানী---

'আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।।
ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ—
আমার লাগল না মন লাগল না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।।
হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন,
বনের পথে আঁধার-আলোর আলিঙ্গন—
আমার লাগল রে মন লাগল রে,
তাই এই গানেতেই দিন কাটে এই খেলার ছলে—
শ্যামল মাটির ধরাতলে—'

কে ইন্দ্রনাথ? ওর ধরাতলের এই খেলায় ইন্দ্রনাথের এতো কি মূল্য যে তাকেই একমাত্র সঙ্গী পেতে হবে? তাকে না হলেই সব মিথ্যে হয়ে যাবে ওর? কি আসে যায় ইন্দ্রনাথ না ফিরলে? মাতাল হয়ে অন্য কোথায় পড়ে থাকলে? কিম্বা একেবারেই তার জীবনে অনুপস্থিত হয়ে গেলে?

ইন্দ্রনাথকে একেবারে অনুপস্থিত করে দিলে শিবানী— ওর জীবনে। উল্টেপাল্টে কেবল তার কথাই ভাবা। তার জন্যই প্রতীক্ষা করা। তাকেই উত্ত্যক্ত করবার জন্য চাকরী করা---না, আর ইন্দ্রনাথের জন্য কিছু করা নয়। চাকরী করতে হয় নিজের ইচ্ছে করছে বলেই করবে। যদি ছাড়তে হয়, তো নিজের ইচ্ছে করছে না বলেই ছাড়বে। যদি ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে, ঘরে বসে থাকবে। যদি না লাগে থাকবে না। ওর বর্তমান চালচলনের বেশিটাই ছিল ইন্দ্রনাথের সঙ্গে টানা-পোড়েন। ঝেড়ে ফেলে দিল শিবানী সে টানা-পোড়েন। একেবারে অনুপস্থিত করে ফেলল শিবানী ইন্দ্রনাথকে ওর জীবনে। পরের দিন সমস্ত সকাল বসে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে মস্ত এক বই-এর তালিকা তৈরি করল। দুপুরে ট্যাক্সি বোঝাই করে সব বই কিনে নিয়ে এলো। শোবার ঘরটাকেই পড়বার ঘর করলো।

শিবানীর মনটা ইন্দ্রনাথের দিক থেকে যত প্রকারে পারে দূরে সরে যেতে চাইছিল। সম্ভব হলে ও ওর শোবাব ঘরটাই তুলে নিয়ে যেত অন্যত্র। কিন্তু সেটা হবে খুবই দেখতে বিসদৃশ। তাই পড়বার ঘরটাকেই ও টেনে নিয়ে গেল দূরে বাড়িটার একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তের একটা ঘরে। যে ঘরটা দেখতে হলে সে ঘরে এসে ঢুকতে হবে---বাড়ির অন্য কোন আসা-যাওয়ার পথে এ ঘর কোন মতেই দেখা যাবে না। ইন্দ্রনাথের দেখা যাওয়ার পথ থেকেও শিবানী দূরে থাকতে চায়। ওর নিবিড় মনের বই পড়া নষ্ট হয়ে যাবে ইন্দ্রনাথের বারান্দা দিয়ে চলায়, ঘরে বসে থাকায়। আবদুলের গ্লাস বোতলের শব্দ তোলায়।

ইন্দ্রনাথকে আর ওর বুকে তরঙ্গ তুলতে দেবে না শিবানী। আর সে ইন্দ্রনাথকে প্রশ্রয় দেবে না। প্রশ্রয় সে দিয়েছে। অনেক দিয়েছে। দীর্ঘ বিস্মরণের পর যখনি সে হাত বাড়িয়েছে, তখুনি সব অসম্মান, সব পরাজয় ভুলে গিয়ে লোভীর মতো নিজেকে সমর্পণ করেছে সে ইন্দ্রনাথের হাতে। সে সমর্পণ মনে হলে যেন সর্বশরীর আজ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে আসে ওর। আর নয়। আর এমন আত্মঅবমাননাকর আত্মসমর্পণ সে করবে না কোনদিন। ইন্দ্রনাথের ভুলে যাওয়া আর মনে করা; মনে করা আর ভুলে যাওয়ার ভেলায় সে আর তার জীবনতরী ভাসিয়ে চলবে না।

কিন্তু কি করবে?

থেমে থাকাও তো চলে না।

আপাতত বই-এর ভেতর দিয়েই চলা যাক। তারপর দেখা যাবে।

চাকরী ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিলো না। একমাসের ছুটি পাওনা ছিল। সেটা নিয়ে বই নিয়ে বসল শিবানী। পনেরোটা দিন কোনদিকে চোখ তুলে তাকালো না শিবানী। এক যখন দিনের আলো কমে আসত, বাতি না জ্বালিয়ে আর পড়া সম্ভব হতো না, কিন্তু উঠে গিয়ে বাতিটা জ্বালাতেও ইচ্ছে করত না— তখন জানালা দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে পশ্চিম আকাশে সূর্য ডোবার রং-এর খেলা দেখত, যতক্ষণ না কাচ্চি এসে বাতি জ্বালাত। কাচ্চিও সহজে বাতি জালাত না। এই একটা সময়ই শিবানীকে বই থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতে দেখে শিবানীর আকাশ দেখার সময়টাকে দীর্ঘ করতে চাইত কাচ্চি। সে যে জানে শিবানী আকাশ ভালোবাসে।

এর ভেতর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি শিবানীর। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সে তার পড়ার ঘরে চলে আসে। সে ঘরেই তার ব্রেকফাস্ট সে খায়। আর ইন্দ্রনাথের বাড়ি থাকার সময় তো এই ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্তই। তারপর ইন্দ্রনাথ যে বেরিয়ে যায়, ফেরে কখন তা এক আবদুল ছাড়া কেউ বলতে পারে না। আজ বলে নয়। এই নিয়ম। শুধু বর্তমানে ব্যতিক্রম চলছে। এই সময়টুকুতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দেখা-সাক্ষাৎ হতো সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এবং ইন্দ্রনাথ এই সময়টুকুতে ওর চাকরী ছাড়া নিয়ে যে উপদ্রব আরম্ভ করত, সেটা করছে না। অবশ্যি উপস্থিত কাজে যাচ্ছে না শিবানী। কিন্তু যদি সে কাজে যেত তবু ইন্দ্রনাথ এসে যে ওর পথরোধ করে চাকরী ছাড়বার বায়না নিয়ে এসে দাঁড়াত না, এ কথা শিবানী বেশ ভাল করেই জানে। এখন কিছুদিন ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে ইন্দ্রনাথ। তার আকর্ষণ-বিকর্ষণ খেলার এই পদ্ধতি।

জানে—জানে সবই। তবু জেনেশুনেও একটু সমাদর পাওয়ামাত্র যে লোভী মেয়েটা ইন্দ্রনাথের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওর ভিতরকার সেই লোভী মেয়েটাকে মনে মনে চাবুক মেরে ক্ষতবিক্ষত করে শিবানী। লোভী মেয়েটা ওর হাতের মার খেতে খেতে কাঁদে ঠিকই, কিন্তু অভিযোগ করতেও ছাড়ে না।

কাঁদতে কাঁদতে বলে ঃ আমাকে মেরে কি ফল হবে? তোমার ইচ্ছার ভেতর থেকেই তো আমার জন্ম। তোমার ইচ্ছাটাকে কি মেরে ফেলতে পেরেছ? যদি তা পেরে থাকো, তবে আমাকে মার—মেরে ফেলো। তার মৃত্যুতেই লোভী মেয়েটার মৃত্যু হবে। কিন্তু যদি তা না পেরে থাকো তবে আমাকে মেরে কি হবে? তোমার লুকোনো ইচ্ছা আবার আমায় জন্ম দেবে।

কপালে ঘাম দেখা দেয় শিবানীর।

লোভী মেয়েটা ওরই ত আত্মজা—শিবানীর কপালে ভাঁজ দেখা দেওয়া তার দৃষ্টি এড়ায় না। চোখের জলে সে চুলগুলি মুখচোখ থেকে সরাতে সরাতে একটু হাঁফছেড়ে বলে. আচ্ছা, তুমি তো হিন্দু কোড বিলের এক মস্ত সমর্থক ছিলে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল সমর্থন করে পত্র-পত্রিকায় ওজস্বী ভাষায় প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছ। তারপর বিবাহ বিচ্ছেদ বিল পাশ হলে আনন্দে নেচে ফেলেছ। মেয়েদের জীবনের যে কি উপায়হীনতার শৃঙ্খল-মুক্তি ঘটল, কি নিঃসীম অন্ধকারে আলো জ্বলল, তা বুঝতে আমাদের আরো কিছু সময় লাগবে। বহুক্ষণ অন্ধকারে কাটালে অতর্কিত আলো চোখ সহ্য করতে পারে না। নিজে বুজে চোখ অন্ধকার খোঁজে। জানি আমাদের আরো কিছুকাল তেমনি যাবে—তবু আলো—আলোই। সে অন্ধকার দূর করবেই।

তোমার এসব কথা গেল কোথায়? তোমার তো চোখ বুজে অন্ধকার খোঁজার কথা নয়। তুমি জগন্নকোর্ট ...রোডের ভিত আঁকড়ে পড়ে রয়েছ কেন, জানতে চাইতে পারি?

পারো।

আঁচল তুলে কপালের ঘাম মুছল শিবানী। এতক্ষণে যেন নিজেকে রক্ষা করবার সুযোগ পেলো সে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তুমি লোভী মেয়ে আমার চলে না যাওয়াটা থেকে কেবল আমার লোভকেই বড় করে দেখছ? আমার এই না যাওয়া যে কত বড় একটা 'দেখার' কথা বলছে তা বুঝছ না। মানুষ কোথায়? ঘর বদলে কি হবে? মিঃ অমল বোস, মিঃ তপন মিত্র আর সুধীর ব্যানার্জি নামের তফাৎ ছাড়া তফাৎ কার সঙ্গে কার? ঘর বদলালেই কি সখ্য-বন্ধুত্ব-প্রীতি মিলবে? চরিত্র হারানো এতো মন্দ কেন? চরিত্র হারালে সব হারায় মানুষ। আজকের মানুষ চরিত্র হারিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছে সখ্য-প্রেম-প্রীতি দেওয়ার ক্ষমতা। কোথায় যাবো? কোথায় খুঁজব? কোথায় মিলবে সুন্দর জীবনের এ সব অমূল্য উপচার? আমি জানি না। কি হবে বৃথা ছুটোছুটি করে! দশ ঘাটের নোংরা জলে মুখ ডোবাবার চাইতে যে ঘাটে নৌকো লাগিয়েছি, সে ঘাটের জলটা থিতানোর অপেক্ষা করছিলাম বা করছি—বুঝেছ? হয়তো আরো করব। হয়তো করব না। এখন তুমি যাও। আমাকে বই পড়তে দাও। আমাকে মানুষ হতে দাও। নিজে তো আগে মানুষ হয়ে নি। তারপর মানুষ অন্বেষণ করা যাবে। বৃথা ছটফটিয়ে ছুটোছুটি করে লাভ কি? তুমি এখন দূর হও। তোমাকে আমি আর এক মুহূর্তও সইতে পারছি না।

চমৎকার কাটতে লাগল শিবানীর বই নিয়ে। একটা শেষ করেই আর একটা নেয়। ভালো লাগলে একটানা পড়ে যায়। খারাপ লাগলে বই পালটায়। চরিত্রগুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে। যে গল্পের যে জায়গাটা মনঃপূত হয় না, সে জায়গাটা মনমত গড়ে নিয়ে চোখ বুজে বসে উপভোগ করে। ঘরে ইন্দ্রনাথকে নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, অন্তর্দাহ নেই। বাইরে অমল বোসকে নিয়ে বহির্দাহ নেই। উপন্যাসের নায়কদের মধ্যখানে বসে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে — ইউজিন বাজারভ, সিড্‌নি কার্টন, সিরানো দ্য বার্জেরাক এক একজনের হাত ধরে আর যেন সে হাত ছাড়তে ইচ্ছে করে না শিবানীর।

কিন্তু যত বড় ভাবে এসেই স্পর্শ করুক—ওগুলি বই-এর হাত। বই শেষ হয়ে গেলে একটা দীর্ঘশ্বাসে চরিত্রগুলি মিলিয়ে যায়। বই হাত থেকে নামিয়ে রাখার পর দেখে ঘরটা যেমন নিঃসঙ্গ ছিল, তেমনি নিঃসঙ্গ আছে এবং ওর নিঃসঙ্গ লাগছে।

শুধু ওর ঘরটা নয়। কলকাতা শহরটাই ওর কাছে শূন্য মনে হয়। কারও জন্য প্রতীক্ষা করার নেই। কাউকে ডাকার নেই। কারও কথা মনে হয় না। মনে হলেও মন এতটুকু দোল খায় না — এ যে মরার বাড়া!

একদিন গিয়ে ললিতাদের বাড়িই উপস্থিত হলো। কিন্তু তাকে পেলো না। ললিতাকে সপ্তাহে একবার করে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে। সে ডাক্তারের কাছে গেছে।

না, ললিতাকে এখন পাওয়া যাবে না আর গেলেও ওর সঙ্গে এখন জমবে না। ও এখন ওর শরীরে সন্তানের ভার নিয়েই হিমসিম খাচ্ছে।

ফিরে এসে সোজা ফোনের কাছে চলে গেল শিবানী। ছ'টা নম্বর ঝটাং-ঝটাং শব্দে ঘুরিয়ে ফোন কানে ধরে কৌচে বসল।

উল্টোদিক থেকে সাড়া এলো—হ্যালো.....

মিঃ বোস?

কথা বলছি—

আমি শিবানী সেন কথা বলছি—

ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। এবার কাজ ছেড়ে দেওয়ার দরখাস্ত পাঠাচ্ছেন আমাদের কাছে, এই তো? গম্ভীর গলা অমল বোসের।

মিষ্টি করে হেসে উঠল শিবানী। বললো, না বরং উল্টোটা। ছুটির সাতদিন বাকি থাকতেই আমি কাজে যোগ দিচ্ছি কাল থেকে—।

—এতো ভালো!

অতি মিষ্টি করে হেসে উঠে শিবানী বললো, হাঁ, এতো ভালো।

খুব আনন্দের কথা।

খুব আনন্দের কথা তো? বেশ, এখন বলুন আজ কখন ফ্রি হচ্ছেন আপনি?

এক্ষুণি হতে পারি।

সে কি! অফিসে কাজ নেই?

অফিসে কেন, আপনি ডাকলে পৃথিবীতে আর কোথাও আমার কোন কাজ থাকতে পারে না, এ কথা কি আপনি জানেন না?

তবে চলে আসুন।

কোথায় আসব?

কোথায়.... কোথায়...দাঁড়ান ভাবছি। না, মনে আসছে না। আপনি বলুন। তক্ষুণি আবার মত বদলে ফেলে বলল, থাকগে অত বলাবলির, ঠিকঠাকের দরকার নেই। গাড়ি নিয়ে চলে আসুন এখানে। ততক্ষণে আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। বেরিয়ে পড়ে দেখা যাবে কোথায় যাবো, কি করব— ঠিক আছে?

ঠিক আছে মিসেস সেন। আপনি ঠিক থাকলেই আমার সব ঠিক আছে।

ঝরঝর করে হেসে উঠল শিবানী। বলল, আমি ঠিক থাকলে নয় বলুন আমি বেঠিক থাকলে।

হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে ওটাই ঠিক। তারপর আবেগভরাকণ্ঠ ভেসে এলো মিঃ বোসের, একেই স্বর্গ হাতে পাওয়া বলে কি না আমি জানি না মিসেস সেন....

আবার হেসে উঠল শিবানী। বলল, সামনে শুনব।

অমল বোস হেসে বলল, আচ্ছা।

যেন মরে গিয়েছিল। এবার বেঁচে উঠল শিবানী।

আরে নমিতা না! গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বেশ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল শিবানী—বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে। তারপর ড্রাইভারকে আদেশ করল বাস-স্ট্যাণ্ডে গাড়ি থামাতে। ড্রাইভার গাড়ি থামালে সোল্লাসে হাত নেড়ে ডাকল শিবানী, এই নমিতা—

নমিতা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল শিবানীর দিকে। সে শিবানীকে চিনে উঠতেই পারলে না প্রথম। এমন নতুন ঝকঝকে গাড়ি থেকে কেউ ওকে কলকাতা শহরে হাত বাড়িয়ে ডাকছে— এ যেন চোখে দেখেও নমিতা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কি, হাঁ করে তাকিয়ে আছিস? শীগগির উঠে পড় গাড়িতে। শিবানী একরকম টেনেই গাড়িতে তুলল নমিতাকে। পেছনে গাড়ির স্রোত। গাড়ি থামিয়ে রাখার কি উপায় আছে?

নমিতা এবার চিনল। বলল, শিবানী?

হ্যাঁ শিবানী। তবু যে এতক্ষণে চিনলি! আমি তো তোকে একবারেই চিনেছি। তুই চিনতে পারছিস না কেন?

কুণ্ঠিতভাবে বলল নমিতা—একটু মোটা হয়েছিস।

তারজন্য চিনতে পারবি নে— আমাকে! সে তো তুই একটু নয়— শুকিয়ে আদ্দেক হয়ে গিয়েছিস। আমার চিনতে বাকি থাকল তোকে? অমন করে বসেছিস কেন? যেন এক্ষুণি নেবে যাবি। বোস ঠিক হয়ে। এখন যেতে পারছিস নে। চল আমার সঙ্গে আমার অফিসে— তা তোর আবার অফিস নেই তো?

না। বলে নমিতা হাতের থলেটা কোলের ওপর রেখে একটু পেছনে সরে ভালো করে বসল।

শিবানী বলল, তবে আর কি। চল আমার অফিসে। অনেকদিন বাদে তোকে পেয়েছি। কত কথা যে জানতে ইচ্ছে করছে। তোর তাড়া নেই তো?

খুব না।

একটু আছে? কোথাও যাবি?

ইন্টারভিউ আছে—

ইন্টারভিউ? ক'টায়?

বারোটায়। ট্রাম বাসের যে অবস্থা, তাই আগেই বেরিয়ে পড়েছি।

ঠিক আছে। চল। তারপর আমার গাড়ি তোকে পৌঁছে দেবে'খন ইন্টারভিউর জায়গায়।

এই নমিতার সঙ্গে কিন্তু শিবানীর বন্ধুত্ব হওয়া দূরের কথা, জীবনে একত্র হবারও বুঝি কথা ছিল না। জমি জরীপ করা একশ' টাকা মাইনের কর্মচারীর মেয়ে নমিতা যখন মফস্বল শহরের টিনের চালাঘরের স্কুলে পড়ত, হাজার টাকা মাইনের পি. জি-র মেয়ে শিবানী তখন লণ্ডন-মেড্ জুতো জামা পরে, মাথায় রিবন জড়িয়ে বাড়ির গাড়িতে মেমের স্কুলে পড়তে যেতো। কিন্তু ফুল আর সুতোর সঙ্গে যতই ব্যবধান থাক, মালা যে গাঁথে তার কোলের উপর তাদের যেমন একত্র হতেই হয় তেমনি জীবনের গল্পের মালা যিনি গাঁথেন সেই নিয়তির অদৃশ্য টানে তাঁর কোলের উপরও দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে ঘটনাকে এসে মিলিত হতে হয়। প্রাইমারী স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে নমিতা যখন এসে ঢাকা ইডেন স্কুলে ভর্তি হলো তখন সে স্কুলে শিবানী পড়ছে।

কুনো স্বভাবের স্বল্পভাষিণী নমিতা। শরীরভরা ওর জড়তা আর সঙ্কোচ। চেষ্টা করেও পারে না সহজ হতে। মেয়েদের চলাফেরার দিকে তাকিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। হাসছে, ছুটছে, খেলছে। এ ওর গলা জড়িয়ে ধরে মাঠে ঘুরপাক খেতে খেতে অনর্গল কথা বলছে—ও পারে না কেন!

একদিন বই-খাতা গুছোচ্ছিল নমিতা স্কুল ছুটির পর, বয়সের তুলনায় অনেকটা বেশি লম্বা একটি মেয়ে তার মাথার লম্বা বেণী দোলাতে দোলাতে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বিরক্ত কুঞ্চিত ভ্রূতে তাকিয়ে জিজ্ঞসা করেছিল, এই—তুমি এতো বাজে বাজে প্রশ্ন করো কেন ক্লাসে?

নমিতা লজ্জায় বুঝি কেঁদেই ফেলে আর কি। সত্যি রোজই কিছু না কিছু পড়া জেনে নেয় ক্লাস-টিচারের কাছ থেকে। ওর যে বাড়িতে কেউ পড়াবার নেই। কিন্তু বাজে! কোনমতে ঢোক গিলে বলেছিল, কেন, বাজে হবে কেন?

কেন হবে তা আমি কি জানি। কিন্তু হয়। রোজ রোজ অত প্রশ্ন করবে না ক্লাসে, বুঝলে। বলতে বলতে সামনে এসে পড়া বেণীটা কাঁধের এক ঝাঁকুনিতে পেছনে সরিয়ে দিয়ে গর্বিত পা ফেলে চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

বই-পত্র হাতে নিয়ে কোনমতে কান্না লুকিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল নমিতা। তারপর থেকে কিছু বুঝে নিতে চাইতে ওর সাহস হতো না। শিক্ষয়িত্রী পড়া শেষে কারো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না জানতে চান। বিশেষ করে নমিতার দিকে লক্ষ্য করেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সে-ই বেশি জানতে চায় বলে। নমিতা নতমুখে 'না' বলে।

তিনি চলে যান। মেয়েটি নমিতার পিঠে চাপড়ে খুশিমুখে বলে, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।

অন্য মেয়েদের ডাক শুনে নমিতা জেনেছিল মেয়েটির নাম শিবানী। শিবানীই ছিল ক্লাশের মধ্যমণি। সমস্ত ক্লাস ওকে ঘিরে গুঞ্জন করতো, মিছরীর চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো। শুধু নমিতা দূরে সরে থাকত। কিছুটা তার স্বভাবের জন্য। কিছুটা—ওর ভালো ভালো প্রশ্নগুলিকে বাজে প্রশ্ন বলার অভিমানে। যেদিন নমিতার অভিমান ভাঙ্গল সেদিনই সে হৃদয় দিয়ে ফেলল শিবানীকে।

একদিন স্কুল থেকে বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে মেয়েরা সব যখন উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠল, 'গোলাপ বাগিচা দেখতে যাবো আমরা—গোলাপ-বাগিচা।' তখন দাঁড়িয়ে উঠে শিবানী আপত্তি তুলল— না, দিদিমণি, আমরা যাবো মণিপুর ফার্ম দেখতে।

গেল দুটো দল হয়ে। একদল বলে, 'গোলাপ-বাগিচা দেখতে যাবো।' একদল বলে, 'মণিপর ফার্ম দেখতে যাবো।' দু পক্ষের চেঁচামেচিতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শিক্ষয়িত্রী ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। মেয়েদের মুখ উঠল কালো হয়ে। আর শিবানী বেঞ্চি বাজিয়ে গেয়ে উঠল—

'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা—'

রুষ্ট মুখে বিরুদ্ধদল বললো, কি করে তোমার জয়েমালা গাঁথা হলো শুনি? আমরা ক-খ-নো মণিপুর দেখতে যাবো না— যাবো না—

শিবানীও ঠিক তাদের মতো করেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, আমিও না। কুমড়োর মতো টম্যাটো, চাল কুমড়ো চেহারার ডিম, ময়ূরেব মাপের মুরগী—যত কিম্ভূত! গোলাপ-বাগিচার লক্ষ গোলাপের বাগান ফেলে কেউ যায় সব দেখতে! রামঃ!

মেয়েরা তো হতভম্ব! তবে তুই মিথ্যে মিথ্যে তর্ক তুলে ক্লাসটা নষ্ট করলি কেন?

মিথ্যে মিথ্যে কোথায়? ক্লাসটা করতে চাই না বলে তো সত্যি সত্যি তর্ক তুলেছি—

কথাটা শুনেই খিলখিল করে হেসে উঠল নমিতা।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, তুমি অমন হেসে উঠলে কেন?

নমিতা বলল, সেদিন আমার প্রশ্নগুলিকেও তুমি বাজে বলেছ ঐ বেশি সময় আরো ক্লাসে থাকতে হয় বলে।

এতোদিনে বুঝলে!

একটি মেয়ে বলে উঠল, গা থেকে এখনও গাঁয়ের গন্ধ যায় নি নমিতার—ও বুঝবে আমাদের!

দেখি, দেখি— বলে নমিতার উপর নুয়ে পড়ে নাক টেনে গন্ধ শুঁকলো শিবানী। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ তো ঠিক তো!... একেবারে গেঁয়ো-গন্ধ রয়ে গেছে তোর। বলে এবার যে মেয়েটি নমিতাকে 'গায়ের গন্ধ যায় নি' বলেছিল তার কাছে গিয়ে নাক টানল। টেনেই চোখ নাচাল শিবানী। হ্যাঁ, তোর গায়ে একেবারে খাঁটি শহুরে গন্ধ। তাও কলকাতার পর্যন্ত নয়। একেবারে প্যারিসের। কিন্তু তুই প্রেমে পড়েছিস মীরা।

ক্লাসসুদ্ধ সব হেসে উঠল।

আর মীরা উঠল দুরন্ত ক্ষেপে। গন্ধ শুঁকে বুঝলি তুই?

গন্ধ শুঁকেই বুঝলাম। আরো বুঝলাম তোর প্রেমিক তোর স্কুলের আসা-যাওয়ার পথেরই কোন মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নইলে স্কুলের সময় তোর সেন্ট মাখবার কথা কিছুতেই মনে আসতে পারে না।

মীরাও কম যায় না। বিদ্রূপে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, তোর অভিজ্ঞতা তাই?

হ্যাঁ। তাও ঠিক প্রেমে পড়া বলা চলে না, একটি ছেলেকে একটু ভালো ভালো মতো লাগতে শুরু করেছিল মাত্র—তাতেই বৌদির সেন্টের শিশি খতম্ করে ফেলেছিলাম। যেই সে-ভাবটা কেটে গেল— সেন্টের কথা ভুলে গেলুম।

সেদিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে শিবানী নমিতার হাত টেনে নিয়েছিল হাতে। বলেছিল, তোমার খুব অসুবিধা হয় ক্লাসে পড়া বুঝে না নিয়ে গেলে—তাই না? তুমি পড়া বুঝে নিও কাল থেকে। আমি তখন বুঝতে পারি নি।

এখন কি করে বুঝলে?

তুমি পড়াশুনায় ভালো। তোমার পরীক্ষার ফল গতবার ভালো হয়েছিল। এবার হয় নি বলে— তা তুমি এতো বোকা কেন?

আবার মনটা গুটিয়ে গিয়েছিল নমিতার। বলেছিল, একা আমি?

অপ্রতিভ কণ্ঠে শিবানী বলেছিল, বোকা মানে—বলছি অমন যে যা বলে শুনে চুপ করে থাকো কেন?

কোথায় চুপ করে থাকি? তুমি যখন বলেছিলে, বাজে প্রশ্ন করো কেন। তখন আমি প্রতিবাদ করি নি? বলি নি, কখনো বাজে নয়।

করেছিলে? ঐ দেখে করা না-করা সমান হয় যদি কথায় জোর না থাকে। জোরের সঙ্গে বলবে। জোরের সঙ্গে চলবে—বুঝলে?

সেই বন্ধুত্ব ওদের নিবিড় হয়েছিল।

আই-এ পাশ করার পর শিবানীর বাবা বদলী হয়ে গেলেন। শিবানী চলে গেল কলকাতায় বি-এ পড়তে। প্রথম প্রথম চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চলত। তারপর গেল তাও বন্ধ হয়ে। সাত-আট বছরের না-দেখায়, না-যোগাযোগে সম্পর্কটাই প্রায় মুছে এসেছিল। শিবানী যদি এভাবে ডেকে না নিত তবে নমিতা শিবানীকে চিনতে পারলেও এগুতে পারতো না। শিবানীর সেই জোরের সঙ্গে বলার, জোরের সঙ্গে চলার উপদেশ নমিতা এখনও পালন করে উঠতে পারে নি। ভাগ্যের মার খেয়ে খেয়ে ভীরু স্বভাব আরো ভীরু হয়ে গেছে ওর।

শিবানী ওকে অফিসে নিয়ে গেল। মিস জেনির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। কফি খাওয়াল। তারপর গাড়ি দিয়ে ওর ইণ্টারভিউর জায়গায় পৌঁছে দিল। যাওয়ার সময় বলল, কাল আসবি নমিতা?

আরো দু'টো ইণ্টারভিউ আছে কাল।

পরশু।

আসব।

চিনে আসতে পারবি?

ঠিকানা রয়েছে। পারব।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে মনে বললো নমিতা, আসবো শিবানী। তোমার কাছে যে সমাদর পেলাম তার সিকি ভাগও এ কলকাতা শহরের আর কোথাও পাই নি। কোথায় চাকরী। কোথায় অন্ন। কোথায় ঘর। বাংলা ভাগের ধাক্কায় কলকাতা শহরে ছিটকে পড়ে কুকুরের মতো পথে পথে ঘুরছি।

যে প্রাণ-মানের ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে এখানে এসেছি সে দুই-এরই বিসর্জনের বাজনা কানের কাছে বাজছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর মনে হচ্ছে সে বাজনা যেন এবার থামল।

॥ ১৮ ॥

নমিতা ওর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে টেনে পথ চলছিল না, তো, যেন পা দু'টোকে দিয়ে শরীরটাকে জোর জবরদস্তি বওয়া বইয়ে নিয়ে চলছিল। ভাদ্রমাসের পচা প্যাচপ্যাচে গরম। ব্লাউজটার অবস্থা হয়েছে টিপলে জল পড়বে। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে কাঠ হয়ে। চলত চলতে বার বার শুকনো ঢোক গিলে গলাটাকে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল নমিতা। ওর চোখের ওপর ভেসে উঠছিল ইণ্টারভিউ দিতে ঢোকা অফিসারের ঘরের টেবিলের ওপর রাখা জলের গ্লাসটা। ঠাণ্ডা এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘর— জলটাও নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হয়েছিল। জলটা সে পেতে পারত। একটা ভদ্রতাসূচক অনুমতি নিয়ে জলটা তুলে নিলেই হতো। হয়তো অফিসার ভদ্রলোকটি নিজেই এগিয়ে দিতেন গ্লাসটা ওর হাতের কাছে— কিংবা হয়তো বা হাতেই তুলে দিতেন। কিন্তু লোকটির হাবভাব তাকানো এতো বেশি বাজে লাগছিল ওর যে, উঠে আসার দিকেই ব্যস্ততা ছিল নমিতার। এখন শুকনো ঢোক গিলে গিলে যেন সেই জলটাই খেতে লাগল সে।

তিনটে ইণ্টারভিউ—তাও এক চৌহদ্দিতে নয়। পণ্ডিতিয়া রোড, থিয়েটার রোড, মিশন রো—শহরের প্রায় তিনটা চৌহদ্দি। এক জায়গার ইণ্টারভিউ শেষ করে আরেক জায়গায় যাওয়া—অর্থাৎ ফের ট্রাম-বাসে ওঠা – কলকাতার লোকই ভয় পায় আর ওতো সবেমাত্র এ শহরে এসেছে। ও চোখে সর্ষেফুল দেখে। একবার কোন মতে উঠতে পারলে ভাবে আর নামা যাবে না ভিড়ের চাপ ঠেলে। নামলে ভাবে আর ওঠা যাবে না ভিড়ের চাপ ঠেলে। কিন্তু তবু যায়। চ্যাপ্টা নিরেট নয়—মানুষের ভেতরটা পাথর হয়ে গেলেও দেহটা এখনও পাথর হয়ে যায় নি। ঠেললে ধাক্কালে ফাঁক হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ওঠাও যায় নামাও যায়। আর তা যায় বলেই কলকাতা এখনও চলছে, নইলে কবে থেমে যেত।

ঝুলন্ত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে কিছু ট্রাম-বাসে উঠবার চেষ্টাই করে নি নমিতা। কয়েকটায় চেষ্টা করেও উঠতে পারে নি। শেষে ইণ্টারভিউর সময় চলে যায় দেখে মরি-বাঁচি করে একটা বাসের মধ্যে নিজেকে নিয়ে নিক্ষেপ করেছে। লোকজনের আতঙ্কিত শব্দের ভেতর নিজের আতঙ্ক কাটিয়ে যখন চোখ মেলতে পেরেছে তখন দেখেছে ও বেঁচে আছে এবং তার চাইতে বড় কথা ও বাসে উঠেছে।

কিন্তু এই যে জীবন তুচ্ছ করে ইণ্টারভিউ দিতে যাওয়া, এর শেষ ফল কী তা কিন্তু নমিতার অজানা নয়। ও বাসের শরীরপেষা ভিড়ের ভেতর খোলা দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে চোখের উপর দেখছে পর পর ওর সাজানো ইণ্টারভিউর দৃশ্যগুলিই। লিফটে সরসর করে উপরে উঠছে। সঙ্গে আরো কয়েকটি ওরই মত ইণ্টারভিউ দিতে আসা মেয়ে। ওরই মতো—তবু তারা ওর মত নয়, সাজে সজ্জায় তারা দীপ্ত। ওর মতো দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ নয়। ওরা নয়। ওয়েটিং-রুমে আরো যারা প্রতীক্ষারত রয়েছে তারাও নয়। ওরা সবাই পরস্পরের দিকে প্রতিযোগিতার দৃষ্টিতে তাকাবে ওর দিকে বাদে। একবার দেখে নেবার পর আর ওরা ওকে স্বীকৃতির মধ্যে আনবে না। পরম নিশ্চিন্তে—বা অবহেলায় ওর দিক থেকে মন সরিয়ে নেবে। নমিতা নিজেও মনে মনে ওদের সঙ্গে একমত হবে। ওদের সঙ্গে নমিতা দাঁড়াতে পারে না। বেশবাসে ওরা সুন্দর, সপ্রতিভতায় ওরা সহজ। আরো জড়সড় হয়ে পড়বে ও। এককোণে চুপ করে বসে থাকবে। তারপর এক সময় ওদের সপ্রতিভতার পাশে অপ্রতিভভাবে কোনমতে ইণ্টারভিউ শেষ করে পালিয়ে আসবে। আশা নিয়ে ও যায় না। আশাভঙ্গের ভাঙ্গনেও তাই ও বোধ করে না কিছু সত্যি সত্যি, কিন্তু তবু—তবু এই নিরাশার ভেতরও 'যদি হয়' এর যে ক্ষীণ আশাটুকু একটা নিশ্চিহ্ন রেখার মতো থেকে যায়, সে কিছুটা মুষড়ে ফেলেই।

সকাল থেকে ঘড়ি ধরে ধরে শহরের এ মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত পড়িমরি ছুটোছুটি করতে করতে চাকরীর ব্যর্থ উমেদারি করেছে। এখন দু'টো বেজে গেছে। আর পারছে না ও। কিন্তু পারি না বললে যাদের রেহাই মেলে তাদের জীবনে ওকথাটার সঙ্গে বড় পরিচয় হয় না। আর হলেও যে নির্মম অর্থ সে বহন করে সে অর্থে হয় না। যাদের হয় তাদের যে আবার অর্থ ছাড়িয়েও অনেক দূর নিয়ে যায়। মরতে মরতেও তাদের পারতে হয়। আর তাই বুঝি নমিতা এক সময় দেখে তার এবারের গন্তব্যস্থল শিবানীর অফিসে ছেঁড়া চটি টানতে টানতে আর আকণ্ঠ পিপাসায় শুকিয়ে-ওঠা গলায় শুকনো ঢোক গিলতে গিলতে এসে উপস্থিত হতে পেরেছে।

শিবানী ঘরে ছিল না। মিস জেনি নয়। তা না থাক কেউ। ওতো ঘরে ঢুকে বসতে পেরেছে। কালকে বেয়ারা ওকে শিবানীর সঙ্গে দেখেছে। তাই হয়ত সমাদর করে এনে বসিয়ে গেল। চেয়ারে বসে আগেই খুঁজল শিবানীর টেবিলে জল আছে কি না। নেই। বেয়ারাটা বসিয়েই চলে গেছে। নইলে তার কাছে একগ্লাস জল চাইত। টেবিলের বেলটা বাজিয়ে সেদিন শিবানীকে নমিতা বেয়ারাকে ডাকতে দেখেছে। ডাকবে নাকি সে ভাবে। ওকে একগ্লাস জল চাইবে? কিন্তু এটুকুও পারলো না ও। শিবানীর প্রতীক্ষায় সে রইল। মাংসপেশীগুলো তখন ওর কেঁপে কেঁপে উঠছে। দপ্‌দপ্ করছে নিম্নাঙ্গের শিরা-উপশিরা। শিবানীর এখানে আসতে অনেকটা পথ ও হেঁটেছে। এমন শক্ত পথে চলা নমিতার অভ্যাস নেই। যে শান-বাঁধানো পথে ও এখন নিত্যদিন হাঁটে তেমন শক্ত পথ তো দূরের কথা তেমন পাকা ঘরও নমিতা দেখেছে অনেক বড় হয়ে। বাবা যখন ওদের গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে এলেন ঢাকায় তখন। গোবরমাটি গুলে ঘরের মেঝে এবং পিঁড়ে লেপতে হয় না, শুধু জলনেকড়া পোঁছা করলেই চলে— এ বিস্ময় কাটতেও নমিতার তখন সময় লেগেছিল- -মজা লেগেছিল। কিন্তু তা ওর ভালো লাগে নি। যেমন ভালো লাগছে না ঢাকা থেকে কলকাতা এসে। এ ভালো না লাগার কারণ কেবল বলতে অসহায় তাই নয়, অনভ্যস্ত জীবন প্রতিপদে ক্লিষ্ট করছে।

একদিন গ্রাম ছেড়ে ঢাকা এসে যেমন মনটা পড়ে থাকত গ্রামের সরু মেঠো পথে, নদীর ধারে, পুকুরপাড়ে, এখন তেমনি পড়ে থাকে ঢাকার বাড়িতে। কূয়োর জল টেনে তুলে মা ওদের যখন স্নান করিয়ে দিতেন ঢাকার বাড়িতে, তখন দীঘির ভরা জলে সাঁতার কাটার জন্য যেমন কান্না পেত, তেমনি এখন এই বারোয়ারী ফ্লাটের এক ঘরের বাসিন্দে হয়ে অদৃষ্টে বেশির ভাগ দিনই স্নানের জল জোটে না তখন কান্না পায় ঐ কূয়োর জলের জন্যই। আজও ওর অদৃষ্টে স্নানের জল জোটে নি। ভেজা গামছা দিয়ে গা-হাত-পা মুছে স্নানের প্রয়োজন মেটাতে হয়েছে।...

আরে! শিবানী এসে নমিতার পিঠে হাত রেখে আনন্দিত অভ্যর্থনা জানালো, কখন এসেছিস? বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠাস নি কেন! তারপর এসে নিজের চেয়ারে বসে নমিতার মুখের ওপর একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে এনে বললো, আঃ, মেয়ে ঘুরে ঘুরে চেহারাখানার অবস্থা কি করেছেন দেখ না! হাত দিয়ে পাশের বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে বললো, ঐ যে টয়লটের ঘর। চলে যা। হাত-পা ধুয়ে; মাথাটাথা আঁচড়ে ঠিক হয়ে আয়। ওখানে একপ্রস্থ প্রসাধনের সব কিছু দেখতে পাবি, পরিষ্কার হয়ে আয়। তারপর কথা হবে কফি খেতে খেতে। আজ জেনি আসে নি। আমাদের জমবে ভালো।

আগে একগ্লাস জল খাওয়া—

বেয়ারাকে ডেকে জল আনতে আদেশ করলে শিবানী। জল খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসে বসে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলল নমিতা। এই নিষ্করুণ নির্বান্ধব শহরে মুখ ঘুরিয়ে থাকা আত্মসর্বস্ব আত্মীয়গোষ্ঠীর মাঝে পিপাসায় একগ্লাস জল বাড়িয়ে ধরবার মতো কারু দেখা এ পর্যন্ত পায় নি নমিতা। শিবানীর সহৃদয়তায় চোখে জল এসে গেল ওর। 'ইণ্টারভিউগুলির কোথাও কোন আশা আছে কি না' শিবানীর এ প্রশ্নের জবাবে, কিছুমাত্র না বলে ম্লানভাবে একটু হাসতে চেষ্টা করল নমিতা। কিন্তু ওকে লজ্জিত বিব্রত করে দু'চোখ ছাপিয়ে জল ভরে উঠল।

ভ্রূ বাঁকিয়ে তিরস্কার করলো শিবানী! আচ্ছা নমিতা এ কি ছেলেমানুষি হচ্ছে!

তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে নমিতা। হেসে বললো, সত্যি ছেলেমানুষি।

তোকে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারব না তুই আমাকে এমন ভাবছিস দেখে আমার এবার হাসি পাচ্ছে-। যা এতো ভাবতে হবে না। কফির সঙ্গে কিছু খাবি? আনাব?

কি খেয়ে এসেছে! কিছুই তো না একরকম। দু'টুকরো পাউরুটি আর এককাপ চা। ক্ষিধেয় নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলছে।

আচ্ছা। সম্মতি জানাল নমিতা। কলকাতা শহরে এমন সুন্দর ঘরে এমন সুন্দর একটা মন ওর-জন্য রয়েছে এ ওর কল্পনায়ও ছিল না তো!

বেল বাজাল শিবানী। বেয়ারা এলে জিজ্ঞাসা করল, কি খাবে বল?

যা হোক---

যা হোক! আচ্ছা! হাসল শিবানী। বেয়ারাকে আদেশ করলো ক্যানটিন থেকে রুটি মাখন ওমলেট দু'ডিস আর দু'কাপ কফি আনার। বেয়ারা চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলো, বি-এ তো তুই?

না।

না! একটু অবাক হলো শিবানী। আই-এ তো একসঙ্গেই ওরা পাশ করে এসেছে। তারপর ও চলে এসে কলকাতায় বি-এ- তে ভর্তি হয়েছে, আর নমিতা ঢাকা ইউনিভারসিটিতে বি-এ- তে ভর্তি হয়েছে দেখে এসেছে। পরীক্ষায় পাশ করে নি নমিতা এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই পড়া বন্ধ করতে হয়েছে বা যে কোন কারণেই হোক পরীক্ষা দিতে পারে নি ও। কিন্তু সে কথায় আর গেল না শিবানী। বললো, ঠিক আছে। সেজন্য আটকাবে না। আজ নয় কাল কিছু একটা ব্যবস্থা আমি করে দেবই তোর।

আজ নয় কাল! কাল হলে আজ খাবো কিরে শিবানী? কথাটার সঙ্গে হাসির প্রলেপ জড়ালো নমিতা।

এবার সত্যি চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল শিবানীর। বললো, এতটা খারাপ অবস্থা তো তোদের ছিল না নমিতা!

অবস্থা কি আমরা কেউ সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছি শিবানী? আর অবস্থা আমাদের খারাপ না থাকলেও ভালোও ছিল না কিছু। গ্রামে জমি-জমা সামান্য ছিল। তাই একরকম চলত। সে সব নিয়ে আসতে পারি নি--- বিক্রি করতেও না।

কেন?

কিনবে কে? এমনিতেই যখন সব পাবে ওরা জানে, তখন টাকা দিয়ে কিনবে কেন।

বেয়ারা দু'ডিস খাবার, দু'কাপ কফি ট্রে করে এনে দু'জনার সামনে সাজিয়ে দিয়ে গেল। শিবানী মস্ত ডবল ডিমের ওমলেটটা চামচে দিয়ে কেটে দু'টুকরো করে এক টুকরো নমিতার প্লেটে তুলে দিল। রুটিও তুলে দিল এক পিস।

নমিতা আপত্তি জানাল। বললো, এ কি করছিস শিবানী! সব যে তুলে দিচ্ছিস আমায়!

শিবানী বললো, আমি এই কিছুক্ষণ আগে লাঞ্চ খেয়েছি রে। এ নিলাম শুধু তোকে সঙ্গ দিতে। তুই খা।

নমিতা খেতে লাগল।

শিবানীও চামচে দিয়ে একটু একটু করে ওমলেট কেটে কষ্টে মুখে তুলতে লাগল সময় নিয়ে নিয়ে। মাঝে মাঝে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগল।

খাওয়া শেষ করে নমিতা বললো, আমার কথা তো অনেক হলো। এখন তোর কথা শুনি?

তোর কথা অনেক হলো কোথায়? তোর দাদা আছেন। কিন্তু তার কথা শুনে যতটুকু বুঝতে পারছি তাতে মনে হচ্ছে, সংসারের সব দায়িত্ব তোর উপর এসে পড়েছে। এর কারণ কি, তোর দাদা কোথায়? বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছেন?

কফির পেয়ালাটার দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল নমিতা, তারপর আস্তে আস্তে চোখ তুলে শিবানীর দিকে তাকিয়ে বললো, দাদা নেই শিবানী।

অতীন নেই! চমকে উঠে ঝুঁকে পড়লো শিবানী নমিতার দিকে।--- বলছিস কি তুই! বিহুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শিবানী নমিতার দিকে।

অতীনের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল নমিতার দাদা হিসাবেই। তারপর যৌবনের ভালোলাগার একটা বড় অংশ সে দিয়ে এসেছিল অতীনকে। ওদের ইউনিভার্সিটির অভিনয়ে---বাঁশরির পার্টে নামিয়েছিল ওকে অতীন। সে দিনগুলির আনন্দ ও ভোলে নি। কখনো ভুলবেও না। যদি চলে আসতে না হতো তবে ওদের সেই ভালোলাগা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত কে জানে! হয়তো ইন্দ্রনাথকে চেনার অবকাশই ওর জীবনে আসত না। হয়তো অতীনের

সঙ্গেই গিয়ে ঘর বাঁধতো একশ' টাকার ফ্ল্যাটে।' হ্যাঁ, ওই কথা সে অতীনকে বলেছেও। অতীন হেসেছে। বলছে, একশ' টাকার ফ্ল্যাটে ঘর বাঁধাটাই তোমার এমন কৃচ্ছ্রসাধন মনে হচ্ছে শিবানী। কিন্তু আমি যে মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ঘর বাঁধব। যে ঘর মাটির। আর জল আনতে যেতে হবে নদীতে। ও নিজেও কিছু কম যায় না। লাফিয়ে উঠে বলেছে—সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে এমন মাটির ঘর যদি না দিতে পার তবে ভালো হবে না—মনে রেখো। কথা দিয়ে কথার খেলাপ করো না। চলে আসবার সময় কেঁদেও ফেলেছিল অতীনের দু'হাত ধরে, কলকাতা চলে এসো অতীন। অতীন তেমনি হেসে বলেছিল, আমার কথা দেওয়া আছে নদীর দেশে মাটির ঘরের। তোমার কথা ভুলব না। যদি তুমিও না ভোল তবে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। ও ভুলে গিয়েছিল অতীনকে, তাই কি আর দেখা হলো না! জলভরা ঝাপসা চোখ তুলে তাকাল শিবানী নমিতার দিকে। কিন্তু একে কি ভোলা বলে? অতীনের বোন বলেই তো নমিতার প্রতি ও এতো আকর্ষণ বোধ করছে। নমিতাকে দেখে যখন গাড়ি থামিয়েছিল ও, তখন তো সব প্রথম অতীনের কথাই ওর মনে পড়েছিল। তার খবরই জানতে ইচ্ছে করছিল। তার কথা শুনবার জন্যই নমিতাকে অফিস পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নমিতার ইণ্টারভিউ থাকায় শোনা সম্ভব হয় নি বলে নমিতার কাছ থেকে কথা আদায় করে রেখেছিল আসবার। চোখের জলটা চোখের ভেতরই মিলিয়ে দিল শিবানী কিছু সময় ধরে দিয়ে। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, কতদিন হলো?

আমরা ঢাকা ছাড়বার আগে, এই তিন মাস হলো।

কি হয়েছিল?

প্রথমটায় দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল নমিতা। তারপর রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করে বললো, ঢাকার এবারকার দাঙ্গায় মারা গেছেন দাদা।

দাঙ্গায়! মাগো!! বলে শিবানী দু'হাতে চোখ ঢাকল।

কতগুলি নিঃশব্দ মুহূর্ত কেটে চলল। তারপর একসময় আকাশে মুখ তুলে শিবানী আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো, তোরা এই ভুল করলি কেন রে নমিতা। কেন তোরা দেশ ভাগ হবার পর পরই চলে এলি নে? অতীনই বা কেন এমন মরণভুল করলে রে নমি—

চোখভরা জল হাত দিয়ে মুছে নিয়ে নমিতা বললো, হ্যাঁ শিবানী, দাদাকে মরণভুলেই পেয়েছিল। মা তো অস্থির হয়েই উঠেছিলেন চলে আসবার জন্য। দাদার হাতধরে কান্নাকাটি করতেন। দাদা কেবল বলতেন, ঘর বাড়ি ছেড়ে কলকাতা গিয়ে ভিখারির খাতায় নাম লেখাতে পারব না। মা আমি যখন দাঙ্গা লাগবার সম্ভাবনার কথা শুনে এসে ব্যাকুল হয়ে পড়তাম তখন দাদা নানা যুক্তি দিয়ে কেবল বোঝাতেন কি কি রাজনৈতিক কারণে দাঙ্গা এখন কিছুতেই হতে পারে না।

তারপর?

দাদার কোন যুক্তিই টিকল না। একদিন সত্যি দাঙ্গা বেধে গেল হঠাৎ। দাদা দুপুরবেলা একথলে কইমাছ নিয়ে এসে বললেন, দু'বন্ধু দু'কুড়ি কিনলাম। কি সস্তা! শুনে মাথা ঘুরে পড়ে যাবি তোরা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এত সস্তা পেলে কি করে? দাদা বললেন, শহরে গুজব রটেছে। আর বাজার খালি—আমরা যা দাম বললাম তাই দিয়ে দিল। আরো কম বললেও বোধ হয় পেয়ে যেতাম। এখন আপসোস হচ্ছে রে! এমনি সময় আমাদের পাশের বাড়ির অবিনাশবাবুর স্ত্রী ও মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে উপস্থিত। অতীন, ভীষণ দাঙ্গা লেগেছে শহরে। তোমার মেসোমশাই ফোন করেছে অফিস থেকে। তিনি কোনমতেই বাড়ি আসবার কোনো ব্যবস্থা করতে পারছেন না। রাস্তায় বেরুনো মানে নাকি অবশ্য মৃত্যু। পুলিশ স্টেশনে ফোন করে গাড়ি চেয়েছিলেন পান নি। বলছেন, আমরা যেন কাছাকাছি বাড়ি ক'টা একত্র হয়ে দরজা-কপাট বন্ধ করে ফেলি এখুনি। দাদা উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলে উঠলেন, একমাত্র আপনার বাড়িতে ফোন আছে। ওটা ছেড়ে এ সময় আপনি চলে এলেন কেন?

ফোন দিয়ে করবে কি অতীন? কাকে ফোন করবে? তোমার মেসোমশাই তো পুলিশ স্টেশনে ফোন করেছিলেন। তিনি বলেছেন আমাদের একত্র হতে।

এমনি সময় সামনের রাস্তায় দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি আর করুণ আর্তনাদ উঠল। মা আর অবিনাশবাবুর স্ত্রী আমাদের দু'জনকে দেখিয়ে বললেন, অতীন এ মেয়ে দু'টোর কি করবে আগে করো। মরণ সামনে নিয়ে মরণের ভয় তখন তাঁদের চলে গেছে। তাঁদের ভয়, আমাদের দু'জনকে যে ওরা মারবে না!

দাদা পাগলের মতো আমাদের দু'হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ির কোঠার তলার অন্ধকার চোরা কুঠরির ভেতর ঢোকালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, একেবারে মরার মতো হয়ে থাকবে। ছুরি বসাতে দেখলেও এতটুকু শব্দ করবে না। জানবে একজনের জন্যে শব্দ করলে সবাইকে মরতে হবে।

কেঁদে উঠলাম আমরা, তুমি?

কিন্তু তখন দাদা দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন চোরা কুঠরির। শব্দে বুঝলাম কোন একটা ভারী আলমারী গোছের কিছু অমানুষশ্রমে টেনে এনে মুখ বন্ধ করেছেন দাদা আমাদের দরজার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুপধাপ শব্দে কতগুলি লোক হাটা-বারান্দায় উঠে এলো, টের পেলাম। কানে এলো, 'মার শালাকে।' কিন্তু দাদার গলার এতটুকু শব্দও আমাদের কানে এলো না। আশ্চর্য! আমরাও কিন্তু এতটুকু শব্দ গলা দিয়ে বেরুতে দিলাম না কেউ।

দৌড়-ঝাঁপ করে পাগুলি এখন ওঘর করে আরো মানুষ খুঁজে বেড়ালো। তারপর যা পেলো লুটপাট করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। নীরব হয়ে গেল বাড়িটা। তারপর সন্ধ্যাবেলা মিলিটারী ব্যবস্থা নিয়ে অবিনাশবাবু এলেন। চারহাত ঘর থেকে আমাদের প্রমাণ সাইজ দেহকে টেনে বের করলেন ওঁরা আধমরা অবস্থায়। বেরিয়ে এসে দেখলাম দাদার রক্তাক্ত দেহ, উপুড় হয়ে পড়ে আছে উঠোনে। বন্ধুদের দোল খেলবার ডাকে ঘর বাঁচাতে আমরা যেভাবে বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে রং নি, দাদা বোধ হয় আমাদের মান বাঁচাতে তেমনি বাইরে বেরিয়ে এসে ছুরি নিয়েছিলেন!

ওঁকে অমনি ফেলে রেখে আসতে হলো তোদের?

অমনি ফেলে রেখে চলে আসতে হলো আমাদের। ছোটভাই রঞ্জনের ফিট হচ্ছে। মা প্রায় অচৈতন্য। রাত এগিয়ে আসছে। কোন বাড়িতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নি। একবিন্দু আলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। টর্চের আলো ফেলে পথ দেখিয়ে অবিনাশবাবু আমাদের এনে বাড়িতে তুললেন। পেছনে পড়ে রইল খোলা ঘর রান্নাঘরে সাজানো রান্না। উঠোনে দাদার মৃতদেহ।

দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে রইল।

নমিতার চোখে নতুন করে ভেসে উঠল সেদিনকার মর্মান্তিক দৃশ্য। আর শিবানী যতটুকু কল্পনায় দেখা সম্ভব, তাই দেখতে লাগল আর বারবার শিউরে উঠতে লাগল।

অনেকক্ষণ বাদে মিঃ বোস এসে ঘরে ঢুকলে তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে দু'টি মুহ্যমান মেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলো। নমিতা তাড়াতাড়ি মুখের শোকার্ত ভাবটা সরিয়ে মুখটাকে স্বাভাবিক করে তুলল মিঃ বোসকে দেখে। শিবানী মিস জেনির শূন্য চেয়ারটা দেখিয়ে বললো, বসুন মিঃ বোস।

মিঃ বোস বসলেন না। শিবানীর কাতর শোকার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

শিবানী তখনও সম্পূর্ণ ঘটনাটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। অন্যমনস্কভাবে বললো, কিছু না।

কিছু না! তবে আপনার মুখ কান্নার চাপে এখন ভেঙে পড়তে চাইছে কেন? জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও যেন থেমে গেলেন মিঃ বোস। ভাবলেন, হয়তো শিবানীর এই নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার কিছু। মেয়েটি হয়তো তার কোন দুঃস্থ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। হয়তো কোন বিয়োগব্যথার সংবাদ নিয়ে এসেছে কিংবা কোন দুঃখজনক ঘটনার। একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, আপনি অফিস ছুটির পর বাইরের গেটে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন! এক ঘণ্টা হলো অফিস ছুটি হয়ে গেছে, আমি আধ ঘণ্টা ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার অপেক্ষা করছি—

শিবানী যেমন বসেছিল তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বোঝাই গেল না মিঃ বোসের কথা সে শুনতে পেয়েছে কি না।

নমিতা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে বলল, আজ আমি যাচ্ছি শিবানী?

যাবি—একটুক্ষণ ভাবল শিবানী। নমিতাকে যেতে দিতে ইচ্ছে করছিল না ওর। কথা বলতে যে ইচ্ছে করছিল তাও নয়। কেবল ওকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল।

যেভাবে ছিল সেভাবেই যদি থাকতে পারতো তবেই তা সম্ভব ছিল কিন্তু এখন আর তা নতুন করে হয় না। নমিতাকে আটকে রেখে তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েই বা ওর বাড়িতে গিয়েই হোক আর বলা যায় না, আয় চুপ করে বসে থাকি। তখন কথা বলার জন্য কথা খুঁজতে হবে। শিবানীও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, যাবি? আয় কিন্তু কালকে আসছিস তো?

দেখি।

দেখি নয়। আসতেই হবে। আমি তোর অপেক্ষা করব।

আচ্ছা।

কথা দিলি?

নমিতা হেসে বললো, দিলাম।

চলে গেল নমিতা।

মিঃ বোস গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই মেয়েটি মিসেস সেন?

আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই নি?

না।

মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কালকে দেবো।

তার আগে পরিচয় পাওয়া যাবে না?

না, তা কেন। মেয়েটির নাম নমিতা দেব। আমার ছোটকালের বন্ধু।

রেফিয়ুজি মেয়ে?

'রেফিয়ুজি মেয়ে' কথাটা বড্ড কানে বাজল শিবানীর। কঠিন কণ্ঠে বললো, আপনাদের সুখের জন্য বলি দেওয়া মেয়ে।

রাস্তার জনস্রোত আর গাড়ির স্রোতের দিকে নজর রাখতে রাখতেও একঝলক শিবানীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে মি. বোস বললেন, বুঝতে পারলাম না।

বোঝা খুব শক্ত।

বুঝিয়ে দিলেও বুঝব না?

বুঝবেন কিন্তু মনে থাকবে না। তাই ও বোঝার কোনো মূল্য নেই।

শক্ত ব্যাপারে মিঃ বোস ঢুকতেও চান না। শিবানী যে কতগুলি শক্ত বক্তৃতা দিলে না খুশিই হলেন মিঃ বোস তাতে। একেবারে সহজ দিকে চলে গেলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, চাকরি চায় মেয়েটি?

পারেন দিতে একটা—? উৎসাহে আগ্রহে একেবারে মিঃ বোসের দিকে ঘুরে বসল শিবানী।

আপনার বন্ধু যখন তখন যে পারতেই হবে মিসেস সেন।

কৃতজ্ঞতায় শিবানী মিঃ বোসের স্টিয়ারিং ধরা হাত স্পর্শ করে এলো।

এদিকে ট্রামের পথে কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল নমিতা। একটা শরীর হিম-করা ঠাণ্ডা স্রোত সর্বশরীর দিয়ে বয়ে গেল ওর। ওর যে ব্যাগে একটি পয়সাও নেই। নেই বলেই শেষ ইণ্টারভিউর পর ওকে হেঁটে আসতে হয়েছিল শিবানীর অফিসে। ভেবেছিল শিবানীর কাছ থেকে কিছু চেয়ে নেবে আসবার সময়। কিন্তু ভদ্রলোক আসায় আর তা সম্ভব হয় নি। মনেও ছিল না। এখন ও কি করবে!!

॥ ১৯ ॥

কলকাতা শহরের অফিস-ছুটির ভিড়! ভিড় তো নয়, যেন জনতার ঢল নেমে আসে অফিস-বাড়িগুলি থেকে রাস্তার ওপর। গাড়ি আর মানুষের স্রোত বয়ে চলে রাস্তায় আর ফুটপাতে। জনতার সেই স্রোতের সঙ্গে — স্রোতের জলের ওপরের ভাসমান বস্তুর মতো ভেসে চলেছিল নমিতা ট্রামস্টপেজের উদ্দেশ্যে। বিদ্যুৎ-চমকের মতো শূন্য ব্যাগের কথাটা মনে পড়ে যেতেই ঠিক বিদ্যুতাহতের মতোই নিঃসাড় দেহে দাঁড়িয়ে পড়ল সে রাস্তার ওপর। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো মানুষগুলির ভেতর থেকে। এসে একটা পানের দোকানের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। ব্যাগটা একবার খুলেও দেখলে না।

নেই—নমিতা জানে ওর এই পুরোনো এবড়ো-খেবড়ো ব্যাগটির মধ্যে একটা পয়সাও নেই। মনের মধ্যে পরিচ্ছন্ন হিসেব রয়ে গেছে ট্রাম-বাসের ওঠা-নামায়। কিংবা কথাটা তাও নয়। আট আনার পয়সা—সমস্ত বাড়ির মোট নগদ ক্যাশ। মনে মনে পরিচ্ছন্ন হিসেব করেই চার আনা পয়সা মা ছোটভাই -এর জন্য রেখে বাকি চারআনা ও ব্যাগে ফেলেছিল। কসবা থেকে গড়িয়াহাটা- -ওতো হাঁটা পথ। তারপর সেখান থেকে চব্বিশ নম্বর ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে চেপে সাত পয়সায় পণ্ডিতিয়া রোড। পণ্ডিতিয়া রোড থেকে দশ পয়সায় থিয়েটার রোড। থিয়েটার রোড থেকে মিশন রোও সেই দশ পয়সায়। হিসেবে দু'পয়সা কম হয়ে যাওয়ায়—একটা স্টপ হেঁটে সে কমিয়ে নিয়েছিল দু'টো পয়সা। শিবানীর অফিসে যাবে হেঁটে। মিশন রো থেকে ডালহৌসি। যদিও ওর মিশন রোর ইণ্টারভিউর জায়গা থেকে শিবানীর অফিস ডালহৌসির শেষ মাথায়। দূরত্বটা কম নয়। তবু খুব বেশিও নয়। হেঁটে আসা যায় এবং কাউকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করলে হেঁটে যাবার কথা শুনে তাদের চোখে বিস্ময় খুব বড় করে ফুটে ওঠে না— যেমন একদিন ডালহৌসি থেকে থিয়েটার রোডে হেঁটে যাবার কথা শুনে এক ভদ্রলোকে চটে উঠেছিল।

মনে মনে একটা বিষণ্ণ হাসি খেলে গেল নমিতার। কত নিয়ে বেরিয়েছিল! ক'পয়সা নিয়ে বেরিয়েছিল বললেই কথাটা ঠিক বলা হয়।

যদিও ওর মনে হাসি খেলে গেল, যা নিয়ে বেরিয়েছিল তার ভাষা প্রয়োগ নিয়ে। কত নিয়ে বেরিয়েছিল না ক'পয়সা নিয়ে। তবু হোক পয়সা। পয়সা তুচ্ছ নয়। এই 'নাই-বাজারেও' নয়। সদাশয় সরকারের অপার মনুষ্যত্বের মহিমাকে, যে মহিমাকে দিনে কম করেও বিশবার দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে প্রণাম করে নমিতা, সেই মনুষ্যত্বের মহিমায় এখনও এই 'নাই-বাজারেও' চারআনায় আধসের আটা বা একসের চাল হয়। ছোটভাই রতন গিয়ে দোকান থেকে চাল নিয়ে আসবে। মা সে চাল ধুয়ে এক সস্‌প্যান জলের মধ্যে ফেলে নিয়ে যাবেন কোন এক ঘরের রান্নাঘরে। তাঁরা তাঁদের উনোনে ফুটিয়ে দেবেন চাল কটা। মা-ছেলের গ্র্যাণ্ড ডিনার হয়ে যাবে নুন-ফেলা ভাত চার আনায়। আর বাকি চারআনা পয়সা দিয়ে কসবা থেকে মিশন রো পর্যন্ত ও চলে আসতে পেরেছে। আর এখন ব্যাগে সেই চারআনা পয়সা নেই বলে চোখে অন্ধকার দেখছে।

যদি কসবা থেকে মিশন রো আসতে ত্রিশ টাকা হতো ট্রামের টিকিট- – কি করতো তবে নমিতা?

কিছুই না। ঘরে পড়ে থাকত।

যদি একপোয়া চালের দাম একশ' টাকা হতো—কি করত তবে নমিতা?

কিছুই না। ঘরে মরে থাকত।

কেবল কি ও?

নমিতা স্পষ্ট দেখতে পায় গোটা দেশটাই ওর মতো হাত গুটিয়ে ঘরে পড়ে থাকত, ঘরে মরে থাকত। তবু তারা—

তবু তারা কি করত না সে কথা থাক। যা করবার শক্তি রাখে না, তা উচ্চারণ করা মিথ্যা বলে শুধু নয়—নমিতা অতি ভীরু মানুষ, উচ্চারণও করে না। ও বরং মহানুভব সরকারকেই দিনে বিশবার হাতজোড় করে প্রণাম করে, এমন মরা দেশের মরা মানুষগুলিকে যে ওঁরা কাঁচিয়ে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন না, সেই মহানুভবতার জন্য।

শূন্য ব্যাগ নিয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় পথে। ব্যাগ ও হাতে ঝোলালো, হাঁটাও শুরু করলো নমিতা কিন্তু ব্যাগটার মতই মাথাটা শূন্য মনে হতে লাগল ওর।

এখন কি করবে!!

ডালহৌসি থেকে কসবা— কি উপায়ে যাবে!

ভিড়ের সঙ্গেই চলতে চলতে নিজের বোকামিকে ধিক্কার দিতে লাগল নমিতা। মা পুরো আধুলিটাই ওকে নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'রতনের জন্য আমার জন্য যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবোখন আমি। তুই একটা পয়সা রাখ। পথে দু'চার আনা বেশি সঙ্গে থাকা ভালো।'

মা'র কথা না শুনে কি- মূর্খামিই করেছে! নিজের মাথাটা ছেঁচে ফেলতে ইচ্ছে করতে লাগল নমিতার। নতুন তো নয়, এমন কতদিন চোখ মুখ বন্ধ করে ঘরের শেষ পয়সা ক'টি নিয়ে ও বেরিয়ে পড়েছে। জ্যান্ত-প্রাণী দু'টো ঘরে বসে ক্ষুধায় ছটফট্ করবে কি না সে প্রশ্ন পর্যন্ত মনে আসতে দেয় নি। ফিরে গিয়ে দেখেছে মা ব্যবস্থা

করেছেন। এক ঘরে চা'ল ধার করে আর এক ঘরে ফুটিয়ে এনেছেন। তার একটু তরকারীও রতনকে দিয়েছে। তারই কিছুটা আবার মা ওর জন্যও রেখেছেন। নমিতা হাতে মুখে জল ছিটিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে সেই কড়কড়ে ভাত-তরকারী গিলে নিয়েছে। তারপর ঢক ঢক করে গ্লাসভর্তি জল খেয়ে নিয়ে পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছে, আঃ। তারপর সন্ধ্যাটা কী রমণীয়! মা আর রতনের সঙ্গে লণ্ঠনের আলোর সামনে বসে গল্প। কলকাতার, ঢাকার, গ্রামের বাড়ির, ইন্টারভিউয়ের। মা তো কোন দিনও উপোষ রাখেন নি ওদের। তবে কেন ও বাহাদুরি করে মা'র কথা শুনলে না। মা'র কথা শুনলে তো এই বিপদে ওকে পড়তে হতো না। ওর তো ভাবা উচিত ছিল এই যে, কেবল যাবার পয়সা হিসেব করে নিয়ে বেরুচ্ছে যদি শিবানীকে না পায় তবে ফিরবে কি করে! যতই নিশ্চয় থাক শিবানীকে পাবেই—নাও তো পেতে পারে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অফিসে না আসতে পারে সে। এসে প্রয়োজনীয় কাজে বেরিয়ে যেতে পারে। আরো কতো কি হতে পারে।

কিন্তু নমিতা শিবানীকে না পাওয়ার কথা মনেই আনে নি। আনলে ওর পথ চলার শক্তি থাকত না। আজকের দিনটা নমিতাও চলতে পারছে, মাও চালিয়ে নেবেন, কিন্তু কাল? কালকের কপর্দকশূন্য দিনটা মুখব্যাদান করে ওর হাত-পা অবশ করে রাখত। ইন্টারভিউগুলির প্রতি নমিতার কোন আকর্ষণ ছিল না। বরং ব্যর্থ-কাজের অবসাদই বেশি ছিল মনে। ওকে খাড়া রেখেছিল শিবানী। শিবানীর অফিসে গিয়ে পৌঁছোবার পর আর কোথাও কোন অন্ধকার দেখছিল না নমিতা।

ও টাকার কথা বলতে না বলতে শিবানী ওর ব্যাগের সব টাকা বের করে হাতে তুলে দেবে। নমিতা কত চাইছে সেটা সে শুনবেও না। তার যা সঙ্গে আছে সব দিয়ে দেবে। সে টাকা কি আর বিশ-পঁচিশের কম হবে? কখনই নয়। হয়তো আরো বেশিই হবে। শুধু তাই নয়। এর পর আর চাইবার প্রয়োজন হবে না। শিবানী নিজেই দিয়ে যাবে টাকা ওকে ওর চাকরি না হওয়া পর্যন্ত।

এ দেখাগুলি যে একটুও ভুল নয় এ-কথা নমিতা খুব ভালোভাবেই জানে। ভুল করেছে ও। না তা-ও নয়। ও ভুল করে নি। একেবারে প্রথম গিয়ে বসেই তো আর টাকার কথা বলা যায় না। তারপর আর সময় পেল কোথায়? ভুলেও গিয়েছিল দাদার মৃত্যুর সেই ভীষণ দিনগুলির কথা বলতে-বলতে! তা বলে গেলেও আবার মনে হতই, যদি না এমন অকস্মাৎ ভদ্রলোক এসে এ-রকম ছোঁ মেরে শিবানীকে নিয়ে চলে না যেতেন। তা আজ না হয়েছে কাল হবে—ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নমিতা, থেমে দাঁড়ালো আবার বের হয়ে এলো সেখান থেকে। এসে দাঁড়ালো একটা গাছের তলায়। এমন নিরুদ্দেশভাবে কোথায় চলেছে সে!

এখন কি করবে। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল নমিতা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে।

সকালবেলায়ও অফিস-ভিড়টা যদিও এভাবেই অফিসের দিকে ছোটে, কিন্তু তবু সে সময়কার ভিড়ের চেহারা আর অফিস-ছুটির সময়কার ভিড়ের চাপের চেহারা একেবারে আলাদা। অফিসের সময় আসাটা নানা সময়ের ভেতর ভাগ হয়ে যায়। কেউ আসে আটটায়, কেউ বা ন'টায়, কেউ এগারোটায়। নানা কাজে, বিভিন্ন সময়ে মানুষের আসা চলতেই থাকে। তাই অফিস-পাড়ার ভিড়টা বাড়ে জোয়ারের জলের মতো। কিছুটা আস্তে আস্তে। কিন্তু যখন ভাঙে তখন যেন বন্যার রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসে লোকগুলি রাস্তায়, ফুটপাতে ছড়িয়ে পড়ে। কেবল নানারঙের গাড়ির মাথা আর মানুষের— মাথা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। একটা মানুষকেও আলাদা করে দেখবার উপায় নেই। কেবল কালো কালো মাথার স্রোত। ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। ইন্টারভিউ হয়ে গেলে চলে গেছে। অফিস-ছুটির ভিড়ের চেহারাটা নমিতার দেখা ছিল না।

কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল ছিল না নমিতার। সবকিছুর দিকেই তাকাচ্ছিল কিন্তু কিছুই দেখছিল না। হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালো। দেখলো একটা মস্ত কালোমেঘ জলো হাওয়া নিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। লোকজন কিছু হাল্কা হয়ে এসেছিল, এখন সেই হাল্কা ভিড়টা মেঘ দেখে দৌড়োদৌড়ি করে ঘরে পালাচ্ছে।

মরিয়া হয়ে একটা বাসের দিকে ছুটতে গিয়েও থেমে গেল নমিতা! না, বাসের কণ্ডাক্টরগুলি যেমন হুঁশিয়ার তেমনি ধূর্ত। ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় না। একদিন ব্যাগ ফেলে আসার অভিনয় করেছিল টিকিট চাইতে এলে কিন্তু বিশ্বাস করাতে পারে নি। পরের স্টপে নামিয়ে দিয়েছিল কণ্ডাক্টরটা ওকে যে কেবল তাই নয়—বিশ্রী মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছিল পেছনে। কে যেন ভিড়ের মধ্যে থেকে টিকিটের পয়সাটা দিতে চেয়েছিল— সে কী অসহ্য লজ্জা! কেঁদে ফেলেছিল নমিতা!

জোর বাতাসে নমিতার কাপড় উড়তে লাগল। রুক্ষ চুল উড়তে লাগল। আঁচলটা কোমরে গুঁজে উড়ন্ত চুল হাতে চেপে ধরে নিরুপায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল নমিতা— কী করে!

এমনি সময় একদিকে একটা মস্ত গাড়ি নিঃশব্দে এসে ব্রেক কষে দাঁড়ালো নমিতার এমন গা ঘেঁষে যে, দু'পা পিছু হাঁটতে হলো নমিতাকে। আর একদিকে বড় বড় ফোঁটায় নেমে এলো জোর বৃষ্টি। লোকজন দৌড়ে দৌড়ে এ-দোকানে সে-দোকানে, এখানে আর ওখানে আশ্রয় নিতে লাগল। মুহূর্তে জনশূন্য হয়ে গেল রাস্তা। নমিতাও কোথাও ছাদের তলায় দাঁড়াবার জন্য দৌড়োতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। শুনতে পেলো—গাড়ি থেকে নেমে একজন আর একজনকে বলছে, তুই বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারেই তবে মিঃ মেননের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস?

গাড়িতে বসা স্টিয়ারিং-ধরা ভদ্রলোক জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

তবে ভাই একটু দাঁড়া। কয়েকটা জিনিস পাঠিয়ে দিচ্ছি, মেননকে দিস। বলিস, আমি কাল সকালে তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করছি।

কথাগুলি বলেই বৃষ্টির ভেতর মাথা নিচু করে ভদ্রলোক দৌড়ে গিয়ে সামনের মস্ত দোকানটায় ঢুকলেন।

চঞ্চল হয়ে উঠল নমিতা। তার আর বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য যাওয়া হলো না। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্সে যাচ্ছে গাড়িটা! সেখান থেকে কসবা আর ক'পা? ও যদি ওর বিপদের কথা জানিয়ে একটু পৌঁছে দিতে অনুরোধ করে? এতক্ষণ গাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে কতবার ভেবেছে, এর ভেতর কত গাড়ি তো বালিগঞ্জেও যাচ্ছে। যদি ওকে তুলে নিত। যদি জানত কোনটা যাচ্ছে ওদিকে তবে ও হয়তো গাড়ি থামিয়ে অনুরোধও করত ওকে তুলে নিতে। যে যতই কুনো স্বভাবের ভীরু লাজুক হোক— তেমন বিপদে সবা'র পক্ষেই সব সম্ভব হয়।

স্থির থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো নমিতার পক্ষে। একবার গাড়িটার দিকে, একবার স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকা ভদ্রলোকের দিকে তাকাতে লাগল। আবার যখন দেখতে পেলো, ভদ্রলোক তার অস্থিরতা লক্ষ্য করছে তখন অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে লাগল।

একবার পাটা বাড়াতে চাইল গাড়ির দিকে অনুরোধ করবার জন্য। আবার পা'টা আটকে রাখল।

কিন্তু কি ভাবছে লোকটি ওকে?

ট্রামে-বাসে উঠছে না, আশ্রয়ের জন্য দৌড়োচ্ছে না, জলবৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কেবল গাড়িটার দিকে আর তার দিকে তাকাচ্ছে কেন মেয়েটা।

ভাববেই তো।

আরো ভাববে—ভাববে বাজে মেয়ে কোন।

একটা লোক দৌড়ে একটা প্যাকেট গাড়িতে দিয়ে গেল। এ জনাই অপেক্ষা করছিল—

কাজ হয়ে গেল, এখন চলে যাবে। বাড়ি যাবার এমন একটা ঈশ্বর-প্রেরিত উপায়ও যাবে অমনি চলে, কেবল মুখ ফুটে কথাটা না বলতে পারার জন্য। তারপর সামনে থাকবে আগতপ্রায় রাতের অপরিচিত শহর রাস্তা। আর কপর্দকশূন্য হাত। ভয়ে শিউরে উঠল নমিতা। এ শহরের কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনা শোনা আছে। এসব অফিস-পাড়া আরো ভয়ঙ্কর। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনমানবহীন হয়ে যাবে এ জায়গা। থাকবে শুধু মাতাল আর গুণ্ডা।

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া হয়েছে—

এক্ষুণি চলে যাবে গাড়িটা—

হয়তো নমিতার ঠোঁট কেঁপে উঠে থাকবে। শরীরে প্রকাশ পেয়ে থাকবে অস্থির ব্যাকুলতা। ঠোঁট বন্ধ থাকলেও চোখে হয়তো ফুটে উঠে থাকবে কাতর মিনতি—ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে বাঁ দিকে একটু এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে ভদ্রলোক বললেন, আসুন।

নমিতার ভেতরটা এমন প্রস্তুত হয়ে ছিল যে, গাড়িতে ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে থাকার মতো গাড়ির মধ্যে উঠে এল ও।

ভদ্রলোক গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার লোকটির দিকে তাকালো নমিতা। একটুক্ষণ যেন অপেক্ষা করলে ওদিক থেকে কিছু জিজ্ঞাসা আসবার। ভেবেছিল লোকটির কাছ থেকে ওকে সহজ করার জন্য সহৃদয়তাসূচক কিছু কথা আসবে।

'একেবারে ভিজে গেছেন যে।' 'কোথায় থাকেন আপনি'—এমনি কিছু। কিন্তু লোকটির মুখ যেন পাথরে গড়া। কোন ভাবের প্রকাশ নেই সেখানে। অন্তত তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী ওর জন্য যে নরম রেখা কয়েকটা মুখে লোকটির থাকা উচিত ছিল— বা স্বাভাবিক ছিল, তা দেখতে পেল না নমিতা সে মুখে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

কোথায় থাকে ও —এটা তো জানতে চাওয়া নিতান্ত দরকার ছিল! নইলে কোথায় যাবেন, কোথায় পৌঁছে দেবেন বুঝবেন কী করে?

হয়তো ভাবছেন ও-ই বলবে?

তাই হবে! তখন নমিতা নিজেই কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, আমাকে নামাবার জন্য আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমি সেখানেই নামব।

ভদ্রলোক যেন বিস্মিত হলেন কথাটায়। একটু আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন, আপনি গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে থাকেন না কি?

না। আমি ওখান থেকে হেঁটে চলে যাবো। গড়িয়াহাট থেকে আমি সব সময় হেঁটেই বাড়ি যাই।

ও-আর অ-জাতীয় একটা মিশ্রিত শব্দ করলেন শুধু ভদ্রলোক, আর কিছু বললেন না। নমিতা দেখল ওর উত্তর শুনে ভদ্রলোকের মুখের বিস্মিত ভাবটা কেটে গিয়ে এবার আবার আগের মতই ভাবলেশহীন হয়ে গেল।

অর্থাৎ ও গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে থাকে এটা লোকটির কাছে অভাবিত ঠেকেছে। থাকে না এবং তার পরের কথাগুলিও লোকটির জানা।

—নমিতা বুঝল ঠিক— কিন্তু এর অর্থটা যা করলে তা ভুল।

ভাবলে খুব স্বাভাবিক। গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারটা হলো সব অফিসার আর বিত্তবানদের জায়গা। ও যে কোন অফিসার বা বিত্তবানের কন্যা বা স্ত্রী নয় তা ওর বেশবাসই বলছে। আর বেশবাস কতটুকু বলে! ওর এই বেশবাসই শিবানীর যদি পরা থাকে আর সে বলে এই মাত্র বিলেত থেকে চার্টারড্ প্লেনে এসে নামলাম, কেউ বিস্মিত হবে না এতটুকুও। কিন্তু ও অফিসার্স কোয়ার্টারে থাকে শুনলেও বিস্মিত হয়। আসল কথা হলো ব্যক্তিত্ব। কিংবা ব্যক্তিত্ব কথাটাও বড় কথা। অবস্থার ছাপটা মানুষের চোখে-মুখে লেখা থাকে। ভাবে-ভঙ্গিতে ফুটে বেরোয়। ওর দৈন্য লেখা রয়েছে ওর চোখের ছায়ায়। ওর পদক্ষেপের পাতায়।

নমিতা একেবারেই ভিজে গিয়েছিল। ব্লাউজ কাপড় একেবারে শরীরে লেপ্টে গিয়েছে। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে শরীরে জড়িয়ে ব্যাগটা আব্রুর মতো বুকের উপর চেপে ধরে গাড়ির কোণ ঘেঁষে বসে রইল চুপ করে। এতবড় একটা বিপদের সমাধান এমন সুন্দরভাবে মিটে গিয়ে খুব স্বস্তিবোধ করছিল ও। এত দেরি করে ও কখনো ফেরে না। মা যদিও জানেন আজ ও শিবানীর কাছে যাবে। তবু ঝড়-বৃষ্টি দেখে নিশ্চয়ই চিন্তিত হচ্ছেন। মাকে আজ নমিতা সত্যি বলবে, মা, আমরা কেবল ঘরে বসে বসে ভয় পাই। পৃথিবীটা সত্যি এতো ভয়ের নয়। এই তো কেমন বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম বাড়ি আসা নিয়ে, ঝড়-বৃষ্টি সে বিপদ আরো বাড়িয়ে তুলেছিল, কিন্তু এসে গেলাম তো! দেখলে ভালভাবেই তো এসে গেলাম। কেবল ভয় পাবে না। তোমরা মায়েরা এমন ভীতু হও বলেই আমরা ভীরু হই।

গাড়ি চলেছে। ঝড়-বৃষ্টির বেগ যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পথে কোন লোকজন নেই। বৃষ্টির জন্য সামনেটা কুয়াশা ঢাকা মনে হচ্ছে। ওয়াইপারটা অনবরত এদিক-ওদিক করতে করতে গাড়ির জল মুছে দিচ্ছে। লোকজন রাস্তায় না থাকলেও গাড়ি চলছে সমানেই। ওদের গাড়িকে কখনো ডান পাশে কখনো বাঁ পাশ কেটে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িগুলি। কখনো পুলিশের হাত তোলায় ওদের থামতে হচ্ছে। কখনো নীল বাতি জ্বলে উঠতে দেখে ফের চলছে।

রাস্তায় বাতি জ্বলেছে। মাঝে মাঝে রাস্তার সেই আলো বেড়ে গাড়ির ভেতরের নীল রঙটা চোখে আবেশ আনছে। পথের উঁচু-নিচুতে এক-একবার গাড়ি দুলে উঠছে আর নমিতার মনে হচ্ছে সাগর জলের এক-একটা নরম ঢেউ যেন চলে যাচ্ছে ওর পিঠের তলা দিয়ে। লোকটি যদি নমিতার আপন কেউ হতো, তবে সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর আরামে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ত প্রকাণ্ড গাড়িটার গদিতে মাথা রেখে।

একটা ভীষণ রকমের সোঁ সোঁ শব্দের হাওয়া বইছে। নমিতা মা'র কাছে শুনেছে আশ্বিনের কালো মেঘ কালবৈশাখীর চাইতেও খারাপ। আশ্বিনের আকাশে ঝড়ের যে তাণ্ডব থাকে তা নাকি সাংঘাতিক ভয়াবহ হয়। মার কাছে গল্প শুনেছে তেরশ' ছাব্বিশ সনের আশ্বিনের ঝড়ের। মা'র তখন সবে দশ বছর বয়স। সেই দশ বছরের মেয়ে মা এখনও পঞ্চান্ন বছরেও সেই ঝড়ের বীভৎসতা ভুলতে পারেন নি। শীতলক্ষ্যা নদীর বুক মৃত মানুষে ভরে গিয়েছিল। বাড়িঘর চাপা পড়ে লোক মরেছিল ঘরে ঘরে। সে ঝড়ের কথা বলতে বলতে শিউরে উঠেছেন তিনি এই সেদিন পর্যন্তও। তবে এখন আর শিউরে ওঠেন না। উঠোনে পড়ে-থাকা ছেলের খুন হওয়া রক্তাক্ত মৃতদেহ চোখের ওপর যে মা'র— সে মা আর কোন ভয়ঙ্কর ছবি কল্পনা করে শিউরোবে!

ঝড় উঠছে না? নমিতার চোখে একটু শঙ্কা।

পুরো চোখে নয়, আধা চোখে একবার ভদ্রলোক তাকালো নমিতার দিকে। তারপরই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল, মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর আবার বললে, ভয় করছে?

সম্বোধনহীন জিজ্ঞাসায় একটু যেন অস্বস্তি হলো নমিতার। যদি ভদ্রলোক, 'ভয় করছে আপনার?' বলত তবে এ অস্বস্তিটা হতো না। সসঙ্কোচে বললে, না। ভয় করবে কেন!

মনে মনে বললে, ভয় এখন করবে কেন। গাড়িতে ভয় কি। ভয় করবে বাড়ি গিয়ে যদি সত্যি ঝড় ওঠে। জমিদারের পুরোনো বাড়ি। ভাঙাচোরা কড়িবর্গা খুলে পড়া, ঝুলে পড়া। বাড়িটা মস্ত। কুড়িটার ওপর ঘর। তারই এক-একটা ঘরে বাস করছে ওরা একদঙ্গল উদ্বাস্তু, বাড়িটা দখল করে। একটুকরো করে রান্নার জায়গা পেয়েছে বারান্দায়। জানালায় বেশির ভাগেই পাল্লা নেই। পুরোনো শাড়ি-চাদর ইত্যাদি দিয়ে সবাই পর্দা ঝুলিয়ে নিয়েছে। সেগুলি এতক্ষণে উড়ে গেছে তো নিশ্চয়ই। ঘরদোর, বিছানাপত্র ভিজে একাকার হয়েছে জলে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ও নিয়ে ভাবে না ওরা। ওরা—বাড়িটার কড়িবর্গ থেকে ছাদ মাথায় ভেঙে পড়াটা নিয়েই কেবল ভাবিত। ওরা কেবল মাথাটাই বাঁচাতে চায়। মাথাটা বাঁচলেই খুশি।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল না গাড়ি চলছে? ডালহৌসি থেকে বালীগঞ্জ কি এত সময়ের পথ? না ও হাঁটতে হাঁটতে উল্টো পথে চলে গিয়েছিল জনতার সঙ্গে?

তাই হবে।

হাওয়ায় শাড়ি-ব্লাউজ প্রায় শুকিয়ে এসেছিল কিন্তু শরীরে ভিজে শাড়িজামা শীত ধরিয়ে দিয়েছিল। সেটাও অনেক কমেছে। শরীরের সঙ্গে আর জামা কাপড়ও লেপটে নেই। বুকের ওপর চেপে ধরা ব্যাগটা কোলের ওপর নামালো নমিতা। ভাবতে লাগল, ভদ্রলোক তো নামিয়ে দেবেন ওকে এক্ষুণি গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার্সের কাছে, কিন্তু এই ঝড় জলের মধ্যে ও যাবে কি করে বাড়ি। গড়িয়াহাট থেকে হেঁটেই যায় ও ঢাকুরিয়া, কিন্তু তাই বলে দূরত্বটা কম নয় খুব। কতকটা জায়গায় আবার বৃষ্টি হলে জল জমে। চটি খুলে শাড়ি হাঁটুর ওপর তুলে চলতে হয়। ময়লা নোংরা জল। কসবার কাঁচা ড্রেনের পচা জল আর বৃষ্টির জল এক হয়ে বইতে থাকে। মা ওকে স্নান করিয়ে কাপড় না ছাড়িয়ে ছোন না। ভিজে পা হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা—ও গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মা পচা ড্রেনের জলের ওপর দিয়ে আসার ঘেন্নায় নাক-মুখ কুঁচকে পা ধোবার জল আনতে ছুটেছেন—দৃশ্যটা কল্পনায় দেখেই নমিতার মনে হলো ও মা'র কাছে পৌঁছে গেছে—বেঁচে গেছে। হ্যাঁ, এখন ও বাড়ি পৌঁছতে পারলেই বাঁচে। তা যেভাবে হোক, যে অবস্থায় হোক। ড্রেনের পচা জলে সাঁতার কেটেই হোক। মা নিশ্চয়ই রতনকে পথের মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। না, এ ঝড়ে রতনকে পাঠান নি। নিজেও বসতে পারেন নি। মা-ছেলে দু'জনই দরজায় বসে আছে। ওকে দেখে রতন লাফিয়ে উঠবে। মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। শ্রান্ত, ক্লান্ত মেয়ের একটু খাওয়া, একটু বিশ্রামের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। ও হাত পা নেড়ে মেঝের বিছানার ওপর টান হবে। পিঠের তলায় সেইবলার গাড়ির পালকের গদী— (মালিকের ফরমাসে বিশেষ ভাবে তৈরি) তাতে পিঠ রেখে নমিতা ওর ঘরের ভেতর বিছানায় শুয়ে পড়তে পারার আরাম কল্পনায় উপভোগ করছিল। ভদ্রলোকের অপ্রত্যাশিত জিজ্ঞাসায় একটু চমকে লোকটির দিকে তাকাল। কথাটা ঠিক শুনে উঠতে পারে নি। বিনীত কণ্ঠে বললো, কিছু বললেন?

কি কাজ করেন আপনি?

ভেতরটায় যেন স্বস্তি নেমে এলো নমিতার। লোকটির মনের এই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসায় রহস্যময় লাগতে আরম্ভ করেছিল নমিতার। মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শুরু করেছিল ও। আরামবোধ করল এবার। ঘাড় নিচু করে একটু মরা গলায় বললে, আমি কিছু করি না।

আচ্ছা! বলে একটু বিরাম দিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, অফিসপাড়ায় তবে করছিলেন কি?

লোকটির চোখের সন্দিগ্ধ কোণাকুণি দৃষ্টি নমিতা খেয়াল করলে না। বললে, কাজ খুঁজছি। ইন্টারভিউ ছিল আজ।

আচ্ছা। পেলেন?

না।

গাড়ি যেন সে চালাচ্ছে না— নিজে নিজে চলছে গাড়ির হুইলের ওপর এমনি অলসভাবে ডান হাত রেখে বাঁ হাতে গাড়ির গদির ওপর পড়ে থাকা সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চাপলেন ভদ্রলোক। লাইটার টিপে সিগারেট জ্বেলে তাতে গোটা দুই টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, আশা পেলেন?

নমিতা বললে, না। সে কোথাও কিছু আশা পায় নি। আশা না পাওয়ার কথা বলতে বলতে মনের ভেতর কিন্তু একটা দারুণ আশা জেগে উঠল নমিতার। এই ভদ্রলোকের হাতেই হয়তো কত চাকরি রয়েছে। ইচ্ছে করলেই হয়তো ইনি কাজ দিতে পারেন। কোন বড় ব্যবসায়ী নিশ্চয়। ব্যবসায়ী না হলে কি এত টাকা হয়। ওর যেমন চোখের পাতার কালো ছায়া থেকে ধুলো মাখা গা পর্যন্ত দারিদ্র্যের কথা বলছে, এঁর বাটন হোলের লাল গোলাপ কুঁড়ি থেকে পায়ের ঝক্‌ঝকে জুতো পর্যন্ত ঐশ্বর্যের কথা বলছে। গাড়ির মহার্ঘতার কথা নয় ছেড়েই দেওয়া গেল। আর যদি মালিক-টালিক কোন কিছু নাও হন—বিরাট কিছু কাজ করেন এতো নিশ্চয়ই। চাকরি না থাকলেও এঁরা চাকরি তৈরি করে নিয়ে দিতে পারেন, নমিতা কতজনের মুখে শুনেছে।

ইনি ইচ্ছে করলে কালই হয়তো ওর চাকরি হয়ে যেতে পারে—মনের চঞ্চলতা ওকে একটু নড়ে চড়ে বসালো। শিবানী কাজ করে দেবে বলেছে। কিন্তু তার জন্য তো অপেক্ষা করতে হবে। একটা চাকরি পাওয়ার পক্ষে সে অপেক্ষাটা হয়তো কিছু বেশি সময় নয়, কিন্তু ওর যে কালকে— মুখে তুলবার মতোও একটা দানা নেই ঘরে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই দয়ালু। নইলে ওকে তুলে নিতেন না গাড়িতে। তিনি তো জানতেন না ওকে কোথায় নামাতে হবে। ও তো অনেক দূরে—ভদ্রলোক যেখানে যাচ্ছেন তা থেকে উল্টোপথেও— থাকতে পারত।

ভদ্রলোক হৃদয়বান!

আকুল হয়ে উঠল নমিতা—ভদ্রলোক যদি বলেন, আসুন কাল আমার অফিসে। একটা চাকরি দিয়ে দেব।

সম্ভব নয়?

এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে না?

এমন ঘটনা কি ঘটে না?

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য কি একটাও ওদের জীবনে আসতে পারে না? কেবল দুঃখই আসতে পারে?

না না, নিমকহারামি করবে না ঈশ্বরের প্রতি নমিতা। ভাগ্য ওর— ও যে শিবানীর দেখা পেয়েছে কলকাতা শহরে। মা'র কাছে শুনেছে বিপদ যখন আসে তখন একটার পর একটা আসে। সৌভাগ্য যখন আসে তখনও নাকি তাই আসে। বিপদের মহাসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে—এবার বোধ হয় কূল মিলছে। শিবানী সৌভাগ্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। এবার একটার পর একটা আসবে।

কোথাও কোন কাজ করেছেন কোনদিন?

করেছি। স্কুলে পড়াতাম।

কাজ গেল কেন?

ঢাকা ছেড়ে চলে আসতে হলো।

আপনারা রেফিউজি! যেন ঠিকই বুঝেছিল এমনি একটা ভাব করলে লোকটি। বললে, মাস্টারি ছাড়া আর কি কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয়?

আশায়, উত্তেজনায় ভেতরটা কাঁপতে লাগল নমিতার। একটু হাসল। একটু নড়েচড়ে বসল। একটু তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। বললে, শিখে নেবো যা পাবো।

নমিতা জানে না, ওর এখনকার হাসি, ওর এখনকার দৃষ্টি, ওর এখনকার শরীরের সামান্য নড়াচড়ার ভঙ্গিমার ভেতরও যা খেলছে তার নাম লাস্য। পুরুষের কাছে যখন নারী কিছু প্রার্থী হয়, তখন এ সব অস্ত্র প্রয়োগ করে। নমিতা সত্যি জানে না গাড়ির কোণ ঘেঁষে বসে থাকা মলিন মেয়েটি রূপান্তরিত হয়েছে লীলাময়ী নারীতে।

ভদ্রলোক কথা আর গাড়ি চালানোর ফাঁকে ফাঁকে নমিতার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক-একবার চোখ বুলিয়ে আনতে লাগল। নমিতা অনুভব করল এটা শুধু তাকানো নয়। এ দেখা। ভদ্রলোক ওকে দেখছেন। দেখুন।

পুরুষরা সুন্দরী মেয়ে দেখতে ভালোবাসে।

অতি নরম হাতে সামনের চুল পেছনে ঠেলে দিল নমিতা। অনেকখানি বাড়তি কোমলতা ঢালল নমিতা সে হাতে— একটা কাজ, একটা চাকরি, ভদ্রলোক কি ওকে নামিয়ে দেবার সময় বলবেন না, কাল আসবেন আপনি অফিসে। একটা কাজ দেওয়া যাবে যা হোক।

॥ ২০ ॥

সন্দেহ-শঙ্কাহীন মন নমিতার আপন ভাবনাতেই বিভোর ছিল। সে খেয়ালই করে নি কতটা সময় এর মধ্যে পার হয়ে গেছে। বুঝতেও পারে নি যে গাড়ি বালিগঞ্জের দিকে না গিয়ে অন্য পথ ধরে চলছে। তার বুঝতে পারার কথাও নয়। ক'টা পথ সে চেনে কলকাতার! ট্রামে আসা-যাওয়ার কয়েকটা পথ সে চেনে বটে, কিন্তু গাড়ি তো সব সময় ট্রামরাস্তা ধরে চলে না। পথ সংক্ষিপ্ত করতে নানা পথে চলে। তা ছাড়া পথের দেখাই বা যাচ্ছিল কি! আশ্বিনের ছোটবেলা। ছ'টা বাজতে না বাজতেই মনে হচ্ছে কত রাত। তাতে ঝড়ে-বৃষ্টিতে সব আবছা অস্পষ্ট। পথের বাতিগুলির মাথায় বৃষ্টি পড়া ছাড়া আর কিছুই প্রায় বাইরের দেখা যাচ্ছিল না। অভিজ্ঞ লোকেরও বোঝার উপায় নেই গাড়ি কোন্ পথে চলেছে। নমিতা তো —আনাড়ী মানুষই। চোখ বুজে বসে থাকাটা শোভন নয় বলেই এতক্ষণ সে চোখ মেলে বসেছিল আর সামনের কাচের পর্দার উপর বৃষ্টির ফোঁটার নাচ দেখছিল। এখন দুইহাতে আশালতা আঁকড়ে ধরে কেবল দোল খাচ্ছে— —চাকরী— চাকরী—চাকরী। একটা কাজ — ওদের দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন, ওদের ক্ষুধার অন্ন, পরার বস্ত্র—এই লোকটির হাতের মুঠোয়! স্টিয়ারিং ধরা বলিষ্ঠ হাত দু'টো যদি এঁর এতটুকু করুণাও প্রকাশ করে, তবে—তবে যে কি হয় ভাববার আগেই বুকটা যেন উত্তেজনায় দুলতে থাকে নমিতার—ভদ্রলোক কি ওকে নামিয়ে দেবার সময় তাঁর কার্ড ধরে দিয়ে বলবেন, কাল আসবেন আমার অফিসে। সত্যিকথা বলতে নমিতা ভদ্রলোকের হাতের দিকেই তাকিয়েছিল। ও যে পথে, সে কথাও মনে ছিল না ওর। হঠাৎ গাড়ি থামতে দৃষ্টিটা বাইরে গিয়ে পড়ল। দেখল, পুরানো আমলের এক ত্রিশূলে গাঁথা লোহার বন্ধ গেটের কাছে গাড়ি এসে থেমেছে। হেডলাইটের চড়া আলো অন্ধকার বাড়ির ভেতর ফেলে ভদ্রলোক হর্ন বাজাচ্ছেন। চারদিকটায় ভালো করে একবার চোখ বুলিয়ে আনল। কিন্তু বুঝল না এ কোন্ জায়গা। শুধু বুঝল বাড়িটা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্স নয়। স্থানটাও বালিগঞ্জ নয়।

দারোয়ান দৌড়ে এসে বৃষ্টির মধ্যে ছুটোছুটি করে গেটের দুই ভারী পাল্লা টেনে টেনে খুলে ধরল। বাড়ির কম্পাউণ্ড পার হয়ে এসে গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি থামল। ভদ্রলোক নেমে নমিতার দিকে ঘুরে এসে দরজা খুলে ধরে বললে, এসো।

এসো!

ভয়ে-বিস্ময়ে দম বন্ধ হয়ে আসবার অবস্থা হলো নমিতার।

কোনমতে বন্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে, এখানে কোথায় নামব? এটা তো বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্স নয়।

না।

এটা তো বালিগঞ্জও নয়!

না।

তবে এখানে আমি নামব কেন? থরথর করে গলা কাঁপতে লাগল নমিতার।

ভদ্রলোক স্থির চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন নমিতাকে।

অস্থিরতায় নমিতা একহাত দিয়ে আর একহাত কচলাতে কচলাতে বললে, এ কোথায় আপনি আমায় নিয়ে এলেন? এখানে আসবার তো কথা ছিল না আপনার। আপনি বালিগঞ্জে যাচ্ছেন বলেই না আমি আপনার গাড়িতে ড

তাই!

লোকটির কণ্ঠে বিদ্রূপের ছোঁয়া।

লোকটি ওকে কি ভেবে গাড়িতে তুলেছে, কিজন্য এখানে নিয়ে এসেছে বুঝতে বাকি রইল না আর। লজ্জায় ঘৃণায় ভেতরটা শিউরে উঠল নমিতার। আর্তকণ্ঠে বলে উঠল সে, হ্যাঁ তাই। আপনি যেখানে যাচ্ছেন-- সেখানে নামিয়ে দিলে অনায়াসে বাড়ি চলে যেতে পারব বলেই আপনার গাড়িতে উঠেছি আমি— বিশ্বাস করুন।

তুমি সত্যি বাড়ি যাবার জন্য ওভাবে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলে?

বিশ্বাস করুন—দু'হাত জোড় করল নমিতা।

বাড়ি যাবার জন্য অপরিচিত কারুর গাড়িতে এভাবে কোন ভদ্রমেয়েকে উঠতে দেখেছ কোনদিন?

এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নমিতা।

লোকটির মুখে-চোখে বিরক্তি, তিক্ততা, অধৈর্য্য ফুটে উঠল। যেন তার মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। যেন শুধু নমিতা নয়, সে-ও অভাবিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে। তিক্তকণ্ঠে বললে, এভাবে পথে দাঁড়িয়ে যারা ডাকে, তাদের আমি কোনদিনও গাড়িতে তুলি নে। আজ তোমাকে তুলেছিলাম সেও নিতান্তই তোমার আকুলতায়—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার আকুলতায়ই তো আপনি আমায় গাড়িতে তুলেছেন। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল নমিতা, আমিই তো এসেছি, সেধে এসেছি। আমার যে বাড়ি যাবার পয়সা ছিল না।

আচ্ছা! বলে লোকটি এবার একটু হাসলে।

এ হাসি অবিশ্বাসের, বুঝতে পারল নমিতা। ওর ব্যাগে যে ট্রামের টিকিট কাটার মত ক'টা পয়সা নেই— এ কথা বিশ্বাস করছে না লোকটা। ভাবছে, পথে দাঁড়িয়ে চোখে ডাকে যে মেয়েরা তাদের কেউ সে নয়—এটা বোঝাবার জন্য অভিনয় করছে সে। ব্যাগের মুখ টেনে খুলে কোলের উপর উল্টে ধরল নমিতা। টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস, কিছু কাগজপত্র আর একটা রুমাল ব্যাগ থেকে কোলের উপর পড়ল। সেগুলি হাতে তুলে লোকটির দিকে বাড়িয়ে ধরে সে বলত লাগল, দেখুন দেখুন—সত্যি বলছি কি না। দু'টো পয়সাও আছে কি না আমার কাছে দেখুন।

এভাবে বেরিয়েছিলে কেন?

ব্যাগের জিনিস ব্যাগে ভরে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে নমিতা বললে, এক বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম ভেবেছিলাম তার কাছে ধার পাব।

পেলে না?

পেলাম না নয়। তার কাছে চাইবার আগেই একজনের সঙ্গে সে বেরিয়ে গেল। আমার চাইবার সুযোগ হলো না।

ট্রামে-বাসে চড়বার পয়সা ছিল না, বৃষ্টিতে পারছিলেনা পথ চলতে, এমন অসহায় অবস্থায় গাড়িটা বালিগঞ্জে তোমার বাড়ির কাছেই যাচ্ছে শুনে তুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলে। আমি ডাকতেই উঠে এসেছিলে—এই হলো তোমার বক্তব্য।

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

গাড়ির খোলা দরজা ধরে একটু সময় চুপ করে রইল লোকটি। তারপর বললে, ঠিক আছে। পৌঁছেই দিয়ে আসছি তোমাকে। কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে।

কেন?

আমার একটু কাজ আছে ভেতরে। সেরেই আসছি। বেশি সময় লাগবে না।

আপনার ড্রাইভার আমায় পৌঁছে দিক না।

এখানে আমার ড্রাইভার থাকে না। থাকলে তাকে পাঠিয়ে দিতাম। তোমার জন্য আমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। দমদম থেকে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিতে গিয়ে অত সময় নষ্ট করতাম না। কিন্তু উপায় নেই। আমাকে যেতে হবে।

—এ্যাঁ, দমদম এটা!

কেন, দমদম কি ভয়ঙ্কর জায়গা নাকি?

না, তা নয়। অনেক দূর সেটাই বলছি।

ঠিক আছে পৌঁছে দিচ্ছি। এখন নেবে এসে একটু বোস।

আমি এখানেই বসছি। আপনি আপনার কাজ শেষ করে আসুন।

তুমি নামবে না?

আপনি আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।

অর্থাৎ যে বিশ্বাসে বিনা দ্বিধায় তার গাড়িতে মেয়েটি উঠে বসেছিল, সে বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে ওর —একটু সময় স্থিরদৃষ্টিতে নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। মনে মনে বুঝি একটু হাসলও। বিশ্বাস-অবিশ্বাস কি এমনি অঙ্ক কষে করে ফেলা যায়! এ মুহূর্তে যে বিশ্বাসের, পরমুহূর্তে সে অবিশ্বাসের হয়ে উঠতে পারে। অবিশ্বাসের ব্যক্তিও বিশ্বাসের কাজ করতে পারে। মেয়েটি তখন ভুল করেছিল বিশ্বাস করে। এখনও আবার ভুল করছে অবিশ্বাস করে। গম্ভীর স্বরে সে বললে, আমার কিছুটা দেরি হবে। এতক্ষণ যদি ঘরে না গিয়ে বাইরে গাড়িতে ঝড়জলের ভেতর তুমি বসে থাক, তবে চাকর-দারোয়ানদের বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। দরজা খুলে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, নামছ না—তাতেই অনেকটা বোঝা হয়ে গেছে তাদের। আর অপমান বাড়াতে না করছি। নেবে এসে বোস।

এবার আর বলা নয়, যেন আদেশ করল সে নমিতাকে নামতে। তারপর অপেক্ষামাত্র না করে গাড়ি বারান্দার প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে, বারান্দা পার হয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

লোকটি ওকে নামতে আদেশ করে চলে গেলে প্রথমটায় মুখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নমিতা। তারপর কান্নার বেগ প্রশমিত হয়ে এলে চোখ-মুখ মুছে সোজা হয়ে বসল।

কি করা যায় এখন!

কি অন্ধকার!

বাড়িটার গেটের মাথায় একটা বাতি জ্বলছে, কিন্তু সে গেট এখান থেকে অনেক দূরে।

এটা দমদম।

নিশ্চয়ই এটা কোন পুরোনো বাগানবাড়ি। কোন ধনী—হয়ত এই লোকটির কোন পূর্বপুরুষ ভোগবিলাসের জন্য এই বাগানবাড়ি এমন নির্জন স্থানে নির্মাণ করেছিল। ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনীর মত কত প্রেম- প্রণয়- প্রতিহিংসার কাহিনী এখানে ক্ষোদিত আছে। ক্ষোদিত রয়েছে না জানি কত নারীর লাঞ্ছনার ইতিহাস। এই যে বাড়িটার উপর অঝোরে জল ঝরে চলেছে, এ যেন ভৌগোলিক বৃষ্টি নয়— ঐতিহাসিক বৃষ্টি। ওর আজকের কান্নার মতো অসংখ্য জমাট বাঁধা কান্না আজ আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে। বাতাসটাও দক্ষিণ সমুদ্র থেকে আসছে না, আসছে সেইসব অত্যাচারিত নারীদের বুক থেকে।

এভাবে বসে থেকে লাভ কি?

নেবে পড়বে?

করবে কি নেবে? যাবে কোথায়? কিন্তু বসে থেকেই বা কি করবে?

নেবে পড়ল নমিতা গাড়ি থেকে। গেটের দিকে তাকালো। দেখলো দারোয়ান তার ঘরেই বসে আছে, কিন্তু লক্ষ্যটা ওরই দিকে। গেট বন্ধ।

তা দারোয়ান ওর দিকে নজর রাখবেই তো! নইলে প্রভুই কি আর আদেশ করে এত নিশ্চিন্তে ওকে এখানে রেখে ঘরে গিয়ে ঢুকতেন।

জীবানন্দের মতো লোকটা যদি বলে ওঠে, 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি পাইকদের দিয়ে দি!'

ভয়ে সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল নমিতার। ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। এ দুর্গ্রহ থেকে ঠাকুর রক্ষা করো আমায়—রক্ষা করো।

সময় বয়ে চলল। একবার গাড়ির বাইরে এলো। আবার গিয়ে ভেতরে বসল। ফের বাইরে এলো। ফের গিয়ে আবার গাড়িতে বসল। একটানা বৃষ্টির শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। বৃষ্টি ঝরার দৃশ্য ছাড়া কোথাও কোন দৃশ্য নেই। দারোয়ানটা তেমনিভাবে বসে আছে ওর দিকে চোখ পেতে। ভেতরের ঘরে আলো জ্বলছে। বাতাসে পর্দা উড়লে ভেতরটা কিছু চোখে পড়ছে। বোঝা যাচ্ছে ওটা বসবার ঘর।

এক পা এক পা করে সিঁড়ি ভেঙে অবশেষে লোকটির উদ্দেশ্যেই রওনা হলো নমিতা। উঠতে উঠতে ভাবতে লাগল, কে জানে মা আর রতন কি করছে! হয়তো দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে বৃষ্টি-ঝড় মাথায় করেই রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! আরো একটু রাত বাড়লে মা কাঁদতে শুরু করবেন। প্রতিবেশীরা হয়তো থানায় খবর দেবার, হাসপাতালগুলিতে খোঁজ নেবার কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করবে—তখনও গিয়ে ও পৌঁছোতে পারবে কি না কে জানে! আজ ভাগ্যে কি আছে তাই বা কে জানে! তাড়াতাড়ি হাতের ছোট্ট রুমালে মুখ মুছে নিয়ে ঘরে ঢুকল নমিতা। কিন্তু দেখল সে-ঘরে কেউ নেই। মূল্যবান সোফা কৌচে কার্পেটে সাজান ঘর শূন্য। উঁচু পাওয়ারের আলোতে ঝক্‌ঝক্ করছে ঘরটা।

ঘরের ভেতর ঢুকেই যে জিনিসের ওপর ওর চোখ স্থির হয়ে রইল, তা হলো টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোন।

উত্তেজনায় বুকটা ধক্‌ধক্ করতে লাগল নমিতার। এই তো হাতের কাছে উদ্ধারের উপায় সাজানো রয়েছে। লোকটার কান বাঁচিয়ে একটা আর্ত আহ্বান যদি ও শিবানীর কানে একবার পৌঁছে দিতে পারে, তবে শিবানী এক্ষুণি তার গাড়ি নিয়ে ছুটে আসবে। বুকের ভেতর যেন ধস্ নেমেছে। ধপ্ করে বসে পড়ল নমিতা টেবিল-ফোনের কাছে।

ফোনের ওপর হাত রাখল—

কিন্তু ফোন নম্বর? শিবানীর ফোন নম্বর তো জানে না ও!

কিন্তু এই তো গাইড বই সামনে রয়েছে। কম্পিত হাতে গাইড বইটা কোলের ওপর টেনে আনল। একবার এদিক ওদিক তাকালো। যেন চুরি করছে। তারপর গাইড পাতা ওল্টাতে লাগল শিবানীর ফোন নম্বরের জন্য। কিছুক্ষণ বাদে মনে মনে কপালে করাঘাত করে ধিক্কার দিলে নিজেকে, কি বোকা আমি! নাম দিয়ে ফোন নম্বর খুঁজছি. ফোন নম্বর তো থাকে উপাধি দিয়ে!

শিবানীর পদবী কি?

জানে না—জানে না নমিতা। বিয়ের আগের পদবী জানত। বিয়ের পরের জানে না।

কিন্তু.... কিন্তু যে ভদ্রলোকের সঙ্গে শিবানী বেরিয়ে গেল, সে ভদ্রলোককে 'মিসেস সেন' বলেই শিবানীকে সম্বোধন করতে শুনেছে না?

হ্যাঁ—মিসেস সেন। শুধু ঐ ভদ্রলোকই নয়, আরো কাকে কাকে যেন শিবানীকে ঐ সম্বোধন করতে শুনেছে নমিতা। আশায় আবার গাইড বই-এর পাতার উপর উপুড় হয়ে পড়ল ও। নজর চালিয়ে চলল তড়িৎ গতিতে লেখার উপর— সেন শিবানী... সেন শিবানী... সেন শিবানী...

কিন্তু পেলো না। নেই। ফোন শিবানীর নামে নয় নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই তার স্বামীর নামে। না, স্বামীর নাম-ঠিকানা কিছুই জানে না নমিতা!

অবশ হাতে ফোন বইটা নামিয়ে রাখল কোল থেকে।

এতক্ষণ শান্ত হয়ে ভাবলে, ফোন নম্বর পেলেই বা কি হতো। শিবানীকে বাড়িতে পাওয়া যেত না। সে তো সিনেমা দেখতে গেছে। রাত ন'টার আগে ফিরবে না।

আর কাকে ফোন করা যায়?

যায়। আছে ওর কাছে দু'একজন আত্মীয়ের ফোন নম্বর। মনেই আছে। বই খুঁজতে হবে না। ব্যাগ থেকে নোটবই বার করতে হবে না। কিন্তু তাঁরা আত্মীয়ই শুধু— বান্ধব নয়।

কেউ অন্তর-মন নিয়ে ছুটে আসবে না। বিরক্ত মন নিয়ে আসবে।

যা ঘটনা তাকে বাড়িয়ে দেখবে—

যা ঘটে নি তা বাড়িয়ে বলবে—

কেচ্ছা হবে এক কাহনের জায়গায় সাত কাহন—

তবু—

তবু ফোনের ওপর হাত রাখল নমিতা। সে যা হয় হবে পরে। এখন প্রথম কথা হলো এখান থেকে উদ্ধার পাওয়া।

কিন্তু ফোন করা হলো না।

ফোন করে কোথায় আসতে বলবে তাদের?

দমদম?

দমদমে কি বাগানবাড়ি একটা?

'দমদমে আছি' বললে কি কারু পক্ষে সম্ভব এখানে আসা?

অসম্ভব।

ফোন নামিয়ে রাখল সে।

আবারও ধিক্কার দিল নিজের বুদ্ধিকে। ফোন করতে বসার সব আগে যে কথাটা মনে হওয়া উচিত ছিল, সব পরে ওর সেটা মনে হলো। বোকা আর কাকে বলে! বোকা— বোকা—বোকা। ওর মতো বোকা মেয়ে আর হয় না। লোকটা বলেছে—এমন ভাবে কোন ভদ্রমেয়ে কি অপরিচিত ব্যক্তির গাড়িতে ওঠে? ও বলবে, কোন বুদ্ধিমতী মেয়ে অবশ্যই ওঠে না।

রাস্তার বিপদের কথা ভেবে কলকাতার মতো শহরে অজানা লোকের গাড়িতে উঠে বসা মানে তো যে বিপদ দূরে ছিল কিংবা ছিলই না— তাকে সেধে ডেকে আনা।

পাশের ঘরে কিছু কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেল।

নমিতা বুঝলে লোকটা পাশের ঘরে।

গাড়িতেই হোক আর এখানেই হোক— এ ভাবে বসে থেকে ফল হবে না কিছু। লোকটা চাকর-বাকরের কাছে মুখ রক্ষা না হওয়া পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দেবে না।

রাত বাড়ছে।

লোকটা করছে কি?

কাজে ব্যস্ত থাকলে ওর কথা ভুলেও যেতে পাবে।

বাগানবাড়িতে কাজ! ওর মতো বোকাই একথা ভাবে।

যদি মদ সামনে নিয়ে বসে থাকে? বাগানবাড়িতে এ সব আয়োজন থাকারই তো কথা। এ সব করতেই তো ওর এখানে আসে। ওকেও তো সেজনাই নিয়ে এসেছে এখানে লোকটা।

না, আর ভাবতে পারে না নমিতা। হাত দিয়ে উস্‌কো খুস্‌কো রুক্ষ চুলগুলি পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। লোকটার সম্মুখীন ওকে হতেই হবে। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকবার আগে চোখের ওপর দিয়ে ওর ভেসে যেতে লাগল মা, দাদা, শিবানীর মুখ। একমাত্র মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেই বুঝি এভাবে প্রিয়জনের মুখ চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

॥ ২১ ॥

ঘরে ঢুকলে লোকটি আহ্বান জানালো, এসো। তার ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেলো না। সেভাবে শুধু একটু যেন সহৃদয়তার ছোঁয়া পাওয়া গেল তার ভেতর।

নমিতা তাকিয়ে দেখলো, যা ভেবেছিল ঠিক তাই। সামনে থালার উপর সাজান রয়েছে মদের বোতল। সোডার বোতল। বরফের জাগ। হাতে রয়েছে মদভর্তি গ্লাস।

কিন্তু কিছুতেই নমিতার পা ঘরের ভেতর ঢুকতে চাইছিল না। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়েও পর্দায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল সে।

লোকটা ওখানে বসে বসে কি করছে কে জানে!

মদ খাচ্ছে?

হয়তো তাই!

মাতাল হয়ে উঠেছে?

হয়তো তাই!

ক্রমে আরো বেশি খাবে আরো বেশি মাতাল হয়ে উঠতে থাকবে?

নিশ্চয়ই—

হাতের কাঁপুনিতে পর্দা কাঁপতে লাগল।

ভেতর থেকে ডাক এলো, এসো।

গলায় কি উৎফুল্ল স্বর লোকটার?

লোকটা কি খুশি হয়ে উঠেছে?

নমিতার হাত খসে পড়ল পর্দা থেকে।

আবার ডাক এলো, ভয় পাবার মতো কাণ্ডকারখানা এখানে কিছু হচ্ছে না। চলে এসো।

কিন্তু না, লোকটা তো মাতাল হয় নি!

না, মদ ও খাচ্ছে না নিশ্চয়।

মাতালের কথা জড়িয়ে যায়। এমন পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে এমন পরিচ্ছন্ন কথা বলতে পারে না। ভয় পাবার মতো কাণ্ড কিছু হচ্ছে না নিশ্চয়ই। লোকটা ওকে বোঝাল সে মদ খাচ্ছে না। নইলে এই নির্জন পরিবেশে বাগান বাড়িতে বসে মদ খাচ্ছে যে লোক তার কাছে যাওয়াটা ভয়ঙ্কর কথা বৈ কি!

বুকের উপর থেকে একটা ভয়ের পাথর নেমে গেল নমিতার। এবার মনে হলো, নাঃ লোকটার ডাকের ভেতর উৎফুল্ল ভাব নেই। বরং অনুকম্পার ভাবই রয়েছে—হয়তো একটু সহৃদয়তাও।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির প্রতি একটু সহৃদয়তা দেখা দিল ওর মনের কোণেও। নিতান্ত অযথা লোকটাও তো জড়িয়ে পড়েছে ওকে নিয়ে এই বিভ্রাটের মধ্যে। সত্যি তো ও যে ভাবে গাড়িতে উঠেছে তাতে ওকে বাজে মেয়ে ভাবাটাই স্বাভাবিক। ওকে ঠিক বুঝতে পারলে কখনই এমনটা করত না। হয়ত তুলতই না গাড়িতে। আর তুললেও পৌঁছে দিয়ে আসত বাড়ি। এত কুরুচির লোক নিশ্চয়ই নয় যে ওকে বুঝে জেনেই এখানে এনে তুলেছে।

যদিও একটি মেয়েকে এভাবে বাগানবাড়িতে নিয়ে এসে তোলার ভেতর কোনই রুচির পরিচয় নেই তা সে মেয়ে যদি পথে দাঁড়িয়ে থাকা বাজে মেয়েও হয়। পথে দাঁড়ানো মেয়েরা পথে দাঁড়িয়ে থাকে যাদের ধরবার জন্য তাদের একজন হওয়াটাই তো কদর্য কথা—ঘেন্নার কথা। কিন্তু তবু কোথা দিয়ে একটা আস্থা যেন এসে গেল লোকটার প্রতি। কিংবা বলা চলে যে অবস্থায় লোকটার গাড়িতে বিনা দ্বিধায় উঠে বসেছিল সে অবস্থা ঠিক আগের মতো ফিরে না এলেও (তা আর আসা সম্ভবও নয়।) কিছু বিশ্বাস ফিরে এলো।

অথবা বলা চলে ভীষণ ভয় পেয়েছিল, ভীষণ ভয়ে বুকটা কেঁপেও চলেছিল কিন্তু তারই মধ্যে এই ভরসাটা প্রথম থেকেই ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল ওর যে, আর যাই হোক লোকটা শারীরিক বল প্রয়োগ করে কোন অত্যাচার করবে না। এ বিশ্বাসটুকু যদি না থাকত তবে খোলা মাঠ থেকে নিজের শরীরটাকে নমিতা বদ্ধঘরের মধ্যে এনে কখনই ঢোকাত না।

হয়তো এটা ভদ্র পোষাকের আস্থা। অর্থাৎ পোষাকটাকেই মানুষ ভাবা।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমরা তাই ভেবে থাকি।

স্যাণ্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গিপরা লোক দেখলেই ভাবি দুর্বৃত্ত। তার কাছ থেকে ছুটে পালাই। ভাবি এর হাতে পড়লে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। যাবে সম্মান সম্ভ্রম সব।

কিন্তু মেয়েদের অদৃষ্টে যত লাঞ্ছনা ঘটে তা কাদের হাত দিয়ে আসে?

নারীর সম্ভ্রম, নারীর লজ্জার অপমান করে কারা সব চাইতে বেশি?

ভদ্র পোষাক পরিহিত পুরুষ-প্রধান কর্মজগতে ক'পা মেয়েরা এগুতে পারে শরীর লাঞ্ছিত না করে?

তাও কি একঘাটে?

হায়!!!

প্রতিঘাটে প্রতি পাড়ির পারাণি দিতে হয় মেয়েদের শরীর দিয়ে দিয়ে।

হ্যাঁ—বুদ্ধি দিয়ে নয়, শক্তি দিয়ে নয়, দক্ষতা দিয়ে নয়, কেবল দেহ দিয়ে তাকে এগুতে হয়—স্থান করে নিতে হয়। যে মেয়ে না পারে, শক্তি ক্ষমতা নিয়েও তাকে ঘরে ঢুকে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়।

শরীর না দিলে মেয়েদের শক্তিকে পুরুষ মেরে ফেলে। নিজ হাতে গলা টিপে না মারলেও অবহেলা ঔদাসীন্য দিয়ে মারে।

বর্বর আদি যুগের এ নতুন রূপ। প্রাগৈতিহাসিক পুরুষ ভোগ করা হয়ে গেলে নারীকে মেরে ফেলত। বর্তমান যুগের সভ্য পুরুষ ভোগ করতে না পারলে ব্যক্তিকে পারে না—শক্তিকে মারে।

এই পুরুষ জগতের চেহারা।

তবু এতো বাহ্যিক জগতের চেহারা

অন্তর জগতের চেহারা?

সেও এইএক বা আরো সাংঘাতিক সম্পর্ক নিয়ে তারপর নারীকে লুটিয়ে পড়ে বলতে হয়ঃ

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ আবরণ
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?***
ভেবে দেখ আনিয়াছ মোর কোনখানে,
শত লক্ষ আঁখি ভরা কৌতুক কঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে।***
ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে একাকিনী
— ছেড়ে দিলে বিবসনা বেশে?

কিন্তু হায়! তবু পোষাকের উপর বিশ্বাস যায় না মেয়েদের।

স্যাণ্ডো গেঞ্জি লুঙ্গি দেখলে সতর্ক হয় ভয় পায়। ধুতি পাঞ্জাবী স্যুট পরা দেখলে সতর্ক হয় না। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রাখে।

নমিতাও রাখল।

সমস্ত শরীরে এবং চলায় নিতান্ত সহজ ভাব এনে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ঢুকেই থমকে পড়তে হলো ওকে—

যা ভেবেছিল তা ভুল।

লোকটা মদ খাচ্ছে।

তার সামনে থালায় মদের গ্লাস।

একেবারে খাঁচার মধ্যে সে ঢুকে পড়ল।

এখন কি করবে?

ফরাসের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে মদের গ্লাসে চুমুক দিয়েছিল লোকটা। নমিতাকে দেখে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে শরীরটা একটু তোলার মত করে বললে, বোস।

এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নমিতা। তারপর দরজা পার হয়ে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেখানের ফরাসের উপর বসে পড়ল।

এছাড়া করবার আর কিছু ছিলও না।

ও ঘর থেকে দৌড়ে পালাতে পারে না। পালিয়েই বা যাবে কোথায়?

লোকটি বললে, আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ফের গাড়িতে চলে গেছ। গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে নিয়ে বললে, যাক্ শেষ পর্যন্ত এলে বলে খুশি হলাম।

কিন্তু তার মুখে চোখে কোথাও কোন খুশির প্রকাশ ছিল না। বরং ছড়িয়েছিল বিরক্তি। গলার স্বর ছিল নিতান্ত নির্লিপ্ত উদাসীন। এখানকার চাকর দারোয়ানদের কাছে আপন মর্যাদা রক্ষার জন্য নমিতাকে নামতে বাধ্য করেছে। সে এলে তাকে ডাকতে হয় ডেকেছে। বসলে বলতে হয় বসতে বলেছে। নইলে লোকটা যে ওর সম্বন্ধে এখন মাত্রও সচেতন নয় বেশ বুঝতে পারলে নমিতা।

কিছু স্বস্তি বোধ করল সে।

লোকটার এই উদাসীনতার একটুও যাতে নাড়া না পড়ে এমনিভাবে অনড় হয়ে ফরাসের উপর বসে রইল। লোকটার এই ভাবটার ভেতর দিয়ে যদি ও পার হয়ে যেতে পারে তবে আজকের সৌভাগ্য ও ভুলবে না। এমন বিপৎকালকেও সৌভাগ্য বলেই মনে রাখবে।

সমস্ত শরীরটাকে না থাকার মত নিস্পন্দ করে দিয়ে জমে বসে রইল নমিতা শুধু লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখে।

ঘরে আসবাব কিছুই ছিল না। মেঝের উপর কার্পেট পাতা ছিল। মাঝখানে গদির উপর ছিল ফরাস বিছানো। কিছু ছোট বড় নানা মাপের তাকিয়া ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। চার দেয়ালে চারটে বিশাল মাপের আয়না ছিল খাড়া দাঁড়িয়ে। সে আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ওদের দুজনকে মনে হচ্ছে আট জন।

লোকটা চুপচাপ ধীরে ধীরে মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চলল।

নমিতা বসে রইল নিস্পন্দ হয়ে।

জীবনে এই প্রথম সামনে বসে কাউকে মদ খেতে দেখছে নমিতা। ওদের পরিবারে মদ নেই। নেশা নেই। একটা ঘটনা মনে পড়ে নমিতা মনে মনে একটু বুঝি শ্লেষের হাসি হাসল। ও তখন খুব ছোট। একদিন শুনলে বাবা খুব দুঃখ করে মাকে বলেছেন তাঁর এক বন্ধুর কথা। সে নাকি একেবারে অমানুষ হয়ে গেছে। দিনরাত কেবল মদ খায় আর ঝিমোয়।

বাবা চলে গেলে ও জানতে চেয়েছিল, মদ কি মা? অমানুষ দেখতে কেমন হয় মা?

মা হেসে বলেছিলেন, মানুষের মতই হয়।

মার জবাব ও বিশ্বাস করল না। ভাবলে মা ওকে ফাঁকি দিলেন। একটা কিছু বলে চলে গেলেন। যেমন আর দশটা প্রশ্নে যান। তারপর একদিন ভরদুপুরে নির্জন রাস্তা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে মাকে বলেছিল, মা, এইমাত্র আমি বাবার সেই মদখাওয়া বন্ধুকে দেখে এলাম।

বিস্ময়ে দু' চোখ বড় হয়ে উঠেছিল মার— সে কি? কোথায় দেখলি? এসেছেন বাড়িতে?

না।

তবে কোথায় দেখলি?

রাস্তায়।

রাস্তায়? তুই চিনিস তাঁকে?

না।

না! তবে বুঝলি কি করে যে সে তোর বাবার সেই বন্ধু?

প্রত্যয়ের জোরে বিষম মাথা ঝাঁকিয়ে ও বললে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই তিনি। পাগলও নয়, ছাগলও নয়, মানুষও নয়—চারটে পা। গায় একটা কম্বল জড়ানো। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। এ ঠিক বাবার বন্ধু সেই অমানুষ। মদ খেয়ে চার-পায় দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে।

মা চাকর পাঠিয়ে দিলেন কি বস্তু দেখেছে ও তা দেখে আসতে। চাকর এসে বললে, মা একটা ভেড়া।

সেদিন মা কাকা কাকিমারা হাসির ঝড় তুলেছিলেন। কেবল বাবা ওর লজ্জিত মুখ কোলে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, ও ঠিক চিনেছে।

...একটা গ্লাস শেষ করতে আর কত সময় নেবে?

অতটুকু করে কেবল ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে গ্লাসে— এ কখন ফুরোবে?

এ রকম করেই খায় নাকি?

না ইচ্ছে করে সময় নিচ্ছে?

রাত করিয়ে দিচ্ছে?

না—তা নয়। নমিতা দেখেছে এ পর্যন্ত একবারও লোকটা ওর দিকে তাকায় নি। যদি সে তাকাত তবে ও এমন করে লোকটার মদ খাওয়া দেখতে পারত না। তাকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে হতো।

কিন্তু ওর শরীরটা যেখানে রয়েছে ওতো কেবল সেখানেই বসে নেই। ঘরের চার দেয়ালের আয়নায় একজন নমিতা চারজন হয়ে বসে আছে চারদিকে।

আয়নার মধ্য দিয়ে দেখছে না তো ওকে?

ফরসা নিটোল হাতে কালো প্লাস্টিকের চুরি— কোলের উপর পড়ে আছে হাতটা। অপরূপ দেখাচ্ছে হাতটাকে। তাড়াতাড়ি আঁচল টেনে হাত ঢাকল নমিতা।

না, লোকটা যে আয়নার ভেতর দিয়েও ওকে দেখছে না সে বিষয়ে নিশ্চয় হল নমিতা। তা দেখতে থাকলে ওকে হাত আঁচল চাপা দিতে দেখে চোখ তুলে একবার ওর দিকে তাকাত।

সে যেন ওর সম্বন্ধে একেবারেই অবহিত নেই।

যেন ওকে সে ভুলেই গেছে।

স্যুট পরে ফরাসের উপর বসতে কোন আরাম হচ্ছে না বোধ হয়। হাঁটু মুড়ে তাকিয়ায় হেলে বসে আছে শক্ত শক্ত ভাবে। বোধ হয় আজ এখানে আসবার কথা ছিল না। থাকলে ধুতি পাঞ্জাবী পরত।

অন্ধকারে বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বৃষ্টির শব্দ কানে আসছে। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। আজ বুঝি বৃষ্টি থামবেই না। ওদের গলিতে এখন নদী বয়ে চলেছে।

অন্ধকার বাইরের দিকে তাকিয়ে লোকটা এত কি দেখছে?

চোখ দুটো ঘরে ঢুকে প্রথমেই ওর লাল ঠেকেছিল। এখন ক্রমেই আরো লাল হয়ে উঠছে। নিশ্চয়ই এটাই প্রথম গ্লাস নয়। ও আসবার আগে আরো খেয়েছে।

একটা চাকরির জন্য লালায়িত হয়ে কিছু ললিতবিদ্যা প্রয়োগ করেছিল এর উপর গাড়িতে— মনে পড়তেই ভেতরটা ছিঃ ছিঃ করে উঠল ওর।

কি সর্বনাশ!

এখনই যদি লোকটা—

বেয়ারা—

ডাক শুনে বেয়ারা ছুটে এলো।

নমিতাও তাকাল।

দেখল গ্লাস শেষ হয়ে গেছে।

বেয়ারাকে কিছু বলতে হলো না। সে শূন্য গ্লাস থালায় তুলে নিয়ে চলে গেল।

নমিতা হাঁফ ছাড়লে।

যাক্ গ্লাসটা শেষ পর্যন্ত ফুরোলো।

এবার নিশ্চয়ই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে ও।

আস্তে আস্তে বললে, এবার—

সে তাকাল ওর দিকে। বললে, হাঁ, এবার তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসব।

উঠছি তবে? জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে উঠতে গেল নমিতা।

কিন্তু বাধা দিল লোকটা।

বললে, আর কিছুক্ষণ বসতে হবে। দেয়াল ঘড়িটার উপর চোখ বুলিয়ে এনে বললে, রাত হয় নি। আটটাও বাজে নি। যেমন শান্ত হয়ে বসেছিলে তেমনি শান্ত হয়ে বোস আর একটু।

উপায়টা কি?

বসতেই হবে।

শান্ত হয়েই ফের বসে রইল নমিতা।

কিন্তু লোকটা করবে কি এখন?

আরো মদ খাবে?

বেয়ারা এসে ভর্তি গ্লাস থালায় করে নামিয়ে রেখে গেল।

লোকটা অল্প চুমুক দিতে লাগল গ্লাসে।

নিরুপায় দর্শকের মতো তাকিয়ে রইল নমিতা।

...আগের গ্লাসটার চাইতে যেন তাড়াতাড়ি ফুরোচ্ছে গ্লাসটা? আগের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে ও বুঝতে পারত না ভেতরের পদার্থটা কমেছে কি না।

এবার যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছে কথাটা। বেশ বড় বড় চুমুক দিচ্ছে লোকটা গ্লাসে।

ওর জন্য তাড়াতাড়ি করছে কি?

লোকটা ভালো—

ও নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকবে।

বেয়ারা।

একটু চমকে উঠল নমিতা এবারের ডাক শুনে। লোকটার গলার বেয়ারা ডাকটা যেন আগের মতো গাম্ভীর্যে মর্যাদায় ভরাট নয়। যেন অনেক আলগা। অনেক পাতলা।

মাতাল হয়ে উঠছে?

ঘাড়ের বলিষ্ঠ ভাবটা কি নরম হয়ে এসেছে? বেয়ারা এসে শূন্য গ্লাস থালায় তুলে চলে গেল।

আরো আসবে?

আরো খাবে?

এখনও শান্ত হয়ে বসে থাকবে ও?

অন্য মেয়েরা কি করত এ অবস্থায়? জানে না ও।

শিবানী কি করত?

না শিবানী এমন অবস্থার ভেতর পড়তই না।

ও পড়েছে। ওর মতো করেই এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ওকে। শিবানী কি করত ভেবে লাভ কি। শিবানী যা করত তা কি ও করতে পারবে। সে তেজ ওর কই। সে রাগ ওর কই— যে রাগে চোখের দৃষ্টি থেকে আগুন ছুটে বের হয়?

ওর চোখে কি আগুন আছে?

আছে জল।

চোখের দু' পাতায় সত্যি জল উপচে উঠল নমিতার। কান্নাচাপা গলায় কোনমতে বললে, এবার আমায় পৌঁছে দিন।

তাকিয়া থেকে এবার শরীর তুলে সোজা হয়ে বসল লোকটা। বললে, এই দিচ্ছি।

না এক্ষুনি।

এক্ষুনি!

হাঁ এক্ষুনি আগে আমায় পৌঁছে দিয়ে নিন।

কিসের আগে?

আরো খাবার আগে—

নেশা করার আগে হলে হয়তো নমিতার উপর তিক্ত হয়ে উঠত লোকটা। কিন্তু এখন মাথায় বেশ নেশা চেপে এসেছে। ওর দিকে তাকিয়ে ওর রূপটাই আর সব কথা ছাপিয়ে এগিয়ে এলো। নমিতার কথার কোন জবাব না দিয়ে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন এই প্রথম দেখছে ওকে।

ভুল করে ফেলেছে নমিতা।

ও আগে যা ঠিক করেছিল যদি তাই করত—অর্থাৎ লোকটার উদাসীনতায় এতটুকুও নাড়া না দিত। যদি যেমন খাচ্ছিল লোকটা খেত। ও শান্ত হয়ে বসে ছিল যেমন তেমনি বসে থাকত। তারপর যখন লোকটা বলত, চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। তখন গিয়ে এমনি শান্তভাবে গাড়িতে উঠত— তবে বিপদটা ও সত্যি পার হয়ে যেত।

কিন্তু ও নাড়া দিয়ে ফেলল লোকটার ঔদাসীন্যে।

এতক্ষণ সে ওর দিকে তাকায় নি। তার মাথায় ছিল, একটু খেয়ে দিয়ে আসবে মেয়েটাকে বাড়িতে পৌঁছে।

এখন নেশার চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

মেয়েটা সুন্দর—

সত্যি ভালো চেহারা—

মাথায় চুল কি কবিদের উপমার সঙ্গে মেলানো ঘন মেঘের মতো?

চোখ দুটো?

উপমা মনে আসছে না— তবে আশ্চর্য সুন্দর। চোখের ভেতর কী একটা কালো তিল?

হাঁ, একটা কালো তিল চোখের ভেতর?

এতক্ষণ লোকটাকে নমিতা দেখেছে। কিন্তু এখন লোকটা ওকে দেখছে। তাই অন্যদিকে তাকিয়ে নমিতা ভাঙ্গা গলায় বললে, দয়া করে আমায় দিয়ে আসুন।

সত্যি তুমি যেতে চাও?

মানে? যেন মাথায় বাড়ি খেয়ে ফিরে তাকাল নমিতা লোকটির দিকে।

লোকটি একটু হাসল। বলল, মানে আমি দেখেছি বেশির ভাগ মেয়েরাই আগে কিছুটা এমনি করে নেয়—। আবার কিছু মেয়ে আছে তারা দেয় না—তাদের থেকে জোর করে নিতে হয়—মানে ওটাই তাদের স্বভাব। জোরটাই তারা চায়।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নমিতা। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, আমায় বিশ্বাস করুন। আমি রাস্তায় এ উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছিলাম না। ঢাকার দাঙ্গায় দাদা মারা গেছেন। মা ভাইকে নিয়ে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি কলকাতায়। একটা মাথা গুঁজবার মতো আশ্রয় জোগাড় করেছি, কিন্তু দুবেলা দু'মুঠো মুখে দেবার মতো কোন উপায় করতে পারি নি— তবু এপথে রোজগারের চিন্তা কল্পনাও করতে পারি নে—বিশ্বাস করুন।

থালায় করে ভর্তি গ্লাস নামিয়ে রেখে গেল বেয়ারা।

গ্লাসের দিকে কোন নজর না করে লোকটা সত্যি সত্যি ওকে পৌঁছে দেবার জন্যই উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু আবারও ভুল করল নমিতা। লোকটার ফরাসে ভর দিয়ে উঠবার ভঙ্গিটাকে ভাবলে মদের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ানো। ব্যাকুলভাবে উঠে কাছে গিয়ে লোকটার হাত চেপে ধরল নমিতা। না, আমায় না দিয়ে এসে আর খেতে পারবেন না।

সমস্ত দিন যত ভুল করেছে নমিতা তার চরম ভুল করলে এবার।

কথা দিয়ে অন্তত ছুঁয়ে ছিল। কিন্তু হাতের স্পর্শে সঞ্চারিত করে দিল উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহ সমস্ত শরীরে!

এর পর আর পুরুষের হাত থেকে বাঁচবার আশা করা ভুল।

লোকটার আকর্ষণ থেকে নিজেকে আর ছাড়িয়ে আনতে পারলে না নমিতা।

অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল নমিতা। কিছু পেলে বুঝি তা দিয়ে আঘাত করতে চায় লোকটাকে। কিন্তু নরম কার্পেট, গদি, তাকিয়া ছাড়া সে ঘরে আর কিছুই ছিল না।

গ্লাসটা কোথায়?

গ্লাসটা তুলেই আঘাত করবে ভেবে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিতে গেল নমিতা কিন্তু ধস্তাধস্তিতে উল্টে পড়ে ভেঙ্গে গেল গ্লাসটা।

মদে ফরাস ভিজে গেল।

প্ল্যাস্টিকের চুড়ি ভেঙ্গে হাতে বসে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

উন্মত্ত নমিতা লোকটার হাত কামড়ে ধরে তার হাত থেকে উদ্ধার পেতে চাইল— পারলে না।

তারপর আর বোঝার মত, কিছু করার মত বুদ্ধি রইল না নমিতার।

* * *

পরের দিন সকাল বেলা জেগে উঠল নমিতা লোহার মত ভারী একটা মাথা আর অবশ চারটে হাত পা নিয়ে। শরীরটা যে ভাবে ছিল ঠিক সেইভাবে রেখেই ও পড়ে রইল। একটুও নড়বার যেন তার সামর্থ্য নেই!

ও কোথায় এখন?

বাড়ি না দমদম?

ভাল করে তাকাল চারদিকে।

এটা বাড়ি।

কখন এলো?

কে দিয়ে গেল?

বাড়িতে এসে বিছানায় শুল কি করে? হেঁটে?

নিশ্চয়ই।

তবে মনে নেই কেন?

চোখের ফোলা ভারী পাতা দুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এলো। চোখ বুজে নমিতা অসাড়ভাবে পড়ে রইল।

ক্ষুধা।

একটা দুর্দান্ত ক্ষুধার যেন ঝড় বইছে পেটের ভেতর। কাল থেকে প্রায় না খাওয়া চলছে। শিবানীর দেওয়া সেই টোস্ট ডিম কফিই ওর কালকে খাওয়া। তাই এই অসাড় দেহমনেও যা একমাত্র বুঝতে পারছে স্পষ্ট করে নমিতা তা হলো প্রচণ্ড ক্ষুধা। এত তীব্র আর নগ্ন তার চাহিদা যে, যে লাঞ্ছনার কথা মনে হলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাবার কথা সেই অপরিসীম বিড়ম্বনাকেও পেছনে ঠেলে সে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

কিছু খাবার চাই-ই।

কিন্তু আসবে কোথা থেকে?

কোথায় মিলবে খাবার?

কিন্তু কিছু না খেলে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না যে ও!

মাকে ডেকে বলবে, যা হোক—যা হোক কিছু এনে দাও মা?

ও ঘরে কে কথা বলছে।

মা আর রতন?

কান পাতল নমিতা।

কাল রাতে দিদি কখন ফিরেছিল মা?

মার জবাব শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে কান পাতল নমিতা। ও নিজেও যে জানে না কখন ফিরেছে, কি ভাবে ফিরেছে। নমিতাও জানতে চায় সব।

মা বললেন, ঘড়ি তো নেই। সময় বলতে পারব না। তবে রাত হয়েছিল। অন্য ঘরের সবাই শুয়ে পড়েছিল। ঝড় বৃষ্টির জন্য শিবানীর বাড়িতে আটকে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই তো চিন্তা করি নি তেমন।

যাক্। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নমিতা। ওকে আর কিছু এ নিয়ে মা জিজ্ঞাসা করবেন না। ওকেও বলতে হবে না।

কিন্তু কে বলল যে ও শিবানীর বাড়িতে বৃষ্টির জন্য আটকে গিয়েছিল?

ও নিজে বলেছে?

আশ্চর্য! মনে নেই তো একেবারেই কিছু।

তবে যে অবস্থায়ই এসে থাক কথাবার্তা বেশ গুছিয়েই বলেছিল!

আর গুছিয়ে না বলতে পারলেই বা কি।

এছাড়া আর কিছু ঘটতে পারে তা মা ভাববেনই বা কি করে।

নমিতাই কি ভাবতে পারত জীবনে যা ঘটে গেল।

মা দিদি খেয়ে এসেছিল শিবানীদি'র বাড়িতে?

এত রাতে কি না খাইয়ে ছাড়ে কেউ?

কি খেয়েছিল দিদি? মাংসভাত?

ছেলের লোভাতুর প্রশ্নে মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, সে কথা তো জিজ্ঞাসা করি নি, নমিতাও বলে নি। সমস্ত দিনের ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়েছিল তো। এসেই শুয়ে পড়েছে।

ছোট্ট সংসার। মা ছেলে মেয়ে। তিনজনেই জেগেছে কিন্তু কিছুই কারো করবার নেই। রতন স্কুলে পড়ে না। পড়ার তাড়া নেই। ভাঁড়ার শূন্য তাই নেই মার কাজের তাড়া। নমিতারও কিছু করবার নেই। সংসারটা যেন কিছু করবার অভাবে অলসভাবে কেবল হাই তুলছে।

নমিতা ভাবে, এক কিছুই করবার থাকে না যাদের অনেক আছে। আর কিছুই করবার থাকে না যাদের কিছু নেই।

দিদি—

রতন উঠে ডাকল দিদিকে।

চোখ চাইল নমিতা।

উঠবে না এখন? জানতে চাইল রতন।

উঠব।

তেমনিভাবে শুয়ে থেকেই বলল নমিতা।

দিদির উঠবার কোন লক্ষণ না দেখে এবার তাড়া দিল রতন। ওঠ শিগ্‌গির। অনেক বেলা হয়েছে। ক্ষিদে পেয়েছে। চা চিনি আনতে হবে। পয়সা দে ত'।

না, না উঠলে চলবে না।

ও না ওঠা পর্যন্ত সংসারটাও অচল হয়ে থাকবে।

উঠে বসল নমিতা। বিছানায় পড়ে থাকা হাত পা গুলিকে যেন কোনমতে শরীরে জুড়ে উঠে বসল সে।

কিন্তু তারপর?

যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলে নমিতা, উঠে তো বসলাম কিন্তু তারপর করব কি?

দিদি পয়সা দাও—

দিচ্ছি—

বলল তো দিচ্ছি, কিন্তু দেবে কোথা থেকে?

দুটো—অন্তত দুটো টাকা কোথায় পাওয়া যায়?

না হয় একটা—একটা টাকাই—

না, এ ভাবে বিছানার ওপর বসে বসে টাকা টাকা করলেই টাকা এসে হাতে পড়বে না।

ধারের চেষ্টা করতে হবে। এখানে কারু কাছে পাওয়া যাবে না। সবারই প্রায় এক অবস্থা। যারা এরই ভেতর কিছু ধারটার দিতে পারে, তাদের কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখনও শুধে উঠতে পারে নি ওরা। এখানে চাওয়া চলবে না। পাওয়াও যাবে না।

কার কাছে যাওয়া যায়।

আমার ব্যাগটা কোথায় রে রতন?

ঐ তো তোমার শিয়রে।

ও আচ্ছা। হাত বাড়িয়ে ব্যাগ টেনে আনল নমিতা। একটা ছোট নোটবুকে কিছু ঠিকানা আছে। নেড়েচেড়ে দেখা যাক কার কাছে যাওয়া যায়।

নোটবুকটার জন্য ব্যাগ খুলে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল নমিতা।

ব্যাগের ভেতর এগুলি কি?

টাকা?

টাকার তাড়া?

কম্পিত হাতে তাড়াতাড়ি ফাসনার টেনে ব্যাগের মুখ বন্ধ করে ফেলল নমিতা।

যেন চুরি করেছে।

যেন কেউ দেখে ফেলবে।

হৃৎপিণ্ডটা এমন দাপাদাপি শুরু করে দিল যেন ছুটে বেরিয়ে আসবে বুক থেকে। দু হাতে বুক চেপে বসে রইল নমিতা—

কি হলো দিদি? শরীর খারাপ লাগছে?

না, একগ্লাস খাওয়ার জল নিয়ে আয় তো।

রতন চলে গেল জল আনতে।

রতন চলে যেতেই আবার ব্যাগ খুলল নমিতা। নোটের তোড়াটা টেনে বার করল—

তিনটে বড় নোট—।

একশ' টাকার নোট এগুলি তো।

তারপর?

হাঁ আরো আছে।

একতোড়া ছোট নোট।

না এক টাকার নয়! দশ টাকার।

এত টাকা নমিতা জীবনেও দেখে নি।

কিন্তু কি করবে সে এখন এ টাকা নিয়ে?

লোকটার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসবে?

পাবে কোথায় তাকে?

ঘৃণ্য টাকা ঘৃণার সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলবে?

কি লাভ হবে?

দেবে পুড়িয়ে?

কি লাভ হবে?

দান করে দেবে পথের ভিক্ষুককে?

কিন্তু পথকে আশ্রয় করলে তবু কিছু সে দেয়। ঘরের মতো শুধু শূন্য করুণ দৃষ্টি মেলে গৃহস্থের দিকে চেয়ে থাকে না।

ওরা তো ভিক্ষুকের চেয়েও অসহায়।

জল নিয়ে আসতে আসতে রতন বলতে লাগল, এমন লাইন দিতে হয় না জলের জন্য। মা তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও চারজনের পেছনে। আমি অনুমাসীর কাছ থেকে জল নিয়ে এলাম।

জলটা রতনের হাত থেকে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে গ্লাসটা মাটিতে নামিয়ে রাখল নমিতা।

রতন চা চিনির পয়সার জন্য ফের তাড়া দিয়ে তারপর ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, কাল শিবানীদি'র বাড়িতে কি কি খেয়েছিলে দিদি? মাংস ভাত?

নমিতা রতনের দিকে তাকিয়ে রইল—কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে। তারপর বললে, আমি কি খেয়েছি সে...শুনলে তো তোর খাওয়া হবে না। তোর কি খেতে ইচ্ছে করে বল?

রতন নীরবে অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

নমিতার এতো করুণ লাগল রতনের এ হাসি যে প্রায় চোখে জল এসে গেল। বলল, বল না কি খাবি

যাঃ। বলে ফের হাসল রতন। বলল, তুমি রাগ করেছ শিবানীদির বাড়ি কি খেয়েছ জিজ্ঞাসা করায়?

আহা— যা বলছি তার উত্তর দে তো। কি খাবি?

যাও, রুটি, ডিম, মাখন, কেক খাবো— দেও পয়সা—

নে। ঝট করে তোড়া থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে রতনের হাতে দিল নমিতা। বলল, যা মন চায় নিয়ে আয়।

দু চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল রতনের।

ও বাবা, তোমার ব্যাগে এত টাকা! এত টাকা কোথায় পেলে?

কাল রাতের সেই লণ্ডভণ্ড চুল তখনও চোখে মুখে পিঠে তেমনি লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়েছিল। মুখচোখের চুল সরিয়ে পিঠের চুলের বোঝা হাতখোঁপায় বাঁধতে বাঁধতে নিজেকে একবারে তরল করে ফেলল নমিতা। ভাই-এর দিকে তাকিয়ে তামাশার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, কোথায় পেলে টাকা? যেন পথে ছড়িয়েছিল কুড়িয়ে এনেছি। ঠিকানা দিলে তুইও গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসতে পারিস। তাই না? আরে বোকা ছেলে, টাকা পায় মানুষ চাকরি পেলে। চাকরি পেয়েছি বুঝলি?

চাকরি পেতেই তোমার টাকা দিয়ে দিলে?

কথাটা খেয়াল ছিল না তো।

গলার মধ্যে একটা ঢোক গিলল নমিতা।

মিথ্যে কথা চারদিকে পাহারা না রেখে বললে, অরক্ষিত দিক থেকে এমনি আক্রমণ আসে।

তা আর কি হয়েছে।

তক্ষুণি সামলে ফেলল সে নিজকে।

তা সামলানোটা শক্তই বা কি? প্রতিপক্ষ যখন বালক।

কথা গুছিয়ে ফেলল ভেতরে।

বলল সব সময় দেয় না। কখন কখন দেয়। অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলতে পারলে, দয়ালু অফিসার হলে অগ্রিম পাওয়া যায়। আর শিবানী আমার বন্ধু তো? ওর খাতিরেই চাকরি তো? ওর খাতিরেই টাকাটাও পেয়ে গেছি। যা দৌড়ো। যা খেতে মন চায় কিনে নিয়ে আয়। তোকে আমি রোজ একটা করে নতুন জিনিস খাওয়াব।

উত্তেজিত কণ্ঠে রতন বললে, আজ দুপুরে মাংস?

বেশ।

কিন্তু তক্ষুণি রতন উল্টে ফেলল মত। না দিদি, দুপুরে নয়। রাতে খাবো মাংস। দিনের বেলা যা হয়। আর এই তো রুটি ডিম খাবো এখন চায়ের সঙ্গে। দুপুরে আর না খেলেও চলবে—

ইস্— ক্ষোভের সঙ্গে ইস্ করে উঠল নমিতা। তোকে নিয়ে আর পারো গেল না রতন। বলছি, রোজ তোকে একটা করে নতুন খাওয়া খাওয়াব।

ছোট রতন তার ছোট মাথা বিজ্ঞের মত দোলাতে দোলাতে বললে, না দিদি আমরা হিসেব করে চলব খুব।

হাঁ, টাকা বুঝেই খরচ করতে হবে।

ও চাকরি তো সত্যি পায় নি।

চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত যক্ষের মত আঁকড়ে থেকে এক পয়সা এক পয়সা করে খরচ করবে।

আর যেন শূন্য ব্যাগে রাস্তায় দাঁড়াতে না হয়।

কিন্তু মুখে রতনকে আগের কথার সুর বজায় রেখে বললে, কেন বাজে বকবক করছিস! বলছি, চাকরি পেয়েছি। প্রতি মাসে মাইনে পাবো।

এখন যা তো খাবার নিয়ে আয়। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। আর একটু পর ক্ষিদেয়ই মরে যাবো আমি!

রতন পেছন ফিরতেই ফের বললে, মাংসও এখনই নিয়ে আসবি। পরে ভালো মাংস পাওয়া যাবে না।

কতটা আনব? ঘুরে জিজ্ঞাসা করল রতন।

এক সের।

এক সের!

হাঁ। আজ খাবো দু বেলা। কাল সকালে খাবো বাসি মাংস লুচি।

দু চোখ চকচক করে উঠল রতনের। দৌড়ল সে প্রথমে রান্নাঘরে। হাতে থলি নিয়ে ছুটল বাজারে।

নমিতা রতনের উপোসী কাঠি কাঠি পা দুটোর দৌড়ো-দৌড়ি ছোটাছুটির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল নিশ্চল হয়ে।

দেখল আনন্দে আত্মহারা মা জলভরা বালতি নিয়েই ছুটতে ছুটতে আসছেন।

রতন মাকে সুসংবাদটা দিয়ে গেছে।

মুখে আবার খুশি টেনে আনতে হবে।

গলায় টেনে আনতে হবে উচ্ছ্বাস।

এবার কথায় ত্রুটি থাকলে চলবে না।

এবার অভিনয় ত্রুটিহীন হতে হবে।

রতনের চোখ কচি, চোখ কাঁচা চোখ।

কথা শুনতে থাকলে মুখের দিকে তাকাতে ভুলে যায়। মুখের দিকে তাকালে কথার ফাঁক ধরতে পারে না।

তার চাইতেও বড় কথা—

রতনের জগৎ এখনও বিশ্বাসের জগৎ।

মার তা নয়।

ঘরে ঢুকে মা কিছু বলবার আগেই উৎফুল্লকণ্ঠে নমিতা বলে উঠল, মা আমার কাজ হয়ে গেছে।

মা যে রতনের কাছে খবরটা শুনেই ছুটে আসছেন যেন এটা ও বুঝতে পারে নি।

মা জলের বালতি দেয়াল ঘেঁষে নামিয়ে রেখে মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এতক্ষণ বলিস নি কেন?

এই তো সবে ভোর হলো।

রাতে? এত বড় একটা খবর এটা বলতে কি একটু দেরি করে। তা কত টাকা দিয়েছে রে আগাম?

কত?

কত বলে একটু সময় নিল নমিতা। তারপর বললে, একশ।

একশ'! বলিস কি! দেখি দেখি—

ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নোটের তোড়া থেকে কোন মতে টেনে একটা বড় নোট বের করল নমিতা। বের করে মার হাতে দিল।

নোটটা লোভীর মত হাত বাড়িয়ে নিলেন মা। নেড়ে চেড়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর মেয়ের দিকে নোট বাড়িয়ে ধরলো — নে।

তুমি রাখো।

আমি রাখব? কেন তোর কাছেই থাক না। এই তোর প্রথম রোজগারের টাকা...

কপালের দু'দিক ধরবার ছলে কানে আঙুল চাপা দিল নমিতা।

নে ধর। মা মেয়ের হাতেদিতে গেলেন নোটটা।

তুমি খরচ করবে। তুমি রাখো।

মনে মনে এ ইচ্ছাই ছিল মার। কিন্তু মেয়ে না বলা পর্যন্ত তো আর তিনি আঁচলে টাকা বাঁধতে পারেন না। হাসিমুখে টাকা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, তা অবশ্যি ঠিক। আমি খরচ করব। আমার কাছে থাকলেই সুবিধে। আর তুই তো অফিসেই চলে যাবি। হ্যাঁ-রে আজ অফিস আছে তো? রান্না চাপিয়ে দেবো?

না মা। আজ ছুটি নিয়েছি। কাল থেকে তোমায় তাড়া দেবো ভাতের জন্য।

সে আমি ঠিক সময় ভাত দেবো দেখিস। মুখের ভাব এমন করে কথাটা বললেন মা, যেন— অফিসের ভাত রাঁধার মতো সুখের কাজ পৃথিবীতে আর নেই। তারপর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা নমিতা একশ' টাকা দিয়েছে ওরা তা সে টাকা তো পুরো আমায় ধরে দিলি। তবে রতনকে বাজার করতে দশ টাকার নোট দিলি কোথা থেকে?

আবার গলতি করে ফেলেছে।

কি জবাব দেবে?

শিবানী দিয়েছে?

একশ' টাকা যেখানে পেয়ে গেছে সেখানে আবার দশ টাকা ধার করে কে।

পেয়ে যাওয়ার পর করে না।

কিন্তু—কিন্তু আগে তো করতে পারে?

পারে।

হ্যাঁ আগেই ধার করে ফেলেছিল নমিতা। তখন জানত না অফিসে টাকা পাওয়া যাবে। পাওয়ার পর ফেরৎ দিতে চেয়েছিল কিন্তু শিবানী নিলে না।

কথা শেষ করে ক্লান্ত নমিতা কপালের ঘাম মুছল আঁচল দিয়ে। ইস্ এত মিথ্যা গড়গড় করে বলে যেতে পারে ও— এ ধারণা ওর ছিল না।

মা চলে গেলেন চায়ের আয়োজন করত। উনোন ধরাতে। উনোনে আগুন দিয়ে এসে মেয়ের কাছে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় ফিসফিস করে বললেন, দেখ নমিতা—আর কিন্তু আমি সেদ্ধ চাল—মুশুরীর ডাল এসব খাবো না। অনাচার যা করেছি অনুপায় হয়েই করেছি—ভগবান বুঝবেন।

এবার হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল নমিতা। সমস্ত শরীর ব্যথায় পচে যাচ্ছিল। তা পর্যন্ত গ্রাহ্য করলে না। তিক্তকণ্ঠে বললে, তা বুঝবেন নিশ্চয়ই ভগবান। অন্তত বুঝতে কষ্ট হওয়া তাঁর উচিত নয়।

আর হলেই বা আমরা ছাড়ব কেন? পাপ নিজ হাতে করাচ্ছেন তাই পুণ্যটা সুদশুদ্ধ আদায় করে ছাড়ব আমরা। তিনি জবাব চাইবার আগে আমরাই জবাব চাইব, কেন তিনি পাপের পথে ঠেলে দেন! কেন বাধ্য করেন পাপীর অন্ন খেতে।

ছিঃ নমিতা ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা করতে নেই মা।

কেন নেই? আমাদের নিয়ে খুশিমত তামাশা করবেন তিনি আর নিজে সত্য কথাও সইতে পারবেন না।

মা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

॥ ২২ ॥

শিবানীর একান্ত চেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যে শিবানীদের অফিসেই একটা কাজ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নমিতা। সেই দিনের সেই ঘটনা এক একদিন দুঃস্বপ্নে দেখা দিয়ে ওকে যন্ত্রণা দিয়ে যায় খুবই, কিন্তু তবু যে ঘটনার সাক্ষী একমাত্র নিজে তার লজ্জা তার গ্লানি মুছে ফেলা কঠিনই বা কি?

নিজেকে বলে, পথে কত দুর্ঘটনা ঘটে, এও একটা দুর্ঘটনা। তার চাইতে এর মূল্য একটু বেশি নয়—

বরং কম—

কম!!

হ্যাঁ কম।

এটা দুর্ঘটনা নয়। এটা শারীরিক অত্যাচার। দুর্ঘটনা আর অত্যাচার শব্দ দুটো তুলনা করলেই তো বোঝা যায়, প্রথমটার কাছে দ্বিতীয় শব্দটা কত —তুচ্ছ।

যদি ট্রাম চাপা পড়ে মাথা উড়ে যেত?

যদি দৈত্যের মতো একটা বাস বা ট্রাক ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওর পা দুটোকে— কেটে নিয়ে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে যেত আর ও দিব্য বেঁচে উঠত?

বেঁচে উঠে দেখত ঊর্ধ্ব-অঙ্গ নিয়ে পঙ্গু ও বিছানায় পড়ে আছে।

না, না— যা ঘটেছে সে কিছুই নয়। ভুলে গেলেই যা মুছে গেল, তা নিয়ে আবার ভাবা।

বরং ব্যাগভর্তি টাকা যেটা মিলেছে, তার মূল্য আছে। ও কিনা মূর্খের মতো টাকাগুলি পুড়িয়ে ফেলবার, ছিঁড়ে ফেলবার, ভিক্ষুকদের বিলিয়ে দেবার কথা ভেবেছিল! তার চাইতে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়ে টাকাগুলিকে যে চেপে ধরেছে এটুকুতেই ও এই সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর একমাত্র বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

ভুলে গেলেই মুছে যায় যা, তার গুরুত্ব কিছুই নেই—এ তো ঠিকই ভেবেছিল নমিতা। কিন্তু ভুলে গেলেও মুছে যায় না, এক মুহূর্তের ঘটনা রক্তের নাড়ীতে বসে বাসা বাঁধতে বাঁধতে বিগত দিনকে আগত দিনে নিয়ে উপস্থিত করতে পারে—এ সম্ভাবনার কথাটা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল নমিতা।

শিবানী ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়। আপত্তি কানে তোলে না। ও বিব্রত বোধ করে। কোথায় বালিগঞ্জ; কোথায় আলিপুর। রোজ এই পৌঁছে দেবার হাঙ্গামায় লজ্জায় পড়ে যায় নমিতা। না পারে বাড়িতে নামিয়ে একটু বসাতে, একটু ভালোমতো আপ্যায়ন করতে। বিদায় দিতে হয় গাড়িতেই। ভারি খারাপ লাগে নমিতার। দু'একবার না নেমেছে শিবানী তা অবশ্যি নয়। নিজেই নেমে এসেছে। নমিতার ওকে ডাকার সঙ্কোচটা ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্যই নেমে এসেছে। ওর মার সঙ্গে কথা বলেছে। চা খেয়েছে। ভাইটিকে আদর করেছে। পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করেছে। কিন্তু ওকে কোথায় বসাবে, কোন পাত্রে চা দেবে, কি খাওয়াবে এসব নিয়ে পরিবারটাকে এতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখেছে শিবানী যে, ওরই লজ্জা করে নামতে। নমিতাও নামতে দেয় না। বলে, গরমে বসে বসে ঘেমে জল হও— তোমারও সুখ নেই, আমরাও সুখ পাইনে। দুপ'ক্ষেরই ভুগে মরা।

শিবানীর সঙ্গে কাজ করে। তার সঙ্গে টিফিন খায়, গল্প করে। সে ওকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায়—এই কলকাতা শহরে শিবানী ওর পাশে দাঁড়িয়ে—আর ও চায় কি?

কিছু চায় না! কিছু চায় না। আনন্দে একা ঘরেই হেসে উঠেছে নমিতা—এমনও হয়েছে।

একদিন চারটে না বাজতেই উঠে দাঁড়িয়ে হাতের কাজ গোছগাছ করতে লাগল শিবানী।

নমিতা জিজ্ঞাসা করলো, আজ এত তাড়াতাড়ি?

আজ বাড়িতে একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

কেউ আসবে?

হ্যাঁ। আমার স্বামী।

অবাক হলো নমিতা? বললো, তার মানে? তিনি রোজ বাড়ি আসেন না?

তা আসেন কিন্তু তাড়াতাড়ি আসেন না। খোঁপার কাঁটাগুলি যথাস্থানে টিপে বসিয়ে দিতে দিতে শিবানী বলল, কালবেলা আমরা একসঙ্গে প্রাতরাশ সারি, বাড়ি থাকলে মধ্যাহ্ন আহার। ভাবেই হোক আর অ-ভাবেই হোক অফিসে আসবার মুখে প্রতিদিন সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আমার অফিসযাত্রা নিরীক্ষণ করেন—আমাদের স্বামী-স্ত্রী মধুর সম্পর্কটা বুঝতে পারছিস?

তাকিয়ে রইল নমিতা শিবানীর দিকে। এই কমাসের ভেতর ওদের কত গল্প হয়েছে কিন্তু নমিতা কখনও শিবানীর মুখে তার স্বামীর কথা শোনে নি। ও তুলতে গেলে শিবানী এড়িয়ে গেছে। নমিতাও আর তোলে নি। আজ শিবানীকে নিজে থেকেই বলতে দেখে ও মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ শিবানীকে প্রশ্ন করতে দেখে একটু হেসে বলল, এটুকু কথা থেকে কি কিছু বোঝা যায়?

এটুকু কথা থেকে বোঝা যায় না বুঝি? অনেক কথা বলবার আজ আর সময় নেই— আর একদিন হবে। একগাদা কাগজপত্র কাগজ চাপা দিল শিবানী। বললো, আমাদের সম্পর্কটা লড়াই-এর। কখন সন্ধি হয় বটে কিন্তু টেকে না। এবারও টিকবে না জানি। তবু ওপক্ষ যখন শান্তিপতাকা তোলে তখন আমি সম্মান করতে চেষ্টা করি। আজও আবার সেই চেষ্টাই করব—একটা যেন একটু বড় নিঃশ্বাস টানলো শিবানী। ব্যাগটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বলল, বুঝলি নমিতা, ভালো ছেলেরা তাদের নিষ্ঠা আন্তরিকতা আর অনভিজ্ঞতা নিয়ে খারাপ মেয়েদের ফাঁদে পড়ে। খারাপ মেয়ে বিয়ে করে। আর খারাপ ছেলেরা জানে কাদের নিয়ে খেলা করে সরে আসতে হয়, আর কাকে হয় ঘরের বৌ করে আনতে —আচ্ছা, অন্যদিন কথা হবে। আজ চলি। তোর তো আরো দেরি আছে?

না আমারও হয়ে গেছে।

কিন্তু আজ তোকে আমার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না যে?

ব্যস্ত হয়ে উঠল নমিতা। বললো, না, না। আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না। তুই রওনা হয়ে পড়।

শিবানী চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে কাজ শেষ করে নমিতাও উঠে দাঁড়ালো। এমনি সময় ব্যস্তসমস্তভাবে অমল এসে জিজ্ঞাসা করলো, মিসেস সেন কোথায় নমিতা দেবী?

তিনি তো বাড়ি চলে গেছেন।

বাড়ি চলে গেছেন? বাঃ বেশ তো কাণ্ড! জানেন সিনেমার টিকিট কেটেছি। অমল বোস চলতি ভঙ্গিতে কাধ বাঁকালো। একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আপনি যাবেন নমিতা দেবী? ছবিটা খুব ভালো।

শান্ত গলায় নমিতা বলল, আমার শরীরটা ভালো নেই। তা ছাড়া দেরি হলে মা চিন্তা করবেন। একটু সৌজন্যের হাসি টেনে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের রূঢ়তাকে ঢেকে নমিতা বললো, কিছু মনে করবেন না যেন। মা ভীষণ ভাববেন। নইলে নিশ্চয়ই যেতাম।

নিশ্চয়ই আপনি যেতেন না— এ আমি জানি। দেখুন নমিতা দেবী—একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল অমল বোস মুখ উপর দিকে তুলে— 'কেরিয়ার' তৈরি করতে আপনি জীবনেও পারবেন না। এই লোয়ার ডিভিশনের কেরানীগিরিতে কলম পিশেই মরবেন চিরকাল। আর একটু স্মার্ট—আই মিন, চটপটে সপ্রতিভ না হলে আজকালকার দিনে একেবারেই অচল হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা বেশ, একটু ঝুঁকে এলেন অমল বোস নমিতার দিকে, শরীরটা যখন ভালো নেই চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি? এটাতে তো আপত্তি করবার কিছু নেই?

সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে নমিতা বলে উঠল, না—না, সে হয় না—

নমিতার এমন আতঙ্কিত কণ্ঠ শুনে বিস্মিত হয়ে গেল অমল বোস। বললো, আপনি ভয় পেয়ে গেলেন? লোকটা আমি কি এতই ভীতিজনক নাকি?

লজ্জা পেয়ে গেল নমিতা। ওর আপত্তি জানানো ভঙ্গির বাড়াবাড়িটা নিজেরও বেজেছিল। অমল বোস ওদের বড় অফিসার। শিবানীর বন্ধু। সর্বোপরি তারই জন্য ওর চাকরি হয়েছে। পরিচয়টাও কেবল হাত তুলে নমস্কার জানানোর পর্যায়ে ঠেকে নেই। শিবানী আর অমল বোসের সঙ্গে এক টেবিলে ও চাও খেয়েছে অনেক দিন। তার বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে এতটা আঁতকে ওঠা নিঃসন্দেহে দৃষ্টিকটু। কিন্তু এর কারণ যে অন্য—এ কথা অমল বোসকে বলবে কি করে। সে দিনের ঐ গাড়িঘটিত ঘটনার পর থেকে যেন গাড়ি-আতঙ্ক রোগে ওকে পেয়ে বসেছে। যে কোন গাড়ির ভেতর শরীর গলাতে গেলেই গোটা শরীরটা কেমন যেন একবার কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে গাড়ি যদি শিবানীর হয়, শিবানী সঙ্গে থাকে তবু। আর অন্য গাড়িতে?

ভাবতেও পারে না নমিতা ওঠার কথা। নিতান্ত লজ্জিতকণ্ঠে বললো, কিছু মনে করবেন না মিঃ বোস। আমাকে পৌঁছোতে গেলে আপনার সিনেমায় যাওয়া হবে না ভেবেই আমার কথাগুলি ওভাবে বেরিয়ে গেছে। নমিতা হাত জোড় করলো—ক্ষমা করবেন সেজন্য।

অমল বোস পকেট থেকে টিকিট বের করে ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে গেল।

নমিতা বুঝল এ অভিমান ওর প্রতি নয়। শিবানীর প্রতি। নমিতা এই টিকিট ছিঁড়ে ফেলার সংবাদটা শিবানীকে দেবে—অমল বোসের এই অভিমান শিবানী জানবে—এইটুকু চায় অমল বোস। নমিতা অমল বোসের এ কাজটা নিশ্চয়ই করবে।

গা-ভরা দারুণ আলস্য নিয়ে এসে পথে দাঁড়ালো নমিতা। ও বুঝতে পারে না··· ও এতো দুর্বল বোধ করে কেন। দু পা' চলতে এমন হাঁফ ধরে কেন। মা যখন জিজ্ঞাসা করেন, দিনকে দিন তোর এত শরীর কাহিল হচ্ছে কেন রে নমি? নমিতা মার দিকে তাকিয়ে থাকে। ও বুঝতে পারে না ঠিক কেন হচ্ছে—কিন্তু কেমন যেন একটা ভয় ওকে ঝড়ের বেগে কাঁপিয়ে তোলে। ও বুঝতে পারছে না, না স্বীকার করতে চাচ্ছে না? কাকের মতো চোখবন্ধ করে বিপদ পার হতে চাচ্ছে?

কিন্তু তা কি আর সম্ভব!

একদিন শিবানীর কাছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলতে হলো নমিতাকে ---শিবানী, কি করব বল?

॥ ২৩ ॥

লাঞ্চের সময় নমিতা রোজই শিবানীদের ঘরে চলে আসে। আজও এসেছিল। ঘরে ঢোকবার সময় প্রতিদিনের মত বেশ স্বাভাবিক ভাবেই এসে ঘরে ঢুকেছিল—অন্তত শিবানী ধরে উঠতে পারে নি কোন অস্বাভাবিকতা। কিন্তু চেয়ারে বসেই তাকে এমনিভাবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে টেবিলে মাথা রাখতে দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেল শিবানী। কী ব্যাপার? কী হল নমিতার? বাড়িতে ভীষণ কিছু ঘটে যায় নি তো? কিন্তু তবে কী সে অফিসে আসত? অফিসে কিছু ঘটেছে? নমিতার মাথায় হাত রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল শিবানী, কী হয়েছে নমিতা? কাঁদছিস কেন?

যদিও জিজ্ঞাসা করল কিন্তু জানে নমিতার পক্ষে এখন জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তাকে একটু সামলে উঠবার সময় দিতে হবে। তাই ওর মাথায় হাত রেখে বসে রইল শিবানী।

মিস জেনি হঠাৎ উঠে কাগজপত্র চাপা দিয়ে ব্যস্তপায় বেরিয়ে গেল। যেন হঠাৎ তার কোন জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। ওদের দিকে তাকাবার সময় নেই তার।

বুদ্ধিমতী মেয়ে জেনি—জেনির চলার পথের দিকে সপ্রীতি দৃষ্টি ফেলল শিবানী।

মিস জেনির চলে যাওয়া বুঝতে পেরেই বোধহয় টেবিল থেকে মাথা তুলে আঁচলে চোখ মুছতে লাগল নমিতা। কিন্তু না পারলো সে চোখ শুকোতে, না পারলো গলা সাফ করতে। যতবার চোখ মোছে ততবারই দুচোখ ফের জলে ভরে ওঠে। যতবার কথা বলতে যায় ততবারই গলা ভেঙ্গেচুরে আসে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর ফের টেবিলের ওপর মাথা রেখে আকুলভাবে কেঁদে উঠল নমিতা। কান্নার দমকে সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ওর।

অসহায়ভাবে আবার ওর মাথায় হাত রেখে শিবানী বললো আচ্ছা, বলবি তো কী হয়েছে?

কিন্তু নমিতা মাথা তুলল না।

হতাশভাবে ওর শান্ত হবার অপেক্ষায়ই বসে থাকতে হলো শিবানীকে। গালে হাত রেখে বসে ভাবতে লাগল, কিছুক্ষণ আগেই জেনির যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বুদ্ধি বস্তুটাকে কতবড় করে দেখেছিল, কিন্তু নমিতাও তো বুদ্ধিমতী মেয়ে—ওর বুদ্ধি এখন কোথায়?

না—যতবড় করেই দেখা যাক, মানুষের অস্ত্র-ভাণ্ডারের সব চাইতে দুর্বল অস্ত্র হলো বুদ্ধি। প্রতিটি বৃত্তি-প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই-এ সে হারে।

একটা বড় করে শ্বাস টানল শিবানী— বুদ্ধি জিনিষটা ঠিক রুচিবান শিক্ষিত ব্যক্তির মতো। যতক্ষণ তার অনুযায়ী পরিবেশ পায় ততক্ষণই সে বড়। তার বাইরে অসহায়। শিক্ষিত জনের বর্বরের লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে যাবার মতো তাকেও বৃত্তি-প্রবৃত্তি লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করতে যেতে হয়।

কিছুক্ষণ বাদে নিজেকে সামলে উঠে বসে চোখমুখ মুছে ভাঙ্গাগলায নমিতা বললো, তোর সঙ্গে আমাব দরকারী কথা আছে। এখানে বসে বলা যাবে না। চল বাইরে কোথাও গিয়ে বসি। আমি ছুটি নিয়ে এসেছি। তুইও ছুটি নিয়ে নে।

তা নিচ্ছি। কিন্তু হলো কী রে হঠাৎ?

বলব—

খারাপ কিছু সংবাদ নয় তো?

এখন পর্যন্ত মা ও রতন বেঁচেই আছে।

আছিস তো? আবহাওয়াটা একটু হালকা করতে চাইল শিবানী। কণ্ঠে একটু ধীর-সুর টেনে বলল, তবে আর ভয় পাই নে। এক যমকে ছাড়া বিশ্বসংসারে শিবানী কাউকে ডরায় না জানিস তো।

তাই নাকি? একটু হাসল নমিতা।

টেবিলের উপর থেকে এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে তাতে লিখতে লিখতে বলল, হ্যাঁ। ও দেবতাটার সঙ্গে পাঞ্জাকষা যায় না।

অন্যদের সঙ্গে যায়?

যায়। হারজিত আলাদা কথা—কিন্তু লড়াই করা যায়। মরে গেলে আর লড়ব কী করে। স্লিপ পেপারে খসখস করে লিখে খুব জোর হাতে কলিং বেলে থাবড়া মারল শিবানী। বেয়ারা দৌড়ে এলো। তার হাতে স্লিপ পেপারটা দিয়ে বলল, ঘোষসাহেব— তারপর উঠে ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল, চল।

একটা রেস্তোরাঁর নির্জন টেবিলে গিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল দুজনে। বেয়ারা এলে নিজের খুশীমত খাবারের কথা বলে চলল শিবানী।

নমিতা বাধা দিল, অত কে খাবে রে? আমি কিন্তু খেতে পারব না মোটেই।

খুব পারবি।

বেয়ারা চলে গেলে এবার নমিতার দিকে ঝুঁকে বসল শিবানী। বললো, বল শুনি এবাব তোর কেঁদে-ভাসানো দরকারী কথাটা—এমন ছেলেমানুষ রয়ে গেছিস এখনও। একটুতে কেঁদে ভাসাস—

একটুতে— ফের গাল-গলা চোখ-মুখ-ঠোঁট ভেঙ্গেচুরে এলো নমিতার কান্নায়। কোনমতে সামলে নিয়ে কান্নাভাঙ্গা মুখকে বিদ্রূপে রূপান্তরিত করে বললো, আমি তো ছেলেমানুষ বয়ে গেছি। দেখা যাক তুই কত বিজ্ঞ হয়েছিস— আমি কেঁদে ভাসাচ্ছি— তুই শুনে কত হাসতে পারিস।

আচ্ছা, দেখা যাক—

যদিও শিবানী— একমাত্র যার কাছে ও লজ্জা ত্যাগ করতে পারে বিনা দ্বিধায় তবু তার কাছেও কথাটা বলতে সময় লাগল নমিতার। দুই হাতের তালুতে মাথা চেপে বসে রইল। তারপর এক ঝোঁকে মাথা তুলে বললো, শিবানী আই এ্যম ক্যারিইং—

ক্যারিইং! চাইল্ড? দুই ফেটে-পড়া চোখে জিজ্ঞাসা করল শিবানী।

হ্যাঁ।

বলিস কী!! চাপাকণ্ঠে যেন আর্তনাদ করে উঠল শিবানী।

এবার মলিন হাসল নমিতা। বললো, কই হাসলি নে তো?

কাঁদিও নি। ব্যাপারটার সম্মুখীন হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলল শিবানী।

নমিতা বললো, কাঁদিস নি, আর্তনাদ করে উঠেছিস।

ওটা বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কার শব্দ। কিছুক্ষন চুপ করে রইল শিবানী। টেবিলের উপর থেকে কাঁটাটা তুলে নিয়ে এ আঙ্গুলে ও আঙ্গুলে টিপে ছোট ছোট গর্ত তৈরী করতে আর ছেড়ে দিতে লাগল। প্রথমটায় অপেক্ষা করল এরপর নমিতা কী বলে শুনবার জন্য। কিন্তু ওর দিক থেকে যখন আর কথা এলো না, দেখল সে টেবিলে কনুই রেখে দু' আঙ্গুলে চোখ টিপে বসে আছে তখন ভাবতে লাগল তার দিক থেকে এখন কিছু বলা উচিত। নমিতা হয়ত সে জন্যই অপেক্ষা করছে। কিন্তু সে কি বলে? লোকটা কে এটা সে জানতে চাইতে পারে। ঘটনাটা কী তা জানতে চাইতে পারে। জানতেও ইচ্ছে করছে— কিন্তু—

বয় এসে দুজনের সামনে খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল। শিবানী ন্যাপকিন খুলে কোলে পাতল। কাঁটায় জড়িয়ে চাউমিন তুলতে তুলতে নমিতার দিকে তাকাল। দেখল সেও কোলে ন্যাপকিন পেতে হাতে কাঁটা তুলে নিয়েছে। চাউমিন মুখে পুরে জিজ্ঞাসা করল সে, লোকটা পালিয়েছে?

না।

পালায় নি? প্লেট থেকে চোখ তুলল শিবানী।

খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে নমিতা বলল, না।

তবে?

চুপ করে রইল নমিতা।

বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না?

তা ত জানি নে।

তাকে বলিস নি?

কোথায় পাব তাকে।

বাঃ! হাতের কাঁটা-চামচ প্লেটে রাখল শিবানী। আশ্চর্য কণ্ঠে বলল, এই বলছিস পালায় নি, আবার বলছিস্, কোথায় পাব তাকে— এর মানে কী? ব্যাপারটা তুই বুঝবার আগেই সে অন্য কোথাও চলে গেছে বা তোর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? এখন আর তার কোন পাত্তাই তুই জানিস নে?

না তাও নয়।

তবে কী—আর জিজ্ঞাসা করল না শিবানী। নমিতা কিছু বলতে চাচ্ছে না। হয়ত খুব লজ্জার কথা। কিংবা আত্মমর্যাদাহানিকর। চুপ করে গেল শিবানী। এ নিয়ে আর কথা বাড়াবে না সে।

শিবানীকে চুপ করে যেতে দেখে তার দিকে তাকাল নমিতা। ঘটনাটা বললে কী বিশ্বাস করবে শিবানী? কিন্তু বলতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেলল সে। না, বিশ্বাস করবে না। এ কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। ওর কাছে ট্রামে-বাসে চাপার মতো চারটে পয়সাও ছিল না। তাই ও বালিগঞ্জের দিকে নিরুপায়ভাবে হেঁটে চলেছিল। হঠাৎ ঘনকালো মেঘ করে ঝড় এলো। আর দিশেহারা ওর কাছে তক্ষুণি এসে একটা গাড়ী দাঁড়াল। আর ও শুনতে পেল গাড়ীটা বালিগঞ্জেই যাচ্ছে। শুনেই অমনি ও উঠে বসল গাড়ীটাতে। সে গাড়ী ওকে নিয়ে গেল দমদম। আর...নাঃ, আষাঢ়ে গল্পের মতো লাগছে ওর কাছেই। অপরে বিশ্বাস করবে কেন। শিবানীও করবে না। ওকে যতই বিশ্বাস করুক সেও ভাববে, এক এক সময় এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে, যে কখনো মিথ্যে বলে না, তাকেও মিথ্যে কথা সাজাতে বসতে হয়। আজ নমিতাও তাই বসেছে। ঠেকে গিয়ে গল্প তৈরী করছে, না, মিথ্যে বলছি ভাববার চাইতে বলতে চাইছি না কিছু এটা ভাবা অনেক ভাল। গ্লাস তুলে দু'সিপ ঠাণ্ডা জল খেল নমিতা। বললা, ধর লোকটা মরে গেছে। তাকে আর পাওয়া যাবে না। আমাকে বুদ্ধি দে আমি কী করব এখন?...

কিছুক্ষণ একমনে খেল শিবানী। একটা প্লেট শেষ করল। আর একটা প্লেট টেনে নিল। একবার দেখে নিল নমিতা খাচ্ছে কি না। দেখল সেও খাচ্ছে। প্রনরোল—শিবানীর সব চাইতে প্রিয় ডিস—তাতে নুন ছিটিয়ে সস্ ঢেলে খেতে খেতে এক সময় শিবানী জিজ্ঞাসা করল—এখন ক'মাস হয়েছে?

অনেক। চোখ নিচু করে জবাব দিল নমিতা।

অনেক। এবার বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল শিবানী নমিতার দিকে। তাই। অনেক মাসই। যাকে বলে ভরামাস। ওর বসার ভঙ্গি তাই বলে দিচ্ছে। ওর মুখের ভাঙ্গচোর তাই বলে দিচ্ছে। ওর পাতলা শরীরের দুই বুকের বোঝা তাই বলে দিচ্ছে। একটুও বুঝতে কষ্ট হয় না যে ও সন্তান-সম্ভবা। ওযে বুঝতে পারে নি তার একমাত্র কারণ কোন কুমারী মেয়ের সম্বন্ধে এমন কথা মনেও ওঠে না কারুর। এখন মনে পড়ল এর ভেতর দু-একদিন ওর মনে হয়েছে যে, নমিতা বড্ড মুটিয়ে যাচ্ছে। ভুঁড়ি হচ্ছে। একদিন বলেছিলও সে নমিতাকে— এই নমি সাবধান। ভুঁড়ি হচ্ছে কিন্তু তোর। একবার ভুঁড়ি হলো কী ফিগারটি কিন্তু গেল। নমিতা কী জবাব দিয়েছিল মনে নেই তো। জেনি হেসে উঠেছিল। বলেছিল শিবানী তোমারও কিন্তু একটু ভুঁড়ি হয়েছে। ও নিজের দিকে তাকিয়ে দারুণভাবে মাথা দুলিয়ে অস্বীকার করেছিল—না জেনি, আমার একটুও ভুঁড়ি বাড়ে নি। কিন্তু তবু ক'দিন বেশ কম করে খেয়েছিল মনে আছে। কিন্তু সেদিন ওর ঐ কথায় নমিতা কী করেছিল? মনে নেই তো। কি করেছিল নমিতা?...মনে পড়েছে। ওর আর জেনির মাঝখানে মলিন মুখে বসেছিল। হ্যাঁ, ভীষণ মলিন মুখে। একদম স্পষ্ট হয়ে উঠছে নমিতার সেদিনের মুখটা এখন শিবানীর চোখে। বললো, এতদিন চুপ করে বসেছিলি কেন? আরো আগে আমায় বলিস নি কেন?

প্রথমে নিজেই বুঝতে পারি নি। যখন বুঝলাম, তখন মরণ ছাড়া আর কোন কথাই ভাবি নি। কিন্তু মা'র জন্য, ছোট ভাইটার জন্য মরণের কথা বাদ দিতে হলো। কিন্তু বাঁচবারও কোন পথ দেখছি নে। তোকে বলার কথা অনেক বার ভেবেছি। বলতেও এসেছি কিন্তু পারি নি বলতে। ফিরে গেছি। এখন যে আর না বললেই নয়— তাই বলতে হলো মরিয়া হয়ে।

এত অল্প সময়ের ভেতর কী করব—আপন মনে ভাবতে লাগল শিবানী।

নমিতা কান্না গিলতে গিলতে বললো, না করবার কিছু নেই শিবানী, এক গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া। তুই মাকে আর ছোট ভাইটাকে দেখিস—

শিবানীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। বললো, মাকে রতনকে দেখব ঠিক আছে? কিন্তু তোকেই বা পথে ছেড়ে দেব কেন? গঙ্গার ঘাট আমি খুব ভাল চিনি। সেখানেও আমিই তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব। তুই কেবল লক্ষ্য রাখবি যেন আমাকে পুলিশের হাঙ্গামায় না পড়তে হয়। যখন দেখবি অনেক দূরে আমার গাড়ি মিলিয়ে গেছে তখন জলে ঝাঁপ দিবি— বাস—ঠিক আছে?

ঠিক আছে। হাসল নমিতা।

তবে আর কী। সমস্যার সমাধান তো হয়ে গেল। এখন খেয়ে নে। আমি গরম কফি দিতে বলছি। গ্লাস ঠুকে বেয়ারা ডাকল শিবানী। বেয়ারা এলে গরম কফি দিতে বলল। বেয়ারা শিবানীর প্লেট-ডিশ তুলে নিয়ে চলে গেল। নমিতা খেতে লাগল। হঠাৎ যেন কেমন বুকটা হালকা লাগতে লাগল ওর। প্রনরোল তুলে মুখে দিতে গিয়ে অরুচিতে মুখ তেমন আর বিষিয়ে উঠল না। জিভ কিছুটা স্বাদ পেতে লাগল। ক্ষুধা কিছুটা তৃপ্তি করে খেতে লাগল। কেন যে এমন হলো বুঝতে পারলে না নমিতা— কিন্তু হলো।

আসলে ওর অনুভব বুঝেছে আশ্রয় পেয়ে গেছে।

শিবানীর সামনা পরিষ্কার। বেয়ারা গ্লাস-প্লেট-ছুরি-কাঁটা চামচ সব তুলে নিয়ে গেছে। সেই পরিষ্কার জায়গায় দুহাত রেখে শিবানী বলল, আচ্ছা নমি, তোদের সব আগে মরবার কথাটাই মনে আসে কেন রে?

সব চাইতে সহজ বলে। শিবানীর কথার উত্তর দিয়ে নমিতা একটু হাসলে। বললে, আমরা যে ভীরু।

নমিতার হাসির দিকে তাকিয়ে শিবানীর মনে হলো—কান্না-ভেজা চোখ যখন হাসি খুঁজে পায় তার চাইতে সুন্দর বুঝি কিছু হয় না। বললো, সব চাইতে সহজ মরণ। তোরা ভীরু? তোদের মত সাহসী কে! আমি তো ভাবতেই পারি নি মরে গেছি; মনে হলে নিজেই নিজের জন্য কেঁদে মরি। বলেছি তো তোকে—এক ঐ মরণ দেবতাটি ছাড়া কোন দেবতাকে ভয় করি নে আমি। ঐ নাম আর আমার কাছে করবি নে। আমার কাছে যখন এসেছিস তখন সব ভার আমার : যা করবার আমি করছি। একটু ভাবতে দে। এর মধ্যে আবোল-তাবোল কিছু করে বসবি নে বলে রাখছি— ঠিক তো?

করব না।

কথা দিলি?

চোখ ছলছলিয়ে এলো নমিতার। বললো, করতে কে চায় বল?

চায়। কিছু বোকা ছেলেমেয়ে আছে। এই তুইও চাইছিলি। আমি না থাকলে হয়ত করতিস।

মরতাম।

কী লাভ হতো? কী পেতিস মরে?

কী পেতাম? আমরা কেবল হারানো বাঁচিয়ে বেঁচে থাকতে পারলেই বেঁচে যাই। কিছু হারানো মানেই আমাদের মৃত্যু। টায়টোয় বেঁচে আছি যে। পাওয়া? পাওয়ার আশা করতেও ভুলে গেছি আমি শিবানী।

তবে তো মরেই গেছিস। আবার কী মরতে যাচ্ছিলি?

যা বলেছিস। সত্যটা স্বীকার করল নমিতা ঘাড় কাত করে। বললো, মরে গেছি তাই শরীরটা গঙ্গায় ফেলে দিতে চেয়েছিলাম। তোর আপত্তি না থাকে তো দিই।

আপত্তি আছে। বেয়ারাকে কফি নিয়ে ঢুকতে দেখে থামল শিবানী। সে কফি রেখে চলে গেলে কফির থালাটা সামনে টেনে এনে কফি তৈরী করতে করতে বললো, রোগা দুর্বল— শুধু হাড় ক'খানা রয়েছে এমন শিশুদের বেলায় মা-কাকিমাদের বলতে শুনেছি, ''হাড় ক'খানাই বেঁচে থাক। হাড় থাকলেই একদিন মাস হবে।'' তেমনি আমি বলি, দেহটা অন্তত থাক। দেহ থাকলেই একদিন প্রাণ ফিরে আসে। কফির কাপ একটা নমিতার দিকে রেখে নিজের কাপে চুমুক দিল শিবানী। বললো, আত্মহত্যাকারীদের স্ট্যাটেস্টিক নিয়ে কী দেখা গেছে জানিস? দেখা গেছে, জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে যারা আত্ম-হত্যা করতে গিয়েও বেঁচে গেছে তাদের সামনে আশ্চর্যরকম সব ভালো সেজেছিল। তারা কল্পনাও করতে পারে না, জীবন তাদের আশ্চর্য আশ্চর্য উপহার দিয়েছে। কাউকে খ্যাতি, কাউকে সম্পদ। কাউকে সুখ-সংসার আনন্দ, বেঁচে যাওয়ার জন্য দুঃখ করতে হয় নি বরং তখনকার বিভ্রান্তি মনে করে তোদের সুখী জীবন শিউরে উঠেছে। তোর সামনেও জীবন কী উপচার সাজিয়ে রেখেছে তুই তার কী জানিস? হয়ত দেখবি এই সময়টুকু তোর জীবনের এমন একটা বাজে অংশ, যে, অনায়াসে কেটে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারিস। শ্রেষ্ঠ অংশ প্রতীক্ষা করছে সামনে। বন্ধু হাত বাড়িয়ে আসছে প্রাণ নিয়ে, গান নিয়ে।

সবার আসে?

স-বা-র আসে রে নমিতা। শুধু অবেলায় এলে অনেক সময় সে আসা হয়ত ব্যর্থ হয়ে যেতে চায়। অই তো প্রার্থনা করি, বন্ধু অবেলা করে ফেল না।

নমিতা কফির পেয়ালা থেকে চোখ তুলে শিবানীর দিকে তাকাল।

হাসল শিবানী। বললো, স্বামী? স্বামী বন্ধু হবে এমন গ্যারাণ্টি আছে? থাকলে তো কথাই ছিল না। বিয়ে করলেই জীবন সুন্দর। কিন্তু না—খালি পেয়ালা ঠেলে রাখল শিবানী। বললো, আমি অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। একথা এখন নয়। আমার আশু বলার কথা হলো, এখন আর অফিসে আসবি নে তুই। অসুখ বলে একটা এ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিবি কাল। ছুটির ব্যবস্থা যা করবার তা আমি করে দেবো। আমার উপর আস্থা রেখে চুপচাপ ঘরে থাক। যখন যাবার আমিই যাব তোর কাছে।

কি বিপদে যে ফেললাম তোকে!

কিছুটা ফেললি—বোকা তো। গ্লাস বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে বিল আনতে আদেশ করল শিবানী। সে চলে গেলে বললো, একটু বুদ্ধি ধরলে কোন বিপদেই পড়তি নে। প্রথম দিকে হলে কত উপায় ছিল—। কিন্তু এখন আমাদের গায়ের জোর বেশী বলেই শিশুটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি নে।

ওরা যখন রেস্তোরাঁ থেকে বের হলো তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। অফিস তখনও ছুটি হয় নি বলে ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হল না। নমিতাকে একেবারে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ঘরের পথ ধরল শিবানী। একবার প্রথমে ভাবলে, ললিতার কাছে যাবে। ওকে বলে ওর পরামর্শ চাইবে। ললিতা সঙ্গে থাকলে ও সাহস পাবে। কিন্তু ট্যাক্সিকে ললিতার বাড়ির পথ বলতে গিয়েও বলল না। ললিতা এখন নিজেই খুব অসুস্থ। বাচ্চা হবার সময় হয়ে এসেছে। এ সময়কার নানা অসুখে ধরেছে তাকে। প্রেসার বেড়েছে। হাত-পা-মুখ ফুলেছে। ডাক্তার নুন খাওয়া ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ললিতা। কেবল বলছে, শিবানীদি বাঁচব না। ঠিক মরে যাবো। না, এখন ওর কাছে বসে লাভ নেই।

কিন্তু একজন কেউ সঙ্গে না থাকলে একা ও কী করে কী করবে। ট্যাক্সির গদিতে পিঠ ছেড়ে দিল শিবানী। আশ্বাস তো দিয়ে এলো খুব নমিতাকে—এখন? বিশ্বসংসারে কে ওর বন্ধু আছে? কার কাছে বলে সাহায্য চাইতে পারে? কেউ নেই। কেউ না।

বেলাশেষের একটুকরো পড়ন্ত ঠাণ্ডা রোদ শিবানীর কোল থেকে বুকে, বুক থেকে মুখে উঠে এসে ধীরে ধীরে শিবানীর দুই বন্ধ চোখের উপর ঈষৎ উষ্ণ হাতের মতো স্পর্শ করল— চোখ খুলে গদি থেকে পিঠ তুলে সোজা হয়ে বসল শিবানী—অরুণ—অরুণকে পাওয়া গেলে তার উপর নির্ভর করতে পারত। ঐ একমাত্র লোক—যাকে ওর এখন দরকার।

অত্যন্ত জরুরি দরকার।

কিন্তু কোথায় পাবে তাকে?

যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

পাগল।

গায়ের জোরে কি সব হয়?

কোথায় খুঁজবে তাকে যার নামটুকু ছাড়া কিছুই জানে না।

হঠাৎ পরশ পাথর পেয়ে যাবার মতো চমক খেল শিবানী—ইন্দ্রনাথের কাছে কাজ করেছে। ইন্দ্রনাথের দপ্তরে অরুণের বাড়ি-ঘর নাম-ঠিকানা সবই তো আছে।

কিন্তু যোগাড় করবে কী করে?

ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ওর কথা বন্ধ আছে সেই থেকে। কথা বলা থাকলেও অরুণের ঠিকানা সে চাইতে পারত না। কোন সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারলে তার ঠিকানা জানতে চাওয়া যেত না।

সঙ্গত কারণ কিছু বের করা যায় না?

কিন্তু তার আগে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কটা ফিরিয়ে আনতে হবে তো?

বুকের ভেতর একটা অনুরণন অনুভব করল শিবানী। হাওয়ায়-ওড়া চুলগুলি হাতে চেপে ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। শ্লেষ করল নিজেকে—যতই দূরে থাক আর বিরাগ প্রকাশ করো তুমি ইন্দ্রনাথের সম্মোহন থেকে মুক্ত হতে পার নি শিবানী। তাকে দেখে তুমি এখনও মুগ্ধ হও। তাকে দেখে এখনও তুমি আবিষ্ট হও। সে তোমাকে টানে।

টানে। ইন্দ্রনাথ আমাকে আকর্ষণ করে একথা সত্য কিন্তু আবার বিকর্ষণ যে করে তাও তেমনি সত্য—বিরাগে এক এক সময় যে তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছে করে না এর ভেতর ছল নেই, শিবানী নিজের শ্লেষকেই যেন জবাব দিল।

গাড়ী জজকোর্ট রোডে এসে ঢুকলো। নির্জন ছিমছাম অভিজাত পথ। অফিস ছুটির ভিড় এ পাড়ায় বোঝা যায় না। ঝকঝকে চকচকে নানা মডেলের নতুন নতুন গাড়ি একটা দুটো করে এসে যার যার বাড়িতে দাঁড়াচ্ছে। দারোয়ান গেট খুলে দিচ্ছে। ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। শিবানী পথ দেখাল। গাড়ি এসে ওদের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াল। ভাড়া মিটিয়ে ওপরে উঠে এলো শিবানী।

কাচ্চি স্নান করব।

মহাখুশী কাচ্চি। এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরেছে শিবানী। শিবানীর স্নানের ব্যবস্থায় লেগে গেল সে। কোন শাড়িটা পরবে মা।

দে যে-কোন একটা।

শাড়ির ব্যাপারে শিবানীর এমন উদাসীন উত্তর কাচ্চির ভালো লাগে না। তবেই বুঝতে পারে সে মা'র মন-মেজাজ ভাল নেই। কিন্তু ও কী করতে পারে। মার মন-মেজাজ ভাল করতে পারেন একমাত্র সাহেব। কিন্তু—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কাচ্চি শিবানীর শাড়ি বের করতে করতে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সমস্ত বাড়ি নিয়ন আলোয় উজ্জ্বল। স্নান সেরে চুপচাপ বসে আছে শিবানী। বারান্দায়। এতবড় বাড়িটাতে ও একা। নিঃসঙ্গতা যেন ওর নিঃশ্বাস চেপে ধরতে চায়। ও কেন এত তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলো আজ? নমিতার কথা ভাবতে? কই গাড়িতে তবু যা একটু ভেবেছে, বাড়ি এসে ভেবেছে কী নমিতার কথা? ইন্দ্রনাথই তো তার মনে ঘুরছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গুন্‌গুন্‌ করতে লাগল শিবানী—

সারা দিনের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাবো যে
ভেবে পাই নে দিশা
এ আঁধার যে পূর্ণ তব
সেই কথা বলিও—
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিও—

আবার এক সময় ইজিচেয়ারে গা এলাল শিবানী। মনে মনে বলতে লাগল, পূর্ণ, সব পূর্ণ। সূর্যের আলো পূর্ণ। রাতের অন্ধকার পূর্ণ। শূন্য কেবল মানুষের মন। ঐ তো একরত্তি মন। কিন্তু তার শূন্যতা কী অসীম! মানুষের মন ভরাটের মাটি এখনও পৃথিবী বানিয়ে উঠতে পারে নি।

কিন্তু না—এসব থাক। কী করা যায় ঐ মেয়েটার ব্যবস্থা-সব ফেলে এখন আমাকে তাই ভাবতে হবে। শিবানী আবার উঠে পায়চারি করতে লাগল।

॥ ২৪ ॥

কার্তিক মাস। ছোটবেলা। এ সন্ধ্যাটাকে রয়েসয়ে মেজাজের সঙ্গে উপভোগ করার উপায় নেই। সন্ধ্যা হতে না হতে রাত। অন্ধকার একেবারে সন্ধ্যার কোমর জড়িয়ে এসে উপস্থিত হয়। সুন্দর শ্লেট রং-এর সায়ংকালটিতে এসে বারান্দায় বসেছিল শিবানী। বসতে না-বসতে একটা কালোরাত হুমড়ি খেয়ে পড়ল বারান্দায়। বেয়ারা এসে সুইচ টিপে দিয়ে গেল। দপ করে একসঙ্গে জ্বলে উঠল বিদ্যুতের টুকরোর মতো নিয়নের সারিগুলো। রাস্তার বাতি, ওদের গেটের বাতি, বাগানের বাতি— বোধ হয় অনেক আগে থেকেই জ্বালান ছিল। অন্ধকার হতে সেগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল; বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শিবানী রাস্তা দেখল। রাস্তার গাড়ীর যাওয়া-আসা দেখল। আশেপাশের বাতিগুলির বাতি জ্বলে ওঠা, চলাফেরা করা দেখল। দূর থেকে দৃষ্টি এনে বাগানে ফেলল। কতক্ষণ সব ভুলে বাগানময় মৌসুমী ফুলের বাজার দেখল। ইন্দ্রনাথের কথা, নমিতার কথা ভুলে গেল। ফুলের রাস্তা ধরে ধরে এক সময় চোখ গিয়ে পড়ল ওদের আউট হাউসের দিকে। যেখানে বাইরের লোকজন থাকে। অফিস কর্মচারী থাকে। অরুণ থাকত।

অরুণ! ইস্‌ অরুণকে যদি এখন পাওয়া যেত তবে আর ওর ভাবতে হতো না। যা করবার সেই করত।

এত বিশ্বাস ওর তার ওপর কিসের?

কতটুকু দেখেছে সে তাকে?

খুব কম। একদিন—না একদিন নয়— একবেলা—না তাও নয়, কয়েক ঘণ্টা মাত্র; কিন্তু তাতে হয়েছে কী। মাটি আর পাথর চিনতে কত সময় লাগে?

কিন্তু ঐ লোকটা কে? শ্লথপায় পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগল কে লোকটা— এমনি করে মেয়েটাকে বিপদের ভেতর ডুবিয়ে রেখে পালাল? নমিতা কিছুতেই নাম বললে না। জোর করে ওর কাছ থেক ধমকে ধমকে নামটা বের করবে নাকি? এ সব মন্দ লোককে চুপচাপ ছেড়ে দেওয়া অন্যায়। এতে করে এদের সাহসও বেড়ে যায় দিনকে দিন। একে শাস্তি দেওয়া উচিত।

একটু থামল শিবানী— নিজেকে সম্বোধন করে বললে, শিবানী তুমি তোমার লাইনের বাইরে চলে যাচ্ছ। তোমার সমস্যাটা এখনকার ব্যক্তির চরিত্র ঠিক করা নয়—একটি মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। তার কথাই ভাবো।

আবার হাঁটতে আরম্ভ করল সে— না, এমন কিছু অফ লাইনে চলে যাই নি আমি। লোকটাকে আমি নমিতাকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারি। আর তা হলেই তো আর কোন সমস্যা থাকে না। সব সমাধান হয়ে যায়।

বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারো মানে? জোর করে বিয়ে দেবে?

আপত্তি কী? এ সব লোকদের তাই করতে হয়।

কী পাগলের মতো ভাবছে ও—অবসন্ন হাতে মুখের উপরের উড়ো চুলগুলি পেছনে ঠেলে দিল শিবানী।

মন্দজনের শাস্তির কথা ভাবতে গিয়ে, ভালোজনের কথা ভুলেই গেছে। এ সব লোকের সঙ্গে কী কেউ জীবন বাঁধে। নমিতাও যে এটা চায় না সে তো স্পষ্টই। সে তার নামও উচ্চারণ করে নি। হয়ত ঘৃণায়। হয়ত বিরাগ-বিতৃষ্ণায়। তবে তো সম্পর্কের শেষ হয়েই গেছে।

কিংবা—

আবার থমকালো শিবানী—

কিংবা হয়তো লোকটা বিবাহিত। স্ত্রী আছে। সন্তান আছে। আজকাল তো কোন কিছু নয়।—যা খুশী করলেই হলো। কোন সম্পর্কের প্রতি সম্মান দেওয়া নেই, শ্রদ্ধা দেওয়া নেই। সন্তানের মতো সম্পর্কও যে মমতার সঙ্গে লালন পালন করে বানিয়ে তুলতে হয়; সে শিক্ষাটুকু পর্যন্ত নেই।—বর্তমানের বুদ্ধিজীবী জগৎ প্রজ্ঞাকে বনবাসে পাঠিয়ে বুদ্ধিকে সার করেছে। প্রজ্ঞাহীন বুদ্ধি আর শয়তান সমান। তাই বর্তমান কাল শয়তানের।

আবার চিন্তাকে বে-লাইনে চালাচ্ছ শিবানী?

ঠিক তো।

গা ঝাড়া দিল শিবানী। যাক গে—মরুক গে। যেখানে যাবার সেখানে চলে যাক লোকটা। ও তার দিকে আর তাকাবে না। নমিতা বলেছে; ধর লোকটা মরে গেছে। ও তাই ধরে নিচ্ছে। বাস। নমিতাকে কী করে পার করে আনা যায় এ ছাড়া আর কিছু দেখবার দরকার নেই ওর।

আচ্ছা, ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

সঙ্গে যাবে কে? দেখাশুনা করবে কে?

হয় না।

এখানেই করতে হবে যা করবার। টাকায় কী না হয়। একজন ডাক্তারের কাছে সব বলে করুণাভিক্ষা করা যেতে পারে। হাতে টাকার তোড়া গুঁজে দিতে দিতে করুণাভিক্ষা কিছু নীরস প্রার্থনা নয়। হয় না?

এটা হয়।

কোন নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেওয়া যেতে পারে বিবাহিত বলে?

এটাও হয়।

পারে কোথাও ফ্ল্যাট নিতে। কলকাতায় কার খবর কে রাখে? আর সে মধ্যবিত্ত পাড়ার ঘিঞ্জি জায়গার ফ্ল্যাট নিচ্ছে না। নেবে অভিজাত পাড়ার নির্জন পরিবেশের নির্জন ফ্ল্যাট। এমন জায়গা হবে সেটা যে সেখানে কেউ হেঁটে পথ চলে না। হুস করে সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। মুখ চেনাচেনি হতেও সময় লাগে সেখানে। ততদিনে ওরা ওখান থেকে পার।

হয় না?

চমৎকার হয়।

একজন ডাক্তার কিছু টাকা আর ও—হয়ে গেল তো।

যত দুরূহ ঠেকছিল তত দুরূহ নয় দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল শিবানী। হাঁক ছাড়লে, কাচ্চি, চা।

উঃ কী আরামই না লাগছে। আর ভয় পাইনে—বারবার কথাগুলি বলতে ইচ্ছে করছিল শিবানীর। সবারই তাই করে। বারবার খুশির কথাগুলি বলে বারবার সুখের ঢেউ তুলতে চায় বুকে। কিন্তু শিবানী কাকে বলবে? অগত্যা হাঁক ছাড়লে, কাচ্চি চা—

সন্তোষ প্রকাশের কোন বাহ্যিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না কিন্তু কিছু না করেও থাকতে পারছে না, এমন অবস্থায় ওর চা চাই। বলার মতো কাছের মানুষ যদি নেই, চায়ের পেয়ালাটাই কাছে থাক। নিঃসঙ্গতায় চমৎকার সঙ্গী সে। একা বসে থাকলে একা লাগে কিন্তু এক কাপ চা কাছে থাকলে আর একা লাগে না।

কী শক্তই ঠেকছিল। কিন্তু কী আর— কেউ টেরই পাবে না। সাতদিন বাদে অফিস করতে পারবে ফের নমিতা।

বাচ্চাটা!!

এতক্ষণ হুঁশ হলো শিবানীর, বাচ্চাটা।

নিজের কপালে থাপ্‌পড় মারলে শিবানী —আসল সমস্যা যাকে নিয়ে তাকে ভুলে কেমন অপূর্ব সমাধান করে খুশিতে নাচছে সে।...

...ললিতার তো শিগগিরই হবে— কোন ভাবে ম্যানেজ করা যায় না ওর যমজ হয়েছে বলে?

দূর। হয় না।

নিয়ে আসবে ও?

—পাগল! ইন্দ্রনাথ ছুঁড়ে ফেলে দেবে রাস্তায়।

ইন্দ্রনাথ কী খুব নির্দয় প্রকৃতির লোক? নিষ্ঠুর হতে বাধে না তার?

না বরং উল্টোটা। নিষ্ঠুর হতে সে পারে না, সে সহৃদয়। কিন্তু তাই বলে পিতৃপরিচয়হীন সন্তান ঘরে এনে তোলে কোন ভদ্রলোক?

কোন ভদ্রলোক তোলে না—চিবুকের কোণে বিষঢালা হাসি ফুটে উঠল শিবানীর। পুরুষের হাতেগড়া সমাজ—তার পরিচয়-পত্রটি ঠিকমত দাখিল না করা পর্যন্ত কোন শিশুকে ঘরে তুলতে দেয় না সে। তাদের একজন কেউ অবশ্যই আছে এই নারীর মা হবার মূলে, এ সত্যে কিছু হয় না। সে কে? কী নাম তার? পুরুষ দরজা আটকে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে কেবল শুধোবে, কী নাম এর বাবার? যতক্ষণ জবাব না মিলবে ততক্ষণ লক্ষ পুরুষ লক্ষ দরজা আটকে দাঁড়িয়ে থাকবে। না দেবে সন্তানকে ঘরে ঢুকতে, না দেবে সন্তান বুকে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কম্পিত নারীকে ঘরে ঢুকতে—কিন্তু 'মা' -এই নাকি নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

হঠাৎ ভীষণ জোরে হেসে উঠল শিবানী— ওর হাসির শব্দে চকিত হয়ে উঠল সমস্ত বাড়ি। বাবুর্চির হাত চলকে কিছু ভিনিগার বেশী পড়ে গেল পাত্রে। যদিও তার বাবুর্চিখানা থেকে বারান্দা তাকালেও দেখা যাবে না। তবু তার দৃষ্টিটা সে দিকে ঘুরে এলো। আবদুল সাহেবের ঘর ঝাড়ছিল। তার হাতের ঝাড়ন থেমে গেল। মালী ফুল নিয়ে উপরে আসছিল, সে থমকাল। কাচ্চি চা বানাচ্ছিল শিবানীর জন্য। সে ছুটে এলো। চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করল, কী মা, কী হয়েছে?

কুপিতদৃষ্টিতে শিবানী তাকাল কাচ্চির দিকে চোখ মুখ ও রকম করছিস কেন? হাসছি দেখতে পাচ্ছিস না?

একা একা হাসছ যে।

একা হাসছি বলে হাসিটা ভয়ের হয়ে গেল? একা বসে কাঁদা গেলে একা বসে হাসা যাবে না কেন?

এ কথার জবাব কাচ্চির ভাণ্ডারে নেই।

আবার আক্রমণ করলে শিবানী কাচ্চিকে, কী একা যদি কাঁদা যায়, হাসা যাবে না কেন— বল? দুঃখ হলে যেমন কান্না পায়, খুশি হলে তেমনি হাসি পায়— তাতে চোখমুখ অমন ছানাবড়া হয়ে উঠবে কেন?

কাচ্চি গোঁজমুখে বললে, সে কী মা অত জোরে হাসে কেউ!

বুঝতে পারছি তুই কী বলতে চাচ্ছিস। তুই বলতে চাচ্ছিস, হাসির কথা মনে পড়ে যে হাসি আসে তা গাল পর্যন্ত আসে, মানুষের কান পর্যন্ত যায় না। তা ঠিক। তবে হাসির কারণটা যদি খুব জোর হয় তবে বুঝছিস না হাসিটাও জোর হয়ে পড়ে—এই আর কী। কিন্তু আমার চা কই?

চা'ই তো ঢালছিলাম। এক্ষুণি নিয়ে আসছি মা। কাচ্চি গেল আর তক্ষুণি চায়ের কাপ হাতে ফিরে এলো।

চায়ের কাপে চুমু দিয়ে শিবানী বললে, কেন হাসছিলাম শুনবি? বোস তবে।

শিবানীর ঐ হাসি থেকে, কথা বলার রহস্যপূর্ণ ভঙ্গি থেকে কাচ্চি বুঝে নিয়েছিল তাকে বসিয়ে অনেক কথা বলবে শিবানী। তাই পায়ে মাখার ল্যাভেণ্ডারের লোশন নিয়ে তৈরী হয়েই এসে বসেছিল। শিবানীর কাছে বসলে কোন না কোন পরিচর্যা তার সে করেই। শিবানীর পা কোলে টেনে নিয়ে মেঝেয় বসল কাচ্চি।

এমন বৈঠক ওদের দুজনাতে হয়। কখনও কাচ্চি কথা বলে, শিবানী শ্রোতা। কখনও শিবানী কথা বলে, কাচ্চি শ্রোতা। শিবানীর কথা কাচ্চি বুঝে উঠতে পারে তা নয়। কাচ্চিকে বলাটা যদিও শিবানীর কখনও নিজের সঙ্গেই কথা বলা—কখনো বিষয়টা নিজের কাছেই পরিষ্কার করে তোলা— তবু তার চাইতে কিছু বেশীও। শিবানী দেখেছে ওর বক্তব্যের ভাবার্থটা ঠিক ধরে নেয় কাচ্চি।

ললিতার কবে বাচ্চা হবে রে?

আরো মাস দু-এক বাকি। সেদিন ললিতা দিদিমণিকে দেখতে গিয়েছিলাম মা।

খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে।

শিবানীর পায়ের তলায় লোশন ভেজানো হাত বুলোতে বুলোতে কাচ্চি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, এ সময় ও রকম কত কী হয় কিছু হয় না তাতে।

এখন আমার একটি বাচ্চা না হলে ভালো লাগছে না— তাই না?

তুমিই বল মা তা কী ভাল লাগে? শিবানীকে এমন স্পষ্ট করে কথাটা বলতে শুনে উৎসুক হয়ে উঠল কাচ্চি— বাচ্চাকাচ্চা না হলে কী নিয়ে সংসার করা, মা বল?

আচ্ছা?

মায়ের কোলই শোভে না বাচ্চা না থাকলে।

মায়ের কোল নয় বল নারীর কোল। শোভে না নয়, বলি নারীজন্মই সার্থক হয় না, মা না হওয়া পর্যন্ত।

ঠিক কথা বলেছ মা।

মা না হলে আর মেয়েরা হলটা কী? সব কিছুই 'না' রয়ে গেল যে। তাই না?

তাই তো মা আমিও দিনরাত প্রার্থনা করছি তোমার কোল ভরুক। সেদিন কালীবাড়ি পুজো দিয়ে এসেছি আমি।

আরে—

হ্যাঁ মা খুব সত্য কালী। তার কাছে পুজো দিলে মানত রাখলে ফল হয়ই। দেখো, ভগবান আমার ডাক শুনেছে। বলে এক গাল হাসে কাচ্চি। তোমার শিগগিরই ছেলে হবে—

চায়ের শূন্য কাপ মেঝেয় রেখে, কাচ্চির কোল থেকে পা টেনে সোজা হয়ে বসল শিবানী। এতই যদি একটা বাচ্চা না হলে একটা মেয়ের সব ব্যর্থ হয় অর্থাৎ একেবারেই না চলে তবে আমার জন্য ভগবানকে ডাকছিস, তোর নিজের হোক না কেন?

হতভম্ব দৃষ্টিতে শিবানীর দিকে তাকিয়ে রইল কাচ্চি।

কী বলছিস? ঐ তোর স্বামী নিরুদ্দেশ যে— এই তো?

এত কথা বলছিল যে কাচ্চি তার মুখ দিয়ে আর বাক্য সরল না। অমন পাগলের মতো হেসে উঠেছিল। এখন কী যা-তা বলছে—শঙ্কিত, সন্দিগ্ধ চোখে সে তাকিয়ে রইল শিবানীর দিকে।

উত্তেজিতভাবে শিবানী বললে, স্বামী নিরুদ্দেশ তাতে— হয়েছেটা কী? একটা মেয়ের জীবন যখন ছেলেমেয়ে না হলে ব্যর্থ তখন হবে ছেলেমেয়ে। স্বামী চলে গেছে বা মরে গেছে বা বিয়ে হয়নি বলে একটা মেয়ে ব্যর্থ হয়ে বসে থাকবে নাকি? ঐ যে দুটি বোন এক-সঙ্গে অফিসে যায় আসে দেখেছিস তো তুই? চেহারা নিতান্ত খারাপ বলে দু বোনের এক বোনেরও বিয়ে হয়নি। বেশ, কুৎসিত বলে যদি বিয়ে না হলো কি আর করা— না হলো। কিন্তু কুৎসিত বলে মা হতে তো বাধা নেই? আর মা হলেই যখন মেয়েজন্ম সার্থক— তখন তারা মা হয়ে জন্ম সার্থক করুক— না তাও হতে পারবে না। এতো বড় তাজ্জব কথা। তোর স্বামী নেই। ঘর নেই। একটা ছেলে মেয়ে হলে তোর ঘরটা হয়— না তা হতে পারবে না।

একটা নিঃশ্বাস টানল শিবানী—কিন্তু আমার স্বামী আছে। ঘর আছে। সাজান সংসার রয়েছে তবু নাকি কিছুই কিছু নয় যতক্ষণ না বাচ্চা হবে। অপূর্ব!

উত্তেজনায় শিবানী যেন আর বসে থাকতে পারলে না। উঠে পড়ল সে কেদারা থেকে। উঠতে উঠতে বললে, নিজেদের মতলব দিয়ে সুখ-দুঃখ, চরিতার্থতা ব্যর্থতা বানিয়ে মেয়েদের মনগুলিকে তা দিয়ে এমন ঠেসে রেখেছে পুরুষ যে, একেবারে যা-তা হয়ে গেছে মেয়েগুলি। কোন পদার্থ নেই আর তাদের ভেতর। সত্যিকারের সুখ সফলতা ব্যর্থতাকে চেনেই না। পুরুষের মতলবের তৈরী কতকগুলো সুখ-দুঃখের মালা গলায় পরে হাসে কাঁদে। কখনও বাচ্চা বাচ্চা ক'রে পাগল হয়। কখনো বাচ্চা হলে গলা টিপে মেরে পেলে। এয়োস্ত্রী হয়ে মাছ না খেলে তার স্বামী মরে। বিধমা স্ত্রী মাছ খেলে, নরক বাস হয়—হাউ রিডিক্যুলাস!

প্রথম দিকে শিবানীর কথাগুলোয় কাচ্চির দুচোখ ক্রমেই ছানাবড়া হয়ে উঠেছিল। বুকের মধ্যে ধরাস ধরাস শব্দ হচ্ছিল; সাহেব বাড়ি থাকলে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডাকতেই হয়তো বলে ফেলত। যদিও শিবানী কিছুক্ষণ থেকেই আর ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল না। সত্যি সত্যি আপন মনের সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছিল। তবু কাচ্চির ছানাবড়া চোখ যেন আস্তে আস্তে এবার শান্ত হয়ে আসতে লাগল— শিবানীর কথার মর্ম গ্রহণ করতে পারছে যেন সে। ওর বুকের নিপীড়িত সত্তা যেন পীড়নের বেদনায় কেঁদে উঠতে চাচ্ছে।

ছটফটে হাতে হাত ঝাড়া দিল শিবানী— না—না এ সব কথা তুই বুঝবি নে। ক'টা শিক্ষিত মেয়ে বুঝবে। আমারও শক্তি নেই বোঝাবার। অস্থিরকণ্ঠ আক্ষেপে ভেঙ্গে পড়ল শিবানীর, আমি যা বলতে চাই তা গুছিয়ে বলতে পারছি নে। সে ক্ষমতা আমার নেই। যতদিন না মেয়েদের বলার সেই শক্তি আসবে, যতদিন না মেয়েরা তাদের নিজেদের সুখ দুঃখ সার্থকতা নিষ্ফলতার কথা বুঝে নিজেদের পথ নিজেরা তৈরী করে না নেবে, ততদিন তাদের এই পুতুল জীবনই কাটাতে হবে। অর্থই বল আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই বল কোন কিছুই সুখ এনে দিতে পারবে না। যা—চা নিয়ে আয়।

আর কত চা খাবে মা?

একটা কিছু তো করব। মাত্র আটটা— এখন তো ভাত খেয়ে ঘুমোতে যেতে পারি নে। বসে বসে তো একটা কিছু করতে হবে?

কেন, তোমার বই পড়ো।

না, আজ বই পড়া হবে না। মাথায় অনেক চিন্তা। আর চা না হলে চিন্তা করা যায় না। যা চা নিয়ে আয়।

অফ দি পয়েন্ট—না, ভাবনার প্রয়োজনীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে বেলাইনে বহুদূর চলে গেছি। এ ভাবে যদি এক ভাবনার ভেতর আর এক ভাবনা এনে ফেলে লাফালাফি করি তবেই হয়েছে।

অনেক পায়চারি করলে। অনেক ভাবলে। কিন্তু কোন কূল দেখতে পেলো না শিবানী। বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে? অসম্ভব তা সে পারবে না। এক সময় শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল নমিতারই ওপর— যেমন বোকা তেমনি শাস্তি ভোগ কর।

শাস্তিটা কী?

ও জানে না।

কিন্তু তা বললে কী হয়। ও যে জানে নমিতা মরবে।

মরাটা এতো সোজা নয়। মুখে বললেই আর মানুষ গিয়ে মরে না।

কিন্তু তাই তো হয়। এ সব ঘটনায় নিজে মরে নয়তো বাচ্চাটাকে মারে। যে ব্যাপারের যা নিয়ম। এ ঘটনার এটাই নিয়ম। সমাজ-ব্যবস্থা তাই। তবে আর ও কী করবে। কিছু করার নেই ওর।

না, এ বললেও চলবে না। সব দায়িত্ব তার ওপর পেছোনো চলবে না। যা করার ওকেই করতে হবে এবং ও করবে।

॥ ২৫ ॥

পরের দিন অফিসে গেল না শিবানী। ঠিক করে ফেলল, নমিতাকে তো ছুটি নিতে বলেই এসেছে, ও নিজেও নমিতার একটা ব্যবস্থা মনে গুছিয়ে আনতে না পারা পর্যন্ত অফিসে যাবে না। মাথায় এক কথা নিয়ে অন্য কাজ করতে গেলে ভুল হবেই। তখন দেও জবাব। কর ক্রটি স্বীকার। কর ভুল সংশোধন। দরকারটা কী।

কিন্তু দুদিন পার করে দিল সে ভেবে তবু স্থির করতে পারলে না কিছু।

কাচ্চি শিবানীকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল, সেদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিতে দিতে বললো, কি হয়েছে মা?

কাচ্চির দিকে তাকাল শিবানী।

কাচ্চি বললো, অফিস যাচ্ছ না। কখনো হাঁটছ তো কেবল হাঁটছই। কখনো চুপ করে বসে থাকছ তো কেবল বসে থাকছই। খাচ্ছ যখন তখনও মন কোথায় পড়ে থাকছে—

চোখের পাতাদুটো একপলকের জন্য স্থির হলো শিবানীর—

কাচ্চির কাছে পরামর্শ চাইলে কেমন হয়?

দেখা যাক না ও কী বলে? শিবানীর স্থির চোখ চঞ্চল হলো। হ্যাঁ, ওকেই সে বলবে না বলে কোন কথা সে কাচ্চিকে? কাচ্চির সঙ্গে কথা বলেই না বেঁচে আছে। একটুকরো প্লামকেক হাতে তুলে নিয়ে তা থেকে একটু একটু দাঁতে কেটে খেতে খেতে বলল, খুব একটা চিন্তায় পড়ে গেছি আমি। কি যে করবো বুঝে উঠতে পারছিনে; তোকে বলছি। শুনে তুই বলতো কী করা যায়।

ঘাবড়ে গেল কাচ্চি। শুনতে তো সে চাচ্ছেই। শিবানীর সব কথাই তো সে শোনে। কিন্তু শিবানী কি করবে সে বুদ্ধি ও দেবে নাকি! বললো, তুমি যে কী বল মা তার ঠিক নেই। তোমাকে আমি বলব, কি করবে।

কেন বলবি নে? তোর বুদ্ধি বিবেচনা কী কারু চাইতে কম? লেখাপড়া শিখিস নি তাতে হয়েছে কী? সব কাজে কী লেখাপড়া লাগে? লাগে আক্কেল। ওটা লেখাপড়ার চাইতেও দামী বস্তু। তোর মধ্যে সেটা আছে— বিনয় না করে বুদ্ধি বাত্‌লা তো।

যদিও শিবানীর কাছে কুণ্ঠা বা লজ্জার বড় ধার ধারে না কাচ্চি। কিন্তু শিবানী বুদ্ধি চেয়েই ওকে ঘাবড়ে দিল। থতমত খাওয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল কাঁচুমাচু মুখ করে।

শিবানী কেকের টুকরোটা খেয়ে হাত ঝাড়লে। তারপর টি-পট টেনে নিয়ে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললে, ব্যাপারটা হলো, একটি মেয়ের বিয়ে হয় নি কিন্তু তার বাচ্চা হবে—

কাচ্চি মাথায় যেন গুলি খেল। তার মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে গেল।

শিবানী দেখল কিন্তু থামলে না। বললে, মেয়েটি আমার কাছে এসেছে এ বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করে দেবার জন্য। কিন্তু ভেবে ভেবে তো হিমশিম খেয়ে গেলাম—মাকে বাঁচালাম কিন্তু বাচ্চাটাকে কী করব কোন কূলই পাচ্ছি নে, একেবারেই দুঃসাধ্য ঠেকছে! কিন্তু আমি যদি কিছু না করি তবে মরবে মেয়েটা।

দুদিন আগের কাচ্চি হলে তক্ষুণি বলে ফেলত, এ মেয়ের মরাই ভাল। আজকের কাচ্চির কথাটা মনে এলো, কিন্তু মুখে এলো না। এতক্ষণ ও শুনতে শুনতে স্তম্ভিত বিস্ময়ে, অসীম ঘৃণায়, গালে হাত চেপে বলতে পারেনি, ও মাগো। কী হবে গো। কী সর্বনেশে কথা। এখনও বলতে পারলে না, মরবে না তো কী। গতানুগতিক রাস্তা থেকে শিবানী ছিটকে ফেলে দিয়েছে ওকে। এককানে সে তার আজন্ম সংস্কারের একটি অবিবাহিত মেয়ের বাচ্চা হবার ভীষণতম পাপকথা শুনছে, অন্য কানের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে বয়ে চলেছে শিবানীর বলা এর অপাপবিদ্ধতার কথা।

তোর স্বামী তোকে ফেলে পালিয়ে গেছে, সেজন্য তুই মা হতে পারবি নে কেন? ঐ যে মেয়ে দুটোকে কেউ বিয়ে করলে না কুৎসিত বলে— বেশ ত' না মিলল স্বামী কিন্তু সন্তান মিলবে না কেন তাদের? ঐ যে মেয়েটা বাপ-মা ভাই-বোনকে প্রতিপালন করতে গিয়ে সময়ে বিয়ে করে উঠতে পারলে না। এখন রূপ যৌবন চলে গেছে বলে আর কেউ বিয়ে করবে না। কিন্তু সেজন্য সে মেয়ে মা হতে পারবে না কেন? যার কেউ নেই যে স্বামী পেল না, যার সংসার মিলল না, তারই তো সবার আগে সন্তান প্রয়োজন তার শূন্য বুকে আঁকড়ে ধরবার জন্য। তার শূন্য সংসার গড়ে তুলবার জন্য—

কাচ্চির হৃদয়ের সত্য কাঁদছে। আর হৃদয়ের সত্য কেঁদে উঠে যা পেতে যায় তাকে পাপ বলার শক্তি খুঁজে পেল না কাচ্চি। তার অন্তরাত্মা ছুটোছুটি করে বলতে চাইছিল, মা-ই রাখুক বাচ্চাকে। কিন্তু এ কথা বলার যে কোন মানে হয় না এ জানা কথা। তাই তার উত্তেজিত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো, তুমি নিয়ে এসো মা।

তা পারলে তো কথাই ছিল না রে। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে খাবার খেতে লাগল শিবানী—

তোদের সাহেব রাজী হবে? দেবে আশ্রয়?

তুমি আমাকে যে ভাবে বললে সব, সে ভাবে সাহেবকে বল না। দেখবে রাজী হবেন সাহেব।

হবেন না।

তুমি কী সুন্দর করে বোঝালে, আমি বুঝে গেলাম আর সাহেব বুঝবেন না?

সাহেব আর তুই কী এক? সাহেব পুরুষ আর তুই মেয়ে। তোর কাছে কী অস্ত্র আছে যে, তুই আমার সঙ্গে লড়বি। তোর অস্ত্র নেই, তোর আছে একমাত্র হৃদয়ের সত্য। তুই তোর হৃদয়ের সত্যের কাছে মাথা নত করেছিস। সাহেব লড়াই-এ নামবে। তার দু'হাতে কত অস্ত্র! একসঙ্গে চালাবে দু'হাত। ডান হাতে কোপ দেবে 'সমাজ' বলে হুঙ্কার ছেড়ে। বাঁ হাতে কোপ দেবে সমাজের অর্থনীতি বলে। ফের ডান হাত চালাবে নিয়মের শৃঙ্খলা বলে। বাঁ

হাত চালাবে নিয়মের উচ্ছৃঙ্খলতা বলে। তারপর ডান হাত বাঁ হাত চলতে থাকবে একসঙ্গে ম্যাট্রিয়ারকেল, প্যাট্রিয়ারকেল, নারীর দায়িত্ব, পুরুষের দায়িত্ব, নারীর স্বাধীনতার সীমা—অনেক আগড়-বাগড়। অস্ত্রগুলোর ধার না থাক ভার আছে। তার তলায় চাপা পড়ে আমি শেষ নিঃশ্বাস ফেলব।

কাচ্চির বোকা বোকা চাউনির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে শিবানী বললে, কি-চ্ছু বুঝছিস্ নে? বুঝবিনে। কেননা এসব কথার মধ্যে তুই আমার কঠিন কঠিন কথা যার সাহায্যে বুঝিস সেই হৃদয়ও নেই, সত্তাও নেই। এসব কথা তুই বুঝতে পারবি নে। আসল কথা হল, পুরুষ তাদের স্বার্থের কাছে, সুখের কাছে, এমন কি সামান্য সামান্য আপাতসুবিধার কাছে পর্যন্ত মেয়েদের বুকের সত্তাকে বিনা দ্বিধায় বলি দেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস টানলে শিবানী— আর বলি হবে না কেন বল? গলা যদি হাঁড়িকাঠে পাঁঠা সাধ করে ফেলে রাখে বলি হবে না কেন? মারার সুখ, ভোজনের সুখ একত্র মিললে ছাড়ে কোন মূর্খ?

খাওয়া শেষ করে ইজিচেয়ারে পিঠ রাখলে শিবানী। বললে, থাক গে এ সব কথা। এখন কথা হলো এই যে, সাহেবকে বলা যাবে না। তাতে বিপদ বাড়বে আরো। আমিও নজরবন্দী হয়ে পড়বো যাতে কিছু না করতে পারি। একটু সামলে শিবানী কি যেন ভাবতে লাগলো একমনে।

চায়ের টেবিল সাফ্ করতে করতে কাচ্চিও কিছু একটা উপায় মাথায় আনতে চেষ্টা করতে লাগল। তারপর টেবিল পরিষ্কার করে বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো নিজের চায়ের বিশাল পেয়ালা হাতে নিয়ে। এসে দরজায় পিঠ রেখে শিবানীর কাছে বসল।

আপন মনে শিবানী বললে, সাহেবের আশা করা বৃথা কিন্তু একজন কাউকে না হলেও তো চলবে না। কাকে পাওয়া যায়। এখন কার কাছে যাওয়া যায় যাকে বিশ্বাস করা যাবে। যার উপর চোখ বুজে নির্ভর করা যাবে—

ঠোঁটের পেয়ালা ঠক্ করে মেঝের উপর নামিয়ে রেখে কাচ্চি বলে উঠল, আমাদের আগের ম্যানজারবাবুর উপর মা। তাকে পেলে চমৎকার হয়। তোমায় আর কিছু ভাবতেই হবে না। এমন ভাল লোক হয় না।

কাচ্চির মুখে অরুণের নাম শুনে প্রথমটায় একটু চমকে উঠেছিল শিবানী। ওর মনের খোঁজ কী করে টের পেল কাচ্চি! কিন্তু তারপর বুঝল ওর মনের কথা হিসেবে কাচ্চি বলে নি। ও এত সামান্য দেখায় অরুণকে চিনেছে আর কাচ্চি তার অনেক বেশী দেখায় অরুণকে চিনবে না? অরুণ যে খাঁটি মানুষ কাচ্চি চিনেছে।

উঠে বসল শিবানী। বললে, কোথায় পাব তাঁকে? ঠিকানা জানিস আগের ম্যানেজারবাবুর?

আমি জানিনে কিন্তু সাহেবের কাছে তো আছে। সব লোকের ঠিকানা সাহেবের অফিসের খাতায় যে লেখা থাকে তুমি জান না?

তা জানি।

তবে আর কী। তুমি সাহেবের কাছে চাইলেই তিনি এনে দেবেন---বলেই হঠাৎ থামল কাচ্চি। তক্ষুণি ওর মনে পড়ে গেল ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শিবানীর বর্তমানে যে বহু দূরের সম্পর্ক চলছে সেই কথা। তাই বললে, তুমি যদি বল তবে আমিও অবশ্যি আনতে পারি।

কার কাছ থেকে?

কেন নতুন ম্যানেজারবাবুর কাছে চেয়ে। তুমি চেয়েছ বললেই তিনি এনে দেবেন ঠিকানা।

কিন্তু ম্যানেজারের কাছ থেকে শুনে সাহেব আশ্চর্য হয়ে যখন এসে জানতে চাইবে, তার আগের ম্যানেজারের ঠিকানায় আমার কী দরকার পড়ল, আমি জবাব দেব কিরে? হয় না, হয় না, হয় না,— বুঝলি কাচ্চি 'হয় না', সব সার বেঁধে হায়েনার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। 'হয়' যে কী, এক ঈশ্বর জানেন। কিন্তু তাঁর ঠিকানাটাও জানিনে।

মা, একটা বুদ্ধি মনে এসেছে মা— চায়ের পেয়ালা দেয়ালের কোণে ঠেলে রেখে উঠে শিবানীর সামনে এসে দাঁড়াল কাচ্চি। বললে, আমার পিসী—

ঐ যার কাছে তুই মাঝে মাঝে রক্তের সম্পর্কের স্বাদ পেতে যাস্?

হ্যাঁ, কথাটা তোমার হয়তো মনে নেই। কিন্তু আমি তোমায় বলেছিলাম। একদিন হঠাৎ সেই পিসী আমার কাছে কিছু টাকার জন্য এসেছিল। খুব দরকার। না হলেই তার চলবে না। তুমি বাড়ি ছিলে না। আগের ম্যানেজারবাবু

তাঁর ঘরে কাজ করছিলেন, তাঁর কাছেই গেলাম। তাঁর কাছ থেকেই টাকা এনে পিসীকে দিলাম। যদিও সে টাকা আমি ম্যানেজারবাবুকে শোধ করে দিয়েছি। কিন্তু নাও তো দিয়ে উঠতে পারতাম?

দিয়ে দিয়েছিস টাকা আবার না দিতে পারার কথা আসছে কোথা থেকে?

শোনই না—

বেশ বল।

ধর মা, আমি ম্যানেজারবাবুর টাকা তখন দিতে পারলাম না। তিনি চলে গেলেন। তবে এখন নতুন ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে ঠিকানা এনেই তো আমাকে সে টাকা আগের ম্যানেজারবাবুকে পাঠাতে হতো?

আচ্ছা!!!

কাচ্চির কণ্ঠ উৎফুল্ল হয়ে উঠল— একথা বলেই তো আমি ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকেই হোক বা অন্য কাউকে দিয়ে হোক, অফিস থেকে ঠিকানা আনতে পারি আগের ম্যানেজারবাবুর? পারি না?

পারিস, পারিস, পারিস, কাচ্চি! ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে বুকে হাত রেখে দু চোখ বুজে 'আঃ' করে একটা স্বস্তির শব্দ করলে সে। বললে, কী হাল্‌কা যে লাগছে কী বলব কাচ্চি! তারপর চোখ মেলে কাচ্চির দিকে তাকিয়ে বললে, বলেছিলি 'আমি বলব মা তোমাকে তুমি কী করবে'— দেখ তুই-ই বললি। একা একা হাঁফিয়ে উঠেছিলাম ভাবতে ভাবতে। তোকে বলে হাঁফ ছাড়তে পারলাম যে শুধু তাই নয়, তুই-ই আমাকে এমন লোক এনে দিলি যাকেই সত্যি মনে মনে খুঁজছিলাম!! তুই আমার সব চাইতে বড় বন্ধু। তোকে না পেলে এ বাড়িতে মরেই যেতাম একা একা—সত্যিই মরে যেতাম।

কাচ্চিও খুশিতে টগবগ করছিল। শিবানীর পিছনে গিয়ে তার রাতের বিনুনি খুলতে খুলতে গলায় আহ্লাদ ঢেলে বললে, সাহেব কিন্তু তোমায় ভীষণ ভালবাসেন মা। এ দুদিন ধরে তিনি আমার চাইতেও বেশী লক্ষ্য করছেন তোমাকে, আমি দেখেছি। তুমি যে বই পড়ছ না, কেবল উঠছ, বসছ, হাঁটছ সাহেব দেখছেন।

কাচ্চির মাথা ম্যাসেজ উপভোগ করতে করতে শিবানী হাসল। বললে, আচ্ছা!

জান, কাল সন্ধ্যেবেলা দুবার তোমার ঘরের দরজার কাছ দিয়ে হেঁটে গেছেন সাহেব।

এবার সামান্য শব্দ করে হেসে উঠলো শিবানী।

কাচ্চি বলল, তুমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে এত ভাবছিলে যে, জানতেও পারনি। কিন্তু সাহেব খুব দেখছিলেন তোমাকে।

খুব তামাশা উপভোগ করছে এমনিভাবে গালে ঈষৎ হাসি নিয়ে, চোখ ছোট করে কাচ্চির কথা শুনছিল বটে শিবানী কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনটা ওর সুরেলা হয়ে উঠছিল। কানে মল্লার রাগিণী হয়ে বাজছিল, সাহেব খুব দেখছিলেন তোমাকে।

কাচ্চিও জানে, সে সুর বাঁধছে। বললে, সাহেব আজ তোমার মতই একবার ঘরে গিয়ে বসছেন, আবার বেরিয়ে এসে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছেন, আবার ঘরে গিয়ে ঢুকছেন। অফিসে যাবার জন্যও তৈরী হননি।

অর্থাৎ সাহেবকে কাচ্চি আজ খুব চঞ্চল দেখছে।

এবার জোরে হেসে ফেলল শিবানী। তারপরই মুখে ব্যস্ততা ফুটিয়ে তুলে বললে, দুধের সর আর কাঁচা হলুদ দিয়ে স্নান করে লাল বেনারসী শাড়িটা পরব কাচ্চি?

ঠোঁট ফুলালো কাচ্চি— তোমার ওসবের কিছু দরকার হয় না মা। তুমি যেমন আছ তেমনই যাও না। তুমি গেলেই সাহেব হাতে স্বর্গ পাবেন।

তবে যাবো? অনুমতি চেয়ে হেসে ফেলল শিবানী। কিন্তু এ সবই তার নিতান্তই বাইরের অভিনয়। অন্তরে সে ইন্দ্রনাথের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢুকে পড়ে চঞ্চল ইন্দ্রনাথকে দেখছিল।

মেমসাব—

আবদুলের ডাক শুনে বুকটা হঠাৎ ভীষণভাবে দুলে উঠল শিবানীর।

আবদুল বললে, মেমসা'ব, অমল বাবু আয়া।

আচ্ছা যাচ্ছি।

আবদুল চলে গেল।

কিছুটা ধাক্কাই যেন খেল শিবানী। আবদুলের ডাক শুনে সে নিশ্চয় করে ভেবেছিল ইন্দ্রনাথ বার্তা পাঠিয়েছে। আর ইন্দ্রনাথের এই ডাকটার জন্য যে সে কী ভীষণভাবে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ছিল এও বুঝলে। বড়ড অপ্রতিভবোধ করলে সে কাচ্চির কাছে। ও জানে ও ধরা পড়ে গেছে কাচ্চির কাছে। লজ্জা ঢাকতে মেজাজের পর্দা চড়িয়ে দিল শিবানী। বললে, দেখ, কার কাছ থেকে ডাক এলো ভেবে আনন্দে দুলে উঠলাম আর ডাক এলো কার কাছ থেকে। দেখলি তো নিয়তির খেলা? আমি কী করতে পারি বল? দুদিন অফিসে যাইনি বলে ছুটে এসেছে যে খবর নিতে তার কাছেই যাই। সুরসিকা নারীর মতো রসালো ঠোঁটে টেপা হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল শিবানী।

ঘরের মধ্যে মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে রইল কাচ্চি। সেও নিশ্চয় করে ভেবেছিল, আবদুল এক্ষুণি বলবে, মেমসাব সাব বোলাতা। খুব খুশি লাগছিল। কিন্তু এলো কি না মিঃ বোস। শিবানী যাকে বলে তার বস্— সেই বোকা বস্টা। শিবানী হয়তো এক্ষুণি এসে বলবে, ক'দিন ধরে ঘরে বসে বসে পচে গেছিরে কাচ্চি। তুই আমাকে এমন নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিস। যদিও ভদ্রলোকের ঠিকানা পেয়ে গেলাম বলেই যে ভদ্রলোককেও পেয়ে গেছি তা অবশ্য নয়— তবু কিছুটা ভরসা লাগছে। যাই একটু বেড়িয়ে আসি। তুই অরুণবাবুর ঠিকানাটা পারিস তো আজই যোগাড় করে ফেলিস। তারপর শিবানীর এই একটু বেড়াতে বের হওয়াটা হয়তো শেষ হবে রাত বারোটায় রাত্রির সিনেমায় শো'র পর। আর ইন্দ্রনাথ? শিবানীকে বের হয়ে যেতে দেখে কিছু সময় সে খাঁচায় বদ্ধ সিংহর মত পায়চারি করবে বারান্দাময়। তারপর সেও যাবে বেরিয়ে হয়তো রাতে ফিরবে। হয়তো ফিরবে না।

কিন্তু আজ এ রকম ঘটার কথা ছিল না। দিনের আয়োজন ধীরে ধীরে যা হয়ে উঠেছিল তা একটা সুন্দর সম্ভাবনার কথা বলছিল।

কিন্তু হলো না।

ভেঙ্গে দিলো কে?

শিবানী বলে গেল, নিয়তি।

নিয়তি কী ঈশ্বর?

না, নিয়তি তো অন্ধ।

ঈশ্বর তো অন্ধ নয়।

মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে তবে কে?

চক্ষুষ্মান সতদ্রষ্টা, ন্যায়দণ্ডধারী ঈশ্বর?

না অন্ধ নিয়তি?

দু'জনেই?

তাই হবে।

চক্ষুষ্মান আর অন্ধের টানাটানির ভেতর গিয়ে না পড়লে মানুষের এমন দুর্দশা হয়।

শিবানী ড্রয়িংরুমে এক অমল বোসকেই দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু দেখলে ইন্দ্রনাথ বসে আছে। তবে বেশ দূরের একটা কোণের কৌচে, পত্রিকা সামনে মেলে। বেশ বোঝা গেল, ইন্দ্রনাথ ড্রয়িং রুমেই ছিল এবং অমল বোসকে বসতে বলার বাইরে তার সঙ্গে দ্বিতীয় কথা বলেনি। বেচারা অমল বোস এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর বসে বসে ঘামছে।

একটা নিষ্ক্রিয় মন নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল শিবানী। কিন্তু ইন্দ্রনাথকে দেখে মুহূর্তে সে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল। কী করবে ভাবছিল। এখন কত কী করবার আছে। পিঠের উপরকার এলো চুলগুলি হাতে জড়িয়ে খোঁপা বেঁধে ফেলল। তারপর দারুণ অভ্যর্থনা নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, এমন সৌভাগ্য। আপনি?

মিঃ বোস যেন বেঁচে গেল শিবানীকে দেখে। বললে, অসময়ে—

থামিয়ে দিল শিবানী মিঃ বোসকে। অসময়? অসময় কেন হবে, এটাই তো কোথাও গিয়ে আড্ডা জমাবার শ্রেষ্ঠ সময়। মিঃ বোসের বিপরীত কৌচে গিয়ে বসল সে। বললে, দুদিন অফিস যাইনি। তাই বুঝি ছুটে এসেছেন খবর নিতে?

এমন তরল কথা শিবানী কোনদিন বলে না। আজ কি না ইন্দ্রনাথের সামনে তরলতা করছে। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে ইন্দ্রনাথ যেখানে বসেছে সেদিকে বারবার তাকিয়ে শিবানীকে বোঝাতে চাইল মিঃ বোস ইন্দ্রনাথের উপস্থিতি।

কিন্তু শিবানী এত বোকা যে বুঝতেই পারলে না অমল বোসের ইঙ্গিত-ইশারা। বললে, খুব খারাপ লাগছিল?

মিঃ বোস প্রায় ওঠার ভঙ্গিতে গা তুলতে তুলতে বললে, আমি একটা কাজে এসেছি—

যেন ধমক দিল শিবানী— বেশ তো কাজে এসেছেন তাতে হয়েছে কী? কাজে এলে কী বসা যায় না। কফি দিতে বলি। আড্ডা দি। তারপর যে কাজের জন্য এসেছেন করে চলে যাবেন। এই যদি না হবে তবে তো আপনি বেয়ারাকে দিয়েই কাজের কথা লিখে পাঠাতে পারতেন। বসুন। মিঃ বোসকে বসিয়েই জোরে হাঁক ছাড়লে শিবানী, বয়, দো পেয়ালা কফি।

ইন্দ্রনাথের পত্রিকার পাতা বদল হলো।

শিবানী কী পত্রিকার পাতা উল্টানোর খসখস শব্দও শুনছে না? অধীরকণ্ঠে অমল বোস বললে, আমি আপনার বন্ধুর পীড়াপীড়িতে পড়ে এসেছি।

সন্ত্রস্ত হলো শিবানী। কার— নমিতার?

হ্যাঁ।

নমিতা অফিসে আসছে? ওকে না আমি ছুটি নিতে বলে এসেছিলাম।

তা আমি জানিনে। এ দুদিন ধরে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি অফিসে এসেছেন আর ব্যাকুল হয়ে আপনার অপেক্ষা করেছেন। আজও অফিসে এসে আপনার অপেক্ষা করছিলেন। যখন দেখলেন, সময় পার হয়ে গেল তখন আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আপনার বাড়ি চিনি কি না। চিনি বলতে বললেন, বিপদে পড়েই এটা করছি। বলে, এই চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা যদি ওকে একটু আপনি পৌঁছে দেন কিংবা কাউকে দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন তবে আমার যে কী উপকার হয় বলতে পারিনে। শিবানীর হাতে চিঠি দিয়ে মিঃ বোস বলল, খুব জরুরী চিঠি বললেন। হাতেও কাজ ছিল না—তাই নিজেই চলে এলাম।

শিবানী চিঠি মুঠোয় রেখে ত্রাসের সঙ্গে বললে, নমিতা কোথায় এখন? অফিসে? ভয় পেয়ে গেছে সে। চিঠির মানে কী? অফিস থেকে ফোনে কথা বললেই তো হতো। যা-তা কিছু করে বসতে যাচ্ছে না তো। কম্পিতকণ্ঠে বলল, নমিতা বাড়ি চলে গেছে?

মিঃ বোস বললে, তা আমি বলতে পারছি নে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে অফিসে ফোন করলে শিবানী। নমিতাকে চাইল। তাকে পেয়ে যেন সে নমিতার চিঠি লেখার কথা শুনবার পর প্রথম নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, তুই চিঠি দিয়েছিস কেন?

পড়লেই বুঝবি।

আচ্ছা দাঁড়া আমি আসছি। চলে যাসনে।

হাসল নমিতা। বলল, তুই ঘাবড়ে গিয়েছিস। ভেবেছিস তোকে চিঠি লিখে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি— তাই না?

হতেও পারে।

হয়তো হতো। তুই দায় নিয়েছিস আর হবে না। কেন চিঠি দিয়েছি চিঠি পড়লে বুঝবি। পড়ে কাল আসিস। নইলে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব।

ঠিক আছে। কিন্তু তুই ছুটি নিবি। আর অফিসে আসবি নে কথা দে।

ঠিক আছে।

ফোন রেখে এসে শিবানী ফের বসল। কিন্তু আর জমল না, কফি খেয়ে অমল বোস চলে গেল। শিবানী চিঠি নিয়ে এসে তার ঘরে বসল চিঠি পড়তে।

ইন্দ্রনাথও উপরে এসে ঘোরাঘুরি করতে করতে ভাবতে লাগল ব্যাপার কী? কে নমিতা? কার চিঠি পেয়ে শিবানী এমন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলো? কেন উঠেছিল?

॥ ২৬ ॥

শিবানী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কাচ্চি বারান্দার কোণের দিকে ইস্তেরি করবার টেবিলে শাড়ি ইস্তেরি করছিল। শিবানীকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাত থামিয়ে একনজর দেখল তাকে। তারপর হাতের কাজের মাঝে মাঝে চোখ তুলে লক্ষ্য করতে লাগল শিবানী বেরুবার উদ্যোগ করে কি না। তাকে চিঠি নিয়ে ঢিলেবসার ইজিচেয়ারে বসতে দেখে যখন বুঝল সে বেরুচ্ছে না, তখন হঠাৎ খুব খুশী বোধ করল কাচ্চি। উৎফুল্ল কণ্ঠে ডেকে বলল, মা চা খাবে?

এইমাত্র নীচে কফি খেয়ে এসেছি।

তবে একটু বাদে দেব'খন।

চোখ তুলল শিবানী— হঠাৎ এ উচ্ছ্বাসটা কিসের?

কাচ্চি হাসল। বললে, বলত তুমি?

নমিতার চিঠির মুখ ছিঁড়তে ছঁড়তে শিবানী বলল, সাহেবকে বোধহয় আর একবার আমার ঘরের দিকে তাকাতে দেখেছিস।

শিবানীর পরিহাসে এত আমোদ বোধ করল কাচ্চি যে একেবারে হাসতে হাসতে মেঝের উপর বসে পড়ল সে।

ধমক দিল শিবানী। তোকে এ রকম গেঁয়ো ভূতের মতো হাসতে মানা করেছি না। বুদ্ধিশুদ্ধিতে কোথাও পেছনে পড়ে থাকিস নে। চালচলনটায় রয়ে গেছে সেই গেঁয়োমী। পা ছড়িয়ে বসবি। মাথা খুঁটে খুঁটে উকুন বাছবি। মেঝেতে গড়িয়ে হাসবি—

লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল কাচ্চি। ঝুলে পড়া আঁচল কোমরে আঁট করে গুঁজে জোরে জোরে ইস্তেরি চালাতে লাগল শাড়ির উপর। কাজের উদ্যম ওর বেড়ে গেছে। ও মানসচক্ষে দেখছে—জীবমাত্রই যে একটা স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধি আছে সেই বুদ্ধি দিয়েও মানসচক্ষে দেখছে, দিনটা আবার সেজে আসছে। শিবানী ঘরে এসেছে। সাহেবও উপরে উঠে এসেছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে অফিসে যাবার তাঁর আজ মন নেই। আনমনা পায় ঘোরাঘুরি করছেন ঘর-বারান্দা। কাচ্চি নারী। তার নারীমন বুঝে গেছে সাহেব আজ নমনীয়। সাহেব আজ সমর্পিত। নিজেকে সমর্পণ করবার জন্য তিনি সুবিধা খুঁজছেন। দুটো শাড়ি হাতে নিয়ে শিবানীকে দেখাতে দেখাতে সোহাগী গলায় বললে, কি যে হয়েছে আজকাল তোমার। ছেঁড়া আস্ত ভালমন্দ কিছু খেয়াল করো না। যে শাড়ি সামনে পাও পরে বসে থাকো। ছেঁড়া ছেঁড়া— এ শাড়িগুলি আমি ইস্তেরি করব না। এগুলি তুমি আর পরবে না।

তুই পরবি? নমিতার চিঠির ভাঁজ খুলে তাতে দৃষ্টি পাতল শিবানী।

কাচ্চি বলল, কেন আমার কী ভাল শাড়ির অভাব? তোমার বাড়ির বেয়ারা বাবুর্চি বয় মালী—সবাই তাদের বৌর জন্য তোমার পুরোনো শাড়ি চায় আমার কাছে। তাদের দেব।

বেশ দিস। শিবানী চিঠি পড়তে লাগল। নমিতা লিখেছে ঃ

শিবানী, সেদিন বাড়ি এসে মনে হলো তোর কাছে ঘটনাটা (ঘটনা! শব্দটা আশ্চর্য করল শিবানীকে) না বলার কোন অর্থ হয় না। তুই হয় তো কত কী ভাবছিস। ঠিক করলাম তোকে বলব সব কথা। অফিসেও গেলাম কেবল সে জন্যই। কিন্তু তোকে পেলাম না। তুই অফিসে এলি নে। তার পরের দিনও নয়। মিস জেনি বললে, ক'-দিনের নাকি ছুটি নিয়েছিস তুই। বুঝলাম আমার ভাবনা নিয়ে পড়েছিস ভালভাবেই। ইচ্ছে করছিল তোর কাছে চলে আসি। কিন্তু সাহস হলো না। তোর বাড়ির কথা কখনও তুই কিছু বলিস নি। আমি তুললেও কেমন যেন এড়িয়ে যেতিস—তাই আমি তোর বাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানি নে। কে জানে তোর ওখানে তুই হয় তো একা নোস। হয় তো শাশুড়ী আছেন। ননদ আছেন। জা, ননাস—কত থকতে পারে। ভয়ে পিছিয়ে এলাম। আর আমাদের বাড়ি মানে তো একখানা ঘর। সেখানে বসে কথা বলার কোন উপায় নেই। কোন রেস্তোরাঁয়—প্রয়াসের অভাব বোধ করলাম। অগত্যা ঠিক করলাম চিঠি লিখেই জানাব।

আমাদের ঢাকা ছেড়ে আসবার ইতিহাস, দাদার মৃত্যুর ইতিবৃত্ত যেদিন তোকে বলেছিলাম, সেদিনটা অবশ্যই তোর মনে আছে। আমি জানি ঐ দিনটা তুই ভুলতে পারবি নে। দাদার ভয়ঙ্কর মৃত্যুকাহিনী দিয়ে দিনটা তোর বুকে গাঁথা হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার বুকে ঐ দিনটা কী দিয়ে গাঁথা হয়ে গেছে?

সুখ না দুঃখ?

আতঙ্ক না আনন্দ?

আশা না হতাশা?

হাসি না কান্না?

একদিকে তোকে পেলাম সেদিন—
কী আনন্দ!
কী সুখ!

কলকাতা শহর আমাকে তোর মতো সুহৃদ মিলিয়ে দিয়েছে, দাদার কথা বলতে বলতে, কাঁদতে কাঁদতেও সে সুখ অনুক্ষণ অনুভব করেছি।

কিন্তু তারপর?

তারপর সেই কলকাতা আমাকে যে ক্লেদাক্ত ঘটনার ভেতর (ব্যাপারটা কী! কৌতূহলী হয়ে উঠল শিবানী) নিয়ে ফেলল তাকেও এ জীবনে ভুলবার কোন উপায় রইল না।

সে কী আতঙ্ক!
সে কী দুঃখ!
সে কী কান্না!

ঐ দিনটা আমার জীবনেও একদিকে নিবিড় ভালবাসা আর একদিকে অসীম ঘৃণা দিয়ে গাঁথা হয়ে গেল। তোকে নতুন করে আবার ভালবাসলাম। যাকে ঘৃণা করলাম সে কে আমি জানি নে।

শিবানী যেন রহস্য উপন্যাস পড়ছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠির শব্দ-সমুদ্র সাঁতরাতে লাগল শিবানীর চোখ দুটো।

তুই অমল বোসের সঙ্গে বেরিয়ে গেলি। আর আমি ট্রামে উঠতে গিয়ে থমকে গেলাম! ব্রহ্মতালু থেকে একটা হিমস্রোত পায়ের তলা পর্যন্ত নেমে এলো শিরশির করে—ব্যাগে একটা নয়া পয়সাও নেই। বাড়ি থেকেই প্রায় শূন্য ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। মনে মনে হিসাব ছিল, তোর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নেবো এবং সে টাকায় শুধু বাড়ি ফেরাই নয় অনেক দিন আমাদের খাওয়াও চলবে। এমন উদগ্র চাহিদার কথাটা এমন বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম কী করে একথাটা আর যেই জিজ্ঞাসা করুক তুই করবি নে। সেদিন আমরা দুজনে তখন বিশ্বসংসার ভুলে গিয়েছিলাম।

হাঁটতে লাগলাম?
কিন্তু হেঁটে ডালহৌসী থেকে কসবা
পথ কী চিনি?
জিজ্ঞাসা করে করে?
সামনে সন্ধ্যা—
তারপর রাত—

কী ঝড়-বৃষ্টি সে রাতে হয়েছিল নিশ্চয়ই মনে আছে তোর। পড়ে গেলাম আরো বিপদে। বিপাক যেন আমায় পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলতে লাগল। একটা গাছতলায় ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছি। বৃষ্টি ঝরে চলেছে মাথার উপর—এমনি সময় একটা বিরাট গাড়ি এসে আমার সামনে দাঁড়াল। (আচ্ছা শিবানী কণ্টকিত হয়ে উঠল।) ভেতরে দু'জন লোক ছিল। একজন বর্ষাতি জড়িয়ে সেখানে নেমে স্টিয়ারিংয়-এ বসা লোকটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

হঠাৎ কানে গেল, বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার্স শব্দটা। কান খাড়া করলাম আমি— গাড়িটা বালিগঞ্জ যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, তাই যাচ্ছে, তো! ওরা তো তাই বলছে।

শিবানী, জানি না তারপরের মানসিক অবস্থাটা আমার তোকে বোঝাতে পারব কি না।

সামনে সন্ধ্যা...
তারপর রাত—
ব্যাগে একটা পয়সা নেই।

ওরা বলছে শুনতে পাচ্ছি, গাড়িটা বালিগঞ্জ শুধু নয়, যাচ্ছে বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার্স— যেখান থেকে আমার বাসা দু মিনিটের পথ। একটা লিফট্ পাবার লুব্ধতা থেকে কেউ নিজেকে রুখতে পারে শিবানী?

আর বিদেশীদের লিফট প্রথাটার কথা আমার মনের মধ্যে এমনিতেই আনাগোনা করে। ভিতরের পথে দাঁড়িয়ে এক আধজন লোক নিয়ে খালি খালি গাড়িগুলোকে যাতায়াত করতে দেখে সর্বদাই আমি ভাবি, মানুষগুলি কী নিষ্ঠুর। স্টপগুলিতে ঠায় দাঁড়িয়ে লোকগুলো পা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম দেখছে, দেখছে বাদুড়ঝোলা হয়ে মরতে মরতে যেতে— তবু একবার কেউ মুখ বাড়িয়ে বলে না, এই জায়গায় আমি যাচ্ছি, সেখানে কে যাবার আছেন আসুন। লিফট দিচ্ছি।

মনের নিভৃতে কথাটা খুব বড় করে ছিল বলেই বোধহয় গাড়িটার গন্তব্যস্থান শুনে ভেতরটা আমার নির্দ্বিধায় উত্তাল হয়ে উঠল... যদি একটা লিফট পাওয়া যেতো।

কিংবা হয়ত বিদেশীদের ঐ লিফট কথাটা মনের ভেতর থাকার কথাটাও বাজে অজুহাত। ঐ অবস্থায় গাড়িটা বালিগঞ্জে যাচ্ছে শুনে এ ছাড়া আর কী মনে আসতেই বা পারে? আমাদের মা-ঠাকুমার আমলে এরকম অবস্থায় পড়লে তাঁরাও নৌকোকে কি বলতেন না, নৌকাটা কই যাইতেছে? আমারে একটু অমুক ঘাটে পৌঁছাইয়া দিতে পারবা?

আমাকে অধীর দৃষ্টিতে বারবার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছটফট করতে দেখে লোকটা আমার আবেদনটা বুঝতে পারল। কিন্তু একেবারে ভিন্ন অর্থে যে তা বলাই বাহুল্য। আমি দৃঢ়প্রত্যয়ে একচক্ষু হরিণের মতো নিজের অর্থটার দিকেই তাকিয়েছিলাম। অন্যপক্ষ যে আমাকে অন্য কিছু ভেবেও গাড়িতে তুলতে পারে এ সম্ভাবনার কথাটা একবার আমার মনে ছায়াপাতও করলে না। লোকটা যেই আমাকে দরজা খুলে ধরে ডাকলে, আসুন—, একটা সুখের নিঃশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে অমনি বিনা দ্বিধায় গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

শিবানীর ঠোঁটের উপর যেন একটা আরশোলা উড়ে এসে পড়ছে, এমনি ক্ষিপ্রতায় ঝোঁকে উঠল তার ভেতরটা। একটু সময় তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। যেন এগুতে ঘেন্না করছে। মুখের উপরের চুলগুলি ঠেলে দিল পেছনে। তারপর আবার চোখ রাখল চিঠিতে ঃ

এ পর্যন্ত বিশদভাবে লিখছি কারণ আমি যে কী অবস্থায় পড়ে একটা পথের লোকের গাড়িতে উঠেছিলাম সেটা তোকে বোঝাবার জন্যে। অর্থাৎ নিজেকে জাস্টিফাইড করার জন্য। মানুষ ভুল কাজ করে মরতে বসে তবু মরতে মরতেও সে তার ভুলটাকে জাস্টিফাইড করতে থাকে— তাই না শিবানী?

যাক্ আর বিশদ নিষ্প্রয়োজন। তারপরের ঘটনার সংক্ষিপ্তসার এই ঃ

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি কোথা দিয়ে যাচ্ছে না যাচ্ছে আমার বোঝবার কথা নয়, আমি বুঝিও নি। গাড়ি যখন দমদমের এক বাগানবাড়িতে গিয়ে থামল তখন চমকে উঠলাম। কাঁদলাম। হাতে পায়ে ধরলাম। কেন দাঁড়িয়েছিলাম, কেন গাড়িতে উঠেছিলাম বললাম। লোকটা বিশ্বাসও করল আমার কথা। মনে হলো যেন নিজের উপর বিরক্ত বোধ করছে। কিন্তু তখনও লোকটা মদ খাওয়া ছিল না।....কখন কী অবস্থায় বাড়ি ফিরেছিলাম জানি না। সকাল বেলা ব্যাগ খুলে অনেক টাকা পেয়েছিলাম। শিবানী অনেক টাকা। (আচ্ছা!) সে টাকা ফেলে দেই নি। সে টাকায় খেয়েছি চাকরী না পাওয়া পর্যন্ত। মনকেও শান্ত করে ফেলেছিলাম এই বুঝিয়ে যে, এটা একটা পথের দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু বেশী নয়। ট্রামবাসের তলায় পড়ে আমার হাত পা উড়ে যেতে পারত। আমি তারপরও বেঁচে থাকতে পারতাম।

এমন আষাঢ়ে গল্প যদি তোর বিশ্বাস না হতে চায় তাই সেদিন বলি নি। আজও তোকে বিশ্বাস করবার মতো কিছু প্রমাণ বাড়িয়ে ধরবার নেই আমার—(আরে কী পাগল মেয়ে! এমন গল্প যদি বানিয়ে বলতে পারতিস তবে তো লেখক হতিস!)

শিবানী, (কি রে? যেন সস্নেহে সাড়া দিল শিবানী) তোকে এক আমি লোকটার গাড়ির নম্বরটা দিতে পারি।

(গাড়ির নম্বর দিতে পারিস! উত্তেজনায় শিবানীর হাতের চিঠি কাঁপতে লাগল। লালবাজারে ফোন করে এক্ষুণি জানব লোকটার নাম-ঠিকানা।)

আমি জানিও না কখন আমার নজর গিয়ে পড়েছিল গাড়ির নম্বরের ওপর কিন্তু এখন আমি চোখ বুজলেই আমার সেই বোজা চোখের অন্ধকার জগতে স্পষ্ট দেখতে পাই একটা নীল সাটিনে মোড়া বিরাট বপুর গাড়ি আর তার নম্বর থ্রি থ্রি নাইন ওয়ান—

একলহমায় শিবানীর পৃথিবীর সমস্ত শব্দ থেমে গেল। সেই নৈঃশব্দ্যের জগতে মূর্তির মতো বসে রইল সে।

থ্রি থ্রি নাইন ওয়ান—ইন্দ্রনাথের গাড়ি।

ওর কানে কোন শব্দ যাচ্ছে না। মনে কোন কথা উঠছে না। বিশ্ব ওর কাছে থেমে গেছে।

কাচ্চি শিবানীর সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে উচ্ছলিতমুখে কী সংবাদ যেন একটা পরিবেশন করতে যাচ্ছিল, হাতের ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বলল শিবানী।

এমন চৈতন্যবিলোপ মূর্তি শিবানীর কোনদিনও দেখে নি কাচ্চি। ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কী হয়েছে মা? কারু কি—

কাচ্চি—

শিবানীর কঠিন গলার স্বরে স্তব্ধ হয়ে গেল কাচ্চি।

শিবানী বললে, এখন যা।

বিমূঢ়ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কাচ্চি। এমন ঘটনা ওর জীবনে আর ঘটেনি। এই তো বেশ ছিল শিবানী। সাহেবের কথা নিয়ে ওকে ঠাট্টা করলে পর্যন্ত। হঠাৎ কী হল? কার চিঠি? কী সংবাদ আছে চিঠিতে? কাজ করতে করতে ভেবে চলল কাচ্চি।

ইন্দ্রনাথ তার বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে করতে বার কয় পাক খেয়ে গেল শিবানীর পড়বার ঘরের বারান্দা দিয়েও। কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা শিবানী এসব কিছুই টেরই পেল না। ওর চৈতন্য যেন বর্ণনাতীত এক অসাড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বেলা এগারটা গড়িয়ে একটা, একটা গড়িয়ে দুটো বেজে গেলে ভয়ে ভয়ে এসে কাচ্চি ডাকলে, মা।

দৃষ্টিটা ঘরে আনল শিবানী।

কাচ্চি বললে, দুটো বেজে গেছে মা।

শান্ত পায়ে উঠে দাঁড়াল শিবানী। বলল, তোরাও সবাই বসে আছিস!

শিবানীর মুখে দুটো স্বাভাবিক কথা শুনে যেন একটু প্রাণ পেলো কাচ্চি। সাহেবও বসে আছেন মা।

কিছুই যেন বুঝলে না এমনি ভাবলেশহীন চোখে কাচ্চির দিকে একবার তাকাল শিবানী। তারপর স্নান করতে চলে গেল। স্নান করে এসে বসে বলল, দে, খাবার দে।

চুল আঁচড়ালে না?

বড্ড ত্যক্ত করিস তুই। যা খাবার নিয়ে আয়।

ভীত গলায় কাচ্চি বলল, তোমার খাবার নিয়ে সাহেব টেবিলে বসে আছেন।

নিরুত্তরে বসে রইল শিবানী।

নিরুপায় কাচ্চির কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা হলো। খাবার তো সে এখানেই নিয়ে আসে রোজ, আজও তাই নিয়ে আসত। কিন্তু সাহেবকে আজ মেমসাহেবের জন্য অপেক্ষা করতে দেখে বাবুর্চি একসঙ্গে টেবিল সাজিয়েছে। সাহেব সেখানে শিবানীর অপেক্ষায় বসে রয়েছেন, ও কী করে ওখান থেকে শিবানীর খাবার তুলে নিয়ে আসে। তার চাইতে বরং শিবানী বলুক, শরীর ভাল নেই। খাবো না— সেও ভাল। কাতরকণ্ঠে বলল, বাবুর্চি খাবার দিয়ে দিয়েছে। সাহেব বসে আছেন— সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসব প্লেট?

নীরবে উঠে দাঁড়াল শিবানী। ধীরপায় গিয়ে প্রবেশ করল খাবার ঘরে।

ইন্দ্রনাথ টেবিলে বসেছিল। শিবানীকে ঘরে ঢুকতে দেখে অভ্যর্থনা জানাবার ভঙ্গিতে একটু মাথা নোয়াল। হাত দিয়ে বসবার চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। এ সব করে সে যেন নিজেকেও প্রকাশ করতে চাইল শিবানীর কাছে।

শিবানী টেবিলে বসে একটু একটু করে গরম সুপ তুলতে লাগল ঠোঁটে। বোধ হয় সুপটা গলা দিয়ে সহজে নেমে যাবে বলে। নইলে সাধারণত সুপ সে খায় না।

সুপের ভরা চামচ মুখে তুলে অল্প অল্প চুমুক দিতে দিতে ইন্দ্রনাথ শিবানীকে দস্তুরমত নিরীক্ষণ করতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। চুপচাপ সুপ খাওয়া শেষ হল। সুপডিস তুলে নিয়ে বাবুর্চি ফ্রাই-ডিস রেখে গেল। হাতে কাঁটা চামচ তুলে নিতে নিতে ইন্দ্রনাথ শিবানীর বর্ণহীন মুখের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, এনিথিং রং?

শিবানীর মাথার স্তব্ধ জগতে ইন্দ্রনাথের গলার ভরাট আওয়াজটা যেন গিয়ে বাড়ি মারল। মাথার যন্ত্রপাতিগুলি ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করে উঠল শিবানীর। একটা যন্ত্রণার ঢেউ খেলে গেল মুহূর্তের জন্য মাথার ভেতর দিয়ে।

কিছুকাল উত্তরের অপেক্ষায় থেকে আবার জিজ্ঞাসা করল ইন্দ্রনাথ, এনিথিং রং শিবানী?

না। প্রাণপণ চেষ্টায় বিকল যন্ত্রপাতিগুলি থেকে শব্দ সংগ্রহ করে জবাব দিল শিবানী।

না? একটু হাসল ইন্দ্রনাথ। ঠিক আছে। জানি বলবে না। তোমাকে কার চিঠি দিয়ে গেলেন মিঃ বোস সেটা জানতে চাইলে কী অপরাধ নেবে?

আনত মুখে শিবানী কাঁটায় ফুঁড়ে ফুঁড়ে কড়াই শুঁটির দানা একটা একটা করে মুখে তুলতে লাগল শুধু একটা কিছু করার জন্যই।

কার চিঠি তাও বলবে না?

নমিতার।

নমিতা কে?

নমিতা কে—ইন্দ্রনাথের এই প্রশ্নটার প্রতি কী ব্যবহার করবে শিবানী?

নমিতাকে তুমি চেন না। নমিতাও তোমাকে চেনে না। কিন্তু আমি তোমাদের দুজনকেই চিনি—বলে কেটে পড়বে?

উত্তেজনা কই?

সেই রাতে— বলে ক্ষেপে উঠবে?

রাগ কই?

তুমি কী সেই লোকটা, যাকে নমিতা চেনে না কিন্তু ঘৃণা করে— বলে ক্লিন্নতায় ঠোঁট বাঁকাবে?

ঘৃণা কই?

আমি জানি সে লোকটা তুমি—বলে বিতৃষ্ণায় মুখ ফেরাবে?

বিরাগ কই?

বোবা গোঙানোতে কাতরে উঠবে?

যন্ত্রণা কই?

ননিতা কে? বলবে, নমিতা সেই মেয়ে যে মেয়ের কাছে জীবনেও আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না শিবানী?

কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধের সেই উপলব্ধি কই?

কেউ, কেউ নেই।

কোন সংবেগ নেই।

কোন অনুভব নেই।

ও মৃত না জীবিত?

ইন্দ্রনাথ বুঝলে শিবানীর কাছ থেকে কোন প্রত্যুত্তরের সম্ভাবনা নেই। কিছু সময় মাথা নীচু করে সে একমনে খেল— না তা নয়, বরং বলা চলে আবিষ্ট হয়ে সে কিছু ভাবলে। তারপর মুখ তুলে বললে—কার চিঠি, কি সে লিখেছে ও সব কথা জানবার আমার কোন আগ্রহ নেই শিবানী। আমার একমাত্র আগ্রহ তোমার প্রতি। কী কারণে তুমি হঠাৎ এতটা আপসেট হয়ে পড়েছ এটাই আমি জানতে চাচ্ছি। আই ফিল ফর ইউ।

থামল ইন্দ্রনাথ। কিছু সময় শিবানীর দিকে তাকিয়ে রইল আবেগভরে। তারপর হাত বাড়িয়ে বাহু স্পর্শ করল তার।

ইন্দ্রনাথের সেই স্পর্শমাত্র শিবানীর দেহের রক্ত কণিকাগুলি পাগলের মতো যেন ছুটাছুটি শুরু করে দিল আত্মগোপন করবার জন্য। ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ও তার গূঢ় অর্থ শিবানীর ভেতর পালাবার তাড়া আগেই এনে দিয়েছিল, তার স্পর্শ এবার ওকে ত্রাসিত করে ফেলল। তার মনে হলো এত ঘৃণা সে আর কখনো কাউকে করেনি। ইন্দ্রনাথের ছোঁয়া মনে করতে শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে শিবানীর। শীতের ছোটবেলা! বেলা তিনটার রোদেই

আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। একটা ম্লান রোদের উপর জানালার পর্দাগুলি ছায়া ফেলে দুলছে।—এক্ষুনি পালাতে হবে ওকে। নইলে সে দিনের নমিতার মতো আজ ওরও রক্ষা নেই!

হাতের চামচ প্লেটে নামিয়ে তক্ষুনি উঠে পড়ল শিবানী। অস্ফুট স্বরে কী যেন বললেও একটা ওঠবার কারণ দেখিয়ে—কিন্তু কী যে বললে তা শিবানীও জানে না, ইন্দ্রনাথও শুনতে পেল না।

পরাভূত ইন্দ্রনাথ মুহূর্তে সামলে ফেলল নিজেকে। শিবানীর চলে যাওয়ার আকস্মিকতার ধাক্কাটা নিজের অচঞ্চলতার পাল্লায় ধরে রাখল স্থিরভাবে। ফ্রাই ডিস শেষ করল। বাবুর্চি এসে কারি ডিস বাড়িয়ে ধরলে চামচে ভরে তুলে নিল প্লেটে। আপন ধারামতো খাওয়া শেষ করল। ঘরে এসে সিগারেট ধরাল। চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল। না, এটা অফিসের বা বন্ধু-বান্ধবঘটিত কোন ব্যাপার নয়। একটা বড় রকমের গোলমেলে কাণ্ড—কিছু কানে এসেছে শিবানীর এবং তার মধ্যে সেও যে জড়িত আছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ওদের ভেতর কলহ্ অশান্তি নতুন নয়। বরং বলা চলে সেই অবস্থাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিবানীর এমন সাংঘাতিক স্তব্ধ রূপ কোনদিনও সে দেখে নি।

কাশ্মীরী মেয়েটাকে যে সে ফ্ল্যাটে এনে রেখেছিল এ কথাটা কেউ লিখেছে?

কিন্তু সে ঝামেলা তো সে চুকিয়েই ফেলেছে। বিদায় করে দিয়েছে টাকা পয়সা দিয়ে।

তা দিক। কোন মেয়েকে যে সে এভাবে এনে রাখতে পারে— এ সংবাদটাই শিবানীকে বিচলিত করার পক্ষে যথেষ্ট। তারপর হয়তো সে রাখার খবরটা পেয়েছে, বিদায়ের খবরটা জানে না।

একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা ধরাল। তারপর আর একটা। তারপর আর একটা। আর যাই করুক রক্ষিতার মতো কোন মেয়েকে এনে ফ্ল্যাটে তোলা, এটা সে কোনদিনও করেনি। করবার আগে করতে যে পারে এ কথাটাও তার সত্যি জানা ছিল না। মন্দ কাজের এই নিয়ম। টানে টানে কেবল তলিয়ে নিয়ে চলে। বিষম অনুতপ্ত হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, খুব বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। শিবানীর পায় মাথা কুটে সে ক্ষমা-ভিক্ষা করবে। বলবে, দক্ষ ডাক্তারের মতো আমার স্বভাবের বিষাক্ত দিকগুলি তুমি দক্ষ হাতে কেটে ফেল—শিবানী। অন্যায় কাজ করে মনে করো না আমি সুখী হই। যে কাজের জন্য তুমি আমায় ঘৃণা কর, সে কাজের জন্য আমিও আমাকে ঘৃণা করি। আমাকে নিয়ে আমিও আর পারছি নে শিবানী। তুমি আমাকে তুলে নেও। তুমি জান না, আমার যা কিছু কল্পনা যত কিছু আনন্দের ভাবনা সব তোমাকে নিয়ে শিবানী— সব তোমাকে নিয়ে। আমাকে ছাড়া তোমার জগৎ চলবে কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার জগৎ একদম নেমে যাবে—শিবানী। অকস্মাৎ দু চোখ জলে ভরে উঠল ইন্দ্রনাথের। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল সে। শিবানীর কাছে অপরাধ স্বীকার করবার জন্য; তাকে কাছে পাওয়ার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথের। হাতের সিগারেট ছাইদানে গুঁজে উঠে পড়ল শিবানীর কাছে যাবার জন্য। কিন্তু শিবানী তার শোবার ঘরে ছিল না। শূন্য ঘরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল ইন্দ্রনাথ, কী করবে। শিবানীর পড়াশুনা করবার ঘরটা বড্ড বেশী খোলামেলা। ওখানে নিজেকে সমর্পণ করবে কী করে?

ডেকে নিয়ে আসবে?

আসবে না শিবানী।

খোলা বারান্দার উপর দিয়ে তাকে সে তুলে নিয়ে আসতেও পারবে না নিজের ঘরে।

কি করা যায় মাথায় এলো না। বড্ড ক্লান্ত লাগছিল। শিবানীর বিছানায় শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। জানালা দিয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। শীতের ধূমবর্ণ ধোঁয়া চাপা আকাশ। সন্ধ্যাতারাটা অতি অনুজ্জ্বলভাবে জ্বলছে মিটমিট করে। কেমন যেন মৃতভাব বাইরেটা। প্রাণে কোন জোয়ার আনে না। চোখ বন্ধ করল সে। সেই ভাবে পড়ে রইল কিছুকাল, তারপর হঠাৎ উঠে পড়ল — গিয়ে শিবানীর কাছে দাঁড়ান যাক তো।

কিন্তু কোথায় শিবানী?

শিবানী বের হয়ে গেছে।

নির্জনতা—নির্জনতা চায় শিবানী। অন্তত একটু চুপচাপ বসে থাকতে চায় সে। কিন্তু বাড়িতে ইন্দ্রনাথ তো আজ তাকে থাকতে দেবে না, একথা সে জানত। তাই শুধু খাবার ঘর থেকেই নয়, বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে শিবানী।

কিন্তু কোথায় যাবে?

ট্যাক্সিটাকে গঙ্গার ঘাটে যেতে বলবে? বসে থাকবে গিয়ে চুপ করে?

এই শীতের রাতে গঙ্গার ধারে?

হয় না নয়, হয়— কিন্তু উচিত নয়। তবে কোথায় যাবে। কারু বাড়ি গিয়ে নির্জনতা ভিক্ষা করে তাদের সুখী কৌতূহলী করে তুলবে?

জেনি—হঠাৎ জেনির কথা মনে পড়ে গেল শিবানীর। সে আত্মীয় নয়— সেটা তো মস্ত কথা বটেই, তা ছাড়াও সে ওর সমাজের নয়, ধর্মের নয়, এক ভাষার নয়। অথচ বন্ধু, বুদ্ধিমান বন্ধু।

ওকে দেখে খুশির জোয়ার তুলে ছুটে এলো জেনি। আরে, মিসেস সেন, এসো এসো। কিন্তু তোমায় এমন ক্লান্ত বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন? কিছু নয়? ঠিক আছে। আমি বেরুচ্ছি কি না? না, আমার আজ বেরুবার কোন প্রোগ্রাম নেই। থাকলে আমি বিনা দ্বিধায় বেরুতে পারি? তুমি আমার সেই শোবার ঘরে নতুন কেনা রকিং চেয়ারটায় বসবার জন্য আজ এসেছ? হাউ ওয়াণ্ডারফুল! আমার চেয়ারটা প্রথম তোমার মত মাননীয় অতিথি পেল— সৌভাগ্য তার। ঠিক আছে, বেরুবার দরকার হলে নিশ্চয়ই আমি বিনাদ্বিধায় বেরিয়ে যাবো, সেজন্য তুমি কিছু ভেব না। আগে চল তো তোমাকে তোমার চেয়ারটায় বসিয়ে দি। শিবানীকে নিয়ে চঞ্চল পায় শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করল জেনি। এই তোমার চেয়ার। বোস। ঠিক আছে? আচ্ছা। ঘরটা নোংরা নোংরা লাগছে না? তুমি আসবে তো জানতাম না। দাঁড়াও একটু সংস্কার করি। জেনি টেনেটুনে বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় খুলে ফেলল। নতুন ধোয়া চাদর পাতলে বিছানায়। বালিশে পরালে ধোয়া ওয়াড়। বালিশ দুটো হাত দিয়ে থাপড়ে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রাখলে খাটে। মাথার বব্ চুলে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ছুটাছুটি করত লাগল সে। চোখে আলো লাগছে? বেড লাইটটা জ্বেলে দি? বেড লাইটটার মূর্তিটা কী সুন্দর নয়? তোমাদের খাঁটি দেশী জিনিষ। রবীন্দ্রমেলা থেকে কিনেছি। পল দিয়েছে। ফুলগুলি কি সুন্দর নয়? তোমার কাছে রাখলাম। রজনীগন্ধার গন্ধটা এত মিষ্টি। তোমার গাড়ি নেই সঙ্গে? ঠিক আছে। পলের গাড়িতে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব তোমাকে। কফি খাবে? খাবে? ওকে। নৃত্যের ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল জেনি।

কিন্তু কফি নিয়ে এসে জেনি দেখলে শিবানী ঘুমিয়ে পড়েছে। রকিং চেয়ারে নয়। বিছানায় হাত পা গুটিয়ে। বোধ হয় শীত করছে। কফির পেয়ালা নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে, পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে কম্বল টেনে দিল জেনি শিবানীর গায়। তারপর তেমনি পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

॥ ২৭ ॥

শিবানীকে এমন হঠাৎ এসে হাজির হতে দেখে জেনি এতটুকুও আশ্চর্য বোধ করেনি। কার জীবনে এক এক সময় এমন ঘটনা এসে উপস্থিত না হয় যে, রাগে ক্ষেভে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে?

আর ওর কাছে আসাটা?

তার কারণটাও এমন জটিল নয় যে সে জন্য বিস্ময়বোধ করবে সে। বিদেশ আর বিদেশীর কাছে সঙ্কোচ কম—এতো অতি সরল কথা। তাই শিবানীর আকস্মিক আসা এবং ওর কাছে আসা কোনটাই অবাক করেনি ওকে। কেবল প্রথম ঢোকার মুহূর্তে শিবানীর মুখের নির্বাপিত চেহারাটা কিছুটা শঙ্কিত করেছিল জেনিকে। দু'তিন বছর হলো একসঙ্গে এক ঘরে বসে কাজ করছে। মিসেস সেনের মুখে অনেক প্রকার ভাবের ছায়া পড়তে দেখেছে কিন্তু এমন ভাবে শূন্য নিবন্ত চেহারা তার জেনি আর কোনদিনও দেখেনি—শুধু সেই জন্য। কিন্তু এই অসময়ে অপরের ঘরে, অপরের শয্যায় মিসেস সেনের মতো আত্মসচেতন মেয়েকে মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে এবার সাংঘাতিক অবাক বোধ করল জেনি। শীতকালের আকাশের কোন বিকেল নেই। সূর্যটি ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বিকেল সায়াহ্ন সন্ধ্যা এই তিনকে অন্ধকার করে কালো বাসর একটানে লেপে মুছে এক করে ফেলে। আর তাই না এখনও মাটির রং কালো; ওর ঘরে নিশীথ। নইলে গরম কাল হলে যে ওর এই পশ্চিমমুখী ঘরের দেয়ালে আয়নায় বিছানায় এ সময় পড়ন্ত বেলার রোদ ঝিকমিক করত।

কিন্তু 'প্রতিবেশীর কুশল জেনো— কিন্তু তার ঘরের বেড়া ডিঙ্গিও— না' এ প্রবাদ জেনি কেবল জানে নয় পালনও করে থাকে। মিসেস সেন ওর নূতন কেনা রকিং চেয়ারটায় বসতে এসেছে? (যার বাড়িতে এমন গোটা কয়েক রকিং চেয়ার হয়ত আছে। আর না থাকলে এ জাতীয় চেয়ারের সখ শিবানীর নেই বলেই নেই। তা হোক—) হাউ ওয়াণ্ডারফুল! আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখে নাচতে নাচতে শিবানীকে শোবার ঘরে নিয়ে এসেছে। কফি খাবে? খাবে। ও-কে বলে শিস্ তুলতে তুলতে বেরিয়ে গেছে। এখনো শিবানীকে শ্রান্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে

পড়তে দেখার বিস্ময়টা মনের বাইরে বার করে দিয়ে শিবানীর জন্য তৈরী কফির পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। হ্যালো...রিক্সায় যেতে যেতে পামেলা পিটার আর তার বয় ফ্রেণ্ড ব্রায়ন হোয়াইট জেনিকে হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। জেনিও হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিল। ইলিয়ট রোডের গলি। রিক্সায় বসা পামেলার হাত বারান্দায় দাঁড়ানো জেনির হাতটা প্রায় স্পর্শ করে গেল। হেসে উঠল দুজনে। গলির উল্টো বাড়ির বাসিন্দা বৃদ্ধা মিসেস বেসনার্ড তার মোটা দু-মণি থলথলে দেহটা নিয়ে কোনমতে ট্যাক্সি থেকে বের হয়ে এলো। লিকলিকে শরীরের দুটো নাত্নী ছুটে এসে দুহাত ধরে গ্রেনীকে সিঁড়ি ভাঙ্গায় সাহায্য করতে লাগল। বৃদ্ধা কাঁপা-কাঁপা গলায় জেনিকে কী যেন বলল। জেনি বুঝতে পারলে না। কিন্তু তবু খুব যেন বুঝেছে এমনি মুখে হাসল। পাড়াটা বড্ড ঘিঞ্জি। পনেরো হাত গলির দু দিকে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ির সারি। তার ভেতর কফিখানা আছে। মুদি দোকান আছে। গলির মোড়ের মাথায় 'বার' আছে। সিনেমার গানে কাবারের মাংস সেঁকা গন্ধে, পরোটা ভাজার চর্বিমাখা ধোঁয়ায় কানে-নাকে জ্বালা ধরে যায়। বিয়ের পর পলকে বলবে এ বাড়ি ছেড়ে দিতে। মিসেস সেনদের জায়গাটা কী সুন্দর। নিজে নিজেই চোখ ঘোরাল জেনি— ও বাবা। সে হলো ধনীদের জায়গা। কফি খাওয়া হয়ে গেল। পেয়ালার তলার কফিটা রাস্তায় ছুঁড়ে দিল জেনি।....পলকে একটা ফোন করলে হতো। যদিও পল এক্ষুণি আসবে—কিন্তু আজ যে ছবি দেখতে যাওয়া যাবে না সেটা বলে, সিনেমার টিকিটটা একেবারে বিক্রি করে দিয়ে তারপর যেন পল আসে, এটা বলে দিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু ফোন করতে হলে আবার তাকে কোন দোকানে যেতে হয়। তা না হয় গেল। কিন্তু পল যদি ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়ে থাকে তবে অযথা কষ্ট করা হবে। ঘরে এসে ম্যাগাজিন খুলে বসল জেনি। কিছুক্ষণ ম্যাগাজিন দেখল। তারপর উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে শিবানীকে দেখল। শিবানী ঠিক তেমনি ঘুমোচ্ছে। ফের এসে বসে আর একটা নতুন ম্যাগাজিন টেনে নিল। পল দেরী করছে। এ ম্যাগাজিনটাও দেখা হয়ে গেল। বড্ড দেরী করছে পল।

জেনি কুঞ্চিত ভ্রূতে হাতের ম্যাগাজিনও বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। পলের গাড়িও এসে দরজায় থামল। ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে জুতো মসমসিয়ে পল এসে ঘরে ঢুকল। খুবই দুঃখিত সে দেরী করে ফেলেছে বলে—

খুব কিছু জোর গলায় কথাগুলি পল বলেনি, তবু হাত-চোখের ইসারায় তাকে থামিয়ে দিল জেনি।

পল তক্ষুণি থেমে গেল। ভীত চোখ-মুখ গলা নিচু করে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার?

পলের কাছে এসে ফিসফিসে কণ্ঠে জেনি বলল আমার বন্ধু মিসেস সেন— বলে থেমে পলের দিকে দৃষ্টি ফেলল সে। যেন জিজ্ঞাসা করল চিনতে পারছ তো? বোঝা গেল শিবানীর গল্প সে পলের কাছে খুব করে থাকে। পলের তাকে চেনা উচিত।

পল মুখে কিছু বলল না। চোখের ভঙ্গিতে সমর্থন জানাল, সে বুঝতে পারছে।

জেনি বলল, সেই মিসেস সেন হঠাৎ এসে পড়েছেন। বোধহয় কিছু অশান্তিকর ব্যাপার ঘটেছে বাড়িতে— হয়তো তার চাইতে বেশীও হতে পারে।

কোথায় তিনি? তোমার ঘরে?

হ্যাঁ।

ওখানে তাঁকে একা রেখে তুমি এখানে বসে ম্যাগাজিন দেখছিলে? পলের চোখে বিস্ময় ফুটল।

জেনি বলল, তিনি ঘুমিয়ে।

ঘুমিয়ে! হাউ স্ট্রেঞ্জ! পল গিয়ে সোফায় বসল। জেনিও গিয়ে বসল তার পাশে। পল বলল, এই বললে তুমি যে, তোমার মনে হচ্ছে অশান্তি ঘটেছে বাড়িতে। তা অশান্তির মনে কী ঘুম আসে? আর এই অসময়ে?

তাই তো বলছি পল, হয়তো ঝগড়া টগরার চাইতে সিরিয়াস কিছু হতে পারে।

অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল পল। বলল, যত বেশী সিরিয়াস ব্যাপার হবে তত ঘুম পালাবে। মাথা শান্ত না থাকলে ঘুম কখনই আসতে পারে না। অসম্ভব তা।

অতি শ্রান্তিতেও ঘুমিয়ে থাকে মানুষ। সৈনিক বন্দুক কাঁধে নিয়ে ট্রেঞ্চের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরিহাস করল পল, তোমার বন্ধু কী স্বামীর সঙ্গে বন্দুক ছোড়াছুড়ি করে এসেছেন নাকি?

হাসল জেনি। বলল, হতে পারে। নাও হতে পারে। জানিনে। কৌতুক কুপিয়ে তুলল চোখে জেনি—লুক হিয়ার পল, শারীরিক শ্রান্তির চাইতেও মনের শ্রান্তি যে অনেক বেশী পরাভূত করে মানুষকে, এটা তুমি জান

বলে আমি ভাবতে চাই। কিন্তু এ সব কথা যাকগে—হাত ঝাড়া দিয়ে অবান্তর কথাগুলিকে যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জেনি বলল, বুঝতে পারছ আজ ছবি দেখতে যাওয়াটা আমাদের বন্ধ করতেই হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম ফোন করে তোমাকে বলে দেব আসবার আগে একেবারে টিকিটটা বিক্রি করে আসতে। সেটা করতে পারলে খুব ভাল হত। কিন্তু তুমি যদি বেরিয়ে পড়ে থাকো—এই ভেবে আর করলাম না। তোমাকে এক্ষুণি আবার টিকিট ঘরে ছুটতে হচ্ছে বলে সত্যি আমি খুবই দুঃখিত পল।

তুমি টিকিট বিক্রির কথা ভাবছ কেন আমি বুঝতে পারছিনে?

বা, টিকিট বিক্রি না করলে পয়সাগুলো অযথা নষ্ট হবে না?

আমরা কী টিকিট বিক্রি করবার জন্য কিনেছিলাম যে, বিক্রি না করলে পয়সা লোকসান হবে?

মাথা ঝাঁকাল জেনি। তা কেন কিনব। আমরা ছবি দেখবার জন্য কিনেছিলাম কিন্তু-—

জেনিকে থামিয়ে দিয়ে পল বলল, দেখব ছবি।

এতক্ষণ পলের বক্তব্যটা যে কী জেনি ধরে উঠতে পারছিল না। এবার বুঝতে পেরে আহত বোধ করল। চুপ করে গেল জেনি।

পল বলল, কী চুপ যে?

তবু মৌন রইল জেনি।

কী আমরা যাচ্ছি তো ছবি দেখতে? মুখটা জেনির একেবারে মুখে লাগিয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করল পল।

মুখ নিচু করে বসে তার শ্যাম্পু করা সোনালী চুলের গুচ্ছকে মুঠো করে ধরতে আর ছাড়তে লাগল জেনি। কোন জবাব করল না।

মৌন থাকাটাকে মানুষ সম্মতির লক্ষণ ভাবে।

মৌনং সম্মতিলক্ষণম্—আমাদের শাস্ত্রেও একথাই বলে। অথচ নীরবতাটা কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই—এক প্রেমের ব্যাপার ছাড়া—অসম্মতিই প্রকাশ করে থাকে। তবু মানুষ ভুল করে। পলও করল। জেনির নীরবতাকে সম্মতি দেওয়া বলে ভেবে নিল। ওঃ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। সন্ধ্যাটাকে একেবারে হত্যা করবার যোগাড় করেছিল জেনি। এই ঘরের মধ্যে কে মিসেস সেন তার জন্য গালে হাত দিয়ে গম্ভীর মুখ করে বসে থাকো। খুশীর চোটে জেনিকে জড়িয়ে ধরে গোটা কয় চুমুই খেয়ে ফেলল পল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে পায়ের উপর পা তুলে খুব আরাম করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, ডার্লিং তুমি সব ব্যাপারকেই বড্ড বেশী বড় করে দেখ। তুমি আমি ঝগড়া করিনি যে কাটা টিকিট বিক্রি করে ফেলব। অত্যন্ত ছেলেমানুষী এগুলি। তোমার মিসেস সেন আর কত ঘুমোবেন? এখন তো সবে—বলে কোটের হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, সাড়ে সাতটাও নয়। আমাদের ছবি ন'টায়। তারপরও আমরা আরো পরে যেতে পারি। নিউজ রিলের সময়টা আমাদের হাতে আছে।

উত্তর দিকের কোন জানালা বোধহয় খোলা। হু হু করে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। জেনি ওর জাম্পারের বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল, তা হয় না—প্লিজ! তুমি আমায় এ নিয়ে আর অনুরোধ করো না পল। আমার খুব খারাপ লাগছে সামান্য একটা ছবি দেখার ব্যাপার নিয়ে তুমি এ রকম করছ বলে। কথাগুলির ভেতর যে নীরসতা ছিল তাকে সরস করবার জন্য কথাগুলি বলেই চোখেমুখে রহস্য ফুটিয়ে তুলল জেনি। বলল, আমার উপর ছেড়ে দাও। দেখো, তোমার সন্ধ্যা আমি নষ্ট হতে দেব না।

কিন্তু পলের মুখ যেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছিল তেমনি রইল।

যদিও মনে মনে বিরক্তি বোধ করছিল তবু খুশি করতেই চেষ্টা করল জেনি পলকে। খুব নরম গলায় বলল, তুমি অবুঝ হচ্ছ পল। মিসেস সেনের ঘুম তো তোমার হিসেব মতো সময়ে নাও ভাঙ্গতে পারে? তখন কী করবো? তা ছাড়া ছবিতে যেতে হলে আমাকে তৈরী হতে যেতে হবে এখনই। এটা কী শোভন হবে—তুমিই বল?

কিন্তু পল আর মুখ খুলল না। গুম হয়ে একটু সময় বসে রইল। তারপর উঠে কোন কথা না বলে গটগট করে হাঁটা দিল। দরজার কাছে গিয়ে মুখও ফেরাল না, সামনা থেকে কথাগুলি যেন পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে গেল। কখন কি হবে তার যখন নিশ্চয়তা নেই-- গুড্ নাইট।

পল বেরিয়ে গেল। তার যে আজ এ বাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল সেটা পর্যন্ত সে অস্বীকার করে গেল। গাড়ি চলে গেল পলের।

জেনি বসে রইল তেমনি ভাবে।

পলকে যে তার প্রয়োজন আছে, শিবানীকে যে সে বলেছে পলের গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবার কথা, পলকে সে কথা বলতে পারলো না জেনি।

ইচ্ছে করল না বলতে। গালে হাত রেখে চুপচাপ বসে রইল সে। ভাবতে লাগল; কত বিভিন্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে দেখলে তবে একটা লোককে চেনা যায়। পলের এ রূপ তার দেখা ছিল না। পলকে তার খুব খারাপ লাগতে লাগল।

এ যে নিছক অশিষ্টতা।

এ যে নিছক দুর্ব্যবহার।

ব্যবহার যে জানে না, সে জানে কী?

যার ভেতর অপরের মনোভাবের প্রতি সম্মান দেওয়া নেই তার ভেতর আছে কী?

যার অপরের দুর্যোগের প্রতি অনুভব নেই তার কিচ্ছু নেই— কিচ্ছু নেই।

কণ্ঠনালী থেকে একটা কান্নার দলা যেন উঠে আসতে চাচ্ছিল জেনির। ও যে পলের সঙ্গে এনগেজড! এজন্য এনগেজমেন্ট ভেঙ্গে দেবার কথা শুনলে লোকে হাসবে। সেও সে কথা কল্পনাও করছে না। কিন্তু ব্যাপারটা কী সত্যি তুচ্ছ? ছোট্ট দূরবীণ দিয়ে যেমন দূরের জিনিষ বড় করে দেখা যায়, তেমনি ছোট্ট ঘটনার ভেতর দিয়েই মানুষকেও বেশী করে চেনা যায় যে। এই যে ছোট্ট ঘটনাটা আজ ঘটে গেল, তা ছোট হতে পারে; কিন্তু তুচ্ছ বলে ঠেলে ফেলে দেবে সে কী করে? মতে না মিললে জীবন চলতে পারে, কিন্তু মনে না মিলিলে মিলিত জীবন চলে কী করে? মন যদি বিপরীত ঘরের বাসিন্দা হয় তবে মিলন ঘটবে কোন ঘরে?

মনটা খুব দমিত হয়ে গেল জেনির। কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ মা'কে ঢুকতে দেখে উঠে পড়ল। মা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। মিসেস স্মিথ জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যালো জেনি, তুমি এমন চুপচাপ একা বসে? পল আসেনি?

পলকে যে ভাবে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়েছিল জেনি, ঠিক সে ভাবে মাকেও থামিয়ে দিল। পলেরই মতো মিসেস স্মিথের চোখেও ভীতি ফুটে উঠল। গলা খাদে নামিয়ে মেয়ের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?

জেনি বলল মাকে শিবানীর কথা।

শুনে মিসেস স্মিথ বললেন, তবে তো তোমাদের ছবিতে যাওয়া হচ্ছে না?

না।

পল এসেছিল? টিকিট বিক্রি করতে চলে গেছে? এটাই ভাল হয়েছে। তা পলের ডিনারের ব্যবস্থা তো সবই তৈরী আছে। বাকীটা আমি দেখছি। তোমাকে আসতে হবে না। আরো কাছে এসে আরো ফিসফিস করে বললেন, তোমার বন্ধুকেও খাইয়ে দিও। নিশ্চয়ই তার খাওয়া হয় নি আজ। মিসেস স্মিথ চলে গেলেন।

জেনি ঊর্ধ্বনেত্রে মাতা মেরীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল, পল এ ব্যবহারটা তুমি করতে পারলে না কেন?

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ শিবানীর খুব কষ্ট হতে লাগল। ওর পিঠের তলায় অসংখ্য কাচের চুড়ি...ও এপাশ ওপাশ করছে আর টুং টাং করে চুড়ি ভাঙ্গছে...ওর পিঠে বিঁধছে বুকে বিঁধছে, গলায় হাতে কোথাও বাদ থাকছে না। রক্তে বিছানার চাদর ভিজে উঠেছে।...না বিছানায় ছড়ান তো নয় চুড়িগুলি। ওর পিঠের তলায় একটা ফর্সা নিটোল হাত পড়ে আছে। সে হাতে কালো জ্বলজ্বলে কাচের চুড়ি। ও হাতটাকে পিঠের তলা থেকে কিছুতেই সরাতে পারছে না। ওর পিঠের চাপে চুড়ি টুং-টাং করে ভাঙ্গছে। হাতটাও রক্তে ভেসে যাচ্ছে...ওর শরীরও রক্তে ভেসে যাচ্ছে...যন্ত্রণায় জেগে বিছানার উপর উঠে বসলো শিবানী... জেগেই পিঠে হাত দিয়ে দেখতে লাগল রক্ত আছে কি না। ব্যথা যেন তখনও আছে।

মিসেস সেন, তোমার কফি। জেনি শিবানীর দিকে তার হাতের পেয়ালা বাড়িয়ে ধরল।

এবার সত্যি জাগল শিবানী। মনে পড়ল কোথায় সে। বুঝল সে স্বপ্ন দেখছিল। হাতটা নমিতার। নমিতার হাতে ঐ রকম কালো চুড়ি কোন সময় সে দেখেছিল। ও ভুলে গিয়েছিল কিন্তু ওর অচেতন মন ভোলেনি।

শিবানী গায়ের কম্বল সরিয়ে গুছিয়ে বসে হাত বাড়িয়ে জেনির হাত থেকে পেয়ালা নিল।

জেনি বলল, মিসেস সেন, তুমি খুব ঘুমিয়েছো। তোমাকে জাগাবার জন্য আমি কফির পেয়ালা চামচ দিয়ে টুং টাং শব্দ করছিলাম। আরো দুবার করে গেছি তুমি জাগ নি।

আচ্ছা! এই টুং টাং চামচনাড়ার শব্দটাই চুড়ি ভাঙ্গার শব্দ হয়ে তাকে ঐ স্বপ্ন দেখিয়ে গেল। কিন্তু সত্যি তার আগে সে খুব ঘুমিয়েছে। দুদিন ধরে অনবরত নমিতার চিন্তায় তার মাথা ক্লান্ত হয়েই ছিল। মাথার সেই ক্লান্ত যন্ত্রগুলি নমিতার চিঠির এক আঘাতে বিকল হয়ে গেল। বাস্ আর কী? কল থেমে গেল। জ্বালা রইল না। শব্দ রইল না। কম্পন রইল না। নিথর নিশ্চুপ মাথা। ঘুমোবে না কেন। ডেকে সাড়া পাওয়া গেল বলেই তো এটাকে ঘুম বলা যাচ্ছে। ডেকে সাড়া না পাওয়া গেলে মাথার ঐ অবস্থাকেই অজ্ঞান বলে।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল শিবানী। বলল, তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম জেনি।

প্লিজ ভদ্রতা করো না মিসেস সেন।

না করব না। কিন্তু তোমার এই আন্তরিকতা আমার খুব মনে পড়বে। ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে চুলটা একটু ঠিক করল শিবানী। শাড়ীটি গুছিয়ে পরল।

জেনি বললে, মিসেস সেন, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে আজ ডিনার করো তবে আমাদের খুশীর অন্ত থাকবে না। চলো।

ডিনারের সময় হয়ে গেছে? বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে উঠল শিবানীর।

দশটা বেজে গেছে বলেই তো তোমাকে তুললাম।

আমার জন্য দশটা পর্যন্ত ডিনার নিয়ে বসে আছ! এত লজ্জিত হয়ে পড়লো শিবানী, যে আর দ্বিরুক্তি করলো না সে। বলল, চলো।

জেনি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলো শিবানীকে। গাড়িতে শিবানী বলল, আমাকে হয়তো কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে হবে, থাকতে হবে। এর ভেতর বিয়ে করে বোস না না জানিয়ে। বিয়ে তো তোমার ঠিক?

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল জেনি। পল আজ আসে নি। তার ডিনার সে নষ্ট করেছে। জেনির খাওয়া নষ্ট করেছে, কিন্তু কিসের জন্য? বলল, বিয়ে আমার ঠিক, বিয়েও আমি করব তাও ঠিক কিন্তু আমার মনে হয় মিসেস সেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা আমাদের আরো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তোমার মুখে শুনেছি গান—

যুগ যুগ হিয়ায় হিয়া রাখলাম
তবু হিয়া জুড়ান গেল না।

ঐ কাব্যের জীবন মানুষও আশা করে বসে থাকে আর মার খায়। কিন্তু এ সম্পর্কটাকে হিয়ার সম্পর্ক করে না রেখে যদি যুক্তির সম্পর্কে নিয়ে আসা যেতো তবে অন্তত আরো কিছু বেশী সুখ আশা করা যেত। আমাদের অন্য সম্পর্কগুলি কিন্তু মিসেস সেন, অনেক বেশী যুক্তিনিষ্ঠ। যার যা করণীয় করার পর সম্পর্কগুলি মুক্ত। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ভেতর কোথাও কোন মুক্তি নেই। আমার তো বিয়ের আগেই দম বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছে। বলেই অপ্রতিভভাবে শিবানীর হাত জড়িয়ে ধরল জেনি। বলল, যে কোন কারণেই হোক তুমি আজ যে খুব বিভ্রান্ত রয়েছ তা আমি বুঝতে পারছি। তবু যে কথা গুলি বললাম— থেমে গেল জেনি। তার চোখে জল এসে গেল।

শিবানী একটু বিমর্ষ হাসল।

জেনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, হৃদয় জিনিষটা বড্ড শক্ত বুঝে উঠা, কিন্তু অঙ্ক বোঝা শক্ত নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা অঙ্কে নিয়ে ফেলতে হবে।

অঙ্ক কী সবাই জানে?

জোর দিয়ে বলে উঠল জেনি, বেশীর ভাগ মানুষ জানে। পাওনা-গণ্ডার হিসাবে ভুল হয় কম মানুষের।

কিন্তু আমি তো অঙ্ক জানিনে।

হয়তো তোমার মতো আরো কিছু পাওয়া যাবে যারা অঙ্ক জানে না। কিন্তু দু একজনের জন্য আমরা বেশীরা বিসর্জন হবো কেন। আমি খুব ভাল অঙ্ক জানি।

আমি তোমার কাছে শিখে নেবো।

ঠিক আছে। বাকি পথ আর কথা হলো না কোন। জেনি শিবানীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাত প্রায় এগারোটা বাজে। কিন্তু বাড়ির সর্বত্র বাতি জ্বলছে।

কাচ্চি গেটে দাঁড়িয়ে। শিবানী বলল, তুই এখানে এই রাতে?

চলে যাচ্ছিলাম।

আচ্ছা! চলতে চলতে বলল— শিবানী, কই আবার পেছন পেছন আসছিস কেন? চলে গেলিনে?

যাবো কালকে — ঠিক চলে যাবো। কর্তা থাকবে না গিন্নী থাকবে না এমন বাড়িতে আর নয়।

যাক্ ইন্দ্রনাথ বাড়ি নেই। নিশ্চিন্তে উপরে উঠে গেল শিবানী। ইন্দ্রনাথ আর ওর ঘরের মধ্যের দরজাটা বন্ধ করে দিল। কাচ্চিকে খেয়ে এসেছে জানিয়ে শুয়ে পড়ল। এবার তার মাথা অনেক শান্ত লাগছে। ঘুমিয়ে মাথাটা সত্যি খুব বিশ্রাম পেয়েছে। ঘুম আর আসবে না। এখন তাকে অনেক ভাবতে হবে।

॥ ২৮ ॥

মাথাটা সত্যি কিছু ঠাণ্ডা লাগছিল শিবানীর। জেনির বাড়িতে যেভাবে ও ঘুমিয়েছে তাকে ঘুম বলে না। যেন কিছুক্ষণ মরে ছিল ও। মৃত্যুর মতো এই ঘুমটা খানিকটা আরোগ্য করে দিয়ে গেছে ওকে। ওর বিশৃঙ্খল মাথাটা একটু হালকা, একটু শৃঙ্খলিত লাগছে।

কিন্তু তবু শিবানী কিছু ভেবে উঠতে পারছিল না। মনের মধ্যে যে ওর কী চলছে তাও ধরে উঠতে পারছিল না।

পাশ-বালিশের ওপর পা রেখে, সাটিনের লেপ গলা পর্যন্ত টেনে খোলা জানালা বরাবর চোখ মেলে শুয়ে রইল শিবানী।

যদিও ইন্দ্রনাথের জন্য এখনও কিছু কিছু বাতি জ্বলছে, তবু সমস্ত আলো জ্বালিয়ে বাড়িটা যেভাবে বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসেছিল ওদের জন্য, এখন আর তা নেই। ও ফেরার পর অনেক বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সুস্থ লাগছে বাড়িটাকে।.... শূন্য বাড়ি যদি সব আলো জ্বেলে কটকটে চোখে তাকিয়ে থাকে... তবে যে এমন বিকারগ্রস্ত দেখায় শিবানীর ধারণা ছিল না।

কিংবা সমস্তই মনের ওপর নির্ভর করে। মন যেমন থাকে তেমন দেখে। রূপে থাকলে অপরূপ দেখে। বিরূপ থাকলে কুরূপ দেখে।

জেনি কফির পেয়ালা চামচে তখন যে টুং-টাং শব্দটা তুলেছিল ওকে জাগাবার জন্য, অন্তর সুরেলা থাকলে আওয়াজটাকে সেতারে মল্লার রাগিণী বাজছে অথবা পিয়ানোয় 'সোনাটা' বাজছে স্বপ্ন দেখত শিবানী, কিন্তু ওর ক্লিষ্ট মন স্বপ্ন দেখলো, কাচের চুড়ির উপর গড়াচ্ছে ও। কটমট কচ্‌কচ্ শব্দে কাচ গুঁড়োচ্ছে; ওর পিঠ বুক কেটে ছিঁড়ে রক্তে রক্তারক্তি হচ্ছে!

স্বপ্নটার তাৎপর্য এতোই প্রাঞ্জল যে, নিজের প্রতি আফসোস ছুঁড়ে মারলো শিবানী, বাঁশরি সরকারের মতো শান দেওয়া ইস্পাতের ধার ও বুদ্ধি থেকে বিদায় নিয়েছে তোমার। স্বপ্ন দস্তুরমতো ভাবাবে। তোমার কোন্ চিন্তা, কোন্ ইচ্ছা, কোন্ কামনা স্বপ্ন হয়ে তৃপ্ত করে বা ক্লেশ দিয়ে গেল তোমাকে। এ তো একেবারে কাঁচা রূপক! বাস্তবের জলছবি।...

কিন্তু না, এভাবে গাছে গাছে, ডালে ডালে ভাবনা নিয়ে উড়লে চলবে না। ...অবশ্যি ভাবনার শেষ কথাটা ওর স্থির হয়ে গেছে যে মুহূর্তে নমিতার চিঠি পড়ে শেষ করেছে সেই মুহূর্তে। ইন্দ্রনাথের যখন সন্তান তখন তাকে ইন্দ্রনাথের ঘর পেতে দিতে হবে।

কিন্তু সে তো শেষ কথা।

তার আগে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে শিবানী করে কী?

ওর মনে হতে লাগল, সমুদ্রের একটা প্রচণ্ডতম ঢেউয়ে যেন ছিটকে এসে পড়েছে শূন্য বালুর চড়ায়। যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও কিছু নেই। যে ঢেউটা ওকে এনে এমন জায়গায় ফেলেছে তার বিপরীত একটা ঢেউ এসে নিশ্চয়ই আবার ওকে টেনে নিয়ে যাবে জীবন-স্রোতে — এ ঠিক, কিন্তু জীবনের সুখ ওর চূর্ণ হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ভেতরে ভেতরে ক্রমেই তো পচে উঠেছিল, এবার তা ঘৃণার বাষ্পে জ্বলে উঠেছে। এ আগুন

সব গ্রাস করে ফেলবে—প্রেম ভালোবাসা মাধুর্য; সহৃদয়তা—এক কথায় দাম্পত্য জীবনের যা কিছু নির্ভর সব। যেগুলোর দিকে তাকিয়ে ও বসেছিল; যেগুলো ওদের সম্পর্কটাকে রক্ষা করছিল; যেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রেখে বহু-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথকে ও ভালো বাসছিল—সব চাইতে বড় কথা যেগুলোর দিকে তাকিয়ে ও ইন্দ্রনাথের পরিবর্তনের আশায় বসে থাকতে পারছিল—এ সবই যদি নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল তবে আর কিসের প্রতীক্ষা? এবার ওর চলে যাবার সময় হয়েছে। এবার নমিতার চিঠিটা ইন্দ্রনাথের সুমুখে ফেলে দিয়ে বলবে ও, চললাম আমি। এমন কদর্য নোংরামির মধ্যে বাস করতে নিঃশ্বাস আমার বন্ধ হয়ে আসছে। আমি আর পারছি নে।

ইস্পাতেও যেমন কখনো কখনো জং ধরে, ইস্পাত চরিত্রও তেমনি কখনো কখনো ক্রন্দন করে থাকে। বালিশে মুখ চেপে এবার কেঁদে ফেলল শিবানী। বলতে লাগল, তোমার চরিত্রের পতনগুলি থেকে তোমাকে উদ্ধার করে এনে তোমার চরিত্রের সুন্দর দিকগুলি নিয়ে সংসার সাজাব বলে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম, পারলাম না। হেরে গেলাম আমি... হেরে গেলাম।

কান্নার আওয়াজটাকে বালিশে চেপে আকুলভাবে ফুলে ফুলে কাঁদলো শিবানী অনেকক্ষণ। তারপর একসময় কান্নার বেগটা আপনা থেকেই কমে এলো। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে চোখ মুখ মুছে একটা বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বুক থেকে বের করে দিলো।

কিন্তু ও যদি চলে যায় তবে নমিতার কী হবে? নমিতা ওর কাছে এসেছিল আর ও তাকে ইন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়ে পালাবে? এ চিঠি ইন্দ্রনাথের হাতে দেওয়া মানেই তো নমিতাকে তার হাতে তুলে দেওয়া। নমিতা যদি জানতে পারে সমগ্র ঘটনার নায়ক শিবানীরই স্বামী এবং ওর পত্রই এ সত্য শিবানীর নিকট উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে - শিবানী ঘৃণায় লজ্জায় ঘর ছেড়ে চলে গেছে, তবে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে আর একলহমা দেরি করবে কী নমিতা?

আর যদি এসব বৃত্তান্ত নাও জানতে পায় (অবশ্যি জানবে না, এ নিশ্চয়। কারণ ইন্দ্রনাথ নির্বোধ নয়।) তবু শিবানী চলে গেলে ওকে মরতেই হবে। মরবেও। আর মরবার সময় ভাববে, শিবানী ওকে অনেক ভরসার কথা বলে তারপর সরে পড়েছে। এতো ভরসা না দিলেও পারত।

আর ইন্দ্রনাথ কী করবে চিঠি পড়ে? সে উঠেপড়ে লেগে যাবে সব চিহ্ন মুছে ফেলতে। নমিতার চিঠি পুড়ে ছাই করে ফেলবে। তার গাড়ির নম্বর পালটাবে নয় তো এ গাড়িটাকে জলে ফেলে দিয়ে নতুন গাড়ি কিনবে। তারপর পৃথিবী অন্বেষণ করে হলেও ওকে খুঁজে বের করবে। পা'য়ে ধরবে। পা'য়ে মাথা কুটবে। পা আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকবে। দুদিন আগে হোক, দুদিন পরে হোক আনবেই সে ওকে ফিরিয়ে। নিজের রোখে অদ্ভুতভাবে লেগে থাকতে পারে ইন্দ্রনাথ এমনিতেই আর এ তো ঘরের বৌ। তার কাছে আবার মান কী? সম্মান কী? এত বড় অপরাধ যখন করেছে, শেষ মূল্য পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকবে ইন্দ্রনাথ।

ওর চলে যাবার সিদ্ধান্তের তবে মোট ফলটা দাঁড়াল কী?

ও ফিরে এলো।

নমিতা মরল আত্মহত্যা করে।

নমিতার মা-ভাই মরল অনাহারে।

বাঃ চমৎকার!

রক্ষা তো করলোই না, উপরন্তু একটা মেয়ের মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীর সঙ্গে একপ্যাঁচ মান-অভিমানের পালা খেলে ঘরে প্রত্যাবর্তন করে সংসারে মন দিল। চমৎকার!!

চলে যাবো?

এ তো নিজেকেই প্রবঞ্চনা করা। বেশ তো দেখা গেল চলে গেলেও ফিরে যে আসতেই হবে এ কথাটা বেশ ভালোভাবেই ও জানে। আর ছেড়ে যাবার কথা মনে করতেই যদি কান্নার দমক উঠে যায় তবে ঘৃণার বাষ্পে সব জ্বলে গেল কই? অবশিষ্ট তো অনেক রয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। প্রেম ভালোবাসা বিশ্বাস সব যদি মরেও যায়—নিজেকে বিদ্রূপে বিঁধল শিবানী—হে ভারতীয় নারী, তোমাদের করুণা যাবে কোথায়? তোমাদের হৃদয় মন ছেঁচে গুঁড়িয়ে দিতে থাকলেও স্বামী ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না তোমরা। তোমার ওপর কী নির্যাতন করছে সে, সে কথাটার চাইতে তুমি চলে গেলে 'স্বামীর কী হবে' সেটাই বড় কথা হয়ে দাঁড়ায় তোমাদের কাছে। হে ভারতীয় নারী, তোমাদের করুণার মৃত্যু নেই বরং বৃদ্ধি আছে। যত অপদার্থ তত তোমাদের করুণা।

তাই চুপচাপ বসে থাকো।

চলে যাওয়াটা সোজা নয় কোনো রকমেই।

আর কেবল কী ইন্দ্রনাথই তোমাকে ধরে রাখবে?

কেবল কী ইন্দ্রনাথই তোমায় ফিরিয়ে আনবে?

হঠাৎ যেন অত্যন্ত চড়া সুরের ঝমঝমে বাজনাটা ঝপ করে পড়ে গেল কোমল পর্দায়:

তোমার ঘর তার চার দেয়াল দিয়ে তোমাকে বেষ্টন করে ধরবে না? তোমার আপন রুচিতে কোনা জিনিষপত্র, আপন অভিরুচিতে সাজানো গুছানো ঘরদোর, আপন দৃষ্টির যত্নে—উজ্জ্বল সংসার—বন্ধনজাল ফেলবে না?

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা—তো সুখের যাত্রা। তবু তার যাত্রাকালে গাছ লতা-পাতা ম্লান হয়ে গেছে। বন গাঢ় শোকে অন্ধকার হয়ে উঠেছে। বাতাস কেঁদে কেঁদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। নদী অশ্রুর ঢেউয়ে থর থর করে কেঁপেছে। মাটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলেছে যতক্ষণ তার সঙ্গে থাকা যায়।

'পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে

করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে

নতুন বন্ধন জাল, অন্তিম মিনতি—

ঘরই হোক, বনই হোক, টানে না কে? বরং বনের চাইতে ঘর আরো বেশী টানে। ঘর তার চার দেওয়ালের মধ্যে আবেষ্টিত করে রাখতে চায় প্রিয়জনকে।

'আমার ঘর'— পৃথিবীর সবচেয়ে সঙ্গীতময় শব্দ।

হঠাৎ চঞ্চলভাবে লেপটা গলা থেকে ঠেলে কোমরে ফেলে শয্যার ওপর উঠে বসল শিবানী। কেন সে ঘটনাটাকে বাড়িয়ে ছড়িয়ে এত বড় করে তুলে ঘর সংসার অন্ধকার করে তার ভেতর বসে কান্নার বিলাসে মেতেছে? এত সময় কী ওর হাতে আছে? ইন্দ্রনাথই সেই লোক জানবার পর, কিছু চমকে ওঠা, বাস। তার চাইতে বেশী কী মূল্য এর থাকতে পারে? ওর জীবনে অন্ধকার কী বা কম ছিল, এ ঘটনায় কী বা বাড়ল নতুন করে? ইন্দ্রনাথের জীবন যে এই তা তো সে ভালো করেই জানে। বাড়তি যেটুকু অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়েছে, তা ঐ বাচ্চা হওয়া। কুকর্মগুলি সয়ে আসছে আর তারই একটা সম্ভাবনাকে ঘটে যেতে দেখে হাউ মাউ কাউ লাগিয়ে দিয়েছে।

সমস্ত ঘটনাটা যেন 'কিছু না' হয়ে উঠল শিবানীর কাছে। কিছু না হয়ে গেল মানে যে তুমুল ঝড় ওর ভেতর চলছিল তা থেমে গেল। ইন্দ্রনাথের অন্য আরো পাঁচটা দশটা বিশটা কেলেঙ্কারি যদি মনের ওপর দিয়ে —চলে যেতে পেরে থাকে— এটাও যেতে পারবে। বরঞ্চ এ ঘটনাটাই তো বিশেষ করে নীরবে বরদাস্ত করে যেতে হবে ওকে। কারণ, নির্দোষী নিরীহ একটা মেয়ের মরণ-বাঁচন, মান-সম্মান সব যে নির্ভর করছে এর ওপর।

নমিতার চিঠি পুড়িয়ে ফেলবে ও নিজে। ইন্দ্রনাথ আর নমিতা কেউ কাউকে কোনদিনও চিনবে না। সব গরল ও একা পান করবে।

বাস আর নয়। লেপ সরিয়ে উঠে বসেছিল শিবানী, ঝপ করে লেপ টেনে ফের শুয়ে পড়ল। আজ আর ভাববে না—কিছুতেই না! চোখের সুমুখে ফোটা ফুলের সমারোহ সাজিয়ে বন্ধ চোখে তা দেখতে লাগল শিবানী। চিন্তা তাড়াতে হলে শিবানী এই করে। চোখ বুজে ফুলের মেলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু ভাবনা বিদায় করা অত সহজ নয়। ফুলের মেলা কোথায় উধাও হয়ে গেল যেন— কোন সময়। ভাবতে লাগল ফের, সব বিষ ও একা পান করবে এ নিশ্চয়। ইন্দ্রনাথের যখন সন্তান, তখন ইন্দ্রনাথের ঘরই তাকে দেবে, এ সঙ্কল্প থেকেও সে কখনই চ্যুত হবে না এও ঠিক; কিন্তু শিশুকে ঘরে এনে তুললেই তো আর তাকে ঘর পাইয়ে দেওয়া হলো না। ইন্দ্রনাথ ওর সনির্বন্ধ অনুরোধে উপরোধে সম্মত যদিই বা হলো— তবে ও শিশু তো আশ্রিত মাত্র।

না মিথ্যা মিথ্যি মনগড়া ভেবেও লাভ নেই—ইন্দ্রনাথ সম্মত হবেই না এমন বাচ্চা ঘরে আনতে। শিশুকে তার ঘর পেতে দিতে হলে ওর সন্তান করে তাকে আনতে হবে।....কিন্তু তার উপায় কোথায়—! আর দু মাসও যে সময় নেই নমিতার বাচ্চা হবার। নাঃ, আর পারে না ভাবতে শিবানী।

মা, হাত পা টিপে দেবো একটু? কাঁচি ওর মেঝের বিছানা থেকে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করল না। শিবানীর শরীর টিপতে শুরু করে দিল হাত চেপে চেপে। বলল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো মা।

কাচ্চি কী অন্তর্যামী? আশ্চর্য হলো ওকে এমন একটা ঠিক মুহূর্তে উঠে আসতে দেখে। সে ছাড়াও আশ্চর্য হলো ও এ ঘরে শুয়ে ছিল দেখে। বলল, তুই এ ঘরে শুয়েছিস কেন?

বাঃ, তুমিই তো বলেছিলে। তুমি বলে এলে না আমাকে গিয়ে যে, খেয়ে দেয়ে আমার ঘরে এসে শুবি।

মনে করতে পারছে না। তবে নিশ্চয়ই বলেছিল। কেন বলেছিল কে জানে। তবে তো কাচ্চি ওর কান্না, ওর চঞ্চলতা, ওর বিছানার উপর একবার শোয়া, একবার উঠে বসা সবই দেখেছে?

আর কাচ্চির দেখা আর না দেখা দু-ই সমান। এ ঘরে না শুলে দেখত না কিন্তু টের পেত ও সব। পাশের ঘর থেকে কান পেতে থাকত না।

এই মধ্যরাতে শীতের বিছানা ছেড়ে উঠে এসে একজন শরীর টিপবে, নিছক আরামের ব্যাপার হলে শিবানী কখনই এই সেবা গ্রহণ করত না। কিন্তু শরীর ম্যাসাজ করার সময় মাথাটা একদম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় ও দেখেছে, তাই নিষেধ করতে পারলো না। কাচ্চি শরীর টিপতে লাগল আর শিবানী চোখ বুজে মাথাটার নিষ্ক্রিয়তায় ভারি শান্তিবোধ করতে লাগল।

ইন্দ্রনাথ ওর মন থেকে এত দূরে চলে গিয়েছিল যে, সে বাড়ি ফিরেছে কী ফেরে নি, এ প্রশ্নটা পর্যন্ত এতক্ষণের ভেতর একবার উঁকিটুকুও দেয় নি ওর মনে। এখনও ইন্দ্রনাথের গাড়ির শব্দ ওর যেন কানে গেল— আবদুল যে তাকে নিয়ে ঘরে শুইয়ে দিলো তাও যেন অস্পষ্টভাবে সে অনুভব করলো। বিলিতি মদের গন্ধ মৃদুভাবে বাতাসে ভেসে যেন নাকেও এলো, যখন ইন্দ্রনাথ বারান্দা অতিক্রম করলো কিন্তু তবু সত্যি ও বুঝল না ইন্দ্রনাথ এলো। পদ্মপাতার উপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বার মতো ওর চৈতন্যর ওপর দিয়ে ঐসব শব্দ গন্ধ গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগল। শিবানীর অনুভূতিতে গিয়ে স্পর্শ করতে পারলো না।

॥ ২৯ ॥

ভোরের আলো দেখা দিলো। বিছানা ছেড়ে উঠে গায়ে একটি শাল জড়িয়ে জানালার কাছে ইজিচেয়ার টেনে বসল শিবানী। গাছের পাতায় তখন উষার প্রথম আলো মাত্র এসে পড়েছে। ভোরের বাতাস জানালার লেসের পর্দা দুলিয়ে ওর মুখের ওপর বয়ে বয়ে ওকে যেন একটু ঘুমিয়ে নিতে বলতে লাগল। বলতে লাগল, এখনো রোদ উঠতে বাকি আছে। উঠলেও আমার সাধ্যমত তোমায় আমি ছায়া দেব। তুমি একটু ঘুমোও। তোমার বন্ধুর বাড়িতে ঘুমিয়েছিলে বটে, কিন্তু তারপর আমি জানি আর তুমি ঘুমোও নি সমস্ত রাত।

পা থেকে গলা পর্যন্ত শালটা টেনে দিয়ে চোখ বুজল এবং ঘুমিয়ে পড়ল শিবানী।

যখন জাগলো, দেখলো একটুকরো রোদও মুখের উপর এসে পড়েছে আর জানালার নেটের পর্দাটা ওর মুখের ওপর তার শরীরের ছায়া দোলাচ্ছে। দুরন্ত অবসাদ লাগছিল। গরমজলে শরীর ডুবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো। অবসাদটা যেন অনেকটা দূর হলো তাতে। নিজের ছোট্ট বসবার ঘরটায় এসে বসল সে। কাচ্চি ধোঁয়াওঠা গরম দুধের কাপ নিয়ে দিতে গেল হাতে। চায়ের বদলে দুধ দেখে কারণ কী জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে চোখ তুলে দেখল কাচ্চি নেই। অর্থাৎ সে পালিয়েছে।

গরম দুধ কাচ্চির কাছে একটা সংঘাতিক ব্যাপার। রোগে পথ্য, আরোগ্যে আহার, দৌর্বল্যে বলবির্বধক, অবসাদে রক্ত-উদ্দীপক, চিন্তায় স্নায়ুসঞ্চারী— কী নয় দুধ? স্বর্গে রয়েছে মৃতসঞ্জীবনী, মর্তে গোদুগ্ধ—কাচ্চির মনের ভাবটা প্রায় এইজাতীয়। এককাপ গরম দুধ শিবানীর সব অবসাদ দূর করে একেবারে তাজা করে তুলবে তাকে। শীতের এই সকালে স্নানের পর এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্য যখন ও হাত বাড়িয়ে রয়েছে তখন হাতে এনে দিল কাচ্চি গরম দুধ— যা ও দুচক্ষে দেখতে পারে না— রাগ ধরে গেল শিবানীর। কিন্তু ওকে ধমক দেবে, দুধ নিয়ে গিয়ে চা দিতে বলবে—একেবারে ইচ্ছে করলো না। দুধের পেয়ালায়ই চুমুক দিতে লাগল সে।

—নমিতা ওকে চিঠি পাঠিয়ে ওর জন্যে প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে। আজ প্রথম কর্তব্য হলো নমিতার কাছে একবার যাওয়া। কিন্তু সেই একই জিনিষের অভাব বোধ করতে লাগল শিবানী —উদাম। কালকে রাতে শেষ পর্যন্ত যুক্তির হাতে বৈঠা তুলে দিয়েছে সে। যুক্তির নৌকা চলে তরতর করেই কিন্তু মুস্কিল হলো, মন আর যুক্তি প্রায়ই বিপরীতমুখী হয়। যুক্তি বৈঠা হাতে নিলো কী মন বৈঠা ফেলে দিলো, তারপর প্রস্তাবকে পরাজিত করার চেষ্টায় উদামটি কোলচাপা করে বসে রইল সকাল গেল। দুপুর গেল, যাওয়া আর হলো না নমিতার কাছে। ঠিক করলো চিঠি লিখে কাচ্চিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। কাগজ কলম নিয়ে খসখস করে লিখল।

নমিতা,

তোর চিঠি পড়লাম। বিশ্বাস করব না কেন রে? ঘটছে তো কত কী— এমনি। ছেড়ে দে ওসব কথা। একেবারে ভুলে যা। একটুও ভাবিসনে রে। আমি তো বলেছি সব ভার আমার। ব্যবস্থা প্রায় করেই এনেছি (এটা শিবানীর মিথ্যে কথা। কিন্তু এমনি মিথ্যে অনেক সময় বলতে হয় নিরুদ্বেগ করবার জন্য) একেবারে সব ঠিক করে তোর কাছে আসব— কেমন? ঘাবড়াবি নে। ভাববি নে। কাঁদবি নে। হাসতে যদি পারতিস তবে আমি খুব খুশী হতাম কিন্তু অতটা তুই হয়তো পারবি নে— তাই সেটা থাক। ওসব আমাদের মতো মেয়েরা পারে। তোদের মতো লক্ষ্মী মেয়েরা পারে না। তুই শুধু শান্ত হয়ে থাক— বাস।

ঠিকানা দিয়ে, কত নম্বর বাসে উঠবে—, কোথায় নামবে, ক'বার ডাইনে, ক'বার বাঁয়ে গেলে কসবার একটা বড় পুরোনো আমলের জমিদার-বাড়ি চোখে পড়বে—সব ভালো করে বুঝিয়ে নমিতার কাছে পাঠিয়ে দিলো কাচ্চিকে শিবানী। তারপর মনে মনে বললো, যাক্ এখনকার মতো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

নিশ্চিন্ত? হঠাৎ অদ্ভুত একরকমের হাসি হাসলো শিবানী। দিল্লী অনেক দূরের মতো অনেক দূর এখনও ওর নিশ্চিন্ততা। বহু কদম চলতে হবে তাকে। আগে তবু ভাবনার সঙ্গে খুব একটা উত্তেজনা উৎসাহ আবেগ ছিল। একজনকে সংকট থেকে উদ্ধার করার ভেতর যত বিঘ্ন যত দুশ্চিন্তাই থাক— প্রসাদও কম থাকে না। কিন্তু এখন? নমিতার বিপদ ওর বিপদ জড়িয়ে-মড়িয়ে এক হয়ে গেছে। ও নমিতাকে ত্রাণ করছে না ইন্দ্রনাথকে রক্ষা করছে? না নিজেকে বাঁচাচ্ছে? পরোপকারের আত্মপ্রসাদ গেছে কিন্তু দায় বেড়েছে। ওজনটাও তাই পাথরের মতো লাগছে।

চিন্তা নিয়ে পায়চারি করা শিবানীর স্বভাব নয়। ওর ভাবা যেন বসে বসে উল বোনা। মাথার মধ্যে চিন্তার গুলিটা গড়াতে থাকে মননের টানে-টানে আর ও নক্সা বুনে চলে বসে বসে। কিন্তু আজ পায়চারি করতে লাগল ওর ঘরটুকুর ভেতর। বোধহয় চিন্তার কোন নক্সা বের করে উঠতে পারছিল না বলে স্থির হয়ে বসতে পারছিল না।

কোন এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে গান ভেসে এলো,— 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে'—

দাঁড়িয়ে পড়ে মন দিয়ে গানটা শুনল। গান শেষ হয়ে গেলে শিবানী বিষণ্ণ হাসল—মনে মনে কিছুরই নিষেধ নেই।

কিন্তু কী লাভ?

কিচ্ছু না।

কিচ্ছু মেলে না তাতে। কিচ্ছু পাওয়া হয় না তাতে।

কেবল ক্লান্ত... কেবল ক্লান্তি, তুলনাহীন ক্লান্তি।

হঠাৎ হাঁটাহাঁটি থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেল শিবানী। নমিতার চিঠিটা কোথায়? সেটা তো নষ্ট করে ফেলা হয় নি!

কোথায় রেখেছে চিঠিটা ভাবতে লাগল সে উৎকণ্ঠিতভাবে। কিন্তু মনে করতে পারলো না। দুরু দুরু শুরু করে দিল শিবানীর বুকটা— টেবিলের ওপর ফেলে রেখেই সে জেনির ওখানে চলে যায় নি তো। চিঠিটার প্রতি ইন্দ্রনাথের এমনিতেই ঔৎসুক্যের সীমা ছিল না। কে লিখেছে জানতেও চেয়েছিল সে। তারপর ওর ভাবগতিক দেখে তার পক্ষে আরও কৌতূহলী হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। যদি ওর ঘর তল্লাশ করে চিঠি নিয়ে গিয়ে থাকে ইন্দ্রনাথ? অথবা সন্ধান করতেও হয় নি তাকে। ঘরে ঢুকেই টেবিলের উপর পেয়ে গেছে। কাচ্চি বাড়ি নেই যে জিজ্ঞাসা করবে ইন্দ্রনাথ ওর ঘরে এসেছিল কি না। পাগলের মতো বই-পত্তর, টেবিল-ঘাঁটাঘাঁটি করে, এদিকে ওদিকে সেদিকে ঝেড়েঝুড়ে অনুসন্ধান করতে লাগল শিবানী। তারপর রেডিওর ঢাকনার তলায় হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা পেয়ে গিয়ে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো তার। যাক্ অন্যমনস্কতার চরম মুহূর্তেও বেশ সতর্ক হয়েই পত্রটা রেখে গিয়েছিল। পত্রটা বের করে এনে সেটার ভাঁজ আর দ্বিতীয়বার খুললো না, টেবিলের উপর একটা গ্লাসে কিছু জল ছিল, সেই জলের মধ্যে চিঠিটা আস্তে আস্তে ডুবিয়ে দিলো।

সূক্ষ্ম নীল রেখায় রেখায় নমিতার লেখাগুলি গলে বেরিয়ে আসতে আসতে ছড়িয়ে যেতে লাগল। তারপর মিলিয়ে। জলটা ক্রমশ নীল হয়ে উঠলো। গ্লাসটা ধরে ঝেঁকে ঝেঁকে লেখাগুলি আরো মিলিয়ে দিতে লাগল। জলটা যখন একদম নীল হয়ে গেল তখন 'যাক' বলে নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু গ্লাস থেকে চোখ তুলেই বিস্মিত হয়ে গেল শিবানী।

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ। শুধু দাঁড়িয়ে নয়, সেও লেখাগুলির গলে যাওয়া দেখছে একলক্ষে চেয়ে।

তাকে দেখে অনেকগুলি মিশ্র ভাবাবেগ যেন হুড়মুড় করে এসে শিবানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঘৃণা রাগ বিরাগ দুঃখ ক্ষোভ অনুকম্পা—কালকে খাবার টেবিলে যেমন কোন অনুভূতিরই সাড়া পাচ্ছিল না, সব অনুভূতিই নিঃসাড় নিথর নির্জিত ছিল; আজ আবার তেমনি সবাই যেন একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে কোলাহল লাগিয়ে দিয়েছে। নিজেকে সংবরণ করল শিবানী। রেডিওর উপর হাতটা তুলে দিয়ে স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে।

শিবানীর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথের বহুক্ষণ পর্যন্ত যেন চোখের পলক পড়লো না। এই একরাতে শিবানী কেমন শীর্ণ হয়ে গেছে। ভেতরটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। খুব কষ্ট অনুভব করতে লাগল সে। মনে মনে শপথ করল শিবানীর সঙ্গে আর কোনদিন সে মিথ্যা আচরণ করবে না। নিশ্চয় অনুমান করল সে এ চিঠি যেই লিখে থাক, ঐ কাশ্মীরী মেয়েটাকে ফ্ল্যাটে এনে রাখার কথাই লিখেছে এবং পত্রদাতা মেয়েটাকে রাখার কথাই জানিয়েছে, বিদায় করার কথাটা জানায় নি। মতলব কী লোকটার সে জানে না। হয়তো ব্ল্যাকমেল করা নয়তো নিছকই শত্রুতা সাধা। সে যাই হোক, যে গর্হিত কাজ সে করে ফেলেছে তা তো করে ফেলেছেন। চিঠিটাও যা অনিষ্ট করার তা করে গেছে এখন না ঢেকে, না ছাপিয়ে সব সত্যস্বীকার করে শিবানীর কাছে একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষমা চেয়ে নিতেই হবে তাকে।

দরজার সুমুখে থেমে পড়ে ইন্দ্রনাথ শিবানীর চিঠি বিসর্জনের ব্যাপারটা দেখছিল। শিবানী তার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই আস্তে আস্তে দু পা ভেতরে এসে ঢুকল সে। লজ্জা অনুতাপ, অস্বাচ্ছন্দ্যবোধের উপর একটা সংযমের আবরণ চাপিয়ে ধীরকণ্ঠে বললো, আমি তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি শিবানী। এটুকু বলে আরো একপা শিবানীর কাছাকাছি এগিয়ে এলো ইন্দ্রনাথ। বললো, এ চিঠি কে লিখেছে, কী লিখেছে যদিও তুমি আমায় তা জানতে দিলে না, এমন কী জানবার সম্ভাবনাটাকে পর্যন্ত ডুবিয়ে মেরে তবে নিশ্চিন্ত হলে দেখলাম। কিন্তু কে লিখেছে না জানলেও আমি জানি ঐ চিঠিতে কী সংবাদ ছিল। (একটু চমকালো শিবানী) যদি অবশ্যি আন্দাজের জানা, (ও! শিবানী স্বস্তি পেলো) তবু আমার সেই অনুমানে ভুল নেই। কিন্তু পত্রলেখক সব কথা তোমায় বোধহয় লেখেনি। যাক গে, মুখটা অবজ্ঞায় ঈষৎ বিকৃত করে তুলল ইন্দ্রনাথ, পত্রলেখককে আমি জানি নে—তাকে আমার দরকার নেই। অবশ্যি খুব কম লোককেই আমি দরকারী মনে করি; কিন্তু যাদের করি তারা আমার কাছে বড় বেশী মূল্যবান। বলে একটু বিষণ্ণ হেসে বললো, আমি নিজেই আজ সব অপরাধ কন্‌ফেস্ করবো তোমার কাছে; ঠিক দেবতার কাছে কন্‌ফেস্ করার মতো শুদ্ধ শান্ত মনে। দেবতা যেমন শরণাগতকে ক্ষমা করেন, তুমিও আমায় তেমনি ক্ষমা কোরো শিবানী। নইলে— থেমে গেল ইন্দ্রনাথ। হঠাৎ যেন গলা ধরে এলো। 'নইলে' বলে অন্তরের কাতরতা প্রকাশ করে এমনি কিছু একটা বোধহয় সে বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলতে পারলো না। একবার থেমে পড়ে আর সেদিকে গেলও না। শিবানীর কাছে থেকে কোনো জবাবের প্রত্যাশায় না এমনি কে জানে, একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে শিবানীর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো, আমার যন্ত্রণা পাওয়া দেখে নিশ্চয়ই তোমার হৃদয় গলবে। বিশ্বাস করো শিবানী, পদ নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, সম্পদ নয় সম্পত্তি নয়— আমার জীবনের সৌভাগ্য তুমি। আমাকে আর একবারমাত্র বিশ্বাস করো—

সমস্ত গলা বুক যেন ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের। নিজের অপরাধবোধ, শিবানীর আঘাত পাওয়ার গভীরতা, তার একদিনে এমন শুকিয়ে ওঠা—সব কিছু মিলে ইন্দ্রনাথের মনের ভেতর এমন একটা দুর্দান্ত আত্মগ্লানির নিষ্পেষণ চলছিল যে যথার্থই তার ভাবাবেগ তার আয়ত্তে ছিল না। শিবানীর রেডিওর উপর ন্যস্ত হাতটা হাত বাড়িয়ে ধরবার সাহস তার হলো না। কিন্তু নিজের একটা হাত সে রেডিওর উপর রাখলো। কণ্ঠে এবার রহস্যের ছোঁয়া লাগিয়ে মুখে শীর্ণশশীর মতো একটুকরো হাসি টেনে এনে বললো, তোমার সেই গানটা মনে করো শিবানী—

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না।
আমার ক্ষমাহীনতা—

ভালই এগোচ্ছিল ইন্দ্রনাথ।
আশ্চর্য এই ভালোবাসা জিনিসটা!

বস্তুজগতের ইট-কাঠ-দালান-কোঠাই হোক, আর ভাবজগতের শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস-প্রেম-প্রণয়ই হোক, সব কিছুই মজবুত বুনিয়াদের উপর স্থাপিত না হলে স্থায়ী হয় না।

কিন্তু ভালোবাসা?

মনের বনিয়াদের যত দুর্বলতম কোণে তার বাস তত তার বল। যুক্তির ভারে ভিত যেখানে যত টলমল করে ওঠে, ন্যায় অন্যায়বোধ যেখানে যত একাকার হয়ে থরথর করে কাঁপে, দৃষ্টি যেখানে যত অন্ধ, ভালোবাসার ভিত সেখানে তত দৃঢ়। তাকে টলায় সাধ্য কার।

ইতিমধ্যে শিবানীর চোখ ইন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি ফেলেছে। শিবানীর মরুভূমির মতো দৃষ্টির ভেতর তার দুই চোখের ঘন পক্ষের গভীর কালোছায়া মরূদ্যানও সৃষ্ট করে গেছে।

ইন্দ্রনাথের আজ সম্ভবত খুব কাজ গেছে অফিসে। হয় তো অন্য অফিসের সঙ্গে অনেকবার ট্রাঙ্কলে কথা বলতে হয়েছে। হয় তো অন্য অফিসের সঙ্গে আমদানী রফতানীর ব্যাপার নিয়ে মতভেদ ঘটেছে। তার ওপর ঘরের হাওয়াটাও অশান্ত। খুব বিপর্যস্ত লাগছে তাকে। বাড়ী ফিরে সে পোষাক পালটায় নি, বিশ্রামও করে নি। শিবানী ঘরে রয়েছে দেখে তাকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ না দিয়ে চলে এসেছে। গলার টাইটা টেনে ঢিলে করে দিয়েছে। সেটা গোল হয়ে ঝুলছে সার্টের উপর। ঘরে ঢুকবার সময় বোধহয় খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

কালকে খাওয়ার টেবিল ছেড়ে চলে যাবার মতো আজও শিবানী যদি ওকে বিড়ম্বিত করে ঘর ছেড়ে চলে যায়। অন্যমনে হাত চুলের মধ্যে চালাতে চালাতে বোধ হয় এসেছিল সে, তাই চুলগুলি ঠিক বিন্যস্ত ছিল না। অর্থাৎ সব মিলিয়ে, ছবিতে এবং কথায় ইন্দ্রনাথ অগ্রসর হচ্ছিল—ভালই। কিন্তু যেই ইন্দ্রনাথ বললো, সর্বপ্রথম আমি আমার কথাটাই বলে নেই, শিবানী — কাশ্মীরী মেয়েটাকে আমি— বাস্ আবার গেল সব ওলোট-পালট হয়ে।

ব্রহ্মতালু পর্যন্ত যেন জ্বলে উঠল শিবানীর— এটা আবার কোন্ কেলেঙ্কারি! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে! না, না, আমি এসব নোংরা কথা আর শুনব না। কাশ্মীরী, পোশায়ারী, রাজস্থানী যা তোমার মন চায় পার্সেল করে করে আনিয়ে নেও। তুলে রাখো। আমি বিদায় নিলাম। আমি আর পারছি নে।

আমি তোমার কাছে আর একবারের মতো ক্ষমা ভিক্ষা করছি শিবানী। পাংশু-মুখে দু'হাত জোড় করে প্রার্থনা করল ইন্দ্রনাথ। আর কখনো যদি এমনি ঘটে, আমাকে তুমি লাথি মেরে তাড়িয়ে দিও। আমি মাথা নত করে চলে যাবো এ বাড়ি ছেড়ে।

চৈতন্য হলো শিবানীরও। ইন্দ্রনাথকে নিয়ে উত্তেজিত হবার কী এখন সময় আছে তার? না নিজের কথা ভাববারই সময় আছে? নমিতার কোন উপায় না করা পর্যন্ত কোন দিকে তাকাবার সময় নেই ওর। ঐ এক ব্রত এখন ওর সামনে "নমিতা।" নিজেকে শান্ত করে ফেলল শিবানী। কিন্তু ইন্দ্রনাথের দিকে তাকাতে প্রবৃত্তি হলো না। অন্যদিকে তাকিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বললো, এই ক্ষমা চাওয়া, এই ক্ষমা করা —এ সবের কী অর্থ, কী মূল্য আমি জানি নে। আমার কাছে এ সবের এতটুকুও মূল্য নেই। তোমার কাছে থাকে— ভালো!

আমার কাছে আছে শিবানী। তোমার ক্ষমার অসীম মূল্য আমার কাছে।

নিরুপায়কণ্ঠে শিবানী বললো, ঠিক আছে। কিন্তু বলেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো তার। তার এই 'ঠিক আছে', বলার অর্থ হলো সে ইন্দ্রনাথকে মাফ করলো। আর মাফ করলো মানে গ্রহণ করলো। একটা লোককে গ্রহণ করে আবার প্রত্যাখ্যান করে কী করে? কিন্তু যেখানে ইন্দ্রনাথের এই সান্নিধ্যটুকুও তার অসহ্য পীড়াদায়ক লাগছে সেখানে আরো সান্নিধ্যের শঙ্কার দৌড়ে পালাবার মত মনের ভাব হলো শিবানীর। ঘর ছেড়ে না হয় এখন গেল। কিন্তু শুধু ঘর ছেড়ে যাওয়ায় কিছুমাত্র লাভ হবে না। তাকে ইন্দ্রনাথের এই আবেগ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে। পালাতেই হবে তাকে। ইন্দ্রনাথের ভাবাবাবেগ তার গা-গুলিয়ে তুলেছে। তাই 'ঠিক আছে' বলার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, কিন্তু আমি আর পারছি নে।

শিবানী, আমি তো বলেছি, আর হবে না।

শিবানী বললো, হবে। ইন্দ্রনাথ বললো, হবে না। শিবানী বললো, বেশ দেখা যাবে। এখন আমায় একটু অব্যাহতি দেও। আমি মার কাছে যাবো ঠিক করেছি—

এই মূহুর্ত আগেও শিবানী জানতো না যে সে মার কাছে যাওয়ার কথা বলবে। বলার পর ঝটিতে তার মনে খেলে গেল, সবদিকেই এ ব্যবস্থা চমৎকার হয়। ইন্দ্রনাথের কাছ থেকে দূরে থাকা হয়। নমিতাকেও সেখানে নিয়ে গেলে মার সাহায্য পাওয়া যায়।

শিবানীর গলার উত্যক্ত ভাবটা ইন্দ্রনাথের মন ভেঙ্গে দিল আর 'অব্যাহতি' শব্দটা লজ্জা দিয়ে গেল তার চরিত্রকে। তবু সে একটু হাসল। বললো, নিশ্চয় 'অব্যাহতি' দেবো। কিন্তু তার জন্য মার কাছে পালাতে হবে না। তোমার মন প্রসন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি নিজেকে থ্রাস্ট করবো না।

'প্রসন্ন' কথাটাকে যেন নদীর জলে ফেলে দিল শিবানী। তারপর টান হয়ে বললো, না, আমার শরীর ভালো নয়। আমাকে কিছুদিনের জন্য মার কাছে যেতেই হবে। বলে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে চাইল শিবানী।

কিন্তু পথ আটকে রাখল ইন্দ্রনাথ।

শরীর যে শিবানীর ভালো নেই এ কথাটা এতই বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো যে, উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ— এও যেমন, ঠিক আবার শিবানীর এই অসুস্থতার ভেতর দিয়ে দুজনার সম্পর্কটা তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে উঠবার সম্ভাবনায় খুশীও যে হয়ে উঠল— সেটাও তেমনি ঠিক। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, তোমার শরীর যে ভাল নেই তোমার চেহারাই সে কথা বলছে। ট্রাব্‌লটা কী? বলেই ঈষৎ হেসে বললো, অবশ্যি আমি ছাড়া। আমি তো তোমার কন্‌স্টেন্ট্ ট্রাব্‌ল রয়েছিই—তার বাইরে?

শিবানীর চোখেমুখে অধৈর্য দেখা দিতে দেখে ইন্দ্রনাথ এবার অসহায়ভাবে বললো, আমায় একেবারেই সইতে পারছ না ঠিক আছে, কিন্তু সে জন্য তো অসুখ অবহেলা করতে পারা যায় না। আমি ডাক্তার ব্যানার্জিকে ফোন করছি। তিনি আসুন। তাকেই বলো। ইন্দ্রনাথ শিবানীর পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেই উদ্‌যোগ করল ডাক্তারকে ফোন করতে যাবার জন্য।

এ আবার কী নতুন ফ্যাসাদ। অসহিষ্ণুকণ্ঠে বলে উঠল শিবানী, ডাক্তার ডাকবার অসুখ হলে আমি চুপ করে বসে থাকতাম না। আমার মরবার ইচ্ছে নেই একটুও।

অসুখ কিন্তু ডাক্তার ডাকবার অসুখ নয়, এ কেমনতর অসুখ! বলতে গিয়েও থেমে গেল ইন্দ্রনাথ। অকস্মাৎ দুই চোখ আলোকিত হয়ে উঠল তার। মনে পড়ল বাড়ির মেয়েদের শরীর খারাপ শুনে ডাক্তার ডাকবার কথা বলতে গিয়ে মাদের মুখে এ জাতীয় কথা যেন সে শুনেছে; "যা যা, ডাক্তার ডাকতে হবে না।" তারপর কিছুদিন বাদে দেখেছে তারা ছেলে-কোলে বসে আছে।

হাত-পা যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল ইন্দ্রনাথের। ভয়-ডর কোথায় গেল হাওয়া হয়ে। শিবানীর কাছে এসে তার দুই বাহু দু'হাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে বলে উঠলো, তবে কী রকমের শরীর খারাপ তোমার শিবানী?

ইন্দ্রনাথের চকচকে চোখ, তার বিষম উত্তেজনা, তার জিজ্ঞাসার ভঙ্গী দেখে শিবানী বুঝলে ইন্দ্রনাথ কোথায় চলে গিয়ে কী ভেবে বসে আছে। আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়বার চেষ্টা করতে লাগল সে। ইন্দ্রনাথ ছাড়লে না। সে অস্থিরকণ্ঠে বললা, কী নিষ্ঠুর তুমি। এত বড় সংবাদটা থেকে আমায় বঞ্চিত করে রেখেছ? উঃ কী হচ্ছে যে আমার ভেতর।

পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শিবানী।

হঠাৎ তার বাহু ছেড়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে মাতালকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো ইন্দ্রনাথ, বল শিবানী, আর ইউ ক্যারিং —আর ইউ?

না করলো না। হ্যাঁ করলা না। নড়লো না, চড়লো না—শিবানী স্তব্ধ।

তবে তো সে যা ভাবছে তা যে সত্য তাতে সন্দেহ কী। আমি যে কী করি এখন। পাগলের মতো ঘর ছেড়ে যেতে যেতে ইন্দ্রনাথ বলতে লাগলো, আরো কতো আগে যে যত্ন নেওয়া উচিত ছিল। ডাঃ ব্যানার্জিকে ফোন করছি। তিনি এক্ষুণি চলে আসুন।

পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ ব্যানার্জিকে এক্ষুণি চলে আসবার জন্য ফোন করতে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটল ইন্দ্রনাথ। আর শিবানী তার চলার দিকে তাকিয়ে স্থাণু হয়ে রইলো। বিষ লাগছিল তার। কী কথাকে কী ভেবে নিয়ে কেমন সুরু করে দিয়েছে লোকটা!

কিন্তু ইন্দ্রনাথকে থামিয়ে তার স্বকল্পিত সুখকে ভেঙ্গে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে না কেন ও? বক্রোক্তিতে ওর ঠোঁট বেঁকে উঠে বলছে না কেন, ছেলে হবার সংবাদে এত খুশি? ছেলের জন্য কাঁদছিলে জানতাম না তো? কিন্তু আমি যে সত্যটা জানি। ছেলেটেলে কিছু নয়, আমি ঘরবন্দী হবো সেই আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছ? কিন্তু মিথ্যে খুশি ছড়াচ্ছ— আমার পায় এখনও শিকল পড়েনি।

কিন্তু কেন বিষ হয়েও দাঁড়িয়ে রইল, তবু ইন্দ্রনাথকে বাধা দিল না বা তার অমূলক... ধারণা ভেঙ্গে দিল না, শিবানী নিজেই জানে না।

অপ্রবৃত্তি?

অবশ্যই সেটা প্রধানতম কারণ। তার সমগ্র সত্ত্বা জুড়ে একমাত্র অপ্রবৃত্তিই বিরাজ করছে এখন।

কিন্তু অন্তঃসলিলা নদীর মতো এ ব্যাপারের স্বতন্ত্র একটা সম্ভাব্য পরিণতির আশাও যে অজ্ঞাতে ওর মনের তলায় তলায় কাজ করে চলেছিল, সে কথা তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল শিবানীর। এখন বর্তমান মুহূর্তে মনের উপর তলার অপ্রবৃত্তিটার পাঁকের তুফান তুলছিল মনের উপর। ডাঃ ব্যানার্জি এ সময় চেম্বারেই থাকেন। ইন্দ্রনাথ ফোন করা মাত্র তাকে পেয়ে যাবে। এবং তিনিও ফোন পাওয়া মাত্র চলে আসবেন। আর তারও আগে ডাঃ ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলে ইন্দ্রনাথ ফিরে আসবে ওর কাছে— বিশ পা মেঝে ত্বরিৎপায় এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো শিবানী।

পরের দিন বেলা দশটার সময় ইন্দ্রনাথ এসে শিবানীর কাছে চেয়ার টেনে বসলো। নিতান্ত আকুতির সঙ্গে বললো, ছেলেমানুষি করো না লক্ষ্মীটি। আমাকে সহ্য করতে পারছ না, ম্লান হাসল সে— বেশ তো বলেছি তো আমি দূরে থাকব। ভীষণ দূরে। বলতো আউট-হাউসে গিয়ে থাকব, তোমাকে এতটুকু তাক্ত করব না। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে কালকে ঘরের দরজা থেকে ফিরে যেতে হলো। কিছুতেই দরজা খুললে না—এটা কী বলত? তিনি আমাদের বাড়ির লোকের মতো। —কিছু মনে করেন নি। বরঞ্চ কী করতে হবে না হবে, কাকে দেখাব সব নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এবং বলেছেন, কারু কারু এরকম নানা কিছু নাকি হয় এ সময়। কিন্তু এটা তো মনে করাকরির ব্যাপার নয়। এ সময় প্রথম মাস থেকে ডাক্তার দেখাতে হয়, ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি করা কিছুতেই চলে না শিবানী। আজ এগারোটার সময় মিসেস ভৌমিক আসছেন তোমায় দেখতে। বড় গায়নোকোলিজস্ট। ডাঃ ব্যানার্জিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সব। আমরা ঠিক করেছি, তুমি তারই ট্রিটমেন্টে থাকবে আপ টু ইওর ডেলিভারি। তাকে দেখে আজ আবার কিন্তু কালকের মতো দরজা বন্ধ করে দিও না লক্ষ্মীটি।

শিবানী নতচোখে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। একটা চমৎকার পথের রেখা দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রনাথের এই ভেবে নেওয়ার ভেতর। সন্তানকে তার পিতার ঘর পেতে দেবে ঠিক করে ছিল। তা বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে নিজেই নিজের ঘরে আসবার ঠিক পথ বেছে নিচ্ছে— বেশ মজা তো।

তবে তাই হোক।

এই মিথ্যার নৌকো চড়েই বৈতরণী পার হয়ে শিবানী বৈকুণ্ঠে পৌছোবে। এমন মিথ্যাও আছে যা সত্যের চেয়েও মহান।

তাই 'মিথ্যা' বলে মিথ্যেমিথ্যি আর মাথা ঘামাবে না। একটার পর একটা ঘটনা এগিয়ে আসবে, একটার পর একটায় পা রেখে রেখে ঘটনার সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাবে। দেখা যাক কতদূর যাওয়া যায়। শেষ পর্যন্তই যাওয়া যায়, না ফিরে আসতে হয়।

আজ ডাক্তার আসছে?

অতিক্রম করতে পারে কি এ সিঁড়িটা, দেখা যাক।

উত্তরের অপেক্ষায় শিবানীর দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে থেকে থেকে জবাব না পেয়ে ইন্দ্রনাথ তখন বলছে শিবানী আমাকে শাস্তি দিতে চাও? তুমি এতো জান আর এটা জানো না বাইরের শাস্তির অনেকটাই বাইরে দিয়ে চলে যায়, কিন্তু অন্তর যখন দগ্ধাতে শুরু করে তার বাড়া আর কিছু নেই?

শিবানী ধীর কণ্ঠে বললে, দরজা দেব না।

শিবানীর উত্তরে এবং কণ্ঠস্বরে আবেগের বান ডাকলো ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে। কিন্তু হৃদয়কে সংযত করে আর একটা কথাও বললো না।

অত্যান্ত স্নেহের সঙ্গে শিবানীর পিঠটা একটু চাপড়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

একটুক্ষণ বাদেই ত্রস্ত পায় ঘরে এলো কাঞ্চি। শিবানীর খুব কাছে এসে দু চোখ গোল করে ফিসফিসে কণ্ঠে বললো, মা, সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে কী বললেন জান?

কী বললেন?

বললেন—একটা ঢোক গিললো কাচ্চি, বললেন তোমার ছেলে হবে। থেমে শিবানীর মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু সেখানে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য না দেখে বলে চললো, বললেন তোমায় খুব যত্ন করতে। একটু শরীর খারাপ হলে সাহেবকে তক্ষুণি জানাতে। আর বললেন, দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল কাচ্চির— ডাক্তার নাকি বলেছে কারু কারু এসব সময় মাথায় কিছু গোলমাল দেখা দেয়, তোমার মতে মতে যেন চলি।

উদাসভাবে শিবানী বললো, বলবেনই তো। যত্ন সেবা করিস না, মতে মতে চলিস না দেখেন তো সব। সাহেব যা বলে দিয়েছেন শুনবি।

বল না মা কী।—

গলায় কিছু উত্ত্যক্ত হওয়ার কিছু আশ্চর্য হওয়ার ভাণ মেশালো শিবানী— সাহেব বলে দিলেন সব, তবু আমায় অবাক জিজ্ঞাসা করছিস, কী মা? সাহস তোর কম নয়। সাহেব মিথ্যেকথা বলছেন তোকে?

কাচ্চি হাঁ করে তাকিয়ে রইল শিবানীর দিকে। মার লীলাখেলা মা কালীর মতো। বন্ধুর ঐ বাচ্চাটাকে ঘরে আনবার জন্যই কী মা এই লীলায় অবতীর্ণ হলেন।

কিন্তু ডাক্তার আসছে যে মাকে পরীক্ষা করতে।

বিচলিতভাবে বললো সে, ডাক্তার এসেছে যে গো?

ডাক্তার আসবে না? এ সময় প্রতি মাসে দেখানো উচিত। পাঁচ ছ' মাস যে দেখাইনি অন্যায় হয়ে গেছে। (পাঁচ ছ' মাস শিবানী স্বীকার করে নিল। সময়টাই তেমন বোঝা যায় না) চেয়ার ছেড়ে উঠে সে হাই তুলল। আলস্য ভাঙ্গল গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে। বললো, ডাক্তার যখন আসছে তখন একটু শুই—কী—বলিস কাচ্চি, ডিভানে শুয়ে পড়ল সে। বললো, শরীরটা একটু দলাই মলাই করে দে দেখি। ভাল করে রক্ত চলাচল করুক। সব স্রোত যেন থেমে আছে।

কাচ্চি পা-পা করে করে এগিয়ে ডিভানের কাছে গিয়ে শিবানীর কোমরে হাত রাখল। বললো, ডাক্তার তো ধরে ফেলবে মা?

কী ধরে ফেলবে? ভীষণ ভ্রূভঙ্গী করে জোর দিয়ে বলে উঠল শিবানী, বলছি যে আমি আমার ছেলে হবে।

শিবানীর কোমরের উপর কাচ্চির হাতটা থেমে গিয়েছিল। সেটা আবার চালাতে চালাতে ক্ষীণস্বরে কাচ্চি বললো, আচ্ছা।

আমি বলছি একথা, তুইও বলবি সবাইকে।

বলব। কোনমতে মিনমিনে স্বর বেরিয়ে এলো কাচ্চির গলা থেকে।

আরাম করে চোখ বুজে বুজে কাচ্চির সেবা নিতে লাগল শিবানী। যাক্ আর একটা ঘাঁটি পার হওয়া গেল। অবশ্যি শত্রুপক্ষের নয়, মিত্রপক্ষের। তাই এটা পার হওয়া অতিক্রমও নয়, উত্তরণ নয়; তবু আরো একটু এগোনো হল তো।

কিন্তু কাচ্চি ভেবে পাচ্ছিল না, ও বললে কি হবে। ডাক্তার বলবে তবে তো? মাথা তোলপাড় করে তুলে ভাবতে লাগল কাচ্চি। হঠাৎ খুব উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল সে, আচ্ছা মা, খুব অনেক বেশি টাকা দিলে ডাক্তারবাবু তোমার কথা শুনবে না?

শিবানীও অন্যমনস্ক ছিল, ডঃ ভৌমিক আসলে কী করবে, সেই চিন্তায়। কাচ্চির উত্তেজনা দেখে তার দিকে ফিরল। তার একটা হাত হাতে টেনে নিয়ে সে হসিক্ত কণ্ঠে বললো, খুব ঘাবড়ে গিয়েছিস না রে? আমার সহায় তুই আছিস না? এটা কী কম বল আমার? তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, টাকার কথা তুই যা বললি, আমিও মনে মনে সেই কথাই ভাবছিলাম। ঐ পথেই যাবো আমি। কিন্তু যিনি আসছেন তিনি ডাক্তারবাবু নয় রে, ডাক্তার মেয়ে।

কিন্তু যদি ভোঁতা হয়, ভীরু হয় মেয়েটি তবে হবে না। সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে আরো। প্রথমে তাকে যাচাই করে নিতে হবে খুব ভাল করে। তারপর পা ফেলতে হবে সাবধানে। যদি দেখি অনুপযুক্ত— মানে কাজ হবে না, তবে এমন গোলমাল করব যে, সাহেব ছুটে এসে উপস্থিত হবেন। তারপর আমাকে শান্ত করে বলবেন, একে দেখাবে না? বেশ আমি আর একজন ভালো বড় কাউকে ডাকছি। জানিস তো বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ সময় অনেক রকম ছিটমিট্ মেজাজমর্জি দেখা দিলেও দিতে পারে? তবে আর কী? এইভাবে একটা একটা করে তাড়াব যতক্ষণ আমার চেকটি ব্যাগে পুরবার মত একটি বুদ্ধিমতী কিংবা সমাজের নিষ্করুণতা বোঝার মতো হৃদয়বতী মেয়ে না আসে। অবশ্যি বুদ্ধিমতী বা হৃদয়বতীর বদলে লোভী হলেও আমার আপত্তি হবে না। ভালই কাজ হবে তাতেও আমার।

শরীর টেপা বন্ধ করে উৎসুক হয়ে শুনল কাচ্চি শিবানীর কথাগুলি। ভীষণ উত্তেজনা বোধ করতে লাগল সে। আবার গা টেপা সুরু করলে তার হাতের চাপ বেড়ে গেল। শিবানী উঃ করে উঠল। আরে করছিস কী। হাড়গোড় ভেঙ্গে দিবি নাকি।

বাইরে ইন্দ্রনাথের জুতোর শব্দের সঙ্গে আরো একটা জুতোর শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। ইন্দ্রনাথ ডাক্তার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

॥ ৩০ ॥

কাচ্চি চলে গেল। শিবানী উঠে বসলো। শাড়ী, জামা, চুল হাতের টানেটুনে চেপেচুপে একটু গুছিয়ে নিলো।

ইন্দ্রনাথ স্ত্রীকে দেখিয়ে বললো, এই আপনার 'পেসেন্ট'। বসুন— নিজের হাতে চেয়ার এগিয়ে দিলো ডক্টর ভৌমিককে। ডক্টর ভৌমিক বসলে বললো, 'আপনি আপনার পেসেন্ট'কে দেখুন, আমি অফিস ঘরে আছি।' মিসেস ভৌমিককে বসিয়ে যেমন এসেছিলো তেমনি চলে গেল সে। শুধু যাবার মুখে অল্প হেসে বলে গেল, 'আপনার 'পেসেন্ট' কিন্তু একটু 'ইমপেসেন্ট', অল্পে ধৈর্য হারান। তারও কিছু ব্যবস্থা থাকলে ব্যবস্থাপত্রে লিখে যাবেন।'

হাতের ব্যাগ টেবিলের ওপর রেখে ডক্টর ভৌমিক বললেন, মিঃ সেন কথাটা বলেই চলে গেলেন, জবাবটা দিতে পারলেম না। বলতাম, সহ্য করবার সময়টা দেখা যায় না। গেলে বোঝা যেত কত ধৈর্য ধরবার পর মেয়েরা ধৈর্য হারায়। কী বলেন মিসেস সেন? কৌতুকে হাসলেন তিনি।

চমৎকার তো মহিলাটি! পেয়ে গেলাম নাকি প্রথমাতেই। মনে মনে বললো শিবানী।

দুই কনুই হাঁটুর উপর রেখে শিবানীর দিকে একটু ঝুঁকে ডঃ ভৌমিক জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এবার আপনার শারীরিক অবস্থাটা বলুন দেখি।

ডিভানে যখন শুয়েছিলো হারের লকেটটা পেছন দিকে চলে গিয়েছিলো। সেটা ঘুরিয়ে আনতে আনতে শিবানী বললো, কি বলবো?

আপনার স্বামী বললেন, আপনি অসুস্থ। 'ট্রাব্‌ল'টা কি?

ট্রাব্‌ল নেই তো!

ট্রাব্‌ল নেই? বেশ ভালো কথা। উঠে পড়লেন ডক্টর ভৌমিক। বললেন, আপনারা আয়াকে ডাকুন। আমাকে একটু হাত ধোবার সাবান জলের ব্যবস্থা করে দিক। আমি একবার আপনার থরোলি 'চেক্' করব।

আসুন আমি দিচ্ছি। শিবানী বেসিনের কাছে নিয়ে গেল ডক্টর ভৌমিককে। ডক্টর ভৌমিক হাত ধুতে লাগলেন। শিবানী দেখতে লাগলো ডক্টর ভৌমিককে। যেন চেহারা থেকে চরিত্র পাঠ করে নিতে চেষ্টা করছে সে। মহিলার বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। দেহের গঠনে কোথাও স্থূলতা নেই, দৃঢ় পরিমিত বাঁধুনির শরীর। হাঁটা চলা, বসা নিজবৃত্তি অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ। আপন খ্যাতি সম্বন্ধে যে যথেষ্ট সচেতন সেটা চোখের প্রত্যয়ে ও চিবুকের দৃঢ়তায় স্পষ্ট। শিবানী জিজ্ঞাসা করলো, আপনার বুঝি নার্সিং হোম আছে?

চোখ কুঁচকে সকৌতুকে হাসলেন তিনি। বললেন, আপনাকে নেবার উপযুক্ত নেই— (হাসিটা ভালো লাগলো শিবানীর) আপনাকে আমরা কুইন নার্সিং হোমে নেবো। আমি সেটার সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত আছি। আপনার স্বামীর সঙ্গে সে সব কথা হয়ে গেছে।

আপনার নার্সিং হোম বুঝি ছোটো?

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ডক্টর ভৌমিক বললেন, মিসেস সেন, ইট্ রিকোয়ার্স প্লেন্টি অফ্ মানি। নতুন করেছি আস্তে আস্তে বাড়িয়ে তুলছি। প্রচুর ইকুইপ্‌মেন্টসের প্রয়োজন হয় একটা নার্সিং হোমে। তোয়ালে রেখে জুতোর শব্দ তুলে টেবিলের কাছে চলে এলেন তিনি। ডাক্তারি ব্যাগ খুলে হাতে গ্লাভস ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, এবার দরজাটা বন্ধ করে একটু শুয়ে পড়ুন তো। সো দিস ইজ ইওর ফার্স্ট্ কনফাইনমেন্ট—পাঁচ মাস চলছে। শিবানীকে পরীক্ষা করবার আগে কেস্‌টা যেন মনে করে নিলেন।

দরজা বন্ধ করে শিবানী এসে ডিভানে বসলো। ঘরটা ডেটলের গন্ধে ভরে গেছে। বোধ হয় গ্লাভ্‌সটা থেকে আসছে। জিজ্ঞাসা করলো সে, গ্লাভ্‌স পরলেন, তো সাবান দিয়ে হাত ধুলেন কেন?

ঠিক বলেছেন। এটা ভাই আমার একটা অভ্যাস। তারপর স্মিত হেসে মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু ভাই, বসলে তো হবে না। একটু ইনটারনাল এক্‌জামিনেশন করতে হবে, চাইল্ডের পসিস্‌নটা দেখতে হবে।

বেশ লাগছে মহিলাটিকে শিবানীর। বুদ্ধি এবং সহৃদয়তা যেন মাখামাখি করে আছে। কপাল ঠুকে বলে ফেলা যাক। সাহায্য না করলেও অনিষ্ট করবেন না। বড়জোর দুঃখ প্রকাশ করে চলে যাবেন। শিবানী ডঃ ভৌমিককে হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বললো, আপনি একটু বসুন।

কেন বলুন তো? বিস্মিত হলেন ডক্টর ভৌমিক।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, আপনার একটু সময় আমাকে দিতেই হবে।

সময়? ডাক্তারের সময় জানেন তো বড়ড মূল্যবান। আমার একটা অপারেশন কেস আছে। আচ্ছা বলুন তো, দেখা যাক। হাতের গ্লাভ্‌স্‌ দুটো খুলে ফেললেন তিনি।

শিবানী কোন প্রস্তাবনার মধ্যে গেল না। ডাক্তারদের সময় সত্যি বড় মূল্যবান। সোজা চলে গেল মূল বক্তব্যে। বললো, আমার একটি ছোটবেলাকার বন্ধু, বিয়ে হয়নি। কিন্তু সে প্রেগনেন্ট হয়েছে।

(ডক্টর ভৌমিকের মুখে এতটুকু ভাবান্তর হলো না কথাটা শুনে। এ সব হরদম শুনছেন ওঁরা) বেচারাকে এই সঙ্কটের ভেতর ফেলবার জন্যে দায়ী নিতান্ত একটা বাজে ঘটনা— রেপ্‌ কেস্‌। কথাটার সঙ্গে সঙ্গে যেন ইন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালো ওর চোখের ওপর। শিবানীর মুখটা কালো এবং ক্লিষ্ট দেখালো। হাত দিয়ে মাথার চুলগুলি পেছন দিকে ঠেলে দিতে দিতে ঘটনাটাকেও সে যেন পেছনে ঠেলে দিলো। বললো, যাকগে সে কথা। ওসবে আমাদের দরকার নেই। প্রথমে ধরে উঠতে পারেনি বেচারা। তারপর যখন বুঝতে পারলো তখন মরা ছাড়া আর কোনো পথ তার চোখে পড়ল না। কিন্তু মেয়েটির গোটা পরিবার নির্ভর করে ওর চাকরীর ওপর। ও মরলে গোটা পরিবার মরবে। কোনো উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি আমার কাছে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। খুব রাগ করলাম, এতগুলো মাস হয়ে গেছে শুনে। বললাম, প্রথম দিকে এলে তো কোনো সমস্যাই ছিল না? এখন যে তোর পেটে কান পাতলে বাচ্চার কথা শুনতে পাওয়া যাবে!

ডক্টর ভৌমিক হেসে ফেললেন।

শিবানী বললো, বলুন তো! আট মাস। শিশুহত্যা হয়ে যায় না? ঠিক কিনা বলুন?

ঠিক। সম্মতি জানালেন তিনি। বললেন, সাত মাস, সাড়ে সাত মাসে কত বাচ্চা হয়ে যায়!

ডক্টর ভৌমিককে ওর কথার সঙ্গে যোগ দিতে দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠলো শিবানী। বললো, বকি আর ঝকি, দায় তো নিতেই হবে! নিলামও। ক'দিন দারুণ ভাবলাম। বাচ্চাটাকে কি করি? শেষে একদিন হঠাৎ বিস্মিত হয়ে দেখলাম নিজের ভেতরেই কখন যেন একটা আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে, বাচ্চাটাকে আমি নিয়ে আসি।

আপনার কতদিন বিয়ে হয়েছে?

তা আট বছর পার হতে চললো। অনেকগুলো বছর বাড়িয়ে বললো শিবানী। ডক্টর ভৌমিক যেন ওর আকাঙ্ক্ষাটার প্রতি আরো বেশী মমতাময়ী হন।

ডাক্তার ভৌমিক দরদের সঙ্গে বললেন, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইউ।

একটু ব্যথা, একটু লজ্জা মেশালো শিবানী হাসির সঙ্গে। মনে মনে ললিতাকে ডেকে বললো, ললিতা, তোমাকে একদিন বলেছিলাম, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কথাটা শুনতে আমার হাস্যকর লাগে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নয় কে? দেখ কেমন অভিনয় করছি! দরজা, জানালা বন্ধ, গরম লাগছিলো শিবানীর। গায়ের শালটা ঠেলে ফেলে দিয়ে বললো, এ-প্রস্তাবে মিঃ সেন যে সম্মত হবেন না, বুঝতেই পারেন। তাই এ-পথটা আমি বেছে নিয়েছি।

ডক্টর ভৌমিক মাথা নেড়ে বললেন, গুড্‌।

তবে অন্যায় করছি না তো আমি।

অন্যায় কোথায়? একটা অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করছেন, একটা শিশুকে আশ্রয় দিচ্ছেন, এতো উঁচু দরের কাজ। আপনাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি বলুন?

আঃ— একটা স্বস্তির স্রোত বয়ে গেল শিবানীর মনে। বললো, কি বলে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, ভেবে পাচ্ছি না। ভালো কাজে তো ভালো না হ'লে সঙ্গী পাওয়া যায় না। তাই ভয় ছিলো মনে। আপনাকে এখন যা করতে হবে, তা হ'লো ব্যাপারটা সত্যি হ'লে মিঃ সেনকে এখন গিয়ে যা বলতেন, সেই কথা বলা। বাস্‌ আর সব আমি সামলাব।

ডক্টর ভৌমিক বললেন, আমি বিশ্বাস রাখি আপনি সুষ্ঠুভাবেই সব সম্পন্ন করতে পারবেন। মিঃ সেন বলছেন ক'মাস তিনি ঠিক বলতে পারছেন না। তাকে ক'মাস বলব বলুন— যদি অবশ্য জানতে চান। আর না বলে পালাতে পারলে তাই পালাব। আপনি অবস্থা বুঝে - বলবেন আপনার সুবিধেমতো।

ছ'মাস বলবেন।

ডঃ ভৌমিকের মনে যদিও প্রশ্ন উঠল স্বামীর কাছে এ মিথ্যাটা কী করে চালাবেন মিসেস সেন। কিন্তু তবু তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। মিসেস সেন যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই এর পেছনেও কারণ রয়েছে—। তাই সে কথায় আর গেলেন না। বললেন, ঠিক আছে। তাই বলব। কিন্তু এখানে থেকে কিছুতেই শেষরক্ষা করতে পারবেন না। আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে। মা আছেন?

হ্যাঁ। আমি মার কাছে চলে যাচ্ছি। আপনি বললেন তো, সাত মাসেও বাচ্চা হয়? বাচ্চাটা হ'য়ে প্রি-ম্যাচুয়র ডেলিভারী বলে বাচ্চা নিয়ে চলে আসব। হবে না?

একদম সব ঠিক আছে। চমৎকার, ঠিক আছে। ডক্টর ভৌমিক উঠে শিবানীর পিঠ চাপড়ে বললেন, সাবাস মেয়ে। আচ্ছা, শুভেচ্ছা রইলো আমার। চলুন দেখি এবার আপনার কর্তার কাছে। যেটুকু আমার করার, করে যাই।

দাঁড়ান— বলে চঞ্চল পায়ে শিবানী টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার টেনে একটা চেক বই বার করলো। তাতে নামের জায়গায় সেলফ লিখে পাঁচ হাজার টাকার অঙ্ক বসিয়ে খস্‌খস্ করে নাম সই করলো। তারপর চেকটা টেবিলের ওপরে রাখা ডক্টর ভৌমিকের ব্যাগে ভরে, ব্যাগটা তুলে দিলো তাঁর হাতে।

ডক্টর ভৌমিক ব্যাগ থেকে চেক টা বের করে কতক্ষণ দেখলেন। তারপর চেক টা নাড়তে নাড়তে বললেন, এটা ঘুষ দিলেন?

ছি ছি করে উঠলো শিবানী। বললো, আপনার নার্সিংহোমের দু-একটা 'ইকুইপমেন্টস' কেনার জন্যে এ-টাকা। এ তো আমাদেরই উপকার। আর আমি বুঝতে পারছি, আপনি বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

গুম হয়ে একটুকাল চিন্তা করলেন ডঃ ভৌমিক। তারপর বললেন, নিলাম মিসেস সেন। একটা নিজস্ব এক্স- রে মেসিন হয়ে যাবে আমাদের নার্সিং হোমের। আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালো কাজে সাহায্য করছি, হাত বাড়িয়ে শিবানীর হাত ধরে হ্যাণ্ড-সেক করলেন তিনি।

শিবানী বললো, নিশ্চয়।

দরজা খুলে ইন্দ্রনাথকে সংবাদ দেওয়া হ'লো। ইন্দ্রনাথ আসতেই ডক্টর ভৌমিক তাঁর বড় পুরুষালি ঘড়িটা দেখে নিয়ে ত্রাসভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, ও মাই গড, সো লেট্। আমার আবার একটা অপারেশন কেস রয়েছে! শুনুন মিঃ সেন। আমি থরোলি এক্সামিন করেছি মিসেস সেনকে। সি ইজ কোয়াইট অল রাইট। চলতে সুরু করলেন তিনি।

ইন্দ্রনাথ ভিজিটের টাকা তার হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওষুধ পত্রকিছু—

এ-সময়ে আমরা ওষুধ দেওয়াটা খুব পছন্দ করিনে। ভালো আছেন, আবার ওষুধ কি? উনি মার কাছে যেতে চাচ্ছেন। আমি বলি, পাঠিয়ে দিন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন তিনি। মার কাছে গেলে ওষুধের চাইতে ভালো কাজ হবে। মার কাছে থাকাটাই এ সময়ে সব চাইতে ভালো চিকিৎসা। বাট সি, মাস্ট কাম বিফোর ডেলিভারী।

ইন্দ্রনাথের মনঃপূত হ'লো না কথাটা। সে বললো, এ সময় সর্বদা একটা, চেকআপের ভেতর থাকা উচিত তো? এখন কি—

এটা একটা সামান্য ব্যাপার। যে দু এক মাস ওখানে থাকবেন করিয়ে নেবেন চেক আপ কোনো ডাক্তার দিয়ে। তারপর উনি ফিরে এলে আমি কেস টেকআপ করব। এ সময় মনের প্রফুল্লতার দিকটাই বিশেষ করে নজর রাখতে হয় মিঃ সেন, এটা মনে রাখবেন।

ডক্টর ভৌমিককে গাড়ীতে তুলে দিলো ইন্দ্রনাথ। তার গাড়ী বেরিয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগলো। গাড়ি বারান্দায় সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মৌসুমী ফুল হেলছে দুলছে বাতাসে। খুশীর প্লাবন মনের দুকূল প্লাবিত করে চলেছে ইন্দ্রনাথের, শুধু মাঝে মাঝে খচ্‌খচ্ করে মনের ভেতর কাঁটা ফুঁড়ে যাচ্ছে ঐ চিঠিটা। তার জীবনের একটা সুন্দর মুহূর্তে পত্রটা এসে যদি তালভঙ্গ করে না দিত তবে এখন সে শিবানীকে দু বাহুতে জড়িয়ে ধরে বিহ্বল হ'তে পারত। সে সুখটা কেড়ে নিল চিঠিটা। হয়তো শিবানী ডাক্তার চলে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। গেলে অপদস্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে— একবাড়ি চাকরবাকরের সামনে। আর যদি দরজা বন্ধ না করেও থাকে, তাকে দেখেই শিবানী যে পর্যন্ত বিরাগ বোধ করছে—না, না, ভাষা মোলায়েম করে লাভ নেই। বিরাগ নয় ঘৃণা করছে শিবানী এখন তাকে। যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো ইন্দ্রনাথ 'ঘৃণা' শব্দটা নিজের প্রতি প্রয়োগ করতে, তবু করল। নিষ্ঠুরভাবে ভাবতে লাগল, শিবানী তাকে ঘৃণা করছে। লম্পট ভাবছে। সহ্য করতে পারছে না তাকে সে। ওকে দেখলে সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকছে। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকছে। তার

কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্যই সে মার কাছে যেতে চাইছে— চোখের চারপাশের রং লাল হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের। মালীকে আসতে দেখে পদচারণের দিক পরিবর্তন করল সে। উত্তরে যাচ্ছিল, দক্ষিণে ফিরল। শিবানীর মন শান্ত হবার জন্যে কিছু সময় দিতেই হবে তাকে। তাই সব দিক থেকেই শিবানীর মার কাছে যাওয়াই এখন ভালো।

অবসাদে, অবসন্নতায় গা ছেড়ে চৌকির ওপর বসেছিলো নমিতা। বিরাট এক পুরোনো আমলের জমিদার বাড়ীর ঘরে ঘরে বাসিন্দে। হাঁটতে চলতে ওর ভয় করে। সবার দৃষ্টিই মনে হয় যেন লক্ষ্য করছে ওকে। সবার না করুক কারু কারু যে করে সেটা ও বেশ টের পায়। সেদিন লাবণ্য বৌদি তো তির্যকদৃষ্টি হেনে বলেই ফেললেন, পিলে রোগীদের মতো পেট বাড়ছে কেন গো তোমার। তাই ঘর ছেড়ে বেরোয় না। শুয়ে থাকে বসে থাকে অসুখের ওজুহরে। তেমনি বসেছিলো নমিতা চুপচাপ। হঠাৎ পিঠের ওপরে একটা মিষ্টি স্পর্শে চমকে পেছন ফিরলো। আরে শিবানী? বসে যাওয়া, ঢালা চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। শিবানী ওর পাশে বসে পড়লো। নমিতা বললো, 'আজই আসবি ভাবিনি রে। লিখেছিলি তো একটু দেরীটেরি হবে যেন না ভাবি।'

ভাবতে না করেছিলাম তাই বসে বসে ভাবছিলি?

শুধু বসেছিলাম।

মাসিমা কোথায়? রতন কোথায়?

মা কলতলায় জলের জনে বোধ হয় ঝগড়া বাধিয়েছেন। আর রতন! এদিক ওদিক তাকাল নমিতা, ছিল তো এখানেই। বোধ হয় রাস্তায় খেলছে।

তবে এই অবসরে আমরা কাজের কথা সেরে ফেলি। আমি ঠিক করেছি আমার মার কাছে তোকে নিয়ে যাবো। আমার মা গিরিডিতে একা থাকেন। দাদারা যার যার চাকরীর জায়গায়। আমার মার কাছে তোদের কোন সঙ্কোচ বোধ হবে না। নিজের মা বলে বাড়িয়ে যে বলছিনে তা গেলেই বুঝবি।

'মেয়েকে দেখেই মাকে বুঝতে পারছি।'

একহাতের তালুর ওপর একপাঁজা বাসন, অন্যহাতে একবালতি জল নিয়ে নমিতার মা চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকলেন। নরেনদের বৌটা হয়েছে এক নম্বরের নচ্ছার মাগী। ঘাড়ে পিঠে দুটো বাল্‌তি— শিবানীকে দেখে থেমে গেলেন তিনি।

শিবানী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মাসীমা ভালো আছেন তো?

শিবানীকে দেখে তাঁর মুখে যে খুশী দেখা দিয়েছিল, শিবানীর গলা শুনে তা নিবে গেল। বিরস মুখে হাতের বাসন নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন— 'আর ভালো! দেখছো তো মেয়ের চেহারা কি হচ্ছে দিনকে দিন। কেবল শুয়ে থাকে। কি যে হ'লো বুঝতেই পারিনে।

হাঁ মাসীমা, আমিও দেখছি নমিতার শরীরটা একেবারেই ভালো নেই। তাই বলছি আমার মা গিরিডি থাকেন। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা ওটা। আমি যাচ্ছি মার কাছে। আপনারা আসুন না আমার সঙ্গে? খুব ভালো চেঞ্জ হবে।

আমাদের কি সে অবস্থা মা? কত টাকা লাগবে!

সেজন্যে আপনি ভাববেন না। নমিতার সঙ্গে আমার সে কথা হয়ে গেছে।

টাকার কথা ভাবতে না করে যদি কেউ ব্যবস্থার ভার নেয়—তবে— আর কথা কি? তবু বললেন তিনি, তুমি আর কত করবে মা?

কথাটা যেন শুনতে পায়নি এমনি করে শিবানী বললো, আজ আমি যাচ্ছি মাসীমা। আমি গিরিডি গিয়েই জানাব আপনারা চলে আসবেন।

একটু চা খেয়ে যাবে না?

আজ তাড়া রয়েছে—মাসিমা। আজ থাক।

মা আর কিছু বললেন না। শিবানী উঠে পড়লো।

নমিতা ওর সঙ্গে সঙ্গে এলো। শিবানী বললো, এখন এ-পর্যন্তই মাসীমার জানা থাক। পরে সময়মত বাকিটা বলা যাবে। এখানকার চাইতে অপরিচিত জায়গায় যখন লোকলজ্জার ভয় থাকবে কম তখন সামলাবেন সহজে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো নমিতা।

শিবানী বললো, 'আমি গিয়ে ব্যবস্থা করেই তোকে চিঠি দেবো। আমার চিঠি পেলেই তুই মাসীমাকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়বি। অবশ্যি আমি কাচ্চিকে পাঠিয়ে দেবো তোদের নিয়ে যেতে? কেমন ঠিক আছে?' মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল নমিতা। তাহলে আসি। শিবানী চলে গেল।

নমিতা মনে মনে বললো, এমন বন্ধু মেলে বহুজন্মের তপস্যার ফলে।

॥ ৩১ ॥

ট্যাক্সি করে নমিতার কাছে গিয়েছিল শিবানী। যদিও ইন্দ্রনাথের ডিমলার গাড়িটা গাড়িবারান্দার তলায়ই দাঁড়িয়েছিল এবং ওকে দেখে ড্রাইভার নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরেছিল তবু সে গাড়িতে শিবানী ওঠে নি। ইন্দ্রনাথের এ গাড়িটাতে কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর যেতে পারে কিন্তু নমিতার কাছে যেতে পারে না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ যেন কেমনতর একটা নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগের বাসনা জাগল শিবানীর। এই ডিমলারটা করেই যাবে নমিতার কাছে। গাড়িটা দেখে নমিতার দু চোখ ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠবে। গাড়ির নম্বর দেখার তার কোন দরকার হবে না এমনি চেনা সে চিনবে গাড়িটাকে। সে চেঁচিয়ে উঠবে।

তারপর?

তারপর নমিতা কি— পাগলের মতো রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাকবে?

না কি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করবে!

না কি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচাতে থাকবে, এ কার গাড়িতে তুই এসেছিস শিবানী — শীগ্‌গির বল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ও তখন নমিতাকে টেনে নিয়ে গাড়িতে তুলবে। নিয়ে আসবে এখানে। ইন্দ্রনাথের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলবে, এঁর গাড়িতে গিয়েছিলাম তোর কাছে। আর পরিচয় করিয়ে দি তোর সঙ্গে। তুই যাকে চিনিস না কিন্তু ঘৃণা করিস, এই দেখ আমি তাকে চিনি এবং তিনিই আমার স্বামী। দেখ তোর সেই জঘন্যতম ঘৃণার মানুষের সঙ্গেই ঘর আমার। মরতে যাচ্ছিলি তো? এখন তুই-ই বল মরা উচিত তোর না আমার?

যদি এরকম করে তবে ইন্দ্রনাথের দশাটা কী হয়? সে আতঙ্কিত হয়ে দেখবে কাশ্মীরী মেয়ের ব্যাপার এটা নয়। মনে রাখবার মূল্য পর্যন্ত যে ঘটনাকে সে দেয় নি— দিলে সে যখন ওর কাছে মার্জনা ভিক্ষার জন্য এসে সেধে কাশ্মীরী মেয়ের কথাটা বলেছে তখন এটাও বলত। এ ঘটনাটাকে ইন্দ্রনাথের স্বীকৃতিযোগ্য মনে হয় নি। রাস্তার ব্যাপার রাস্তায়ই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেমালুম ভুলে গেছে। স্বপ্নেও ভাবে নি তার জীবনের সেই আকস্মিক ঘটনা অকস্মাৎ রাস্তা থেকে উঠে এসে সোজা তার ঘরে ঢুকে সামনে দাঁড়াতে পারে এমন চেহারা নিয়ে, যাকে শুধু স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভেতর দিয়েই শেষ করে দেওয়া যাবে না। শিবানীর শত ক্ষমাও যা ধুয়েমুছে নির্মল নির্মুক্ত করে ফেলতে পারবে না—তখন কেমন চোখে তাকাবে ইন্দ্রনাথ ওর দিকে বিহ্বল ভাষাশূন্য চোখে? ইন্দ্রনাথের সেই ভীত ভাষাহীন চোখ শিবানীকে বেশ তৃপ্ত করতে লাগল। নিষ্ঠুর চোখে সে পথের দিকে নয়, যেন ইন্দ্রনাথের বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হাঁটতে লাগল। এতক্ষণে মনে হলো এখানে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির অপেক্ষা করে কোন পাগল। এ রাস্তায় তো কেবল ব্যক্তিগত গাড়ির স্রোত। তাকে আরো দুটো রাস্তা পার হয়ে মোড়ে দাঁড়াতে হবে। তাই গেল সে। একসময় ট্যাক্সি পেলো এবং ট্যাক্সি চেপেই সে নমিতার কাছে গেল।

কিছুই নয়। নমিতার প্রতি মমতায় ও বিবেচনায় বাস্তব ক্ষেত্রে যা শিবানীকে নীরবে সয়ে যেতে হচ্ছিল, মনের ক্ষেত্রে তা শিবানী সহ্য করে উঠতে পারছিল না। তাই কল্পনায় ইন্দ্রনাথের প্রতি কিছু ছুরি চালিয়ে নিল। নমিতাকে টেনে এনে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আক্রমণ চালাব—এই যে নমিতা, তুই যাকে চিনিস না কিন্তু ঘৃণা করিস এই দেখ আমি তাকে চিনি এবং সে আমার স্বামী। তোর জীবনের সেই ঘেন্নার মানুষটার সঙ্গেই আমার জীবন জড়িয়ে তুই যার গাড়ি দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠিস, আমি তার ঘরে বাস করি। তুই-ই বল, মরতে যাচ্ছিলি তার প্রয়োজন কার? তোর না আমার—?

কথা তো নয় যেন নেপালী ছুরি চালিয়ে নিল শিবানী ইন্দ্রনাথের উপর। সমস্ত শরীর থেকে রক্ত ঝরছে দেখতে পাচ্ছে।

নমিতার কাছ থেকে ঘুরে এসে গেটে ঢুকতেই শিবানী দেখতে পেল ইন্দ্রনাথ গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে। এ অপেক্ষা তার জন্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অফিস যাবার সময় হয়ে গেছে, প্রস্তুত হয়েছে ইন্দ্রনাথ অফিসের পোষাকে কিন্তু শিবানী না আসা অবধি যেতে পারছে না। দু ঘণ্টা বাদেও যদি আসত তবু দেখতে পেতো ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে বা পায়চারি করে ওর অপেক্ষা করছে প্রত্যাবর্তন না দেখে সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

গাড়ী এসে গাড়িবারান্দায় থামলো। মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়ে দিল শিবানী। শিবানীর সঙ্গে চলত চলতে কথা বলছিল ইন্দ্রনাথ। দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে গিয়েছিল ওরা। শিবানী এবার উপরে উঠে যাবে। ইন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলল। বললো, তুমি মার কাছে যাবে বলছ, ডাঃ ভৌমিকও সেদিন বলে গেছেন তোমাকে কিছুদিনের জন্য মার কাছেই পাঠাতে—এর উপর তো আর কথা চলে না। তা কতদিন থাকতে চাও?

এ কিছুদিন।

একমাস? দু মাস?

এই রকমই—

কিন্তু তার বেশী দেরি করতে পারবে না। ডাঃ ভৌমিক বলে গেছেন বিফোর ডেলিভারি তোমাকে এখানে চলে আসতে! কবে যেতে চাও?

আজ, কাল পরশু যেদিন হয়—

একটু ম্লান হাসল ইন্দ্রনাথ। বললো, আজ হবে না। কালও নয়। তবে এ সপ্তাহের ভেতরই তোমাকে আমি নিজে গিয়ে গিরিডিতে রেখে আসব। আচ্ছা চলি—কথাটার সঙ্গে একটু হাত তুলেই পেছন ফিরল ইন্দ্রনাথ। কোটের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে এবার অফিসে যাওয়ার পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে।

শিবানী তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথের চলে যাওয়ার দিকে। একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার অন্তর চিরে — কি ভালো কিন্তু কি মন্দ। ভালো মন্দ দুটো দিক যেন জট পাকিয়ে আছে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে— ও এ জট ছাড়ায় কী করে!

ইন্দ্রনাথ তার কথামতো সে সপ্তাহেই শিবানীকে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলো মার কাছে। যতরকম ব্যবস্থা করবার তাও করে এলো। শিবানীর মাকে বলে এলো প্রতি মাসে ডাক্তার দেখানোর কথা।

কী সুন্দর শহরটা। এতো থেকেছে তবু ভুলে গিয়েছিল শহরটাকে। এমন সুন্দর শহর তার উপর মাও রয়েছেন এখানে—ও আসে না কেন ঘুরে ঘুরে এখানে? কেন আসে না এই মুক্ত আকাশের তলায় ছুটে? যতই নির্দয় আর অত্যাচারী মা হোক শিশু যেমন মার কাছে থাকতে ভালোবাসে, মাকেই চায়, যৌবনও বোধ হয় তেমনি স্বামী যেমনই হোক না কেন তার কাছে থাকতেই ভালোবাসে। তাকেই চায়। নিশ্চয়ই তাই—নইলে আর কী?

শিবানীর ইচ্ছে করতে লাগল, কেবল মাঠে পাহাড়ে ঘোরে নয়তো ওদের বকুলতলার নির্জন বেদীতে চুপচাপ বসে লালমাটির পথ আর পাহাড় দেখে। কিন্তু ওতো অবসর কাটানোর জন্য আসেনি। এসেছে বিরাট দায় নিয়ে। মাঠ, পাহাড়-নির্জনতা এ সব উপভোগের সময় কোথায় তার হাতে? প্রথমে মাকে সব বলতে হবে। তারপর কাজের ব্যবস্থায় নেমে পড়তে হবে যতশীঘ্র সম্ভব।

মেয়ের কথা শুনে মা হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন। তার হাতের কাজ থেমে গেল। তোর ছেলেমেয়ে হচ্ছে না—

হবে। তবে এখন হচ্ছে না।

এ সমস্তই তোর মিথ্যাগল্প সাজানো?

উপায় কী মা? শুনলে তো সব মিথ্যা ছাড়া যখন কোন পথ থাকে না তখন মিথ্যাকেই বরণ করে নিতে হয় বৈ কি।

মা যুক্তিটা না মানার ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, একজনের সন্তানকে ঘটনা সাজিয়ে আর একজনের উপর চাপিয়ে দেওয়া—না, আমি তোমার এ কাজ কিছুতেই সমর্থন করতে পারছিনে শিবানী।

শিবানীর মুখ কালো হয়ে উঠল। মা'র কাছ থেকে যেন এমনটা আশা করে নি শিবানী। বললো, তুমিই বল কী করার ছিল আমার?

আমার কাছে যেমন বললে ইন্দ্রনাথের কাছেও তেমনি সত্যকথা বলা উচিত ছিল। দেখতে সেই তোমাকে সাহায্য করতো।

বিদ্রূপে ঠোঁট শাণিয়ে তুললো শিবানী. ক'জনকে দেখেছ তুমি এমন সাহায্য করতে, একজনও কী?

সচরাচর এমন ক'টা ঘটে যে দেখব।

ঘটে মা, অনেক ঘটে। দেখনি তার কারণ কেউ সাহায্য করতে আসেনা এঁদের। এঁরা হয় নিজেরা মরে। নয়তো বাচ্চাটাকে মারে।

সত্য একসময় প্রকাশ হবেই। তখন কি করবে শুনি?

তখন? তখন কী করব? দু চোখ যেন জ্বলে উঠল শিবানীর। রক্তশূন্য শুকনো দু'গালের ঝলক দিয়ে যেন রক্ত উঠে এলো। দু ঠোঁট অত্যন্ত কঠিন রেখায় উঠল সংবদ্ধ হয়ে—কিন্তু আস্তে আস্তে সব শান্ত করে ফেলল সে। উত্তর তার ছিল। বলতে পারতো সে, সত্য যদি একদিন নিজের গরজে প্রকাশ হয় মা, তবে সেদিনের জন্যে ভয় পেয়ো না। সেদিন তোমার মেয়ের দুই চোখের দিকে তাকিয়ে তোমার জামাই-এর চোখ মাটির দিকে নেমে আসবে।

কিন্তু তা হলে তো সব কথা বলাই হয়ে গেল। তারপর নমিতাকে রক্ষা করা সহজ হয়ে যাবে ঠিকই। কিন্তু ইন্দ্রনাথকে রক্ষা করা হলো কই।

সব গরল একাই পান করবে সে— একটু ক্ষীণ হেসে বললো, অতদূরের কথা ছেড়ে দাও মা। আমি এতদূর এগিয়েছি এখন আর পিছোবার উপায় নেই। শ্বশুরবাড়ি থেকে আত্মীয়বন্ধু সবাই এখন জানে। সত্য প্রকাশ করার কোনো উপায় নেই। বরং কোনভাবে যদি সত্যটা জানা যায় তবে আমাকে বিষ খেতে হবে। যতদূর এগিয়েছে তাতে যে সত্যি ফিরবার উপায় নেই মনে মনে সেটা মা বুঝলেন। চুপ করে রইলেন তিনি।

শিবানী বললো, একেবারে সময় নেই মা এখন কাজে লেগে পড়তে হবে। তুমি আমাকে সাহায্য করো মা। তোমার দিকে তাকিয়েই এখানে এসেছি।

বন্ধুকে কোথায় রাখবে? এ বাড়িতে তো না। তোমার দাদারা হঠাৎ যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন।

না—এ বাড়িতে রাখবো তা কী হয়— সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল শিবানী।

বললো, ওদের আলাদা বাড়িতে পাঠাব। তাই আমাদের সব প্রথম একটা ঘর দেখতে হবে। পাওয়া যাবে তো মা?

এখানে বাড়ি পাওয়া কিছু শক্ত নয়। খালি কত বাড়ি পড়ে রয়েছে। পেয়ে যাবে। কিন্তু ব্যবস্থা? তুমি কী ভেবেছ একটা বাচ্চা হওয়া চাট্টিখানি কথা? কত বিপদ আছে—

না না, সে কী ভাবতে পারি। আর এমনি চাট্টিখানি কথা যদিও হয়, এ সব ক্ষেত্রে যে পর্বতপ্রমাণ কথা, আমার চাইতে কে এখন বেশী টের পাচ্ছে। তাই না তোমার কাছে এসেছি। তুমিই এবার আমায় পাহাড় পার করে দেবে।

আগে বাড়িব ব্যবস্থা করে ওদের নিয়ে তো এসো। তারপর দেখি কি করে কি করা যায়।

তিনচার দিন ধরে সকাল-বিকাল মা-মেয়ে কাচ্চিতে মিলে কেবল বাড়ি দেখল। খালি বাড়ি প্রচুর রয়েছে কিন্তু বাড়ি হলেই হলো না। ওদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত হতে হবে। বিশ বিঘা ত্রিশ বিঘা জমির উপর আগের দিনের বড়লোকদের আগাছা জঙ্গলে ভরা আরাম নিবাস হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব জায়গায় পুরুষ অভিভাবক ছাড়া থাকা নিরাপদ নয়। বাড়িগুলি প্রায় ফাঁকা মাঠের উপর। তা ছাড়া ওদের দেখাশুনা করতে হবে; অতদূরে হলে ওরা পেরে উঠবে না। আবার ঘিঞ্জি পাড়ায় যাওয়া চলেই না।

সেদিন ওরা তিনজন বাড়ি দেখে ফিরছিল, পথের মাঝখানে হঠাৎ বিস্ময়ে থেমে পড়ল শিবানী। বললো, কাচ্চি দেখ তো, অরুণবাবু আসছেন না?

ম্যানেজারবাবু! বল কী মা! কই? দৃষ্টিটাকে যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে দিল কাচ্চি সামনের দিকে। কই দেখছি না তো মা?

ঐ সামনের গলিটায় ঢুকে গেছেন, আমি ঠিকই দেখেছি। তুই দৌড়ে গিয়ে ধর—শীগগির যা।

কাচ্চি ছুটল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন অরুণ কে? ইন্দ্রনাথের সেই ম্যানেজার?

হ্যাঁ মা। ভদ্রলোককে যদি পেয়ে যাই তবে এ সময় যে কী উপকার হবে আমাদের—ইস্ ভাবতেও পারছি নে আমি এমন সৌভাগ্য—

অনেকটা চলে গিয়েছিল অরুণ —কাচ্চি হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ধরল তাকে। জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে পেছন থেকে ডাকল ম্যানেজারবাবু...ও....

অরুণ থেমে পড়ে পেছন ফিরল। কাচ্চিকে দেখে সেও আশ্চর্য হলো কম নয়। বললো, কাচ্চি, তুমি এখানে?

আমরা এখানে এসেছি। মা আপনাকে ডাকছেন।

মা ডাকছেন? তিনি কোথায়?

ঐ বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে। মা-ই আপনাকে দেখতে পেয়ে ডাকতে পাঠালেন। বললেন, ঐ দেখ কাচ্চি অরুণবাবু যাচ্ছেন। শীগগির দৌড়ে গিয়ে ধর। আসুন।

চলো।

কাচ্চির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একটু অবাক লাগতে লাগল অরুণের।

ওর মনের কোথায় যেন একটা ধারণা ছিল মিসেস সেনের সঙ্গে ওর আবার দেখা হবে।

॥ ৩২ ॥

কাচ্চির সঙ্গে শিবানীদের কাছে এসে দাঁড়ালো অরুণ। চেহারার মিল দেখে বুঝতে পারলো, শিবানীর পাশে দাঁড়ানো মহিলাটি শিবানীর মা। আর তা না হলেও বর্ষীয়সী যিনি তাঁকেই আগে নমস্কারটা জানান উচিত। শিবানীর মাকে নমস্কার জানিয়ে তারপর শিবানীকে নমস্কার জানাল অরুণ।

শিবানী ও তার মা দুজনেই প্রতি নমস্কার জানাল। শিবানী মাকে দেখিয়ে বলল, আমার মা।

হাসির উত্তরে অরুণ জানাল সেটা সে বুঝতে পেরেছে।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

একরকম তাই।

আমি কিন্তু কাজ নিয়ে এসেছি। এবং সে কাজে আপনার সাহায্য আমার খুব প্রয়োজন হবে।

বেশ। আমি এখানে থাকব কিছুদিন। আপনার যখন যা দরকার বলবেন।

আপনি কী কোন কাজে যাচ্ছিলেন?

কিছু না।

তবে চলুন না আমাদের বাড়ি?

চলুন।

কাচ্চিকে নিয়ে মা এগিয়ে গেলেন।

শিবানী অরুণের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলতে লাগল। বললো, আপনাকে যে কী ভীষণ খুঁজছিলাম —

কোথায় খুঁজেছিলেন?

কোথায় আর খুঁজব বলুন? খুঁজছিলাম মনে মনে। 'মনে মনে' শব্দটা কানে বাজল। সঙ্গে সঙ্গে তাই ব্যাখ্যা করল শিবানী, জানিনে তো কোথায় আছেন, কোথায় থাকেন কিছুই। তাই মনে মনে আপনার অন্বেষণ চালাচ্ছিলাম, কোথায় কোথায় আপনাকে পেতে পারি। হঠাৎ পথে পেয়ে গিয়ে এমন বিস্ময় লাগছে।

অরুণ হেসে বলল, এটা রাস্তা। এখানে অচেনা লোকের সঙ্গেই যে কেবল চলতে হয় তা তো নয়, চেনা লোকের সঙ্গেও দেখা হয়। বিস্ময়ের কী আছে?

চেনা লোকের সঙ্গে অবশ্যই দেখা হয় পথে। কিন্তু সে দেখাটা যদি প্রবাসে হয় এবং যাকে বিশেষভাবে চাচ্ছিলাম তার সঙ্গেই হয়, তবে আশ্চর্য নয়? আমার যেমন বিস্ময় লাগছে, তেমনি ভালো লাগছে। কি হালকা যে লাগছে আপনি বুঝতে পারবেন না।

ব্যাপারটা কী বলুন তো?

বলব। কিন্তু সব চাইতে আগে একটা বাসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে আপনাকে। আর তা এত তাড়াতাড়ি দিতে হবে যে, আজ হলে আজই।

এখানে বাসা পাওয়া খুব সহজ। কোন অসুবিধে হবে না।

মাও তাই বলেছিলেন। কিন্তু কই পাচ্ছি না তো। আপনার জানা আছে কোন বাড়ির কথা?

আছে।

তবে চলুন এক্ষুণি দেখে আসি। তারপর বাড়ি ফিরে চা খাওয়া যাবে।

তখনও সন্ধ্যার অনেক বাকী। মা আর কাচ্চিকে ডেকে ওরা বাড়ি দেখতে চললো। মা বললেন, তুমি কি হোটেলে উঠেছ?

না। আমাদের বাড়ি আছে এখানে।

তুমি গিরিডির ছেলে?

আমি গিরিডির ছেলে নই। আমার দাদামশাই এখানে একটা বাড়ি করেছিলেন। তিনি আমার মাকে তাঁর এই গিরিডির বাড়িটা দিয়ে যান। আমি নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি।

ঐ আমার জন্যই আসতে হয়েছে আপনাকে। আমার কাজ ছাড়া আপনার এখানে কোন কাজ নেই মনে রাখবেন।

অরুণ হাসল।

শিবানীকে কী প্রগলভ লাগছে?

লাগতে পারে। শিবানী সে বিষয়ে অচেতন নয়। ইন্দ্রনাথের পি-এর কাজ করেছে যে এক সময়, যাকে সে আদেশ করেছে অবহেলায়, তার সঙ্গে সামান্য হৃদ্যকণ্ঠে কথা বললেও তা প্রগলভতাব চেহারা নেবে। উপায় নেই। অরুণ এখন ওর কর্মচারী নয় যে অঙ্গুলীচালনায় আদেশ করে যাবে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনাটা এখন তার বন্ধুর কাছে সঙ্কটে সহযোগিতা চাওয়ার মতো। আর সত্যিই তো সে অরুণকে বন্ধুই ভাবছে। এর মধ্যে কোনো ছলনা নেই।

কিন্তু তিনচার দিন ক্রমান্বয়ে ঘুরে ঘুরেও বাড়ির কোন হদিশ করতে না পেরে হতাশকণ্ঠে শিবানী বলল, এই আপনাদের এখানে বাড়ি পাওয়া সহজ?

অরুণ চুপ করে রইল।

কিন্তু শিবানী নিজেই বলল, আপনি চুপ করে থাকলেও আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনার তরফে বলার কথা আছে। আপনি বলবেন, আপনার একটা বাড়ি চাওয়ার সঙ্গে যে এতো কিছু 'চাওয়া' রয়েছে তা কি আমি জানতাম। ছোট হওয়া চাই। একটু দূরে হওয়া চাই কিন্তু আবার খুব বেশী নয়। জায়গাটা হওয়া চাই লোকবিরল কিন্তু একেবারে জনশূন্য হতে পারবে না। কিছু ব্যবধানে, কিছু কিছু বসতি থাকবে।

কথা বলছিল ওরা শিবানীদের বসবার ঘরে বসে। কাচ্চি চা দিয়ে গেল। অরুণ চায়ে চুমুক দিল। শিবানীও পেয়ালাটা হাতে তুলল বটে কিন্তু মুখে তুলল না। অন্যমনে একটু বসে থেকে বলল, আপনি হয়ত খুব অবাক হচ্ছেন এই দেখে যে, একটা বাসা নেবো এর এতো বায়নাক্কা কেন? কারণটা বলি, তবেই বুঝতে পারবেন কেন এই বিশেষ খোঁজাখুঁজি। সংক্ষেপেই বলব। অবশ্যি বলার কথাও বড় কিছু নেই। আমার এক বান্ধবী একটা আকস্মিক—, থেমে গেল শিবানী। না, এভাবে বললে ইন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হয়। খুব যন্ত্রণা বোধ করে তাতে শিবানী। কথাটা ঘুরিয়ে বলল, ব্যাপারটা একটি কথায় হলো, আমার এক অবিবাহিতা বান্ধবী খুব বিপন্না। তাকে আমি বিপদ থেকে বাঁচাতে চাই। বুঝতেই পারছেন কুমারী মেয়ের জীবনে বিপর্যয় ঘটনাটা কী হতে পারে? মেয়েটি—

থামিয়ে দিল অরুণ শিবানীকে। তার বোঝা হয়ে গেছে। আর প্রয়োজন কী বিশদের? বলল, আমার বাসায় আসুন।

আপনার বাসায়?

আমি একতলায় থাকি। দোতলার ঘর খালিই পড়ে আছে। জায়গাটাও নির্জন।

শিবানী একেবারে লাফিয়ে উঠল। পেয়ালার চা চল্‌কে মেঝের উপর পড়ল। হাত থেকে পেয়ালা টিপয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এতদিন বলেন নি কেন। আর বলবেন কী ছাই। কেন যে বাড়ি চাচ্ছি জানতেনই তো— না।

তবে চলুন একবার দেখবেন বাড়িটা।

কিছু দরকার নেই। আপনার যখন মনে হয়েছে হবে, তখন হবেই।

অরুণ খালি চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, অবসর জীবনে দাদামশাই প্রায়ই আসতেন। তাই জীবনযাত্রার এক প্রস্থ উপকরণ এখানে সর্বদাই মজুদ থাকত। মালীও একটা আছে—

দাঁড়ান দাঁড়ান, উঃ। এতো সুব্যবস্থার কথা কল্পনাই করতে পারছিনে যে। সব বন্দোবস্তের উপর,—

আপনি সেখানে থাকবেন—আর কী চাই? এখন দেখুন, আমি মনে মনে কেন আপনাকে এত আরাধনা করছিলাম। বাড়ি বল বুদ্ধি সহায়— সব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

কাজ কি কারু জন্য ঠেকে থাকে। হয়েই যেত।

কখনও নয়। ছেলেমানুষি মাথাঝাঁকুনি দিল শিবানী। একেবারে আমাদের দাদামশাই-এর আমলের মতো কথা বলা হলো এটা। "কাজ কারু জন্য ঠেকে থাকে না।" "জন্ম দেন যিনি, আহার দেন তিনি।" কিন্তু জন্ম দেন যিনি আহার তিনি দেন না। না খেয়ে সব চাইতে বেশী শিশু মরে আমাদের দেশে। এবং কাজের নৌকোও ঠেকে যায় সাহায্য ও সহযোগিতা না মিললে। মা যদি বেঁকে বসতেন, ডাক্তার ভৌমিক এবং আপনার সহানুভূতি যদি না পেতাম, তবে— আমি কী পারতাম একা?

তবে এ বন্দোবস্তই পাকা?

তা আর বলতে। কাচ্চিকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, কালকের সকালের গাড়ীতেই ওদের নিয়ে আসবার জন্য।

নমিতাকে দেখে একেবারে স্পষ্ট যেন চমকে উঠল অরুণ।

এই মেয়েটিকে সে চেনে।

ইন্দ্রনাথের বাগানবাড়ি থেকে অর্ধ-অচৈতন্য এই মেয়েটিকে তারই বাড়ি পৌঁছেদিতে হয়েছিল। দুর্যোগপূর্ণ ঝড়-বৃষ্টির রাতটা ভেসে উঠল চোখের উপর। সে দিন পর্যন্ত মেয়েটাকে যে সেই বা কী ভাবে পৌঁছে দিয়েছিল বাড়িতে, সে কথা অরুণেরও নমিতার মতই মনে নেই। নমিতা কি নিজেই হেঁটে গলিটা পার হয়েছিল, না অরুণকে ধরতে হয়েছিল মনে নেই। কারণ অরুণ তখন ফিরে গিয়েই পদত্যাগ পত্র দাখিল করে ইন্দ্রনাথের সব সংস্রব ত্যাগ করবার কথা ভাবছিল। যদিও সে যাত্রায় তার কাজ ছাড়া হয়নি। সে কাজ ছেড়েছিল, ইন্দ্রনাথ তার নামে ফ্ল্যাট নিতে চাওয়ায়। তাও অরুণ ছাড়েনি। ইন্দ্রনাথই তাকে বরখাস্ত করেছিল।

মালপত্র নামিয়ে কাচ্চি কুলির মাথায় তুলছে—শশব্যস্তে এগিয়ে এল অরুণ। মুটের মাথায় মাল তোলায় হাত লাগাল। মেয়েটি শিবানীর বন্ধু। কিন্তু ইন্দ্রনাথ যে একে চিনত না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কোন মেয়ে ভেবেই নমিতাকে যে ইন্দ্রনাথ গাড়ীতে তুলেছিল, এ অরুণ জানে। ঐ ঘটনাটাই কী মেয়েটির এই নিগ্রহের কারণ?— দলটির পেছন পেছন চলতে লাগল অরুণ— শিবানী বলেছিল বটে, আকস্মিক কোন ঘটনায়। শিবানী কি সব জেনে সাহায্য করছে, না, না-জেনে?

প্ল্যাটফরম পার হয়ে আসতে আসতেই নিজেকে সামলে ফেলল অরুণ। ভাবলে নমিতাকে দেখে তার এই চমক্ খাওয়া কেউ দেখল না। তার মুখের ভাবান্তরের রেখাও কারু চোখে পড়ল না। মালেপত্রে দুতিনটে রিক্সায় সবাইকে তুলে দিয়ে সেও একটা রিক্সায় উঠে বসল।

কিন্তু যার দেখবার সে ঠিকই দেখল। অরুণ অতি অন্যমনস্ক ছিল বলে, নইলে শিবানীর দিকে তাকালেই দেখতে পেত শিবানী তাকে লক্ষ্য করছে।

অরুণ যে ইন্দ্রনাথের পি, এ-র কাজ করছিল ঐ সময়ই—কথাটা ঠিক সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে একবারও তার মনে আসেনি। এবার এলো। গিরিডির রাস্তার লালমাটি উড়িয়ে রিক্সা চলতে লাগল। নমিতার সঙ্গে এটা ওটা কথা বলতে লাগল শিবানী, কিন্তু মুখে সে নমিতার সঙ্গে কথা বললেও মনে মনে ভাবছিল একেবারে আলাদা কথা—

যদি অরুণের বিষয়টা জানার সম্ভাবনার কথা ওর মনে আসত, তবে কী তাকে শিবানী ডাকত না?

ডাকত।

তার জানা আর না-জানার চেহারা তো এক।

এই একবারই অপ্রস্তুত মুহূর্তে চোখমুখের ভাষায় কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বাস্ ঐ পর্যন্ত। আর নয়। জিহ্বা তো নয়ই, অরুণের চোখের দৃষ্টিও আর একথা বারেকের তরে উচ্চারণ করবে না। এমন কি সব বৃত্তান্ত শিবানী জ্ঞাত না অজ্ঞাত এই স্বাভাবিক ঔৎসুক্যটুকুও সে প্রকাশ করবে না। আবশ্যকও হবে না। শিবানী যেমন অরুণের দৃষ্টি থেকে সবিস্তারে সব বুঝে ফেলল, অরুণও তেমনি ওকে দেখেই সব বুঝে নেবে।

নমিতার মা দস্তুরমত হক্‌চকিয়ে গেলেন। বাড়িঘর, সুব্যবস্থা তো আছেই; শিবানীর মত, শিবানীর মায়ের মত, অরুণের মত আশ্চর্য আশ্চর্য লোকগুলি পর্যন্ত সর্বক্ষণ ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। কেমন যেন অভিভূত

হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু বিহ্বল বোধ করলেও ভালোই কাটতে লাগল দিনগুলি। সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য, মানুষের মনোরম ব্যবহার— এসব তো ভুলেই গিয়েছিলেন। মেয়ের অসুস্থতার উদ্বেগও মন থেকে দূর হয়ে গেল। এখন ভালো হয়ে উঠবেই। এই কয়েক দিনেই তো স্পষ্ট দেখছেন, অনেক সজীব হয়ে উঠেছে নমিতা। শিবানীর সঙ্গে বেড়াতে যায়। তিনি বসে বসে নানা রকম ঝাল ভাজাভুজি করে রাখেন। ওরা-ফিরে এসে চায়ের সঙ্গেই আসর জমিয়ে খায়— বড় ভালো লাগে নমিতার মা'র। পরের দিন আবার ওদের কী ঝালভাজা করে দিয়ে আনন্দিত করবেন, তা নিয়ে দস্তুরমতো মাথা খাটান।

শিবানী অরুণকে জিজ্ঞাসা করে, এখন নমিতার মাকে তো জানাতে হয় কথাটা?

অরুণ বলে, লাভ কী? বুড়ো মানুষ আনন্দে আছেন। অযথা কতগুলি দিন বেশী যন্ত্রণা পাবেন।

থাকবে?

থাক।

শিবানী বুঝল, যখন জানবার দিন এসে হাজির হবে তখন জানবেন— এ কথাই অরুণ বলছে।

অরুণ আজকাল বলে।

এমনি স্পষ্ট মতামতে বলে।

শিবানী লক্ষ্য করছে, সে দিন নমিতাকে ষ্টেশনে দেখার পর থেকে— অরুণ যেন আরো আন্তরিক, আরো সুহৃদ হয়ে উঠেছে। সব কাজ, সব দায় একাই টেনে নিচ্ছে। শিবানী দেখে আর মনে মনে দুঃখের হাসি হাসে! অরুণ বেদনা বোধ করে ওর জন্য।

শিবানী বলল, কিন্তু হঠাৎ ধাক্কাটা বেশী হয়ে পড়বে না?

আঘাত আর আরোগ্য এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে এলে তাতে ক্ষতি হয় না।

হলোও ঠিক তাই।

নমিতার ব্যথা উঠল, দাই এলো, কাচ্চি এসে আসন করে শিয়রে বসল, শিবানী ঘরের দরজা বন্ধ করবার আগে এসে ছোট্ট করে বলে গেল—মাসিমা কিছু ভাববেন না আপনি। সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন কতক্ষণ হতভম্বের মতো নমিতার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি গিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। নিজেকে বোবা বুড়ি, নির্বোধ বুড়ি, অন্ধ হয়ে ছিলি, চোখে ঠুলি পরে ছিলি নাকি, বলে গাল দিতে দিতে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। ঠাকাস্ ঠকাস্ করে কপাল চাপড়াতে লাগলেন। অভিশাপ দিতে লাগলেন ভগবানকে—হতচ্ছাড়া একচোখে। দুঃখী মানুষের দুঃখের শেষ রাখো না; সুখী মানুষের সুখের উপর সুখ চাপাও। মানুষের মমতাটুকুও তো তোমার মধ্যে নেই— ফটোর উপর কপাল ঠুকতে লাগলেন, কি করব এখন আমি, কি করব—

অন্ধকার চারদিক। নির্জন নিস্তব্ধ। যদিও চেঁচাচ্ছিলেন জোরেই, তবু বাড়ীর মাঠ ছাড়িয়ে সে গলা বাইরে যাচ্ছিল না।

অরুণ অন্ধকার বারান্দায় ধীরপায়ে পায়চারি করতে লাগল।

এভাবে কত সময় যে পার হয়ে গেল অরুণও জানে না, নমিতার মাও জানে না। শিবানী বেরিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে অরুণকে, সব ঠিক আছে-বলে চলে গেল নমিতার মার কাছে। বলল, এ রকম করছেন কেন মাসিমা। কিছুই করতে হবে না আপনাকে— । মরা শিশু হয়েছে।

শিবানী যখন নমিতার মাকে— মৃত শিশু হবার সংবাদ দিচ্ছে, অন্যদিকে তখন কাপড়ে জড়ানো বাচ্চাটাকে বুকের তলায় চেপে ধরে কাচ্চি মাঠ পার হচ্ছে। চলছে আর শ্রীকৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে বাসুদেবের ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নদীপার হবার যে ছবিটা ওর ঘরে আছে, সেই ছবিটা চোখে ভেসে উঠছে কাচ্চির। তাই এতটুকুও ভয় হচ্ছে না তার। যদিও ভোরের আলো ফুটল বলে। কিন্তু এখনও তো তা ফোটেনি। অন্ধকারটাই বেশী।

কিন্তু এ তো পুণ্যকাজ। গতজন্মের সুকৃতি ছিল তার, তাই বাসুদেবের কাজ করছে। ভয় করবে কেন। বড় পা ফেলে লাল মাটির উঁচু পথ পার হতে লাগল কাচ্চি। যেমন— কংসের হাত থেকে কৃষ্ণ কে রক্ষা করেছিলেন বাসুদেব— আর ও শিশুটাকে রক্ষা করছে মানুষের থেকে এমনি দৃপ্তভঙ্গিতে।

শিবানীর মাও এ অপেক্ষায়ই করছিলেন। তাঁর কোলে শিশুকে তুলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল কাচ্চি, কি ভাবে দাইটা বাচ্চাটার মুখ চেপে ধরেছিল। ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল যদি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যায়? মা

গো। বুকে হাত রেখে নিজেকে আশ্বস্ত করল কাচ্চি। বলল, ঠেলে হাত সরিয়ে দিলাম দিদিমা, কি হবে কাঁদলে? শুনবার মধ্যে তো রয়েছে ঐ এক বুড়ি। তা সে তো ঠাকুরঘরে কপাল ঠুকেই মরছে। তারপর যেই না দিদিমা, মা-ছেলেকে নাড়ী কেটে দাইটা আলাদা করে দিল, আমি নিয়ে পালিয়ে এলাম। হাঁপাতে লাগল সে। গরম জল করতে হবে তো দিদিমা।

আমি বসিয়ে রেখেছি। তুই নিয়ে আয়।

কাচ্চি দৌড়ল রান্নাঘরে।

মা যেখানে শিশুস্নানের যোগাড় রাখা ছিল সেখানে নিয়ে বসলেন বাচ্চা নিয়ে স্নান করাবার জন্য।

॥ ৩৩ ॥

একটা মাস ঘূর্ণি হাওয়ার ভেতর কুটোটার মত কেবল পাক খেয়েছে শিবানী। আজ সে বকুল গাছের তলায় সিমেন্ট বাঁধানো চত্বরে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসেছে শুধু একটু চুপচাপ বসে থাকার জন্য।

নিচু পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। পথ থেকে দেখা যায় সদর, অন্দর সবই। কিন্তু পাহাড়ের গা ঘেঁষা ওদের এই বাড়িটার পাশ দিয়ে একটামাত্র পায়ে হাঁটার পথই চলে গেছে, সে হলো সাঁওতালদের গ্রামে যাবার। পথ তো নয় যেন একটা রক্তবর্ণ রেখা— চলে গেছে এঁকেবেঁকে। এই সিঁদুর রং -এর বাঁকা রাস্তা আর তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলা নারী-পুরুষ দুটোকেই ছবির মত লাগে শিবানীর। ওদের দেখতে ওর ভালো লাগে।

বেলা পড়ে গেছে। বেচাকেনা শেষে মাটির পথ দিয়ে ওরা ওদের মাটির ঘরে ফিরছে। কাঁধে ঝোলানো তাদের বাঁশের বাঁকে ঝুড়ি, ডালা, চেঙ্গারি বা লাঠির ডগায় বাঁধা বোঁচকাবুচকি। কিছু মেয়ের পিঠে কাপড়ের ডোঙ্গায় বাঁধা বাচ্চা। মেয়েগুলি হাসছে। কল্‌কল্‌ কণ্ঠে কথা বলছে। দুহাত ডাইনে বাঁয়ে ছড়িয়ে হেলে দুলে চলছে। কদাচিৎ দু-একজন শহরের দিকেও যাচ্ছে। কিন্তু তাদের গতি তড়িঘড়ি। যেন আকস্মিক দরকারে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে গ্রামটাকে কুয়াশা কম্বল চাপা দিয়ে ফেলবার আগেই ঘরে ফিরতে চায়।

এখন ওর-ও ঘরে যাবার পালা। সবই সুষ্ঠুমতো, সুন্দরমতো হয়ে গেছে। প্রথম দুতিনদিন অজ্ঞান হয়ে থেকে যদিও নমিতা খুব ঘাবড়ে দিয়েছিল ওদের, কিন্তু এখন সেও ভালর দিকে। আর ভাবনার নেই। কেবল সময় নেবে আরো কিছু। মা বলছেন, সে আমরা রইলাম। আমরা দেখব। তুমি আর দেরী করো না। ইন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাম করে দেও আজই। সাত মাসে বাচ্চা হলে তাকে তুলোয় করে পালতে হয় সেকথা তুমি জান না। ভরামাসে হওয়া বাচ্চাকে বিলিতি ফুড খাইয়ে আট পাউণ্ডের করে নিয়ে গিয়ে বলবে, তুমি প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি? এসব বিষয়ে কোন ধারণা নেই বলে তুমি এ ভাবতে পারছ। শিশু দিনে দিনে বাড়ে। পনেরো দিনেই।—

অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে গেছে বাচ্চার মুখে, তাই না মা? যদিও পরিহাস করেছিল মাকে শিবানী কিন্তু আর বিলম্ব করা যে চলে না সে নিশ্চয়। আজ না হোক কাল ইন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাম করে দিতেই হবে। আর টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র সে হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তার নার্স নিয়ে এসে উপস্থিত হলে এবং ওকে চলে যেতে হবে। শিবানী নিজেও ইন্দ্রনাথ এসে পড়ার পর আর একদিনও এখানে থাকতে চায় না। নমিতার সঙ্গে তখন কোন যোগাযোগ রাখতে চায় না, রাখবেও না। শুধু কি নমিতার সঙ্গে? অরুণের সঙ্গেও। অরুণের কথাও জানতে দেবে না ইন্দ্রনাথকে সে।

ভয়, ভাবনা, উৎকণ্ঠা— প্রতিদিন যেখানে কেবল ক্লেশ আর যন্ত্রণা বয়ে এনেছে, মনে হয়েছে দিনগুলি কেটে গেলে বাঁচে। আজ যাবার দিন ঘনিয়ে এলে সেই দুঃসময়ের দিনগুলিই মনের মধ্যে আশ্চর্য মোহ সৃষ্টি করতে লাগল শিবানীর। নমিতার হাঁটা দরকার। তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। উঁচুনিচু পাহাড়ী রাস্তা আর মাঠ ধরে কতদূর দূর চলে গেছে ওরা। বসেছে পাহাড়ী নদীর তীরে তীরে জলস্রোতের কাছে। দেখছে মাছের ঝাঁকের উল্টোস্রোতে মুখ রেখে লেজনাড়া। দেখেছে বকের ঝাঁকের আকাশ পাড়ি দেওয়া। শুনেছে পাখীদের সান্ধ্য-সুখের কিচিরমিচির শব্দের প্রেমকথন। চক্রবালের দিকে তাকিয়ে ভেবেছে, কোথায় শেষ? কি আছে শেষে?

উত্তর মিলত না।

দিগন্ত উত্তর দিত না।

উত্তর মিলত বাসায় এসে।

ঘরে ফিরে শাল-আলোয়ান মুড়ি নিয়ে বসে গরম চায়ের সঙ্গে গরম গরম ঝালভাজা খাওয়ার মতো তুচ্ছ একটা ব্যাপারের কাছে নৈসর্গিক প্রভাবের এই উচ্চ দার্শনিক জিজ্ঞাসা দাঁড়িয়ে পড়ত। ঝাল খেত শিসাতো, নুন জিবে দিয়ে দিয়ে ঝাল মারত, নমিতার মা শঙ্কিতকণ্ঠে বলতেন, দেখো মেয়ে আবার অসুখ বাধিও না।

নমিতা বলত, বাঙাল দেশের মেয়ে ঝাল খেতে চোখের জল ফেলিস।

শিবানী রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছত। সেই বোজা চোখের অন্ধকারে কিন্তু তখন এখানকার সবাই একাকার হয়ে মুছে যেত। সে দেখত নির্জন ঘরে ও একা, আর ইন্দ্রনাথ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর দিকে তাকিয়ে।

তার দু চোখ বেদনায় ভরা। আর তখন যে রক্তের উত্তাল ঢেউটা শিবানীর বুক থেকে উঠত তার মধ্যে যেন সেই ঘরে এসে দাঁড়িয়ে পড়া দিগন্তের 'শেষ কোথায়' প্রশ্নটা অবশেষে মিশে যেত।

কাশ্মীরী শালটা তুলে মাথা কান ঢাকল শিবানী। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। হাওয়াটা কনকনে। গায়ে শাল রয়েছে, তার তলায় উলের ব্লাউজ রয়েছে তবু যেন ভেতর পর্যন্ত কনকন করছে শীতে। কিন্তু ঘরে যেতে ইচ্ছে হলো না। মা ডেকে পাঠালেন। ও বলে দিল, কিছু হবে না। বল গিয়ে কত শীতের দেশ ঘুরলাম, ঠাণ্ডা লাগতে দেখেছেন মা।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আর কুয়াশা এক হয়ে অস্পষ্ট করে ফেলল চারদিক। সাঁওতালদের চলাচল বন্ধ হয়ে এলো। দু একজন যারা যাচ্ছে আসছে তাদের আর স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। খালি চায়ের পেয়ালাটা সরিয়ে সেখান দিয়ে পা টান করে দিল শিবানী। পিঠ রাখল বকুল গাছের গুঁড়িতে। তাকিয়ে রইল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের মাথায় কিছু কিছু তারা উঠেছে। কিন্তু আলো একেবারে চলে যায় নি বলে সেগুলো তেমন জলজ্বল করছে না। তারার ভাষায় ঠিকানা লেখার কথাও কবি ভেবেছেন। কিন্তু তারার ভাষা কি? তারার ভাষা তো কেবল চেয়ে থাকা।

বাঁশের বাঁশিতে একটা গ্রাম্য সুর বাজাতে বাজাতে একটা লোক দূর থেকে কাছে এসে আবার দূরে মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ পথ চলতি লোকগুলোকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তাদের দেখেছে। একদল মিলিয়ে গেলে আগত দলের উপর চোখ রেখেছে। দৃষ্টি নিয়ে বেশী দুর তো যেতে পারেনি। এবার বাঁশির সুরের সঙ্গে মন নিয়ে দূরে চলে গেল শিবানী। যেন সুরের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়ল সে। 'এ পথে আমি যে গেছি বারবার'— হ্যাঁ, বারবার যাতায়াত করেছে শিবানী এ পথ দিয়ে। ওদের বাড়ি থেকে নমিতাদের বাড়ি যাবার এটাই সব চাইতে কাটছাঁট দেওয়া ছোট রাস্তা—মানে মেঠোরাস্তা। অরুণের সঙ্গে এই মোহময় মাঠের পথ অনেকবার পার হয়েছে শিবানী। কখনো কুয়াশায়, কখনো অন্ধকারে, কখনে বা চাঁদের আলোয়। বেশীর ভাগই কেটেছে চুপচাপ। কথা যা হয়েছে তাও সামান্য। ও বলেছে, ডাক্তারবাবু কিছু সন্দেহ করছেন না তো? অরুণ বলেছে, দরকার কি তা দিয়ে আমাদের। তিন গুণ ভিজিট দেওয়া হচ্ছে, তিনি নিচ্ছেন এবং রোগী ভালো হচ্ছে। ব্যস। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পাহাড় প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে ও যদি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠেছে, কি সুন্দর! অরুণ শুধু একটু হেসেছে।

শিবানীর হঠাৎ মনে হলো অরুণের তখনকার সেই হাসির সঙ্গে আজকের এই দূরে চলে যাওয়া বাঁশির সুরের কোথায় যেন মিল আছে। জিনিসটা যে ঠিক কী বোঝাতে পারবে না ও। কিন্তু ভীষণ মিল লাগছে যেন শিবানীর। তারার ভাষা যেমন কেবল চেয়ে থাকা। অরুণের হাসি যেন তেমনি কেবল দূরে চলে যাওয়া। কিন্তু অরুণকে কখনোও শিবানী ওর মননের সামনে আসতে দেয় না। আজও দিল না। অরুণকে মনেপ্রাণে কামনা করেছিল সে এই দুঃসময়ে। ওর সেই চাওয়া সার্থক করে দিয়েছে সে। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই ওর। শিবানীর দুহাতের অঞ্জলি অরুণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরা।

শরীর অনুযায়ী জামার কাটছাঁটের মতো সমাজ অনুযায়ী চিন্তার কাটছাঁট করতে হয়। মানুষ যে এটা সচেতনভাবে করে তা নয়। বরং বেশীটাই তার অবচেতন মনের কাজ। মানুষ চেতন মনকেই সব ভেবে বসে থাকে। সে ভুলে যায় বা জানেও না আসলে। অবচেতন মনই সচেতন মনের নিয়ন্তা। অবচেতন মনও ভুল করে। কিন্তু নিশানাটা থাকে তার বিবেকের দিকে, বিবেচনার দিকে। মহত্ত্বের দিকে। তার কাঁটা সহজে হেলে পড়তে চায় না আর তাই না শিবানী দেখছে তার অঞ্জলি ভরা আছে কেবল সীমাহীন কৃতজ্ঞতায়, আর কিছুতে নয়।

অরুণ এসে দাঁড়াল চত্বরের উপর।

অরুণকে দেখে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে বসা পা গুটিয়ে, গাছে হেলান পিঠ তুলে উঠে বসল শিবানী। বলল, আসছেন একেবারেই দেখতে পাইনি। বসুন।

শতরঞ্জির একধারে বসে অরুণ বলল; এত কুয়াশা পড়েছে আজ যে চার হাত দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। যাবার সময় আমিও আপনাকে দেখতে পাইনি। গিয়ে শুনলাম আপনি এখানে। ঘরে যাবার জন্য অনেক ডাক হয়েছে কিন্তু যান নি। তাই না ভেবেচিন্তেই চলে এলাম এখানে।

ভালো করেছেন। তারপর একটু হাসল শিবানী। বলল, আপনি না ভেবেচিন্তে কিছু করেন না তাই আপনার চলায় ভুল নেই। আমরা কেবল মুডের বা ঝোঁকের মাথায় চলি আর ভুল চলি।

অরুণ বলল, কথাটা ঠিক নয়। ভেবেচিন্তে চললেই কি সব সময় চলা নির্ভুল হয়? ভাবনা ভুলপথে ভাবতে বসতে পারে। ভ্রান্তপথে পা ফেলতে পারে। তারপর আপনি হয়তো খুব সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে চলছিলেন কিন্তু সামনে যে ঘাসে ঢাকা কুয়ো বা গর্ত রয়েছে জানেনই না। দশ হাত পরে কি রয়েছে যেখান জানিনে, দশ মিনিট পরে কি হবে যেখানে বুঝিনে সেখানে আপনার না ভেবে চলা, আর আমার ভেবেচিন্তে চলা গড়ে পড়ে এক। অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ আর অজ্ঞাত ভবিতব্যের কাছে আমরা সবাই অজ্ঞ।

ঠিক— বলে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল শিবানী। যদিও দৃষ্টি চার হাতের বাইরে গেল না। ওরা যেন একটা ঘন কুয়াশার বৃত্তের মধ্যে বসে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শিবানী বলল, আমার যাবার সময় হলো। আমাকে দু এক দিনের ভেতরই চলে যেতে হবে। নমিতা ভাল হয়ে উঠলে আমি জানি আপনিই ওদের কলকাতা পৌঁছে দেবেন। ও নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে না—

আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম মিসেস সেন ঃ

কি বলুন তো? উৎসুক চোখে তাকাল শিবানী অরুণের দিকে।

নমিতা দেবীকে নিয়ে আপনি মোটেই আর ভাববেন না।

মোটেই আর ভাবব না!

না। একেবারে ভুলে যান আপনি তার কথা।

একেবারে ভুলে যাবো? ভীষণ বিস্ময় বোধ করল শিবানী।

হ্যাঁ। একেবারে ভুলে যাবেন। আপনার যা করবার ছিল, আপনি করেছেন।

তারপর কে করবে?

আমি।

আপনি?

হ্যাঁ, এবার আমার উপর ছেড়ে দিন। এখন থেকে ওদের ভার আমার।

সব সময়ের জন্য?

তাই নিলাম।

এ কথাটাই বলতে এসেছেন আজ আপনি?

তাই।

প্রস্তাবটার অভিনবত্বে একেবারে যেন হতভম্ব হয়ে গেল শিবানী। নমিতা ভালো মেয়ে। এ দু মাস একসঙ্গে থেকে নমিতাকে ভালোবেসেছে অরুণ? কিছু অস্বাভাবিক নয়, তার কথার তো এই মানেই একমাত্র হয়। উৎফুল্ল কণ্ঠে শিবানী বলল, বাঃ এ তো চমৎকার কথা। এর চাইতে ভালো আর কী হতে পারে! সত্যি, নমিতা অত্যন্ত মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে অরুণবাবু। আপনি সুখী হবেন নিশ্চয় ওকে নিয়ে।

হ্যাঁ, খুব ভালো মেয়ে নমিতা দেবী।

অরুণের জবাবটা কেমন যেন ভীষণ সাদাটে ঠেকলো শিবানীর কানে। বলল, ভালো মেয়ে আর ভালোবাসা তো এক কথা নয়। আপনি নমিতাকে ভালোবেসেছেন নিশ্চয়ই?

অরুণ চুপ করে রইল।

অরুণকে মৌন দেখে শিবানী বলল, কিন্তু আপনি ওকে ভালোবেসেছেন কিনা সেটা আমাকে জানতে হবে। তবে তো দায় চাপাব আপনার উপর।

এবার একটু হাসল অরুণ। বলল, ভালোবাসা শব্দটা সম্বন্ধে আমি একটু ফাস্টেডিয়াস। যথেচ্ছভাবে কথাটা বলিনে।

কিন্তু সব দায়িত্ব নিতে হলে আপনাকে তো বিয়ে করতে হবে নমিতাকে?

অবশ্যই করব।

কিন্তু কেন? ভালোবাসা শব্দটা নিয়ে আপনি যেখানে এত ফাস্টেডিয়াস, ভালোবাসার ব্যাপারে আপনি সেখানে কখনই উদাসীন হতে পারেন না। তবে যাকে ভালোবাসেন নি তাকে— বিয়ে করবেন কেন—আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।

অরুণ কি বলতে গিয়েও যেন বলল না। একটু নীরব থেকে তারপর বলল, একটি ভালোমেয়েকে বিয়ে করব—একদিন নিশ্চয়ই ভালোবাসব তাকে। এখন আপনি আমার উপর এদের দিয়ে, অন্য ভারটি নিয়ে ঘরে চলে যান। দুটো বইতে গেলে আপনি পারবেনও না, বাঁচবেনও না।

আপনি আমাকে বাঁচাবার জন্য নমিতাকে বিয়ে করবেন? বিমূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল শিবানী।

যদি তাই হয়, আপনি তাতে এত আশ্চর্য হতে পারেন কখন? বন্ধুর জন্য আপনি যা করলেন, তার কাছে এতো কিছু নয়। একেবারেই কিছু নয়।

কিছু সময় বিহ্বলভাবে বসে থেকে অস্ফুট কণ্ঠে শিবানী বলল, কী বলব বুঝতে পারছিনে। শুধু আমার জন্যই আমি এ কাজ আপনাকে করতে দিতে পারি নে। দিতামও না করতে। কিন্তু এতে নমিতার জীবনে যে সুখ আসবে, নমিতার মা, ভাই যে আশ্রয় পাবে তার দিকে তাকিয়ে—'না' করতেও যে মন সরছে না—আমি ব্রত নিয়েছি সুখী করবার—একটু হেসে ফেলে বলল, বা বলা যায় আমার ভালো লাগে সুখী করতে।

আমি জানি।

আমার কাছে এসে আপনিও সে কাজে জড়িয়ে পড়বেন? কি যে বলব বুঝছি নে।

কিছুই বলবেন না। বিরাট কিছু আমি করছি নে। কোন একটি মেয়েকে বিয়ে করতাম। নমিতা দেবীকে করছি। কিছুকাল বাদে করতাম, কিছুদিন আগে করছি। কী আছে এর মধ্যে? মাটির উপরই হাঁটছি আমি। আপনি তো হৃদয়ের উপর হাঁটছেন মিসেস সেন—গলায় আবেগের ছোঁয়া টের পেয়ে থেমে পড়ল অরুণ। একটু চুপ করে থেকে আবেগটাকে — গলা থেকে তাড়িয়ে তারপর বলল, আপনার আদেশ নীরবে রেখে গেছি। একটা কথা না বলে। এবার আপনিও কোন কথা না বলে আমার এ অনুনয়টা রাখুন, এই আমার অনুরোধ।

শিবানী যদিও বাহ্যত অরুণের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল এবং কথা বলছিল; কিন্তু ওর দৃষ্টি ছিল অন্তর্মুখী। খনন চলছিল অন্তরের অভ্যন্তরে। অরুণের মনের খবরে বিস্মিত হবার অবসর পেল না সে। হতভম্ব হয়ে গেল শিবানী—নিজেরই মনের খবরে। ইন্দ্রনাথের প্রতি ঘৃণা বিতৃষ্ণা ওর মনের জমিকে একেবারে ভেঙ্গেচুরে ফেলেছিল। সেই কর্ষিত ভেজা-জমিতে পড়ে অরুণের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের বীজটি যে ক্রমে কী—রূপ নিচ্ছিল কোন ধারণা ছিল না শিবানীর। ও কেবল কৃতজ্ঞতার খবরটাই রাখত। অকস্মাৎ অরুণের কথার ভেতর দিয়ে শুধু তার মনই নয়, নিজের মনটাকেও দেখতে পেয়ে চমকে উঠল শিবানী। শান্ত কৃতজ্ঞতার বেলাভূমি উদ্বেলিত করে বুকের মধ্যে আছাড় খাচ্ছে কি শিবানীর? অনুরাগ?

তবে এ কথাই রইল? জিজ্ঞাসুকণ্ঠে বলল অরুণ।

শিবানী ঝট্ করে চোখ তুলল, এই মুহূর্তে এ কথাটাই আপনি ভাবছিলেন কি?

না।

তবে বললেন কেন?

শান্তভাবে হাসল অরুণ। বলল, আমি এ কথাটাই যে বলতে এসেছি। তারপর ততোধিক শান্ত কণ্ঠে ফের বলল, তবে ঐ কথাই রইল। আপনি নমিতা দেবীকে নিয়ে ভাববেন না। জানবেন আমি আছি।

শিবানীর দিক থেকে কোন জবাব এলো না। অন্ধকার প্রায় ঢেকে ফেলেছিল ওদের। স্পষ্ট করে আর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। কতক্ষণ নীরবে বসে থেকে— বলল, আমি তবে যাচ্ছি?

শিবানীর তরফ থেকে কোন জবাব এলো না দেখে উঠে পড়ল সে, কিন্তু চত্বর থেকে নেমে কিছুদূর যেতেই শিবানীর ডাক শুনে ফিরে আসতে হলো তাকে। এসে দেখল অন্ধকার বেদীটার উপর দোতলার ঘর থেকে একটা আলোর ছটা এসে পড়েছে। শিবানী সেই আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে। অরুণকে দেখে দু পা এগিয়ে এসে কেমনতর একটু হেসে বলল, ওপরের ঘরের বাতিটা জ্বলতেই এখানে আলো এসে পড়ল। আর আলোর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, আপনার চেহারা আমার কিছু মনে নেই। চেষ্টা করলাম মনে করতে; কিছুতেই পারলাম না। বোধহয় অন্ধকারের ভেতর চলে গেছেন বলে এরকম বোধ হচ্ছে— একটু হাসল সে, তাই ডাকলাম বিদায়টা আলোর-দেখায় নেবার জন্য—

অরুণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই অধৈর্য অশান্ত শিবানীর সঙ্গে অরুণের পরিচয় আছে। শিবানীর চরিত্রের এই অস্থির দিকটাই সেদিন ইন্দ্রনাথের জন্য পাগলের মতো পথে পথে ঘুরিয়েছিল ওকে।

আকুল কণ্ঠে শিবানী বলল, অরুণবাবু, আপনি যে সব জানেন আমি জানি। আমি জানি সে রাতের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আপনি। নমিতা এবং আমার স্বামী কেউ কারু দৃষ্টির কাছাকাছি যেন এসে পড়তে না পারে, আমার জীবনে যেন আবার নতুন করে জটিলতা আর দুর্যোগ সৃষ্টি না হয়, শুধু এই জন্য— শুধু এই জন্য নমিতাকে বিয়ে করে, তাকে নিয়ে যতদূরে সম্ভব আপনি চলে যেতে চাচ্ছেন। আমাদের আর দেখা হবে না। বলুন ঠিক কি না?

বলুন না—চুপ করে থাকবেন না। শিবানী যেন ঝাঁকুনি মারল নিশ্চল অরুণকে। অরুণের স্থিরতা সইছিল না শিবানীর।

এ ছাড়া যে আমার করবার কিছু নেই।

কিছু করতেই হবে তোমাকে? কেন? কি জন্য?

শক্ত মাঝির হাল ধরা হাতের দাঁড়িতে দুরন্ত ঝড়ের টান মারার মতো শিবানীর 'তুমি' সম্বোধন অরুণের স্থৈর্যের শিরায় শিরায় ঝড়ের টান মারল। যত শান্ত অরুণকে দেখাচ্ছিল তত শান্ত সে ভেতরে ভেতরে ছিল না। সম্বরণ করতে সময় নিল সে। দাঁড়িয়ে রইল। ঝড় থামিয়ে নিয়ে বলল, এই যে তোমার জীবন রচনা তাতে সাহায্য করতে হবে না আমাকে?

শান্ত থাকতে পারা কি আশ্চর্য গুণ। কিন্তু আমি পারিনে কেন— কেন পারিনে। শতরঞ্জির উপর বসে পড়ে দু হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজল শিবানী। তার চুলের উপর, শরীরের উপর কুয়াশা-ঢাকা ধোঁয়াটে আলোর রশ্মি পাক খেতে লাগল।

এবার শতরঞ্জির উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে শিবানীর হাতটা মুঠোর ভেতর টেনে নিল অরুণ। ঈষৎ হেসে বলল, এ গল্পের নায়ক ইন্দ্রনাথ— তাকে পরাস্ত করবার সাধ্য আমার নেই।

শিবানী হাঁটু থেকে মুখ তুলল। বুঝলাম না।

অরুণ কৌতুকের ভঙ্গীতে বলল, আমি অবশ্যি মেয়েদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে এখন বলতে পারতাম, দেবদাস, জীবানন্দ, সিডনি কারটনদের নায়কত্বে পরাজিত করতে পারে কোন পুরুষ? কিন্তু থাক। জয়ীদের দিকে বাক্যবাণ ছোঁড়া দ্বিতীয় পরাজয়। তার পরই হঠাৎ গলার সুর পাল্টে গেল অরুণের। গাঢ়কণ্ঠে বলল, ইন্দ্রনাথ-বাবুকে তুমি গভীরভাবে ভালোবাস শিবানী। গভীরভাবে ভালোবাস।

বাসতাম।

না, এখনও বাস। ভালয়-মন্দয়, রাগে-অনুরাগে, বিচ্ছেদে-মিলনে সে ভালোবাসা যে কেবল অভ্যাসেরই গিটে গিটে বাঁধা পড়ে গেছে। তাই নয়— যদি বা বিরাগে কিংবা ঘৃণায় সাময়িক তোমার মুখ তার দিক থেকে ফেরেও, তখনও করুণার প্রাবল্যে তোমার বুক থরথর করে— আর সে যে কী সুন্দর, কী হালকা নরম কচি পালকের মতো কোমল স্পন্দন, তুমিও তা জান না শিবানী। আমি আবিষ্ট হয়ে দেখেছি। মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। তোমার মনের এই রূপ অপরূপ শিবানী। তোমার স্বভাবের সব সুন্দরের উপর সুন্দরতম জিনিস হলো এই মমতা। তোমার চরিত্রের সেই সুন্দরতমকে হত্যা করে আমি পাব কি? প্রেম? প্রেম যেখানে যাত্রা শেষ করে মমতা সেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করে —জান না? মমতার মরূদ্যান থেকে তোমাকে আমি টেনে নিয়ে যাবো প্রেমের মরুভূমিতে? তৃষ্ণার জগতে? শিবানী, আমি জানি আমার ক্ষমতা কতটুকু। তোমাদের দুজনের সম্পর্কটাকে আমি কিছু নষ্ট করতে পারি, কিছু ঘোরালো করে তুলতে পারি— আর কিছু পারি না। অর্থাৎ ইন্দ্রনাথবাবুর ক্ষতির খাতায় কিছু অঙ্ক বসাতে পারি বটে কিন্তু নিজের লাভের অঙ্কে কিছুই যোগ হবে না তাতে— ম্লান হাসল সে।

শিবানী পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল— অরুণের দিকে।

শিবানীর হাত একহাতের মুঠোয় ধরে ছিল অরুণ, এবার দুহাতে ধরে বলল, তোমার এই আকুলতা কেন— ভাবব আমার জন্য? আসবার সময় পথ চলতে চলতে কেবল বিদায়রাগিণী কানে শুনছিলাম। পথ ঘাট মাঠ নদী কাউকে ছেড়েই আসতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল, আরো একটু নদীর ধারে বসি। আরো একটু পথ চলি। পথিকের সঙ্গে আরো কিছু কথা বলি। চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল যেন শুধু—'যেতে নাহি দেব'র সুর। তোমার

মনেও তো এই 'যেতে নাহি দেব'র গানই গাইছে গিরিডি। গিরিডির সেই পাহাড় পথ নদী মানুষের সুরের সঙ্গে আমিও যোগ হয়ে গেছি মাত্র। সংসার দু'দিনে তার ঘূর্ণি হাওয়ায় গিরিডিকে যেমন ভুলিয়ে দেবে, তেমনি তোমার আজকের ইচ্ছাকেও উড়িয়ে দেবে। যদি তা না হয়, যদি তার চাইতে আরো কিছু বেশী হয়—তবে রইল তা—থেমে গেল অরুণ। ভাষার অভাবে না রুদ্ধ কণ্ঠের জন্য বোঝা গেল না। শিবানীর হাতটা তুলে আস্তে করে কপালে ছুঁইয়ে ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল সে।

কিন্তু একেবারে চলে গেল না। চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে বেদীর পাশ ধরে একবার এ মাথা আর একবার ও মাথা করতে লাগল কেন যেন।

একটা গাছকে যদি তুফান মাথায় নিয়ে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়—যদি দেখা যায় তুফান তার একটি পাতাও নাড়াতে পারছে না তবে যেমন বুঝতেই হয় সেটা পাথরের, অরুণের এতক্ষণের স্থির ভাবটাও তেমনি পাথর লাগছিল শিবানীর। আন্দোলিত অরুণ এবার ওর স্তব্ধ বুকের কলরোলের মুখ খুলে দিল। হাওয়াটা বাদল দিনের নয়। কনকনে শীতের সন্ধ্যার, কিন্তু মনের পাগলের কাছে দুটোর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই নিশ্চয়ই। থাকলে শিবানীর মনের পাগল এমন জেগে উঠত না। অরুণের এই চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে অস্থির পদচারণ—শিবানীর মনে যেন নেশা ধরিয়ে দিল। নেমে এলো শিবানী। ওকে দেখে থেমে গেল অরুণ।

শিবানী বলল, এভাবে চলে যাওয়াটা কেমন?

পুনরায় সেই অচঞ্চল অরুণ। হেসে বলল, ভাল নয়। সে কথাই ভাবছিলাম দাঁড়িয়ে।

দাঁড়িয়ে নয়।

তা ঠিক। পায়চারি করতে করতে।

তাও নয়।

তবে কি ভাবে ভাবছিলাম?

খুব অস্থিরভাবে।

আচ্ছা— খুব যেন হাসির কথা—এমনি ভাবে হেসে উঠল অরুণ।

শিবানী হাসল না। দোতলার যে ঘরটা থেকে আলো এসে পড়ছিল সে ঘরটার দিকে এগিয়ে গিয়ে মুখ উপর দিকে তুলে ডেকে বলল, মা, আমি একটু অরুণবাবুর সঙ্গে মাঠে হেঁটে আসতে যাচ্ছি।

মাঠের পথে চলতে চলতে অরুণ বলল, খুব অন্ধকার কিন্তু।

দ্বাদশীর চাঁদ এক্ষুণি উঠল বলে। কিন্তু আলো দিয়ে করব—কি? 'চেনাশোনার কোন বাইরে। যেখানে পথ নাই নাইরে' সেখানে চলেছি আমি। তারপর হেসে ছন্দের ব্যঞ্জনায় বলল, 'ঘরের মুখে আর কি রে কোনোদিন সে যাবে ফিরে। যাবে না, যাবে না— দেয়াল যত সব গেল টুটে। যা না চাইবার তাই আজ চাই গো— যা না পাইবার তাই কোথায় পাই গো'— কি ভয় করছে?

না—

তবে কি করছে?

কিছুই না।

বাঃ, চমৎকার। আমার উপস্থিতি, আমি, সব একেবারে শূন্য অনুভবের।

শিবানী—

কেন?

তোমার পাগল তো মাঠে বেরিয়ে পড়েছে, আমার পাগলটাকে বন্দী থাকতে দেও।

নইলে?

অরুণের দিকে তাকাল শিবানী। মুখ দেখতে পাবে ভাবেনি। কিন্তু পেলো। অর্থাৎ দ্বাদশীর চাঁদ উঠে গেছে এবং ঘন কুয়াশা ভেদ করে চাঁদের ধূসর আলো মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদ দেখে সেখানেই মধ্যমাঠে বসে পড়ল শিবানী। অরুণ বসলে ওর জিজ্ঞাসার পুনরাবৃত্তি করল আবার, নইলে কী হবে?

প্রশ্ন করল কিন্তু জবাবের দাবী করল না। বোঝা গেল সে উত্তর চায় না, ঐ কথাটা ধরে কিছু বলতে চায়। বলল, মমতার মালা গলায় পরাচ্ছিলে, মাথা গলিয়ে নিচ্ছিলাম আর সভাভরা হাততালি কানভরে শুনতে

পাচ্ছিলাম। সে হাততালি থেমে যাবে? অরুণবাবু। জানিনা আমার এই ক্ষণের আমি পাগল না প্রতিদিনের শিবানী পাগল—

একটু থামল সে তারপর ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, সত্যি আমি জানি না, যে শিবানী নিজে বাইরে বাইরে ঘোরে প্রতিকূল টানে স্বামীকে ঘরে ফেরাবার জন্য, চাকুরী করে স্বামীকে যন্ত্রণা দেবার জন্য; আনন্দহীন সঙ্গীর সঙ্গে শূন্য মন নিয়ে রেস্তোরাঁয় সিনেমায় বসে থাকে স্বামীকে ঈর্ষালু করবার জন্য— আরো আরো কত কী করে অনিচ্ছায়; অনীহায় মরা গাধার মতো নিজেকে টেনে টেনে— সেই শিবানী পাগল না যদি আজ কোন ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসে থাকে; যদি সে ইচ্ছে তার মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে না করে তবে সেই শিবানী পাগল। খুঁটিকে কেন্দ্র করে নাগরদোলার একই বৃত্তে পাক-খাওয়ার মতো স্বামীকে কেন্দ্র করে একই বৃত্তে পাক খাচ্ছে কেবল সে এক ইন্দ্রনাথ? কী হয় সে বাড়ি না ফিরলে, দেরীতে ফিরলে কিংবা জীবন থেকে একেবারেই অনুপস্থিত হয়ে গেলে? কেন এই একই মাথা কোটাকুটি নিত্য দিন? কোথাও কি আর কিছু নেই? কত বলে সে নিজেকে। লাভ হয় না। মাথা থেকে খ্যাপা নামে না। ঐ শিবানী পাগল নয়? কিংবা আরো বড় করে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ মেয়ে জাতটাই আসলে পুরো পাগল কি না। যারা জীবনলগ্নের কথা জানে না, পুঁথির লগ্নের চাকায় জীবন পিষ্ট করে। যাদের হাসি, কান্না, মরা, বাঁচা সব লটারি-খেলা। কোন একদিন এতোটার সময় টিকিট কেনা হয়, তারপর জেত তো বাঁচ। হার তো মর। লটারি খেলায় জীবন উৎসর্গ করে বসে থাকে— উন্মাদ নয় তারা? পাগল হয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়েছি? না। বেরিয়ে পড়তে আমরা জানিনে। আমরা খ্যাপার দল একই বৃত্তে পাক খাই কেবল। হঠাৎ উঠে পড়ল শিবানী। বলল, আচ্ছা, এবার চললাম। অন্ধকারে বিদায় নিতে চাইনি তাই ঘরের আলো, চাঁদের আলো আমার বিদায় সম্ভাষণে প্রদীপ জ্বালল—ধন্যবাদ তাদের।

শিবানী কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর যেন ধ্যান ভাঙ্গল অরুণের। উঠে শিবানীর সামনে গিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল সে। তারপর তার দুই কাঁধে হাত রেখে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, আজকের সন্ধ্যা যে মহা ঐশ্বর্য আমার কাছে এনে ধরেছে, যদি এতটুকু তরল হই, এতটুকুও চঞ্চলতা প্রকাশ করি এই ধুলোয় সব বৈভব গড়িয়ে যাবে। কিন্তু এর সামান্য লোকসানও আমার সইবে না তাই চঞ্চলতাকে পাথর করে, ঢেউগুলির সামনে বাঁধ বেঁধে বসে রইলাম।

শিবানী, তুমি আমার ধ্যানের; তুমি আমার মর্ত্যের নয়নে অমরার মূর্তি। তোমারে আমি নমি। তোমারে আমি নমি। অরুণের রুদ্ধকণ্ঠ থেমে গেল আপনা থেকে। শিবানীর কাঁধে তেমনি হাত রেখে তার দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত, তারপর হাত তুলে নিয়ে সুধীর কণ্ঠে বলল, চল।

পথে আর একটি কথাও কেউ বলল না। বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে প্রতিদিনের মতো হাত তুলে একটি নমস্কার জানিয়ে চলে গেল অরুণ। শিবানী গিয়ে ফের সেই বকুল বেদীর উপর বসল। বহুক্ষণ বসে রইল সে। কাচ্চির আর মার ডাকাডাকি বকাবকিতে একসময় যখন তাকে বাধ্য হয়েই উঠতেই হলো, তখন উঠল সে। ঘরে এসে প্রথম কথাই বলল, কলকাতায় কালই টেলিগ্রাম করে দেও মা। এবার রওনা হয়ে পড়ি।

ওর বোধ, ওর চৈতন্য যেন আচ্ছন্ন অবসন্ন। ওর মন কোথাও দু চোখ বন্ধ করে পিঠ রেখে একটু বসতে চাইছে—এইমাত্র সে অনুভব করছে। আর কিছু নয় সকালে টেলিগ্রাম পেয়ে বিকেলেই যখন ইন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তার ভৌমিককে একেবারে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো, তখন নবপ্রসূতির পার্টটা শিবানীকে সত্যি সত্যি রক্ষা করল। সন্তান জন্ম দিয়ে নিঃশেষিত নারী চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকবে। সেবায় শুশ্রূষায় সুস্থ করে না তোলা পর্যন্ত কারু কোন চাওয়া নেই তার কাছে। আরামচেয়ারে বসে ম্লান একটু হাসি, একটু হাত নাড়া, শ্রান্ত কণ্ঠে দু-চারটে উক্তর প্রত্যুত্তরের ভূমিকা বর্তমান দেহ-মনের সঙ্গে এমন খাপে খাপে মিশে গেল শিবানীর যে, ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাল সে। আজ ওকে অন্য কোন ভূমিকা করতে হলে শিবানী পারত না।

কে জানে, কিছুই পারছিল না বলে, একেবারেই নিঃশেষ লাগছিল বলে— শিবানী নিজেকে ফেলে রাখবার এই ভূমিকাটার মধ্যে আত্মরক্ষা করছে কি না।

ডাক্তার ভৌমিক বাচ্চাকে এবং শিবানীকে নিয়মমাফিক কিছু ডাক্তারী পরীক্ষা করে বললেন, চমৎকার আছে মা আর শিশু। মিঃ সেনকে বুঝিয়ে পারিনে, এমন প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি হামেশা হচ্ছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। আর নেই যে দেখতেই তো পাচ্ছেন। ডেলিভারি হয়ে গেছে এবং মা ও বাচ্চা ভালো আছে ওরা

জানিয়েছেন—আবার কি। কিন্তু শোনেন কি সে কথা। আমাকে এনে তবে ছাড়লেন। অবশ্যি শেষ অবধি রাজী হয়েছিলেন অন্য একজন কাউকে আনতে — কিন্তু ভাবলাম যখন আমার পেসেন্ট, তখন আমারই আসা কর্তব্য। শিবানীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

শিবানীও দৃষ্টির উত্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল, কবে পর্যন্ত ওদের কলকাতা নিয়ে যেতে পারব, ডাক্তার ভৌমিক?

ডাক্তার ভৌমিক হাত নেড়ে বললেন, বোথ আর কোয়াইট ফিট— আজই নিয়ে চলুন না।

ইন্দ্রনাথ মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে একটু লজ্জিত হাসি হেসে বলল, না, তা বলছিনে। দুতিন দিনের ভেতর পারব কি না—

নিশ্চয় পারবেন। ডাক্তার মানুষ, ছুটি তো মেলে না। এসেই যখন পড়েছি, পকেট ভরা টাকাও দিয়েছেন, সাঁওতালদের লাল মাটির গ্রাম একটু দেখি, দু দিন। তারপর একসঙ্গে যাত্রা করা যাবে!

স্প্লেণ্ডিড্। ইন্দ্রনাথ একেবারে লাফিয়ে উঠল।

ইন্দ্রনাথের খাস বেয়ারা আবদুল এসেছে। গাড়ী এসেছে। ড্রাইভার এসেছে। সাধারণ গৃহস্থবাড়িটা হঠাৎ ধনী হয়ে উঠল। ঘরে ঘরে আলো জ্বললে খোলা মাঠের উপর দিয়ে বহু দূর থেকে আলোকিত বাড়িটা দেখা যেতে লাগল।

যেখানে কালকে শিবানী বসে পড়েছিল মাঠের ঠিক সে জায়গাটায় বসে অরুণ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার হাতে একখানা বই। বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরেই সে এখানে এসেছে। বই পড়ছিল। এখন অন্ধকার হতে বই বন্ধ করেছে। 'দি কমপ্লেসেন্ট লাভার'—বইটা সে বহুবার পড়েছে। সমস্ত বইটাতে তার হাতের কত চিহ্ন যে রয়েছে লেখকের সঙ্গে একমত হয়ে মাথা নাড়ার তার ঠিক নেই। শেষ পাতা ক'টা আবার ও এইমাত্র পড়ল। পড়ে নিজেকে ফের সমর্থন করল—শিবানীর কাছ থেকে এভাবে বিদায় নেওয়া ছাড়া সত্যি আর কিছু তার করার ছিল না। করতে গেল গ্রেহাম গ্রীনের এই 'দি কমপ্লেসেন্ট লাভারে'র নায়কের মতো একদিন ইন্দ্রনাথ আর শিবানীর দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে নিজেকে একান্ত ফালতু দেখে তাকে বিদায় নিতে হতো।

।। পরিশেষ ।।

চারিদিক শান্ত।

শিবানী নিজেও শান্ত।

শুধু একটু ক্লান্ত।

ঠিক সন্তান জন্ম দেবার পরের সময়ের ক্লান্তির মতো। অনেকগুলি মানুষের সুখ জন্ম দিয়েছে ওর বেদনা।

আজ বিকেলে ললিতা এসেছিল ছেলে নিয়ে বেড়াতে। শিবানীর সঙ্গে খুনসুড়ি করে গেছে, আমার ছেলে আমার মতো হয়েছে। তোমার মেয়ে কিন্তু শিবানীদি তোমার চেহারা একটুও পায়নি। একেবারে বাবার চেহারা নিয়ে নিয়েছে। হেরে গেছ তুমি আমার কাছে।

জিতে গেছি।

কি করে?

জানো না 'মেটারনিটি ইজ এ ফাক্ট, পেটারনিটি ইজ এ প্রবাবিলিটি?' তাই বাবার নাম মেয়ের মুখে লিখে দিয়েছি। কেউ প্রশ্নই তুলতে পারবে না। তুমি ঠকে যেতেও পারো।

হেসে উঠেছে দুজনে।

ললিতা যাবার সময় বলে গেছে, ভগিনীর 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় এখনও কিন্তু মঞ্চস্থ হয়নি শিবানীদি। জোর রিহার্সেল চলছে। যাবে নাকি একদিন ওদের মহড়া দেখতে?

হয়নি এখনও ওদের নাটক? উৎসাহিত হয়ে উঠল শিবানী— নিশ্চয় যাবো রিহার্সেল দেখতে। এ নাটকটা এতো ভালো লাগে আমার। বলে আবৃত্তি করে উঠল,

''আমি সাধু। মাগো, এমন মিথ্যে
মুখেও আনিনে, ভাবিনে চিত্তে।

নিই থুই খাই দু হাত ভরি
দুবেলা তোমায় আশীষ করি;
কিন্তু তবু সে দুহাত' পরে
দু-মুঠোর বেশী কতই ধরে।
ঘরে যত আনো মানুষ-জনকে
তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যা।
হাত যে সৃজন করেছে বিধি, নেবার জন্য জান তো দিদি।"

আবার হেসে উঠেছে দুজন।

ললিতা চলে গেছে। ঘরের হৈ হৈ থেমে গেছে। শোনা যাচ্ছে কাচ্চির অতি মৃদু গুন্-গুন্ ঘুমপাড়ানো গান, ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়োলো আর কাচ্চির গলার সেই মৃদু গুঞ্জন ঢেকে দিয়ে স্নানের ঘর থেকে ইন্দ্রনাথের মোটা গলা ভেসে আসছে—

ডোন্ট থ্রো ইওর লাভ অ্যাওয়ে— নো, নো;
নো, নো,
— ফর ইউ মাইট নিড ইট সাম ডে।
ডোন্ট থ্রো ইওর ড্রিমস অ্যাওয়ে— নো, নো,
নো, নো।

ফর ইউ মাইট নিড দেম সাম ডে—

নমিতার চিঠি এসেছে। চিঠিটা সবে একবার পড়েছে, ললিতা এসে পড়ায় আর ভালো করে পড়া হয়নি। বই-এর ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছিল। সেটা বের করে আবার পড়তে লাগল শিবানী।

বন্ধু,

সম্বোধনটা খুব নাটকীয় লাগবে জানি। কিন্তু শিবানী, জীবনে কি 'অতি'-র মুহূর্ত মানুষের দেখা দেয় না? যদি দেয়ই তবে তখন তাকে নাটক ভেবে রুখ্‌ব কেন? 'বন্ধু' ব্যতীত কোন্ সম্বোধন আজ আমার মনের পুরো ভাব প্রকাশ করতে পারবে?

এইখানে থেমে পড়ল শিবানী। চিঠি থেকে চোখ তুলল না। দৃষ্টিটা রইল চিঠির উপরই কিন্তু সে দু কান ভরে শুনতে লাগল গিরিডির মাঠের উপর দাঁড়িয়ে ওর দু কাঁধে হাত রেখে অরুণের বলা কথাগুলি, শিবানী, তুমি আমার ধ্যানের, তুমি আমার মর্ত্যের নয়নে অমরার মূর্তি — তোমারে আমি নমি। তোমারে আমি নমি।'

হ্যাঁ, 'অতি'র মুহূর্ত জীবনে আসে। এবং যখন আসে তখন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অরুণকেও নিয়েছিল। 'অতি' মনের বন্যা। বন্যাকে রুখতে পারে কে?

চিঠি হাতে করে কতটুকু সময় অন্য মনে গিরিডির মাঠেই বসে রইল শিবানী। অরুণ যদি 'এসো' বলে ডাক দেয় তবে বুঝি সে চেয়ার থেকে উঠে এইভাবেই রওনা হয়ে পড়তে পারে। তারপর আবার চিঠিতে মন দিল ঃ

হঠাৎ অরুণবাবুর মুখে বিয়ের প্রস্তাব শুনে একটুও বিস্মিত হলাম না শিবানী। জানি এও তোরই দান। ভেবেছিলাম অনেক নিয়েছি, কিন্তু এ দানটা নেব না কিছুতে। একটু অহঙ্কার বাঁচুক। কিন্তু অহঙ্কার আর জীবনের ভেতর শিবানী আসমান ফাঁক। অত ফাঁক ভরবার মতো কী আছে আমার বল?

যাই হোক এ সময়ে একবার তোর কাছে যাবার জন্য মনটা বড় উতলা লাগছে—কিন্তু অরুণবাবু শুধু বলেন, 'এখন থাক্।' দু দুবার কলকাতা গেলাম এর ভেতর, ভেবেছিলাম চুপ করে চলে আসি তোর কাছে। কিন্তু কম কথা বলার মানুষ যখন যা বলার বলে থেমে যায়, তখন আর কথা বলতে সাহস হয় না যেমন, তেমনি তার কথা অমান্য করতেও সাহসে কুলোয় না—তা আড়ালেও। তাই আর এলাম না। কবে যে আর দেখা হবে তোর সঙ্গে জানিনে। ১৭ই অগ্রহায়ণ বিয়ে। বিয়ের পরই মালয় চলে যাচ্ছি। সেখানের কলেজে অধ্যাপকের কাজ নিয়েছেন অরুণবাবু। পাঁচ বছরের চুক্তি। আরো বাড়ানো যাবে ইচ্ছে হলে। মা ও রতন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

অনেক ভোগালাম তোদের। প্রার্থনা করিস আর যেন তোদের যন্ত্রণার কারণ না হই।

শিবানী, তোর মনের কোথাও একটা গভীর—অত্যন্ত গভীর ব্যথা আছে। যদিও তুই কোনদিনও কিছু বলিসনি তবু আমি অনুভব করেছি। আমি জানি না সে ব্যথা কিসের। কিন্তু এতো যে দিতে পারে তার জীবন ব্যর্থ যেতে পারে না— কিছুতেই পারে না। তুই একদিন নিশ্চয়ই সুখী হবি। সার্থক হবি। ভগবান আছেন।

আবার চিঠি থেকে চোখ তুলল শিবানী—।

সার্থকতার ব্যাখ্যাটা কি? ইন্দ্রনাথ ওর চাওয়া দিয়ে নিজেকে গড়ছে বা গড়তে চেষ্টা করছে? এ চার পাঁচ মাসের ভেতর কি ইন্দ্রনাথ—না, থাক সে কথা— বড় কথা, সে চাচ্ছে শিবানীর মন। আর একটা কথা কেউ এখনও জানে না কিন্তু শিবানী জানে ওর সন্তান আসছে—এই কি সার্থকতা? কিন্তু নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে কই?

আর ভগবান আছেন?

হ্যাঁ ভগবান আছেন। নইলে মানুষ কাঁদবে কার কাছে? সব ত্যাগ করবে কার উপর অভিমান করে?

সিরিন।

পোষাকে-পরিচ্ছদে তৈরী হয়ে ইন্দ্রনাথ শিবানীর কাছে এসে দাঁড়াল। ইন্দ্রনাথের দিকে তাকাল শিবানী। কেমন যেন বুকটা ব্যথায় দুলে উঠল তার। এই লোকটিকে সুখী করতে সে সব ত্যাগ করতে পারে। নমিতার চিঠিটা হাতের ভেতরে কুঁচকে ফেলে হেসে বলল, নতুন নাম?

নতুন নাম। খুঁজছিলাম মনে মনে অনেক দিন। আজ হঠাৎ পেয়ে গেলাম। 'সিরিন'— তোমাকেই এ নাম মানায়। টাইটা গলার ঠিক জায়গায় বসাতে বসাতে একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে বলার মতো করে বলল, যদি একটু রাত হয়?

হবে।

আর একটা 'কথা' জিজ্ঞাসা করব?

না ও যদিটাতে রাজী নই আমি। ড্রিঙ্ক এতটুকু বেশী হতে পারবে না। যাতে মানুষ বুঝতে পারে তুমি ড্রিঙ্ক করেছ—ভদ্রজনের ড্রিঙ্কের এই রীতি হওয়া উচিত।

তুমিও চল না সিরিন? তোমারও নেমন্তন্ন রয়েছে। তবে আর আমার বেশী খাওয়া হবে না।

না। এ সব পার্টি আমার ভালো লাগে না তো জানই। আর পাহারা দিয়ে বসে থাকব তবে তুমি ড্রিঙ্ক কম করবে, তাতে লাভ কি? আমার উপস্থিতি অনুপস্থিতি সমান হবে—তবে তো। শিবানী ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

'ও-কে ডার্লিং' বলে ইন্দ্রনাথ সাদরে শিবানীর মুখ চুম্বন করল।

ইন্দ্রনাথ চলে গেলে বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে শিবানী ভাবতে লাগল:

মানুষ কি ভগবানের হাতের শুধু একটি সৃষ্ট চরিত্র? গল্প লিখতে বসবার আগে লেখক যেমন একটা গল্পের কাঠামো তৈরী করে নেন, মানুষের সৃষ্টিকর্তাও কী তেমনি জন্মাবার আগে একটা জীবন কাঠামো তৈরী করে নেন? কুন্দনন্দিনী, কুমু, অচলা, রমাকে যেমন তাদের সৃষ্টিকর্তার ছকের মধ্যে মাথা কুটে মরতে হয়েছে কিছুতেই তা থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি; মানুষেরও কী তেমনি তাদের সৃষ্টিকর্তার কাটা ছকের ভেতর মাথা কুটে মরতে হয়। ও কী সেই ছকেই বন্দী? নিজে চলছে না, ছকের উপর ঘুরছে?

সতেরই তারিখ কবে? বারান্দা থেকে জানালা দিয়ে ঘরের দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাল শিবানী—সতেরই তারিখের খোঁজে। কিন্তু হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারের পাতাটা এতো ওলোট পালোট খাচ্ছিল যে তারিখটা দেখতে পেলো না।

পারলাম না

"যে ব্যথা ভুলেছে আপনার ইতিহাস
ভাষা তার নাই আছে দীর্ঘশ্বাস"

আজকের গল্পের বাজারে সব চাইতে বড় চাহিদা — প্রেমের গল্প চাই।

তা বাজার বস্তুটা মোটেই যে অবহেলার জিনিস নয় সেটা তুমিও নিশ্চয়ই জানো উত্তরা। তাই আজ একটি প্রেমের গল্প লিখতেই বসেছিলাম—

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কথাটা শুনে তুমি আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছ— অর্থাৎ জানতে চাইছ, 'কাকে নিয়ে?'

তোমার চোখের জিজ্ঞাসাটা আমি সহজেই ধরতে পারব। কিন্তু তোমার পাতলা ঠোঁটের তলায় হাসি না কান্না কি চেপে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছ—এই দীর্ঘদিন পরে আজ আর ঠোঁটের সেই হাসি-কান্নার ভাষা আমি বুঝে উঠতে পারব না। বোঝার চেষ্টাও করব না। শুধু বলব, তোমাকে নিয়ে, উত্তরা, আজ তোমাকে নিয়েই একটি গল্প লিখতে বসেছিলাম আমি। প্রেমের গল্প আমি এর আগেও লিখেছি। কিন্তু সে সব গল্প আমার হৃদয়ে জন্ম নেয়নি। জন্ম নিয়েছে মাথায়। কল্পনার জগতে বিচরণ করে প্রেমের উপাখ্যান তৈরী করেছি কিন্তু তবু তোমার কথা নিয়ে কথা সাজাতে বসিনি। আমার বুকের প্রেমের ঝাঁপি কোন এক সন্ধ্যায় পূববাংলার এক জমিদার বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সেই যে বন্ধ করেছিলাম, সে ঝাঁপির মুখ আর খুলিনি।

কেন জানো?

আমার কেমন যেন ধারণা, তোমাকে নিয়ে লিখলে, তোমার প্রতি যে ভালোবাসা এখনও আমাকে উন্মনা করে, এমন কি কখনো কখনো আকুল করে তুলে বেদনার স্বর্গে নিয়ে যায়— আমার সেই বেদনার-স্বর্গ আমি হারাব। দুঃখের কথা বললে যেমন দুঃখের ভার লাঘব হয়, তেমনি যদি লিখতে গিয়ে আমার ব্যাথার ভার লাঘব হয়ে যায়। কত চিন্তা নিয়ে কত সময় ছট্‌ফট্‌ করি। লিখে উঠতে পারলেই দেখি হালকা হয়ে গেছি। আমার ভয়— লেখার পর যদি দেখি হালকা লাগছে? বুকের ভার নেমে গেছে খাতায়?

তবে আজ লিখতে বসেছিলাম কেন?

আমিও সে কথাই ভাবছি।

হয়তো নিয়তি।

সেই দিনের সেই ছাদের সন্ধ্যা হয়তো সে দিনের সেই ঘটনার ভেতরই নিহিত ছিল আজকের দিনের নিয়তির বীজ। মনে পড়ছে, দুজনে দাঁড়িয়ে রয়েছি ছাদে। ছাদ থেকে নদী দেখা যায়। তোমাদের জমিদার বাড়ির ঘাটের সিঁড়ি নেমে গেছে নদীতে। তোমরা স্নান করো কখনো নদীতে— কখনো দীঘিতে। একসারি আম বাগানের ভেতর দিয়ে দীঘিতে যাবার পথ। আমাদের বিদায়-সন্ধ্যা ছিল সেটা। তোমাদের রাজবাড়ি সেদিন ফুলে আলোতে বিয়ে বাড়ি সেজেছিল। তোমার সাজও ছিল তাই। ছাদের অন্ধকারে তোমার গয়নার হীরে মুক্তো চুনি পান্না জ্বলছিল আকাশের তারার সঙ্গে এক হয়ে।

নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম দুজনে।

তুমি নদীর দিকে তাকিয়েছিলে।

আমি তাকিয়েছিলাম তোমার দিকে।

শ্রাবণ মাসের ভরা বর্ষা। কোন দুঃসাহসী মাঝি এই ভরা বর্ষায়— রাতের অন্ধকারে নৌকা ছেড়ে ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে দোতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। সুরটা আসছিল। কথা বোঝা যাচ্ছিল

না। রাতের নদী আর দোতারার সুর— আবিষ্ট করে ফেলবার মতোই জিনিস। কিন্তু তুমি আমি তাতে আবিষ্ট ছিলাম না। আমরা আবিষ্ট হয়েছিলাম নিজেদের ভাবে। কিন্তু আমাদের নীরবতার ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসাবে নদীর বুক থেকে ভেসে আসা সেই দোতারার সুর আশ্চর্য মিলে গিয়েছিল। নৌকাটা দূরে চলে যেতে সুরও. অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল। আমি কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গেলাম। তুমি তোমার হীরের হাত-পদ্ম পরা হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে বললে, 'চুপ। আর ভালোবাসার কথা নয়।'

সেই যে মুখ বন্ধ করেছিলাম উত্তরা—স্ত্রীকেও ভালোবাসার কথা শোনাইনি।

দরকারও হয়নি। আমাদের ঘরের স্ত্রীরা 'ডিয়ার' 'ডার্লিং' ডাক শুনতে চায় না। ভালোবাসার ফিরিস্তিও না। ও সব ডাক আর কথাকে আমাদের স্ত্রীরা হালকামো ভাবেন। মা কি সন্তানকে ভালোবাসার ফিরিস্তি শোনান?

না।

কেন শোনান না?

শোনানো নিষ্প্রয়োজন বলে। বরং বললেই হাস্যকর শোনায়।

আমাদের স্ত্রীরা দাম্পত্য সম্পর্কেও তেমনি ভাবেন। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা যেন সন্তান স্নেহের মতোই তাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ।

ফাঁকি কি থাকে না?

থাকে।

তবে? স্ত্রীরা কি তা জানেন না?

জানেন। জেনে শুনে বুঝেই তারা ফাঁকিকে হাতের শক্ত মুঠোয় চেপে রাখেন। নিজেও দেখেন না। অপরকেও দেখতে দিতে চান না। ফাঁকি আর বঞ্চনার শূন্য মুঠো চেপে রেখে হেসে খেলে জীবন তরী বেয়ে চলেন।

আগে ভাবতাম কি মূর্খ আমাদের মেয়েগুলো! এখন ভাবি কি মহৎ আমাদের মেয়েগুলো নিজের 'না পাওয়া' নিয়ে তারা যাত্রীসুদ্ধু নৌকো নদীতে ডোবান না। পাওয়ার হিসেবের দিকে দৃকপাত না করে তারা নৌকো বেয়ে চলেন। তাদের কাছে যাত্রী বড়, নিজে নয়। জীবনের দায় দিতে হলে এমন পাইলটদের হাতেই তো দিতে হয়।

আমার স্ত্রী কি আমার ফাঁকি বোঝেন না উত্তরা? এমন অবিশ্বাস্য কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমরা চারিটি যাত্রী—(আমি আর আমার তিনটি ছেলে মেয়ে) তার নৌকোতেই তো পাড়ি জমিয়েছি। সে কি আশ্চর্য নিরুদ্‌বেগ নিশ্চিন্ত পাড়ি! আমাদের নৌকোয় তিনি সামান্য একটি ঢেউ-এর আঘাত লাগতে দেন না। পারলে ঝড়কে রোখেন দু বাহু বাড়িয়ে। পারাণির-কড়ির শূন্য হাতের মুঠো তিনি একবারের তরেও খুলে, কি পান নি—তার হিসেব মেলাতে বসেন না। তাই আগে যাদের মূর্খ ভাবতাম এখন তাদের মহৎ ভাবি। জীবনতরীর শ্রেষ্ঠ মাঝি ভাবি।

একদিন আমার অপরাধী মন কিছু একটু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। আমার স্ত্রী ঝট্ করে উঠে পড়ে হেসে বললেন, 'চা খাবে? দাঁড়াও তৈরী করে আনছি।'

আমাকে চুপ করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন স্ত্রী।

তোমার সেই ভালোবাসার কথা বন্ধ করে দেওয়া মুখ আমাকে তাই বড় বিশেষ আর খুলতে হয়নি।

আর কলম তো আমি নিজেই বন্ধ করেছিলাম।

আজ খুলেছিলাম। তোমাকে একদিন যেমন হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলাম, এতকাল বাদেও তেমনি ভালোবাসা নিয়েই তোমার কথা লিখতে বসেছিলাম। যে সঙ্গীত তোমাকে দেখলেই মনের মধ্যে শুরু হতো, আজ কলম তুলে নেওয়া মাত্র হৃদয়ে সেই সঙ্গীত শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নিয়তি—

অর্থাৎ যে আমাকে আজ তোমার কথা লিখতে এনে বসিয়েছিল, তার ইচ্ছেটা কিন্তু একেবারে অন্য। একদিন সে তোমার হাত আমার মুখে চাপা দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিল, 'আর ভালোবাসার কথা নয়।' এবার আবার সে তোমাকে দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলিয়ে নিতে চাচ্ছে, 'আর প্রেমের গল্প নয়।'

আমাকে প্রেমের জগৎ থেকে বের করে দিতে চাচ্ছ উত্তরা?

এবার উত্তরা আর তুমি নীরব জিজ্ঞাসা চোখে রাখবে না। ঠোঁট খুলবে আমি জানি। তুমি বলবে, 'জগৎ-সংসার এখন প্রেমের জোয়ারে ভাসছে, না আগুনে পুড়ছে অমল? ঘর আগুন লেগেছে, আর তোমরা বসে বসে কাঁচা প্রেমের গল্প লিখছ! ঠিক যেন মনে হচ্ছে মানুষের ঘর পোড়া দেখতে দেখতে নীরোর মতো বেহালা বাজাচ্ছো তোমরা। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে অমল। 'মাদার' 'হাঙ্গার'—'

আমি একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলব, 'কি পাগলের মতো কথা বলছ তুমি উত্তরা। একেবারে উন্মাদের মতো কথা যাকে বলা যায়। 'কলম' বলে একটা জিনিষ আছে না?'

'কলম না থাক, মন? মন কই? মন আগে ভাববে তবে তো কলম লিখবে।'

'ভাবে না, একথা তুমি কেন বলবে? ভাবলেই হয় নাকি। লেখার জন্য লেখার শক্তি চাই!'

'তা চাই জানি। কিন্তু পাঠক ভুলানো কাঁচা গল্প তো তোমরা কাঁচা কলমেই লিখছ। ও সব লেখা একেবারে বন্ধ করে দেও অমল। তাতে যদি তোমাদের পত্র পত্রিকার হাট যায় যায়। অখাদ্য বেশী খাওয়ার চাইতে কম খাওয়া অনেক স্বাস্থ্যকর। রোজকার কাঁচা বাজারের মতো কাঁচা লেখা রোজ লিখে এই যে সাহিত্যের বাজারে তোমাদের বেঁচে থাকার পর্ব চলছে— এমন বাঁচা না হয় নাই বাঁচলে...

কেতকী এখন তুমি কোথায়? সেই ঢাকাতেই আছ কি? কি করছ? খুব বই পড়ছ? পড়ার অভ্যাসটা গেছে না আছে? তোমার কথা একবার একটু আমায় জানতে দেও। বয়স বাড়ছে। কল্পনা মরে আসছে। আর আমি তোমার রূপটা কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতে পারছি না। যে রূপটি পারছি সেটা আবার নিজের সঙ্গে মেলাতে পারছি না। আমার বয়স এখন চল্লিশের উপর। তোমার সেই কুড়ি বছর বয়সের তরুণ কচি মুখ এখন আর আমার মনে রোমাঞ্চ জাগায় না। আমার মেয়ের বয়স যে আর কিছুদিন বাদে ঐ বয়সে পড়বে। তাই তোমার কুড়ি বছরের মুখ আমার মনে প্রেম আনতে পারে না। এসে যায় কন্যাস্নেহ। তাই তোমার পরিণত যৌবনের ভরা বর্ষার চেহারাটা একবার মাত্র আমাকে দেখতে দেও, চোখ দিয়ে স্পর্শ করতে দেও। যে যৌবন ভরা নদীর মতো আমাকে টানবে। আমি সে ছবিটা মনের ভেতর এঁকে নেবো।—তারপর আর তোমায় ডাকব না। ইথার তরঙ্গে মনের ডাক পাঠিয়ে তোমাকে উন্মনা করব না। বিশবছর চালিয়ে দিলাম তোমার বিশ বছরের রূপ চোখে নিয়ে। তোমার পরিণত রূপ মনে এঁকে নিতে পারলে ফের চলে যাবে বিশ বছর। আচ্ছা, তোমার বয়স এখন কত হলো কেতকী? চল্লিশ? আমার থেকে তুমি বছর দুই তিনেকের ছোট! তোমার চুলের গোছার কোথায় কোথায় দু এক গাছা রূপালী তারের মতো চুল দাগ কেটে গেছে কি ডোরা কাটা নক্সা তুলে? সুষমার চুলের রূপোলী রেখার টান গুলির দিকে তাকিয়ে ভাবি, তোমারও হয়তো অমনি রূপোর টান পড়েছে চুলে। কিছু সুন্দর যে লাগে। সুষমা তোমার বয়সী। তার দিকে তাকিয়ে আমি তোমার এই বয়সের চেহারাটা কল্পনা করতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। চোখ বুজলেই তোমার সেই কুড়ি কচি মুখ ভেসে ওঠে চোখে। এত কাঁচা লাগে জলো লাগে—শুধু তাই নয়। ঐ কচি মুখের মেয়ের সঙ্গে প্রেমে বিভোর হতেও আমার যেন বিকৃত রুচি মনে হয়।....আচ্ছা তোমার কটি ছেলে মেয়ে? দুটি? তিনটি? এরকমই হবে। আজকাল তো বেশী সন্তান আমরা হতে দি'নি। তুমি হাসছ নিশ্চয়ই? সেই পুকুর পাড়ে জলের ভেতর পা ডুবিয়ে বসে যে ভাবে হাসতে ঠিক সেই হাসি যেন আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু ঐ হাসিটা এখন আমি চাচ্ছিনে। তারণ্যের সঙ্গে তরল শব্দের ঝংকার তোলা হাসিটাও বিদায় দেওয়া উচিত। মাধুর্যভরা গম্ভীর হাসি সে বড় সুন্দর জিনিস। তোমার মুখে নিশ্চয়ই এখন সেই পরিণত গম্ভীর হাসি— যা আমি দেখতে চাই। দেখে বিহ্বল হতে চাই।....

অকস্মাৎ তুমি বলে উঠলে—

কিন্তু অমল আমি আর কথা বলতে পারছিনে। আজ সাত দিন সাত রাত হাঁটছি, হাঁটছি, হাঁটছি— কেবল হাঁটছি। কাদের সঙ্গে হাঁটছি, কোন পথে চলেছি—জানি না। কোথায় যাবো—জানি না। কি কি হবে— জানি না। তবু চলছি। হাত পা মুখ ফুলে গেছে। পায়ের তলা কেটে ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে। পিপাসায় ব্রহ্মতালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। বারবার আকাশের দিকে দোখ তুলে তাকাচ্ছি। বৃষ্টি নামলে চাতক পাখীর মতো হা করে বৃষ্টিরজলের ফোটায় গলা ভিজিয়ে নেবো সেই আশায়। কিন্তু বৃষ্টির কোনই সম্ভাবনা নেই। সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে। একটা শুকনো কাশি শুকনো কণ্ঠনালীতে সুড়সুড়ি তুলছে—তবু একটা পায়ের পরে আর একটা পা ফেলছি। সঙ্গীরা বলাবলি করছে, সামনেই একটা নদীর স্রোত ঢোকা মস্ত খাল পড়বে। কি করে পার হবে। কে যেন খাল কথাটা শুনে চমকে উঠলো, 'খাল? খাল মানে জল? কোথায়? কতদূর সেটা? খাল পার হতে চাই না। শুধু দু আঁজলা জল খেতে চাই।'

আমিও আওড়ালাম, 'খাল। খাল মানে জল! কোথায়? আর কতদূর সেটা? খাল পার হতে চাই না। শুধু দু আঁজলা জল খেতে চাই।' কিন্তু আমার দু আঁজলা জলে হবে না। আমি ঝাঁপ দেবো জলে। শরীরের সমস্ত লোমকূপ

দিয়ে জল টানব। ঢোকে ঢোকে জল খাবো। হাঁটতে পারছিনে। কিন্তু সাঁতরাতে পারব। পা দুটো এখনও আছে কিনা জানি না। যদি থেকে থাকে তবে তাকে পড়ে থাকতে দেবো। শুধু হাত দুটো সামনে ফেলে ফেলে এগুবো।

তোমার হীরের হাত-পদ্ম পরা হাতখানা চোখের উপর নিয়ে লিখতে বসেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ নিরাভরণ হিমশীতল একটি হাত এসে পড়ল আমার খাতার ওপর আমার হাতের উপর।

কেঁপে উঠলাম আমি। কোথা থেকে তোমার হাত এসে আমার হাতের উপর পড়ল। তবে কি তুমি আমার ঘরে এসে পৌঁছোতে পেরেছে উত্তরা?

তোমার ঘরে! অমল, না। আমি পথের উপর বসে পড়েছি। আমি আর চলতে পারছি নে। খাল এখনও অনেক দূর। সবাই আমাকে এখানে ফেলে চলে যাবে। দাঁড়াবার সময় তাদের হাতে নেই। ওরা চলে গেলে শরীরটাকে আমি একটা গাছতলায় টেনে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ব। তারপর আমি চোখ বুজব। মৃত্যু না ঘুম— কি নেমে আসবে আমার চোখে, আমি জানি না।

উত্তরা, থামো!

আমাকে একটু নিশ্বাস টানতে দেও। আমি বুঝে উঠতে পারছি না, এ সব কি সত্য না আমি স্বপ্ন দেখছি? না প্রেমের গল্প লেখার অনীহা আমাকে এ সব উদ্ভট কল্পনার ভেতর নিয়ে ফেল্‌ছে?

সত্য হোক মিথ্যে হোক, আগে আমাকে একটু নিঃশ্বাস নিতে দাও। তারপর দাও তোমার সঙ্গে পূববাংলার জলে নদীতে মাঠে ঘাটে প্রান্তরে ঘুরতে। শেষ কথা যদি এসে গিয়েই থাকে— তবে তা এখন নয়। আরো পরে। আরো অনেক পরে।

উত্তরা তোমার হিম হাতখানা এখন আমার হাতের উপর থেকে তুলে নাও।

তোমার লক্ষ্মীর মতো পদ্ম-পরা হাতখানা রাখো আমার হাতের উপর—

কিন্তু না। সে হাতও নয়। তুমি আমাকে বরণ করবার জন্য সেদিন সাজ নি বা হাত-পদ্ম পর নি। সে হাতও ছিল তোমার আমার কাছে বিদায় নেওয়ার হাত। হাতের সাজটা বড় সুন্দর লেগেছিল। তাই অনেক সময় চোখের উপর রাখি। কিন্তু ঐ হাতকে আমি ভালোবাসিনে। কারণ সে হাত বরণ করেছিল অন্যকে।

তবে কোন হাত রাখবে বলছ?

বলছি—

তুমি পূববাংলার মেয়ে। তোমাদের প্রায় জলজ প্রাণীই বলা চলে। আর আমি খাস কলকাতার ছেলে। জলে পা ডোবাতেও ভয় পেতাম। তুমি আমার জলের ভয় ভাঙলে। জলে নামলে। আমার বুকের তলায় হাত রেখে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সাঁতার শেখাতে লাগলে—

উত্তরা, তোমার সেই জলে ভেজা সিক্ত পদ্মের মতো হাতখানা আমার বুকের তলায় রেখে তুমি আমাকে আজ আবার একবারের মতো কিছু সময় ভাসিয়ে রাখ। নইলে আমি ডুবে যাচ্ছি। তুমি আমাকে এক্ষুনি ডুবতে দিও না।

যে দীঘির পাড়ে তোমায় প্রথম দেখেছিলাম সেই দীঘির পাড়ে তোমার সঙ্গে গিয়ে আর একবার দাঁড়াতে চাই—আর একবার সেই পুরানো সমুদ্রে তোমার সঙ্গে ডুব দিতে চাই। তুমি সাতরাত সাতদিন ধরে পথ চলছ— উত্তরা আমি জানতাম না। এবার আমি তোমার সঙ্গে আছি উত্তরা। আমি তোমার গল্প শোনাতে শোনাতে চলব। তোমার মনকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবো আমাদের সেই হাসি-কান্নার দিনগুলিতে। পথ চলার কষ্ট কমে যাবে তোমার। তুমি গাছ তলায় শুয়ে পড়ো না উত্তরা।

তুমি আর হাঁটতে পারছ না?

গাছ তলায় শুয়ে পড়েছ!

তোমাকে ফেলে সবাই চলে গেছে!!

তুমি একা পড়ে রয়েছ এক প্রান্তহীন মাঠে!!

দাঁড়াও উত্তরা! আমাকে একটু নিঃশ্বাস টানতে দাও.... তোমার কাছে আসবার সময় দাও...

এবার তুমি আর একা নেই। এই দেখ আমি এসে গেছি। তোমার শিয়রে আমি বসে আছি। তোমার মুখের উপর থেকে রুক্ষ চুল সরিয়ে দিতে দিতে কথা বলছি। দেখ তোমায় আমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছি—

আচ্ছা, খাস কলকাতার ছেলে—যার চৌদ্দ পুরুষের কেউ কোনদিন পূর্ববাংলায় যায় নি, তাতে আবার ধনীর ঘরের একমাত্র দুলালের পক্ষে সাপ খোপ জল জঙ্গলের দেশে গিয়ে এক জমিদার কন্যার সঙ্গে প্রেমে পড়ার ভেতর বেশ একটা নাটক রয়েছে না উত্তরা?

তবে নাটকটা আমি শুরু করিনি। করেছিলেন আমার ছোটমামা। বাঙ্গাল বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে এসে তোমার দিদিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরলেন তিনি। খুব সহজে যদিও তোমার দিদিকে তিনি বিয়ে করতে পারেন নি। অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিল। তখন দু'বাংলাই দু'বাংলাকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখত। দিদিমা তো দু'পা ছড়িয়ে বিলাপ করতেই বসে গিয়েছিলেন। বাঙ্গাল দেশের মেয়েদের ছিরি ছাঁদ নেই। কথায় নেই মিষ্টতা। চলে যেন দস্যির মতো। পা ফেলে যেন ঘোড়ার মতো...আরো আরো কত খুঁত যে বাঙ্গালদেশের মেয়ের বের করলেন তিনি তার শেষ নেই। তবু শেষ পর্যন্ত ছেলের কাছে নতি স্বীকার করতে হলো। তোমরা খুব বড় লোক— তোমরা বিক্রমপুরের জমিদার—এটা বড় রকম সহায় হয়েছিল ছোটমামার। নইলে হয়তো এ বিয়ে সম্ভব হতো না।

ছোটমামা তার পছন্দের কন্যাকে বিয়ে করতে পারলেন বলে তার জীবনে নাটক সেখানেই থেমে গেল। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারলাম না বলে আমার জীবনের নাটক ক্রমেই জমে আসতে লাগল। এই যে গাছতলায় তোমার শিয়রে বসে রয়েছি— এ কি কম নাটক উত্তরা?

যাক্ শোনঃ

বাঙ্গাল মেয়েটি আমার ছোট মামীমা হয়ে এলেন। তার কাছে গল্প শুনে শুনে পূর্ববাংলাকে আমি চিনে ফেলতে লাগলাম। ছোট মামীমার কাছে তার দেশের জল নদী ধান ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের কথা শুনতে আমার এত ভালো লাগত যে বার বার শুনতে চাইতাম। ছোটমামীর দেশ আর বাপের বাড়ির কথা বলতে ক্লান্তি ছিল না। তার আর একটা অভ্যাস ছিল— কাজ করতে করতে প্রায় সব সময়ই শুনতাম গুন্‌গুন্ করে গান গাইতেন। আজ হঠাৎ দিকে দিকে 'আমার সোনার বাংলা' শুনে মনে পড়ছে এটা ছিল মামীর প্রিয় গান। কত যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁকে এ লাইনটা গাইতে শুনতাম— 'তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।'

—গানটা শুনবে? না থাক। গান বড় কাঁদায়। এসো কথাই বলি।

সবই তো তোমার জানা কথা?

তাতে কি হয়েছে উত্তরা? যৌবনের চিঠি পড়ে না বসে বৃদ্ধ দম্পতি? দুজনেরই জানা কথার দিকে তাকিয়ে সেই সুখ, সেই দুঃখ বেদনার ভেতর আবার অবগাহন করার আনন্দ কি কম? জানা কথা কখনো শুনতে, কখনও বা শোনাতে ইচ্ছে করে। তুমি অসুস্থ। আজ আমি তোমাকে শোনাই।

ছোট মামীর ঐ গান শুনে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'তুমি কেন ছোট মামীমা কেবল পূর্ববাংলার দিকে তাকিয়ে তার আকাশ বাতাসের বাঁশি শোন। বাংলা তো কলকাতাও।'

ছোট মামীমা হেসে ফেললেন, 'আমি পূর্ববাঙ্গলার দিকে তাকিয়ে এ গান করি, তুই বুঝতে পারিস? আশ্চর্য তো!'

'বুঝব না কেন? গাইতে গাইতে তুমি মাঝে মাঝেই দীর্ঘশ্বাস ফেল। তুমি কলকাতাকে ভালোবাস না?'

'সে কি রে! কলকাতাকে ভালবাসব না কেন? কলকাতা কি আমার দেশ নয়?'

—তবে তুমি কেন কেবল পূর্ববাংলার বাঁশি শোন?

—ছোট মামা যে মুখ দেখে ভুলেছিলেন, সেই সুন্দর মুখের দুই ভুরুতে টান দিয়ে, মাথাটা সামনে পেছনে ভঙ্গিমা করে নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, 'ওখানে জন্মেছি। বড় হয়েছি। ওখানেই বিয়ে হয়েছে। জন্ম, মৃত্যু বিয়ে; জীবনের বড় তিনটের দুটোই ওখানে হয়েছে। মৃত্যু কোথায় হবে জানিনা। জানতেও চাই নে। শৈশব-কৈশোরের প্রিয় দিনগুলি যেখানে রেখে এসেছি, তাকে কি ভোলা যায়? তাকে ভালোবাসব না তো ভালোবাসব কাকে।'

আমাদের দেশ তো দেখিস নি। দেখলে বুঝতিস তার মাটি কি তাজা। জলে কি বেগ। গাছ কি সবুজ। আকাশ কি স্বচ্ছ। মাঠ প্রান্তর ধানের ক্ষেতের কি শোভা। মাঠ ভরা হলদে সরষে ফুলের হাওয়ায় দোলা যদি একবার দেখিস, জীবনেও ভুলতে পারবি নে। নদী—কত যে নদী, আর কত সুন্দর সুন্দর যে তার নাম। চল একবার তোকে সরষে ফুলের হাওয়ার দোলা দেখিয়ে নিয়ে আসি। তুই তো কবি। কেমন সুন্দর কবিতা লিখেছিস স্কুল ম্যাগাজিনে। পূববাঙ্গলার জল নদী মাটির গান তুই আমার চাইতেও বেশী শুনতে পাবি।

আমি সদম্ভে বললাম, কেন তা হবে? তোমার জন্মভূমি বলে পূববাংলার মত জায়গা যেমন তোমার কাছে 'আর হয় না'; আমার জন্মভূমি কলকাতাও আমার কাছে ঠিক তেমনি। কলকাতার মত জায়গা আমার কাছে 'আর হয় না।'

ছোট মামীমা হঠাৎ হাতের কাজ ফেলে উঠে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—ওমা কি দারুণ ছেলে। এই তো কথার মত কথা। এমনি বড় বড় অহংকার দিয়েই তো সত্যিকার মানুষ চেনা যায়। তুই নিশ্চয়ই অনেক বড় হবি।

আমাকে ছেড়ে দিলেন।

একটা নিঃশ্বাস পড়ল তার।

আমার বড় হবার সম্ভবনাময় আশার সঙ্গে ছোট মামীমার নিঃশ্বাসটা একেবারেই মানাল না। ঐ বয়সে আমার ঠিক বোঝার কথা নয়, তবু কিন্তু আমার কেন জানি মনে হলো, ছোট মামীমা আমার ছোট মামাকে 'বড়' দেখতে চাইতেন। কিন্তু তিনি তা দেখতে পেতেন না। সেই বেদনাই তার নিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে এলো।

জানো উত্তরা, ছোটমামীমার বুকের কোথাও একটা নিদারুণ কান্না ছিল। এখন যেমন আমি উপস্থিতকে দুহাতে দূরে ঠেলে রাখবার জন্য পুরানো কথায় ডুবে থাকতে চাচ্ছি— ছোট মামীমাও যেন তেমনি কান্না ভুলবার জন্য কেবল তার বাপের ঘরের কথায় আর তার দেশের কথায় ডুব দিয়ে থাকতে চাইতেন। ছোটমামা ছোট মামীমাকে নির্বাচন করেছিলেন বড় সুন্দর। কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন নি ঠিক মত। শিশু যেমন চাওয়া জিনিস না পেলে হাত পা ছোঁড়ে, পেলে ফেলে দেয়, ছোট মামা যেন ছোট মামীমাকে নিয়ে সেই শিশুর খেলাই খেলেছিলেন। বাড়ি মানুষ তোলপাড় করে বিয়ে করেছিলেন। বাড়ি মানুষ তোলপাড় করেছিলেন বটে। কিন্তু সমাদরে অবহেলা ঘটিয়েছিলেন। ছোট মামীমার ভাবপ্রবণতা ছোট মামার কাছে ছিল বড় অবজ্ঞার বস্তু। ছোট মামীমার অনুভব তাতে বড় মার খেত। বোধহয় তাই তিনি বেশী দিন বাঁচলেন না।

উত্তরা তুমি কাঁদছ। মাপ করো উত্তরা। তুমি যে তোমার দিদির কথা শুনে কাঁদবে— আমার খেয়াল হওয়া উচিত ছিল। কি বলছ? দিদির কথা শুনতে তোমার ভালো লাগছে? না উত্তরা তবু তাঁর কথা আর নয়। তাকে নিয়ে তো আমি গল্প লিখতে বসিনি।

তোমার কথায় চলে আসি।

কিন্তু তোমার কথায় আসতে হলে সবার আগে আমাকে পূর্ববাংলায় চলে আসতে হয়।

তা সেখানে আসতে দেরি করার আমার কিছু কারণও নেই। সত্য বলতে ছোট মামীমার কাছে পূর্ববঙ্গীয় টানে তাঁর প্রাণের পূববাঙ্গলার কথা শুনতে শুনতে— তোমাদের দেশ, তোমাদের জমিদার বাড়ি, বুড়িগঙ্গা নদীর ঢেউ আছড়ে পড়া তোমাদের নদীর ঘাট— আমার মনেও বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করে ছিল। আর তখনও বাঁশির ডাকের ভেতর না হলেও দেখার আগ্রহের ভেতর তুমিও ছোট্ট করেছিলে। ছোট মামীমার সব কথার বেশী অংশ জুড়েই থাকত তার দেশ, নয়তো ছোট্ট উত্তরা। যার জন্মের পর মুহূর্ত থেকে অন্য সব পদ ছুঁড়ে ফেলে গুরু গম্ভীর দিদি সেজে বসেছিলেন তিনি। তার গল্প আমার মনে তোমার প্রতিও ঔৎসুক্য এনে দিয়েছিল। মোট কথা— সব মিলিয়ে আমি তখন পূর্ববাংলার নদী বেষ্টিত বিক্রমপুরের এক জমিদার বাড়ি বেড়াতে আসবার জন্য ব্যাকুল।

পূজো এসে গেল।

ছোট মামীমা তোমাদের কাছে আসবার জন্য বাক্স-পেটরা গোছাতে লাগলেন। তাঁর তখন চলায় আনন্দ। বসায় আনন্দ। মুখের হাসি মিলায় না। ছোটমামা খোঁচা দেন, 'বাপের বাড়ি যাবার খুশি দেখ্ অমল তোর ছোট মামীমার। সম্বোধনের আগে একটা 'ছোট' থাকলেও—তিনি যে এখন আর ছোট নেই, বাপের বাড়ি যাবার নামে এতো নাচা যে তার উচিত নয় তাও ভুলে গেছেন।'

'নাচা' কথাটা বোধহয় ছোট মামীমার বিশ্রী লেগেছিল। ভুরুতে একটা ভাজ পড়তেও যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি তা ফেললেন না। বরং—

আবার সেই ছোট মামীমার কথায়ই এসে পড়লাম!!

ব্যাপারটা হলো কি জানো উত্তরা, ছোট মামীমার চরিত্রে গল্পের উপাদান ছিল। আমার লেখক মন— যদিও লেখক হবো একথা তখন আমি ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু যা ভবিষ্যতে হবো, আমি না জানলেও সে মনটা তো ভেতরে ছিল ঠিকই। আমার সেই ছোট লেখক মনকে ছোট মামার চরিত্র টানত। মামাবাড়িটা ছিলও কাছে। আমি ঘুরে ঘুরেই তার কাছে চলে আসতাম। ছোট মামীমা বেঁচে থাকলে তাঁকে নিয়ে আমার কলম খুলে বসতে হতো— এই আমার দৃঢ় ধারণা। এই যেমন তোমাকে নিয়ে বসতে হলো।

যাকে নিয়ে লিখতে বসা হলো না, তাকে ছেড়ে দিয়ে, যাকে নিয়ে লিখতে বসতে হলো, এবার তাকে ধরব। তাই পূর্ববাংলায় রওনা হচ্ছি এবার।

মাকে বললাম, ছোট মামীমার সঙ্গে আমিও যাবো বেড়াতে।

মা খাড়া আকাশ থেকে মাটিতে পড়লেন। ছোট মামীর সঙ্গে কোথায় বেড়াতে যাবি? সে বাপের বাড়ি যাচ্ছে—অজ গাঁয়ে। ওয়ালটেয়ার গোপালপুর যাচ্ছে না।

বললাম, গ্রামেই যাবো বলছি।

পাগল আর কি! সেই সাপখোপের দেশে আবার কেউ বেড়াতে যায়?

আমি যাবই।

মাও দেবেন না-ই।

ওখানে বিষ সাপ ঠেলে পথ চলতে হয়। পাগলা শেয়াল উঠোনে দৌড়োয়। জলের মধ্যখানে দ্বীপের মতো বাড়িঘর—টুপ করে পড়লেই হলো— গেলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরবি নে।

ছোটমামীমা ফিরবেন না বুঝি?

তার বাড়িঘর। জন্ম থেকে ঐ সবের মধ্যেই সে বড় হয়েছে। তার কি।

তবে আমারও ভয়ের কিছু নেই। ছোটমামীমার সঙ্গে যখন ওদের ভাব আছে, তখন আমাকে কামড়াবে না।

মা রেগে কেঁদে হৈ হৈ কাণ্ড বাধালেন। আমিও মা'র চারগুণ অতিরিক্ত তালে ঐ কাণ্ডগুলো করতে লাগলাম। মা ছেলের ব্যাপার দেখে বাবা হেসে বললেন, যাক ঘুরে আসুক। অত ভয় পাবার কিছু নেই।

দেখলাম, ছোটমামা আমি যাচ্ছি শুনে ভারি খুশি। পূজোর সময় কলকাতা ছেড়ে গ্রামে বসে থাকা কি পোষায়। ঢাকা হলেও বা কথা ছিল। ছোট মামা আমার পিঠে এক থাপ্পর মেরে বললেন, সাবাস ছেলে। মাকে রাজী করিয়ে ছেড়েছিস? তবে আমি আর যাচ্ছি না। তোর সঙ্গেই তোর মামীকে পাঠিয়ে দেবো। কি পারবি না নিয়ে যেতে?

সগর্ব বললাম, খুব পারব।

ছোট মামা উৎসাহের চোটে তখনই সব আমায় বাতলে দিতে বলেন। বললেন, শিয়ালদা স্টেশনে আমিই তুলে দিয়ে আসব তোদের। আর মুন্সিগঞ্জ-ঘাটে তোর ছোট মামীমার বাড়ি থেকেই নৌকো নিয়ে লোক থাকবে। শুধু সকাল বেলা গোয়ালন্দ স্টীমার ঘাটে তোর মামীকে স্টীমারে তুলতে হবে। পারবি না?

পুরো দায়িত্বটা থেকে ছেটে কেটে বাস দেওয়াটা মোটেই মনঃপূত হচ্ছিল না আমার। অধৈর্য কণ্ঠে বললাম, কি যে বল! কেন পারব না। স্কুলের এস্‌কারশনে আমাকে ক্যাপটেন করে জানোনা বুঝি?

এবার আমার পিঠ চাপড়ালেন ছোট মামা। সামনের বছর কলেজে যাবি— লায়েক হতে আর বাকি কি। যা মামীকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়— তোকে খুব ভালো একটা কলম দেবো।

ছোট মামা আমি যাচ্ছি শুনে আমার চাইতেও খুশি।

—সব সংবাদ নিয়ে ছুটে এলাম মামীমার দরবারে। মামীমা বাক্স গোছাচ্ছিলেন। বললেন, মা বুঝি অনুমতি দিয়েছেন?

হাঁ। মামীমার খাটের উপর বসে পড়ে স্যুটকেসের ডালা ধরে বললাম, গোছানো শেষ ক'রো না। আমার কাপড় জামা ভরতে হবে।

ছোট মামীমা বললেন, তোকে নিয়ে গিয়ে আমি মরি আর কি। আমি নিয়ে যাচ্ছিনে তোকে।

গম্ভীর ভাবে বললাম, তুমি আবার আমাকে নিয়ে যাবে কি। আমিই তো তোমাকে নিয়ে যাবো।

কথাটার মানে হেঁয়ালি ঠেকছে। তুই নিয়ে যাবি আমাকে— কথাটার মানে কি রে অমল?

বললাম, 'তোমাকে নিয়ে যাবার ভার আমার উপর দিয়েছেন ছোট মামা।' বুকে হাত দিয়ে নিজেকে দেখালাম।

'তাই!' তেমনি স্যুটকেশ গুছোতে গুছোতেই ছোট মামীমা বললেন।

তখনও বোধ হয় ছোট মামা যে যাচ্ছেন না, এ কথাটা ধরতে পারেন নি ছোট মামীমা।

আমি বললাম, 'ছোট মামা বললেন, আমাকে যেতে হচ্ছিল তোর মামীমাকে পৌঁছে দেবার জন্য। তুই যখন যাচ্ছিস তখন আর আমার যাবার দরকার নেই।'

ছোট মামা যে কথাগুলো ঠিক এ ভাবে বলেন নি—তুমি জানো উত্তরা। কিন্তু তাই বলে আমি মিথ্যেও বলিনি। ছোট মামার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ করলে এই কথাগুলোই তো সত্যি দাঁড়ায় উত্তরা— যে, ছোট মামা বাধ্য হয়ে যাচ্ছিলেন পুরুষ চলনদারের প্রয়োজনে? এখন আমাকে সে ভারটা দিচ্ছেন?

একটি চৌদ্দ বছরের কিশোরের কাছে পুরুষের কাজের ভার পাওয়া যে কি ব্যাপার তা তুমি বুঝবে না উত্তরা। কিশোরীর কাছে তরুণী হওয়ার সংবাদ মনোরম। কিন্তু ওজনদার নয়। বরং সে তখন আরো হাওয়ায় ওড়ে। কিন্তু একটি কিশোরের কাছে পুরুষ হওয়ার সংবাদ বড় ওজনদার। সে হাতের মাসলের দিকে তাকায়। গিরিশৃঙ্গে ওঠার কথা ভাবে। এ সংবাদে—টগ্‌বগিয়ে মায়ের পাশে পাশে চলার রাঙা ঘোড়ার রংটা হঠাৎ তার চোখ থেকে খসে পড়ে যায়। তার ঘোড়া আরো টগ্‌বগিয়ে ওঠে।

ছোট মামীমা যে আমার কথা শুনে হঠাৎ একবার আমার দিকে তাকালেন; নীরব হয়ে গেলেন। স্বামীর এই কথায় যে তিনি অপমানিত বোধ করছেন— এ সব আমি খেয়ালই করলাম না। আমি তখন টগবগে ঘোড়ায় চেপে খোলা তলোয়ার হাতে ছোট মামীমার সঙ্গে চলেছি। পাছে তিনি আমার ঘোড়াকে 'রাঙা ঘোড়া' ভেবে বসেন, সে ভয়ে আমি তখন মনে মনে কাতর।

নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে অপরের কথা ভাববার সময় থাকে না। নইলে নিশ্চয়ই আমি বুঝতাম, ছোট মামার না যাওয়ার কথাটা এ ভাবে বললে ছোট মামীমা আঘাত পাবেন। বুঝলাম না তো বটেই, বরং আরো উল্টোটাই করলাম। ছোট মামার কথার নিগূঢ় অর্থ টেনে বার করে আনলাম।

ছোট মামীমা চুপ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য সেটা। তারপর বললেন, 'তবে দৌড়ো। মায়ের কাছ থেকে জামা কাপড় নিয়ে আয়। গত বারের পূজোর ধুতি পাঞ্জাবীর সেটটা নিয়ে আসিস। পূজোর সময় ধুতি পাঞ্জাবী পরবি।'

আমি ছুটলাম মায়ের কাছে জামা কাপড় নিয়ে আসতে।

উত্তরা—আমরা পথ চলতে বেরিয়েছি।

ধীরে ধীরেই চলি।

আমরা তো কোথাও পৌঁছতে চাইনে।

বরং না পৌঁছতেই চাই।

যেখানে যেতে চাইনে, সেখানে গিয়ে পৌঁছোনোর গতি দ্রুত করে কে?

মনে যা পড়ছে বলে যাই—

আমি ছোট মামীর সঙ্গে তোমাদের কাছে আসবার জন্য যাত্রা করলাম।

তখনও দেশ ভাগ হয়নি। ভাগ হতে পারে এমন কল্পনাও কেউ করতে পারত না। ঢাকা কলকাতা ভিসা পাসপোর্ট? পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কথা বলে যদি কিছু থাকে, তবে এটা সেই রকম কথা। তখন ভিসা পাসপোর্ট শব্দটাই বলতে জানত ক'জন? অর্থতো দূরের কথা। তখন পূর্ববাংলায় আসা বিদেশে যাওয়া ছিল না। ছিল দেশে ফেরা। পূজোর সময় শেয়ালদা স্টেশনে ভিড়ের চাপ এমন হতো, মনে হতো কলকাতা শহরটাই বুঝি পূব দিকে ছুটছে। ছোট মামীমার কাছে পূর্ববাংলার মানুষদের ঘরে ফেরার কত কত মজার গল্প যে শুনেছি তার ঠিক নেই। সে সব গল্পের ভেতর না গিয়ে যেটা ফ্যাক্ট ছিল সে কথাই বলি। ছোট মামীমা বলতেন, পূজোর সময় দেশে আর কিছু না নিয়ে গেলেও পূজো-সংখ্যা যে ক'খানা বের হতো, সব ক'খানা নিয়ে যেতে হতোই। নইলে কর্তাদের নাকি বাড়ি ঢুকতে দিতেন না গিন্নীরা।

শুনে সে বয়সেও আমি অবাক হতাম। তোমাদের দেশ তো শুনতে পাই জল জঙ্গল সাপের দেশ। সেই জঙ্গলের মধ্যে সাপের মুখে বসে বই পড়ে কারা? দেশটা দেখার পর বুঝলাম, নদীর স্রোত কেবল নিজের মনেই বয়ে চলে না। মানুষের মনকেও তার সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে। চলা মনের বই না হলে চলবে কেন?

ছোট মামীমার কথায়, 'আমাদের দেশ যদি দেখতিস তবে বুঝতিস, সেখানকার মাটি কি তাজা। জলে কি বেগ। হাওয়া কি দুর্দম। আমার মনে হয় তোমাদের দেশের মানুষ মাটির তেজ, জলের বেগ, হাওয়ার দুর্দমতা—প্রকৃতির এই উপাদান গুলো জল মাটি হাওয়া থেকে শুষে নেয়। তাই তোমাদের মাটিতে গিয়েই সবার আগে টেররিজিমের বীজ ঘরে-ঘরে বাসা বেঁধেছিল। আজও আবার সবার আগে সে মাটি-ই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যারা মারে—তাদের মারার জন্য। তারা মারছে আর মারছে। নদী আপন স্রোতের সঙ্গে সমান তালে বয়ে নিয়ে চলেছে. রক্তের স্রোত ভ্রূক্ষেপ না করে। সে জানে তার জল আবার সাদা হবেই।

তুমি আজ গাছ তলায় শুয়ে আছ কেন—যতক্ষণ সম্ভব আমি সে কথা থেকে দূরে থাকতে চাই, এ কথা তুমি জান।

গাছ তলায় তোমার এ শয্যা শেষ শয্যা কিনা তাও আমি এক্ষুণি জানতে চাই না—তবু তোমার কানে কানে একটা কথা বলে রাখি উত্তরা, রাক্ষুসী পদ্মার বাড়ি ঘর গ্রাসের মতো রাক্ষুসী ক্ষমতা লোভী রাজনীতি তোমাদের ঘর বাড়ি গ্রাস করে দেশ ছাড়া করেছে। একদিন পদ্মাপাড়ের মানুষগুলোকে তাদের টিনের ঘর, বাঁশেরে ঘর ভেঙ্গে মাথায় তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু শুধু এই বেরিয়ে পড়ার জন্যই একদিন গোটা বিক্রমপুরের মানুষ শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নতিতে শক্তিতে— সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। সর্বক্ষেত্রে তারা একদিন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। পদ্মা যেমন বাড়ি ঘর গ্রাস করেছিল কিন্তু মানুষগুলোকে গ্রাস করতে পারে নি, রাজনীতিও ঐ বাড়ি ঘরই গ্রাস করতে পারবে—মানুষগুলোকে গ্রাস করতে কখনও পারবে না।

আজ ফুটপাতে বসে দেশ হারানো মেয়েরা পান বানাচ্ছে। শাড়ি বিক্রি করছে। আরো কত কি করছে। তারা মান জলাঞ্জলী দিয়েছে। লাজ জলাঞ্জলী দিয়েছে। প্রবৃত্তি জলাঞ্জলী দিয়েছে। সব জলাঞ্জলী দিয়ে বাঁচার যুদ্ধে নেমেছে। দেখে, এ জীবন-যুদ্ধ তাদের দু হাতে কত শক্তি এনে দেয়। সব জল যেমন সমুদ্রে মেশে, তাদের এই বিচার হীন ভালো মন্দ নোংরা কুৎসিত সব শক্তিও একত্রে মিশবে। মিশে একদিন শক্তির সমুদ্র হয়ে দেখা দেবে। সে শক্তির কাছে দাঁড়াবার শক্তি কারু হবে না। তুমি আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কানে নিয়ে যাও উত্তরা।

ফার্ষ্টক্লাশ রিজার্ভেশন ছিল আমাদের। পূজার ভিড়কে ঠেলে প্ল্যাটফরমে রেখে আমরা কামরায় উঠে এলাম। রাত দশটায় ট্রেন ছাড়বে। তখনও মিনিট দশেক বাকি— ট্রেন ছাড়ার। ছোটমামা না নিয়ে যাওয়ার অপরাধকে কমানোর জন্যই বোধ হয় নিজের হাতে বিছানাপত্র খুলে ঠিক ঠাক ঠাক করে দিতে লাগলেন। আমরা বসলে তিনি নিজেও বসলেন। ছোটমামীমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, 'দিনরাত নদীর সিঁড়িতে বসে থেকোনা সুমিত্রা।'

সুমিত্রা অবাক চোখে বললেন, 'নদীর ঘাটে বসে থাকব কেন?'

ছোট মামা সকৌতুকে বললেন, 'ভাবতে':

এবার সুমিত্রা হাসলেন।

আমি কামরার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

ছোট মামা বললেন, খুব খুশি লাগছে না?

তার উত্তরেও সুমিত্রা হাসলেন।

ঘড়ি দেখে ছোট মামা উঠে দাঁড়ালেন। কি ভাবে আমাকে গোয়ালন্দ ঘাটে ষ্টীমারে উঠতে হবে সেটা আবার ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি কামরা থেকে নেমে জানালায় এসে দাঁড়ালেন। গাড়ী নড়ে উঠল। ছোটমামা সুমিত্রার হাতের উপর হাত রেখে বললেন, 'ভালো থেকো। চিঠি দিও।'

তাতেও সুমিত্রা শুধু হাসলেন।

গাড়ী আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো। ছোট মামা গাড়ীর সঙ্গে চলতে চলতে বেশ অভিমানের সঙ্গেই যেন বললেন, 'কই তুমি তো একবারও আমায় সাবধানে থাকতে বা ভালো থাকতে বললে না সুমিত্রা?'

এবার সুমিত্রা বেশ শব্দ করে হেসে উঠলেন।

গাড়ীর স্পীড বেড়ে গেল। ছোট মামা সুমিত্রার হাতের উপর থেকে হাত তুলে নিয়ে একলক্ষ্যে তাকিয়ে রইলেন ছোট মামীর দিকে।

গাড়ী স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল। ছোট মামা আমার দিকে তাকিয়ে হাত তুললেন। আমিও তুললাম। মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললাম, তুমি ভেবোনা ছোট মামা। আমি ঠিক মামীমাকে ভালোভাবে নিয়ে যাবো।

ছোট মামার সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে থাকার ভেতর কি ছিল—জানি না। কিন্তু আমি সেই মুহূর্তে ছোট মামাকে ক্ষমা করে ফেললাম। ছোট মামীমার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মনে হল যেন কান্নায় তার চোখ মুখ ফেটে আসছে। আমি অন্য দিকে তাকিয়ে যাত্রীদের বিছানা পাতা, স্যুটকেস গোছানো দেখতে লাগলাম। ছোট মামীর ডাকে মুখ ফেরালাম। তিনি বললেন, কি ভালোই লাগছে। কাল এ সময় আমরা বাড়িতে বসে আছি। বাবা ঠিক মুন্সিগঞ্জে আসবেন নৌকা নিয়ে। উত্তরাটাও কি ছাড়বে। ঠিক চলে আসবে।'

ছোট মামীমার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল।

বুঝলাম, কলকাতার বিষাদকে কলকাতায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, মা বাবা ভাই বোনদের সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে গেছেন।

ছোট মামীমা আর আর আমি দু জনেই কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বাতিরছুটে চলে যাওয়া দেখলাম। তারপর আমরা শুয়ে পড়লাম, যাত্রীদের টুকিটাকি কথা কানে আসতে লাগল। এক সময় তাও থেমে গেল। ... ছোট মামা না আসাতে ছোট মামীমা খুব আঘাত পেয়েছেন। আমি না এলেই আর এই আঘাতটা তাকে পেতে হতো না। তা আমি কি জানতাম যে আমি এলে ছোট মামা কেটে পড়বেন। কলকাতা ফিরে টেস্টের জন্য খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে বিমলকে বিট করতেই হবে। এবার আমি সেন্টজেভিয়ার্সে পড়ব না। সেখানে মেয়েরা পড়ে না। আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়ব। সেখানে মেয়েরা পড়ে। নিশ্চয়ই কোন একটি সুন্দর স্মার্ট মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। বড়দার কাছে যেমন তার ইউনিভারসিটির বন্ধু কল্যাণীদি আসেন তেমনি আমার সেই বন্ধুও আমাদের বাড়ি আসবে। মা বলেন কল্যাণীকে নিশ্চয়ই খোকা বিয়ে করবে। আমি যখন ইউনিভারসিটিতে যাবো— তখনও নিশ্চয়ই সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকবে। মা বলবেন...নাম যে জানিনে মেয়েটির।

সুমিত্রা—যাঃ এতো ছোট মামীমার নাম! লজ্জা লাগল ভীষণ। উত্তরা—এও তো ছোট মামীর ছোট বোনের নাম। মঞ্জুলা? বাজে। অসীমা? দূর। কোন নামই মনঃপূত হয় না। মেয়েটির নাম পছন্দ করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে বিছানার উপর বসলাম। স্বপ্ন দেখেছি, আমায় সাপে কেটেছে। ছোট মামীমা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করছেন, ওর মাকে গিয়ে আমি কি বলব। বাবা ওকে বাঁচাও। নইলে আমিও নদীতে ঝাঁপ দেবো।

ছোট মামীমা আমাকে উঠে বসতে দেখে বললেন, 'কিরে উঠলি যে?'

'এমনি। তুমি ঘুমোও নি?'

—'আমার ট্রেনে ঘুম আসে না।'

আমি আবার শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলা ছোট মামীর হাতের ঠেলায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

ছোট মামীমা হেসে বললেন 'আরে ছেলে! এই তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ? গোয়ালন্দ এসে গেছে যে।'

আমি ভীষণ লজ্জা পেলাম।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে স্যুটকেশ বাক্স টেনে নামাতে গেলাম।

ছোট মামীমা হেসে উঠলেন।—'আরে দাঁড়া দাঁড়া কুলি আসতে দে। অত তাড়ায় কিছু নেই। ট্রেনের এটাই শেষ স্টেশন। সামনে পদ্মা।' বলে, হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ঐ দেখ পদ্মা। দেখেছিস কখনো এত বড় নদী?

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বিশাল পদ্মার বুকে ষ্টীমার দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, 'বাবা কত বড় নদী।'

ছোট মামীমা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বললেন তবু তো এখানটা পদ্মার তেমন চওড়া নয়। এরপর দেখবি এপার ওপার দেখা যাবে না।'

এর মধ্যে কুলি এসে গেছে। যদিও বাক্স বিছানা কুলির মাথায় তুলতে আমিই সাহায্য করলাম। কিন্তু তবু আমি মামীমাকে নিয়ে যাচ্ছি, না তিনি আমায় দিয়ে যাচ্ছেন সে বিষয়ে আমার মনেই সন্দেহ এসে গেল।

ছোট মামীমা আগে নেমে, আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'নে ধর, আমার হাত ধরে নাম। এখানে মস্ত একটা গর্ত রয়েছে। পড়ে যাবি।'

আমি মামীমার হাত ধরে নেমে এসে বললাম, 'এই নাকি তোমাদের প্রসিদ্ধ গোয়ালন্দ স্টেশন।'

'এমন স্টেশন পৃথিবীতে নেই।' ছোট মামীমা আমার হাত ধরে রেখে কুলির পেছনে চলতে চলতে বললেন।

আমি হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বললাম, হাত ছাড়োনা। আমার হাত ধরে রেখেছ কেন? আমি থামলাম।

ছোট মামীমা বললেন, 'আরে থামছিস কেন! কুলিগুলো কোথায় হারিয়ে যাবে না ভিড়ের মধ্যে। পা চালিয়ে চল। আমি তোর হাত ধরে রাখব কেন। দেখছিস না কি উঁচু নীচু গর্ত— পড়ে যাই যদি তাই আমি তোর হাত চলেছি। মামা বলে দেন নি, গোয়ালন্দে তোর মামীমাকে হাত ধরে নিয়ে যায়। পথ চলতে তো ওস্তাদ। গর্তে পড়ে হাত পা ভেঙ্গে বসবি। তাই যদি হয় তখন কি বলবি মামাকে গিয়ে?'

কথাটা ছোট মামা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি যে সে জন্য আমার হাত ধরে চলছেন না, বুঝলেও এ কথার পর আর হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার উপায় রইল না।

নদী পাড়ের এবড়ো থেবড়ো মাটির ওপর গোয়ালন্দ ঘাট। মানে স্টেশন। মাথার ওপর আকাশ। সামনে নদী। আসে পাশে কতকগুলো চালাঘর। মানে হোটেল। নদীর উঁচু পাড়ে ঢেউ এসে আঘাত করছে—তার কি গর্জন। এরই ভেতর একটা ঢালু জায়গা চলে গেছে ষ্টীমারের গা পর্যন্ত। সেখান দিয়ে স্রোতের মতো মানুষ বিছানা বাক্স বোঁচকা গাঁটরি নিয়ে নেমে যাচ্ছে ষ্টীমারে উঠবার জন্য। মানুষের স্রোতটা গিয়ে থেমে পড়ছে ষ্টীমারের কাছে। মাটি থেকে তিনখানা তক্তা বেঁধে ষ্টীমারে উঠবার যে জেটি বানানো হয়েছে তাতে পাশাপাশি দু জনের বেশী যাওয়া যায় না। ভিড়টা সেখানে জমাট বাধছে। মাথার উপর ঝড়ো হাওয়া বইছে। ষ্টীমার দুলছে। ঘাটে বাঁধা ছই ঢাকা বড় বড় নৌকোগুলি ঢেউ-এর বাড়িতে আছাড় খাচ্ছে। মাঝি মাল্লারা হাঁকছে। খালাসীরা দড়ি কাছি নিয়ে ছুটোছুটি করছে— সব মিলিয়ে এ সবের নূতনত্বে আমি যেন কিছুটা বিহ্বল হয়েই গিয়েছিলাম।

ছোট মামীমা আমার হাত ধরে কুলির পেছন পেছন ঢালু পথ দিয়ে নেমে এলেন। জেটির কাছে এসে আমাদেরও থামতে হলো। ষ্টীমারের দোতলার কেবিন উঠে ছোট মামীমা বললেন, 'কি ভিড়। ষ্টীমারের খোলে ধরলে হয়।'

উঠবার সময় দেখেছিলাম ষ্টীমারের গায়ে লেখা রয়েছে 'এমো'। বললাম, 'ষ্টীমারটার নাম কি 'এমো' ছোট মামীমা?'

'এমো অষ্ট্রিচ্ কিউই— কত নামের ষ্টীমার আছে। এটা তা হলো এমো।'

কুলির মাথা থেকে মালপত্র ধরে নামাতে গিয়ে হেসে ফেললাম।

ছোট মামীমা কুলিদের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসলি যে?'

বললাম, 'আমি তোমাকে নিয়ে এলাম, না তুমি আমাকে নিয়ে এলে, সেই কথাটা ভেবে।'

'আমরা দু জনে যাচ্ছি। কেউ কাউকে নিয়ে যাচ্ছি নে— কি বলিস? তোর ছোটমামা যদি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না ভেবে 'দুজনে যাচ্ছি' ভাবতে জানতেন তবে ঠিক ভাবতেন। ভুল ভাবেন বলে ভুল চলেন।'

হঠাৎ যেন আমি ছোট মামীমার বন্ধু হয়ে গেলাম। বললাম, 'তুমি ঠিকটা বলে দাও না কেন?'

ছোট মামীমা মাথা নাড়ালেন। বললেন, 'ভেতরে না থাকলে বলে কিছু হয় না। উল্টোত্যাক্ত হয়। বলাকে, বক্তৃতা দেওয়া ভাবে।'

ছোট মামীমার সঙ্গেই আমার কথা, যত গল্প। কিন্তু তা হলেও কোন দিনও তিনি এভাবে ছোট মামাকে নিয়ে কথা বলেন নি।

জলের ওপর বোধ হয় মানুষের ভাব পরিবর্তন ঘটে। টলমলে জল মনকেও টলমলে করে তোলে। যেটা শক্ত মাটি সহজে হতে দেয় না।

স্যুটকেস খুলে আমার হাতে ধোয়া পাজামা পাঞ্জাবী, পেষ্ট ব্রাস ধরে দিয়ে ছোট মামীমা বললেন, যা হাত মুখ ধুয়ে রাতের জামা কাপড় বদলে আয়। ডেকে বসে চা খাবো আমরা।

বেয়ারা এসে চায়ের অর্ডার নিয়ে গেল।

আমি তৈরি হয়ে এসে দেখলাম, ছোট মামীমা তৈরী হয়ে বসে আছেন। তিনি স্নান করেছেন। একখানা গেরুয়া রং এর কালো পাড় শাড়ি পরেছেন। চুল পিঠের উপর ছড়ানো। ডেকে তখন পর্যন্ত কেউ আসেনি। আমি আসতে একটু চমকে উঠলেন। বোধহয় ছোট মামার কথাই ভাবছিলেন।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

চা রুটি মাখন ডিম কলা মিষ্টি। ছোট মামীমা বললেন, ভালো করে পেট ভরে খেয়ে নাও। যদিও বারোটার ভেতর মুন্সিগঞ্জ-ঘাটে পৌঁছে যাবো। কিন্তু বাড়ি যেতে একটা বেজে যাবে। নৌকোতে যাওয়া — সময় নেয়। জোয়ার না পেলে, হাওয়া উল্টো দিকে বইলে এক ঘণ্টার জায়গায় দুঘণ্টাও লেগে যেতে পারে।

জাহাজ চলতে লাগল।

আমরা চা খেতে লাগলাম।

ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলেছে 'এমো'। আর কেবল বাঁশি বাজাচ্ছে, ভোঁ....ও....ও....ও। বোধ হয় গভীর জলের নাগাল পাচ্ছে না। জল মেপে মেপে সন্তর্পণে এগুচ্ছে। আর সে কথাটাই বলছে বাঁশিতে।

আশ্বিনের আকাশে মেঘলা রং।

হাওয়াটা ঝড়ো।

হাওয়ায় উথাল-পাথাল ভাবটা আরো কিছু কম থাকলে বেশী ভালো লাগত। হাওয়ার দাপটে মাথার ওপর পাখাটা নিজে নিজে ঘুরছে।

আমার নদী পাড়ি দেওয়া, ষ্টীমারে চড়া, ডেকে বসে চা খাওয়া—এই প্রথম। আমি বেশ অভিভূত বোধ করছিলাম। ছোট মামীম হাত দিয়ে ষ্টীমারের সামনেটা দেখিয়ে বললেন 'ঐ যে পাখীগুলি উঠছে, এগুলিকে বলে গাং চিল। ওরা সব সময় ষ্টীমারের আগে আগে উড়ে চলবে দেখিস। পাখীগুলি পথ দেখায় ষ্টীমারকে।'

পাইলট পাখী এগুলি? সমুদ্রে পথ হারানো জাহাজকে দ্বীপে পৌঁছে দেয় যে পাখী— ঔৎসুক্যে উঠে গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে গলা বাড়ালাম পাইলট পাখী দেখবার জন্য। ছোট মামীমা ছুটে এসে আমায় টেনে ধরলেন— 'আরে, অত ঝুঁকছিস যে। উল্টে পড়ে যাবি তো। ষ্টীমারের রেলিং কত নীচু দেখছিস না?'

'আমি বাচ্চা নাকি?'

'দুর্ঘটনা বুঝি কেবল বাচ্চাদেরই ঘটে? বড়দের ঘটে না? তুমি অত ঝুঁকো না।'

আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হলো।

হঠাৎ নদীর বুকে কালো ভূশণ্ডি মতো একটা কিছুকে জল থেকে মাথা তুলে ডিগবাজী খেয়ে মুহূর্তে ডুবে যেতে দেখে, সেদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম— 'এটা কি ডিগবাজী খেয়ে জলের মধ্যে ডুব দিল ছোট মামীমা?'

ছোট মামীমা বললেন, 'শুশুক মাছ।'

'মাছ? খাই আমরা?'

'না এ মাছ খায় না।'

'কেন?'

'নিশ্চয়ই স্বাদ ভালো নয়। নয়ত বিষ। আমি ঠিক জানি না।'

ছোট মামীমা আর আমি দুজনেই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নদী দেখতে লাগলাম।

ছোট মামীমা বললেন, 'আমরা নৌকোতে কিন্তু পদ্মা দিয়ে যাবো না। যাবো ধলেশ্বরী নদী দিয়ে। দেখিস একটা আশ্চর্য জিনিষ দেখাবো তোকে। এক নদীর জল অন্য নদীর জলের সঙ্গে কখনোই মিশে যায় না। যেখান থেকে যে নদী আরম্ভ সেখান থেকে সে নদী তার নিজের রং নিয়ে বয়ে চলেছে। পদ্মা মাটি খেয়ে খেয়ে ঘোলা রং ধরেছে, ধলেশ্বরীর রং সাদা। দেখবি দুটো নদীর মাঝখান দিয়ে স্পষ্ট রেখায় ঘোলা হলদে জলের আর সাদা জলের রেখা টানা রয়েছে। শীতলক্ষ্যা ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা মেঘনা সব নদী একখানে নয়ত অন্য খানে একের সঙ্গে মিলেছে। যেখানে মিলেছে সেখানটা তুই চোখে দেখে বুঝতে পারবি। একই জলের স্রোত জোয়ার ভাঁটা নিয়ে যাওয়া আসা করে কিন্তু কেউ কারু রং হারায় না। আশ্চর্য নয়? আর এই আশ্চর্য ক্ষমতা আছে বলেই ওরা বেঁচে আছে। রং হারালে নামও হারাত। কেউ আর শীতলক্ষ্যা বুড়িগঙ্গা মেঘনা থাকত না। সবাই পদ্মা হয়ে যেত। তাতে পদ্মার গৌরব বাড়ত। কিন্তু ওরা মরত।' ছোট মামীমা একটি নিঃশ্বাস টানলেন।

ছোট মামীমা এই জাতীয় কথার পরে— অর্থাৎ যে সব কথা খুব আবেগ দিয়ে বলতেন, আমি দেখেছি সে সব কথার শেষে তিনি নিঃশ্বাস ফেলতেন। আমি যখন বলেছিলাম, 'তোমার জন্মভূমির মতো যেমন তোমার কাছে 'আর হয় না'— তেমনি আমার জন্মভূমি কলকাতার মতোও আমার কাছে 'আর হয় না।' আমার কথা শুনে খুশিতে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে বলে উঠেছিলেন, 'দেখিস তুই অনেক বড় হবি।' সেদিনও কিন্তু কথার শেষে একটি নিঃশ্বাস পড়েছিল তাঁর। সে কথা তোমায় আগেও বলেছি উত্তরা। কিন্তু সে দিনের কথাটার অর্থ আমি ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু নদীর নিজস্ব রং না হারাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথার পর কেন তার নিঃশ্বাস পড়বে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি অমন করে নিঃশ্বাস ফেললে কেন?'

ছোট মামীমা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কি রকম করে রে?'

'একটু বড় করে।'

ছোট মামীমা বললেন, 'তুই কোন স্কুলে পড়িস?'

'বা, তুমি বুঝি জান না!'

'বল্ না।'

'মিশনারি স্কুলে পড়ি।'

'আমি তোর মা হলে তোকে মিশনারি স্কুলে পড়তে দিতাম না।'

ভীষণ বিস্মিত হলাম। বললাম, 'কেন পড়তে দিতে না?'

ছোট মামীমা জবাব দিলেন না। নদী দেখতে লাগলেন।

আমি থমথমে মুখে বললাম, 'তোমাদের পূর্ববাংলার মেয়েদের বোঝা খুব কঠিন।'

ছোট মামীমা আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন; বললেন, 'ছোট মামার মুখে শুনতে শুনতে কথাটা শিখে ফেলেছিস। যাঃ, তোকে পূর্ববাংলার মেয়েদের চিনতে হবে না। তোর বিয়ে পশ্চিমবাংলার মেয়ের সঙ্গেই দেবো। এখন পদ্মার গল্প শোন। পদ্মা কিন্তু ভয়ঙ্কর নদী। মাটি খেয়ে পদ্মা গোলা রং ধরেছে— কথাটার মানে তুই নিশ্চয়ই বুঝিস নি? পাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখিস। দেখবি কিভাবে পদ্মা তার ঢেউ-এর বাড়িতে তীর ভেঙ্গে ভেঙ্গে মাটি খাচ্ছে। আর শুধু কি পাড় খাচ্ছেরে অমল? গ্রামের পর গ্রাম খাচ্ছে।'

'তবে পদ্মার পাড়ে লোক থাকে কেন?'

'যতদিন থাকা সম্ভব, ততদিনই থাকে। যখন বোঝে পদ্মা খেতে আসছে, তখন সরে পড়ে।'

'কি করে বোঝে পদ্মা খেতে আসছে?'

'বুঝতে পারে মাটিতে ফাটল ধরে। গ্রামের যত ভেতরেই হোক না কেন মাটিতে ফাটা চিহ্ন দেখলেই বুঝতে হবে, মাটির তলা দিয়ে পদ্মা সেখানে পর্যন্ত এসে গেছে। তখন লোকজনরা বাড়িঘর ভেঙ্গে নেবার মতো যা আছে নিয়ে সরে যায়। তারপর একদিন দেখা যায় মাটিতে চিড়ধরা জায়গা অবধি সব তলিয়ে গেছে। পদ্মা বইছে সেখান দিয়ে।

আমি আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনতে লাগলাম।

ছোট মামীমা বললেন, আর কিছুক্ষণ বাদেই আমাদের ষ্টীমার এমন একটা জায়গার উপর দিয়ে যাবে অমল, যেখানে দেশবন্ধু সি. আর. দাশের বাড়ি ছিল। দেশবন্ধুর দেওয়া স্কুল ছিল। হাসপাতাল ছিল। আমি সব দেখেছি। বাড়ি স্কুল হাসপাতাল। আমার মেসোমশাই ছিলেন সেই হাসপাতালের ডাক্তার। সমস্ত গ্রাম সেখানে বিনে পয়সায় নিদান পেত। বিধান পেত। ওষুধ পেত। এমন কি পথ্য পেত। বিনা চিকিৎসায় কেউ মরত না।'

এ সব কথা উত্তরা বেশীদিন আগের কথা তো নয়?

ঐ বুকগুলো গেল কোথায়?

আজ হাসপাতালে বাচ্চা হচ্ছে মেঝের উপর। ঠাণ্ডা ঘরের অভাবে বন্ধ থাকছে অপারেশন। নষ্ট হচ্ছে ওষুধ। ঘরের অভাবে মরছে রাস্তায়। আর বড় বড় বাড়ির ঠাণ্ডাঘরে বসে অপরিমেয় বিলাস করছে কিছু লোক।

...একটু থামতে হচ্ছে উত্তরা। দ্বিধা লাগছে। লজ্জা করছে। কিন্তু তোমার কাছে বড় কথা বলে, নিজের কথা লুকোবো না।....আমর কিন্তু একটা ঠাণ্ডাঘর আছে। ঠাণ্ডা মেশিন আছে। গাড়ি আছে।...পায়ের তলায় পুরু কার্পেট আছে। লিখে এ সব—করেছি?....হাঁ...হাঁ না...এই —আচ্ছা এখন থাক। কি করে এ সব হলো পরে বলব। কিন্তু সপাং করে তোমার চাবুক আমার পিঠে এসে পড়লো, তখন বুঝলাম, বলার দরকার নেই। তুমি জানো আমার কি করে এসব হয়েছে। কিংবা এ সব আমাদের কি করে হয় তোমরা সবাই-ই তা জানো।

ছোট মামীমা তখন বলছেন, 'সি. আর. দাসের সে বাড়ি এখন এই পদ্মার তলায়। রাক্ষুসী পদ্মা সব গ্রাস করেছে।'

'সেই বাড়ির উপর দিয়ে এখন আমাদের ষ্টীমার যাবে?'

'হাঁরে।'

আমি দস্তুরমতো উত্তেজনাবোধ করতে লাগলাম। যে ঘরে দেশবন্ধু জন্মেছিলেন, যে ঘরে তিনি মায়ের বুকের তলায় গুটিগুটি হয়ে মায়ের বুকের দুধ খেতেন— সে ঘর এখন এই পদ্মার নীচে। আমি মাথা নীচু করে জলের তলার দৃষ্টিটাকে নিয়ে গিয়ে যেন সেই ঘরটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

হঠাৎ ছোট মামীমা একটা কিছু আবিষ্কার করার করে বলে উঠলেন, 'আরে নারে অমল, পদ্মা রাক্ষুসী নয়। এ বাড়ি পদ্মা না নিলে কি হাল হতো বাড়িটার বল তো? পোড়া বাড়ি হয়ে থাকত না? সাপ-খোপের বাসা হতো না? তা কেন হতে দেবে পদ্মা। বাড়ির ওপর দিয়ে নদী বইয়ে দিয়েছিল। পদ্মা মা তোমাকে প্রণাম করি।' যাকে মুহূর্ত আগে রাক্ষসী বলে গাল দিয়েছিলেন, সেই পদ্মাকেই এবার দুহাত জোড় করে প্রণাম করলেন তিনি।

'তুমি প্রণাম করলে কেন?

'করতে হয়।'

'কেন করতে হয়?'

'এই প্রণামের দরজা—বড়দের আদর্শ জীবনে ঢোকার পক্ষে বড় সুন্দর পথ। তুমিও প্রণাম কর অমল।

উত্তরা, সঙ্কোচবোধ করছি বলতে, আমারও ইচ্ছে হয়েছিল মামীমার মতো হাত জোড় করে প্রণাম করি। কিন্তু ঐ লজ্জাই তা করতে দিলো না। ছোট মামীমাকেও লজ্জা করত, কিন্তু আমাদের কেবিনের ডেকে আরো দুটি পরিবার চেয়ার ঘিরে বেশ জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। তাদের জন্যই আমার হাত আর কপালে উঠলো না। আমাদের জীবন থেকে প্রণাম চলে গেছে। এখনও অন্তঃসলিলা নদীর মতো মনের ভেতর যদিও বয়। কিন্তু আর ক'দিন বাদে তাও থাকবে না।

আমাদের 'এমো' এখন আর ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে জল মেপে পা ফেলছিল না। সোজা চলেছিল। কিছুটা তীর ঘেষে—একটু ঢিমে তালে।

হঠাৎ 'এমোর' গতি বেড়ে গেল। তার শরীর কাঁপতে লাগলো থরথর করে। সে কম্পনে আমাদেরও পা থেকে কোমর পর্যন্ত কেঁপে চললো। শুরু হলো শব্দের এক বিচিত্র মৃদু ঐকতান। 'এমোর' হৃদপিণ্ডের ঝক্‌ঝক্, যাত্রীদের ট্রাঙ্কে বাঁধা ঘটির ঘটাং ঘটাং, রেষ্টুরেন্টের কাপ ডিস ছুরি কাঁটার টুং টাং। এবার 'এমো' গভীর জলের নাগাল পেয়েছে। তার স্পীডোমিটারের কাঁটা কেঁপে কেঁপে ঘুরে চলেছে পাঁচ থেকে দশ, দশ থেকে পনেরো। একটা দীর্ঘস্থায়ী টানা ভোঁ...ও....ও....ও শব্দের গুরুগম্ভীর বাঁশি বাজিয়ে এমো পাড়ি জমালো পদ্মায়।

'এমোর' বাঁশির গভীর গম্ভীর আওয়াজ আমার মনে আবার সেই প্রণাম করার ইচ্ছাটা এনে দিল।

একটা যান্ত্রিক শব্দকে বড্ড বেশী বাড়িয়ে ফেললাম বলে মনে হচ্ছে কি তোমার উত্তরা?

হয়তো তাই হলো। আমি কিছুটা উছল মনেই ছিলাম সে দিন।

কিন্তু তবু বলব উত্তরা, ষ্টীমারের বাঁশির গভীর চাপা আওয়াজের মধ্যে একটা গম্ভীর আবেগ আছে। যেন অতল জলের অন্তর থেকে আওয়াজ উঠে আসছে। আমার ট্রেনের বাঁশি যেমনি খারাপ লাগে, ষ্টীমারের বাঁশি তেমনি ভালো লাগে। বাঁশি দুটোর শব্দের ভেতর এতো তফাত কেন আমি জানি না। এ তফাৎটা যদি যান্ত্রিক হয়, তবে বলব আশ্চর্য। আর যদি মানুষের দেওয়া হয়, তবে বলব যিনি দিয়েছেন তিনি শিল্পী। ট্রেনের বাঁশির শব্দ ষ্টীমারে, আর ষ্টীমারের আওয়াজ ট্রেনে— মনে মনে বদল করে দেখো— চলেই না। একটা শব্দ। অন্যটা আওয়াজ।'

শুনলাম ছোট মামীমা গুনগুন করছেন, 'বসে আছি হে— কবে শুনিব তব বাণী—'

তুমি তো জানই, তিনি কখনো গলা ছেড়ে গাইতেন না। গান করতেন প্রায় সর্বক্ষণ। হাতের কাজের সঙ্গে গান তার গলায় থাকতোই। কিন্তু তাঁর গান ছিল পুরোটা শুধু নিজের জন্য। কাউকে শোনাবার জন্য তাঁকে কেউ কোনদিন গান গাওয়াতে পারেনি। কিন্তু শোনবার মতো গান জানতেন। আমি মাথাটা ছোট মামীমার কিছু কাছে নিয়ে যেতেই তিনি গান থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ গান তোর গান নয়। এ গান আমার।'

'বেশ আমার গানই একটা গাও না।'

'তোর গান কি?'

'তুমিই তো বললে এটা আমার গান নয়। আমার গান যেটা সেটা গাও। আমি তো জানি সব গানই সবার।'

'তা কি হয়। 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা—' এটা কি তোর গান হতে পারে? তোকে উত্তরা গান শোনাবে। সে ভারি সুন্দর গায়।'

রেলিং থেকে হাত তুলে নিয়ে ছোট মামীমা বললেন, 'আমি কেবিনে যাচ্ছি। তুই যাবি?'

'তুমি চলে গেলে, আমি বুঝব কি করে সি. আর. দাশের বাড়ির উপর দিয়ে কখন ষ্টীমার যাচ্ছে?

'সেটা আমিই কি বলতে পারব নাকি রে? এই বিশাল পদ্মার কোথায় সে জায়গা তা আমিও ধরতে পারব না। তুই যাবি না থাকবি এখানে?'

'নদী ফেলে আমি নড়ছিনে। মাত্র ষ্টীমার স্পীড নিয়েছে। তার শরীর থর থর করে কাঁপছে। এখন কেবিনে ঢোকে নাকি? তুমিই বা যাচ্ছ কেন?'

ছোট মামীমা বললেন, 'আমি অনেক দেখেছি। আরো অনেক দেখব। ঘুম ঘুম লাগছে। তুই নতুন। তুই দেখ। কিন্তু রেলিং-এ বেশী ঝুঁকে দাঁড়াস না।'

ছোট মামীমা চলে গেলেন।

আবার তক্ষুণি ফিরে এলেন। একখানা পাতলা চাদর আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'বেশ ঠাণ্ডা। জলের হাওয়া তো। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নে।

তারপর বললেন, 'রাতে ঘুম হয়নি। আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। যদি না জাগি স্টেশন এলে জাগিয়ে দিস কিন্তু। যেমন গোয়ালন্দে তোকে আমি দিয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'যাও ঘুমোও গিয়ে। আমি ঠিক জাগিয়ে দেবো।'

'বল্ তো আমরা যেখানে নামবো সে স্টেশনের নাম কি?'

'মুন্সিগঞ্জঘাট।'

'ঠিক বলেছিস। নামটা ভুলিস না। ভুলে গেলে স্টেশন এলেও তুই বুঝবি নে। আমাকেও জাগাবিনে। আমার বাড়ির লোকেরা তো আর তোকে চিনবেন না। তুইও তাদের চিনবি নে। তারা আমি আসিনি ভেবে ফিরে যাবে। জাহাজও মুন্সিগঞ্জ থেকে ছেড়ে দেবে।'

'তবে আমরা কোথায় চলে যাবো?' মনে মনে মুন্সিগঞ্জঘাট মুন্সিগঞ্জঘাট নাম জপতে জপতে জিজ্ঞাসা করলাম।

'তবে আমরা কোথায় চলে যাবো?' মনে মনে মুন্সিগঞ্জঘাট নাম জপতে জপতে জিজ্ঞাসা করলাম।

'তবে আমরা নারায়ণগঞ্জ চলে যাবো। সেটা তেমন একটা বিপদ অবশ্যি নয়। নারায়ণগঞ্জে আমার মাসী বাড়ি। একখানি ঘোড়ার গাড়ী ডেকে চলে যাবো মাসীর কাছে। তিনি মহাখুশি হবেন। তারপর একেবারে তাকে নিয়ে চলে আসব মার কাছে। সেও মন্দ হবে না।'

'না না—আমি মুন্সিগঞ্জ ভুলব না। আমার লেখার মধ্যে নাকি বেশ মুন্সিয়ানা থাকে, একদিন মাষ্টার মশাই বলেছিলেন। ঐ মুন্সিয়ানা শব্দটা দিয়েই আমি মুন্সিগঞ্জ মনে রাখব।'

ছোট মামীমা হেসে চলে গেলেন।

প্রথম কিছু সময় ঐ 'মুন্সিগঞ্জ-ঘাট' নাম ভুলে যাবার ভয় আমার দেখার ব্যাঘাত ঘটাতে লাগলো। তারপর ভুলে গেলাম তাকেও।

তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর আমাকে এ পথ অনেকবার টেনে নিয়ে এসেছে। এ পথে বহুবার যাতায়াত করেছি আমি। কিন্তু আজকের যাওয়া আর সে সব যাওয়ার প্রভেদ ছিল অনেক। এ যাত্রার পর যত বারই গেছি, তোমার কাছে তখন ষ্টীমারের ঢিমে চলা আমার মনের দ্রুত চলার সঙ্গে তাল রাখতে পারত না। পথ আমার কাছে দীর্ঘ মনে হতো। আমি সময় গুণতাম, কখন পৌঁছোবো। কখন তোমায় দেখব। তখন লক্ষ্য তুমি। পথ তোমার কাছে যাবার উপায়।

কিন্তু এবারের যাত্রায় পথই আমার লক্ষ্য। আমি কারু কাছে যাবার জন্য চলছি না। আমি দেশ দেখতে চলেছি। একটা নতুন জায়গা দেখার উত্তেজনা যে একটি তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হবার মতো— সেটা তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছি। আমি পথের একটা দৃশ্যও নজর থেকে ফস্‌কে দিচ্ছিলাম না। দু চোখ পেতে দেখেছিলাম পদ্মার বুকের সংসার। নৌকা, মাঝি, গাংচিল, শুশুক মাছ, মাছ ধরা, স্রোতের টানে কচুরি পানার ভেসে চলা। আর দেখেছিলাম, ঢেউ আর ঢেউ। সূর্যের আলো পড়ে ঢেউ সোনা রং হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে গলানো সোনার ঢেউ উঠছে আর পড়ছে। পড়ছে আর উঠছে; ষ্টীমারের বিরাট চাকা নদীর সোনা গালানো জল মন্থন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। জেলে নৌকাগুলি ষ্টীমারের শব্দ পেয়েই ত্রস্ত হাতে যতটা পারে ষ্টীমারের ঢেউ-এর আওতা থেকে নৌকাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঢেউ তাদের আছড়াচ্ছেই। নৌকোগুলি ঢেউয়ের বাড়িতে একবার তলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ডুবেই বুঝি গেল। কিন্তু ভেসেও উঠছে আবার তখনই। ঢেউ যেন কতগুলি রোদে পোড়া কালো কালো মানুষকে মৃত্যুর মাথায় নাচাতে থাকে।

পদ্মাপাড়ের সংসার কিন্তু বেশীটাই রইল দৃষ্টির বাইরে। বর্ষার ভরা পদ্মা সমুদ্রের মতোই প্রায় একূল ওকূল দুকূল বিহীন। সামান্য দু এক জায়গায় মাত্র পদ্মা তন্বী। সেখানেই শুধু তীর দেখা যায়।

যেখানে তীর দেখা যায় সেখানে আমি সাগ্রহে লোকজন গ্রাম দেখার জন্য চেষ্টা করি। লোকজন বিশেষ চোখে পড়ে না।

মাথায় কোন বোঝা নিয়ে দু একজন হেঁটে যাচ্ছে—

কোথাও চাষীরা ক্ষেতে কাজ করছে—

ছোটরা দাঁড়িয়ে ষ্টীমার যাওয়া দেখছে—

গ্রামের মেয়ে বৌ পদ্মার জলে কলসী ভরছে। ষ্টীমার দেখে তারাও ঘোমটা ফাঁক করে তাকাচ্ছে—

ভরা কলসী নিয়ে কেউ কেউ আঁকাবাঁকা পথে চলেছে—

দেখা যায় দূরে কিছু মাটির ঘর, টিনের ঘর— ধান রাখবার মরাই— গরুর জাবর কাটা।

দেখা যায়, কিছু গরু, ছাগল মাঠে চরছে।

শুধু টুকরো টুকরো কতগুলি ছবি। ছবিতে তৃষ্ণা মেটে না তো। সেটা মেটানোর জন্য রেখে দিলাম উত্তরা তোমাদের গ্রামকে।

ছোটমামীর মুখে শোনা পদ্মার গ্রাম-গ্রাস না দেখলেও মাটি-গ্রাস চোখের উপর দেখতে লাগলাম। দুরন্ত ঢেউ-এর অবিশ্রান্ত বাড়িতে পদ্মার উঁচু পাড়ের মাটির বড় বড় চাঙ্গড় ঘাস আর কাঁটা ঝোপ নিয়ে ভেঙ্গে পড়ছে জলে। শব্দ হচ্ছে ঝুপ্ ঝুপ্। পদ্মা সেই মাটি গিলে ফেলছে এক থাবায়।

এই পাড় খাওয়াটা বোধহয় পদ্মার প্রতিদিনের সাধারণ খাওয়া। আর গ্রাম খাওয়াটা বোধহয় তার বিশেষ উৎসব দিনের আহার।

এর মধ্যে গোটা কয়েক স্টেশনে 'এমো' ভিড়েছে। 'এমো' কোনো স্টেশনে ভেড়া মাত্র ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকোয় গ্রামের দোকানীরা তাদের পসরা নিয়ে যাত্রীদের কাছে বিকি করতে আসছে। এটা দেখতেও বেশ লাগে। দই ক্ষীর দুধ কলা চিড়ে মুড়ি মিষ্টি মোয়া—কত কি যে নৌকোর দোকানীর হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে যাত্রীদের হাতে দেয়। যাত্রীরাও ঝুঁকে পড়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে সে সব কেনে। ষ্টীমারের খাবারের দাম অনেক। তাই যাত্রীরা নৌকোর খাবার কেনার জন্য ভিড় জমিয়ে ফেলে। বাচ্চাদের জন্য টাটকা দুধ কেনে। তা আবার গরম। থার্ডক্লাস ডেকে তখন বাচ্চাদের দুধ খাবার ধুম পড়ে যায়।

বারোটার সময় মুন্সিগঞ্জে ষ্টীমার পৌছোনোর কথা। এগারোটার পর থেকেই কোনো ষ্টেশন এলেই আমি তাড়াতাড়ি স্টেশনের নাম দেখতে ছুটি। নয়তো কাউকে জিজ্ঞাসা করি, 'এটা কি ঘাট? মুন্সিগঞ্জ কখন আসবে?'

'এমো' বাঁশি বাজাচ্ছে ভো...ও...ও...।

কোন স্টেশন এসেছে। একজন যাত্রীকে দুবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মুন্সিগঞ্জ কখন আসবে। সে ভদ্রলোক এবার নিজেই এসে ডেকে বললেন, 'খোকা মুন্সিগঞ্জে ভিড়বে এবার ষ্টীমার।'

তাড়াতাড়ি কেবিনে গিয়ে ছোট মামীমাকে ঠেলে তুললাম। 'উঠে পড়ো। আমাদের মুন্সিগঞ্জ এসে গেছে।'

ছোট মামীমা উঠে বসলেন। অগোছালো শাড়ি একটু গুছিয়ে নিয়ে, চিরুণী নিয়ে চুলটা পাট করে, জিনিস পত্র গোছানোয় হাত দিলেন। আমিও হাত লাগালাম। হোল্ডঅলের ষ্ট্রেপ বাঁধতে বাঁধতে বললাম, ' ছোট মামীমা এবার তার জন্মভূমিতে এসে গেছেন।'

ছোট মামীমা হাসলেন।

বাঁধাছাদা করে আমরা ডেকে এসে দাঁড়ালাম।

ষ্টীমারের চাকা শ্লথ গতিতে ঘুরছে।

দূরে মুন্সিগঞ্জ স্টেশন দেখা যাচ্ছে।

আমি বললাম, 'ছোট মামীমা, আমাদের কিন্তু শোধবোধ হয়ে গেছে।'

মামীমা আমার দিকে তাকালেন।

'আমি বললাম, গোয়ালন্দে তুমি আমাকে ডেকে তুলেছ। মুন্সিগঞ্জে আমি তোমাকে ডেকে তুললাম। গোয়ালন্দের কথা নিয়ে তুমি গল্প করতে পারবে না কিন্তু।

ছোট মামীমা মুখ টিপে হেসে বললেন; 'তুই আমায় নিয়ে এলি। নইলে কোথায় হারিয়ে যেতাম এ কথা কেমন করে বলি দেখিস।'

আমি সত্যিই রেগে গেলাম। বললাম, 'তুমি আমাকে এত শিশু ভাবো কেন বলত? আমার চাইতে কত বড় তুমি শুনি?'

অবাক বিস্ময়ে গালে হাত দিলেন ছোট মামীমা— তোর চাইতে কত বড় আমি?

বললাম, 'তোমার বয়স চব্বিশ। তুমি ছোট মামার চাইতে দশ বছরের ছোট মা বলেছেন। কিন্তু কই ছোট মামাতো তোমাকে ছোট ভাবেন না। তবে তুমি আমাকে এত ছোটো ভাবো কেন? আমি তো তোমার চেয়ে নয় বছরের ছোট মাত্র। তুমি ছেলে হলে আমার সমান একটা মেয়েকে তো দিব্যি বিয়ে করে ফেলতে। যেমন মামা

তোমায় করেছেন। একটা ছেলে তার চাইতে বারো চৌদ্দ কুড়ি বছরের ছোট মেয়েকে বিয়ে করে। আর তোমরা, ছেলেরা তোমাদের চাইতে ছোট হলেই বুড়ি সেজে বসে থাকো।'

ছোট মামীমা সকৌতুকে আমার দিকে তাকিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। আমার কথা শেষ হতেই ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কথার মতো কথা বলেছিস বটে। এটা গবেষণা করবার মতো বিষয় সন্দেহ নেই।'

আমি ছোট মামীর পরিহাসে এবার আরো চটে গেলাম। 'যাও, তুমি আমাকে ছোট ভাবো গিয়ে। ছোট মামা আমাকে মোটেও ছোট ভাবেন না?'

ছোট মামীমা বললেন, 'তোর ছোট মামার তো অন্যকে বড় ভাবতে পারলেই সুবিধে। নিজের দায় কমানো যায়। তাই তুই বড়। আমি বড়। কিন্তু তাড়াতাড়ি বড় হয়ে লাভ কিরে অমল? এই তো বেশ আছিস। যখন বড় হবি তখন দেখবি জীবনের সুন্দর দিন এই যাচ্ছে। চারিদিক থেকে ভালোবাসার হাত তোকে বেষ্টন করে রয়েছে—এমন দিন বড় হয়ে আর পাবি নে। তখন আসবে তোর বেষ্টন করার দিন। তখন দেখবি বিনা মূল্যে—এমন কি দেউলে হয়েও কত দিয়ে যেতে হয়। আর যেদিন তা দিতে ঠেকে যাবি, সে দিন দেখবি তোকে নির্দয়ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ডাষ্টবিনে তারাই, যাদের তুই জীবনের সব দিয়েছিস। যতদিন ছোট আছিস, থাকনা ছোটই। আমরাও পাই। তুইও পা। যেদিন বড় হবি— আমাদেরও হারাবি, সেদিন থেকে জানবি তোরও হারানোর দিন আরম্ভ হলো।

কি ছিল ছোট মামীমার কথায় জানি না। কথাগুলির অর্থও আমি তেমন ধরে উঠতে পারিনি। তবু কেন একটা কান্না গলায় উঠে এলো সত্যি আমি বুঝে উঠতে পারলাম না উত্তরা। সবাইকে হারিয়ে ছি, আমারও হারানোর দিন শুরু হয়ে গেছে, হয়তো এই ছবি আমার বুকে আঘাত করেছিল।

মুন্সিগঞ্জে 'এমো' নোঙ্গর ফেলেছে।

এবার আমি তোমার কাছে সোজা চলে আসব উত্তরা। যদিও মুন্সিগঞ্জ থেকে নৌকোয় চেপে ধলেশ্বরী দিয়ে যাওয়া আমায় কম মুগ্ধ করেনি। কিন্তু স্টেশনে নেমে পড়েছি। এখন সরাসরি তোমার কাছে চলে আসতে ইচ্ছে করছে। পথে শরীর মন ঢেলে দিয়ে নৈসর্গিক শোভা দেখা যায়। কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌঁছে আর কোন দেখার দিকে চোখ যেতে চায় না। তখন যার কাছে এসেছি তার কাছে মন ছোটে। আর দেরি সয় না।

নৌকো এসে তোমাদের বাঁধানো ঘাটে লাগলো। মাঝি মাল্লারা তোমাদের নিজেরে মস্ত চারমাল্লাই নৌকোকে ঘাটের দু দিকে বাঁশ পুঁতে তাতে বাঁধলো। ছোট মামীমা বললেন, এটা আমাদের খালের ঘাট। নদীর ঘাট দূরে বলে এখানেই নৌকো লাগালাম।

আমি কিন্তু খাল আর নদীর কোন তফাৎ বুঝলাম না। ধলেশ্বরী নদীর জল আর তোমাদের খাল তখন মিলেমিশে একাকার। খালের জলের রঙ নদীর জলের। ঢেউ বইছে। ছলাৎ ছলাৎ করে পাড়ে পড়ছে। ছোট মামীমা নৌকো বাঁধতে না বাঁধতেই লাফ দিয়ে সিঁড়িতে নেমে পড়লেন ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু নায়েব মশাইকে নির্দেশ দিয়ে দিতে ভুললেন না যে আমাকে হাত ধরে নামাতে হবে। আমি সে কথা কানে নিলাম না। ছোট মামীমার মতো লাফ দিয়েই নৌকো থেকে সিঁড়িতে নামলাম। ছোট মামীমা এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, দস্যি ছেলে।

তোমাদের জমিদার বাড়ি তার মাঠ ঘাট সিং-দরজা নিয়ে যেন দ্বীপের মতো জলের উপর ভাসছে। আমি তোমাদের মস্ত গেটের মাথায় থাবা গুটিয়ে বসে থাকা সিংহ দুটোকে ভালো করে দেখে নিয়ে তারপর ঘাটের ভীড়ের দিকে তাকালাম। আত্মীয় স্বজন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী সব এসে জড়ো হয়েছেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে।

একটা উৎসব পড়ে গেল ছোট মামীমাকে নিয়ে। এ হাত বাড়িয়ে প্রণাম করে। সে হাত বাড়িয়ে প্রণাম করে। ছোট মামীমা তাদের নানা সম্ভাষণ জানান। আবার ছোট মামীমাও একে প্রণাম করেন। তাকে প্রণাম করেন। সেই ভিড়ের মধ্যেও তোমার মাকে চিনে নিতে আমার অসুবিধা হলো না। জমিদার গৃহিনীর আভিজাত্য পূর্ণ বৈশিষ্ট্য তো ছিলই—তাঁকে চিনে নেবার পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। তারপর ছোট মামীমার চেহারা এতই তাঁর মায়ের মতো ছিল যে, আমাকে কেউ কিছু বলবার আগেই আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। ছোট মামীমা হেসে বললেন, 'ওমা, অমল তুই আমার মাকে চিনলি কি করে?' 'আমি সলজ্জ কণ্ঠে বললাম, তোমার মতো দেখতে যে।'

তোমাকে তখনও দেখিনি। পরে দেখলাম তোমার চেহারাও ঠিক তোমার মায়ের মতো। আমাদের দেশের মেয়েরা বলেন, মায়ের চেহারা পেলে নাকি মেয়েরা দুঃখী হয়। উত্তরা, তোমার আর ছোট মামীর জীবন দেখে এই সংস্কারটা যেন আমার ভেতরেও ঢুকে গেছে। আমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে যখন দেখি সে তার মায়ের চেহারা পায়নি, পেয়েছে আমার চেহারা—সত্যি তখন আমার ভালো লাগে। অন্তত একটা দুঃখের সংকেত ওর চেহারায় অনুপস্থিত।

তোমার বাবা যে জমিদারী সংক্রান্ত জরুরি কাজে সরজমিন সফরে বেরিয়েছেন সে খবর আমরা নৌকোতেই শুনেছি। তোমাদের নায়েব মশাই গিয়েছিলেন আমাদের আনতে। আমার চোখ তখন খুঁজছিল তোমাকে। ছোটো মামীমার উত্তরীকে দেখছিনে কেন? আমার সব কৌতূহল সব ঔৎসুক্য তখন তোমাকে দেখবার জন্য।

তোমাদের মা বাবা আত্মীয় পরিজন এমন কি পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেকের সঙ্গে দিনে দিনে অনেক পরিচয়, অনেক হৃদ্যতা আমার হয়েছিল। কিন্তু তাদের নিয়ে বা তোমাদের জমিদার বাড়ির হালচাল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজ আমি কিছু লিখতে বসব না। যদিও সে সব নিয়েও লেখার মতো, বলার মতো অনেক আছে। কিন্তু কচুরিপানা ঠাসা খাল বিলের উপর দিয়ে নৌকোকে মাঝি যেমন সড়সড় শব্দে টেনে নিয়ে যায়—আমি ঠিক তেমনি করে আমাদের দুজনের নৌকোটাকে অন্য সব কথার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলতে থাকব। আর তোমাদের ভাষায় আমার মাত্রও দখল নেই।

তাই সে চেষ্টা আমি করবই না। তোমাদের কথা অমার ভাষায়ই বলে যাবো।

ছোট মামীমা তখন বলছেন, 'উত্‌রি কোথায় মা? তাকে দেখছিনে যে?'

আমিও ছোট মামীর জিজ্ঞাসার উত্তরটা শুনবার জন্য তোমার মায়ের দিকে তাকালাম। তোমার মা বললেন, 'তোর উত্‌রির কথা কে বলবে? সে এই ভর দুপুরে মাছ ধরতে গেছে তোর জন্যে। আমরা নাকি সব রুই কাতলা রেঁধেছি। তুই নাকি সে সব মোটেই ভালোবাসিসনে। তুই ভালোবাসিস পুঁটিমাছ ভাজা। সে তাই ধরতে গেছে।'

ছোট মামীমা বললেন, 'আজ আমি উত্‌রির সঙ্গে কথা বলব না। ওর জন্য ছুটে আসি। ওর মুখটা সবার আগে দেখতে চাই। আর লক্ষ্মীছাড়ি চলে গেছে মাছ ধরতে।'

সবাই বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন।

কে যেন বললেন, 'এই উত্‌রি, উত্‌রি করে সেই ছোট বেলা থেকে সুমি পাগল হলো। নিজের কোলেও একটা এলো না। তবে এটা যেত!'

আর একজন কে বললেন, 'এবার সুমিকে ষষ্ঠীমায়ের খানে নিয়ে যাবো। ষষ্ঠীমায়ের গাছে সিঁদুর বেঁধে দিলে সন্তান হয়।'

ছোট মামীমা রেগে গেলেন, 'হ্যাঁ, নিজের ছেলে হলেই সুমি উত্তরাকে ভুলে যাবে। যতসব কথা। উত্তরাই আমার মেয়ে। এবার আমি ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো। কি, দেবে তো মা?'

মা বললেন, 'আমি তো বাঁচি। ছিপ বঁড়শি নিয়ে দিনভর এ পুকুর সে পুকুরে মাছ ধরছে রোদ নেই বৃষ্টি নেই। আর নয়তো খাল বিল পুকুর সাঁতরাচ্ছে। চেহারার যা ছিরি হয়েছে দেখবি।'

'কিছু বল না কেন?'

'বললে তো শুনছে! আর তোর বাবার জন্য বলবার উপায় আছে? বলেন, তোমার বড় মেয়ে তো জমিদারের মেয়ে হয়েছে। সুখী অভিমানী। উত্তরা শক্তপোক্ত হোক।'

'দরকার নেই শক্তপোক্ত হয়ে। ওকি ঢেঁকি পাড় দেবে নাকি। উত্তরাকে আমি কলকাতা নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া করাবো।

আমরা বড় দালানের কাছে এসে গিয়েছিলাম। তোমার মা সিঁড়ি উঠতে উঠতে হাসলেন। ছোট মামীমা থেমে পড়ে বললেন, 'কি হাসছ যে মা? দেবে না যেতে—এই তো?'

'আমি কি দেবার মালিক? সে তোর বাবা। আর তোমার বোনটিও যেতে বসেছে! তাকেই রাজী করাতে পারো কিনা দেখো। তোমাদের বাড়িতে তিনটে পুকুর, চারটে দীঘি, পাঁচটা নদী থাকে তো নিয়ে যেও। সেও থাকবে। নইলে তিন রাতও রাখতে পারবে না।'

'সে আমি জানি। তোমরাও দেবে না। সেও যাবে না। নদী দীঘি না হলে তোমার ছোটমেয়েরই কেবল প্রাণ বাঁচে না। আর আমার প্রাণ খুব বাঁচে। তাই শুকনো ডাঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। আমি কাতরাচ্ছি কিনা একবার চোখ তুলেও দেখ না' বলে ছোট মামীমা দালানে না উঠে পেছন ফিরলেন।

মা মেয়ের দিকে এক পলক চেয়ে ছোট মামীমাকে না উঠে পেছন দালানে ফিরতে দেখে বললেন, 'এক্ষুনি কোথায় চললি?'

'দাঁড়াও উত্তরাকে নিয়ে আসি।'

'আঃ, হা....তোর তাকে নিয়ে আসার জন্য ছোটবার কি দরকার সুমি। আমি লোক পাঠাচ্ছি তুই ঘরে এসে জিরো না।'

ছোট মামীমা চলতে চলতে বললেন, 'শুয়ে ঘুমিয়ে এলাম। তার আবার পরিশ্রমটা কি। জিরোনই বা কি?'

আমিও ছোট মামীমার পেছন ধরলাম।

তোমার মা বললেন, 'তুমি যেও না বাবা। পথ ঘাট জলে কাদায় ডুবে রয়েছে। কাল রাতে ঝড় বাদলা গেছে খুব। তুমি কলকাতার ছেলে। জল কাদা গর্তের পথে চলতে পারবে না।' বলে দালানে উঠে ডাকলেন, 'কুমুদ, অমলবাবুকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে জামা কাপড় বদলাবার ব্যবস্থা করে দে।'

আমি তোমার মায়ের আপত্তিতে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলাম। কিন্তু ভীষণ ইচ্ছে করছিল আমার ছোট মামীমার সঙ্গে তোমার মাছধরা দেখতে যেতে। ছোট মামীমা বুঝলেন সেটা। বললে, আসুক মা আমার সঙ্গে। আমাদের দেশ দেখতে এসেছে জল কাদা গর্ত সব দেখুক।'

আমি ছোট মামীমার সঙ্গে চললাম। চারদিকে তাকাতে তাকাতে চললাম। জল জল জল— বিশ্বচরাচর যেন জলময়। আমার কাছে যেমন বিস্ময়কর লাগছিল, তেমনি ভালো লাগছিল। বঁড়শিতে মাছ ধরা জিনিসটা যে কি তারও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আমি বেশ বড় বড় পা ফেলে ঔৎসুক্যের সঙ্গে চলতে লাগলাম এক জমিদারের আদরিণী কন্যার পুঁটিমাছ আর বাঁশপাতা মাছ শিকার দেখতে।

তা দৃশ্যটা দেখার মতোই বটে!

'এই যে মেয়ে!'

ছোট মামীমার কথা শুনে তাকিয়ে দেখলাম, সামনে আকাশ। তার তলায় এক বিশাল জল জঙ্গলময় বিল! বাঁশ ঝাড়ের পাতা ওড়ার সড়সড় শব্দ উড়ছে হাওয়ায়। সেখানে বিলের ধারে দাঁড়িয়ে একটি তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে মাছ ধরছে। রঙিন শাড়ি হাঁটুর কাছে তোলা। চুল উড়ছে বাতাসে। চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিপের ফাতনার দিকে। একটি প্রৌঢ়া ঝি বসে আছে কাছে বড় পেতলের ঘটি নিয়ে। বোধহয় পাহারাদারও বটে আবার মাছ ধরার সাহায্যকারীও বটে।

ছোট মামীমার 'এই যে মেয়ে'— কথাটা তোমার কানে গিয়েছিল। চট করে চোখ তুলে ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে দিদিকে ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করলে। শব্দ শুনলে তোমার মাছেরা নাকি পালিয়ে যাবে। যে দিদির জন্য মাছ ধরছ তখন তাঁর দিকে তাকাবারও ফুরসত নেই তোমার। পুরোনো ঝি। সে তাড়াতাড়ি এসে ছোট মামীমাকে প্রণাম করল। আমাকে প্রণাম করলো। কিন্তু সেও ভয়ে মুখ খুলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন দিদি।

আমিও তাই রইলাম।

ছোট মামীমা মিটিমিটি হেসে ফিসফিস কণ্ঠে বললেন, 'কিরে অমল, আনব নাকি চুলের মুঠি ধরে টেনে?'

আমিও ছোট মামীমার মতো ফিসফিস কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'থাক না। দেখিনা কি মাছ ওঠে।'

রূপ দেখে ভোলার বয়স হলে আমিও নিশ্চয়ই ছোট মামার মতো সেই মুহূর্তে তোমাকে দেখে ভুলতাম। বয়স তখন আমার রূপে মজবার নয়। কিন্তু না মজলেও আমার ভারি মজা লাগছিল তোমাকে দেখতে। আমি তোমার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ফাতনার দিকে তাকিয়ে থাকা চোখ দুটো দেখছিলাম—হঠাৎ তুমি ঝটাৎ করে হাতের ছিপে একটান দিতেই, আমিও আচমকা দু'পা পিছিয়ে গেলাম। তুমি বঁড়শি টেনে তুলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলে। আমার পিছু হটা দেখে ফেললে। বাঁকা ঠোঁটে হাসলে একটু। হাসিটা আমার ভালো লাগল না। গম্ভীর হলাম। মাছ উঠেছিল তোমার ছিপে। মাছটা ইঞ্চি সাতেক লম্বা। বাঁশপাতার মতোই তার ছিপছিপে শরীর। পিঠের দিকে রংটাও বাঁশপাতার মতো সবুজে। এই মাছকেই বোধহয় বাঁশপাতা মাছ বলে। তোমার দিদি যে মাছ ভাজা খেতে ভালোবাসেন। তুমি যে মাছ ধরার জন্য ছিপ নিয়ে বসে আছ! মাছটা তুমি বঁড়শি থেকে খুললে না। সেটা বঁড়শিতে গাঁথা অবস্থায় লাফাতে লাগল। তুমি মাছটাকে তেমনি ভাবে নিয়েই দৌড়ে দিদির কাছে এলে। বললে, দেখ কত বড় বাঁশপাতা মাছ। আছে এমন মাছ কলকাতায়? খাইয়েছে তোমার কেউ উত্তরার মতো তক্ষুনি ধরে, তক্ষুনি কেটে, তক্ষুনি ভেজে, গরম গরম থালায় করে এনে দিয়েছে মাছভাজা?'

তোমার দিদি তোমার মাথাটা টেনে কাছে এনে আদর করে বললেন, 'পাগল নাকি! কে খাওয়াবে আমাকে এমন ভালোবেসে? আছে নাকি কেউ? চল, এখন বাড়ি চল। আর ধরতে হবে না।

'না, আর ধরব না। অনেক ধরেছি। কিন্তু দাঁড়াও আগে মাছটা বঁড়শি থেকে খুলে নি। দেখছ না কেমন লাফাচ্ছে। বঁড়শি গলায় গেঁথে আছে তো। কষ্ট হচ্ছে। কাউকে কষ্ট দিতে নেই মিছামিছি।

ছোট মামীমা হেসে ফেললেন। বললেন, 'বঁড়শি গেঁথে ধরলি। এখন নিয়ে কাটবি। ভাজবি। তাতে বুঝি কষ্ট নেই?'

তুমি মাছটার মুখ হাঁ করিয়ে কাঁটা খুলতে খুলতে বললে, 'বঁড়শিতে না গাঁথলে ধরব কি করে? আর না কাটলে খাবো কি করে? কিন্তু এখন গেঁথে রাখলে মিছামিছি কষ্ট দেওয়া হবে যে। এখন খুলে ঘটিতে রেখে দেবো। জলের মধ্যে খেলবে।'

ছোট মামীমা ঘাড় নেড়ে তোমার কথার যথার্থতা স্বীকার করলেন। বললেন, 'ঠিক বলেছিস। যে কষ্ট না দিয়ে উপায় নেই, তা তো দিতেই হয়। মিছামিছি যেন কষ্ট না দি। তা বাড়ির দীঘি ফেলে এখানে এসেছিস কেন মাছ ধরতে?'

তুমি বললে, 'দিদি তুমি একেবারে কলকাতার হয়ে গেছ। পালেদের বিলে খুব মাছ; জানো না?'

ছোট মামীমা বললেন, 'ঠিক তো! কিন্তু আমার সঙ্গে কে এসেছে দেখেছিস?'

তুমি বসে বসে মাছ খুলছিলে বঁড়শি থেকে। চোখ তুলে আমার দিকে এক নজর তাকালে। আমিও তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দুজনের দৃষ্টি মিলল। কিন্তু সেটা শুভদৃষ্টির বয়স ছিল না। তাই হলো না। তবে পরে সেটা শুভদৃষ্টি হতে পারতো কোনদিন। কিন্তু ক্ষণটা নিশ্চয়ই শুভ ছিল না। তাই কোন দিনই শুভদৃষ্টি হলো না আমাদের।

তুমি আমাকে দেখলে এবং বেশ ভালভাবেই বুঝলে আমি কে। তুমি জানতে আমার আসার কথা। কিন্তু তুমি আমাকে আমল দিলে না। তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছিলাম, তখন তুমি আমাকে ঈর্ষা করছ। ছোট মামীমা যে আমায় ভালোবাসেন সেটা তোমার মোটেও পছন্দ হচ্ছিল না। তুমি আমাকে এক নজর মাত্র দেখলে এবং বললে, 'হ্যাঁ, দেখেছি।' তারপর মাছটা ঝিয়ের ঘটিতে ফেলে দিয়ে দিদির হাত ধরে বকবক করতে করতে চললে। আমার দিকে আর তাকালেও না। আমারও কিন্তু খুব অভিমান হচ্ছিল। ছোট মামীমা বোনকে পেয়ে আমায় খেয়ালই করছেন না। তোমার সঙ্গে হাসছেন। কথা বলছেন। চলেছেন। আমি যে পেছনে পড়ে তা তাকাচ্ছেন কই? আর তোমার কাদা মাখা পা, হাঁটুর উপরে পরা শাড়ি, গ্রাম্য টানের কথা কোনটাই আমার মন বিশেষ গ্রহণ করতেও পারছিল না। তাই আমিও বেশ অবহেলার সঙ্গেই তোমাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাঁশঝাড়, তালগাছ, নারকেলগাছ দেখতে দেখতে চলছিলাম।

পরের দিন সকাল বেলা ছোট মামীমা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কুমুদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসতে। আমবাগান দেখলাম। গেলাম তোমাদের দীঘির পাড়ে। বসলাম গিয়ে নদীর ঘাটে। দেখলাম তোমাদের স্কুল। এলাম তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপে। সেখানে তখন প্রতিমা তৈরীর কাজ প্রায় শেষ। তৈরী হচ্ছে শোলার চালচিত্র। বসে বসে দেখলাম অনেকক্ষণ চালচিত্রের কাজ। তারপর ফিরে এসে বসলাম আমার ঘরের সামনের বারান্দায়। আমার ঘর বলতে দোতলার যে ঘরটায় ছোটমামা এলে থাকেন। সে ঘরটাই আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন ছোট মামীমা। পাশের ঘরে শোয় কুমুদ। কুমুদই শুধু এ যাত্রায় নয়, যখনই গেছি— সেই আমার দেখাশুনা করেছে। আগের দিনের এইসব কাজের লোকগুলো যে কোথায় গেল, তাই ভাবি।

আমি ঘুরে টুরে এসে বেশ কলেজী চলে একটি বই নিয়ে বসলাম। তোমার কথা আমার মনেই ছিল না। একটা গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছিলাম। শুধু তোমাকে নয়— সব ভুলে আমি তখন নিজেই নায়ক হয়ে খুনী ধরবার চেষ্টা করছি। এটা পূর্ববাংলা না কলকাতা হঠাৎ কেউ জিজ্ঞাসা করে বসলে তখন আমি বলতে পারতাম না।

'এই স্নান করতে যাবে না?' তুমি গামছা কাঁধে এসে জিজ্ঞাসা করলে।

আমি চমকে বই থেকে মুখ তুলে তোমার দিকে তাকালাম। সত্যি সত্যি আমার একটু সময় লাগলো গোয়েন্দা কাহিনীর নায়কের রোলটা বদলে অমলের ভূমিকা নিতে। বই বন্ধ করে বললাম, 'আমার নাম জানো না তুমি?'

'জানব না কেন?'

'তবে এই বলে ডাকছ কেন?'

'তোমাকে চিনি নাকি? আগে চেনা হোক। কথাবার্তা হোক। তারপর নাম ধরে ডাকব। যেমন পরেশকে ডাকি। প্রফুল্লকে ডাকি। এখন লজ্জা করে।'

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, 'লজ্জার কি আছে। কই আমার তো লজ্জা করে না।'

'ওমা, তুমি আবার কখন আমার নাম ধরে ডাকলে?'

'কখন আর ডাকব? তুমি তো আমাকে চিনতেই চাও না। কালকে সেই যে আমাকে পেছনে ফেলে দিদির সঙ্গে চলে এলে, আর তো এই তোমাকে দেখলাম।'

একটু যেন লজ্জা পেলে তুমি। একটা ঢোক গিলে বললে, 'কতদিন বাদে দিদিকে দেখলাম তো। তাই আর কারু সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। তাই তো আজ এলাম। তুমি স্নান করতে যাবে না? আমার বন্ধুরা সবাই এসে গেছে। পরেশ, প্রফুল্ল, রমা, কুসুম।'

গামছা কাঁধে ফেলে একসঙ্গে সবাই কোথায় স্নান করতে যাবো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাবো স্নান করতে?'

তুমি ভারি অবাক হলে যেন। বললে, 'স্নান আবার কোথায় করব? পুকুর নয়তো নদীতে। তুমি যাবে না?'

মনে মনে ভয় পেলাম। কিন্তু মুখে বললাম, 'যাবো না কেন?'

'তবে চলো। আমার সঙ্গে কেউ সাঁতারে জেতে না। দেখো তোমাকেও হারিয়ে দেবো।'

আমি সাঁতার জানি কিনা—এ প্রশ্নটাও তোমার মনে এলো না। আমি কোন দিন পুকুরে পা ডুবিয়ে পর্যন্ত দেখিনি। পদ্মার ঢেউগুলি আমার চোখের ওপর নাচতে লাগলো। তবু আমি তোয়ালে নিয়ে তোমার সঙ্গে চললাম। নীচে নেমে সবে উঠোন পার হচ্ছি— ছোট মামীমা দৌড়ে এলেন। 'আরে উত্তরি কোথায় যাচ্ছিস তোরা?'

'কেন স্নান করতে যাচ্ছি?'

'কোথায়? পুকুরে?' হাত ধরে একেবারে বুকের কাছে টেনে আনলেন আমাকে ছোট মামীমা। 'মাগো, হয়েছিল কেলেঙ্কারী কাণ্ড। ওকি সাঁতার জানে যে ওকে পুকুরে নিয়ে যাচ্ছিস স্নানের জন্য?'

প্রথমটায় তুমি একটু হক্চকিয়ে গেলে। তারপর ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'ও, হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো? আমি যেন ওঁর আদরের অমলকে পুকুরে ডুবিয়ে মারবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি কি জানি কলকাতার ছেলেরা সাঁতার জানে না। তারা ঘটি দিয়ে জল ঢেলে স্নান করে!' বলেই হঠাৎ হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলে। 'ও, এতদিনে বুঝলাম কলকাতার লোকদের কেন ঘটি বলে।' তারপর হাসি থামিয়ে আবার ঠোঁট ফুলিয়ে তুললে তুমি দিদির প্রতি অভিমানে—'ওমা, অমলকে নিয়ে যাচ্ছিলি পুকুরে? মাগো, কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটত। আমার জন্য যেন ভয়ের কিছু ছিল না। ডুবলে কি একাই ডুবতো তোমার অমল? আমাকে সুদ্ধু ডুবিয়ে মারত না বুঝি? কই সে ভয়তো পেতে দেখলাম না। একবারও তো বললে না, মরছিলো দুটোতে?'

ছোট মামীমা হেসে তোমাকে কাছে টানতে গেলেন। তুমি তাঁর হাত ঠেলে পালিয়ে গেলে। বলতে বলতে গেলে, 'আমাকে আদর করতে হবে না। তোমার অমলকেই আদর করো। আর ঘটি দিয়ে জল ঢেলে ঢেলে স্নান করাও।'

তোমার সঙ্গী সাথীর দল কাছেই ছিল। তোমার কথা শুনে তারও হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে তোমার সঙ্গে চললো। সে দিন আমার মনে হয়েছিল, এত দিন আর কিছু না শিখেও যদি কেবল সাঁতারটাই শিখতাম। তবে আজ তোমাদের সঙ্গে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম।

তখনকার দিনে স্নানের ঘরের রেওয়াজ প্রায় ছিলই না। শহরেই ছিল না, গ্রামে তো নয়ই। তোমাদের বাড়ি জমিদার বাড়ি বলেই হয়তো সে দিনেও একটা চমৎকার স্নানের ঘর ছিল। ধোয়া পাট করা তোয়ালে, গন্ধতেল, ভালো বিলিতি সাবান সব কিছু রেখে কুমুদ যখন আমাকে স্নান করতে যেতে বললো, তখন স্নানের ঘরে ঢুকে আমি যেন কিছুতেই ঘটি দিয়ে জল তুলতে পারলাম না কতক্ষণ। একা ঘরেও লজ্জা, করতে লাগলো। মনে হলো, উত্তরা যে বললো, ঘটির জলে স্নান করি বলেই আমাদের কলকাতার লোকদের ওরা 'ঘটি' বলে—সত্যি কি তাই? আমি ঘটিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। ওটা গড়াতে গড়াতে ড্রেনের দিকে গিয়ে কাৎ হয়ে রইল। আমি সোজা বালতি তুলে নিয়ে মাথায় জল ঢাললাম।

আমাকে খেতে দেওয়া হলো ভেলভেটের আসন পেতে তোমার মায়ের ঘরে। রূপোর থালায় ভাত। চারপাশে রূপোর বাটিতে বারো ব্যঞ্জন।

...উত্তরা তুমি কি এখন কলাইয়ের থালা হাতে নিয়ে খিচুড়ির জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছ?

না—না। এখনও নয়। এখনও নয়। এসব কথা আরো পরে। আরো পরে।

আমরা বাড়িতে সবাই এক টেবিলে বসে খাই। একা একা খেতে আমার ভালো লাগে না। বললাম, 'তোমরা খাবে না ছোটমামীমা?'

ছোটমামীমা চোখ বড় করে বললেন, 'জমিদার বাড়ির মানুষেরা বেলা তিনটের আগে এমনিতেই খায় না। তাতে পূজোর দিন, কত কত লোক কাজ করছে। সবাই খাবে। আমরা কি খেয়ে বসে থাকতে পারি।'

আমার মনে মনে ইচ্ছা ছিল, অন্তত তোমার জন্য অপেক্ষা করি। তুমি নিশ্চয়ই তিনটে পর্যন্ত সবার খাওয়া হবার অপেক্ষায় বসে থাকবে না। ছোট মামীমা তাতেও নিরাশ করলেন। বললেন, 'উত্রি আজ আমার সঙ্গে অভিমান করেছে। সেও দেখিস শিগ্‌গির ফিরবে না। তুই খেয়ে নে।' তোমার মা এসে কাছে বললেন। একটি ঝি এসে বসলো হাওয়া করতে। মাথা নিচু করে খেয়ে গেলাম।

খেয়ে উঠে ভাবলাম, যাই তোমাদের সাঁতার পর্ব দেখি গিয়ে বসে। কিন্তু মনে হলো তাতে আমার পজিশনটা আরো নেমে যাবে। তার চাইতে একটা বই নিয়ে বসাই সম্মানের হবে। আমি তোমাদের বাড়ির সামনের মাঠের গাছের ছায়ায় গিয়ে একটা বই নিয়ে বসলাম, যেন তোমার, তোমার সঙ্গী সাথীদের চোখে পড়ে আমি পড়ছি। শুধু পড়ছি নয়। ইংরাজী বই পড়ছি। তোমরা সাঁতার জানো। ইংরেজি বই পড়তে জানো না। ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পড়ছিলাম সেই অসমাপ্ত গোয়েন্দা কাহিনীটাই। যে বই রেখে উত্তরা তোমার সঙ্গে উঠে এসেছিলাম। তখন আবার বই -এর নায়ক হয়ে—খুনীর পেছন পেছন ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়ে চলেছি। এমনি সময় একটা কি যেন এসে আমার পায়ের উপর ধুপ করে পড়লো। পড়েই পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে দাঁতে কাঁটলো। বই ফেলে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলাম, 'ছোট মামীমা সাপ। সাপে কেটেছে আমায়। শিগ্‌গির এসো।'

চারদিক থেকে দৌড়ে এলো লাঠি-সোটা নিয়ে। তোমার মা ছুটে এসে আমার পায়ের যেখানটা চিরে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল, সেখানটা ঠেসে ধরলেন। লোকজনরা সাপ খুঁজতে লাগলো। কেউ গেল ওঝা আনতে। কেউ গেল ডাক্তার ডাকতে। একজন ছুটে গিয়ে দড়ি নিয়ে এসে ইতিমধ্যেই আমার গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বেঁধে ফেলেছে ঠিক রোমান সৈনিকের জুতোর ফিঁতে বাঁধার মত করে। ছোট মামীমা কেবল হাঁটছেন আর হাত কচলাচ্ছেন। পাগলের মত বলছেন, 'আমি এখন কি করি!

আমায় সাপে কামড়েছে। এরপর বাঁচা সম্ভব নয়। আমি মরে গেছি। নয়তো মরতে চলেছি। কিন্তু আমার শরীর খারাপ লাগছে না কেন? আমি বেশ তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছু দেখলাম। দেখলাম, তুমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছ। যেন বেশ ঘাবড়ে গেছ। তুমিও যেন ছোটো মামীমারই মতো বুঝেউঠতে পারছ না, এখন কি করবে তুমি।

হয়তো তোমার সত্যি ভয়ে কান্না আসছিল। নয়তো তুমি দেখলে কান্না ছাড়া ঘটনা আয়ত্তে আনবার আর কোন উপায় তোমার হাতে নেই। হাউহাউ করে কেঁদে উঠলে তুমি। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'সাপ নয় গো সাপ নয় ওটা—'

সবাই এক সঙ্গে তোমার দিকে তাকালো। ছোট মামীমা ছুটে গিয়ে তোমার দু কাঁধ ধরে বললেন, 'সাপ নয়? তুই দেখেছিস উত্তরা কিসে কেটেছে?'

হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে তুমি বললে, 'একটা মস্ত দাড়াওলা গলদা চিংড়ি ধরেছিলাম নদীতে। সেটা দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম তোমাদের কলকাতার ছেলেকে। যেই কাছে এসেছি, গলদাটা তিড়িং করে লাফিয়ে গিয়ে পড়েছে ওর পায়ের উপর। চিংড়িটার ধার দাড়ায় একটু চিরে গেছে—আর কলকাতার ছেলের সাপ সাপ বলে কি লাফানো।'

ছোট মামীমা বললেন, 'কোথায় গলদাটা?'

'ঐ তো পড়ে রয়েছে সামনে।'

সত্যি মস্ত একটা গলদা পড়ে রয়েছে একটু দূরে। বোধহয় আমার পায়ের লাথিতেই সেটা দূরে ছিটকে গেছে। আমি ততক্ষণে উঠে বসেছি।

তোমার মা আমার বুড়ো আঙ্গুলি ছেড়ে দিয়েছেন। দড়ি খুলে নেওয়া হয়েছে। সবাই হাতের লাঠি শোঁটা নামিয়ে রেখেছে।

ছোট মামীমা তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, 'বাঁচালি আমাকে উত্রি। তুই আমাকে — বাঁচালি।'

তোমার মা কিন্তু রেগে গিয়েছিলেন। বললেন, 'হাত থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে পড়েছে, না ওকে চমকে দিতে ওর গায়ে ফেলেছিস—ঠিক করে বল্‌তো বিলি?' তোমাকে তোমার মা বিলি বলে ডাকেন এটা এই প্রথম শুনলাম।

ছোট মামীমা তোমার মাথাটা আরো বুকে চেপে ধরে বললেন, 'না মা, এ নিয়ে ওকে কিছু বলতে পারবে না। এত বড় একটা মাছ ধরেছে। অমলকে দেখাতে নিয়ে এসেছে। আর যদি মজা করে একটু ছুড়ে দিয়ে থাকে, তাও দোষের হয়নি কিছু। ওকি জানে অমল সাপ ভাববে? আর অমল কলকাতায় শুনেছে এখানে কেবল সাপ কিলবিল করে। এরপর পায়ের উপর ধুপ্ করে কিছু পড়লে, কাটলে সাপ ছাড়া আর কি মনে আসবে ওর?'

নিজেকে নির্দোষ ভাবতে পারা মাত্র নিজ প্রকৃতি ফিরে এলো তোমার। ঝট্ করে দিদির বুক থেকে মাথা টেনে এনে ফুঁলে উঠলে, 'না মনে আসবে না। চোখ চেয়ে দেখবে তো কিসে কাটলো?'

তোমার মা ক্ষেপে গেলেন এবার—'সাপ কি কেটে বসে থাকে যে দেখবে?'

তুমিও ঘাড় বাঁকিয়ে বললে, 'চিংড়িটা তো দেখতে পেতো। সে তো পালিয়ে যায় নি।'

'ওটা পায়ের ধাক্কায় দূরে ছিটকে পড়েছে। দেখবে কি করে?'

'পায়ে পিঁপড়ে কামড়ালেই যারা সাপ সাপ বলে চেঁচাতে শুরু করে তাঁরা কিছু দেখেও না! এমন ভিতু জানলে কে কাছে ঘেঁষতো বাবা! সাপ নয়, বাঘ নয়— একটা চিংড়ি মাছের দাড়ার ঠোকরে অজ্ঞান! কলকাতার মানুষের কাছে জীবনেও আর ঘেঁষছি নে। তাঁদের খুরে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।' আমাকে গোটাকয়েক নমস্কার ঠুকে বড় বড় পা ফেলে তুমি চলে গেলে।

ছোট মামীমা হেসে বললেন, 'এটা পাগলী।'

তোমার মা আর তোমার সম্বন্ধে কিছু বলেন না। আমায় বললেন, 'সাপ থাকাটা কিছু আশ্চর্য নয় বাবা। এখন চারিদিকে জল। বর্ষাকালটা সত্যি খুব সাপের ভয়। তুমি ঘরে গিয়ে বই পড়ো বাবা।'

আমি হাসলাম।

ছোট মামীমা বললেন, 'এতো লোকজন আসা যাওয়া করছে। এখন আবার সাপের ভয় কি? পূজোর কাজ হচ্ছে। সবাই বাইরে। ও ঘরে বসে থাকবে কেন। এখানেই থাক। বই পড়ুক। দেখুক যা খুশি করুক। এখন চলো মা খেতে দেবে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে আমার।'

আমার হাসিটা যে নিজের ভয় পাওয়াকেই পরিহাস করে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা, এটা ছোট মামীমা বুঝলেন। তাই আমার লজ্জা কমাবার জন্য তিনি আমাকে এখানেই রেখে গেলেন।

ওঁরা চলে গেলেন।

আমি বসে রইলাম।

যে বয়সে বীরত্ব হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যে বয়সের প্রিয় স্বপ্ন হলো নির্ভীক অভিযাত্রী হওয়া, সে বয়সে ভীরুর কাজ করে ফেলার মতো মরে যাওয়া কাজ আর হয় না। অন্য সব পরাজয় তবু সয়, পৌরুষে হেরে যাওয়া কৈশোর সহ্য করতে পারে না। আমি মরে গিয়ে বসে রইলাম। আমার অহঙ্কারের ইংরেজী বই ঘাসের উপর পড়ে বাতাসে ফরফর করে উঠতে লাগলো।

এরপর থেকে সত্যি তুমি আমার কাছে আর ঘেঁষলে না। আমি রুটি মাখন ডিমের জায়গায় লুচি তরকারী, ক্ষীরের সন্দেশ, তিলের লাড়ু, নারকেল তক্তি ইত্যাদি পরম উপাদেয় খাবার দিয়ে ব্রেকফাস্ট আর চাঁদির থালায়, চাঁদির বাটিতে পরিবেশিত রাজভোগ দিয়ে লাঞ্চ সমাধা করার ফাঁকে ফাঁকে কুমুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম কখনো নৌকোতে। কখনো বা হেঁটে। বাজার হাট বন জঙ্গল নদী। চণ্ডীমণ্ডপের প্রতিমা গড়া, সন্ধ্যাবেলা কাঁসর ঘণ্টা আর শাঁখের বাজনার সঙ্গে ঠাকুরের আরতি দেওয়া—কত নতুন দেখা যে দেখতে লাগলাম তার ঠিক নেই। এর ভেতর তোমাকে দেখলাম না বলব না উত্তরা— এ কথা বলব না। তোমাকেও দেখলাম। কিন্তু কাছে থেকে নয়। দূর থেকে। প্রথম দিন তোমাকে যেখানে মাছ ধরতে দেখেছিলাম, সেখান দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, তুমি সে দিনের মতোই মাছ ধরছ। সেদিনের মতোই তোমার দৃষ্টি একান্ত নিবিষ্ট হাতে তোমার হাতের ছিপের ফাতনার দিকে। কাছে চাঁপা ঝি বসে। তার পাশে রয়েছে ঠিক তেমনি চকচকে একটা ঘটি। বাঁশঝাড় বাতাসে দুলছে ঝিরঝির শব্দ তুলে। এছাড়া কোন শব্দ নেই। মাছ ধরার জন্য এই স্থান নির্বাচনের পেছনে বোধ হয় জায়গাটার নিঃশব্দতাও একটা কারণ। মাছেরা শব্দ শুনলে আসে।

একবার মন হলো 'হাউ' করে একটা শব্দ করে উঠি। এতো জলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে চমকে উঠলে যেটুকু নড়বে তাতেই জলে পড়ে যাবে। তখন বলবো, 'এতটুকু শব্দে চমকে জলে পড়ে গেল। এত ভিতু তুমি?'

ইচ্ছাটা বেশ চেপেই এসেছিল।

একটু থামলামও।

কিন্তু হঠাৎ দেখলাম, আমি কুমুদের সঙ্গে হাঁটছি।

আর একদিন দেখলাম, তোমাদের সাগরের মতো বিলে তুমি নৌকো চালাচ্ছো। তোমার ভ্যালেট চাপা বসে'ছে নৌকোর মধ্যে। তুমি বৈঠা মেরে মেরে বিলে ঘুরছ, যেন জলের বাগানে বেড়াচ্ছ। হেলাঞ্চা আর কলমি লতার কেয়ারি করা বাগানে নৌকো লাগিয়ে টেনে তুলছ হেলাঞ্চা কলমি লতা। আবার আর এক জায়গায় গিয়ে তুলছ জলের ভাসমান ফল সিঙ্গারা। জলের বাগান আলো করে ফুটে থাকা লাল শাপলা ফুলের ভেতর নৌকো ঢুকিয়ে টেনে আনছ নৌকোয় শাপলা ফুলের থোকা।

তোমায় পরণে ছিল বাসন্তি রঙ-এর শাড়ি। শাড়ির পাড়টা ছিল লাল। হাতে ছিল দুটো মোটা মোটা মকর মুখের চুনি গাঁথা বালা। শাড়ির লাল পাড় শাপলা ফুলের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। হাতের বালার সাচ্চা চুনি সূর্যের দীপ্তিতে মাঝে মাঝেই জ্বলে উঠছিল লাল আগুন হয়ে।

তখনও তোমার যৌবন আসেনি। কিন্তু মুগ্ধ তো কেবল যৌবনই করে না। যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ করার সম্পদ আছে সে সব বয়সেই মুগ্ধ করে। আমি মুগ্ধ হলাম। প্রথম দিন তুমি আমার মন টানতে পারোনি। কিন্তু তখন টানতে লাগলে। ইচ্ছে করতে লাগলো তোমার সঙ্গে গিয়ে আমিও শাপলা ফুল তুমি। কুমুদের নৌকোয় না বেড়িয়ে, তোমার নৌকায় বেড়াই। শাপলা ফুলের একটা আধফোটা কুঁড়ি তুলে দি তোমার হাতে। নিজে হাতে পরিয়ে দেবার সাহস তখন ছিল না। তুমি সেটা মাথায় গুঁজে আমার দিকে তাকিয়ে হাসো। নন্দিনী আর রঞ্জন হয়ে যাই আমরা।

কিন্তু সে দিনও আমি যেমন 'হই' করে তোমায় চমকে দিতে পারিনি, তখনও তেমনি কুমুদকে বলতে পারলাম না, আমাদের নৌকো নিয়ে ঐ নৌকোটার সঙ্গে লাগাও। আমি ওটায় উঠব। কিন্তু বলাটা কোনই শক্ত কাজ ছিল না। বরং অতি সহজই ছিল।

কি আর বলব উত্তরা আমার কথা। এই সহজ কাজটা নিজে তো করতে পারলামই না; কুমুদ যখন বললো, 'আপনি ছোট দিদিমণির নৌকোতে যাবেন?' তখন বললাম, 'দূর ওখানে গিয়ে কি করব? শাপলা আর হেলাঞ্চা তুলব? নদীর চড়ায় মাঝে মাঝে কুমীর আসে বলেছ তুমি। দেখি গিয়ে আজ এসেছে কি না।'

চলে গেলাম কুমীর দেখতে।

কিন্তু তোমার এই নৌকো বেয়ে বেয়ে জলের বাগান থেকে শাক পাতা ফল ফুল তোলা আমার মনে বেশ একটা আমেজ এনে দিয়েছিল।

আমি তোমার সঙ্গে সন্ধির পথ খুঁজতে লাগলাম।

ছোট মামীমার মুখে শোনা ছিল তোমাদের বাড়িতে একটা পুঁথি ঘর আছে। একদিন তিনি আমাকে দেখিয়েও এনেছিলেন সেই পুঁথিপত্রের ঘর। আলমারী ঠাসা সব লাল রং ধরে যাওয়া বই। পাতা ওলটাতে গেলে ফেটে যায়। আমার কোনান ডয়েলের গোয়েন্দা কাহিনী শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর বই নেই হাতে। তোমাদের পুঁথি ঘরে বসে বই বের করে উল্টেপাল্টে দেখছিলাম—

হঠাৎ তুমি এলে ঘরে।

তাড়াতাড়ি হাতের বই রেখে বললাম, 'এ কেমন ভদ্রতা তোমার উত্তরা? তোমাদের কাছে এলাম। আর তুমি অতিথির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছ না?'

'তুমি তো আমাদের দেশ দেখতে এসেছ।'

'মানুষ বাদ দিয়ে দেশ দেখার কি মানে?'

'ওমা! কি যে বলে। আমি ছাড়াও কত মানুষ রয়েছে না?'

'নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু জল-বাংলার একেবারে খাঁটি প্রতিভূ যাকে বলা যায়, সে হলে তুমি। এক তোমাকে দেখলেই ধারণা হয়ে যায় এখানকার লোকের প্রকৃতি। কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা দেখছি ভীষণ। আমার কাছেই ঘেঁষছ না।'

তুমি একটা কেদারার হাতের ওপর বসলে। বললে, 'তোমার কাছে ঘেঁষলেই একগলা অপহ্নব হতে হয়। তুমি কিচ্ছু পারো না। পারো গাছে উঠতে? বলেই কথা ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'না বাপু দরকার নেই। আবার দিদি ছুটে আসবেন 'ও হতচ্ছারি উত্তরি, করছিস কি! ছেলেটার হাত পা ভেঙ্গে কেলেঙ্কারী বাধাবি নাকি।' তারপর আত্মগতভাবে বললে, আমিই পারতাম। কিন্তু মা'র আবার কড়া হুকুম, আর যাই করি, গাছে চড়তে পারবো না।'

বুঝলাম তোমার আসার কারণ। বান্ধবরা বোধহয় কেউ নেই এখন বা যে কোন কারণেই হোক গাছে ওঠার লোক পাচ্ছ না। তাই আমার ঘরে হানা দিয়েছ।

আমি আর থতমত খেয়ে অন্যান্য বারের মতো নিজেকে খেলো হতে দিলাম না। বেশ জোর দিয়ে বললাম, 'আমি গাছে উঠতে জানি নে।'

তোমার কাছে কেবলই হেরে যাচ্ছিলাম। তাই তোমাকে কি ভাবে হারাবো এ নিয়ে বেশ ভাবতাম। কিন্তু তোমার জগৎ এতই আলাদা ছিল যে সে জগতে আমার 'জানা' দিয়ে তোমাকে পরাজিত করার কোন উপায় ছিল না। তাই 'না জানার' উপরই এবার শক্ত পায় দাঁড়ালাম।

আমার উত্তর শুনে তুমি বললে, 'কিছু জানো না কেন তুমি?'

'কলকাতা গেলে দেখবে, তুমিও অনেক কিছু জানো না। ট্রামে বাসে উঠতে গিয়ে এমন হাঁকপাঁক করবে যে, ছোট মামীমা আমার বেলা যেভাবে চেঁচিয়ে উঠছেন, তোমার বেলাও ঠিক তেমনি চেঁচিয়ে উঠবেন, 'অ অমল করছিস কি! মেয়েটার হাত পা ভেঙ্গে কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটাবি নাকি?' রাস্তা পার হতে পারবে না। শহরের গরুগুলো যা পারে। এমনি অনেক কিছু পারবে না। তার জন্য তুমি কিচ্ছু জানো না হবে নাকি?'

তুমি বড় বড় চোখ করে শুনছিলে। বললে, 'রাস্তা পার হতে পারব না কেন?'

'দীঘি পুকুর পার হওয়া আর রাস্ত পার হওয়া দুটো দু রকম জিনিস বলে।'

কিন্তু তবু তুমি বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে, 'ও সব যতই বল না কেন, তুমি বাপু খুব ভিতু।'

আমি রাগলাম। বললাম, 'তুমি যে নিজের গোঁ নিয়ে চলো সেদিনই আমি বুঝেছি।'

'কোন দিন?'

যেদিন, একটু মজা করবার জন্য চিংড়িটা যদি ছুড়েই দিয়ে থাকো দোষের কিছু হয় নি— দিদির এই যুক্তিটা নিজের বেলা বেশ মেনে নিলে। কিন্তু আমার ভয় পাওয়াও যে কত স্বাভাবিক— বিশেষ করে এখানে আসবার আগে যে কেবল দু'কান ভরে শুনে এসেছে; সাপ সাপ সাপ— দিদির সে যুক্তিটা গ্রাহ্য করলে না। আমাকে চৌদ্দটা নমস্কার ঠুকে চলে — সেই দিন।'

তুমি হেসে ফেললে। বললে, 'ঠিক আছে। আর তোমাকে ভিতু বলব না।'

ট্রিটি?

কি?

সন্ধি?

হ্যাঁ সন্ধি।

'অমল বলে ডাকবে এখন থেকে?'

'ডাকবো তো। দাঁড়াও না। সামনে বসে আবার কেউ নাম ডেকে ডেকে কথা বলে বুঝি?'

'উত্তরা, তুমি কি এখনও শ্রান্ত?'

একটুও কি প্রফুল্লবোধ করছ না আমাদের সেই ফুলের মতো দিনগুলির ভেতর দিয়ে চলতে চলতে? আমি ভেবে নিচ্ছি করছ। ভেবে নিচ্ছি এবার আরো ভালো লাগবে তোমার। আমরা এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে পরিচিত হবো। বন্ধু হবো। এখন যদি তোমার ভালো না লাগে— এখনও যদি তুমি একটুও প্রফুল্লবোধ না করো, তবে আমাকে থেমে যেতে হয়। তার মানে সমাপ্তিতে এসে যাওয়া। কিন্তু আমি যে উত্তরা, এখনই শেষ পর্বে পৌঁছাতে চাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে জীবনের যে অল্প কয়েকটা দিনই মাত্র একত্র চলেছিলাম, সে ক'টা দিন আর একত্রে চলতে চাচ্ছি শেষবারের মতো। তুমি একটু যোগ দিও আমার সঙ্গে। একটু হাস। একটু এটা ওটা বল।

তোমার সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেল।

তোমার মাছ ধরার সময় সঙ্গে যেতে লাগলাম। তোমরা দলবল মিলে সাঁতারের প্রতিযোগিতায় পুকুর তোলপাড় করে এপার ওপার করতে, আমি পাড়ে বসে বসে দেখতাম। ছোট মামীমা জানে আমি একা বসে খেতে ভালোবাসিনে। তিনি তোমায় বসিয়ে দিতেন আমার সঙ্গে। তোমার খাওয়া খুব খারাপ ছিল। মানে খেতে কম ফেলতে বেশী। ছোট মামীমা তোমার মা রাগ করতেন। তুমি যেই দেখতে ওঁরা কথা বলছেন, অমনি চুপচাপ এবং বিনা দ্বিধায় তোমার বাটি থেকে মাছ মাংস আমার বাটিতে ঢেলে দিতে। তারপর পরিস্কার থালা বাটি দেখিয়ে বলতে, 'দেখ মা, সব খেয়ে নিয়েছি।' আমি কিছু বলতাম না। যা পারতাম খেতাম। যা খেতে পারতাম

না থেকে যেত। তুমি বাইরে এসে বলতে, 'তুমি বেশ ভালো ছেলে।' আমি বলতাম, আর তুমি যে একটি অতি স্বার্থপর মেয়ে তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। নিজের থালা বাটি সাফ রেখে ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করে খাওয়ার দুর্নাম আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ। তারপর তোমার সঙ্গে জলের বাগানে বেড়ানো— যা দেখে কয়েকদিন আগে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সে বেড়ানো জীবনেও ভুলব না উত্তরা। মনে করতে এখনও—এই চল্লিশ বছরের রোমন্থহীন মনেও রোমাঞ্চ জাগছে। প্রথম দিন তোমার দিকেই নজরটা ছিল, তাই তোমার জলের বাগান দেখিনি ভালো করে। এখন তোমার নৌকোতে বসে রয়েছি। তোমার ভ্যালেট চাপা অবশ্যই আছে। তুমি নৌকা বাইছ আর আমায় গাছ চেনাচ্ছ। নদীর জলের তলায় ডুবে রয়েছে বিলটা। তাই বিশাল দেখাচ্ছে। নইলে বিল নিশ্চয়ই এত বড় নয়। কারণ বহু গাছ এখানে ওখানে ধারে পাশে জলের ওপর মাথা জাগিয়ে রেখেছে। সবুজ পাতা ঝাঁপা গাছের মাথাগুলোকে দেখতে লাগছে যেন মালীর হাতের সযত্ন কাঁচি ছাটা গাছের মতো। জলের ওপর বাঁশ গাছের মাথা নুয়ে পড়ে বাতাসে দুলছে। তার লম্বা লম্বা পাতা জলের তিরতিরে ঢেউয়ের উপর তোমার বাঁশপাতা মাছের মতই যেন তিরতির করে সাঁতার কাটছে। সেদিন শাপ্‌লাফুলের শোভা দেখেছিলাম। আমাকে নিয়ে কিন্তু তুমি শাপ্‌লাফুল তুলতে গেলে না। নৌকো ঢুকিয়ে দিলে পদ্মবনের ভেতর। শ'শ' পদ্ম ফুটে আছে সেখানে। হাতের বৈঠা অতি সন্তর্পণে চালাতে লাগলে। যেন ফুলের গায় না লাগে। বললে, 'পদ্মবনে কিন্তু ভীষণ সাপ থাকে। বড় বড় সাপ। ফুলের গায় জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে। ফুল তুলতে যেও না কিন্তু।' আমি ভাবলাম কথাটা বুঝি সত্য। আমি ফুল তুলতে হাত বাড়ালাম না। তুমি হেসে উঠে বললে, 'তুমি না বলে ভিতু নও?' বললাম, 'তুমি বুঝি সাপকে ডরাও না?' তুমি বললে, 'সাপকে না ডরায় কে? কিন্তু আমি বৈঠা চালাচ্ছি, নৌকোটা চলছে— সাপরা কি বসে থাকছে? পালিয়ে যাচ্ছে না?' বলেই হাত জলে ডুবিয়ে পটপট করে গোটা কয় পদ্ম ছিঁড়ে আনলে। তারপর জলে ভেজা পদ্মগুলো আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলে,' ওরে বাবারে। পদ্মের ডাঁটিতে একটা সাপ।'

'না দাদাবাবু সাপ নেই। তুমি ভয় পেয়ো না।' চাঁপা আমাকে অভয় দিল। তোমাকে শাসন করল, 'রাণী, খামকা ওকে ভয় দেখাচ্ছিস কেন?' তুমি বললে, 'ভয় পায় কেন?' আমি বসে বসে মাথায় ফন্দি আঁটতে লাগলাম, তোমাকে ভয় দেখানো যায় কি করে। কিন্তু 'সাপ' বলে মিথ্যে চেঁচিয়ে টেঁচিয়ে তোমাকে ভয় দেখানো যাবে না। সাপ শুনলেই তুমি ডরাবে কেন? সব সাপের কি বিষ আছে নাকি? এর ভেতর কয়েকবার আমি সাপ যেতে দেখেছি। দিব্যি তরতর করে সাঁতার কেটে এদিক ওদিক করছে। দেখাতেই বলেছ, এটা জল সাপ। বিষ নেই। সেটা ঢোরা সাপ, বিষ নেই। ওটা দুমুখো সাপ, বিষ নেই। এক তুমি ভয় পেতে ভূতকে। যারা তেঁতুল গাছে বাস করে। পুকুরের দুই পাড়ের দুই তাল গাছে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। নাকি সুরে কথা বলে। উল্টো পায়ে হাঁটে। আর বাগে পেলেই মানুষের ঘাড় মট্‌কায়। তেতুল গাছ, বাঁশ ঝোপ, পোড়া মাঠ— এমনি অনেক ভূতের নিবাসের ঠিকানা তোমার মুখস্থ ছিল। সে সব জায়গায় তোমাকে মেরে কেটেও নেওয়া যেত না। আবার তার বাইরে ভূত থাকে— একথা তুমি বিশ্বাসই করতে না। তাই অন্ধকারে নির্জনতায় বা একা চলা ফেরায়ও তোমার ভয় ছিল না। তোমার মত হলো, ভূতের চেহারার সঙ্গে মানুষের চেহারার যেমন অনেক প্রভেদ তেমনি বাসস্থানেরও অনেক প্রভেদ।

তারা সব জায়গায়ও থাকে না। আসেও না। আমার মতটা কিন্তু উত্তরা ভূত সম্বন্ধে ঠিক এ জাতীয় ছিল না। ভূত আমি বিশ্বাস করতাম, না করতাম না তাই ঠিক জানতাম না। কিন্তু একা বাড়িতে অন্ধকারে থাকতে আমার ভয় করত। ভয় করত খুব নির্জন জায়গায় সন্ধ্যার পর একা যেতে। তাই সে দিনই কেবল নয়, তোমাকে ভয় দেখানোর কোন উপায় আমি কোনদিনই বের করে উঠতে পারিনি। আমি একটু ভিতু স্বভাবেরই ছিলাম। এখনও তাই আছি। তুমি সেকথা ঐ ছোট বয়সেও বুঝে গিয়েছিলে। আমাকে তুমি তোমার সাহসিকতার অভিযানে ডাকতে না। সে সময় তোমার সঙ্গী প্রফুল্ল পরেশ রমা কালী ইত্যাদিরাই থাকত।

তুমি কথা বলতে এবং শুনতে ভালবাসতে। আর এই জায়গাটায় দেখলাম তোমার বন্ধুরা আমার কাছে হেসে যাচ্ছে। ভূত-দৈত্য-দানব, দেব-দেবী থেকে নানা গল্প কাহিনীতে তোমার সঞ্চয় ভর্তি ছিল। কিছু হয়ত তোমার ভ্যালেট চাঁপা শোনাতো। কিছু হয়ত আশ্রিত জনরা। আবার কিছু হয়ত শিক্ষিত পরিজনদের কাছেও শুনতে। কারণ তোমার গল্পের ভাণ্ডারে কাঁচা পাকা দু'জাতীয় গল্পই ছিল। আমার মনে হয়, তুমি খুব একাগ্র মনে গল্প শুনতে। আবার তেমন রসগ্রাহী শ্রোতাকে সেগুলি শোনাতে চাইতে। প্রফুল্ল কুমার পরেশ কুমার আর কালীতারা

রমাতারারা আলাপচারি হিসেবে তোমার সমাদর হারিয়ে ফেলেছিল। আর আমি বোধহয় ক্রমেই উঁচু নম্বর পাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে কথায় বসলে তুমি উঠতে না। সঙ্গীদল উঁকি ঝুঁকি দিত। ডাকত। তারপর চলে যেত। বুঝলাম কথার বেলায় তোমার আমাকেই পছন্দ।

কথা আমারও প্রিয় ছিল তখন থেকেই। ভবিষ্যতে যে কথার কারবারী হবে, কথার প্রতি ঝোঁক তার তো থাকবেই। তোমার সঙ্গে আমার এখানে মিলে গেল। এক চত্বরে দাঁড়াবার সুযোগ পেলাম তোমার সঙ্গে।

সন্ধি হয়ে যাবার পরদিন দুপুরে তুমি আমার ঘরে এসে বসলে। বললে, 'সব সময় বই নিয়ে থাকো কেন তুমি?'

আমি হাতের বই রেখে বললাম, 'কোথায় বই নিয়ে থাকি? সকাল থেকে খাবার আগে পর্যন্ত কত ঘুরে এলাম। তোমার সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেল। তবু কই ডাকলে আমাকে তোমাদের সঙ্গে যেতে?'

'দিদিটা কোথা থেকে হা হা করে ছুটে এসে বলবে, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস অমলকে'—এই ভয়েই তো ডাকিনি।'

'আবার ঐ সব কথা?'

তুমি তাড়াতাড়ি বললে, 'ঠিক —কাল তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবো দেখো।'

বোঝা গেল, রাগ দ্বেষ নয়— তোমার মনোভাব আমার প্রতি এখন আপোসের। বললাম, 'এই দুপুরবেলাটায় কি প্রোগ্রাম থাকে তোমার?'

তুমি কিছুটা হতাশ সুরে বললে, 'কিচ্ছু না। মা এসময় আমাকে বেরুতে দেন না। গল্প শুনি। আজ তোমার কাছে এলাম।'

'এ সময়টা তুমি বেকার?'

'না গল্প শুনি। গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে— ভীষণ ভালো লাগে। তুমি গল্প জানো?'

'তা জানি। কিন্তু তুমি গল্প শোনা ছেড়ে এখানে এলে যে?'

'পূজো এসে গেছে যে। সবাই ক্ষীর সন্দেশ লাড়ু মোয়া বানাতে বসে গেছে। যত লোক পূজো দেখতে আসবে— সবাইকে জলপান দিতে হবে। কারু সময় নেই। তুমি গল্প জানো বলেছ। বল না একটা?'

সেদিন গল্প শোনার জন্যই তুমি এসেছিলে।

কি গল্প তোমাকে বলবো— গোয়েন্দা না অন্য কিছু ঠিক করে উঠতে না পেরে বিপদেই পড়ে গেলাম। এ ভাবে গল্প বলার ডাক আমার কোন দিন আসেও নি। বললাম, 'নিজে না পড়ে তুমি কেবল গল্প শোন কেন? গল্প শোনে যে বাচ্চারা পড়তে শেখেনি তারা।'

তুমি বললে, 'আমার পড়তে ভালো লাগে না। শুনতে ভালো লাগে। দিদি আমাকে কত ভালো ভালো গল্পের বই এনে দেয়।'

'তুমি তা পড়ো না।'

'পড়ি। কিন্তু আমার মোটেই ভালো লাগে না। টুনু পিসী, চাঁপা দি, রাঙা ঠাকুমা কি সুন্দর করে গল্প বলে। তেমন করে কেউ লিখতেই পারে না।'

তুমি ফের গল্প বলতে বলার আগেই আমি চট করে অন্য কথায় চলে এলাম। বললাম, 'তুমি স্কুলে পড়ো তো নিশ্চয় উত্তরা?'

তুমি নির্বিকার ভাবে পা দোলাতে দোলাতে বললে, 'আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে।'

আমি হাসি চেপে বললাম, 'আচ্ছা। তা কোন ক্লাসে পড়া শেষ করলে?'

তুমি আমার পরিহাস ধরতে পারলে। রেগে গেলে একটু অপমানিতও হয়তো বোধ করলে। তোমার পা দোলানো থেমে গেল।

আমি প্রমাদ গুনলাম। প্রশ্ন পাল্‌টে ফেলবার আগেই দেখলাম তুমি উঠে যাচ্ছ। তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি ভালো ভালো গল্প জানি। এবং এক্ষুনি বলতে রাজি আছি।'

আমার প্রতি আপসের মনোভাব ছিল বলেই তুমি ফিরে এসে বসলে। হেসে বললে, 'তবে বল।'

সে দিন তোমাকে উত্তরা আমি বেশ বড় একটা গল্প শুনিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গীরা তোমাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছিল। কুমুদ তিনটের সময় চা জলখাবার নিয়ে এসে তোমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, 'ঝড় নেই, তুফান নেই—তুমি ঘরে বসে আছ ছোট দিদিমণি?' 'যাও গল্প বলার সময় বিরক্ত করবে না বলছি'। বলে কুমুদকে ঠেলে দিয়ে আবার নিবিষ্ট হয়ে বসে আমাকে বলেছিলে, 'বল, তারপর?'

আমি আবার বলতে শুরু করেছিলাম। কুমুদের মুখে শুনে ছোট মামীমা এসে দাঁড়িয়েছিলেন গালে হাত রেখে। অতি অভিনয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, উত্তরিয় নৌকোটা উত্তরির প্রতীক্ষায় জলের উপর ছলাৎ ছলাৎ করছে, চম্পাবাঈ তৈরী হয়ে বসে রয়েছে, আর উত্তরি কিনা ঘরে।'

'যাও না— যাও না বলছি'— আব্দারি আহ্লাদি নাকি সুরে বলতে বলতে দিদিকে ঠেলে বের করে দিয়ে ফের এসে গুছিয়ে বসেছিলে। আমার দিকে তাকিয়ে বসেছিলে, 'বল, তারপর'?' কুমুদ হ্যারিকেন রেখে যেতে এসে আবার বলেছিল, 'ছোট দিদিমণি আজ বাড়িসুদ্ধ সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে।'

গল্প শেষ হতে রাত হয়ে গিয়েছিল।

পরিতৃপ্ত মনে তুমি বলেছিলে, 'সব চাইতে ভালো গল্প বলতে পারো তুমি। টুনু পিসী, চাঁপাদি. রাঙাঠাকুমারা কেউ এত সুন্দর করে বলতে পারে না।'

কিন্তু গল্প যে আমারই তৈরী—আমি যে বানাতে বানাতে বলে চলেছিলাম, এ কথা তুমি জেনেছিলে অনেক পরে। যখন আমি লেখক হয়েছি তখন। তার আগে বলিনি। কিন্তু আশ্চর্য। এতো কথা মনে আছে, গল্পটা কি বলেছিলাম—আমার প্রথম গল্প কি নিয়ে রচিত হয়েছিল, সে কথা একেবারেই মনে নেই! একে আমার প্রথম রচনা, তাতে তোমার কাছে বলা, তাই আজকাল গল্পটাকে মনে মনে খুব খুঁজি। কিন্তু পাই না। আমি জানি তোমার মনে আছে। পুরোটা মনে আছে। আমি যে ভাবে বলেছিলাম ঠিক সেই ভাবে মনে আছে।

'কিন্তু তুমি আছ কি?'

জানি না......

তোমার সঙ্গে আর একদিনের কথোপকথনটা বলে এবারের যাত্রার কথা শেষ করব। তোমার সে কথাগুলো এতই মজার যে না বলে পারছি না। তুমি বলেছিলে তোমার পড়াটড়া ভালো লাগে না। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কি ভালো লাগে উত্তরা?'

তুমি আঙুলের কর গুণে গুণে বলতে লাগলে মাছ ধরতে— এক। সাঁতার কাটতে—দুই। নৌকো চালাতে— তিন। গল্প শুনতে— চার। ব্যস খতম।'

'আর কিছু ভালো লাগে না?'

'না।'

'মাছ ধরবে, সাঁতার কাটবে নৌকো চালাবে-সারা জীবন এগুলোই করবে?'

'হ্যাঁ।'

'জলেই থাকবে তবে?'

'জলই জীবন। পড়ো নি?'

'পড়েছি। কিন্তু তুমি তো পড়তে ভালোবাস না।' এমন মূল্যবান কথাটা পড়লে কোথায়?

'কোথায় পড়েছি মনে নেই। আমার সঙ্গে মিলে গেলে তো? তাই মনে আছে।'

আমার এতো আমোদ লাগছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'খাল বিল পুকুর পর্যন্তই থাকবে না সাঁতার দিতে, নৌকো বাইতে আর মাছ ধরতে নদীর অবধি যাবে?'

তুমি গম্ভীর ভাবে বললে, 'সে তো সবাই। খাল বিলে পড়ে থাকব নাকি? আর একটু বড় হয়ে নেই— তারপর চাঁপা তো থাকবেই। রমা কালী প্রফুল্লদের নিয়ে নদীতেও মাছ ধরব।'

'ভয় করবে না?'

'ভয় করবে? কেন?' বেশ বিস্মিত হয়ে ভুরু থোবা করে বললে তুমি।

'জেলে নৌকোগুলোকে যে ভাবে ঢেউ-এর তলায় ডুবতে আর ভাসতে দেখলাম আসবার সময় তাতে মনে হয় গেল বুঝি ডুবে। এবার পর ভাসবে না। ভয় করে না?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'ডুবে যায়, সাঁতরে উঠে আসব। জেলেদের নৌকো এমন কত ডোবে। তুমি যে ঢেউ দেখেছ এ ঢেউ তো পদ্মার শান্তমনের ঢেউ। যখন রেগে যায়, তখনকার ঢেউ দেখলে তুমি অজ্ঞান হয়েই যেতে। জেলেরা তার মধ্যেও মাছ ধরে। তোমার নদীতে মাছ ধরা দেখতে ভালো লাগে না?'

'তা লাগে। কিন্তু তাই বলে সারা জীবন মাছ ধরব এমন কথা ভাবিনে। তোমার স্বপ্নে সমুদ্রে মাছ ধরাও আছে নাকি উত্তরা?'

আমি ভেবেছিলাম আমার ঠাট্টায় তুমি হাসবে। কিন্তু তুমি গম্ভীর ভাবে বললে, 'আমি সমুদ্র দেখিনি। পদ্মার চাইতে বড়?

'অনেক—অনেক—অনেক বড়।'

'পদ্মার মতো ঢেউ?'

'অনেক—অনেক—অনেক গুণ বড় ঢেউ।'

'দেখে নেই আগে। তারপর বুঝব।' তারপর ভারিক্কি চালে বললে, 'তোমার সব কিছুতেই ভয়ের কথা আগে মনে আসে কেন বলো তো? খুব সাহসীর মতো বীর হও তো। ক্যাসাবিয়াঙ্কার গল্প জানো?'

'জানি।'

'কেমন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল আগুনের মধ্যে পতাকা নিয়ে। পারবে?'

'না পারব না। তুমি পারবে?'

'আমি?' ভাবতে লাগলে তুমি।

আমি তোমার উত্তর দেওয়ার সততা দেখে সকৌতুকে তোমাকে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর মাথা নেড়ে বললে, 'না! আমিও পারব না। আমি পুত্তর মা আর বৌ-এর মতো যুদ্ধ করতে করতে মরতে পারব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে পারব না।'

'পুত্ত কে?'

'জানো না পুত্তর কাহিনী? এ তো সত্য ঘটনা। বই-এ লেখা আছে। রাজপুত বীর বালকের কথা।'

আমাকে স্বীকার করতে হলো জানি না।

তুমি পুত্তর কাহিনী শোনালে আমাকে—

মাত্র ষোল বছরের রাজপুত বালক পুত্তর উপর ভার পড়েছিল চিতোর দুর্গের তোরণ রক্ষার। মা পুত্রকে সাজিয়ে দিলেন রণসাজে। কপালে পরিয়ে দিলেন চন্দন তিলক। আশীর্বাদ করলেন মাথায় হাত রেখে। পুত্ত যুদ্ধ করলো যতক্ষণ দেহে প্রাণ রইল। পুত্রের প্রাণ হীন দেহ যখন পড়ে গেল অশ্ব থেকে, তখন মা নিজে রণসাজে সাজলেন। বধূকে রণসাজে সাজালেন তারপর গিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়ালেন সমরাঙ্গনে বধূকে নিয়ে। মাত্র তো ষোল বছরের ছেলে পুত্ত। তায় বৌ-এর আর বয়স কি বলো? এই আমার মতোই হবে তো? তের কি চৌদ্দ?

আমি সমর্থন জানালাম। 'নিশ্চয়ই তোমার মতই বয়স হবে।'

'তবে? দেখো তো ঐ বয়সে কেমন আকবরের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলো? কি সুন্দর না? আমি এরকম মরতে পারি। পুত্তের মায়ের মতো। বউ-এর মতো। তুমি পুত্তের মতো মরতে পারবে?'

'ডাক পড়লে অন্তত চেষ্টা করে দেখতেই হবে। কিন্তু এবার আজ তোমার একটা গান শুনব। ছোট মামীমা বলছেন, তুমি খুব ভালো গাও।'

'কোথায় গাইব? এখানে? ঘরে বসে?'

কথাটার অর্থ বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'ঘরেই যখন রয়েছি। তখন ঘরে বসেই শোনাও।

'ঘরে আমি গাইতে পারিনে।'

'তবে কোথায় গান গাও তুমি?'

'সে কি ঠিক আছে? যখন বাইরে ঘুরি তখন গাইতে ইচ্ছে করে। ঘরে আমার গাইতেই ইচ্ছে করে না। বেশ দিব্য গাছের উপর পা ঝুলিয়ে বসে— গলা ছেড়ে গাইতে ভালো লাগে। পুকুর ঘাটে জলে পা ডুবিয়ে বসে গাইতে ভালো লাগে। চিৎ সাঁতারে হাত পা ছেড়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে গাইতে ভালো লাগে। আমার কিছু ঠিক নেই। ঘরে আমার গলাই বেরোয় না।'

আমি হেসে ফেলেছিলাম উত্তরা। বলেছিলাম, 'তোমার মা গাছে উঠতে মানা করেছেন বলে গাছে উঠা ছেড়ে দিয়েছো। বাঁচা গেছে। গান শুনবার জন্য তোমায় গাছে চড়িয়ে দিয়ে আমি তলায় বসে থাকতে পারতাম না।

তুমিও হেসে ফেলেছিলে। ঐ ভাবে গান গাও বলে গাছে বসে গান গাওয়ার হাস্যকর দিকটা তোমার মনে আসেনি। কিন্তু আমি ওভাবে বলতেই তোমারও হাসি পেয়ে গিয়েছিল।

তারপর আমি বললাম, 'আর পুকুরে চিৎ সাঁতারে গা ভাসিয়ে গান— সেটা মন্দ কিছু নয়। ভালোই। কিন্তু আমি সাঁতার জানিনে। তোমার সঙ্গে ভেসে চলতে পারব না। গান শুনব কি করে? বাকী রইল পুকুরে পা ডুবিয়ে বসে। এটা সব চাইতে সুন্দর। আমি পারবও সেটা। তবে চলো— তাই যাওয়া যাক্।'

কিন্তু তুমি সে যাত্রায় আমাকে গান শোনালে না। এমন কি আরও যে ক'বার গেলাম তার একবারও নয়। তুমি গান শোনালে একেবারে শেষ বিদায়ের দিনে। তোমার বিয়ের আগে রাতে।

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

পূজোর দু দিন বাকী। প্রতিমা গড়া শেষ। আত্মীয় কুটুমে তোমাদের বাড়ি ভরে গেছে। কে যে আসেন জানি না। ছোট মামীমা ডেকে নেন। প্রণাম করতে বলেন। প্রণাম করে পালিয়ে আসি। কত যে পূজার উপহার এসে কোলের উপর পড়তে লাগলো, তারও ঠিক নেই। জরিপাড় শান্তিপুরের ধুতী, দুধ গরদের পাঞ্জাবী। জুতো রুমালের সেটও বাদ গেল না। বাড়ির বড় মেয়ের ননদের ছেলে। তোমাদের জেঠিমা, কাকিমা, পিসিমারা সবাই কাপড় জামা দিতে লাগলেন। আমি তোমায় বললাম, 'সবাই কত কি উপহার দিচ্ছে। কই তুমি তো কিছু দিলে না?' পরের দিন আমার হাতে একটা কালো ভেলভেট মোড়া বাক্স দিলে তুমি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি?' তুমি বললে, 'খুলেই দেখ না।' খুললাম। অবাক হলাম! একটা অতিমূল্যবান রূপোর পাল-তোলা নৌকো। পাল থেকে শুরু করে নৌকোর শরীর পর্যন্ত সব জায়গায় সাদা পোখরাজ বসানো। মাঝে মাঝে আবার লাল চুনি আর সবুজ পান্নার ছিটে। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম জিনিসটা কতক্ষণ দেখবার মতো জিনিষ বটে। বললাম, 'ভারি অপূর্ব তো?'

'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

আমি তোমার দিকে তাকালাম।

তুমি বললে, 'আমার পূজোর উপহার।'

'আমাকে দিলে নাকি এটা! পাগল কাকে বলে। নেও।' আমি বাড়িয়ে ধরলাম বাক্সটা।

'নেবো? কেন?' ভুরু কুচকে বললে তুমি।

'আমি কি তোমাকে সত্যি বলেছি নাকি উপহার দেবার কথা?'

'আমি সত্যি দিয়েছি।'

'অন্য কিছু দিও। আমি কি করব এটা দিয়ে বলো? নৌকো দিয়ে মাছ ধরবে তুমি। তুমিই রাখো এটা।'

'ওমা, এটা কি মাছ ধরবার জেলে নৌকো নাকি? তুমি কিছু জানো না। এটা তো চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য তরী।'

'সমুদ্র মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে এই বাণিজ্য তরী নিয়ে দ্বীপে চলে যাবে। মতি মুক্তো চন্দন বাণিজ্য করে আনবে চাঁদ সদাগরের মতো। তাই তোমাকেই আবার এটা আমি উপহার দিচ্ছি।'

তুমি হাত ঝাপটা দিয়ে দু পা পিছিয়ে গেলে। বললে, 'ধেৎ, দিয়ে নিলে শিয়াল হয়। এটা তো আমার জিনিষ। জন্মদিনে বাবা দিয়েছিলেন।'

'জন্মদিনে বাবা দিয়েছিলেন? তবে তো দেওয়াই চলে না। জন্মদিনের উপহার কাউকে দিতে নেই। নাও ধরো তো।'

আমার বাড়িয়ে ধরা হাত বাক্স শুদ্ধু ঠেলে দিলে তুমি—'নিশ্চয় দিতে আছে। নইলে মা আর দিদি বুঝি দিতে বলতেন?'

তোমার সেই বাণিজ্য তরী আমার রত্ন ভাণ্ডারে জমা আছে। ভেবেছিলাম, তুমি বাণিজ্য তরী দিয়েছিলে। বাণিজ্য মোটামুটি ভালোই তো করছি। বাড়ি গাড়ি অনেক কিছুই হলো। আজ বুঝছি মিথ্যা আচরণের পর মিথ্যা আচরণ দিয়ে ঘর ভরেছি মাত্র।

আমি নৌকোটা থেকে চোখ তুলতে পারছিলাম না। মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে বললাম, 'এখন আমি তোমাকে কি দি বলো তো?'

'তুমি আমাদের কাছে এসেছ, আমরা দিচ্ছি। আমি যখন তোমাদের কাছে যাবো, তখন তুমি দেবে।'

'তুমি তো যাবেই না কলকাতা।'

'এবার যাবো। আগে তো তোমাকে চিনতাম না। এবার তোমাদের কলকাতাকে একবার দেখে আসবো গিয়ে।'

'কলকাতাকে সেজন্য কতদিন প্রতীক্ষাকাল কাটাতে হবে?'

আমার বয়স পনেরো। আমি কলকাতার ছেলে। আমার মনে রোমান্সের ছোঁয়া লেগেছে। তোমার বয়সও চৌদ্দ। তোমার মনেও সে ছোঁয়া লাগতে পারত। কিন্তু তুমি শিশু বয়স থেকে জল নিয়ে মেতে আছ। এখনও সে মত্ততা তোমার থামেনি। শিশুর জল ঘাঁটার মতো এখনও জলই তোমার সব চাইতে প্রিয় খেলনা।—জল থেকে এখনও তোমার দৃষ্টি সরেনি। আমার জিজ্ঞাসার রোমান্টিক ইসারা তুমি ধরতে পারলে না। বললে, 'বড় দিনের সময় যাবো। আমাদের পরব যেমন পূজো, তোমাদের পরব নাকি বড়দিন। এবার বড়দিনের সময় যাবো—ঠিক দেখো। ফুলকফি, গলদা চিংড়ি, মুরগী মটন, হুইস্কির ডালি সাজিয়ে—এমনি করে মাথায় তুলে নিয়ে পূর্ববাংলার বাবু, সাহেব কলকাতার সঙ্গে ভেট করতে যাবে।' বলে ডালি মাথায় নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিটা দেখালে তুমি।

তোমার দু হাত তুলে ভেটের ডালা মাথায় নিয়ে ক'পা চলার ভঙ্গি আমার ভেতর শিহরণ জাগালো। বুঝলাম বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছি।

তোমার এই ভেট নিয়ে যাওয়ার কথাটা আমাকে আশ্চর্য করেছিল। আমি বললাম, 'এ সব তুমি জানো কি করে?'

'কালেক্টর সা'ব এলে নায়েবকাকা এসব ভেট নিয়ে দেখা করতে যান। বড়দিনে সাহেবের দপ্তরে পাঠাতে? আচ্ছা!'

তারপর বললাম, 'তুমি যে কিছু জানো না। তোমাদের কাছে আমি যা হেরেছি, আমার কাছে তার চাইতে অনেক বেশী যে হেরে যাচ্ছ—কলিকাতা এলে তখন বুঝবে।'

'কক্‌খনো নয়। ওখানেও আমি তোমাকে হারিয়ে দেবো দেখো।'

'আচ্ছা, দেখবো!'

দুদিন বাদে ঢাকে কাঠি পড়ল। সন্ধি পূজোর দিন তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপের চত্বরে ঢাকীরা নতুন শালুর পোষাক পরানো ঢাক আর জয়ঢাক বাজাতে লাগলো— তালে তালে পা ফেলে ঘুরে ঘুরে, ডিম-ডিমা-ডিম টিটিম্-টিটিম্...টিটিম্...টিটিন্। সঙ্গে কাঁসি বাজতে লাগলো, ঠং ঠং ঠং ঠং। আট দশ বছরের কয়েকটি ছেলে বাসন্তী রং এর ধুতি পাঞ্জাবী, গলায় লাল রং-এর চাদর জড়িয়ে ঢাকিদের সঙ্গে নাচতে নাচতে হাতে তাল দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো,

> ডিম-ডিম-ডিম টিটিম্-টিটিম্
> পূজো এসেছে জ্বালো পিদিম
> —জ্বালো পিদিম।
> জ্বালো পিদিম।।

বাচ্চারা রঙিন ডুরে শাড়ি আর রং বেরং -এর জামা পরে নাচ দেখছে। দাঁড়িয়ে আছে আরো অনেক জন। জল নদী ডিঙিয়ে দূর থেকেও ভেসে আসতে লাগলো ঢাকের ডিম ডিম শব্দ।

তোমাদের রায়েদের বাড়ির পূজোই গ্রামের সব চাইতে বড় পূজো। সাজি ভরে শিউলি ফুল আর পদ্ম নিয়ে মেয়ে পুরুষ অঞ্জলি দিতে আসতে লাগলো। সন্ধ্যায় আসতে লাগলো আরতি দেখতে। প্রসাদ পেতে লাগলো রেকাবি ভরে ভরে। দাস দাসীরা থালা ভরা ফল মিষ্টি-প্রসাদ, মাংসের মহাপ্রসাদ দিয়ে আসতে লাগলো বাড়ি বাড়ি।

আর দুলে বাগ্দী ধোবা নাপিত ঘরামীদের রান্নাঘর তো পূজোর পাঁচ দিনের জন্য একেবারে বন্ধ। তারাই ছিল দেখলাম তোমাদের বাড়ির মান্য অতিথি। প্রতিদিন তোমার মা ছোট মামীমারা দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাওয়াতেন পরিতৃপ্ত করে। কেউ না আসতে পারলে ছাঁদা বেঁধে দিয়ে দিতেন তার মা বৌ-এর সঙ্গে। বলে দিতেন, 'কাল আসতে বলিস হরিন্দরকে। কোন বড় মানুষ হয়েছে শুনি?'

তোমাদের সিং-দরজার ভেতরে মন্ত্রপাঠ, স্তোত্রপাঠ, ঢাকের বাদ্যি, পাঁঠা বলি, প্রসাদ বিতরণ। সিং-দরজার বাইরে যাত্রাগান। লাঠিখেলা। বাইচ খেলা। তীরের মতো লম্বা লম্বা নৌকোগুলোর নদীর উপর। বাইচ খেলা দেখবো না মাঠে লাঠি খেলা দেখব? এটা দেখে দলবেঁধে ওটা দেখতে ছুটি। ওটা দেখে আবার ছুটি সেটা দেখতে।

পরেশ প্রফুল্ল আমি নতুন ধুতি পাঞ্জাবী জুতো পরে আর তুমি রমা কালী নতুন শাড়ি পরে সমস্ত দিন ছোটাছুটির মধ্যে থাকতাম। রাতে এসে বসতাম সেজেগুজে পান মুখে দিয়ে যাত্রার আসরে।

নিয়তির অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণী. বিবেকের ক্রুদ্ধ অঙ্গুলি নির্দেশ দেখতে দেখতে ঢুলান শুরু হয়ে যায়। কুরু সভার মধ্যে পঞ্চ-স্বামীর সামনে দুঃশাসন দ্রৌপদীর শাড়ি ধরে টানছেন। দ্রৌপদী দু হাতে বুক চেপে পঞ্চ-স্বামীকে ধিক্‌কার দিচ্ছেন—ধিক্ বীর বিকোদর, ধিক্ বীর অর্জুন, ধিক্ তোমাদের জন্ম। তারপর নারায়ণকে ডাকছেন ঊর্ধ্বনেত্রে তাকিয়ে, কোথায় প্রভু নারায়ণ, রক্ষা করো মোরে—

দুঃশাসনের হাতে প্রায় দ্রৌপদীর শাড়ি চলে এসেছে—দস্তুর মতো থ্রিলিং জায়গা! কিন্তু চোখের পাতা টেনে রাখতে পারছিনে। তুমি জলে ভেজা ছোট একটা রুমাল হাতে দিয়ে বলো, 'চোখে জল দাও। ঘুম চলে যাবে।'

জল-রুমাল তুমি ডিবেয় করে রোজ সঙ্গে নিয়ে আসতে। যখন আর চোখ খুলে রাখতে পারতে না তখন চোখে ঠাসতে। আমাকেও দিতে। আমি চোখে জল দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে তাকিয়ে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ আড়ালে বসে দুষ্টু দুষ্টু মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন আর একের পর এক শাড়ি যুগিয়ে চলেছেন দ্রৌপদীকে।

পরের দিন সদলবলে আমরা গিয়ে স্কুল বাড়িতে যাত্রাদলের ঘরে উঁকি ঝুকি মারি—কৃষ্ণ আর দৌপদীকে দেখার জন্য। দ্রৌপদী তখন লুঙ্গী পড়ে নিমের দাঁতন দিয়ে মুখ ভেংচে ভেংচে দাঁত মাজছে। আর শ্রীকৃষ্ণ বসে অধিকারীর গোদা গোদা পা টিপছে!

মনই খারাপ হয়ে গেল দেখে।

প্রায় সাতটা দিন উৎসবের স্রোত কাটিয়ে প্রতিমা বিসর্জন শেষে প্রতিমা শূন্য চণ্ডীমণ্ডপে এসে সবার সঙ্গে বসলাম শান্তিজল মাথায় নিতে। সবাই পা মুড়ে কাপড় দিয়ে পা ঢেকে বসেছেন। যেন শান্তিজলের ছিঁটে পায় না পড়ে। আমিও ধুতির কোঁচা দিয়ে পা ঢাকলাম। ঠাকুর মশাই মন্ত্রপাঠ করতে করতে সবার মাথার উপর 'শান্তিজল' ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। প্রতিমা শূন্য জায়গাটার দিকে তাকিয়ে একান্ত প্রিয়জন কারু চলে যাওয়ার বেদনার মতো মনটা কাঁদতে লাগলো। ঢাক বাজছে, ডিমডিম; ডিমডিম; ডিমডিম...। হাতের কাঠি এখন আর ঢাকীর টিটিম্-টিটিম্ বোল তুলছে না। পূজো হয়ে গেছে। প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে। উৎসাহ উদ্দীপনা শেষ। ঢাকীর কাঠি ঢিমে তালে বাজছে—ডিম ডিম; ডিম ডিম; ডিমডিম...।

পনেরোটা দিন তোমাদের মধ্যে অপূর্ব আনন্দে কাটিয়ে বিজয়ার বিষণ্ণতা নিয়ে কলকাতা রওনা হবার জন্য গোছগাছ করতে বসলাম।

তুমি এসে বসলে। বললে. 'দিদিটা খুব কাঁদছে। দিদির ইচ্ছে ছিল লক্ষ্মীপূজোর পরে যায়। জামাইবাবু দিলেন না। কেন বলতো।'

একেবারে খামকা।

তুমি চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলে।

আমি বললাম, 'তুমি লেখো না ছোট মামাকে? তুমি হলে শালী। তোমার আব্দার রাখবেন দেখো।'

'তুমি যে বললে খামকা দিদিকে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'তাই তো নিচ্ছেন।'

'খামকা যারা কষ্ট দেয়, তাদের আমি ভালোবাসিনে।'

আমার মনে পড়লো বঁড়শিতে গাঁথা মাছকে তুমি খুলে তাড়াতাড়ি ঘটির জলে ছেড়ে দাও। কিছু পরেই কাটবে—তবু এই মাঝের সময়টুকু যেন কষ্ট না পায়।

কুমুদ এসে আমার জামা কাপড়ের বোঝা ছোট মামীমার কাছে নিয়ে গেল। তুমি বললে, 'তুমি আবার আসবে।'

'আর সে আসতে পারব—অন্তত শিগগির যে পারব, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। বললাম, আসতে খুব ইচ্ছে করবে।'

'তবে চলে আসবে?'

বললাম, 'এটা আমার পরীক্ষার বছর যে। তারপর ক্ষেপালাম—আর আমি তো একটা 'কিচ্ছু না' লোক। সাঁতার জানিনে। সাপ দেখলে ভয় পাই...

'থামো না'...কান্না কান্না গলায় বললে তুমি। 'আমার বলে ভীষণ মন খারাপ লাগছে।'

'সে তো দিদির জন্য।'

'তোমার জন্যেও লাগছে।'

এমন সরল পরিচ্ছন্ন স্বীকৃতির পর নিজের মনোভাব লুকোনো বিশ্রী কপটতা। আমিও বললাম, 'আমারও খুব মন খারাপ লাগছে উত্তরা— খুব খারাপ লাগছে।'

'তা হলে নিশ্চয়ই আসবে বলো?'

'আসব।'

'ঠিক?'

'ঠিক। কিন্তু তুমিও কলকাতা যাবে বলেছ মনে রেখো।'

'সে আমি যাবই। কিন্তু তা তো একবার! তুমি বার বার আসবে।'

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'বার বার আসব? আসলাম! তারপর?'

'তারপর কি?'

'বারবার আসতে থাকলাম। কিন্তু একবার তো থামতে হবে?'

'থামতে হবে কেন?'

'চাকরীবাক্‌রী করব না?'

'ছুটিতে আসবে।'

'তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে তো?'

'আমি বিয়েই করব না।'

'আমি তো করব?'

'বৌ-এর হিংসে হবে। সে তাহলে তোমাকে হিংসে করবে।'

'কেন? আমাকে হিংসে করবে কেন?'

'ছুটি হলেই ছুটে তোমার কাছে— ভাববে, তোমায় ভালোবাসি। ভাববে, তাই যদি হয় তবে তোমাকে বিয়ে না করে তাকে করলাম কেন!

ভেবেছিলাম, এবার তোমার মুখটা একটু লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু হল না। তুমি মাথা নেড়ে বললে, 'তোমাকে বিয়ে করা আমার হবে না। আমি কলকাতায় থাকতে পারব না।'

'আমি পূর্ববাংলায় থাকতে পারব।'

তুমি ভীষণ সিরিয়াস ভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'কক্‌খনো পারবে না। কলকাতার লোক কলকাতার বাইরে যেতেই চায় না। আবার থাকবে। জামাইবাবু দুদিনের জন্য পর্যন্ত আসেন না—। দেখছি না বুঝি আমি? দিদির কাছে শুনেছি, কলকাতার বাইরে দশ দিনেই হাঁপিয়ে ওঠে।'

'তুমি নিজেও এই মাত্র বললে, কলকাতায় থাকতে পারবে না। আর দোষ বুঝি হলো কলকাতার মানুষ না থাকতে পারলে?'

'আমি দোষ বলেছি? তুমি ভারি ঝগড়াটে। যাবার আগে কোঁদল করবে না বলছি। তবে আমি এই যে পালাবো—আর আসব না।' তোমার চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠলো।

আমি তাড়াতাড়ি আমার চেয়ারটা তোমার একটু কাছে টেনে বসে বললাম, 'চমৎকার একটা গল্প ঠিক করে রেখেছি তোমাকে শোনাবার জন্য।'

তোমার দু-চোখ হেসে উঠলো। কলকাতা ফিরে এলাম প্রীতি নিয়ে।

কলকাতা পৌঁছেই তোমায় চিঠি দিলাম।

ছোট মামাকে ধরে কলেজ স্কোয়ারে ভর্তি হলাম। তোমার চিঠি আশা করতে লাগলাম। না পেয়ে রেগে গেলাম। আর চিঠি দিলাম না। উঠে পড়ে লাগলাম। পড়া নিয়ে। পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। বড়দিনে আসবে বলেছিলে। একবার ভাবলাম, কথাটা মনে করিয়ে দি। কিন্তু দিলাম না। বন্ধু-বান্ধব স্কুল নিয়ে আমি তখন বেশ ব্যস্তই বলতে পারো। আবার পূজো এলো। ছোট মামা ছোট মামীমাকে নিয়ে তোমাদের কাছে গেলেন। আমি টেস্টের পড়া পড়তে পড়তে ঢাকের বাজনা শুনতাম। কখনো বা গতবারের পূজোতে তোমাদের সঙ্গে কি ভাবে

কেটেছে সেই স্মৃতিচরণ করতাম। তখন তোমার জন্য মনটা বেশ খারাপ লাগত। টেষ্ট হয়ে গেল। তৈরী হতে লাগলাম এবার আসল পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষা হয়ে গেলে এলো ফলাফলের চিন্তা। যদিও পরীক্ষা আমি ভালো দিয়েছি। তবু কতো ভালো—এটাও কম চিন্তার বিষয় নয়। দশজনের ভেতর থাকতে হবে। রইলাম দশজনের ভেতরই। ভর্তি হলাম গিয়ে প্রেসিডেন্সিতে। কৈশোর থেকে যৌবনে যাওয়া আর স্কুলে থেকে কলেজে যাওয়া—প্রায় যেন একই জাতীয় ভয় ভাবনা আনন্দ— শিহরণের ব্যাপার মনে হলো আমার। কলেজে নোট নিই। লাইব্রেরীতে গিয়ে মোটা মোটা বই আনি। বাড়ি ফিরে খুব কায়দা করে বসে সেগুলো পড়ি। বেশ খেলা খেলা ভাবের আনন্দ। এর মধ্যে সাঁতার প্রায় শিখে ফেলেছি।

এবার একবার আসতে পারি জলের দেশের মেয়ের কাছে।

ছোট মামীমাকে গিয়ে বললাম, 'তুমি দেখছি বাপের বাড়িকে ভুলেই গেলে। কতদিন হলো যাও না?'

ছোট মামীমা বললেন, 'কতদিন হলোরে? গত পূজোয় গিয়ে এলাম না?'

'সেও অনেক দিন হয়েছে। উত্তরা বলেছিলো, পূর্ববাংলা দেখা নাকিআমার কিছুই হয়নি। জল আর মাছেদের সঙ্গেই যদি পরিচয় না হলো, তবে আবার পূর্ববাংলা দেখা হলো কি? মাছেদের ঘুম নাকি দেখবার মতো।'

ছোট মামীমা হেসে বললেন, 'ওটা একটা পাগল মেয়ে। মেয়েটার একটা ভালো বিয়ে দিতে পারতাম!'

পাত্রটা ছোট মামীমা আমাকেও ঠিক করতে পারে না কি? সে রকম কিছু মনে করেই কথাটা আমায় বলছেন কি? ছোট মামীমার মুখের রেখায় সে কথাটা রয়েছে কি না বুঝতে চাইলাম। কিন্তু কোন ইঙ্গিত পেলাম না। বললেন, তুই কিন্তু উত্তরাকে সে জন্য সত্যি পাগলা মেয়ে ভাবিস নে। বয়স অনুযায়ী বুদ্ধি পাকেনি এখনও। তাই ছেলেমানষি করে। মেয়েটা ভালো।'

আমি বললাম, 'ছাই ভালো। ওকে সাঁতার না দেখানো অবধি আমার শান্তি নেই।'

'তুই সাঁতার শিখেছিস উত্‌রিকে দেখাবার জন্য?' খুব হাসলেন তিনি। 'তোর খুব অপমান লেগেছিল সেবার? তবে তো একবার যেতেই হয় মান উদ্ধার করে আনবার জন্য।'

মান উদ্ধার করবার জন্য মামীমা নিয়ে এলেন ভাগ্নেকে। কিন্তু মান উদ্ধার তো হলোই না। আরো গেল। জলে পা ছোঁয়াতে ভয় পেতাম, সেখানে ডুব চিৎ উপুর সাঁতার দিচ্ছি। লেকের বাঁধানো জলের আধার এপার ওপার হচ্ছি। ভেবেছিলাম সাঁতার শিখে গেছি চমৎকার। কিন্তু সিমেণ্ট বাঁধানো ফুট মাপা জলে সাঁতার দেওয়া আর দীঘির গভীর জলে সাঁতার দেওয়া যে এক কথা নয়—জানতাম না। কারণ ফুটমাপা জলের কোন ওজন নেই। তার ভেতর চাপ নেই। তলিয়ে নেবার টান নেই। কিন্তু গভীর জলের ওজন আছে। চাপ আছে। তলার দিকে টেনে নেবার গুপ্ত টান আছে। গভীর জলের এই শক্তিগুলোকে চিনে নেবার আগে পর্যন্ত পাড়ের দিকে থাকাই যে ভালো তার কোন ধারণাই ছিল না। আমি গর্বে উৎসাহে এ যাত্রার পথকে প্রায় দেখলামই না। ঘাটে যখন নৌকো লাগলো তখন নেমেই পুকুরের দিকে ছুটি এমনি ইচ্ছে হতে লাগলো। কিন্তু কলেজে পড়ি। ছেলেমানষি ইচ্ছাকে ছেড়ে দিই কি করে। বরং বেশী নয়, একটু মাত্রা মতো ইনটেলকচ্যুয়েল ভঙ্গিতে এলো চুল আঙ্গুলে ঠেলতে ঠেলতে অনেককেই দেখছি না, ভাবটা চোখে রাখাই মানান সই?

ছোট মামীমা নৌকো থেকে নেমেই তোমাকে না দেখে রেগে গেলেন। 'কি গেছে বুঝি মাছ ধরতে? উত্‌রিকে এখনও মাছ ধরতে যেতে দেও কেন বলো তো মা? বড় হচ্ছে না?'

মা বললেন, 'তোর সাধ্য থাকে তো বন্ধ কর তো উত্‌রির মাছ ধরা।'

'এবার মাছ ধরা ওর বন্ধ করে তবে যাবো।' কোন পুকুরে তুমি গেছ জেনে নিয়ে ছোট মামীমা তখুনি চললেন তোমাকে ধরে আনতে। আমারও ইচ্ছে হলো যাই। কিন্তু গেলাম না। প্রণাম ট্রোণাম সেরে কুমুদের সঙ্গে আমার সেই গতবারের ঘরে চলে এলাম। দেখলাম, কুমুদ আগের বারের মতোই আমার খিদমতগার নিযুক্ত হয়েছে। আমি স্নান সেরে তোমার অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছু পরেই তুমি এলে। একটু বড় হয়েছ। অনেক সুন্দর হয়েছ। দেড় বছর বাদে দেখার প্রথম সঙ্কোচ একটু যেন ছিল তোমার চোখে। তোমার চলায়। কিন্তু কাটিয়ে ফেললে। বসেই জিজ্ঞাসা করলে, 'সে বার চিনতে না। তবু দিদির পিছু পিছু গিয়েছিলে। এবার গেলে না যে?'

'তুমি কি জলার ধারে, মাছ শিকার করতে করতে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে?'

তুমি হেসে ফেললে। বললে, হুঁ. তাই তো করছিলাম। গেলে না কেন?'

'ওবার দেখতে গিয়েছিলাম তুমি দু পায়ে হাঁটো না চার পায়ে হাঁটো।'

'মানুষ আবার চার পায়ে হাঁটে নাকি?'

'অনেকে হাঁটে।'

'আমাদের এখানে হাঁটে না। সে তোমাদের কলকাতায় হাঁটে।'

'কলকাতার সঙ্গে তোমার বিবাদ গেল না?'

'বিবাদ তোমাদের সঙ্গে। কলকাতার সঙ্গে নয়।'

'তোমাদের? আর একজন কে?'

'আমার জামাইবাবু। তোমার ছোট মামা। দিদিটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আমার কান্না পায়।'

'কিন্তু আমার দোষটা কোথায় দেখলে?'

'তুমিও যেন কেমনতরো। রাগ হলে মন খুলে রাগবে। খুশি হলে মন খুলে হাসবে। ডাকবে। খুঁজবে। কথা বলবে। তা নয়, এসে বই নিয়ে বসে রয়েছ। সবাইকেই তো চেনো। তবে ঘরে বসে রয়েছ কেন? তোমাদের কলকাতার রোগই হলো এইটা। জামাইবাবুও ঠিক এমনি। তোমরা আমাদের মতো মন খোলা হও না।'

'মন কি হেসে ডেকে চেঁচিয়ে খোলে?'

তুমি হাসলে।

আগের চাইতে বড় হয়েছ তবে।

কিন্তু তুমি সেটা ধরতে দিলে না। বললে, 'হেসে ডেকে চেঁচিয়ে মন খোলো খোলে না। খোলা মন হলে ঐ ভাবে চলে। কলেজে পড়ো। এখন অহংকার তো বাড়বেই। নাগালই পাবো না।

'আগে সাঁতারে নাগাল পাও তো।'

'ইস্, তোমার সাহস তো কম নয়। আমাকে সাঁতারে হারাবার কথা ভাবো? প্রফুল্ল পরেশরাই বলে পারে না আমার সঙ্গে।'

আমি তোমার কথা শোনার চাইতেও বেশী তোমাকে দেখছিলাম। আমার ভেতরে তখন ইচ্ছাটারও রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। সাঁতার দেখানোর চাইতে তোমার সঙ্গে সাঁতরাচ্ছি—এই অনুভূতি আমাকে রোমাঞ্চিত করছিল। বললাম, 'না হারতে পারি, সাঁতরাতে পারবো তোমার সঙ্গে সঙ্গে। সেটা ভাবতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। সমস্ত স্টীমার কেবল এই ভেবেছি।'

বুঝলে তুমি আমার কথা। বুঝলে কথার সুর। কিন্তু এবারও ধরতে দিলে না। বললে, 'সঙ্গে সঙ্গেও পারবে না। তোমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবো— দেখো।'

তোমার পায়ে আলতা ছিল। বললাম, 'দেখি উত্তরা তোমার হাত?'

'তুমি হাত দেখতে জানো নাকি? আমার ঠিকুজি নাকি ভী-ষ-ণ খারাপ। মা রাগ করে ছিঁড়ে ফেলেছেন।

আমি বললাম, 'না আমি হাত দেখতে জানিনে। তুমি আলতা পরেছ। আঙ্গুলগুলোতে নিশ্চয়ই আলতা লেগেছে। পায়ের চাইতেও আলতার ছোপ লাগা রচা হাত দেখতে আমার বেশী ভালো লাগে।'

'ওমা আলতা কি আমি পরি নাকি? চাঁপা পরিয়ে দেয়। আমারও কিন্তু আঙ্গুলে লাল ছোপ ধরা হাত দেখতে ভালো লাগে। চাঁপার হাত টেনে নিয়ে দেখি। চাঁপা আমার চাইতেও ফর্সা তো। খুব সুন্দর লাগে হাতটা দেখতে।'

'আশা করি তুমি চাঁপার সুন্দর হাত আমাকে দেখানোর জন্য তাকে আমার কাছে ধরে আনবে না।'

তুমি হেসে ফেললে।

কুমুদ খাওয়ার ডাক নিয়ে এলো। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। স্নান করার পর তোমার মা মিষ্টির থালা নিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু আমি খাই নি। ছোট মামীমা স্টীমারে আগের বারের মতোই রুটি মাখন ডিম মিষ্টি দিয়ে বলেছিলেন, জোয়ার না পেলে পৌঁছোতে বেলা হয়ে যাবে। ভালো করে খেয়ে নাও।' তাই ক্ষিধে ছিল না। সিঁড়ি নামতে নামতে বললাম, স্টীমারের বাবুর্চির হাতের মুরগীর কারি খেয়েছ? শোনা ছিল এমন জিনিস নাকি আর কোথাও নেই। ওবার যাবার সময় ছোট মামীমা আর আমি খেয়েছিলাম। স্বাদ গন্ধ এখনও লেগে আছে জিবে!

তুমি বললে, 'অনেক খেয়েছি। আমার মাসীমা যে গ্রামে থাকেন সেখানে গোয়ালন্দ স্টীমারে যেতে হয়। যখনই যাই ঐ মুরগীর ঝোল আর ভাত আমার চাই-ই চাই। সকাল বেলা হলে ঐ সকালেই ডেকে বসে কাঁটা চামচ দিয়ে এক থালা রাইস কারি খেয়ে নিয়ে তবে নামি। বাবা হাসেন। মা রাগ করেন।'

'সকালবেলা রাইস কারী পাওয়া যায়?'

'বলে করিয়ে নিতে হয়।'

পরের দিন এগারোটা বাজতে না বাজতে তোয়ালে কাঁধে ফেলে তোমাদের সঙ্গে দীঘিতে স্নান করতে চললাম।

তুমি বেশ আঁট করে খোঁপা বেঁধেছ। খোঁপার চারিদিকে গুঁজে দিয়েছে রুপোর ফুল-কাঁটা। চাঁদি রূপোর সাদা ফুলগুলি সদ্য ফোটা বেলফুলের মতো তোমার কালো চুলের উপর ফুটে আছে। শাড়ি পড়েছ একটা লাল টুকটুকে তাঁতের। পাড়টা তার হলদে। গোড়ালি থেকে বেশ উঁচুতে তুলে পরেছ শাড়ি। আঁচলটা সামনা দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়ে গুঁজে দিয়েছ পেছনে। হাতে তোমার লাল চুণির মোটা বালা। কানে বড় বড় দুটো লাল চুনির ফুল। গলা খালি। বোধহয় জলে পড়ে যেতে পারে বলে খুলে রেখে এসেছ। আমি আস্তে বললাম, 'কাল বলেছিলে আমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে। যাবে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতরাবে।' আমি তখন আঠারো বছরের প্রেমিক।'

যদিও তোমার চলা বলাটা আগের বারের মতোই ছিল। কিন্তু এবার সেটা তত খাঁটি ছিল না। তোমার চোখ আমার মুখের উপর পড়েই সরে যাচ্ছিল। ওটা লজ্জা। ওটা তোমার নতুন অনুভবের ভয়। তুমি বললে, 'থাকব।'

দীঘির ঘাটে এসে চওড়া সিঁড়িতে দাঁড়ালাম। বিশাল দীঘিটার দিকে তাকিয়ে একটু ভয় পেয়েই গেলাম। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না ভয় পাওয়ার; তোয়ালে সিঁড়ির ওপর রেখে পাজামার পা গুটিয়ে হাঁটুতে তুললাম। স্যাণ্ডো গেঞ্জী টেনে নীচে নামালাম। ততক্ষণে পরেশ প্রফুল্লরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছ। আমি তৈরী হতেই তুমি, 'এসো' বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে। আমিও ঝাঁপ দিলাম।

ছোট মামীমা আমার সাঁতার দেখতে এসে দাঁড়ালেন। তুমি বললে, দিদি তোমায় পাহারা দিতে এসেছেন। আমি ছোট মামীকে চেঁচিয়ে বললাম, 'উত্তরা বলছে, তুমি নাকি আমাকে পাহারা দিতে এসেছ। শিগ্‌গির চলে যাও।'

ছোট মামীমা হেসে চলে গেলেন।

তুমি আমার সাঁতার দেখে বললে, 'অত হাত পা ছুঁড়ো না। তাড় তাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

তোমার সাঁতার ছিল সত্যি দেখার মতো। নিঃশব্দ পা দিয়ে জল ঠেলে হাত দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। বললাম, 'দাঁড়াও। আস্তে আস্তে হবে সব।' তুমি ডুব দিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়ে ভেসে উঠে শরীরটা জলের উপর চিৎ করে দিলে। বললে, 'অপেক্ষা করছি। চলে এসো।' আমিও তোমার কাছে ডুব সাঁতারেই গেলাম। কিন্তু এক দমে পারলাম না। তিনটে ডুব লাগলো। আর তাতেই দম ফুরিয়ে এলো যেন। রমা কালী পরেশরা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। ওরা দীঘির ওপাড়ে যাবে। তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিলে, 'ওপাড়ে যেতে পারব কিনা।' আমি বলেছিলাম, 'পারব।' তাই তুমি ওপাড়ের দিকে এগুচ্ছিলে। আমিও এগুতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে আমার মনে হলো, কোথায় ওপাড় ? কোথায় এপাড় ? চারদিকে জল ছাড়া কিছুই নেই। তবু সাঁতরাতে লাগলাম। অহং আমায় থামতে দিলো না। কিন্তু আমার মনে হতে লাগলো, দীঘির পাতলা ঢেউগুলি রেশমী রুমালের ফাঁসের মতো ফাঁস বাঁধছে আমার গলায়। গভীর জলের চাপ আমাকে টানছে দীঘির তলার দিকে। যত না ক্লান্ত হয়েছিলাম তার চাইতে বেশী ভয়ে আমার হাত পা অবশ হয়ে এলো। ফিরে যাবো ? কোথায় ফিরবো ? যতটা সামনে রয়েছে ততটাই তো পেছনে যেতে হবে। আমি তোমার কাছে এগুতে চাইলাম। তোমাকে গিয়ে ধরতে চাইলাম। ডাকতে চাইলাম। তোমাকে রমারা কি যেন বলছিল। তুমি উত্তর দিচ্ছিলে। আমি ডাকলাম, উত্তরা...

ঝট্ করে মুখ ঘোরালে আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার শরীরটা জলের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরে আমার দিক হয়ে গেল। সাপের মতো বেগে সাঁতরে আমার দিক হয়ে গেলে। নিজেকে দূরে রেখে হাত বাড়িয়ে আমার চুলগুলি শক্ত মুঠিতে ধরলে। বললে, 'তুমি শুধু শরীরটা একটু ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করো। একেবারে ছেড়ে দিও না।' কিন্তু ভাসিয়ে রাখতে পারলে আমি ডুবব কেন। কিভাবে আমার মাথা জলের উপর জাগিয়ে রেখে চুলের মুঠি ধরে টেনে আমাকে সিঁড়ির উপর এনে ফেলেছিলে তুমি, আমি জানি না। আমি কোন মতে সিঁড়িতে উঠে বসে হাঁপাতে লাগলাম। আর উত্তরা তুমি কি করলে ? সিঁড়ির উপর বসে দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললে তোমার খোঁপা খুলে গিয়েছিল। চুলগুলি ছড়িয়ে ছিল সামনে পেছনে। রূপোর কাঁটাগুলির কিছু জলে পড়ে গিয়েছিল। দু তিনটে চুলের এদিক ওদিক ঝুলছিল। ভিজা শাড়ি জামা লেপটে ছিল প্রতিমার গায়ের মাটির শাড়ি জামার মতো। পরিশ্রমে আতঙ্কে কান্নায় তোমার শরীর কাঁপছিল।

লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সান্ত্বনা আর কেউ ব্যাপারটা দেখে নি। দীঘি তোমাদের বাড়ির পেছন দিকে। জায়গাটা নির্জন। রমারা ওপাড় থেকে আমাদের এখনও হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওরা কেবল দেখছে আমরা ফিরে এসেছি। কেন এসেছি বোঝেনি। তুমি কাঁদছিলে। আমি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। আমি বললাম, 'ওপাড় থেকে ওরা তোমায় ডাকছে।' তুমি মুখ থেকে হাত নামিয়ে হাত নেড়ে বলে দিলে যাবে না। তারপর চোখ মুখ মুছে বললে, 'তুমি ঘরেই স্নান করো বাবা! আর তোমার সঙ্গে জলে নামছিনে।' তারপর শিউরে উঠলে। মাগো, আর একটু পর দেখলে তো মরেই যেতে। আমিও আর উঠতাম না জল থেকে।'

আমার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বিপদ কেটে গেছে। ব্যাপারটা কেউ দেখেনি। তোমার কাছে লজ্জা লজ্জা বলে মনে হচ্ছিল না। আমি কাল অবশ্যই এখানে স্নান করবো। জলে নামব। সাঁতার কাটব—তবে হ্যাঁ পাড়ের দশ হাতের মধ্যে। বুড়ি ছুঁয়ে। মানে সিঁড়ি ছুঁয়ে। নিজেকে ফিরে পেয়ে বললাম, 'আমি মরলে জল থেকে উঠতে না— দিদির কথা ভেবে?'

আমি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তখনও তা হতে পারো নি। তোমার গলায় তখনও কান্না ছিল। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললে, 'ডুবতে ইচ্ছে করতো ডুবতাম। আর কিছু জানিনে।' গতবার যখন বলেছিলাম, 'মন খারাপ লাগছে তো দিদি চলে যাচ্ছেন বলে।' তুমি বলেছিলে, 'না তোমার জন্যও মন খারাপ লাগছে।' দেখলাম, এবার তেমন সরল ভাবে বললে না যে, দিদির কথা ভেবেও। আমার কথা ভেবেও।' শুধু আমি নই, উত্তরা তুমিও এখন বড় হয়েছ বুঝলাম।

ফিরে এলে ছোট মামীমা বললেন, 'ওমা, তোরা যেন আজ বড় শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরে এলি?' আমি ভাবলাম, এবার তুমি বলে দেবে কি কাণ্ড হচ্ছিল। তুমি কিন্তু তা বললে না। ছোট মামীমা বললেন, 'অমল আমাদের কেমন সাঁতার শিখেছেরে উত্‌রি?' তুমি শুধু বললে, ' সে কথা তোমার অমলকেই জিজ্ঞাসা করো না।' আমি মনে মনে কৃতজ্ঞতাবোধ করলাম কথাটা বললে না বলে।

পরের দিন আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আমাকে দীঘিতে স্নান করতে যেতে ডাকবে না। আমি জানি যাবোই আমি স্নান করতে। তবু দেখছিলাম তুমি ডাকো কি ডাকো না। তুমি এলে। কালকের মতোই তোমার স্নানের সাজ। তেমনি মস্ত আঁট খোঁপার চার পাশে রূপোর বেল ফুল গোঁজা। একটা গাঢ় নীল শাড়ি গোড়ালি থেকে অনেক উঁচুতে পরা। আঁচলটা শক্ত করে কোমরে জড়ানো। গলা খালি। হাতে চুনির বালা। গলায় চুনির ফুল। কোমরে হাত দিয়ে বেশ ভঙ্গী করে বললে, 'কি যাবে তো স্নান করতে?' আমি বিরস গলায় বললাম, 'না যাওয়াই ভালো।' তুমি বললে, 'ধেৎ। শিখতে হবে না। বলেছিলাম তো আমি শিখিয়ে দেবো। ছাই শিখিয়েছে তোমাকে তোমার মাষ্টার। সিমেন্ট বাঁধানো গামলায় কি সাঁতার শেখা হয়।'

তুমি রোজ একটু একটু করে গভীর জলে নিয়ে যেতে। শ্রান্ত হয়ে আসছি দেখলে বুকের তলায় হাত রেখে ভাসিয়ে পাড়ে নিয়ে আসতে। শেখালে বেশী শ্রান্ত হয়ে পড়লে জলের মধ্যে কি করে শরীরটা চিৎ করে দিয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। শেখালে বেশী হাত পা ছুঁড়লে শরীর তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীর শান্ত রেখে শুধু পা দিয়ে জল ঠেলে, হাত সামনে ফেলে কি ভাবে শরীর এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। দেখালে দুপুরের নির্জনতায় মাছেদের নিবিড় ঘুম। সত্যি দেখবার মতো জিনিস এটা! জলের এখানে ওখানে শরীর স্থির করে মাছগুলো ভেসে রয়েছে। পাড়ের কাছে অল্প জলে শরীর ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে বেলে মাছ। লম্বা লম্বা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে চিংড়ি মাছ। চাঁপার হাত থেকে পলো নিয়ে তুমি নিঃশব্দে মাছের উপর চেপে ধরতে মাছ জেগে উঠে পলোর ভিতর থেকে পালাবার পথ খুঁজতো। তুমি পলোর উপরের গোল পথ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাছ তুলে আনতে। মোটা বেলে মাছ। মস্ত চিংড়ি মাছ। কখনো একটা। কখনো দুটো। জলের নড়াচড়ায় মাছেদের যেত ঘুম ভেঙ্গে। পালিয়ে যেত এখান থেকে। তুমি তখন দীঘির অন্য পাড়ে চলতে। তুমি আমার হাতেও পলো দিতে। কিন্তু আমার পলো মাছেদের উপর গিয়ে পড়ার আগেই তারা জেগে যেত। আমি যখন পলো চেপে তাকাতাম, দেখতাম একটা মাছও চাপা পড়েনি। তুমি হেসে কুটিকুটি হতে। 'তোমার পলো যেটুকু শব্দ করেছে, তাতেই মাছরা পালিয়ে গেছে। ওদের ঘুম খুব সজাগ— ও রকম করে পড়ে থাকলে কি হবে।'

তোমার হাত থেকে বঁড়শি নিয়ে মাছ তুলেছি টেনে। সে কি থ্রিল! মাছ ধরার নেশা যে কি তখন বুঝলাম। নৌকো বাওয়াতে হাত খড়ি দিলে। দু হাতে কষে বৈঠা ধরে নৌকোর দুদিকের জল ঠেলে ঠেলে নৌকো চালাতাম। কখনো কখনো অনভ্যাসের জন্য বৈঠাটা পড়ে যেত হাত থেকে। তুমি আবার হেসে কুটি কুটি হতে। একদিন নদীর ঘাটে বসে বললাম, 'তোমার বিদ্যেগুলি তো আমি ভালো ছাত্রের মতো শিখছি। আমার বিদ্যে তুমি একটু শেখ?'

তুমি বললে, 'পড়তে আমার ভালোই লাগে না।'

'লাগাতে হবে। নইলে আধুনিক যুগের সঙ্গে চলবে কি করে? হেরে যাবে যে?'

'দিদি কোথায় হেরেছেন শুনি?'

'ছোট মামীমা খুব পড়েন।'

'দিদির মতো আমিও বুঝি পড়ি না? দিদি কত বই নিয়ে আসেন আমার জন্য। ঐ ইংরেজী শেখা—আমার একদম হবে না।'

'কিন্তু ইংরেজী না শিখলে কিছু হবে না। সেই মুর্খই থেকে যাবে।'

'হ্যাঁ, হাঁ। যাও যাও।' তুমি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছ। কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছ না। তারপর বললে, মধুসূদনের কবিতা আছে কেন তবে,

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে—
'ওরে বাছা মাতৃ -কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরে ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে—
পাইলাম কালে মাতৃ-ভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণি জলে—'

কেন লিখেছেন তবে এ কথা শুনি? বাংলাভাষা ছেড়েছিলেন বলেই তো নিজেকে অজ্ঞান বলছেন— কি তাই না।'

আমি জবাব দিতে পারলাম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে গর্ব বেড়ে গেল তোমার। বললে, 'তবে কেন লিখেছেন।'

'শৈশবে অবোধ আমি, ডাকিলা যৌবনে,
যদিও অধম পুত্র, মা কি ভোলে তারে?
এই বর, হে বরদে মাগি শেষ বার
জ্যোতির্ময় করো বঙ্গ—'

'নিজেকে অধম পুত্র বলছেন ওতো বাংলা ভাষা ছেড়েছিলেন বলেই?'

'বললাম, তোমার স্মরণ শক্তি তো বেশ ভালো?'

খুশি হলে তুমি। বললে, 'আমাকে বই পাঠাবে!'

'পাঠাবো। কিন্তু চিঠি দিতে হবে তোমাকে। ওবার দেওনি।'

তুমি বললে, 'আমার হাতের লেখা ভীষণ ভীষণ ভীষণ খারাপ যে। তাইতো দেইনি।'

'চিঠি জিনিষটা কি হাতের লেখার পরীক্ষার খাতা নাকি? এবার তুমি আগে দেবে— আগের বার চিঠি না দেওয়ায়—এই শাস্তি রইল।'

তোমার পরণে ছিল কমলা রঙের শাড়ি। জরির পাড়। ছিল সেই রং -এরই ব্লাউজ। পিঠের উপর পড়েছিল মোটা বেণীটা। হাতে ছিল আজ পোখরাজের বালা। কানে ছিল পোখরাজের ফুল। গলায় ছিল পোখরাজের মালা। নদীর ওপারের আকাশে মস্ত থালার মতো লাল টকটকে আগুনের গোলার মতো সূর্য। নদীর জলে শরীর ছুঁয়ে আছে। এক্ষুনি টুপ করে ডুব দেবে। আমাদের গায়ে তারই লাল আলো। তোমার গয়নার পদ্মারাগমণিগুলোকে ছোট ছোট সাদা বনফুলের মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি ফুলের গয়না পরে বসে রয়েছ।

বললাম, 'তোমার আজকের সাজের সঙ্গে বেণীবাঁধা চুল একেবারেই মানাচ্ছে না। এলোচুল পিঠছড়িয়ে পড়ে থাকবে। বাতাসে উড়বে দুলবে। তবে তো মানাবে। খুলে দি?

'আমাকে তবে ভূতে ধরুক। ঘাড় মটকে নিক? এই ভর সন্ধ্যাবেলা নদীর পাড়ে চুল খোলে কেউ? এলোচুল ভূতেদের খুব পছন্দ জানোনা।'

আমি বললাম, 'এলোচুল আমারও পছন্দ।'

'তুমিও ভূত তো?'

'তবে চুল খুলে দিচ্ছি কিন্তু?' বলে আমি ভাবছি—হঠাৎ তুমি পা ফস্‌কে নদীর জলে পড়ে গেলে। পড়েই চেঁচিয়ে উঠলে, 'কি স্রোতের টান অমল! আমাকে টেনে নিচ্ছে অ-ম-ল।'

আমি ধুতিটা মালকোঁচা মেরে লাফিয়ে পড়লাম জলে। আমি তোমাকে ধরতে চাচ্ছি। কিন্তু পারছিনা। আমি যতটুকু এগোই, স্রোত তোমাকে ততটাই টেনে নেয়। ধরি ধরি করেও ধরে উঠতে পারিনে। আকুল ভাবে চারদিকে একবার তাকালাম। তোমাদের বাড়ির ঘাট। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কেউ নেই এখানে। দূরে দু তিনটে নৌকো যাচ্ছে। কিন্তু তারা ডাকলেও শুনবে না। সূর্য আরো শরীর ডুবিয়ে দিয়েছে। তুমি আবার ডাকলে, 'আমি ভেসে গেলাম। ভীষণ স্রোত। অমল, তুমি আর এসো না। আমিই ভেসে যাচ্ছি। তুমি তো পারবেই না।' আমি প্রাণপণে তোমাকে ধরতে চেষ্টা করছি। হঠাৎ তুমি বলে উঠলে, 'উঃ! অ-ম-ল আমার পা ধরে কিসে যেন টানছে। এ কুমীর—এ কুমীর অমল। এ কুমীর।' আমি কি শক্তিতে যে নিজেকে তোমার কাছে নিয়ে গেলাম; তোমার হাত ধরলাম দৃঢ় মুঠিতে, তা আমিও জানি নে। তুমি বললে, 'আমার হাত ধরে তুমি কি করবে অমল? আমার পা কুমীরে টানছে। কুমীরের সঙ্গে তুমি পারবে টেনে?

'এ নদীতে ভীষণ কুমীর। তুমি পালাও অমল—পালাও বলছি আমাকে ছেড়ে দিয়ে।'

হ্যাঁ, আমি জানি এই নদীতে কুমীর আছে। তারা নদীর চড়ায় উঠে রোদ পোহায়। কুমুদ আমাকে দেখাবে বলেছিল। আমার বুকে নিঃশ্বাস বইছিল কিনা আমি জানি না। আমার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। তোমার হাত ছুটে গেল আমার হাত থেকে। তুমি আরো একটান দূরে চলে গেলে। আবার মুহূর্তের অবসন্নতা এক ঝট্‌কায় কাটিয়ে উঠে আবার গিয়ে তোমার হাত ধরলাম। তুমি কাতর কণ্ঠে বললে, কুমীরের সঙ্গে পারবে না অমল।' আমি বললাম, 'তোমার কুমীরকে সুদ্ধু টেনে পাড়ে তুলব আমি।'

'ভালো পাশ করেছো। এবার হাতটা ছাড়ো। ভীষণ লাগছে।' কোথায় তোমার আকুল স্বর? কোথায় তোমার আর্তডাক—অমল...অমল...।

আমার হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেল।

এবার তুমিই আমার হাত ধরলে। আমাকে টেনে নিয়ে পাড়ে এলে। সিঁড়িতে উঠে বসে হেসে বললে, 'পরীক্ষা নিলাম।'

বললাম, 'পরীক্ষাটা কিছু শক্ত হয়ে গেল না?'

তুমি বললে, 'সহজ পরীক্ষা আবার পরীক্ষা নাকি?'

ফেলও করতে পারতাম। ভীষণ ফেল। আমিই স্রোতের টানে ভেসে যেতে পারতাম।'

'আমি দিতাম না ভেসে যেতে। নিজের উপর সে বিশ্বাস না থাকলে কি এ খেলা খেলতাম।'

'এই ভিজে জামা কাপড়ে দুজনে উঠবে কি করে গিয়ে বাড়ি? কি বলবে?'

'বলবো, অমল নদীতে পড়ে গিয়েছিল।'

'সে দিন বললে না যখন পুকুরে ডুবছিলাম। আর আজ উল্টো কথা বলবে?'

'এরকম উল্টে পাল্টে বলতে হয়।'

'ওঁরা কখনো বিশ্বাস করবেন না একথা।'

'কেন বিশ্বাস করবেন না একথা? আমি পড়ে গেলাম না?'

'সে তো ইচ্ছে করে।'

'যেটা ইচ্ছে করে করা যায় তা ঘটেও যেতে পারে।'

হঠাৎ অকারণ পুলকের মতো একটা আনন্দের ঢেউ উঠল মনে। বললাম, 'এসো তবে আবার সাঁতার দি?'

'আমার হাত ধরে সাঁতরাতে হবে কিন্তু?'

'সে তো আরো রমণীয়।'

দুজনে আবার ঝাঁপ দিলাম নদীতে।

উত্তরা সে দিনগুলি আবার ফিরে পেতে পারি বিজ্ঞান কি তা করে দিতে পারে? যদি পারে তবে চাঁদে যেতে চাই না।

এ যাত্রায় তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়ে ফিরলো আঠারো বছরের অমল। আর সেই টানে আরো দু দু বার ছোট মামীমার আঁচল ধরে গিয়ে তোমার সঙ্গে জল মাছ নদী নিয়ে খেলা করে এলো। এখন সে পঞ্চবার্ষিকের ছাত্র। উত্তরা নামের মেয়েটিকে সে 'দূরের মেয়ে' সম্বোধনে চিঠি লেখে। তার লেখা এখন কলেজ ম্যাগাজিনের বাইরেও বড় কাগজে ছাপা হচ্ছে। লেখা বের হওয়া মাত্র 'দূরের মেয়েকে' তার একটি কপি পাঠাতেই হয়। চিঠি

লেখাটা তাদের অব্যাহত গতিতে চলছে। সে লেখে, 'মাছ ধরার পরিকল্পনা কি তোমার এখনও আছে?' উত্তর আসে, 'আছে।' প্রশ্ন যায়, 'রমা কালী প্রফুল্ল বৃন্দরাই সঙ্গী; না সে ইচ্ছার পরিবর্তন হয়েছে?' জবাব আসে, 'সে ইচ্ছার বদল হয়েছে। পাঁচ জনের জায়গায় একজন হয়েছে।' সে জানতে চায়, 'সে কে?' উত্তর আসে, 'কে জানিনে। শুধু জানি তুমি নও। তোমার বৌ হিংসে করবে।' উত্তর যায়, 'সে তো চিঠি লিখতে দেখলেও করবে। আর শুধু আমার বৌ-এরই কি হিংসে হবে? তোমার স্বামীরও হবে।' চিঠি এলো, 'জানো অমল, সবাই আমাকে এখন কেবল জিজ্ঞাসা করছে অমল কই? দীঘির জল রোদের ঝিলিক মেরে শুধোয়, 'অমল কই।' পদ্মফুলের মুখ মলিন। বলে, 'অমল আসছে না কেন?' মাছেরা জলের উপর চোখ জাগিয়ে দেখে তুমি এসেছ কিনা। আর নদী? ঘাটের কাছে এসে কেবল পাক খায়। যেন তোমাকে একবার না দেখে স্রোতের টানে পড়তে চায় না।' চিঠি গেল, 'তুমি যে বড্ড দূরের মেয়ে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াই 'পেল্লাই' কাণ্ড একটা। ট্যাক্সি— রেল—কুলি—স্টীমার—স্টেশন—নৌকো—তারপর একটি মুখের আশা। তুমি আসবে বলেছিলে। একবার চলে এসো না? হেঁটে চলে যাই। গড়ের মাঠে গিয়ে বসি? সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কটাকেও পাকা করে নেই।' উত্তর এলো, 'দূর বলছি তোমাকে বিয়ে করব না। তবু বাজে কথা। সম্পর্ক পাকা করতে নয়, কলকাতা আসছি কলকাতাকে দেখতে। আর.... তোমাকে দেখতে।' ছেলেটি গেয়ে উঠলো, 'এবার, সখী সোনার মেয়ে দেয় বুঝি দেয় ধরা—'

আমাদের চিঠির খেলা বেশ চলছিল। সব থেমে গেল হঠাৎ! সব বেশ লাগা থামিয়ে দিলেন ছোট মামীমা। শরীর তার ভালো যাচ্ছিল না—এটাই জানতাম। মৃত্যু সামনে এটা জানতাম না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে গেল। ছোট মামার শোক দুঃখের খবর জানিনে। জানবার ইচ্ছেও আমার হয় নি। আমার নিজের তখন সব অর্থহীন মনে হচ্ছিল। আমার কিশোর বয়সের সব আকর্ষণ গচ্ছিত ছিল ছোট মামীমার কাছে। কেবল ছুটে ছুটে তাঁর কাছে যেতাম তাঁর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে, আজ পদ্মাপাড় হয়ে তোমার কাছে ছুটি সেই এক আকর্ষণে। তখন যেমন বাড়িতে মা বাবা বা অন্য কেউ আমায় আকর্ষণ করতে পারেন নি, এখন তেমনি অন্য মেয়েরা আকর্ষণ করতে পারে না। এখন যেমন তোমার কাছে তখন ছিল ছোটমামীর কাছেই আমার সব ভালো লাগা। জীবনের একটা দিক অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হতে লাগলো, এবার তুমিও সরে যাবে—অনেক দূরে। তোমার চিঠিবন্ধ। তোমার খবর কিছু জানিনা এ দু মাস ধরে। তোমার দিকটাও এখন অন্ধকার। ছোট মামী আমাদের সম্বন্ধে একদিন বলেছিলেন, 'আমি বলি অমল এখানে থামো তোমরা।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন বলছো এ কথা'? তিনি বললেন, 'আমার ছেলেমেয়ে হয় নি। তোমার মায়ের একমাত্র ছেলে। আমার বোনকে তিনি বৌ করতে চাইবে না। বিরোধ বাধবেই।

'বিয়ে মানুষের নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা তুমি অন্ততঃ মানো নিশ্চয়ই।'

ছোট মামীমা খুব ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, 'না অমল, বিয়েকে আমি একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মানিনে। বিয়েকে আমি মানুষের জীবনের সব চাইতে বড় দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যাপার বলে ভাবি অমল। ব্যক্তি এখানে তুচ্ছ। বিয়ের ব্যাপারে সমাজ বড়। দেশ বড়। তোমাদের সন্তান-সন্ততিরাই হবে ভবিষ্যৎ দেশ! ভবিষ্যৎ সমাজ। তোমরা ছেলে মেয়েরা যদি ব্যক্তি স্বাধীনতার দাপটে ইচ্ছে খুশি মতো যার ইচ্ছে চীনে, যার ইচ্ছে জাপানে, যার ইচ্ছে রাশিয়ায় আমেরিকায় বিয়ে করো তবে সমাজ বা দেশের চেহারা কি দাঁড়াবে তুমিই বলো অমল?'

আমি চুপ করে রইলাম।

ছোট মামীমা বললেন, 'এ বয়সে একজনের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলেই তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়। সেই ইচ্ছের জন্য ঘর সমাজ দেশ সব আঁস্তাকুড়ে টেনে ফেলে দিতে পারবে—ব্যক্তির এতো স্বাধীনতা থাকতে পারে না। দেশ সমাজ ছাড়িয়ে সে বড় হয়ে উঠতে পারে না অমল। তুমি যদি বলো, পারে। সে নিজে বড় হতে পারে। তবে আমি বলবো, কার জন্য বড় হবে? ঘর গেল, সমাজ গেল, দেশ গেল—তবে রইল কি? কার জন্য মেহনত করে বড় হবে? কার কাজে লাগবে সেই ফল?'

আমি বললাম, 'উত্তরা তো ছোট মামীমা চীন জাপান রাশিয়া বা আমেরিকার মেয়ে নয়।'

'না তা নয়। এখানে দেশ বা সমাজ আসছে না। কিন্তু ঘরকেই বা তুমি দুঃখ দেবে কেন অমল বলো? তারা তো তোমাকে কখনো এতটুকু দুঃখ পেতে দেন না?'

ছোট মামীমার বোধহয় আরো ক্লান্তি লাগছিল। একটু সময় নীরব থেকে বললেন, 'আরো সমস্যা রয়েছে অমল। উত্তরাও কলকাতার জল হাওয়ায় সুখ পাবে না। সব দিক দিয়েই সুখের নিশ্চয়তা যেখানে কম সেখানে থেমে যাওয়াই ভালো।'

এবার আমি বললাম, সুখের নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে, ছোট মামীমা? সুখ কোথায় এ কি কেউ আগে বলতে পারে?'

ছোট মামীমা শ্রান্ত গলায় বললেন, 'না তা পারে না।'

'তবে?'

'তবে হলো এই অমল, আমরা কি মরা বাঁচার কথাই নিশ্চয় করে বলতে পারি? তবু বাঁচার চেষ্টা করি বিপদকে দূরে রেখে। ফুটপাথে উঠেও তো বাস মানুষ চাপা দেয়। তবু আমরা ফুটপাথ দিয়েই চলি কারণ কিছুটা বেশী নিশ্চয়তা আছে জীবনের। বিয়ের ব্যাপারের নির্বাচনের পেছনে ঐ জাতীয় মনোভাব টুকুই থাকে মাত্র।'

'আমাদের সম্বন্ধে দুঃখের ভয় করছ কেন? আমি ছোট মামা নই নিশ্চয়ই?'

'না অমল, আমি তোকে চিনি। জীবনে বড় হয়ে দাঁড়াতে পারবি কি না জানি না। কিন্তু মানুষটা তুই বড়। আর সেটাই আমার কাছে বড়ই বড় কথা রে অমল। আমি তোর লেখার একটা মন দেখতে পাই।'

'লেখা দিয়ে লেখক চেনা যায় না।'

'আমি অমলকেও চিনি তো। কিন্তু আমি বড় ছোটর কথা বলছিনে। জল-মাটির টান বড় সাংঘাতিক টান। যে জল-মাটিতে জন্মায়, যে জল-মাটিতে সে বড় হয় সেই জল-মাটি মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে। পরিবেশ, পরিজন, অভ্যস্ত আচার আচরণ—'

'সব সব কিছু টান সাংঘাতিক। তা জিবের স্বাদ সোওয়াদের কথাটাই বা বাদ দিচ্ছ কেন।? তার টানই কি কম সাংঘাতিক নাকি?'

ছোট মামীমা হেসে ফেললেন।

এই হাসি আর দেখবো না। যেমন শ্রান্ত, তেমনি বিষণ্ণ। তেমনি সুন্দর। ষ্টীমারের রেলিং ধরে নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন ছোট মামীমা। গুণগুণ করে গাইছেন, 'বসে আছি হে— কবে শুনিব তব বাণী।' কত সময় ছবিটা চোখে নিয়ে বসে থাকি। ভাবি, ছোট মামীমা কি তার সেই আকাঙ্খিত বাণী এখন শুনতে পাচ্ছেন? যদি পান তবে এই ভালো।

হাত অবশ করে বসেছিলাম।

তোমার কাছে চিঠি লিখবার জন্য কলম হাতে নিতে পারছিলাম না। ছোট মামার অপরাধের দায় আমার কাঁধেও যেন এসে পড়েছিল। তুমি ছোট মামাকে ভালোবাসতে না তোমার দিদির প্রতি তাঁর ব্যবহারে উদাসীনতা ছিল বলে। কলকাতার মানুষ বলতে তুমি এক জামাইবাবুকেই ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতে। তার ত্রুটি বিচ্যুতি তুমি আমার উপরও আরোপ করে বলতে, 'কলকাতার মানুষই ঐ রকম হয়।' যদিও এ কথা গুলোকেই বড় করে দেখছিলাম, তা অবশ্য নয়। তবু ছোট মামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন ছোট হয়ে গিয়েছি—এই রকম লাগতো আমার। তাতে তোমার চিঠি বন্ধ। তুমি বন্ধ দরজা না খুললে আমার দরজা ধাক্কা দিতে হাত উঠছিল না। তাই হাত অবশ করে বসেছিলাম; প্রতিদিন বার কয় করে চিঠির বাক্স হাতড়াতাম। পেতাম না। এসে বসে ভাবতাম, 'কি করা যায়!'

ছোট মামীর মৃত্যুর পর বছরও ঘুরতে পারলো না। ছোট মামা বিয়ে করলেন। আর আমিও যেন হঠাৎ মুক্তি পেয়ে গেলাম। ছোটমামার দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে তোমাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করতো। কিন্তু এবার আমি তা করতে পারবো। 'পুরী যাচ্ছি' বলে পূর্ব বাংলায় চলে এলাম; এলাম তোমার কাছে।

তোমার মা বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলাম না। ছোটমামীমা তাঁদের মেরে রেখে গেছেন। মুখের দিকে তাকাবার উপায় নেই। ভেলভেটের আসনে বসে সেই রূপোর থালা বাটিতে সাজানো বারো ব্যঞ্জনের সামনে খেতে বসলাম। তোমার মা বললেন, 'খাও বাবা। একটা দীর্ঘশ্বাস তিনি চেপে গেলেন। তোমার বাবা কখনো আমার খাওয়ার কাছে এসে বসেন নি। দেখলাম তিনিও এসে বসলেন। হয়তো আমার মনে কোথাও সমাদরের অভাব যেন না বাজে, সেই জন্য। রাশভারী কণ্ঠে কলকাতার খবর, আমি এম. এ. পাশ করে কি করবো, প্রফেসারি না অন্য কোন লাইনে যাবার ইচ্ছে—এমনি টুকিটাকি কথা।

তুমিও সহজ ভাবে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলে। চাঁপা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলে। কেন তা বলতে পারব না। ছিলেন না কেবল একজন। বাইরে তোমরা যে যাই করতে থাকো না কেন, ভেতরে নীরবে চোখের জল ফেলে চলেছিলে।

খেতে বসতে ইচ্ছে ছিল না। তবু বসেছিলাম। গলা দিয়ে যেন নামছিল না। তবু খেলাম।

আমার আসা একেবারে হঠাৎ। ঘর তৈরী ছিল না। স্নান করতে যাবার সময়ও ছিল অগোছালো। খেয়ে এসে দেখি ঘর তৈরী। ধোয়া চাদর ওয়াড় দিয়ে বিছানা করা। জাগে জল। আলনায় তোয়ালে। একটা সিগারেট ধরিয়ে তোমার অপেক্ষা করতে লাগলাম। তুমি যখন এলে দেখলাম তোমার মুখ কান্না মোছা আমার কাছে আসবার আগের এতক্ষণ কেঁদেছ তুমি। আমি জানতাম এবার আমি কান্না সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। গলা পরিষ্কার করে নিতে হবে আমাকেও কথা বলার আগে। গলা খাঁকরি দিয়ে সেটা করতে ইচ্ছে করলো না। জল খেলাম।

তুমি বললে, 'সিগারেট ধরেছ?'

'একটু একটু। তুমি পছন্দ করো?'

তুমি হাসলে।

বললাম, 'বিলেত যাচ্ছি। মদ সিগারেট না খেলে ও দেশের মেয়েরা মুখ ভেংচায়। তাই অভ্যাস করছি।'

'কবে বিলেত যাচ্ছ?'

'সে কথা বলতে পারছিনে। সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

'আমার ওপর।'

'তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। যদি যাও, তবে আর বিলেত যাবো না।' হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে চেয়ারটা টেনে আমি তোমার কাছে আনলাম। বললাম, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি উত্তরা। ভালোবাসার কথা বলতে আমার জিব আটকে যায়। ব্যবহারে কথাগুলো ক্ষয়ে গেছে। কিছু পদার্থ নেই ভেতরে। তবু বলতেই হয় বলে বলেছি, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

তুমি যেন লজ্জা পাচ্ছিলে।

আমি দেখেছি 'বিয়ে কথাটাতে তুমি লজ্জা পাও না। কিন্তু ভালোবাসার কথা বললে সঙ্কোচ বোধ করো। এর অর্থ আমি ধরতে পারি না।

তুমি আমার কথার জবাবে একটু হাসলে।

'আমি কি হাসির কথা বলছি?'

তুমি মাথা নেড়ে বললে, 'না।'

'তবে হাসছ কেন?'

'কাঁদবো না বলে। চলো নদীর সিড়িতে গিয়ে বসি। ঘরে ভাল লাগে না আমার।'

'চলো।'

আমরা এসে নদীর সিড়িতে বসলাম। তুমি আমার হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই দিলে। আমি সেগুলো নিয়ে বললাম, 'আরো! তুমি নিয়ে এসেছ দেখছি! থ্যাঙ্ক ইউ।'

'তুমি বললে, অনেক কিছু নতুন শিখেছ। কেমন যেন অন্য লোক, অন্য লোক মনে হচ্ছে তোমাকে।'

'এবার নিজের লোক এমন ভাবে হয়ে যাবে যে আর কোন দিনও অন্যলোক লাগবে না।

মাসটা ছিল আষাঢ়। একেবারে ভরা বর্ষা। এর আগে আর এমন ভরা বর্ষা দেখিনি। আকাশে মেঘ ছিল। কিছু আগে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি ভিজে। মসলিনের ওড়নার মতো হালকা বৃষ্টির ওড়না মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। বৃষ্টি নয়। যেন ঠাণ্ডা হাওয়া। তোমার কত শাড়ির রঙ আমার মনে আছে। মনে আছে গয়নার পাথর। সেদিন কি শাড়ি পরেছিলে মনে করতে পারছি না। মনে হচ্ছে নীলাম্বরী? হাতে ছিল সেই আগের পোখরাজের বালা কি? আমার মন চঞ্চল ছিল। নানা এলোমেলো হাওয়া বইছিল সেখানে নানা ভাবের। যে মাছ সব সময় পাখনা নেড়ে সাঁতারের উপর থাকে— তার স্থিরভাব তোমাকে মুগ্ধ করে। তোমার শান্তভাবও আমাকে তেমনি মুগ্ধ করেছিল। আবার এই শান্তভাব যে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া—তাও বুঝছিলাম।

তুমি বললে, 'এ বৃষ্টিকে কি বলে জানো? বলে 'ইল্‌শেগুড়ি' বৃষ্টি। এ বৃষ্টিতে গভীর জল থেকে উপর উঠে আসে ইলিশ মাছ। জেলেরা প্রাণের আনন্দে তখন তাদের ধরে।

আমি সিগারেট ধরালাম। একটান ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, 'তোমার মাকে বলবো ব্যবস্থা করতে?

'কিসের?'

'তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাবার?'

'ব্যবস্থাটা কি?'

'বিয়ে। 'যা হোক করে কোনমতে দু হাত এক করে দেওয়া'— যাকে বলে সেই রকম কিছু।'

তুমি বললে, 'ও বার যেভাবে নদীতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম, সেভাবে আবার পড়ে যাবো কিন্তু।'

'এক প্রশ্নপত্র দুবার চলে না।'

'খেলা তো চলে?'

'তা চলে। ঝাঁপ দাও তবে। আমিও দিচ্ছি।'

'তোমার কি কি লেখা বেরুলো তাই বলো?'

'কিচ্ছু না। তুমি আমার কথার উত্তর না দিলে আমি চলে যাবো।'

এবার তুমি জবাব দিলে। বললে, 'অমল আমি কলকাতা যেতে পারব না। এ ছাড়া আর যা বলবে তাই শুনব।'

'বেশ আমি কলকাতার বাইরে প্রফেসরি নেবো।'

'সে তো এক কথাই হলো।'

'তুমি এখানে বসে বসে আমার কথা শুনবে?'

'মা বাবাকে ছেড়ে এখন আমি যেতে পারি? তুমিই বলো।'

'উত্তরা— তোমার আসল কথা এটা নয়। আসলে তুমি বিয়ে করবে না। আগেও সব সময় এটা বলতে। আমি ভেবেছি ঠাট্টা।' তারপর ক্ষুব্ধ বিদ্রূপের সঙ্গে বললাম, 'উত্তরা, তুমি ঘরে থাকতে পারো না। জমিদারের মেয়ে হয়েও নিতান্ত গ্রাম্য মেয়ের মতো মাঠে ঘাটে জলে পড়ে থেকেছো। কিন্তু তোমার বাইরেটা ঐ ঘরের চৌকাঠের মধ্যেই রয়ে গেল। তার বাইরে পা বাড়াতে পারলে না। মায়ের আঁচল ধরে থাকোনি। কিন্তু মাটির আঁচল ছাড়তে পারলে না।'

তখন কত রাত বলতে পারব না। আকাশে আষাঢ়ের মেঘ ছিল। আবার চাঁদও ছিল। একবার মেঘ চাঁদকে ঢেকে ফেলছিল। জ্যোৎস্না মলিন হয়ে যাচ্ছিল। আবার মেঘ ঠেলে চাঁদ বেরিয়ে আসছিল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে এই খেলা দেখছিলাম। বা কিছুই দেখছিলাম না, শুধু তাকিয়ে ছিলাম। তুমি ঘরে এলে। নীরবে মোড়া টেনে আমার খাটের পাশে বসলে। যা কোনও দিনও করো নি, যা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল, তুমি তাই করলে। আমার কপালের উপর চিবুক রাখলে। নিজেকে দমিত করে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আমার কপাল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তুমি কাঁদছো। তোমার চোখের জল আমার কপালের উপর টপ্ টপ্ করে পড়ছে। কপাল বেয়ে নেমে নাকের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। বুঝলাম, তোমার এ আসা সমর্পণ নয় বিদায় নিচ্ছ তুমি। তোমার মাথা দু হাতে চেপে ধরে বললাম, 'চলো উত্তরা, আমরা পালিয়ে যাই। ছোট মামী আমাকে ভালোবাসতেন। তোমার মা বাবা আমাকে স্নেহ করেন— তারা খুশি হবেন দেখো।'

'তবে কার কাছ থেকে পালাবে?'

তাও তো বটে। বোধহয় সমস্যাগুলি থেকে পালাতে চাইছিলাম। যদিও ঘরে ঘড়ি ছিল। স্তব্ধ রাতের নিঃশব্দতার মধ্যে তার শব্দ টিক্‌টিক্ করছিল আওয়াজ নিয়ে। কিন্তু তাঁর দিকে তাকাবার কথা মনে ছিল না। বললাম, 'তোমার বাধা কোথায় বলতে পারো?' তুমি আমার কপালে চাপা চিবুকেই জবাব দিলে, 'বাধা?' ক'টা বলবো অমল? বাবা মা দিদি তোমার মা জল মাটি বাতাস সব। দিদির ছেলেমেয়ে হয়নি। আমার দুই পিসিমারও হয়নি। মা বলেন, এটা পারিবারিকও হতে পারে। যদি আমারও ছেলেমেয়ে না হয়, তবে পীড়ন আসবে আমার উপর। দিদির উপর গাল আসবে, তোমাকে ধরে এনে ফাঁদে ফেলেছেন। মা আরো বলেন। বলেন, 'অমল একমাত্র ছেলে। তার ঘরে ছেলে মেয়ে না হলে ওদের বংশের নাম থাকবে না। ওর মা রাজী হবেনই বা কেন।' তুমি আস্তে আস্তে কথাগুলি বললে। আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ তুলে উপর থেকে।

আমি তেমনি ভাবে শুয়ে তোমাকে দেখতে লাগলাম। চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে তোমাকে ছবির মতো লাগছিল। মনে মনে ভাবছিলাম, 'হায় ছেলে মেয়ে। এই তো আমি মা'র ছেলে। কি পাচ্ছেন আমার কাছ থেকে তিনি? কি দেবো ভবিষ্যতে তাকে আমি? এই মুহূর্তে উত্তরাকে বিয়ে করে সুখে ঘর বাঁধতে পারি মাকে ত্যাগ করে। চোখের উপর দেখেও ছেলে-মেয়ে চাই; চাই-ই! মানুষের প্রবল প্রবৃত্তিগুলি সব পাগলের খেলা।

হঠাৎ তোমার শান্ত ভাবটা যেন চলে গেল। অশান্ত ভাবে বলতে লাগলে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি অমল। একদিন অন্যকে বিয়ে করবো। হয়তো তাকে ভালোও বাসব। কিন্তু আজ তোমার কাছ থেকে নিজেকে

সরিয়ে নিতে আমার মৃত্যু মনে হচ্ছে—এ কথা বিশ্বাস করে যাও।' বলতে বলতে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, 'এখন পর্যন্ত তুমি ছাড়া আমার সব অন্ধকার। দিদির জামাইবাবুর কাছে যাওয়া ছিল মিথ্যা যাওয়া। তোমার কাছে আমার এই সমর্পণ সত্য। ভীষণ সত্য অমল...ভীষণ সত্য। এতো সত্য বলেই আসতে পেরেছি। নইলে পারতাম না— কক্‌খনোই পারতাম না।'

আমিও উদ্‌ভ্রান্তের মত তোমার গলার তলায় মুখ ঢুকিয়ে বলতে লাগলাম 'কেন এলে। কেন এলে আবার। আমি তো তোমার কাছ থেকে চলেই এসেছিলাম।'

ফিরে এসে ছাত্র পড়ানো আর লেখায় মন দিলাম। তখন রাজনৈতিক পরিবর্তন তরতর করে এগিয়ে চলেছে উত্তেজনার ভেতর দিয়ে। আমরা স্বাধীন হলাম। বাংলা ভাগ হয়ে গেল। আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম আমি। এবার কলকাতায় তোমাদের আসতেই হবে। আমি তোমাকে কলকাতা আনতে পারিনি। রাজনীতি তোমাকে এনে দিল। নমস্কার ঠুকলাম একটা রাজনীতিকে। তোমাকে সেই কথাই লিখলাম। তুমি লিখলে, 'রাজনীতিকে তুমি নমস্কার ঠুকতে পারো কিন্তু আমি পারছিনে। মানুষের মুখ তো দেখছ না। দেখলে বুঝতে অসহায় মুখের চেহারা কি। তারা বুঝছে না কোথায় যাবে ভিটেমাটি ছেড়ে। তুমি জানতে চেয়েছ দীঘি মাছ নদী তোমার কথা আর জিজ্ঞাসা করে কিনা। তারা কার কথা আজ জিজ্ঞেস করবে বলো? তারা নীরবে তাকিয়ে থেকে কেবল এই দৃশ্যই তো দেখছে, আকাশ মাটি জল নমস্কার করে ছেলেমেয়ের হাত ধরে সবাই চলে যাচ্ছে। বাবাকে দেখলে এখন আর চিনতে পারবে না। বসে বসে কখনো বা পায়চারি করতে করতে কেবল চিন্তা করেন। তুমি জানতে চেয়েছ আমরা কবে আসছি। আসছি কিনা তাইতো জানি না। জানেন বাবা।' আমি রাগ করে লিখলাম, 'রোজ দাঙ্গা লেগে আছে। এর মধ্যে থাকবে? সাহসটা কি বেশি হয়ে যাবে না?' তুমি লিখলে, আসা না আসার ব্যাপারে আমার মতামত মূল্যহীন। ওটা নির্ভর করছে বাবার উপর। তিনি ভাবছেন, দেখতেই পাচ্ছি। কি ভাবছেন, দেখতেই পাচ্ছি। কি ভাবছেন জানতে চাই নি। স্থির করতে পারলে নিজেই তিনি বলবেন। আর থাকার সাহসের কথা বলছ? আমাদের লাঠিয়ালরা করিম, জলিল, আজাদ, শামসুদ্দিন ইত্যাদি নামের। এতদিন তাদের লাঠিই আমাদের মাথা রক্ষা করেছে। আজ সেই লাঠিগুলিকে রাজনীতি আমাদের মাথার দিকেই ঘুরিয়ে দিয়েছে। যারা এই কাজ করেছে, তাদের কাছেই বা কোন ভরসায় আশ্রয় নিতে যাবো?'

তোমরা এলে না।

উত্তরা, সত্যি করে বলো, এতক্ষণ বর্তমানকে একেবারেই ভুলে ছিলে কিনা? ছিলে? আমার চলা সার্থক।

আমাদের পথ শেষ হয়ে এলো। যত ঢিলে পায়েই হাঁটা যাক, পথ এক সময় ফুরিয়ে যাবেই। একবার তোমার বিয়ের রাতটার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো— আমাদের অতীত পরিক্রমাও শেষ হয়ে যাবে। বিয়ের রাতের পনেরো বছর হলো, আমি তোমার সংবাদ কিছুই জানি না।

একদিন এলো তোমার বিয়ের চিঠি।

চিঠির এক কোণে লেখা ছিল, 'এসো।' অনেক ভাবলাম। বিয়ের চিঠিটা নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করলাম। তোমার 'এসো' ডাকের পর না গিয়ে পারলাম না। তুমি বললে, 'স্বার্থপরের মতো কাজ হলো জানি। তবু করলাম।' আমি হেসে বললাম, 'বেশ করেছ।' তুমি বললে, 'আমি আসতে না লিখলেও আসতে?' বললাম, 'বোধহয় না।' তোমার মুখটা একটু যেন ম্লান হয়ে গেল।

আত্মীয় কুটুম অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে। জমিদার বাড়ির মতো জনসমাগম নেই। তবু অনেক লোক। অনেক আলো। অনেক বাজনা। অনেক আয়োজন। ছেলে ডাক্তার। বিলেত থেকে পাশ করে এসেছে। আমার ঘরটাই আমাকে দেওয়া হয়েছিল। কুমুদ তেমনি সব গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল। লোকজন আত্মীয় ভরা বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা একা ঘরে বসে নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা বেচারা গোছের লাগছিল। মেয়েলী একটা অর্থহীন আব্দার রাখার জন্য নিজের এই ফালতু উপস্থিতি আমাকে লজ্জা দিচ্ছিল। বিশ্রী লাগছিল আমার। খুব বাজনা বাজছে। কাল বিয়ে কিন্তু বর আজই এসে গেছে। নদী পথ তাই আগেই আসা ভালো। আমি বর দেখে এসেছি। বেশ উজ্জ্বল চেহারা। বরযাত্রীদের চা জলখাবার দেওয়া হচ্ছে। কোমরে গামছা জড়িয়ে পরিবেশকরা যাতায়াত করছে। গ্যাসের আলো জ্বলছে কিছু দূরে দূরে। আলোর মাথা ঘিরে পতঙ্গ ঘুরছে। আমি চুপচাপ চলে এসেছিলাম।

বসেছিলাম ঘরে। ভাবিনি তুমি আসবে এত আত্মীয়ভরা বাড়িতে। কিন্তু তুমি এলে। আমি তোমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কাঁচা হলুদ বাটা দিয়ে স্নান করেছ। সমস্ত গায়ে হলুদের আভা। সাদা তাঁতের লালপাড় শাড়ি পরণে। মাথা ঘষা একরাশ এলোমেলো আধ ভেজা চুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠে। গলায় চিকচিক করছে এক ছড়া সরু হার। হাতে দু গাছা তেমনি সরু চুড়ি। চুড়ির কাছে লাল মোটা সূতোর গুচ্ছ বাঁধা। তোমায় দেখে অসহ্য ব্যথায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। কোনমতে গলার স্বর বের করে বললাম, 'এই সন্ধ্যায় স্নান করেছ?'

আমি চেয়ারে বসেছিলাম? তুমি মোড়া টেনে আমার গা ঘেঁষে বসলে। আমার কোলের উপর হাত রাখলে। আমি তোমার হাত দুটো মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললাম, 'আজকের এই স্নান এই লালপড়া শাড়ী পরা লক্ষ্মীর মতো সাজ আমার জন্য হতে দিলে না উত্তরা! তোমার ইচ্ছে হলেই আজ আমি নিজেকে— সুখী ভাবতে পারতাম।' তুমি বললে, 'আর একজন কেউ তোমার জন্য এই লক্ষ্মীর সাজ সাজবে। তোমাকে সুখী ভাবাবে।' তারপর বললে, 'তোমাকে আসতে লেখা নিতান্তই একটা ইচ্ছা। আর একবার তোমার কাছে বসব মোড়া টেনে। তোমার হাত হাতে নেবো। যা আর কোনদিনও নিতে পারব না।

আশ্চর্য মানুষের মন! যে মন মুহূর্ত আগে বিরক্ত সেই মন তখন এতো সুখী যে বললো, 'আমি কৃতজ্ঞ সেই জন্য।' তারপর বললাম, 'তুমি বাঁধছ নূতন বাসা—আমার 'ভাঙ্গছে ভিত।'

তুমি বললে, 'কখনো না অমল। তোমার ভিত যাতে এতটুকু না নড়ে তাই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। নিজেকে ছিঁড়ে সরিয়ে নিয়ে গেলাম'। তোমার বলিষ্ঠ চলা দেখে আমি বিস্ময় মানলাম। এই এক বাড়ি লোকের মধ্যের তুমি আমাকে বিয়ের আসরে যাবার আগে পর্যন্ত সঙ্গ দিলে। আসরে যাবার আগেও ছাদে এলে। আমি ছাদে ঘুরছিলাম। তুমি জমিদার কন্যা রাণীর বেশে হীরে মুক্তো জড়োয়ায় সেজে, সোনার বেনারসী পরে আমার কাছে এলে। আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, হাতপদ্ম পরা হাত আমার ঠোঁটের উপর রেখে বললে, 'আর ভালোবাসার কথা নয়। আজ থেকে আমি তোমার পর হয়ে গেলাম।' দু হাতে মুখ ঢেকে তুমি কেঁদে ফেললে। আমি তোমার কান্না দেখতে লাগলাম।

বর্ষার নদী বেয়ে কোন নৌকোর মাঝি দোতারা বাজিয়ে ভাটিয়ালী গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

আমাদের এই ছাদের দৃশ্য নিয়েই প্রেমের গল্প লিখতে বসেছিলাম আজ পনেরো বছর পরে। গল্পের ছক কেটেছিলাম, 'নায়িকা যখন নায়কের ঠোঁটে হাত রেখে বললো, 'চুপ' তখন নায়ক নায়িকার হাত ধরে টেনে ছাদ থেকে নেমে এলো। সমস্ত লোকজন আলো বাজনা সব বাইরের দিকে। পেছন তখন নির্জন জনশূন্য। পেছনের পথ দিয়ে নায়িকাকে টেনে নিয়ে পালিয়ে এলো নায়ক। এসে দাঁড়াল অন্ধকার নদীর ধারে। চেঁচিয়ে ডাকলো ভাটিয়ালি গেয়ে যাওয়া মাঝিকে, ও মাঝি ভাই...

'বাবু'—আমার ঠাণ্ডাঘরের ভারী কাঠের পাল্লা ঠেলে ভোলা মুখ বাড়ালো।

লেখার সময় বিরক্ত করলে আমি চটে যাই। বিশেষ করে এই সকাল বেলা। এটাই আমার লেখার সময়। ঘরের ঠাণ্ডায় মাঘ মাসের শীত এনে গায় শাল জড়িয়ে লিখতে বসেছি— খাতার দিকে চোখ রেখে কলম চালাতেই জবাব দিলাম, 'কি বলছিস!'

'একজন বাবু এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন। বলছেন খুব জরুরি দরকার।'

কলম রেখে উঠতেই হলো। বসবার ঘরে যেতেই একজন অফিসার গোছের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত কণ্ঠে বললেন, 'স্যার, একটি মেয়ে আমাদের শরণার্থী শিবিরে মারা গেছেন। তার কাছে একটি ডাইরি পাওয়া গেছে। আপনার নাম পরিচয় লেখা রয়েছে তাতে। যদি আপনার কেউ হন তবে বডি নিয়ে যাবার আগে আপনাকে জানানো উচিত। আর ডাইরিটাও আপনাকে পৌঁছে দেওয়া উচিত তাই আমি এলাম।'

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কিছুই ধরে উঠতে পারলাম না। অফিস ব্যাগ খুলে একটা ডাইরি বই বের করে আমার হাতে দিলেন অফিসারটি। ডাইরি খুলে লেখা দেখে আমার চল্লিশ বছরের হৃৎপিণ্ডটা যেন বুক থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইলো। ঠিকানা জানো না। তাই আমার অমল চৌধুরীর নামের পাশে ব্রাকেটে 'লেখক' লিখে রেখেছ। যেন খাতাটা আমার হাতে এসে পৌঁছোলেও পৌঁছোতে পারে।

অফিসার ভদ্রলোক বললেন, 'চেনেন আপনি স্যার?'

কম্পিত কণ্ঠে বললাম, 'চিনি।'

উত্তরা তোমাকে কলকাতা আনার জন্য পাগল হয়েছিলাম। আসবে শুনে গেয়ে উঠেছিলাম, 'এবার, সখী সোনার মেয়ে দেয় বুঝি দেয় ধরা।' এই ধরা দিলে তুমি আমার কাছে? এতোটুকু দয়া দেখালে না।

'তবে বডি....'

'হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। চলুন।'

গেলাম বেনাপোল শরণার্থী শিবিরে। কিন্তু কি দেখলাম সে কথা আমার কলম লিখবে না। এতদিন বাদে তোমার মুখ না দেখে পারছিলাম না। একটা ময়লা কাপড় দিয়ে তোমার শরীর ঢাকা ছিল। রুক্ষ এলোচুল ছড়িয়ে ছিলে মাটির উপর। মুখের কাপড়টুকু তুলে তাকিয়ে রইলাম। সুন্দর—এখনও সুন্দর। তোমার মুখের তেজকে আরো দৃঢ় করেছে বয়স আর তুফান। শুধু মৃত্যু হলদে ছোপ ফেলেছে মুখে। কিছু আসে যাচ্ছে না তাতে। কাঁচা হলুদ দিয়ে বিয়ের রাতে স্নান করার পরও তোমার মুখ এমনি হলদে দেখিয়েছিল। ফের মুখ ঢেকে দিয়ে তোমার পায়ের কাছে চাটাই -এর উপর বসলাম। পায়ের উপর হাত রাখলাম। অফিসার ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে চেয়ার নিয়ে এলেন। বসতে বললেন। হাত নেড়ে না করলাম। আমি কেবল তখন চাইছিলাম তোমার প্রিয় নদীর জলে এক ডুবে তলিয়ে যেতে— এটুকু যেন করতে পারি। পারলাম। টাকার ব্যাগটা ভদ্রলোকটির হাতে দিয়ে দিলাম। আমার ভক্ত পাঠক অফিসারের চেষ্টায় সব ব্যবস্থাই হলো। মাঝিরা আর অফিসার ভদ্রলোকটি মিলে কি কি যেন করতে লাগলো যাতে বডি ভেসে না উঠে। আমি নদীর দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম—নদী থেকে তুমি উঠে এলে। মস্ত মাথা ভরা খোঁপা। তার চারপাশে রূপোর ফুল গোঁজা। গাঢ় নীল শাড়ি উঁচু করে পরা, হাতে চুনির বালা। কানে চুনির ফুল। কোমরে হাত দিয়ে ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে ডাকলে তুমি, 'কি যাবে তো স্নান করতে, না যাবে না?'....পরনে কমলা রঙের শাড়ি। হাতে পোখরাজের বালা। গলায় পোখরাজের মালা। কানে পোখরাজের ফুল। অস্তগামী সূর্যের লাল রঙ টেনে নিয়ে লাল হয়ে জ্বলছে তোমার হাতের গলার কানের পোখরাজ। আমি তোমার চুল খুলে দিতে গেলাম। তুমি টুপ করে পড়ে গেলে জলে। তোমাকে স্রোতে ভাসিয়ে নিচ্ছে। তোমাকে কুমীরে টানছে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার হাত ধরলাম। 'কুমীরের সঙ্গে পারবে না। অমল আমায় ছেড়ে দাও। 'আমি তোমার কুমীরকে টেনে পাড়ে তুলব।' বলে সাঁতরাতে লাগলাম তোমার হাত ধরে। ....পরনে লাল পাড় কোড়া শাড়ি। হলুদ-স্নানের হলদে আভা সমস্ত শরীরে। গলায় চিক চিক করছে এক গাছা সরু সুতোর মতো হার। আমার হাত দুটো দিয়ে মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে গাইছ,

এখন আমার সময় হলো
যাবার দুয়ার খোল।
হল দেখা, হল মেলা আলো ছায়ায় হলো খেলা—
স্বপন যে সে ভোলো ভোলো....

তোমার গলায় মুখ ডোবাচ্ছি আর উঠাচ্ছি আমি...

...'সার'...

চমকে উঠলাম। উঠে দাঁড়ালাম।

তোমার পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম উত্তরা। ভগবানের পরীক্ষা আরো কঠিন। আজ তোমাকে নিজ হাতে নদীতে ডুবিয়ে যাবার জন্য বসেছিলাম এতক্ষণ। এবার ডাক পড়েছে। একদিন রেগে গিয়ে বলেছিলাম, 'নদী কি কেবল তোমাদের দেশেই রয়েছে। আমাদের ওখানে নেই? চলো গঙ্গা দেখবে। সে কি এই দেখা?'

'স্যার...

'ও।' বলে প্রস্তুত হলাম।

গায়ের শালটার কথা মনে ছিল না। ঠাণ্ডা ঘরে জড়িয়ে বসেছিলাম। এখন যে ঘেমে জল হয়ে গেছি, তাও জানতাম না। সেটা খুলে জড়িয়ে দিলাম তোমাকে। নিজ হাতে ডুবিয়ে দিলাম নদীতে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। লাল সূর্যের দিকে দু'হাত জোড় করে কিছু প্রার্থনা জানাতে চাইলাম। কিছুই মনে এলোনা। শুধু দু' হাত জোড় করে শেষ সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বাড়ি ফিরে তোমার ডাইরি খুলে বসলাম।

[ডাইরি]

'না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে?
কিসের তরে এই আয়োজন এমন কলরবে।'

আজ তিরিশে মার্চ। পূর্ববাংলার পথ রক্ত বয়ে নিয়ে নদীতে ঢালছে আজ পাঁচ দিন ধরে। পঁচিশে মার্চ ঢাকা আক্রমণ শুরু হবার পরই আমরা পালিয়ে এসে আমার স্বামীর এক পরিচিত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। গরিব চাষী মানুষ। ডাক্তার সাহেবকে আশ্রয় দিয়েছে। সাধ্যমত খেতেও দিচ্ছে। এখন পর্যন্ত তার সাহায্যেই বেঁচে আছি।

এটা চিঠি লেখার সময় নয়। আমার স্বামী বেড়ার ঘরের মাটির মেঝের উপর এ মাথা ও মাথা হেঁটে চলেছেন। আমিও কিছু একটা করতে চাচ্ছিলাম স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয় বলে। এই ভরা দুর্দিনে তোমাকে মনে পড়ছিল। স্বামীর পোর্টফলিওতে একটা ডাইরি বই ছিল। সেটা খুলে নিয়ে এসে তোমার কাছেই বসলাম অমল দুর্যোগের ঘোর রাতে।

ছেলে দুটো গুটিশুটি পায় বসে আছে পাটির উপর। বড়টির বয়স তেরো। ছোটটির বয়স দশ। বড়টির নাম রাজীব। ছোটটির নাম সঞ্জয়। ইন্দিরা গান্ধীর ছেলেদের এ নাম দুটো আমার খুব ভালো লাগে বলে আমি ওদের এ নাম দুটোই রেখেছি।

সমস্ত শহর অন্ধকার। যেখানে আছি সে পল্লীও অন্ধকার। সন্ধ্যাদীপও কেউ জ্বালেনি। শুধু আমার মোমবাতির আলোর শিখা তরতর করে কাঁপছে আমার ডাইরির পাতার উপর। রাজীব আর সঞ্জয়ের কচি বুক দুটোও কাঁপছে ঠিক মোমবাতির এই শিখাটার মতো। মাঝে মাঝেই আতঙ্কিত চোখ মেলে তাকাচ্ছে বাবা মার দিকে। ট্যাঙ্ক কামানের শব্দে চমকে উঠে মুখ চাপছে দু'হাঁটুর ভেতর। ঢাকা ছেড়ে আমাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে। কিন্তু তার কোন উপায় চোখে দেখছিনে। আমার স্বামী বড় ডাক্তার। ঢাকা শহরে তার নাম পশার বাড়ি গাড়ি সব আছে। অতএব তার নামে পরোয়ানাও আছে। আর তার মানেই হলো, মাথা নেওয়া হয়ে আছে। আর যে মাথা নেওয়া হয়ে আছে, সে মাথাকে বাঁচিয়ে নিয়ে কি করে যে এখান থেকে পালাব পথ দেখছি না। আমার স্বামী কখনো পায়ের কাছে বসে ভিখারীর মতো প্রার্থনা করছেন, কখনো পাগলের মতো আমার দু হাত জড়িয়ে ধরছেন— 'ছেলে দুটোকে নিয়ে পালাও উত্তরা। আমার কথা রাখো। রহিমুদ্দিন বলছে, তার বৌ বলছে, রাজীব সঞ্জয়কে তাদের আটটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশিয়ে তোমাদের তিনজনকে তার চাচার বাড়ি পৌঁছে দিতে পারে। তোমাকে বোরখা পরিয়ে নেওয়া তো কিছুই শক্ত নয়। তারপর রহিমুদ্দিনের চাচাই আবার আর একটা গ্রামে পৌঁছে দেবে তোমাদের। এমনি করে রাজীব সঞ্জয়কে নিয়ে তুমি যে কোন বর্ডার লাইন দিয়ে ভারতে চলে যাও উত্তরা। তারপর আমি দেখবে ঠিক এসে পড়বো। আমার কথা ভাবতে গিয়ে তুমি রাজীব সঞ্জয়কে মেরো না। তোমার বুদ্ধি আছে। শক্তি আছে। তুমি পারবে ওদের বাঁচাতে। চলে যাও উত্তরা। না, রাজীব সঞ্জয়কে মারতে পারি না।'

কিন্তু ওঁকেই কি ফেলে যেতে পারি?

পরের দিন আবার সেই একই ভিক্ষা—'উত্তরা কথা রাখো। কথা রাখ উত্তরা। তোমার পা ধরছি।' আমার পা দুটো মুঠো করে ধরে বসে আমার দিকে প্রার্থনা নিয়ে চেয়ে থাকেন। ছেলেদের নিয়ে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে বুঝতে পারছি। বাবা মা মারা গেছেন। ওদিকের ভাবনা শেষ। স্বামীর ভাবনাও রেখে দিতে হবে। হবেই যখন রাখবো।

জুন। তারিখটা বড় জানি না। এর ভেতর আর ডাইরি লিখবার সময় পাই নি। আজ আমার অফুরন্ত অবসর। বেনাপোলের এক শরণার্থী শিবিরের তাঁবুতে বসে আছি চাটাই বিছিয়ে।

তুমি চমকে উঠছ? খুশি হয়ে উঠছ? আমরা তবে চলে আসতে পেরেছি।

পেরেছি। তবে আমরা নয়। একা আমি পেরেছি।

রহিমুদ্দিনের চাচার বাড়ি যাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত তৈরী হচ্ছিলাম। আমার স্বামী টাকার ব্যাগ আমার কোমরে গুঁজে দিচ্ছিলেন আর নানা কথা বলে দিচ্ছিলেন করতে হবে না হবে। একটা ভারী জিপের শব্দ পেয়ে কেঁপে উঠলাম সবাই। আমার স্বামী ভাঙ্গাচোরা গলায় বললেন, 'উত্তরা কবে চলে যেতে বলেছিলাম তোমাদের। কথা শুনলে না। রাজীব সঞ্জয়কে বাঁচালে না উত্তরা।' রহিমুদ্দিনে-র বৌ ছুটে এসে রাজীব সঞ্জয়কে পাটি চাপা দিয়ে তার উপর ছেঁড়া কাঁথা বালিশ ফেলতে লাগলো। আমার স্বামী আমাকে ঘরের কোণায় টেনে নিয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন কি দিয়ে চাপা দেবেন তার খোঁজে। জিপটা এসে থামলো। 'এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো' বলে, আমাকে কোণে ঠেসে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আমার স্বামী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমি গুলির শব্দের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু শুনলাম আমার স্বামী হতবাক কণ্ঠে বলছেন, 'আরে ফণী! তুই জিপ নিয়ে এসেছিস? এ্যাঁ!!'

বৃষ্টি বৃষ্টি...হঠাৎ যেন আমার গায় বৃষ্টি নামল। ফণী আমাদের নিতে এসেছে। ফণী আমাদের বিশ বছরের পুরোনো ড্রাইভার। সে আমাদের ড্রাইভার চাপরাশি, বাজার সরকার বন্ধু। সে আমার স্বামীর ডান হাত বাঁ হাত দুই হাত। আমার স্বামী তাকে টাকা দিয়ে বলেছিলেন, 'আর একদিনও নয়। তুই পালা। আমরা আসছি।' সেই যে ফণী চলে গিয়েছিল এই দশদিনের মধ্যে তাকে দেখিনি। আমার স্বামী তার সব প্রিয়জনকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে—নিজে মৃত্যুর জন্য তৈরী হচ্ছেন। সেই ফণীকে দেখে এখন আমার স্বামী বিস্ময়ে আনন্দে পাগল হচ্ছেন। বলছেন, 'তুই চলে যাস নি ফণী!' আমি বেরিয়ে এলাম। পাটি বালিশ ঠেলে রাজীব সঞ্জীব ছুটে এসে ফণীকে জড়িয়ে ধরলো।

কিন্তু ফণীর তখন এসব দেখার বা কথা বলার সময় নেই। সে আমাদের কথা বলবার সময় দিতে পারে না। সে এক ব্যস্ত দ্রুত গলায় বললো, 'আমি জিপের সন্ধানে ছিলাম। জিপ ছাড়া মাঠ ঘাট পার হওয়া যাবে না। আর দেরী করবেন না সাহেব। জিপে উঠে বসুন আপনারা। আমি জিনিসপত্র নিয়ে আসছি।' বলতে বলতে একরকম দৌড়ে ঢুকে গেল ঘরে। যে দুটো তিনটে ব্যাগ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসবার সময় নিয়ে এসেছিলাম, তাই হাতে ঘাড়ে নিয়ে ফণী বেরিয়ে এলো। জিপে ফেললো। সামনের সিট নামিয়ে রাজীব সঞ্জীবকে কোলে করে জিপে তুললো। আমাদের বললো, 'উঠুন মা।' আমি উঠলাম। আমার স্বামী উঠতে উঠতে বললেন, 'দিনের বেলায়—'

ঘুরে গিয়ে লাফ দিয়ে জিপে চালকের আসনে বসতে ফণী বললো, 'দিনের বেলায়ই আমাদের এগোতে হবে সাহেব। হেড লাইট জ্বালানো যাবে না।' রহিমুদ্দিনের বৌ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গাড়ির ভেতর একটা পোটলা আর এক কুঁজো জল তুলে দিল। বললো, বাবারা, খিদা লাগলে জল মুড়ি গুড় খাইও চাইট্টা। আমাগো আর কিবা আছে কিবা দিমু।' রহিমুদ্দিন প্রার্থনা করলো, 'আল্লা ঠিক মতন যাইবার যেন পারে। দুযমন গুইলার চক্ষু যেন্ বিষ সাপে ছোবলাইয়া খাইয়া ফেলায়।' আমার স্বামী আর আমি ওদের কাছ থেকে বন্ধুর মতো হাত নেড়ে বিদায় নিলাম। রহিমুদ্দিন জিপের সঙ্গে চলতে চলতে বললো 'ফণী চাচা, বড় সড়ক দিয়া গাড়িডা চালাইবা না কিন্তুক—শালারা সড়কের মোড়ায় মোড়ায় খাড়াইয়া রইছে কিন্তু।'

ফণী মাথা নেড়ে না তা যাবে না জানিয়ে জিপ চালিয়ে দিলো। আমরা সিটের উপর বসেছিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে ফণী বললো, 'সাহেব, সিটে বসবেন না। নীচে বসুন। শালাদের যেন চোখে না পড়ে।' আমরা নেমে বসলাম। জিপটা যত পারে এ পথ ও পথ করে গা আড়াল করে চলতে লাগলো। ভেতরে আমরা চারটা প্রাণীও শরীর গুটিয়ে মাথা গুটিয়ে বসে রইলাম নিজেদের আড়াল করে।

রাজীব আর সঞ্জয়ের মুখ এখন উজ্জ্বল। আমার থুতনী টেনে নিজেদের দিকে ফিরিয়ে বললো 'আমরা কলকাতা যাচ্ছি?' মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ বাবা আমরা কলকাতা যাচ্ছি।' মনে মনে বললাম, 'তোদের মা বাবা এখনও জানে না তোদের কলকাতা পৌঁছে দিতে পারবে কিনা।' দেখলাম আমার উত্তর শুনে দুই ভাই তখন খুশিতে জিপের নাচের সঙ্গে কোমর উঁচু তুলে আর ফেলে মনের আনন্দে নাচছে।

[ভগবান আমার হৃৎপিণ্ডকে বেরিয়ে যেতে দাও....]

ফণীর হাতে জিপ ছুটে চলেছে। কখনও গ্রামের ভেতর দিয়ে কখনো মাঠ ক্ষেত গাছের আড়াল আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। পারতপক্ষে ফণী রাস্তা দিয়ে চলছে না। রাস্তা এড়িয়ে চলেছে।

ঘণ্টা দুয়েক চলার পর বললো, 'সাহেব বিশ মাইল চলে এসেছি!' তারপর থেকে মাঝে মাঝেই বলতে লাগলো...'তিরিশ মাইল চলে এসেছি।' 'চল্লিশ মাইল পার হলাম।' সন্ধ্যার আগেই একটা গ্রামের ভেতর জিপ ঢোকাল ফণী। বললো, 'আজ এখানে রাতটা কাটাতে হবে আমাদের। কাল সকালে আবার বেরিয়ে পড়বো। আমার বন্ধু কাজী আজাদের বাড়ি। ও জানে আমি আপনাদের নিয়ে আসব এখানে। এইভাবে কখনো দিনে, কখনো রাতে লুকিয়ে থেকে, আবার বেরিয়ে এসে, কখনো চলে আবার কখনো নিঃশব্দে থেমে পাঁচ দিন পথ চললাম আমরা। রাজীব সঞ্জয়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। নামছে, উঠছে। নতুন নতুন বাড়িতে অতিথি হচ্ছে। চিড়ে মুড়ি গুড় লাড়ু খাচ্ছে। মোটা চালের ভাত খাচ্ছে। কলমি শাকের ঝোল দিয়ে। এ সবই যে নতুন ওদের কাছে।

আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৈশাখের খর রোদের ভেতরও তাই হাওয়াটা ঠাণ্ডা। ফণী গাড়ী চালাতে চালাতে সাহেবকে মাইলের খবর বলে যাচ্ছে। এবার বলার ধারা বদলেছে। এর আগে পর্যন্ত বলেছে, এত মাইল পথ এসেছি। এখন বলছে, আর এতটা পথ বাকী আছে। বলছে, 'বর্ডার লাইন আর ত্রিশ মাইল।' 'আর বিশ মাইল।' 'মাইল দশেক।' 'পাঁচ মাইল।' বুকের ভেতরে দপ্‌দপ্ শব্দ হতে লাগলো। সত্যি তবে অমল তোমাদের কলকাতায় এলাম। আমার স্বামী আমার আঁচলে একটা সাদা রঙের ছোট্ট বড়ি বেঁধে দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি দেখো না নিজেকে, না ছেলেদের কাউকেই রক্ষা করতে পারছো না তবে জিভে ফেলে দিও।' আমি কোমরে গোঁজা বড়িটা শাড়ির উপর দিয়ে একবার টিপে দেখলাম। বোধহয় মৃত্যুকে যে আর কিছু বাদেই ছুঁড়ে ফেলে দেবো— সেই অনুভবটা দিলাম। এই পাঁচটা দিন একটা শূন্য ফাঁকা মাথা নিয়ে চলেছিলাম। ফণী যা বলেছিল করে যাচ্ছিলাম। যখন শুনলাম বর্ডার লাইন এসে গেছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই আমরা এ দেশের মাটি ছেড়ে যাবো, তখন মাটি মাঠ আকাশের দিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম, তোমাদের ছেড়ে যেতে চাইনি বলে যৌবনের সব চাইতে বড় চাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম—তবু আজ ছেড়ে যেতে হচ্ছে কেন? কেন মার খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে এলাম জীবন নিয়ে (হায় ঈশ্বর।) বাড়ি ঘর সংসার সব ফেলে? এ কাদের জন্য? যদি বলি তোমার জন্য অমল? চমকে উঠবে? উত্তেজিত ভাবে 'তুমি' শব্দটা সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজ সম্বন্ধে তোমরা খুব স্পর্শকাতর। তোমরা বললে তোমাদের গায় কিছুই স্পর্শ করে না— 'তুমি' সম্বোধনে মুখ লাল হয়ে উঠে। তোমরাই বলব না হয়। আজ চব্বিশ বছর ধরে কতগুলি বিদেশী আমাদের জীবন নিয়ে, দেশ নিয়ে যে জুয়া খেলেছে, তোমরাই হলে তাদের অস্ত্র। তুমি কবি, তুমি সাহিত্যিক, তুমি প্রাবন্ধিক— এদেরই তো বুদ্ধিজীবি বলে? এই তোমাদের হাত দিয়েই ওরা জুয়া খেলছে আমাদের সন্তান, সংসার, ঘর বাড়ি, মাটি সব —সব কিছু নিয়ে।

ফণী— ব্যাগ্র বিচলিত কণ্ঠ আমার স্বামীর! শূন্য মাথায় মাটি ফেলা বন্ধ হয়ে গেল এক লহমায়। চমকে উঠে তাকালাম ওঁর মুখের দিকে। চারিদিকে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন আমার স্বামী। হঠাৎ ফণীকে আঙ্গুলের ইসারায় দূর দেখিয়ে বিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'ঐ যে ক'টা মূর্তি আসছে মনে হচ্ছে, ওরা কি—'

ওরা যে কি সেটা আর আমার স্বামীর মুখ দিয়ে বের হলো না। বের হলো না ফণীর মুখ দিয়েও। সেও শুধু মাথা নাড়লো। যার অর্থ হলো, 'হ্যাঁ, সাহেব।' ষ্টীয়ারিং -এর উপর ফণীর হাত থরথর করে কাঁপছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে গলা দিয়ে। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা ঠাণ্ডা হিম রক্তস্রোত বয়ে গেল। রাজীব আর সঞ্জয়ও মুহূর্তে বুঝে ফেললো ব্যাপারটা। এরই ভেতর তো কাটাচ্ছে আজ দশদিন ধরে। 'মা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে আঁকড়ে ধরলো ওরা দুই ভাই। আমার স্বামী আমার দু কাঁধে দু হাতে চেপে ধরে জোরে এবং কথায় জোর দিয়ে বলে উঠলেন, 'এবার আমার কথা শুনতে হবে। যদি না শোন তবে তোমার আঁচলে যে বড়ি দিয়েছি, সে বড়ি আমার কাছেও আছে। আমি এক্ষুনি তা মুখে পুরে দেবো।'

আমি আমার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত করে তৈরী হলাম। বললাম, 'বলো।'

গলার কথায় এতটুকু দুর্বলতা না এনে তিনি বললেন, আমি নেমে যাবো। ওদের দিকে দৌড়াবো। ফণী তোমাদের নিয়ে ছুটবে। একটা শেষ চেষ্টা। হয়তো পৌঁছে যেতে পারো। বর্ডার আর দু মাইলও নয়। নইলে ওরা গুলি করে টায়ার এক্ষুণি ফাটিয়ে দেবে। আমাকে আসতে দেখলে হয়তো সেটা নাও করতে পারে। ততক্ষণে তোমরা তবে অনেক এগিয়ে যেতে পারবে। বলতে বলতে জিপের পেছনের দিক দিয়ে শরীরটাকে মাঠের উপর ছুঁড়ে দিলেন তিনি। আমি চোখ বন্ধ করলাম। আবার খুললাম। দেখলাম আমার স্বামী দুইহাত মাথার উপর তুলে লোকগুলোর দিকে দৌড়োচ্ছেন। আমি রাজীব আর সঞ্জয়কে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেশরীরের কাঁপুনী আটকাতে লাগলাম আর দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ঠোঁটের কাঁপুনী। কান খাড়া করে রইলাম গুলির শব্দের জন্যে। গুলির শব্দ হলো। আবার চোখ বন্ধ করলাম।

কিন্তু আমাদের জিপ চলছে না কেন? ফণী লাফিয়ে নেমে পড়লো কেন? সঞ্জয়কে রাজীবকে আমার বুক থেকে নামিয়ে দিচ্ছে কেন সে? জিপের টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছে। রাজীব সঞ্জীবের হাত ধরে আমাকে ছুটতে হবে এখন। এসিড, লোহার রড এমনি কিছু জিনিস পত্র আছে নাকি ফণীর কাছে। বলছে সে লড়াই দেবে।

সঞ্জয় আর রাজীবের হাত ধরে দৌড়োতে লাগলাম। সঞ্জয়ের হাত ধরে ফণীও দৌড়োতে লাগলো আমাদের সঙ্গে; যেন আমাদের দৌড়োনোর স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছে সে। কিছুটা গিয়েই সে হাত ছেড়ে দিল সঞ্জয়ের। আমরা দৌড়োতে লাগলাম মাঠের ওপর দিয়ে। দুটো শিশুর হাতে পায়ে তখন কি শক্তি। আমি ওদের রক্ষা করতে দৌড়োচ্ছি না। ওরাই যেন আমাকে রক্ষা করতে দৌড়োচ্ছে। ওদের মনোভাব তাই। গুলির শব্দ হলো। ওঁর গলার শেষ 'আঃ' শব্দ ভেসে গেল মাথার ওপর দিয়ে। আবারও গুলির শব্দ হলো। আবারও হলো। তারপর আমার দুই কানের পাশ দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো গুলির শব্দ। তবু রাজীব সঞ্জয়ের হাত ধরে দৌড়োচ্ছি। 'মা'....ওদের আর্ত ডাক বুকের পাঁজরার ওপর আছড়ে পড়লো। ওদের মাথা ঝুলে পড়লো, শরীর ঝুলে পড়লো, শেষ হয়ে গেছে ওরা। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম ওদের নিয়ে মাঠের ওপর। পড়ে রইলাম। ওঠার আর দরকার কি। কিন্তু উঠতে হবে। আঁচল থেকে ছোট সাদা বড়িটা খুলে জিবে ফেলতে হবে। কিন্তু কি করে উঠবো? হাত ছাড়া কি কেউ উপুর হয়ে পড়ে থাকা শরীরকে উঠাতে পারে? কিন্তু আমার হাত কই। আমার হাত খুঁজে পাচ্ছিনা কেন? কোথায় গেল হাত দুটো? পেলাম না খুঁজে। ওরা এসে আমায় ধরলো আমার হাত ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো। ওরা আমার হাত পেল আর আমি পেলাম না কেন বুঝলাম না!

যখন জ্ঞান হলো দেখলাম একটা জঙ্গলের কাছে পড়ে আছি। শরীরের শাড়ি কাপড় কিছু নেই। শাড়িটা খুঁজতে লাগলাম। পরার জন্য নয়। ওটার আঁচলেবড়িটা। শাড়ি পেলাম। কিছু দূরেই জল কাদার মধ্যে পড়ে রয়েছে শাড়ি জামা। আঁচলটা খুঁজলাম। কিন্তু বড়ি পেলাম না। জলে গলে গেছে। আঁচলের যে দিকে বাঁধা ছিল বড়িটা সেই কোণটা মুখে পুরে দিয়ে বসে রইলাম; কিছুই হলো না। ভিজে শাড়ি জামা পরলাম। শুয়ে পড়লাম। গাছের তলায়। কিছু মেয়ে পুরুষের দল পালাচ্ছিল। তারা আমায় দেখলো। আমায় সঙ্গে নিয়ে নিল। সেটা কোন দিন—পরের দিন, না তার পরের দিন, না তার পরের দিন আমি জানি না। কে একজন যেন দেখতে পেলো কাপড় জামার সঙ্গে ডাইরি বইটাও একটা গাছের তলায় পড়ে রয়েছে। আমায় এনে দিল।

এখন আমি এক শরণার্থী শিবিরে। যাতে আমরা কলকাতা না ঢুকতে পারি তাই বাঁশের বেড়া দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখা হয়েছে!! আমি এখানে এই বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি; এই বেড়ার ঐ পিঠে তুমি আছ, এ কথা আমার মনে হয়। তোমার নাম বললে সবাই চেনে। তুমি একজন বড় লেখক। তুমি একজন বিখ্যাত কবি লেখক প্রাবন্ধিক আমি জানি। এ খবর আমি আগেও জানতাম। তোমার বই আমি ঢাকা বসেও পড়েছি। আমার স্বামী যে ভাবেই হোক তোমার বই—শুধু তোমার বই-ই নয় আমি পড়ি বলে কলকাতা উজার করে এনে দিতেন। পত্র পত্রিকা বইতে আমার টেবিল ঢাকা থাকতো। এখানে বই নেই। কাগজ পড়ি। আমায় কাগজ নিয়ে বসে থাকতে দেখে যে যখন যে কাগজ পায় আমার কাছে ফেলে যায়। আমি পড়ি। বিভ্রান্ত লাগে আমার। কে যে কি বলছো তোমরা লেখক কাগজ পত্র পত্রিকা কিছুই বুঝে উঠতে পারিনে আমি। আজ এক রকম বলছো তো কাল বলছো অন্য রকম। কেবলি উলটে যাচ্ছে মতটা। বাংলাদেশ, বাংলাদেশ—কি বিক্রমে তোলপাড় করলে মারো কাটো শেষ করো পাকিস্তানকে। এখন আবার স্তব্ধ! পত্রিকা বড় করে বলছে, 'আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র দেবে না।' তারপর ছোট করে বলছে 'এই প্রস্তাব সেনেট থেকে পাশ হয়ে গেছে। তবে মানা না মানা প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা। মানতে পারেন আবার নাও মানতে পারেন।' বড় করে বলছে, 'রাশিয়া পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছে না।' তারপরই ছোট করে বলছে, 'যাও দিচ্ছে তা সামান্য।' যেন 'অশ্বত্থমা হত—ইতি গজ' সংবাদ সব। সব লেখা, সব সংবাদ আলোচনা প্রবন্ধ— কেবল যেন কারচুপি। কাদের ঠকাচ্ছ তোমরা? আমাদের তো? কি লাভ? কিছুদিন করে খাবে—এই মাত্র তা?

জুলাই। বৃষ্টি নেমেছে। চাটাই-এর তলা জলে ভিজে গেছে। বৃষ্টি নামলেই আমার কোল ঘেষে এসে বসতো রাজীব আর সঞ্জয়— গল্প বলো মা। গল্পের থলি আমার ভরাই থাকে— জানোই তো তুমি। গল্প বলতাম। বুকের সঙ্গে মিশে বসে গল্প শুনতো। কথা আমি ভালোবাসি। ডাইরিটা আমায় কথা বলতে দিচ্ছে। রাজীব সঞ্জয় তোমাদের কাছে, তোমাদের বাবার কাছে আমি আসছি। দেখো শিগগিরই এসে যাবো।

জুলাই। কাগজ পড়ছিলাম। দেখলাম, কি ব্যাপারে যেন তোমাদের বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষরের এক বিরাট তালিকা বের হয়েছে। তোমার নাম প্রথম সারিতে। আচ্ছা অমল, তোমরা কি মনে করো এতে কোন কাজ হয়? যদি মনে করো হয় তবে হয় না কেন? আর যদি জানো কাজ হয় না— তবে নামের তালিকা ছাপো কেন?

জুলাই। রোদ উঠেছে। তিনদিন ধরে বৃষ্টি চলছে। ভিজে মাটি ভিজে চাটাই। চাটাই-এর তল দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল। শাড়ি ভিজে গেছে। রোদ উঠেছে দেখে বাইরে বাঁশের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালাম। আসতে চাইনি দেশ ছেড়ে। আসতেই যখন হলো তখন এসে দেখছি বেড়া দেওয়া কলকাতা। ঢুকতে দেবে না ভেতরে।

জুলাই। আজকাল আর চাটাই ছেড়ে বড় উঠতে ইচ্ছা করে না। ডাইরিটা নিয়েই পড়ে থাকি। কখনো পড়ি কি লিখেছি আগে। আবার কখনো লিখি।

...অমল রাজীব সঞ্জয়ের রক্ত কিন্তু তোমাদের হাতেও লেগেছে। তোমরা দেশকে ঠিক পথে চালানো তো দূরের কথা কেবলি বিপথে চালাচ্ছ। কেবলি বিভ্রান্ত করছো। নইলে এক কলকাতাই রাজীব সঞ্জয়কে বাঁচাতে পারতো। তোমাদের পকেটে এক এক দেশের ম্যানি ব্যাগ। যার হাতে যে দেশের ম্যানিব্যাগ সে সেই দেশের কথা বলছো। সত্য বলছো না কেউ। তোমাদের মিথ্যা আচরণের আঁধিতে আজ সমস্ত দেশ অন্ধকার। সূর্য ঢেকে ফেলেছো তোমরা। অন্ধকারে কেউ পথ ধরতে পারছে না। নইলে দেশ কি স্বাধীনতা আনেনি? তখন কি অন্য দেশের সাহায্যের দরকার হয়েছিল? তবে আজ কেন অন্য দেশের মর্জি ছাড়া ঘাড়টুকু পর্যন্ত ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাতে পারে না দেশ? তোমাদের জন্য। তোমাদের হাত দিয়ে দেশটাকে আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে বিদেশী দেশগুলি। রাজনৈতিকদের কার কানে কোন রঙ-এর পালক গোঁজা দু চার দিনেই ধরে ফেলা যায়। কিন্তু তোমাদের পালকের রঙ চেনা শিবেরও দুঃসাধ্য। "আমি নিজে ব্যক্তিত্ববাদী, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি আস্থা আমার —" এই মতের প্রশ্রয়ে বিশ বছর ব্যক্তি বড় হতে হতে আজ দৈত্যের চেহারা নিয়েছে। এই ব্যক্তি নামক দৈত্যের ইচ্ছার ক্ষুধা মেটানোর সাধ্য দেশের নেই। আসছে বিদেশের টাকা।

দেশটা নাকি গেছে অমল।

যে দেশের বুদ্ধিজীবীরা অন্য দেশের কথা বলেন— সে দেশ যায়।

আগষ্ট। শরণার্থী শিবিরে থাকতে আমার কিন্তু বেশ লাগছে। কত রাজপুরুষ, কত মহাজন, কত পত্র পত্রিকার লোক আসছেন, যাচ্ছেন। সেদিন প্রধানমন্ত্রী এলেন। নিজের হাতে খিচুড়ি দিলেন। আমি আমার কলাই-এর থালাটা সবার আগে বাড়িয়ে ধরলাম তাড়াতাড়ি করে। বেশ লাগছিল। আমার ভেতর থেকে একটা মহা কৌতুক যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

খিচুড়ি এনে কিন্তু ফেলে দিয়েছিলাম ছুঁড়ে। প্রধানমন্ত্রীর উপর রেগে নয়। আমি রোজই খাবার আনি আর ফেলে দি। আচ্ছা অমল, খাবার ফেলে দিয়ে থালা রেখে দি কেন বলো তো? এর মানে কি? আবার পরের দিন খাবার আনব বলে? এটা কি? বাঁচার ইচ্ছে?

আমি হেসে ফেলি। আমার তাঁবুর প্রতিবাসিনীরা তাকায়। ভাবে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

আগষ্ট। বুঝছি এবার রাজীব সঞ্জয়দের কাছে যাবো। যাবার আগে একবার তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে অমল— ভীষণ সে ইচ্ছে। একবার গিয়ে তোমার ঠাণ্ডা ঘরে দাঁড়াবো— তোমার লেখার খাতার উপর হাত রাখবো। তুমি আমার দিকে তাকাবে। সব ইচ্ছা শেষ হয়ে গেছে। এক আছে মরণের ইচ্ছা। আর তার আগে একবার তোমাকে দেখে যাবার ইচ্ছা।

খিচুড়ি দিয়ে গেল একটি সহানুভূতিশীল মেয়ে। আমি আজকাল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না বেশীক্ষণ। খিচুড়ির দলাটার দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছি। পদ্মার ঘোলা জলের মতো খিচুড়ির রঙটা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে খিচুড়ির পিণ্ডটা যেন পদ্মার ঘূর্ণিজল হয়ে গেল। নৌকো দিয়ে যেতে যেতে বিরাট ঘূর্ণিজল দেখতাম। এটা ওটা ফেলে দিয়ে দেখতাম ঘূর্ণায়মান জলের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তলিয়ে নিয়ে যাওয়া। নিজেকে যদি আজ ফেলে দিতে পারতাম নদীর ঘূর্ণিজলের মধ্যে! আঃ! আরাম লাগতো কত! চারদিক থেকে ঠাণ্ডা শীতল জল আমাকে বেড়িয়ে ধরতো। পাক খেতে খেতে তলিয়ে যেতাম আমি। কোথায় পদ্মা? কোথায় মেঘনা? কোথায় বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষ্যা—

অমল! তোমার কলমের কালো কালি ধুয়ে ফেলো। নূতন কালি ভরে নাও। কংস কি জানতো তাকে যে বধ করবেন তিনি গোকুলে বাড়ছেন? মথুরাবাসীই কি জানতো সে কথা? জানতো না। আমরাও জানি না কে গোকুলে বাড়ছে। কিন্তু বাড়ছে। এই নিয়ম। দ্রোণাচার্যের মতো অস্ত্র শিক্ষা দাও সেই বালককে। কলমের শক্তি? সত্য নিজেই শক্তিমান।

ডাইরির পাতা উল্টালাম—

সাদা। সাদা পাতা সাদা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কে যেন জিজ্ঞাসা করলো আমাকে, গাড়ি বাড়ি টাকা...টাকা...টাকা এসব কোথা থেকে আসছে....

দু আঙ্গুলে কপাল টিপে ধরলাম।

টেবিলের উপর গোটাছয়েক কলম ছিল। একটা একটা করে খুলে খুলে এ্যাসট্রের ভেতর কালি ঢেলে দিলাম। সামনে কাটগ্লাসের জাগ ছিল। তার মধ্যে জল টলটল করছিল। কলমগুলি একটা একটা করে ডুবিয়ে দিলাম তাতে। সমুদ্রের রঙ ধরলো জল।

সামনে সমুদ্র। খোলা ডাইরির উপর মাথা রেখে চোখ বুজে বসে রইলাম।

জিজ্ঞাসা

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। অফিস-কোয়াটারের বিরাট সৌধগুলি হইতে সবেমাত্র কর্ম-ক্লান্ত লোক দু'চার জন করিয়া বাহির হইয়া দ্রুত-গতিতে ছুটিয়াছি ট্রাম-বাসের উদ্দেশ্যে। কেউ বা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দ্রুত কলম চালাইতেছে হাতের অসমাপ্ত কাজের উপর—কেউ বা মুহূর্ত বিশ্রামে সোজা হইয়া বসিয়া টান করিয়া লইতেছে পিঠের শিরদাঁড়া।

বীণাও সমস্ত দিনের বৃথা ইনটারভিউ দেওয়ার ক্লান্তি ও অবসাদ কাড়িয়া একটা অফিস কামরার ভিতর উঠিয়া দাঁড়াইল। সে তার বান্ধবী ইন্দ্রাণীর অফিসে আসিয়া বসিয়াছিল, মুখ্যতঃ বিশ্রামের উদ্দেশ্য লইয়াই—তার পর মনে এ ইচ্ছাও ছিল যদি কিছু একটা চাকরীর ব্যবস্থা ইন্দ্রাণীর দ্বারা করিয়া লওয়া সম্ভব হয়। নইলে দিন যে আর চলে না। ভারত বিভাগের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে যে প্রাণ-মানের ভয়ে ছুটে এসেছিল—সে দু'য়েরই বিসর্জ্জনের বাজনা যে কানের কাছে ভাল ভাবেই বাজছে—তাতে সন্দেহ নেই।

বীণাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে, "তুই বড় বেশী ভাবছিস্—দেখিস, ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। কালকেব ইন্টারভিউটা দিয়ে আয়—যদি নাই-হয়, তখন আমার অফিসেই চেষ্টা করব।" তারপর হাতের ব্যাগটা খুলিয়া ভিতর হইতে ছোট্ট আয়না চিরুণী ও পাউডার পফটি বাহির করিয়া, বীণার সম্মুখে ঠেলিয়া দিতে দিতে বলে, "সারা দিন ঘুরে ঘুরে চেহারাখানার অবস্থা যা হয়েছে—চুলগুলো ও মুখটা একটু পরিষ্কার করে নে।—আচ্ছা, বি-এটা পাশ করেছিলি তো?"

বীণা বান্ধবীর আয়নায় চেহারাখানা দেখিয়া ভাবে—ভাগিস ইন্দ্রাণী চেহারাটা পালটাইয়া লইবার এ সুব্যবস্থা টুকু করিয়া দিল, নইলে যে সত্যি পাগলের মতই দেখাইতেছিল। চুলে চিরুণী চালাইতে চালাইতে জবাব করে, "না।"

'না!' একটু সময় ভাবিয়া লইয়া বলে 'আচ্ছা সে জন্য আটকাবে না—আজ না কাল কিছু একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারব বলেই তো আশা করি।"

"আজ নয় কাল! কাল হলে আজ খাব কি?" বীণা হাসির আবরণে আড়াল করিতে চায় কথার করুণ ভাবটাকে।

বিস্মিত ইন্দ্রাণী যেন একটু চমকাইয়া যায়। বলে, 'কেন, এত খারাপ ত তোদের অবস্থা ছিল না বীণা? তোর দাদা?" ... উত্তরের জন্য তাকাইয়া থাকে বীণার দিকে। কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায় নাই ত!

বীণা কেশ-বাসটা মোটামুটি ঠিক করিয়া প্রসাধন দ্রব্যগুলি ইন্দ্রাণীর দিকে সরাইয়া দিতে দিতে বলে, " যে মেয়েটির প্রেমে দাদা হাবুডাবু খাচ্ছিলেন—হঠাৎ সে কি না বিয়ে করে বসল গাড়ী-বাড়ীওলা আর এক জনকে—তারপর বিবাগী হয়ে যাওয়া ছাড়া তিনি হয়ত আর গত্যন্তর পেলেন না। এই আর কি।"

ইন্দ্রাণীর হাসি পায় এই ভাবিয়া—যে মেয়ে নিতান্ত অবহেলায় প্রতারণা করিয়া গেল, তাহার জন্য কি না বিধবা মা ভাই বোনকে অসহায় ভাবে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলিয়া দিয়া বিবাগী হইয়া যাওয়া। পৌরুষের কি অপূর্ব পরিচয়!

বীণা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, "আজ উঠি ভাই।" কথার শেষে একটু ইতস্ততঃ করিয়া কিছু একটা বলিবার জন্য ঠোঁট দুটি ঈষৎ খুলিবা মাত্র—বাহির হইতে দ্রুত পায় অগ্রসর হইয়া আসা জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়া সে থামিয়া যায়।

কায়দাদুরস্ত যুবকটি ঘরে ঢুকিয়াই ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাইয়া তাড়া দেয়—"চলে, চলো। বড্ড দেরী হয়ে গেল কাজ সেরে বেরিয়ে আসতে।" হাতের কব্জি ঘুরাইয়া সময় দেখিয়া লইয়া বলে, "ওঃ, সাড়ে চারটা! আধ ঘণ্টার ভেতর চায়ের পর্ব্বটি সেরে নিতে হবে। ছ'টায় শো আরম্ভ। উঠে পড়ো—উঠে পড়ো।"

ইন্দ্রাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বীণার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয়। 'আমার বান্ধবী বীণা। আর উনি হলেন—উনি হলেন আমাদের অফিসের ম—স্ত বড় এক জন অফিসার—" বলিয়া ইন্দ্রাণী অহেতুকই হাসি হাসে।

নমস্কারের আদান-প্রদান হয়।

তিন জনই বাহির হইয়া আসে। ইন্দ্রাণী বলে, "তোর কালকের 'ইন্টারভিউটা' সেরে সোজা আমার এখানেই চলে আসবি। তার পর যা হয় পরামর্শ করে দেখা যাবে।"

যুবকটি যাইয়া দরজা খুলিয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দাঁড়ায়, ইন্দ্রাণী প্রবেশ করিতে নিজেও উঠিয়া বসে—গাড়ী ছাড়িয়া দেয়।

"চমৎকার দেখতো তো মেয়েটি। চাকরীর চেষ্টায় এসেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, পারেন না একটা ব্যবস্থা করতে? বড্ড অসুবিধেয় পড়েছে।"

চিন্তিত মুখে রমেশ যেন মনে মনে একবার খোঁজ করিয়া দেখে কিছু একটা করিয়া দেওয়া যায় কি না। তার পর মাথা নাড়িয়া বলে, "উপস্থিত যে অসম্ভবই ঠেকছে।"

ইন্দ্রাণী একটু হতাশ হয়। সে যে বীণাকে আশা দিয়াছে!

ইন্দ্রাণীরা চলিয়া গেলে বীণা ধীর পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইল একটা স্ট্যাণ্ডের কাছে। সমস্ত চেহারায় তার ক্লান্তির ছাপ। হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া বীণা দেখিতে পায়, সেখানে ব্যস্ত মেঘের আনা-গোনা কখন যেন সুরু হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণ দিক হইতে এক বিরাট কালো মেঘের চাপ আকাশের উপর ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে, ঝড়-বৃষ্টি আসিল বলিয়া। লোকজন ব্যস্ত ভাবে যে যার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে। বাস-ট্রামগুলিতে তিলধারণের স্থান নাই—অবশ্য বাসে-ট্রামে না উঠিতে পারার সমস্যা তাহার স্থানাভাবটাই নয়। আসিবার সময় ট্রাম ভাড়া দিয়া অবশিষ্ট দু'টি পয়সায় সে পান খাইয়াছে। এবং সমস্ত দিনে এই হইয়াছে তাহার আহার্য্যগ্রহণ। কিছু ধার চাহিতে গিয়াও থামিয়া যাইতে হইয়াছে ইন্দ্রাণীর অফিসের বন্ধুটির আগমনে!... এখন সে কি করিবে। বালিগঞ্জের শেষ-প্রান্ত পর্য্যন্ত হাঁটিয়া বাসায় যাওয়া—সে যে একান্তই অসম্ভব! তাহার উপর অনাহারে গিয়েছে সমস্তটা দিন। কালকের রাত্রির খাওয়াকেই কি আর খাওয়া বলা চলে—আধ পাউন্ডের ছোট রুটিখানা দুই ভাই-বোনের দুর্দ্দান্ত ক্ষুধার পক্ষে কিছুই নয়, দু'পয়সার চিনির সঙ্গে সেইটুকু খাইয়া জল খাইয়াছে।

ঝড়-বৃষ্টি আসিয়া পড়িল বলিয়া। বাতাসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চুলগুলা হাতে চাপিয়া নিরুপায় ভাবে সে এদিক-ওদিক তাকায়—রাস্তা যেন প্রায় জনমানব শূন্য হইতে চলিল। একটা চলতি বাসের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়াও সে থামিয়া পড়ে—নাঃ, বাসের কন্ডাক্টরগুলো বড় হুঁসিয়ার। এক দিন পয়সা ফেলিয়া আসিবার অজুহাতে—অবাক হইবার ভাণে টিকিট কাটিবার বিপদটা এড়াইয়াছিল, কিন্তু নামিয়া যাইবার সময় কণ্ডাক্টারের সেই টেরছা দৃষ্টি ও 'ডাকু জেনানা হ্যায়" মন্তব্যটা কানে বাজিয়া আছে—এ পথ আর নয়। তবে কোন্ পথ? হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া বীণা ভাবে—যতটুকু পথ আগাইয়া যাওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি যোগ দিয়া সমস্যা আরও গুরুতর করিয়া তোলে। একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বীণা আশ্রয়ের ইতস্ততঃ তাকাইতেছে, ঠিক এমনি সময় একখানা গাড়ী আসিয়া আকস্মিক ভাবে সশব্দে ব্রেক কষিয়া দাঁড়াইল তাহারই সম্মুখে। বীণা প্রায় চমকাইয়া উঠিয়া দু'পা পিছাইয়া দাঁড়ায়।

এক জন লোক নামিয়া ভিতরের ষ্টিয়ারিংধারী ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলে, "একটু দাঁড়া, এক্ষুণি জিনিস কটা পাঠিয়ে দিলাম বলে। বাসায় পৌঁছে দিয়ে বলে যাস্—আমার ফিরতে একটু দেরীই হবে।" চলিয়া যাইতে গিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত ভাবে বলে, "আমার নতুন বাসার 'লোকালিটিটা' মনে আছে তো? একেবারে বালিগঞ্জের শেষ মাথায় — তের নম্বর বাড়ী বুঝলি?"

"রাস্তাটার নামটা যেন কি বলেছিলি?" ভিতরে উপবিষ্ট লোকটি জিজ্ঞাসা করে।

রাস্তাটার নামটা বলিতে বলিতে—মাথা নিচু করিয়া বৃষ্টির জল হইতে বাঁচিতে দৌড়াইয়া গিয়া ভদ্রলোকটি উঠেন উলটো দিককার একটা দোকানে।

ভদ্রলোকটি রাস্তার যে নাম বলিয়া গেলেন বীণার বাসাও যে ঠিক সেই রাস্তার উপরই! গাড়ীখানা তো তাহা হইলে তাহার বাড়ীর কাছেই যাইতেছে! সে যেন ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না—আহা, যদি তাহাকে তুলিয়া লইত। গাড়ীখানার দিকে চোখ পড়িতেই দেখিতে পায় উপবিষ্ট লোকটি স্থিরদৃষ্টিতে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। বীণা অস্বস্তি বোধ করে—কি ভাবিতেছে তাহাকে লোকটি—ট্রামে-বাসে উঠিতেছে না—আশ্রয়ের জন্য দৌড়াইল না—কেন একটি গাছের আশ্রয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইল! হাঁটিতে আরম্ভ করিবে না কি সে? নাঃ, এত বৃষ্টিতে হাঁটা অসম্ভব। এদিকে সন্ধ্যার আঁধার ঘন হইয়া রাত্রি হইতে চলিল যে! বীণা এদিক্-ওদিক্ তাকায়—ভাবেঃ অনুরোধ

জানাইবে না কি লোকটিকে? ...একটা কুলী দৌড়াইয়া কতকগুলো প্যাকেট লইয়া আসিলে ভদ্রলোকটি হাত বাড়াইয়া সব তুলিয়া লইলেন। ...বন্ধুর জিনিসের জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন, কাজ হইয়া গিয়াছে এবার চলিয়া যাইবে—বাড়ী পৌঁছানোর শেষ আশাটুকু বুঝি সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে মিলাইবে! সে কি তবে রাস্তায় থাকিবে? গুণ্ডার হাতে পড়িবে! পথচারী যাহাকে ডাকিয়া সাহায্য চাহিবে সে যদি ভাল লোক না হয়... আর সময় নাই—গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়া হইয়া গিয়াছে—আবার সে চোখ তুলিয়া তাকায় আবার—স্থিরদৃষ্টিতে তাকান লোকটির চোখে যাইয়া চোখ পড়ে। বীণা চঞ্চল হইয়া ওঠে—হয়ত কিছু বলিবার জন্য তাহার অজ্ঞাতেই ঠোঁটটি ঈষৎ নড়িয়া উঠে। লোকটি হঠাৎ দরজা খুলিয়া আহ্বান জানায়, "ভিতরে আসুন, একেবারেই ভিজে গেলেন যে!"

বীণা যেন মাত্র এ আহ্বানটুকুরই অপেক্ষায় ছিল—এমনি ভাবে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তারপর কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলে, "যে রাস্তায় আপনার গাড়ী যাচ্ছে, ঠিক সেই রাস্তার উপরই আমার বাসা। আপনার কিছু অসুবিধে হবে না পৌঁছে দিতে—"

লোকটি কিন্তু স্বল্প হাসির সঙ্গে হাতের ইঙ্গিতে থামিতে বলিয়া বলে, "বুঝেছি"!

বাসার ঠিকানা না বলিতেই বুঝিয়া গেলো! বীণা এর কথা ও হাসির ভঙ্গিতে অস্বস্তি বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। সে ভিজা শাড়ী ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া—হাত দু'টি কোলের উপর রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। বৃষ্টি-বাতাসের ঠাণ্ডায় না ভয়েই কে জানে—শরীর তার বার-দুই শিহরিয়া ওঠে।

"শীত করছে বুঝি?"

লোকটির প্রশ্নে চম্‌কাইয়া উঠে বীণা। বলে, "না।" তাহার এই সামান্য শিহরিয়া উঠাটাও এর দৃষ্টি এড়াইতেছে না। লোকটার অনুভূতি সম্পর্কে এতটা তীক্ষ্ণ হইয়া আছে। কিন্তু কেন? উদ্দেশ্য কি এর ভাল নয়? ... আর ভাল হোক, মন্দ হোক, তাহার ভয় পাইবার কি থাকিতে পারে? বীণা নিজেকে প্রবোধ দেয়। "না সে ভয় পায় না—যেই গাড়ী তাহাদের রাস্তায় পৌঁছাইবে ওমনি সে ধন্যবাদ জানাইয়া নামিয়া পড়িবে— বন্ধুর জিনিস পৌঁছাতে—বন্ধুপত্নীকে খবর বলিতে গাড়ী তো সেখানে যাইতেছেই।

গাড়ী সন্ধ্যা ও মেঘে আচ্ছন্ন বর্ষণ-সিক্ত নির্জ্জনপ্রায় রাস্তার উপর পূর্ণ-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। বৃষ্টিরও বিরাম নাই। হঠাৎ গাড়ী থামিবার শব্দে চম্‌কাইয়া তাকাইয়া দেখে—তার এ-স্থান নিতান্ত অপরিচিত। এ তো তাহাদের বাড়ী নয়! ততক্ষণে লোকটি দরজা খুলিয়া নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। বীণার কণ্ঠ চিরিয়া তীক্ষ্ণ আর্তস্বর বাহির হইয়া আসে—"এ কোথায় আপনি আমায় নিয়ে এলেন?"

"চিৎকার-হল্লা করো না। নেবে এসো বলছি।" আদেশ-সূচক গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

"না, আমি এখানে নামবো না—কিছুতেই না"—এবার সে ভয়ে ও কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

গাড়ীর হাতলে হাত রাখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে লোকটি —এ জ্বালাইবে দেখিতেছি—এখনও যখন ভড়ং বজায় রাখিতেছে। এ সব সস্তা ভড়ং—সে কি ডাকিয়া আনিয়াছে? নিজেই তো সাধিয়া আসিয়াছে। গাছের নীচে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ইসারা—কি হয় এ সবের অর্থ? এগুলো দাম বাড়ানো—চেহারাখানা ভাল; বেশ ত দেওয়া যাইবে উচ্চমূল্যই। গম্ভীর কণ্ঠকে ততোধিক গম্ভীর করিয়া বলে, 'বলছি নেমে এসো। চাকর-বাকরের কাছে আমার অপমান করো না। বেশ তো, না হয় নেবে ঘরে বসে একটু অপেক্ষা করো—আমার কাজ সেরে পৌঁছেই দিয়ে আসবো তোমায়।"

কান্নায় ভেজা মুখ তুলিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বীণা বলে, "আমি এখানেই বসছি—আপনি আপনার কাজ সেরে আসুন।"

"নাবতে তোমাকে হবেই—কথা শুনলে ভাল ফল আশা করতে পার।" কথার শেষে অপেক্ষা মাত্র না করে লোকটা বাড়ীর ভিতর যাইয়া প্রবেশ করে।

বীণার দৃষ্টিতে এতক্ষণে অন্ধকার প্রায় সহ্য হইয়া আসিয়াছে। সে দেখে বিরাট এক বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় গাড়ী দাঁড়াইয়া; গেট সেখান হইতে অনেক—অনেক দূরে। গেটের মাথায় জ্বলিতেছে একটি বাতি—চালার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া দারোয়ান। বাহিরে অঝোরে বাড়িয়া চলিয়াছে বৃষ্টি—সব স্তব্ধ। বীণা দরজা খুলিয়া নাবিয়া পড়ে—ইতস্ততঃ দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে ভাবে, ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবে কি? কিন্তু গেটে যে দারোয়ান দাঁড়াইয়া! সে নিশ্চয়ই এ কাজের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত — নইলে প্রভু এত নিশ্চিন্তে এত বড় ভয় দেখাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইত না। বীণা সিঁড়ি দিয়া এক-পা এক-পা করিয়া উঠিতে থাকে—যেমন করিয়া শিকার যাইয়া অজগরের মুখে পড়ে ... দেখা যাক্ লোকটার কথা শুনিয়া —যদি-ই বা ভাল ফল পাওয়া যায়! আবার তাহার দু'চোখ ছাপাইয়া

জল নামিয়া আসে—কার মুখ দেখিয়া আজ তাহার রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল—এত বড় অস্বাভাবিক ও অচিন্ত্যনীয় দুর্ঘটনায় পড়িয়া গেল, যা সে জীবনে ভাবিতেও পারে না। কে জানে ছোট ভাইটি ও মা কি করিতেছেন— হয়ত দুশ্চিন্তায় পথের দরজাটি খুলিয়া রাস্তায় উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি পাতিয়া তাহার অপেক্ষায় দু'জনে মুহূর্ত গুনিতেছেন! কূল-ছাপান অশ্রু মুছিতে মুছিতে বীণা দরজার ভারী ভেলভেটের পরদার উপর হাত রাখিয়া একবার কাঁপিয়া ওঠে, তার পর জোর করিয়া যেন ঠেলিয়া লইয়া গিয়া প্রবেশ করে ঘরে।

পলকে বীণা দেখিয়া লয়—ঘরে আসবাব পত্র কিছুই নাই। সমস্ত মেঝে মূল্যবান কার্পেটে মোড়া—মাঝখানটাতে উঁচু গদিতে মস্ত ফরাস বিছানো। চাদর তাকিয়া সব ফরসা ধবধবে। তাহার উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছে লোকটা— পলক মাত্র তাকাইয়া শরীর তার ঘৃণায় ও ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে।

বীণাকে দেখিয়া লোকটি ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছে। বলে, "এসো বসো।" হাত দিয়া দেখাইয়া দেয় ফরাসটা।

বীণা অতি বাধ্য মেয়ের মত বসিয়া বলে, "আপনার কথা আমি শুনলাম, আপনি এখন আপনার কথা রাখুন।"

"কি কথা?" চোখ তুলিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করে।

"আপনার কথা শুনলে ভালো ফল হবে!" কম্পিত কণ্ঠে বীণা বলে।

"ভাল হবে বলিনি, বলেছি আশা করতে পার।" লজ্জাহীন হাসি হাসিয়া লোকটা নির্ব্বিকার ভাবে জবাব করে।

এই নির্লজ্জ উত্তর ও ততোধিক নির্লজ্জ হাসিতে—এত বড় একটা জংলীর সঙ্গে কথা বলিতে ঘৃণায় বীণার শরীর-মন যেন বিষাইয়া ওঠে। —তবে কি আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই?...ভীত কম্পিত কণ্ঠে সে বলে," হ্যাঁ, আশাই করছি—ভদ্রলোকের কাছে একটি ভদ্র মেয়ে যা আশা করতে পারে— তার চাইতে বেশী একটুও নয়।... আমায় আপনি রক্ষা করুন—বিশ্বাস করুন মন্দ উদ্দেশ্য আমার ছিল না—আমি সত্যি বিপদগ্রস্ত হয়েই দাঁড়িয়েছিলাম। আমায় ছেড়ে দিন—চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো... আপনার মহানুভবতা স্মরণ করব—আমি..." মুখে হাত চাপিয়া সে কান্নায় কণ্ঠরোধ করিতে চেষ্টা করে।

অসহ্য এ ত্যক্ততা! বিরক্তির সঙ্গে লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু না, হয়ত অভিনয় নয়—সত্যি বিপদে পড়িয়াই দাঁড়াইয়াছিল—মনটা নরম হইয়া উঠে—আচ্ছা তাই যদি হয় তবে দিয়াই আসা যাইবে পৌঁছাইয়া।... আজকের সন্ধ্যাটাই মাটি—! কিন্তু বুদ্ধিটা একটু খাইয়া আগে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইতেছে—ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে হইতে বলে, "আচ্ছা, অপেক্ষা কর একটু, আসছি ও-ঘর থেকে। পৌঁছেই দিয়ে আসব তোমায়।"

বীণা কিন্তু তড়িৎ-গতিতে উঠিয়া গিয়া ব্যাকুল ভাবে লোকটার হাত চাপিয়া ধরে—"না, ও-ঘরে যাওয়ার আগেই আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।" বীণার এই অধৈর্য্য ব্যাকুলতার কারণ—সে যে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে তকমা-আঁটা বাবুর্চ্চির গ্লাস বোতল হাতে পাশের ঘরে আগমন। তাই সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া আসিয়া এমনি ভাবে তার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। লোকটাকে সে কিছুতেই ঐ ঘরে যাইতে দিবে না। তাহা হইলে উদ্ধার পাইবার ক্ষীণ আশাটুকুও যে একেবারেই বিলীন হইয়া যাইবে।—বীণা ইহার গাড়ীতে উঠিবার চাইতেও বড় ভুল বুঝি এবার করিয়া বসিল—শয়তানের বিবেকে যে নাড়াটুকু দিয়া তাহার বিবেককে মাত্র জাগাইয়া তুলিতেছিল—এত কাছে আসিয়া নিটোল শুভ্র হাতের নরম স্পর্শে জাগাইয়া তুলিল তাহার এর দুর্দ্দমনীয় পশু-ক্ষুধাকে। আত্মরক্ষার্থে দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সে হাত সে চাপিয়া ধরিল, সে হাতই তখন তাহাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে লাঞ্ছনার পথে। অসহায় বীণা এদিক ওদিক তাকায়—হাতের কাছে কিছু একটা পাইলে তাহা দিয়া আঘাত করিবে লোকটার মুখে। কিন্তু শুধু হাতের কাছে নয়, সমস্ত ঘরেই নরম কার্পেট ও ততোধিক নরম ফরাস ছাড়া আর কিছুই নাই। আত্মরক্ষায় উন্মত্ত হইয়া বীণা লোকটার মুখখানা বীভৎস চাপে কামড়াইয়া ধরে। কিন্তু আঁকড়াইয়া থাকিবার মত এমন জোর তার অনাহার-ক্লিষ্ট আতঙ্কগ্রস্ত শরীরে তখন কোথায়? লোকটার বলিষ্ঠ হাতের দুই-তিন ধাক্কাতেই দাঁত তার আলগা হইয়া আসে—ছিট্‌কাইয়া গিয়া জ্ঞানহারা বীণা লুটাইয়া পড়ে। ফরাসের উপর।

পরদিন অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙিয়া গেলে প্রথমে বীণার মনে হইল মাথাটা তার একেবারেই শূন্য—হাত-পা যেন আয়ত্তের বাহিরে। সে কোথায় আছে—কাল কি ঘটিয়াছিল—কিছুই প্রথমটা দুর্ব্বল মাথায়, দুর্ব্বল শরীরে সে ভাবিয়া উঠিতে পারে না—টানিয়া মেলিতে পারে না ক্লান্ত দু'টি চোখের পাতা। জাগিয়াও তাই সে পড়িয়া

থাকে অসাড় হইয়া। সমস্ত দেহে শুধুমাত্র একটি প্রবৃত্তির উপস্থিতি এই অসাড় দেহ-মনেও যা সে টের পায়—সেটি হইতেছে—প্রচণ্ড ক্ষুধা। এত তীব্র ও নগ্ন তার চাহিদা যে, যে-লাঞ্ছনার কথা মনে হইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইবার কথা—সেই লাঞ্ছনার কথাও পিছনে ঠেলিয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদ্য বস্তু কিছু চাই-ই—কিন্তু আসিবে কোথা হইতে? বীণা নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে—কি হইবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া? কানে আসে মা ও ছোট ভাইটির কথোপকথন...

"কাল রাতে দিদি কখন এসেছিল মা?" অনেকক্ষণ মা'র সঙ্গে জাগিয়া থাকিয়া শেষে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মা'র জবাব শুনিবার জন্য প্রশ্নকর্তার-চাইতেও উৎকর্ণ হইয়া ওঠে বীণা।

মা বলেন, "তা রাত অনেকই হবে। ঘড়ি তো নেই, সময় বলব কি করে? ঝড়-বৃষ্টির জন্য আট্‌কা পড়ে গিয়েছিল বন্ধুর বাড়ী, তারাই শেষে গাড়ী দিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।"

বীণা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—লোকটা তবে সে রাত্রিতে মাকে ইহাই বুঝিয়াছিল! নিশ্চয়ই বেশ গুছাইয়া বলিতে পারিয়াছিল—মা বিশ্বাস করিয়াছেন। করিবেনই তো—এ ছাড়া আর কিছু যে সম্ভব, এমন কথা সে নিজেই কোন্ আর ভাবিতে পারিত—না কেউ পারে!

মা'র জবাব শুনিয়া রতন উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া ওঠে, "বন্ধুর বাড়ী ছিল দিদি? নিশ্চয়ই খুব খাইয়ে দিয়েছে দিদিকে—না, মা?"

"কি জানি। সে কথা তো কিছু বলেনি বীণা।" অনাহারক্লিষ্ট পুত্রের লোভাতুর প্রশ্নে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে যেন নিজে নিজেই বলেন, "অন্ন নেই, বস্ত্র নেই—এ কেমন স্বাধীনতা এলো!"

কিশোর রতন পত্রিকার সস্তা বুলি আওড়ায়, "শিশু-রাষ্ট্র যে মা।"

ছোট্ট সংসারটির তিনটি প্রাণীই জাগিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু কিছুই কাহারও করিবার নাই। ভাইটিকে স্কুলে ভর্তি করিবার সামর্থ নাই—নাই সামর্থ বই কিনিবার, নাই তাই তাহার পড়িবার—স্কুলের যাইবার তাড়া।

ভাঁড়ার শূন্য—নাই তাই মায়ের কর্ম্মব্যস্ততা। বীণারও করিবার কিছুই নাই, নাই পড়া, নাই চাকরী—সমস্ত সংসারটি যেন কিছু করিবার অভাবে হাত পা ছড়াইয়া অলস হইয়া ঝিমাইতেছে। বীণা উঠিয়া একটি চেয়ারে শরীর এলাইয়া বসিয়া ভাবে—এক, কিছুই করিবার থাকে না যাহাদের অনেক আছে, আর কিছুই করিবার থাকে না যাহাদের কিছুই নাই! বীণা আড়মোড়া দিয়া সোজা হইয়া বসে, ভাবে কিছু টাকার ব্যবস্থা না করিলেই যে নয়। হাঁটা পথে যাইয়া ধার চাওয়া যায় এমন একটা ঠিকানা বাহির করিতে সে তাহার হাতব্যাগটা টানিয়া লয়—ছোট্ট নোটবইখানার জন্য। ব্যাগে খুলিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়—ব্যাগে যে অনেক টাকা! তাড়াতাড়ি 'ফ্যাসনার' টানিয়া ব্যাগটার মুখ সে বন্ধ করিয়া ফেলে— যেন কাহারও দেখিয়া ফেলিবার ভয়ে ও আতঙ্কে। ...বুকের অসহ্য ধক্‌ধকানিটা না থামিলে কিছুই ভাবিয়া সে স্থির করিতে পারিবে না। বুকটা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়—না হইলে যেন হৃৎপিণ্ডটা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে। এত বড় নোটের তাড়া যে বীণা জীবনেও একসঙ্গে দেখে নাই—কি করিবে এখন সে এ টাকা দিয়া? লোকটার মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে? পাইবে কোথায়? ঘৃণ্য টাকা ঘৃণার সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলিবে? দিবে পোড়াইয়া?—কি লাভ হইবে? দান করিবে পথের ভিক্ষুককে?... তাহারা তো পথের ভিক্ষুকের চাইতেও অসহায়!

"দিদি—"

বীণা রতনের ডাকে চমকাইয়া চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল।

"কাল রাতে বন্ধুর বাসায় খেয়ে এসেছিলে? ইন্দ্রাণীদির বাসায় ছিলে? কি কি খেলে?"

বীণা স্থিরদৃষ্টিতে রতনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে—খাওয়ার অভাবে এতটুকু ছেলে খাবারের কথা শুনিয়াই খুশী হইতে চায়,—তৃপ্ত করিতে চায় অতৃপ্ত খাওয়ার সাধ। বীণা, বলে, "আমি কি খেয়েছি তা শুনে তোর তো কোন লাভ হবে না? তোর কি খেতে ইচ্ছে যায় বল?"

রতন নীরবে অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

বীণার এত করুণ মনে হয় রতনের মুখের এই হাসি—সে যেন দেখিতে পায় অসংখ্য ছেলের মুখের প্রতিবিম্ব রতনের মুখের হাসিতে। যাহার জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য খাদ্যটুকুও না পাইয়া তরুণ মনের সজীব রঙ্গীন আশা-আকাঙ্ক্ষার অকাল-সমাপ্তি-রেখা টানিয়া দিয়া ত্যাগ করে শেষ নিশ্বাস। —বুকটা তাহার মোচড় মারিয়া ওঠে .... না, রতনকে সে এ পথে ঠেলিয়া দিতে পারিবে না। খাদ্য দিয়া শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিবে সুস্থ, সবল যুবক—মরিবার পথে নয় — দিবে বাঁচিবার পথে অগ্রসর করিয়া।...ব্যাগটা সে টানিয়া আনে—দশ টাকার একখানা নোট রতনের হাতে দিতে দিতে বলে, "একটা কাজ হয়ে গেছে রে রতন, যা তোর খুশীমত খাবার নিয়ে আর—দেখি কত খেতে পারিস্ তুই। যা চট করে।"

কাজ হওয়া এবং অগ্রিম পাওয়ার সংবাদে মা আনন্দে আত্মহারা হইয়া ওঠেন। "সত্যি! এতক্ষণ বলিসনি বীণা। তা কত দিয়েছে অগ্রিম? শ-খানেক হবে!" সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন মা'র মন বলিয়াই বুঝি উঁকিটুকুও মারে না—তিনি যেন আনন্দে ছেলে-মানুষ হইয়া উঠেন। আব্দারের সুরে বলেন, "আর কিন্তু আমি সেদ্ধ চাল খাব না, বীণা। রান্নাটাও করব ভিন্ন হেঁসেলে—অনাচার যা করেছি—অনুপায় হয়েই করেছি, ভগবান তা বুঝবেন।"

"তা ভগবান বুঝবেন—অন্ততঃ বুঝতে কষ্ট হওয়া তো উচিত নয়। আর হলেই বা আমরা ছাড়ব কেন? জেনে-শুনে নিজের হাতেই তো সব করাচ্ছেন—পুণ্যটা সুদ-শুদ্ধ আদায় করে তবে ছাড়াছাড়ি। তিনি জবাব চাইবার আগে আমরাই জানতে চাইব—কেন তিনি দেন পাপের পথে ঠেলে—কেনই-বা বাধ্য করেন পাপের অন্ন খেতে!"

"ছিঃ, বীণা ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে নেই।"

"কেন নেই মা। তিনি বুঝি ঠাট্টা-তামাসা করতেই ভালবাসেন, শুনতে নয়?" শ্রদ্ধাহীন তিক্ততার সঙ্গে কথা কয়টি বলিয়া বীণা সরিয়া গেল মা'র কাছ হইতে। নিজের জীবন দিয়া যে সত্য সে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি সে শুনিতে চায় না।

ইন্দ্রাণীর ঐকান্তিক চেষ্টায় কিছু দিনের মধ্যেই তাহার অফিসে কর্ম্মে বহাল হইয়া অভাবের দুঃখ-দুর্ভাবনা হইতে বীণা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে দিনের ঘটনা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার মত কখনও কখনও হঠাৎ উঁকি মারিয়া—আতঙ্কিত ঘর্ম্মাক্ত তাহাকে জাগাইয়া দিয়া যাওয়া ছাড়া আর বেশী কিছু উৎপাত করে না। যে ঘটনার সাক্ষী একমাত্র নিজে—সে ঘটনা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা এমন কি আর কঠিন!

আলো-আঁধার, জল-ঝড়-বন্যা, আগ্নেয়গিরির লাভা বৃষ্টি—প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া মানিয়া লইয়া, ভ্রূক্ষেপহীন চিত্তে পার হইয়া সময় চলে তার নির্দিষ্ট গতি-পথে—ঘটনার আকস্মিকতা ক্ষণিকের জন্যও তাহাকে স্তব্ধ নিশ্চল করিয়া দাঁড় করাইতে পারে না। তাই চলার চুল-চেরা হিসাব তার ক্রটিহীন — তার সেই চলার ক্রটিহীন নিজস্ব পদ্ধতিতে সময়—এক-একটি ঋতু পার হইয়া গিয়া পৌঁছিল আশ্বিনের স্বচ্ছ স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল দিনে।

॥ দুই ॥

হল ঘরে পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া রিডের উপর টুংটাং করিয়া চলিয়াছে ইন্দ্রাণী। উদ্দেশ্য বিহীন টেপা হইলেও সুর আছে। দূরে থাকিলে সুর শোন, সামনে থাকিলে আঙ্গুলের লীলায়িত ভঙ্গি দেখ—দু'টাই সমান উপভোগ্য। আঙ্গুল তাহার সুরের জাল বুনিয়া চলিলেও মন চলিয়াছে চিন্তার জাল বুনিয়া। বিষয়-বস্তুও হয়ত পিয়ানোর উপর আঙ্গুল টিপিয়া ভাবিবার মতই হইবে—অর্থাৎ তেমন কিছুই নয়।

অনেক আছে ইন্দ্রাণীর—নাই তাই তার সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে কর্ম্মব্যস্ততা। বিরাট বাড়ী তার বিরাটত্বের গাম্ভীর্য্য, মূল্যবান আসবাবের প্রাচুর্য্য ও বাবুর্চ্চি খানসামার দলটি সমভিব্যাহারে আভিজাত্যের গৌরব লইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। অন্দর-মহলের মহা মূল্যবান পরদা হইতে গেটে দণ্ডায়মান তকমা-আঁটা দারোয়ান — সবাই নীরব আভিজাত্যের ঘোষণা করিতেছে—'আমরা বিশেষ কেউ—' বলিয়া। পঞ্চাশ জনের আরাম ও সুখ-স্বচ্ছন্দ বাসের আয়োজনে বাস করে কিন্তু দু'টি ব্যক্তি—ইন্দ্রাণী ও তাহার স্বামী শিবনাথ।

ইন্দ্রাণীর এই বাজনা অনেকদিন ধরিয়াই শিবনাথকে ত্যক্ত করিতেছিল -সে উঠিয়া আসিয়া ইন্দ্রাণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলে, "তখন হতে বসে বসে কি ঠুং-ঠাং করছ? ভাল লাগে না। উঠে এসো, কথা আছে।"

"ঠুং-ঠাং নয়, টুং-টাং।" ইন্দ্রাণী উঠিতে উঠিতে বলে, "কিন্তু সুরে-স্বরে-ভঙ্গিতে যে পর্য্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে কথা শুনতে ডাকছ, তাতে কথা শুনবার আগ্রহ আমার চলে যাচ্ছে কিন্তু!"

"আমার কথা শুনবার আগ্রহ কখনই বা তোমার থাকে? হয় পিয়ানো, বই নয়ত বাহির—এ তিন নিয়েই তো তোমার জীবন—সেখানে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির স্থান কোথায়?"

"আর তোমার জীবন কি কি নিয়ে? আমার জীবন সম্বন্ধে যখন একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা, নিজেরটা সম্বন্ধেও তা আছে নিশ্চয়ই?"

"আমারটা তুমিই বল—আমি বললে হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না।"

" তোমারটা আমি স্ত্রী হয়েও জানি না। জানি না তার কারণ —কিছুটা তোমার নিপুণ কর্ম্মকুশলতার গুণে, কিছু বা আমার স্বভাবের লুকানো কর্ম্ম-তালিকার খবর সংগ্রহের প্রতি বিতৃষ্ণার ফলে। তোমার চোখের তেরছা বাঁকা দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার পিছু নিতে চেষ্টা করে, আর আমি যখন তাকাই—তাকাই পুরো দৃষ্টিতে। মানুষের মনুষ্যত্বে আমি বিশ্বাস রাখি।"

"খালি বড় বড় কথার প্যাঁচ সর্ব্বদা অত্যন্ত বিরক্তিকর"—শিবনাথের মুখ বিরক্তিতে যেন বিষাইয়া ওঠে। বলে, "কিন্তু পুরো দৃষ্টিতে তাকানোর সময়ের অভাবে তাকানোই যে আর হয়ে ওঠে না।"

"হয়ত তাই, কিন্তু যে কথা বলতে ডেকেছিলে তাই বল। ঝগড়ার বিষয়-বস্তুটা পাল্‌টিয়ে নেওয়া যাক্।"

"আমি যে কথা বলতে ডাকছি তাও 'ঝগড়াই'—এই তোমার স্থিরবিশ্বাস?"

"স্থির না হলেও একেবারে অ-স্থির নয়। সর্ব্বদাই যা হয়ে থাকে সেটাই তো মনে আসা সম্ভব। তা কি বলবে চট্‌পট্ বল—" চোখ তুলিয়া দেয়াল-ঘড়িটা দেখিয়া লইয়া বলে, "স্নান খাওয়া সব পড়ে—অফিসের সময় যে প্রায় হয়ে এলো।"

"এ কথাটাই আমার জিজ্ঞাস্য—চাকরী তুমি কেন করছ?—এ তোমাকে ছাড়তেই হবে। কি প্রয়োজন তোমার ঘড়ি-ধরা দশটা-পাঁচটায়?"

"এক কথা নিয়ে বার বার বিরক্ত করা ভাল লাগে না। অনেক বার তো বলেছি—অপ্রয়োজনবোধে ছাড়তে হলে তোমারও অনেক কিছুই ছাড়া উচিত। তুমি যেদিন ছাড়বে তোমার অপ্রয়োজনীয় সব অভ্যাস — আমিও ছাড়বো সেদিন আমার অপ্রয়োজনীয় চাকরী—তার আগে নয়।"

"দু'টো এক কথা হলো?" শিবনাথ যেন খেঁকাইয়া ওঠে।

নির্ব্বিকার নিরীহ মুখ-ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণী জবাব করে "না, এক কথা তো হলোই না—চাকরী-অভ্যাস আর বদ-অভ্যাস যে একই কথা নয়। এতো জানা কথা। তবু তোমার মন্দ অভ্যাস ছাড়াতে আমার না হয় একটা ভাল অভ্যাসই ছাড়তে হলো। তা আমার কথায় রাজী হলে আজকেই আমি কাজে জবাব দিয়ে আসতে পারি।" জিজ্ঞাসু কৌতুকোজ্জ্বল চোখে ইন্দ্রাণী শিবনাথের দিকে তাকায়।

"যত উদ্ভট বুদ্ধি মাথায় আসে তোমার। আমার মদ ছাড়ার সঙ্গে তোমার চাকরী ছাড়া! এ কি একটা কথা!"

"তবে তুমি মদ ছাড়, আমার কাজটি থাক। ওঃ, তাও তো ঠিক কথা হলো না। তবে আমি কাজ ছেড়ে ঘরে বসি, সন্ধ্যার প্রতীক্ষা আমার ঘড়ির প্রতিটি বিন্দুতে ধীর-মন্থর পা ফেলে ফেলে গড়িয়ে যাক্ মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত! তুমি মদ খাও, রাত্রে খেয়াল-খুশী মত ফেরো না ফেরো, যা মন চায় তাই কর কেমন? এবার বোধ হয় কথাগুলো খুব ভাল যুক্তিসঙ্গত কথার মত ঠেকছে?"

শিবনাথ গলার সুরে বিদ্রুপ মাখাইয়া বলে, "না, খুব ভাল ঠেকছে না—আমার জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকবে এ কি হতে পারে! তোমার প্রতীক্ষায়ই বসে থাকে কত কত লোক!"

"তাদের ভেতর তুমি নেই নিশ্চয়ই? যার স্বামী কি স্ত্রীর প্রতীক্ষা কোন দিনই করলো না, সে স্ত্রীকে অন্য পথ দেখতে হয় বৈ কি—অন্তত দেখা উচিত।" ইন্দ্রাণী চলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলে, "প্রতীক্ষা যত দিন তুমি না করছ আমার প্রতীক্ষাও তুমি পাচ্ছ না। কিন্তু আর নয়, এই অর্থশূন্য কথায় কিচিরমিচি না করাই ভাল।" — ইন্দ্রাণী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

শিবনাথ ইন্দ্রাণীর নিষ্ক্রমণের দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে একটি কৌচে বসিয়া পড়িয়া গুম হইয়া শুনিতে থাকে ইন্দ্রাণীর কণ্ঠের ভাসিয়া-আসা গানের পর গান। শিবনাথ উঠিয়া হাত দু'টা পেছনে রাখিয়া ঘরময় অস্থির পায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতে থাকে।

"আকাশ বাতাস কেমন করে জানলো,
কাহার গলে দিলেম তুলে আমার বরমাল্য—"

—গান করিতে করিতে বারান্দায় গিয়া ইন্দ্রাণী রেলিঙে ঝুঁকিয়া বাবুর্চ্চিখানার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে—"বাবুর্চ্চি, খানা লে আও।"

খাবার টেবিলে আবার দু'জনে সাক্ষাৎ হইলে শিবনাথ বলে, "আকাশ-বাতাসেরও জানবার কথা নয়—এমনি ভাবেই একেবারে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছ কার গলে?"

প্রথমটা ইন্দ্রাণীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সে তার বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া শিবনাথের দিকে তাকায়। কিন্তু হঠাৎ অর্থটা বুঝতে পারিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে, "সত্যি, এ ভাবে এক জনের গলার মালা পরিয়ে দিলে মন্দ হয় না কিন্তু! গভীর রাত্রিতে একান্ত কাছে গিয়া পরিয়ে দেওয়া মালার খবর দু'জনার বাইরে আকাশ-বাতাস মানুষ কেউই যখন জানছে না—এমন একটা নিতান্তই দু'জনার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকাও উচিত নয়। আবার সে হাসিয়া উঠিয়া বলে, "বাস্তব পথের হদিশ না পেয়ে শেষে বুঝি গানের পথে পা বাড়িয়েছ? এ পথে সত্য না মিললেও জ্বলবার ও জ্বালাবার বিষয়বস্তুর অভাব হবে না।" তার পর একটু সময় নীরব থাকিয়া বলে, "কেন

জ্বলছ নিজে—কেনই বা জ্বালাচ্ছ আমাকে? এসো, তুমি শোনো আমার কথা—আমি শুনি তোমার। এক তরফা শোনা আমার দ্বারা সম্ভব নয়—এ জানা তোমার হয়ে গিয়ে থাকবে।" কথার শেষে চোখ তুলিয়া শিবনাথের বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দ্রাণী হাতের কাঁটা চামচ রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলে, "কিছুই না দিয়ে সব পাওয়ার অভ্যাস তোমাদের মন্দ স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে—লজ্জাহীন চাওয়ারও তাই তোমাদের শেষ নাই। দেও—নেও, নয় তো পাওয়ার ঘর শূন্যই হইল।"

"আমি অপরের ঘর তা দিয়ে ভরিয়ে তুলি।" ভ্রূ কুঁচকাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া শিবনাথ বলে।

'নিজের ঘরে যা এলো না, কার ঘরে তা গেল সে দিকে নজর না দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ তো নিশ্চয়ই—রুচির-পরিচয়ও বটে" এবার উত্তেজিত ইন্দ্রাণী সশব্দে চেয়ার পেছনে ঠেলিয়া খাওয়ার প্লেট ঠেলিয়া উঠিয়া পড়ে।

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে শিবনাথের আবার দেখা হয় সিঁড়ির গোড়ায়। সাক্ষাৎটা যেন হঠাৎই হইয়া গিয়াছে—শিবনাথ সে ভাবটাই দেখায়, কিন্তু ইন্দ্রাণী বুঝতে পারে কিছু বলিবার জন্যই শিবনাথের এ ছল করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা। তাহার দুঃখ হয়, শিবনাথ না ছাড়িবে নিজের পথ—না হইবে নিজে সুখী, না পাইতে দিবে তাহাকে সুখ।

ইন্দ্রাণী কাছে আসিতেই কেসের উপর সিগারেটটা ঠুকিতে ঠুকিতে শিবনাথ বলে, "কখন বাড়ী ফিরছ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"যাঃ নিশ্চয়ই পার—তা তুমি কখন ফিরছ?"

শিবনাথের ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে চায়, "আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?"

"স্বামী-স্ত্রী। এত দিনে ছাই তাও জান না, তাই তো সমস্যা?" ইন্দ্রাণী নকল গাম্ভীর্য্যে বলে।

শিবনাথের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতে চায়। কিন্তু গম্ভীর থাকিয়াই সে বলে, আমার সঙ্গে তো তোমার কথা চলতে পারে না; অফিসের পর আমি ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ী আসি যে।"

"আমিও যে তাই আসি। কি হবে একা একা বসে থেকে।"

"কোথায় যাও?"

"তুমি কোথায় যাও?" কিন্তু জবাবের জন্য ইন্দ্রাণী অপেক্ষা করে না। বলে "দেখ, এ সব কথা-কাটাকাটিতে অনর্থক সময় নষ্ট। আসল কথা, তুমি কোথায় যাও না-জানা পর্য্যন্ত আমারটাও তোমার জানা হবে না, তুমি ক'টায় ফিরছ না বললে আমিও বলতে রাজী নই। তুমি কখন ফিরছ জানলে তোমার আগে নিশ্চয়ই আসব।"

"আমি যদি রাত দুটো-তিনটায় ফিরি?" গম্ভীর হয়ে শিবনাথ বলে।

"তা আমারও একটা-দুটো হতে পারে বৈ কি।"

নিরুপায় হয়ে শিবনাথ দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরে, তার পর যেন ইন্দ্রাণীকে বাজাইয়া দেখিবার জন্যই বলে, "পাঁচটায় আসব আমি, আসবে তুমি চারটায়?"

"আসব।" ঘড়ি দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলে, "ওঃ আর সময় নাই; চলি। দ্রুত পায়ে ইন্দ্রাণী তর-তব করে সিঁড়ি নামিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। শিবনাথকে ভাল করিবার সব চেষ্টাই যখন সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রাণীর ব্যর্থতায় দাঁড়াইল। তখন হইতেই ধীরে ধীরে ব্যবধান বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক আজ এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইন্দ্রাণীর গাড়ীর শব্দ দূরে মিলাইয়া গেলেও শিবনাথ তেমনি নিশ্চল হইয়াই দাঁড়াইয়া থাকে। স্ত্রী এমন ভাবে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইবে— এ কি সে কল্পনা করিতেও পারিয়াছে? গাড়ী, বাড়ী, জড়োয়ার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ-বিস্ময়ে মজিয়া থাকিবে—কর্ত্রীত্ব করিবে সর্ব্ব বিষয়ে শুধু তাহাকে বাদ দিয়া,—কিন্তু সব কিছুই যেন উল্টা হইয়া গেল। তাহার সব কর্ত্রীত্ব শুধু শিবনাথকে লইয়া। শিবনাথের খুসী মত চলা দূরের কথা, নিজের অজ্ঞাতে শিবনাথই যেন বাধ্য হইয়া চলিয়াছে ইন্দ্রাণীর ইচ্ছা মত। কেমন করিয়া এই দুর্দ্ধর্ষ মেয়েকে সায়েস্তা করা যায়, শিবনাথ ভাবিয়া পায় না।

অফিসের ঘড়িতে চারিটা না বাজিতেই ইন্দ্রাণীর ব্যস্ততা দেখিয়া বীণা জিজ্ঞাসা করে, "এত তাড়া? আজ কোথায় যাওয়া হচ্ছে—ছবি দেখতে?"

"না ভাই, আজ যাওয়া হচ্ছে বাড়ী।"

"হঠাৎ আজ বাড়ী ফিরবার এত তাড়া কেন? কেউ আসবেন?"

"হ্যাঁ, স্বামী।" ইন্দ্রাণী অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলে।

"স্বামী!" বীণার এই সীমাহীন বিস্ময়ের নামই বুঝি আকাশ হইতে পড়া—"তোমার বিয়ে হয়েছে না কি? স্বামী থাকেন কোথায়?"

"থাকেন এখানেই"—বলিয়া হাত দিয়া মাথার ফোলানো-ফাঁপানো চুলের গুচ্ছ ফাঁক করিয়া সিঁদুরচিহ্নটুকু দেখাইয়া বলে, "এর চাইতে বেশী স্বামী-থাকার বিজ্ঞাপন নিয়ে আজকালকার মেয়েরা চলা পছন্দ করে না। সর্ব্বাঙ্গ চিহ্নিত হয়ে দৃষ্টিপাতের নিষেধের নিশানা আঁটার চাইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করাটাই আমাদের পছন্দ বুঝলে?"

বীণা হাসিয়া বলে, "তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু কলেজ ছাড়ার অনেক দিন বাদেই যদিও তোমার সঙ্গে আবার এই দেখা—কিন্তু তাও তো দেখা হয়েছে মাস পাঁচ-ছয় হবে? বলেছিস্ এক বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিস্। যেতে চাইলে এড়িয়ে গেছিস, কিন্তু কেন?" বীণার বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই কাটিতে চায় না।

খোঁপায় কাঁটাগুলি ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে দিতে ইন্দ্রাণী বলে, "বাড়ী নিয়ে যাওয়া এড়ানোর কারণ বিয়ে ব্যাপারটা তাহলে আর লুকানো সম্ভব ছিল না। আর তা জানা মানেই আমার চাল-চলন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠা। তার পর আরম্ভ করবি, উচিত-অনুচিত বোধের উপদেশ। রমেশ বাবুর সঙ্গে ভাব জমছে ভেবে তুই নির্ব্বাক আছিস, আমাকেও বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করছিস। কিন্তু আজ কেন যে হঠাৎ সব বলে ফেলতে ইচ্ছে গেল বুঝে পাচ্ছি না।"

"হ্যাঁ, আমি তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু এখন কি ভাবব বুঝে উঠতে পারছি না?"

"তোমার 'বুঝে উঠায়' সাহায্য আর এক দিন আমিই করব—আজ নয়।"

বীণা তার আগের কথার রেশ ধরিয়াই কিন্তু বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া চলে, "কি এর অর্থ? রমেশ বাবুকে নিয়ে কি তুই তবে খেলা করছিস?"

"খেলাই। হয়ত তাই। কিন্তু সত্যিকারের জীবনসঙ্গী পাওয়ার চাইতে একটুও কম কঠিন নয় বীণা মনের মতো খেলার সাথী পাওয়া। খেলার আনন্দও তুচ্ছ নয়, সে আনন্দ দিতে পারাতেও কৃতিত্ব আছে বৈকি। এ শুধু সময় কাটান—ভাল আমার কাউকেই লাগে না।" কথার শেষে ভাল না-লাগার ভঙ্গিতে চেয়ার পেছনে ঠেলিয়া ইন্দ্রাণী উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমার বিয়ের গল্প আর এক দিন বলব—সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দর চেহারা মুগ্ধ করেছিল—তার উপর পেছনে ছিল ঐশ্বর্য্যের ছটা। কিন্তু যখন বোঝা গেল রূপ আর রূপার বাইরে আর কোন ঐশ্বর্য্যের গৌরব এঁর নেই—যা আমার ভাল লাগাকে স্থায়ী ভালোবাসায় নিয়ে দাঁড় করাতে পারে, তখন এ বোঝা-বুঝি অর্থহীন—বিয়ে হয়ে গেছে। তবে রুচি-জ্ঞানের প্রশংসাটা করি—এটা না থাকলে আমায় ঘরে আনবেন কেন? কি বলিস?" ইন্দ্রাণী বেশ একটু শব্দ করিয়াই হাসিয়া ওঠে। তার পর বলে, "এটা জেনে রাখবি বীণা, ভাল ছেলেরা অভিজ্ঞতাহীন জীবন নিয়ে পড়ে মন্দ মেয়েদের ফাঁদে—করে মন্দ মেয়ে বিয়ে। আর মন্দ ছেলেরা জানে—কাদের নিয়ে খেলা করে চলে আসতে হয় আর কাকে হয় ঘরে আনতে। কিন্তু আর নয় —আর এক দিন চেষ্টা করা যাবে বাকীটার। আজ পাঁচটায় বাড়ী যাওয়া চাই।"

'ইন্দ্রাণী বীণার কাছে বিদায় লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসে। ইন্দ্রাণীর অপসৃয়মান গাড়ীর দিকে তাকাইয়া বীণা ভাবে, রহস্যময়ী নারী আখ্যায় আখ্যায়িত করার মত মেয়েই বুঝি ইন্দ্রাণী. সে যাক্—কিন্তু তার যে কিছু বলবার ছিল ইন্দ্রাণীকে।

রমেশ ব্যস্ত ভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "ইন্দ্রাণী কোথায়?"

"বাড়ী চলে গেছেন।" বীণা রমেশের দিকে তাকাইয়া ভাবে, কে জানে এও জানে কি না ইন্দ্রাণী বিবাহিতা।

"বাড়ী চলে গেছেন! আমার সঙ্গে যে কথা ছিল ছবি দেখতে যাবার।" কাঁধ দু'টা ঝাঁকাইয়া রমেশ একটা চলতি অঙ্গভঙ্গি করিয়া চিন্তিত মুখে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলে, "দু'খানা টিকিট কেটে ফেলেছি—কি করি—আপনি যাবেন? ছোট্ট ছবি-তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে। একেবারে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসব আমি—যাবেন?"

"ধন্যবাদ, আমার শরীরটা একেবারেই ভাল নয়" — ভদ্রতাসূচক হাসি হাসিয়া বীণা অসমাপ্ত আপত্তিতে কথা শেষ করে। আবার সেই কাঁধ ঝাঁকান ভঙ্গি করিয়া, হাত উল্টাইয়া রমেশ চলিয়া গেল। রমেশের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সেও বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হয়। শরীরটা তার কিছু দিন হইল ভাল যাইতেছে না—অফিস না করিলেই নয়, তাই আসা। ভীড়ের চাপ হইতে গাড়ীতে যাইতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু সেদিনের ঐ গাড়ী-ঘটিত ঘটনার পর হইতে তাহার যেন গাড়ী-আতঙ্ক রোগে পাইয়া বসিয়াছে—গাড়ীর পাদানীতে দাঁড়াইয়া ভিতরে গা গলাইবার আগে গোটা শরীরটা একবার তার শিহরিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিবেই —হোক না তা ইন্দ্রাণীর গাড়ী,

থাক না ইন্দ্রাণী সঙ্গে।... বীণা ট্রামের পথে পা বাড়াইল। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তার অসুস্থতার শ্রান্তিতে ও চিন্তার গুরুভারে ভারাক্রান্ত।

ইন্দ্রাণী বাড়ী পৌঁছাইয়া সিঁড়ির কাছে থামিয়া হাতের ঘড়িটা একবার দেখিয়া লইল—ঠিক আছে। মূল্যবান কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি তরতর করিয়া পার হইয়া উঠিয়া গেল উপরে—হাতের ব্যাগটা বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঘুরিয়া-ফিরিয়া বাইরের শাড়ী-কাপড় পালটায় আর তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে গুণ গুণ করিয়া চলে—

"আজ কোন কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধ-গ্রন্থ গীত—এসো তুমি প্রিয়ে..."

স্নানের ঘরে যাইয়া বাথ-সল্টমিশ্রিত ঈষৎ সবুজাভ জলে গা ডুবাইয়া স্নান শেষ করিয়া প্রবেশ করে পাশের কাপড় ছাড়িবার ঘরে। ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া সযত্নে পরিপাটীরূপে প্রসাধন শেষ করে। পরে ধীর-মন্থর অলস গতিতে আবেগ-ভরা কণ্ঠে—

আজন্ম সাধন ধন সুন্দরী আমার,
কবিতা কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে বসো—"

আবৃত্তি করিতে করিতে বারান্দা পার হইয়া বসিবার ঘরের দিকে রওনা হয়।

—"ওমা তুমি এখানে বসে? কখন এলে?" ঘরে ঢুকিয়া আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত শিবনাথকে দেখিয়া সত্যি ইন্দ্রাণী ভীষণ চমকাইয়া ওঠে। শিবনাথ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকেই তাকাইয়া আছে দেখিয়া ইন্দ্রাণীর মনে হয় — সন্দিগ্ধচিত্ততা, অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তির পরিবর্তে সে দৃষ্টি যেন আজ দার্শনিকের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ। কাছে আসিয়া বলে, "কথা তো এরকম ছিল না? প্রথমে আমার আসাটা হতে দিলে না কেন?"

"না হয় আগে আমিই এলাম।"

ইন্দ্রাণী ছেলেমানুষের মত মাথা দোলাইয়া বলে, "প্রথম দিনের বউনিটা এ রকম হতে না দিলেই ভাল হতো — তুমি এসে বসে থাকবে, শেষে আমি আসব!"

শিবনাথ ইন্দ্রাণীর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসে—"আগে এসে বসে আছি বলেই না তোমার মিষ্টি আবৃত্তি শুনতে পেলাম। তুমি তো অরসিক ভেবে আমায় দূরেই ঠেলে রাখ। ভাল জিনিষ আমারও ভাল লাগে বুঝলে?

গান ও কবিতা ইন্দ্রাণীর নেশা। সময় অসময় নাই, যখন যেটার ঝোঁক চাপে করিয়া যায় একের পর এক কিন্তু শিবনাথের কিছুমাত্রও ভাল লাগিবার তথ্যটা এতদিন তার অজানাই ছিল—ভুলেও কোনদিন ভাবে কিংবা ভাষায় শিবনাথ বুঝায় নাই তার এই ভাল লাগিবার সংবাদ। কিন্তু সে জন্য আজিকার এই ভাল লাগাটা হয়ত মিথ্যা নয়—হয়ত তার মনের ভাল লাগিবার অনুভূতির স্পর্শের মত শিবনাথের মনেও তেমনি কোন অনুভূতির স্পর্শ লাগিয়াছে, না হইলে তাহার প্রতীক্ষায় শিবনাথের এই বসিয়া থাকা—এ কি সম্ভাব্য ঘটনা!

পরের দিন অফিসে যাইয়া ইন্দ্রানী যেন তেমন করিয়া কাজে মনঃসংযোগ করিয়া উঠিতে পারে না। মনটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া যাইয়া উপস্থিত হইতে চায় কেবলই কালকের সন্ধ্যাটিতে। বেশ কাটিয়াছে সন্ধ্যাটি। শিবনাথকে যে সে ভালবাসে—এতে যেন মনের ভিতরটা তাহার পড়া হইয়া যায়। ভাল না বাসিলে কি এক জনের সঙ্গ ও সাহচর্য্যে মন এমন ভাল লাগিবার আবেশে কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে! স্বামীর স্বাভাবিক সহৃদয় মাধুর্য্য-পূর্ণ ব্যবহারটুকুর জন্যও নারীর মন কি কাঙ্গাল হইয়া থাকে না।... হাতের কাজ রাখিয়া সে চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া বসিয়াছে এমন সময়ে বীণা আসিয়া ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে এমনই ভাবে ইন্দ্রাণীর পাশের চেয়ারটায় বসিল, যেন শরীরের গুরুভার টানিয়া চলিতে সে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। চেয়ারে বসিয়া সে টেবিলের উপর মাথা রাখিল।

ইন্দ্রাণী উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া বলে, "কি হয়েছে রে বীণা? অসুস্থ বোধ করছিস? শুবি?"

বীণা হাত তুলিয়া ব্যস্ত হইতে নিষেধ করে।

ইন্দ্রাণী বসিয়া থাকে বীণার সুস্থ হইয়া উঠিবার অপেক্ষায়, "তোর শরীরটা কিছু দিন হতেই খারাপ যাচ্ছে—এ আমি লক্ষ্য করছি। শরীর নিয়ে অবহেলা ভাল নয়। ভাল ডাক্তার দেখিয়ে ব্যবস্থা নে বীণা!"

বীণা মুখ তুলিয়া মলিন হাসিয়া বলে, "আমার ব্যবস্থা দেওয়া ডাক্তারের হাতের বাইরে।"

—"এ কথার অর্থ।" ইন্দ্রাণী বিস্মিত ও আতঙ্কিত হইয়া ওঠে। থাইসিস্ নয় তো!"

—"এ কথার অর্থ বুঝিয়ে বলার স্থান এটা নয়। আমি আজ ছুটির ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি, তুইও যদি তাই নিস তো চল এক জায়গায় বসে চা খেতে খেতে বলি।"

ইন্দ্রাণী সম্মত হইয়া উঠিয়া গেল ছুটি লইয়া আসিতে। দুই বন্ধু ছুটি লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এমন সময় রমেশ আসিয়া সঙ্গ লইয়া বলে, "বেরুচ্ছ তোমরা? কালও যে এসে ঘুরে গেছি।"

—"আজও তাই যেতে হবে। দরকার আছে।" ইন্দ্রাণী চলিতে চলিতেই বলে।

কথাগুলোর জন্য তত নয়, ইন্দ্রাণীর কণ্ঠের নির্লিপ্ত ও অবহেলাজনিত সুরের আভাসে প্রথমটায় হক্‌চকাইয়া যাইবার পর রমেশ সচেতন হইয়া বলে, "এত দরকার দু'দিনের ভেতর যোগাড় করলে কোথা থেকে? তা বেশ! কিন্তু জবাবটা ইচ্ছে করলে ভাল করে দেওয়া চলত নিশ্চয়ই। না সে ইচ্ছেটাও নেই?"

—"না, নেই!"

—"ভাল করে কথা বলবার যখন সময়ের অভাব, তখন—তখন" রমেশ যেন কথা যোগাইয়া উঠিতে পারে না।

ইন্দ্রাণী অবহেলা ভরে রমেশকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকে। তার গতির সঙ্গে সমতা রাখিয়া অগ্রসর হইতে হাঁপাইয়া ওঠে বীণা।

পাংশুমুখে অবাক চোখ মেলিয়া রমেশ তাকাইয়া থাকে ইন্দ্রাণীর নিষ্ক্রমণের দিকে। ইন্দ্রাণীকে কোন সময়ই সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, আজও পারিল না! দুর্ব্ব্যবহার ইন্দ্রাণী বড় কাহার সঙ্গে করে না, তাহার সঙ্গেও করে নাই। তার বেশী কিছু কি ইন্দ্রাণীর ব্যবহারে সে কি কোন দিন পাইয়াছে? না। তবু সিনেমা বা চায়ের আহ্বানে কোন দিন সে বড় আপত্তি জানায় নাই! বাল্যকালের পরিচয়-সূত্র টানিয়া বাহির করিয়া সে "তুমি" বলিয়াছিল। ইন্দ্রাণীও আপত্তি করে নাই—করে নাই নিশ্চয়ই কিছু আসিয়া-যায় না বলিয়া। মুখের উপর রূঢ় হইয়া নিষেধ করিবার সঙ্কোচও হয়ত ছিল। ভাবের গভীরতার "তুমি" সম্বোধন এ নয়। কিন্তু কিছু দিন হইল ভিতরটা তাহার অগ্রসর হইবার দুর্দ্দমনীয় আগ্রহে দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিল—বুঝিতে পারিয়াই কি ইন্দ্রাণী আজ তাহাকে আঘাত হানিয়া দূরে সরাইয়া দিল? পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখটা মুছিয়া লইয়া রমেশ সিগারেট ধরায়; ভাবে, অন্ধের মত পথ চলিলে যেমন আছাড় খাওয়া অনিবার্য্য, তেমনি আঘাত পাওয়া অনিবার্য্য নারীর চরিত্র না বুঝিয়া অগ্রসর হইলে।

নারী-মন তুচ্ছ জিনিসও অবহেলা ভরে ফেলিয়া আসিতে কাঁদে। তাই বুঝি দু'টি নারী-মনই আঘাত দিয়া ফেলিয়া আসিবার বেদনায় কিছু ম্লান হইয়া পথ চলে। চৌরঙ্গীর একটা রেঁস্তরার কেবিনে যাইয়া দু'জনে বসে। বয় আসিয়া ফরমাস লইয়া চলে গেলে ইন্দ্রাণী বীণাকে বলে, "এবার বল তোর কথা।"

বীণার লজ্জা-সঙ্কোচ ও উত্তেজনায় জড়িত কণ্ঠস্বরকে পরিষ্কার করিয়া কথা বলিতে সময় লাগে। হোক ইন্দ্রাণী তাহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু! তবু বলিবার আগে কণ্ঠস্বরের চাইতেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে বুকের অসহ্য হৃৎস্পন্দনটা। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া বুকের অসহ্য দাপাদাপিটা সামলাইয়া উঠিতে সময় দিয়া বলে, "তুই ছাড়া এ বিপদে পথ দেখাবার— সাহায্য করবার আমার আর কেউ নেই ভাই—কিন্তু কণ্ঠস্বরকে ভারমুক্ত করিয়া সহজ করা ইচ্ছা করিলেই যায় না। এই ভিতরের চাপা কান্নায় কণ্ঠস্বর শোনায় বিকৃত। ঠেলিয়া-ওঠা কান্নার চাপে ভগ্ন কণ্ঠ ও কম্পিত ওষ্ঠ অসমর্থ হইয়া পড়ে কথা লইয়া অগ্রসর হইতে।

ইন্দ্রাণী ভাবিয়া পায় না—এমন কি কথা কইতে পারে, যে কথা বলিতে একটা মেয়ে এতটা পীড়া অনুভব করিতেছে?

নিজেকে শান্ত করিয়া বীণা রুমাল দিয়া চোখ-মুখ মুছিয়া স্থির কণ্ঠে ভূমিকাহীন সংক্ষিপ্ত কথায় তার বক্তব্য শেষ করে, "ভেরী সুন্ আই স্যাল বি এ মাদার।"

ইন্দ্রাণী আতঙ্কিত আর্তনাদে অস্ফুট শব্দ করিয়া ওঠে, বলে কি বীণা! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বীণার দিকে তাকাইয়া দেখে। কয়েকটি বিশেষ রেখার সাহায্যে শিল্পী যেন সন্তান-সম্ভাবনাময়ী নারী-রূপ ফুটাইয়া তোলে, তেমনি প্রতিটি বিশেষ রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে বীণার দেহে সন্তান ধারণের সঙ্কেত। এ না বোঝার কারণ— বীণার শারীরিক গঠনে অবস্থানুরূপ-বিশিষ্ট পরিবর্ত্তনটা এমন ভাবে মানাইয়া গিয়াছে, যাতে কোন অপরিণীতা সম্বন্ধে না বলিয়া দিলে এ লক্ষ্যে পড়িবার কথা নয়। ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিতে ইন্দ্রাণী সময় নেয়।

বয় আসিয়া সার্ভ করিয়া চলিয়া যায়।

চায়ের ট্রে টানিয়া লইয়া চা করিতে করিতে ইন্দ্রাণী চিন্তা করিয়া চলে—কি ভাবে কোন কথা দিয়া প্রসঙ্গটা আরম্ভ করা যায়। বীণার পেয়ালা আগাইয়া দিয়া নিজেরটা টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। বীণা ইন্দ্রাণীর এই নিশ্চেষ্ট ভাবে শঙ্কিত হইয়া ওঠে। চোখ তুলিয়া ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার সাহসও সে করিয়া উঠিতে পারে না। কে জানে, ও-মুখে যদি ঘৃণার—বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়া থাকে? আবার আরম্ভ হইয়া যায় তার বুকের অসহ্য তোলপাড়টা।

— "অপরাধী বুঝি সময় বুঝে পালিয়েছে?" ইন্দ্রাণী চায়ের পেয়ালা টানিয়া লইয়া চুমুক দিতে দিতে বলে।

—"হ্যাঁ, সে অনেক কথা। সে ইতিবৃত্ত তোকে পরে এক দিন বলব। আজ বড় বেশী অসুস্থ বোধ করছি।" তার চোখ-মুখ-শরীর এ কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছিল। শ্রান্তি, ক্লান্তি, ভয়, ভাবনা ও অসুস্থতা যেন মুখে ছাপ মারিয়া বসিয়াছে।

—"আচ্ছা, ও-সব ইতিবৃত্ত শুনবার জন্য আমি ব্যস্ত নই। কিন্তু আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। ভাবতে—ব্যবস্থা করতে তো সময়ের দরকার।" তার পর বীণার দিকে তাকাইয়া একটু দ্বিধা-ভরেই জিজ্ঞাসা করে, "কত দিন?" কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে কণ্ঠস্বর যেন সঙ্কোচে জড়াইয়া আসিতে চায়।

—"দূর!" বলিয়া কথাটার গ্লানি কাটাইয়া লইতেই যেন বীণা একটু থামিয়া বলে, "এত দিন না বলার কারণ প্রথম বুঝতে পারিনি। পরে গিয়েছি ভয়ে দিশেহারা হয়ে। কার কাছে যাব, কে দেবে বুদ্ধি, কে দেবে বল—কে-ই বা করবে সাহায্য! সামনে ভাগ্যে যে কলঙ্ক, লজ্জা ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা করে আছে, কি করে তার কবল হতে নিষ্কৃতি পাব—মনে করতে গেলেই ভয়ে-ভাবনায় হাত-পা অবশ হয়ে যাবে। তোর কাছে বলি-বলি করেও বলে উঠতে পারিনি। কি ভাববি, কি ভাবে কথাটা নিবি, আমায় বিশ্বাস করবি কি না কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। দ্বিধায় সঙ্কোচে কেবলি পিছিয়ে গেছি। কিন্তু এখন আর না বলে উপায় দেখছি না যে..." একটু থামিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলে, "তুই দুর্ভাগিণীর ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই বাতলে দিতে পারবি। আর এ অসুস্থ শরীরে দুর্ভাবনার বোঝা সহ্য হয় না। এবার আমি নিশ্চিন্ত..." মুখে নিশ্চিন্ততার কথা বলিলেও চেহারায় কিন্তু সে ভাব সে বজায় রাখিতে পারে না। নীরব কান্নায় সর্বাঙ্গ তার কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

ইন্দ্রাণী ভাবিয়া পায় না—কি সান্ত্বনা সে দিতে পারে, কোন্ নির্ভাবনার বাণী শুনাইয়া পারে অশ্রু মুছাইতে। বীণার স্বেদ-সিক্ত রমণীয় পাতলা হাতখানা টানিয়া নিজের হাতে লইয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে।

বীণাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া ইন্দ্রাণী বাড়ী আসিয়া নীচের হল-ঘরটাতে বীণার চিন্তা লইয়া বসিল। লঘুপদে তরতর করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া যাওয়া যেন আজ আর সম্ভব নয়। বিরাট হল-ঘরটা সৌন্দর্যে চাকচিক্যে মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত। ভোর হইতে সমস্ত দিনই চলে ঝাড়ন হাতে ঝাড়-পোঁছ ও ব্রাসো ঘসা। একাধিক ব্যক্তির সচেষ্ট প্রচেষ্টায় গৃহসজ্জার দ্রব্যসম্ভারের নতুনত্বের ঔজ্জ্বল্য প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয়, ম্লান হইতে পারে না। ইন্দ্রাণী একটা কৌচে খানিকক্ষণ বসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। না, এত বড় ঘরে এত দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে বসিয়া গুছাইয়া চিন্তা করা সম্ভব নয়। সে যাইয়া বসিবে তার শোবার ঘরের সঙ্গে একান্ত নিজস্ব ঘরে—যে ঘরে প্রবেশ করিতে শিবনাথকেও জানান দিতে হয়। তার ঐ ছোট্ট ঘরখানা মনকে বিক্ষিপ্ত করে না, সন্নিবিষ্ট করে। সে তার ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হইতে যাইবে, বেয়ারা আসিয়া হাতে দেয় একখানা চিঠি। চিঠিতে শিবনাথ জানাইয়াছে তাঁহার ফিরিতে আজ দেরী হইবে। বিশেষ কাজে এক জায়গায় যাইতে হইতেছে। ইন্দ্রাণীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে, "সেক্রেটারী বাবু হ্যায়?"

"হ্যাঁ মেমসাব।"

" বোলাও।" কোন দিনও সেক্রেটারীকে ডাকিয়া সে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই। করে নাই এই কারণে যে, এ জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি রুচিবিরুদ্ধ অতি নোংরা কাজ মনে হয় তার। কিন্তু মনটা তার আজ এমনিতেই চিন্তায় জড়ানো। আর শিবনাথের গতকালকার ব্যবহারে মনটা বুঝি আশান্বিত হইয়া রহিয়াছিল। একটির বেশী দু'টি দিন শিবনাথ স্ত্রীকে দিতে পারিল না। দপ্ করিয়া মাথাটা তার জ্বলিয়া ওঠে। সেক্রেটারী অজিত আসিয়া দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসা করে, "সাহেব কখন ফিরবেন এবং কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

অজিত বলে, "না।"

"বলতে পারবেন না? কেন আপনি আজ অফিসে যাননি?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"তবে কেন বলতে পারছেন না?" ইন্দ্রাণীর স্বরের রূঢ়তা চাপা থাকে না।

অজিত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিছু দিন হয় সে শিবনাথের কাছে চাকুরী লইয়াছে। এর ভিতর গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তার হইয়াছে নিতান্তই কম। আর হইলেও কথাবার্তা নাই বলিলেই চলে।

অজিতের এই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা দেখিয়া তার রাগ বাড়িয়া যায়, অস্বস্তি হয়। নিজেকে সংযত করিয়া ইন্দ্রাণী বলে, "জানেন না, না, বলবেন না?"

অজিত নিরুপায় বিপন্ন মুখভঙ্গীতে ইন্দ্রাণীর প্রতি তাকাইয়া চোখ নামাইয়া নেয়।

"তবে জানেন, কিন্তু বলবেন না। এই তো? বেশ দরকার নেই বলবার? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, "বলতে মানা আছে বুঝি?"

"আপনি কোন দিনও ডেকে জিজ্ঞাসা করেন না। তাই মানা করবার প্রশ্ন শিবনাথ বাবুর মনেও আসেনি। কিন্তু আপনাকে চিঠিতে যখন লেখেননি, তখন নিশ্চয়ই বলতে চান না...।"

"তাই আপনিও বলবেন না?"

ইন্দ্রাণীর অত্যধিক গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অজিত এবার স্পষ্ট করিয়াই বলে, "দেখুন, কারো কোন একটা কথা, যা তার অপরকে জানাবার ইচ্ছা নেই তা আমি জেনেছি বলেই বলে দিতে পারব না। আবার জানি না এমন মিথ্যে কথাও মুখ দিয়ে বের হবে না। তাই আমাকে ক্ষমা করবেন।" হাত জোড় করিয়া সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ইন্দ্রাণী লোকটির কথাগুলোতে আশ্চর্য হয়। বলে "আচ্ছা, যান।"

অজিত নমস্কার করিয়া চলিয়া যায়।

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ লোকটার দিকে তাকাইয়া ভাল করিয়া কথা বলাও প্রয়োজন মনে করে নাই। এইবার তাকাইল। পরিধানে দামী সুট। শিবনাথেরই দেওয়া হইবে। কিন্তু পোষাকের উচ্চমূল্য অনুযায়ী যত্ন, পরিশ্রমের ও পরিপাট্যের মূল্য দিয়া যে এ ব্যক্তি পোষাক পরিধান করে নাই তা একবার দেখিলেই বোঝা যায়। অজ্ঞতা না অবহেলা-জনিত এ ত্রুটি! অজিতের অপসৃয়মান দেহের দিকে তাকাইয়া সে ভাবে, কত স্বল্প কথায় স্পষ্ট বক্তব্যে সসম্মানে প্রভুপত্নীকে বলিয়া গেল, প্রতারণা করা বা মিথ্যা বলা তার আসে না।

ইন্দ্রাণী উপরে তার পড়িবার ঘরে গিয়া আরাম-কেদারায় গা এলাইয়া দিয়া বসিল। শিবনাথের প্রতি একটা দারুণ বিতৃষ্ণার ভাব আসিয়া মন জুড়িয়া বসে। কিন্তু তার এই অভ্যস্ত সমস্যাকে সরাইয়া সে ভাবিতে বসে, বীণার এ অবস্থায় সে কি করিতে পারে। এটা ঠিক, বীণার জন্য যা করার তাহাকেই করিতে হইবে। কিন্তু কিভাবে — কি উপায়ে? সত্যি কি বোকা মেয়েই না বীণাটা। ছিঃ এমন ভুলও করিতে হয়! আচ্ছা লোকটা কে? এ ভাবে একটা ভাল মেয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া পলাইল? পুরুষ জাতটার উপর তার ঘৃণা আসিয়া যায়। ঠিক হইয়াছে রমেশকে অপমান করিয়া।... আচ্ছা, বীণার কাছে লোকটা কে, জানিয়া লইয়া খোঁজ করিয়া দেখিবে না কি? কি লাভ হইবে? সমস্যা সমাধানের কি কোন সুব্যবস্থা হইবে তাহাতে? জোর করিয়া বীণাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করাইবে? মনে হইতেই তার ঘৃণা হয়। না, বীণাও এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চায় না। তাহা হইলে সে সেই সাহায্যই চাহিত। না, অবান্তর পথে চিন্তা করিয়া লাভ নাই। যদিও আশ্বিনের ঠাণ্ডার আমেজ, খোলা জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া সুস্থ অবস্থায় একটু শীত ভাবেরই উদ্রেক করিয়া দেয়, তবুও ইন্দ্রাণী উঠিয়া যাইয়া পাখাটা ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া বসে। 'কথার পৃষ্ঠে ভাল বা তীক্ষ্ণ কথা বলিয়া ধাঁধাঁ লাগাইয়া চমৎকৃত করিতে আর কত বুদ্ধির দরকার হয়? পথ-হারাকে পথ দেখাইবার বুদ্ধি আছে তোমার? আছে দুঃসময়ে ধৈর্য্য ধরিবার সাহস? তবে তো বুদ্ধি আছে বলিয়া মানিব।" ... ইন্দ্রাণী নিজের বুদ্ধিতে আঘাত হানিয়া যেন কাজ আদায় করিতে চায়। বীণাকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু কে দেখা-শোনা করিবে? টাকায় কি না হয়? আচ্ছা, সে যদি এখানেই কোন লেডী ডাক্তারের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া লয়? বেশ, ব্যবস্থা করিল কিন্তু শিশুর কি করিবে? যে উপায় প্রথমেই আসিয়া মনে উঁকি দেয়, ভাবিতেও সে শিহরিয়া ওঠে। তীব্র প্রতিবাদে মন তার পিছাইয়া আসে। না না, সে এ হইতে দিতে পারে না। আচ্ছা, সে যদি আনিয়া তার কাছে রাখে? সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু শিবনাথকে রাজী করান যাইবে না। ঘৃণ্য সন্তানে তার বড় ঘৃণা। তবে কি করা যায়? মনে মনে কত ব্যবস্থা করিল আবার পাল্টাইল তার বুঝি ইয়ত্তা নাই। গান ভুলিল, ভুলিল সময়ে অসময়ের কবিতা আবৃত্তি। দু'টি দিন কাটিয়া গেল তার নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার — অস্থিরতার ভিতর। এ অস্থিরতা তার স্থির হইল তার তৃতীয় দিন বীণার চিঠি পাইয়া। চিঠি অফিসের দারোয়ান আসিয়া হাতে দিয়া গেল। এই দু'দিন সে অফিসে যায় নাই। কেন যায় নাই তা সে নিজেও জানে না। হয়ত ব্যবস্থা একটা কিছু ভাবিয়া স্থির না করিয়া বীণার ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টির কাছে দাঁড়াইবার অনিচ্ছা। চিঠি পড়িতে পড়িতে ইন্দ্রাণীর দু'চোখ জ্বলিয়া ওঠে। হয়ত পুরুষের নৃশংসতার পরিণাম দেখিয়া। চিঠি হাতে সে

উঠিয়া দাঁড়াইল, দোতলার খোলা জানালা পার হইয়া দৃষ্টি গিয়া তার স্থির হইয়া থাকে কেয়ারী-করা লাল মসৃণ পথের উপর দণ্ডায়মান শিবনাথের গাড়ীর উপর। শিবনাথ বাহির হইয়া যাইতেছে। এ দু'দিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা নাই বলিলেই চলে। শিবনাথকে পথে দেখা যাইতেই ইন্দ্রাণী একটু সরিয়া দাঁড়ায় শিবনাথকে লইয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে আবার যাইয়া তার দৃষ্টি গাড়ীর পিছনে নিবদ্ধ হয়। সে স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গাড়ীখানা অদৃশ্য হইয়া গেল ধীর পদক্ষেপে স্নানের ঘরে যাইয়া ধারা-স্নানে মাথা পাতিয়া বসে।

পরের দিন হইতে হঠাৎ ইন্দ্রাণী ভারি অসুস্থ হইয়া পড়ে। দিন যায়, অসুস্থতা বাড়ে বই কমে না। মাথা-ঘোরা গা-বমি-বমি লাগিয়াই আছে। মাঝে মাঝে স্নানের ঘরে যাইয়া বমি করিয়াও আসে। খাওয়া প্রায় বন্ধ। নির্জ্জীব হইয়া সে বিছানায় পড়িয়া থাকে। শিবনাথ চিন্তিত হইয়া ওঠে। ডাক্তার ডাকে, প্রেসক্রিপশন হয়, গাড়ী ছোটে, ওষুধ আসে; রোগিনীর রোগ কিন্তু বাড়ে বই কমে না। শিবনাথ ভীত হইয়া ওঠে। চিন্তিত মনে পায়চারী করিতে করিতে আসিয়া বলে, "এক জন লেডী ডাক্তার দেখালে বোধ হয় ভাল ছিল।" উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না। পাশের ঘরে যাইয়া ফোন তুলিয়া লইয়া 'কল' দেয়। লেডী ডাক্তার আসিলে নার্স দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইতেই ইন্দ্রাণী উঠিয়া বসে। বলে, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। লেডী ডাক্তারটি বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া ইন্দ্রাণীর প্রতি তাকায়। কথা শুনিয়া, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া যেন কত কি ভাবিতে থাকে। তারপর মাথা নাড়িয়া দারুণ আপত্তি জানাইতেই ইন্দ্রাণী বালিশের তলা হইতে কি যেন বাহির করিয়া তার হাতে গুঁজিয়া দেয়। গুঁজিয়া দেওয়া বস্তুর অঙ্গ দেখিয়া এবং তার কোনও বিপদে পড়িবার আশঙ্কা নাই স্পষ্ট বুঝিয়া লইয়া লেডী ডাক্তার বাহির হইয়া অপেক্ষারত শিবনাথকে জানাইল ইন্দ্রাণী সন্তানসম্ভবা। শিবনাথের বিস্মিত মুখের প্রতি তাকাইয়া আবার বলে, "স্বাস্থ্য ভাল আর বিশেষ কোন উপসর্গ ছিল না বলে আপনারা দু'জনেই বুঝতে পারেননি। ছেলে না হওয়া পর্যন্ত শরীর আর বিশেষ ভাল হবে না। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই।"

শিবনাথ সংবাদটাতে যেমনি বিস্মিত হইয়াছিল, তেমনি আনন্দিত হইয়া ওঠে। তার চাল-চলনের পদ্ধতি দেখিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, স্ত্রীকে সে ভালোবাসে না। কিন্তু সত্যি তা নয়। ইন্দ্রাণীর প্রতি ভালবাসা তার আন্তরিক। কিন্তু মানুষ অভ্যাসের দাস। বদ্‌অভ্যাসগুলি শিকড় গাড়িয়া এমনি স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে যে, সন্ধ্যা না হইতেই প্রতিটি রক্তবিন্দু হইতে শিরা-উপশিরা পর্য্যন্ত তাদের সমস্ত রকম চাহিদা লইয়া আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। সেই দুর্দ্দান্ত চাহিদাকে হার মানাইবে সে শক্তি তাহার কোথায়? সমস্ত শক্তিতে একটি দিন নিজেকে বাঁধিয়া রাখিলে দ্বিতীয় দিন পরাজয় হয় তার অনিবার্য্য। নিজের স্বভাবের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে সে যেমন অক্ষম, তেমনি অক্ষম ইন্দ্রাণীর সঙ্গে যুঝিতে। চারিত্রিক দুর্ব্বলতায় দুর্ব্বল মানুষের স্বাভাবিক সন্দিগ্ধচিত্ততাও তার স্বভাবে বর্তমান। তাই পীড়ন সে শুধু করেই না, অহেতুক ভোগও করিয়া থাকে। প্রাণ-প্রাচুর্য্যে উচ্ছল ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধে মনে তার এক-টা ভয়ও যেন বাসা বাঁধিয়া আছে। আজ তাই এই খবরে সে অত্যধিক খুশী হইয়া উঠে। ভাবে, এবার ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে ভাবনা ঘুচিবে।

কিছু দিন বাদে এক দিন ইন্দ্রাণী জানায়, সে তার মা'র কাছে যাইতে চায়। এ অবস্থায় মেয়ের মা'র কাছে যাইবার ইচ্ছায় আপত্তি জানান যুক্তিসঙ্গত নয়। তবু শিবনাথের মন চায় না। সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা তো সে এখানেই করিয়া দিতে পারে। কিন্তু খুব সহজে না হইলেও শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রাণীর একান্ত ইচ্ছার কাছে শিবনাথের হার মানিতেই হয়।

॥ তিন ॥

সকালের দিকে বীণা গা-ভরা আলস্য ও জড়তা ঝাড়িয়া উঠি-উঠি করিয়াও যেন শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমনি সময় মায়ের ডাকে গা মোড়া-মুড়ি দিয়া সব চিন্তা ও জড়তা ঠেলিয়া সে উঠিয়া বসে।

"আজ অফিসে যাবি নে বীণা?" রান্না-ঘর হইতে মা বলেন।

"হ্যাঁ মা, যাব। না গেলে চলবে কেন?"

"শরীরটা বলছিলি ভাল নেই, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"রোজ রোজ শরীর খারাপের কৈফিয়ৎ ওঁরা মানবেন কেন?" বীণা উঠিয়া বসিয়া স্নানের উদ্দেশ্যে খোঁপার কাঁটা টানিয়া টানিয়া খুলিতে থাকে। কে জানে আজও ইন্দ্রাণী অফিসে আসিবে কি না! কত সময় মনে হইয়াছে নিজেই একবার ইন্দ্রাণীর বাড়িতে যায়, কিন্তু এ অবস্থায় কোথাও যাইবার মতো বল সে কিছুতেই সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। যতটা সম্ভব লোকের দৃষ্টির আড়ালে গা বাঁচাইয়া চলাই ভাল। অতি সাধারণ দৃষ্টিও তার মনে

অর্থপূর্ণ চাউনির আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ওর বাড়ীতে কে আছে না আছে তাই বা কে জানে। তাই যাওয়া আর হয় নাই, এর ভিতর তার চিঠির জবাবে ইন্দ্রাণী জানাইয়াছিল, পত্রপ্রাপ্তিসংবাদ। সে নিজে অসুস্থ তাই অফিসে আসিতে পারিতেছে না। দেখা হইলেই সব কথা হইবে। বীণা যেন চিন্তা করিয়া অস্থির না হয়। ভার যখন নিয়াছে ব্যবস্থা একটা করিবে বৈ কি! কিন্তু চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেই কি আর নিশ্চিন্ত থাকা যায়? এ লজ্জা ও কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতির বুঝি পথ নাই। অর্থই বা আসিবে কোথা হইতে। ব্যবস্থার ভার—টাকার ভার—এত ভার ইন্দ্রাণীই বা বহিবে কেন?

ব্যস্তভাবে রতন ঘরে ঢুকিয়া বই-খাতা গুছাইতে গুছাইতে বলে, "আজ মাইনে দেবে না কি দিদি?"

বীণা বালিশের তলা হইতে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া রতনের হাতে টাকা গুনিয়া দেয়। রতন সেগুলো পাটা গলাইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া যায়, আজ খেলা "আছে দিদি। ফিরতে দেরী হলে চিন্তা করো না।"

রতনের চেহারাখানা কিন্তু বেশ ফিরিয়াছে। ... সে উঠিয়া স্নানের উদ্দেশ্যে যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই বাড়ীর দরজায় একখানা গাড়ীর 'ঘ্যাস্' করিয়া থামিবার শব্দে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহে আগ্রহান্বিতা বীণার বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া ওঠে, ইন্দ্রাণী নয় ত!

ইন্দ্রাণীই। সব বুঝিয়া শিবনাথের অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে বীণার সঙ্গে কথা সারিয়া যাইতে। ইন্দ্রাণীকে দেখিয়াই যেন বীণার কান্নায় গলা বন্ধ হইয়া আসিতে চায়। নিজেকে সংযত করিয়া ইন্দ্রাণীর হাত দু'টি ধরিয়া বসাইতে বসাইতে ভাঙ্গা ধরা-গলায় বলে, "সেদিন থেকে অফিসে যাওয়া ছেড়ে দিলি কেন রে?"

"আর চাকরী করবো না।"

"কেন?" বিস্মিত হইয়া বীণা প্রশ্ন করে।

"ভেরী শুন আই স্যাল বি এ মাদার।" ইন্দ্রাণী যেন বীণার সেদিনের কথাটাই পাল্টাইয়া বলে।

"সত্যি"! বীণা চেষ্টা করিয়া আনন্দের ভাব দেখাইতে চাহিলে কি হইবে, কিছুতেই পারিয়া ওঠে না। ইন্দ্রাণী নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার উপায় কে করিবে? সে অসহায় সুরে বলে, "তোর এত বড় সুখবরেও আনন্দ প্রকাশ করতে না পারাতে অপরাধ নিস্ নে ভাই। নিজ স্বার্থের চাহিদা এত বড় যে, তুই অসুস্থ জেনে আমি যে সব অন্ধকার দেখছি, ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছি না। এখন আমি কি করবো?" বীণা দাঁত দিয়া কম্পিত ঠোঁট চাপিয়া ধরে।

ইন্দ্রাণী নীরবে বীণার কথা শুনিয়া যায়। মুখে তার উদ্বেগ বা সমস্যার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। যে সব সে সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে। বীণা কথা শেষ হইলে বলে, "তোর ভেবে স্থির করার সঙ্গে মিল রেখে যখন এত সব ঘটনা ঘটে যায়নি, তখন স্থির করতে না পারার অপরাধে এটাও ঠেকে থাকবে না। আমি শুধু বাড়ী বয়ে আমার খবরই দিতে আসিনি; তোকে কিছু বলতেও এসেছি বৈ কি।"

বীণা একান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া বসে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে। তার পর রুদ্ধ নিশ্বাসে ইন্দ্রাণীর সব কথা শোনা হইয়া গেলে নীরবে শুধু তার হাতটা চাপিয়া কিছু সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যেন সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টাও এই মহত্ত্বপূর্ণ আবহাওয়ার গাম্ভীর্য্য লঘু করিয়া ফেলিবে। তার পর শান্ত কণ্ঠে বলে, "বেশ, রতনের জন্য বোর্ডিং-এ ব্যবস্থা করে আমি ছুটির দরখাস্ত করছি।"

বীণার ডাকে মা রান্না-ঘর হইতে আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে ঘরে আসিয়া ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হন। কিন্তু কি করবেন, কোথায় বসাইবেন, উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন।

ইন্দ্রাণী বলে, "ব্যস্ত হবেন না মাসিমা। আমিও আপনার মেয়েই। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি। বীণার শরীরটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন। একটু হাওয়া বদ্‌লে এলে হয়তো ভাল হয়ে যাবে। নইলে গুরুতর হয়ে দাঁড়াতে কতক্ষণ।" মা মাথা নাড়িয়া সায় দেন। ইন্দ্রাণী বলে, "তাই বলছিলাম, আমি চেঞ্জে যাচ্ছি — চলুন না আপনারাও আমার সঙ্গে? কি বলেন, ব্যবস্থা করি?"

সম্মত হইতে মা'র মুহূর্ত সময় লাগে না। টাকা-পয়সার প্রশ্নটা তুলিতে গিয়াও থামিয়া যান।

বিদায় লইয়া গাড়িতে বসিয়া ইন্দ্রাণী বলে, " এ পর্য্যন্তই এখন মাসিমা'র জানা থাক। পরে সময় বুঝে বাকীটা বলা যাবে। ওঁকে লুকানো তো সম্ভব নয়! এখন জানলে অস্থির হয়ে পড়বেন। অপরিচিত জায়গায় যখন লোকলজ্জার আশঙ্কা থাকবে না, তখন সামলে নিতে পারবেন। আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করে জানালে মাসিমাকে নিয়ে তুই রওনা হয়ে পড়বি। কেমন?" তারপর গাড়ী ছাড়িয়া দেবার মুহূর্তে মুখ বাড়াইয়া আস্তে আস্তে বলে, "আমার মা'র কাছে দু'দিনেই তোর আর কোন সঙ্কোচ থাকবে না, দেখিস্। আমি কিন্তু আমার মা'রই ছায়া রে!"

ইন্দ্রাণীর গাড়ী চলিয়া গেলে বীণা ঘরে ঢুকিয়া সোজা গিয়া বিছানায় গা ঢালিয়া দেয়। অপ্রত্যাশিত নিশ্চিন্ততার চেয়েও ইন্দ্রাণীর মহানুভবতা যেন তার সমগ্র ব্যক্তিসত্তাটাকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

মায়ের একমাত্র মেয়ে ইন্দ্রাণী। তার দুই দাদা সপরিবারে থাকে তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্রে। ছেলেদের কারুর সঙ্গে বাস না করিবার কারণ পুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়া জনিত কারণ নয়; সর্ব্বকালে সর্ব্বক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়া আসিতেছে তাহা ঘটিবার শঙ্কায় মা'র এই দূরে সরিয়া থাকা। নিজস্ব অর্থের প্রাচুর্য্য না থাক, অপ্রতুলতাও নাই। তাই খুশীমত চলা এবং সময়ে সময়ে চালিত করাও একান্তই অসম্ভব হয় না। নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্বের জ্যোতি চরিত্রে আছে, আর আছে সর্ব্ব সংস্কারের উর্দ্ধে একটি পবিত্র ধর্ম্মভাব— যে ধর্ম্মভাব আশ্রয় দেয়, আশ্রয়হীন করে না কোন কারণেই। এবং তার উপর নির্ভর করিয়াই ইন্দ্রাণীর এই বৃদ্ধা মাতার কাছে ছুটিয়া আসা। শিবনাথ নিজেই আসিল ইন্দ্রাণীকে পৌঁছাইয়া দিতে। চার পাঁচ দিন থাকিয়া সকল রকম সুব্যবস্থা করিয়া সে চলিয়া গেল। শিবনাথ চলিয়া গেলে ইন্দ্রাণী মাকে ডাকিয়া সঙ্গোপনে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিল, শুনিয়া খানিকক্ষণ মা স্তব্ধ হইয়াই বসিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, " এ দুঃসময়ে বন্ধুর উপকার করবে, সে ত' খুবই ভাল কথা। আমি খুশী মনেই তোমায় সাহায্য করবো রাণী। কিন্তু তুমি যা স্থির করেছ তার সবটাতে সায় আমি দিতে পারছি না।"

—"কেন মা?"

—"এক জনের সন্তানকে মিথ্যে ঘটনা সাজিয়ে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা অন্যায় রাণী।"

ইন্দ্রাণী যেন নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলে, "অন্যের সন্তান নেওয়াটা কি ফেলে দেওয়ার চাইতেও খারাপ মা?"

—" নেওয়াটা খারাপ বলছি না মা। তুমি স্থান দেবে বেশ ত। কিন্তু এ যে শিবনাথকে মস্ত মিথ্যার জালে জড়ানো হচ্ছে। মন থেকে কিছুতেই এই মিথ্যার পক্ষে সায় পাচ্ছি না ইন্দ্রাণী।"

—"কি করব তবে? তুমিই বল মা। ফেলে দেব? মেরে ফেলব?"

—মা শিউরে ওঠেন। "অসন্তুষ্ট হচ্ছ কেন ইন্দ্রাণী। আমি কি তাই বলছি? যদি কোন আশ্রমে-টাশ্রমে..."

" সে ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। আর থাকলেও তো ফেলে দেওয়ারই সমান হবে মা।" তার পর মা'র দ্বিধাগ্রস্ত মুখের পানে তাকাইয়া বলে, " স্নেহের ভাণ্ডার আমাদের বড় ছোট মা। নিজ সন্তানের জন্য ছাড়া অপরের জন্য ভাণ্ডার উজাড় করে ঝাড়লেও এক ফোঁটা কিছু বেরুতে চায় না। তাই এ ভাবে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তুমি আমার এ ব্যবস্থাটা গুলিয়ে দিও না মা। অনেক ভেবেও কূল পাচ্ছিলাম না। কিন্তু যখন পেলাম তখন আর ভাববার প্রয়োজন বেশী হয়নি।" ইন্দ্রাণী মাকে মিনতি করে, "জানলে রাজী করান অসম্ভব। আর না জানিয়ে নেওয়ার এই তো একমাত্র পথ। একটা জীবনকে বৃথা ঘৃণা, অনাদর ও অবহেলায় নষ্ট হতে দেওয়ার চাইতে এটা এমন কি দোষের হবে মা?" ইন্দ্রাণী ব্যকুল ভাবে তাকাইয়া থাকে মা'র দিকে উত্তরের জন্যে। মা'র মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না ঘুচিলেও মেয়ের এত বড় আগ্রহের কাছে তিনি নীরব হইয়া যান।

আগ্রহায়ণের শেষে সবে মাত্র শীতের আমেজ পড়িয়াছে।

শিবনাথ যখন ইন্দ্রাণীদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল, তখন সবে শীতের ভোরের আলো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোট্ট পায়ে হাঁটা পথটুকুর দুই ধারে বিচিত্র বর্ণের ফুলের গাছ। প্রভাতে মিষ্টি আলোর রশ্মি ছোট বাড়ীখানার গায়ে এখানে-ওখানে ঝিলিক মারিতেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার চোখ বা মন শিবনাথের নয়, কিন্তু আজ যেন সব-কিছুই তার ভাল লাগিতেছিল। আর একটু অগ্রসর হইলেই দেখা হইবে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে— দেখিবে তার প্রথম সন্তানকে। দ্রুত পায়ে সে অগ্রসর হইয়া চলে। পরিচিত পরিচারিকা তাকে একেবারে ইন্দ্রাণীর ঘরে আনিয়া উপস্থিত করে—ইন্দ্রাণী ঘুমাইয়া। তৈলহীন রুক্ষ চুলের গুচ্ছ কপোল ও উপাধানে ছড়াইয়া আছে। হাত দু'খানা বুকের উপর। মুখখানা যেন কিছুটা ম্লান ও পাণ্ডুর—একটা অপরিমিত মমত্ববোধ যেন শিবনাথের মনকে মুহূর্তের জন্য আবিষ্ট করিয়া ফেলে। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলাইতে যাইয়া সুঠাম পা দু'খানার উপর দৃষ্টি তার স্থির হইয়া থাকে। কিউটেক্স-রঞ্জিত শুভ্র পা দু'খানা তাকে ভারি আকর্ষণ করে।

স্বামীর আদরের মাঝেই যেন ঘুম ভাঙ্গিল, ঠিক এমনি ভাবে মাথা তুলিয়া অস্ফুট আনন্দে ইন্দ্রাণী উঠিয়া বসিল। কে বলিবে—গেটের মাথায় শিবনাথকে আসিতে দেখিয়া দোলনা হইতে শিশুটিকে তুলিয়া পাশে শোয়াইয়া ঘুমের ভাণ করিয়া সে শুইয়াছিল।

ছেলে দেখিয়া শিবনাথ ছেলের গালের গাল টিপিয়া অত্যন্ত নরম হাতে আদর করে। বলে, "দেখতে কেমন হবে, কিছুই এখন বোঝা যায় না ইন্দ্রাণী!"

শিবনাথের আগমন ইন্দ্রাণীর মা জানিতে পারেন। কিন্তু মিথ্যা প্রবঞ্চনার অপরাধে কুণ্ঠা কাটাইয়া শিবনাথের সম্মুখে যাইতে তাঁর বেশ খানিকটা সময়ই লাগে। সাক্ষাতের পর সামান্য দু'চার কথায় কর্তব্য সারিয়া দুর্ভাবনা পীড়িত মন লইয়া তিনি দূরে সরিয়া আসেন। মেয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যাইয়া জামাই-এর প্রতি অন্যায় করার ক্ষোভ তাঁর মনে গাঁথিয়া আছে। যদি কোন দিন জানাজানি হইয়া যায় এবং শিবনাথ আসিয়া জবাব চায়, তবে কি জবাব তাঁর দিবার আছে?

চা খাইতে খাইতে শিবনাথ একেবারে ইন্দ্রাণীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া বসে। সুস্থ যখন, তখন আর থাকিবার প্রয়োজনটাই বা কি? এবার না লইয়া গেলে তাহার পক্ষে শীঘ্র আর আসা সম্ভব হইবে না। এইটুকু শিশু লইয়া পথে অন্য কাহারও উপর ভার দিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাওয়া স্থির হইয়া যায়।

পরের দিন আহারান্তে শিবনাথ শয্যা গ্রহণ করিলে ইন্দ্রাণী গাড়ী করিয়া ঝিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। খানিকটা অগ্রসর হইয়া গাড়ী থামে। একটি ছোট একতলা বাড়ীর কাছে।

বাড়ীখানা নির্জ্জন একটা মাঠের উপর বলিলেই হয়। দু'এক ঘর যারা এদিকে ওদিকে বাস করে, তারাও কৃষক বা গোয়ালা শ্রেণীর। অনেক খুঁজিয়া ইন্দ্রাণী এ বাসা পছন্দ করিয়াছেন বীণাদের থাকিবার জন্য। একটি ঝি লইয়া বীণা ও তাহার মা এখানেই আছেন। ইন্দ্রাণীর মা'র পরিচিত এক জন ক্রিশ্চিয়ান লেডী ডাক্তারের সাহায্যে এ বিপদ মুক্ত হইতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন তাহাদের হইতে হয় নাই। তার পর সত্যিই তো টাকায় কি না হয়।

বীণার মা প্রথমটায় শুনিয়া স্তম্ভিত ও হতভম্ব হইয়াছিলেন—এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। দাঁড়াইয়াও ছিলেন বাজ-পড়া মূর্ত্তির মত। দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু ভিতর তাঁর পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে, সামান্য একটু স্পর্শেই যেন ঢলিয়া পড়িবেন। ক্রমে সবই সহ্য হইয়া আসে—এটাও আসিল। মানিয়া লইলেন অদৃষ্ট বলিয়া। এখন আর এ সমস্ত বিপদের ছায়াটুকুও নাই, কিন্তু এ ঘটনা চরম আঘাত হানিয়া গিয়াছে তাঁর সরল মনের উপর। মর্ত্তের মৃত্তিকায় গড়া মূর্ত্তিপূজার আচার-নিষ্ঠার সংস্কারের ঊর্দ্ধে কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নাই—নাই কোন নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব। তাই ভাঙ্গিয়া মোচাইয়া তিনি যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন—পাপ-পুণ্যের খতিয়ানে নরকবাসের আতঙ্কে ঘুম-জাগরণে কেবলই শিহরিয়া উঠেন। ... কিছু স্বস্তি বোধ করিয়াছিলেন মাত্র সেদিন, যে সময় শুনিলেন, শিশু কাঁদিবার শক্তি লইয়াও ভূমিষ্ঠ হয় নাই—ডাক্তার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও শিশুটিকে বাঁচাইতে পারে নাই। শুনিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিয়াছিলেন, "এ ছুঁই-পাশ আবার বাঁচানোর চেষ্টা করা কেন!"

"আমরা ডাক্তার—আমাদের করণীয়, আমরা না করে তো পারি না। মেরে ফেলা তো সম্ভব নয়।" ক্রিশ্চিয়ান লেডী ডাক্তার বলিয়াছিল।

"মেরে ফেলতে না পার মা, যে মরছে তাকে কেন ঘাঁটাঘাঁটি করা।" ঘৃণায় তিনি মুখ বিকৃত করেন।

ইন্দ্রাণী ও তাঁর মা চুপ করিয়াই ছিলেন। কথা বলেন নাই— বলেন নাই বৃথা কথা বাড়াইয়া লাভ নাই বলিয়া। তর্কের বিষয়বস্তু এ নয়, এ দুঃখের বুক-চেরা কথা। কিন্তু সব ভাল বুঝি এক সঙ্গে হইবার নয়, তাই বীণা পড়িল অসুস্থ হইয়া। ভাবনার না হইলেও ভোগ করিবার পালাটা চলিবে বেশ কিছু দিন। এখনও সে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। হাঁটা, চলা ডাক্তারের নিষেধ আছে, আর পারেও না।

সেদিন ইন্দ্রাণী আসিয়া প্রবেশ করিলে হাতের বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া সে সহাস্য মুখে উঠিয়া বসে।

"কেমন আছিস বীণা?" ইন্দ্রাণী বীণার চৌকির পাশে বসিয়া বলে।

"অ—নে—ক ভাল।" বীণা অনেক শব্দটাকে টানিয়া লম্বা করিয়া বলিতে চায় যেন প্রায় সে ভাল হইয়া গিয়াছে।

তার কথার সুর ও টানিয়া বলার ভঙ্গি দেখিয়া ইন্দ্রাণী হাসে। বীণাও হাসে—তরুণী মনের সহজ সুন্দর হাসি। তাকায় তারুণ্যপূর্ণ প্রাণ-চঞ্চল দৃষ্টিপাতে। মুখে অসুস্থতার চিহ্ন যথেষ্ট, কিন্তু নাই তাতে ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার গুরু বোঝার ভার। সে যেন তার আগেকার জীবন ফিরিয়া পাইতেছে। সে জীবনটা যে বীণার এত ভাল, এত

সুখের ছিল এবং সে জীবনটা যে এত কাম্য তার, এত বড় ভাগ্য-বিপর্যয়ের ভিতর না পড়িলে সে তা বুঝিতেও পারিত না। ইন্দ্রাণীর হাতটা টানিয়া হাতে লইয়া বলে, "বলেছিলি শীগগিরই চলে যেতে হতে পারে. পরোয়ানা হাজির হয়নি তো?"

"হ্যাঁ, ভাই, সশরীরে হাজির। দু'-এক দিনের ভেতরই চলে যেতে হচ্ছে ভাই।"

"সত্যি।" বীণা যেন নিজেকে সামলায়।

মাও দুঃখিত কণ্ঠে বলেন, "এত শীগ্‌গিরই যাবে মা?"

"শীগ্‌গির কোথায় মাসিমা? কত দিন তো হয়ে গেল। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় কেউ তো নেই। মেয়েরা না থাক্‌লে শত লোক-জন থাকলেও সংসার কি বিশৃঙ্খলই না হয়ে দাঁড়ায় জানেনই তো।"

"বাচ্চাটি মাত্র সেদিন হলো যে। বীণার অসুখের জন্য ভাল করে দু'দিন গিয়ে দেখাও হ'ল না।"

"এই এইটুকু বাচ্চা, বেশী কি আর দেখবেন বলুন। বীণাকে ত সেদিন এনে দেখিয়ে নিয়ে গেলাম। বড় হোক, বেঁচে থাক, দেখবেন বৈ কি।"

মা মাথা নাড়িয়া বলেন "ষাট্! ষাট্! বেঁচে থাক তোমার বুক ঠাণ্ডা করে। দেখব বৈ কি মা। তুমি যাচ্ছ কার সঙ্গে? জামাই এসেছে?"

"হ্যাঁ মাসিমা।"

বীণা ও মা তার প্রায় একই সঙ্গে বলিয়া উঠেন, "এক দিন নিয়ে আসছ তো এখানে? বীণাকে নিয়ে ত যাওয়ার উপায় নেই।"

ইন্দ্রাণী জানায় সম্ভব হইলে নিশ্চয়ই লইয়া আসিবে, আর যদি না আসিতে পারে তবে যেন তারা দুঃখিত না হয়। কারণ একটি মাত্র দিন মাঝে। পরের দিন ভোরেই ট্রেনের সময়। ঝামেলা জমিয়া আছে অনেক। ব্যবসা সংক্রান্ত কি কাজও যেন আবার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাই সময় হয়ত হইবে না। তার পর বলে, "আমি চলে গেলেই মা তোদের নিয়ে যাবেন। সেখানেই এখন তোরা মা'র কাছে থাকবি। এ সব ব্যবস্থার কথা তো আগেই পাকাপাকি ভাবে ঠিক হয়ে গেছে।"

বীণা মাথা নাড়িয়া বলে, "হ্যাঁ।"

"তোর যখন কলকাতা যাওয়ার এত অনিচ্ছা আর লেডী ডাক্তারটিও আমাদের যখন ভরসা দিয়েছেন তোকে তাঁর কাছে নিয়ে নার্সিং শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার, তখন ত আর ভাবনাই নাই। যদি চাস তো ভাল করে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য বিলেত পর্য্যন্ত ঘুরে আসতে পারিস্।"

"কি করে?" বিস্ময়ের সঙ্গে বীণা ইন্দ্রাণীর দিকে তাকায়।

"সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"অনেকে ত'গিয়ে.." বীণা কথা শেষ করিতে পারে না।

ইন্দ্রাণী বলিয়া ওঠে, "অনেক নিয়েছ! তবু ঋণের বোঝা কতটুকু হালকা করতে পারছি জানি না। থাকসে অবাস্তব কথা। সত্যি যদি বন্দোবস্ত করতে পারিস আমায় জানাতে দ্বিধা করিস না। আচ্ছা, এ বিষয়ে আমিই কথা বলব লেডী ডাক্তারটির সঙ্গে।"

বীণা এ প্রস্তাবে কিছু মাত্রও সম্ভাবনার আনন্দে আত্মহারা হইয়া ওঠে। স্বাভাবিক সুখ-দুঃখে-ঘেরা ঘরোয়া জীবনযাত্রাটুকু পর্য্যন্ত তার বিপর্যস্ত হইতে চালিয়াছিল, এ সব যে তার পক্ষে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ-ঘটিত ঘটনার মত!

বীণার মা কলিকাতায় না ফিরিবার নিশ্চিন্ত প্রস্তাবে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন। কলিকাতা আজ কেন তাঁর কাছে এক বিভীষিকায় পরিণত হইয়াছে। ইন্দ্রাণী বীণার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সমপনান্তে বিদায় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অস্ফুট স্বরে মা বলেন, "ঘরে ঘরে তোমার মত মেয়ে জন্মাক, ইন্দ্রাণী।"

বীণাও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল শরীর টানিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মুখে কোন কথা বলে না, করে না আজও কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা। ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাইয়া থাকে নীরব দৃষ্টিপাতে।

ইন্দ্রাণী মুখে হাসি টানিয়া বলে, "এমন করে মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস ভাই? এ মুখ নিয়ে একেবারে পালাচ্ছি না, আবার দেখা হবে। সে বীণার হাতখানা ঝাঁকিয়া দিয়া হাসিতে চায়; কিন্তু বীণার জল-ভরা চোখের পাতার দিকে চাহিয়া তারও চোখের পাতা জলে ভরিয়া ওঠে। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে অপসৃয়মান পথ, গাছপালা,

বাড়ী-ঘর কিছুই ইন্দ্রাণীর চোখে পড়ে না। তার চোখে লইয়া চলিয়াছে বীণার জলে-ভিজা স্থিরদৃষ্টির ছবি। হৃদয়ের গভীরতম ভাব-প্রকাশে ভাষা যখন খেই হারাইয়া ফেলে, এমনি করিয়া চোখই বুঝি তখন বলিয়া দেয় কি তার বলিবার ছিল।

ইন্দ্রাণী চলিয়া গেলে বীণা আসিয়া দুর্ব্বল শরীরে আশ্রয় নেয় তার শয্যায়। ইন্দ্রাণীকে ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত পরিস্থিতিটা কেমন যেন মুহূর্তে শূন্য বলিয়া মনে হইতে থাকে। আবার কবে দেখা হইবে কে জানে! কেন জানি বীণার মনে হয়, ইন্দ্রাণীর রওনা হইবার আগে আর আসা সম্ভব হইবে না। চাপা কান্নার সঙ্গে কেবলই তাঁর দু'চোখ ছাপাইয়া জল আসিতে থাকে।... উপযুক্ত পাত্রে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বিনিময় হইলে তার চাইতে আকর্ষণীয় বুঝি আর পৃথিবীতে কিছুই নাই। ... বীণার মনে হয়, ইন্দ্রাণীর মনে নিশ্চয়ই আছে এক ব্যথার গুরুভার। যা তার একান্তই নিজস্ব। এক দিন সব বলিবে কথা দিয়াও কেন যেন আর তা ব্যক্ত করার আগ্রহ সে প্রকাশ করে নাই। এড়াইয়াই গিয়াছে। কিন্তু সে ইন্দ্রাণীর মনে এই ব্যথা ও দুঃখের উপস্থিতি অনেক সময়ই টের পাইয়াছে। কিন্তু এত যে দিতে জানে, তার জীবন কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। এক দিন সে তার ঈপ্সিত জীবনের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই পাইবে। গৃহকর্ম্মরতা মাতার সুদীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে বীণা বোঝে এ নিশ্বাস ইন্দ্রাণীর বিদায়-ব্যথার নিঃশব্দ প্রকাশ। নীরবতার মধ্য দিয়াও উপলব্ধি করে নিজের এবং মা'র বর্ত্তমান মানসিকঅবস্থা একই চিন্তার খাতে বহিয়া চলিয়াছে।

॥ চার ॥

বাড়ী পৌঁছাইয়া ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইয়া সব ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখে। শিবনাথ বাড়ী-ঘর সব নতুন সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছে। আসবাব-পত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে এ-ঘরেরটা ও ঘরে ও-ঘরেরটা সে ঘরে। কত কিছু অদল-বদলই না করিয়াছে সে। প্রতিটি ঘর যেন প্রভু-পত্নীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য প্রভুর নির্দ্দেশে সাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া আছে। শিশুর প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারই না আনিয়াছে সে কত। শুধু দ্রব্য-সম্ভারই নয়, প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়াছে মেম নার্স পর্যন্ত। সমস্ত বাড়ীখানা যেন শিবনাথের ভালবাসার ফুল হইয়া ফুটিয়া আছে ইন্দ্রাণীর হস্ত-শোভিত হইবার আকাঙ্ক্ষায়। সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া শিবনাথের আনন্দের পরিমাপ করিতে না পারিয়া ইন্দ্রাণী ভাবে, ঘটনা যখন সম্ভাব্য আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহিরে যাইয়া ঘটে তখনই মানুষ প্রকাশের ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে। শিবনাথ কি এরই মধ্যে তাহাদের সন্তান হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল? কিন্তু কেন?

দিন যায়।

পুত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি শিবনাথের। পিতা হইয়া মাতার মন লইয়া সামান্য অসুস্থতায় চোখ-মুখ ছলছলাইয়া তোলে। আগ্রহান্বিত অপেক্ষায় দিন গোনে—কবে ছেলে হামা দিবে, বসিবে, হাঁটিবে, ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহার হাত ধরিয়া। দোলায় শায়িত পুত্রের দোলা ধরিয়া ঝুঁকিয়া হাতের তুড়ি ও শীষের শব্দে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণের খেলায় সময় পাইলেই সে মাতিয়া ওঠে!

দিন কাটে।

কিছু দিনের ভিতরই শিবনাথের চোখে পড়ে টুকিটাকি অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে ভারী হইয়া চলা ইন্দ্রাণীর চাল-চলন। —চোখের কোলে জমিয়া-ওঠা কালি। মনে হয় গালের রক্তাভবর্ণ যেন তার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিতেছে। চঞ্চল চরণের গতি মন্থর, কাজে আলস্য—এবং সব কিছু মিলাইয়া এমন একটা আবেশময় আকর্ষণীয় নতুন রূপ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, যে রূপ অকারণেই কাছে বসিয়া কথা বলিবার ইচ্ছা জাগায়—কারণ শুনিয়া শিবনাথ খুশী হইয়া ওঠে। সন্তান পরিবেষ্টিতা ইন্দ্রাণী—দৃশ্যটা কল্পনায় আনিতেও মনে তার হাসির আভাস খেলিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রাণীর বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা যাইয়া ঠেকে "রাণীর" পর্যায়ে।

সব বেশের ভিতর অ-বেশের নিঃশব্দ আগমনে আসিয়া নাক ঢুকাইতে খুব বেশী সময়ের দরকার হয় না, তাই বুঝি স্বল্প ব্যথা হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হইয়া ইন্দ্রাণীকে করিয়া ফেলে একেবারে শয্যাশায়ী। কিছু দিন ধরিয়াই প্রথম মাতৃত্বের স্বাভাবিক শঙ্কার ভাবটা তার মনে দারুণ একটা ভয়-ভয় ভাবের সৃষ্টি করিতেছিল। এবার সে ভয়ে ও যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বালিশে মুখ চাপিয়া কাঁদে। শিবনাথ ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠায় সহরের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের কাছে। ডাক্তারের প্রশ্নের জবাবে যন্ত্রণা-কাতর মুখ তুলিয়া কোন মতে সে 'হ্যাঁ' 'না' করিয়া শেষ করে। ইন্দ্রাণীর সর্ব্বশক্তি ব্যয়িত হয় যন্ত্রণাটা মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইবার চেষ্টায়। এক সময়ে শিবনাথের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া আতঙ্কিত মুহূর্তের সাময়িক দুর্ব্বলতায় ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিয়া বসে: "এবার আমি নিশ্চয়ই বাঁচব না. প্রথম বারই নাকি বিশেষ ভয় ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে ডাক্তার বাবু? আমার ভারি ভয় হয়েছে।" যন্ত্রণা-কাতর ঠোঁট ইন্দ্রাণী দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরে।

পরীক্ষা-ব্যস্ত ডাক্তার যন্ত্র-আঁটা কানে কোন কথাই শুনিতে পান না। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিতে যাইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে শিবনাথ। এ কি কথা বলিল ইন্দ্রাণী!

কানের যন্ত্র সরাইয়া লইয়া ডাক্তার ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কি বলছিলেন"?

ইন্দ্রাণী ততক্ষণে কিন্তু কথাটা সামলাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার কানে আসিয়া স্পষ্ট আঘাত করিয়াছে থমকাইয়া যাওয়া জুতোর শব্দ। সে বলে, "না, বলছিলাম যে, বড্ড ভয় হয়েছে এবার। ওবার ত' এ সব উপসর্গ কিছুই ছিল না।"

"ওঃ হ্যাঁ, এবার ত' আপনার 'সেকেণ্ড টাইম'। আমার যেন কেমন শুধু মনে হচ্ছে — 'ফার্ষ্ট টাইম' বলে।'

শিবনাথ আসিয়া ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়াছিল, ইন্দ্রাণীর কথার পরই ডাক্তারের মুখেও একই কথা শুনিয়া তার পিঠের শিরদাঁড়াটা যেন শির-শির করিয়া ওঠে।

ডাক্তার একটু থামিয়া বলে, "এত ভয় পাওয়ার কি আছে বলুন? কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নেই। এখন যেমন ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, সময়ে দেখবেন বিনা ব্যথায় মা হয়ে গেছেন। কি বলেন?" ডাক্তার হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। শিবনাথও হাসে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে এ হাসি পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো টানিয়া-আনা হাসি।

ডাক্তারকে বিদায় করিয়া ধীর পদক্ষেপে যাইয়া তার অফিস-ঘরে প্রবেশ করে শিবনাথ। এ কি আশ্চর্য অবিশ্বাস্য কথা সে আজ হঠাৎ শুনিয়া ফেলিল! প্রথম বারের ভয় ইন্দ্রাণীকে পাইয়া বসিবে কেন? এই কি তার প্রথম! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? না, মতিভ্রম ঘটিয়াছে তার! শিবনাথ প্রতিটি পদক্ষেপ যেন গণিয়া গণিয়া ফেলিয়া ঘরের এ-মাথা ও-মাথা ঘুরিয়া বেড়ায়। নাঃ এ অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। ইন্দ্রাণী কেন জানাইল ডাক্তারের কাছে তার প্রথম মাতৃত্বের আশঙ্কার কথা। পেছনে হাত রাখিয়া সে ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়ায়। এ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে! এত অভিনয় চাতুরী কি একটি মেয়ের পক্ষে সম্ভব? আর সম্ভব হইলেই বা করিবে কেন? তার চাইতে সম্ভব অসুস্থ সময়ে ইন্দ্রাণীর ভুল বলা। যুক্তিজালের নিশ্চিন্ততার আড়ালে মন কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে চায় না। তার অস্থিরতা বাড়িয়াই চলে। ...ডাক্তারেরই বা প্রথম মনে হইবার কারণ কি? এত বড় ডাক্তারের ভুল হইবার কথাও নয়। হয় সে সত্যই বুঝিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কথার পর আর ওদিকে নজরই সে দেয় নাই। ... শিবনাথ হঠাৎ বাহির হইয়া দোতলায় উঠিয়া গিয়া পুত্রের ঘরে প্রবেশ করে। দোলায় মূল্যবান পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হইয়া শিশু ঘুমাইতেছে। নার্স ব্যস্ত পায়ে হাই হিলের ঠুকঠাক শব্দ তুলিয়া এটা, ওটা সেটা করিয়া যাইতেছে। মাতা অসুস্থ, পিতা সময়ে অসময়ে পুত্রকে দেখিয়া যাইতে আসে, এ বিষয়ে নার্স সজাগ। সে সাহেবকে কায়দা-মাফিক সম্ভাষণ জানায়। শিবনাথ অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ শিশুটিকে দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসে। না, — কিছুমাত্র তাহাদের পরিবারের ছাপ নাই। এত তীক্ষ্ণ খাড়া নাক ও পাতলা সরু ঠোঁট তাহাদের পরিবারের চোদ্দ পুরুষের ভিতরও বুঝি নাই—এ সব মাংসপিণ্ডে আদল দেখতে পাওয়া মানে মনের বাতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ কি রহস্য-জালে জড়াইল সে। ...গভীর রাত্রিতে ফিরিল সে মদে চুর হইয়া। বাকী রাতটুকু কাটাইল বাহিরের ঘরে।

ইন্দ্রাণী ভাবিল আর কত দিন!

যদিও ইন্দ্রাণী আসিয়া-পড়া জুতার শব্দ লক্ষ্য করিয়াছিল, তবু সে ভাবিতে পারের নাই, তাহার কথা শিবনাথ শুনিতে পাইয়াছে। তার ধারণা, সে পরবর্ত্তী কথায় আগের কথাটাকে একেবারেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

পরের দিন দু'একটা মামুলি কুশল প্রশ্নে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কথা শেষ করিয়া শিবনাথ কাজের অজুহাতে চলিয়া আসে নীচের অফিস-ঘরে। তুলনা করিয়া চলে এ-বারের সঙ্গে ও-বারের ইন্দ্রাণীর শারীরিক অবস্থার তারতম্য। এবার ইন্দ্রাণী প্রথম হইতেই অসুস্থ। তার হাঁটা চলা বসা খাওয়া সব সাক্ষ্য দেয় তার মাতৃত্বের সূচনার। মুখ যত শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, শরীর হইয়া চলিয়াছে তত ভারী। একটু উপর-নীচে ওঠা-নামা করিয়া যখন সে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া জোরে টানিয়া নিশ্বাস নেয়. সেই টানিয়া নেওয়া নিশ্বাসের ও শিশুর আহার্য্যের গুরু ভারে ভারাক্রান্ত ও বর্দ্ধিত স্তনের চাপে ব্লাউজের টিপ-হুকগুলো পট্‌পট্ করে খুলিয়া গিয়া সৃষ্টি করে যেন অতি মৃদু একটি মিষ্টি শব্দের মূর্চ্ছনা। মাতৃত্বের সম্ভাবনার আয়োজন-সম্ভারে সমৃদ্ধ রূপের বুঝি তুলনা নাই। ... কিন্তু এ সবের একটি লক্ষণও কি সে গতবার দেখিয়াছিল? না! শিবনাথ চেয়ার ছাড়িয়া এক পাক ঘুরিয়া আসে। দৃষ্টিটা বাইরে ছড়াইয়া দিয়া ভাবে—মিথ্যা যতক্ষণ সত্যের আবরণে আসিয়া ঘটনা ঘটাইয়া দিয়া যাইতে থাকে, ততক্ষণ মানুষের মন কোন সন্দেহই উঁকিটুকু পর্য্যন্ত মারে না। এবং এই নিঃসন্দেহের ছায়ায় গা বাঁচাইয়াই মিথ্যা

তার কাজ গুছাইয়া সমাধা করিয়া যায়। কিন্তু সেই মিথ্যার আভাস সামান্য কোন ফাঁক দিয়াও যদি একবার আত্মপ্রকাশ করে, তখন তারই সূত্র ধরিয়া কত প্রমাণই না আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়! তখন মনে হয়, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে না পারাটা হইয়াছে নিজেরই নির্বুদ্ধিতা! শিবনাথেরও আজ নিজেকে নির্বোধ মনে হইতে থাকে। কিন্তু এ রহস্যের অর্থ কি? ইন্দ্রাণী, বিশেষ করিয়া তাহার মা—তিনি তো এ ভীষণ খেলায় মেয়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার মানুষ নন বলিয়া তার ধারণা। তবে? না, — শিবনাথ ভাবিয়া কিছু কূল-কিনারা ঠিক করিতে পারিবে না। কোথায় পাইল ইন্দ্রাণী এ সন্তান? কিছু একটা কল্পনা করিতেও গা'টা যেন তার কুঞ্চিত হইয়া ওঠে। কোন ঘৃণ্য সন্তান নয় ত! নইলে কে নিজের সন্তান বিলাইয়া দেয়। ইন্দ্রাণী কি তার উপর প্রতিশোধ লইতেছে? শিবনাথের ইচ্ছা করে ছুটিয়া গিয়া ইন্দ্রাণীর কাঁধ ধরিয়া, ঝাঁকি মারিয়া মারিয়া সব কথা—সব রহস্য টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া আসে ... কিন্তু না, সে অসুস্থ, তাকে ব্যস্ত করা চলিবে না। অসুস্থতার উপর জুলুম করিয়া তার যে সন্তান সত্যি আজ আসিতেছে, শিবনাথ তার সে সন্তানের অনিষ্ট হইতে দিবে না। ইন্দ্রাণী সুস্থ হইয়া না ওঠা পর্যান্ত ধৈর্য্য ধারণ করিতেই হইবে! মিথ্যা প্রমাণিত হইলেই ত সকল সমস্যার সমাধান সোজা হইয়া যাইবে। কতক্ষণ সময়ের দরকার হইবে দূর করিয়া দিতে! ... কথাটা মনে হইতেই ইন্দ্রাণীর প্রবঞ্চনাময় ব্যবহারের কথা ভাবিয়াই বুঝি বা তাহার বুকের ভিতর হইতে মোচড় মারিয়া কি একটা বস্তু যেন গলার কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিতে চায়। না, সে পাগলই বুঝি হইয়া যাইবে....

এমনি ভাবে অসুস্থ স্ত্রীকে অস্থির করিয়া না তুলিবার প্রতিজ্ঞায় নিজে নিদারুণ অস্বস্তি ও অস্থিরতার ভিতর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কাটাইয়া সন্ধ্যায় আর সে ইন্দ্রাণীর সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না। কথাটা পাড়িয়া বসে।

ডাক্তারের ওষুধের গুণেই হোক, বা যে জনাই হোক সন্ধ্যায় বেশ কিছুটা সুস্থ-বোধ করিতেছিল ইন্দ্রাণী। সে কৌচে বসিয়া একখানা ছবির বই-এর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল। শিবনাথ আসিয়া আর একটি কৌচে আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ এখন?"

ইন্দ্রাণী বই হইতে চোখ তুলিয়া জবাব করে, "অনেকটা ভাল আছি।"

শিবনাথ অল্প হাসিয়া বলে, "ভাল ডাক্তার দেখে ভরসা দিয়ে গেছে বলে, না সত্যি ওষুধের গুণে?"

ইন্দ্রাণীও মৃদু হাসিয়া নীরবে ছবির পাতা উল্টাইয়া যায়। শিবনাথ সিগারেট টানিয়া চলে আর ভাবে, কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করা যায়। এগুলো তো আসল বক্তব্য আরম্ভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা মাত্র। দু'এক টানের পরই সিগারেটটা সে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তার পর দ্বিধা ঝাড়িয়া একটু ইন্দ্রাণীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারের কাছে বলা তোমার একটা কথা হঠাৎই আমি শুনে ফেলেছি। জানি, সে কথা আমার কানের জন্য নিশ্চয়ই বলা নয়। কিন্তু কানে যখন এসে গেল তখন আর কি করতে পারি বল? এখন এ কথার অর্থ জানতে চাইলে নিশ্চয়ই অপরাধ নেবে না। এ রকম ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা সাধারণদের পক্ষেও অসম্ভব, কি বল ইন্দ্রাণী।" — উত্তেজনায় শিবনাথের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে থাকে। জবাবের অপেক্ষা করিতে না হইলে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা তার পক্ষে অসম্ভবই ছিল। কিন্তু কোন একটা ভীষণ উত্তেজনার চাপ যে তাহাকে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেও দিতেছে না, তা বোঝা যায় তার নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসার অস্থিরতায়।

ইন্দ্রাণী এই পরিস্থিতির জন্য এতটুকু মাত্রও প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথমটায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় স্তব্ধ হইয়া যায়।

তার এই বিমূঢ় স্তব্ধতা দেখিয়া শিবনাথ অপলক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া স্থির কণ্ঠে বলে, "এ ছেলে তুমি কোথায় পেলে?"

পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হইয়া লইতে ইন্দ্রাণীর একটু সময়ের দরকার হয়। দুর্ব্বল শরীর তার উত্তেজনার ধাক্কায় থরথর করিয়া বুঝি কাঁপিয়া উঠিতে চায়। কিন্তু বাহিরের স্থির ভাব সে প্রাণপণে বজায় রাখে এবং মুখে একটু হালকা হাসির ভাব টানিয়া বলে, "এ জানা কথার জবাব কি?"

"জানা কথা নয়। তা যত দিন ছিল, জবাব চাইতে আসিনি ইন্দ্রাণী। এর ভেতর গভীর রহস্য ও ষড়যন্ত্র আছে। আমার উপর যে দস্তুর মত "টরচার" করা হচ্ছে—সে কি তুমি বুঝতে অক্ষম?" কৌচ ছাড়িয়া এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া বলে, "জানি না, কি করে আমি তোমার এ অসম্ভব অন্যায় ও অসহ্য অত্যাচার বরদাস্ত করছি! — কিছুদিন আগেও নিজেকে দিয়ে নিজেই কি ভাবতে পেরেছি! এতটা সম্ভব বলে? ভগবান তোমার হাতে আমায় হার মানিয়েছেন ইন্দ্রাণী।" অস্থির পায়ে আবার শিবনাথ কয়েক পাক ঘুরিয়া আসে।

ইন্দ্রাণী শেষ চেষ্টা করিবার মত নিরুপায় কণ্ঠে বলে, ''অসুস্থ অবস্থায় ভুল কথা মুখ দিয়া বের হয়ে পড়াটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপায় নয় যে, সে কথাটাই সত্যি—এমন অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব—একেবারে স্থির করে ফেল্লে! এত উত্তেজিত অবস্থায় এসে হৈ-হৈ করে জবাব চাওয়া চলে?''

শিবনাথের প্রশস্ত ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া ওঠে। ইন্দ্রাণীকে বাগ মানান সম্ভব হইবে না। সত্য অপ্রকাশিত থাকিয়া চিরকাল হৃদয়কে সংশয়ের খোঁচায় ক্ষত বিক্ষত করিবে। সত্য জানিবার উপায় নাই বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এই জঘন্যতম মিথ্যাকে? কিন্তু অসম্ভব!... শিবনাথ হাতের মুঠার শক্ত চাপে এমনি ভাবে মাথার চুলগুলো চাপিয়া ধরে যে, হাতের জোর চাপে চুলের গোড়া যেন ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া আসিবে। তাহার মনে হয়, নিতান্ত অবহেলাভরে ইন্দ্রাণী চূড়ান্ত নৃশংস খেলা তাহাকে লইয়া খেলিতেছে। একবার মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কি যেন গভীর ভাবে চিন্তা করে, আবার আরম্ভ করে অস্থির পদে হাঁটাহাঁটি। একটা সিগারেট অর্দ্ধেক শেষ না হইতেই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আর একটায় করে অগ্নি-সংযোগ...।

ইন্দ্রাণী শিবনাথের অস্থিরতা স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিয়া চলে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে।

হঠাৎ শিবনাথ নার্সকে আহ্বান করিয়া শিশুকে লইয়া আসিবার আদেশ করিতেই, ইন্দ্রাণী অস্ফুট শব্দে কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। স্বেচ্ছাচারী স্বামী হঠাৎ কিছু করিয়া বসিবে না তো! তাহার আতঙ্কিত রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকাইয়া শিবনাথ একটু হাসিয়াই ফেলে। হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলে, ''কিছু করব ভাবছ? ছিঃ, তা নয়। তোমার মাই দিতে বলব।''

এ রকম একটা পরীক্ষার জন্য ইন্দ্রাণী প্রস্তুত ছিল না। তার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিতে চায়। যে মেয়ে আজ পর্য্যন্তও মা হয় নাই; সে কি করিয়া এ কাজ করিবে।

ইন্দ্রাণীর এই বিব্রত ভাবটা গভীর মনঃসংযোগে দেখিয়া শিবনাথ স্থির হইয়া বসে। অধৈর্য্য ও অধীরতাকে সীমায় বাঁধিয়া রাখিতেই যেন তার এই ক্ষণিকের স্তব্ধতা। তার পর স্থির-গম্ভীর স্বরে বলে, ''পারবে না তো? তবু বলতে চাও এ তোমার সন্তান? ইন্দ্রাণী, জীবনটা ছেলেখেলা নয়। তুমিও সামান্য লোকের স্ত্রী নও। তোমার ছেলে যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, তা তিন পুরুষ বসে খেয়ে যেতে পারার সম্পত্তি। খামখেয়ালি, ছেলেমানুষি তোমার সাজে না। আর সাজে না পথ হতে কুড়িয়ে-আনা ঘৃণ্য সন্তানকে এ সবের উত্তরাধিকারী করতে নিয়ে আসা। আভিজাত্যের রক্ত থাকা চাই তার। এ কথা মনে হলে আমার মাথা খারাপ হবার অবস্থা হয় ইন্দ্রাণী। কাকে তুমি বাড়ীর বড় ছেলে হবার গৌরব দিতে কুড়িয়ে নিয়ে এলে! ভগবান আমায় অল্পে রক্ষা করেছেন।'' তার পর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, 'সত্য আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার কাছ থেকে এখন শুধু জানতে চাই—এ সবের উদ্দেশ্য কি? তুমি কাউকে প্রবঞ্চনা প্রতারণা করতে পার এ আমি ভাবতেই পারি না—আর সেই তুমিই নিয়ে ফেলেছ আমায় এত বড় মিথ্যা প্রবঞ্চনার ভেতর। কিন্তু কেন? আর চুপ করে থাকা তোমার শোভা পায় না, ইন্দ্রাণী!'' ... অধৈর্য্যে শিবনাথ উঠিয়া গিয়া ইন্দ্রাণীর নরম হাতটা নিজের অজ্ঞাতে এমনি ভাবে চাপিয়া ধরে যে, পাঁচ আঙ্গুলের রক্ত-চিহ্ন বসিয়া যায়। ''এবার বল,—এখনও কি বলবে তোমার...?''

—''না, আমার নয়, কিন্তু তোমার।''

—'আমার?' বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া শিবনাথ তাকাইয়া থাকে অবাক দৃষ্টিতে। তার পর বলে, ''তুমি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছ ইন্দ্রাণী? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? পরের ছেলে সহ্য হবে ইন্দ্রাণী, —সহ্য হবে না তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটলে—'' কথাগুলার সুরে শানাইয়া তুলিতে চায় ঠাট্টা বা বিদ্রূপ, কিন্তু কোন রূপ-না-লওয়া কথাগুলায় কিছুটাও জোর ধরিতে চায় না। মুহূর্ত্ত আগের এত উত্তেজনা আস্ফালন সব যেন মিয়াইয়া চুপসাইয়া আসিয়াছে।

স্বামীর চাপিয়া-ধরা হাত ছাড়াইয়া লইতে ইন্দ্রাণীর চেষ্টা করিতে হয় নাই। তার জবাব শুনিয়া সে হাত আপনিই খসিয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রাণী নড়িয়া-চড়িয়া কৌচে সোজা হইয়া বসে। তার ধৈর্য্যের বাঁধও আর সে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। বলে, ''রহস্য এতক্ষণ তুমিও করনি, আর এখন আমিও করছি না। এমন গুরু-গম্ভীর আয়োজন আড়ম্বরের ভেতর কি আর রহস্য জমানো চলে? তবে এই প্রহসনের সমাপ্তি এত বড় মর্মান্তিক কৌতুকেই করতে হবে যার পর তোমার অবস্থা দেখে লোকে হয়ত কৌতুক বোধ করতেও বা পারে। তবে তার ভেতর আমি নেই। আমি কৌতুক, বিদ্রূপ, রহস্য কিছুই করছি না—করছি না রাগ, অভিমান বা দুঃখ। আমি তোমার জানতে-চাওয়া সত্য শুধু বলে যাচ্ছি। তুমি শুনে যা খুশী তাই করতে পার। কোন জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন ছিল না, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মানিয়ে নিয়ে নিজেই এক দিন সব বলতাম। তোমার আমার দু'জনার পক্ষেই

সেটা ভাল ছিল। কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। শোন—'ইন্দ্রাণী বলিয়া চলে ঃ "বীণা—ওঃ, নাম তো তোমার জানবার কথা নয়; তবু ব্যাগ খুঁজে ঠিকানা বের করে মুমূর্ষু মেয়েটাকে উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যখন বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেছিলে. তখন হয়ত নামটা জানতে ব্যাগটা সাহায্য করে থাকতেও পারে বা। তবে মনে করে রাখবারই বা এতে কি আছে— সেও তো সত্যিই। কি বলো?" ইন্দ্রাণী কথার শেষে এমনি ভাবে শিবনাথের প্রতি তাকাইল যেন মনের ভাবটা পড়িয়া লইতে চায়।

কিন্তু সে মুখ তখন মৃতের মুখ। এখন কেন— কোন ভাবের প্রকাশ এ মুখে যেন আর এ জীবনে হইবে না।

ইন্দ্রাণী একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া বলে, "মেয়েটি এক ভেবে তোমার গাড়ী চাপল, তুমি ভাবলে আর। কোন রকমেই সে আত্মরক্ষায় সমর্থ হল না। ... বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ও অর্থ সাহায্য করে তার উপকারও যে না করেছিলে তা নয়। শুধু অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়ে তোমার উপর অবিচার করব কেন? যাক্, মেয়েটি তো যা হওয়ার হয়ে গেছে বলে সব গ্লানি ঝেড়ে ফেললো। কিন্তু ঘটনাকে 'যা হবার হয়ে গেছে' বলে অতীতে ঠেলে দিতে দিলে না তোমার এ সন্তান! মার দেহ আঁকড়ে সে ঘটনা শুদ্ধ বর্তমান থেকে প্রস্তুত হতে লাগল ভবিষ্যত-এর জন্য!"—ক্লান্ত ইন্দ্রাণী আবার একটু থেমে দু'বার নিশ্বাস নিয়ে বলে ঃ "অদৃষ্টের পরিহাসে অসহায় মেয়েটা আশ্রয়ের আশায় এবার যার হাত ধরল, সে তার আশ্রয় কেড়ে-নেওয়া লোকটিরই স্ত্রী। স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের গুরুভার স্ত্রীকে টেনে চলতে হলো তাই অবাঞ্ছিত এ অভিনয়ের ভেতর দিয়েই।

বাক্শক্তিরহিত মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ দৃষ্টি দেখিয়া যেমন বুঝিতে কষ্ট হয় না সে কি জানিতে চাহিতেছে, শিবনাথের মৃতের মত মুখের ঘোলাটে দৃষ্টি দেখিয়াও ইন্দ্রাণী তেমনি যেন বুঝিতে পারে—দৃষ্টি তার কি প্রশ্ন তুলিতেছে। সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মত করিয়া একের পর এক বলিতে থাকে : "বীণা কে? বীণা আমার ছোট বয়সের বন্ধু। তোমার কবলে পড়বার মুহূর্ত আগেও ছিল সে আমারই কাছে। সে ব্যক্তি যে তুমি কেমন করে তা বুঝলাম?" এবার ইন্দ্রাণী হাসিল ম্লান করুণ হাসি। বৈকালিক প্রসাধন-রঞ্জিত রুক্ষ চুলের গুচ্ছ হাত দিয়া জড়াইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলে : "বহু দিনের সহবাসে মানুষকে কিছুটা চিনতে পারা এমন কি আর অস্বাভাবিক? আর তোমার গতি-বিধি সম্পূর্ণ না হলেও একেবারে অজ্ঞাত যে নয়, সে তো বুঝতেই পার। তবে সে যে এতটা, এ আমার কল্পনায়ও ছিল না, এ সত্যি।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে : "বীণা অবিশ্যি সামান্যতম পরিচয় বুঝতে পারার একটি সূত্র আমার হাতে তুলে দিতে পারেনি। সে চেষ্টাও হয়ত সে করেনি, ভেবেছে হয়ত কি হবে লোকটার খোঁজে আর খোঁজ পেলেই বা আমি তার কি জানব, কি করব! কিন্তু নিয়তির খেলা, —শেষে নিতান্তই অবহেলা ভরে চিঠির উল্টো কোণায় গাড়ীর নম্বরটা লিখে দিয়েছিল সে। হয়ত সে দিনের সব ভীষণ ভাবে মনের উপর দাগ-কাটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নম্বরটাও এসে গিয়েছিল—আমার জানবার সাহায্য করার উদ্দেশ্য নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ ছোট্ট ক'টি সংখ্যা একত্র হয়ে যে আমার কাছে কতখানি মর্মান্তিক সত্য বলে যাবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। পারলে হয়ত আমার কথা ভেবেই—আমার কাছে এ সত্য সে গোপন করে যেত।... তার পর বুঝতে আর কষ্ট হওয়ার তো কথা নয়, তোমার গালের ব্যাণ্ডেজটাও আমার স্মরণে ছিল।"

শিবনাথ অস্ফুট শব্দে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া যেন কাতরাইয়া ওঠে।

কিন্তু ইন্দ্রাণীর মায়া হয় না। শুনিতে চাহিয়া এখন মুখ ঢাকিলে চলিবে কেন? সে ত সম্মান ও সহানুভূতির চরম দেখাইয়া তাহাকে দূরেই রাখিয়াছিল। যাহার নিজের উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মন নয়, যে নিজে শেখে নাই সহৃদয় ব্যবহার, জানে না অপরের ঘটনাকে সংবেদনশীল মন লইয়া বিচার করিতে—যাহাদের উদারতার পরিধি শুধু নিজেদের ঘটনা লইয়া—তাহাদের উদারতা দেখান মানে ভস্মে ঘি ঢালা। সে নিজের ঝোঁকে বলিয়া চলে—"সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য এক উপায়ে নয় অন্য উপায়েই করতেমই। কিন্তু মনে যখন সন্দেহ রইল না যে, এ তোমারই সন্তান—তখনই বিনা দ্বিধায় স্থির করে ফেললাম, তোমার সন্তানকে তোমার ঘরেই আনব। তোমার কাছে এলেই তার সব পরিচয়। কিন্তু পরিচয়হীন সন্তান নিয়ে একটি মেয়ের জীবন তো অসম্ভব। স্থির করে ফেললাম, শিশুটাকে দেব না দশ জনের ঘেন্নার ও অবহেলার সামনে ঠেলে। জড়িয়ে যেতে লাগলাম একের টানে আরএক অভিনয়ে।" সামান্য বিশ্রামে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলে ঃ "অভিনয় আবার দু'দিকেই, বীণাকেও জানতে দেইনি। সে জানে এ সন্তান আমারই। তার শিশু জন্মেই মরেছে। কারণ, তাকেও যে ফিরে যেতে দিতে হবে তার অনূঢ়া জীবনে একেবারে গা ঝেড়ে।" তার পর গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করে ঃ "কার শিশু নিয়ে এলে,—কাকে করলে আমার উত্তরাধিকারী"—এ মনে হলে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় মানি; কিন্তু এ সঙ্গে এটাও জিজ্ঞাসা করব, কেন মাথা খারাপ হয়ে উঠবে না এ কথা ভেবে যে, আমার অপরাধের ফল কোথায় আশ্রয় পেল—হয়ত আমার সন্তান এক দিন আমারই দরজায় এসে দাঁড়াতে পারে অপরিচিত ভিক্ষুকের মত আমার পাপের ফলে? পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান ভেবে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করবার আগে কেন মনে হ'বে না পিতৃ পরিচয়হীন তোমার সন্তানকেও এমনি ঘৃণায় মানুষ লাঞ্ছিত করবে? আশ্রয় দিতেই স্থানের অভাব—স্নেহের অভাব—আশ্রয়হীন করাটাকে বুঝি কোন সমস্যাই মনে হয় না? কি বল?"

প্রশ্নে শিবনাথ চোখ তুলিয়া একবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাইয়াই চোখ নামাইয়া লয়। সহ্য করা যেন কঠিন সে দৃষ্টির উজ্জ্বলতা। তাহার মনে হয়, ইন্দ্রাণীর অসুস্থ শরীর উত্তেজনার ধাক্কায় আর খানিক বাদেই যেন লুটাইয়া পড়িবে। ইচ্ছা করে, বুকে তুলিয়া অতি যত্নে বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। স্নায়বিক উত্তেজনায় অনেক নারীকেই সে কাছে টানিয়াছে, কিন্তু উত্তেজনাহীন শুধু হৃদয়ের শুদ্ধ আবেগে বুকে টানিয়া নেওয়ার একান্ত আগ্রহান্বিত অনুভূতির সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়। কিন্তু ইন্দ্রাণীর কাছে অগ্রসর হইতেও তাহার ভয় করে। সে উপলব্ধি করে—এর বিদ্যার চাইতে বেশী শিক্ষা ও বুদ্ধি! বুদ্ধির চাইতে বেশী সংস্কারহীন ধর্ম্মভাব; রূপের চাইতে বেশী ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব—এ মেয়ের জাত আলাদা।

সে কোণের কৌচটায় দুই হাতে মাথা গুঁজিয়া যেমন স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। এ সব কথার কোন জবাবই যে তাহার নাই তাহা তাহার নির্জ্জীব স্তব্ধতাই বলিয়া দেয়।

নিজের সমস্ত নালিশ উজাড় করিয়া দিয়া ইন্দ্রাণীর উত্তেজনাও তখন পড়িয়া আসিয়াছে। শিবনাথের ঝুঁকিয়া-পড়া মাথার বিস্রস্ত চুলগুলির দিকে কয়েক মুহূর্ত পলকহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া শিথিল পদক্ষেপে ইন্দ্রাণী গিয়া দাঁড়াইল খোলা জানলাটার সামনে, বলিল ঃ "জানতে চেয়েছিলে, এত দিনকার গোপন কথা সব কথাই খুলে বললাম। শুধু বলা হয়নি—ক'দিন ধরে যে নতুন কথাটা থেকে থেকে আমার মনে এসে উঁকি দিচ্ছে সে-কথাটা।"

শেষের এই কথা কয়টিতে ইন্দ্রাণীর ক্লান্ত কণ্ঠ বড় বেশী শান্ত শুনাইল। এই পরিবর্তনটুকুতে শিবনাথ যেন তার অজ্ঞাতেই আবার একবার মাথা তুলিয়া তাকাইল ইন্দ্রাণীর দিকে। ইন্দ্রাণী জানালার দিকে মুখ করিয়া পিছন ফিরিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল, আরও কিছুক্ষণ তেমনি রহিল। তার পর ক্লান্ত দেহটাকে দেয়ালের আশ্রয়ে এলাইয়া দিয়া বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া অনেকটা যেন আপন মনেই বলিতে থাকে ঃ "যেদিন এ দুঃসাহসের বোঝা মাথায় নিয়েছিলাম সে দিন আমি ছিলাম শুধু মাত্র ইন্দ্রাণী—বীণার বন্ধু, আর আজ!" ইন্দ্রাণীর মন্থর কণ্ঠ মুহূর্তের জন্য থামে, তারপর আবার বলিতে সুরু করে ঃ "আজ আমি মা হতে চলেছি। কিছু দিন পরেই আমি আর শুধু ইন্দ্রাণী থাকব না, আমি হ'ব আমারই রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া এমনি একটি শিশুর মা।" ইন্দ্রাণীর বিবর্ণ ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া ওঠে একটু ম্লান বক্র হাসি যেন নিজেকেই ব্যঙ্গ করিতে ঃ "কে জানে, যে শিশুকে তাড়াতে একটু আগে তুমি উঠে পড়ে লেগেছিলে, মা হয়ে সে প্রবৃত্তি একদিন আমার মধ্যেই জেগে উঠবে কি না—!"

ইন্দ্রাণীর কমনীয় স্ত্রীমূর্ত্তি আপন অন্তরের তেজে শিবনাথের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দেয় যে, নারীর এই অপূর্ব্ব পরিচয়ে সে নিজের জীবন সার্থক বোধ করে। সে নিজের সমস্ত অহংকার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্য্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জ্জন দিল— ধীরে কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া যায় ইন্দ্রাণীর কাছে, সসম্ভ্রমে একখানা হাত তার কাঁধে রাখিয়া বলে ঃ "সে তুমি পারবে না ইন্দ্রাণী— আমি জানি। কোন অন্যায় তোমাকে দিয়ে যেন কোন দিনও সম্ভব না হয় — উঠতে হলে, তোমার দিকে চোখ রেখেই যে আমাকে এগুতে হবে ইন্দ্রাণী।"

মাসিক বসুমতী—

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৫৭

সব বয়স বাজারে ছেড়ে দেবেন না

ললিতবাবু ইংরেজীর অধ্যাপক। যতীনবাবু সওদাগরী অফিসের অ্যাকাউনট্যান্ট। কলেজে একই বিষয় পড়েননি, তবু যেমন তাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল, দুই মানসিক জগতে কাজ করেও তাদের সেই বন্ধুত্ব অটুট ছিল। সম্প্রতি যে অসুবিধেটা দুজনের সম্পর্ককে কিছু ঢিলে করে আনতে চাইছিল, সে হলো বাড়ির দূরত্ব। যতীনবাবু থাকতেন বৌবাজার। ললিতবাবু বেহালায়। এক সময় যে পথটাকে তুচ্ছ মনে হতো, এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই সে পথকে দীর্ঘ মনে হতে আরম্ভ করছিল। যতীনবাবু বলেন, এ তো হতে দেওয়া যায় না ললিত। তুমি প্রফেসর মানুষ, বই নিয়ে পড়ে থাকো। কথা বলার লোক না হলেও তোমার চলে। কিন্তু আমি হলাম কেরানী মানুষ। সমস্ত দিন কলম পিষে বুদ্ধি যায় জমাট বেঁধে। সন্ধ্যায় কিছু কথার হাওয়া ভেতরে চালনা করতে না পারলে মাথা হালকা হতে চায় না। ছোটখাটো একটা হাত পা রাখবার মতো জায়গা করব ভাবছি — তা তোমার বেহালায়ই চলে আসি।

বেহালায় জমি কিনে বাড়ী বানিয়ে প্রতিবেশী হয়ে গেলেন ওরা। বাড়ীর দূরত্বের দরুন বন্ধুত্বের যে গিঁটগুলি ঢিলে হয়ে আসছিল, আবার তা গাঁটে গাঁটে আঁট হয়ে গেল। ললিতবাবু পেশাগতভাবে কিছুটা কুনো। নিত্যদিন হাজিরা দেন যতীনবাবুই। যতীনবাবুর মধ্যে একটা টগবগে ভাব আছে। ঘরে ঢোকেন। চেয়ারে বসেই হাঁক ছাড়েন, 'চুনো চা দিয়ে যা।' তারপর কাগজ খোলেন, সংবাদ পড়েন, চায়ের কাপে চুমুক দেন আর আক্রমণ করে চলেন, কখনো রাজনীতিবিদদের, কখনো কাগজকে, কখনো ব্যবসায়ীদের। ললিতবাবু বলেন, 'তুমি যে যতীন কাউকে রেহাই দাওনা হে?' যতীনবাবু চ্যালেঞ্জ করেন, 'কেউ আছে রেহাই পাবার মতো? যে ক্ষেত্রে যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন—করেছেন ঘুর পথে। আজকের দিনে সব কালোবাজারি। সব সার্থকতা চোরাগলি পথে।' ললিতবাবু বলেন, 'তাহলে তুমি একা চেঁচিয়ে কি করবে?' যতীনবাবু টেবিলের উপর থাপ্পড় মেরে বলেন, 'কিছুই করতে পারব না। কিন্তু পাপকে বধ করতে পারব না বলে প্রতিবাদ করতেও ভুলে যাব? হাতে বাণ মারতে পারব না বলে মুখেও বাণ ছুঁড়বো না—ডু ইউ থিঙ্ক মি সো উইক?' ললিতবাবু বলেন, 'তুমি এই গরমে আরো গরম হয়ে উঠে যখন আরো কষ্ট পাচ্ছ, তখন ওরা — অর্থাৎ তোমার কথায় সিদ্ধিলাভীর দলরা যে-যার ঠাণ্ডাঘরে বসে ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছেন।'

'ওদের ঠাণ্ডাঘরের কাচের জানালা আর ঠাণ্ডা বিয়ার-মগ আমি ঘুষি মেরে ভেঙে ফেলব।' শূন্যে ঘুষি ছোঁড়েন যতীনবাবু।

'ওদের ঘরের জানালা আর বিয়ার মগের গা পর্যন্ত কি তোমার ঘুষি গিয়ে পৌঁছলো যতীন?'

'আমার ঘুষি পৌঁছল না। আমার ছেলের ঘুষি পৌঁছবে। আমায় ছুঁড়তে না দেখলে ছেলে ছুঁড়তে শিখবে কি করে? আমাকে ব্যর্থ ছোঁড়াই ছুঁড়ে যেতে হবে, ফের নেক্সট জেনারেশন।'

সেদিন রবিবার। ছুটির দিন। ঘরে ঢুকেই উত্তেজিত কণ্ঠে যতীনবাবু বললেন, 'আজকের দিল্লি ডেসপ্যাচটা পড়েছ ললিত?'

'আচ্ছা তোমার কটি মেয়ে যতীন?'

যতীনবাবুর উষ্ণমস্তিষ্কে যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন ললিতবাবু। তবে নতুন কিছু নয়। ললিতবাবু প্রায় সময়ই রাজনীতি থেকে এমনি বিষয়ান্তরে টেনে নিয়ে যান যতীনবাবুকে। কিন্তু তা এই তুচ্ছ সাংসারিক ব্যাপারে কখনও নয়। একটু আশ্চর্যই হলেন যতীনবাবু। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, 'আমার মেয়ে হলো পাঁচটি।'

'পাঁচটি! ক'টির বিয়ে দিয়েছ? বার কয় নিমন্ত্রণ খেয়েছি মনে আছে, কিন্তু ক'বার খেয়েছি মনে নেই।'

'দু'টির বিয়ে দিয়েছি। তৃতীয়টির বি-এ. পরীক্ষা চলছে। সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক সম্বন্ধেরও খোঁজ চালাচ্ছি। আশা করছি হয়ে যাবে কোন একটা।'

ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে যতীনবাবু কেবল ললিতবাবুর জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব দিয়ে যেতে লাগলেন।

ললিতবাবু আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন, 'আরে তুমি যে কেবল দেখছি রাজনীতিবিশারদনও, সংসারনীতিবিশারদও। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছ। তৃতীয়টিরও ভাবছ হয়ে যাবে কোনও একটা; আর আমি একটামাত্র মেয়ের জন্য একটামাত্র পাত্র ঠিক করে উঠতে পারছিনে। বিশেষ কোন আর্ট আছে নাকি যতীন মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক করার ভেতর?'

যতীনবাবু খুব অবাক হলেন। ললিতবাবুর মেয়ে কবিতা দেখতে সুন্দর। এম-এ. পাশ করে কলেজে পড়াচ্ছে। নিজের মেয়েদের সঙ্গে কবিতার তুলনাই করেন না তিনি। ললিতবাবু প্রফেসার। নিজ হাতে তৈরী করেছেন মেয়েকে। তেমন পাত্র পেলে তবেই বিয়ে দেবেন, এই ভেবেছেন যতীনবাবু। বললেন, 'কবিতার মতো মেয়ের পাত্র পাচ্ছ না—একি একটা কথা হলো? সুন্দরী বিদুষী তন্বী স্বাস্থ্যময়ী সুলক্ষণা—পাত্রপক্ষ যা যা চান সবই কবিতার রয়েছে—তবে ঠেকছে কোথায়?'

'বয়স-বয়স-বয়স। মেয়ের বয়স ছাব্বিশ সাতাশ?' আমাদের ছেলেরও যে তাই। তবে আর হয় কি করে। সমান সমান হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা শেষ করতে একটা ছেলের যে বয়স লাগে, একটা মেয়েরও যে সেই বয়স দরকার হয়—এ কথাটা মাথায় ঢোকে না এঁদের?'

মাথা নেড়ে মুখব্যাদান করে আস্তে আস্তে বলে উঠলেন যতীনবাবু। 'আচ্ছা!' এতক্ষণে যেন সমস্যাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন তিনি। আর ব্যাপারটা বুঝে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমোদ অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে। সোজা হয়ে বসে ছিলেন। এবার চেয়ারের পেছনে শরীর ছেড়ে দিলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, 'তা পাত্রের চাইতে কনে অন্তত চার পাঁচ বছরের ছোট হবে—এটা তো ছেলের পক্ষ চাইবেনই?'

মাথা নেড়ে কথাটার যথার্থতা সমর্থন করলেন ললিতবাবু।

'কি রে চুনো, তোর মা কি আজ আমাকে চা দেবেন না?' হাঁক ছাড়লেন যতীনবাবু।

চা আর নিমকি ভাজার ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো চুনো। চেয়ার থেকে পিঠ তুলে যতীনবাবু উল্লাস করে উঠলেন, 'আরে নিমকি ভাজা! যা মাকে বল গিয়ে দেরীতে চা দেওয়ার জন্য আর কোন নালিশ নেই। কিন্তু আর এক কাপ চা দিয়ে যাস। এক কাপ চায়ে এমন নিমকি জমবে না।'

চা আর নিমকির প্লেট নামিয়ে নিয়ে নিমকি হাতে নিয়ে তার কয়েকটা মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতে বললেন. 'অনবদ্য।'

শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ছাইদানে ফেলে দিলেন ললিতবাবু! 'এদিকে কবিতাও ভীষণ চটে গেছে। বলছে, 'আমাকে নিয়ে এ খেলা যদি তোমরা না থামাও তবে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। কলেজ হোস্টেলে গিয়ে থাকবো।'

'আচ্ছা!' আরাম করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চললেন যতীনবাবু।

'আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম যতীন। ভেবেছিলাম হয় কবিতা নিজে করবে, নয়তো যখন হবার হবে। কিন্তু শোভনার কাণ্ড। পাত্র-পাত্রী সংবাদে এক লোভনীয় পাত্রের বিজ্ঞাপন পড়ে চিঠি দিয়ে বসেছে। পাত্র নাকি সি.এ তাও আবার এখানের নয় হে, খাস বিলেতের সি. এ। তারও আবার উপর আছে। কলকাতায় বাড়ি আছে। গাড়ি আছে।'

পাত্রটির পরিচয় পরিচিত। কারণ যতীনবাবুর গিন্নীও এ বিজ্ঞাপনে চিঠি ছুঁড়েছেন। কিন্তু সে কথা বললেন না যতীনবাবু। দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে শুধু বললেন, 'আচ্ছা!'

আর একটি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ললিতবাবু বললেন, 'শোভনা চিঠি দিয়েছে। ফটো পাঠিয়েছে। ওদিক থেকে শুধু মামুলী জবাব নয়, একটা বিশেষ আগ্রহান্বিত জবাব এসেছে। কিছুই জানায়নি আমাকে। কিন্তু এখন ওরা যেই কবিতাকে দেখতে আসতে চাইছেন আর অমনি আমার কাছে এসে হাত পা ছেড়ে বসে পড়েছে। —'কি করবো গো? ছেলের বয়স যে লিখেছে সাতাশ? বিজ্ঞাপনে তো ছেলের বয়স ছিল না। এখন কি করি?'

চটে উঠে বললাম, 'আবার এর ভেতর ঢুকেছ?'

'মেয়েদের কথা— কি বলব যতীন। চোখের জলটি তো পাতার তলায় রয়েছেই। টপ্ টপ্ করে ঝরালেই হলো। মেজাজ চেপে বললাম, যাও লিখে দাও গিয়ে, আমার মেয়ের বয়সও সাতাশ। আগে ছেলের বয়স জানতাম না। তাই এগিয়েছিলাম।'

'তার মানে তুমি ভেঙে দিতে বলছ?'

'তুমি গড়তে যদি পার তো গড়। আমায় জ্বালিও না।' খালি চায়ের কাপটা ঠেলে রেখে চেয়ারে পিঠ ফেলে ললিতবাবু হতাশকণ্ঠে বললেন, 'কিছুটা বয়স যে কমাবো তারও উপায় নেই যতীন। মেয়ে কোন্ সনে এম-এ পাশ করেছে—বস্ হয়ে গেল। ওরা ঠিক মনে মনে হিসেব করে ফেলবে, এ সনে যদি এম-এ পাশ করে থাকে তবে এখন এই বয়স হয়। কমানো তো দূরের কথা, ষোলতে স্কুল-ফাইনাল পাশ করার যে মাপকাঠি দিয়ে বয়স মাপা হয়, তা দিয়ে কবিতার বয়স মাপতে গিয়ে আরো দু বছর তার বেড়ে যায়। জানই তো কবিতা চোদ্দতে স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছে।'

'আচ্ছা'।

'কি তখন থেকে কেবল 'আচ্ছা আচ্ছা' করছ যতীন।' রেগে উঠলেন ললিতবাবু। 'তোমার কি বলার মতো কথা নেই?' 'রাজনীতি না হলে কি তোমার বাক্য-স্ফূর্তি হয় না?'

এবার ঘর কাঁপিয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন যতীনবাবু। বললেন, 'আমার ভারি ইনটারেসটিং লাগছে ললিত।'

বিস্ময়ের সঙ্গে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন ললিতবাবু 'ইনটারেসটিং লাগছে?'

চুনো আর এক কাপ চা দিয়ে গিয়েছিল। আগের খালি কাপটা সরিয়ে রেখে ভরা কাপটা সামনে টেনে আনতে আনতে যতীনবাবু বললেন, 'ইনটারেসটিং লাগবে না ললিত? আমার তৃতীয় মেয়ে নীরা—এইবার বিয়ের কথা চলছে বলছিলাম, সেই নীরার ছ'বছরের জন্মদিনে কবিতার জন্ম। অর্থাৎ কবিতার চাইতে নীরা ছ'বছরের বড়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতার সাতাশ হলেও নীরার বয়স এই সবে কুড়ি।' ললিতবাবুর কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে তাকিয়ে যতীনবাবু বললেন, 'নোট কর ললিত, নীরা এবার বি-এ দিচ্ছে। যদি ষোলতেও সে স্কুল-ফাইনাল পাশ করে থাকে তবে তোমাদের বয়স মাপার ফরমূলায় ফেলে দেখ কুড়ির চাইতে একটুও বেশী হয় কি না?'

ললিতবাবু সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন বন্ধুর কথা শুনে। কিছুটা চমৎকৃতও। কথাটা শুনতে যতই হাস্যকর লাগুক—এর সত্যতা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এভাবেই তো বয়স হিসেব করা হয়।

যতীনবাবু বললেন—'বয়সের মাইলপোস্ট যখন ডিগ্রির সন-তারিখ, তখন ঐ ডিগ্রির পোস্টটাকে বেশ ভেবেচিন্তে পুঁততে হয় বুঝলে ললিত। তোমার কি বল? একটি মেয়ে। আমার পাঁচ-পাঁচটি। বিয়ে দিতে অর্থ লাগবে। সময় লাগবে। মেয়েগুলোকে তরতর করে বাড়তে দিলে কি রক্ষে ছিল হে।'

'আচ্ছা।'

ললিতবাবুর 'আচ্ছা' শুনে যতীনবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হাঁ এতক্ষণ তুমি বলেছ আমি 'আচ্ছা' বলেছি, এবার আমি বলছি তুমি 'আচ্ছা' বলে যাও।'

'বল।'

যতীনবাবু সিগারেট খান না। তাঁর নেশা নস্যি। পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে মোটা মোটা দুই আঙুলে মস্ত এক টিপ নস্যি নিয়ে দুই নাকের মধ্যে ঠাসলেন। রুমাল টেনে টেনে বেশ করে নাক ঝাড়লেন। তারপর নস্যির দাগভরা ময়লা রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, 'বয়স জিনিসটা ভাই ললিত চাট্টিখানি কথা নয়। তার একটা বাস্তব দিক যেমন আছে, আবার তেমনি একটা মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে তো? হিসেবের গোলমালে বা প্রিয়জনের আঁচলের তলায় কিছু বয়স চাপা পড়লে, বয়সের অঙ্কটা যেই কম দেখি, এখনও দস্তুর মতো ভিগারাস বোধ করি —' দুই কাঁধ ফুলিয়ে তুললেন যতীনবাবু। তারপরই ফুলানো কাঁধ নেতিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিন্তু মন নয় তো যেন শুদ্ধচারিণী সতী। ফাঁক পেলেই টুক করে সত্য বয়সটি বলে দেবে। আর অমনি মনে হবে, আর কেন! এবার কাশী চলি। বয়সের পিছনে মানসিক সংস্কার বড্ড বেশী কাজ করে। কালে কালে আবার এ মানসিকতা বদলায়। আগে মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি ছিল। এখন দেখ না, পঞ্চাশ উত্তীর্ণা ইন্দিরা, প্রিয়দর্শিনী-তরুণী।'

ললিতবাবু হাসলেন।

যতীনবাবু তার কথার ঝোঁকেই বলে চললেন, 'তারপর চলে এসো বাস্তবের মাঠে। মেয়েদের বিয়ের সময়কার ঝামেলা তো নিজেই দেখছ। তারপর চাকরী বল, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা বল, পেনসন বল, — কোথায় বয়সের প্রশ্ন নেই? তোমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে পর্যন্ত আজকাল দেখছি একটা 'তরুণ' শব্দ জুড়তে পারলে একস্ট্রা কোয়ালিফিকেশন হয়। এমন যে মহামূল্যবান বস্তু বয়স — তাকে কি পকেট উজাড় করে মাঠেঘাটে ছড়িয়ে ফেলতে আছে হে? বাবা যদি আমার বয়স থেকে কয়েকটা অঙ্ক পকেটে ভরে রাখতেন তবে সাত বছরের জায়গায় দশটা বছর অন্তত আরো কাজ করতে পারতাম। তা বাবার ভুল সংশোধন করবার তো উপায় নেই— আমি আমার পুত্র-কন্যাদের বেলায় সে ভুল হতে দেইনি ললিত। সবারই কিছু বয়স আমি আমার বুক পকেটে সযত্নে রেখে দিয়েছি। আর তা দিয়েছি বলেই আজ পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের পাত্রদের সঙ্গেও সম্বন্ধের কথা চালাতে পারছি নীরার।'

এবার ললিতবাবু একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কিন্তু ছেলের চাইতে মেয়ে বড় হয়ে যাবে পাঁচ ছ' বছরের—এটা কি ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে সুখের হয়?'

'প্রফেসর! তুমি দেশ-বিদেশের এত এত সাহিত্য ঘেঁটে তারপর এমন কথা বলছ? নারীপুরুষের সুখ কি বয়স নির্ভর?'

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ললিতবাবু বললেন, 'না তা অবশ্যি বলছি নে। তবে—'

'না ললিত, এর মধ্যে তবে টবে কিচ্ছু নেই। সন্তানের সুখ সম্বন্ধে মায়েরা বাঘিনীর মতো সতর্ক। যে পথে বিপদ সে পথে মারা এক পাও এগোন না। যদি দাম্পত্যজীবনের সুখ বয়সনির্ভর হতো তবে কি মা-বাবারা কুষ্ঠি পালটে যা-তা ভাবে বয়স কমিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতেন হে?'

এ কথাটাও যে যতীনের সত্য তা অস্বীকার করেন কি করে। ললিতবাবু চুপ করে রইলেন।

যতীনবাবু বললেন, 'মা বাবা হয়ে আমরা সবাই যা করছি, তোমরাও তাই কর।'

অসহায় কণ্ঠে ললিতবাবু বললেন, 'বাবা মা হিসেবে আমারা কি বিশেষত্বের দাবি করছি যতীন? সব মা বাবারা যা করেন, তা করতে মুখ ফিরিয়ে নেবো আমরা কোন অহঙ্কারে? কিন্তু তারা কুষ্ঠি পালটান—আমি ডিগ্রি পালটাব কি করে?'

'ডিগ্রি সিন্দুকে ভরে রাখো!'

'সিন্দুকে ভরে রাখবো? সেটা কি জিনিস?'

'পাত্রপক্ষকে বলবে না ডিগ্রির কথা। বলবে বি-এ পড়ছে মেয়ে কিংবা এম-এ।'

'যতীন—এটা কি কুষ্ঠির মতো ঘরোয়া ব্যাপার? প্রতিবেশী আছে। আত্মীয়স্বজন আছে। কবিতার বন্ধুবান্ধব আছে—'

'তারা জানবে কি করে আমরা কি বলেছি না বলেছি? আর জানলেই কি কেউ বলে দিতে যায় নাকি? ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও।'

'বলতে না যাক জানায় লজ্জা আছে?'

'না লজ্জা নেই বরং মজা আছে।'

'তুমি সবাই নও।'

'দুষ্ট লোক ছাড়া আমি-ই সবাই।'

ললিতবাবু তবু না বোঝার ভঙ্গিতে হাত উল্টে বললেন, 'এ যে কি করে সম্ভব—আমার মাথায় আসছে না ললিত!'

'ঠিক আছে। আমার কথামতো চলে দেখ, ঠকে যাবে মনে হয় না।'

'বেশ, কি করতে হবে আমাকে, বল?' একটু উদ্দীপ্তকণ্ঠেই বললেন ললিতবাবু।

'বর্তমানে মেয়ের এম-এ ডিগ্রি আর প্রফেসরি গডরেজে রেখে দিয়ে, কুড়ি বাইশ বছরটা ওঁদের হাতে তুলে দাও! শ্বশুর-শাশুড়ী-বৌ নিয়ে আনন্দিত মনে ঘরে তুলুন। তারপর মেয়ে এক সময় বরকে খুশী করে দেবে—তার ডিগ্রি আর প্রফেসরি দিয়ে।'

'ভায়া-হে, যত সহজ ভাবছ, তত সহজ নয়। কবিতাই বেঁকে বসবে দেখ।'

সেধে বলতে যাবে কেন তাকে। চলতে তো থাকো। ছেলের বাপ মা'র দিকটা যদি ম্যানেজ হয়ে যায় তারপর কবিতার চিন্তা। আর পাত্রের মা ম্যানেজ হয়ে গেলে তারপর আর আমাদের চিন্তা করতে বসবার সময় কই। পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে ছুটছি দৌড়োচ্ছি—বাজনা বায়না করছি ভিয়েন বসাচ্ছি—প্যাণ্ডেল তৈরী করছি—আমাদের সেই ব্যস্ততার খরটানে কবিতা একেবারে ভেসে যাবে। কূল যখন পাবে, দেখবে সেটা বাসর-শয্যা।'

'সেখানকার কথা তোমার আমার ভাবতে বসবার দরকার নেই। বসলে অনধিকারচর্চা হবে।'

ললিতবাবু চিন্তিত মুখে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।

যতীনবাবু চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে বললেন, 'দেখ, ভেবে দেখ। এখন যাচ্ছি। সন্ধ্যেবেলা এসে শুনব কি স্থির করলে।'

যতীনবাবু চলে গেলেন। ললিতবাবু বসে বসে ভাবতে লাগলেন। তারপর স্নান খাওয়ার ডাক এলে উঠলেন। স্নান করলেন। খেলেন। স্ত্রী কন্যার সঙ্গে কথাবার্তাও বললেন। কিন্তু সব কিছুই করলেন অনামনে। মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জন্য ঘরে এসেও শুতে পারলেন না। ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট টেনে চললেন।

কিছুক্ষণ বাদে শোভনা দেবী সংসারের পাট শেষ করে ঘরে এলেন। ললিতবাবুকে বসে থাকতে দেখে পান জর্দা ঠাসা মুখ উঁচুতে তুলে ট ট করে বললেন, 'ওমা—তুমি শোওনি? টা ভালই হয়েছে—জানালার কাছে গিয়ে পিচ্ করে কতকটা পিক্ ফেলে বেশ জুত করে এসে খাটে বসলেন। বললেন, সকালবেলা চটেমটে চলে গেলে। বিয়ের মেয়ে ঘাড়ের উপর থাকলে ধৈর্য্য হারালে কি চলে? কত করে ওঁরা লিখেছেন কবিতার ছবি পছন্দ হবার কথা। বল না গো কি করি।'

পাতলা চুলে হাতে চালাতে লাগলেন ললিতবাবু... সাংসারিক বিজ্ঞতায় যতীন পাকা। তার কাছে তিনি দাঁড়াতেই পারেন না। তার পরামর্শমত চলে দেখা যাক না—বললেন, 'আমার কথামত যদি চল, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি — সম্বন্ধটা করা যায় কি না।'

আহ্লাদি মেয়ের মত দুলে উঠলেন শোভনা দেবী—'শুনব যা বলবে তাই শুনব।'

'নীরার বয়স কত বলত?'

'নীরা আবার কে?'

'আরে যতীনের মেয়ে।'

'ওমা সত্যি তো। পুচকির নাম নীরাই তো। তা পুচকির বয়স হয়েছে। কবিতার চাইতে ছ'বছরের বড় তো—বত্রিশ হবেই।'

'না, নারীর বয়স কুড়ি।'

'কে বললে?' গর্জে উঠলেন শোভনা দেবী— 'যতীনবাবু বুঝি? ছেলেমেয়েদের বয়স বাবা মারা অমনি বলেন। কিন্তু যতীনবাবু বাইরের লোকেদের কাছে বলুন। আমাদের কাছে বলেন কি করে বুঝি না।'

শান্ত কণ্ঠে ললিতবাবু বললেন, 'যতীন কমায়নি। তার বয়স সত্যি কুড়ি বলেই সে কুড়ি বলেছে। নীরা এবার বি-এ দিচ্ছে জানত?'

'বাঃ কি কথা। বি-এ দিচ্ছে বলেই বত্রিশ কুড়ি হবে?'

'কেন হবে না। ধর ষোলতে যদি—'

'আমি ওভাবে ধরতে যাব কেন? আমি তো পুচকির বয়স জানি।'

'যদি না জানতে তবে ঐভাবেই হিসেব করতে তো?'

মুখভাব করুণ হলো শোভনা দেবীর — 'তা করতাম। সবাই-ই তো তা করে।'

'সবাই তা করে বলেই, ছাব্বিশ সাতাশ বছরের ছেলের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ করতে চাও তবে বর্তমানে কবিতার এম এ ডিগ্রিটাকে সন সমেত সিন্দুকে তুলে রাখতে হবে। পারো যদি তবেই এ সম্বন্ধ নিয়ে এগোনো চলে। নচেৎ নয়। কবিতা বি এ পড়ছে—পারবে বলতে?'

স্বামীকে কথা দিয়েছেন, তিনি যা বলবেন শুনবেন—শোভনা দেবী একটা ঢোক গিললেন—তা, তা কেন পারব না। বিয়ের ব্যাপারে কত মিথ্যে মানুষ বলে। ঠিকুজি কুষ্ঠি পালটায়। অন্যের সেলাই রান্নাকে মেয়ের বলে চালায়। আর এতো আমরা গুণকে বরং কমিয়েই বলছি—কি বল? পারব—খুব পারব। কিন্তু তোমার মেয়েকে রাজী করাতে পারবে?'

'তাকে এখন বলার দরকার কি?'

'বল কি গো।' কেঁপে উঠলেন শোভনা দেবী। 'তবেই হয়েছে। মেয়ে বলবে, এই চললাম, আমাদের মত মূর্খ নয় যে ল্যাজে মাথায় যখন যেখানে মর্জি কাটবে। আচ্ছা, গত বছর পাশ করেছে বলা যায় না?'

'না। চারদিক সামলে বলতে হবে। গত বছর বলব—ওঁরা যদি গেজেট দেখেন?'

'যাঃ, তা কি দেখে কেউ?'

'যদি দেখে।'

কিন্তু কবিতাকে না জানিয়ে ....

এই কিন্তুটা যে ললিতবাবুর মনের মধ্যেও কাজ না করছে তা মোটেই নয়। বললেন, 'যতীন যে মানা করেছে বলতে।'

'ও, তাই বল!' মাথা নাড়তে লাগলেন শোভনা দেবী। যেন এতক্ষণে বুঝলেন এমন গভীর বুদ্ধিটা কার। যদিও যতীনবাবুর বিচক্ষণতার উপর বিশ্বাস আছে খুবই—যতীনবাবু বলেছেন শুনে তিনি জোরও পেলেন মনে, কিন্তু তবু মেয়েকে না জানিয়ে? 'না বাবা, সে হয় না। তুমি মেয়েকে বলে নাও। ডাকব তাকে?' খাট থেকে নামতে গেলেন তিনি।

ললিতবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, 'আরে রোস রোস। আর একটু ভেবে নি।'

শোভনা দেবী থামলেন।

'... আচ্ছা না হয় ডেকেই আনো। যদি ক্ষেপে ওঠে, তবে থেমে যাবো। কি বল? যদিও যতীন না করেছে—তা যতীন তো আর কবিতাকে তত জানে না, যত আমরা জানি। ডেকেই আন। বলেই নি।'

শোভনা দেবী চললেন মেয়েকে ডেকে আনতে।

'আচ্ছা, শোন—'

আবার থামলেন শোভনা দেবী।

ললিতবাবু বললেন, 'এখন না হয় থাক-ই। সেই সকাল থেকে পরীক্ষার খাতা দেখছে। ক্লান্ত আছে। সন্ধ্যের সময়েই ভালো হবে কি বল?'

শোভনা দেবী সমর্থন করলেন, 'হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে।'

বসবার ঘরে বসে শোভনাদেবী আর ললিতবাবু মেয়ের কাছে কথাটা তুলবার জন্য শলাপরামর্শ করছিলেন। না বলে বরং বলা চলে পাঁয়তারা কষছিলেন। খুশিখুশি চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ললিতবাবু বললেন, 'তুমি ডাকতে যেতেই কবিতা বললে বুঝি সেই দুপুর থেকে কি মন্ত্রণা করছো দুজনে? এবার কিন্তু আমি আড়ি পাতব। মেজাজটা তবে ঠাণ্ডাই দেখলে?'

'অযথা বদনাম করোনা! আমার মেয়ের মেজাজ সব সময় ঠাণ্ডা।'

কবিতা এসে ঘরে ঢুকলো। তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয়নি। মাত্র রোদটা ঢলে পড়েছে। সমস্ত দিন একটানা কলেজের খাতা দেখে শ্রান্ত লাগছিল। তাই স্নান করেছে সে। আধা ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়ানো। পরনে হালকা গোলাপী রং-এর শাড়ি আর লাল রং -এর বাটিকের কাজ করা ব্লাউজ। খুব প্রাণবন্ত আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাকে। বাবা মা একটা নতুন কোন সম্বন্ধের যুক্তি পরামর্শই যে করছেন সারাদিন ধরে, সে কথা বোঝা হয়ে গেছে কবিতার। তাকে কেন ডাকা হয়েছে তাও সে জানে। তবু শুনতেই হবে! মা বাবার মুখোমুখি সোফায় এসে বসল সে। বলল, 'তুমি আমায় ডেকেছ বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'বল কি বলবে'। ঠাণ্ডা গলায় বলল কবিতা।

'বলছি' একটু থামলেন ললিতবাবু তারপর বললেন, 'কিন্তু শুনেই যেন রেগে উঠোনা।'

কবিতা হাসল 'সব দায়দায়িত্ব আমার ওপরই চাপিয়ে দিওনা! তুমিও এমন কথা বলোনা, যে কথা আমার খুব বাজে মনে হতে পারে।'

অভিভাবকের চালে ললিতবাবু বললেন, 'দেখ মা, তোমাদের এখন যে বয়স, তাতে কাজের কথা না বাজে কথা তোমরা কি তা বুঝে উঠতে পার? বরং কাজের কথাকেই তোমরা বাজে কথা মনে কর।'

'আচ্ছা বল তো আগে।'

'আমার অত্যধিক প্রেসারের কথা, তোমার মার হার্টের অবস্থার কথা—সবই জান। এ অবস্থায় আমরা তোমার জন্য ভাবিত হব বুঝতেই পার। কবে আছি - কবে নেই — কে জানে।'

'একেবারে উল্টো কথা বলছ বাবা। এ অবস্থায় আমিই ব্যস্ত হবো তোমাদের জন্য। তোমরা আমার জন্য ব্যস্ত হবে কেন?'

' বেশ তো তুমিই ব্যস্ত হও আমাদের জন্য। যতই লেখাপড়া করানো যাক, মেয়েকে একটি সৎপাত্রে বিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত বাপ মার মনে শান্তি থাকে না। তোমার একটি ভালো বিয়ে দিতে পারলেই দেখবে আমাদের আয়ু বিশ বছর বেড়ে গেছে।'

'তুমি দেখছি আগের দিনের অরক্ষণীয়া কন্যা নিয়ে যেভাবে লোকে কথা বলত, সেভাবে কথা বলছ বাবা।'

'বড় হলে সর্বকালেই কন্যা অরক্ষণীয়া। আগের চাইতে এখন অনেক বেশী দিন রাখা চলে। কিন্তু তাই বলে মেয়ে বাপের ঘরে রক্ষণীয় হয়ে যায়নি।

'তা না যাক, মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত হয়ে গেছে'—মুখে এলেও কথাটা বললো না কবিতা। বরঞ্চ, অসন্তোষ আড়াল করে একটু হেসে বললো, 'আচ্ছা তারপর কি বলতে চাচ্ছ তাই শুনি?'

নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন ললিতবাবু এইভাবে—প্রথম যখন যতীন বলেছিল তখন প্রস্তাবটা যেমন হাস্যকর তেমনি আজগুবি ঠেকেছিল তো ললিতবাবুর নিজের কাছেও।

কবিতারও প্রথমটা অবশ্যই তা লাগবে। কিন্তু তারপর তিনি যেমন এর সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন—কবিতা কি তা করবেনা—মনে মনে দূর্গা নাম জপে নিলেন ললিতবাবু। তারপর বললেন, 'খুবই ভালো একটি ছেলে পাওয়া গেছে। ছেলেটি সি.এ.। বিলেতের। আলিপুরে বাড়ি আছে। ছেলে কলকাতায় কাজ করে। এটা আমাদের কাছে আরো একটা বিশেষে প্রলোভনের জিনিস। এ সম্বন্ধ হলে তুমি কাছে থাকবে—আমাদের কত আনন্দ এবং ভরসার হবে সেটা। সবদিক দিয়েই আকাঙ্ক্ষা করার মত ছেলে। কিন্তু, কথা হলো, একবার কেশে নিলেন ললিতবাবু— ছেলেটির বয়স সাতাশ। আমরা বুঝতে পারছি ওঁরা মেয়ের বয়স কুড়ি বাইশ চাইবে।'

স্তম্ভিত কবিতা। অবাক চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চান, পাবেন। কিন্তু আমি কুড়ি বাইশ হবো কি করে? আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগছে বাবা—যে সম্বন্ধ প্রথমেই না হবার মস্ত কারণ রয়ে গেছে, তা নিয়ে তোমরা এত কথা বলছ কেন?'

হঠাৎ শোভনা দেবীর উপর আগুন হয়ে উঠলেন ললিতবাবু—'সেই থেকে চুপ করে রয়েছ—যেন কিছুই জাননা। চিঠি কি আমি লিখতে গিয়েছিলাম?'

সঙ্গে সঙ্গে শোভনা দেবী দম দেওয়া পুতুলের মত গরগর করে বলে উঠলেন—'আমরা ঠিক করেছি তোমার এম. এ পাশ করার কথা বা প্রফেসরি করার কথা বলব না। আমরা বলব তুমি বি.এ. পড়েছ।

কবিতা বাবা মার দিকে তাকিয়ে রইল। দুজনের একসঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

ললিতবাবু একটু স্নেহের হাসি হেসে বললেন —'তোমার খুব অবাক লাগছে না? তা লাগবেই। এ সব কথা কি সহজে মনে আসে মা? বাপ-মা হলে তবেই মনে আসে। মেয়ের বিয়ের জন্য কত মিথ্যেই যে মা-বাপকে বলতে হয়, তার কি সীমা-পরিসীমা আছে? ঠিকুজি পালটে বয়স কমান—এতো...'

'থামো বাবা।' ললিতবাবুকে থামিয়ে দিল কবিতা। বললো, 'আমার বড্ড খারাপ লাগছে তোমার মুখে এ জাতীয় কথা শুনতে। এ যেন ঠিকুজি লুকোবার মত একটা ঘরোয়া ব্যাপার!'

শোভনা দেবী চোখে আঁচল চাপা দিলেন, 'যদি একটুও মায়া থাকত তোর আমাদের প্রতি তবে কি আমাদের সাধ আহ্লাদে এমন নিষ্ঠুরের মত বাদ সাধতে পারতিস?'

কবিতা উঠে পড়ল। ক্লান্ত কণ্ঠে বললো, —'ছেলেমেয়ে দু-চারটি বেশী থাকাই ভালো দেখছি। একটি দুটি হলে বড় বেশী চাপ এসে পড়ে তাদের ওপর।'

'তাদের ওপর চাপ এসে পড়ে না বাপ-মার উপর চাপ এসে পড়ে? যক্ষের ধনের মত বুকে আঁকড়ে বড় করে তোলার পর যদি সে সন্তান ফিরেও না তাকায়, তখন কার দিকে চায় বাবা-মা? বেশী সন্তান থাকলে একজন অবহেলা করলে আর একজন সেটা পুষিয়ে দেয়। আজ যদি তোমার ছোট মেয়েটা বেঁচে থাকত'—দু-চোখ ভরা জল আঁচলে মুছলেন শোভনা দেবী। কিন্তু তারপরই আচমকা দস্তুরমত তাজা হয়ে উঠে বসলেন—'বেশ তুমি কবিতা নও। তুমি আমাদের হারানো কল্পনা। সে বেঁচে থাকলে তো এখন আই, এ-বি-এই পড়তো।'

'আচ্ছা, তবে এবার কবিতা মরবে। কল্পনা বেঁচে উঠবে?

'বালাই ষাট, মরবে কেন? কবিতা আরো লেখাপড়া করতে বিদেশে যাবে।'

কবিতা আর না হেসে পারল না। ঝরঝর করে হেসে উঠল সে। 'মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তো সত্যি দেখছি মিথ্যার মাথা খুলে যায় মা'দের।'

মেয়ের সম্বন্ধে পূর্বের সেই ভীতভাবটা আস্তে আস্তে কমে আসছিল শোভনা দেবীর। বিশেষ করে মেয়ের মুখে হাসি দেখে গদগদ হয়ে পড়লেন তিনি। হাসি তো নয় যেন বরাভয় দেখলেন মেয়ের মুখে। তিনিও হেসে ফেললেন। কিন্তু ললিতবাবু কন্যার কাছে তিরস্কৃত হয়ে সেই যে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন, আর মুখ খুলছিলেন না। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, — বৃথা।

চুনো সংবাদ নিলে এলো, দিদিমণি তোমার কাছে কারা যেন এসেছেন। পর্দা সরিয়ে কয়েকটি মেয়েকে ঘরে ঢোকবার পথ করে দিলো চুনো। মেয়ে কটি ঘরে ঢুকে কলকল করে উঠল—'তোর বাড়ী পেতে আজ আমাদের জীবন বের হয়ে গেছে রে কবিতা।'

বাবা-মার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি ফেলল কবিতা তার চোখে প্রচ্ছন্ন আমোদের আভাস। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললো—'আমি কবিতা নই। আমি তার ছোট বোন কল্পনা। আপনারা বসুন। আমি দিদিকে ডেকে দিচ্ছি।'

মেয়ে তাদেরই একহাত নিচ্ছে! শোভনা দেবী আর ললিতবাবু আস্তে আস্তে সরে পড়লেন।

বন্ধুরা সবাই গালে হাত দিল—'কবিতার ছোট বোন তুমি? কি আশ্চর্য্য। একেবারে একরকম দেখতে।'

কবিতা বিনীতকণ্ঠে বললো, 'হ্যাঁ সবাই ভুল করে। আপনারা বসুন।' সবাইকে বসিয়ে কবিতা বেরিয়ে গেল।

এক সখী বললো—'কি আশ্চর্য্য মিল!'

অন্যজন বলল — 'ভাইবোনদের ভেতর এমনি মিল খুব দেখা যায়। যমজ হলে তো কথাই নেই।'

সেই গোলাপী শাড়ি-পরা, সেই লাল বাটিকের কাজ করা ব্লাউজ গায়ে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে শুধু খোলা চুল-টাকে হাতে জড়িয়ে উঁচুখোঁপা বেঁধেছে—কবিতা এসে ঘরে ঢুকল। 'কি রে তোরা সব হঠাৎ?'

'তুই কবিতা না কল্পনা রে?'

ভীষণ জোরে শব্দ তুলে হেসে উঠল কবিতা। 'আমি যথার্থই কবিতা আর কল্পনা যথার্থই কল্পনা!

একজন বললো, 'একরকম পোশাক করিস তোরা?

'সব সময়।'

আর একজন বললো, 'এত মিলও হয় নাকি?'

অন্যজন বললো, 'হয়'।

তারপর কে কোথায় বিস্ময়কর মিল দেখেছে সেই গল্প হতে লাগল। ওরা একটা নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। নিমন্ত্রণ করে চলে গেল। কবিতা মনে মনে বললো, 'কাল কলেজে তোমাদের গাধা বানিয়ে ছাড়ব।'

ওর ক্লান্ত লাগছিল। সকাল থেকে একটানা কলেজের খাতা দেখেছে। বিকেল থেকে এই পর্য্যন্ত বাবা-মার আজগুবি সব কথার সঙ্গে লড়াই করছে। ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সোফায় মাথা রেখে চোখ বুজল কবিতা। ও টেরও পেল না একজোড়া কর্তা-গিন্নি যে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। কর্তা নীরবে আসন গ্রহণ করলেন এবং গিন্নিকেও ইশারায় আসন নিতে বললেন।

এক সময় চোখ মেলে একজোড়া কর্তা-গিন্নিকে ওর মুখোমুখি বসে থাকতে দেখে ত্রস্তে উঠে বসল কবিতা।

'আমার নাম গণেশ রায়।'

কবিতাকে উঠে বসতে দেখেই ভারী মোটা গলায় নিজের নাম বললেন গণেশ রায়। এ নাম জীবনেও কবিতা শোনেনি। কিন্তু যেমন দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি নাম বললেন তাতে কবিতার বুঝতে আটকালো না, এত কাণ্ড যে লোভনীয় ছেলেটির জন্য—এরা নিশ্চয়ই সেই পাত্রের পিতামাতা হবেন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন কবিতা। বললো — 'আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।'

'তুমিই বোস মা। তোমার সঙ্গেই কথা বলা যাক্। বাবা একটু পরে এলেও ক্ষতি নেই। বোস মা বোস।'

বসাতেই হলো কবিতাকে। বসে একটু হাসতেও হলো। গম্ভীরভাবে বসলে বিশ্রী দেখাবে বলেই হাসতে হলো তাকে। কিন্তু গণেশবাবু বলে উঠলেন, 'এই হাসিটাই চাই আমি। তোমার ফটোতে এই হাসিটি ছিল, বাস্তবেও আছে কিনা সেটাই দেখতে এসেছিলাম। আমার কনে দেখা হয়ে গেছে গিন্নি—এবার তোমার দেখা তুমি দেখো।'

'কি পড়ছ মা তুমি?'

কি জবাব দেবে কবিতা? মা-বাবা কি লিখে বসে আছেন কে জানে! ভীষণ নির্দয় হয়ে উঠতে ইচ্ছে করল কবিতার বাবা-মার উপর। ওকে নিয়ে এমনি ছেলেখেলা করতে কখনোই পারেন না ওঁরা। ইচ্ছে হলো জোরে বলে ওঠে—আমি এম-এ পাশ করে পাঁচ বছর ধরে প্রফেসরি করছি।

এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে ললিতবাবু আর শোভনা দেবী এসে উপস্থিত হলেন। কর্তা লাঠিশুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার জানালেন—'খবর না দিয়েই এসে পড়লাম মশাই। অপরাধ নেবেন না।'

বিনয় বিগলিত কণ্ঠে ললিতবাবু বললেন—'না, না, তার জন্য কি। খুব ভালো করেছেন।' কথার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাইতে লাগলেন। কি বলেছে মেয়ে কে জানে!

দৃঢ় চিবুকে বাবাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল কবিতা। শোভনা দেবী, ললিতবাবু বসলেন। দরাজ গলায় গণেশবাবু বললেন—'আপনাদের মেয়েটি আমাদের খুবই পছন্দ হয়েছে। ফটোর পাহাড় জমে উঠেছিল মশাই—যাকে বলে পাহাড়! কাকে ফেলে কাকে দেখি! আরে মশাই দেশের অবস্থা কি হয়েছে দেখেছেন? একটা চাকরীর জন্য পঁচিশ হাজার প্রার্থী। একটি মেয়ে চাইলে বিশ হাজার ফটো—'

গিন্নি মুখ ঝামটা দিলেন—'মেয়ে দেখতে এসেও যত বাজে কথা।'

গণেশবাবু চোখ পাকালেন, 'দেশের কথা বাজে কথা?'

গিন্নি মুখ মটকালেন, 'সবটারই একটা সময়-অসময় আছে।'

কর্তা রায় দিলেন, 'দেশের কথার কোন সময়-অসময় নেই।'

ললিতবাবু হেসে বললেন, 'আমার বন্ধু যতীনের সঙ্গে আপনার খুব মিলবে। তারও কেবল এই এক উত্তেজনা।'

কর্তা গিন্নিকে আড়নয়নে একবার দেখে নিয়ে ললিতবাবুকে বললেন—'চটে যাচ্ছেন। আজ ওঁকেই কিন্তু ছেড়ে দেওয়া যাক ওঁর যখন ছেলে— কি বলেন? লাখ কথা না হলে যখন বিয়ে হয় না, তখন কিছু কথা না বললে উনি শান্তি পাবেন না।'

গিন্নি শোভনা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'না ভাই, লাখ কথাটথা আমার নেই। তবে কিছু কথাবার্তা তো দুই পক্ষকেই জানতে হবে।'

'সে তো অবশ্যই।' ম্রিয়মান গলায় শোভনা দেবী, ললিতবাবুর কথাটা সমর্থন করলেন।

প্রস্তুত হয়ে বসলেন গিন্নি।

'গান-বাজনা-টাজনা কিছু জানে নিশ্চয়ই?

বাঘ এখনও আসেনি। শোভনা দেবী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'বাজনা জানেনা। কিন্তু গানের গলা ওর খুব মিষ্টি।'

'বাঃ! আমার ছেলে আবার গান খুব ভালোবাসে।' খুব তৃপ্ত হলেন গিন্নি মনে হলো।

'কি পড়ছে এখন?'

বাঘের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখন কি জবাব দেবেন শোভনা দেবী। কিন্তু শোভনা দেবীকে কিছু করতে হলো না। প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে ললিতবাবু যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠলেন—'ও এম.এ. পাশ করেছে।

স্ত্রীকে মুখ খুলতে সুযোগই দিলেন না তিনি। যদি সন্তানের প্রতি মায়ের দুর্বলতা দুঃসাহসী হয়ে ওঠে!

'আমার ছেলের বয়স সাতাশ। মেয়ের বয়সটা ভাই কত? কোন সনে এম. এ দিয়েছে?'

বাঘ এসে পড়েছে। এক লহমার জন্য দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কিন্তু গণেশবাবুর লক্ষ্য এড়াল না এই দৃষ্টি বিনিময়। 'এম-এ পাশ করেছে—বাইশ তেইশ হবে আর কি।'

গিন্নি ক্রুদ্ধ হলেন— 'ওঁদের মেয়ে, বয়সটা ওঁদেরই বলতে দাওনা?'

'ওঁরা বলতে পারবেন না ঠিকটা।'

'ওরা, বলতে পারবেননা ঠিকটা।'

'কেন'? ভ্রূ কুঁচকে তুললেন গিন্নি।

'তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছ গিন্নি—বলতে পেরেছ কখনো ঠিক বয়স?'

কালো হয়ে উঠলো গিন্নির মুখ। অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন শোভনা দেবী আর ললিতবাবু। এখন তাদেরই উচিত কবিতার বয়সটা গিন্নিকে বলা। শোভনাদেবী একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন— 'না, না, ঠিক বয়স উনি জানতে চাইবেন বৈকী। কবিতার বয়স'—

'ত্রিশে পড়েছে তো'? আবারও উত্তর দিলেন গণেশবাবুই।

শোভনা দেবী এবার ঠিক হাসি হেসে বললেন, 'না, ত্রিশ হতে ওর দেরী আছে।'

'হলেই বা ক্ষতিটা কি। কি বল গিন্নি আমাদের কি ক্ষতিটা হয়েছে? গিন্নির অগ্নিবর্ষী দৃষ্টির উপর হা-হা করে হাসির জল ঢেলে দিয়ে গণেশবাবু বললেন—'আরে এখন বলার আর আপত্তি কি? আমার বাবা-মা তো এখন স্বর্গে! বুঝলেন ললিতবাবু ওঁর বাবা-মা আমার বাবা-মার কাছে কিছু বয়স ফাঁকি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে জন্য আমাদের জীবনে কোন ফাঁক পড়েনি। কি বল গো? পড়েছে?' — বলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রহস্যপূর্ণ ভাবে চোখ টিপলেন গণেশবাবু।

শোভনা দেবী ললিতবাবু হেসে ফেললেন। 'আসছি' বলে শোভনা দেবী উঠে গেলেন জলযোগের ব্যবস্থা করতে। মনটা যেন আনন্দে নাচছিল তার। যাক মেয়ের সঙ্গে আর বিরোধ রইল না। গণেশবাবু সত্যি সত্যি তার জীবনে সিদ্ধিদাতা গণেশ হয়ে দেখা দিয়েছেন। কেউ আছে কিনা—চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে শোভনা দেবী দু-হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। সিদ্ধিদাতা গণেশকে করলেন না গণেশবাবুকে করলেন, কে জানে?

কিছুক্ষণ বাদেই পেন্টভরা মিষ্টি আর চা নিয়ে ঢুকলেন শোভনা দেবী। কর্তা মিষ্টির প্লেট হাতে নিয়ে বললেন, 'খাবার সময় আমি কথা বলিনে। নাও, গিন্নি, এবার তোমার কথা তুমি সেরে নাও।'

গিন্নি এবার খাঁটি অর্থে মুখ ঝামটা দিলেন— 'তুমি থাকতে কথা? তোমাকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে তবে কথা কওয়া যাবে।'

মুখভরা মিষ্টি নিয়ে গণেশবাবু অতি কষ্টে বললেন, 'আমি এখন খাচ্ছি। আমার মুখ চাবি দেওয়াই ধরে নিতে পার। দেনা-পাওনার কথাটা তোমার সেরে নাও এই বেলা।'

গিন্নিও মিষ্টির প্লেট হাতে তুলে নিয়ে বললেন — 'চাওয়া-পাওয়া নেই ভাই কিছু। বড় ছেলের বিয়েতেও আমরা কিছু চাইনি। কিন্তু চাইনি বলে কি দেয়নি তারা? হীরে-মুক্তোর সেট থেকে ডাইনিং রুম, বেড রুম, ড্রেসিং রুম সেট—ফ্রিজ থেকে রেডিওগ্রাম, টেপরেকর্ডার, কোনটা দেননি ওঁরা? বড় ছেলের ঘরে রয়েছে, ছোট ছেলের ঘরে না থাকলে কি হয় আপনিই বলুন? বড় বৌর অহঙ্কার হবে না?'

ললিতবাবু আর শোভনা দেবীর বুক হিম! মুখে সন্দেশ ঠাসতে ঠাসতে গণেশবাবু বললেন — 'তোমার দাদা কিন্তু মেয়েকে কিছুই দেননি, — যদিও তিনি টাকার কুমিরই বলা চলে।'

'আমার দাদা? আমার ভাই-ই নেই কোন, আর তুমি কার নামে মিথ্যে কথা বলছ?'

গলায় বোধহয় সন্দেশ আটকে গিয়েছিল; কিছুটা জল খেয়ে নিয়ে গণেশবাবু বললেন, —'দেখুন ললিতবাবু কি বোকা? যে ভাই জন্মায় নি তার নামে আবার সত্য মিথ্যে কি? দুই বেচারাকে বড্ড ঘাবড়ে দিচ্ছিলে—একটু ভরসা দিলাম।' ফের ছেলেমানুষের মতো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন গণেশবাবু।

শোভনা দেবী হেসে বললেন—'ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। দরকারী কথা ওঁর সামনে হবে না। আমরা পরে কথা বলব।'

গণেশবাবু খাওয়া শেষ করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'কবিতার সঙ্গে একটু গল্পসল্প করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মেয়েটা বোধহয় আজ খুব ক্লান্ত। এসে দেখলাম চোখ বুজে বিশ্রাম করছে। কাল হবেনা—পরশু আসছি, আবার আমরা।'

'আমি তোমার সঙ্গে, আর আসছিনে। দিনে দিনে ভীমরতি ধরছে তোমার।'

'ছেলের সঙ্গে এসো।'

'সে দেখা যাবে।'

কর্তা-গিন্নি চলে গেলে শোভনা দেবী আদুরে গলায় বললেন, 'আমরা তো কিছু মিথ্যে বলিনি-তবে আর কি! কিন্তু জিনিস যা চাইছেন—'

'আরে জিনিসের জন্য ভেব না। হীরের গয়না থেকে কলাপাতা পর্যন্ত সব আজকাল কিস্তিতে পাওয়া যায়। সব দেবো—মেয়ে কোথায়?'

'বোধহয় ওর ঘরে।'

'আচ্ছা দেখেছ, গণেশবাবু সিগারেট খান না—আমিও তাই সিগারেট খেতে ভুলে ছিলাম।' খুশি মনে একটা সিগারেট ধরাতে গেলেন ললিতবাবু—

ঠিক তক্ষুনি স্যুটকেস হাতে এসে ঘরে ঢুকল কবিতা। বললো—'আপাততঃ এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। তারপর কলেজ হোস্টেলে ব্যবস্থা করে নেব।'

আর সিগারেট ধরান হলো না। বিমূঢ় দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ললিতবাবু বললেন—'আমরা বয়স নিয়ে মিথ্যে কথা বলিনি তো?'

'কিছু মনে করোনা বাবা। তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি সত্যি আজ হতভম্ব হয়ে গেছি। এঁদের কাছেও আবার কি বলে বস, কি করে বস—তাই পাশের ঘর থেকে আমি তোমাদের কথায় কান রেখেছিলাম। মিথ্যে কিছু বলনি ঠিকই—কিন্তু সত্যও বলনি।'

'বেশ তো বলব। তাতে হয় হবে, না হয় না হবে। তোমার চলে যাবার কি আছে?

শোভনা দেবী ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'কি হৃদয়হীন মেয়ে গো!'

এমনি সময় যতীনবাবু এসে উপস্থিত হলেন, ঘরের মানুষগুলোর দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে এনে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

যতীনবাবুকে দেখে ললিতবাবু যেন প্রাণ পেলেন। বললেন, 'তোমার বুদ্ধি এবার তুমি সামলাও যতীন। তোমার কথামত কিছুই করিনি, শুধু বলে ছিলাম কথাটা—তাতেই এই কাণ্ড!'

'এটা আপনার বুদ্ধি কাকাবাবু?'

যতীনবাবু মাথা চুলকোতে লাগলেন। 'বুদ্ধিটা কি মন্দ ছিল মা?' বিদ্যে-লুকোনো —সে তো বিনয়। যাক্ গে। হাত থেকে স্যুটকেসটা তো নামাও। মা-বাবার অবস্থা দেখছ না? বলে যতীনবাবু নিজেই কবিতার হাত থেকে স্যুটকেস টেনে নিলেন। তারপর স্যুটকেসে ঝাঁকুনি দিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'এযে একদম ফাঁকা!'

অস্থৈর্য্য কণ্ঠে কবিতা বললো—'এর চাইতে বেশী দরকার হবে না, জানতাম কাকাবাবু তাই কাপড়জামা টানাটানি করে কাজ বাড়াইনি। কিছু মনে করবেন না কাকাবাবু, আজ আমি বড্ড ক্লান্ত —আমি যাচ্ছি।' ভেতরে চলে গেল কবিতা।

কবিতা চলে গেলে ললিতবাবুর কাছে সব শুনে যতীনবাবু বললেন 'আগেই মেয়েকে বলতে গিয়েছিলে কেন? ঐ ভুল করেছ।'

আপসোস করলেন ললিতবাবু—'মস্ত ভুল করেছি। তোমার কথা শুনলে এ সম্বন্ধটি হয়ে যেত বোধহয়।'

'এখন আর কি করা, জানিয়ে দাও। যদি গণেশবাবু ম্যানেজ করতে পারেন স্ত্রীকে।'

কিন্তু গণেশবাবু ম্যানেজ করিতে পারলেন না স্ত্রীকে। গিন্নি শোভনাদেবীকে চিঠি দিলেন —'মেয়ে আমাদের যারপর নাই-ই পছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু ছেলের বয়সের সঙ্গে মানাইবে না। একেবারে সমান সমান বয়স হইয়া যাইবে বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

দু-মাস পর।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে কবিতা দেখল মা কাঁদছেন। মেয়েকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন শোভনা দেবী। কবিতা মার মুখ টেনে নিজের দিকে এনে ভীত কণ্ঠে বললো, 'কাঁদছে কেন? কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

'তবে কাঁদছ কেন?'

'এমনি।'

'এমনি আবার কেউ কাঁদে নাকি?'

'কিছু করার নেই তাই একটা কিছু করছি।'

'কিছু করার নেই? এসো, আমার পরীক্ষার খাতার নম্বর গুনে দেবে—এসো', মার হাত ধরে টানতে লাগল কবিতা।

শোভনা দেবী চোখ মুছে বললেন—'গণেশবাবুর ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।'

'সে জন্যে তুমি কাঁদবে কেন?'

'কার সঙ্গে ঠিক হলো জানিস?'

'না।'

'পুচকির সঙ্গে।'

'হ্যাঁ। যতীনবাবু বলে গেলেন। বিজ্ঞাপন পড়ে তোর যতীনকাকিমাও নাকি চিঠি দিয়েছিলেন। তা নীরা দেখতে সত্যি তো সুন্দর। পছন্দ হবারই কথা। তার ওপর তোর চাইতে 'ছ' বছরের বড় হলে কি হবে, বি.এ. পড়ে। বয়স কুড়ি যে।'

কৌতুকে মার গলা জড়িয়ে ধরে হেসে উঠলো কবিতা— 'বাঃ চমৎকার তো। কাঁদছিলে কেন তবে? হাসবে তো।'

হাসব কেন? আক্কেল দেখব, বিদ্রূপে ঠোঁট উছলে তুললেন শোভনা দেবী .... 'আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বয়সে মানাইবে না- সমান সমান হইয়া যাইবে'— যা বুড়ি যা, এবার মানা গিয়ে ছেলের সঙ্গে।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা
৭ই এবং ১৪ই চৈত্র, ১৩৭৭

মর্যাদা

মুখার্জি বংশ লোহার পারমিট দিয়ে বড়লোক হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশে যে কালোটাকার খেলা আরম্ভ হলো, সেই কালোটাকার খেলায় বাঙালী হেরে গেল মাড়োয়ারীর কাছে। প্রসাদ মুখার্জি মরণবাঁচন চেষ্টা করেছিলেন—অনেক অনেক টাকাও ঢেলেছিলেন, যেখানে টাকা না ঢাললে পারমিট চালু থাকে না। কিন্তু পারলেন না। চুক্তিপত্র চলে গেল মাড়োয়ারীর হাতে।

তারপর থেকেই শুরু হলো ধনী মুখার্জি বংশের পড়তি দিন। অবশ্যি শুধু মাখার্জি বংশের নয়— ধনী আর জমিদার বংশের পড়তি সময়ের সেটাই আরম্ভকাল। কিন্তু তাই বলে আনন্দে উদ্‌বাহু হয়ে উঠবার কোন কারণ ঘটেনি। টাকা এক হাত থেকে অন্য হাতে গেছে মাত্র। ধর্মপরায়ণ সমাজসেবী ধনী আর জমিদার উৎখাত হয়েছে কিন্তু তৈরী হয়েছে এক দিকভ্রষ্ট সমাজবন্ধনহীন আত্মপরায়ণ অঢেল টাকাওলা গোষ্ঠী। নতুন গজানো এই ফ্যাশেনেরল বড়লোকবৃন্দ বিলাস ব্যসন আর ফুর্তিতে ডুবন্ত দুর্জনের দল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই টাকার হাত বদলে লাভ তো হয়ইনি—লোকসান হয়েছে ষোল আনার জায়গায় এক'শ আনা! সমাজ তলিয়ে যাচ্ছে নীতি বিবেকহীনতার অতলে। দেশের চরম দুর্ভাগ্যের কারণ হবে একদিন এরাই। কিন্তু আমি দেশের কথা লিখতে বসিনি—এটুকু কলমের টানে এসে গেল! ঠেকাতে পারলাম না।

এই পড়ন্ত মুখার্জি বংশের ছেলে নীরেন মুখার্জি উত্তরাধিকারসূত্রে শেষ পর্যন্ত যা পেলেন তা হলো সব ধরনের ঝড়তি পড়তি একখানা বাড়ি আর তার সঙ্গে একটি বড়লোকী মেজাজ।

পেপার মিলের হাজার দেড় হাজারী ম্যানেজারীর টাকায় আজকের দিনে বড়লোকী মেজাজ চালিয়ে যাওয়া যায় না। নীরেন মুখার্জীকে মাঝে মাঝেই মেজাজ নামিয়ে আনতে হয়। দোল দুর্গাপূজা ইত্যাদি তো গেছেই। বাজারে গিয়েও মাছের বদলে ডিম, মাংসের বদলে কিমা কিংবা কাঁকড়া কিনে ফিরতে হয়। ভুলে যেতে হয় মুরগীর স্বাদ। বাড়ির ট্যাকস্ গুনতে না পেরে জমে উঠে দাঁড়ায় গিয়ে বড় অঙ্কে। সময় নিতে হয় বেলিফের কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে। ঘরে এসে সক্ষোভে স্ত্রী সুষমাকে বলেন, বাড়িঘরটুকুও আর বাঙালীদের থাকতে দেবে না এরা। শেঠ মশাই তো বসে আছেন ওত-পেতে আমার বাড়ির জন্য। ন'তলার ফ্ল্যাট করেছেন, কিন্তু জমি পাননি মাটির তলায় গ্যারেজ বানাবার। আমার বাড়ি ধূলিসাৎ করে দিতে পারলে তার সে বাসনা সফল হয়।

সুষমা বলেন, 'একতলাটা ভাড়া দিয়ে দিতে বলেছি। কানেই নিচ্ছনা।'

কানে নিতেই হয় একদিন। ভাড়াও দিতে হয়। কিন্তু আজকাল টাকা—হাতের মুঠোর জল। এলো তো ফুরিয়ে গেল। জমার যোগফলে সংখ্যাটা কিছু বাড়তি দেখায় বটে, খরচের বেলা কিন্তু সেই শূন্য হাতই লাগে।

সে দিন অফিস থেকে ফিরে জামা কাপড় বদলে নীরেনবাবু বসেছিলেন। মাথার উপর পাখা ঘুরছিল।

সুষমা এসে দাঁড়াল—বা, হাতমুখ ধোওনি? লুচি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঠেলে রাখবে। শিগ্‌গিরি যাও। আমার লুচি ভাজা হয়ে গেছে কিন্তু।

নীরেনবাবু উঠে হাতমুখ ধুয়ে এসে লুচি তরকারীর প্লেট নিয়ে বসলেন। সুষমা বসলেন সামনে।

নীরেনবাবু খেতে খেতে বললেন, 'ছেলে মেয়েরা কোথায়?'

'রুমাঝুমারা নীচে খেলছে। আর জয়তি' — বলে থামলেন সুষমা।

জয়তি ওদের বড় মেয়ে। বি. এ. পড়ছে।

নীরেনবাবু মুখ তুললেন, 'জয়তি বলে থামলে যে?'

'না থামবো কেন?' মুখে বললেন। কিন্তু একটু থেমে থেমেই যেন বললেন সুষমা, 'একটু বেড়াতে বেরিয়েছে—অবশ্যি আমার কাছে বলেই গেছে—এই এক্ষুনি ফিরবে।'

'কোথায় গেছে বেড়াতে?'

'কোথায় গেছে তা তো বলেনি। বলল, একটু ঘুরে আসব মা?'

'একা?'

'না — একাকী দি নাকি! গৌতমের সঙ্গে গেছে। চমৎকার ছেলেটি।'

ব্যাপার বোঝা হয়ে গেল নীরেনবাবুর। কিন্তু বোঝার পরও শোনার যে কথাগুলি থাকে তা শুনবার জন্য সুষমার দিকে তাকালেন।

ভেতরের অনামনস্কতার উপর কথা টেনে এনে বললেন, 'এই চমৎকার ছেলেটি কে?'

'জয়তি লাইব্রেরী পড়তে যায় তো? সেখানেই পরিচয় হয়েছে। গৌতমও পড়তে যেত। সে তখন আই. এ. এস. দেবার জন্য তৈরী ছিল। আই. এ. এস. অবশ্যি পাশ করতে পারে নি। কিন্তু ক্লাশ ওয়ান চাকরী পেয়েছে রেলওয়েতে। গৌতমের বাবাও বড় কাজ করেন ব্যাঙ্কে। নতুন বাড়ি করেছেন যোধপুর পার্কে।' চোখমুখ উদ্ভাসিত করেই সুষমা কথাগুলি বললেন। কিন্তু তবু কোথায় যেন চোখের আড়ালে ভয়ের ছায়াও রয়ে গেল।

হরি এসে খাবার প্লেট সরিয়ে নিয়ে গরম চা রেখে গেল দুজনের সামনে।

নীরেনবাবু চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'কে বলল গৌতমের এত খবর তোমাকে? জয়তি?'

'আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি।'

সুষমার মুখে গৌতমের কথা শোনার পর থেকে নীরেনবাবুর ভেতরে অন্যমনস্কতা কাজ করে চলছিল। তবু তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সুষমার চোখের ছায়া এড়ায়নি। 'ছেলেটির পুরো নামটি কি?' জিজ্ঞাসা করতেই সুষমার চোখের সেই ছায়া যে সমস্ত চোখে আরো গভীর দাগে ছড়িয়ে পড়ল—এটাও লক্ষ্য করলেন নীরেনবাবু।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঢোক খাওয়া ভাবটা চায়ের চুমুকের সঙ্গে গিলে ফেলে সুষমা বললেন, 'গৌতম জানা।'

'জানা?'

'জানা'! কথা নয়তো যেন নীরেনবাবুর মুখ থেকে গুলি ছুটল।

মুখ কালো হয়ে গেল সুষমার।

নীরেনবাবু চা শেষ করলেন থমথমে মুখে। তারপর কাপ নামিয়ে রেখে গম্ভীর কণ্ঠ কিন্তু একটু জোরেই বললেন, 'এই ঘুরতে বেড়ানোটা নিশ্চয়ই সাত পাক ঘোরার আগের মহড়া? নইলে নিশ্চয়ই তুমি যেতে দিতে না?'

সুষমা চুপ।

নীরেনবাবু কেন জানি আরো একটু গলা ছড়ালেন, মুখার্জির মেয়ের সঙ্গে জানার ছেলের বিয়ে? তুমি এতো আধুনিক হলে কবে থেকে? বিদেশী সমাজে জাত নেই কিন্তু অভিজাত্যের বেড়া আছে। সে বেড়া ডিঙ্গানো হাজার ছেলে মেয়েদেরও সম্ভব নয়। ডিঙ্গোলে রাজত্ব ছাড়তে হয়। সবই তো গেছে। পারিবারিক আভিজাত্যটাও ডুবাতে বসেছ? আমাদের গরু চরাত জানারা — তা জানো?

নীরেনবাবুর স্বর চড়ছিল, কথা কড়া হচ্ছিল—কারণ তিনি টের পেয়েছিলেন একটা চটির শব্দ উঠে এসে দরজার কাছে থেমে পড়েছে। পরিবারের প্রত্যেকের পায়ের চলার শব্দ প্রত্যেকে চেনে। জয়তি এসে দরজায় থমকে গেছে তিনি বুঝেছিলেন। কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে জয়তি যে তার চটির শব্দ চেপে অন্য দরজা দিয়ে ঘুরে ভেতরে ঢুকে গেল তাও তিনি বুঝলেন। জয়তি দাঁড়িয়ে থাকলে আরো কিছু শক্ত কথা হয়তো তিনি বলতেন। কিন্তু সে চলে যেতেই তিনিও থেমে গেলেন। তার প্রায়োজন ছিল নিজের মত জানিয়ে দেওয়া। হয়ে গেল। ব্যাস্। একটা মোটা চুরুট ধরালেন তিনি।

সব উৎসাহ, আশা উবে গেল সুষমার। চা গলা দিয়ে আর নামল না। কাপটা নামিয়ে রেখে কাঠ হয়ে বসে রইলেন। স্বামীর অনিচ্ছায় এক পা বাড়াবার শক্তি নেই তার। এবং সেটা ভয়ের নয়। শ্রদ্ধার। একটু বাদে মিনমিনে গলায় তবু বললেন, 'জাতটা এত বড় কিছু নাকি আবার আজকাল।'

মুখের চুরুট সরিয়ে নীরেনবাবু বললেন, 'বড়। লেখাপড়া শেখা যায় পরীক্ষায় পাশ করা যায় এক পুরুষেই। কিন্তু রক্তে গিয়ে সেই শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটতে—রক্তকে পরিশুদ্ধ কালচারে পরিণত করতে শিক্ষার সময় লাগে কয়েক পুরুষ।'

'গৌতমের আসা যাওয়া বন্ধ করে দেবে। জয়তির সঙ্গে মেলামেশাও।'

মুখ কালো করে উঠে দাঁড়িয়ে এক পা করে চলে যাচ্ছিলেন সুষমা। নীরেনবাবু বললেন, 'তোমার চা খেলে না?'

'ওঃ' বলে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন সুষমা। বারান্দায় এসে দেখা হলো নীরেনের বোন মায়ার স্বামী বিমলবাবুর সঙ্গে। সুষমা চোখের ইশারায় তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন একেবারে বারান্দার কোণের

দিকে। চাপা গলায় ব্যাপার জানিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'এমন ছেলে পাওয়া কি সোজা বলুন তো? দেখুন না একটু বলে আপনি। ছেলেটি সব দিক দিয়ে চাইবার মতো ছেলে।'

'আচ্ছা দেখছি।' বলে বিমলবাবু এসে বসলেন নীরেনবাবুর কাছে। চুরুটের কেস্ থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে ধরিয়ে বেশ জুত করে বললেন, 'মুখ গম্ভীর কেন? কেনই বা এতো চিন্তা আকুল? কি হয়েছে?'

'আজকাল সর্বত্র যা হচ্ছে তাই হয়েছে।'

সর্বত্র যা হচ্ছে তাই যদি হয়ে থাকে তবে আর রাগ করে, চিন্তা করে লাভ কি? হতে দাও?'

'হতে দেবো? কেন, আমার নিজস্ব চলতি থাকতে পারে না?'

অবশ্যই পারে। কিন্তু সমাজ যে দিকে গতি নেয়, তার বিপরীত দিকে চলতে গেলে লাভ হয় না — বরং ক্ষতিই হতে দেখা যায়।'

'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এসো এক হাত খেলা যাক্।' উঠে আলমারির উপর থেকে দাবা নামিয়ে আনলেন নীরেনবাবু। বসলেন গুটি সাজিয়ে।

বিমলবাবু খেলায় বসেও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন—হাত তুলে থামিয়ে দিলেন নীরেনবাবু।

সুষমা ঘরে ঢুকে জয়তিকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। জয়তি তো এসে চুপচাপ বসে থাকার মেয়ে নয়! বাপের সব চাইতে আদরের যাকে বলে, বাপ সোহাগী—জয়তি ঠিক তাই। অফিস থেকে ফেরা মাত্র ছুটে গিয়ে পায়ের কাছে বসবে। কোলে হাত রাখবে। তারপর যত রাজ্যের গল্প আর সংবাদ বলতে আরম্ভ করবে বাবার কাছে। আজ অন্য দরজা দিয়ে এসে বই মুখে নিয়ে বসে রয়েছে কেন? কখনই বা এলো? বাবার কথা কি শুনেছে? তাড়াতাড়ি জয়তির কাছে এসে দাঁড়ালো সুষমা। বললেন, 'কখন এসেছ জয়তি? টের পেলাম না তো?'

'অনেকক্ষণ এসেছি। তোমরা কথা বলছিলে, তাই ঢুকি নি।' বই থেকে চোখ না তুলে জবাব দিল জয়তি।

জয়তির টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন সুষমা। বঝলেন, জয়তি শুনতে পেয়েছে বাবার কথা। কোনদিন কড়া কথা তো দূরের কথা, উঁচু কথা শোনেনি জয়তি—যে অভিমানী মেয়ে! বুক দুরদুর করতে লাগল তার। কিছু কথা খুঁজে না পেয়ে বললেন, 'চা খাবে?'

এবার জয়তি চোখ তুলল বই থেকে। বলল, 'তুমি খাবে?'

'তুমি খেলে আমিও খাব।'

'আমি খাব তুমি খেলে—' বলে হেসে উঠল জয়তি, শান্ত জয়তি।

কিন্তু তবু যেন এটা শান্তভাব নয়।

এটা নিশ্চলতা।

অস্বস্তিকর নিশ্চলতা।

সুষমা বারবার উঠে গিয়ে রাত্রে দেখে এলেন মেয়েকে। সকালবেলাও প্রথমই গিয়ে উঁকি দিলেন জয়তির ঘরে। তাকে বিছানায় না দেখে ঢেঁকির পাড় পড়ল সুষমার বুকে। দৌড়োলেন ছাদে। বুক শান্ত হলো। জয়তি পায়চারি করতে করতে একমনে পড়ছে।

কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। কলেজে যাওয়া নেই। বাড়িতে বসে জয়তি মুখ গুঁজে পড়ে চলেছে—লাইব্রেরীতে যাওয়া বন্ধ করে। বাপ আর মেয়ের মাঝখানে যেন একটা স্বয়ংক্রিয় দরজা। দরজা ঠেলে উঁকি দিয়ে বাবা বলেন, 'ইস্ খুব পড়ছ তো! সব নম্বর নিয়ে নেবে নাকি?' আবার দরজা নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। কখনো জয়তি দরজা ঠেলে বলে, 'বাবা, চা করে দেব আমি? কেবল তো হরির হাতের চা খাচ্ছ?' উৎফুল্ল কণ্ঠে বাবা বলেন, 'নিশ্চয়! হরির চা আবার চা।' চা আনে জয়তি। চা খাওয়া হয়। স্বয়ংক্রিয় দরজা আপনি বন্ধ হয়ে যায় আবার। নীরেনবাবু নতুন নক্সার মনিপুরী শাড়ী এনে বলেন, 'পরে এসো জয়তি। দেখি কেমন মানায়।' জয়তি বলে, 'এমন সুন্দর শাড়ী বাড়ীতে পরব?' বাবা বলেন, 'আবার ভাঁজ করে রেখো।' জয়তি শাড়ী পরে, চুল আঁচড়ে টিপ দিয়ে এসে বাবা মা'র কাছে দাঁড়ায়। বাবা দেখে বলেন, 'মাই প্রিটি গার্ল। কেবল চেহারায় নয়। স্বভাবেও।' হেসে উত্তর দেয়, 'তোমাকেও ঘুরিয়ে আমি এ কথাগুলিই বলছি। শুধু মেয়ের জায়গায় 'বাবা' বসিয়ে।' তারপরই বাপ মেয়ের মধ্যিখানের সেই অদৃশ্য স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ হয়ে যেতে সময় লাগে না।

গৌতম আর আসে না।

তাকে জয়তি আসতে নিষেধ করে চিঠি দিয়ে দিয়েছে।

আশাভঙ্গটা যদিও সুষমার মন মুষড়ে ফেলেছিল, তবু যা হবার হয়—তা যদি শান্ত ভাবে মিটে যায়, তাই ভালো।

পনেরো ষোলো দিন পার হয়ে গেল এমনি ভাবে। অভিমানী মেয়েকে নিয়ে যে হাবিজাবি শঙ্কায় কাতর হচ্ছিলেন সুষমা, তা প্রায় কেটে এসেছে। সে দিন মধ্যাহ্নে বিশ্রামে শুয়ে ছিলেন। ঘুমের আমেজও প্রায় চোখে নেমে এসেছিল। হঠাৎ সে আমেজ তার ছুটে গেল— গৌতমের গলা না! আর নড়লেন চড়লেন না। যেমন ভাবে ছিলেন তেমনি পড়ে রইলেন। শুনলেন, রুমি বলছে, 'গৌতম দা, এত দিন আসোনি কেন?' গৌতম বলছে, 'ভী-ষ-ণ কাজ ছিল। দিদি কোথায়?' 'দিদি আবার কোথায়? পড়ার ঘরে। দিদি তো কেবল পড়ছে আর পড়ছেই।' গৌতম হেসে বলল, ''আচ্ছা! তাই নাকি?' গৌতমকে দিদির ঘরে পৌঁছে দিয়ে রুমি চলে গেল।

সুষমা নিঃশব্দে খাট থেকে নামলেন।

নিঃশব্দ পায়ে গিয়ে মেয়ের ঘরের দরজায় কান পেতে দাঁড়ালেন।

গৌতমের সঙ্গে রুমির কথাবার্তা জয়তির কানেও গিয়েছে। গৌতমের গলা শোনা মাত্র একটা রক্তের ঢেউ মাথা থেকে নেমে বুকের উপর ভেঙ্গে পড়ে বয়ে গেল জয়তির পায়ের নখ পর্যন্ত। নোট লেখার হাত কলম সুদ্ধ তার থেমে রইল খাতার উপর।

গৌতম গিয়ে জয়তির সামনে চেয়ারে বসল। বলল, 'চলে এলাম তোমার নিষেধ অমান্য করে।'

কলমের মুখ বন্ধ রেখে দিয়ে জয়তি বলল, 'অমান্য করা উচিত হয়নি।'

'উচিত! বড় বিশ্রী জিনিস ওটা। তবু যতক্ষণ ঘাড়ে হাত না দেয়, ততক্ষণ তাকে মানা যায়। ঘাড় ধরে করাতে চাইলে আর তাকে মানা সম্ভব নয়!'

'মানামানি নিজের ইচ্ছার ব্যাপার নয়। তোমাদের কাছে হলেও আমাদের কাছে নয়। তুমি কেনএলে! কেন এলে। আমি না করেছি না—' থরথর করে কাঁপতে লাগল জয়তির ঠোঁট।

'একি ছেলেমানষি হচ্ছে'—বলে গৌতম জয়তির একটি হাত হাতে তুলে নিল। বলল, 'এলাম সোজা কথায়—তোমাকে না দেখে থাকতে পারছি না। তোমার বাবা এখন অফিসে তাই ভরসা পেয়েছি।' হাতে টেনে নিয়ে জয়তি বলল, 'আমাদের বাড়ি লুকিয়ে-পালিয়ে আসবে নাকি তুমি? আমার অপমান লাগে না?'

তুমি থাকবে ঘরে বসে। কিছুতেই বেরুবে না। আমার ইচ্ছে করবে তোমায় দেখতে। তোমার বাবা ঢুকতে দেবেন না। কি করব তবে?

মেনে নিতে হবে।

তা কি হয় নাকি? লুকিয়ে আসা যদি তোমার পছন্দ না হয়—অপমান লাগে, তবে এসো—পৃথ্বীরাজের মতো ঘোড়ায় তুলে লুঠ করে নিয়ে যাই।'

মলিন হাসল জয়তি। বলল, 'ঘোড়া আছে নাকি তোমার?'

'রেসের মাঠের একটি তাগড়া ঘোড়া জকিকে ঘুষ দিয়ে নিয়ে আসব—অসুবিধে হবে না।'

'চড়তে পারবে?'

'তাও হয়ে যাবে। দুচার রোজ তালিম দিয়ে নেবো জকির কাছে। হয় না কি? আর প্রিয়ার জন্য করাই বা না যায় কি? তোমার যদি মাথা ঘোরে, আমি রইলাম সেবা করবার জন্য। আর আমার যদি পা ভাঙ্গে মাথা ফাটে—তুমি রইলে সেবা করার জন্য।'

'এ জন্মে তা আর হবে না।'

'পরজন্ম মানিনে। আমি এ জন্মে বিশ্বাসী। যা চাই — তা এ জন্মেই চাই।'

'চাইলেই পাওয়া যায় না।'

'অতি পুরোনো পচা কথা।'

'পুরোনো হতে পারে কিন্তু পচা নয়। তরতাজা সত্য কথা। প্রতি মুহূর্তে জীবন থেকে জীবনে সে প্রাণ পাচ্ছে। যেমন আমাদের জীবনে পেলে।'

'আচ্ছা গৌতম, আমরা বন্ধুত্বে চলে যেতে পারি না?'

'চলে যাবো কি? আমরা শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সচিব সখা—স্ত্রী ছাড়া আর কে?'

'আমি সাধারণ বন্ধুত্বের কথা বলছি।'

'প্রিয়তম, আমার তোমার বন্ধুত্বের কথা দয়া করে আমায় বলো না। যত সময় যাচ্ছে, তত বেশী করে তোমাকে আমি ভালোবাসছি। এবং বুঝতে পারছ তুমি, তোমার ঐ মনমুগ্ধকর রূপ এবং তার চাইতেও বেশী তোমার স্বভাবের মাধুর্য আমার কাছে কত অপরিহার্য।'

'তুমি কি তরজমা করে প্রেম নিবেদন করছ নাকি?'

'তাই। কথাগুলি একজন বড় কারুর লেখা প্রেমপত্রের তরজমা।'

খেদ উক্তি করল জয়তি। 'হায় কপাল! রবীন্দ্রনাথ থাকতে প্রেমের কথা ধার করতে বিদেশের দরজায় গিয়েছ? চাল ডাল তেল নুন থেকে সাহিত্য পর্যন্ত---কি উঞ্ছবৃত্তিতেই পেয়ে বসেছে তোমাদের। 'ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই তবে আর কোথা যাই—' কোথাও দাঁড়াবার উপায় রাখছ না।'

'মাপ কর দি জ্জিয়ে---' হাত জোড় করল গৌতম হেসে। তারপর বলল, 'শোন, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলি আমি।?'

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে জয়তি বলল, আগে সে কথাই তো ভেবেছিলাম। কিন্তু বাবার কথা আমি নিজেই শুনে ফেলেছি। ভালই হয়েছে। আর আমার স্পৃহা নেই এ নিয়ে কথা বলার। বাবা রাজী হবেন না — কিছুতেই না। সে যে কারণেই হোক।' চোখ নত করল জয়তি। তার দুচোখ জলে ভরে আসছিল। সেটা আড়াল করল সে।

জয়তির কথা শুনে হাসল গৌতম। বলল, 'আমি জানি কারণটা।'

জয়তির চোখের জল টপ্‌টপ্ করে ঝরে পড়তে লাগল টেবিলের কাচের উপর। গৌতম জয়তির চোখের জলের ফোঁটাগুলি আঙ্গুলে মুছে তুলে নিয়ে নিয়ে কপালে টিপ পরার মতো লাগাতে লাগল! জয়তি কান্নাভেজা চোখ তুলে মলিন হেসে বলল 'এ কি হচ্ছে?'

জয়তির এ কথার জবাব দিল না গৌতম। তার হাতটা তুলে নিল হাতে। বলল, 'চোখের জল ফেলছ কেন?'

'তবে কি ফেলব—ফুল?'

'তাই তো ফেলবে। ফুল কি শুধু বাগানেই ফোটে! চোখে ফোটে না?' এতক্ষণের সহজ ভাবটা যেন নেই আর তার। একটু অন্যমন। একটু বিষণ্ণ।

জয়তি তার হাত ছাড়িয়ে আনতে চাইলে—গৌতম বলল, হাত ধরলে তোমার অন্যত্র বিয়ের নিশ্চয়ই ব্যাঘাত ঘটবে না?'

জয়তি পরিহাস করল, 'হাতের পর হয়তো মাথা টানবে।'

'কান টানলে মাথা আসে। হাত টানলে আসে শরীর। কিন্তু শোন জয়তি—' বলে বিষণ্ণতা ঝেড়ে আবার যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল গৌতম। বলল, আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার বাবার আপত্তিটা বেশী বড় করে দেখছ। রাগারাগি, বাধা নিষেধ—এগুলো ঠেলেই ভালোবাসার বিয়েতে এগোতে হয় সবাইকে। আমাদেরও হবে।'

'আমার বাবা অন্য রকম।'

গৌতম হাসলো। বলল, 'কেউ কারু মতো হয় না এ পৃথিবীতে। না চেহারায়। না স্বভাবে। আঙ্গুলের ছাপটুকু পর্যন্ত একজনের মত আর একজনের নয়। একটু সময় চুপ করে বসে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে বলার মতো বলে উঠলো, 'আমি মনে করি আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

'বাঃ!' রাঙা হয়ে উঠলো জয়তির মুখ।

জয়তির হাতে চাপ দিলো গৌতম —'হ্যাঁ বলো।'

'মিথ্যে কথা বলবো?'

'এটা মিথ্যে কথা? আমরা সত্য করি নি?'

জয়তি নীরব।

এবার জয়তির হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলো গৌতম—'চুপ করে থাকলে হবে না। বলো কথা দিয়েছ কি না?

'দিয়েছি।'

'তবে? 'মিথ্যে কথা বলব' বলছ কেন?.. ঠিক আছে, এতদিন আমরা কেবল গুনগুন্ করে বলেছি। অস্পষ্ট অস্ফুট ভাবে বলেছি, আজ এসো স্পষ্ট উচ্চারণে বলে নি।'

জয়তির হাত নিজের হাতের উপর বিছিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো করে গৌতম বললো, বল---

'আজ থেকে তোমার হৃদয় আমার হোক
আমার হৃদয় তোমার হোক---'

'বাঃ, যা হয় না এ আমি বলতে পারব না।'

'কি হয় না?'

ঐ হৃদয় মনটন—কারোটা কারু হয় না। যার যারটা তার তার কাছেই থাকে। আর থাকাই ভাল। তোমার পুরুষ-হৃদয় নিয়ে আমি কি করবো! আমার মেয়েলী-হৃদয় নিয়ে তুমিই বা চলবে কি করে।'

'তবে কি মন্ত্রে বিয়ে হবে?'

'ভাবো। আধুনিক বিয়েতে আধুনিক মন্ত্র চাই। হৃদয়-টিদয় অচল।'

'হৃদয় অচল হলে থাকে চুক্তি—'

'চুক্তি-ই হলো আধুনিক বিয়ের মন্ত্র।'

'কি চুক্তি করতে হবে?'

'এটা ভাবতে সময় লাগবে।'

'আমার হাতে সময় নেই। আমি সাদা কাগজে সই করে দিচ্ছি তুমি শর্তগুলি বসিয়ে নিও।'

টেবিলের উপর থেকে জয়তির খাতা টেনে নিয়ে তার একটা সাদা পাতায় সই করে খাতাটা জয়তির দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ—'

'আত্মসমর্পণ—সেও বড় বাড়তি কথা।'

'হৃদয় না, আত্মা না—তবে সমর্পণ করবো কি শুধু দেহ?''

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল জয়তি। ঠাট্টার ধাক্কায় যেন নিজেই কাত হয়ে পড়ল।

গৌতম সিরিয়াস হয়ে উঠে বললো, 'আমার হৃদয় তোমার, তোমার হৃদয় আমার—কিন্তু কারু হৃদয় কারু হয় না' — তোমার এ কথা আমি মানছি জয়তি। বিয়ে মানে চুক্তি একথা মানছি না। আমার ভাবনায় বিয়ে হলো হৃদয় এক্সচেঞ্জ নয়—সর্বাত্মক মিলন। সর্বাত্মক মিল। মিল আর মিলন রইল, বিয়ে রইল। মিলন গেল, মিল গেল—বিয়েও গেল—এম আই রাইট?'

'রাইট' বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল জয়তি।

'বিয়ে হয়ে গেল তবে?'

'নিশ্চয়। আর বাকী রইল কি?'

সঙ্গে সঙ্গে জয়তির মাথা বুকের ওপর টেনে এনে গৌতম চোখে মুখে ঠোঁটে চুম্বন করে তক্ষুনি আবার ছেড়ে দিলো। তারপর শান্ত হতে একটু সময় নিয়ে বললো, 'বিয়ের দিন— তাই বাড়াবাড়িই করলাম। রাগ করলে না?'

জয়তির শরীর থরথর করে কাঁপছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে রয়েছে সে।

তার মুখ থেকে হাত টেনে সরিয়ে ফেলল গৌতম—'রাগ করেছ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে জয়তি বলল, 'তুমি যেন হঠাৎ ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠলে?'

'বাধার সঙ্গে বেপরোয়া হয়ে ওঠে মানুষ। যত প্রতিকূলতা বাড়ে, তত সাহসও বাড়ে। নইলে তো প্রথমেই হেরে বসে থাকতে হয়। কিন্তু তুমি রাগ করো নি বলো?' অর্থাৎ শুনতে চায় কোন মিষ্টি কথা। নয় তো দেখতে চায় জয়তির একটু কপট অভিমান।

তার ইচ্ছা পূর্ণ হলো। জয়তি ভ্রূ বাঁকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমার কত যেন বাধ্য ছেলে! রাগ করলেই মানছে! কিন্তু গৌতম'—এবার মিনতি ভরা কণ্ঠ জয়তির, 'এখন চুপচাপ থাকো। দেখা হওয়া থাক না কিছু দিন বন্ধ। পরে দেখা যাবে কিছু করা যায়, কি যায় না। আমাকে ভুল বুঝ না গৌতম—বাবার অমতে চলবার সাধ্য নেই আমার।'

জয়তির এ কথাটা ঝেড়ে ফেলে দিল গৌতম। বলল, 'সে হয় না। মত না হলে অমতে চলব। কিন্তু তার আগে চেষ্টা করে দেখা যাক তো।'

'না—না, তুমি এক্ষনি গিয়ে বাবার কাছে হাজির করো না—প্লিজ। এতো তাড়াহুড়ো 'কি আছে?'

'আমার না থাক, তোমার বাবার থাকতে পারে। তিনি তোমার বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন!'

'বা — আমি যেন কিছু নই। দিলেই হলো'?

কোথায় তুমি কিছু? এই তো বললে, বাবার অমতে চলতে পারবে না তুমি।'

জয়তি হেসে বলল, 'অমতে চলতে পারবো না বলেছি। কিন্তু বলিনি তো মতে চলব।'

'অমতে, চলবে না, মতেও চলবে না—এ ঘরটার মধ্যে মুখ থুবড়ে বসে থাকবে?'

জয়তি বলল, 'আমি ঠিক মতো তোমাকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি আমার মনোভাব। বাবার অমতে চলতে পারব না—কথাটার মানে কি জানো? বাবার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে টাগ-অফ্-ওয়ার চালানোর কথা মনে হলেই সঙ্কোচে আমি মরে যাই। জিনিষটা আমার কাছে লাগে যেন মা বাবার মুখে ঘুষি মেরে বাসর-ঘরে ঢোকার মত। যে কেউ প্রেম করে পরিবারের সঙ্গে হাঙ্গামা চালালেই যেন আমার লজ্জা করে। কেমন যেন নির্লজ্জ মনে হয়। যতই বড় বড় কথা বলা যাক— আসলে তো সে সব একেবারেই গৌণ। আসল কারণ হচ্ছে পরস্পর পরস্পরের দেহ চাচ্ছি আমরা। মা বাবার সঙ্গে এই চাওয়া নিয়ে মারামারি বাধাতে লজ্জা করে না? শুধু লজ্জা নয় গৌতম, আমার যেন—'বলে নাকের কুঞ্চনে ঘেন্নার ভাব করল জয়তি।

' দেহটা যা-তা ব্যাপার?'

'না। দেহটা খুব রমণীয় মোহময় ব্যাপার। কিন্তু সেটা পাওয়ার জন্য হাটের মাঝখানে নাচানাচি করব?'

গৌতম হেসে বলল, 'ঠিক আছে, দেখা যাক, যত কম নাচানাচি করে পারা যায়।'

'তাই তো বলছি, একটু থিতোতে দেও না। ফুরিয়ে তো যাচ্ছে না।'

'যাবে ফুরিয়ে। এ সব ক্ষেত্রে সাত তাড়াতাড়ি মেয়েকে বাপ মা পাত্রস্থ করে ফেলেন—এই হলো ওদের হাতের টেক্কা। আচ্ছা আজ যাই এখন—কি বলো?'

দরজার ওপিঠে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকা সুষমা তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। মটকা মেরে পড়ে রইলেন বিছানায়। পড়ে রইলেন তার ঘুমানোর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তারপর তিনটের সময় উঠলেন যথা নিয়মে। গিয়ে বসলেন হরির সঙ্গে বিকেলের জলখাবার বানাতে। খাবার তৈরী হয়ে গেলে রুমি ঝুমি রাণা তিন ছেলেমেয়েকে দিলেন দুধ আর খাবার। জয়তিকে দিয়ে এলেন খাবারের সঙ্গে চা। দাঁড়িয়ে কথা বললেন মেয়ের সঙ্গে এটা-ওটা-সেটা। সর্ব রকমের সহজ ভাব বজায় রাখছেন সুষমা। কিন্তু ভেতরে তিনি চঞ্চল ছিলেন। ভেবেছিলেন, মিটে গেল বুঝি। নিষ্কৃতি পাওয়া গেল বুঝি একটা ঘনিয়ে আসা সঙ্কট থেকে। কিন্তু কোথায়। এ যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে কালো মেঘের মতো ঝড় নিয়ে। কাজ করছিলেন আর উলটে-পালটে, এ রকম-সেরকম করে ঘুরিয়ে চিন্তা করছিলেন—কোণ পাওয়ার। কিন্তু সব চিন্তাই যেন নড়বড় করে। শক্ত ভিতে আশ্রয় দিতে পারলেন না কোন চিন্তাকেই।

অফিসফেরত নীরেনবাবু প্রতিদিনের মতো হাত মুখ ধুয়ে এসে বসলেন। তাঁর জলখাবার নিয়ে এসে বসলেন, সুষমাও।

নীরেনবাবু সুষমার মুখের দিকে তাকিয়ে আজকাল প্রতিদিনেই তাঁর অনুপস্থিতির সময়টা আঁচ করে নিতে চেষ্টা করেন। আজও তাকালেন। এবং আঁচ করেও নিলেন। অবশ্যি আজ আঁচ করার প্রয়োজন ছিল না। নীরেনবাবু শুনেছেন রুমির কাছে গৌতমের আসার কথা। খাবার ডিসে হাত লাগিয়ে নিচু মুখেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ গৌতম এসেছিল শুনলাম।'

যেন বিস্ময় সমুদ্রে পড়লেন সুষমা—'গৌতম এসেছিল? কখন? কে বললো?'

খাবার ডিস থেকে ঠাণ্ডা দৃষ্টি তুললেন নীরেনবাবু, 'রুমি বলল। তুমি জানো না?'

হ্যাঁ এ কথা ভুলে যাওয়া তার ঠিক হয় নি যে বাপ এলে ঘরের খবরের ঝুড়ি নামিয়ে বসে রুমি। বিরাট ভুল হয়ে গেছে। রুমিকে নিষেধ করে দেওয়াটা উচিত ছিল। মিথ্যে কথায় জোর বেশী দিতেই হয়। রাগত ভাবে সুষমা বললেন, 'ঐ তো দুপুরটুকু মাত্র বিশ্রামের সময় পাই। একটু ঘুমোই। সে সময় আমি কি করে দেখব শুনি?'

কচুরি-তরকারির ডেলা পাকিয়ে মুখে পুরে নীরেনবাবু বললেন, 'তবু দেখতে হয়। বাড়ী কর্ত্রীর সব দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি করে সজাগ দৃষ্টি রাখে আমি জানিনে। তোমার জানা থাকলে তুমিই করো এ কাজটা।' তারপর পরামর্শ দেওয়ার মতো করে বললেন, 'দেখো একটা কথা বলে রাখছি—সাবধানে চলো। মেয়ে বড় হয়েছে।'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়! মনে রাখতে হবে বৈকী! আফিম-টাফিম খেয়ে বসে যদি।'

স্বামীর দিকে ক্রুদ্ধ আর অসহায় চোখে একটু সময় তাকিয়ে থেকে সুষমা বললেন, 'আমি তোমার মেয়ের ব্যাপারে নেই; পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। তুমি গোয়েন্দা লাগাও মেয়ের পেছনে।'

'সেই দিনই এসেছে। ঘরের লক্ষ্মী দিয়ে আর ছেলেমেয়েদের সামলানো যাবে না। গোয়েন্দাই লাগাতে হবে। যা দেখছি তাতে বেশ বুঝতে পারছি, ছেলেরা বিয়ে করে নিয়ে এসে উপস্থিত হবে—উপর অঙ্গে আর নিম্নাঙ্গে দু টুকরো নেকড়া জড়ানো ছিপি মেয়ে। মেয়েরা বিয়ে করে এসে উপস্থিত হবে লুঙ্গি পরা, খালি গা বব্

চুল আর দু গালে জুলফির-বনওলা হিপি ছেলে। তারা এসেই শ্বশুর শাশুড়ীকে আদেশ করবে, 'এই লোক, ছিলিম বানাও। শ্বশুর শাশুড়ী সভয়ে উবু হয়ে বসে যাবে গাঁজার ছিলিম সাজাতে। পাছে কিছু বললে, আফিম খায়—সে ভয়ে বসে গাঁজার ছিলিম বানাও—'

স্বামীর দিকে ক্রুদ্ধ আর অসহায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে 'চা নিয়ে আসছি', বলে উঠে গেল সুষমা। আজকের দুপুরের গৌতম জয়তির ঘটনাগুলি মনে হয়ে ত্রাসে ভয়ে তার বুক কাঁপছিল। কান্না পাচ্ছিল। চা আনবার ছল করে পালালেন তিনি।

হ্যাঁ, নীরেনবাবু জানেন সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। অভীষ্ট সিদ্ধির যে অভিসন্ধি তিনি আঁটছেন, সে পথ যে সাংঘাতিক পিচ্ছিল, তা তিনি জানেন। এই পিচ্ছিল পথ পার হতে হবে তাকে একূল-ওকূল দুকূল রক্ষা করে।

ঘরের ভেতর জুতোর শব্দ পেয়ে খাবার ডিস থেকে চোখ তুললেন নীরেনবাবু। কিন্তু ঘরে যে ঢুকল তাকে চিনতে পারলেন না তিনি। যে ঢুকল সে নীরেনবাবুর বিপরীত দিকের সোফায় গিয়ে বসে একটু হেসে বলল, "আমার নাম গৌতম।"

গৌতমকে নীরেনবাবু দেখেন নি। বুঝতে পারছিলেন না, কে এমন ঘরে ঢুকে নিজেই বসলো। নাম শুনে প্রথমে শুধু বললেন, 'ও!' তারপর বললেন, 'আজ দুপুরে তুমি এসেছিলে?'

বিনীত স্বরে গৌতম বলল, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'জয়তির সঙ্গে কথা বলতে।'

'কি কথা। 'যেমন খাচ্ছিলেন তেমনি খেতে খেতেই নীরেনবাবু বলতে লাগলেন।

গৌতম হেসে বললে, 'সেই কথা আপনাকেও বলতে এসেছি।'

'বল।'

চা নিয়ে আসছিলেন সুষমা। দূর থেকেই দেখতে পেলেন গৌতমকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে মুহূর্ত দাঁড়িয়েই তিনি ফিরে গেলেন রান্নাঘরে। চা পাঠিয়ে দিলেন হরির হাতে। দিলেন এক পেয়ালা। তিনি তো জানেন না গৌতম এসেছে।

কিন্তু সত্যি যে জানলো না সে জয়তি। সে কল্পনাও করেনি গৌতম আজই এসে উপস্থিত হবে বাবার কাছে। এতো বড় বাড়ির এক ধারের ঘর থেকে কেউ না বললে জয়তির টের পাওয়া সম্ভব নয় গৌতমের আসার কথা। টের পেলও না সে।

নীরেনবাবু 'বলো' বলতেই গৌতম সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, 'আমি জয়তিকে বিয়ে করতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে নীরেনবাবুও প্লেট থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আমি চাই না। আর তাই তোমার সঙ্গে জয়তির দেখা-সাক্ষাৎ হয়, আমি পছন্দ করি না। এর পর তোমার কিছু বলার আছে?'

গৌতম মুখে হাসি টেনে এনে বলল, 'আপনি যেমন সাফ্-কথায় কথা বলে দিলেন, তেমনি ভাবে বলবো? কিন্তু আপনার পক্ষে মানিয়ে গেলেও আমার পক্ষে তো তা মানাবে না। আবার, সাফ্ কথার উত্তর ঘুরিয়ে দিতে গেলে—মিথ্যে উত্তর হয়ে যায়। সেটাও পারব না। তাই ভাবছি কি করি!'

'ভাব'। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। প্লেট সরিয়ে চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন নীরেনবাবু। দু তিন চুমুক চা খেয়ে নিয়ে খুব ধীর গলায় নীরেনবাবু বললেন, 'জয়তির মতো গুণান্বীতা মেয়ে আর নেই?'

গৌতম কি যেন ভাবছিল। তবু সহজ ভাবেই জবাব দিল, 'জানিনে। কোন মেয়ের কি আছে জানবা'র আমার দরকার কি? এর চাইতে বেশী গুণান্বিতা হলেও আপত্তি নেই—কম হলেও না। তাদের তো আমি চাচ্ছি না।'

'তুমি জয়তিকেই চাচ্ছ'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'যখন পাচ্ছ না তখন অন্যত্র খোঁজ।'

'কিন্তু পাবো না কেন?'

'বললাম তো আমি রাজী নই।' ঠাণ্ডা শান্ত কথা। এতটুকু উত্তাপ নেই নীরেনবাবুর কথায়। তেমনি নিরুত্তাপ স্বরেই বললেন, 'মুখার্জিবাড়ীর গরুমোষকে ঘাসজল খাওয়াতে জানারা।'

লাল হয়ে উঠলো গৌতমের মুখচোখ। আগুনের হল্কা বেরুতে লাগলো দু কান দিয়ে। নিজেকে সামলালো গৌতম। কণ্ঠস্বরকেও স্বাভাবিক রাখলো। বললো, 'আমাকে সেই কাণ্ডটাই না হয়ে তবে দিন।'

এবার গর্জিত কণ্ঠে নীরেনবাবু বললেন, 'ঠাট্টা করছ? তুমি লেখাপড়া শিখেছ সেটাই বোঝাচ্ছ? লেখাপড়া শেখা যায় এক পুরুষে কিন্তু রক্তে শুদ্ধি আসতে সময় লাগে কয়েক পুরুষ।'

গৌতম নিজেকে বিচলিত হতে দিল না। জবাব দিল অবিচলিত ভাবে। বলল, 'রক্তের কম্‌পোজিশন সবার এক। নিচু কাজ করার ভেতর রক্ত-বৈষম্যের ব্যাপার কিছু নেই। তাঁরা লেখাপড়া জানতেন না, বা তাঁদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হতো, তাঁরা নিচু কাজ করতে বাধ্য হতেন। পূর্বপুরুষ ধরে টানতে গেলে আরও ভাববার বিষয় না হোক — জানবার বিষয় আছে। সে কালে আমার পূর্ব-পুরুষগণ গরুকে ঘাসজল দিয়ে, কাজের শেষে সন্ধ্যায় মাটির ঘরের দাওয়াটিতে বসে রামায়ণ মহাভারতের কথকতা শুনতেন, কুলীন বংশের পূর্বপুরুষগণ সে কালে গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে ধোপা নাপিত নিয়োগের দাম্পত্য-ব্যবসা চালাতেন। কারচুরির ব্যাপার—ব্যক্তি খুঁজে বা উপাধি দিয়ে এই ধোপানাপিতের রক্তের ধারা বের করা সম্ভব নয় বলে এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ এটা ইতিহাসের সত্য। আর দরকারই বা কি বের করার। অতীত অতীতেই থাক—তাকে বাদ দিয়ে বর্তমানে আসা যাক।'

নিস্পলক চোখে গৌতমের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিলেন নীরেনবাবু।

বিমলবাবু এলেন। এসেই ভেতরে চলে যাচ্ছিলেন—নীরেনবাবু বললেন, 'অন্দরমহলে আবার যাচ্ছ কেন? বোস। এক হাত খেলা যাক।'

'তোমরা কথা বলছ—'

'আমাদের কথা বলা হয়ে গেছে।'

বিমলবাবু বসলেন।

গৌতম বুঝল তার কথার জবাব দিতে চান না এবং আরও কথা বলতে চান না এ সম্বন্ধে নীরেনবাবু। গৌতমের ফর্সা মুখের উপর গভীর কালো ছায়া পড়লো।

বিমল বাবু ধরে ফেললেন ব্যাপারটা। তবু নিশ্চয় হবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমাকে তো চিনতে পারছি না। তোমার নামটি কি?'

'গৌতম জানা।'

'আচ্ছা! এটা আগে ছিল আমার শ্বশুরবাড়ি। এখন শালার বাড়ি। আমি ছেলেমেয়েদের পিসেমশাই।'

গৌতম ম্লান হাসল। বলল, 'জয়তির মুখে আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

'তাই নাকি। তা সে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু তোমার মুখখানা এতো কালো লাগছে কেন? বললাম তো এটা আমার শালার বাড়ি। তিনি আবার মাথায় বাড়ি মারতে একটু ভালবাসেন।'

নীরেনবাবু গম্ভীর সুরে বললেন, 'বিমল, তুমি বড্ড বাজে কথা বলো।'

গৌতম উঠে দাঁড়ালো। বলল, 'আপনার কথা হয়ে গেলেও আমার কথার একটু বাকী আছে। এর ভেতর বাবা এসে জয়তিকে একদিন নিয়ে যাবেন।'

এবার দস্তুর মতো হুঙ্কার ছাড়লেন নীরেনবাবু—'কি বললে? বাবা এসে নিয়ে যাবেন জয়তিকে? তোমার বাবাই বাবা। আর জয়তির বাবা—বাবা নয়?' তোমার বাবা এসে আমার মেয়েকে নিয়ে যাবে!

'তিনি জয়তিরও বাবা হয়ে গেছেন।' বলেই গৌতম আর দাঁড়ালো না। চলে গেল।

গৌতমের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরেনবাবু। তার জুতোর শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার পরই দাবা নামিয়ে পেতে বসলেন নীরেনবাবু। বললেন, 'এসো বিমল।'

হতভম্ব হয়ে বসে ছিলেন বিমলবাবু। নীরেনবাবুর আহ্বান শুনে বললেন, 'তুমি কি করবে যদি সত্যি গৌতমের বাবা আসেন?'

নীরেনবাবু ছকের উপর গুটি সাজাতে সাজাতে বললেন, 'গৌতমের বাবা অবশ্যই গৌতমের চাইতে কিছু বড় হবেন। বুদ্ধির উত্তেজনার চাইতে বাস্তববোধ বেশী থাকারই তো কথা।'

'জয়তি যদি চলে যায়—বা যেতে চায়?'

'জয়তি তেমন মেয়ে নয়।'

'তুমি যে তেমন বাবা সেটাই কি আগে জানা ছিল? কিন্তু নীরেন, তোমাকে একদিন যত দেখছি, তত আমি আশ্চর্য হচ্ছি। বুঝেই উঠতে পারছিনে তোমাকে। এই হুঙ্কার ছাড়ছ, গর্জাচ্ছ—এই আবার যেন কিছুই হয় নি, এখনি শান্ত ভাবে দাবার ছক পেতে বসছ খেলতে!'

'যার সঙ্গে গর্জাচ্ছিলাম সে চলে গেলে গর্জাব কার সঙ্গে?'

'ভেতরে রাগ অসন্তোষ থাকলে খালি ঘরেও গর্জায়।'

'সে রকম গর্জায় খাঁচার বাঘ।'

'তুমি মুক্ত বাঘ।'

এবার দাবার ছকের উপর থেকে চোখ তুললেন নীরেনবাবু। তার চোখে যেমন চাপা অস্থিরতা, তেমনি যেন এক সিদ্ধ বিষাদ। বললেন, 'না বিমল, আমি বাঘ নই। আমি খাঁটি বাঙালীত্ব দিয়ে ঠাসা একজন সমাজসেবী মানুষ। আমি দোল দুর্গোৎসব পার্বণ ভালোবাসি। আমার বাবা যে ভাবে মায়াকে তোমার হাতে দিয়েছিলেন, সুষমাকে ঘরে এনেছিলেন—তেমনি ভাবে যৌতুকসম্ভারে, সহস্র ফুলের মালা আর আলোর মালার সাজানো আতর গন্ধে দিক আমোদিত করা আসরে বিয়ে দিতে চাই মেয়েদের।' বলেই বিষাদের সুরটা ঝট্‌কা হাতে সরিয়ে ফেলে সদম্ভে বললেন, 'দেবোও সেই রকম। তবে পাত্র হওয়া চাই শিক্ষায় আভিজাত্যে কুলে-শীলে-সমান।'

'কুল দেখতে গিয়ে কূল পেলে হয়!' অস্ফুট কণ্ঠে কথাটা বলে সুষমা এসে ঘরে ঢুকলেন। তার পেছনে হরির হাতে ট্রের উপর তিন পেয়ালা চা।

কিন্তু নীরেন বাবুর কানে গেল কথাটা। তিনি গর্জে উঠলেন, 'কেন কূল পাবো না? তুমি ভাবছ কি আমাকে?'

বিমলবাবু বললেন, 'বাঃ, এই তো গর্জাবার লোক এসে গেলেন। মায়া আসতে চাইছিল দাদার সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য। বললাম, তোমার দাদা তো? ভয় কি? তিনিও তোমারই মতো একাই একশ। তোমার সাহায্যের দরকার হবে না।'

কার্যসিদ্ধি হয়—আবার কিছু অঘটনও না ঘটে যায়, তুল্যো মূল্যো হিসেব করে নরমে-কঠিনে চলছেন নীরেনবাবু। স্নায়ুতে চাপ চিন্তা দুটোই ছিল। তার ওপর নীরেনবাবুর সব চাইতে স্পর্শকাতর স্থানে ঘা দিয়ে ফেললেন সুষমা। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নীরেনবাবুর সেই অভিজাত মেজাজের উপর বিদ্রূপ-কটাক্ষ হেনেছে সে। সুষমার খোঁচা বুক-বিদ্ধ করেছে নীরেনবাবুর। আহত বাঘের মতোই রোষের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল তার চোখ দিয়ে—সুষমা চা হাতে দিতেই পিরিচ পেয়ালা চামচ সমেত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দেয়ালের উপর। তারপর বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন বাপ ঠাকুর্দার তৈরী লাইব্রেরী ঘরে।

ধীর পায়ে জয়তি এসে দাঁড়ালো মায়ের কাছে। সন্দিগ্ধ চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, চা ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে গেলেন?'

চোখে এসে যাওয়া জলটা ভেতরে ঠেলে পাঠিয়ে সুষমা অভিমানে মুখ গোমড়া করে তুলে বললেন,' সংসারে কি আমি দু হাতে লুটেপুটে খাচ্ছি যে আমার হাতে টাকা উড়ছে? বাপের বংশের কেউ এমন নেই যে তাদের ঢেলে দিচ্ছি দশটা টাকা যে দশটা পয়সাও নয় আজকাল, এটা কি আমাকে বোঝাতে হবে ওঁকে। তুমি বড় হয়েছ। বাবার টাকা বুঝে নেও। আমি ঝি রয়েছি। সেই ভালো।'

মায়ের কথায় জয়তির চোখ থেকে সন্ধানী দৃষ্টি গেল না। বলল, ''বাবা তো টাকা পয়সা নিয়ে কখনো কিছু বলেন না।'

'তুমি কী করে জানবে কি বলেন আর না বলেন? আমি বলি তোমাকে?'

'এখনও তো বলো নি, তবু তো জানলাম।' তার পর বিমলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্যি কি বাবা টাকা পয়সা নিয়ে রেগেছেন পিসেমশাই?'

বিমলবাবু অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে জয়তিকে বললেন, 'আমি মা এইমাত্র এলাম। কিছু নিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল—একটু রাগের সঙ্গেই অবশ্যি। কিন্তু কি নিয়ে তা বলতে পারব না।'

জয়তি চলে গেল।

হরি এসে ঘর পরিষ্কার করে গেল।

সুষমা সক্ষোভে বললেন, 'এখন বুঝছেন না। কিন্তু পরে বুঝবেন — কি ছেলে হারালেন। ভাগ্যকে অবহেলা করলে তার কাছে ভাগ্য আর আসে না।'

বিমলবাবু দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

'জয়তি আমার কথা বিশ্বাস করে গেল বলে আপনার মনে হয়?'

সুষমার জিজ্ঞাসার জবাবে বিমলবাবু বললেন, 'উপস্থিত ফাঁড়া তো কাটলো।'

'উপস্থিত আর কতটুকু সময়?'

'ভাববেন না—সব ঠিক হয়ে যাবে বৌদি।'

'সেই আশাতেই তো ছিলাম। ভেবেছিলাম তো ফাঁড়া কেটে গেল। কিন্তু জানেন—' বলে বিমলবাবুর দিকে মুখটা এগিয়ে চুপি চুপি গলায়, আজ দুপুরে গৌতমের আসা এবং সংক্ষেপে ওদের দুজনের কথোপকথনগুলি বললেন। তারপর আবার সোজা হয়ে বসে বললেন, 'সেই থেকে আমার বুকের যে ধড়ফড়ানি আরম্ভ হয়ে থামছেই না। দেখছেন তো কর্তার চেহারা?'

বিমলবাবু নিবিষ্ট মনে সব শুনে বললেন, 'একটা কিছু করতে হয়—মনে হচ্ছে।'

'কি করব বুদ্ধি দিন আপনি।' আশার আলো ঝিলিক দিল সুষমার চোখে।

'আজ রাতটা ভেবে দেখি।' বলে ডাক দিলেন, 'জয়তি...'

জয়তি এসে দাঁড়ালো। বিমলবাবু দেখলেন জয়তির দু চোখ ফোলা। আসবার আগে কান্না মুছে এসেছে। বিমলবাবু সেটা দেখলেনই না। বললেন, 'তোমার বাবা মেজাজ মাটি করে দিয়েছেন। চা টা পর্যন্ত খেতে দিলে না। হরিকে গরম—খুব গরম চা দিতে বলো। বিষে বিষ নষ্ট করার মতো চা দিয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা করি। আর চা খেতে খেতে শুনব তোমার একটি গান। বাস্—তোফা সরিফ মেজাজে চলে যাবো বাড়ি।'

'গান আজ পারব না পিসেমশাই। গলাটা ধরে রয়েছে।'

'আমি চা নিয়ে আসছি।' সুষমা উঠে গেলেন।

বিমলবাবু তার লম্বা সোফার পাশটায় থাপ্পড় মেরে বললেন, 'এসে বোস এখানে আমার পাশটিতে। গলা ধরে আছে—খুললেই খুলে যাবে। মন, মেজাজ, আনন্দ খুলে দিলেই খুলে যায়, ধরে রাখলেই ধরে।'

জয়তি এসে বসল পিসেমশাইয়ের পাশে।

'গাও। আমি চোখ বুজে শুনি'

গলার ভাঁজে ভাঁজে জলের স্রোত বইছে। সুর ডুবে যেতে লাগল তার তলায়।

তবু পিসেমশাই -এর কথা রাখল জয়তি। গাইল চাপা গলায়,

'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।'

সহাস্যমুখে ভ্রূ কুঞ্চিত করে জয়তির গান শুনলেন বিমলবাবু।

জয়তি পিসেমশাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। বলল, 'তুমি বুঝছ আমাকে। আর আমি বুঝি তোমাকে বুঝি নে? কিন্তু হাসিটা যেন আলগা এসে, আলগা ঝরে গেল। জয়তির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

বিমলবাবু চা শেষ করতেই, জয়তি মৃদু গলায় বলল, 'চল একটু ঘুরে আসি। পিসেমশাই যাবে?'

'নিশ্চয়। চলো।' তক্ষুনি উঠে পড়লেন বিমলবাবু। কথা বলার সুযোগ নিজে নিজে এসে গেল, বা জয়তিই আনল। এই তো চাচ্ছিলেন তিনি। সুষমাও খুশি হলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে নিঃশব্দে কিছুটা পথ চলে বিমলবাবু বললেন, 'চল , গৌতমদের বাড়ি থেকেই ঘুরে আসা যাক।'

'গৌতমদের বাড়ি?

'চেনো তো বাড়ি?'

'চিনি। কিন্তু কেন যেতে চাইছ?'

'আমি ওর বাবার সঙ্গে আলাপ করে আসি, তোমরা দুজনে ততক্ষণ একটু ট্যাক্সিতে ঘুরে এসো।'

'এ সব থাক পিসেমশাই। বাবা—'

'ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো নিয়ে যাচ্ছি।'

'ভয় আমার নেই পিসেমশাই। এটা দুঃখ দিতে পারার শক্তির প্রশ্ন। ঐ দুঃখ দেবার শক্তিটাই আমার নেই। বিশেষ করে বাবাকে।'

'দুঃখ দেবার শক্তি নেই তোমার। তবে তো আধুনিক যুগের চমৎকার ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিটা থেকেই তুমি বঞ্চিত।... মা সঙ্গে আছেন বলেই তো আমি সঙ্গে আছি। মাকে দুঃখ দেবার কথাই আসছে না। আর বাবা? মা যখন খুশি তখন বাবার খুশি হতে সময় লাগবে না। বাবা যতক্ষণ অচল, ততক্ষণ পিসেমশাই চলুক। চিয়ার আপ মাই গার্ল—চিয়াব আপ্।'

একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়ে জয়তিকে নিয়ে তাতে উঠে পড়লেন বিমলবাবু। বললেন 'কোথায় যাবে বলে দাও।'

জয়তি যোধপুর পার্ক যেতে বলে দোমনা মন নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিমলবাবু বললেন, 'শিক্ষিত সপ্রতিভ তেজ আছে—পরিবার ভালো। এমন ছেলে কেউ ছাড়ে!'

জয়তি বিস্মিত হয়ে শুনছিল পিসেমশাই -এর কথা। বলে উঠল, 'আপনি দেখলেন কোথায় ওঁকে?'

ভুলটা সামলে ফেলতে চাইলেন বিমলবাবু। বললেন, 'না দেখিনি। তোমার মায়ের কাছে শুনেছি তো।'

'ক-খ-নো নয়।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল জয়তি। 'নিশ্চয়ই বিকেলে গৌতমই এসেছিল। আর তাই বাড়িতে এ কাণ্ড। তোমরা লুকিয়েছ আমাকে।' জয়তি কেঁদে ফেললো। 'পিসেমশাই গাড়ি ফিরিয়ে নেও। আমি যাবো না। বিয়ে নিয়ে এ সব কাণ্ড আমার বড্ড বিশ্রী লাগছে—ভীষণ বিশ্রী লাগছে। লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি। গৌতমকে আমি চিঠি দিয়ে দেবো। আমাদের পরিচয় এখানেই শেষ...'

বিমলবাবু জয়তির পিঠে হাত রেখে বললেন, 'বেশ শেষ করে দিলে গৌতমের সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু তার আগে এতে লাভটা কার হবে—সেটা তোমাকে দেখাতে হবে। গৌতমের? নিশ্চয়ই নয়? তোমার? তাও নিশ্চয়ই নয়? তোমার মায়ের? তাও নিশ্চয়ই নয়? তোমার বাবার? তাই যদি ভাবো, তবে বলো কি লাভ হবে তাঁর? যদি বলতে পারো, তবে এক্ষুনি গাড়ি ফেরাচ্ছি আমি।'

জয়তি স্তব্ধ হয়ে রইল।

'পারলে না বলতে। তবে কেন অযথা একটা আকাঙ্ক্ষণীয় পরিবারের আত্মীয়তা থেকে বঞ্চিত হবো?—মার মনে যখন এতটুকু খুঁত-খুঁতানি নেই, তখন বুঝতে হবে পাত্র নিখুঁত।'

'বাবা তো এ কথা স্বীকার করেন না।'

'করবেন। একটু সময় লাগবে। সময়ের সঙ্গে সমান তালে পা কি সবাই চলতে পারে? যারা না পারে তাদের পারার সময়টুকু দিতে হবে। আমি কি না বুঝেসুঝেই এগোচ্ছি মেয়ে? আমি রয়েছি—তোমার বাবার রোষের ধাক্কাটা আমিই পিঠ নেতে নেবো। তারপর দেখবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে সব।

'আমি কি না বুঝে সুঝেই এগোচ্ছি মা।' বিমলবাবুর এ কথার পর যেন ঘুম নেমে এলো জয়তির মনে। ঠিক মৃত্যুর মতো ঘুম যার পরে ভাবনা বলে কিছু থাকে না। এর পর এক্ষুনি গৌতমের সঙ্গে দেখা হচ্ছে—এই আনন্দে বিভোর হলো সে। সব কিছু মুহূর্তে মধুর হয়ে উঠল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—এই প্রথম শরীর অনুভব করল। আকাশে চাঁদ উঠেছে—এই প্রথম দেখল। ড্রাইভারের সামনের রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিতে যে বেলফুলের তাজা মালা দুলছে—এই প্রথম লক্ষ্য করল। নিঃশ্বাসে এই প্রথম পেলো টাটকা বেলফুলের মিষ্টি গন্ধ।

একটি সুন্দর আধুনিক নক্সায় বানানো ছোট্ট লনওলা বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থামালো জয়তি। তকতকে ঝকঝকে দোতলা বাড়ি। ঘরে ঘরে নিয়ন জ্বলছে। বাতাসে হালকা নীল পর্দা উড়ছে। সামনে বেঁটে গ্রিলের গেট। তার দুপাশের মোজাইক পিলারের মাথায় দুটো সাদা ডুম বাতি। দুটো বাতির পাশ দিয়ে উঠে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দুটি প্রসারিত হাতের মতো হাসনু-হানার ঝাড়। বেলফুলের নরম গন্ধকে জব্দ করে দিয়ে হাসনু-হানার চড়া মিষ্টি গন্ধ ঢুকে পড়ল গাড়ির ভেতর। যেন গৌতমের হয়ে সৌরভিত আহ্বান জানাল —'এসো।'

বিমলবাবু বললেন, 'এমন সুন্দর রুচির মানুষ বলেই গৌতম তোমাকে পছন্দ করেছে। একটুও ন্যূনতা ঘটলে বাতিল করে দিত।'

জয়তি হেসে বলল, 'ইস্'।

বিমলবাবু 'বোস তুমি।' বলে নেমে পড়লেন। ড্রাইভারকে বলে গেলেন অপেক্ষা করতে।

ফুলের গন্ধের ভেতর দিয়ে লনটুকু পার হলেন তিনি ফুর্তির সঙ্গে পা ফেলে মাথা নেড়ে নেড়ে। যেন নিজের বুদ্ধির তারিফ করছেন। বারান্দায় উঠতেই কলিং বেল পেয়ে গেলেন দরজায় ধারে। টিপ দিলেন-চাকর এসে দরজা খুলল। কাকে চাই জেনে নিয়ে চলে গেল বিমলবাবুকে বসিয়ে। চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসবার ঘরখানা দেখতে লাগলেন তিনি। এক দিকে সোফা অন্যদিকে চৌকি শান্তিনিকেতনী কায়দায় জয়পুরী চাদর বিছানো। তার উপর গোটা দু তাকিয়া গাঢ় হলদে রঙ-এর ওয়াড় পরানো। মাঝের টেবিলে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। বাতাসে দুলছে। বোধহয় এইমাত্র কেউ বসা ছিল। তবে যাবার সময় পাখা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। সব কিছুই এমন তকতকে ঝকঝকে যে মালিন্যের চিহ্ন কোথাও নেই—আর এটাই সব চাইতে বেশী মুগ্ধ করল বিমলবাবুকে। মনে বললেন, মেয়ের মায়ের কপাল ভালো।

'আপনি!'

গৌতমের বিস্ময়ের জবাবে বিমলবাবু বললেন, 'এলাম তোমাদের বাড়ি বেড়াতে।'

গৌতম হাসলো। সে বসতে যাচ্ছিল, বিমলবাবু বললেন, 'তোমায় বসতে হবে না। বাবাকে ডেকে দিয়ে তুমি যাও—জয়া ট্যাক্সিতে বসে। বাবা বাড়ি আছেন তো?'

'আছেন। আমি ডেকে দিচ্ছি।' বলেই গৌতম দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেল। বাবাকে সঙ্গে করে তক্ষুনি ফিরে এলো। বলল, 'বাবা, ইনিই জয়তির পিসেমশাই। তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। তোমরা কথা বলো। আমি একটু বাদেই আসছি।' এক রকম ছুটে লন পার হয়ে গৌতম ট্যাক্সির দরজা খুলে জয়তির পাশে বসে পড়ল, ড্রাইভারকে বলল, 'লেকের রাস্তায় যান।'

ট্যাক্সি লেকের দিকে ঘুরলো।

গৌতম জয়তির হাতে হাত তুলে নিয়ে বলল, 'কার দয়ায় আমার এমন আশ্চর্য্য সৌভাগ্য—বুঝতেই পারছিনে। কাকে প্রণাম জানাই বলতো?'

জয়তি আঙ্গুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে বললো, 'শুকতারাকে।'

জয়তির কথার সঙ্গে সঙ্গে শুকতারাকে হাত জোর করে প্রণাম করল গৌতম। 'ঠিক বলেছ জয়তি — ঠিক বলেছ। ভোরে দেখব শুকতারাকে পূর্ব আকাশে শান্ত-স্নিগ্ধ-কল্যাণময়ী রূপে। সন্ধ্যার দেখব পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা-দীপ হাতে। দীপ্ত-উজ্জ্বলতায় জ্বলতে দেখব ভেনাসকে—রাতে। অপূর্ব আবিষ্কার জয়তি।' এই উচ্ছাসের পরও বিমোহিত কণ্ঠে বলল, 'প্রণাম জানানোর ব্যাপারে দেব-দেবীদের সঙ্গে শুকতারার নাম আসার কথা নয়। অন্তত আমি তো কখনো শুনিনি। এটা কি তুমি ভেবেচিন্তে বলেছ?'

'কথা বলান অন্তর্যামী—জানো না?'

'তবে অন্তর্যামীকেও প্রণাম জানাচ্ছি—' আবার দুহাত জোড় করে প্রণাম করল গৌতম।

'করছ কি! তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

গৌতম হেসে জয়তির হাত আবার হাতে তুলে নিল। বললো, 'জানোতো, আমাদের বিয়ের রাত এটা—?'

জয়তি লজ্জিত কণ্ঠে 'যাঃ' বলে উঠল।

'আবারও 'যাঃ'? আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়েছেন অন্তর্যামী—পুরুতঠাকুর নন, এটা মনে রেখো। আর তাই তিনি আপন দায়িত্ব পালন করেছেন। তোমাকে আমার কাছে নিজে পৌঁছে দিয়েছেন তাই। যাঃ নয়, হ্যাঁ বলতেই হবে তোমাকে। বলো হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ।' বলে জয়তি হেসে ফেলল।

জয়তির মাথা বুকের ভেতর টেনে আনল গৌতম। তারপর জয়তির একরাশ চুলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে আদর করে আবার তক্ষুণি ছেড়ে দিল তাকে। বলল, 'একটা সিগারেট ধরাই?'

জয়তি বলল—'অনেক পরিশ্রম করেছ—ধরাও।'

সিগারেট ধরাতে ধরাতে দেশলাই-এর আলোয় জয়তির দিকে তাকিয়ে হাসল গৌতম। জ্বলন্ত কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে গাড়ির জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'জানো তোমাদের বাড়ি থেকে ফিরে বিছানায় পড়ে রইলাম ছাদের দিকে তাকিয়ে। খুব বাজে লাগছিল। তিক্ত বিরক্ত ভাব—অবশ্যি বেশীটাই নিজের ওপর। মা এসে মোড়া টেনে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে। এই সন্ধ্যাবেলা শুয়ে আছি কেন। কোথায় গিয়েছিলাম।' বললাম, 'জয়তির বাবার কাছে গিয়েছিলাম।' 'তাড়িয়ে দিয়েছেন?' বলে মা হেসে ফেললেন। আমি বললাম, 'এক রকম তাই।' মা বললেন, 'ব্রাহ্মণ কুলীন মানুষ। রেগে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। তাতে টাকা পয়সায় মানে কত বড় ঘর। কি আর করা যাবে অপেক্ষা করা ছাড়া।' বললাম, 'অপেক্ষা করতে গেলে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেবেন সেই ফাঁকে।' হাসি চাপলেন না—অবশ্যি মমতার হাসি। বললেন, 'তবে আজকাল যেমনি বিয়ে হয় তেমনি বিয়ে করো। ভালো দিন দেখে দি। গিয়ে রেজিস্টারী করে এসো। আমরা বৌভাত করে ঘরে তুলি।' বললাম, 'জয়তিকে মত করানো যাবে না। বাবার অমতে সে কিচ্ছু করবে না।' মা বললেন, 'তবে তো করার কিছুই নেই।' আমি বললাম 'করবার কিছু নেই।' মা চিন্তিত মুখে চলে গেলেন। আমি পড়ে রইলাম—তিক্ত বিষাক্ত বিষাদিত মন নিয়ে। এ সময় তোমার পিসেমশাই এলেন বাবার সঙ্গে কথা বলতে। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন তোমার সঙ্গে ঘুরে আসতে। অন্তর্যামীকে প্রণাম করব না?'

দেরী করল না ওরা। লেকের ধারে কয়েক পাক ঘুরে চলে এলো বাড়ি। গৌতম বলল, 'তুমি নামবে না?'

জয়তি বলল, 'আজ থাক, লজ্জা করছে।'

'না নামলে খারাপ দেখাবে কিন্তু। মা বাবা নিশ্চয়ই বুঝেছেন তুমিও এসেছ। নইলে তোমার পিসেমশাইকে দেখেই আমি রাস্তায় দৌড়তে বেরিয়ে পড়িনি।'

জয়তিকে নামতে হলো।

গৌতমের মা এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ডিসভরা খাবার আর চা এনে দিলেন। বাবা কাছে বসিয়ে জয়তির কাঁধের উপর হাত রেখে বিমলবাবুর সঙ্গে কথা বলে চললেন।

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বসে বিমলবাবু সকৌতুকে বললেন, 'কেমন লাগল বেড়ানোটা।'

জয়তি হেসে বলল, 'ভালো।'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বিমলবাবু বললেন, 'শুধু ভালো, না খুব ভালো?... তোমার মা আমার কাছে বুদ্ধি চাচ্ছিলেন। সময় নিয়েছিলাম ভাববার। কিন্তু কেমন আপনা থেকে সব হয়ে গেল।'

'হয়ে গেল?'

'হয়ে গেল না? সব ভার নিয়ে নিলেন গৌতমের বাবা। চমৎকার ভদ্র ব্যক্তি গৌতমের বাবা। মাও তেমনি। ছেলের জন্য ওঁরা যেন সব করতে প্রস্তুত। অবশ্যি আসল কথা, কন্যাটিকে ওরাও হারাতে চান না। একেবারে মনের মত পাত্রী পেয়ে গেছেন যেন ওরা।

জয়তি বাড়ি এসেই চলে গেল নিজের ঘরটিতে। সুষমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন বিমলবাবুকে—'জয়তি কিছু বললো টললো?'

বিমলবাবু মাথা চুলকে বললেন, 'তেমন নতুন কিছু নয়। আপনি অস্থির হবেন না, আমি তো রয়েছি। নীরেন বুঝি লাইব্রেরীতেই বসে আছে?'

সুষমা বললেন, 'বাড়ি যতক্ষণ থাকেন হয় দাবা নয় বই—এই তো আছে।

বিমলবাবু লাইব্রেরী ঘরের দিকে চললেন। সুষমার কাছে তিনি কিছু ভাঙ্গলেন না। হয়তো সেই পণ্ড করে দেবে শেষে। লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে দেখলেন, নীরেনের সামনে বই একখানা খোলা রয়েছে বটে, কিন্তু পড়েছিলেন বলে মনে হলো না। এখনই চলে যাবেন তাই আর বসলেন না বিমলবাবু। দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, 'চায়ের কাপ-টাপ ছুঁড়ে যে কাণ্ড করলে, দেখলাম জয়তির মুখ এতটুকু হয়ে গেছে। তাই বেড়িয়ে নিয়ে এলাম।'

'জানি। গিয়েছিলে কোথায়?'

'তোমাদেরই পার্কে। জয়তি তার এক বান্ধবীকে পেয়ে জমে গেল। আমিও জমে গেলাম রাজনীতির তর্কে—'

কথার মধ্যেই 'হুম্' করে উঠলেন নীরেনবাবু। তারপর বললেন, 'কিন্তু বিমল আমার বিরুদ্ধাচরণ করলে মায়া লড়বে তোমার সাথে—এটা জেনো।'

'আমি ভালো ক্রিকেট খেলতাম জান তো?' মায়াকে বোল্ড-আউট করে ফেরৎ পাঠাবো রান্নাঘরে। আর তোমাকে আউট করবো গুগ্‌লী বলে।' বলে হেসে চলে গেলেন বিমলবাবু।

সে দিন রবিবার।

নীরেনবাবু পত্রিকা পড়ছিলেন।

বিমলবাবু এসে সোফায় বসে ডাকলেন, 'বৌদি এ ঘরে আসুন।'

পত্রিকা নামিয়ে রেখে নীরেনবাবু বললেন, 'এসেই বৌদির খোঁজ?'

সুষমা এলে বিমলবাবু বললেন, 'বসুন বৌদি, কথা আছে।'

সুষমা বসলেন। তার দুই চোখে ব্যাধ-তাড়িত হরিণের দৃষ্টি। নীরেনবাবুর মুখেও উৎকণ্ঠা-ঔৎসুক্য দুই-ই।

বিমলবাবু হেসে বললেন, 'ভালো খবর আছে। জয়তি আর গৌতমের রেজিস্টার্ড ম্যারেজ আজ সোয়া ন'টার সময় হয়ে গেছে বৌদি।'

'মানে জয়তির বিয়ে হয়ে গেল কি রকম?' সুষমা যেন কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইলেন বিমলবাবুর দিকে।

'আমি একটু হাত লাগিয়ে ছিলাম বটে—কিন্তু যা করবার করেছেন গৌতমের বাবা মা। ভালো দিন ঠিক করেছেন। জড়োয়ার গয়না, বেনারসী কিনেছেন। সানাই বসিয়েছেন। প্যাণ্ডেল বানিয়েছে চমৎকার। সকালে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল। রাতে বৌভাত। কার্ড ছাপিয়েছেন। নিমন্ত্রণ করেছেন শ'তিন চার মতো।'

কান্না, সুখ-আনন্দ-ব্যাকুলতা-অস্থিরতা-ভয় সুষমার বুকের ভেতর যেন একসঙ্গে কোলাহল শুরু করে দিল। এতগুলি অনুভবের সমাবেশ মিলেমিশে দিশেহারা করে ফেলল সুষমাকে। কোন ভাবেই আলাদা প্রকাশের গতিপথ না পেয়ে একসঙ্গে রূপ নিল কান্নার। মুখে কাপড় চেপে আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

নীরেনবাবু কথাটা শোনার পর সেই যে স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন।

বিমলবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখো নীরেন, আমি যে তোমাকে না জানিয়ে —'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন তিনি। কর্কশ গলায় বললেন, 'আর একটি কথাও নয়।' তারপরই কর্কশতার সঙ্গে মেশালেন তিরস্কার আর বিদ্রূপ—'একটি ভদ্রপরিবারের মেয়েকে ঘরের বার করে নিয়ে গিয়েছ তুমি। গৌতমের বাবা পারতেন না তাই কাজটা করে দিলে তুমি। ঘরের লোক যে—।'

'বার করে নিয়ে যাইনি—বিয়ে দিতে নিয়ে গেছি পাত্রটি সত্যি আকাঙ্ক্ষণীয় বলে। ঘরের লোক বলেই ভালো করতে চেয়েছি।'

ক্রোধে-আক্রোশে ফেটে পড়লেন নীরেন বাবু—'তোমার অভিভাবকত্বে আমার সংসার চলবে?'

'হাতে ঘুষি চলে না বলে বুঝি কথায় আর গলায় ঘুষি মারছ?'

সুষমা কান্নার তোড়ের ভেতর হাবুডুবু খেতে খেতে আর হিককা তুলতে তুলতে বললেন, আজ জয়তির বিয়ে—। বড়— শুভদিন—।—নাই—বা—দেখলাম—আমরা। তোমরা শান্ত—থাকো। ক্ষমা — করো — মেয়েকে। আশীর্ব্বাদ — করো — ওরা — যেন সুখী — হয়। আমি-তার মা—। আমার বুক — ফেটে — যাচ্ছে। মেয়েকে — দয়া — না — করো, আমাকে দয়া করো। আমি — তো তোমার — কাছে অপরাধ — করিনি।'

ওঁরা চুপ করে গেলেন।

মায়ের অসহায় কান্না ছাড়া ঘরে আর কোন শব্দ রইল না।

বিমলবাবু সব কিছুর—কিংবা এর চাইতে বেশী কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর অগ্রসর হবার নক্সা সাজানো আছে। তাই তাঁর চিত্ত নির্লিপ্ত।

কিন্তু নীরেনবাবুর মনোভাব উপলব্ধি করতে তিনি পারেন নি। তিনি জানেন না, যে গুগ্‌লী বলে নীরেনবাবুকে আউট করবেন বলেছিলেন এবং ভাবছিলেন আউট করে দিয়েছেন; সেই গুগ্‌লী বলে—অর্থাৎ হাওয়ার উপর প্যাঁচমারা ঘোরানো বলে নীরেনবাবুর হাত তিনি নিজেই পরাস্ত হয়ে বসে আছেন। বিমলবাবুর সে কথা কোনদিনও জানা হবে না। বড়লোকী মেজাজের অহংকার নীরেনবাবু কোন গর্বের লোভেই পরিত্যাগ করবেন না। কিন্তু আমরা সে কথা জানব একটু পরেই। যখন অন্তরের গভীর-গুহার বন্ধ-মুখ তিনি খুলে দেবেন—যখন উর্দ্ধপানে মুখ তুলে তিনি নিজের অন্তরের সঙ্গে কথা বলবেন—তখন।

জয়তিদের ওখান থেকে বৌভাতে নেমন্তন্ন সেরে আবার এলেন বিমলবাবু। এসে দেখলেন, সমস্ত বাড়ি নিঝুম নিঃশব্দ। শুধু নীরেনবাবু ঘরের এ মাথা-ওমাথা হাঁটছেন খাঁচা-বন্ধ বাঘের মতো।

বিমলবাবু শান্তভাবে আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৌদি, ছেলেমেয়েরা সব কোথায়?'

'মায়া এসে নিয়ে গেছে।' এমাথা-ওমাথা করার বিরতি না দিয়েই উত্তর দিলেন নীরেনবাবু।

'তুমি তো দেখছি এখন বাঘ হয়ে আছ—' বৌদির কাছেই যাই।

'সেও নিশ্চয়ই তোমার অপেক্ষাই করছে।'

'তবে উঠি। মায়ের প্রতীক্ষা যে কী—তা তুমি বুঝবে না।'

'তুমি মা তাই বুঝছ সেটা।' বলে বসলেন নীরেনবাবু।

'আমি মা নই। কিন্তু আমার হৃদয় আছে। তোমার ভেতর ও বস্তু নেই।'

'তাই নাকি!'

সারটেন্‌লি। ভাইবোনগুলি কাঁদছে, মা কাঁদছে, জয়তি কাঁদছে। জয়তির কান্না দেখে গৌতমের মুখ শুকিয়ে গেছে। বলছে, 'জয়তি আমি গিয়ে রুমি ঝুমিদের নিয়ে আসি?' জয়তি সবেগে মাথা নেড়ে বলছে, 'বাবা দেবেন না—কখনো দেবেন না।' ফিরে এসে বিমর্ষ মুখে ঘুরছে গৌতম। এতো আনন্দের আয়োজন—কিন্তু ওদের কাছে সব বৃথা লাগছে তোমাদের ছাড়া। হৃদয় আছে তোমার বলতে চাও?'

নীরেনবাবু দুটো লাল টকটকে চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইলেন বিমলবাবুর মুখের দিকে। হৃদয় নেই? তবে ভেঙ্গে মুচড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে ভেতরে—'সে কে?'

বিমলবাবু বলতে লাগলেন, গৌতমের মা বললেন, মেয়ের এমন রাজেন্দ্রাণী রূপ বাবা দেখলেন না। আমরা ওঁদের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে এসেছি, ওঁরা কাঁদছেন—বড় আঘাত করছে এ দুঃখ আমাকে। আমি ওঁদের মেয়েজামাই নিজে গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসব সুখে-ঐশ্বর্যে সাজিয়ে। দেখবেন ওঁরা জয়তি ভুল করেনি আপনিও ভুল করেন নি। শুধু ওদের ডাকার অপেক্ষা—আমরা বসে থাকব ওঁদের ডাকের অপেক্ষায়। আমার কথাগুলি ওঁদের বলবেন—এই অনুরোধ।'

'বলা হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। যতক্ষণ মানুষ নিজের ভুলনিজে না বোঝে; ততক্ষণ তাকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা—এটা শাস্ত্রবাক্য।'

'শাস্ত্রবাক্য পালন করো।'

'করতেই হবে পালন। এই তো অমান্য করতে গিয়েছিলাম—শাস্ত্রবাক্য পালন করিয়ে ছাড়লো।' তারপর ওঠার জন্য শরীরটা সোফা থেকে এগিয়ে এনে স্বগতোক্তি মতো বললেন, 'আমি যেতেই মেয়েটা ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, মা শুনে কি করলেন। বাবা কি বললেন। রাণা রুমি ঝুমি কাঁদল কি না। আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম যদি অনুমতি করো—যাবো ওদের নিয়ে?'

'—যা—বে?'

'আরে ঘাড় ছাড়ো—ভীষণ লাগছে।'

নীরেনবাবু তাকিয়ে রইলেন বিমলের দিকে।

নীচু ঘাড় সোজা করে বিমলবাবু হেসে বললেন, 'ও, ঘাড় ধরোনি? তবে তোমার হুহুঙ্কারটাই এসে আমার ঘাড়ে ছিটকে পড়েছিল। চলি।' বলে বিমলবাবু চলে গেলেন।

এবার নীরেনবাবু একা।

তার অন্তর-গুহার বন্ধ-মুখ এখন নিশ্চিন্তে খুলে দিতে পারেন তিনি।

জাত!

হায়, তিনি কী এতই অশিক্ষিত আর আহম্মক যে সুষমা যেটুকু বুঝবে, তিনি সেটুকু বুঝতেও সমর্থ নন?

শিক্ষা চাকরী পরিবার; স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বুদ্ধির সমুজ্জ্বলতা—এক পাত্রে এতো গুণের সমন্বয় যে সহজে মেলে না, এ কথা সবাই বুঝতো, বাদে বুঝি তিনি?

কিন্তু আজকাল একটি বিয়ের মানে কি?

বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা।

হ্যাঁ, তিনি জানেন, কম দিলেও চলতো।

'হ্যাঁ তিনি জানেন, অনেক কম হলেও চলতো।'

হ্যাঁ—হ্যাঁ তিনি এও জানেন, এমন কি না দিলেও চলতো!

কিন্তু নীরেনবাবু চলবেন কেন সে চলা!

বিয়ের রাতে শ্বশুরের টাকায় সাজানো মেয়ের রাজেন্দ্রাণী রূপ দেখবার জন্য চোখ তুলবেন নীরেনবাবু।

না, তা সম্ভব নয়।

তাই ঘটনা উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় তার হাতে আর কিছু ছিল না। আর এই ঘটনাকে উলটো মোড় দিতে গিয়ে হাঁটতে হয়েছে তাকে উলটো পথে। মনের নিদারুণ ইচ্ছাকে নিয়ে যেতে হয়েছে নিদারুণ ক্রোধে। বুকভরা আগ্রহকে নিয়ে যেতে হয়েছে বুকভরা গর্জনে। কখনো রূঢ় আঘাত করে, কখনো আবার খুশি করে, কখনো কথা না বলে, কখনো আবার কথা বলে হেসে, সাজিয়ে দেখে। প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলেছেন, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো ছিটানো পথে যে সন্তর্পণে পা ফেলে মানুষ এগোয়, ঠিক সেই ভাবে। সুষমারই মতো উদ্বেগে ছটফট করেছেন, অভিমানী মেয়ে কিছু যদি করে বসে—সেই শঙ্কায় চলার তুলমূল্য হেরফেরে ঘটে যেতে পারে অঘটন। টলমল করেছে পা।

আজ চুরি করে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে হয়েছে ওঁদের। সেই অপরাধের গুরুভারে ওঁদের ভদ্রমন আজ ম্রিয়মান। ওঁরা দুঃখিত অন্তরে অপেক্ষা করছেন নীরেনবাবুর একটি ডাকের জন্য। মানে-সম্মানে, দাপটে-দম্ভে, আজ তার কৌশল সার্থক।

আর এইজন্য বিমল, সব আগে ধন্যবাদ, অন্তরের অভিনন্দন তোমার প্রাপ্য। আমার এই দুরূহ চলা কতদিন টেনে চলতে হতো—কিই বা তার পরিণতি ঘটত কে জানে?

ক্লান্ত পথিক গাছতলায় বসে যে ভাবে গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মোছে, তেমনি ভাবে নীরেনবাবু রুমাল দিয়ে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত মুখ মুছলেন। আস্তে আস্তে চোখ দুটি লাল হয়ে জলে ভরে উঠল নীরেনবাবুর। অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'তোর অসহায় বাবার পলাতক বৃত্তিকে ক্ষমা করিস মা জয়তি।'

'বলাকা' আষাঢ়, ১৩৮৫

ঝড় উঠেছিল

ছোট্ট রুমালটা হাতের মুঠোয় নিয়ে, ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে— লাইটহাউসের একেবারে পেছনের লাইনে একা বসেছিল ময়ী।

না, না একা শুনে তার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসবার জন্য মন নিয়ে ছোটাছুটি করবেন না। সে তরুণী নয়। তার বয়স হয়েছে। কেউ বলে চল্লিশ—কেউ বলে, ত্রিশের বেশী হতেই পারে না। শুনে পরিচিত যারা তারা ভ্রু কুঁচকে তুলে বলে, 'কি যে বল তোমরা। বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশের ওপর ছাড়া নীচে নয়।' তারপর তারা ময়ীকে কোন বয়সে দেখেছে, কত সনে কি পাশ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি বয়স বের করার যত রকম পদ্ধতি রয়েছে তা দিয়ে ময়ীর বয়স প্রমাণ করতে বসে। প্রমাণ করেও। প্রতিপক্ষদের বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে, তারপর বলে, 'শরীরখানা ছিমছাম। চেহারাখানা ভালো, বয়সটা সত্যি বোঝা যায় না।'

কিন্তু এদের কারু কথাই ঠিক নয়। নিজের বয়স ময়ী নিজেই জানে না, জানতে চায়ও না। যে জানে সে হলো বয়সের কাজ যার হাতে সে। যার হিসেবের অঙ্কে ভুল হয় না। গোঁজামিল থাকে না। মাঝে মাঝে একটু আধটু পক্ষপাতিত্ব করতে তাকে দেখা যায় বটে। কখনো কখনো বয়সের ব্রাশটা হাতে নিয়ে থমকে দাঁড়াতে। কিন্তু বাস্, ঐ পর্যন্ত। তারপর নিজের কাজ আরম্ভ করতে সে দেরী করে না। সে নিয়মের অধীন। বয়সের ভাঙ্গ চুরের অনিবার্যতাকে নিয়ে একটু দাঁড়াতে পারে মাত্র। এই যেমন ময়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন তাকে দেখছে। একটা তাজা শরীর-মনের ওপর শুধুমাত্র নিয়মের অঙ্ক কষবার জন্য রেখা টানতে তার ইচ্ছে করছে না। কিন্তু গোটাকয়েক—তা যত হাল্কা রেখাই হোক টানতেই হবে। চোখের দ্যুতি ঈষৎ কমাতেই হবে। নইলে নিয়ম ভঙ্গের দায় এসে পড়বে ঘাড়ে। ময়ীর উজ্জ্বল মসৃণ রেখাহীন মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন তার এই নিষ্ঠুর দায়িত্ব ভারের প্রতি আজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।

তা নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেক সময় ময়ীও। কিন্তু সে তাকানো বিতৃষ্ণার। তার রূপ কি ছিল, কি গেছে, কি যাবে দিনে দিনে, ময়ী জানে না, জানতে চায়ও না। তার ইচ্ছে করে শরীটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়িয়ে দেয়। টুকরো টুকরো অঙ্গ তার ছড়িয়ে পড়ুক উমার দেহের মতো নানা জায়গায়। ভারতের সতী তীর্থের মহিমাক্ষেত্রে যোগ হোক আরো কিছু সংখ্যা।

ছবি দেখায় ময়ীর রুচি নেই। দেখেও না। যখন দেখে কারু না কারু অনুরোধে পড়েই দেখে। কিন্তু নিঃসঙ্গতার চাপে সত্যি সে হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই নিঃসঙ্গতার হাত থেকে রক্ষা পেতেই যে সে আজ এসে ছবি দেখতে বসেছে, তা কিন্তু একেবারেই নয়। বরং উল্টো। নিঃসঙ্গতার বেদনা দিয়ে আরো পিষ্ট, আরো দলিত করতে চাচ্ছে সে নিজেকে। 'আরো আরো প্রভু আরো আরো—এমনি করেই আমায় মারো।' হ্যাঁ, আরো মার খেতে চাওয়ার মতোই আরো নিষ্ঠুর ভাবে অনুভব করতে চায় ময়ী একা ছবি দেখতে এসে—সে কত একা।

টিকিট ঘরের ছোট খোপটার ভেতর টাকা ঠেলে দিয়ে টিকিট কাটা, দরজায় টিকিট দেখান, আশারের নির্দেশিত আসনের দিকে শরীরটাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করতে করতে অগ্রসর হওয়া—এক কথায় কোন একটা হলে টিকিট কেটে ছবি দেখতে বসা ব্যাপারটা যে এমন ঘর্মাক্ত কাণ্ড ময়ীর ধারণা ছিল না। কারণ একা সে কোন দিন আসে নি। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে কপালে। রুমাল দিয়ে ঘাড় মুখ মুছল ময়ী।

বিরতির সময় পুরুষদের আসনগুলো প্রায় খালি হয়ে গেল। তাদের সিগারেটের পিপাসা এ সময়টুকুর ভেতর মিটিয়ে আসতে হয়। হলে গুঞ্জন উঠলো। গলায় ট্রে ঝুলিয়ে হাউসবেয়ারা ঘোরাঘুরি করতে লাগল। চকলেট, পটেটোচিপস্-এর প্যাকেট বাড়িয়ে ধরতে লাগল। ময়ী দু আঙ্গুলে চোখ টিপে ধরে বসে রইলো। ওর বন্ধ চোখের সামনে অন্ধকার নয়, একটুকরো সাদা শূন্যতা।

ছবি আরম্ভ হলো। চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে সোজা হয়ে বসল ময়ী।

ময়ীর সামনের তরুণী-স্ত্রী স্বামীর দিকে ভূভঙ্গী করল, 'আমার ডালমুট?' স্বামী বসে পড়েছিলেন, ফের উঠতে যেতেই তার হাত ধরে ফেলল মেয়েটি, 'থাক আর যেতে হবে না। ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে—খুব বুঝেছি।' স্বামী হেসে চলে গেলেন। বোধহয় মেয়েটি যা 'বুঝেছে' বলছে সেটা মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য। এদের-ই পাশে বসা প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার প্রৌঢ়া স্ত্রীর হাতে এক প্যাকেট চকলেট দিতেই ভদ্রমহিলা, 'কী ছেলেমানসি হচ্ছে।' বলে স্বামীর হাত ঠেলে দিলেন, 'রাখো তোমার নাতি-নাতনিদের জন্য।' স্ত্রীর দিকে একটু চোখটেপা হাসি হেসে নিজেই মোড়ক খুলতে খুলতে ভদ্রলোক বললেন, 'আজ তাদের দিদা-মা খাক ছবি দেখতে দেখতে।' ভদ্রলোকের পাশের চেয়ারগুলোতে একদল মেয়ে বসেছিল। বোধহয় কোন কলেজের ছাত্রী ওরা। ব্যাপারটা ওদের একজনের কান থেকে অন্যজনের কানে রিলে হয়ে চলল। ওদের সকৌতুক দৃষ্টি একবার করে দেখে যেতে লাগল প্রৌঢ়া দম্পতিকে।

ময়ীর ডানপাশে বসেছিল এক বিদেশী দম্পতি। ওরা বোধ হয় দুজনেই সমান সিগারেট খায়। ওদিক থেকে কড়া সিগারেটের গন্ধ ময়ী নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পেতে লাগল। তবু ময়ীকে সেই বিদেশিনীর দিকেই শরীর কাত করে বসে থাকতে হলো। কারণ ওর বাঁ পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন, ওর সম্বন্ধে তার সচেতনতা বারবার অনুভব করছিল সে। কিন্তু কেন, তা সে বলতে পারবে না। ভদ্রলোক একবারও ওর চেয়ারের হাতায় হাত রাখেননি। ও যেমন মেয়েটির দিকে শরীর রেখেছে। ভদ্রলোকও তেমনি তার পাশের ভদ্রলোকের দিকে শরীর রেখে বসেছিলেন। তবু যেন ভীষণ ভাবে ময়ী অনুভব করছে এর সচেতনতার স্পর্শ।

ছবিটা বিয়োগান্ত। কিন্তু প্রথম দিকটা যথেষ্ট মজার। মাঝে মাঝেই হাসির রোল উঠতে লাগল হলে। হাসে ময়ীও। কিন্তু ওর হাসি নিঃশব্দে ঠোঁটের ভেতরই মিলিয়ে যায়। কিন্তু বই-এর লেখক ও পরিচালক আরো কিছুটা বেশী হাসি দাবি করতে পারতেন ওর কাছে। তবে পুরোটাই সে অবিচার করলো না। বরং প্রাপ্যের অনেক বেশী দিয়ে পুষিয়ে দিল—ছবির শেষ অধ্যায়ে। তখন সমস্ত হল যে চোখের জল ফেলল, সে একাই তা ফেলল। হল থেকে বেরুবার আগে বারবার রগড়ে রগড়ে চোখ মুছে তারপর বেরুল। বাইরের আলোয় এসে লজ্জা করতে লাগলো। দু চোখ কান্নায় ফুলে উঠেছে।

কিন্তু বেশ লাগছে।

ওর ভেতরটা যেন কান্নার জলে পূর্ণ হয়ে গেছে। ওর মন এখন সে জলে সাঁতার কাটতে পারে।

ছবিটা সত্যি ভালো। অনভ্যস্ততার জড়তাও অনেকটা কমে গেছে। টিকিট ঘরের ছোট ফাঁকে টাকা ঠেলে দিয়ে পরের দিনের জন্য একটা টিকিট কাটল। ব্যাগে ভরল। স্বচ্ছন্দভাবে এসে সিঁড়িতে দাঁড়াল। একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে তাতে উঠে বসে বলল, 'সাদার্ন এ্যাভেনিউ'।

পরের দিন ময়ী এসে বসবার পর মুহূর্তে টিকিটের ওপর টর্চের আলো ফেলে আশার্ ওর পাশের সিট যাকে দেখিয়ে দিল, এবং দু পা গুটিয়ে যার যাবার জন্য ওকে জায়গা করে দিতে হলো, ময়ী অবাক বিস্ময়ে দেখলো তিনি সেই ভদ্রলোক। যিনি কালও ওর পাশে বসেছিলেন নির্লিপ্তভাবে। ছবি আরম্ভ হলে নিবিষ্ট হয়েছিলেন ছবি দেখায়। কিন্তু তবু যার সচেতনতার স্পর্শ কাল ওকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল বারবার।

নিজের পাতলা শরীরটাকে যথাসম্ভব গুটিয়ে ছোট করে ফেলল ময়ী।

কিন্তু ব্যাপারটা কী!

ছবিটা ভালো। সে যেমন আবারও দেখতে এসেছে, ভদ্রলোকও আসতে পারেন। কিন্তু একই দিনে আর ওরই—পাশে। এটা কি করে সম্ভব? অসম্ভব ঘটনা ঘটে। বরং সম্ভবের চাইতে বেশী ঘটে। কিন্তু এমন গুছিয়ে ঘটে না।

বিস্ময়, অস্বস্তি মন থেকে সরিয়ে ফেলে ছবিতে মন দিতে চাইল ময়ী। কিন্তু পারল না। যে দিনকাল পড়েছে। কার মনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে কে বলতে পারে। চলে যাওয়াই ভালো। কিছুটা দেখেই উঠে পড়ল সে।

রাত মোটেই বেশী হয় নি। ঘড়ি দেখল—আটটাও বাজে নি। সহজ স্বাভাবিক মনেই ময়ী হাঁটছিল। হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। লোকজনের পা নানা দিকে যাচ্ছে। কিন্তু একজনের পা যেন তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। মাথার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ ঝলসে গেল ময়ীর— 'সেই ভদ্রলোক কি!' তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে

তাকালো। দেখল সে-ই ভদ্রলোক! একটা নিদারুণ ভয়ের ধাক্কা খেল। কিন্তু ঘুরেও দাঁড়াল। ভদ্রলোক আরো দু পা কাছে আসতেই গলা না চড়িয়ে, সব জোর কথার উপর দিয়ে বলল, 'কাল থেকে আপনি আমার পিছু নিয়েছেন। এবার আমি লোক ডাকব।'

ভদ্রলোক বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট খেতে খেতে চলছিলেন। ময়ীর আচমকা দাঁড়িয়ে পড়া, এবং হঠাৎ জিজ্ঞাসা প্রথমটায় যেন তাকে কিছুটা বিশৃঙ্খল করে ফেলল। কিছু বিব্রত, কিছু ত্রস্তব্যস্ত দৃষ্টিতে ময়ীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

ময়ী কিন্তু ততক্ষণে ভদ্রলোকের উপর থেকে চোখ তুলে নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

তার চোখে কেবল একটা অস্পষ্ট আভাস ছিল লোকটির চেহারার। এবার মুখোমুখি সোজা তাকিয়ে হক্‌চকিয়ে গেছে সে। বাঃ, বাঃ, এ কে! উজ্জ্বল দৃষ্টি, খাড়া নাক, চাপা ঠোঁট। ঘন চুলের ভেতর কিছু কিছু সাদা চুলের টান। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। গলায় শান্তিনিকেতনী জড়িপাড় চাদর। পোষাক চেহারা থেকে দৃষ্টি পর্যন্ত সব কিছুতে আভিজাত্যের গরিমা।

ময়ী বুঝল সে ভুল করেছে। কিন্তু কি ভুল তা বুঝল না। প্রথম দিনের পাশে বসা অপরিচিত একজন লোক পরের দিনও ঠিক তার পাশে এসে বসলেন। সে উঠে পড়লে তিনিও উঠে পড়লেন। এখন কয়েক হাত ব্যবধানে তাকে অনুসরণ করে চলেছেন—এ সব-ই আকস্মিক ব্যাপার হতে পারে না। আবার এ বয়সের একজন অভিজাত ব্যক্তি কোন মহিলার পিছু নিতে পারেন, এও ভাবা যায় না। তাই ভদ্রলোকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘটনার ইতি টানতে চাইল। এখন একটা ট্যাক্সি পেলেই সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি। সামনে দিয়ে কয়েকটা খালি ট্যাক্সি গেল। কিন্তু ওর ডাকে ভ্রূক্ষেপও করল না। ময়ীর এবার মনে হলো হুমায়ুন প্লেসের দিকে এসে ভুল করছে। মার্কেট দোকানপাট সাড়ে সাতটায় বন্ধ হয়ে যায়। তারপরই এ জায়গাটা বেশ নির্জন হয়ে পড়ে। ওর উচিত ছিল এসপ্লানেড টার্মিনাসে গিয়ে ট্রামে ওঠা।

লোকবিরল পথ মোটেই নয়। লোকজন যাওয়া আসা করছে। গাড়িও। মার্কারি ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো পথে। তবু যেন মনে হচ্ছে স্তব্ধ নির্জন পথ। চৌরঙ্গির মোড়ে এসে দাঁড়াতেই হলো। আর কত হাঁটবে। এ পর্যন্ত আর একবারও সে পেছন দিকে তাকায় নি। এবার একবার পেছন দিকে না তাকিয়ে সে পারল না। আর পেছন ফিরে তাকাতেই ভদ্রলোকের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলে গেল ময়ীর।

'আমায় খুজছেন?' তক্ষুনি হাতের সিগারেট রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক।

ময়ী স্তম্ভিত। ময়ী ভীত। পা কাঁপছে তার। উঁচুতলার মানুষই তো আজকাল যত পাপকাজের মাস্টার মাইণ্ড সবাই বলে। লোকটা নিশ্চয় তাদেরই একজন। ওদের শিকারী চোখ শিকার ধরায় অব্যর্থ। কি করবে এখন? চেঁচাবে? লোক ডাকবে? কিন্তু লোকটা কি আর একা! অবশ্যই অনুচর সহচররা কাছাকাছিই রয়েছে। ভয়টা জোর করে ঠেলে ফেলে দৃঢ় কণ্ঠে ময়ী বলল, 'আপনাকে দেখে ভদ্রজন মনে হয়েছিল। শুধু ভদ্রজন নয়, দামী লোক মনে হয়েছিল। তাই তখন চলে এসে ছিলাম। এবার আমি লোক ডাকব।'

দুটি মাদ্রাজী ছেলে ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'আপনার কথা বুঝে উঠতে পারে নি ওরা। পারলে ডাকতে হতো না। এক্ষুনি লাফিয়ে পড়ে শরীরটাকে আমার দলা পাকিয়ে দিত। আপনার চোখ আমাকে ভুল দেখে নি। দামী লোক নিশ্চয়ই নই, কিন্তু ভদ্রজন অবশ্যই। এবং নিতান্ত ভেতো বাঙ্গালী। এখানে আপনি ট্যাক্সি পাবেন না। আপনার যাবার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। আর রাজী হন তো আমার গাড়ী পৌঁছে দিতে পারে।' বলে হাসলেন, 'আমার ড্রাইভার যাবে। আমি না।'

আমার গাড়ীতে উঠে বোস, মানে আমার খাঁচায় ঢোক। এমন সুন্দর ফাঁদ পাততে না জানলে কি আর 'মাষ্টার মাইণ্ড' হওয়া যায়।

কোন জবাব না দিয়ে ময়ী কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিসটার দিকে যেতে লাগল। এ ছাড়া পথ নেই। দেখল লোকটাও আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে আসছে। তার ফাঁদে পা দিয়েছে। ওকে লোকটা ফাঁদে ফেলতে পারে নি কিন্তু ও লোকটাকে ফাঁদে ফেলতে পেরেছে। ও যেন জয়ী।

পুলিসটা হাতের লাঠির ওপর থুঁতনি চেপে অলস ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। নারী কণ্ঠের ডাক শুনে লাঠির উপর থেকে মুখ তুলল। কিন্তু তার দৃষ্টি ময়ীর মাথা ডিঙ্গিয়ে পড়ল ভদ্রলোকের উপর। আর অমনি সে সন্ত্রস্ত হয়ে বুকটান করে দাঁড়াল। মিলিটারী কায়দায় দুপা ঠুকে দীর্ঘ স্যালুট জানাল ভদ্রলোককে।

কাকে স্যালুট ঠুকছে পুলিস! ময়ী পেছনে তাকাল। কই ঐ লোকটি ছাড়া দ্বিতীয় আর তো কেউ নেই। আর তিনিই তো বেশ মজা উপভোগের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আর তারই মধ্যে বাঁ হাতটা তোলা না তোলার মধ্যপন্থায় পুলিসম্যানের স্যালুট গ্রহণ করছেন। এখন ওকে বলছেন, 'আসুন।' যেন তারই সঙ্গী ও।

লোকটি তা হলে পুলিসের কর্তাব্যক্তি কেউ। তা তিনি ওর পিছু নিয়েছেন কেন? কিসের আসামী ওকে ভাবছেন তিনি।

'আসুন আমার সঙ্গে।'

কর্তার ডাক অগ্রাহ্য করলে পুলিসটা ধরবে এখন ওকেই। নিরুপায় ময়ীকে সঙ্গে চলতে হলো। ভাবল যত বড় কর্তাব্যক্তিই হোক, ওর ভয়টা কী। ও ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নয়। স্মাগলারও নয়। কি করবে ওকে। হঠাৎ পা দুটো যেন ময়ীর পাথর ওজন হলো, কিন্তু যদি নারীলোভী হয়? চারদিকে তাকাল ময়ী—কার সাহায্য চাইবে? পুলিসের কর্তাব্যক্তির কাছে ঘেঁষবে কে।

ময়ী ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটু পেছনে থেকে হাঁটছিল। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন। ও পাশে এলে এক সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন।

'আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন। তাই দিন।'

'নিশ্চয় দেবো। আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে ইচ্ছে করছে—আরে, থামবেন না। ভয়ের কথা কিছু বলি নি। আপনাদের এ সংস্কার এমন বদ্ধমূল যে, কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে কিছুতেই কথা বলা যায় না। যদি ভালো লাগে, কথা কইতে ইচ্ছে করে তবে কেন আমরা নিজেই পরিচয় করে নিতে পারব না বলুন তো? একটা গল্প আছে, জাহাজডুবি হয়ে এক ইংরেজ পুরুষ আর এক ইংরেজ মহিলা একই ভাসমান কাঠের দু প্রান্ত ধরে সাত দিন কাটাল, তবু কেউ কারু সঙ্গে কথা বলল না। কারণ তাদের পরিচয় করিয়ে দেয় নি কেউ। দেশটা ওদের নকল করতে গিয়ে সব দিকে ভরাডুবি হচ্ছে। কিন্তু আমরা আলাপী দেশের মানুষ। খালে বিলে নদীতে নৌকো দেখতে পেলেই ডেকে উঠি, 'ও বাই মাঝি, নাও কোনখান থিকা আইল? কোন বাড়ি যাইব!'

'আপনি পূর্ব বাংলার লোক?' হঠাৎ মুখ ফসকেই কথাটা বেরিয়ে এলো ময়ীর।

'হ্যাঁ। আপনিও তাই।'

'আপনি বুঝলেন কি করে?' কথা বলার ইচ্ছে না থাকলেও না জিজ্ঞাসা করে পারল না ময়ী।

'বুঝলাম আপনার কথায় বাঙাল টান শুনে।'

'কোথায় শুনলেন আমার কথা?'

'কাল যখন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট চাইলেন। তাকালাম। আপনাকে দেখলাম। পরের আসনটার টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ছবি দেখার জন্য নয়। এক আসামীর অনুসন্ধানে।'

নতুন করে সিগারেট ধরালেন। বললেন, 'এই তো দেখুন কেমন আলাপ হয়ে গেল। এখন পরিচয়টা দিয়ে নি। যদিও দুর্বৃত্তের পাল্লায় পড়েছেন এ আতঙ্ক নিশ্চয়ই আপনার গেছে। কিন্তু দুর্জন তো হতে পারি। আমার নাম অমিতাভ সেন। নিবাস আগে ছিল ঢাকা। অধুনা কলকাতা। বাস করি থিয়েটার রোডে। বাড়ির নম্বর ১১।১। কাজ করি পুলিসে—এ তো দেখতেই পেলেন।'

'তা পেয়েছি। কিন্তু আমাকে ধরেছেন কেন?'

'ঐ যে বললাম, ইচ্ছে করছিল পরিচিত হতে। আর আপনাকে ধরেছি? আপনি কি আমার দু'হাতের ভেতর?'

ময়ী কথার ইঙ্গিতের দিকে কান দিল না। এগুলো ওদের পুলিসী ধূর্ততা। বলল, 'আপনি আমাকে স্মাগলার, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার -দের লোক ভেবেছেন!

'দূর! ওরা হল আমাদের চেনাজানা বন্ধুজন। নিত্য যাওয়া আসা। ঘরের লোক বলতে পারেন।'

'তবু তাদের অ্যারেষ্ট করেন না।' ময়ী যেন হতভম্ব।

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে চারিদিকে দেখে নেবার ভাব করে অমিতাভ সেন বললেন, 'করছেন কী! রাস্তাঘাটে এ সব কথা বলতে হয়! আপনিও এ্যারেষ্ট হবেন। আমার চাকরীটিও খাবেন।'

'মানে?'

'না, আপনি দেখছি দেশের অবস্থার 'দ' আর রাজনৈতিক অবস্থার 'র' কোনটাই জানেন না। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে এ্যারেষ্ট হবেন না? দেশের মাথা মাথা লোকদের ধরে টান দিলে আপনার ঘাড়ে মাথা থাকবে? অর যদি ঘাড়টা বাঁচেও, এ সব কথা বললে একঘরে হবেন যে। ধোবা নাপিত বন্ধ হয়ে যাবে যে। এ কথার পরও আপনাকে এ্যারেষ্ট করলাম না। দেখুন কত সজ্জন ব্যক্তি আমি।'

'আমি আপনাকেই কোন স্মাগলারদলের মাষ্টার মাইণ্ড ভেবেছিলাম।'

'এ্যাঁ—' বলে দুচোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করলেন অমিতাভ সেন, এটা ভেবেও আহ্লাদে আটখানা না হয়ে পালাচ্ছিলেন। হা ভগবান! সে জন্যই বলছিলাম দেশের অবস্থার 'দ' আর রাজনৈতিক অবস্থার 'র' আপনি কোনটাই জানেন না। অর্থ চান, খ্যাতি চান, লক্ষ টাকার পুরস্কার চান, পত্র-পত্রিকা—রেডিও টেলিভিশনের প্রচার চান, আগে ওদের লোক হতে হয়, তবেই বাণিজ্য করে ওসব ঘরে তোলা যায়। আর আপনি কিনা ওদের হাতে পড়েছেন ভেবে পালাচ্ছিলেন।'

ময়ী হাসল। নিজের পূর্বকথা ধরে বলল, 'এ্যারেষ্ট না করলেও নজরবন্দী করে রেখেছেন। যেতে দিচ্ছেন না।'

'সেটা বলতে পারেন। ... যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না। চলুন না কোথাও গিয়ে বসি? অনেকক্ষণ ধরে হাঁটাচ্ছি আপনাকে।'

' যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না।' 'চলুন কোথাও গিয়ে বসি।'

ভদ্রলোক সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। হোক পুলিসের কর্তা, ওর কী। বলল, 'আপনি আমাকে একা পেয়ে এবং আপনার চাকরির সুযোগ নিয়ে অপমান করছেন।'

অমিতাভ সেন ময়ীর কথায় সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ঠিক। চাকরির সুবিধেটা বিরাট ভাবে নিয়েছি। নইলে সাহসই পেতাম না। এক্ষুনি তো ধরিয়ে দিচ্ছিলেন পুলিসের হাতে। চাকরি, খ্যাতি, অর্থ যারই হোক একটা জোর হাতের মুঠোয় না থাকলে অনেক ইচ্ছা মানুষকে চেপে যেতে হয় বৈকী। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার দুরন্ত ইচ্ছাকেও চেপে যেতে হতো আমার।'

একটা সিগারেট থেকে আরেকটা ধরিয়ে নিয়ে অমিতাভ সেন তার পূর্ব কথায় চলে গিয়ে বললেন, 'আমার চাকরির সুবিধে আমি নিয়েছি কিন্তু তার সুযোগে আপনাকে অসম্মানিত করছি এ কথা ঠিক নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের গতির কতগুলো স্তর আছে। সে স্তরগুলো ধীরে সুস্থে পার হতে হয়। হঠাৎ আবেগে তাড়াহুড়ো করে এগোতে গেলে সত্য হলেও তার চেহারা আর সুন্দর থাকে না।' হাতজোড় করলেন অমিতাভ সেন, ' সে জন্য আমি দুঃখিত। আর আপনাকে একা পেয়ে পিছু নেই নি। সে যতই একা থাকুন, যত সুবিধা থাক আমার চাকরির—যত প্রচণ্ড ইচ্ছা থাক আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার—তবু সেটা নিতাম না। আপনি যে কি নিদারুণ ভাবে 'একা' সেটা বুঝতে পেরে আমি আপনার আলাপচারী হতে চাইছি।

'মানে?'

'মানে? চলুন মাঠে গিয়ে বসি। আর কত হাঁটবো। আপনার ইচ্ছে হয় বসবেন। না ইচ্ছে হয় বসবেন না। আমার চাকরির যেমন সুবিধা আছে, অসুবিধাও কম নয়। মাঠেও পুলিস পাহারাদার রয়েছে একবার যদি তাদের ডাকেন, আমার মান থাকবে না।

'চলুন।'

অমিতাভ সেন ময়ীর দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন, 'অগত্যা?'

'আপনি কি আগ্রহ চাইছেন?'

থেমে পড়লেন অমিতাভ সেন, আপনার বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার গাড়িতে যাবেন। ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসবে। না ট্যাক্সি?'

ময়ী বলল, 'আপনার আত্মবিশ্বাস আর দম্ভ তো কম নয়।'

বিস্মিত কণ্ঠ অমিতাভ সেনের, 'কি রকম? আমি তো বরং হার মানলাম।'

'ঐ দম্ভে আঘাত লেগেছে বলেই। আপনি ভেবেছিলেন আপনি আর আপনার পজিশন একজন মহিলাকে বশ করতে যথেষ্ট—এতো যথেষ্ট যে দু এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগাও উচিত নয়।'

এবার হেসে উঠলেন অমিতাভ সেন। 'না, এটা আমার দম্ভ নয়। অসহনীয়তাও নয়। এটা আমার—কি বলব? ময়ীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, বলেই ফেলি রাগ করবেন না। এটা আমার অভিমান। বেশ না হয় ক্ষোভ দুঃখ জাতীয়ই কিছু বলি। আমি এক মুহূর্তে আপনাকে চিনে ফেলেছি। কিন্তু আপনি আমাকে এত কথা, এত সময়ের পরেও চিনতে পারলেন না।'

একটু হাসল ময়ী, 'কথা অবশ্যি অনেক হয়েছে'।

'আমি বলে গেছি। আপনি না।'

'সে যেই বলুক কথা অনেক হয়েছে। কিন্তু এত সময়? কিছু আগেও জানতাম না অমিতাভ সেন কে।'

কিন্তু আপনাকে বুঝে গেছি আমি এক মিনিটে। আপনাকে দেখেই আমার মনে হলো ছবি দেখতে আপনি আসেন নি। একটা নিরাশ্রয় মন নিয়ে বসে থাকতে এসেছেন।'

এবার ময়ী আশ্চর্য চোখে অমিতাভ সেনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ময়ীর চোখমুখের আশ্চর্য ভাব লক্ষ্য করে অমিতাভ সেন বললেন, 'আমি মনস্তত্ত্বের ছাত্র। আমার কাজের জগতেও প্রধান অস্ত্র মনস্তত্ত্বজ্ঞান। আপনার দিকে না তাকিয়েও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ছবির কান্না আপনার উপর কাজ করছে শুধু বাতাসের। সে শুধু নাড়া দিয়ে ঝরিয়ে যাচ্ছে। আসলে এ কান্না আপনার হৃদয়ের। আপনার সঙ্গ নিলাম।'

'কান্নার কারণ জানবার জন্য?'

'না।' একটু অন্যমনস্কভাবে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে মনে কাউকে বোধহয় খুঁজছিলাম। নইলে আপনাকে দেখে কেন মনে হলো, 'পেলাম'।

'কাঁদে এমন সঙ্গী খুঁজছিলেন?'

দূরের দৃষ্টি সামনে এনে সশব্দে হেসে উঠলেন অমিতাভ সেন, 'পাগল, সে কি কেউ চায় নাকি।' তারপর ময়ীর দিকে তাকিয়ে একটু গভীর সুরে বললেন, 'মানুষের তো অভাব নেই। এই জনারণ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ—বোধহয় তেমনি কাউকে খুঁজছিলাম।'

'নিঃসঙ্গবোধটা কি কোন গুণ নাকি?'

'বড্ড উঁচু মাপের জিনিস। সাধারণ মানুষ বড় স্থূল। বড় ছোট মাপের তাদের অনুভব। সাধারণ মানুষ এঁদের মনের নাগাল পায় না। এঁদের মনের খাদ্য জোগাতে পারে না। তাই তারা বড় একা। কিন্তু মানুষ একা থাকতে পারে না। সে কাঁদে। সে কান্নাই সাহিত্য। সে কান্নাই কাব্য। 'কোথায় পাব তারে মনের মানুষ যে রে'—এ খোঁজা কি সাধারণের খোঁজা।'

ময়ী যেন সম্মোহিত!

একটা খালি ট্যাকসি ধীর গতিতে ওদের ডাকের প্রত্যাশা নিয়ে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। এই একটা ট্যাক্সির জন্য ময়ী না অস্থির হয়ে উঠেছিল? সে কি দেখল না? কিন্তু সে তো গাড়িটার দিকেই তাকিয়েছিল। কিন্তু এও তো ঠিক শুধু তাকিয়ে থাকলেই হয় না। মন সঙ্গে থাকা চাই দেখার জন্য।

'আর কতবার বলব, চলুন একটু মাঠে গিয়ে বসি'—অমিতাভ সেনের কণ্ঠে ঈষৎ অধৈর্যভাব।

ময়ী নীরব। ইচ্ছা দ্বিধা সংস্কারের সংগ্রাম চলছে কি তার ভেতরে?

'এই তো সবে ন'টা—আপনার কি খুবই তাড়া রয়েছে বাড়ি ফেরার?'

বাইরে নীরব। কথা চলছে ময়ীর ভেতরে — কি তাড়া আছে?

বসবার ঘরে ছেলে সোফায় বসে বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছে? মা এসে বসলে সে অস্বস্তি বোধ করবে। মেয়ের নতুন বিয়ে হয়েছে। সে টেবিলে মাথা গুঁজে বসে বরকে চিঠি লিখছে। মা গিয়ে বসলে লজ্জা পাবে। চিঠি

লেখা বন্ধ হয়ে যাবে তার। আর দেবেশ—অর্থাৎ স্বামী। তার সব ঘড়ি ধরা কাজ। সন্ধ্যায় পত্রিকা পড়া। ছেলেমেয়ের সঙ্গে কিছু কথা বলা। রান্না ঘরে উঁকি দিয়ে, 'কি রান্না করলি আজ—কাজের লোকটির কাছে জানতে চাওয়া। সাংসারিক দুচার কথার আদান প্রদান ওর সঙ্গে। তারপর ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়া। ঘুম। ময়ীর কথাকে দেবেশ পরিহাস করে সাহিত্য করা বলে। কিন্তু তবু তার এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে। ছেলের ঘরে গেলে সে উসখুস করবে... মেয়ের ঘরে গেলে তার চিঠি লেখা থেমে যাবে ... দেবেশের ঘুম ভাঙ্গলে সে ত্যক্ত হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করবে হ্যাঁ তবে তাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে।

কঠিন হলো ময়ীর চিবুক — ওর যদি এখন মাঠে বসে অমিতাভ সেনের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে, কেন সে তা করতে পারবে না? নিশ্চয় পারবে।

কিন্তু কাজে যা করে বসল সেটা তার চিন্তার বিপরীত। ইচ্ছার বিপরীত। খালি ট্যাক্সি দেখে ডেকে উঠল, 'ট্যাক্সি...'।

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে মিটার নামাতেই মুহূর্তে অমিতাভ সেন পকেট থেকে একটা নোট বের করে গাড়ির ভেতর ফেলে দিয়ে। হাত নেড়ে চলে যেতে বলল তাকে।

ময়ী হতাশ সুরে বলল, 'যেতে দেবেন না আমাকে?'

'সাধ্য কি রাখি। থাকলে—থাক সে কথা। মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু বসব, আমার মনের এই ইচ্ছা পূরণের ঈশ্বরী আপনি।'

'বড্ড কাঁচা লাগছে।'

'ভাব এখন ওথলাচ্ছে। মজতে দিন।' বলে ঈষৎ আর্দ্র হাসলেন অমিতাভ সেন।

ট্রাম বাস গুলো যখন যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কত মানুষ। কিন্তু তারপরই মনে হচ্ছে কেউ কোথাও নেই।

অমিতাভ সেন বললেন, 'বাড়ি ফেরা নিয়ে ভাববেন না। আমার গাড়ি পৌঁছে দেবে। এত রাতে আপনার ট্যাক্সিতে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'এই না বলে চলেছেন রাত বেশী হয় নি?' ময়ী যেন অমিতাভ সেনকে জব্দ করে খুশি।

কিন্তু জব্দ হলেন না অমিতাভ সেন। বললেন, 'ঘরের রাত আর পথের রাত দুটো কি এক।'

'আপনার গাড়ি কোথায়?'

'আমি ডাকলেই আসবে।'

ক্ষীণ কণ্ঠে ময়ী বলল, 'মাঠে বসাটা আজ থাক।'

'আজ! উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ঝলকে উঠল অমিতাভ সেনের মুখ। বললেন, 'আজ' কথাটা থাকতে পারে 'কাল' সঙ্গে থাকলে। বলুন কাল দেখা হচ্ছে। এক্ষুনি ছেড়ে দেব আপনাকে।'

'কালকে আসুন না আমাদের বাড়ি? আপনাদের ড্রাইভার তো বাড়ি চিনে আসছে।

'কখন বলুন?'

'বিকেলে চা খাবেন।'

'কাল বিকেলে...' পকেট থেকে নোট বই বের করে পাতা ওলটাতে লাগলেন। নোটবই দেখে নিয়ে ফের পকেটে রেখে বললেন, 'রবিবারের আগে দিন পাচ্ছিনে। রবিবার সন্ধ্যায় আসতে পারি। দেখুন আপনার অসুবিধে আছে কিনা।'

'আপনার মতো আমার নোটবই এর পাতা উলটে দেখতে হবে না। কোনদিনই অসুবিধে নেই আমার। আসবেন রবিবার সন্ধ্যায়।'

'আপনার বাড়ির চায়ের নিমন্ত্রণটা রইল রবিবারের জন্য। আপনার যখন কোন দিনই অসুবিধে নেই, তবে মাঝের দিনগুলো বৃথা যায় কেন?'

অমিতাভ সেনের এ জাতীয় কথায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে ময়ী। হাসল সে, 'আপনার তো নোট বই ভরতি কাজের দিন।'

'আটটার পরে যে করেই হোক আমি ফ্রি হবোই—'

'আটটা।'

'বেশ সাতটা? যে কোন ছবি দেখতে বসবেন। পাশের আসনটা থাকবে খালি। আমি এসে বসব। তারপর ইচ্ছে হয় ছবি দেখব। না ভালো লাগে উঠে পড়ব। হাঁটব, বেড়াব, কোথাও বসে চা খাবো। তারপর আপনাকে পৌঁছে দিয়ে ফের সামনের সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করব।'

'রবিবার আসছেন তো নিশ্চয়ই?'

'অর্থাৎ আপনি আমার আবেদন নাকচ করে দিলেন। ঠিক আছে। আসব রবিবার।'

'আপনার গাড়ি?'

অমিতাভ সেন হাত তুলতেই ময়ীকে আশ্চর্য করে দিয়ে একটা কালো এ্যাম্বাসেডার এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। এখানে তো কোন গাড়ি ছিল না।

ময়ী গাড়িতে উঠতে ইতস্তত করতে লাগল। 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'আমি ট্যাক্সি ধরে নেবো।' নিজে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরলেন অমিতাভ সেন।

এ ভাবে গাড়ির মালিককে ট্যাক্সিতে, আর নিজে তার গাড়িতে যেতে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগল সে। কিন্তু উপায় কি।

অমিতাভ সেনকে নমস্কার জানিয়ে ময়ী গাড়িতে উঠে বসল। হাতজোড় করে প্রতি নমস্কার জানালেন অমিতাভ সেন। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন ময়ীকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে।

অতি সামান্যই — তবু সেই আয়োজন দেখে শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ আসবে?'

'হ্যাঁ।'

উত্তর শুনে মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে আসবে?'

উত্তর দিতে হলো।

দেবেশ ভ্রূ কোঁচকালো, 'অমিতাভ সেন? কে সে?'

'বন্ধু'।

'বন্ধু। অমিতা সেন বলছ?'

'না, অমিতাভ সেন বলছি।'

'কই নামও শুনিনি তো কোনদিন।'

'নতুন নাম।'

'নতুন নাম—মানে?' বোকার মত তাকিয়ে রইলেন দেবেশ ময়ীর মুখের দিকে।

ময়ী বলল, 'হ্যাঁ, নতুন নাম। পুরোনো নামগুলো আমার জীবনে পচন ধরিয়ে দিয়েছে।'

সন্ধ্যাবেলা বাড়ির দরজায় অমিতাভ সেনের গাড়ি থামার শব্দ হতেই ময়ীর বুকটা ধক্ করে উঠল। একবার ধক্ করেই থামল না। ওটা যেন স্টার্টিং শব্দ। তারপর হৃৎস্পন্দন চলতে লাগল দ্রুত তালে। হৃৎ-স্পন্দনের এই নিয়ম-বহির্ভূত তরিৎ চলা থামার জন্য সময় দিতে হলো ময়ীকে।

অমিতাভ সেনের বিদ্যাসাগরী চটির শব্দ একবারে বারান্দায় উঠে এলে ঘর থেকে বেরুল ময়ী। হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। হাসল। 'আসুন' সম্ভাষণে বসবার ঘরে নিয়ে এলো। সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

অমিতাভ সেন কিন্তু বসলেন না। ঘুরে ঘুরে সাজানো ঘরের এটা—ওটা—সেটা দেখতে লাগলেন হাতে তুলে, কখনো ঝুঁকে।

পোষাক কালকের মতই। ধুতি পাঞ্জাবি, গলায় জড়িপারের মাদ্রাজী চাদর। আজকের জড়ির পাড়টা খুব চওড়া। নিয়ন আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে।

বুক সেলফের উপর রাখা তরুণী ময়ীর ফটোটা হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর যথা স্থানে রেখে দিয়ে সকৌতুকে মন্তব্য করলেন, 'বড্ড কাঁচা।'

অর্গেনের ঢাকনা তুলে 'দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো তোমার ঘরে—' কথাগুলোর সুর রিডের উপরে টেনে যেতে যেতে ময়ীর দিকে তাকিয়ে গূঢ় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসলেন। অর্গেনের ঢাকনা ফেলে এসে কৌচে বসলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

'অতিথি না বসা পর্যন্ত বসা সৌজন্যবিরুদ্ধ।' বলে অমিতাভ সেনের উলটো দিকের সোফায় গিয়ে বসল ময়ী। বলল, 'চাকরির কাজ গুলো কিভাবে স্বভাবে পরিণত হয় সেটাই দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল আপনি বাড়ি সার্চ করছেন।'

হা হা করে হেসে উঠলেন অমিতাভ সেন। সোফায় পিঠ রেখে বললেন, 'চা কোথায়?'

'আনছি—' বলে ময়ী উঠে দাঁড়াল।

বাধা দিলেন অমিতাভ, 'আপনি বসুন তো। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। কথা খুঁজে না পেয়ে একটা কিছু বললাম।'

ময়ী এ সুযোগ ছাড়ল না। বলল, 'কথা বলার সঙ্গী চাইছিলেন। এক সন্ধ্যায়ই কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।'

'খুঁজলে কথা পাওয়া যায় না।'

'কাল খুঁজতে হলো না। আজ খুঁজতে হচ্ছে কেন?'

'ঘরবন্দী করলেন যে।'

ময়ী হেসে বলল, 'দাঁড়ান চা নিয়ে আসছি।

চায়ের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে আসবেন না। শুধু চা। এক দুই তিন কাপ বলেন সানন্দে খাবো। কিন্তু আর কিছু নয়।'

'কেন?'

'আমি বিকেলে কিছু খাই নে।'

'সে দেখা যাবে।' যাবার সময় কতগুলো ম্যাগাজিন ধরিয়ে দিয়ে গেল ময়ী অমিতাভ সেনের হাতে। 'এ গুলো ওলটান পালটান। আমি আসছি।'

ময়ী ফিরে এলে ম্যাগাজিনগুলো ঠেলে সরিয়ে অমিতাভ সেন বললেন, 'কি বাচ্চাদের মত এক বোঝা ছবির বই দিয়ে বসিয়ে রেখে গেছেন।'

হেসে উঠল ময়ী।

স্তব্ধ বাড়িটাকে দু দুবার নাড়া দিয়ে গেল উচ্চ হাসি। একবার অমিতাভ সেনের। এবার ময়ীর।

বিরস মুখে শাশুড়ী বলে গেলেন, 'রাতের রান্না এসে বলে যেতে।'

ছেলে এসে এসে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবার ঘড়ি কোথায় রেখেছ?'

মেয়ে কালো মুখ করে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে গেল অমিতাভ সেনকে।

বাড়ির উদ্ধত ধৃষ্টতায় ময়ী নিশ্চল, নীরব। কারু কথার জবাব দিল না সে।

অমিতাভ সেন সোফায় পিঠ রেখে বসেছিলেন। পিঠ তুলে সোজা হয়ে বসলেন। মুখের রং যেন এক মুহূর্তে বদলে গেছে।

রান্নার লোকটি এসে খাবার ট্রে সেন্টার টেবিলে রেখে গেল। তারপর রেখে গেল টিকৌজি ঢাকা টিপট আর চায়ের সরঞ্জাম।

প্লেটে খাবার তুলতে তুলতে নিজেকে শান্ত করে নিল ময়ী। মনের সত্য ভাব গোপন করে অন্য ভাব দেখাতে গেলে কিছু আধিক্য ঘটে যায়। খাবার ডিস অমিতাভ সেনের হাতে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো মাথা দুলিয়ে বলল, 'সব খেতে হবে কিন্তু।'

'নিশ্চয়।' কিন্তু কি কথার উত্তরে নিশ্চয় বললেন, হাত বাড়িয়ে কিনলেন অমিতাভ সেন বোধ হয় জানেনও না।

তেমনি ছেলেমানষি সুরের ভঙ্গিতে ময়ী বলল, 'এবার শুনব আপনার কথা। আমার কথা তো আপনি মনস্তত্ত্ব দিয়েই বুঝে ফেলেছেন। আমি তো মনস্তাত্ত্বিক নই। আমাকে বুঝতে হবে কথায়। বলুন।'

'কি বলব?'

'কাল কি আমি আপনাকে কথা শিখিয়ে দিয়েছিলাম?'

পাতলা হাসলেন অমিতাভ সেন।

'মুড নষ্ট হয়ে গেছে?'

'মুড? ভাবের জগতের মুড আর ডাক্তারী জগতের এলার্জি দুটোই আমার কাছে সমান ধোঁয়াটে লাগে। তাই মুডের কথা বলতে পারব না তো।'

অমিতাভ সেন খেয়ে যাচ্ছিলেন। ডিস খালি রেখে নামিয়ে রাখলেন। যদি আরো থাকত খেয়েই চলতেন। ময়ী যে আরো লুচি তরকারি মিষ্টি ডিসে তুলে দিয়েছে জানেনও না। কিন্তু অমিতাভ সেন বাইরে কিছু খান না। শত অনুরোধেও না। এখানেও খেতেন না। ডিসটা টেবিলে রেখে বললেন, 'এখন কি করব?'

'এতক্ষণ কি করছিলেন?'

সকৌতুকে অমিতাভ বললেন, 'বোধহয় খাচ্ছিলাম। তাই না?'

'কি খাচ্ছিলেন?'

'লুচি সন্দেশ হালুয়া—'

'ছিল না।'

'চপ কাটলেট রোস্ট—'

'ছিল না।'

'তবে ইডলি দোসে—'

'ছিল না।'

হেসে ফেললেন অমিতাভ। বললেন, 'আত্মস্থ ছিলাম।'

চা তৈরী করে অমিতাভ সেনের সামনে রাখল ময়ী।

অমিতাভ সেন চা খেতে লাগলেন। ময়ী যে খাচ্ছে না, পেয়ালাটির দিকে তাকিয়ে চামচে দিয়ে কেবল চা নেড়ে চলেছে—তাও দেখলেন। নিঃশব্দে চায়ের পাট শেষ করে অমিতাভ উঠে পড়লেন।

'উঠলেন যে?' ময়ী তাকাল অমিতাভ সেনের দিকে।

'এবার যাবো।'

'না।'

ফের বসলেন অমিতাভ সেন। ভেতরটা প্রচণ্ড অশান্ত। বাইরে শান্ত।

'যত বার উঠতে যাবেন উঠতে দেব না। বসে থাকতে হবে রাত দশটা পর্যন্ত। কালকে আমি যেমন ছিলাম।'

' বেশ।'

এবং কালকের মতো হতে হবে আপনাকে। অর্থাৎ আপনি যা — ঠিক তাই। 'ঘরটাকে মাঠের এক টুকরো জমি, মানুষগুলোকে জনতা ভেবে নিতে কতক্ষণ লাগে? আমি তো তাই করি। ঘরটাকে করে ফেলি মাঠ প্রান্তর। আকাশটাকে করে ফেলি নদ নদী পাহাড় সমুদ্র সৈকত। নইলে নির্জনতা পেতাম কোথায়? ভাবনাকে ছেড়ে দিতাম কোথায়? চোখ ভরে দেখতাম কি?'

ময়ীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন অমিতাভ। শরীর মন বুদ্ধি — সব কিছু যেন আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে ফেলছে ময়ী অমিতাভ সেনের। গলার গভীর তলা থেকে স্বর বের করে বললেন, বেরিয়ে পড়বেন?'

'কোথায়?'

'যেখানে বলবেন।'

'মানস সরোবরে—পারবেন?'

'একটাতে পারব।'

মানস সরোবর দুটো আছে নাকি?'

'আছে।'

'আর একটা কোথায়?'

অমিতাভ সেন বুকে হাত রেখে জায়গাটা দেখালেন।

দারুণ লজ্জায় গাল লাল হয়ে উঠল ময়ীর। এ কোথায় চলেছে সে। নিজের রাস টেনে ধরল ময়ী। চোখ অন্যদিকে রেখে বলল, 'আপনি তো অনেক কাপ চা খান। আর এক পেয়ালা দি?'

এবার কাতর ভাবে হাত জোড় করলেন অমিতাভ, 'দয়া প্রার্থনা করছি। আপনার সম্মতি না পেলে উঠতে পারছি নে। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। একটু চোখ বুজে শুয়ে থাকতে চাই।'

ময়ী অমিতাভ সেনের অবিন্যস্ত চুল, গলায় ঝোলানো মাদ্রাজী চাদর থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ টেনে আনল। কালকের—অমিতাভ সেন এবং আজকের প্রথম দিনের অমিতাভ যেন আর এই ব্যক্তি যেন ভিন্ন মানুষ। বিব্রত, চিন্তিত, অন্যমনস্ক। কাল যে জুলুম করেছে, আজ সে দয়া প্রার্থনা করছে।

ময়ী নীরবে উঠে দাঁড়াল।

'আপনার এই উঠে দাঁড়ানকে কি আমি আমার যাবার অনুমতি পাওয়া ভাবতে পারি?'

'ঠিক আছে।'

দু হাতে কৌচে ভর দিয়ে একটু শরীর তুলে কৌতুকের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন অমিতাভ সেন, 'উঠব?'

ময়ী হাসল।

মুহূর্তের কৌতুক আবার মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল অমিতাভ সেনের। উঠে পড়ে একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলার ভেতর দিয়ে বললেন, 'জীবনে ঠিক মানুষটির দেখা হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক সময় পাওয়া যায় না। আচ্ছা চলি।'

নমস্কার জানিয়ে অমিতাভ সেন বেরিয়ে গেলেন।

ময়ী দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে।

মনিবকে দেখে ড্রাইভার এসে দরজা খুলে ধরল।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে পেছনে দ্রুত চপ্পলের শব্দ শুনে ফিরে তাকালেন অমিতাভ সেন। ময়ীকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ময়ী কাছে এলে বললেন, 'আপনি সঙ্গে আসছেন বুঝতে পারি নি—'

হঠাৎ দোতলার দিকে চোখ পড়ল। দেখলেন—সারি সারি কতকগুলো মাথা অন্ধকার বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আচ্ছা চলি—' বলে গাড়িতে উঠে বসলেন।

ময়ী গাড়ির দরজা ধরে বলল, 'শুধু চলি বললেন যে?'

ম্লান হাসলেন অমিতাভ সেন, 'তবে কি বলব?'

'আজ চলি বলবেন।'

'বলেছি তো, 'আজ' বলা যায় 'কাল' সঙ্গে থাকলে।'

'কাল' আছে। শুধু একটা নয় অনেক—অনেক 'কাল' আছে।' ময়ী হাঁপাচ্ছে। তার ভেতরটায় উত্তাল এলোমেলো হাওয়া বইছে—'কেবল কাল' বলছেন যে। চিরকাল যদি বলি আমি?'

ময়ীর দিকে তাকিয়ে মনস্তত্ত্বের ছাত্র অমিতাভ সেন অশান্ত হৃদয়ে শান্ত হাত রাখলেন ময়ীর হাতের উপর।

'কথা বলছেন না কেন? মিটিং আছে কাল?'

'জানিনে। থাকলেও বাদ দেব যদি বলেন।'

'কাল আসবেন?'

'কোথায়?'

'এখানে?'

'এখানে! বেশ আসব।'

'কখন আসবেন।'

'আজ যে সময় এসেছিলেন—না, আরো আগে। না, ঠিক আছে আজ যে সময় এসেছিলেন—'

ময়ীর দু হাত মুঠো করে ধরলেন অমিতাভ সেন গভীর আবেগে। গভীর অনুরাগে।

অন্ধকার বারান্দায় সারি সারি মাথাগুলো আবার চোখে পড়ল। ময়ীর হাত ছেড়ে দিলেন অমিতাভ সেন। বললেন, 'আজ চলি।'

গাড়ি স্টার্ট নিতেই 'এই রাখো—' বলে গাড়ির বন্ধ দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ময়ী। ছট্‌ফট্‌ কণ্ঠে বলল, 'না, — এতক্ষণ আমি ভুল করেছি। এখানে না—এখানে না। আপনার সঙ্গে আমার পথে পরিচয়। পথই ভালো। কাল ছ'টার সময় থাকবেন। আমি আসব। ঠিক আছে?'

'কোথায় থাকব?'

'তাই তো! লাইট হাউসে?'

অমিতাভ সেন হাসলেন, 'গঙ্গার ধারে থাকব। আপনি আসবেন। আমি খুঁজে নেবো।'

'গঙ্গার ধারে ... বাঃ সুন্দর জায়গা বেছেছেন তো ... সেখানে বোটে বসব ... কথা বলব। জলে হাত ডোবাব চমৎকার হবে। গাড়ি... গাড়ি ... না, দরকার নেই। ট্যাক্সিতেই যাবো...।'

ময়ীর লাল ঘর্মাক্ত উত্তাল মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন অমিতাভ সেন। তার কম্পিত ঠোঁটের উপর আলতো স্পর্শে হাত বুলিয়ে আনলেন একবার। তারপর—বারবার।

অমিতাভ সেনের দৃষ্টি আর আঙ্গুলের স্পর্শ ময়ীর শরীরটা যেন উড়ন্ত পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মাটি তাকে ফিরিয়ে আনল। দরজা ছেড়ে দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। অস্ফুট কণ্টে বলল, 'কাল থাকবেন।'

'থাকব।'

পরের দিন ঠিক ছ'টার সময় অমিতাভ সেন গিয়ে যখন গঙ্গার ধারে গাড়ি থেকে নামলেন, ময়ী তখন শ্রান্ত পায়ে একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাদে উঠল।

প্রতীক্ষাক্রান্ত অমিতাভ সেন তখন অধীর পায়ে পায়চারি করছেন। সিগারেটের পর সিগারেট ধরাচ্ছেন। দু চার টান দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন—অস্থির ব্যাকুল।

ময়ী তখন স্থির শান্ত। বসে রয়েছে ছাদের ওপর দূরের দিকে তাকিয়ে। দুটি হাত কোলের ওপর রেখে।

অর্চনা মিত্র সম্পাদিত
'গল্পসম্ভার'— ১৩৮৫

সম্পাদকীয়—১

আমাদের এই নতুন পত্রিকা নতুন বছরের প্রথম দিনে তার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। কামনা করছে সবার শান্তি ও সমৃদ্ধি।

প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করে তার উদ্দেশ্য আদর্শ সম্বন্ধে একটা জবাব দিয়ে নেবার চলতি রীতি বাজারে প্রচলিত আছে। কেউবা বলেন, রাজনীতি, কেউবা বলেন, সাহিত্য-সেবা, কেউবা বলেন সৎসাহিত্য প্রচার।

আমাদেরও কিছু বলে নেওয়া উচিত— কিন্তু বলি কি!

ইন্দ্রের সহস্র চোখের মতো রাজনৈতিক দলের সহস্র নাম জানা নেই— জানবার ইচ্ছাও নেই। অবশ্য রাজনীতির লক্ষ পথের গোলকধাঁধায় পড়ে দিশাহারা হতে চাইনে বলে এমন কথা বলছি না যে আমরা সে নীতি -বর্জিত। রাজনীতি আজ ওতপ্রোতভাবে জড়ানো জীবননীতির সঙ্গে, তাকে এড়িয়ে চলা অসম্ভব। কিন্তু সাহিত্য পথ-পদ্ধতির বিতণ্ডা-ক্ষেত্র নয়— সর্বমানবীয় মঙ্গলই তার চরম লক্ষ্য। কোন বিশেষ দলীয় নীতির অনুগামী না হয়ে সে-নীতি অনুসরণ করেই আমরা চলব।

আর সৎসাহিত্য? সাহিত্যে সৎ-অসৎ মস্ত বিতর্কের বিষয়। তার মীমাংসার ক্ষেত্র এটা নয়।

রইল সাহিত্য-সেবা। সাহিত্যে এই 'সেবা' কথাটি অত্যন্ত অপব্যবহৃত শব্দ। সত্যিকারের সাহিত্য-সেবী হতে যে নিমগ্ন-সাধনার প্রয়োজন—সে নিমগ্নতায় ডুবে যেতে পারার মত সুকৃতি ক'জনার থাকে।

তবু আমাদের পত্রিকার একটা উদ্দেশ্য আছে বৈকী—

নারীর কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রকে আমরা যতই প্রসারিত এবং ব্যাপ্ত করিনা কেন, কতক বিষয়-বস্তু ও আলাপ-আলোচনা থেকেই যায় যা বিশেষ করে নারী-জগতেরই উপযোগী। এ সত্য যে পত্র-পত্রিকাগুলো স্বীকার না করে তা নয়। কিন্তু সর্বত্রই সে বিভাগটিকে— এমন কোণঠাসা করে রাখা হয়, যা এই প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতিটুকু মাত্র দিয়ে বাকীটা হয়ে দাঁড়ায় অবহেলার নামান্তর। আমাদের এ পত্রিকা নারীর প্রয়োজন ও পর্য্যালোচনাকে মুখ্য বলে মেনে নেবে—কিন্তু তাই বলে পুরুষ-বর্জিত থাকবে না। নারীর কর্ম, চিন্তা বা জীবন-সমস্যা তো বনের পশু-পাখীদের নিয়ে নয়—তাই অপর পক্ষকেও আমরা সাগ্রহে আহ্বান জানাবো, তাঁদেরটা বলতে এবং আমাদেরটা শুনতে।

অতএব বলাই বাহুল্য যে আমাদের কাগজটির উদ্দেশ্য বিশেষ করে মহিলাদের পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হওয়া।

এক বছরেরও বেশী একটি দৈনিক পত্রিকার মহিলা বিভাগ পরিচালনার ভার ছিল আমার উপর। তখন 'বৌরাণী' নামে আমার দেশের সাহিত্যানুরাগী বহু মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটবার সৌভাগ্য হয়। সেসময় তাদের চিঠিপত্র আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো যেন একটা নতুন জগৎ। দেখলাম, কত, কত জাগ্রত মন ছড়িয়ে আছে চারদিকে। তারা ভাবে, চিন্তা করে, নতুন কথা বলবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক বিল সম্বন্ধে মতামত না থাক, সুস্পষ্ট মতামত রাখে, ছোটবড় নারী-সমস্যার নানাদিক থেকে শুরু করে হিন্দুকোড আর উত্তরাধিকার বিল সম্পর্কে।

দিনে দিনে আত্মিক যোগাযোগে তাদের সঙ্গে এমন একটা আনন্দ-সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করলো যে তাদের সংবাদ আমার কাছে আর সংবাদমাত্র হয়ে রইলো না। অন্তররসে প্রাণ পেয়ে হয়ে উঠতে লাগলো সাহিত্য। তাদের চিঠি-পত্র আর কাঁচা-পাকা হাতের প্রবন্ধ ছাপিয়ে—তাদের চিঠির জবাব দিয়ে, কেবলই মনে হতো এ যেন কাজ নয়—ডানা-গুটিয়ে বসে-থাকা পাখীদের ডানা ধরে ধরে মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেওয়া। দৈনিকের দায়িত্ব থেকে বিদায় নেবার দিন বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনাই বোধ করেছিলাম। তার ওপর তাদের কাছে থেকেও যখন অনুরোধ আসতে লাগলো, যে কোন উপায়ে একটা যোগসূত্র স্থাপনের পথ বার করবার, তখনই প্রথম সাধ জাগলো একটি সাময়িক পত্র প্রকাশের। কিন্তু সাধের সঙ্গে সাধ্য আমার সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে এমন সুবিধা কই! তবু বুঝিবা আগ্রহের আতিশয্যই আকর্ষণ করলো নিকটতমদের খানিকটা উৎসাহ আর সহযোগিতা। কালবিলম্ব না করে তাঁদের এই দুর্ব্বলতাটুকুকে তখ্খনি কাজে লাগিয়ে ফেলবো মনস্থির করে ফেললাম। এই, স্থির করা এমনি হঠাৎ, যে বুঝলাম মনোমত প্রস্তুতিরও সময় মিলবে না। তা না মিলুক। অরক্ষণীয়া কন্যার জীবনে

যদি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে 'ওঠ মেয়ে তোর বিয়ের' মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়, তখন সে কি চুয়া-চন্দন-চেলির বায়না ধরে, না পারিপাট্য-বিচ্যুতি নিয়ে মনক্ষোভ রাখে। সে জানে সাজবার সময়ের তো শুরু মাত্র। বিনা দ্বিধায় নেমে পড়লাম।

মিত্ররা ছুটে এলেন আপত্তির ঝড় সঙ্গে করে। এত লোকের এমন একমত এক কথা আর জীবনে শুনিনি। সবিস্ময়ে দেখলাম, কাগজ বের করতে যাওয়াটা যে কি সাংঘাতিক দুঃসাহসের কাজ এটা যারা ছাপার অক্ষর চেনে না তারাও জানে। ভয় হ'লো বইকি। কিন্তু অলস 'পারব না-র' চাইতে আন্তরিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে 'পারলাম না' বলাটা অনেক বেশী শ্রদ্ধেয়—তাই তারই ঝক্কি কাঁধ পেতে নিলাম।

অভিজ্ঞতাহীন কাজে এগুতে হয় অসংখ্য অকাজের বোঝা ঠেলে। ব্যর্থকাজ হয় পুঞ্জীভূত। তবু দুঃখ হয় না। এরই নাম তো কাজ শেখা। কিন্তু সব চেষ্টা এসে থামলো লেখার জগতে। কাগজের প্রথম প্রশ্নই টাকা। তারপরেই বিজ্ঞাপন আর লেখা। ব্যবসা আছে তাই বিজ্ঞাপন আছে । আজ যা মিলেছে, কাল আরো মিলবে—দুদিন বাদে আরো। কিন্তু লেখা। দেশে যা নেই তা আমি যোগাড় করবো কি করে? নবীনরা যেটুকু লেখেন স্বাভাবিক ভাবেই তা তারা সরিয়ে রাখেন এমন কাগজের জন্যে যেখানে টাকা এবং প্রচার দুটোই একসঙ্গে হবে। তাঁদের তবিলে এত প্রাচুর্য্য নেই যে যত্রতত্র ছড়িয়ে দেওয়া চলে। আর প্রবীণদের কিছুর কলম বন্ধের মুখে, কিছু ডুবে গেছেন সিনেমায়। সিনেমা চায় শুধু কাঠামো, দেয় প্রচুর। সাহিত্যের দাবী একটি একটি করে ইট-গাঁথা ইমারত, কিন্তু দেয় অতি স্বল্প। তাই প্রায় সর্বস্তরের লেখকদেরই দৃষ্টি বর্তমানে নিবদ্ধ সিনেমার দিকে। আমাদের সাহিত্যে লোভ নামক রিপু এই সিনেমার সূত্র ধরেই এসে বাসা বেঁধেছে। ছাপাশাড়ী আর যান্ত্রিক চারুশিল্পের মতো—সিনেমা নিছক যান্ত্রিক ব্যবসায়ী শিল্প। কোন শাস্ত্রে ব্যবসায়ে বসতি সরস্বতী এমন কথা নেই। তাই বুঝি সরস্বতী আজ বিদায়ের মুখে।

বঙ্কিম-প্রতিভা একহাতে অজস্র লিখে পত্র-পত্রিকা চালিয়েছে, শত পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দানে, শরৎ-রচনা বহু কাগজকে বাঁচিয়েছে মৃত্যুর হাত থেকে। আমাদের উপায়? লেখার জগতে কপাল ঠুকে-ঠুকে সর্ষে ফুল দেখলাম চোখে। প্রশ্ন হয় কতদূর এগুলো? শুনে মনে পড়ে এক আত্মীয়ার কথা। তাঁর একমাত্র আদরিণী কন্যার বিয়ের যৌতুক, আলমারী ভরা শাড়ী, ঘর ভরা আসবাব, গা ভরা অলঙ্কারের কিছুই কেনাকাটা গড়ানোর বাকী ছিলনা। কিন্তু কন্যার বিয়ের কতদূর জিজ্ঞাসার জবাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন.... 'সবই তো ঠিক কিন্তু পাত্রই যে পাচ্ছিনে।' আমার অবস্থাটা দাঁড়ালো সেই রকম। সবই প্রস্তুত— লেখা কই? বিয়েতে বর আর কাগজের জন্য লেখা দুটোই যেমন না হলে চলে না, তেমনি যা-তা হ'লেও চলে না। দেখলাম সাতটি সন্তানের অন্ন যোগানোর আর সাতফর্মা কাগজের লেখা যোগাড়ের গলদ-ঘর্ম অবস্থাটা একেবারে এক। বুঝলাম 'বলাকা' যদি কোনদিন পাখা গুটোয় তবে এই উদর সংস্থানেরই অভাবে। অবশ্য জীবন্মৃত অবস্থায় টিকিয়ে রাখার কথা ভিন্ন।

কিন্তু থাক সে সব ভবিষ্যতের ভাবনা। এখন করি কি— বেরিয়ে পড়লাম বই-এর দোকানগুলোতে। কাগজের বাজার কি করে চলছে দেখতে হয়। দেখলাম, নিছক পারিপাট্যের সুবিন্যাস। ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সর্বস্তরের মাসিক সাপ্তাহিকগুলো যেন এক একটি সুন্দরী রমণী। ভেতরে বস্তু থাক চাই না থাক, দেখার নেশা লাগিয়ে দিতে হবে।

লেখা যদি নাই জোটে অগত্যা সে চেষ্টাই করা যাবে। তারপর ভাগ্য। জমি চষতে পারো, পারো অতি উত্তম বীজ বুনতে। কিন্তু ফসল ফলানোর শেষ নির্ভর যে এক পশলা বৃষ্টি সেটি পুরো দৈবের হাতে। অর্থাৎ 'সবার উপরে মানুষ সত্যের' মতোই 'সবার উপরে.....বরাত সত্য।' আমরাও এ সত্য মেনে শেষ সার্থকতার ভার ভাগ্যের ওপর দিয়ে শুভ-নববর্ষ দিনে কাগজ বের করলাম। অর্থাৎ সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দেবার জন্য নৌকো ভাসালাম।

'বলাকা', বৈশাখ, ১৩৬২

সম্পাদকীয়—২

ঘর গুছিয়ে না ওঠা পর্যান্ত বাইরের দিকে নজর দেওয়া যায় না। তাই আজও আমরা নিজেদের কথাই বলবো।

বাংলাদেশে একটি ভালো মহিলা-পত্রিকার বড় অভাব এবং সেই অভাব মেটানোরই অন্যতম প্রয়াস আমাদের এই 'বলাকা'। 'বলাকা'র প্রথম সংখ্যাতেই যে সাড়া আমরা পেয়েছি স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তা আমাদের আশার চাইতে অনেক বেশী। 'ভোর দেখে দিন বোঝা যায়' এই ইংরেজী প্রবাদটি যদি আমাদের দেশের ভিজে হাওয়ায় নেতিয়ে না পড়ে, তবে 'বলাকা'র অদৃষ্ট নিঃসন্দেহে সুপ্রসন্ন। পাঠকবৃন্দ যে অভিনন্দন জানিয়েছেন, উপযুক্ত অনুপযুক্ততার প্রশ্ন সরিয়ে রেখে অভিভূত অন্তরে তা আমরা মাথা পেতে নিয়েছি। তাঁদের এ শুভেচ্ছা অমূল্য। কিন্তু 'বলাকা' যা হতে চায় এ তার কিছুই নয়। তাকে চাই আমরা মেয়েদের অপরিহার্য্য বন্ধুরূপে গড়ে তুলতে— তা কি সাংসারিক কি সাংস্কৃতিক। 'আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পারব, এত বড় স্পর্ধার কথা আমি বলতে পারিনে, কেননা যে সাহিত্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়, সে সাহিত্য গড়বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়— তার মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই অর্থাৎ নৈসর্গিক প্রতিভা থাকা চাই। অথচ ও ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করে পাবার জিনিস নয়। তবে বাংলার মন যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের আছে।' 'বলাকা' তার সর্বশক্তি দিয়ে কেবল এই ঝাঁকিয়ে দেবার কাজটাই করতে চেষ্টা করবে। নানাভাবে জীবনের বাস্তবতা থেকে বিভ্রান্ত করে, আমাদের মায়ের কোলে তুলে দিয়ে যে ভাবে দোল দেওয়া গান গাওয়া হচ্ছে— তাতে জাগিয়ে রাখবার জন্য এই ঝাঁকুনীর কাজটা জোর হাতে চালিয়ে না গেলেই বুঝি নয়।

আমাদের বৈশাখ সংখ্যাটি বের হবার পর বিভিন্ন কাগজে তার সমালোচনা বের হয়েছে। সে সমস্ত সুচিন্তিত আলোচনা থেকে আমরা যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কেবলমাত্র একটি পত্রিকার এই মন্তব্যটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে— 'আকর্ষণীয় কিন্তু বৈশিষ্ট্যবিহীন। বৈশিষ্ট্য থাকে না বলেই অনেক পত্রিকা অকালে বন্ধ হয়ে যায়'—

আমরা এত বড় স্পর্ধার কথা মনেও পোষণ করি না যে পত্রজগতে বিশিষ্টতা অর্জন করবো। পত্র-পত্রিকাকে মাসের পর মাস একাধিক সার্থক রচনায় সমৃদ্ধ করে জনপ্রিয় করে তোলা বা স্বল্প সংখ্যক বিদগ্ধ পাঠকের অনুযায়ীরূপে স্বতন্ত্র করে রাখার কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু একটি পত্রিকাকে সত্যিকারের বিশিষ্ট করে তোলা সহজ কথা নয়। পত্র-পত্রিকার ইতিহাস খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেটা কচ্চিৎ ঘটনা। স্বাতন্ত্র্য আর বৈশিষ্ট্য এক কথা নয়। প্রচলিত ধারার মধ্যে খানিকটা নূতনত্ব যোগ করলেই স্বতন্ত্র হওয়া যায়। কিন্তু বিশিষ্ট হতে হলে চাই মৌলিক নতুনত্ব—যা প্রচলিত ধারায় আঘাত করে বৃহৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাবে। বিভিন্ন যুগ-সন্ধিক্ষণে সম্পাদক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং কল্লোল-এর প্রতিভাবান গোষ্ঠির আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ-পাল্টানো ঘটনা। সে ছাড়াও সম্পাদনার জগতে যাঁরা বিশিষ্টতা অর্জন করে গেছেন তাঁদের ভেতর এমন একজনও কেউ নেই যিনি সংস্কৃতিতে বা সাহিত্যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। অর্থ এবং প্রতিপত্তি দিয়ে অনেক কাগজের তুলনায় খানিকটা ব্যতিক্রম আনাকে— বৈশিষ্ট্য অর্জন বলে না। সেটা নিছক স্বাতন্ত্র্য মাত্র। স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে অনুকূল পরিবেশ আর প্রয়াসই যথেষ্ট কিন্তু বৈশিষ্ট্যের জন্য চাই প্রতিভা।

'.....নব সাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে।....বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোন প্রকাণ্ড কাণ্ড (যদিও প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নিজে তাই করে গেছেন) করে তোলা অসম্ভব।... এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে যে কোনো জিনিষ মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে...এক কথায়, বহু শক্তিশালী স্বল্প সংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্প শক্তিশালী বহু সংখ্যক লেখকের দিন আসছে।' কেবল লেখকদের ক্ষেত্রেই নয় এ পত্র-পত্রিকা গুলোর পক্ষেও সমান সত্য। আজ বহু খ্যাত স্বল্প সংখ্যক পত্র-পত্রিকার দিন চলে গিয়ে এসেছে স্বল্পখ্যাত বহুসংখ্যক কাগজের দিন। সংবাদ প্রভাকর, বঙ্গদর্শন, প্রচার আর সবুজপত্রের দিন আর আসবে না। এখন অগুন্তি কাগজ নিত্যদিন বেরুবে। যে টিকেযাবে, যাবে অর্থ, অধ্যবসায় আর প্রতিপত্তির জোরে। আর যার অকাল মৃত্যু ঘটবে—ঘটবে ঐ অর্থ, অধ্যবসায় আর প্রতিপত্তিরই অভাবে। বৈশিষ্ট্যহীনতা তার কারণ নয়। হলে বর্তমানে একটি কাগজও টিকে থাকত না।

অবশেষে আর একটি কথা বলে এবারের বক্তব্য শেষ করবো। মেয়েদের-পত্রিকা বলতে দেখছি একটা অতি ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দেশের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে— সে কাগজে ছেলেদের লেখা থাকা চলবে না—

থাকলে আর সেটা মহিলা-কাগজ হলোনা; এমন ধারণা আর কোন দেশে প্রচলিতআছে বলে আমার জানা নেই। বিদেশের বিখ্যাত মহিলা-পত্রিকাগুলোতে— যে মানে আমরা জীবনেও পৌঁছোতে পারব না— ছেলেদের লেখার যেমন আদর তেমনি তাঁদের লেখা দিয়েই থাকে ভর্তি। ডাক্তার, মনস্তাত্ত্বিক, নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিকদের রচনা দু হাতে সংগ্রহ করে সম্পাদিকা ধরে দেন মেয়েদের কাছে। বক্তব্যের প্রাধান্য দিয়েই পত্রিকার জাতবিচার। শুধু মেয়েদের রচনা দিয়ে একটি পত্রিকার পরিচালনা সম্ভব এটা মানলেও তাকে একটা পরিণত পর্য্যায়ে তুলে ধরা যায় এ কথা আপাততঃ মানা সম্ভব নয়। অবশ্যি পত্রিকার পরিণতত্ব বজায় রাখবার জন্য কেবল পরিণত লেখকদের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে না। আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ থাকবে নতুনের প্রতি। সম্পাদনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই কথাকটিই আমরা আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি—

‘‘যত পার নতুন লেখক টেনে নেও। লিখতে লিখতে তারা তৈরী হোয়ে নেবে। কাগজের আদর্শ সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী কড়া হলে নিষ্ফল হতে হবে।... সাময়িক সাহিত্য অত্যন্ত বেশী যদি খুঁতখুতে হয় তা হলে তাকে বিলেতের old maid -এর মত যৌবন ব্যর্থ কোরে নিঃসন্তান শুকিয়ে মরতে হবে। চির সাময়িক সাহিত্যই অত্যন্ত সতর্ক হোয়ে যাচাই ও বাছাই করে—সাময়িক সাহিত্যের আমদরবার খাসদরবার নয়।

নিতান্ত পক্ষে দুটি তিনটি লেখক-লেখিকা ‘বলাকা’ যদি আবিষ্কার করতে পারে তো সে তার সমগ্র প্রয়াস সার্থক মনে করবে।

‘বলাকা’, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

সম্পাদকীয়—৩

আগষ্ট মাস আমাদের স্বাধীনতার স্মারক মাস। পনেরই আগষ্ট উৎসবদিন উদ্‌যাপিত হলেও এ মাসটিতে একটা অন্য সুর জড়ানো থাকে। এমনি বিশেষ সুর অঙ্গে জড়িয়ে আমাদের কাছে আরো যে কটিমাস আসে, তা হলো রবীন্দ্র আবির্ভাব ও তিরোভাব মাস-বৈশাখ আর শ্রাবণ। আর আসে আশ্বিন। বৈশাখ-শ্রাবণ গানে গীতে কাব্যে কথায় আমাদের মৃত মনকে সঞ্জীবিত করে তুলে যেন ধুলিমলিন পৃথিবীর মাটি থেকে সংস্কৃতির সপ্তম-স্বর্গে তুলে দিয়ে যায়, জ্বালিয়ে দিয়ে যায় অন্ধকার ঘরের আলোর প্রদীপটি। আর আশ্বিনের বিজয়া-সন্ধ্যা বিসর্জনের বিষাদ-স্নাত স্নিগ্ধ অন্তরে, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে—‘এসো, আলিঙ্গন করি। সমুদ্র মন্থনে কেবল বিষপাত্র নয় অমৃতভাণ্ডও যে উঠেছিল।’

কিন্তু স্মরণীয় আগষ্ট কি শেখায়? যাবার সময় কি দিয়ে সে নিজে সার্থক হয়ে যায় বা আমাদের সার্থক করে যায়? কিছু পুনরাবৃত তিক্ত বক্তৃতা, আর কিছু আবেগ-আসক্ত গান, যার মূল্য স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে যতখানি ছিল, ঠিক ততখানি মূল্যহীন এখন। শুনতে কি ভালো লাগে না? লাগে। অপূর্ব লাগে—এমন অপূর্ব যার তুলনা মেলে না। উদাত্ত-কণ্ঠের গীত হৃদয়মন উদ্‌বেলিত করে তোলে, রক্ত নেচে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছু করবার জন্যে. কিন্তু কি সে করবে?

> ‘আগে চল, আগে চল ভাই।
> পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
> বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।
> আগে চল, আগে চল ভাই’—

এ আহ্বানে আগে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরাধীনতা মুক্তিপণে। এখন তো সে ভেবে পায় না এ কিসের আহ্বান, কোথায় যাবার জন্যে এগোতে হবে, কোথায় পৌঁছোনো আজ তার লক্ষ্য। মানবজীবনের যে একটা চরম লক্ষ্য আছে আর সে লক্ষ্যে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাবার জন্যই অধীনতাপাশ ছিঁড়ে ফেলা প্রয়োজন. স্বাধীনতা যে জীবন-লক্ষ্যের শেষ কথা নয়, সুরুর কথা এ জানাটা তো ছোট্ট জানা নয়। সার্বজনীন এ বোঝার জন্য সার্বজনীন যে সুশিক্ষার প্রয়োজন তা দেশে কোথায়। জীবনের লক্ষ্য বোঝার চাইতে স্বাধীনতার লক্ষ্য বোঝা সহজ। তাই এ লক্ষ্য বুঝিয়ে দেওয়া মাত্র আমরা বুঝেছি—ছুটেছি, জীবন-মৃত্যু পণ করে ছুটেছি; এক ভারতে দুই স্থান হিন্দুস্থান পাকিস্তান স্বীকার করে নিয়ে ছুটেছি। স্বাধীনতা অর্জিত হলে, ‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, ‘জয় মা’ বলে

ভাসা তরী' বলে পিতৃপিতামহের ভিটেমাটি ছেড়ে পথ সামনে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। নদী সাঁতরে স্বদেশ ভূমির পাড় আঁকড়ে ধরে জল-রক্ত ভেজা শরীরের উপরে উঠে, নেচে গেয়ে হেসে অধীর আনন্দে মেতে একশা হয়ে উৎসব করেছি—বলেছি, পেলাম, পেলাম স্বাধীনতা পেলাম। এবারে সব হবে। দুঃখ ঘুচবে, অভাব ঘুচবে, যে শিক্ষার আলোর স্পর্শে পৃথিবী জেগে উঠেছে সে আলো এসে এবার আমাদের ঘুমও ভাঙ্গিয়ে দেবে।

কিন্তু তরী যেন কোথায় ঠেকে গেল। ঘর ছেড়ে যারা বেরুলাম দীর্ঘ আট বছরেও তারা আর ঘর বেঁধে উঠতে পারলাম না। নিরন্ন যারা ছিলাম অন্ন তাদের এখনও জুটল না। ছেঁড়া কাপড়ে যারা শরীর জড়াতাম, শরীর তাদের বেআব্রু হবার পর্য্যায় এসে গেল—পরিধেয় মিলল না। কাজ পাওয়া নাতো যেন স্বপ্ন সত্য হওয়া। স্বাধীনতার কোন কল্যাণস্পর্শ তো জীবনের দরজায় এসে ঘা দিল না। যে শান্তি শব্দ কানে শোনার চাইতে জীবনে জড়িয়ে ছিল বেশী, যে শান্তি আজ কানে শুনি বেশী, জীবনে নেই। তাই স্বাধীনতার সীমাহীন উৎসব বন্যায় আজ কি নিদারুণ ভাটার টানই না পড়েছে! আজ যেন এ উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেস আর তার গভর্ণমেন্টের ঘরোয়া উৎসব। জনসাধারণ সেই উৎসব প্রাঙ্গনে ভীরু দর্শক হয়ে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র। তাও বিনি-পয়সায় নয়, টিকিট কেটে। শোনে রাষ্ট্রপ্রধানদের আত্মকরিৎকর্ম্মতার উজ্জ্বল ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিত্তহারী পরিকল্পনার দীর্ঘ বক্তৃতা। দেখে আলো, দেখে অভিনয়, দেখে গুণীজন সমাদর, প্রাণের যোগ কোথাও খুঁজে পায় না। ঘরে ফিরে এসে গালে হাত রেখে বসে। কিছু হতাশাবাক্য আর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যায়। যারা প্রসাদভোগী, তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বলেন, এই সামান্য সময়ের ভেতর কত কি হলো দেখতে পাওনা? দেখতে পাওনা আরো কত কি হবার পরিকল্পনা হচ্ছে? কেবল নিজের কথাই ভাবো আর নিজ ঘরটুকুর পানেই তাকিয়ে থাকো?

হ্যাঁ, তাই থাকি। তোমার দিকে তাকিয়ে যে 'করা' আর 'হওয়া' আমার বুঝতে হবে, সে বোঝায় আমার মন উঠবে কেন? মহামানব না হলে অপরের বাড়ী গাড়ী, সাজানো খাবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে মানুষের মন আনন্দে নেচে ওঠে না, উপরন্তু বিষিয়েই ওঠে। ইংরেজের যে বিলাস-ব্যসন, উচ্চ বেতন আর রাজ্যরক্ষার রাজসূয় যজ্ঞ-ব্যয় অনুপায় মানুষ মুখ বুজে সয়েছে—আপন গভর্ণমেন্টের ঠিক সেই চলন নিজে বঞ্চিত বুভুক্ষিত থেকে যদি সন্তুষ্টচিত্তে তারা মেনে নিতে না পারে, তবে নিশ্চয়ই মানবতাবিরোধী কাজ হয় না। কেবলমাত্র মহৎ কাজের জন্যই নিঃস্বার্থ হয়ে হাসিমুখে দুঃখ বরণ করা যায়। যদি এই কষ্টস্বীকারও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সমগ্র জাতিকেই মেনে নিতে হয়েছে এ সত্য দেশবাসীর সামনে ধরে দেওয়া যেত— যদি ধরে দেওয়া যেত স্বদেশের চিরন্তন হিতের জন্য এটা আমাদের দুঃখের সাধনাকাল, তবে সে সাধনায় সহগামী হয়ে নিজেকে ধন্য করত সবাই বিনা ক্ষোভে, বিনা দ্বিধায়। মহালাভের জন্য মহাদুঃখ নিশ্চয়ই ভোগ করতে হয়। কিন্তু কিছুসংখ্যক সুখ-সুবিধা-সম্পদের চূড়াশ্রয়ী থেকে অপর অংশকে কেবল ত্যাগ স্বীকার আর দুঃখ বরণ করবার জন্য আহ্বান জানালে সে আহ্বান উদ্বুদ্ধ করে না, করে ক্রুদ্ধ। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনা ব্রত গ্রহণ করার প্রেরণা জোগাতে সবার আগে সে ব্রত গ্রহণ করতে হয় জাতীয় নেতাদের।

কিন্তু উপায়হীন জনসাধারণ। তারা সমষ্টিগত ভাবে যতই প্রয়োজনীয় আর সমীহজনক হোক, একা বড় ক্ষুদ্র—বড় দুর্বল। তারা বাঁশ নয়, কঞ্চি। তাদের দিয়ে লাঠির কাজ চলে না, চলে তাদের জড়ো করে আগুন জ্বালানোর কাজ। যারা সংগ্রহ করেন, করেনও সেই প্রয়োজনে। সে প্রয়োজন মিটলে তো তার আঁস্তাকুড়ে যাবারই সময়। তাই সন্তুষ্টচিত্তে না হলেও নিরুপায় ভাবে মেনে নিতেই তারা অভ্যস্ত। বাইরের বৃহত্তম জগৎ থেকে, সংসারের ক্ষুদ্র আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রটি পর্য্যন্ত তাদের শুধু মেনে আর মানিয়ে নিয়েই চলতে হয়। সকরুণ প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকে কেবল সন্তানের প্রতি— শুধু এই ক্ষেত্রটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল সম্ভাবিত ভবিষ্যৎ নিয়ে গড়ে উঠুক এই তাদের শেষ প্রার্থনা।

এই আশা-ভরসার স্থলটির অবস্থা কি?

মাইনে দিতে না পারলে বন্ধ ক্লাশে ওঠা, পরীক্ষা দেওয়া। বন্ধ ক্লাশ করা। একঘর সহ-অধ্যায়ীর সামনে ক্লাশ বিতাড়িত হয়ে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসবার লাঞ্ছিত অসম্মানে কচি কিশোর মুখগুলো ওঠে অপমানে কালো হয়ে। অক্ষম পিতার লজ্জার বোঝা মাথায় চাপিয়ে শিক্ষার পীঠস্থান থেকে শিশু বিতাড়নে সামান্য সঙ্কোচ নেই রাষ্ট্রের। শিক্ষা-তীর্থের ভূমি শিশু বলিতে আজও রক্তাক্ত।

দেশের অগণিত শিশুভাগ্য নিয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, তাদের কিশোর মনের আত্মমর্য্যাদাবোধ নিয়ে চলছে এক নিষ্ঠুর খেলা। জীবনের সুরুতেই যাদের মাথায় অমর্য্যাদার বোঝা চাপিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তারা আর কোনদিনই পারেনা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে। অগণিত আশাহীন নিরুদ্যম শিশু কিশোর আর

যুবক অতিবৃদ্ধের মতো তিনমাথা এক করে ঘরে বসে বসে হারাচ্ছে স্বাস্থ্য আর সুস্থ চিন্তাশক্তি। জীবনের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকাল বৃথা বয়ে গিয়ে বৃথা হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য জীবন। পিতামাতার ভবিষ্যতের সঙ্গে দেশের ভবিষ্যতেরও কি সমাধি রচিত হচ্ছে না? সন্তান তো কেবল মা-বাবার নয়— মুখ্যত সমস্ত সমাজের। তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ। এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশী। ধনী আত্মীয় বা পড়শীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে গিয়ে যে অভিভাবক সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অবহেলা করে, তার যেমন নিন্দার ভাষা নেই— তেমনি নিন্দার ভাষা নেই আমাদের বর্তমান ধনী দেশবিদেশের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলনে ব্যস্ত রাষ্ট্রনায়কদের। গৃহে যেমন তিনিই আদর্শ অভিভাবক যিনি সব কিছুর উর্ধ্ব স্থান দেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে, রাষ্ট্রেও তিনিই যোগ্যতম অধিনায়ক যিনি দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে স্থান দেন সর্বাগ্রে। কিন্তু সব চাইতে বড় দায়িত্বের প্রতি মুখ ফিরিয়ে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তাগণ দেশকে উদ্বুদ্ধ করছেন কেবল শ্রমের মর্য্যাদায়। তাঁরা বলছেন না, 'এসো তোমরা প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও জ্ঞানে গুণে দক্ষতায় পারদর্শীতায়। তবেই আমাদের স্বাধীনতা সার্থক হবে, স্বপ্ন হবে সফল।' তাঁরা ডাকছেন— 'এসো, শ্রমিক হও এসে।' এ ডাক মজুর সংগ্রহের ডাক, সহকর্মী সংগ্রহের নয়। শ্রমের মর্য্যাদা, যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য কিন্তু তার স্থান নিশ্চয়ই শিক্ষার উর্ধ্ব নয়। 'শুধু যন্ত্রে কোন কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে।'

সেই 'মানুষ' না হয়ে ওঠা মানুষদের কাজে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে রাষ্ট্রনেতাগণ বলেন, কখন অপদার্থ, কখন বলেন, এরা দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলাকারী, এরা জাতীয় পতাকার অমর্য্যাদা করে তাই বিশ্বাসঘাতক, এরা বিনা টিকিটে বাসে, ট্রেনে চড়ে, এরা গার্ড ও রেল কর্মচারীদের লাঞ্ছনা করে,— শুনে মনে পড়ে ব্রিটিশ শাসন সময়ে সাইমন কমিশন তার তালিকাভর্তি ভারতীয়দের দোষক্রটি অপরাধের বিরাট ফর্দ দিয়ে কেবলমাত্র একটি অপরাধ নিজেদের বলে স্বীকার করেছিলেন— সেটি হলো তাদের যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা বিধান ব্যবস্থার ক্রটি। তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মনে করুন যদি বলা হয় গৃহস্থ সাবধান হতে শেখেনি, একঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে সে চৌকাঠে হুঁচট লেগে আছাড় খেয়ে পড়ে, জিনিসপত্র কেবলই হারায়, তারপর আর খুঁজে পায় না, ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে, নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেছে বলে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়, কেবল বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে, উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহস নেই, খিদে পায় কিন্তু খাবার কোথায় খুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত। তার পরে সব শেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয়, আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি—তা হলে সেটা কেমন হয়।'

ঠিক সেটা যেমনি, সেই নেভানো বাতি না জ্বালিয়ে অপরাধের তালিকা দেওয়াটাও তেমনি।

'বলাকা', ভাদ্র, ১৩৬২

সম্পাদকীয়—৪

তোমাকে আমরা ডাকছি

গল্প শুনছিলাম, পার্লামেন্টে বিতর্কসভার একমাত্র আকর্ষণ ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর অনুপস্থিতির দিনে দর্শক-চেয়ার শূন্য কোল নিয়ে ঝিমুতো। আর সে কক্ষেই তিল ধরবার স্থান থাকত না যে দিন তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর পার্লামেন্টারি জবাবের কাছে মুখবন্ধ হয়ে যেত মুখর প্রধানমন্ত্রীরও।

শুনতে শুনতে যে হৃদয়ভার বুক চেপে ধরেছিল, দীর্ঘশ্বাসে তা হালকা করে দিয়ে তাকিয়ে রইলাম আরো কিছু শুনবার আশায়। অন্ততঃ এক আধটা শ্যামাপ্রসাদী পার্লামেন্টারি রিটর্ট।

বক্তা বলে চললেন, যে রক্তারক্তির ভয়ে ভারত বিভাগ, সেই রক্ত-স্রোত যখন গঙ্গার মতো বয়ে পদ্মার বুক রাঙিয়ে তুললো; যখন স্বামী-পুত্র-বাপ-ভাই-এর মৃতদেহের কাছে নারী তার সম্ভ্রম হারাতে লাগলো—একটি নারীর অমর্য্যাদায় যেখানে সভ্য দেশের সমস্ত ভিত কেঁপে ওঠে সেখানে অসংখ্য নারীর অসম্ভ্রমেও নেহেরুজী যখন রইলেন স্থির অকম্প তখন তার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। শ্রীনেহেরু পার্লামেন্ট কক্ষ কাঁপিয়ে উত্তেজিত চাঞ্চল্যে বক্তৃতা দিলেন—"এ সাম্প্রদায়িক মনোভাব আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। আমি ক্রাশ (crush) করবো এ মনোভাবকে।"

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্যামাপ্রসাদ—'আমি ক্রাশ করবো প্রধানমন্ত্রীর এই ক্রাশিং মনোভাবকে।"

যেন বাংলার অতীত গৌরবকাহিনী শুনছি। ঝুঁকে পড়লাম—তারপর?

পার্লামেন্টারি বিতর্কে তারপর নাও থাকতে পারে কিন্তু ঘটনার থাকেই। শ্যামাপ্রসাদের এ চ্যালেঞ্জ বীরের মতো গ্রহণ করলেন না নেহেরুজী। শ্যামাপ্রসাদের মনোভাব নয়, শ্যামাপ্রসাদ নিজে ক্রাশ হলেন কাশ্মীরের জনবিরল পর্ব্বতের চূড়ায় আত্মীয়বন্ধুহীন অবস্থায়। শ্রীনেহেরুর অন্ধ আবদুল্লাপ্রীতি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবার যে গভীর ষড়যন্ত্র প্রায় শেষ করে এনেছিল তাতে বাধা দিতে গিয়ে লক্ষো আবদুল্লার হাতে, পরোক্ষে কার হাতে একদিন তা ইতিহাস বলবে—প্রাণ হারালেন শ্যামাপ্রসাদ। স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্তান বলি বাংলার চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট করেনি কোনদিন। কাশ্মীরও সে তারই সন্তান দিয়ে রক্ষা করলো—দুঃখ সে জন্য নয়। দুঃখ এটিই ছিল তার শেষ উপযুক্ত সন্তান—তার শেষ সম্বল। আজ তার মান নয় শুধু নামটুকু বজায় রাখবার মতোও কেউ নেই। শত্রুর শেষ রাখতে নেই—তাই এবার স্থির হয়েছে শুধু ক্রাশ নয় গোটা বাংলাকেই করতে হবে গ্রাস।

স্থির বাংলা অস্থির হতো না যদি এতে তারই সন্তানদের কলঙ্কমুখ এদিক ওদিক উঁকি না দিত। যদি তাঁদেরই যোগসাজশে তাঁদেরই যোগসাজে তাঁদেরই মুখ দিয়ে কথাটা বের করে, তাঁদেরই নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করে কার্য্যসিদ্ধি করবার চেষ্টা না হতো। উপযুক্ত সন্তানের অভাবে ভোগসুখের অভাব ঘটতে পারে—দুর্গতি ঘটে না। দুর্গতি ঘটায় অপদার্থ সন্তানে। আজ তার গৌরবহীন সন্তানরা তার বিনিময়ে পদগৌরব কিন্‌ছে, ছুটছে অর্থগন্ধী হয়ে। রসালো মাংসের টুকরো নাকের কাছে নাচিয়ে লোভাতুর করে দলে টানার পদ্ধতি মনুষ্য পদ্ধতি নয়। এ পদ্ধতিতেও যখন দেশের মানুষ বিকোতে আরম্ভ করে তখন বুঝতে হবে সে দেশের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যারা মারে তারা যত পাপীই হোক, পড়ে মারও খায় অনেক পাপ জমা হলে তবেই।

বলাকা', ফাল্গুন, ১৩৬২

সম্পাদকীয়—৫

মনে পড়ে

মনে পড়ে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী আমরা কোথায় যাবো, কি করে মুখের অন্ন জোগাবো, কোথায় মাথা গুঁজবো কিছুই জানিনে তবু বিনা দ্বিধায় বেরিয়ে পড়েছিলাম ঘর ছেড়ে— পরিজনের হাত ধরে—এমনি অন্ধবিশ্বাস ছিল নেতাদের প্রতি, এমনি অসীম শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের ন্যায়বিচারে। আজ আর সে বিশ্বাস নেই, নেই সে শ্রদ্ধা। যাঁদের ডাকে ভিটা-মাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি চোখ বুজে, আজ তাঁদের একটি সামান্য সদ্‌ইচ্ছায়ও আর বিশ্বাস রাখিনে। কে জানে কোন ইচ্ছার পেছনে কোন বিষবৃক্ষের বীজ লুকানো রয়েছে। প্রাদেশিকতা, প্রাদেশিকতা করে কর্ত্তাদের যে চিৎকার এ প্রাদেশিকতার বীজও কর্ত্তাদের আপন হাতে রোপণ করা। আজ সে বিষবৃক্ষ যতটুকু মাথা তুলেছে, তুলেছে প্রাদেশিক রোগগ্রস্ত কংগ্রেসী নেতাদেরই জন্য। এখনও সময় আছে একে ঝাড়ে-বংশে নির্ম্মূল করবার, কিন্তু তারপর হয়ত গৃহবিবাদের ভয় দেখিয়েই গৃহবিবাদ ঠেকিয়ে রাখা নাও যেতে পারে।

ব্যবসা, বাণিজ্য, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, চাকরীর ক্ষেত্র থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা এবং রাজ্য পুনর্গঠন পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁদের দৃষ্টি পক্ষপাতদুষ্ট। এমন কি ভাষা নিয়ে তারা সুস্থ মনের পরিচয় দিতে পারছেন না। বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্রীনেহেরু বলেন, 'শিল্প সাহিত্যই একটা দেশের সব চাইতে বড় পরিচয়। কোনদেশে গিয়ে কলকারখানা যন্ত্রপাতি দেখে তার পরিচয় পাওয়া যায় না, যায় তার শিল্পসাহিত্য দেখে।' ভালো কথা বলতেও ভালো লাগে, শুনতেও ভালো লাগে, কিন্তু করতে খারাপ লাগে কেন জানি নে। বুলগানিনকে তিনি কিন্তু যত যন্ত্রপাতিই দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন দেখাননি। হয়ত বাংলাদেশে বলে। টাকার জোর আর গায়ের জোরের খাতির আছে, কিন্তু সংস্কৃতি আর সাহিত্যের স্বীকৃতি নেহেরু-রাজত্বে নেই। আর এই না থাকার একমাত্র কারণ বাংলা তার শীর্ষস্থানে। ভাষা ও সাহিত্যের মর্য্যাদা দিতে হলে বাংলাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। বরং তার চাইতে প্রথম দুটোর জোরে কি ভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় চলছে তারই অপচেষ্টা।

'দেশের পরিচয় তার সাহিত্য তার শিল্প'— এই যদি সত্য তবে হিন্দীর মতো ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা পায় কি করে? ভারতের অপর দু তিনটি ভাষার সমপর্য্যায়ে পৌঁছোতে যার আরো কয়েক শতাব্দী কেটে যাবে তবু

পৌঁছোতে পারবে না। তাকে সমৃদ্ধ করতে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার জন্ম লাগে। সেটা ভাগ্যনির্ভর। দেশের মানুষ কোন মহাকাব্য, কোন অমর সাহিত্য পড়বার জন্য হিন্দী শিখবে? সংখ্যায় গোটা দুই দেশের ভাষা হিন্দী তাই বাকী ভারতকে হিন্দী শিখতে হবে, না থাকলো তার সম্পদ আর সমৃদ্ধি— কি অপূর্ব যুক্তি! প্রাদেশিকতার বীজ রোপিত হয় এমনি করে। ভাষা-শিক্ষা কোনটাই সহজ নয়। শিক্ষার শ্রম মানুষ এমন কাজেই দেবে যাতে তার ভাষার ঐশ্বর্য্য, মনের প্রসারতা বাড়বে, চিন্তার খোরাক মিলবে। একমাত্র প্রাদেশিকতার মোহে গোটা ভারতকে কংগ্রেসী কর্তারা টেনে নামাচ্ছেন ভাষার ক, খ-তে। কবিসম্মিলনীতে রাষ্ট্রকবির আসন যাঁকে দেওয়া হলো তিনি হিন্দীভাষী। যাঁর কবিতার ভাব ও ভাষা নাকি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগের! আর সে আসরেই কবি হিসাবে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙ্গালী।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কলমের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার সম্মান দিতে যাঁদের হৃদয়-প্রসারে বেড় পায় না তাঁরা শুধু চরিত্র-সম্পদেই দেউলে নয়, তাঁরা অদূরদর্শীও। অন্ধের হাতী দেখার মতো হাতীর লেজ মুঠো করে ধরে ভাবছেন—চেপে ধরেছি।

মানুষ মারা যায়, সাহিত্যকে মারা যায় না। সাহিত্যিককে লোভে বশ করা যায়, সাহিত্যকে লোভ দেখিয়ে বশ করা যায় না; একমাত্র যায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া। তা গোটা বাংলাদেশটার একটা মোটা বীমা বিদেশীর কাছে করে নিয়ে তারপর আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিলে কেমন হয়? শত্রুরও শেষ হয়, সঙ্গে প্রচুর ডলার পাউণ্ডের সম্পদও মেলে—ভেবে দেখতে পারেন পন্থ-আজাদ-নেহেরু।

'বলাকা',— ফাল্গুন, ১৩৬২

সম্পাদকীয়—৬

প্রথম বছর

আজ বলাকার বয়স এক বছর পূর্ণ হলো। এক বছরটা কোন হিসেবেই কিছু ভরসার বয়স নয়। তবু পত্রিকা বের করে আমরা যে সাতসমুদ্র তের নদী পাড়ি দিতে বসেছিলাম—এই তের মাসে আমরা যেন তারই তেরটি নদী পার হয়ে এলাম। সামনে রয়েছে সাত সমুদ্র, তারপর যদি পার মেলে। আর না মিললেই বা কি? পারে পৌঁছানোটা সার্থকতার শেষ কথা হতে পারে, আনন্দের নয়। আনন্দ তো পথে। আর যে পথে যত বৈচিত্র্য, যত শঙ্কা বিপদ সে পথই তো তত আনন্দের। শান্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে লাভ কি না রইল, যদি তাতে উত্তাল ঢেউ, না উঠল যদি তাতে উদ্দাম ঝড় না ছিঁড়ল তার পাল, না ভয় রইল ভাসিয়ে নেওয়ার। পথের আনন্দ শেষ হয় পৌঁছানোতে, সার্থকতা হয়ে দাঁড়ায় সাধনার সমাধিক্ষেত্র—এই তো দেখা যায়। সার্থকতার কথা ভাবিনে—আমাদের প্রার্থনা, চলা যেন আমাদের বন্ধ না হয়, শ্রান্ত না হই ক্লান্ত না হই। ভেসে যাচ্ছি ভেবে হাল ছেড়ে দিয়ে ডুবে না যাই।

তরী ডোবে কেন? প্রতিকূল হাওয়ার কাছে হেরে গিয়েই তো? আমাদের দেশের এই যে অসংখ্য সাহিত্যপত্র জন্মমৃত্যু একসঙ্গে বরণ করছে তারও কারণ নিশ্চয়ই একটা কোনো বিরুদ্ধ শক্তির কাছে হারস্বীকার। সেই বিরুদ্ধ শক্তিটি কি? সেটি হলো সিনেমা পত্রপত্রিকা। তারা কেবল সাহিত্যকেই ডোবাচ্ছে না, মানুষের রসবোধ রুচিবোধটিকেও টেনে নাবাচ্ছে অধঃগতির শেষ স্তরে। মনে প্রবেশ করার এতবড় একটা মাধ্যম নিয়ে, এ জগৎ সম্বল করেছে মাত্র মানুষের জৈব-প্রবৃত্তিটিকে নেড়েচেড়ে দুপয়সা রোজগার করা। মদ খাইয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিলে মাতলামি করা অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান সিনেমা পরিবেশন করে চলেছে শুধু পাত্রভরা মদ। সে মদে মাতাল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে রাঙা চোখে খোঁজে কেবল রঙ্গিন ছবি, নানা দৈহিক ভঙ্গি, চোখের ইসারা আর ঐ সময়োপযোগী অরুচিভরা কথা। সামনেই মেলে। সিনেমা পত্র-পত্রিকা সাজিয়ে ধরেই বসে আছে।

এ রুচির পরিবর্তন না হলে সাহিত্যপত্রের আপন গৌরবে বাঁচবার কোন উপায় নেই। টিকে থাকতে পারে বিজ্ঞাপনের জোরে। কিন্তু বিজ্ঞাপন যারা দেন তারা ব্যবসায়ী লোক। তাদের লক্ষ্য প্রচারসংখ্যা। ব্যবসার জগতেও পৃষ্ঠপোষকতা বলে একটা কথা আছে। সেটা এরা নিজেরাও ভালো করেই জানেন। কারণ বিদেশী পণ্যের ওপর অস্বাভাবিক করা বসিয়েই সরকার এদের বাঁচিয়ে বাড়িয়ে সমৃদ্ধ করে তুলছেন। পৃষ্ঠপোষকতার তারই সামান্য

পরিচয় যদি বর্তমান ব্যবসায়ীগণ সাহিত্য পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে আরোপ করতেন তাহলে নবজাত পত্রিকাগুলি বেঁচে থেকে সংগ্রাম করত মানুষের ভেতরকার শুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধটিকে জাগিয়ে তোলার জন্যে। বিজ্ঞাপন জগৎ অবহেলা ভরে মুখ ফেরাল—লোকে সিনেমাপত্র কিনলো —এই যদি অবস্থা, সাহিত্যপত্রের বাঁচবার তবে উপায় রইল কি? কিছুই না। কোন দিক থেকে কোন সহানুভূতি বা সহযোগিতার আশ্বাস তাদের মেলেনা। অবশেষে তারা কেউ মরে, কেউ জাত দেয়। তাই বর্ষ শেষ হতে শুভানুধ্যায়ীরা আবারও নিষেধের ঝড় তুলে ছুটে এলেন —দেখলে তো এক বছর —, এবার কাঁধ থেকে এ ভূত নাবাও। নইলে কাগজ তো বাঁচবেই না, নিজেও মরবে।'

কোনদিকে কোন আশার আলো নেই— এ যাত্রা শুধু অন্ধকারের। জানিনা সামনে মৃত্যু না জীবন। তবু কাগজ বের করলাম। কাজ করবার আছে। দেশের এই সামাজিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক দুঃখপথযাত্রায় সমুদ্রবন্ধনে কাঠবিড়ালির প্রয়াসটুকু 'বলাকা' করতে চায়— তাই চায় বাঁচতে।

'বলাকা'— চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৬৩

সম্পাদকীয়—৭

কিছু লেখা আর বিভাগ একসঙ্গে জড়ো করে গেঁথে বাজারে ছেড়ে দিলেই কাগজ হয় না— যে কাগজের নিজের কোন বলার কথা নেই সে কাগজ সংগ্রহমাত্র—এই যদি কারো ধারণা হয় তবে তাকে একটা কিছু সম্পাদকীয় লিখতেই হয়।

কিন্তু লিখি কি?

একটা সংসারের পক্ষে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আসর বসানো, আলোচনা করা বা জীবনের সামনে তাকেই এগিয়ে আনা তখনই সম্ভব যখন সংসারটাকে কাঁটার উপর দিয়ে টেনে চলতে হয় না। একটা কাগজের পক্ষেও কেবলমাত্র শিল্প-সাহিত্য নিয়ে চলা সম্ভব যখন দেশ কাঁটা-পথে হাঁটছে না। শিল্পী যদি নিছক কল্পলোকবাসী না হন তবে হয়তো আজ তিনি বিক্ষত-পদক্ষেপের ছবিই আঁকবেন, সাহিত্যিক হলে হয়তো প্রকাশ করবেন সত্য জীবন, সম্পাদকের ক্ষেত্রে—আর হয়তো নয়—নিশ্চয়ই করবেন সত্য বক্তব্যে জন-মন তৈরী।

'বলাকা' রাজনীতি বোঝে না— বোঝে মনুষ্যনীতি। আর বোঝে, নদী যেমন সমুদ্রমুখী, সর্ব নীতি তেমনি মনুষ্যত্বমুখী। নদীর সমুদ্রমিলনের মতোই নীতির মিলন মনুষ্যত্বে। সাহিত্যিক, শিল্পী—যিনি যাই হোন, কোন নীতির দিক থেকেই মুখ ফেরাতে পারেন না তিনি—ফেরালে মানুষের দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে থাকা হবে। সে জানে না নেতারা অতিমানুষ কিনা কিন্তু সাধারণ মানুষের দিকে তাকালে তাঁদের দিকে তাকানোর বাসনাটাই উবে যায় তার।

—এমন বেয়াড়া ইচ্ছা নিয়ে ঘরে বসে থাকো আপত্তি নেই। কিন্তু মুখ বাড়াতে যেওনা বাইরে। কেনার মূল্য তোমার নয়—তুমি মরবে।

মানুষের মতোই মরণ সঙ্গে করে কাগজ জন্মায়। বাঁচার মতো বাঁচতে না পারলে মরণই ভালো। সেজন্য দুঃখ বোধ করলেও ভাবিনে। কিন্তু 'এ কেন হচ্ছে' আর 'এ কেন হবে না' —এ জিজ্ঞাসার অধিকার তো সবার আছে।

—জিজ্ঞাসাটা কি?

অন্তত এইটুকু— সভ্য দেশগুলোর অনুকরণে পরিষদ-ভবন আর বিধান-সভা সাজাবার আগে, সভ্য দেশগুলো যা দিয়ে সভ্য হলো, সেই তাঁদের শিক্ষা আর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা নেওয়া হচ্ছে না কেন? ওদের দেশের জনসাধারণ সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ন্যূনপক্ষে যেটুকু পায়, এদেশের জনসাধারণকে সেটুকুও— যদিও আমাদের দেশে এটা টুকু নয় মোটেই; ছেলে-মেয়েকে অর্থচিন্তায় স্কুল ছাড়িয়ে আনতে হচ্ছে না, রোগে ওষুধ মিলছে, এটা যে কতখানি—বুঝি দেশটাকেই এ দিয়ে কিনে রাখা যেত। কিন্তু এ ন্যূনতমটুকুও হচ্ছে না। যা হচ্ছে সে হল শুধু পরিষদ আর বিধান-সভার রাজার জাতের রাজকীয় ব্যাপারগুলো, অর্থাৎ নিজেদের ভোগ-সুখ-আরামের ব্যবস্থাগুলো।

—কেন? জবাব মিলবে তোমার জিজ্ঞাসার?

মিলবে না কিন্তু 'বলাকার' পাঠকদের মনেও যদি জিজ্ঞাসাটা ওঠে তবেই সে সার্থক। আজ পশ্চিম বাংলার বিধানসভা গরম বৃটিশ 'হাউস অব কমন্সের' দৃষ্টান্তে বেতন দেওয়া নিয়ে; দিল্লীর রাজ্যসভা জমাট পররাষ্ট্রনীতি আলোচনায়। এদিকে জনসাধারণের রাজ্যে চলছে তাজা রক্ত বিকিকিনি। চড়তি বাজারে পড়তি মুখে এক রক্ত— পঞ্চাশ টাকার রক্ত আজ পনেরো টাকা। ভিড় বাড়ছে। আরো দাম নামলো বলে। এ রক্ত দান নয়। এ হলো অভাবী মানুষের উপায়। রক্ত-জল-করা উপায় শুনেছি, শুনিনি তাজা-রক্ত-বের-করে-দেওয়া উপায়ের কথা। কিন্তু মাথার ভেতর এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ঘুরিয়ে এনে মিলিয়ে উঠতে পারিনে— খাওয়ার জন্য রক্ত-বেচা, আবার সেই রক্ত হবার জন্য খাওয়া, আবার খাওয়ার জন্য 'রক্ত নেও' বলে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ানো— চক্রটা কি ঘুরছে? ভাবছি এই বৃত্তটাই একদিন কৃষ্ণের হাতের সুদর্শনচক্র হয়ে উঠবে না তো?

— আচ্ছা, দরকার কি তোমার অততে? সাহিত্য-পত্র তোমার— একাডেমী পুরস্কার নিয়ে এসেছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। অভিনন্দন জানাও তাঁকে। করো 'নিখিল ভারত লেখক সম্মিলনীর' সার্থকতা কামনা। ছোট্ট করে না হয় একটু অনুরোধ জানিয়েই রাখো—ঠিকানা না-জানা আর নানা ব্যস্ততার কারণে 'নিখিল ভারত লেখক সম্মিলন' থেকে যেন বাংলার লেখকই বাদ পড়ে না যান— বাংলার কোন সাহিত্যিক যেন অনিমন্ত্রিত না থাকেন! 'গোষ্ঠী-ব্যাপার হলো', এ যেন সম্মিলন-শেষে ভাবতে না হয়। দশ-পঁচিশের টিকিট—এ চাট্টিখানি কথা নয় আজকের দিনে!

বেশ।

বলাকা', পৌষ, ১৩৬৪

সম্পাদকীয়—৮

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর বৎসর ঘুরে এলো। তাঁর মৃত্যু-সময়ে যে শ্রদ্ধা নিবেদন— যে বেদনা প্রকাশ বলাকার সাময়িক অপ্রকাশের দরুন আমরা করে উঠতে পারিনি— আজ বৎসর পূর্ণ হবার দিনে তা প্রকাশ করে আমরা হৃদয়ের ভার কিছু লাঘব করছি।

সকলেই জানি, গতবারের রবীন্দ্র-পুরস্কারটি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়ার প্রস্তাব একটি সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দ্বারা আনীত হয়েছিল। যদিও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং কবি জীবনানন্দ দাসকে, মৃত্যুর পরই এই রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলা সে প্রস্তাব রক্ষা করা হলো না। লোকের সন্দেহ, এর কারণ রাজনৈতিক। যদি তাই সত্য হয়, সে বাধা নিশ্চয়ই এখন দূর হয়েছে। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কোন বাধা-নিষেধ আর নেই— তাঁদেরই নেতার মাসোহারার জন্য শ্রীবিধানচন্দ্র রায় নিজেই উঠে পড়ে লেগেছেন। বাধা যখন দূর হয়েছে তখন এ বছরের রবীন্দ্র-পুরস্কারটি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্পণ করে তাঁকে সম্মান দেখানো কি সম্ভব নয়? সম্ভব নয় কি, যাদের কথা মনে করে চিরশান্তির চোখ-বোজার মুহূর্তটিতেও শান্তিতে চোখ বুজতে পারেন নি, সেই তাঁর স্ত্রী-সন্তানের প্রতি সম্মান দেখানো? পরিবার-পরিজনের কথা ভেবে মানুষ নিজের বর্তমান সময়টার চাইতে অ-বর্তমান কালটা নিয়ে শঙ্কিত হয় বেশী। এখানে প্রতিভাবান আর সাধারণে কোন তফাৎ নেই। কবি মধুসূদন মৃত্যুটাকে বুঝি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন শুধু বন্ধুর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতিটুকু আদায় করবার জন্য— যে বন্ধু তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কবির সন্তান দুটির মুখেও অন্ন তুলে দেবেন।

আজ শতাব্দী পরেও বাংলার ঘরে সেই প্রহসনই চলছে! কবির রোগ-শয্যায় বন্ধুরা বের হয় ভিক্ষা-পাত্র হাতে। সাহিত্যিকের রোগশয্যায় আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে দৈনিকের পাতায় প্রচারিত হয় আবেদন। সে আবেদন প্রচার করতে না লজ্জা পায় কর্তৃপক্ষ— পড়তে না লজ্জায় অবনমিত হয় আমাদের চোখ— না থমকায় একবার অপব্যয়ে-ভেসে-চলা রাজন্য! এ লজ্জার হাত থেকে কবে উদ্ধার পাবে দেশ কেউ বলতে পারে না। কেউ বলতে পারে না, মসনদের শোকে মাথা নত করার আগে দেশের পতাকা মাথা নত করেছে গুণীর শোকে —সে দিন আরো কতদূরে। যে কথাটা আমাদের আসল বক্তব্য সেটা হলো, প্রতিভাকে পুরস্কৃত করে সে পুরস্কার পরিজনদের

হাতে তুলে দিলে— তৃপ্ত হবেন তাঁরা— খুশী হবে দেশের লোক। নইলে রবীন্দ্র-পুরস্কার আর একাডেমী পুরস্কার বা যে কোন সরকারী পুরস্কারের চেহারা যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে না মান বাড়ছে যিনি পাচ্ছেন তাঁর, না যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের।

বলাকা', পৌষ, ১৩৬৪

সম্পাদকীয়—৯

বৈদ্যুতিক ট্রেনের 'দ্বিতীয়-পক্ষের' বোতাম-টেপা-উৎসবে ব্যয়িত হলো লক্ষ লক্ষ টাকা। বিরাট-তার আয়োজন, অপরিসীম তার আড়ম্বর— সেখানে সানন্দে যোগ দিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু। 'বিবাহ-বাসরীয়' জাঁকে মুগ্ধ হয়ে খুশীমনে মন্তব্য করলেন তিনি, এই আনন্দোৎসব শেষ হলো জনসাধারণের জীবন-যজ্ঞে। সেখান থেকে ফিরে এলেন শ্রীনেহেরু রাজভবনে, আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। প্রারম্ভেই ঘোষণা করলেন,— 'ভারত একটি গরীব দেশ, ভারত নিঃস্ব।'

তিনি আরও বললেন,— 'এই যে রাজভবন, ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন।' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই জাঁক পুরোপুরি বজায় রেখে তাঁরা উপভোগ করছেন কি করে? সরকারী আয়োজনকে দরিদ্র দেশের অনুযায়ী করে সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব প্রাসাদভবনগুলো স্কুল-কলেজ বা হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হলো না কেন? বৃটিশ পরদেশ শোষণ করে এ জাঁক উপভোগ করে গেছেন, আমাদের দেশ-নেতারা নিজদেশ শোষণ করে তাই যখন করে চলেছেন, তখন দেশের দারিদ্র্য নিয়ে এ কুম্ভীরাশ্রু কেন?

বিরোধী দলের নেতা শ্রী জ্যোতি বসুকে গাড়ী-বাড়ী, খাওয়া-পরা, পরিবার-প্রতিপালন ইত্যাদির জন্য বারশত টাকা করে যে মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা শ্রীবিধানচন্দ্র রায় করেছেন, তা নিয়ে অনেক জলই ঘোলা হয়েছে। তৃষ্ণা অদম্য হলে ঘোলা জল মানুষ পান করে। কিন্তু সে পান করার ভেতর তৃষ্ণার যে চেহারা প্রকাশ পায় সেখানে আমরা অন্ততঃ নীরবে পিছু হটবো।

●

কিন্তু ব্যক্তি সম্বন্ধে নীরব থাকলেও দেশ সম্বন্ধে নীরব থাকা কঠিন। নিজে অধোগতির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে সরকার গোটা দেশটাকে তার দিকে টানছে। অর্থ,পদ, মান, খ্যাতি দিয়ে সে মানুষ কিনছে। কিনছে কিন্তু কাজে লাগাচ্ছে না। শুধু বন্ধক রাখছে চরিত্রটি। মূল্য হিসাবে চরিত্রটি ধরে না-দেওয়া পর্যন্ত তার কাছ থেকে না মেলে কোন সাড়া, না কোন সহযোগিতা। বন্যার টানে মানুষ ভেসে যায় এ যেমন তার দোষ নয়, প্রতিরোধ শক্তির অভাব—এও হচ্ছে যেন কতকটা তাই। অর্থ, পদ, মান, খ্যাতি— দুর্বার এর টান। এ টানের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন সাহিত্যিক, সম্পাদক, জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী। কাঠামোটাকে ভেঙ্গে গড়বার শক্তি তার নেই—ইচ্ছাও না। তাই লোভ দিয়েই কাবু করতে চাচ্ছে সে। প্রলোভনের পশরা নিয়ে এক সে এসে দরজায় ঘা দেয়না সাধারণের। আর তাই এখনো দেশে মানুষ আছে। ন্যায়, নীতি, মনুষ্যত্ব বিদায় নেয়নি — আর সব চাইতে বড় কথা সংখ্যায় তারাই বেশী।

তাই এই মনীষীবাক্য যদি সত্য হয়—'জনসাধারণকে মুক্ত করতে পারে জনসাধারণেরই আপন শক্তি, অন্য কোন শক্তি নয়'—তবে অন্ধকার নিশ্চয়ই গাঢ় নয়।

'বলাকা'— পৌষ, ১৩৬৪

সম্পাদকীয়—১০

বলার কথা

'বলাকা' মাসিক-পত্রটি প্রথম প্রকাশকাল থেকেই জ্ঞানীগুণীমহলে সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁরা পত্রিকাটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছিলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই নিজস্ব চিন্তায়, বৈশিষ্ট্যে 'বলাকা' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছিল পত্রিকা জগতে। মহিলা-পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হলেও গুণীজন একবাক্যে বলেছেন, 'যে নামে চিহ্নিত হয়েই প্রকাশিত হোক, বলাকা একটি সত্যিকারের খাঁটি সাহিত্য-পত্র।'

কিন্তু দুর্ভাগ্য— সার্থকতার চরম সময়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আমাদের 'বলাকা' প্রকাশ স্থগিত রাখতে হয়।

সর্বক্ষেত্রেই ভিসাস সারকেল বলে একটা কথা আছে।

কাগজের জগতেও আছে।

কাগজের জগত সেই ভিসাস সারকেলটিতে ঘোরে—

কাগজ চালাতে হলে বিজ্ঞাপন চাই।

বিজ্ঞাপন পেতে হলে প্রচার চাই। প্রচার সংখ্যা গুণে না নিয়ে কোন বিজ্ঞাপনদাতা কখনো 'দাতা' হল না।

আর প্রচার-সংখ্যা বাড়াতে হলে নিয়মিত কাগজ বের করা চাই।

নিয়মিত বের করতে হলে বিজ্ঞাপন চাই...

চক্রটি বিজ্ঞাপন জগৎ থেকে যাত্রা আরম্ভ করে বিজ্ঞাপনের চক্রবিন্দুতে এসে মিললো।

সব চাইতে দুঃখের কথা হলো, সরকারী বিজ্ঞাপন জগৎ ও এই একই পদ্ধতিতে ঘোরে।

কিন্তু সরকার ব্যবসা করতে বসেন নি। তাঁরা যদি নতুন কাগজকে কিছু সহযোগিতা দিতেন— বিজ্ঞাপন চাওয়া মাত্র একটি তিন-চার পাতার ফরম পাঠিয়ে না দিয়ে কিছু বিজ্ঞাপন দিতেন, অন্তত কিছুকাল বাঁচিয়ে রেখে পত্রিকার উপযুক্ততা, দৃষ্টিভঙ্গি দেখে নিতেন তবে এর ভেতরও কিছু নতুন পত্রপত্রিকা অবশ্যই স্থান করে নিতো। কিন্তু সরকারও পরোক্ষে গোটা কয় পত্রিকাকেই সাম্রাজ্য ভোগ করতে সাহায্য করে চলেছেন! কিন্তু এর ভেতর মঙ্গল তো নেই-ই; নিদারুণ অমঙ্গল ওৎ পেতে রয়েছে! আর রয়েছে অদূরদর্শিতার ভয়ঙ্কর পরিণাম। যে ভয়ঙ্কর পরিণামের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি।

বলার কিছু নেই।

কিন্তু বলার যখন কিছু থাকে না তখনও ভাবার কথা থাকতে পারে।

এবং বলা বন্ধ হয়ে যখন শুধু ভাবাতে গিয়ে ঘটনা দাঁড়ায় তখন বুঝতে হবে অবহিত হবার সময় এসেছে— বা বলা যায় অবহিত হবার সময়ও অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু কি হওয়া উচিত বলা আজকের দিনে অরণ্যে রোদন!

কি হচ্ছে সেটাই বলি।

কাগজের জগতের এই পাপ-চক্রে পড়ে নতুন পত্রিকা জন্ম-মৃত্যু প্রায় এক সঙ্গে নিয়েই জন্মাচ্ছে জেনেও জন্মায়। উত্তরসূরীদের সাধানালব্ধ প্রতিষ্ঠিত আসনে বসে বড় বড় কাগজ সংবাদপত্র নামে বিজ্ঞাপন-পত্র বের করতে করতে দৌলতের সাম্রাজ্যে বসে নতুন পত্রিকার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হাসে। প্রথম প্রকাশকালে এঁদের সেই হাসি বলে, 'ক' দিন!' যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন সে বাঁকা হাসি বলে 'জানা কথা'।

যেন পত্রিকা জগতে সাম্রাজ্য গেড়ে বসেছেন ওঁরা নিজেদের ক্ষমতা দক্ষতার গুণে। আর যে কাগজে মরছে,— মরছে নিজেদের অক্ষমতায়, অদক্ষতায়।

ওঁরা জানেন না, হাসি কিন্তু আমরাও।

অবশ্যি সে হাসি দেশের দুর্ভাগ্য আর দুঃখ দেখে।

হ্যাঁ দেশের। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-দুর্ভাগ্য প্রকাশের স্থান কাগজ নয়।

কিন্তু দুঃখের কথা নিয়ে বসতে চাই না।

দুঃখ বড় নিবীর্য।

তাকে ঠেলে ফেলে উঠে দাঁড়াতে হয়।

'বলাকা' জানে সেই পাপ-চক্র ঘুরছে।

সেই ঘূর্ণন থেকে মাথা রক্ষা করা হয়তো যাবে না।

মানুষ মরণশীল। ক' দিন তার জীবন সে কথা কেউ বলতে পারে না। তবু পিতা-মাতা আকুল স্নেহে সন্তান সৃষ্টি করেন। মা ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে তাকে বুকে তুলে নেন। জীবন দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। কখনো পারেন। কখনো পারেন না। যদি রক্ষা করতে পারা না পারাটাই সর্বক্ষেত্রে বড় কথা হতো তবে মার এমন মহিমান্বিত রূপ হতো না।

স্বামী বিবেকানন্দ তার ছোট্ট আয়ুটুকুর মধ্যেই যুবশক্তির ভেতর বীর্য এনে দিয়ে গিয়েছিলেন।

তাই কাজ করে যাওয়াটাই বড় কথা।

কাগজের জগতে সেটা আরো বিশেষ করে সত্য।

বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা থেকে ভারতবর্ষ প্রবাসী সবুজপত্র কল্লোল— কোন কাগজই আজ আর নেই। যে কাগজ যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলো তা করে গেছে। আজও যদি সে সব কাগজগুলো বেঁচে থাকতো তবে হয়তো যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে কাগজের আদর্শচ্যুতি ঘটে যেত। গিয়ে দাঁড়াতো সোজা ব্যবসায়। একখানা ঘরে মাদুর বিছিয়ে বসে হ্যারিকেনের আলোয় যে সব পত্রিকার উত্তরসূরীবৃন্দ একদিন দেশের চিন্তায় ও বোধে দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবোধ জাগিয়েছিলেন, সে সব জাতীয়তাবাদী পত্রিকার বেশীর ভাগই আজ বিজাতীয় বিষ ছড়াচ্ছে দেশে। যদি স্বাধীনতার পর এ সব পত্রিকা লোপ পেয়ে নতুন নতুন হাতে নতুন নতুন পত্রিকা জন্মাত তবে দেশের সামনে এমন দুঃসময় আসতো না। কাগজ আর সাহিত্যই মানুষ গড়ে। এখানে ধর্মচ্যুতি ঘটে গেলে সে দেশের দুর্ভাগ্য কেউ কমাতে পারে না।

তাই 'বলাকার' বাঁচার কথা ভাবছি না।

সেটা ভাবতে গেলে নিজের বাঁচার কথা ভাবতে হয়—যা ভাবতে বসা একেবারে নিরর্থক।

তা হলে উত্তরাধিকারীর কথা ভাবতে হয়।

তার প্রয়োজন দেখি না। উত্তরাধিকারী যে পত্রিকামনা হবেন তার কোন কথা নেই। 'বলাকা' শুধু বেঁচে থাকবার মতলব নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে না। যদি কিছু কাজ করে যেতে পারে তবে সেই সার্থকতার আনন্দে পাখা বন্ধ করবার দিন এলে পাখা বন্ধ করে দেবে।

কাজ?

খুব বড় কথা?

না, খুব বড় কথা নয়। প্রচারসংখ্যা প্রতিযোগিতায় গিয়ে দাঁড়াবার মতো হাতে শক্তি এনে দিন — তবেই 'বলাকা' দেখিয়ে দেবে ভালো কাজ করা কত সহজ। কারণ যতই বলি 'দেশের মানুষ নেই'— কথাটা সত্য নয়। বেশীর ভাগ মানুষই সতিকারের মানুষ। সৎ এবং ধার্মিক। তারা বহুলপ্রচারিত কাগজের অপপ্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত। তাদেরই একাংশ ক্রুদ্ধ এবং ক্ষিপ্ত। ধনীর হাতের কাগজ যে পথে অর্থ সেই পথই তাদের পরমার্থ! লক্ষ লক্ষ প্রচারের দ্বারা যথেচ্ছাচার চালিয়ে তাঁরা মানুষকে একদিকে যথেচ্ছাচারী করে তুলছে। অন্যদিকে দিচ্ছে মেরুদণ্ডহীন করে।

আমাদের দেশে খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, ঘর নেই— এই নাই নাই হাহাকারের ভেতর যা আছে তা একমাত্র কাগজ। লক্ষে লক্ষে রোটারি মেশিনে ছাপা হয়ে, মেসিনে ভাঁজ হয়ে সকাল হতে না হতে ঘরের দরজায় বাড়ি মেরে এসে পড়ছে। পড়ছেই। একখানা। দুখানা। তিনখানা—পাঁচখানা। দশখানা....কিন্তু এই কাগজের সমুদ্রে বসে মানুষ আজ ভালো কাগজ, বলিষ্ঠ কাগজের তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত— ঠিক সমুদ্রের উপর বসে এক গণ্ডুষ পানীয় জলের তৃষ্ণার মতো।

কিন্তু জনসাধারণ নিরুপায় জীব। তাঁরা বাঁশের কঞ্চি। কেউ একত্র করলে জ্বলে উঠতে পারে। লাঠি হয়ে উঠতে পারে না তারা।

'বলাকা' এবার তার করণীয় কাজ হিসেবে নিয়েছে বাংলা সাহিত্যকর্মের সঙ্গে প্রাদেশিক সাহিত্যকর্মের আন্তরিক যোগ স্থাপন করা। কারণ প্রাদেশিকতাকে মাথা চাড়া দিয়ে তুলে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে যে ভাবে কিছু লোক, এবং কিছু কাগজ তৎপরতার সঙ্গে সুকৌশলে কাজ চালাচ্ছেন, তাতে এই দুরভিসন্ধিকে সমূলে বিনষ্ট করতে না পারলে যে বিপদ দেখা যাবে সেটা ধ্বংসের। ভাবের বিনিময় দিয়েই প্রীতি সৌহার্দ্য জন্মায়। আর ভাবের বিনিময় অনুভূতির বিনিময় সম্ভব একমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ভেতর দিয়েই। তাই বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য প্রকাশ করার সংকল্প নিয়েছে 'বলাকা'। প্রতিটি প্রদেশের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতি দৃঢ়বদ্ধ করতেই হবে।

'বলাকা', আষাঢ় ১৩৮০

সম্পাদকীয়—১১

আমাদের এই পাতার নাম 'বলার কথা।'

কিন্তু বলি কি?

যদি 'বলার কথা' না হয়ে এ পাতার নাম দিতাম, 'কথা বলার পাতা'— তবে ভাবনার ছিলো না। কথার অভাব কি? মননের দরকার নেই, অসংলগ্নতার দায় নেই, বলে চললেই হলো। কথা না বলে আমরা থাকতেই পারিনে। নিজে বসে বলি। অপরের বাড়ী চড়াও হয়ে বলি। রাস্তায় পরিচিত কারু সঙ্গে দেখা হলে অমনি দাঁড়িয়ে পড়ি কথা বলার জন্য। কেউ অবিশ্রান্ত কথা বলে আমার মাথা খারাপ করে দেয়। কারু মাথা খারাপ করে দেই আমি। 'কিছু বলার' জন্য যার দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় সেই মাথার কাছ থেকে চিন্তা আদায় করা সহজ তো নয়-ই, অতি দুরূহ কাজ। তার উপর দেশজুড়ে যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ডকারখানা আরম্ভ হয়েছে তাতে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাওয়ার যোগাড়! ব্যাপার দেখে প্রতি পদে আর কেবল হতবাক হয়ে 'কিচ্ছুই বুঝি না' বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়। এই যেখানে দেশের অবস্থা আর হালচাল সেখানে 'বলার কথার' পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে ফেলাই উচিত।

আমরা দেশের বর্তমান হালচাল বুঝি না।

আপনারা বোঝেন কি?

যদি বোঝেন তবে আমাদের একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন কি হঠাৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের ধর্মঘটের তাৎপর্য কি? যখন নানা কারণে ধর্মঘট হয় তখনও 'এসেনসিয়াল সার্ভিস' বলে একটা ছাড় থাকে। জল, বিদ্যুৎ, ডাক্তার তার মধ্যে পড়ে। যত বড় ধর্মঘটই হোক ডাক্তারের গাড়ি আটক করা চলে না। চলে না জল বিদ্যুৎ বন্ধ করা। সেই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররাও ধর্মঘটে নেমেছেন কেন?

তাঁরা প্রশাসনিক পাওয়ার চান?

অকস্মাৎ এই চাওয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো কেন জিজ্ঞাসা করবো না; সাধারণভাবে এমন কানুন কোন দেশে নেই— অর্থাৎ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কোন দেশেই পরিচালনার কাজ করেন না। তাঁরাও সে দাবি করেন না। যার যার ক্ষেত্রে সে সে বড়। যার ক্ষেত্রে তাঁর তাঁর প্রয়োজন এবং মূল্য সীমাহীন। পত্রিকা যতই বলুক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের এ দাবি অনেক দীর্ঘদিনের—কিন্তু তা সত্য নয়। ইংরেজ আমলে ছিলো না। স্বাধীনতার এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ভেতর শুনিনি। হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত দাবির প্ররোচনা দিয়ে কারা কোন মতলব হাসিল করবার উদ্দেশ্যে এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে— এ প্রশ্নও করবো না। শুধু বলবো, সব 'চাওয়ারই' সময় অসময় বলে একটা কথা আছে। পদ্ধতি আছে। আছে 'চাওয়া' আদায় করার মানবিক দিক। জল বন্ধ আলো বন্ধ করে, মরণাপন্ন রোগীকে মেরে যার একঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন তার মৃত্যু ঘটিয়ে ধর্মঘট করার ভেতর কোন মানবতা নেই। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের ধর্মঘট কোন অর্থনৈতিক কারণে নয়। তাঁরা প্রশাসনিক অফিসারদের চাইতে কতগুণ বেশী উপায় করেন তার হিসেব ইনকামট্যাক্স জানে না— অন্য কে জানবে! তাতেও সন্তুষ্ট না থেকে শুধুমাত্র ক্ষমতা লাভের জন্য মানুষের ওপর পীড়ন চালিয়ে ধর্মঘট করা, মুহুর্মুহু ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া এ কেমনতর ব্যাপার?

তার ওপর দেশ এখন অর্থনৈতিক-সংকট, খাদ্য-সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য যখন সর্বতোভাবে সবার সহযোগিতা করা উচিত, তখন দেশের পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলে সরকারকে আরো সংকটের মধ্যে ফেলার চেষ্টা, এটাই বা কেমনতর?

পাওয়ার চাই?

বেশ তো—পাওয়ার তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। কিছুদিন পাওয়ার চাওয়াটা অবশ্যই মুলতবি রাখা চলে।

সর্বদাই দু কান ভরে কেবল শুনছি সরকারের সমালোচনা—'এ সরকার কিছুই করতে পারছে না।'

কিন্তু সরকার কিছু করতে পারছে না, না যাতে সরকার কিছু করতে না পারে তারই চাতুরি এ সব ধর্মঘট? সর্বদিকে সরকারকে অচল করে দেবার চেষ্টা করতে করতে 'এ সরকার' অচল বলে চেঁচানো—

অদ্ভুত!

না—বুঝি না কিছু! শুধু দেশের চালচলন দেখে হতভম্ব হয়ে থাকি। বলার কথা মাথার মধ্যেই বোবা হয়ে থাকে।

'বলাকা', শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০

প্রবন্ধ

বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল (১ম)

বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হয়ে ভারতীয় মেয়েদের জীবনে মৌলিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় অধ্যায় সূচিত হলো।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের বুকে চলেছিল সতীদাহ প্রথা--- ধর্মের নামে এক নৃশংস নারীবধ যজ্ঞ। আরো কতকাল চলতো কে জানে— যদি এসে রামমোহন রায় রক্ষা না করতেন। প্রাণে বেঁচে থাকার চাইতে প্রাণীজগতে বড় কিছুই নেই। তাই বিষাক্ত ঘা জর্জ্জরিত ভিক্ষুক পথে পড়ে, অন্ধ অপরের হাতের লাঠি ধরে পথ চলে, পঙ্গু-বিকলাঙ্গ কোমর ছেচ্ড়ে ভিক্ষে করেও বেঁচে থাকতে চায়। বেঁচে থাকে। সতীদাহ প্রথা রহিত হয়ে মেয়েদের দিয়ে গিয়েছিল তেমনি এক সর্ববঞ্চিত বেঁচে থাকা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ আইন সিদ্ধ করে সে বঞ্চনা থেকে মেয়েদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দিলেই তো হয় না, গ্রহীতার গ্রহণ করবার শক্তি থাকা চাই। মানুষ নিজে সংস্কৃতিসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রগতিসম্পন্ন আইনকেও যুগ-পার করতে হয় নথি-পত্রের আড়ালে ঘুমিয়েই। বটগাছের বিস্তৃত শিকড়ের মতো সংস্কার আমাদের মনের নির্জ্জনিস্তর পর্য্যন্ত অক্টোপাশবাঁধনে আঁকড়ে আছে। কিন্তু ঘুণে ধরা গাছ যেমন আত্মরস আত্মস্থ করেই বেশ কিছুকাল টিকে যায়, চোখে দেখে বোঝা যায় না ভেঙ্গে পড়বার দিন তার ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের সংস্কারগুলোরও চলছে সেই অবস্থা। মূল ঘুণে শিথিল— অপেক্ষা শুধু ধস নামবার। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সেই ভেঙ্গে পড়বার প্রতীক্ষায় কাল না গুণে, আইনের দ্বারাই হোক বা কর্মের দ্বারাই হোক ঘটনাকে ত্বরান্বিত করেন মাত্র। নইলে যুগের অনিবার্য্য গতিবেগে ঘটনা যখন এগিয়ে চলে, তখন তাকে রুখবার ক্ষমতা কোন শক্তিরই থাকে না। সতীদাহ প্রথা উঠাতে তখন আইনের সাহায্য নিতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তা না হলে আজও সেটা চলতো এ কখনই নয়। কিন্তু যুগের গতি প্রায়শঃই অলস ও মন্দগামী। আর সাধারণের ঘুম— সে তো কুম্ভকর্ণের ঘুম। তাদের জাগার অপেক্ষায় জগৎ-সংসার নিয়ে থেমে থাকতে প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরা অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন। তাই যুক্তি-বুদ্ধিতে অবুঝ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেন তাঁরা আইনের অঙ্কুশ হাতে। আইনের দণ্ড কঠোর হাতে ব্যবহার না করে কেবল মানুষের শিক্ষা ও শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে গোটা সমাজের মঙ্গল করা যায় না। তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিদেরও সাগর-প্রমাণ জ্ঞানের পথ ছেড়ে সর্ব্বসংস্কারে বেছে নিতে হয়েছিল আইনের পথ। আজকের এই পাশ হওয়া বহুবিবাহ নিরোধ আইনটি নিয়েও বিদ্যাসাগর মহাশয় সেদিন আন্দোলন তুলে ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিষম বিরোধিতায় সে আন্দোলন তাঁকে বাধ্য হয়েই বন্ধ করতে হয়। বঙ্কিম-মতে বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন হবেনা। এটা নিজ থেকেই উঠে যাচ্ছে, সুশিক্ষার ফলে একেবারেই যাবে। এই বাদানুবাদে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধর্ম ইঙ্গিতে যে ব্যক্তিগত ঘেঁসা আক্রমণ করেছিলেন তাতে তিনি মানীর মান রাখতে পারেননি। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিজের মনেও দ্বিধা এসেছিল। ভবিষ্যৎ মানুষের সুবিচারের জন্য তিনি সে প্রবন্ধের তীব্র অংশ বাদ দিয়ে প্রকাশ করেন। আজ সেই ভবিষ্যৎ মানুষের বিচারে বঙ্কিম বিজিত। বিধবা- বিবাহ আইনটিরও বিপক্ষে ছিলেন তিনি। বহু বিদ্রূপ বাণ বিদ্যাসাগরের প্রতি এনিয়ে তিনি নিক্ষেপ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কি দেশপ্রীতি, মানব-প্রীতি কম ছিল। তাঁরই মন্ত্র মুখে করে তো আমরা দেশোদ্ধার করেছি। কিন্তু বঙ্কিম হলেন প্রেমিক আর বিদ্যাসাগর দরদী বন্ধু।

কি জানি, কথায় কথায় কেমন বিষয়ান্তরে চলে এলাম যেন!

যা বলছিলাম। আজ শত বছর পরে বহুবিবাহ নিরোধ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হ'য়ে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে অধিকারের সমান মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'লো। 'ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে আর অভাগার ঘোড়া মরে'— এই তো ছিল তার জীবনমান!

বিবাহিত জীবনের অর্থ হলো আইন-প্রথা এবং এ দুই এরও অব্যক্ত কতগুলো স্বীকৃতি নিয়ে মিলিত জীবন। তাতে দুপক্ষই সমান অংশীদার। সেখানে এক পক্ষকে অপরিমিত স্বাধীনতায়— এমন-কি বলা চলে স্বেচ্ছাচারিতায় মুক্তি দিয়ে অপর পক্ষকে অর্থাৎ নারীকে কেবলি আইনের নিগড়ে বাঁধলে— তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে অস্বীকার ও অসম্মান করা হয়: সমান অধিকারে সমান দায়িত্ব ও সমান স্বাধীনতা না থাকলে বঞ্চিত পক্ষের উপর অবিচার অনিবার্য্য!

আমাদের দেশের মতো এমন গোঁজামিলের দাম্পত্য সম্পর্ক বুঝি আর কোন সভ্যদেশ টেনে চলে না। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য সমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভেতর একাত্মবোধ না থাকলে সংসার তাদের অচল হয়। সাংসারিক সুখ ও শৃঙ্খলার জন্য পরস্পরের ভেতর সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি ও সহৃদয়তাবোধ থাকা চাই তাঁদের সর্ব্বাগ্রে— যে বস্তুর দেখা আমাদের দেশের স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সমস্ত জীবনেও মেলে কিনা সন্দেহ। এ দেশে স্বামীর সঙ্গ বা সাহচর্য্য যে মেয়ের দিনে রাতে হয়ত একবারেও মেলেনা তারও সব দিক সামঞ্জস্য করে সংসার চালিয়ে যেতে হবে হাসিমুখে। নইলে লোক 'ছিঃ ছিঃ' দেবে তাকে, তার স্বামীকে নয়। তাই স্ত্রীর মনের দিক দেখে চলা কিছু মাত্র অপরিহার্য নয়। যা পরিহার্য— সজ্ঞানেই হোক অজ্ঞানেই হোক তার প্রতি উপেক্ষা মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম।

অবিচ্ছিন্ন দাম্পত্য সম্পর্কের নিঃশঙ্ক নিশ্চয়তা পুরুষের মনকে স্ত্রী সম্বন্ধে চরম উদাসীন করে ফেলেছে। এবং এই অভ্যাসের উদাসীনতা শেষে এসে একদিন রূপ নিচ্ছে অবহেলা ও অনাসক্তির। ছোটবেলা হতে একবার যে অভ্যাস গড়ে তোলা না যায়, সে অভ্যাস বড় হয়ে যেমন স্বভাবে কিছুতেই আসতে চায়না, তেমনি প্রথমে ঘরে এনে স্ত্রীর প্রতি সম্মান ও সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারের শিক্ষা একবার রপ্ত ক'রে না নিলে সমস্ত জীবন ভ'রেও আর তা সম্ভব হয়না। অভ্যাসের রেওয়াজ না থাকলে ভদ্র আচরণও মানুষ ভোলে বৈকি। বিশেষ ক'রে ঘরের স্ত্রীর প্রতি। যে সমাজ-ব্যবস্থায় মেয়েদের যাবার দ্বিতীয় কোন স্থান নেই— স্থান থাকলেও নেই সম্মান, তাকে অবহেলা আর অস্বীকার ক'রতে বাধা কোথায়? মৃত্যু আছে, যে কোন মুহূর্তে সব চাওয়া-পাওয়ার বাইরে প্রিয়জনকে হারাতে হ'তে পারে। এই হারানোর ভয় ভাবনাই উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে আকুল হ'য়ে কেবলি দু'বাহু বাড়িয়ে প্রিয়জনকে কাছে টানে। বর্ত্তমানে দাম্পত্য জীবনের প্রীতি-মাধুর্য্য বাড়িয়ে তুলবার জন্য প্রয়োজন হ'য়েছে এই হারানোর শঙ্কা জাগানো।

কথা উঠতে পারে কই আগেকার দিনে তো এই বিবাহ-বিচ্ছেদ না থাকার দুঃখে কোন মেয়েকে কাঁদতে দেখা যায়নি। তা যায়নি। কারণ তখনকার মেয়েদের এ আইনের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু অত্যাচার ও অসম্মানের দুঃখে কাঁদতে দেখা গেছে বৈকি। ঘরে 'দেবী দেবী' ক'রেছেন, আর বাইরের জীবনে— বাগানবাড়ী, জলসাঘর, নাচ-গান থেকে আরম্ভ ক'রে তার আনুষঙ্গিকগুলোর কোনটাকেই দেবী-রোষের ভয়ে বাদ দিতে দেখা যায়নি। সর্ব্বভোগান্তে ঘরে ফিরে দেবী পায় আছড়ে পড়া ক্ষমা-ভিক্ষা প্রহসন বহু যুগ ধ'রে মেয়েরা সহ্য ক'রে আসছে নীরব অশ্রু বিসর্জ্জনে। কিন্তু পরিণামে হারানোর ভয় থাকলে এসব ঘট্‌ত কি? ঘর ভাঙ্গার ভয়ই ঘর সম্বন্ধে অবহিত করত। কিন্তু যে বিয়েতে একবার ঘরে টেনে তুলতে পারলে সমস্ত জীবনের জন্য হাতঝাড়া নিশ্চিন্ত, তা নিয়ে মাথা ঘামায় কে? সময়ই বা নষ্ট করে কে? কিন্তু মানবমনের সম্পর্কগত প্রীতি-ভালোবাসা শুধু মন্ত্রের জোরে আনা যায়না— এত শক্তি মন্ত্রের নেই। প্রীতি ভালোবাসার পুরো নির্ভর ব্যবহার নৈপুণ্যে। এ ব্যবহার নৈপুণ্যের প্রয়োজন ঘরে নেই— এ হ'তে পারেনা— কিন্তু হ'চ্ছে। আর সেই জন্যই মানসিক বিচ্ছেদের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গোটা সমাজের দাম্পত্য সম্পর্ক! তবু যে বিচ্ছেদ নাম শুনে আঁতকে ওঠা এ শুধু সুনিপুণ আত্মপ্রবঞ্চনা। সত্য বটে, সমাজ নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা। শৃঙ্খলের তবু বিস্তৃতিআছে। কিন্তু সে শৃঙ্খল যখন বেড়ি হ'য়ে ওঠে তখন আর প্রাণ বাঁচেনা।

প্রত্যেক বিষয়বস্তুরই দুটো দিক থাকে— ভালো আর মন্দ। কোন বিষয়ই কেবল ভালো বা কেবল মন্দ হ'তে পারেনা। বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থারও তেমনি দুটো দিকই আছে। দেখতে হবে কোন দিকে ওজনে ভারী।

আইন চালু হওয়া মাত্র সুখী দম্পতি সুখের ঘর ভেঙ্গে দিয়ে বিচ্ছেদ ব্যবস্থা আনতে ছুটবে—এ নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আর যাদের দাম্পত্য জীবন গেঁথে আছে শুধু আইনের বাধার উপর তাদের সে বাঁধন ছিড়ে যাওয়াই মঙ্গলের। জীবনের সব চাইতে প্রীতির সম্পর্ক যদি অপ্রীতিকর হ'য়ে ওঠে তবে সেখানে একমাত্র কল্যাণ পথ দূরে সরে দাঁড়ানো। অসুখী স্বামী-স্ত্রী শুধু নিজেদের অসন্তোষ আর অশান্তিই ব'য়ে বেড়ায় না--- সে গ্লানি ছড়িয়ে প'ড়ে সমস্ত আবহ'ওয়াটাকে পর্য্যন্ত করে তোলে সুখহীন ও শ্রীহীন। তাই সুখ যে দম্পতির জীবনে এলো না স্বস্তিটুকু সেখানে মস্ত কাম্য।

তবে নবলব্ধ স্বাধীনতা হাতে পেলে সাময়িক খানিকটা স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিলেও দিতে পারে। কিন্তু সেটাই কায়েমী হ'য়ে গেঁথে বসেনা। যে কোন স্বাধীনতাই তার স্বধর্ম্মে মানুষকে মনুষ্যত্বের পথেই এগিয়ে নিয়ে চলে। যৌবন ধর্ম্মে এক সময় কেবলি মনে হয়, বাধাবিপত্তিবর্জ্জিত বঞ্চিত পক্ষের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেলে

অফুরন্ত সম্ভোগ-বন্যায় গা ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে সে সুযোগ যখন সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে তখন তারা সে স্বাধীনতার অপচয় ঘটায় না। তখন এই স্বাধীনতাই বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে ভারসাম্য পৌঁছে দেয়। শেখায় উপভোগের জন্যই উপভোগকে জীবনে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এই উপভোগটা জীবনের একটা অংশ মাত্র। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য সামাজিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

বিশ্বমানচিত্রের দু'তিনটি তিলপরিমাণ স্থানেও হয়ত হবে না যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত নয়। প্রায় গোটা পৃথিবী যে আইন মেনে নিয়েছে আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকবো সেখানে কিসের গর্ব্বে? পুরোনো ঐতিহ্য! সমাজের কাছে তার বর্ত্তমান কথাটাই বড়। তাই যুগ অনুযায়ী তার রূপ বদলায়।

আগে টাকা ছিল, এখন না থাকলেও চলবে। অনেক খেয়েছি, এখন উপোষ করেই কাটাতে পারবো এ যেমন হয় না— তেমনি পুরোনো দিনের দিকে তাকিয়ে বর্ত্তমান পার করা যায় না। তারপর সে পুরোনো ঐতিহ্যটাই বা কি? রামায়ণ মহাভারত আর মুনিঋষিদের নিয়েই তো আমাদের যত আদর্শ আর উপদেশ। কোন্ মেয়ে এ দেশে সীতা নয়। ক'টি মেয়ে সীতার দুঃখ ভোগ করে না। সীতাকে স্বামীর অত্যাচারে পাতালে প্রবেশ করতে হয়েছিল। আমাদের সামনে তেমন কোন পথও খোলা নেই। মাতা ধরিত্রী আমাদের শত ডাকেও কোল পাতেন না।

আর মহাভারতে একদিকে বল্গাহীন অসংযম, অপর দিকে সংযমের জয়গান। একদিকে সাবিত্রী স্বামীর মৃত আত্মার পেছনে ধাওয়া করছে, অপর দিকে শাশুড়ী সত্যবতী বিধবা পুত্রবধূ অম্বা আর অম্বালিকাকে পাঠাচ্ছেন পুত্র কামনায় ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে। দ্রৌপদী নিত্যস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার একজন। কিন্তু পাঁচ স্বামী নিয়ে ঘর করবার ভেতরও কর্ণকে না পাওয়ার দুঃখ তার মনে— কর্ণ তো কুন্তীরই পুত্র! কুন্তীদেবীর বহু দেব ভজনা বহুভর্ত্তৃক জাতির কথাই বলে। একদিকে বর্ণসঙ্করের ভয়, আবার কত প্রকারের বর্ণসঙ্করের উল্লেখ যে মহাভারতে আছে তার সীমা সংখ্যা নেই। মুনিঋষিদের সাধনাচ্যুতি ঘটিয়ে তাদের নিয়ে ক'দিন ঘর করে দু একটি পুত্র-কন্যা রেখে যাওয়াটা তো স্বর্গের অপ্সরাদের খেলার বস্তু ছিল। নারীপুরুষের সমান অসংযমের ইতিহাস মেলে এই মহাভারতে।

কলিতে পুরুষ নিজেকে মুক্ত রেখে নারীকে করল ঘর-বন্দী। করতে লাগল অত্যাচার, অবিচার আর বঞ্চনা। একযুগে ধর্মের নামে পুড়িয়ে মারল। আর একযুগে রাখল বিধবা নাম দিয়ে সমস্ত ভোগসুখের বাইরে ঠেলে। কুলীনত্বর নামে করতে লাগল শত বিয়ে। তারপর ধোবা নাপিতনিয়োগে করল উপার্জ্জন। (কত ব্রাহ্মণ সন্তান যে তাদেরই বংশধর কে জানে!) কত মর্ম্মন্তুদ ঘটনা যে এ নিয়ে মেয়েদের জীবনে ঘটে গেছে সে ইতিহাসের পাতা ওল্টালে মিলবে। কিন্তু লাভ কি! অতীত—অতীত। সে পাঁক ঘেঁটে ঘটনা টেনে বার করবারও উৎসাহ নেই— মিথ্যে বড় করে তুলে পুরোনো ঐতিহ্য বলে গৌরব করতেও নারাজ। শুধু বর্ত্তমান গড়ে উঠুক দশটা সভ্য জাতির মতো, এই চাই।

আজ এই বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হয়ে ভারতীয় মেয়েদের জীবনে যে কি উপায়হীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে দিল— কি অন্ধকারে দিল পথ মিলিয়ে তা বুঝতে আমাদের আরো কিছু সময় লাগবে। বহুক্ষণ অন্ধকারে কাটালে অতর্কিত আলো চোখ সহ্য করতে পারে না— নিজে বুজে থেকে সে অন্ধকার খোঁজে। জানি আমাদের আরো কিছু সময় তেমনি যাবে।

'বলাকা', আষাঢ়, ১৩৬২

বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল (২য়)

কাজ হয়ে গেলে তা নিয়ে কথা বাড়ানোটা নিতান্ত অকাজের গণ্ডীতে পড়ে। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল নিয়ে আর আলোচনায় আগ্রহ ছিল না। তার ওপর বিলটি নতুন হলেও সমস্যাটি বহু আলোচিত, পুরোনো। পুরোনো জিনিসে এমন একটা নাক কোঁচকানো গন্ধ মিশে থাকে যে যতই তেল-ঝাল-মসলায় কষানো যাক— সে গন্ধ ছাড়ানো যায় না। কিন্তু মাদ্রাজের 'হিন্দু সাপ্তাহিক' পত্রিকাটিতে শ্রীআচার্য্য কৃপালনী 'ম্যারেজ ল রিফর্ম ইন ইন্ডিয়া' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। শ্রীকৃপালনী বিবাহ-বিচ্ছেদ-বিলের সমর্থক নন। পরিষদেও তিনি বিরুদ্ধতা করেছেন এবং প্রবন্ধটিতেও নিজ মত যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। শুধুমাত্র তার যুক্তিগুলো একটু উলটে পালটে দেখবার জন্যেই এই বহু আলোচিত বিষয়টির আবার অবতারণা।

শ্রীকৃপালনীর মতে নিতান্ত অসময়ে এ বিল পাশ হয়ে মেয়েদের জীবনে দুঃখ-দুর্ভোগ বাড়িয়ে চলবে বই কমাবে না। কারণ মেয়েরা এখনও এ বিল পাশ হবার মতো অর্থনৈতিক উপযুক্ততায় পৌঁছোয়নি।

এই উপযুক্ত না হয়ে ওঠার মন্তব্য আমরা দেশ স্বাধীনতার ব্যাপারেও বহুজনমুখে শুনেছি। তাদের মতে আমাদের সব দুঃখের মূল— অনুপযুক্ত দেশের হাতে স্বাধীনতা অর্পণ। আরো কিছুকাল ইংরেজ অধিষ্ঠানই ছিল নাকি মঙ্গলের। শ্রীকৃপালনী নিশ্চয়ই এই মতাবলম্বীদের সঙ্গে একমত হবেন না। বলবেন, মনুষ্যত্বের অপমান আর লাঞ্ছনা ভোগার চাইতে দুঃখ-দুর্ভোগ স্বীকার করেই আমরা উপযুক্ত হয়ে উঠবো।

আমরাও তাঁকে সে কথাই বলবো। আরো বলবো— বিশ্বের বেশীর ভাগ কাজেই অনুপযুক্ত অবস্থায় গিয়ে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয়। উপযুক্ত হয়ে উঠবার অপেক্ষায় বসে থাকলে সমস্ত জীবনেও উপযুক্ত হওয়া হয়ে ওঠে না। আর দুঃখ-বিপদের ভয়? দূরের ভয় তো কিছু শেখায় না, কেবল ভয় বাড়ায়, আতঙ্কিত করে। কাছে গিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরলে তবেই সে নিজে ভয় পায়।

শ্রীকৃপালনী জিজ্ঞেসা করেছেন—বিচ্ছেদ ঘটে গেলে এ সব মেয়েদের অবস্থাটা কি হবে? বিয়েই বা তাদের করবে কে? সন্তান সঙ্গে সমস্যাটা তো দুরন্তই—না থাকলেও বিয়ে করবার বেলা কুমারী কন্যাই পুরুষের বিশেষ পছন্দ। মেয়েরা বুড়ো হয় পুরুষের চাইতে অনেক আগে। তখন তারা আশ্রয় নেবে কোথায়?

হায় ভগবান! কুমার কি আর মেয়েরাই কম পছন্দ করে। দোজবরে একাধিক সন্তানের পিতাকে বিয়ে করতে কি নারীমনই খুশীর আনন্দে পাখা মেলে দেয়! পুরুষের কাছে সম্ভোগের মূল্য এত বেশী যে তারা চিরকাল নারীমন দাবিয়ে রেখে, এমনি সব অপূর্ব্ব একতরফা যুক্তি দিয়ে তরুণী আর কুমারীতে লোভ ক'রে আসছে। পঞ্চাশে বিয়ে করছে পনের বছরের কিশোরীকে। বিশ-বাইশের তফাৎ তো তফাৎই নয়—নারী যে বুড়ো হয়ে যায় তাড়াতাড়ি!

তা যায়। যে সমাজ যত নীচে, নারীর সৌন্দর্য্যও সেখানে তত অল্প আর ততোধিক ক্ষণস্থায়ী— এ হিসেব-নিকাশের সত্য। কিন্তু কতগুলো কথা আছে শুনলে যেন কেমন গাটা কুঁকড়ে ওঠে। পুরুষের কুমারী পছন্দ করা, নারীর বুড়িয়ে যাওয়ার সমস্যা, সন্তান নিয়ে তাদের বিয়ে করার প্রশ্ন--- এ সব কথাগুলো যেন সে জাতীয়। নারীর মর্য্যাদা তো দূরের কথা পুরুষের মর্য্যাদারও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

নারীর থাকার চিন্তা! পূর্বকালে কুলীন কন্যারা কোথায় থাকত? বর্তমানে বিধবা নারী কোথায় থাকে? স্বামী-ঘর-চ্যুত নারীর সংখ্যা এখনও কম নয়, তারা আছে কোথায়? সুখের আশায় ঘর বেঁধে দেন যারা সে ঘর দুঃখের হলে বুকেও টেনে নেন তারাই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রয়োজনে যা চলছিল তাই চলবে।

যদি এ বিল একান্তই পাশ করতে হয় তবে কেবল নারীর জন্য পাশ করতে পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীকৃপালনী। নারী পারবে প্রয়োজনে বিচ্ছেদ ব্যবস্থা চাইতে, পুরুষ নয়। পুরুষের হাতে এই আইনের অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কারণ এ আইন তাদের অন্যায় করবার, নির্য্যাতিত করবার সুবিধা বাড়িয়ে দেবে।

আমরা বলি, তাও ভালো। যা করবার ছেড়ে দিয়ে করতে হবে, বেঁধে রেখে পারবে না--- সেই মস্ত মুক্তি।

নিজ দেশের ভ্রাতা-ভগ্নি, মাতা-পুত্রের তুলনাহীন সম্পর্ক-মাধুর্য্যের যে বর্ণনা শ্রীকৃপালনী দিয়েছেন তা পড়ে মনে প'ড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান—

> 'ভায়ে মায়ে এত স্নেহ
> কোথায় গেলে পাবে কেহ
> ওমা তোমার চরণ দুটি
> বক্ষে আমার ধরি—'

এমন স্নেহ কোথাও মেলে না নয়—যা মেলেনা তা হলো সম্পর্কগুলো নিয়ে ভাববিলাস। তারা স্ত্রীকে দেবী বলে না। মায়ে বোনে ভালোবাসা দেখাতে আবার সেই দেবী জীবন নষ্ট করে দেয় না। মায়ের চরণ বক্ষে ধরে না। তারা জানে বক্ষটা হাঁটবার বা পা রাখবার জায়গা নয়। পা বুকে নেওয়ার চাইতে অনেক বেশী বড় করণীয় মার জন্য করার আছে। প্রতিটি সম্পর্কের মূল্য আর পরিমিতি বোধ তাদের আমাদের চাইতে অনেক বেশী। তাই তাদের সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর। আমাদের সম্পর্কগুলো যেন একটা সূতোর জটপাকানো বান্ডিল। শত চেষ্টা করেও গিঁট ছাড়ান যায় না। একদিক থেকে খুলে আনলে জট পাকায় অন্যদিকে। হয়তো সেই জন্যই শ্রীকৃপালনী আমাদের তুলনাহীন স্নেহবন্ধন, মাতার গৃহের একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্বের গৌরব, একান্নবর্তী পরিবারের

নানা সুখ ও সুষমাচিত্র দেখিয়েও বিনা দ্বিধায় বলেছেন, একান্নবর্তী পরিবারই বিবাহিত জীবন নষ্ট করে দেওয়ার মূল কারণ। মেয়েরা বধূ জীবনে নিপীড়িত হয় স্বামীর দ্বারা নয়— শাশুড়ি ননদের দ্বারা। বেশীর ভাগ ছেলেই মার মন্দ প্রভাবে চালিত হয়। যারা তা নাও হয় তাদের পক্ষেও একান্নবর্তী পরিবারের পারিপার্শ্বিকে স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি বা বিবেচনা দেখানো সব সময় সম্ভব হয় না। কারণ তা হলে তাদের স্ত্রৈণ আখ্যায় ভূষিত করা হয়। তাই কৃপালনীর মতে শাশুড়ী ননদের দ্বারা দলিত না হয়ে, প্রথম বধূজীবন সুখ ও আনন্দের হলে, আপনা থেকেই স্বামী-স্ত্রীর ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে। নারীরাই নারীর প্রধান শত্রু। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের চাইতে পারিবারিক জোটটা ভেঙ্গে দেওয়াই হলো দাম্পত্য জীবনের শান্তিসুখের পক্ষে বেশী কল্যাণের। শ্রীকৃপালনীর এ মন্তব্য বিরূপ ভাব প্রকাশ করে প্রশংসা লুটাতে চাইবেন তারাই, যাদের জীবনেও শাশুড়ী এবং শ্বশুর ঘরের পরিজন নিয়ে ঘর করতে হয়নি। অথবা তেমন অসীম সৌভাগ্যবতী রমণী, যার শাশুড়ী এবং শ্বশুর ঘরের পরিজন ভালো এবং ভদ্র। নইলে একথা নির্ভেজাল সত্য— বধূজীবন বিষাক্ত করে তুলে ভবিষ্যৎ-জীবনের পুরো দাম্পত্য সম্পর্কটির ভেতর দুষ্ট কীট ঢুকিয়ে দেয় যারা তারা নিঃসন্দেহে নারী।

স্বামীর ঘরে রওনা করে দেবার দিন-- অশ্রুমুখী কন্যার মুখটি সস্নেহে কাছে টেনে সংশয়াকুল ভীরু মা আশীর্ব্বাদ করেন— স্বামীর মন ও ভালোবাসা পেয়ে স্বামী-সোহাগিনী হও। কিন্তু পুত্রের মুখটি কাছে টেনে তো মাকে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করতে শোনা যায় না— স্ত্রীর মন ও ভালোবাসা পেয়ে কল্যাণময় আনন্দ-সংসার গড়ে তোল। পুত্র ও বধূর মিলিত জীবনযাত্রায় পুত্রের স্ত্রীর মন পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নটা যেন নিতান্তই অবান্তর।

যেন নয়—সত্যসত্যই মা সেটাই ভাবেন। আর ভেবেই থেমে থাকেন না। বধূর মন পদার্থটির কথা পুত্রকে ভুলিয়ে ছাড়েন এবং পুত্রের মন দেওয়া যাতে বন্ধ হয় এমন ভাবে দৈনন্দিন ঘটনা চালিত করেন। প্রতিনিয়ত বধূকে মন্দ প্রতিপন্ন করে করে, পুত্রের মন স্ত্রীর প্রতি বিরূপ করে তুলতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে টেনে নেন আপন অপর পুত্রকন্যা আত্মীয় পরিজন। পুত্র ও বধূর সমগ্র জীবনের শান্তি সুখ নিয়ে পরিবারটি অবশেষে মেতে ওঠে এক আশ্চর্য্য নিষ্ঠুর খেলায়। এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত পর্য্যন্ত তফাৎ মেলে না। দাম্পত্য জীবনের গোড়ায় ছাই ঢালা আরম্ভ হলো তখন থেকেই। গোড়ায় ছাই ঢেলে জগতের প্রায় কোন বস্তুই বাঁচানো যায় না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও বেঁচে থাকে না। তারপর জীবনভর তারা টেনে চলে একটা মৃত-সম্পর্ক। নয়তো দেখা যায় আরো বিষময় ফল। এবং বধূ গৃহিনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়ায় শাশুড়ীর উপর যে ব্যবহার আরম্ভ করেন তাতে সুরু হয় নারীর হাতে নারীর লাঞ্ছনার আর এক পর্ব।

কিন্তু নারীর প্রতি নারীর এই শত্রুতার মূলে কারণটা কি?

কারণটা খুবই স্পষ্ট। শিক্ষার অভাব, সমাজের বিস্তৃত পটভূমি থেকে অপসারিত হয়ে, ঘরের কোণে সসঙ্কোচ অবস্থান আর পুরুষের পরম অধীনতা-- এই তিনের বিষময় ফল ঐ একটিতে। বিশেষ করে পরাধীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা মানুষের প্রধান গুণগুলোকে নষ্ট বা পঙ্গু করার পক্ষে যথেষ্ট। এর নজীর আমরা জাতি হিসাবে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছি। মর্ম্মান্তিক বেদনায় একদিন বারংবার আমাদের স্বীকার করতে হয়েছে ভারতবাসী-ই ভারতের সব চাইতে বড় শত্রু— যত বড় শত্রু ইংরেজ নয়। তারাতো ছিল স্বার্থান্বেষী পরদেশী কিন্তু আমরা চাকরী আর অর্থ লোভে আত্মকলহে মেতে তাদের প্রভুত্বকে আসীন রেখেছিলাম। এবং তাদের সে আসন কায়েমী রাখার জন্য যত নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সবাই হয়েছিল আমাদের হাত দিয়ে।

একটা গোটা জাতিই যদি এমন অপজাত অবস্থায় পৌছতে পারে তবে আর নারীর দোষ কি? ঘরের কোণে বসে ঘরকন্নার খুঁটিনাটি নিয়ে আত্মকলহ আর পুরুষরূপী নির্ভর ক্ষেত্রটিকে আয়ত্ত্বে রাখার প্রতিযোগিতায় মেতে থাকা মেয়েদের পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

আজ মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা মন্থরগতিতে হলেও বিস্তার লাভ করছে। ঘরগন্ডীর বাইরে সমাজের বৃহত্তম দায়িত্ব গ্রহণে তারা দ্বিধা করছে না এবং তা গ্রহণ করে পালনও করছে কৃতিত্বের সঙ্গে। শিক্ষায়, স্বাধীনতায় আর কর্ম্মক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলে মেয়েরাও স্বজাতি শত্রুর নিকৃষ্ট ভূমিকা থেকে, মুক্তি পেয়ে মনুষ্যত্বের উন্নত পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হবে। তাই আজ আর উপযুক্ততা অনুপযুক্ততার দোহাই নিয়ে সময়ের অপচয় না করে সামাজিক স্বাধীনতার প্রতিটি দরজা তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়াই হবে সামাজিক পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যকে উদ্ধার করার শ্রেষ্ঠ পথ। বিয়ের অনুষ্ঠানে বর তার উত্তরীয়র খুঁটে বেঁধে বধূকে যে একটি জীব হিসাবে টেনে আনবে— সেটি নয়। জানতে হবে হাতে হাত মিলিয়ে চলাতে রয়েছে সত্যিকার চলার শক্তি।

'বলাকা', শ্রাবণ, ১৩৬২

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি (১ম)

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, এ অপবাদ বাঙ্গালীর আছে—কিন্তু আত্মঘাতী জাতি হিসাবে আর একটি গুরুতর পরিচয় পাকা করবার মতো দুর্বুদ্ধি এবার তার মাথায় এসেছে। আত্মস্বার্থের মুখ চেয়ে গুটিকয়েক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আজ বঙ্গ-বিহার একীকরণের ঢাকে বাড়ি দিয়েছেন। এ বোধন বাদ্য নয়— বিসর্জনের। এ দুর্বুদ্ধি কখন সরকারের মাথায় এলো — না যখন দেখতে পাওয়া গেল— রাজ্যপুনর্গঠনের অন্যায় রায়ের বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল আকার ধারণ করেছে, যখন দেখা গেল— ন্যায়সঙ্গত দাবী অনাদায় রেখে এ বিক্ষোভ শান্ত হবে না. বঙ্গভঙ্গ রোধ করার দুর্জয়তা নিয়ে বাঙ্গালী আর একবার সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন করার জন্যে, এবং বাঙ্গলার যে অপ্রতিরোধ্য শক্তির কাছে একদিন ইংরেজ মাথা নত করেছিল, সে শক্তির কাছে প্রাদেশিক রোগগ্রস্ত কংগ্রেস সরকারেরও মাথা নত করার দিন এসেছে। তখন এই সঙ্ঘবদ্ধ দুর্জয়তাকে জয় করবার জন্যে যে বিভ্রান্তকর চক্রান্ত বের করা হলো — তারই নাম 'বঙ্গবিহার সংযুক্তি'। বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীর ব্রত উদ্‌যাপন মুহূর্তে এমন দুষ্ট আঘাত— আর কোনদিন বুঝি কেউ করেনি। মঙ্গলাকাঙ্খীর মুখোশ মুখে আঁটা থাকে বলে ঘরের শত্রুর শত্রুতাসাধনের সুযোগটা বেশী—কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। বাঙ্গালীত্বের সুযোগ ছাড়া এমন প্রস্তাব উচ্চারণেরও সাহস কেউ রাখত না। সুযোগ বুঝে প্রস্তাবটি অবশ্য দুহাতে লুফে নিয়েছেন কর্তারা। তা নেবেনই বা না কেন, যাকে মারতে চাই, তাকে মারার অস্ত্র হাত পেলে ছাড়ে কে? বিশেষ করে ছোড়ার দায়ও যখন অপরের।

যতদিন বাংলা তার দাবীর খসড়া প্রস্তুত করেছে, তৈরী হয়েছে দরবারে আর্জি পেশ করবার জন্যে, ততদিন বাংলা সরকারের সহযোগিতাটা ছিল উপায়হীনতার পদক্ষেপ। কেন্দ্রের অন্যায়টা এতই স্পষ্ট যে সামনা সামনি বিরুদ্ধাচরণ সাহসে কুলায়নি তাদেরও। তখনকার ভাবটা সরকার ধরেছিলেন— 'বেশ বেশ, তোমরা এগোও, আমরা আছি।' আর এই 'আছিটা' যে কোন দিকে সেটা বোঝাতে চোখ টিপেছেন পেছন থেকে।

কিন্তু এ ধোঁকায় এবার সামাল দেওয়া সম্ভব হলো না। বাঙ্গালী বহু বিষয়ে উদাসীন—মহত্ত্ব মানুষকে কিছুটা উদাসীন আর নিরাসক্ত করে তোলে। কিন্তু মরাবাঁচা সমস্যায় প্রাণীমাত্রই আত্মরক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে— এ প্রকৃতির নিয়ম। জাতির এই আত্মরক্ষার একতায় দিশেহারা আত্মস্বার্থসর্বস্ব সরকার এবার একেবারে বাংলার বলির বাদ্যে কাঠি দিলেন— 'বঙ্গ-বিহার এক'।

এক অর্থের ব্যাপার ছাড়া এই 'এক' কথাটার একটা মোহ আছে। মানুষ ঐক্য শব্দটাকে মনুষ্যত্ব সম্বলিত শব্দ মনে করে। তাই থমকে দাঁড়ালো দেশ। 'রায়-সিংহ' বিবৃতি অগ্নিতে বারিসিঞ্চন করল' বলে উঠলেন রাজাজি। কিন্তু মানুষ দাহ্য পদার্থ নয়। তাকে দাহ করতে অন্য দাহ্য বস্তুর সাহায্য নিতে হয়। এমন ক্ষেত্রে সে যখন নিজে থেকে জ্বলে ওঠে, তখন সে দাবানল বারিসিঞ্চনে নেবানো কি এতই সহজ? শুধু কিছু সময় ক্ষয়িত হবে বিষয়টা কি তাদের তা হৃদয়ঙ্গম করতে। সে বুঝতে পারছে না এ একত্রীকরণ মঙ্গল আনবে— না ঘরে অমঙ্গলের শনি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে যাবে।

এটা বোঝা একটু সময়সাপেক্ষ— কিছুটা বা কঠিনই। মাটিতে লাইন টেনে বর্গমাইলের হিসাব কসা যায়, নগদ নগদ বুঝিয়ে দেওয়া যায় লাভ-লোকসানের অঙ্কটা। কিন্তু এ বিষয়টাতো সরজমিনে ফিতে মেপে বোঝানোর জিনিস নয়, এ ধীরে ধীরে অজগরের মতো গ্রাস করবে বাংলার সত্তা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। এ নগদ বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও কাজটা দুরূহ। দূরের ব্যাপার বলেই কুযুক্তি সাময়িক আসন দখল করবে। বিশেষ করে এতে বড়ো বড়ো গালভরা কথার জাল বিস্তারের ক্ষেত্র রয়েছে এবং সেই ভারী ভারী কথা সর্বভারতীয় ঐক্য, আগে ভারত, তারপর প্রদেশ ইত্যাদির বিস্তৃত জালেই এখন সরকার শিকার ধরছেন।

কিন্তু মানুষ আগে সর্বভারতের নয়, সে আগে তার ঘরের, তারপর প্রদেশের, তারপর ভারতের, এবং অবশেষে বিশ্বমানবের একজন। গাছকে যদি বলা যায়, আগে তুমি আকাশের তারপর তুমি মাটির—তবে আকাশ মাটি দুই তাকে হারায়। যত দৃঢ়মুঠিতে সে মাটি আঁকড়ে ধরতে পারে তত জোরের সঙ্গে সে ঊর্ধ্ব দিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এমনকি এক মাটির গাছ অপর মাটিতে বন্ধ্যা! আঙ্গুর খেতে হলে তাকে এনে বাংলার মাটিতে রোপণ করলেই সে মিষ্ট ফল দেবে না। তার জল-বাতাস-মাটির সীমায় বাড়তে দিলেই তবে সে বিতরণ করবে

মিষ্টি ফল। প্রকৃতির বৃক্ষতত্ত্বেই শুধু এ নিয়ম নয়— মনুষ্যপ্রকৃতিরও নিয়ম এই। আপন জল-বাতাস-মাটি, ভাষা আর সংস্কৃতির স্পর্শ বেড়ে উঠতে পারলেই ঘটে তার পূর্ণ স্ফুরণ।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমিক এবং বিশ্বকবি হয়েও মুক্তকণ্ঠে গেয়েছেন,

'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ
তোমার বাতাস, আমার
প্রাণে বাজায় বাঁশী।'

সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করেও তাঁর বিরাট সাহিত্য বুক পেতে আঁকড়ে রয়েছে সুজলা শ্যামলা বাংলার সীমারেখাটি। প্রতি ছত্রে উপাদান হয়ে এগিয়ে এসেছে বাংলার ফুল, লতা, নদীপ্রান্তর।

আজ বাংলার সংকটকালে শঙ্কিত অন্তরে তারই গৃহপ্রাঙ্গনে গিয়ে সমবেত হয়েছেন বাংলার সত্যিকারের কল্যাণকামী জ্ঞানী, গুণী, মনীষীবৃন্দ। 'যাঁদের ভেতর বহু ব্যাপারেই প্রকৃতির মিল নেই, ভারতের ঐক্যের নামে গায়ের জোরে তাদের এক করবার চেষ্টা অস্বাভাবিক কাজ। এতে ঐক্যের পরিবর্তে বিদ্বেষের বীজই বপন করা হবে; ফলে উভয়েরই অকল্যাণের পথ হবে প্রশস্ত। ভারতের ভাগ্যদেবতা রাজনৈতিক নেতাদের এই খামখেয়ালী অপচেষ্টাকে নিশ্চয়ই ব্যর্থ করবেন।' একদিকে মনীষী অতুল গুপ্ত এই ভাষণ দিচ্ছেন রবীন্দ্র গৃহপ্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাতিল করছেন একীকরণ প্রস্তাব; সাহিত্যিকবৃন্দ গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন সরকারী দপ্তরে··· অপরদিকে প্রকাশ্য সভায় শ্রীডেবর মন্তব্য করছেন কলিকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব একটি প্রশংসাযোগ্য ব্যবস্থা, কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটি এতে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন, দেশ ও জাতির উন্নতি ও ঐক্যের স্বার্থ অপেক্ষা জনপ্রিয়তাকে উচ্চে স্থান দেবো না!

জনগণের মুখপাত্র গণতন্ত্র সরকারের গণদাবীর শ্রেষ্ঠ জবাব—শুধু গণদাবির নয়, সমগ্র বিদ্বজ্জন ও মনীষীজনদের দাবীর কি স্পর্দ্ধিত উত্তর! আজ বাংলায় এমন একজন ব্যক্তিও নেই এর সমুচিত জবাব দেবার— কিন্তু এ পথ বাঁচার পথ নয়। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ পোষক কংগ্রেস তার মৃত্যুবাণ তৈরী করছে আপন হাতে, আর সে বাণ ছুঁড়বার আপাত লোকাভাবটাকেই ভাবছে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। কিন্তু মানুষের উত্থান চিরতরে থেমে যায়নি— বন্ধ হয়ে যায়নি নতুন জন্ম।

এই রায়-সিংহ ঐক্য বিবৃতি যদি পাশ হয়ে যায়, তবে একদিন সিংহের উদরে প্রবেশ করেই রায় মহাশয়কে তাঁর একীকরণ প্রস্তাব সার্থক করতে হবে। কিন্তু সেদিন তিনি আর থাকবেন না— বহুদূর থেকে শুধু নীরব অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখিয়ে দেবেন শ্রান্ত ক্লান্ত বাংলাকে— এ ঐক্যের এই পরিণতি। আমরা যদি অবহিত না থাকি— সজাগ না থাকি তবে এ সংযুক্তি প্রস্তাব যাবে পাশ হয়ে। লোকসভার মতামত আর দৈনিক কাগজের মতামতই গ্রাহ্য হবে জনসাধারণের মত বলে। আর এখানেই রয়েছে বিরাট ফাঁকি।

কংগ্রেস সরকার ধনীর হাতের যন্ত্র। এবং দৈনিক কাগজের পেছনে ধনীর অস্তিত্ব অনিবার্য্য। এবং দুপক্ষের সুবিধার জন্যে দুপক্ষের সুসংযুক্তি ও আপোষ রফা তেমন স্বতঃসিদ্ধ। সেখানে সত্যভাষণে উন্মুখ সম্পাদকরূপী মধ্যবিত্ত মনীষা বেতনভুক কর্মচারী মাত্র। এবং যে মনীষার কর্মক্ষেত্র মাত্র একটি দুটি কাগজেই সীমাবদ্ধ সেখানে মালিকের চাপ দেবার পথটিও থাকে সুপ্রশস্ত। অতএব এই সীমিত স্বাধীনতার সম্পাদকীয় মন্তব্যকেও ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় মতামত বলে গ্রহণ করা মস্ত ভুল। আর লোকসভার সদস্যদের কথা—ভোটের ব্যাপারে বিরুদ্ধপক্ষ সেখানে দুর্বল। কংগ্রেসী সদস্যরা ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক— কংগ্রেসের পরোক্ষ নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য— সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কংগ্রেস তার প্রস্তাব বহাল রাখবে অনায়াসে।

বাংলা এবং বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক মর্য্যাদকে ধূলিসাৎ করবার এই সুপরিকল্পিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের জনসাধারণকে। ভেতরে ভেতরে আমরা সবাই প্রস্তুত। দুর্ভাগ্য সংগঠন করবার নেতা নেই—তা নেতা না থাক জনতা আছি। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন ব্যতীত আমরা শান্ত হবো না। 'জগৎকে দেবার জন্য বাংলাদেশের একটা নিজস্ব বাণী আছে।... বাংলার জাতীয় চরিত্রের মধ্যে এই বাণী অন্তর্নিহিত রয়েছে।... হাজার বছরের সংঘাত ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েও সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে বাংলা আপনার ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে।''.... সেই ব্যক্তিত্ব, সেই অহং আমরা স্রোতের জলে ভাসিয়ে দেবো না।

'বলাকা', মাঘ, ১৩৬২

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি (২য়)

লোকসভা, রাজ্যসভা অ-নে-ক দূর। আমাদের গলার স্বর সে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয় না। মনের জ্বালা মনেই বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু বাঁধলেই কি আর বাঁধ মানে— পাক খায় কেবল ছাড়া পাওয়ার জন্য! মনের বোঝা কাগজে ঢেলে নিজে তো হালকা হই। লোকসভা, রাজ্যসভা রইল না হয় অ-নে-ক দূরই।

কলকাতা কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে চলে যাবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বলেন, "পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যা কলকাতা সদরকে পশ্চিমবঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।"

কথাটা এখন প্রসঙ্গের বাইরে। তবে কেন আসে?

এ মিলন প্রস্তাব কার্যাকরী করার আগে দেশের জনমত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা যাঁরা উল্লেখ করেন ডাঃ রায় তাঁদের বলেন, গত কয়েক বৎসর দেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে, রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রতিনিধিরাই সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেশ বিভাগ ও রাজ্য সীমানা কমিশন নিয়োগ উল্লেখ করেন।

—হায়রে দৃষ্টান্ত! সীমানা কমিশন আর দেশ বিভাগ! এ যাঁদের হাত দিয়ে ঘটেছে তাঁদের হাতের পরমান্নেও আর বিশ্বাস করিনে।

বিহারের দ্বিগুণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপ থেকে বাংলার আত্মরক্ষা করবার জন্য, রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও তিনি রাখবেন, সেই সঙ্গে এও জানিয়েছেন।

— বাংলা কি পেঁচোয়-পাওয়া ছেলে যে, শেষে তাকে রক্ষাকবচের মাদুলি গলায় ঝুলিয়ে বাঁচতে হবে? বুদ্ধিতে নয়, বিদ্যেতে নয়, শক্তিতে নয়, সামর্থ্যে নয়— মাথা গুনতির বেশী অত্যন্ত তুচ্ছ। কিন্তু এই মাথা গুনতির হিসাবই যখন গণতন্ত্রের মূল কথা— হিন্দীকে রাজাসনে বসাবার জন্য যে লাফালাফি, যে মাতামাতি সুরু করেছেন হিন্দী গভর্নমেন্ট তাও এক সংখ্যা-হিসাব দেখিয়ে। গুণের জোরে নয়, সমৃদ্ধির জোরে নয়। এমন ক্ষেত্রে মাথা গুনতির মেদের চাপে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সেধে জীবন বিপন্ন করে তোলে কে? আর তুলে তারপর আত্মরক্ষার মাদুলিই বা গলায় ঝোলায় কে? এমন প্রস্তাব যাঁরা আনেন, এবং তা কার্যকরী করার জন্য সর্বগর্হিত পথে জেদের দাপটে চলতে থাকেন তাঁদের বলবার জন্য কথা থাকে না, থাকে করবার জন্য কাজ।

শ্রীরায় বলেন, 'যদি এই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করা যায় তবে উত্তেজনার এবং আলোড়নের সৃষ্টি হবে।' উদাহরণ দেন তিনি, বোম্বাই ও উড়িষ্যার।

— বোম্বাই আর উড়িষ্যায় কি ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন করার জন্য গোলমাল হয়েছে, না, না করার জন্য হয়েছে? ভাষার ভিত্তিতে যে যে জায়গায় প্রদেশ গঠন হয়েছে, সে সে জায়গায় অশান্তি হয়নি। আর যদি তা করতে গেলে কোথাও কোথাও শান্তির ব্যাঘাত হয়ও তাতেই বা কি? এখনও তো শান্তি বজায় থাকছে না। গোলাগুলী চালানো হয়েছে— সৈন্য ও ট্যাঙ্ক ব্যবহারটা যে করা হয় নাই সেটা শ্রীনেহেরু বলেছেন নিতান্ত উদারতা! তবে এক আদর্শ সামনে রেখে চললে বিপদ আসলেও সামলানো যায়— আদর্শচ্যুতিতে আর নানা মতে বিপদও আসে নানা পথে।

তিনি বলেন, "বাঙ্গালীকে বাঁচতে হবে। তার খাদ্য চাই, কর্মক্ষেত্রের প্রসার চাই, পরার কাপড় চাই, তার জীবন ধারণের জন্য সংগতি চাই।"

...দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়াতে হবে। এই উৎপাদন শক্তি বাড়াতে হলে মিলনের প্রয়োজন। বাংলা এবং বিহার এই যুক্তপ্রদেশের মধ্যে অনেক প্রকার খনিজ সম্পদ আছে যেগুলিকে কাজে লাগাতে পারলে উভয় প্রদেশ তো বটেই ভারতবর্ষও সমৃদ্ধ হবে। যাতে দেশের প্রত্যেক লোকেরই আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা।... অভাবের দ্বারা পীড়িত যে লোক তার যদি সম্পদ বাড়ে এবং তার যদি আর্থিক উন্নতি হয়, তা হলেই ধনী নির্ধনের যে তারতম্য তা অনেক কমে যাবে।.... আমি বলতে চাই যে, যদি বিহার এবং বাংলাদেশের শিল্প এবং কৃষির উন্নতি হয় তা হলে আমাদের মধ্যে বেকার সমস্যার ও সমাধানের সুবিধা হবে। এবং পূর্ববঙ্গ হতে যাঁরা আসছেন তাঁদেরও একটা জীবিকা নির্বাহের পথ আবিষ্কার হবে।"

—পড়ে মনে হয়, বাংলা ও বিহারের মালা বদলে যে দেবশিশু জন্ম নেবে তারই নাম বুঝি স্বর্গ। আর ভারতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা থেমেও আছে বুঝি শুধুমাত্র এই মিলন প্রতিক্ষায়ই।

হায় ভগবান! যে বিহার কঠিন শীত নিবারণ করে খড়ের গাদায় শরীর ঢুকিয়ে, উপোষ সহ্য করতে না পেরে দেশে-বিদেশে বেড়ায় মোট বয়ে— যে বাংলার মুখের হাঁ অন্নের হাহাকার আকাশে বাতাসে— খনিজ সম্পদ কাজে লাগানোর কুবের-ধন জোগাবে সেখানে কে? বাংলা না বিহার কার ঘরে আছে সে ধন? দরিদ্রের মিলন জন্ম দেয় ভিক্ষাপাত্র। এসব কথা যে অলীক এ যিনি বলছেন তিনিও জানেন, আমরাও জানি। আসল কথা "কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করার বিকল্প প্রস্তাব হচ্ছে এই মিলন প্রস্তাব—" বলেছেন শ্রীরায় নিজের মুখে। তাই শ্রীরায়, হয় এ প্রস্তাব পাশ করবেন নয়ত মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারী ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করবেন বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যাকরী করুন। তাতে শেষ জীবনে তিনি যে লোকক্ষয়ের কারণ হতে চলেছেন, তা না হয় উপরন্তু লোকের জীবনদানের পূর্ণার্জন করে যেতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেন, এই একীকরণ প্রস্তাব তাঁরা করেননি, করেছেন বাংলা-বিহারের মন্ত্রীদ্বয়।

—পাঁচ হাত কাপড়ে ঘোমটা টানতে গেলে লজ্জা বাঁচে না, বাড়ে।

তিনি বলেন, জনগণের সমর্থন সাপেক্ষই এ প্রস্তাব তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভালো, একথাই যদি সত্য হয় তবে এ সংযুক্তি প্রস্তাব এখনও তুলে নেওয়া হচ্ছে না কেন? স্থানে স্থানে পৌরসভার নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় কি প্রমাণ নয়! এখন তো জনসাধারণের মতামত জানা হয়ে যাওয়া উচিত।

শ্রীনেহেরু এবং অপর কংগ্রেসী কর্ত্তারা বোম্বাই ও উড়িষ্যাকে সৈন্য ট্যাঙ্কের ধমক দিচ্ছেন আড়নয়নে বাংলার দিকে তাকিয়ে। বলেছেন, পথের সমস্যা তাঁরা পথেই সমাধান করবেন। কলকাতার সংযুক্তিবিরোধী হরতাল লক্ষ্যে উপদেশ দিচ্ছেন বাংলাকে ত্যাগী হতে ও দেশের কথা ভাবতে।

ভীষ্মকে প্রতিজ্ঞা, কর্ণকে দান আর যুধিষ্ঠিরকে ধর্মপরায়ণতা শিক্ষা দিতে বসা আর বাংলাকে ত্যাগ, ঐক্য, স্বাধীনতার মূল্য শেখাতে বসা এক। এও যদি শুনতে হয় তবে আমরা হাসবো না কাঁদবো? কেঁদে মরার চাইতে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই নাকি ভালো— তবে তাই করি—হাসি। আর হাসতে হাসতে বলে যাই—সৈন্য, ট্যাঙ্ক? ধীরে, বন্ধু গো, ধীরে—ধীরে।

'বলাকা'— ফাল্গুন, ১৩৬২

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি (৩য়)

প্রতিবাদ

বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবটির ভেতর বাংলাকে ধ্বংস করবার যে বিষবৃক্ষের বীজ পোঁতা রয়েছে তা দেখে দেশের যাঁরা সত্যিকারের জ্ঞানী, গুণী, মনীষী ব্যক্তি তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে বাস করেও স্থির থাকতে পারছেন না। পারা সম্ভবও নয়। রাজনীতির অন্যায় অবিচারের দুঃখভোগটা কয়েক টুকরো জমি করে না, করে মানুষে। রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা দেশের মানুষের হিত-অহিত সম্বন্ধে উদাসীন থাকা। তাই তাঁদের পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছে না। যে মানুষের মনে মানুষের প্রতি কল্যাণকামনা নেই তিনি সাহিত্যিকই হোন, শিল্পীই হোন আর যত বড়ো জ্ঞানীগুণীই হোন তাঁর সর্ব সৃষ্টি, তাঁর সর্ব জ্ঞান ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোন সার্থক কাজ, কোন সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয় যদি সেই কাজ, সেই সৃষ্টির পেছনের প্রেরণায় মানবপ্রীতি না থাকে। আর প্রীতি থাকলে হিত অহিতে অবিচলিত থাকা অসম্ভব।

জ্ঞানী, গুণী সাহিত্যিক শিল্পী যিনি যাই হোন তারাও মানুষই। রাজনীতির ভালোমন্দের ফল তাঁদের উপরও এসে পড়বে। আপাত সুবিধায় যদিই-বা নিজে বাঁচা সম্ভব হয়, পরবর্তী সন্ততিদের বাঁচাবে কে? যাদের দৃষ্টি শুধু আপন বর্তমানটুকুতেই বদ্ধ তারা জ্ঞানী হইতে পারেন, গুণী হতে পারেন—মহৎ নন্। রাজনীতি তুচ্ছ করবার মতো বিষয় নয়, উদাসীন থাকবার মতে বিষয় নয়, নয় এড়িয়ে যাবার বা না ভাববার মতো বিষয়। রাজনীতি মানবীয় নীতিরই এক বৃহৎ অঙ্গ। বঙ্কিম আমাদের দিয়ে গেছেন সে দীক্ষা, রবীন্দ্রনাথ জুগিয়ে গেছেন তাতে শক্তি, সাহস, উদ্দীপনা। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাও হিজলী জেলে বন্দীদের উপর গুলী-চালনার প্রতিবাদ জানাতে জনসমুদ্র সম্বোধন করে দাঁড়িয়েছিলেন এসে মনুমেন্টের নীচে। ত্যাগ করেছিলেন খেতাব জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যার প্রতিবাদে। লক্ষ বুকে সাড়া তুলবার মতো তেমনি কণ্ঠ আজ বাংলার নেই। আমরা বহুকণ্ঠ চয়ন করে তাই বলাকার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ধরে দিলাম। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি সমস্যায় কেউ নির্বিকার থাকবেন না। বিকার অর্থে যদি হাত-পা ছোঁড়া আর প্রলাপ বকা হয়—তাও সই। বিকার রোগের প্রাবল্য লক্ষণ। মানুষকে অবহিত করে বিপদ সম্বন্ধে।

'বলাকা'—ফাল্গুন, ১৩৬২

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কবি-সম্মেলন

২৫শে জানুয়ারীর রাত্রিতে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর দিল্লী কেন্দ্র থেকে একটি বিশেষ কবিসম্মেলন প্রচার করা হয়। সেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে এসে ভারতের বিভিন্ন ভাষার চৌদ্দজন কবি যোগ দেন এবং নিজের নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। যতই আগ্রহ করে এ অনুষ্ঠান শুনতে বসা যাক, অর্থ না বুঝতে পারলে রস গ্রহণ করা সম্ভব নয় আর রসগ্রহণ না করতে পারলে এ সব অনুষ্ঠানের কাছে বসা প্রায় অর্থহীন। কিন্তু প্রায়, একেবারে নয়। সংস্কৃত বা উর্দ্দু তাদের শব্দের লালিত্যে এবং ছন্দের মাধুর্য্যে এমন একটা আবেদন রেখে যায় যেখানে অর্থ না বোঝায় একটু বঞ্চিত হলেও—আনন্দ পাওয়া বাদ থাকে না। আর সে আশা নিয়েই এসে বসা গেল। কিন্তু দেখলাম বেশীর ভাগ ভাষাই সে সৌভাগ্য বঞ্চিত। অর্থ না বুঝতে পারলে শুধু ছন্দে লালিত্যে মন স্পর্শ করতে পারার ক্ষমতা তাদের নেই এবং বেশীর ভাগ ভাষাই আনাড়ীর কাছে দস্তুর মতো পীড়াদায়ক। কবিদের আবৃত্তির ভঙ্গিতেও নানা দেশের নানা চেহারা। এটা খুবই স্বাভাবিক। এবং অনভ্যস্ত কানে ভালো না লাগতে পারে। রস গ্রহণের ক্ষেত্রেও সংস্কার তার কাজ বন্ধ রাখে না। কয়লা ধুলেই যেমন ময়লা যায় না, সংস্কারেরও সেই অবস্থা। তার উন্নতি নেই। তাই কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছিলাম না। কবিদের কণ্ঠ ও প্রায় কারুই আবৃত্তি উপযোগী নয়। একমাত্র পাঞ্জাবী মহিলা শ্রীমতী অমৃত প্রীতমের আবৃত্তিটি আমাদের ভালো লেগেছে। ভাষাটিও মিষ্টি। উর্দ্দুর গান গাওয়া সুর ভালো লাগেনি। গান যেমন কবিতা হয়ে উঠলে ভালো লাগেনা, কবিতাও তেমনি গান হয়ে উঠলে খারাপ লাগে। কন্নাদের শ্রীডি, আর, বেন্দ্রের চিৎকার আর হুঙ্কার অসহ্য লেগেছে। বাংলা পড়েছিলো বারটি ভাষার পর, সেটা না শুনে ওঠা যায়না বলেই বসে থাকতে হলো। শুনতে হলো বসে চৌদ্দ ভাষার কবিতা আর তার চৌদ্দ দফা হিন্দি অনুবাদ। বিশেষ করে বিস্মিত হলাম কবিদের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন দেখে। সব কবিতায় ছাব্বিশে জানুয়ারীর আবেগ, সাম্য, মৈত্র, স্বাধীনতার বুলি; এমন দেশটি কোথাও খুঁজে না পাওয়া ভাবাবেশের বর্ণনার ছড়াছড়ি আর বাপুজী, নেহেরুজীর স্তুতি—ব্যাপার কি। কবি সম্মেলনে কবিদের উপর আদেশ ছিল নাকি এ সব লিখবার বা এগুলোকেই মাত্র বিষয়বস্তু করবার। নইলে সবাই কি করে এক অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হলেন। কিন্তু এমন আদেশ কি সম্ভব? সম্ভব নয়। সরকারের সহযোগিতায় শিল্প-সাহিত্যের এই চেহারাই ধরে। বাংলার জন্যে উৎকণ্ঠায় উঠলাম উদ্‌গ্রীব হয়ে— সেও কি এই করেছে! না, সমস্ত শরীরে আনন্দধারা বইয়ে দিয়ে বাংলার কবিকণ্ঠ বলে উঠলেন— 'আমার কবিতায় সাম্য, মৈত্র, স্বাধীনতা নেই, নেই ছাব্বিশে জানুয়ারী। আমার কবিতা নিছকই একটি কবিতা—' শ্রীবুদ্ধদেব বোস তার নিচু কিন্তু সুরেলা কণ্ঠে পড়ে গেলেন। কেবল মনে হতে লাগল অপূর্ব্ব। এর বুঝি তুলনা হয়না। দুঃখ, কবিতাটি তুলে দিতে পারলাম না। একবার শুনে শ্রুতিতে ধরে রাখতে পারার কথা নয়। কাগজ কলম ত ছিল না হাতের কাছে। এখন সে জন্যে হচ্ছে অনুতাপ। শুধু মনে আছে ঘুরেফিরে বারংবার আবৃত্ত একটি পংক্তি 'তোমায় আমি সঁপে এলাম ঈশ্বরের হাতে।' বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য গায়ের জোরে উল্টে ফেলবার মতো হালকা নয়। বেছে বেছে অযোগ্য লোক নিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্র আয়ত্বে রাখলেও বাংলার শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্র তাদের আয়ত্বের বাইরে।

মহাভাগ্য— মহাভাগ্য। রাজস্থান টাকা গনুক, বিহার উত্তর প্রদেশ আসীন থাক রাজগদিতে, সামরিক ক্ষেত্র দখল করে যাক শিখ মারাঠা। বাংলা বাজাক বাঁশী, গাক গান, লিখুক মহাকাব্য আর কালজয়ী সাহিত্য। মগ্ন থাক, শিল্পের সাধনায়। তার এ ক্ষেত্রটিতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মিললে আর কোনো লাভ নেই তার। সে তোমাদের রাজসূয় যজ্ঞে গিয়ে গদিতে নয় বসবে কবির আসনটিতে। যখন দেখবে হিংসা, স্বার্থপরতা, লোভ— পদলোভ, অর্থলোভ, ক্ষমতালোভ নানা দিক থেকে তোমাদের গ্রাস করেছে তখন উদাত্ত কণ্ঠে এমনিভাবে ঈশ্বরের হাতে তোমাদের সঁপে দিয়ে গেয়ে আসবে 'তোমায় আমি সঁপে এলাম ঈশ্বরের হাতে।'

'বলাকা'- মাঘ, ১৩৬২

পত্রিকা জগতে মেয়েদের কাজ

আজ কাগজ বের করবার সময় পত্রিকা জগতে মেয়েদের শত বছরের কাজের একটা সালতামামি করে নিচ্ছি।

পূর্বসূরীদের উদ্দেশে কিছু বলতে গেলে তাঁদের সাধিত কাজকে দান বলাটাই রীতি। এ ক্ষেত্রেও 'পত্রিকাজগতে মেয়েদের দান'— এ নামটাই বোধহয় হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু আমি দানের পরিবর্তে কাজ শব্দ ব্যবহার করেছি। কেন করেছি, সেটাই প্রথমে একটু বলে নি। যদিও প্রতিটি ছোটোবড়ো কাজের পেছনে কিছু না কিছু দান থাকেই— তবুও দান আর কাজ এক নয়। যে যুগান্তকারী চিন্তার দ্বারা, যে দুর্নিরীক্ষ্য দূরদর্শিতার দ্বারা এবং যে বলিষ্ঠ পরিচালন শক্তির দ্বারা লোককে চালনা করা বা লোকের চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়— অর্থাৎ যে যে শক্তির দ্বারা দান করা সম্ভব, তা নিছক সদিচ্ছার জোরে অর্জন করা যায় না। তার মূলে থাকা চাই প্রতিভা— যে বস্তু প্রসাদগুণে না মিললে মাথা-কপাল কুটেও মেলান যায় না।

আর যদি প্রতিভার মত অত বড় অর্থে দান শব্দটি ব্যবহার না করে তাকে খাপিয়েও আনা যায়, তবু যে কোনো দানের জন্যে সব আগে চাই নিজ ভাণ্ডারের পরিপূর্ণ সঞ্চয়। সেটাও কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। তাই ইচ্ছে করলেও আমরা দান করতে পারিনে। কিন্তু ইচ্ছে করলে আমরা কাজ করতে পারি এবং প্রত্যেক কাজের পেছনে যে দান থাকে, তার সাহায্যে 'প্রকাণ্ড-কাণ্ড' কিছু করে যেতে না পারলেও অনেক কল্যাণ কাজ করে যেতে পারি। বিশেষ করে মানসিক এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রগুলিতে তো অবশ্যই। তার কারণ আমাদের স্নায়ু যেমন কোনো আকস্মিকতাকে সহজে গ্রহণ করে উঠতে পারে না, আমাদের মানসিক কাঠামোটাও ঠিক তেমনি— কোনো পরিবর্ত্তনকেই সে কোনোমতে আচমকা গ্রহণ করে উঠতে পারে না। দীর্ঘ সময় ছেড়ে দিতে হয় মনকে শুধু তার প্রস্তুত হয়ে নেবার জন্যে। কাগজের সব প্রয়োজন—সব মূল্যও এখানে। মনকে তার এই মন্থর পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গড়ে তুলবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো পত্র-পত্রিকা। তাই পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে কাজ যাঁরা করে গেছেন এবং যাচ্ছেন— দান করার শক্তি তাঁদের থাক আর নাই থাক, বৃহৎকাণ্ড তাঁরা কিছু করে যেতে পারুন, আর নাই পারুন, মনের মাটিকে তাঁরা যে তৈরী করে যেতে থাকেন, সেটাই তাদের শ্রেষ্ঠতম কাজ। এই মন তৈরীর কাজটুকু কর্মী হিসাবে আগেভাগে সেরে না রাখলে বড়ো বড়ো প্রতিভাকেও থেমে থাকতে হয় তাঁদের বড়ো বড়ো দান হাতে নিয়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ আইন-সিদ্ধ করে নারীজীবনকে এক বিরাট বঞ্চনা থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পেরেছিলেন কী ? আইনসিদ্ধ বিধবাবিবাহ যুগ পার করে দিলো নথীপত্রের আড়ালে ঘুমিয়ে। শুধু দিলেই হয় না, গ্রহীতারও গ্রহণ করার শক্তি থাকা চাই। মানুষ না জাগলে চেতনাসম্পন্ন আইনকেও যুগ পার করতে হয় ঐ অমনি ঘুমিয়েই। এ কথা আজ থেকে নব্বই বছর আগে যে মহিলারা সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন, তাঁদের সেই অনুভব যে কি বিস্ময়কর ছিল তা আমরা আজকের দিনে হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারব না। তখনও সতীদাহের ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশ তার গা থেকে মুছে উঠতে পারেনি, নারী তখনও পুণ্যের লোভে সন্তান ভাসিয়ে আসছে সাগরে, পুরুষ তার শিক্ষা-প্রদীপের আলোয় আপন পথটুকু চলে ঘরে ঢুকবার আগে ফুঁ দিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিয়ে ঘরে এসে বসেছে অন্ধকার দেশের বাদশা হয়ে। সেই সময়, সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবার দিশারী হিসেবে যে সব মেয়েদের পত্রিকা বের করবার কথা প্রথম মনে এসেছিলো এবং যাঁরা কাগজ দিয়ে মেয়েদের মন তৈরীর পথ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সে কাজের মূল্য কোনো বড় দানের

চাইতে কম নয়। এই আলোর দরজা যখন মেয়েদের সামনে প্রথম খোলা হলো, যখন মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গমহিলা' নামে প্রথম মহিলা কাগজ বের করলেন তখন নারী পরিচালিত প্রথম পত্রিকাটি পুরুষ পরিচালিত কাগজের কাছ থেকে কি লাভ করলো? শুধু কি অভিনন্দন আর আশীর্বাদ? না, সঙ্গে সঙ্গে লাভ করলো উপদেশও।

পত্রিকাটি সমালোচনা করতে গিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লিখলেন— "স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদ-পত্র এদেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্তভাবে প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেরূপ পাইবে।"

এই রূপ কিরূপ?

'বঙ্গমহিলা'র সম্পাদকীয় থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলেই সেটা বোঝা যাবে। সম্পাদিকা তাঁর প্রথম সম্পাদকীয় মন্তব্যে কাগজের উদ্দেশ্য, আদর্শ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন— "বঙ্গমহিলারা যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাধীনাতা জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত বলিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি না। কে বলে বঙ্গমহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধ আছে? তাহারা কি আপন ইচ্ছামত ধর্মকর্ম করিতে পারে না? ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হয় না? আত্মীয় স্বজনের বাটিতে কি গমনাগমন করিতে পারে না? শিক্ষাভাব এ দেশের স্ত্রীলোকের একটি বিশেষ অভাব। তাদের উচ্চশিক্ষা লাভ হউক, ইহাই আমার দাবী।"

সম্পাদিকা যদি ইচ্ছানুসারে অশনবসন প্রাপ্ত হওয়াকে এবং আত্মীয়-স্বজনের বাটিতে গমনাগমন করতে পারাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা না বলে তৎকালীন সমাজের পক্ষে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে দাবী করে বসতেন, বিবাহিত জীবনে সমান অধিকার, অর্থের উত্তরাধিকার: দাবী তুলতেন বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের, তবে তার মস্তকচ্ছেদের সঙ্গে পত্রিকার মূলোচ্ছেদ ঘটতে বিলম্ব হ'তো না—আশীর্বাদ লাভ তো দূরের কথা। তাঁরা সেদিন এ দাবী নিয়ে হাজির হননি, তাঁরা নিজেরাও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা এসেছিলেন শিক্ষার দাবী নিয়ে। ঊনবিংশ শতকের নারী-পরিচালিত পত্রিকার তথ্য থেকে এটুকু অনায়াসেই বলা যায়, সবারই মূল দাবী ছিলো, স্বাধীনতা নয়, স্বাধিকার নয়, উত্তরাধিকার নয়—শিক্ষা লাভ। জীবন উত্তরণের প্রথম সোপান। পর পর কাগজ বের করে চললেন তাঁরা নানা নামে—অনাথিনী, আহ্লাদিনী, সোহাগিনী, বিরহিণী, হিন্দুললনা ইত্যাদি। কিছু সংখ্যক মহিলার যুগ্ম-সম্পাদনায় বের হলো সাপ্তাহিক পত্রিকা পর্যন্ত। এলো ভারতী। ভারতী পত্রিকা-জগতের একটি খ্যাত নাম। তার খ্যাতি, গৌরব প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের হলেও স্বর্ণকুমারী দেবী এবং তাঁর কন্যা সরলা দেবী অতি দক্ষতার সঙ্গে ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করে যান। রবীন্দ্রনাথের পরিচালিত কাগজ হাতে নিয়ে তার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে পরিচালনা করার শক্তিও সহজ শক্তি নয়। পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে অতখানি কর্মদক্ষতার পরিচয়ও নারী দিয়ে গেছেন ভারতীর মাধ্যমে। শুধু তাই নয়—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আনন্দ সঙ্গীত' পত্রিকাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবসর গ্রহণের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে প্রতিভা দেবী এবং ইন্দিরা দেবী সেই সঙ্গীত পত্রিকাটি পুনঃপ্রচার করে এমন দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন যে তার সামমানের সঙ্গীত পত্রিকা এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় আর একখানা প্রকাশিত হয়নি।

এই হলো ঊনবিংশ শতকের মহিলা সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার মোটামুটি তালিকা। যদিও তাঁরা নারীর শিক্ষার দাবী নিয়েই সরব হয়েছিলেন কিন্তু তা-ও হয়েছিলেন পুরুষের মন-মর্জির মুখ চেয়ে, রয়েসয়ে— যেন কিছুটা আবদারের ভঙ্গীতে। তাঁদের নির্বাচিত নামগুলিও তাই বলে। আদরিণী, সোহাগিনী কার? বিরহের বারি বর্ষণ কার জন্যে? কিন্তু তাঁদের ঊনবিংশ শতকের চাওয়া শিক্ষা যখন বিংশ শতকে পাওয়ায় পৌঁছলো, তখন তাঁরা কেউ আর সোহাগিনী, আহ্লাদিনী, আর্দরিণী রইলেন না। তখন তাঁরা হলেন, ভারতী, ভারত মহিলা, জাহ্নবী, জয়শ্রী। তাঁরা তখন শুধু অন্তঃপুরিকা নন, তাঁরা হলেন ঘরে-বাইরে।

আজ বিংশ শতকে পুরুষ-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা এত সমানতালে বেড়ে গেছে যে, তাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া তো দূরের কথা, নামোল্লেখের জন্যেও বহু পরিসরের

দরকার। সেই তালিকা দাখিলের ভেতর প্রবেশ না করে অনায়াসে বলা যায়—১৮৭০ থেকে ১৯৭৩ সনের এই শত বছরের সাধনায়, নিষ্ঠায়, একাগ্রতায় মেয়েরা পত্র-জগতে তাঁদের যে কর্মশক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন—তা পুরুষের চাইতে কিছুমাত্র ন্যূন নয়। আজ পুরুষ এবং নারী সম্পাদিত সাময়িক-পত্রে উৎকর্ষগত কোনো পার্থক্য নেই। হয়তো অনেকেই এ-কথা স্বীকার করিতে চাইবে না। তাঁরা বলবেন, কোথায় মেয়েদের দ্বারা সম্পাদিত একখানাও ভালো কাগজ দেখাও দেখি? উত্তরে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে, না নেই। কিন্তু পুরুষচালিত উচ্চমানের সাময়িকপত্রই কি আজ আছে? পুরুষ অর্থ এবং প্রতিপত্তির জোরে কাগজের ব্যবসা চালাচ্ছে, তারা অর্থের জোরে লেখা কিনছে,— সাহিত্যের নয়, তার পত্রিকা-ব্যবসার উন্নতিসাধন করেছে। অপর দিকে আমাদের দেশের মেয়েরা এখন পর্যন্তও যখন কাগজ করতে নামে তখন আর যে জন্যই নামুক, ব্যবসা করার জন্য বা কিছু অর্থ উপায়ের জন্য নামে না। উপরন্তু তারা থাকে নিতান্ত অর্থবলহীন প্রতিপত্তিহীন। তার হাতে পার্টি নেই। পলিটিক্স নেই — সরকার নেই। ব্যবসা নেই, বাণিজ্য নেই, বিজ্ঞাপনদাতা নেই।—এককথায় কাগজের ক্ষেত্রে এখনও সমান মাটিতে দাঁড়িয়ে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারছে না। বাইরের জগতটা তাদের আয়ত্তের ভেতর নয় বলে। তাই বিভিন্ন কর্ম আর সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারী আজ পুরুষের সমসঙ্গী। একমাত্র দৈনিক সংবাদ জগৎ আর পত্র পত্রিকা জগৎ বলতে গেলে আজও প্রায় নারীবিহীন। সর্বক্ষেত্রে নারী যেমন বাধা-বিপত্তি ঠেলে এগিয়ে তার স্থান করে নিয়েছে এ ক্ষেত্রেও তার স্থান তেমনি করেই একদিন মেয়েরা জয় করে নেবে— এ ঠিক। কিন্তু যে কোনো নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে আজও মেয়েদের বাধার পাহাড় ঠেলে এগুতে হবে কেন? এখানে মেয়েদের কাজ করার মতো প্রচুর ক্ষেত্র পড়ে আছে।

'বলাকা'—আষাঢ়, ১৩৮০

তলবী মেয়ে

বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় ইদানিং কিছু নিশ্চুপ নির্জীব ইংল্যাণ্ড - ল্যাম্বটন-জেলিকো-কলগার্ল এই তিন নিয়ে সংবাদের আসর বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। ঐশ্বর্যময় রাজসিক অ্যাপারটমেন্ট সেকস্-ড্রাগ-কলগার্ল; নায়ক মহান দুই মন্ত্রী : সংবাদ-বিদ্বেষীদের চোখও বেদানার দানার রঙ ধরে জিজ্ঞাসায় 'টইটম্বুর' হয়ে উঠেছিলো— শুনে বুকে দোলা তুলেছিলো।...কলগার্ল.....রূপ......লাস্য......নৃত্য.....সেকস্.....মদ ড্রাগ.....আরো কত কি..... কিন্তু হায়!

দীর্ঘশ্বাস!

কিন্তু সাধারণ মানুষের দীর্ঘশ্বাস বাজে জিনিস।

দু কানের কাছে দিনরাত সমানেই পড়ছে।

যাদের তেলনুন নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়, এ তাদের বাড়াবাড়ি। রসের ক্ষেত্রে হলেও মানতে রাজী নই। তবে 'আঙ্গুর ফল টক' জাতীয় সংবাদ দিয়ে তাদের অসূয়াবৃত্তিকে ঈষৎ তৃপ্ত বোধ করতে পারি। কলগার্লদের নিয়ে কেলেঙ্কারে লিপ্ত থাকার ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ার পর ল্যাম্বটন জেলিকোর পদচ্যুতি ঘটে গেছে।....

কিন্তু বিষয়টা তরলতা করার নয়।

তবে অতি দুঃখে মানুষ এক এক সময় হেসে থাকে।

ল্যাম্বটন জেলিকো ইংল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। প্রতিরক্ষা দেশের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। কলগার্ল নিয়ে রাত কাটাবার মতো হাল্কা চরিত্র সে কাজের উপযুক্ত নয়। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হীথ তাদের সরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্য কথা হলো, ইংল্যাণ্ডের সমাজ মন্ত্রীদ্বয়ের কেলেঙ্কারিকে গর্হিত কাজ মনে করছে না। তারা মন্ত্রীদ্বয়ের অনুকূলে!

কিন্তু বেশীদিন আগের কথা নয়, এই একইজাতীয় ঘটনা ঘটেছিলো ইংল্যাণ্ডে প্রফিউম আর কলগার্ল-কিলারকে নিয়ে। তখন এই ইংল্যাণ্ডের সমাজে যে ঝড় উঠেছিলো, যে ধিক্কার তুলেছিলো তাতে প্রফিউমকে বস্তি সেবায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। এখনও তিনি সে কাজই করছেন।

প্রফিউমর ঘটনার পর যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়েছে সময়ের বিচারে তা এক পলকও বলা যায় না। কিন্তু তারই ভেতর ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তাকে অভাবিত বলা চলে। সেক্স-ড্রাগ-কলগার্ল সমাজ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে। দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, পরিবেশ দিনে দিনে পঙ্কে ডুবছে তবু সমাজচিত্তে বিচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে না! অধঃপাতের গতি বড়োই তড়িৎ— বোধহয় তাই সময়র বিচারে এক পলকে রক্ষণশীল ইংল্যাণ্ডের সমাজ এতো নেমে আসছে! নেমে আসছে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ।

আর সেই অধঃপতনের পথে পাওয়ার জন্য কতোই না আয়োজন!

সেখানের কলেজ ইউনিভারসিটি থেকেই বাছাই করা মেয়েদের কলগার্ল হওয়ার ট্রেনিং দেওয়া হয়। কলগার্ল-এর কাজও শুরু হয় ঐ কলেজ জীবন থেকে। তারপরও কলগার্ল ট্রেনিং-এর বড়ো বড়ো জায়গা আছে পাশ্চাত্য দেশ ছড়িয়ে। কলগার্লদের কপটতা, চাতুর্য, কৌশল, ফন্দিফিকির, ছলাকলা অনেক কিছু শিখতে হয়। হাবভাগ চালচলন বাক্যসংযম (বোধহয় সংযমের ব্যাপারটা ঐ বাক্যেই তাদের আবদ্ধ থাকে) জানতে হয়। কিন্তু পড়াশুনাও করতে হয় ইন্‌টেলেকচ্যুয়েল কথা বলার জন্য; কারণ তাদের প্রধানতঃ দেশ বা বিদেশের প্রধানদের ড্রাগ ও সেকসের সাহায্যে, দৈহিক সঙ্গদানের সঙ্গে দিতে হয় ইনটেলেকচ্যুয়েল সঙ্গও। দেহমনে সঙ্গী হয়ে ওরা দেশবিদেশের প্রধানদের অপ্রকাশ্য গোপনীয় সংবাদ টেনে বের করে থাকে।

কলগার্লবৃত্তি কলেজ জীবন থেকে শুরু করে তারপর ছড়িয়ে পড়ে তারা কর্মের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। ভালো চাকরী করে, শিক্ষকতা করে আর করে তলবী মেয়ের কাজ। প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতি যখন কলগার্লদের এতো

লক্ষ্য এবং কলেজ এবং নানা ট্রেনিং সেন্টার থেকে যখন এদের তৈরী করা হয়, তখন এর পেছনে রাজনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

ল্যাম্বটনের উক্তি ঃ সমাজের দশজন যে চরিত্রের হবেন মন্ত্রীরা তার উর্দ্ধে যেতে পারে না। এই নির্বোধ উক্তি নিয়ে যুক্তি দিতে বসার প্রবৃত্তি নেই। জনসাধারণের উর্দ্ধে থাকার অধিকারী না হলে জনসাধারণ হয়ে থাকাই উচিত, চালক নয়, এ কথা বলেও কোন লাভ নেই। রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র আর প্রবৃত্তির পরিবর্তন প্রবচন দ্বারা করা যায় না। আবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

রাজনীতির কথা তাই ছেড়ে দি। রাজনীতি জটিল ব্যাপার। তার চাইতেও জটিল ব্যাপার রাজনৈতিক গুপ্তচরদের ক্রিয়াকর্ম; এর ভেতর যখন আবার নারী সর্ব অপবিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে এস্পিয়োনাজের কাজে নামে সে খেলার চেহারা বড়ো মারাত্মক!! সেখানে প্রবেশের সাহস রাখিনে। তাই ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকগণ পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও মারফৎ ল্যাম্বটন-জেলিকো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যাণ্ডের বর্ত্তমান সমাজ-জীবনে যে চিত্র নির্দ্ধিধায় তুলে ধরছেন, তা নিয়েই আলোচনা করা যাক। আশা করি— এই আলোচনাকে কেউ সাতসমুদ্র, তেরনদীপারের কথা নিয়ে অনর্থক মাথা ঘোলা করা বলবেন না। পশ্চিম আজ পূবের উলটো দিক নয়। পাশাপাশি গায় গায়। পূবের সূর্য কবে আবার পূবে উঠবে জানিনে। তবে ডুবছে পশ্চিমের গলা জড়িয়ে ধরে। খুব বেশীদিনের কথা নয় যখন ইংল্যাণ্ড আফিং খাইয়ে চীনের মস্তিষ্ককে ঝিমিয়ে রাখতো। আজ সে নিজেই নিজের হাতে সেই বিষ গিলছে। তাদের এই বিষপানকে পূর্ব দুষ্কৃতিরই বুমেরাং বলা যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের?

উপহার। 'পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সব আনে উপহার, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'র উপহার! ড্রাগ-সেকস-সিকিউরিটি পারমিসিভ সমাজ সব— সব কিছুই পশ্চিমের প্রণয়-মিলনের উপহারের হীরের আংটি! জহরে ভরা। গিললে কি মরলে।

কিন্তু প্রণয়ের ব্যাপার?

সে যে বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার!

বাধা দিতে গেলে, বন্ধ করতে গেলে মাথায় লাঠি পড়বে যে!

আজকাল দেশপ্রধানদের দেখছি সর্ব জায়গায় 'মিত্রতা কী যাত্রা।'

এই মিত্রতায় আমরা ফুটো ধরাতে চাই না। দুদিন আগে হোক পরে হোক মানুষ মরেই। দেশও বেঁচে থাকে না। স্তূপের তলায় চাপা পড়ে গেছে কত কত সভ্য কৃষ্টিময় দেশ। নিজেদের মরণ তারা নিজেরা ডেকে এনেছিলো; মরে ছিলো। তারপর সময় মাটির-স্তর ফেলে স্তূপে পরিণত করেছে, না প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের চাপা দিয়েছে মাটির তলায়—সেটা ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। কিন্তু মানুষ যেমন মরে দেশও মরে।

তাই মৃত্যু নিয়ে ভাবিত নই— না মানুষের। না দেশের।

কিন্তু মিত্রতা চাই-ই! গরল গলাধঃকরণ করে হলেও। প্রণয় যে মধুর জিনিষ! সঙ্গে গরল থাকলেও।

আমাদের বাসনা শুধু যাদের কাজের জন্য ট্রেনিং-এর এতো আয়োজন, এতো উত্তম উপকরণ; এবং বৃটিশ সমাজজীবন যেটাকে নিয়ে বলছে কলগার্ল হয়ে অর্থ রোজগার করার অধিকার মেয়েদের আছে সেই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা এবং কলগার্লদের পেছন পেছন গেলে কোথায় গিয়ে পৌঁছাই সেটা দেখা।

সেক্স, ড্রাগ, সিকিউরিটি, কলগার্ল, পারমিসিভ্ সমাজ কথাগুলো সদ্য আমদানি শব্দ। কিছুদিন আগেও এ কথাগুলির সঙ্গে বেশীরভাগ মানুষের পরিচয় ছিলো না। এখনও সম্যক পরিচয় ঘটেনি।

কলগার্লদের যে কর্মপদ্ধতি জানা গেলো তাতে এ নামের ভাবার্থ বোঝা গেলো, যে মেয়েদের ডাকলেই দৈহিক সঙ্গ-দানের জন্য পাওয়া যায় তারাই কলগার্ল। বাংলায় বলা চলে 'তলবী মেয়ে।'

দৈহিক সঙ্গ যে মেয়েরা দেয় তাদের তো জানতাম বলে বারবণিতা। হঠাৎ নবনামকরণ প্রয়োজন হলো কেন? কিন্তু যখন হয়েছে তখন নিশ্চয়ই বারবণিতা আর তলবী মেয়ের ভেতর কিছু অর্থের পার্থক্য রয়েছে।

সেটা কি কলগার্লদের শিক্ষা, শিক্ষকতা, পদস্থ চাকরী ইত্যাদির জন্য বারবনিতাদের থেকে আলাদা নাম দিয়ে একটা ফলস্ রেস্পেক্টেবিলিটি (!) আরোপ করা?

না আরো কিছু গভীর তাৎপর্য বহন করছে এই নতুন নাম?

এ কথা বুঝতে হলে অনেক গভীর জলে ডুব দিতে হয়।

কিন্তু আজকাল যে কোন ব্যাপারের গভীরে তলিয়ে দেখতে গেলে এমন সব বিস্ময়, ভয়, হতভম্ব হয়ে পড়ার মতো ব্যাপার দেখা যায় যে, আতঙ্ক হয় কোন কিছুর ভেতর ঢুকতে!

তাই ভেসে থাকাই ভালো।

কিন্তু ভেসে থাকলে বা কাকের মতো চোখ বুজে থাকলে লাভ শুধু এটুকু -- নিজেরা জানলাম না। নিজেদের ধমনী সুস্থ রাখলাম।

কিন্তু আত্মরক্ষা সর্বরক্ষা নয়। তাই কলগার্লদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিকটা ছেড়ে দিয়ে সমাজজীবনের দিকটাই দেখি।

যে নামেই ডাকা যাক গোলাপ যেমন তার রূপ গন্ধ নিয়ে গোলাপই তেমনি নাম যাই দেওয়া যাক যে বৃত্তির যে চেহারা তা অপরিবর্তিতই থাকে। তফাতও বড়ো গোলাপ ছোটো গোলাপ জাতীয়। কলগার্ল বড়ো দরের। বারবনিতা ছোট দরের। অবশ্যি ছোটোদরের কলগার্ল আছে। তারা রাজনৈতিক বিষশূন্য। তলব করলে দেহ নিয়ে উপস্থিত হয়। বিনিময়ে টাকা নিয়ে চলে যায়। এরা নির্বিষ।

তা বিষাক্ত হোক আর বিষশূন্যই হোক তলবী মেয়ের বৃত্তি ইংল্যাণ্ডের সমাজ মেনে নিয়েছে --- এ কথা আমরা ইংল্যাণ্ডের সংবাদদাতাদের কাছ থেকে জেনেছি। আরো জেনেছি বৃটিশ সমাজ বলছে 'তলবী মেয়ের কাজ করে অর্থ রোজগার করার অধিকার মেয়েদের আছে।'

এবার তা হলে আমারা বিনাদ্বিধায় বলতে পারি তবে ইংলণ্ডকে পিতৃতন্ত্র বদলে ফেলে মাতৃতন্ত্রে চলে যাওয়া উচিত। যে যুগ পর্যন্ত নারীপুরুষ নির্বাধ সেক্স জীবনে বাস করেছে সে পর্যন্ত মাতৃতন্ত্রই চালাতে হয়েছে। মাতৃত্ব নিশ্চিত। মাকে দশমাস দেহে বহন করতে হয় সন্তানকে। তারপর জন্ম দিতে হয়। তারপরও নাড়ী কেটে সন্তানকে আলাদা করতে হয়। কে মা সেটা প্রশ্নের বাইরে। কিন্তু পিতৃত্ব সব সময়ই সম্ভাবনা। সে যুগে নারী জানতোও না কোন সন্তান কার ঔরসে জন্মেছে। তার সন্তানের পিতৃত্বের দাবী নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে সে কার কাছে? দাঁড়ালেই বা পুরুষ সে কথা মানবে কেন।

তারা দাঁড়ায়ও নি।

নিজের কাঁধে বহন করছে সন্তানের দায়-দায়িত্ব।

কিন্তু কাজটা সুবহ নয়। তাই পিতৃত্বের শিকল পায় পরাবার জন্য নারী নিজেকে ঘরবন্দী করলো। সেবা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে বহির্মুখী পুরুষকে করলো ঘরমুখী। যেমন নিজেকে তেমনি পুরুষকেও করলো সে ঘরবন্দী। সুখের নীড়, স্নেহের নীড়, ভালোবাসার বাসা বানিয়ে নারী তার সন্তানের জন্য পিতৃপরিচয়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করলো। সেই বাঁধা ঘরেও পুরুষকে বেঁধে রাখতে হয় এখনও সেবা, স্নেহ, প্রেম, ধৈর্য্য দিয়েই। নইলে আজ পর্যন্তও পুরুষকে হারাতে হয়। হিন্দু কোড বিল হবার আগে তারা আবার বিয়ে করে বসতো। এখন করে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ ডাইভোর্স্। অত দূর অবধি যারা নাও যেতে পারে তারাও সুখ খোঁজে বাইরে।

বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে কতকগুলি মূলসত্য আছে। জল নীচের দিকে গড়ায়। গাছ শিকড় দিয়ে জল টানে। পাথরে বীজ ছড়ালে চারা বেরোয় না ইত্যাদি। তেমনি মানুষের প্রকৃতির ক্ষেত্রেও কতকগুলি মূলসত্য রয়েছে। শত আধুনিকীকরণেও সে প্রকৃতির বদল হয় না। আধুনিকতা হলো পোষাকের মতো। অনবরতই যার রূপ বদলাতে পারে---বদলায়ও। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির প্রধানতম মূলসত্য হলো যে ভালোবাসা, তার বদল নেই। চিরকাল মানুষ ভালোবাসার কাছে বিকিয়ে থাকে— থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু 'ভালোবাসি' বলে টানাছেঁড়া করা ভালোবাসা নয়। তার সুস্পষ্ট লক্ষণীয় দিক আছে। সমর্পণ, ত্যাগ ইত্যাদি বড়ো বড়ো কথা না হয় নাই এলো---কিন্তু উৎকণ্ঠা, আগ্রহ, ব্যাকুলতা এবং সানুরাগ মনযোগের সঙ্গে যত্ন থাকতেই হবে। থাকতেই হবে মহৎ এবং বড়ো দেখার ইচ্ছা। তবেই থাকে পুরুষ নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে।

যত আধুনিক মা-ই হন তাই তরুণী কন্যাকে এই শিক্ষাগুলিই দেন। নারীজীবনের শ্রেষ্ঠতম আর্ট যে গৃহকে সুন্দর করে গড়া, ভালোবাসা দিয়ে এটাই বলেন। যে মা আধুনিকতার পোষাকের অহমিকায় এই শিক্ষাগুলি কন্যাকে না দেন, তুচ্ছ করেন, তবে দুদিন আগেই হোক আর পরেই হোক সেই মাকে মেয়ের ভাঙ্গা ঘরের দিকে তাকিয়ে চোখের জলের মূল্য দিতে হয়।

ভীত নারী তাই তার কিশোরী কন্যাকে শৈশবের খেলা শেখায় ঘরকন্না। শেখান কত যত্নে সুন্দর-সংসার গড়ে তুলতে হয়। যৌবনে পড়লে মা তার সঙ্কোচকে 'বালাই' বলে ঠেলে ফেলে শিক্ষা দিতে বসেন স্বামীর অভিলাষ অভিরুচি কামনার কথা। তার সুখ কি। সে সুখী কিসে।

রমণীর এই সুদীর্ঘ যুগের সাধনায় তৈরী রম্যতা ভরা রমণীয় নাড়িটি কলগার্লবৃত্তি ডেকে এনে তছনছ করতে যদি চায় এ যুগের নারী—করুন। শুধু তাড়াতাড়ি না করে ভেবেচিন্তে করুন এটুকু বললে দোহাই আপনাদের অপরাধ নেবেন না ইনটেলেক্চুয়েল কলগার্লরা।

স্বৈরিণী হয়ে অর্থ উপায়ের অভিলাষ আপনাদের ?

বেশ।

কিন্তু তার আগে সন্তানের পরিচয় নিজের নামে নিয়ে আসতে পারবেন কিনা—এটাই ভেবে নিতে বলেছি শুধু।

তবেই কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট বাধবে না সংসারে।

নইলে কিন্তু বাধবে।

আপনি দশজনকে দেহ সমর্পণ করবেন আর পিতৃত্ব চাপাবেন স্বামীর ওপর এনে— এ কি হয় ? ইনটেলেকচুয়েলদের বিবেক বলে কিছু থাকে কিনা আমি সে সংবাদ ঠিক জানিনে অবশ্যি। তাই বিবেকের কথা ছেড়ে দি। কিন্তু মর্যাদা—না, এটাও বাড়তি কথা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের পক্ষে! সে যাই হোক একটা কিছু নিশ্চয়ই আপনাদেরও আছে যাতে স্বামীর ওপর এ বোঝা চাপাতে আপনারাও হয়তো (!) অপ্রতিভ বোধ করতে পারেন। আর সে বালাইও যদি না থাকে তবে আপনাদের দিকে ঠিকই আছে কিন্তু পুরুষ আর যাই মেনে নিক সন্তানের ক্ষেত্রে সন্দেহ বরদাস্ত করা তার সহন শক্তির বাইরে একথা জেনে রাখবেন।

মোঁপাসার একটি বিখ্যাত গল্প আছে এক কাউন্টেস সন্তানের জন্ম দিতে দিতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কাউন্টের এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ন্তর না পেয়ে একদিন বলে বসলেন, 'এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি তোমার নয়।'

কাউন্টেসের কথা শুনে কাউন্টের ঘুম গেলো। খাওয়া গেলো। ছেলেমেয়েদের কাছে এনে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। কখনো ভাবেন এটি আমার নয়। কখনো ভাবেন ওটি আমার নয়। নিশ্চয় হতে পারেন না। সব কটিকেই ঠেলে সরিয়ে দেন। মাথাটাই ক্ষেপে গেলো যেন। কাউন্টেসের কাছেও ঘেঁষেন না। কেবল স্ত্রীর পায়ের তলায় বসে কাকুতি করেন, 'কোনটি আমার নয় বলো, বলো, বলো।' কাউন্টেস নীরব। কাউন্টের ইচ্ছে করে গলা টিপে ধরেন স্ত্রীর। কিন্তু তাহলে যে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা জানার আশা!

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী। মাতৃ-আজ্ঞা-শিরধার্য-করা সমাজসম্মত বিয়ে। তবু এলোমেলো শৃঙ্খলাহীন ভাবে স্বামী-সঙ্গ লাভের বাসনা চরিতার্থ করার অধিকার ছিলো না, দস্তুরমতো নিয়মবন্ধনের মধ্য দিয়ে তাকে স্বামী সঙ্গ লাভ করতে হতো।

এর কারণ অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। সোজা কথা—উদ্দেশ্য পিতৃত্ব চিহ্নিত রাখা। দ্রৌপদীর স্বামী-সঙ্গ লাভের মধ্যে এই নিয়মবন্ধন না থাকলে অভিমন্যু অর্জুন পুত্র হতেন না; হতে পঞ্চপাণ্ডব পুত্র। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সম্মত হতে পারেন নি পাঁচমেশালো পিতা হতে!

'আমার' এ কথাটি নির্দ্বিধায় ভাবতে না পারা পর্যন্ত মানুষ ভালোবাসতে পারে না। এটা বুঝেই নারী নিজেকে ঘরবন্দী করে পুরুষকে তারই সন্তান প্রমাণ করে তবেই সন্তানকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আজ পুরুষের হৃদয়মনের পরিবর্তনও অবশ্যই ঘটে গেছে। সে আজ তার সন্তানকে ভালোবাসে। কিন্তু তবু পুরুষের সে ভালোবাসা এখনও সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালোবাসা তারই প্রতিফলন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসায় নারীর আকর্ষণের ব্যাপারটাই প্রধান। স্ত্রীর মৃত্যু হলে বর্তমান শয্যাসঙ্গিনী যে নারী হল তার সন্তানই বাপের কোল পায়। তাই কথায়-ই বলে 'মা মরলে বাপ তালুই।'

আদি যুগেও যেমন সন্তান সর্বতোভাবে মায়ের ছিলো, আজও তাই আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গেলেও মা তার সন্তান বুকে আঁকড়ে নিয়েই চলে আসে। ছেড়ে আসে না।

তাই বলছি, সন্তান যখন একান্তই মায়ের তখন কলগার্লবৃত্তি গ্রহণ করার আগে মাতৃতন্ত্রে চলে আসুন! উচিতও তাই। কলগার্ল বৃত্তি থাকবে আবার পিতৃপরিচয়ে সন্তান পরিচিত হবে — এ হয় না। তবে পিতৃত্ব ঘাড়ে চাপানোটা তলবী মেয়েদের প্রয়োজনমতো খুশিমতো হতে বাধ্য। এবং তার ভেতর শঠতা থাকতে পারে। প্রতারণা থাকতে পারে। ফাঁদে ফেলা থাকতে পারে। তলবী মেয়ের বৃত্তি সুপ্রবৃত্তির জিনিস নয়। তাদের কাজের পেছনে অভিসন্ধি থাকাটাই স্বাভাবিক।

ঘরোয়া জীবনে যে নিয়মবন্ধন চলতে পারে, মুক্ত জীবনে সে নিয়মবন্ধন চলতে পারে না। সমাজ পালটালে নিয়মও পালটাতে হয়। স্ব-ইচ্ছায় পাল্টাতে না চাইলেও আপন গতিতেই সে পালটাতে বাধ্য। অযথা দেরী করে সন্তানের একটা পিতার নামের জন্য ছোটাছুটি করে ঘরে বাইরে হুলস্থূল বাধানোর প্রয়োজন কি? সোজাসুজি মাতৃতন্ত্রে চলে যাওয়াই সুন্দর।

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের মেম্বার শ্রীমতী বার্নাডেট ডেভলিন সোজা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'সন্তান আমার। বাবার নাম বলবো না।'

আপনারাও তেমনি বলুন।

অন্তত এটা বলার সাহস আপনাদের থাকা উচিত। না হয় আরো একটু বড়ো করেই বললাম---- গাটস্।

এতো কথা কেবল ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনের দিকে তাকিয়ে বললাম, ভাববেন না কেউ। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবের' ঢেউ মদ ড্রাগ সেকস কলগার্ল ভারতের ভূমিকেও আছড়াচ্ছে। ফলস রেসপেকটেবিলিটির ইনটেলেকচ্যুয়েল মুখোশ পরাই হোক আর সাদামাঠা সাধারণ তলবী মেয়েই হোক--- উভয়কেই নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে; এখানেও কলগার্ল হয়ে রোজগার করার অধিকার থাকার' ঘোষণাও শোনা গেলো বলে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার উচ্চরোলে এমনিতেই দেশ, সমাজ, পরিবার অতিক্রম করে ব্যক্তি আজ দৈত্যের চেহারা নিয়েছে। সেই দৈত্যকে আবার মহাদানব করে তোলবার জন্য তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে 'পারমিসিভ্ সোসাইটি' নামে যা-খুশি; যা-তা খুশি করার নতুন অনুমোদন!

কিন্তু এ অনুমতি কি কেউ দেওয়ার অধিকার রাখে?

চুরি-ডাকাতি-খুন করার অধিকার দেওয়ার অধিকারী কে আছে পৃথিবীতে?

'পারমিসিভ সোসাইটি' কথাটির যে ব্যাখ্যা তা তো সমাজের বুকের উপর বসে প্রকাশ্যে যা তা যথেচ্ছাচার করার অনুমোদন দেওয়া! সে যে চুরি-ডাকাতির চাইতেও ভয়ঙ্কর। কে এমন ক্ষমতাধর আছেন যে এ অনুমোদন দিতে পারে?

তবু দিয়েছে!

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উঁচু গলায় বিনা দ্বিধায় বলতে শুনছি, 'ড্রাগ? সে তো ভালো জিনিস!'

ড্রাগ খেয়ে উন্মাদ হয়ে যাওয়া ছেলেকে তেতলার ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে বাপ মা কাঁদছেন বসে বসে -- এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর কানে আসছে তো অহরহ।

সেখানে নিজের দেশের বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যদি বলতে দেখা যায়, 'ড্রাগ ভালো জিনিস।' তবে তা যে অদৃশ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলা বুঝতে কষ্ট হয় না। শুধু মাথার ভেতর যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, অর্থের জন্য কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, অপরিণামদর্শিতা কতদূর যেতে পারে দেখে!

কিন্তু করার কিছু নেই।

রাষ্ট্র যেখানে দর্শক সেখানে ঘরে বসে কপাল চাপড়ানো ছাড়া কিছু করার নেই।

তরুণ তরুণী সমাজের প্রবৃত্তি-অভিলাসকে যদি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সুপরিকল্পিত ভাবে কুপথগামী করে তোলে তবে সেই যুবশক্তি আর বিশিষ্ট শক্তি মিলে যে মহাশক্তির সৃষ্টি হয় তা অপনয়ন দুঃসাধ্য। দানবের সঙ্গে সংগ্রামে দেবতাদেরও হেরে যেতে হয়েছে বারবার। তাঁদেরও রক্ষা করেছেন দেবাদিদেব বিষ্ণু।

'সম্ভাবামি যুগে যুগে'র প্রতীক্ষা আমাদেরও করতে হবে।

এখন আসন্ন বিপদের আশু সমাধানটা আসুন আমরা করে ফেলি সোজা মাতৃতন্ত্রে চলে গিয়ে।

তাতে নারী বাঁচবে পিতার নাম অন্বেষণের ব্যাপার থেকে।

পুরুষ বাঁচবে তার আত্মজ কিনা সে দ্বন্দ্ব সন্দেহ থেকে।

সন্তান রক্ষা পাবে একদিকে পিতামাতার টানাপড়েন থেকে, অপর দিকে সন্দেহের অতীত মাতৃত্বের নিশ্চিত কোল পেয়ে।

পিতৃত্বের দায় ইচ্ছে খুশি ঘাড়ে চাপাবার কারচুপিতে না ঢুকে এই গাট্স নিয়ে তারপর কাজে নামুন।

কলগার্ল বৃত্তি গ্রহণ করতে হলে মাতৃতন্ত্রে চলে যাওয়া ব্যতীত নান্য পন্থা বিদ্যতে।

'বলাকা' -- আষাঢ়, ১৩৮০

শারদ-সংখ্যা ও সাহিত্য

বিভিন্ন পত্রিকার পূজো-সংখ্যার বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে তারপর তা বেরিয়ে যাওয়ার সংবাদ পড়তে পড়তে কেমন যেন ধারণা হয়ে গিয়েছিলো, পূজো হয়ে গেছে!

আজকাল শারদীয়া-সংখ্যার ঢাকঢোল কাঁসি এতো আগের থেকে বাজতে আরম্ভ করে যে ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর হয়ে উঠেছে।

পণ্যদ্রব্যের মতো নিয়ন আলোর ব্যানারে ব্যানারে বিজ্ঞাপন—

সাহিত্যের সোব্রাইটি বজায় থাকছে কি?

'এঁরা আমাদের পূজো-সংখ্যায়েই কেবল উপন্যাস লিখছেন আর কোথাও নয়।'

অর্থাৎ মস্ত অঙ্কের টাকা দিয়ে এই সব লেখকদের আমরা কিনে নিয়েছি। মালিকপক্ষ এ সংবাদ প্রচার করেন অহংকার করে; সাহিত্যিকরাও তাঁদের এমন ভাবে বিক্রিত হওয়ায় বিজ্ঞাপনে অধোবদন তো হন-ই না বরং তাঁরাও স্ফীত হয়ে ওঠেন। তারপর মালিকপক্ষ আর সাহিত্যিকদের মিলিত আত্মপ্রসাদ-স্ফীত স্থূল চর্বিঠাসা দেহ নিয়ে পূজো-সংখ্যাগুলি এসে বাজারে আছড়ে পড়ে। তাদের বিরাট অহংকৃত বপুর তলায় ক্ষীণাঙ্গী শারদ-সংখ্যাগুলি চাপা পড়ে দমবন্ধ মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকে।

বড় বড় কাগজগুলো পূজোর সময় (সব সময়ই অবশ্যি!) কত লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন পায় তা আমাদের মাথায়ও আসে না। তবু পূজো-সংখ্যার দাম বাড়ানো হতে থাকে মাছের বাজারের মতো! তাতেও হয় না। তারপরও ক্রেতাদের মাসমাহিনা পকেটে আসার দিকে নজর রেখে কাগজ বাজারে আসে— তা মহালয়া আর পূজা ক্যালেণ্ডারের যে পাতায়ই থাক। কিন্তু পূজো-সংখ্যা প্রকাশিত হবার শ্রদ্ধেয় প্রথা এটাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো যে, মহালয়ার মাতৃ-আহ্বানের আগের দিন বা মহালয়ার দিন পূজা-অর্ঘের মতো কাগজ বেরুনো।

যাই হোক— পূজা-সংখ্যার বিজ্ঞাপনের অগ্রিম দাপটে দেবীচৌধুরাণীর হরবল্লভের 'মরেই তো গেছি, আর কৃষ্ণনাম করে কি হবের' মতো আমাদেরও মনে হচ্ছিলো; পূজো তো হয়ে গেছে; আর শারদীয়া-সংখ্যা বের হলো না! এক শুভার্থী আমাদের শরীর ঝাঁকিয়ে হতাশা ভেঙে দিয়ে বললেন, 'কি পাগলের মতো কথা বলছো' পূজো হয়ে গেছে?' ততোধিক বিস্ময়ে আমি বললাম, 'হয় নি?' তিনি বললেন, 'না, অনেক দেরি আছে পূজোর।' তবে তো একটা পূজা-সংখ্যা বের করতেই হয়। আমরা কাজে লেগে গেলাম।

আমাদের কাউকে কেনার ক্ষমতা নেই। কিন্তু অর্থ কেনার ক্ষমতাই আটকায়। দেখার ক্ষমতা নয়। সাহিত্যের হাটের বড়ো বড়ো মহাজনদের মহা কারবারের মধ্যে বসে তাই আমরা শুধু দেখি।

এবারের শারদ-সাহিত্য দেখার সৌভাগ্য হয় নি! কেনার মতো পয়সা নেই। এ পর্যন্ত কোথাও দেখতে পেলাম না। তাই শারদ-সাহিত্য থাক। সাধারণ সাহিত্য-জগৎটা একটু ঘোরা যাক।

এই ঘুরতে গেলে প্রথমেই যে অভিজ্ঞতা হবে তা হলো, সাহিত্যের উপাদান আজকাল একমাত্র সেকস্।

রবীন্দ্রনাথ কল্লোলযুগের প্রখ্যাত এক সাহিত্যিকের লেখা পড়ে তাঁকে লিখেছিলেন, 'ভারতের মানুষের জীবনে সেকস্ খুব বড়ো স্থান নিয়ে থাকে না। তোমরা সেটাকে এতো বড়ো করে তোল কেন?'

কেন সেকস্কে বড়ো করে তুলতেন কল্লোলযুগের লেখকরা তার মানে রবীন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারেন নি। হয়তো বড়ো কারণও তখন কিছু ছিলো না। তরুণ সাহিত্যিকদের তারুণ্যের চঞ্চলতার প্রকাশই হয়তো

ছিলো সেটা। তখনকারটা জানি--- এখনকার সাহিত্যিকদের সেকস্ সর্বস্ব লেখা সোজা কথায় বই কাটতির ব্যবসা। টাকা রোজগারের ব্যবসা। এ সত্যের উপর মাটিচাপা দেবার উপায় নেই।

শুধু এই হলেও বোধ হয় রক্ষা পাওয়ার পথ ছিলো। কিন্তু টাকা উপায়ের কারণ ছাড়াও এর পেছনে তরুণ সমাজের চরিত্রহননের যে সুনিপুণ ষড়যন্ত্র রয়েছে সেটাই ভয়ঙ্কর! এবং এই ভয়ঙ্কর কাজে তারা সিদ্ধকাম হয়েছেন; হচ্ছেন; যত করবেন ততই আরো সিদ্ধকাম হবেন। চরিত্রহননের এমন সহজ উপায় আর নেই।

বর্তমান প্রখ্যাত সাহিত্যিকরা সাহিত্যের হাঁটে বারবনিতালয় সাজিয়ে বসেছেন। কিন্তু সাহিত্যিক আর যাই করতে পারুন তাঁদের সৃষ্টিকে রক্ত-মাংসের শরীর দিতে পারে না। তাঁরা উন্মাদক লেখা দিয়ে প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করতে পারেন, উদ্দীপিত করতে পারেন, কিন্তু খাদ্য দিতে পারেন না। সাহিত্যিকদের হাতে জাগানো সেকসের ক্ষুধা তখন নানা ব্যভিচারের মধ্যে খাদ্য খোঁজে। পারমিসিভ সমাজ-জীবনের জন্য চিৎকার করে যথেচ্ছ প্রবৃত্তি উপভোগের জন্য।

কিন্তু সাহিত্যিকরা তাদের সেকস্‌সর্বস্ব লেখার জবাবদিহি করেন, যা দেখবো তাই লিখবো। এটা বাস্তব ধর্মীয় সাহিত্যের যুগ!'

যদি তাঁদের দায়িত্ব এড়ানো কথা মেনেও নেওয়া যায় যে তাঁদের লেখার জন্য এসব ঘটছে না, ঘটছে দেখেই তাঁরা লিখেছেন, তবু 'কি হচ্ছে' সেটাই বড়ো করে প্রচারের জন্য সাহিত্য নয়। 'কি হওয়া উচিত' সে কথাই সাহিত্যের বলবার কথা। রামায়ণ-মহাভারত তাঁদের কাব্যে নানা আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেই ভারতকে মহৎ করে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের হাতের সৃষ্ট চরিত্রে দানব অসুরের মধ্যেও দান, দয়া, ত্যাগ, ভক্তি থাকতো। কিন্তু বর্তমান সাহিত্যিকদের সৃষ্ট চরিত্রে মানুষের মধ্যে তা থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতো বড়ো সাহিত্যিক— এখন পর্যন্ত জন্মান নি। তাঁরাও মানুষকে বড়ো করার কাজই করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে ত্যাগ করে কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে সুখে ঘর করেন নি। স্ত্রীই স্বামীকে পেয়েছিলো। কুন্দনন্দিনী নয়। রবীন্দ্রনাথের হাতে কখনো কোন চরিত্রহীন চরিত্রই সৃষ্টি হয় নি। শরৎচন্দ্রের, জীবনানন্দের কোন দোষ না ছিলো? কিন্তু মদে আর চরিত্র-হীনতায় সুখ নেই, সুখ হলো সুন্দর সংসারে— মমতাময়ী স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে দেশের মানুষের কল্যাণচিন্তায়— জীবানন্দের জীবন এঁকে সেটাই তিনি দেখিয়েছেন। বর্তমান সাহিত্যিকের হাতে পড়লে বিন্দু আর নারায়ণী কিশোর অমূল্য আর রামের সঙ্গে প্রণয় খেলা খেলতে শুরু করে দিতো। তাঁরা লিখতেন কিশোর আর বয়স্ক-যুবতীর দৈহিক সম্পর্কের কামজ উপাখ্যান। এমন নারী আছে। একথা শরৎচন্দ্র জানতেন। আবার বিন্দু নারায়ণীও আছে। একথাও শরৎচন্দ্র জানতেন। দুইএরই উপস্থিতির মধ্য থেকে তিনি সুন্দরকেই বেছে নিয়েছেন। সুন্দরের প্রচার করেছেন। অসুন্দরের নয়।

সাহিত্যের সঙ্গে যখন 'সাধনা' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তখন বুঝতে হবে সাহিত্য কল্যাণ-চিন্তা-নির্ভর। সাহিত্যকে মানুষ নির্দ্বিধায় অন্দরে প্রবেশের যে ছাড়পত্র দিয়েছে তার কারণও সাহিত্য কল্যাণ-চিন্তা-নির্ভর বলেই। সে বড়ো হতে শেখায়; মহৎ হতে শেখায় বলেই। সমাজের এই আন্তরিক বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যারা সাহিত্যের নামে সেকস্ নিয়ে অন্দর মহলে গিয়ে প্রবেশ করেন তাঁদের কাজটা দাঁড়ায় ঠিক সাধুর বেশে দুর্বৃত্তের ঘরে প্রবেশের মতো। যে সাহিত্যিকরা এ কাজ করছেন তাঁরা সাহিত্যিক (!) হতে পারেন কিন্তু সাধক নন। তাদের ঋদ্ধি নেই। তস্কর আর তপস্বী দুজনেই গুহার অভ্যন্তরে বসে আপন আপন চিন্তা করেন। কিন্তু তস্করের চিন্তাকে 'সাধনা' বলে না। 'সাধনা' বলে তপস্বীর চিন্তাকে!

'সেকস্ সর্বস্ব বা অশ্লীল লেখা কাকে বলে?' জানি — রক্ত চোখ প্রশ্ন এসে পড়ার সম্ভাবনা আছে এর পর।

অশ্লীল বলে, কোনো উপলব্ধি-শূন্য, শুধু বর্ণনার জন্যই দৈহিক বা দৈহিক-সম্পর্ক বর্ণনা করে প্রবৃত্তিকে উত্তাল করবার জন্য, কাম জাগাবার জন্য যে লেখা হয় তাকে। চিকিৎসক আর শিল্পীর মতোই সাহিত্যিক প্রয়োজনে শ্লীল-অশ্লীল নির্বিচারে যতদূর যাবার যেতে পারেন নির্বাধায়, নির্দ্বিধায়। কিন্তু অপ্রয়োজনে ঘোমটাটুকুও খুলে দেবার নাম অশ্লীলতা।

আর সাহিত্যিক যখন পাঠকের সঙ্গে অশালীনতা আরম্ভ করেন তখন তাকে বলা যায় সিক্।

দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

নায়ক দিল্লি শহরে মিথ্যা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে লাঞ্ছিত হলেন। জেল খাটলে। জেলের মেয়াদ শেষে বাড়ি ফেরবার সময় ট্রেনেও নানা কাণ্ড দেখলেন; ফের নিজেও জড়িয়ে পড়লেন ইত্যাদি।....বাড়ি ফিরে নায়ক স্নান করতে গেলেন। স্নানের ঘরে নিরাবরণ হলেন। স্নান শেষে দেখলেন, পরবার কাপড়-চোপড় নিয়ে আসেন নি।...

কোনো প্রয়োজন ছিলো কি গল্পের জন্য এ অংশের?

নায়কের এই পরিচ্ছদত্যাগ আর পরার কাপড়জামা না নিয়ে আসার বর্ণনা—কার জন্য? নায়ক দেখছে না। নায়িকাও নয়। দেখছে লেখক আর পাঠক। এটা লেখক নিজে পাঠকের সঙ্গে অশ্লীলতায় লিপ্ত হচ্ছেন। এটা পারভারশন।

'বলাকা'—শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০

চিঠিপত্র

মুখবন্ধ

'বলাকা' মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করার আগে সুলেখা দাশগুপ্ত বছরখানেক দৈনিক বসুমতী কাগজের মহিলা বিভাগ "বৌঠাকুরাণীর হাট" সম্পাদনা করেছিলেন। সেই সূত্রে একটি মহিলা পাঠক গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল যারা তাঁর লেখা চিঠি এবং সম্পাদনার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই পাঠিকারাই লেখিকাকে বলাকা বের করার প্রেরণা যুগিয়েছেন। 'বলাকা'র চিঠিপত্র বিভাগে তিনি 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র পাঠিকাদের সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র নতুন করে বেঁধেছেন। এই চিঠিগুলোর মধ্যে লেখকের ভাষা, ভাব, গভীর চিন্তা-শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখিকার ভূমিকা ঃ—

যদিও মরণ তেমন কোন ভব্যতার ধার ধারে না যে তার আসার সময় আমাদের সময়-অসময়ের হিসাবের সঙ্গে না মিললে সামান্যতম অপ্রস্তুত হবে। তবু 'মরবারও সময় নেই' বলে যে একটা কথা আছে—কাগজ নিয়ে আমাদের অবস্থাটা চলছে সেই রকম। কিন্তু এটা আমাদের বড় প্রিয় বিভাগ। যাদের সঙ্গে পরিচিত হবার, যাদের চেনবার, জানবার কোনো সুযোগই হয়ত জীবনে মিলবে না, আমাদের সেই বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবো, তাদের সঙ্গে ভালোবাসা গড়ে তুলবো এই চিঠির আদান প্রদানের ভেতর—তাই এটা আমাদের চাই—ই। পত্র-পত্রিকায় চিঠির জবাব বিভাগ না থাকলে পাঠক আর পত্রিকার ভিতর হৃদয়ের যোগ গড়ে ওঠে না—কাগজ হয় কেবল পাঁচমিশালো সংগ্রহশালা এই আমাদের ধারণা। হয়ত দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাবে আপনাদের চিঠির জবাব পেতে, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তাতে আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না।

।। ১।। বিভা মিত্র, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে আমাদের কিন্তু ভাই দুঃখবাদী হবার অধিকার নেই। হাসি, গান, আলো, আনন্দ, আশাদিয়ে ঘিরে রেখে গেছেন তিনি আমাদের। কেবলমাত্র হাত বাড়িয়ে একটি গান কি কবিতার বই টেনে নেবার শ্রমে বুক ভরা মেলে। তবে কেন কারু জন্য বা ঘটনায় মুখ অন্ধকার, ঘর অন্ধকার, জীবন অন্ধকার দেখা! সবাই কি আর মনমত হয়। 'ক্ষণিকা' খানা খুলে বসুন না, আচ্ছা— আজ না হয়, আমিই একটা পড়ে শোনাচ্ছি—

'তোমার মাপে হয়নি সবাই
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে –
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমন কিসের টানাটানি ?

তেমন করে হাত বাড়ালে

সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।...

খুব খানিকটা কেঁদে কেটে

অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া

মনের সঙ্গে এক রকমে

করে না ভাই, বোঝাপড়া

তাহার পরে আঁধার ঘরে

প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো—

ভুলে যা ভাই কাহার সঙ্গে

কতটুকুন তফাত হল।

মনেরে তাই কহ যে,

ভালো মন্দ যাহাই আসুক—

সত্যেরে লও সহজে।

আভা চট্টোপাধ্যায়, মিত্রা চট্টরাজ, সবিতা চৌধুরী,—আপনাদের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। 'বলাকা' ভালো লেগেছে জেনে খুশী হলাম। কিন্তু তবু এ কিছুই হয়নি। আরো কত ভালো করা যায়—তাই ভাবুন, বুদ্ধি দিন, আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করুন—এ কাগজ আপনাদেরই।

আজ আর নয়।

নমস্কার

।।২।। সুরমা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা —

আপনি লিখেছেন—"আমি অর্থনীতিতে এম, এ। আপনার আপত্তি না থাকলে সহজ নিবন্ধে অর্থনীতি ও আয়কর সম্বন্ধে আপনার কাগজে লিখতে পারি।"

আপনি যদি সত্যি সহজ উপায়ে এমন একটা বিষয় পরিবেশন করে সবার মনে একটা ধারণা দিতে পারেন—খুবই ভালো কথা। আপনি লেখা পাঠাবেন। কিন্তু আমি নিজে, কাগজের ঐ পতাকটি পার হব চোখ বুজে। পাছে আপনার প্রবন্ধ পড়ে কিছুও শিখে ফেলি। আমার ধারণায় পৃথিবীর এই একটি বিষয়ে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা যত কম থাকে ততই মঙ্গল! আর আয়কর? উপোষে যে ষ্ট্রেট দায় নেয়না—উপার্জ্জনে দাবী তার মানায় না—আগে দায় তারপরে দাবী। অবশ্য রথীমহারথীদের কথা সর্ব্বক্ষেত্রে আলাদা।

।। ৩ ।। পূর্ণিমা ভট্টাচার্য্য, হাওড়া —

আপনি লিখেছেন, "বলাকার" দাম আর কিছু কম করা যায় কিনা।

ব্যবসা জগতে জিনিসের দাম ফেলা হয় খরচ অনুপাতে লভ্যাংশ রেখে। কিন্তু নতুন মাসিক গুলোকে দাম ফেলতে হয় শুধু লোকের কেনার ক্ষমতার দিকেই নজর রেখে নয়—তাদের কেনার আগ্রহ জাগিয়ে তুলবার দিকেও লক্ষ্য রেখে। তাই কাগজ বার করতে যারা আসেন তারা দামটাকে বড় হিসেবের খাতায় রাখেন না। তাদের পুরোটাই নির্ভর করতে হয় বিজ্ঞাপনের ওপর। সেই নির্ভর ক্ষেত্রের জোর আমাদের কতটুকু তা 'বলাকার' বিজ্ঞাপনের পাতা কটি উল্টে গেলেই বুঝবেন। 'বলাকার' প্রতি সংখ্যায় গড়পড়তা খরচ এক টাকা—বাজারে দর দশ আনা। কমিশন বাদ দিয়ে যে ক' পয়সা ঘরে ফিরে আসে আরো দাম কমালে সেটুকুও ছাড়তে হয়।

।। ৪ ।। সবিতা চৌধুরী, যাদবপুর—

হ্যাঁ, ও চিঠি আপনাকেই লেখা। ভাল গল্পের বড্ড অভাব। তবে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই জানবেন। কিন্তু আমি আপনাদের ভাই প্রবন্ধের দিকটাতে বিশেষ ভাবে ঝোঁক দিতে অনুরোধ করছি। 'চয়নীয়' খুঁজতে বসে সামনে রাখি আপনাদের মুখ---- লক্ষ্য করি সে মুখ 'চয়নীয়' পড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কিনা। এটা আপনারা একাধিকবার পড়বেন। পড়া থাকলেও পড়বেন! দেখবেন ভালো প্রবন্ধে ভাব এবং ভাষার যে উন্নতি করে তা কত স্পষ্ট।

।। ৫ ।। কনকলতা ঘোষ, কলকাতা—

নিশ্চয়ই কাগজ পেয়েছেন? আরো দু'একমাস আপনাদের অনিয়ম বিশৃঙ্খলা সইতে হবে। তারপর আশাকরি গুছিয়ে উঠবো। গ্রাহিকাদের লেখা প্রকাশের একটা আলাদা বিভাগ আমরা খুলতে পারি কিন্তু সেটাই ভালো না। দেরী হোক তবু দশটা ভালো রচনার সঙ্গে স্থান পাক সেটাই ভালো।

।। ৬ ।। গৌরী দেবী, কলকাতা—

সভ্য জগতে সম্মান করা বা দেওয়া নামে একটা বস্তু আছে -- এটা মানুষের আপন পরিচয় বহন করে। অর্থের বা পদ গৌরবের গর্ব্বে সেটা ভুলে গেলে বা তা অগ্রাহ্য করলে নিজের পরিচয়েই অমনুষ্যত্ব আরোপ করা হয়। অপর পক্ষের সাময়িক রাগ বা ক্ষোভ হয় এই মাত্র—অর্থাৎ যেটা আপনার হয়েছে। হয়েছে ঠিক আছে। কিন্তু ঝেড়ে ফেলবেন। অহেতুক অসম্মানও অনেক সময় নীরবেই সয়ে যেতে হয়-- উপায় কি! নিজেকে তো ছোট করা যায় না।

।। ৭ ।। ইলা ঘোষ, বৰ্দ্ধমান—

পরজন্ম আছে কিনা জানিনে। থাকলেও জানি এ জন্মের কর্ম্ম অকর্ম্মের ফলই ওজন্মের ভাগ্যনিয়ন্তা কিনা। জানিনে কর্ম্মফলের স্বর্গ, নরক সত্য কি মিথ্যে। এইটুকুই বলতে পারি—এসব হলো যাদের জীবনে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি, তাদের জীবন-পথকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করে শ্রেয়র দিকে চালিয়ে নেবার অঙ্কুশ। কিন্তু যাদের জীবনেশিক্ষার আলো মিলেছে, যাদের জীবনকে শ্রেয় পথে চালাবার জন্য এসব অঙ্কুশ তাড়নার প্রয়োজন নেই—যাদের ভয় দেখানো বৃথা, পাপ পুণ্যের তীরের খোঁচা দিয়ে সজাগ রাখার চেষ্টা বৃথা—আলোর সুবিধা নিয়ে পথের ভয় গেছে কিন্তু অন্তর মহৎ হয়নি—তাদের সুপথে চালিত করার কি উপায় তা ভাই আমার জানা নেই।

।। ৮ ।। মিতা সেন, আসাম—

আপনার মাধ্যমে আমরা আসামের সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আরো নানা প্রবাসে বাঙ্গালী ছড়িয়ে—জানিনা কোথায় সংখ্যা কত। কিন্তু আসামের প্রবাসী মেয়েদের কাছ থেকে যে সাড়া আমরা পেয়েছি তেমনি আর কোন জায়গা থেকে নয়। আপনাদের সংখ্যা আমায় বিস্মিত করেছে। ... সঙ্কীর্ণতাবর্জিত সত্যনিষ্ঠা আর শালীনতা — এ দুটো আদর্শে অবিচলিত থাকলে মঙ্গলকর যে কোন প্রগতিশীল পদক্ষেপের পাশেই আমরা আমাদের দেখতে পাবো।

।। ৯ ।। সুশীলা দেবী, হাওড়া—

'মেয়েদের কাগজে ছেলেদের লেখা কেন থাকবে।'

মনের এ কাঁটা বুঝি কিছুতেই তুলে ফেলতে পারছেন না আপনারা? ভালো! আষাঢ় সংখ্যাটিতে কিন্তু মেয়েদের কথাই বেশী গেছে। আমার হাত ভরা কি মেয়েদের এত লেখা জড়ো হয় যা দিয়ে মান বজায় রেখে প্রতিমাস চালাতে পারি? তা যেদিন পারবো সে দিন কি আমিই কম খুশী হবো। কিন্তু মহিলা পত্রে ছেলেদের লেখা না নেওয়ার সংস্কার আমাদের নেই। এটা সাহিত্যাসর। ভাবধর্মিতার ক্ষেত্রে দেহধর্মিতা টানতে নেই। শিশুসাহিত্য

বা শিশু পত্রিকা বলতে শিশুদের দ্বারা লিখিত বা তাদের দ্বারা সম্পাদিত বোঝায় না। সেখানে প্রবীণদের ভীড়টাই বেশী। উপমা টানছি বলে মনে করবেন না মেয়েদেরও আমরা তেমনি একটা পর্য্যায়ে ফেলে পুরুষ প্রতিভার আশ্রয় নিতে চাইছি। এখানে নাম শুধু বক্তব্য গত জাতের নির্দেশ, ব্যক্তিগত জাতের নয়।

।। ১০ ।। **ললিতা গুপ্তা, শিলিগুড়ি—**

চিঠির জবাবের জন্যে বা লেখা প্রকাশের জন্যে গ্রাহক না হলে চলবে না - এমন কোন বাধ্য-বাধ্যকতা নেই। উত্তর দেবার মতো চিঠি হলেই উত্তর দেবো, প্রকাশযোগ্য লেখা হলেই সানন্দে তা প্রকাশ করবো। আমরা পাঠক হলেই খুশী। তবে আপন ঘরের লোকের প্রতি আগ্রহটা কিছু থাকে সে তো জানা কথাই।

।। ১১ ।। **প্রতিভা ঘোষ, এলাহাবাদ—**

চয়নীয় পড়তে বলেছি বারে বারে কিন্তু সব বুঝতে পারেন না? কি হয়েছে তাতে। জ্ঞানী, গুণী, মনীষী ব্যক্তিদের সব চিন্তা, সব ভাব-ভাষা আমাদের আয়ত্তে আনতে পারার কথাও নয়। আমার বুদ্ধি যতটুকু গ্রহণ করতে পারে তাই আমার পরম লাভ। প্রবন্ধের ভেতর প্রথমে ঢুকতে কষ্ট হবে ঠিকই—কিন্তু এছাড়া যে নিজেকে সমৃদ্ধ করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

।। ১২ ।। **কৃষ্ণাশ্রী সেন, রাজস্থান —**

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি, — ঝমঝমে বৃষ্টি ভেতর পিয়ন সন্ধ্যার ডাক দিয়ে গেল বর্ষাতি জড়িয়ে। আপনার চিঠির এনভেলাপে জল পড়ে চারিদিকে গেছে কালে ছড়িয়ে - - যেন মরুভূমির দেশের চিঠি জলের স্পর্শ পেয়ে আনন্দে নেচে উঠেছে। কিন্তু একি কাণ্ড? আপনার মুখে আবার ও সম্বোধন কেন! ও ডাক আমার পুরোনো বন্ধুরা ছাড়তে পারেন না— কিন্তু আপনি তো আমার বলাকা বান্ধবী!... বলাকার প্রতি আপনাদের যে আগ্রহ জন্মেছে—যদি তা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলতে পারি, যদি আপনার মতো প্রবাসী মেয়েদের কাছে সে দেশাগত বন্ধু হয়ে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, পারে তেমনি সঙ্গ দিতে তবে তো। ... সেলাই -এর নক্সা নয়, যদি নতুন নমুনার জামা, ব্লাউজ, ফ্রক, বেবী ফ্রক ইত্যাদি এঁকে এবং তা তৈরী করার পদ্ধতি লিখে পাঠান তবে তা নিশ্চয়ই ছাপাবো। এ বারের সংখ্যায় আপনাদের পাঠানো রান্নাই দিলাম। নতুন নতুন ওদেশীয় খাবার, ওদের জীবন ধারা—বিশেষ করে মেয়েদের জীবনের গতি-প্রকৃতি লিখে পাঠান না। শুধু আপনি বলে নয়-এ অনুরোধটি আমি প্রবাসী গ্রাহিকাদের সবাইকেই করছি; যেখানে আছেন সেখানকার মেয়েদের রীতিনীতি; সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি বেশ লক্ষ্য করে দেখে জেনে যদি তাদের জীবন-চিত্র আপনারা লিখে পাঠান তবে তা আমরা প্রকাশিত করবো।

।। ১৩ ।। **জয়ন্তী দেবী, বরদা—**

বলাকাকে ওখানকার বাঙ্গালী সমাজে পরিচিত করার ভার আগ্রহভরে নিজেই নিচ্ছেন— এর চাইতে আনন্দের আর কি হতে পারে। হিন্দী গল্পের অনুবাদ আমাদেরও পাঠান না। আপনার পাঠানো গল্পটিকে যদি একটু ঘুরিয়ে দি তবে কি আপত্তি আছে?

।। ১৪ ।। **মীরা লাহিড়ী, আগড়পাড়া—**

শ্রাবণ সংখ্যা এবারও আপনি পেলেন কিনা জানিনা। এ নিয়ে আপনার নামে তিনবার এই সংখ্যাটি পাঠানো হলো। পোষ্ট অফিসের গোলমালের জন্য তিনবার না হোক, দুবার করে বহু জায়গাই আমাদের কাগজ পাঠাতে হয়—এবং সে জন্যে আমরা কোন নালিশও মনে রাখিনে। কাগজ তো আর বরফের চাকা নয় যে, পথে গলে ফুরিয়ে যাবে। কেউ না কেউ নিয়েছেন আর তিনি নিশ্চয়ই এত হাঙ্গামা করে উনুন ধরাবার জন্যে কাগজখানা নেননি, নিয়েছেন পড়বার জন্যে। তা হলেই হলো। তবে যাকে বলে খুশী হওয়া তাই হতাম যদি, আপনাদের কাগজটি ঠিক মতো পেতে দিয়ে তারা আপন ঠিকানা জানিয়ে আমাদের কাগজ পাঠাতে বলতেন। আগ্রহান্বিত পাঠকের হাতে বা বন্ধুজনের হাতে তুলে দিতে না পারার মতো সংখ্যা গুনে আর বাজার বুঝে কাগজ ছাপানোর

ব্যবসাবুদ্ধি এখনও আমাদের হয় নি। (ভবিষ্যতের হওয়া থেকে যেন ভগবান আমাদের রক্ষা করেন।) তাই এক সংখ্যার জায়গায় ক'সংখ্যা পাঠালাম সেটা কিছু বড় কথা নয়, আপনাকে আমার অন্য কথা বলবার আছে।

চিঠি লিখবার একটা ভদ্র রীতি আছে। আপনি 'অনুগ্রহ' আর 'বাধিত' শব্দ দুটি দিয়ে সে রীতিরক্ষা অবশ্য করেছেন। কিন্তু একটা আরো কিছু ---- সেটা কি -- নিজে না বুঝলে বোঝান কঠিন। আপনি এর আগেও একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, সেটাও ছিল রূঢ়। এখানা আরো।

লিখেছেন, 'বই যদি নিয়মিত না পাই গ্রাহিকা থাকা সম্ভব হবে না। অনুগ্রহ করে টাকা ফেরৎ দিলে বাধিত হব। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় তিন সংখ্যা মাত্র পেয়েছি। যদি শ্রাবণ সংখ্যা পাঠাতে পারেন তা হলেই গ্রাহিকা থাকব। নচেৎ আর বই নেব না। ভদ্র ও শ্রাবণ মাসের বই পত্রপাঠ পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।'

ভাদ্র সংখ্যা আমাদের এখনও বের হয়নি। আর আমাদের চারটি সংখ্যাই এ পর্যন্ত বের হবার কথা এবং তাই বেরিয়েছে, আপনি তার তিনটি সংখ্যাই ঠিকমত পেয়েছেন। চারের ভেতর তিন পাওয়াকে 'মাত্র' বলে না। সংখ্যা না পাওয়া নিয়ে বহু বন্ধুর চিঠি পাই -- কিন্তু ভাবে ভাষায় আপনার খানা অদ্বিতীয়! নতুন কাগজ। চাঁদা দিয়ে ঠকে গেলেন কিনা এ ভয় মনে থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে ঠকা কত? এক সন্ধ্যার সিনেমা খরচ? খান তিনেক সংখ্যা যখন পেয়েছেন তখন একেবারে বাঞ্ছা দিয়ে নিতে চাইন নিশ্চয়ই টাকাটা? তবু যদি হাত গুটোতে হয় তবে যে টাকা ঢেলে হাত গুটাবো তার কত ভগ্নাংশ আপনার ঐ চাঁদার টাকা? বলবেন -- 'তা দেখার আমার কি দরকার। আমার যেন না যায়, আমি তাই দেখব।' খুব বিচক্ষণ কথা। তবুও আপনি চাঁদা দিয়েছেন কিছুটা বোকা বলেই। বেশীর ভাগ মানুষ আপনার চাইতেও বিচক্ষণ -- তারা এও দেয় না। এবং আমাদের মতো মূর্খের দিকে তাকিয়ে হাসে, আপনাদের মতো অদূরদর্শীদের জন্যে দুঃখ করে।

আমরা শুধু আপনাকে নয়, আমাদের প্রতিটি গ্রাহিকাকে অভয় দিয়ে রাখি। (যদিও জানি অনেকের প্রতিই অবিচার করা হচ্ছে এই 'অভয়' শব্দ ব্যবহার করে। কারণ-- তাদের ভয় পাওয়ার কথা তো তারা বলেননি) কাগজ যদি কখনও আমাদের বন্ধ করেই দিতে হয় (ঈশ্বর না করুন) তবে সেটা আপনারা জানতেই পাবেন গ্রাহক চাঁদা হাতে ফেরত পেয়ে। কাগজে-কলমে অঙ্গীকারবদ্ধ রইলাম। কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারবেন।

এত কথা লিখবার চাইতে আপনার গ্রাহকচাঁদা ফেরৎ পাঠানোই আমি নিজে শ্রেয় ভেবেছিলাম! কিন্তু সেটা নাকি নিয়মবিরুদ্ধ। তবু যদি আপনার তাই ইচ্ছে হয় -- জানাবেন। আমি পাঠিয়ে দেবো।

আমার পত্রিকা সম্বন্ধে আমার বন্ধুদের আগ্রহ ও ভালবাসার একটি ছোট নমুনা তুলে না দিয়ে পারলাম না — 'আপনার 'বলাকা' বাজারে কি রকম সমাদর পাচ্ছে? গ্রাহিকা সংখ্যা কত হলো? অবশ্য আপনি রাগ করছেন নাতো? জানতে চাইছি এই জন্যে যে, যে আশা ও উদ্যম নিয়ে আপনি পরিশ্রম করছেন, সে অনুযায়ী সাড়া ও উৎসাহ পাচ্ছেন শুনলে বড় খুশী হবো। আমার দিক থেকে আপনি অভিনন্দন গ্রহণ করুন, আপনার বলাকা দীর্ঘ-জীবী হোক। নিঃসন্তান আমার বলাকাই শেষ দিনের সঙ্গী। -- সতীরাণী দেবী ---- জনাই।'

।। ১৫ ।। অন্নপূর্ণা রায়চৌধুরী, কলিকাতা—

আজ আর চিঠির জবাব লিখতে মন উঠছে না। কেমন যেন বেসুরো হয়ে গেছে মনটা। তারওপর জবাবটা নিয়ে, মুশকিলেও পড়ে গেছি। চিঠিটা পড়তে পড়তে এই কবিতাটি মনে পড়ে গেল, তাই লিখলাম। যদি এতে জবাব মিলল তো মিলল---নইলে আর হলো না--

বাইরে থাকুক মধুর মূর্তি
সুধামুখের হাস্য,
তরল চোখের সরল দৃষ্টি--
করব না তার ভাষ্য।
বাহু যদি তেমনি করে
জড়ায় বাহুবন্ধ
আমি দুটি চক্ষু মুদে
রইব হয়ে অন্ধ।
মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাকো,
মন বলে যা পায় রে

কোনো জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায়রে।
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিস...?
চাই নে রে মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।

'বলাকা', ভাদ্র, ১৩৬২

আপনাদের কাছে আমরা লজ্জিত। এ দুমাস পূর্ব মান অনুযায়ী কাগজ আমরা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারিনি বলে দুঃখের শেষ নেই আমাদের। আপনাদের কাছ থেকে অবশ্যি কোন অভিযোগ আসেনি—কারণ বলাকাকে আপনারা ভালবাসেন। কিন্তু যারা বলার জন্যে তৈরী, তারা ভালোর সময় না বললেও মন্দের সময় তো ছেড়ে কথা কইবে না।

'ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে
সেই যেন কাঁটা দেখে অন্য নহে নহে'—

কিন্তু আমাদের দেশের চক্ষু যেখানে ফুল দেখে, দেখে কেবল ফুলই। যেখানে কাঁটা দেখে, দেখে কেবল কাঁটা। আর যেখানে কাঁটা দেখে সেখানে ভালোর মূল্য দেবার সময় দেয় ফাঁকি—মন্দের বেলায় ফাঁক রাখেনা নিন্দার। অনেকেই হয়তো ভাবছেন বলাকার মুমূর্ষু অবস্থা শুরু হয়ে গেছে—মৃত্যু এলো বলে।

কিন্তু তা নয়। বলাকা ঠিক আছে এবং ঠিক থাকবে জানিয়ে দিয়ে প্রীতি নমস্কারান্তে চিঠির জবাব আরম্ভ করছি—

।। ১৬ ।। আভা চট্টোপাধ্যায় — কলিকাতা,

এতদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে এমন যোগাযোগছিন্ন অবস্থায় থাকতে, এমনকি পত্রোত্তর বিভাগটি পর্য্যন্ত বন্ধ রাখাতে, আমারই কি কম দুঃখ হয়েছে? যদিও কথায় বলে, 'শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়।' কিন্তু সে কথা সত্য নয়। জোর করে শরীর মহাশয়কে কিছু সওয়াতে গেলে, এমন বিগড়ানোটাই তিনি বিগড়ান যে, তারপর সেই মহাশয় ব্যক্তিটির রাগ ভাঙ্গাতে অনেক নাকের জল, চোখের জল এক করতে হয়।

।। ১৭ ।। সুলতা রায় — কলিকাতা,

আপানার সুদীর্ঘ চিঠিখানা পড়লাম। আপনি রাজ্য পুনর্গঠনের অবিচার সম্বন্ধে লিখেছেন, পরাধীন আমরা একদিন ইংরেজের 'সেটেল্ডফাক্ট'কে — 'আনসেটেল' করে দিয়েছিলাম—আজ কি স্বাধীন আমরা পারবো না এই বঙ্গ বিহার এক হওয়া রোধ করতে? পারবো না কি, যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন কংগ্রেসের বহু ঘোষিত নীতি ছিল সেই ভাষাভিত্তিতে কংগ্রেসকে রাজ্য পুনর্গঠনে বাধ্য করতে?

—কঠিন। প্রথমতঃ ঘরের শত্রুর চাইতে বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা অনেক সহজ। দ্বিতীয়তঃ ঘরের শত্রুর মুখে থাকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মুখোস—দশজন চেনে তো পঞ্চাশজন চিনতে পারে না।

।। ১৮ ।। অলকা রায় — হাওড়া,

আপনি লিখেছেন, 'রাজ্য পুনর্গঠন নিয়ে আমি অত্যন্ত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠি দেখে বাড়ীর লোক হাসে। আমিও জানি, আমার এ উত্তেজনা অর্থহীন। কি করতে পারি আমি। কিছুই নয়। বৃথা উত্তেজনায় তবে লাভ কি?'

—লাভ কি! অনেক — অনেক। উত্তেজনার জিনিসটা অন্তরের উত্তাপের বাহিরের প্রকাশ। ভেতরে আগুন না থাকলে উত্তাপের সৃষ্টি হয় না। তাই এটা প্রাণের লক্ষণ। বেশীর ভাগ মানুষইতো বরফের মতো হিমপ্রাণ, মৃত। তারা উত্তেজিত হয়না, অধৈর্য্য হয়না, ওঠে না অন্যায় অবিচারে অসহিষ্ণু হয়ে। আর তাই সম্ভব হয়ে যায় যত অসম্ভব কিছু। ভেবে দেখুন তো, আপনার মতো অনুপায় উত্তেজনায়ও যদি আমরা প্রতিটি লোক উত্তেজিত হয়ে উঠতাম, চঞ্চল হয়ে উঠতাম, ক'দিন লাগত সমস্যার সুসমাধান করতে?

আজ এখানেই শেষ করবো সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। অসুস্থতার সংবাদে আপনারা যে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, যে মঙ্গলকামনা জানিয়েছেন তাতে 'বলাকা'কে যে আপনারা কতটা ভালবাসেন তাই প্রকাশ পেয়েছে। সে জন্যে আমার গর্বের সীমা নেই। আপনাদের সবার চিঠিই আমি পেয়েছি — কিন্তু সবার নাম উল্লেখ সম্ভবপর নয় বলে সে চেষ্টা করলাম না। আশাকরি অপরাধ নেবেন না। নমস্কার।

বাংলা নববর্ষে লেখিকার নিজস্ব ভাবনা ঃ

আপনাদের নববর্ষের সম্ভাষণ আমি পেয়েছি। এবার জানাবার পালা আমার। কিন্তু ভাবছি, নতুন বছরে কি নবকামনা জানাতে পারি—আর কিইবা অর্থ এই জানানোর। নতুন বছর—নতুনের সমারোহ প্রকৃতির চারদিক জুড়ে। কিন্তু এতো প্রকৃতির একান্ত নিজস্ব উৎসব। এতে যোগ দেবো আমরা কি নিয়ে?

গাছ তার পুরানো পাতা ঝরিয়ে দিয়েছে। বন-স্থল রঙ্গিন হয়ে উঠেছে নানা রংএ। পথের রিক্ত বুক ভরিয়ে তুলেছে কৃষ্ণচূড়া — রুক্ষ হাওয়ায় আবেশ ঢালছে বকুল, বেল, যুঁই। তৃণ-লতা গুল্মে—ফুলে ফলে-পাতায় আজ কেবল নতুনেরই খেলা।

প্রকৃতির এই নবযৌবনের মাঝে বসে আমরা নতুনের উৎসব পালন করি। কিন্তু সত্যি কি কোন দিক দিয়ে সামান্যতম নতুনত্ব আমাদের জীবনে উঁকি দেয়? দেহমনে সত্যি কি তার কোন নতুন স্পর্শ এসে পৌঁছায়? প্রকৃতি যে ভাবে নিজে নবযৌবনসাজে সাজে, তার কণামাত্রও কি আমাদের সাজায়? ঐ যে জানালার ধারে বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছটা—যার বাকলে ফাট ধরেছে, শরীরে শেওলা জমেছে, বৃষ্টি ধারায় রেখায় রেখায়, সেও আজ তার একমাথা পাকা পাতা ঝরিয়ে দিয়ে সবুজ চিকুর হাওয়ায় দোলাচ্ছে। বৃদ্ধের মাথার টাকের মতো পোরো জমিটুকু ঢেকে গেছে নতুন কচি ঘাসে। কিন্তু আমরা কি দেখছি — কারু পাকাচুল কাঁচা হতে—, লোল শরীরে লাবণ্যের ঢল নামতে। প্রতিটি নতুন বছর এসে আমাদের যায় আরো এক বছর করে বেশী পুরোনো করে দিয়ে—রিক্ত করে দিয়ে। জীবনে বিশ বছর সে যা দেয় বাকী জীবন দিয়ে তিলে তিলে সে ঋণ আমাদের শোধ করতে হয়—তাই তার দেওয়ার প্রতিও শ্রদ্ধা নেই, নেওয়ার প্রতিও নেই আতঙ্ক। তাকে নিয়ে মাততেও রাজী নই কাঁদতেও না।

তাকে উপলক্ষ্য করে নিজের জন্য বা আপনাদের জন্য কোন কামনা আমার নেই। আপনাদের শান্তি সমৃদ্ধি আমার সব সময়েরই প্রার্থনা।

।। ১৯ ।। অমিতা পাল, হাওড়া।

কাগজ কেন বের করলাম? এটা ভাই অনেককালের মনের কোনে বাসা বাধা ইচ্ছে। ইচ্ছে আর সফলতা এ দুই-এর দেখা সাক্ষাত মানুষের জীবনে বড় বিশেষ ঘটে না। তবু যে আমাদের ইচ্ছে করার শেষ হয় না তার কারণ, মনের বাসার মস্ত সুবিধা আছে যে খালি হবার বা স্থান সঙ্কুলান না হবার কোন ভাবনা নেই। সেখানে চাপাচাপি হয় না বিশ্বের বাসনা, চেপে রাখলেও আমার কাগজ বের করবার বাসনাটিও মাথা গুঁজেছিল কেবলমাত্র এই আশ্রয়টি সম্বলে।

।। ২০ ।। উমা বাগচি ঃ এলাহাবাদ

চিঠির জবাবের জন্য বা লেখা প্রকাশের জন্য বাৎসরিক বা ষাণ্মাষিক গ্রাহক না হলে চলবে না—এমন কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই। উত্তর দেবার মতো চিঠি হলেই উত্তর দেবো, প্রকাশযোগ্য লেখা হলেই প্রকাশ করবো। আমরা পাঠক হলেই খুশী—শুধু চাইব কাগজখানা কিনে পড়া—। আমাদের দেশের পাঠকগোষ্ঠীর গরিষ্ঠ সংখ্যাটির

ঝোঁক পত্র-পত্রিকা (সিনেমা কাগজ ছাড়া) না কিনে পড়বার দিকে। আত্মীয়বন্ধুর বাড়ী গিয়ে ফেরবার মুখে হাতের কাছে যে কখানা বই বা সাময়িক পত্র পাওয়া গেলো—'একটু ভাই পড়তে নিচ্ছি' বলে হাতে তুলে নিতে বা 'কয়েকটা বই দাও' বলতে আমাদের কোন সঙ্কোচের বালাই নেই। যত লজ্জা যেন আরো যার বই তারই। নতুন পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে চেহারার সমাদর সব কিছুর। একটি নতুন তকতকে বই দশ হাত ঘুরে নোংরা হোক এ তিনি হয়তচান না। বই -এর প্রতি দরদ হয়ত তার কিছু বেশীই। কিন্তু সে দরদ প্রকাশ করতে তার লজ্জা বেশী যিনি বেদরদী হাত পাতছেন তার চেয়েও — বই-এর ব্যাপারে এ এক উল্টো সঙ্কোচ-বোধের সংস্কার আমাদের। বই -এর প্রতি আমাদের দরদ নেই, ভালবাসা নেই। পয়সা খরচের মন নেই। আগ্রহ শুধু নিখরচায় নিশ্রমে হাতের কাছে পেলে অপরপক্ষের সঙ্কোচের সুযোগে তুলে আনায়। এ মনোবৃত্তির সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। চাল, ডাল, টাকা ধার করা যদি লজ্জার হয় তবে এই ধার করাটা আরো বেশী লজ্জার। চালডাল ধার করার পেছনে থাকে অভাব। বই ধার করার পিছনে থাকে স্বভাব। এটা কিছুতেই স্বীকার্য্য নয় যে, মাসে টাকা দুটাকা আমরা বইপত্রের পিছনে খরচ করতে পারিনে। শহরের অগুনতি -প্রায় ছবিঘরগুলো বেঁচে আছে কি করে।

ক্ষুধা আর নেশা, এছাড়া আমরা যে পয়সা খরচ করতে রাজী নই, এটা বুঝেই টিসেস কোম্পানী একদিন পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকান খুলে ডেকে, সেধে ধরে বেঁধে চা খাইয়েছিল। আজ গলাকাটা দাম নিক ভেজলীরা কাঠের গুঁড়ো চামড়ার গুঁড়ো মেশাক তবু আমাদের চা চারবার চাই—ই।

নেশা পড়ারও হয়। কিন্তু শক্ত। তবু ভাবি—টিসেসের মতো বিনি পয়সায় বিলোলে কি হবে। সামর্থ্য নেই নইলে তাই করতাম।

।। ২১ ।। অসিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কলকাতা

আপনার চিঠির বিষয়বস্তুটি কমবেশী আমাদের উপস্থিত মন আলোড়িত প্রশ্ন। কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি, আর হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ প্রস্তুতের একগুঁয়েমি, তার দুরন্ত প্রাদেশিকতা, তার বাঙ্গলার ব্যাপারে চক্ষুলজ্জাহীন বিরুদ্ধচারণ -এর ক্ষোভ এর অসন্তুষ্টি আমাদের সবার অন্তরই যে দলিত করছে। কিন্তু উপায় কি বলুন ? নেহেরু-আজাদ-পন্থ এই ত্রিনায়কের নাটক দেখে যাওয়া ছাড়া বর্তমানে আমাদের তো গত্যন্তর নেই। কিন্তু স্বাধীনতা নাটকের শেষ অঙ্ক নয়, এ যে সুরুর অঙ্কমাত্র- এ সত্য তাঁরা ভুলে গেছেন।

।। ২২ ।। নমিতা হাজরা ঃ কলকাতা

জানতে চেয়েছেন, এই অশোক সেন কে—কোন বঙ্গের লোক তিনি ? অনেক নাকি উপায় করেন তবে কিসের লোভে তার এই লোভী চেহারা ?

লোভের কি শেষ আছে নাকি ? শ্রী বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় কি সংসার অচল বলে মন্ত্রীত্ব করছেন ? অর্থ আছে বলেই তো গদী চাই। দেখছেন না গদীর লোভে পত্রিকার মালিক থেকে সাহিত্যিক পর্য্যন্ত কি চেহারা। আর অশোক সেনের দেশ ? পুব বাঙ্গালার মানুষ আমি— তার দেশের নাম বলতে পারব না।

।। ২৩ ।। মনীষা বাগচী ঃ দিনাজপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নেই বলে লেখা পাঠাতে ভয় করবে কেন ? ডিগ্রী তো চাকরীর প্রবেশপত্র। তাকে নিয়ে চাকরীর বাজার যতই মাতিয়ে বেড়ানো যাক সাহিত্যের অর্থাৎ সত্যকার মননশীলতার ক্ষেত্রে সে একেবারেই অচল। সেখানে এমন একটা বিশেষ শক্তির প্রয়োজন যার কাছে মৌনমুখে মাথানত করা ছাড়া উপাধির উপায় থাকে না রক্ষেও তাই। আপনি যে যে কাগজ পাননি জানাবেন, পাঠিয়ে দেবো।

।। ২৪ ।। অসীমা পাল ঃ হাওড়া

কাগজ না পেয়ে চিঠি দিলে বিরক্ত হবো কেন বলুন। সময় মতো কাগজ বের করতে পারছিনে, অপরাধ তো আমাদেরই। অসংখ্য অব্যবস্থা আর নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতর কেবল কোনমতে মাথা বাঁচিয়ে চলছি। কাগজের পক্ষে অপরিহার্য্য বলের কোন বলটা আছে বলুন ? অর্থ, প্রতিপত্তি, দল— কোনটাই নয়। কেবল মনোবলে চলা—আপনারা ধৈর্য্য হারালে চোখে অন্ধকার দেখি।

'বলাকা' চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৬৩
